"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

গল্প-লহরী

সচিত্র-মাসিক-পত্র

দ্বাদশ বর্ষ

সম্পাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু
৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক—সাড়ে তিন টাকা মাসিক—পাঁচ আনা

গল্পলহরী

দ্বাদশ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৩ | প্রথম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বাস্তবের স্বরূপ

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম্-আর্-এ-এস্

'গল্প-লহরী'র লহরে ভেসে ভেসে সর্ব্বদাই হাবুডুবু খাচ্ছেন—'গল্প-লহরী'র পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই। চোখের সাম্‌নে যে সকল ঘটনা নিত্যই ঘট্‌ছে বা কল্পনার সাহায্য নিয়ে সেই সকল ঘটনাকে রূপায়িত করে তাদের আপাত-মনোরম ছবিগুলি এঁকে 'গল্প-লহরী'র সেবকগণ সমাজ-সেবা কর্‌ছেন। কিন্তু এইখানে একটু গোল আছে—যা' কিছু সাম্‌না-সাম্‌নি ইন্দ্রিয় বিশেষের সাহায্যে আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে, সেইগুলো ঠিক কি না, অর্থাৎ, সেগুলো বিশ্বাস্য কি না তা' আমরা হলপ করে যদি বলি তা' হ'লে ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে একটা খাঁটী বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে হয়। কিন্তু এম্‌নি মজার ব্যাপার যে, সব সময় ইন্দ্রিয়গুলো যা' আমাদের সাম্‌নে ধরে দেয় সেগুলো আমরা প্রথমে একরকম বুঝ্‌লেও শেষকালে ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না—অর্থাৎ, প্রথমকার ধারণাগুলো বদ্‌লে যায় এবং ইন্দ্রিয়গুলোর উপর অপ্রত্যয় এনে দেয়। স্বপ্নে যে সকল ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলো ঠিক ঠিক ঘটে নি, বা ঘটে না—তবুও স্বপ্ন দেখ্‌বার সময় সেগুলো আমরা বিশ্বাস ক'রে নি। কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে, জেগে আমরা যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ কর্‌ছি সেগুলোও স্বপ্ন দেখার মত, তা' হ'লে আমাদের চোখের সাম্‌নে ঘটার ব্যাপারগুলোর উপর আর তত্‌টা আস্থা থাকে না।

আজ আমরা এমন একটা বিষয়ের আলোচনা কর্‌বো—যেটার সত্যতা প্রথমে অতি অল্প লোকের হৃদয়ে একটু সত্য বলে স্থান পেলেও অনেকেই রহস্য বলে কাছে ঘেঁসতে ভয় পেত, কিন্তু সেগুলো বিশ্বের দরবারে গিয়ে পৌঁছে বেশ সত্য ব'লে সপ্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এবং মানব-

জাতির মন তা'তে আস্থা স্থাপন করে শান্তি ও সুখ অনুভব করছে।

'গল্প-লহরী'র পাঠকবর্গ সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। এমন কি, তাঁদের অনেকের—যদিও সকলের না হয়—ঘরেই ঐ অসাধারণ মানুষ, মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষের এক একখানি প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে ব'লে বিশ্বাস ক'রলে অপরাধ হবে না। সাধারণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখে বহুলোকে এই মহত্তোমহীয়ান ব্যক্তিকে চিনতে পারে নাই। বুঝতে পারে নাই, এমন কি ধারণাও করতে পারে নাই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকপ্রবর, যিনি ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথমে বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য একটা বিশেষ আয়োজন ও ব্যবস্থা ক'রতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন—সেই অনন্যসাধারণ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিকিৎসা করতে আসতেন। ডাক্তার সরকার বলে গেছেন যে—"যখন থেকে আমি দক্ষিণেশ্বরের এই পরমহংসের চিকিৎসা আরম্ভ করি, তখন থেকে সদা-সর্ব্বদাই তাঁর অতি বিস্ময়কর জীবনের কথা মনে হয়—অন্য সকল দরকারী কায ভুল হয়ে যায়, বা সময় মত ক'রে উঠতে পারি না।" একদিন তিনি বলে উঠলেন যে (শ্রীরামকৃষ্ণকে)—"তোমার চিকিৎসা করতে এসে রোগ নির্ণয় ক'রে ঔষধ দিচ্ছি, এ সব বেশ বুঝতে পারি; তুমি যে সব ভাল ভাল কথা বল, তাও বেশ বুঝতে পারি; কিন্তু তোমার ঐ যে একটা কি হয়—যাকে সবাই বলছে সমাধি—ঐটে আমি কিছু বুঝতে পারছি না—বেশ কথা কইছ, ভাল ভাল উপদেশ দিচ্ছ, ভাল ভাল গানের বিষয় বলছ, কিন্তু হঠাৎ কেন যে তোমার ঐ রকম একটা কি হয়ে যায় তা' বুঝতেই পারি না—এবং বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে সেটা বোঝবার চেষ্টা করেও সেটার কিছুই হদিস্ পাচ্ছি না—হাতে নাড়ী দেখি নাড়ীর কায বন্ধ, সব নীরব নিথর—অর্থাৎ, যাকে বিজ্ঞানের মতে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যায় না—কিন্তু তারপর দেখি খানিক পরে তোমার সংজ্ঞা ফিরে আসে, তোমার চেতনা হয়। আমি অনেক চেষ্টা করছি—এটাকে কিন্তু ধরতে পারছি না।" এতে প্রমাণ হয়—এমন অনেক বাস্তব আছে, যা' মানুষের সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর নয়—এমন কি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়ও নির্ণয় করা যায় না।

উপরে আমরা সাধারণ মানুষের শক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছি—তবে এমন অনেক অনন্যসাধারণ মহামানব ছিলেন ও আছেন, যাঁরা ভবিষ্যতের বাস্তব ঘটনা পর্য্যন্ত—অতীত ও বর্ত্তমানের বাস্তব ঘটনার কথা দূরে থাক—বলে দিতে পারতেন বা পারেন। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে রামধন মিত্রের গলি-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে পরলোকগত) মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন—এবং মুখুয্যে-মহাশয়ের বাড়ীর বৈঠকখানাটি লোকারণ্যে পরিণত

হয়েছিল। বহু মনীষী ভক্ত ও পল্লীবাসী শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দুইজনের নাম করলেই বোঝা যাবে যে, ঐ সভা কিরূপ লোকে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও পূতচরিত্র মনীষী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবরণটী আমরা স্বর্গীয় স্বনামধন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মুখে শুনি। তিনি বাগবাজার 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সমিতি'র চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"এম্-এ পরীক্ষা দিয়ে কিছুদিন প্রাণখুলে অবসর উপভোগ করছি, এমন সময় একদিন সকালে শুন্‌লুম দক্ষিণেশ্বরের মহান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের পাড়ার প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে এসেছেন। কৌতূহল চরিতার্থ করা এবং অমন একজন ধার্ম্মিক মানুষকে দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে গেলুম—কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর বৈঠকখানায় তিলধারণের স্থান নাই, প্রবেশ-লাভই অসম্ভব, বসবার স্থান পাওয়া ত দূরের কথা। তদুপরি এ দরজা ও দরজা ঘুরে দেখি—সাম্‌নে কলিকাতার তৎকালীন প্রধানতম দুইজন মনীষী ব'সে আছেন—যাদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দেশবিখ্যাত এবং যাঁরা জাতির শ্রদ্ধার পাত্র—শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। স্বভাবতই কেমন সঙ্কোচ এল—কি করে তাঁদের পাশে গিয়ে বস্‌তে পারি—তাই সেখানে স্থান গ্রহণ করবার চেষ্টা থেকে বিরত হলুম এবং গৃহের এককোণে দরজার একপাশেই দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ কর্‌তে লাগ্‌লুম। দেখ্‌লুম, তাঁদের সাম্‌নে একজন এলোথেলো কাপড়-জামা-পরা একটা কেমন নতুন ধরণের লোক বসে আস্তে আস্তে কিছু কিছু বাক্যালাপ কর্‌ছেন—সাদাসিদে মোটা কথায়। কোনও গুরুগম্ভীর শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যাও নয়, কোনও জটিল দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণও নয়। ভাবতে লাগ্‌লুম—এই সকল সামান্য আলোচনা ত সকলেই জানে ও করতে পারে, তবে কেশব ও প্রতাপবাবুর মত অশেষ প্রতিভাশালী লোক এঁর কথা কেন অত আগ্রহসহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুন্‌ছেন। বুঝ্‌তে পারলুম না—তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি—বড় বড় ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদের মস্তিষ্ক আলোড়নকারী তত্ত্ব হজম করে এসে, এই সামান্য লোক-ভোলান কথাগুলিকে আমল দিতে পারলুম না—এবং পরমহংসকে তেমন বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে উঠ্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু ঐটেই হেঁয়ালি হ'য়ে মনকে মাঝে মাঝে বিচলিত কর্‌তে লাগ্‌ল—কেশব, প্রতাপবাবুরা অত উদগ্র হয়ে কি শুন্‌ছেন।

"এমন সময় একটি যুবক আমাদের দিকে পেছন করে ঘরে ঢুকল এবং ঠেলে-ঠুলে তাঁদের সাম্‌নে মাঝামাঝি গিয়ে বস্‌ল। এই সময় এমন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঐ যুবক পরমহংসের কাছে বসবামাত্রই (অবশ্য তাঁকে ও উক্ত মনীষীদ্বয়কে নমস্কার ক'রে) তিনি আনন্দে অধীর হয়ে প্রায় কতকটা উন্মাদের মত, ব'লে উঠ্‌লেন—'তুই এতক্ষণ পরে এলি, বস্, বস্, বিষয়ী লোকদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে আমার মুখটা জ্বলে যাচ্ছিল—আয়, আয়, তোর সঙ্গে দুটো ঈশ্বরীয় কথা বলে মুখটা শীতল করে নিই।' কথাটা শুনে পূর্ব্বেই বলেছি আমার মাথাটায় ঝনাৎ করে একটা আঘাত লাগ্‌ল—ভাবলুম এ কি রকম মহান্তরে বাবা, এতগুলি শিক্ষিত গুণী, জ্ঞানী, বিশেষতঃ কেশব, প্রতাপবাবুদের সাম্‌নে কথা বল্‌তে বল্‌তে এঁর মুখ ঝল্‌সে যাচ্ছিল—এবং এমন কে-ই বা একজন পীর-পয়গম্বর এলেন, যাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর প্রাণমুখ শীতল হবে। বিস্ময় ও সঙ্গে সঙ্গে অশ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ফিরে ঘুরে খোঁজ নিয়ে জান্‌লুম যুবকটী কলিকাতার সিমলা-বাসী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ। বিশু দত্ত এটর্ণীর নাম তখন সকলেই জান্‌ত এবং জেনারেল এসেমব্লীর ছাত্র নরেন্দ্রকে আমরা জান্‌তুম। কিন্তু সে জানাটা ঠিক উলটা রকমের ছিল—অর্থাৎ, খুব ভাল ছেলে ব'লে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় থাক্‌লেও তার অতি চঞ্চল প্রকৃতি সহাধ্যায়ীদের চিরদিনই উত্যক্ত কর্‌ত এবং যাদের অশেষ সহ্যগুণ এমন দু'-একজন ছাড়া বাকী সহপাঠীরা তাকে ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চল্‌ত। অত্যন্ত উদ্দাম, অত্যন্ত বাকচাতুর্য্যপূর্ণ, অথচ

মেধাবী—এবং বহু বিষয়ে অধিকারী এবং সকল বিষয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী চপল যুবক—এই তার পরিচয়।

"এই ছোক্‌রার ভেতর দক্ষিণেশ্বরের মোহান্তজী কি এমন দেখেছেন যে, তাকে পেয়েই—ঐ সকল অপরূপ কথা বলে ফেল্‌লেন! এইটুকু বুঝে উঠ্‌তে গিয়ে মনে হ'ল মহান্তজী বোধ হয় অনেক ধর্ম্ম সাধনা করে মাথা কিছু খারাপ ক'রে ফেলেছেন—কিন্তু আমাদের এ ধারণা চরম সীমায় উঠে গেল এবং স্থির সিদ্ধান্ত করলুম যে,—মহান্তজী নিশ্চয়ই বায়ুরোগগ্রস্ত, যখন তিনি বলে ফেল্‌লেন—'দেখ কেশব, দেখ প্রতাপ—তোমরা যত লোক এই ঘরে বসে আছ, তাদের মধ্যে এই ছোক্‌রা সকলের চেয়ে বড়।' তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে, বহু সাধন ভজন করলে কা'রও কা'রও মস্তিষ্কের বিকৃতি হওয়া অসম্ভব নয়। তার পরের কথাবার্ত্তা ও গানের উপর আর তেমন আস্থা রইল না। বাড়ী ফিরে এলুম—যা' দেখ্‌ব বলে আশা করে ওখানে গিয়েছিলুম—তার কিছুই হ'ল না, বরং উল্‌টা ঘটল।

"এরপর বহু বর্ষ কেটে গেছে, তখন আমি হাইকোর্টে এটর্ণীর কাজ করছি—আঠার শ' তিরানব্বই সালের 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' পত্রিকায় একদিন হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল। তা'তে দেখলুম, কে একজন বাঙালী সন্ন্যাসী আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চিকাগো সহরে অনুষ্ঠিত মহাধর্ম্মমেলায় ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন ক'রে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ও সেই মেলায় উপস্থিত নানা জ্ঞানি-শিরোমণিদের ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিকট হিন্দুধর্ম্মের পরিচয় দিয়ে তাদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন—এবং দেশের ধর্ম্মকে জয়ী ক'রে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে জগৎবরেণ্য করেছেন ও নিজে শত শত জয়োল্লাস পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সেদিন কাগজে ঐ সন্ন্যাসীর নাম ছিল না। পরে যেদিন ঐ চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার সংবাদ পাই, সেদিন পড়লুম—ঐ সন্ন্যাসীর নাম বিবেকানন্দ স্বামী—ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ও কলিকাতার বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র নরেন্দ্রনাথ। তখন মনে ধিক্কার এল—কি ভুলই করেছিলাম! হায়! হায়! তখন কেন সেই পরমহংসকে চিন্‌তে চেষ্টা করলুম না—যাঁর নিকট সে অসম্বন্ধ বাক্যগুলি শুনে আমি বা আমার মত কয়েকজন ইংরাজি শিক্ষাভিমানী যুবক অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা নিয়ে ফিরে এলেও মহামনীষী কেশব, প্রতাপ শিষ্টের ন্যায় গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন—একটুও চাঞ্চল্য দেখান নাই। তবে একথা বলা হয় নি যে, নরেন্দ্রনাথ ঐ তুলনামূলক কথা শুনে অতি লজ্জিত হয়েছিলেন এবং বারংবার বলে-ছিলেন—'আপনি ও কি বল্‌ছেন—ও কি বল্‌ছেন'!"

এরপর ভূপেন্দ্রবাবু বলে উঠলেন যে—"সেই দিন থেকে আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি কথা সাগ্রহে মনোনিবেশে গ্রহণ করতে আরম্ভ করি; এবং পরে বিবেকানন্দ স্বামী বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে এসে কি ভাবে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা' আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং তাঁর ও তাঁর ইষ্টদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপর প্রাণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ঢেলে আস্‌ছি। তাই আজ অবসর পেয়ে আমি এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে আমার মনের অজ্ঞতারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলুম।"

এখানে আর একটি কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটা এই—আমেরিকার হারভাড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক রাইট্ (প্রফেসার রাইট্), অধ্যাপকমণ্ডলীর সমক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় দেবার সময় বলেছিলেন—"এক কথায় এঁর (বিবেকানন্দের) পরিচয় এই যে, আমরা সকলে আজ যে এখানে সম্মিলিত হয়ে বসে আছি এই সকলকার পাণ্ডিত্য একত্র হলেও তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে খাটো হবে।"

এই অধ্যাপকপ্রবর স্বামীজীকে একখানি পত্রে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থ লিখেছিলেন যে, "সূর্য্যকে আলোক বিকীরণ করবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ও আপনাকে নিজ প্রতিপত্তির পরিচয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করা—এই উভয়ই এক পর্য্যায়ভুক্ত।

'গল্প-লহরী'র অনেকটা স্থান বাজে গেল—তবুও এ চিত্র আঁকা হ'ল এই জন্য যে, যুগাবতারের শতবার্ষিক উৎসবের সময় যদি শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প দু'-একটা বলা যায় ত বোধ হয় অসমীচীন হবে না। বিশেষত, গল্প-লেখকেরা যে বাস্তবের কথা লিপিবদ্ধ করছেন—নিজেদের চোখে দেখে—সেগুলি যে প্রকৃত বাস্তবের রূপ, তা' হয় ত অনেক সময় প্রমাণ করা দুঃসাধ্য এবং ইন্দ্রিয় সাহায্যে যা' উপলব্ধ হয় বা বিজ্ঞান সাহায্যে যা' উপলব্ধ হয় তার উপরও জিনিষ আছে—যা' ইন্দ্রিয় সাহায্যে বা বিজ্ঞান সাহায্যে নির্ণীত হয় না—অনেক সময় ইন্দ্রিয় সাহায্যে গৃহীত অনুমান বা ধারণা মিথ্যায় পরিণত হয়—এবং ইন্দ্রিয় যা' বুঝ্‌তে পারে না, বা মিথ্যা বলে হাঁকিয়ে দেয়, তাই বাস্তবে পরিণত হয়। সেই রকমের দু'-একটা খাঁটী বাস্তবের পরিচয় দেবার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা গেল। এ সকল আসল বাস্তবের গল্প 'গল্প-লহরী'তে স্থান পাবার অবকাশ পাবে কি না জানি না—যদি পায়—মানুষের স্বরূপ পরিচয়ের বাস্তবটি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সাহায্যে প্রচার কর্‌তে চেষ্টা করা যেতে পারে—যদি চাহিদা থাকে।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

ঘূর্ণী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষ্টেশনের প্লাটফরমে অনুপ পায়চারী করিতেছিল। বাড়ীর বিচ্ছেদ-ব্যথা তার বুকে, বিষাদের ঘন কালিমা তার মুখে চোখে; কিছুতেই সে মর্ম্ম-যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকিতে পারিতেছিল না।

পিছন হইতে কে একজন অতিসন্তর্পণে তার স্কন্ধে একখানি হাত রাখিল। মনে হইল—এ পেলব স্পর্শ যেন কুসুম হার। অনুপ পিছু ফিরিয়া চাহিল। দেখিল—কে এক নারী! পরিচয় কোনদিন ইহার সঙ্গে হইয়াছিল বলিয়া স্মরণে না আসায় অনুপ কিছু বিব্রত হইয়া উঠিল। অপরাধী কণ্ঠে বলিল, "আপনি—?"

বাধা দিয়া নারী বলিল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

ইহার পরও অনুপ নিজের স্মরণ শক্তিকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। নিজের অপ্রস্তুতভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া বলিল, "যাব মুজাফরপুর, টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা হচ্ছি। বাঙ্গালী জীবনের চরম পরিণতি চাকরী জানেন ত—হাতে পেয়ে তাই ছুটে চলেছি, পাছে ফস্‌কে যায়।"

মেয়েটী কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া হঠাৎ হাসিল। বলিল, "বেশ হ'ল। আমার জন্যেও একখানা টিকিট কেটে আনুন।"

অনুপ হাসিয়া বলিল, "প্রয়োজন হবে না, একখানা বাড়তি টিকেট কেনাই আছে।"

মেয়েটী হাসিবার চেষ্টা পাইয়া বলিল, "সে টিকিটের মালিক কোন অভিযোগ তুলবেন না ত?"

অনুপ পরিহাসের লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না। বলিল, "তোলেন, আপনাকে 'ডাবলিউ-টি' বলে ধরিয়ে দেওয়া যাবে তখন। এখন ত চলুন।"

মেয়েটী, হঠাৎ যেন কেমন বিষণ্ণ হইয়া গেল; একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল, "না থাক্, আপনি আমার জন্যে—"

অনুপ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "মালিক কেউ আসে নি, আসবেও না। স্নেহ-অন্ধ হরিহর দা' একে ত বাতে পঙ্গু, তার ওপর বৌদি'র কঠোর শাসনে তিনি শয্যাশায়ী। আর আছেই বা কে, যাবেই বা কে।"

কণ্ঠটা ভিজিয়া আসিল। মেয়েটী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা' হ'লে এ পথের বোঝায় আপনার আপত্তি নেই—কি বলেন?"

বেশ সহজ সরল কণ্ঠে অনুপ বলিল, "না, মোটেই নয়। চলুন গাড়ী ত এল, উঠে বসা যাক্?"

মেয়েটী বলিল, "আপনার মাল-পত্র?"

অনুপ বলিল, "মুটে সে সব তুলে দেবে 'খন। আপনার কি কি আছে?"

মেয়েটি ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমার আছি আমি, তাও ক্রম পরিবেষ্টিতা লতৈব—আপনার বাহু-সংলগ্না হ'য়ে। এটা যদি মুটের হাতে ছেড়ে দেন, আপত্তি নেই।"

অনুপ কথায় ইহার জবাব দিল না, দিল কার্য্যে; ধীরে, অতি সন্তর্পণে নারীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে মুটের হাত হইতে বিছানাটা টানিয়া লইয়া এক দিক্‌টায় বিছাইয়া দিয়া বলিল, "নিন্, এবার ভাল হ'য়ে বসুন।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। দিগন্তের দিকে চাহিয়া অনুপ আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। এতক্ষণ পরে মেয়েটীর নূতন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা আর করা চলে না; অথচ, স্মৃতির কোন পরদা তুলিয়াও রং তুলিতে ফুটান যায় না। এ রূপ তার মানস-পটে কিছুতেই উদিত হইতেছিল না।

নির্জ্জন কামরা। যাত্রী কেবল মাত্র তাহারা দুইজন। কিন্তু এতক্ষণ সব কথাই যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মেয়েটী বলিল, "কি এত ভাবছেন, আমার নাম কই জিজ্ঞেস করলেন না ত?"

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে গাড়ী থামিয়া গেল। অনুপ বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, তারপর আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "এত পুলিশ কেন, কি চায় ওরা?"

কিন্তু ফিরিয়াই সে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল।

দুই

পুলিশের লোক তিন চার দলে বিভক্ত হইয়া প্রতি কামরায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এবার দ্বার ঠেলিয়া তাহাদের কামরায় ঢুকিয়া একজন পদস্থ লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মেয়েটীকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি কে, নাম কি ওঁর?"

বিছানার উপর মেয়েটীকে শোয়াইয়া দিয়া অনুপ তখন অতি সন্তর্পণে তার গায়ে নিজের গায়ের শালখানির আচ্ছাদন দিতেছিল। ফিরিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী, নাম বেলা। বিরক্ত না করলে সুখী হবো, উনি অসুস্থা।"

লোকটী বিনীতভাবে বলিল, "মাপ করবেন, কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক কিছুই আমাদের করতে হয়। আচ্ছা, একটা কথা—সুষমা নামে কোন স্ত্রীলোককে এ গাড়ীতে উঠ্তে দেখেছেন কি?"

অনুপ দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "না। আপনার প্রশ্নের দিক্‌টা সংক্ষেপ করে নিলে সুখী হবো। উনি 'নার্ভাস ডিবিলি'তে ভুগছেন—কোন উত্তেজনা সহ্য করতে পারেন না।"

নামিয়া যাইবার মুখে পদস্থ কর্ম্মচারী অন্য একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি ঠিক্ দেখেছ ত যতীন?"

"নিশ্চয়! সে এ গাড়ীতে উঠেছে স্যার। আমার চোখে ধাঁধা—না, কোন রকমেই সে দিতে পারে না—বিশেষ নারী হ'য়ে।"

"কিন্তু এ নারী তোমার আমার চেয়ে কম বুদ্ধিমান নয়, এখন এটা বুঝতেই পাচ্ছ?"

তাদের স্বর দূরে মিলাইয়া গেলে, মেয়েটী ধড়মড করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওদের ডাকুন, আমিই সুষমা।"

অনুপ করুণ আর্ত্তস্বরে বাধা দিয়া বলিল, "কি করেন, থামুন। কেউ শুনতে পেলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমার কি দশা হবে বলুন ত?"

সুষমা গম্ভীর স্বরে বলিল, "কিন্তু আপনি ত জানেন না কার সঙ্গে চলাফেরা করছেন—বিশেষ, ওদের সাম্‌নে যে সম্বন্ধ পাতালেন, তারপর আর উচিত কি এভাবে একত্র চলাফেরা করা?"

অনুপ চুপ করিয়া রহিল। উচ্ছ্বাসের মুখে কোন কথা না বলাই যে কর্ত্তব্য, তাহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছিল। সুষমা বলিতে লাগিল, "আমি পালাতে চাই, কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায় সে কথা একবার ভাবি নি। যার আশ্রয় গ্রহণ করবো, তাকেও বিপদের বেড়াজালে জড়িয়ে—"

অনুপ ধীরকণ্ঠে বলিল, "আর আমি তা'তে স্বেচ্ছায় যদি রাজী হই?"

"কিন্তু কেন—কি সম্পর্ক আপনার আমার সঙ্গে? তা' ছাড়া, আমি যে কতবড় সাংঘাতিক মেয়ে, তা' ত আপনি—জাতে কি তাই কি জানেন—জানেন কি আমি সধবা না বিধবা?"

অনুপ এতক্ষণে যেন কূল পাইয়া বলিল, "আপনি হিন্দু কুমারী।"

"কি করে জানলেন, কে বল্‌লে আপনাকে? ওরা কি—কিন্তু না, যা' কিছু কথা আমার সাম্‌নেই ত হ'ল—তবে? দেখুন, আপনার অপরিচিতা, অজ্ঞাত কুলশীলা, বিপদ আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আর তা' আমার স্বকৃত—না না, আপনি আমায় ত্যাগ ক'রে অন্য গাড়ীতে আশ্রয় নিন্ গে।"

অনুপ ফিকে হাসি হাসিয়া বলিল, "এরপর তা' হয় না—কারণ, আপনিই বুঝ্‌ছেন। ও ধূর্ত্ত লোকগুলার মনে সন্দেহের ছাপ একেবারে যতদিন মুছে না যায়, আপনায় আমায় ছাড়াছাড়ি অসম্ভব। তবে নারীর সম্মান আমি রাখ্‌তে জানি কি না সেটা আপনার জানা নেই—দেখুনই না পরীক্ষা করে।"

সুষমা বলিল, "আমি হিন্দু কুমারী—কই, সে সন্দেহ ত মেটালেন না? তবে, তবে কি আপনিই একজন—"

অনুপ হাসিয়া বলিল, "না, আমি ও টিকটিকি-মিকটিকি নই, একজন হাসপাতালের ডাক্তার। নূতন চাকরী পেয়ে কাজে যোগদান করতে চলেছি। হ্যাঁ, আপনি যে হিন্দু কুমারী, তার প্রমাণ আপনার হাতের ওই নোয়া। হিন্দু কুমারী ছাড়া—"

মেয়েটী ধীরকণ্ঠে বলিল, "বাঁচলুম, যাক্। হ্যাঁ, আমাদের একত্র বাসই দেখছি এখন নিয়তির পরিহাস। কিন্তু আমার ব্যয়ভার আমাকেই চালিয়ে নেবার অবকাশ দিতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জন করবার সুযোগে বাধা দিতে পারবেন না। এ যদি স্বীকার না করেন, আমি নিজেই ওদের ডেকে—"

অনুপ মিনতিভরা স্বরে বলিল, "সেটুকু করবার সুযোগ যখন তখনই ত পাবেন, এখন একটু ধৈর্য্য ধরতেই হবে। অভিনয় হলেও বাহ্যিক, বাস্তবের তুলিতে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ফুটতে দিতে হবে। অন্তরে থাকবে—সুমেরু আর কুমেরুর ব্যবধান।"

মেয়েটী হঠাৎ অনুপের গায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "চুপ্! কেউ যেন আসছে।

তিন

মুজাফরপুর পর্য্যন্ত কোন বিপদপাত হইল না।

হাসপাতালে উপস্থিত হইতেই সিনিয়র সার্জ্জেন মিঃ কডলিট্ বলিলেন, "আপনি সস্ত্রীক এসেছেন, বেশ ভালই হয়েছে। আমাদের একজন সিষ্টার এইমাত্র আমাদের ছেড়ে গেলেন। তাঁর শূন্য পদ পূর্ণ করবার জন্যে আমরা মহা বিব্রত হ'য়ে পড়েছি। আপাততঃ যে ক'দিন না কাউকে পাওয়া যায়, উনি কি আমাদের একটু-আধটু সাহায্য করতে পারবেন না?"

অনুপ কথা কহিবার পূর্ব্বেই সুষমা বলিল, "ধন্যবাদ! আমি নিজে হ'তেই কথাটা তুলতে চাইছিলুম। অন্য কাউকে না খুঁজে আমাকেই পাকা বাহাল করতে পারেন না কি? আমিও এ বিষয়ে একেবারে 'নভিস' নই—মেডিকেল লাইনে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমি। সার্টিফিকেট ছিল—এখন কিন্তু চাইলে দেখাতে পারব না, হারিয়েছে। তবে অন্ধ বলে হয় ত কিছু অসুবিধে—"

মিঃ কডলিট্ বিস্ময়সূচক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অন্ধ, সে কি! দেখি, দেখি। না না, আপাততঃ জগতের আলো আপনার কাছে কুয়াসা-জালে ঢাকা হ'লেও, আমি বলছি—আপনাকে আমিই নিরাময়ের পথে ফিরিয়ে আনব।"

সুষমা হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদ! তবে আমার মতে পাখী ডানা কাটা হয়েই থাকা ভাল নয় কি? তা'তে দানা জল পাবার অনেক সুবিধেই হয়।"

সার্জ্জেন সাহেব হয় ত সন্দেহ মুক্ত হইতে পারিলেন না; ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সুষমাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। কয়েকটী মাত্র, কিন্তু ইহার সমাধান এ শ্রেণীর লোক না হইলে করা অসম্ভব। সুষমা কিন্তু হাসিতে হাসিতে প্রত্যেক কথাটীরই উত্তর দিয়া চলিল।

কডলিট্ বেশ সন্তোষ-মাখা হাসি হাসিলেন। তারপর একখানা খাতা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ডিউটির খাতায় আপনার নাম লিখে দিচ্ছি মিসেস্।"

সুষমা ধীর হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বলিল, "রায়, মিসেস বেলা রায়।"

তারপর অনুপের দিকে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বিব্রত অনুপ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল। এবার যা' হয় একটা বলিবার অজুহাতেই বলিয়া ফেলিল—"আমাদের কোয়াটার—"

মিঃ কডলিট্ ত্বরিত কণ্ঠে বলিলেন, "মাফ্ করবেন রায়, কথাটা আমারি আগে তোলা উচিত ছিল। হ্যাঁ, উত্তরের একটা কোয়ার্টার একেবারে নির্জ্জন। আমার মনে হয় আপনার বিশেষ তা'তে অসুবিধে হবে না মিসেস রায়? আমাদের সিষ্টার ওইটেই নিজে পছন্দ করে রেখেছিলেন; আজ চলে যাবার আগে তার সবটুকুই আপনাকে নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দিয়ে গেলেন।"

সুষমা সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে বলিল, "তিনি কি বদ্‌লী হলেন?"

কডলিট্ ব্যথাতুর হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মিসেস্ রায়—তবে জগতের এপারে নয়, ওপারে!"

চার

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনুপ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন বোধ করছ সু?"

ফিকে হাসি হাসিয়া সুষমা কহিল, "না না, সু নয়, সে মরেছে—আমি মিসেস বেলা রায়। জানেন ত পুলিশ পেছনে আছে।"

অনুপ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "জমিদার অতুলন চৌধুরীর তরফ হ'তে এটর্ণী পূর্ণবাবু বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—সন্তোষ লাহিড়ীর মেয়ে সুষমাকে ফিরে যেতে; তার বাপের বিষয় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ কি, তুমি সু?

সুষমা গম্ভীর হইয়া বলিল, "কথামালায় আছে—'দুষ্টের ছলের অসদ্ভাব নেই।' এও তাই। তবে লোকটা যে না মরে ফাঁসির ফ্যাসাদ থেকে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছে, এজন্যে ধন্যবাদ!"

অনুপ ত্যক্তকণ্ঠে বলিল, "মরুক সে! এখন আছ কেমন, তাই বলো?"

সুষমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আছি স-ব্যাণ্ডেজ বিছানায় শুয়ে। আচ্ছা, বলুন ত—এ অপারেশন করলে কে?"

"আমি। সাহেব কিছুতেই ছুরী ধরলেন না যখন, তখন যা' হোক্ একটা গোঁয়ার্ত্তুমী করে বসেছি। তারপর থেকেই কিন্তু অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি। আচ্ছা, হঠাৎ তোমার এ খেয়াল গেল কেন বলো ত?"

সুষমা বলিল, "কেন, হ'ল বেশ, নয়? চোখ ত গিয়েই ছিল, যদি ফিরে আসে, চিরদিন একটা নাড়া দেবার পন্থা থাক্‌বে।"

আগ্রহে রোগিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চিরকাল! তা' হ'লে চিরকালের অধিকার আমায় দিচ্ছ ত সুষমা?"

"আবার সুষমা?"

"আচ্ছা, বেলা। তা' হ'লে—"

সুষমা স্মিতহাস্যে বলিল, "আচ্ছা, আগে আমার জীবনের পুরনো কাসুন্দিটা শুঁকে দেখুন—যদি ঘৃণা, বিরক্তি, তাচ্ছিল্য না ধরে, তখন যা' বল্‌বেন শুন্‌ব।"

"না, আমি শুন্‌ব না, শুন্‌তে চাই না—আমি তোমায় যেমনটী পেয়েছি, ঠিক্ তেমনিটীই চাই!"

গম্ভীর হইয়া সুষমা বলিল, "তবে আমারও স্পষ্ট কথা—জীবনে যেমন মুক্ত আছি, তেমনি থাক্‌ব, কারুর বন্ধনে পা দেব না। যান্, আমার কাছে থাক্‌তে হবে না আপনাকে।"

"কিন্তু তুমি যে বড় দুর্ব্বল।"

"হোক্। এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই সব কথা স্বীকার পাওয়া ভাল। নইলে—শুনুন আপনি।

"বাবা মারা গেলেন, আমি তখন মাত্র আই-এ পাশ করেছি। মা অনেক আগেই বাবার সেবার ঘর সাজাতে চলে গিয়েছিলেন!"

গলাটা রীতিমত দুলিয়া উঠিল। অনুপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, এ তোমাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, হত্যা করা। আমি—"

হাত বাড়াইয়া তার হাত টানিয়া নিজের বুকের সহিত মিশাইয়া রাখিয়া সুষমা বলিতে লাগিল, "মকর্দ্দমা চল্‌ছিল। জানি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পরে ঠকিয়ে খাচ্ছিল। সেই জন্যে বাবা কতকটা জেদে পড়ে, কতকটা মানের দায়ে বিপক্ষের সাথে যুঝে যাচ্ছিলেন। এবার সে পথ চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ ত হ'লই, অধিকন্তু আমার দাঁড়াবার স্থল রইল না!"

নিশ্বাস ছাড়িয়া অনুপ বলিয়া উঠিল, "এ পৃথিবীতে মানুষ নেই সু, এটা জানোয়ারের চিড়িয়াখানা!"

সুষমা হাসিল। তারপর বলিয়া চলিল—"আমি পল্লীর এক প্রবীণ ডাক্তারের পরামর্শে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হলুম। তাঁর নিজের চেষ্টায় আমার পথে বাধা দাঁড়ালেও টিঁকে রইল না।"

অনুপ আগ্রহ উত্তেজনায় বলিয়া উঠিল, "তুমি ভাল

হও সু, আমরা গিয়ে এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব।"

সুষমা বলিল, "পাশ হলুম। চাকরীর প্রাক্কালে রাহু উদয় হ'ল গুরুপুত্ররূপে। এসে বললেন, 'তোমার মত বড় ঘরোয়ানা মেয়ের এ অবস্থা—না, আমি দেখ্‌তে পারব না সুষমা! চলো আমার বাড়ী; আমি তোমায় যা' হোক্ শাক ভাত দিয়েও মানের আসনে বসিয়ে রাখব।' হায়, নারী আমি, চাতুরী ধরতে পারলুম না! সঙ্গে গেলুম।"

নিশ্বাস রোধ করিয়া অনুপ শুনিতে লাগিল। একটু চকিত হইয়া সুষমা বলিতে লাগিল, "অতুলন চৌধুরীর গুপ্তচর তিনি। আমি কয়েদ হলুম শত্রু-পুরীতে। যখন বুঝ্‌লুম, তখন পালাবার কোন পথই খোলা ছিল না। অতুলন নিজে এসে যে প্রস্তাব করলে, তার বিনিময়ে লাথি খেয়ে চলে গেল। সে যাবার সময় শাসিয়ে গেল—এর প্রতিফল সে নেবেই!"

অনুপ শিহরিয়া উঠিল। সুষমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "বলেছি ত ঘৃণার হাত এড়াতে পারবে না।"

বাধা দিয়া অনুপ কহিল, "তা' নয় সু, আমি চাই সেই নর পিশাচকে একবার দেখে নিতে। আমি আসি—"

তাহার কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া সুষমা বলিয়া চলিল, "গভীর রজনী। কষ্টে পড়েও মানুষে ঘুমায়—আমার সেই রাত্রই তার প্রমাণ। হঠাৎ চোখের উপর কিসের একটা স্পর্শে চম্‌কে উঠে বস্‌লাম। কার আকর্ষণ স্পষ্ট অনুভব কর্‌লাম। দেহের সবটুকু জোর একত্র করে একটা ঠেলায় তাকে ধরাশায়ী কর্‌লাম। পর মুহূর্ত্তেই শুন্‌লাম—আমি হত্যাকারিণী। জমিদার অতুলনকে—হাঁা, মিথ্যা নয়, বুকের মাঝে লুকানো ছুরিখানা আমি আমূল তার বুকে প্রোথিত করে দিয়েছিলুম।"

অনুপ স্পষ্ট অনুভব করিল, তার হাতের মধ্যের বক্ষপঞ্জর অতি দ্রুততালে চলিতেছিল। সাগ্রহে বলিল, "মিছে ভয় সু। সে বেঁচে আছে—এই বিজ্ঞাপন তার জলন্ত প্রমাণ।"

"আর প্রমাণ আমি নিজে"—বলিয়া একজন আধবয়সী ভদ্রলোক কামরায় প্রবেশ করিল।

সুষমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই, ওই সেই!"

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিল, "হ্যা, আমি সেই লম্পট জমিদার অতুলন। কিন্তু না, বাধা দিতে হবে না অনুপবাবু। আমি জানি আপনার স্ত্রী অসুস্থা। কেবল এই দলিল ক'খানা দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। পাপ অনেক করেছি, প্রতিদানে পেয়েছি জ্বালা! আজ তাই দেখ্‌তে চাই, কেড়ে নেওয়া জিনিষটা হক্‌দারকে ফিরিয়ে দিয়ে কিছু শান্তি মেলে কি না! আচ্ছা, আসি তা' হ'লে। নমস্কার।"

সে নমস্কারের প্রতি নমস্কার করিতেও অনুপ ভুলিয়া গেল; কেবল 'হঁা' করিয়া শূন্য দ্বারের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর ছুটিয়া গিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বল্‌তে পার সু, এটা স্বপ্ন না সত্য?"

সুষমা কেবল তার মাথাটা নীরবে তার বুকের উপর ফেলিয়া রাখিল। মুখে কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাস
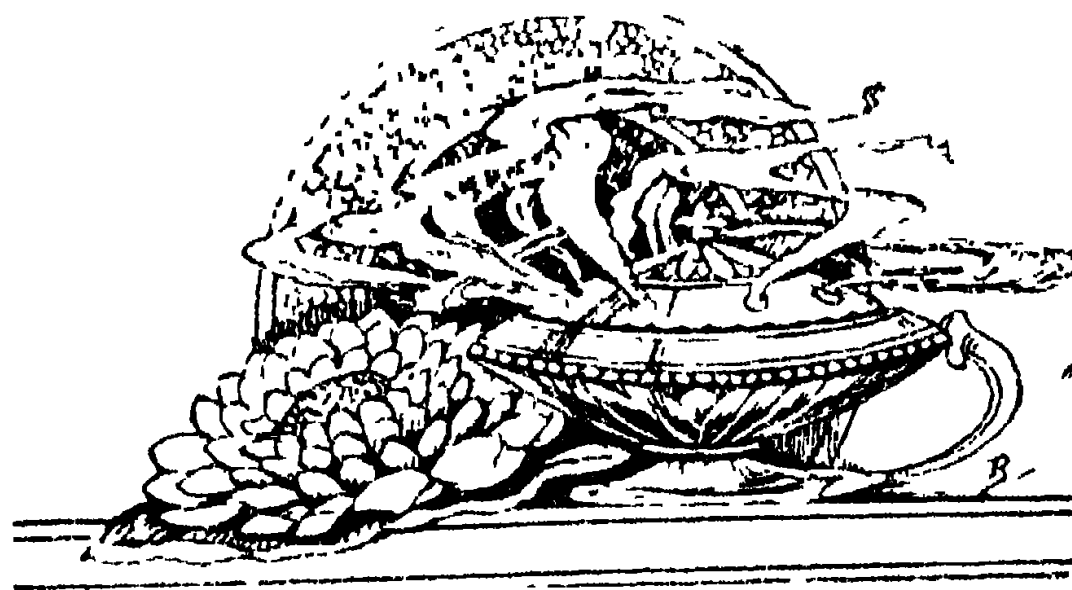
আলো ও ছায়া

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মাংশ—

একটা শব্দ মুখর রাতে এ গল্পের সুরু। অজয় কলে কাজ করিতে গিয়া দুইখানি হাত কাটিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখনও সরযূ তাহারই আগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়া বসিয়া ছিল।

সঙ্গীরা তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ রাত্রির মত সেখানে থাকিবার আবশ্যক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু সরযূ তাহাকেও থাকা প্রয়োজন বোধ করে নাই।

খানিক পরেই অজয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু চোখের জলে তখন তাহার মুখখানি ভাসিয়া যাইতেছে। সে গাঢ়কণ্ঠে ডাকিল—সরযূ!

সরযূ ধীরে ধীরে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিপদ যে একটা গভীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই। এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কি করেছ অজয় দা'!

অজয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—অপরাধীর শাস্তি যা' পাওয়া উচিত, তাই হয়েছে সরযূ! অমরকে চিঠি দিয়ে দিয়েছি, কাল পরশুর মধ্যে সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে। মূর্খ আমি, তাই অমন করে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসে একেবারে নিজের করে নিতে চেয়েছিলুম—কিন্তু লাভে হ'তে পাকই ঘাঁটলাম, পদ্ম দূরে সরেই রইল। শুধু যদি জানতুম—

মেয়েটী কান্নার ভারে ভাঙিয়া পড়িল। বলিল—তবু কি জান্তে অজয় দা', ভালবাসি কি না? অন্ধ তুমি, তাই ধরতে পার নি, কত ভাল আমি বাসি তোমায়! নইলে মরতে কি পারতুম না মনে কর! তুমি আমায় বোন্ বলে একদিন ডেকেছিলে, আমিও ত সেইদিন থেকে দাদা বলেই তোমাকে জানি। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এ তুমি কি করলে দাদা! নিজের হাত দুটোই খোয়ালে!

অজয়ের চোখের জল এবার রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অনুতাপে, দুঃখে একদিন সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, আজ যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া গেল। সে বলিল—এত ভালই হ'ল সরযূ! এরপর এই অশক্ত, অক্ষম দাদার সমস্ত ভার তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে জীবনভোর! এতবড় পাপ করেও যে এমন মধুর শাস্তি পাব, এ আমি ভাবতেও পারি নি! আমায় সারা জীবন বইতে পারবে ত দিদি?

সরযূ কথা কহিল না। হাসিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

অজয় ও অমর যেন এক বৃন্তের দুইটী ফুল। এমন

বন্ধুত্ব কলিযুগে দুর্ঘট একথা শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করিত। কিন্তু সরযুকে লইয়া দুইজনের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। কেমন করিয়া, প্রথমটা কেহই ধরিতে পারে নাই। হঠাৎ ধরা পড়িল সেইদিন, যেদিন বায়স্কোপ হইতে বাড়ী না ফিরিয়া অজয় সরযুকে লইয়া সোজা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া হাজির হইল। সরযু কোন প্রতিবাদ করিল না—বুঝি করিবার প্রবৃত্তিও তাহার হইল না।

কুসুমপুরে আসিয়া অজয় ঘর বাঁধিল। পয়সা প্রয়োজন, কাজেই কলে কাজও লইল—কিন্তু যাহার জন্য এত, তাহার ছায়াও মাড়াইতে পারিল না। সরযুর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়যুক্ত আচরণ তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিল। শেষে অমরের নিকট পত্র দিয়া ক্ষমা চাহিয়া সরযুকে লইয়া যাইতে বলিয়া যেন সে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু মানুষ বাঁচিতে চাহিলেই ত আর বাঁচা সম্ভব নয়। বন্ধুর চিঠি আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল। অমর লিখিয়াছে—সে বিবাহ করিয়াছে, কাজেই সরযুকে লইতে পারিবে না এবং অজয়কে ক্ষমা করিবার মত মহৎ মনও তাহার নহে।

সামনের সমস্ত পথটাই অন্ধকারময়। ভাবিয়া ভাবিয়া অজয় একেবারে শয্যা লইল। সরযু নিপুণ নাবিকের মত অর্দ্ধ জলমগ্ন প্রায় ডোবা সংসারটীকে টানিয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

গ্রামেরই এক ভদ্রলোকের বোন্ ভূপালীর সহিত তাহার ঘটনা-চক্রে আলাপ হইয়া গেল। তাহার স্বামী অসীমবাবু মুন্সেফ্। তাঁহারই সাহায্যে কল হইতে সে হাজার তিনেক টাকা হাতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আদায় করাইয়া লইল। তারপর কোথায় যাওয়া যায় এই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, এমন সময় অমরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শেফালীর একখানি পত্র আসিয়া সরযুকে পাইয়া বসিল। দীর্ঘদিন স্বামীর মুখ দেখে নাই—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াই সে শেফালীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

শেফালী তাহাকে সত্যই এমন আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিল যে, ভাবিলেও বিস্ময় জাগে। দিদিকে না হইলে তাহার যেন একদণ্ডও চলিবে না। সপত্নীকে এমন করিয়া আপন ভাবিতে পারে কয়জন! সরযু তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সেখানে বাস করা তাহার সম্ভব হইল না।

অজয়কে ত্যাগ করিলে তবে সে সেখানে থাকিতে পারে—স্বামীর এই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া শেফালীও সে বিষয় জেদ ধরিল। কিন্তু সরযু অজয়কে ত্যাগ করিয়া একা থাকা কোনমতেই সম্ভব বিবেচনা করিল না। তখন স্বামীগৃহ পরিত্যক্ত হইয়া সে বৃদ্ধ পিতার নিকট কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সেখানে থাকাও সম্ভব হইল না। বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবু ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক। তিনি কন্যার হাতের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করিলেন না।

সরযু তখন বাধ্য হইয়া অজয়কে লইয়া অন্য একটা বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। কিন্তু সেখানেও অধিক দিন থাকিতে পারিল না। অপূর্ব্ব নামে একটী ছেলে জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজের গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব ছেলেটি অসীমেরই ভাই। স্বদেশীর ভক্ত। দু'-চারবার জেলও সে খাটিয়াছিল। পরোপকার প্রবৃত্তি তাহার ভয়ানক প্রবল। এজন্য জমিদার পিতা তাহাকে একটা কুগ্রহ মনে করিতেন।

অসীমকেও তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন, তাঁহার বিনা অনুমতিতে ভূপালীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া। দীর্ঘদিন কাহারো মুখ দেখাদেখি ছিল না। একটা কঠিন মোকর্দ্দমায় পড়িয়া পিতা মুন্সেফ্ পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনা-চক্রে অমরের উপরই এ মোকদ্দমার ভার পড়িয়াছিল এবং অসীমও একদিন মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতে তাহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া আসিল। আসিয়া কিন্তু তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। এই বাড়ীর ঠিকানাই ত সরযু তাহাকে দিয়াছিল। তবে সরযু অমরবাবুর কে হন্? কিন্তু কয়দিন আগে ভূপালী সরযুর নামে এই বাড়ীতে একখানি পত্র দিয়াছিল। সেখানি ফেরৎ গিয়াছে বলিয়া অনেক ইতস্ততঃ

করিবা শেষটা সে অমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—সরযূ তাঁহার কেহ হন্ কি না?

অমরের মনটা সরযূর প্রতি হয় ত অত্যন্ত বিমুখই ছিল। সে যাহা জানাইল, অসীম তাহা অবগত না হইলেই ভাল হইত। বাড়ী গিয়া সে ভূপালীকে খুব করিয়া শুনাইয়া দিল। বলিল—অমন স্ত্রীলোকের মুখ দেখাও পাপ। ইত্যাদি।

ভূপালী কিন্তু এক কথায় এতটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অমরবাবুর স্ত্রী শেফালীকে পত্র দিয়া সত্যাসত্য জানিতে চাহিল। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া সেও ধারণা করিতে বাধ্য হইল যে, সরযূ পতিতা।

মনে তাহার অত্যন্ত বেদনা হইল বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন পরে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর স্নেহ-ভালবাসা পাইয়া সে অনেকটা ভুলিয়া রহিল। তাহার একটি ছেলে হইয়াছিল। তাহার জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া জমিদার শ্বশুর একেবারে দশখানি গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। ভূপালীর মা-বাবাও আসিলেন। অপূর্ব্ব মাস কয়েক পূর্ব্বে বৌদি'র নিকট কয়েক শত টাকা লইয়া বর্দ্ধমানে বন্যার সাহায্যে গিয়াছিল। সেও সে সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অপূর্ব্বের সহিত ভূপালী গল্প করিতেছে, এমন সময় কয়েকটা ছোকরা আসিয়া ডাকাডাকি করায় ভূপালী জানিতে পারিল—গ্রামে একটা মেয়ে স্কুল করিতে হইবে, তাই তাহারা অপূর্ব্বের নিকট ধর্ণা দিতে আসিয়াছে।

ভূপালী ও অপূর্ব্বের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বৃদ্ধ রামজীবনবাবু গ্রামে একটা মেয়ে স্কুল খুলিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ভূপালী প্রতিজ্ঞা করিল—মাস মাস স্কুলের মাষ্টার প্রভৃতির মাহিনা সেই দিবে। এমন সময় অসীমের ছুটি ফুরাইয়া গেল। ভূপালী যাইবার সময় অপূর্ব্বকেও ধরিয়া লইয়া যাইতে ভুলিল না।

কিন্তু তাহাকে তাহার লইয়া যাওয়াই সার হইল। যেদিন তাহারা কর্ম্মস্থলে পৌছিল, ঠিক্ তাহার পরদিনই অপূর্ব্বকে আর সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ভূপালী খুব একচোট হাসিল; আর একটী মেয়ে কিন্তু চোখের জলে ভাসিতে লাগিল—মেয়েটীর নাম শোভা। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার মায়ের সৎকার হইতেছিল না বলিয়া অপূর্ব্বই নিজের আংটী বিক্রয় করিয়া তাহা সম্পন্ন করাইয়াছে। তারপর সে তাহাদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। হঠাৎ এখানে আসিয়া দেখিল, বৌদি' তাহাকে শুধু বাড়ীতে আনিয়াই ছাড়ে নাই, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছে—তাহারই সহিত সেই মেয়েটীর বিবাহ দিবে।

বিবাহ করা অপূর্ব্বের ধাতে সহ্য হইল না। মেয়েটীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সে একেবারে সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিল।

তারপর দেশে আসিয়া স্কুল-বাড়ী তৈয়ারী করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। স্কুল-বাড়ী তৈয়ারী হইল। সমস্ত ঠিক্-ঠাক্—দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে কবে স্কুল খোলা হইবে। এমন সময় অপূর্ব্ব কলিকাতায় গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। একজন স্ত্রীলোককে সাহায্য করিতে গিয়া কাশীতে উপস্থিত হইল। তাহার যাহা কিছু ছিল, সেই স্ত্রীলোকটা ঠকাইয়া লইয়া পলাইল। উপরন্তু অন্য একটা লোককে বাঁচাইতে গিয়া সে গুণ্ডার ছোরার আঘাতে ধরাশায়ী হইল।

তারপর ঘটনা-চক্রে অজয়ের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল।

সরযূর লেখাপড়া এবং জ্ঞান প্রচুর জানিয়া সে তাহাকেই শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া দেশে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু অজয় বা সরযূ কেহই জানিল না যে, তাহারা কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। যোগাযোগ আর কাহাকে বলে। শেষে কি না ভূপালীদের বাড়ী আসিয়াই তাহাদের উঠিতে হইল।

ওদিকে অমর কিন্তু মুখে সরযূ এবং অজয়কে যতটা অস্বীকার করিল, মনে কিন্তু তাহার কণামাত্রও করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত অন্তরটা হাহাকার করিতে লাগিল। মুখে সে যতই আস্ফালন করুক না কেন, শেফালীর বুঝিতে বাকী রহিল না কোথায় তাহার কাঁটা

বিঁধিয়া আছে। সে প্রাণপণ যত্নে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া স্বামীর বুকের বেদনা লাঘব করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষটা নিজের উপরই তাহার বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িল। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। মরণ তাহাকে ছুঁইয়াও ছাড়িয়া গেল।

সে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সাতদিন অজ্ঞান হইয়া থাকার পর অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। অমর নিজের অপরাধ যে কতটা গুরুতর তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিয়া নিরপরাধ পত্নীকে বাঁচাইতেই হইবে মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া হাওয়া বদলে বাহির হইয়া পড়িল।

তারপর—

পঁচিশ

সরযূর বলার মধ্যে যে বাহুল্য ছিল না, ইহা দুইদিন যাইতে না-যাইতেই প্রমাণ হইয়া গেল। তাহার তাগিদে বাধ্য হইয়া অজয়কে একটী আবাহন সঙ্গীত রচনা করিতে হইল—এমন কি আবৃত্তির জন্য একটি খণ্ড কবিতা না লিখিয়াও সে অব্যাহতি পাইল না।

সঙ্গীতের সুর দিবার ভার অবশ্য সরযূকেই লইতে হইল। সকলের অজ্ঞাতে অত্যন্ত গোপনে বসিয়া সে যে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিল, তাহা শুধু সুন্দর নহে, অপূর্ব্ব। কয়েকটী মেয়ে বাছিয়া লইয়া সে তাহাদের দু'-একদিনের মধ্যেই গানখানি আয়ত্ত করাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে লোকের মুখে মুখে গানখানি প্রাণ লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

সরযূ হাসিয়া বলিল—কেমন অজয় দা', ফল্‌ল ত? তোমার গানই যথেষ্ট, বলেছি কি না?

অজয় হাসিয়া উত্তর দিল—তবু যদি না তুই ওর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতিস্। অমন সুর যে তুই দিতে জানিস, এত-দিন ত তা' ধরতে পারি নি।

সরযূ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—তোমার কেমন বাড়ান স্বভাব। ও কি আবার সুর না কি!

—অ-সুর ত, তা' হলেই হ'ল। রামজীবনবাবু সেদিন বল্‌ছিলেন কি জানিস, তাঁদের ভাগ্যি ভাল, তাই তোকে এখানে আন্‌তে পেরেছেন।

সরযূ হাসিয়া বলিল—তা' আর একবার বল্‌তে। কিন্তু তোমার ওদিকের কতদূর অজয় দা'?

অজয় বলিল—যে কাজের পিছনে আমার দিদি রয়েছে, তার কি কোন ভাবনা থাকে। সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু—

—কিন্তু কি অজয় দা'?

রাধহরিবাবুকে আসতে বলে দিয়েছিলুম—কতকগুলো ফুল দিয়ে 'স্বাগতম' লেখ্‌বার জন্যে। তিনি এসে হয় ত বসে আছেন। একটু ঘুরে আসি।

—বেলা যে অনেক হ'ল, খাওয়া-দাওয়া—

—সে হবে 'খন দিদি। দু'-তিনটে দিন বই ত নয়, তারপর কত খাওয়াতে পারিস দেখব 'খন—বলিয়া হাসিতে হাসিতে অজয় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরযূ তাহার গমন-পথটার দিকে চাহিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

অজয় বুঝি তাহার বিগত দিনগুলাকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সারা সময় কেমন করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সে ধরিতে পারে না। যে এতদিন অশক্ত, পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকাটাই দুর্ভাগ্য, মরণটাই কাম্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, সে আজ বাঁচিয়া থাকার মাধুর্য্য বেশ ভাল করিয়াই মনে-প্রাণে স্বীকার করিতে চায়। বৃহত্তর আনন্দের সম্ভাবনায় বিভোর হইয়া উঠে।

নিজের জীবনটাই ত সব নয়, এই সুকোমল শিশু-গুলির মধ্যে যদি সে তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারে, তাহাদের সত্যকার মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলেই ত যথেষ্ট কার্য্য হইল। অপূর্ব্বের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। সে আজ শুধু তাহাকে দেহ ধারণেরই খাদ্য যোগায় নাই, মনের খোরাকও পর্য্যাপ্ত পরিমানে আনিয়া দিয়াছে—বাঁচার মত করিয়া বাঁচাইতে চাহিয়াছে। একথা কি ভুলিবার?

তাই সে তাহার এতটুকু ছোট্ট চিঠির অনুরোধটীকে দেবতার আদেশের মতই ধরিয়া লইয়াছে। এটুকু যেমন করিয়া হউক, যে ভাবেই হউক তাহাকে সুসম্পন্ন করাইতেই হইবে। রাত্রে ঘুম নাই, দিনে মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নাই, বোধ করি ভগবানের জন্যও এতটা ঐকান্তিক চেষ্টা সম্ভব নয়, যতটা সে করিয়া চলিয়াছে। তবু যেন তাহার মনে তৃপ্তি আসে না। কারণে অকারণে ছুটিয়া আসিয়া সরযূর সহিত পরামর্শ করে, সাহায্য লইয়া তবে শান্তি পায়। নিজেকে নিষ্ঠুর বিচারকের আসনে বসাইয়া তাহার প্রাতিদিনের কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া তবে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সরযূরও চেষ্টার অবধি নাই। অপূর্ব্বের জন্য ত খাটেই, অজয় দা'র জন্যও। অজয় দা'র এই উৎসাহ তাহার প্রাণের কোন্ গোপনতম কোণে যেন পুলকের হিল্লোল বহাইয়া দেয়। সে চোখ বুজিয়া মনে মনে সে আনন্দ উপভোগ করে। নিজের জীবনের কথা হয় ত তখন তাহার মনে পড়ে; কিন্তু বেশীক্ষণ তাহা লইয়া তোলাপাড়া করিবার অবসর সে পায় না। অজয় দা' সুখে আছে, ভুলিয়া আছে, ইহাতেই যেন তাহার সব চিন্তার পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে।

আর একখানি অতি প্রিয় মুখ তাহার মনো দর্পণে অত্যন্ত গোপনে উঁকি মারে কি না কে জানে! সে কিন্তু বারবার শেফালীর স্নেহোজ্জল মূর্ত্তিখানির কল্পনাতেই বিভোর হইয়া উঠে। সে মুখের পাশে আবার অনেক সময়ই ভূপালীর ছবিখানিও খেলা করিয়া বেড়ায়। কৃপণ যেমন পরম যত্নে তাহার গচ্ছিত ধনরত্ন লইয়া সকলের দৃষ্টির অন্তরালে নাড়াচাড়া করিয়া তৃপ্তি পায়, সেও তেমনি তাহার সংসারের সম্বল কয়টীকে নাড়িয়া-চাড়িয়াই দিনের পর দিন কাটাইয়া দেয়।

অজয়ের কথাগুলা শুনিবার পর হইতে কি একটা মোহ যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সেও স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছে অজয় দা'র কথাই ঠিক্—এ মুন্সেফ্ অসীম না হইয়া যায় না। ভূপালীকে লইয়া সে একদিন নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া হাজির হইবে। সে যে কত বড় আনন্দের, তাহা ভাবিতেই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠে। এক-একবার সে মনে করিয়াছে, জানিয়া লইবে—এ মুন্সেফের নাম কি, কোথায় থাকেন তিনি? কিন্তু বলি বলি করিয়াও সে কাহাকেও বলিতে পারে নাই। সে অসীম নয়, এটুকু শুনিবার মত ধৈর্য্যও বোধ করি তাহার নাই। তাই বারবার জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও সে পিছাইয়া আসিয়াছে। সকলেই বলে বড়বাবু, বড়বাবুই ভাল। প্রসন্নময়ী বলেন—লালু আসিবে। লালুই আসুক—তাহার সহিত অসীমের কোন সম্বন্ধ আনা পাগ্‌লামী ছাড়া আর কি হইতে পারে। যাহার নামের সহিত বর্ণমালার একটা অক্ষর পর্য্যন্ত মিলে না, তাহাকে এক লোক ভাবা দুর্ভোগ নহে ত কি? নিজের দুর্ব্বলতায় সে নিজেই হাসিতে থাকে। কিন্তু মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আর একজন যে তাহারই দুঃখে হাসিতে সুরু করিয়াছেন, তাহার খবর কে রাখে!

সেদিন সরযূ খবর পাইয়াছে রাত্রের ট্রেণে জমিদারের বড় ছেলে এবং বড় বউ নির্ব্বিঘ্নেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অপূর্ব্ব আসে নাই। অজয় অপূর্ব্বের উপর চটিয়াছে, সরযূ কিন্তু রাগ করিতে পারে নাই। একটী বোন্ এবং একটী দাদা লইয়াই ত তাহার সংসার নহে। হয় ত তাহারই মত কোন দুঃস্থের ডাকে সে ধরা দিয়াছে—অনুযোগ করিলে চলিবে কেন?

ভোরবেলা উঠিয়াই অজয় ছেলেদের লইয়া স্কুল-বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। সরযূও কয়েকটী মেয়েকে লইয়া কি সব করিতেছিল। একটী মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—জমিদার-গৃহিণী তাঁহার পুত্রবধূকে লইয়া এই দিকেই আসিতেছেন।

সরযূ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে দ্রুতপদে দরজার নিকট আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রসন্নময়ী হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন—বউমার আর তর সইল না মা, ছুটে এসেছে। এই যে—

বলিয়া মুখ তুলিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—ও কি! কি হ'ল বউমা, অমন করছ কেন?

ভূপালীর মাথাটা বোধ করি ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে হয় ত পড়িয়াই যাইত, কিন্তু সরযূ 'খপ্' করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিতেই সে পতনের হাত হইতে কোনমতে রক্ষা পাইল।

প্রসন্নময়ী বলিয়া উঠিলেন—কি বিপদে পড়লুম বলো ত, এখনই একবার—

কিন্তু ততক্ষণে ভূপালী নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছে। সে সরযূর নিকট হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া বলিল—কিছু নয় মা, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেছল। বেশ আছি আমি, চলুন বাড়ীটা দেখা যাক্।

প্রসন্নময়ী বলিয়া উঠিলেন—কিছু না নয়, চলো বস্‌বে চলো আগে, তারপর দেখা-শোনা। বল্‌লুম —রেলের ধকল সাম্‌লে, একদিন জিরিয়ে না হয় যেও। কিন্তু তা' ত শুন্‌লে না। বল্‌লে—আপনার নতুন মার সঙ্গে আলাপ না করে স্থির থাকৃতে পাচ্ছি না। বেশ, এসেছ, দু'জনে একটু গল্প-গুজব কর বসে বসে।

ভূপালী সে কথায় কান দিল না, একবার সরযূর মুখের পানেও চাহিল না, ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সরযূর অন্তরের মধ্যেও কম বিপ্লবের ঝড় বহিয়া যায় নাই। সে প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নিজেকে কোনরূপে সামলাইয়া লইয়া প্রসন্নময়ীর কথায় সায় দিল। তারপর তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভূপালী গিয়া উঠানে পাতা একখানি চেয়ারের উপর 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপকেও বোধ করি এ ঘটনা ছাড়াইয়া যায়। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ভূপালীর সারা অন্তরটা যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। এ বাড়ী কেন, এ গ্রামটাও যেন তাহার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। একবার মনে করিল সে সরযূকে টানিয়া আনিয়া মন খুলিয়া যা' তা' বলিয়া বুকটাকে হাল্‌কা করিয়া লয়—কিন্তু পরক্ষণেই সে সঙ্কল্প আর তাহার মনে স্থায়ী হইল না। তবে কি করিবে সে? কি করিলে তাহার সমস্ত ক্ষতি সে নিঃশেষে উসুল করিয়া লইতে পারে?

অমরবাবুর স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিয়া সে বড় আশা করিয়াছিল—তাহার উত্তরে সে এমন কিছু পাইবে, যাহা তাহার তৃষিত হৃদয়েরই অনুকূল। কিন্তু তাহা হয় নাই— বরং তাহার কল্পনা যে কত ভুল তাহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, সে উত্তর না দিয়া। সেই হইতে অসীমের মত ভূপালীও নিজেকে কঠোর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। কোন কোন সময় সরযূর মুখ মনে পড়িলেও জোর করিয়া সে তাহা সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু—

উচ্ছন্নে যাক্ ও কিন্তু!

মানুষের ইতিহাসের মূলে ওই 'কিন্তু' জুটিয়া সমস্ত সংসারগুলাকে ছারখার করিতে শুরু করিয়াছে। ও চিন্তা ভুলিতেই হইবে।

প্রসন্নময়ী ও সরযূ আসিয়া তখন অন্য দুইখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। কি একটা কাজে প্রসন্নময়ী উঠিয়া যাইতেই ভূপালীকে যেন কিসে পাইয়া বসিল। যে 'কিন্তু'কে বিপুল সমারোহে অস্বীকার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সেই 'কিন্তু'রই প্রেরণায় মুহূর্ত্তে সে উন্মাদ হইয়া উঠিল। সহসা সরযূর দিকে চাহিয়া সে বলিল— তোমার মুখ দেখ্‌তেও প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু—

—কিন্তু কি ভাই?

সেই প্রাণঢালা সম্বোধন!

সরযূর কণ্ঠে যেন মধু মাখান রহিয়াছে। ভূপালীর কাঙাল অন্তরটা মুহূর্ত্তের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িল, একবার বুঝি সে তাহার মুখের পানে চাহিলও বা। কিন্তু পরক্ষণেই কঠিন শাসনে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—এই যে না বুঝে বিশ্বাস করে শুধু মানুষ ঠকে না, বুঝেও সে বিশ্বাস ছাড়তে না পেরে পদে পদে নিজেকে ঠকায়। তাই নিজেকে ঠকাবার জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি— যদি একটুও মনুষ্যত্ব বাকী থাকে, বলবার সাহস থাকে, তবে বলো যা' শুনেছি তা' কি সব সত্যি?

সরযূ সরল হাসি হাসিয়া বলিল—কি শুনেছ, না বল্‌লে ত বল্‌তে পারি না ভাই—কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে?

ভূপালীর সারা গায়ে কে যেন জ্বলন্ত বারুদ ছিটাইয়া

দিল। সে বলিয়া উঠিল—লোকে বলে তুমি তাই—যাদের কথা ভাবলেও—

সাড়ম্বরে সুরু করিলেও সে কথাটা কিন্তু শেষ করিতে পারিল না। সরযূর মুখের পানে অসহায়ের মত চাহিয়া রহিল। সরযূর কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। ভূপালী সজোরে তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল—বলো, চুপ করে থেকো না। তোমার মুখ থেকে শুধু একটীবার শুনতে চাই আমি—তুমি কি? তুমি—

কিন্তু তাহার কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিল; সে আর কথা বলিতে পারিল না। সরযূ এইবার যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। অদূরে প্রসন্নময়ীকে আসিতে দেখিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

ভূপালী বলিল—এখন থাক্, কিন্তু কাল ভোরেই জান্‌তে চাই আমি—অজয়বাবু তোমার কে? যদি জানাবার উপযুক্ত সম্পর্ক খুঁজে না পাও, ও মুখ আর দেখিও না। এমন করে লোক ঠকানোর চেয়ে তোমার মরাই ভাল।

প্রসন্নময়ী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—কেমন, সত্যি বলি নি বৌমা, মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। একবার আলাপ হলে আর ছাড়তে পারবে না।

ভূপালী সে কথার কোন উত্তর দিল না। বলিল—শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না, বাড়ী চলুন মা।

—এখনো ভাল লাগ্‌ছে না। তাই ত বড় মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি! বাড়ী গিয়েই একজন ডাক্তার—

দৈত্যের হাসি হাসিয়া ভূপালী বলিল—মাও যেমন! ডাক্তার কি হবে? একটু জিরুলেই ভাল হয়ে যাবে 'খন। চলুন এখন—বলিয়া নিজেই সে ফটকের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

—আজ তবে আসি মা। বৌমার শরীর ভাল হলে আবার তখন আসব। কেমন—বলিয়া প্রসন্নময়ী সরযূর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

সরযূও তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আস্‌বেন বই কি মা।

পাল্কীতে উঠিয়া দুইজনে দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া গেলে সরযূ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আবার স্কুল-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর মেয়েদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শয্যার উপর বসিতেই জানালার বাহিরে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল—অদূরে স্কুল-বাড়ীর ফটকটা দেবদারু পাতা দিয়া সাজাইবার জন্য ছেলেদের মধ্যে তখন হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

অকারণ একটা হাসি তাহার মুখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সে কি ভাবিয়া সাম্‌নের তাক হইতে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিতে বসিল—স্নেহের ভূপা!

কিন্তু পত্রখানি সমাপ্ত করিতে পারিল না। কলম হাতে করিয়া কতক্ষণ যে সে বসিয়াছিল, কে জানে!

বাহিরের দরজায় কে ডাকিল—অজয়বাবু, বাড়ী আছেন?

সরযূর চমক ভাঙিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল—হাতের কলম হাতেই ধরা রহিয়াছে। স্নেহের ভূপার পর একটী কথাও আর লিখিতে পারে নাই। ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিতেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছি, ছি, একটা ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সে করিল কি! কিন্তু কি করিল তাহার হিসাব পরে হইবে, এখন অজয় দা'কে কে ডাকিতেছে দেখিতে হইবে।

সরযূ ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একটা হাতভরা সেলাম করিয়া জমিদার-বাড়ীর দারোয়ান একখানা পত্র তাহাকে দিয়া আবার সেলাম জানাইয়া বাহির হইয়া গেল।

সরযূ একবার শিরোনামার দিকে চাহিয়া দেখিল। অজয় দা'রই নাম লেখা। জমিদার-বাড়ী হইতে এ সময় হঠাৎ চিঠি আসিল কেন? কে লিখিল? কি লেখা আছে ইহার মধ্যে? সে একবার কি ভাবিয়া পত্রখানি নিজের শয্যার উপর রাখিয়া দিল, কিন্তু নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। খানিক পরেই আবার কি ভাবিয়া সেখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিল।

লছমন বাজারে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—মা কোথায় গো?

—এই যে লছমন, কি আন্‌লে—বলিতে বলিতে সরযূ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

—ক'টা মাগুর মাছ এনেছি মা। কুটে ফেলি, কি বলো ?

—তাই ফেলো—বলিয়া সরযূ ফিরিয়া যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মাছ থাক্ লছমন, ও আমি কুটব 'খন। একখানা চিঠি বড়বাবুকে দিয়ে আস্‌তে পারবে তুমি ? কে বড়বাবু, বুঝেছ ? জমিদার—

বাধা দিয়া লছমন বলিল—তা' আর বুঝি নি মা, ছোট-বাবুর দাদা গো। এ আর কেন পারব না, এখনই দিচ্ছি। এই খানিক আগেই ত তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল আমার। কিন্তু তোমাকে মাছ কুট্‌তে দিয়ে ছোট দাদাবাবুর বকুনি খাই আর কি—তা' হচ্ছে না। এ ক'টা কুট্‌তে কতক্ষণ আর লাগ্‌বে, তুমি লিখে ফেল ততক্ষণ—বলিয়া লছমন বঁটি লইয়া বসিয়া গেল।

সরযূ প্রতিবাদ করিল না। মৃদু হাসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। লছমন যখন পত্র দিয়া ফিরিয়া আসিল, সরযূ তখন বাক্স-প্যাঁট্‌রা গুছাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে। লছমন সবিস্ময়ে বলিল—জিনিষ-পত্র গোছাচ্ছ কেন মা ?

—এখানে আর ভাল লাগ্‌ছে না লছমন। কাশীর মত তীর্থস্থান ছেড়ে আসা ভাল হয় নি আমাদের।

লছমন গাঢ়কণ্ঠে ডাকিল—মা !

সরযূ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল—কি লছমন ?

কি বলিতে গিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া লছমন নিজেকে সংযত করিয়া লইল। তারপর শুষ্ককণ্ঠে বলিল—কিছু নয় মা, ওঠো, আমি বেঁধে দিচ্ছি সব।

সরযূর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই বুড়ার নিকট তাহার কোন ফাঁকী চাড়ান পায় নাই ; সবই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার হইল না। সে লছমনকে জিনিষ-পত্র বাঁধিতে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া গিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

অজয় বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু মহা হট্টগোল বাধাইয়া তুলিল। বলিল—তুই কি একটুও সুস্থ থাক্‌তে দিবি না দিদি ! যাব কোথায় ? এ যে আমাদের আপনার বাড়ী হয়ে গেছে। এ মুনসেফ্‌ কে জানিস, অসীম নিজে। এইমাত্র খবর পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে গিয়েছিলুম। কিন্তু বড় ব্যস্ত আছে বলে দেখা করতে পারলে না। বিকালে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসব যখন, তখন বলবি—হ্যাঁ, অজয় দা' বলেছিল বটে !

তথাপি সরযূর কিন্তু কোন উৎসাহই দেখা গেল না। সে মৃদু হাসিয়া বলিল—ওই জন্যেই ত আরও থাকা উচিত নয় অজয় দা'। অন্য লোকের কাছে চাকরী করতে অপমান নেই, কিন্তু—

—তুই কি বলিস পাগ্‌লী, অসীমের কাছে কাজ করতে হবে আমাদের অপমান !

—হবে বই কি অজয় দা', আমায় মেরে ফেল্‌লেও আমি কুটুমের কাছে কাজ করতে পারব না। যেতেই হবে আমাদের। আমাকে নিয়ে ত অনেক কষ্টই সহ্য করলে, আর কখনও তোমার অবাধ্য হব না, শুধু এবারটীর মত আমায় ক্ষমা কর তুমি—বলিয়া সরযূ হাতজোড় করিল।

অজয় অর্থহীন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—তাই চল্ বোন্।

ঠিক্ সেই সময় গ্রামের ছেলেরা তাহারই রচিত আবাহন সঙ্গীতের কয়েকটা চরণ গাহিতে গাহিতে পথ পার হইয়া চলিয়া গেল। সরযূ আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া কি একটা কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে আসিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। অজয় পাষাণ মূর্ত্তির মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝি তাহার কাণে সে সুরের একটুও প্রবেশ করে নাই।

পরদিন মেয়েরা দিদিকে খুঁজিতে আসিয়া মলিন মুখে ফিরিয়া গেল।

তারপর সারা গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কেহ কেহ বা কণ্ঠ সরস করিয়া বলিতে লাগিল—এ আমরা আগেই জানতুম—অমন অল্প বয়সের মেয়েছেলে অত লেখাপড়া শিখ্‌লে ভাল হয় কখন। বাবা, পালাতে পথ পেলে না।

কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে পল্লবিত হইয়া ভূপালীর কাণে আসিয়া পৌঁছিতেও বিলম্ব হইল না। সে বাক্‌হারা হইয়া জানালার ধারটীতে আসিয়া বসিয়া পড়িল। একটা চিল তখন উড়িতে উড়িতে দূরে আরও দূরে মিলাইয়া গেল। তাহার মনটাও বুঝি তাহারই সহিত তখন কোথায় কোন্ অসীমের মধ্যে হারাইয়া গেল, সে ধরিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস

প্রভা দে, সরস্বতী

যা' কেউ ভাবে নি, তাই। অবিনাশ আজকাল জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। স্বপ্ন দেখ্‌ছে, তাব ভালো সময় আসবার আর দেরী নেই। এই এলো, এই এলো। অভাব অনটনের কালো পর্দ্দাটা চোখের সাম্‌নে থেকে সরে যাচ্ছে। ফুটে উঠ্‌ছে জীবনের উজ্জ্বল, উন্নত একটা ছবি।···দিনে দিনে পৃথিবীর ওপর বিজাতীয় বিতৃষ্ণাটা হয়ে এসেছে নিস্তেজ। বিরক্ত হবার কারণ আর নেই—ঘৃণা করবার নেই শক্তি। প্রেরণা গেছে নিরঙ্কুশ ফুরিয়ে। এখন শুধু চোখ মেলে স্বপ্ন দেখা। এ অভাব এ দারিদ্র্য একদিন অপসারিত হবেই হবে। মেঘ কেটে যাবে, ঝলমলে রৌদ্র উঠ্‌বে। সে বাঁচবে, তার ভাই-বোনেরা বাঁচবে—দু'মুঠো খেয়ে বাঁচবে।

আজ আড়াই বছর অবিনাশ কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে একটা চাকরীর আশায়—মেলে নি। তার বাপ-মা শুধু দুটো জিনিষ রেখে গেছেন—দেনা, এবং ছোট তিন ভাই বোনের বুভুক্ষু উদর। অপরের কাছে বারে বারে ধার চাইতে লজ্জা হওয়াটা দস্তরমতো 'ট্র্যাজিডি'। তবে অবিনাশ এখন এমন স্তরে এসে পৌচেছে, যেখানে একজন মানুষও নেই তাকে একটি মাত্র পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করবে। এমন কি, মুদীর দোকানে গিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করেও একপো চাল পাওয়া গেল না। সুতরাং অবিনাশের ভাইবোনেরা 'হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক্' করে বস্‌ল।

চেতলা থেকে বালীগঞ্জ হেঁটে অবিনাশ টিউশনী করতে যায়—সাড়ে ছ' টাকার। তাও, আজ মাসের দশ তারিখ এ দশদিন বিশবার তাগদা করেও মাইনেটা পাওযা যায় নি। বহু দিন থেকে অচল একটা টাকা বাক্সের তলায় পড়েছিল। অবিনাশের ছোট ভাই শম্ভু আজ সেটাকে চালাবার বৃথা চেষ্টা করে ফিরে এসেছে।

প্রতিবেশীরা আগে আগে অবিনাশ এবং তার ভাই-বোন্‌কে একটু কৃপার চোখে দেখ্‌তো—চেয়ে-চিন্তে এটা-সেটা পাওয়াও যেত। এখন অবিনাশের মত আগাছাটাকে বাদ দিতে পারলেই যেন তারা বাঁচে। জোয়ান, সোমত্ত ছেলে,—এত দিনেও কিছু একটা করে উঠতে পারল না! আরে, দিনকাল যে খারাপ—ও কথা আর কতবার বল্‌বে? তাই বলে না খেয়ে আছে না কি কেউ?

দুই

শম্ভু এসে ডাকল—দাদা।

পেছন পেছন রতন আর শেফালীও এল।

অবিনাশ তক্তাপোষের ওপর শুয়ে চোখ মেলে হয়তো স্বপ্ন দেখ্‌ছিল। নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—কি রে শম্ভু, ডাকলি আমায়?

—হ্যাঁ, একটা পয়সা হবে? রতন আর শেফালীকে মুড়ি কিনে দিতাম।

ম্লান একটু হেসে অবিনাশ বল্‌ল,—আর তুই? তোর বুঝি খিদে পায় নি? কাল রাত্রেও তো...

ভাই বোনের ভেতর শম্ভুই বড়। বয়স বছর ষোল হবে বোধ হয়। কিন্তু এইটুকু বয়সেই সে দুনিয়ার অনেক কিছু নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

শম্ভু দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল,—পয়সা থাকে তো দাও।

—পয়সা যে নেই, সে তো কাল থেকেই জানো। সেই অচল টাকাটা চালাতে পারলি না?

—না।

রতন আর শেফালী তাদের অনাহারে দুর্ব্বল, স্তিমিত দুই চোখ মেলে একবার শম্ভু, একবার অবিনাশের দিকে চাইতে লাগ্‌ল। তাদের চোখের অসহায় ভাষা অবিনাশকে আজ একটুও চঞ্চল করতে পারছে না। অবিনাশ পেরিয়ে

গেছে সকল সীমা—তার হৃদয়ে আলোড়ন নেই, নেই দৌর্ব্বল্যের বিন্দুমাত্র অভিযোগ। এখন শুধু স্বপ্ন দেখা...

শেফালী এতক্ষণে কেঁদে ফেলেছে। দুই হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে সে বল্‌ল,—বড় দা', মুড়ীওয়ালী চলে যাচ্ছে—ডাকো না।

রতন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—এই মুড়িওয়ালী, দাঁড়াও।

অবিনাশ তেমনি শুয়ে। নড়বার নামটি নেই।

শেফালী রীতিমতো কাঁদতে সুরু করল। বল্‌ল,—কাল রাত্রে খেলাম না, আজও বেলা কত হয়ে গেল, ক্ষিধে পায় না বুঝি!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রতন বল্‌ল,—আয় শেফালী, কাঁদিস নি।

শেফালী না কেঁদে ছাড়বে না। এবারে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে। শম্ভু ধম্‌কে উঠ্‌ল,—এই ছুঁড়ি, কাঁদবি তো গলা টিপে দেব। চুপ করলি?

অবিনাশ শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল,—মুড়িওয়ালী চলে গেল না কি রে শম্ভু?

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শম্ভু বলে উঠ্‌ল,—চলে যাবে না তো কি সে আমাদের ভরসাতেই বসে থাক্‌বে না কি?

হেসে অবিনাশ বল্‌লে,—রাগিস্ নি শম্ভু, রাগিস্ নি। ডাক তো আর একবার—বাকী দেবে না বল্‌লে?

—হ্যাঁ। আগের বাকীই তো রয়েছে পাঁচ আনা।

রতন উৎসাহিত হয়ে বলে উঠ্‌ল,—ডাক্‌ব, ডাক্‌ব বড় দা'?

অনেক বলে-কয়ে মুড়িওয়ালীকে রাজী করান গেল। অবিনাশ অনেক করে প্রতিশ্রুতি দিলে কালকেই তার সমস্ত পয়সা শোধ করে দেবে। মুড়িওয়ালী জানে এ প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই নেই। তবুও সে দিল।

রতন আর শেফালী আঁচল পেতে মুড়ির ধামার সাম্‌নে বসে গেছে। কাছে দাঁড়িয়ে শম্ভু। অবিনাশ ছিল পেছনে। লোলুপ দৃষ্টিতে সে দেখ্‌তে পেল, মুড়িওয়ালীর পিঠের দিকে ঘুরিয়ে ফেলা আঁচলের প্রান্তভাগে কয়েকটা পয়সা বাঁধা। আশ্চর্য্য নয় একটুও, অবিনাশ ক্ষিপ্র, অকম্পিত হস্তে পয়সা ক'টি খুলে নিলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শম্ভু দেখ্‌ল ব্যাপারটা।

'উপকারীর অপকার করতে নেই'—ছোটবেলায় অবিনাশ কথাটা পড়েছিল বই কি! মুড়িওয়ালী চলে যেতেই পয়সা ক'টি সে শম্ভুর হাতে দিয়ে বল্‌ল,—এই নে। যাবি আর আস্‌বি। পোয়াটাক চাল, আর এক পয়সার আলু...

শম্ভু জিজ্ঞেস কর্‌ল কোনমতে,—তুমি চুরি কর্‌লে দাদা? শেষকালে তিনটে পয়সা ..

হাসিতে অবিনাশ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়্‌ল। বল্‌ল,—আরে, চুরি করা একটা কৌশল, পাপ নয়। এত বড় হয়েছিস্, এটাও তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে!

মুড়িওয়ালী ফিরে এল। পয়সার কথা জিজ্ঞেস করলে। অবিনাশ তাকে শুনিয়ে দিলে,—ইয়ারকী করবার আর জায়গা পেলে না বাবা!

রাস্তায় নেমে মুড়িওয়ালীকে আড়ালে ডেকে শম্ভু বল্‌ল,—এই নাও মুড়িওয়ালী তোমার পয়সা। আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম দরজার গোড়ায়।

—বেঁচে থাকো! মুড়িওয়ালী শম্ভুকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ল।

আজকালকার হিসেবে শম্ভুকে বোকা বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই। তবে এমন বোকা সে আর বেশীদিন বোধ হয় থাক্‌বে না। এখন তার মনটা কাঁচা আছে—অদূর ভবিষ্যতে সে হয়তো অবিনাশের চেয়ে বেশী চালাক হ'য়ে পড়বে।

থাক্ ভবিষ্যতের কথা। আজ শম্ভুর মন কিছুতেই এটাকে সমর্থন করতে পারল না। তবে, তাদেরই ভরণ-পোষণে অক্ষম দাদাটির কথা মনে করে তার চোখ দুটো জলে ভিজে উঠ্‌ল। দাদার অসীম অথচ অব্যক্ত দুঃখ লজ্জা যে কত যন্ত্রণাদায়ক সে এই বয়সেই তা' বুঝতে পেরেছে।

পাশের বাড়ী নিতাইবাবুদের। সেখানে কিছু ধার চাইতে গিয়ে অবিনাশ আজ ফিরে এসেছে। অনেক ধার তাঁরা এ পর্য্যন্ত দিয়েছেন, ফিরে পান নি কিছুই। তবুও নিতাইবাবুর ছেলে সমবয়সী পরিতোষের কাছ থেকে

চুপিচুপি চারটে পয়সা চেয়ে নিয়ে শম্ভু চাল এবং আলু কিনে নিয়ে এল।

তিন

ভাত বেড়ে এসে শম্ভু ডাকল,— দাদা, খেতে চলো।

অবিনাশের বিস্ময় কাটতে না কাটতে শম্ভু হেসে আবার বলে উঠ্‌ল,—চলো, ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

অবিনাশ বল্‌ল,–সে কিরে! রতন শেফালী খেয়েছে, তুই খেয়েছিস?

—ওরা খাচ্ছে। আমি তোমার সঙ্গেই বসব 'খন।

হেসে অবিনাশ বল্‌ল,—মাত্রতো তিনটে পয়সা। তিন পয়সায় ক' সের চাল দিয়েছে রে?

—সে পরে শুন্‌বে, এখন তুমি চলো।

বারান্দায় এসে অবিনাশ দেখ্‌ল, রতন আর শেফালী গোগ্রাসে গিলে গিলে চলেছে। নিশ্বাস ফেল্‌বারও সময় নেই—আলু সেদ্ধ আর ভাত এতই উপাদেয় হ'য়ে উঠেছে। মনে মনে নিজের সঙ্গেই অবিনাশ একটু রসিকতা করল, —'হাঙ্গার ইজ্‌ দি বেষ্ট্‌ সস্‌'!

কিন্তু, আর একটি থালার দিকে চেয়েই সে একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—ওই ক'টা ভাতে তোরই তো হবে না শম্ভু, আমি আবার খাবো কিরে?

পেছনে আস্‌তে আস্‌তে শম্ভু বল্‌ল,—হবে, হবে। তুমি বসো দিকি। রতন আর শেফালী আজ ডবল খেয়েছে দাদা—বলেই সে হেসে উঠ্‌ল।

অবিনাশ বল্‌ল—না, তুই খেয়ে নে। আমার তেমন ক্ষিধে নেই।

শম্ভু হেসে বল্‌ল,—চালাকী, না? ও সব হবে না— বসো।

শম্ভু কিছুতেই ছাড়বে না। সে অবিনাশের হাত ধরে জোর ক'রে বসিয়ে দিলে। দু'জনের শারীরিক শক্তির খানিকটা পরীক্ষা হ'য়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ল শম্ভুই।

খেতে খেতে শম্ভু বল্‌ল,—বাঃ, তুমি হাত গুটিয়ে কেবল বসে থাক্‌বে না কি!

অবিনাশ যেন চুরী কর্‌তে কর্‌তে ধরা পড়েছে। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠ্‌ল,– না না, এই তো খাচ্ছি...

—কোথায় খাচ্ছো? আচ্ছা দাদা, তুমি সব সময় অত ভাব কেন বলো তো? ভেবে কি হবে?...আর, চাকরীর আশা তুমি ছেড়ে দাও দাদা। তার চেয়ে বরং...

—নে, নে, পাকামো করিস নে। খাবি তো খা—

—সত্যি দাদা, আমি একটা মতলব ঠাউরেছি। তুমি আমায় খবরের কাগজ কিনে দাও, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেচব। বেশ হবে দাদা। কালীঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে হাক্‌ব,—চাই 'ষ্টেস্‌ম্যান্‌', 'ফারোর্ট'......

গম্ভীর হ'য়ে অবিনাশ বল্‌ল,—টাকা চাই শম্ভু? খবরের কাগজ বেচতেও কিছু মূলধন চাই। হাতে একটা পয়সা নেই...কাল থেকে তোরা উপোস ক'রে আছিস... তারপর একটু থেমেই আবার বল্‌ল,—তবু...

—যা' হোক্‌, মুড়িওয়ালীটা আজ এসেছিল—বলেই সে একেবারে হোহো ক'রে হেসে উঠল। হাসি আর থাম্‌তেই চায় না।

শম্ভু কিন্তু একটুও হাস্‌ল না। অবিনাশ তার মুখের দিকে চেয়ে হাসি থামিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল। দু'জনকার মাঝখানের বাতাস ভীষণ ভারী হয়ে উঠছে।...

চার

বিকেলবেলায় অবিনাশ 'টিউশনী'র টাকাটা আবার চাইতে গেল। ছেলের বাবা রেগে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন,— রোজ রোজ কেন তাগাদা কর হে ছোক্‌রা। অনেকবারই তো বলেছি পনের তারিখের আগে পাবে না। না পোষায়, ছেড়ে দাও।

অবিনাশ সাম্‌নের চেয়োটায় বসে পড়ে বল্‌ল,--ছেড়ে দেব কি মশায়! আমার মাইনেটা দিন্‌ আগে।

—আজ হবে না, হবে না—

—ও যতবারই বলুন হবে না, আমি আজ নাছোড়-বান্দা। আজই আমার টাকা দিতে হবে। নইলে—

—নইলে কি হে, মারবে না কি? হাত গুটোচ্ছা যে বড়!......

—আজ্ঞে না, সে ভয় আপনার নেই। তবে, মাইনেটা আজ আমার চাই!

—চাই বল্‌লেই হ'ল কিনা।

সাম্‌নের টেবিলের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করে অবিনাশ দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,—নিশ্চয় হ'ল—আমার পাওনা দিতে আপনি বাধ্য !···

তার ভাবগতিক দেখে ভদ্রলোক ঘাব্‌ড়ে গেলেন। কারণ, সে ঘরে তখন আর কেউ উপস্থিত ছিল না। অবিনাশের রুক্ষ চেহারা, মাথার অবিন্যস্ত চুল এবং রক্তবর্ণ চোখ দেখে ভদ্রলোক সত্যিই দমে গেলেন। একেবারে একগাল হেসে ফেলে বল্‌লেন,—আর একটা, একটা দিন, নিশ্চয় কাল্‌কে......

অবিনাশ উঠে পড়ল কথা না ক'য়ে। না একটা নমস্কার, না একটা কিছু। তখন তার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, বুকে জ্বলছে আগুন। এখন আর স্বপ্ন দেখা নয়—অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তের জন্য নয়।

পথ চল্‌তে চল্‌তে এই বিদ্রোহের ভাবটা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। বালীগঞ্জ থেকে কালীঘাট আস্‌তে আস্‌তেই অবিনাশ আবার সেই স্বপ্ন দেখা সুরু করল। আবার সেই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কাল্পনিক ছবি। সব ছেড়ে এখন শুধু সে ভাবছিল—তার ভাল সময়ের আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

কালীঘাটের মন্দিরের কাছে এসে অবিনাশ 'হাঁ' হ'য়ে গেল। তারই চোখের সাম্‌নে ভীড়ের মধ্যে একটা লোক একজনের পকেট মেরে দিব্য সরে পড়লো। মনে মনে সে এই নিপুণ পকেট-মারের প্রশংসা না করে থাক্‌তে পার্‌ল না। কিছুদিন আগে হলে সে নিজেই হয়ত সেই পকেট-মারকে পেছন থেকে জাপ্‌টে ধরত। আজ কিন্তু আনন্দে সে একেবারে গলে গেল যেন...এক কথায় চমৎকার! এক মিনিটের নিপুণতায় তোমার এই নির্লজ্জ অভাব দূর হতে পারে। তা' নয় ত কি? বাঁচতে হ'লে তোমার অর্থ চাই—আর অর্থ চাইলেই কোন একটা নিপুণতা ...

রাস্তায় টহল দিতে দিতে অবিনাশ অনেকক্ষণ এই কথাটা ভাব্‌ল।···আচ্ছা, সে কি একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারে না—এই পকেট-মারের কাজটা?

হয়তো সে হাতে-হাতেই ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু একবার যদি কোনমতে, কোনমতে সে কৃতকার্য্য হতে পারে—তখন!···অবিনাশ নিজের ডান হাতটা উল্টে-পাল্টে দেখ্‌ল। তার এই নিষ্কর্ম্মা পঙ্গু হাতখানা আজ এই দুঃসাহসিকতায় সঙ্কুচিত বা আড়ষ্ট হয়ে পড়বে না তো? ভগবানকে ডেকে অবিনাশ প্রার্থনা জানাল,—ও গো, আমায় সাহস দাও, সাহস দাও!...

পিঁপড়ের মতো লোক চলেছে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। অবিনাশও তার ভেতর নিজেকে ঠেলে দিলে। রাস্তায় আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠ্‌ছে। দিনের মরুচে পড়া কোলকাতা রাত্রে যৌবন লাভ করছে—ধীরে ধীরে।

অনেক ভয়ে, অনেক আশায় অবিনাশ তার সাম্‌নের লোকটির পকেটটা বাইরে থেকে স্পর্শ করল। একবার ডানদিকেরটা, অন্যবার বাঁদিকেরটা। আশ্চর্য্য, লোকটির দুটো পকেটই তার পকেটের মতই ফাঁকা! না—হ'লো না।

চল্‌বার গতি অবিনাশ মন্থর করে দিলে। তার সাথে সাথে যারা ছিল তারা এগিয়ে গেল অনেক। সে আবার পাশের একটা লোকের পকেটে মৃদু স্পর্শ কর্‌ল। হাঁ, এইবার হাতে কি যেন ঠেক্‌ছে টাকার মতো! ..বেশ বড়, পয়সা নয় নিশ্চয়ই।...অতি সাবধানে, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে, সে আস্তে আস্তে সেই পকেটের ভেতর হাত চালিয়ে দিলে।

ভগবানের রাজ্যে পাপ ক'রে নিস্তার নেই। অনভিজ্ঞ অনিপুণ অবিনাশ ধরা পড়ে গেল। বজ্রমুষ্টিতে লোকটা তার পকেটের ভেতরেই অবিনাশের হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—চোর, চোর!

সমস্ত জনতা রুখে এল অবিনাশের ওপর। লোকটি বলে উঠ্‌ল,—শালা আমার ছেঁড়া পকেট আরো ছিঁড়ে দিল মশায়! কিন্তু ভীড় ঠেলে চোরের সাম্‌নে আস্‌তেই লোকটি যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। বোকার মতো সে কোনমতে বলে উঠ্‌ল,—এ কি! দাদা!

হেসে অবিনাশ বল্‌ল,—হ্যাঁরে, আমি। তুই বুঝি ভেবেছিলি চোর? কেমন মজা করা গেল বল দিকি! চ', বাড়ী চ'—বলেই অবিনাশ শম্ভুর গলা জড়িয়ে ধরে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল।

একটু নির্জ্জনে এসে অবিনাশ ভীষণ রেগে বল্‌ল—তুই এখানে কি করতে মরতে এসেছিলি ?

নির্ব্বাক বিস্ময়ে শম্ভু দাদার দিকে চেয়ে রইল। ব্যথায়, অভিমানে তার কচি বুকটি ভরে উঠেছে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা।

—কি ? 'হাঁ' হয়ে দেখছিস কি অমন ক'রে ? বল্ কি করতে এখানে এসেছিলি ?

কথা না কইতে পারলেই যেন শম্ভু বেঁচে যায়। এই বুঝি সে কেঁদে ফেল্‌ল···

—তবু চুপ করে রইলি যে ? তোর পকেটে টাকা এল কোত্থেকে ? এই শূয়ার !

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শম্ভু ধরা-গলায় বললে,—বেড়াতে এসেছিলাম...

—ওরে আমার বাবুরে ! বেড়াতে এসেছিলেন ! টাকা পেলি কোথায় ?

—তোমার সেই অচল টাকাটা পকেটে ছিল।

অবিনাশ শম্ভুর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

পাঁচ

বাড়ী ফিরে আস্‌তে আস্‌তে শম্ভু ভাব্‌ল, দাদার সব বিশ্রেই তবে হচ্ছে একে একে। তার বুক ফেটে কান্না আস্‌ছিল। হাজার দুঃখ-কষ্টেও তার চোখ দিয়ে এক-ফোঁটা জল কোনদিন বেরোয় নি। আজকের সকালের ও এখনকার ঘটনা তার সংযমের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছে। এ যে কিসের ব্যথা সে ভালো করে বোঝে না।··

কালীঘাটের পুলের ওপর শম্ভু দাঁড়িয়েছিল। নীচ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। তখন পূরো জোয়ার। বড় বড় ইটের নৌকাগুলো ছাড়বার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সেই ভরা নদীর ওপর তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে ফোঁটার পর ফোঁটা জল ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।...

সে রাতটা কাটল একরকম ক'রে। শেফালী, রতন দু'-চারবার খাবার জন্য বায়না ধরেছিল। কিন্তু শম্ভুর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে তারা তাদের ক্ষিধেকে হজম ক'রে ফেল্‌ল। দাদার জন্য বসে থেকে শেষটা শম্ভু ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকাল কাটল, দুপুরও কাটে কাটে। অবিনাশের দেখা নাই। এদিকে শম্ভু রতন আর শেফালীর জন্য প্রায় পাগল হ'য়ে উঠেছে। শেফালী দুর্ভিক্ষের কাঙালিনীর মতো কাঁদতে সুরু করেছে। রতন তক্তা-পোষের ওপর একপাশে শুয়ে পড়ে ফোঁপাচ্ছে।

বেলা চারটার সময় শেফালী এক কাণ্ড করে বস্‌ল। হঠাৎ চোখ উল্‌টে সমস্ত শরীর এলিয়ে দিলে। চীৎকার করে উঠ্‌ল শম্ভু। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল। প্রায় মিনিট পাঁচ-সাতের পর শেফালী চোখ মেলে চাইল। বল্‌ল,—ছোড় দা', জল খাব।

গ্লাসে ক'রে কর্পোরেশনের সস্তা জল এনে শম্ভু শেফা-লীকে খাইয়ে দিলে। রতন এই এতবড় একটা ব্যাপারে উঠেও একবার বস্‌ল না। হয় তো উঠে বস্‌বার তার শক্তিও ছিল না। শুধু কাত্‌রে কাত্‌রে জিজ্ঞেস করল,—শেফালী অমন করছে কেন ছোড় দা' ?

শম্ভু বল্‌ল,—বোস শেফালী, দেখি যদি পরিতোষের বাড়ী থেকে খানিকটা গরম দুধ—

দুধ পাওয়া গেল না। পরিতোষের মা বল্‌লেন,—নেই শম্ভু। চা হবে বুঝি ?

আসল কারণটা গোপন করে শম্ভু বল্‌ল,—পরিতোষ কোথায় ?

—সে তো মাঠে গিয়েছে খেলা দেখ্‌তে। মোহন-বাগানের খেলা আছে আজ। তুমি জান না ?

—আনা দুই পয়সা হবে ?

—পয়সা ! পয়সা কোথা' পাব বাবা ? পয়সা কি আমার কাছে থাকে না কি ?

অগত্যা শম্ভুকে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হ'ল।

পরিতোষের পড়ার ঘরের মধ্য দিয়ে ফিরে আস্‌বার সময় সে দেখ্‌ল টেবিলের ওপর দুটো চক্‌চকে সিকি পড়ে আছে। হঠাৎ—একেবারে হঠাৎ—চার-চারটে দুরন্ত অবিনাশ গোবেচারা শম্ভুর ভেতর গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল।

এখন সে মস্ত একটা দায়ীত্বের মধ্যে পড়ে গেছে। শেফালীর কথা মনে হ'তেই তার হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসতে লাগ্‌ল।

না, সে চুরীই করবে। এই নির্লজ্জ অভাবের বোঝা আর সে বহন করতে পারে না। ঠুন্‌কো মান-সম্ভ্রম, অর্থহীন নীতিবাদ, কোমল মনোবৃত্তি—না, ও সবকে প্রশ্রয় দিলে আর চল্‌বে না। দাদার চৌর্য্য-বৃত্তিটা এখন আর তার চোখে তেমন নোংরা বলে মনে হ'ল না এবং চুরী করার ভেতর এখন সে ন্যায়তঃ একটা অধিকার দেখ্‌তে পেল।...সে সেই সিকি দুটো একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে তুলে নিল। তারপর বাজার থেকে দুধ নিয়ে আসবার সময় ভেবেই সে পেল না, কোন্ দুঃখে কাল তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিলো। পাগল না কি! —এমন একটা সহজ ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?

শেফালী ও রতনকে খানিকটা করে দুধ খাইয়ে সে আবাব বাজারে বেরিয়ে গেল। কাল রাত্রে তেল ছিল না; সে জন্যে ঘরে আলোই জালা হয় নি। তেলের বোতলটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

রতন জিজ্ঞেস করলে,—ছোড় দা' দোকানে যাচ্ছ?

—হ্যাঁরে।

—এ বেলা রান্না হবে না?

অতি দুঃখেও তার হাসি পেল। সে বল্‌ল,—হবে রে হবে। তাইত চাল-ডাল সব আন্‌তে যাচ্ছি।

ছয়

রাত্রি সাতটার সময় বাড়ী ফিরে অবিনাশ একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। দেখ্‌ল, রতন আর শেফালী ধামীতে ক'রে মুড়ি আর জিলিপি খাচ্ছে।

বড় দা'র চেহারা দেখে রতন আর শেফালী ভয় পেল। ডেকে উঠ্‌ল,—ছোড় দা', ছোড় দা', বড় দা' এসেছে।

শম্ভু মাছ কুটছিল। আজ বাজার থেকে সে ছোট একটা চিথল মাছ কিনে এনেছে। মাছের কাটা ল্যাজটা হাতে করেই সে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। বল্‌ল, —কোথায় ছিলে এ দু' দিন? এ কি চেহারা হয়েছে তোমার!...

গায়ের জামাটা খুলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে অবিনাশ বল্‌ল, —তারপর এদিকের ব্যাপার কি রে শম্ভু? মাছও যে এনেছিস একটা। সেই অচল টাকাটা চলিয়েছিস বুঝি?

শম্ভু যেন গর্ব্বিত হয়েই বলে উঠ্‌ল,—না দাদা। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে—

তারপর সে ব্যাপারটা আদ্যন্ত খুলে বল্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই শম্ভু সবিস্ময়ে দেখ্‌ল, অবিনাশের চোখ দিয়ে তাজা রক্তের মতো এক-ফোঁটা জল টপ্ করে মাটিতে পড়ল।

মুখ ফিরিয়ে সে কর্কশ গলায় বলে উঠ্‌ল,—সাবধান শম্ভু! আর যেন কখনও এমন না শুনি। মাছ-টাছ রাস্তায় ফেলে দিয়ে এস। যাও—

দুঃখে, ভয়ে, বিস্ময়ে শম্ভু তার সমস্ত কথাকে হারিয়ে ফেল্‌ল। অবিনাশ আবার রুখে উঠ্‌ল,—যাও বলছি!

মাথা নীচু করে শম্ভু খানিকটা কি ভাব্‌লে। তারপব সেও কঠিন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—যাও বল্‌লেই তো হ'ল না। পয়সা দাও, এগুলো ফেলে দিয়ে আবার কিনে নিয়ে আস্‌ছি। আজও আমরা না খেয়ে থাকব না কি?...

আজ প্রথম নিজের খাওয়ার জন্য সে নালিশ কর্‌ল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। অবিনাশ নিজেও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। কিন্তু সে একটু পরেই আবার ফেটে পড়ল,—না খেতে পাও, রাস্তায় ট্রামের তলায় গিয়ে মর গে। তাই বলে ও সব এখানে চল্‌বে না।

শম্ভুর সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। মুখ বিকৃত ক'রে সেও জ্বলে উঠ্‌ল,—আর তুমি? তুমি কাল কি কীর্ত্তি করেছিলে?

কালকের ব্যাপারটা অবিনাশ যেন ভুলেই গিয়েছিল। শম্ভু আচম্‌কা সেটা মনে করিয়ে দিতেই সে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে পড়ল। খাটের ওপর শুয়ে পড়ে নিস্তেজ, ভাঙা গলায় কোনমতে থেমে থেমে বল্‌তে লাগ্‌ল,—আমি...আমি...আমার কথা ছেড়ে দে শম্ভু।......

ততক্ষণে শম্ভু মাছ তরকারী এবং হাঁড়ির সমস্ত ভাত রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছে।

সাত

পরের দিন সকালবেলা অবিনাশ আবার টল্‌তে টল্‌তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কাল রাত্রে সকলের উপোস গেছে। তবু ভাগ্য, রতন, শেফালী দুধ মুড়ি খেয়েছিল।

আজ এতদিনের পর সত্য সত্য অবিনাশের আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হ'ল। বাপ-মা-হারা ভাই-বোন্‌দের জন্য আর মাথা না ঘামালেও চল্‌বে। এতদিন সে তবু মনে করত তার জীবনে একটা মস্তবড় দায়িত্ব আছে। মরে নিষ্কৃতি পাওয়ার লোভকে তাই সে বরাবর সংবরণ করে এসেছে। তার কাছে মরে যাওয়াটা একটা লোভনীয় ব্যাপার ছাড়া আর কি!

রাস্তার জনতা ঠেলে সে চলেছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। অগণিত মানুষের মিশ্রিত কলরব তার কানে মোটেই পৌঁচচ্ছে না। সে যেন জড়, বধির, বুদ্ধিহীন একটা চতুষ্পদ। কি যে তার করণীয়, কোথায় যে তার গন্তব্য স্থান, কিছুই সে জানে না। শুধু সে চলেছে তার ক্লান্ত, দুর্ব্বল শরীরটাকে টেনে নিয়ে।...

...আচ্ছা, মরবার আগে সে আর একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারে না—এই চুরীবিদ্যেটা? চেষ্টায়, সাধনায় সব হয়। একবার ধরা পড়েছ—তা'তে কি? দ্বিতীয়বারেও যে ধরা পড়বে, তার ত কোন নিশ্চয়তা নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়ল শম্ভুর কথা।......সে এখানে নেই তো? বাস্তবিক অবিনাশ আন্‌মনাভাবে বারকয়েক ডেকে উঠ্‌ল,—শম্ভু, শম্ভু—

আরে না, না। শম্ভু তো বাড়ীতেই বসে রয়েছে দেখে এলাম। সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

...হ্যাঁ, ওই যে শম্ভুটা। আর পারা গেল না ওর সাথে। শেষকালে কি না সে চুরী করতে শিখ্‌লে!......

বেলা প্রায় দশটার সময় অবিনাশ বাড়ী ফিরে এল। ঈশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ, আজ সে কৃতকার্য্য হয়েছে। মাছের বাজারে গিয়ে সে বেমালুম একজনের পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ্‌টা তুলে নিয়েছে। আজ সত্য-সত্যই তার ভাল সময় এসে পড়ল না কি!

...কে বলে ঈশ্বর নেই? সাধনায়, চেষ্টায় এ জগতে কি না হয়? অসহ্য পুলকে ব্যাগ খুলে অবিনাশ দেখ্‌ল সেখানে চকচক্‌ করছে দশ-বারোটা টাকা! মাছ-তরকারী চাল-ডাল, এমন কি এক ঠোঙা সন্দেশ কিনে কুলীর মাথায় চাপিয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো।

—শেফালী, শেফালী, ওরে রতন—

শেফালী আস্‌তেই অবিনাশ তাকে কোলে করে চুমোর পর চুমো খেয়ে বেচারীকে অস্থির করে তুল্‌ল। রতনের গাল দুটো বারকয়েক ধীরে ধীরে চাপ্‌ড়ে দিল। আজ তার সত্যিকার অধিকার হয়েছে ছোট ভাইবোন্‌দের আদর করবার। এ ক'দিন ওদের দিকে ভালো করে চাইবারও সাহস তার ছিল না।

সে জিজ্ঞেস করল,—সন্দেশ খাবি শেফালী?

চোখ দুটো বড় বড় করে শেফালী বল্‌লে,—চালাকী করছ বড় দা', না?

—নারে, না। এই কুলী, ইধার—

সন্দেশের ঠোঙা নিয়ে নাচতে নাচতে শেফালী আর আর রতন চলে গেল। ওদের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ ভাব্‌ল,—মরা তার হ'ল কই?...

—শম্ভু, শম্ভু।

—এই যে দাদা।

—কুলীর মাথা থেকে জিনিষগুলো নাবিয়ে নে। ব্যাটারা আজ টিউশানীর মাইনেটা যা' হোক্‌ দিলে। আর শোন্—

—কি?

—এই নে দুটো সিকি। চুপিচুপি এক সময় পরিতোষের টেবিলের ওপর রেখে আসিস—বুঝ্‌লি?

সিকি দুটো হাতে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে শম্ভু বল্‌ল,—জানো দাদা, সেদিনকার সেই তিনটে পয়সা মুড়িওয়ালীকে আমি ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কুড়িয়ে পেয়েছি।

শম্ভুর দিকে খানিকটা আড়চোখে চেয়ে, গম্ভীর হ'য়ে অবিনাশ শুধু একটা 'হুঁ' করল।

প্রভা দে

হাসি ও অশ্রু

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

সহরতলীর অনতিপ্রশস্ত রাস্তাটির উপর প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীটা যেন উদ্ধত স্পর্দ্ধায় সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিধারে প্রায় সমস্তই দরিদ্রশ্রেণীর বসতি; নীচু নীচু খোলার ঘরগুলা যেন নিজেদের হীনতার লজ্জায় নিজেরাই ম্রিয়মান।

বৃহৎ বাড়ীটায় পায়রার খোপের মত ছোট ছোট কক্ষ যে সংখ্যায় কতগুলি, এক নজরে সে কথা বলাও যেমন নিতান্ত সহজ নহে, কত ঘর বাসিন্দা সেখানে বাস করে সে কথা বলাও তেমনি কঠিন। কঠিন আরও এইজন্য যে, বাসিন্দারা অধিকাংশই স্থিতিশীল নহে। আজ সায়াহ্নে যে কক্ষটি হয়ত একাধিক নরনারী বালকবালিকার কলকণ্ঠে মুখর, কাল পূর্ব্বাহ্নে তাহাই আবার আপন একাকীত্বে রব-হীন মৌন;—পুরাতন অধিবাসীরা নূতন নীড়ের উদ্দেশ্যে উঠিয়া গিয়াছে। আবার হয়ত দুইদিন না যাইতেই দেখা গেল নবাগত আর একদল লোক সেই পরিত্যক্ত ঘরে আপনাদের সংসার রচনায় ব্যাপৃত। কিন্তু স্থিতির এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই অনন্যসাধারণ বাড়ীটির অতি সাধারণ লোকগুলির পরস্পরের মধ্যে পরিচয় স্থাপনে কোন বাধা নাই; তা' সে পরিচয় যত চলনসই রকমেরই হউক আর ক্ষণস্থায়ীই হউক।

ইহাই হইল 'মধুচক্রে'র বিশদ ইতিহাস।

বলিতে ভুলিয়াছি কবে কোন্ অজ্ঞাতনামা সুরসিক ব্যক্তি বাড়ীখানির 'মধুচক্র' নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই হইতে লোকের মুখে মুখে ঐ নামটিই বহাল রহিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি দু'তলায় ঠিক সিঁড়ির পার্শ্বেই দক্ষিণদিকের সর্ব্বশেষ কোণের ঘরটায় যে ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসিয়া উঠিয়াছেন, সরল অমায়িক ব্যবহারে, সহজ সৌজন্যে ও স্বাভাবিক হৃদ্যতায় সকলের অন্তরেই তিনি একটি প্রীতির আসন লাভ করিয়াছেন। রায়মহাশয় লোকটি প্রৌঢ়; বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, হয়ত পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছিই হইবে; কিঞ্চিৎ স্থূলবপু ও খর্ব্বকায়। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই ভদ্রলোক বড় বিব্রত হইয়া পড়েন। মাথার মসৃন টাক ঘিরিয়া স্বল্পাবশিষ্ট যে কয়গাছা কাঁচা পাকা চুল যাই যাই করিয়াও নিতান্ত টিঁকিয়া আছে, তাহাই চুলকাইতে চুলকাইতে স্মিতমুখে তিনি বলেন,—"তা' হলো বই কি দাদা, পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়েছি"—বলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তাঁহার দৌর্ব্বল্যটুকু ধরা পড়িল কি না দেখিবার জন্য।

রায়গৃহিণী নমিতার বয়স কিন্তু খুব বেশী করিয়া ধরিলেও বাইশের উপর কিছুতেই বলা চলিবে না। তরুণী গৃহিণী; নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডলের মতই মনোহর তাহার মুখশ্রী। চক্ষে এমন একটি অসাধারণ দীপ্তি আছে যে, সেদিকে একবার অতর্কিতে দৃষ্টি পড়িলে তথাকথিত বহু জিতেন্দ্রিয় পুরুষকেই বোধ করি আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হইবে।

মোটের উপর নমিতাকে প্রথম দর্শনেই একবাক্যে বলিতে হয়,—রায়মহাশয় জিতিয়া গিয়াছেন, রায়মহাশয় ভাগ্যবান।

নূতন সংসার গুছান হইলে নমিতা একদিন আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে প্রতিবেশীদের ঘর ঘর গিয়া আলাপ করিয়া আসিয়াছে। অনুরূপক্ষেত্রে 'আলাপ' বলিতে আমরা প্রথম পরিচয়ের মামুলি মৌখিক ভূমিকাই বুঝি, কিন্তু রায়গৃহিণীর আলাপ করার মধ্যে এমন একটি মধুর আন্তরিকতা ছিল, যাহার জন্য সেই একদিনেই সে সমুদয় বালকবালিকা, তাহাদের মাতা ও ঠাকুরমা এই তিন পুরুষের (?) চিত্ত জয় করিয়া ফেলিল। নারীমহলে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। পঞ্চমুখে তাহার প্রশংসা। মীরার মা

উৎফুল্ল হইয়া মন্তব্য করিলেন,—"খাসা বৌটি, যেন গেল জন্মে আমাদের আপনার জন কেউ ছিল।"

পরদিন রায়মহাশয়ের সাময়িক অনুপস্থিতির অবকাশে একপাল মেয়ে আসিয়া হাজির নমিতা দি'র ঘরে, তাহার সহিত গল্প করিতে। মেয়েগুলি প্রায় সকলেই নমিতার সমবয়সী;—কেহ দু'তলার গোবর্দ্ধনবাবুর কন্যা, কেহ তিনতলার আদিত্যনাথের পত্নী, কেহ একতলার সুকুমারের ভগ্নী, এমনি অনেকগুলি। স্ত্রী-চরিত্রের একটি চিরন্তন বিশেষত্ব এই যে, মেয়েরা স্বল্প পরিচয়েই পরস্পরের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রসক্তি বোধ করে, পুরুষেরা সেরূপ করে না। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। গল্প-গুজব, রহস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে এই কয়টি তরুণী নারীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হইয়া পড়িল।

দিব্য সাবলীল, স্বচ্ছন্দ গতি, আবেগ-স্পন্দিত, অনবদ্য কবিতা,—মধ্যে যদি সহসা ছন্দ পতন হয়, তাহা যেমন কর্ণকে পীড়িত করে, সেইরূপ 'মধুচক্রে'র অধিবাসীদেরও একদিন এক আকস্মিক অকল্পিতপূর্ব্ব ঘটনায় উদ্বেগের আর সীমা রহিল না। কথাটা প্রথমে ভস্মাচ্ছাদিত ঈষৎ ধূমায়িত বহ্নির ন্যায় অস্পষ্ট ছিল এবং তাহার আলোচনাও এক বিশেষ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে আগুনের মতই তাহা সকল সীমা, সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 'মধুচক্রে'র কক্ষে কক্ষে সঞ্চারিত হইয়া সকলের মনে যেন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। রায়-মহাশয়ের অগোচরে চুপিচুপি সব পরামর্শ চলিতে লাগিল। সকলেই প্রায় একমত; কিনারা ইহার একটা করিতেই হইবে। পুত্রকন্যা লইয়া সকলকে বাস করিতে হয়, এরূপ অনাচার অসহ্য।

সনাতনবাবু স্থানীয় কোন স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। তিনি এখানে পণ্ডিতমশাই নামেই খ্যাত। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিল,—"তাইত এ যে বড় ভয়ানক কথা—বিহিত এর একটা করা বিশেষ প্রয়োজন; নচেৎ আমাদেরই বাস তুলতে হয়⋯ শাস্ত্রে ত তাই বলেছে,—'সসর্পে চ গৃহে বাস"—বলিয়াই তিনি সহসা থামিয়া নস্যাধার হইতে নস্য লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে এরূপ ঘন ঘন নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন যে, ইহার পর তাঁহার অর্দ্ধোচ্চারিত শাস্ত্র বচন আর সমাপ্ত হইবার অবকাশ পাইল না।

নারীমহল আরও সচকিত, উদ্বিগ্ন। যে শান্তদর্শন বধূটীর বাহ্যিক ব্যবহারে এমন অভাবনীয় মাধুর্য্য, তাহারই অন্তর এমন কলঙ্ক কলুষিত হইল কেমন করিয়া? গোবর্দ্ধনবাবুর মাসীমা বিধবা, বয়সও হইয়াছে; সর্ব্বজ্ঞের মত বলিলেন,—"দেখ্‌লে ত বাছা তোমরা, আমি গোড়া থেকেই জানি ও মেয়ে ভাল নয়...চোখ্‌েই যার অমন আগুন—"

—"তাই ত মাসীমা, ঠাট-ঠমকই বা কি!"

—"চোখের চাউনিও যেন কেমন কেমন—"

কথাগুলা মাসীমার মনঃপূত হইল না। নারী-চরিত্র অধ্যয়নের কৃতিত্ব সবটাই তাঁহার একার, ইহারা যেন অন্যায়রূপে তাঁহার সে কৃতিত্বের অংশ দাবী করিতেছে।

—"তা' বাছা, সকলেই যদি সুরু হতে জেনেছিলেত এত আস্কারা দিলে কে মাগীকে? আমিত আর দিতে যাই নি?⋯ কা'কে ছেড়ে কা'কেই বা বল্‌ব?...ঐ যে মীরার মা, তার নাম করতে অজ্ঞান হয়ে যায়, নাও, এমন সামলাও।" একটু দম লইয়া বলিলেন—"সব নাকে খৎ দাও, আজ হতে আর কেউ আমরা ওর ত্রিসীমানায় ঘেঁসবো না।⋯"

সকলে তাঁহার এই বিধানে সম্মতি দিলেন।

নমিতা 'একঘরে' হইল।

ঘটনাটীর বিবরণ খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

নমিতারা আসিবার মাস দুই পূর্ব্ব হইতে যামিনীবাবু দ্বিতলের একখানি ঘর লইয়া 'মধুচক্রে' বাস করিতেছেন। যামিনীবাবু একজন অতি আধুনিক সাহিত্যিক—কবি; বয়সেও তিনি তরুণী। বাঙালী মাসিক সাহিত্য পাঠকদের

নিকট যামিনীকান্ত সমাদ্দারের নাম সুপরিচিত—অবশ্য সেই সব পাঠকদের নিকট, যাঁহারা মাসিক-পত্রের কবিতার পাতাকে নগণ্য জ্ঞানে অবহেলা করেন না। যামিনী-বাবুর কবিতা প্রায় বাংলা মাসিক-পত্রেরই পাদ-পূরণ করিয়া থাকে...যদিও তাঁহার ভক্তদের সুচিন্তিত মত এই যে, যামিনীবাবুর কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ঠিক পার্শ্বেই স্থান পাইবার সর্ব্বাংশে যোগ্য। 'আমার মানসী প্রিয়া', 'রক্তে মোর লেগেছে আগুন', 'সে রাতি কি ফিরিবে না' প্রভৃতি তাঁহার কবিতা তরুণ মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভগবান যেন যামিনীবাবুকে বাংলার নবযুগের কবি হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। না হইলে তাঁহার আকৃতি প্রকৃতিতে এমন কবিজনোচিত বৈশিষ্ট্য আসিল কোথা হইতে? যামিনীবাবুর দীর্ঘ রুক্ষ কেশ বাব্‌রি করা; স্বপ্নালস দুইটি চক্ষের উপর 'পাঁস্‌নে' চসমা···উহা হইতে কালো কার ঝুলিয়া গলদেশ বেষ্টন করিয়া আছে। গায়ের রঙ খুব ফরসা না হইলেও, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—স্নো, ক্রীম প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পালিশে বর্ণের জৌলুসটুকু যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। গুম্ফশ্মশ্রুহীন নির্ম্মল মুখখানি যেন সর্ব্বদাই ভাবাচ্ছন্ন...দৃষ্টি সুদূর নিবদ্ধ। মোটের উপর বুঝিতে বিলম্ব হয় না, লোকটি সর্ব্বদাই কাব্যলোকে বিচরণ করিতেছে।

ইনি এখানে আসিবার পর প্রতিবেশীরা প্রথম প্রথম দুই-একবার পরিচয় স্থাপনের চেষ্টায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু লোকটিকে অত্যন্ত স্বল্পভাষী, অসামাজিক ও গম্ভীর প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আদিত্য ত লোকটির অভদ্র আচরণে চটিয়াই আগুন,—"দেখলেত সুকুমার, লোকটার ব্যবহার দেখ্‌লেত?...'মার্ক' করেছ, কি দাম্ভিক; আর শুধু তাই নয়, কি রকম ফ্যাল্‌ফেলে 'ভেকাণ্ট' দৃষ্টি, সেটাও বোধ হয় 'মার্ক' করেছ।...ওর মাথায় ছিট্ যদি না থাকেত—" কি একটা ভয়ঙ্কর দিব্য করিতে গিয়া আদিত্য থামিয়া গেল।

কিন্তু ব্যাপারটি ঘোরাল এবং রসাল হইয়া উঠিল, নমিতারা আসিবার পর হইতে। ইদানী সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে কবি পূর্ব্বের মত আর সেরূপ 'মুডে' থাকেন না, ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের মুখোস তাঁহার খসিয়া গিয়াছে। সকলের সহিত এবং বিশেষ করিয়া রায়মহাশয়ের সহিত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তিনি আলাপ করেন।...দৃষ্টি তাঁহার সুদূর কল্পলোক হইতে ফিরিয়া এই ধূলির ধরায় এবং বিশেষ করিয়া দ্বিতলের ঠিক সিঁড়ির পার্শ্বেই দক্ষিণ দিকের সর্ব্বশেষ কোণের ঘরটার উপরই নিবদ্ধ হইয়া থাকে যেন।

বিস্ময়ে উপর বিস্ময়! কবি আজকাল সময় অসময়ে অনুচ্চস্বরে তাঁহার মানসীর উদ্দেশে রচিত গানের আলাপ করেন, কখনও শিস্‌ও দেন। রায়মহাশয়কে নিজের ঘরে ডাকিয়া দাবা খেলাও চলে। এমন কি, তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া নমিতার সহিত সরস আলাপেও আর বাধা নাই। বৌদি'র ঘরে যামিনী ঠাকুরপোর জলযোগের নিমন্ত্রণও না কি বেশ ঘন ঘন চলিতেছে।

নব-পরিচিত অনাত্মীয় এক যুবকের সহিত তরুণী গৃহস্থ বধূর এই অশোভন অন্তরঙ্গতাও সকলে এতদিন কোন-প্রকারে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু মাসীমা যেদিন মেয়েদের সকলকে ইঙ্গিতে ইসারায় ডাকিয়া দেখাইলেন, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কোণের দিকে নিরালায় দাঁড়াইয়া নমিতা কবির গায়ে গা দিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, সেইদিন সকলে সচেতন হইয়া উঠিল: প্রতি-বেশী হিসাবে কথাটা রায়মহাশয়ের কর্ণগোচর করা নিতান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যও বটে।

মাসীমা অনুপস্থিত রায়মহাশয়ের প্রতি অনুকম্পায় বিগলিত হইয়া বলিলেন,—"মিন্সের কি পোড়া বরাত দেখ···কালসাপ পুষেছে দুধকলা দিয়ে!···বেচারী সরল মানুষ, স্ত্রী বলতে অজ্ঞান, শালগেরাম শিলার মতন যত্নে মাথায় করে রেখেছে, আর তুই ছুঁড়ী কি না ভেতর ভেতর এই ঢলাঢলিটে করছিস্?···মুখে আগুন!..." ইহার পর তিনি এক বিচিত্র ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িয়া সুর করিয়া করিয়া বলিলেন,—"বলে, ডুবিয়া খাইলে জল কে ধরিতে পারে?···কিন্তু বাবা, এই ক্ষ্যান্ত বামনীর এই দুটি চোখ্‌খে

ধুলো দেওয়া বড় সহজ নয়, সেকথা এই আমি বলে দিলুম, হ্যাঁ”—বলিয়া তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সমাগত রমণীদের মধ্যে হইতে কে একজন বলিল,—“কথাটা ত তাঁকে জানিয়ে দেওয়া—

—“নিশ্চয়! গোবর্দ্ধনকে বলি, সে ব্যবস্থা ওরা করুক ...এখুনি করুক...দুঃখু হয়, ছুঁড়ীর সোয়ামীটার জন্যে··· এই ঢলাঢলি কেচ্ছার কথা শুনলে কি আর পুরুষ-মানুষ—”

পুরুষ অধিবাসীদের মধ্যে যথারীতি গুপ্ত পরামর্শের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল রায়মহাশয়ের নিকট এই অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটনের দায়ীত্ব পালনে স্পষ্টবক্তা গোবর্দ্ধন-বাবুই উপযুক্ততম ব্যক্তি; তবে বেচারা রায়মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া এই কদর্য্য ব্যাপারটাকে লইয়া বেশী হৈচৈ না করিয়া তাঁহাকে গোপনে স্ত্রীর উপর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেই হইবে। আদিত্য বলিল,—“আহা, আপনারা ‘মার্ক’ করেছেনত, বেচারা রায়মশাই কি রকম ‘ইনোসেণ্ট’ প্রকৃতির লোক! ভদ্দরলোক সাতেও নেই, পাঁচেও নেই; যেটুকু অবসর পান,—সুকুমার, তুমি বোধ হয় ‘মার্ক’ করেছ,—শুধু তাস, পাসা আর গল্প-গুজব নিয়েই থাকেন।”

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে ‘বেচারা’ ‘ইনোসেণ্ট’ ব্যক্তির মন্দ ভাগ্যের জন্য সকলে এত সহানুভূতিসম্পন্ন, অথচ যাঁহার স্ত্রী-সম্পর্কিত এই কুৎসিত কলঙ্ক-কাহিনীর সরস আলোচনায় এতগুলি রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, পরদিন সকালে কথাটা শুনিয়া তিনিই যখন নির্ব্বিকার রহিলেন, ক্রোধে উন্মত্ত, অথবা ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইলেন না, তখন লোকগুলার নৈরাশ্যের আর অবধি রহিল না। শুধু তাহাই নহে; তিনি সেইদিনই বৈকালিক পাশার আড্ডায় বসিয়া এরূপ সোৎসাহে ‘কচে বারো’, ‘চার দুই ছয় পাশা’ ইত্যাকার হাঁক্ ছাড়িতে লাগিলেন যে, সকলে সচকিত হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় আরও এক বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইল এই যে, এ কয়দিন যাঁহারা রায়মহাশয়ের প্রতি অসীম অনুকম্পায় করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন তাঁহারাই সে ব্যক্তির নির্লিপ্ত নিস্পৃহভাব দেখিয়া অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

মাসীমা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—“ভেড়ো, ভেড়ো...মিন্সেকে ছুঁড়ী মন্‌তোর তন্‌তোর করে’ একেবারে ভেড়ো বানিয়েছে!··ছি-ই, ছি-ই!”

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইয়াই ব্যাপারটা সহসা থামিয়া গেল। ‘মধুচক্রে’ এ কয়দিন অবিরাম যে একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, তাহা স্তব্ধ হইল। এতগুলি লোকের সম্মিলিত জীবনধারা সহজ গতির পথে বাধা পাইয়া ক্ষণিকের জন্য যে কলধ্বনি তুলিয়াছিল, এখন তাহা আবার স্বচ্ছন্দ ধীরগতিতে প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে।

মাসীমা প্রমুখ নারীদের বিচারে নমিতা যেমনই হউক, ভালই হউক আর মন্দই হউক, ভদ্র হউক বা নাই হউক, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই নবাগতা তরুণী বধূটিকে ঘিরিয়া যেন এক অবর্ণনীয় মোহজাল বিস্তারিত আছে। ইহার ভাবে ও ভঙ্গিমায়, আকৃতি ও আচরণে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে যে, প্রথম দর্শনেই সে যে কোন পুরুষ চিত্তে স্বতঃই একটি দুর্ল্লভ কামনার বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, গোবর্দ্ধন-বাবু হইতে পণ্ডিতমশাই পর্য্যন্ত সকলেরই আনাগোনা প্রয়োজন অপ্রয়োজনে বেশ অশোভনরূপেই বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঐ নমিতারই ঘরের কোল ঘেঁসিয়া। শুধু তাহাই নহে;—আজকাল সময়ে অসময়ে রায়মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া ও দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী নমিতাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে যে সকল অহৈতুক ও অতিরঞ্জিত প্রশংসার বাণী ঘন ঘন উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, প্রাতঃ-স্মরণীয়া যে কোন মহীয়সী মহিলার প্রতি সেগুলি

সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী শেফালিকা

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা]

[স্বদেশের সৌজন্যে

আরোপিত হইলেও, বোধ করি অত্যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। কথাগুলা শুনিয়া ও লোকগুলার দুর্ব্বলতা দেখিয়া, নমিতা হাস্য সংবরণ করিয়াছে অতিকষ্টে। তথাপি, ইহারাই তাহার কলঙ্ক রটনায় পঞ্চমুখ হয়...এই 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' লোকগুলাই তাহার অসাক্ষাতে স্বামীকে তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেয়।...সিংহ-চর্ম্মাবৃত ছদ্মবেশী কুক্কুরের দল! ইহাদের স্বরূপ জগতের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে।...ভাবিতে ভাবিতে নমিতা শাণিত অসির মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ;—পাপ সে করিয়াছে নিশ্চয় এবং সে পাপের গুরুত্বও কিছু কম নহে, কিন্তু এই নীচ ভণ্ড লোকগুলাই কি সব সাধু না কি?

সেদিন অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া আদিত্য দেখিল, পত্নী নীলিমার মুখখানা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র জলভারনত বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতই অন্ধকার। কাপড় ছাড়িবার জন্য গিয়া দেখিল কাপড় নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই,—গামছা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অন্যদিনের মত ঘর বিছানা সব পরিপাটি ছিম্‌ছাম্ করিয়া সাজান নহে।...পত্নীর আনত মুখের দিকে অপাঙ্গে আর একবার চাহিয়া বলিল,—"শুন্‌ছ গা? কাপড়টা কোথায়?"

সাড়া নাই।

অধীরকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি আশ্চর্য্য! কাপড়টা রাখ্‌লে কোথায়?"

নীলিমা নির্ব্বাক।

—"কি হ'ল কি তোমার?"

নীলিমা চক্ষে অঞ্চল দিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদিতে বসিল। তাহার পর সহসা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল ;—"কেন যাও না, তোমার ঐ আদরের নমিতার ঘরে যাও না...সে এতক্ষণ সব সাজিয়ে গুছিয়ে, তোমার আশায় পথ চেয়ে বসে' আছে"—বলিতে বলিতে তাহার দুই আঁখির প্রান্ত ছাপাইয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।—"তুমি...তুমিও শেষে ঐ যামিনীবাবুর মতন ঐ মাগীর জালে পড়লে?...এত সুখ্যাতি সুনাম তোমার, আর আজ আমি লজ্জায় কা'রও কাছে মুখ দেখাতে পাচ্ছি না·· চারধারে ঢিঢি পড়ে' গেছে, ঘরে থেকেও কান পাতা যায় না...ছিঃ!"

আদিত্য বিমূঢ়, নির্ব্বাক! মনে হইল যেন তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু কলঙ্কের মূল কথাটা যে অসত্য বা অতিরঞ্জিত নহে সে কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া? সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাদের দুইজনকে রসালাপ করিতে দেখিয়াছে, একাধিক ব্যক্তি। আদিত্যের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে সেই কথা লইয়া আলাপ-আলোচনার আর অবধি নাই। তাহার মত একজন গোঁড়া 'মর‍্যালিষ্টে'র এই নৈতিক অধঃপতনের সংবাদে 'মধুচক্র' লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মতই কলগুঞ্জনে শব্দায়মান হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, কথাটা লোকের মুখে মুখে পরে অবশ্য পল্লবিতও হইয়া উঠিয়াছে অল্প নহে; এবং সেই পল্লবিত কাহিনীটি ইতিমধ্যে সবিস্তারে রায়মহাশয়ের গোচরীভূত করায় তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই সম্পর্কে বেশ একটু বচসাও বুঝি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দাম্পত্য কলহের ফলে না কি বেচারা বৃদ্ধ স্বামীই তরুণী স্ত্রীর নিকট ভর্ৎসিত হইয়াছেন বেশী।

এ সকল সংবাদ সে সংগ্রহ করিয়াছে বন্ধু সুকুমারের নিকট হইতে। সেও অবশ্য প্রথম প্রথম সকলের সমক্ষে আদিত্যকে বিদ্রূপই করিয়াছে প্রচুর—এমন কি তাহাকে 'স্কাউনড্রেল' বলিয়া গালি দিতেও কসুর করে নাই। কিন্তু সেটা শুধু মৌখিক। সকলের অসাক্ষাতে আদিত্যকে সে আন্তরিক যাহা করিয়াছে, তাহা অভিশাপ নহে, অভিনন্দন; এবং উৎফুল্লকণ্ঠে তাহাকে আহ্বানও করিয়াছে 'লাকি ডগ্' বলিয়া।

কিন্তু সুকুমার যাহাই বলুক, আদিত্যের আর কাহারও কাছে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। তাহাকে দেখিলেই সকলে চোখ টিপিয়া যে সকল মন্তব্য করে, তাহা আদৌ শ্রুতিসুখকর নহে। ভাষায় যে কিছু ব্যক্ত করে না, সে

সেটুকু স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করে প্রখর কটাক্ষে ও অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে।

পণ্ডিতমহাশয় হয়ত নস্য লইতে লইতে ভ্রূকুটি করিয়া বলেন,—"বকধার্ম্মিক, বিড়াল তপস্বী।..."

তাম্রকুট সেবনরত গোবর্দ্ধনবাবু মুখ হইতে হুঁকার নল নামাইয়া বলেন,—"হাম্‌বাগ্‌!..."

দগ্ধপ্রান্ত বিড়িটা দুই আঙুলে টিপিয়া সুকুমারও বলে,—"লোদ্‌সাম!..."

সম্মার্জ্জনী হস্তে মাসীমা বলেন,—"লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া কোথাকার...যেন ভিজে বেড়ালটি!"—বলিয়া আবার স্বকর্ম্মে রত হন।

নমিতা শুধু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি জানি কিসের পরিতৃপ্তিতে হাসিতে থাকে। এবং হাসে লুকাইয়া নহে, মাসীমার সম্মুখেই।

মাসীমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলেন,—"মরণ আর কি! ছেনাল মাগীর ঢং দেখলে গা জ্বলে' যায়.. একেবারে বাজারের!"—বলিয়া দৃষ্টিতে যেন বিষ ছড়াইতে থাকেন।

কয়েকমাস পরের কথা।

তখন চৈত্র মাস। সপ্তাহের মাঝামাঝি কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে অফিস আদালত সব বন্ধ। মহাসমারোহে সেদিন দ্বিপ্রহরে তাসের আড্ডা বসিল, তিনতলার পুরাতন অধিবাসী করালী কুণ্ডুর গৃহে। করালী কুণ্ডু লোকটি সার্থকনামা ও স্বপদবীখ্যাত। ঘরে বাহিরে তাহার কুণ্ডু বলিয়াই খ্যাতি। তাহার সুদীর্ঘ শ্রীহীন আকৃতিতে এমন একটা অমার্জ্জিত, রূঢ়, কর্কশভাব বিদ্যমান যে, প্রথম দর্শনেই তাহার উপর একটি বিশেষণ আরোপ করিতে ইচ্ছা হয়,—বেপরোয়া। লোকটির দৃষ্টিতে যেন সর্ব্বদাই একটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব।

কুণ্ডু-পত্নী সন্তানসম্ভবা। মাত্র গত রবিবার তিনি পিত্রালয়ে গিয়াছেন। এরূপ যাওয়া তাঁহার বাৎসরিক ব্যাপার বলিলেই চলে। গৃহিণীহীন গৃহে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা আর নির্জ্জন কারাবাস করার মধ্যে যে বিশেষ কিছু প্রভেদ আছে, কুণ্ডু একথা স্বীকার করে না। সেই জন্য এই সময়টা সে পাঁচজনকে লইয়া ক্রীড়া-কৌতুকে অবসর বিনোদন করিতে চাহে।

সেদিন রায়মহাশয়ের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। বিলম্বের কারণ,—তাঁহাদের দাম্পত্য কলহ। রায়-মহাশয়ের মন বড়ই বিমর্ষ।...বিগত যৌবন তিনি, স্বার্থপরের মত কেন মিথ্যা নিজের সুখের আশায় এই তরুণী নারীকে জীবন-সঙ্গিনী করিতে গিয়াছিলেন?... এ অসম্ভব দুরাশা তাঁহার হইল কেন?...

তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেই, ক্ষণকালের জন্য খেলা স্থগিত রাখিয়া সহাস্য কলরবে সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল,—"এই যে দাদা, এসে পড়েছ···অনেকদিন বাঁচবে দাদা, এই মাত্তর তোমার নাম হচ্ছিল·· বস', বস'।"

খেলা তখন পূর্ব্বোদমে চলিতেছে। রায়মহাশয় কাহারও কথার জবাব দিলেন না, বসিলেনও না। ঘরের মধ্যে নীরবে একটু পায়চারী করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণের বড় জানালাটা দিয়া বেশ ফুর্‌ফুর্‌ করিয়া বাতাস আসিতেছিল; সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। পাশে রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া ও বলরামচূড়ার গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া যেন আলো করিয়া আছে। রায়মহাশয় কবি, এমন অযথা অখ্যাতি তাহার প্রবলতম শত্রুরও রটনা করার দুঃসাহস হইবে না, অথবা তিনি সদ্যবিবাহিত তরুণ যুবকও নহেন, তথাপি কে জানে কেন সেদিন তিনি সেই পুষ্পিত বৃক্ষের দিকে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিলেন।···কিছুক্ষণ এইভাবে উন্মনা থাকিতে থাকিতে তাঁহার মন হইতে বিষণ্নতার মেঘ কাটিয়া গিয়া অন্তর অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

জানালার ঠিক পার্শ্বেই ঘরের মধ্যে একটা নীচু বেঞ্চের উপর বহু বৎসরের পুরাতন ধূলি-মলিন পঞ্জিকা, চুল বাঁধা ফিতার টুক্‌রা, দাড়াভাঙা চিরুণী, জুতাঝাড়া বুরুষ—এক কথায় জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠের যত কিছু উপকরণ স্তূপীকৃত করা ছিল। বহুকাল সঞ্চিত ধূলায় সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই উপর একটি

'পিস্‌বোর্ডে'র জুতার বাক্সের মধ্যে কুণ্ডুর নিত্যব্যবহার্য্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সজ্জিত ছিল। রায়মহাশয় জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া একখানা সচিত্র দেয়াল-পঞ্জীর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া কি যেন দেখিলেন। তারপর জুতার বাক্সের মধ্যে একটি কারুকার্য্য খচিত নস্যাধার দেখিয়া হাতে তুলিয়া লইলেন; ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"বাঃ কুণ্ডু! এ নস্যির ডিবেটীত যোগাড় করেছত দেখ্‌ছি দিব্যি!"—বলিয়া নস্যাধার হইতে কিঞ্চিৎ নস্য লইয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

ঘরের মধ্যে, মেঝের উপর বসিয়া কয়টি শিশু ছিন্নপত্র, জল, ইষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি অনুরূপ মহার্ঘ্য উপকরণ লইয়া আপন-মনে খেলায় মগ্ন ছিল। রায়মহাশয় তাহাদের কাহারও গাল সস্নেহে টিপিয়া দিলেন, কাহারও মুখচুম্বন করিলেন; তাহার পর তাস খেলার দর্শকরূপে গিয়া সকলের সহিত তক্তাপোষে স্থান গ্রহণ করিলেন। খেলা চলিতে লাগিল। এবং তাহারই রসাস্বাদ করিতে করিতে নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে ক্রমে রায়মহাশয়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

খেলা যখন শেষ হইল, কুণ্ডুর ঘড়িতে তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন রবি পশ্চিম গগনে অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দিবালোক তখনও বিশেষ ম্লান হয় নাই। রায়মহাশয় ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়াই উঠিয়া পড়িলেন,—"ওঃ, আর নয়, এবার তা'লে ওঠা যাক্ ভাই। সাড়ে পাঁচটার সময় একজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার—"

কুণ্ডু তখনও সোৎসাহে খেলার কথাই আলোচনা করিতেছিল। গোবর্দ্ধনবাবু একবার হাই তুলিয়া আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে বলিলেন,—"এত বড় বেলা, কোথা দিয়ে কেটে গেল একবার দেখো। মনে করেছিলাম, ছুটির দিন, ঘড়িটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখ্‌ব আজকে—"

সুকুমার বাধা দিয়া বলিল,—"সে আর আপনি পেয়েছেন···যিনি আমার পার্কারের ফাউন্টেন পেনটি 'না বলিয়া' নিয়েছেন, আপনার ঘড়িও তিনিই চক্ষুদান দিয়েছেন, এ আমি নিশ্চয় বলে দিলাম।"

তাহার কথা বলার সরস ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

আদ্যনাথ মন্তব্য করিল,—"কিন্তু যিনিই এ কাজ করুন,—আপনারা 'মার্ক' করবেন—তিনি বাইরের লোক নন্ নিশ্চয়—এখানকারই কোন সন্ধানী—"

কুণ্ডু তাহার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"সে মহাপুরুষ কিন্তু যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হ'ন, একদিন তিনি ধরা নিশ্চয়ই পড়বেন। আর সেদিন—আমাকে ত ভাই তোমরা জানই—করালী কুণ্ডু কখনও কারও খাতিরের ধার ধারে না।"—বলিয়া সে তাহার বক্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়াই এমন একটা ইঙ্গিত করিল, যাহাতে বুঝিতে পারা গেল, সেই অনাগত সুদিন অথবা দুর্দ্দিনে নিঃসন্দেহ একটা নিদারুণ অঘটন ঘটিবে।

গোবর্দ্ধনবাবু 'শ্লিপারে' পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে বলিলেন,—"কই কুণ্ডু, তোমার নস্যি এক টিপ্ দাও দিকিন।"

—"এই যে ভাই"—বলিয়া কুণ্ডু জুতার বাক্সের দিকে আগাইয়া গেল।

নস্যের ডিবা নাই!

কুণ্ডু জুতার বাক্স উপুড় করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খুঁজিতে লাগিল, সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানে অনুসন্ধান করিল—কিন্তু না, নস্যের ডিবা সত্যই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে!

সর্ব্বনাশ! নস্যাধারের কি পক্ষোদ্গম হইল না কি? ...কত সখের রৌপ্য-নির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত মনোহর ডিবাটি···কাঞ্চন বিনিময়ে উহার মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না। কুণ্ডুর অধুনা-পরলোকগত শ্যালক উহা আনিয়াছিল দিল্লী হইতে। তাহারই স্মৃতির নিদর্শন ঐ ডিবাটিও কি শেষে সেই সন্ধানী মহাপুরুষের করতলগত হইল?

কিন্তু কথাটা সকলেরই মনের মধ্যে যেন একই সঙ্গে বিদ্যুতের মত ঝিলিক্ হানিয়া গেল। স্বেচ্ছায়ই হউক, আর ভ্রমক্রমেই হউক, এ দুষ্কার্য্য রায়মহাশয়ই করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইত তখন তিনি ডিবাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, কে না দেখিয়াছে?...

ছি ছি, ভদ্রলোক হইয়া এমন নীচ প্রবৃত্তি !...যাহা হউক, এতদিনে বুঝি সমস্ত চুরির একটা কিনারা হইবে।

কুণ্ডু তাহার পেশীবহুল হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উত্তেজিত-ভাবে বলিল,—"তোমরা ভাই সকলেই সাক্ষী আছ? এখন বুঝ্‌তে পারছ কেন সেই ভদ্রবেশী চোর আগেই সরে' পড়েছে?...এসত সব একবার দেখি।"

সকলে একযোগে ঘর হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কিন্তু তাহাদের যাইতে হইল না বেশী দূর। রায়-মহাশয় তখনও নীচে নামেন নাই। সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তিনতলারই একটি ভদ্রলোকের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন।

সহসা সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া বেচারা একেবারে বিমূঢ় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কয়জনে মিলিয়া অজস্র শ্লেষ, কটূক্তি ও প্রশ্নের শরাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। তিনি যতই নস্যাধার অপহরণের কথা অস্বীকার করেন, কুণ্ডু ততই কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া তাঁহাকে অপমানের চরম করিতে থাকে। সে না শুনে যুক্তি, না বুঝে তর্ক। ...তাহার শুধু এক কথা,—"ডিবেটা কি পাখ্‌না মেলে উড়ে গেল না কি তা' হলে?...ও সব ধাপ্পাবাজী আমার কাছে চলবে না বলে দিচ্ছি।...ভালোয় ভালোয় এখনও বা'র ক'রে দাও, সব মিটে যাবে।"

কুণ্ডুর সেই ছাদ-বিদারণ চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল হইতে এক এক করিয়া অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয় লোক ব্রণলোলুপ মক্ষিকার মতই সেখানে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলা বলিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে একজনকেও দেখা গেল না যে, এই একতরফা বিচার মায় রুলজারীর প্রতিবাদ করিয়া একটি কথা বলিবার সাহস রাখে।

ঘটনাটি যখন এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় সকলকে চকিত, বিস্মিত করিয়া, সিঁড়ির মুখের ভিড় ক্ষিপ্র হস্তে সরাইতে সরাইতে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দৃপ্তভঙ্গীতে আসিয়া দাঁড়াইল নমিতা। না আছে তাহার কোন কুণ্ঠা, না আছে সঙ্কোচ।...ইস্পাতের মত শাণিত তাহার ভ্রূভঙ্গী।...তাহারই মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে কী তীক্ষ্ণ দুঃসহ অসহিষ্ণুতা।...উত্তেজনায় মুখ তাহার আরক্ত, অবগুণ্ঠন মাথার উপর হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশ দুই-চারিটা মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে চেতনা সম্ভবতঃ তাহার নাই।...স্থির, অকম্পিতকণ্ঠে সে বলিল,—"আপনারা কা'কে কি বল্‌ছেন, বুঝে বল্‌ছেন কি?"

প্রশ্নটা ঠিক কাহাকে করা হইল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না, অথবা সে প্রশ্নের উত্তর দিতেও যেন সহসা কাহারও সাহস হইল না। শুধু অগাধ বিস্ময়ে ক্ষণকালের জন্য নমিতার নিরাবরণ রক্তাভ মুখের দিকে চাহিয়া সকলে মূক হইয়া রহিল।

—"মানুষ আপনারা চেনেন না।...সে দৃষ্টি সে বিচক্ষণতা আপনাদের নেই—যা'তে করে' কাচ আব কাঞ্চনের প্রভেদ বোঝা যায়।"

কুণ্ডুর সমস্ত আস্ফালন যেন কোন্ যাদুমন্ত্র প্রভাবে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া অনতি-স্পষ্ট নিম্নকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলিল,—"কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখেছি—"

—"মিথ্যা কথা!"—নমিতা যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"আপনারা তাঁবা-তুলসী নিয়ে বল্‌লেও আমি ও কথা বিশ্বাস করি না।...হয়ত আপনারা ভুল দেখেছেন। ...আমার স্বামীকে আমি চিনি।...মহৎ তাঁব প্রাণ, নিষ্কলঙ্ক তাঁর চরিত্র!"...

প্রবল উত্তেজনায় তখন তাহার অধর রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ীর মত কাঁপিতেছে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে সমাগত লোকগুলির মুখের দিকে নির্ভীক সতেজ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রখর কণ্ঠে কহিল,—"নিজেদের দিয়ে অথবা আমার মতন একজন অতি সামান্য মেয়েমানুষকে দিয়ে আমার স্বামীর বিচার করলে, একটা মস্ত ভুল করবেন আপনারা।...কথাটা শুনতে হয়ত একটু খারাপই লাগ্‌বে, কিন্তু আজ এখানে একজন নিরপরাধ ভদ্রলোকের দুর্গতি দেখে আনন্দ পেতে জড় হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে এমন একজন আছেন কি না জানি না,

যাঁর চরিত্রের সঙ্গে আমার স্বামীর উন্নত চরিত্রের তুলনা চল্‌তে পারে।" বলিতে বলিতেই নমিতার দুই চক্ষু প্রান্তে অশ্রু টলটল করিয়া উঠিল।

তাহার সেই করুণ অথচ গৌরবোজ্জ্বল মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দিবাশেষের সেই স্তিমিত আলোকে ক্ষণকালের জন্য নমিতাকে সকলের অপরূপ বলিয়া বোধ হইল। অথচ কেহ বুঝিল না কোন্ অসহনীয় বেদনার অনুভূতিতে অথবা কোন্ মহৎ ভাবের অনুপ্রেরণায় আজ এই নারী এমন অভিনবরূপে মূর্ত্তিমতী হইল।...বুঝিল না বটে, কিন্তু এই একটী তুচ্ছ আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়া সেদিন একটি দুর্লক্ষ্য পরিচয় লাভ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল।

সহসা ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,—"এইত একটা নস্যির ডিবে—এইটে না কি?" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল, ভিড়ের মধ্যে একটি উলঙ্গ শিশু সেই ডিবাটী হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় সে এতক্ষণ নীচে খেলা করিতেছিল, এই মাত্র মজা দেখিতে উপরে আসিয়াছে।

দেখিবামাত্র কুণ্ডু বিনা বাক্যব্যয়ে ছেলেটীর নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ টপ্ করিয়া ডিবাটী কাড়িয়া লইল। কিন্তু নিজের অপরাধের গুরুত্বে দৃষ্টি তখন তাহার ম্লান, নমিত হইয়া আসিয়াছে...মাথা তুলিয়া নমিতার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইবার সাহস আর নাই। অত বড় দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ, কিন্তু তখন সে কাতর অন্তরে জননী ধরণীকে দ্বিধা হইবার প্রার্থনা জানাইতেছে।

ততক্ষণে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত তাহার নিকট জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। স্মরণ হইল, ঐ উলঙ্গ ছেলেটা তখন ঘরের মধ্যে খেলিতেছিল বটে।...যত নষ্টের মূল ঐ ছেলেটাকে ইচ্ছা হয়, এক প্রকাণ্ড চপেটাঘাতে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে। মুখ তুলিয়া চাহিতেই কুণ্ডু দেখিল নমিতা স্বামীর সহিত ইতিমধ্যে কখন নীচে নামিয়া গিয়াছে।

গোবর্দ্ধনবাবু এতক্ষণে কথা কহিলেন,—"সত্যই হে, কাজটা আমাদের বড় অন্যায় হয়েছে।...রায়মশায়ের কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।"

অনুতপ্ত কুণ্ডু সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"তাই চলো।"

এমন রোমাঞ্চকর ঘটনাটির শেষ অঙ্ক দেখিবার জন্য কৌতূহলী দর্শকের দল তখনও উন্মুখ চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল; সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসন্ন দেখিয়া তাহারাও দ্রুতপদে উহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে ভুলিল না।

কিন্তু নীচে নামিয়া রায়মহাশয়ের ঘরের ঈষদুন্মুক্ত দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভিতর হইতে অস্বচ্ছ চাপা কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত রোদনের শব্দ আসিতেছে। তাহারা উৎকর্ণ হইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিল নমিতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—"আমায় ওরা যা' খুসী বলে বলুক, গালাগাল দেয় দিক্...আমি তার যোগ্য, কিন্তু তাই বলে তোমায় ছোট ভাববে, এ আমি কিছুতেই সহ—"

সঙ্গে সঙ্গে রায়মহাশয়ের কণ্ঠ হইতে বেশ স্নিগ্ধ শান্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, তিনি বলিলেন,—"তোমার দিকে কতটা ওদের ভর্ৎসনার যোগ্য তুমি, তা' আমি ভাল জানি নমিতা! তুমি চাও ওদের বাঁদর নাচিয়ে খেলা করতে। বাইরে যতটা, ভেতরে তার ধোঁয়াটুকুও নেই। তোমায় চিন্‌তে কেউ পারুক না পারুক আমি জানি ও চিনি, আর সেই চেনা থেকেই তোমায় আমি আদর্শের আসনে চিরকাল—"

যাহারা কলরব করিতে করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরপদে প্রস্থান করিল।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

শরতের মেঘ

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা, বি-এস্-সি

জগত্তারণ রেল ষ্টেশনে পাখা টানে।

ভিতরে বসিয়া থাকিয়া সাহেবেরা ঘামিয়া অস্থির হয়। তারণ বৈশাখের কড়া রোদে পিঠ দিয়া বাহিরে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখা টানিয়া তাহাদের ঘাম শুকাইয়া দেয়। এক-একসময় সে হাঁপাইয়া উঠে, কড়া রোদে পিঠ পুড়িয়া যায়, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসে, শ্রান্তিতে শরীর এলাইয়া পড়ে, চোখ দুইটা অবসন্ন হইয়া বুজিয়া আসে, হাতটা শ্লথ হয়—দড়িতে আর টান পড়ে না। ভিতরে সাহেবেরা গর্জ্জিয়া উঠে, জগত্তারণ চমকাইয়া উঠিয়া আবার দড়িতে জোরে টান মারে।

চা বাগানের কাছে ছোট ষ্টেশন। একজন মাত্র পাংখাদার। সে জন্য কোন কোনদিন সারা দিনরাতই তাহাকে পাখা টানিতে হয়—নাওয়া-খাওয়ার জন্য বাড়ী যাইতে পায় না, বড়বাবুর ওইখানেই খায়। সারা দিনরাতে ছ'খানা ট্রেন যায় আসে, যাত্রীরা উঠে নামে, যাহারা উঁচু শ্রেণীর তারণ তাহাদের ফাইফরমাস্ খাটে, পাখা টানে। সময় সময় চা বাগানের সাহেবেরা ষ্টেশনে আসিয়া আড্ডা জমায়—সারারাত্রি ধরিয়া হল্লা করে। তাহাদিগকেও বাতাস করিতে হয় তারণকে। সন্ধ্যার সময়ই শেষ গাড়ী চলিয়া যায়। ষ্টেশনের কাছেই বাড়ী। ইচ্ছা করিলে সে বাড়ী যাইতে পারে—কিন্তু যাওয়া হয় না; সারা রাত ধরিয়া পাখা টানিতে হয়। হাত আর উঠে না, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে—পাখা থামিয়া যায়। কর্ত্তারা সে কসুর মাপ করে না—কেহ গর্জ্জিয়া উঠে, কেহ মেজাজ রুক্ষ করিয়া আসিয়া কাণটা নাড়িয়া দিয়া যায়—সময়ে ঘুসি, কিল, লাঠিটাও বাদ পড়ে না। জগত্তারণ চুপ করিয়া মার খায়—গা ঝাড়িয়া উঠিয়া আবার পাখার দড়ি লইয়া বসে। টানে—টানে—টানে।......অবুঝ চোখ দুইটা সময় সময় অশ্রু-ভারী হইয়া উঠে, কিন্তু সে মুছিতে ভুলিয়া যায়। দিগন্তের কোলে তাহার ব্যথাতুর চোখ দুইটা নিজের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে।......

বাড়ীতে সোহাগী সব শুনে। গণ্ডগোল বাধায়—কান্নাকাটী করে। তারণের প্রহার-জর্জ্জরিত পিঠের উপর হাত রাখিয়া বিবর্ণ সোহাগী এমন ব্যথিত করুণ অপলক দৃষ্টিতে তারণের দিকে চায়, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। এক-একদিন এমন বিশ্রীই সে করিয়া বসে যে, তারণ আর তাহাকে কিছুতেই বাগ মানাইতে পারে না। সোহাগী কাঁদিয়া বলে, অমন করে মার খেয়ে চাকরী করা হবে না। তারণ শোনে না। তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে কয়টা মাস আগের কথা। ব্যায়রামে পড়িয়া ছিল সে—ভারী ব্যায়রাম। মরণটাই তার নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল এই সোহাগী—নিজের প্রাণ, টাকা, সেবা যত্ন দিয়া। নিজের দামী গোট ছড়া বন্ধক রাখিয়া রেলের বাঁধের ডাক্তারকে দেখাইতেও সে কসুর করে নাই। যে তাহার জীবন ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহার কথা কি সে ভুলিতে পারে?...সেই অবধি সোহাগীর কোমর খালিই আছে। তারণ সোহাগীর খালি কোমরের দিকে তাকাইতে পারে না—চোখ দুইটা কি জানি কেন জলিয়া উঠে—বুকে শেল বিঁধে। গহনা সে সোহাগীকে একখানাও দিতে পারে নাই—কত করিয়া দিয়াছিল ঐ গোটছড়াটী—ঐ একখানি মাত্র গহনা। পাড়ার রামদুলাল কাহারের বউয়ের কাটা বাজু দেখিয়া আসিয়া সোহাগী সেবার কি আবদারই না করিয়াছিল! তারণ হাসিয়া বলিয়াছিল, ছয়টী মাস দেরী করিলেই তৈরী করিয়া দিবে সে। দিতও, কিন্তু কাল রোগ!...মনের ইচ্ছাটা মনেই রহিয়া গিয়াছে। আজও গোটছড়াটাই সে ছাড়াইয়া আনিতে পারে নাই।

জগত্তারণ সে কথা ভুলিতে পারে না। এই না দিতে

পারার তীব্র ব্যথা যখন তখন তাহাকে তীব্র বেদনায় পাগল করিয়া তুলে—নিজেকে খাটো করিয়া আনে সোহাগীর কাছে। প্রাণখুলিয়া সে সকল সময় কথা বলিতে পারে না—অপরাগতার লজ্জা তহাকে সোহাগীর নিকট অহরহ সঙ্কুচিত করিয়া তুলে। বাহিরে সে কথা প্রকাশ না করিলেও অন্তর হইতে জগত্তারণ তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে না—আর পারে না বলিয়াই সোহাগীর অত আবদার ঠেলিয়াছে, তবুও চাকরী সে ছাড়িতে পারে নাই।

সোহাগী তাহাকে ভালবাসে—এমন ভাল বুঝি কেউ বাসিতে পারে না। দুপুরে শাক চচ্চড়ী দিয়া ভাতের থালাখানা যখন সোহাগী আগাইয়া দেয়,—তারণ মন প্রাণ দিয়া সে মমতা অনুভব করিতে পারে—অন্তর বাহিরে তাহার সুখের হিল্লোল বহিয়া যায়।...তারণ অমৃত বোধে খায়। তাহার মনে হয়, বুঝি এত ভাল কেউ রাঁধিতে পারে না। তাহার একটু অসুখ হইলে সোহাগীর মাথার ঠিক থাকে না—পাগলের মত হয়। কি যে করিবে তাহা ঠিক পায় না। অভাবের সহস্র দীনতা অহরহ সূচের মত ফুটে, তবুও সোহাগীর কি প্রাণঢালা সেবা যত্ন! শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও মুখে স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই আছে। গাঁয়ের জোলাদের বোনা মোটা 'চারখানা' কাপড় সোহাগীর কোমল দেহে মানায় না, তবুও তাহাই সোহাগী আদর করিয়া পরে—স্বামীর দেওয়া বলিয়া গৌরব করে।

সোহাগীর রূপের খ্যাতি ছিল। গ্রামের নিধু মোড়ল হইতে জমিদার যতীন রায় পর্য্যন্ত একদিন সোহাগীর দোরের গোড়ায় মাথা খুঁড়িয়াছে—প্রলোভনের বিরাট্ ফিরিস্তিতে কাণ ঝালাপালা করিয়া দিয়াছে—নগদ টাকা অলঙ্কার, গাড়ী, বাড়ী কত কি! সোহাগী তাহা কাণেও তুলে নাই—অসীম ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কেহ না বুঝিয়া কিছু দিতে আসিলে পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, মুড়ো ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিয়াছে—জগত্তারণ তাই বুক ফুলাইয়া চলে।

তবুও সময় সময় সে ভাবে এ দেবতার জিনিষ—তাহার সুখ ক্ষণিকের—স্বপ্নের স্বর্গ সুখের মত। কবে হয়ত স্বপ্নের মতই মিলাইয়া যাইবে—রাখিয়া যাইবে শুধু আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস, গাঢ় বেদনা, দুর্ণিবার অশ্রুধারা! তারণ তাই শঙ্কিত হয়, ভীত হয়—বসিয়া বসিয়া ভাবে।...

জগত্তারণের শরীরটা সেদিন বড় ভাল ছিল না—তাহার উপর কাজটাও যা' পড়িয়াছিল! সারারাত পাখা টানা—একমুহূর্ত্তও চোখের পাতা ফেলার অবসর পায় নাই। একটা ক্লান্ত অবসাদ যেন সর্ব্বাঙ্গে গভীর আলস্যে এলাইয়া পড়িয়াছে। ভোরে একটু অবসর পাইতেই জগত্তারণ চলিয়াছে বাড়ী—এরপর হয়ত আর অবসরই পাইবে না।

নদীর ধারের বটগাছটা পার হইয়া সে সোজা বাঁধে উঠিতেই ও পাড়ার সুবল দাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ও তারণ দা', বলি এরই মধ্যে যে আবার ফিরে চল্‌লে?

তারণ থামিয়া কহিল, রাত্তিরে যেতে পারি নি ভাই—

ও, সারা রাত ধরেই বুঝি লোক ছিল?

আর বলো না ভাই, জীবনটাই গেল!

সুবল হাসিয়া কহিল, পেটে খেলে পিঠে সয়! অমন পয়সা! আমি পেলে—

তারণ ক্লান্তভাবে কহিল, বাইরে থেকে বল্‌বে বটে তাই, কিন্তু যে একবার করেছে! এক মিনিট যদি বসবার যো থাকে!

না থাক্—তবুও ত বাঁধা পয়সা দাদা। এ ছাড়া, উপরিটাও মন্দ নয়—সিকিটা দোয়ানীটাত আছেই।

জগত্তারণ ম্লান হাসিয়া শ্লেষের সহিত কহিল, চড় লাথিও বাদ নেই ভায়া!

প্রত্যুত্তরে সুবল হাসিল। জগত্তারণ কহিল, আসি ভাই—আবার ফিরতে হবে। ট্রেণের সময় না থাকলে জানইত—মাইনে কাটা যাবে।

সুবল কহিল, এস। তারপর একটু থামিয়া অবশেষে কহিল, রেতে বুঝি সোহাগী একাই থাকে?

তাইত থাকে, কোথায় আর লোক পাব বলো?

সুবল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, না পেলেও একটা রেখো দাদা। সোমত্ত মেয়ে—

জগত্তারণ চমকিয়া উঠিল। সুবলের মুখের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তার্ই কি—

কিছু নয়। কত কথাইত শোনা যায়—নতুন রেল সড়কের ছোকরা ডাক্তারটা—সাবধানেই চলো দাদা।

তারণের বুকটা কে যেন পিসিয়া দিয়া গেল। মুখ কালো করিয়া কহিল, সোহাগী আমার তেমন নয় ভাই।

সুবল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তবুও মেয়েমানুষ ত!··· ওদের বিশ্বেস কর তুমি?

তারণের মুখের কথা হরাইয়া গেল। তবুও টানিয়া টানিয়া বলিল, ওকে জানো না সুবল—

সুবল পলকে একবার তারণের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া তেমনিভাবে কহিল, জান্‌তে চাই নে দাদা। শুন্‌লেম—বল্‌লেম। একটু নজরেই রেখো। ডাক্তারটা শুন্‌ছি প্রায় তোমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করে—স্বভাব-চরিত্তিরও না কি ভাল নয়!

তারণের দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। সুবল পাগল না কি!···তাহার সোহাগী—অমন ভালবাসা... অমন প্রাণঢালা সেবা...মনভরা সন্তোষ...লক্ষ্মীর মত কল্যাণী···তারণ উষ্মার সহিত কহিল, তা'তে আমার কি? যত সব বাজে—

বাজে নয় দাদা, পাড়া ছেপে গেছে। তুমিত কিছু দেখ্‌বে না? অন্ধ! যেদিন উধাও হবে—

তারণ গর্জ্জিয়া উঠিল, খবরদার! সহেরও একটা সীমা আছে সুবল!

অপরিসীম শ্লেষের সহিত ওষ্ঠপুটে হাসি ফুটাইয়া সুবল কতকটা ব্যঙ্গভরেই বলিল, তা'ত আছেই। কিন্তু চোখ থাক্‌তে যে অন্ধ হয় তা' আমার জানা ছিল না!... শেষটায় ঘরে বাইরে উপায় আরম্ভ কর্‌লে দাদা!...বলিয়া সুবল পাশ কাটাইয়া দ্রুত আগাইয়া গেল।

তারণের মাথার ভিতর দিয়া একটা ক্রুদ্ধ ঝড় প্রবল বেগে বহিয়া গেল। বৈশাখের অপরাহ্ণ বেলার মেঘভার পিঙ্গল আকাশের মত তাহার চোখ মুখ ঘোলাটে হইয়া উঠিল—রাগে শিরাগুলি দপ্‌দপ্‌ করিয়া ফুলিয়া উঠিল। একটা আগুনের ঝাপ্‌টার মত গরম বাতাস তাহার নাক মুখের রন্ধ্র বহিয়া সবেগে বাহির হইয়া আসিল। তারণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জিয়া সুবলের উপর লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণপণে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, শূয়োর কোথাকার! যত বড় মুখ নয়, ততবড় কথা!

অতর্কিত আক্রমণে সুবল প্রথমে হতভম্ব হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা প্রবল ঝাঁকিতে তাহাকে সরাইয়া দিয়া শান্তকণ্ঠেই কহিল, আমার গলা টিপেই তুমি সব বন্ধ কর্‌তে চাও? কানে তুলো দিয়েছ না কি? পাড়ার সকলের মুখ বন্ধ কর্‌বে কি করে? আর ডাক্তারের যেমন পয়সা—পার্‌বে ওর সাথে? পার্‌বে অমন করে সোহাগীকে রাখ্‌তে—পার্‌বে?

অপলক অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া তারণ সেইখানে দাঁড়াইয়া শুধু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সুবল বোধ কবি আর একবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তারণের মুখের দিকে চাহিয়া নিতান্ত অপ্রয়োজন বোধেই শুধু নীরবে একটু হাসিয়া নিজের মনে পথ চলিতে লাগিল।

মাঠের শেষ সীমায় যেখানে আকাশ আর মাটি কোলাকুলি করিয়াছে, সেইখানে সুবলের সরু দেহটা মিশাইয়া যাইতেই জগত্তারণ সেইখানে এলাইয়া বসিয়া পড়িল— সুবলের কথাগুলি তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর একটা বিদ্যুতের স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া একবারে যেন সব নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়া গিয়াছে। চক্ষের সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত শস্যহীন ধূসর প্রান্তর পুঞ্জীভূত বেদনায় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। অশ্রু-সিক্ত লতায় পাতায় ক্ষীণ একটু বিষাদ হাসির রেখা টানিয়া এই একটু আগে বোধ হয় অরুণোদয় হইয়াছে। বাঁধের নীচে রূপালী নদীর বালুচরের উপর দুইটী পাখী ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া বোধ করি আসন্ন বিয়োগ-ব্যথা স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া জগত্তারণের চোখ দুইটী জলে ভারী হইয়া আসিল। বুকের ভিতরের একটা আর্দ্র বাষ্প যেন ক্রমশঃ দুর্ব্বার

হইয়া উঠিল। জীবনের প্রদোষকালে আজ যেখানটায় তাহার আঘাত লাগিয়াছে, তাহার বাড়া পরম আদরের জিনিষ আর জগত্তারণের নাই—সুবল না জানিয়াই পা দিয়া নিষ্ঠুরের মত তাহার মর্ম্মস্থলটা নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে।…এত বড় ব্যথা—এমন অসহনীয় বেদনা বোধ করি জীবনে আর সে কখনও ভোগ করে নাই…তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা আর্ত্তনাদ ফাটিয়া পড়িতেছিল, মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা! তাহার সোহাগীকে তাহার চেয়ে আর বেশী কে চিনে—বেশী কে জানে! সেত জানে কত বিশ্বাসী সে। কিন্তু হায় রে মন, কেমন করিয়া কখন যে সে আপনা আপনিই বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল!..তাহার সহস্র দিনের অভিজ্ঞতার চাহিতে তুচ্ছ শোনা কথাটাই আজ যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে।.. ডাক্তার প্রিয়দর্শী মণ্ডল বিত্তশালী। হাসিয়া গল্প করিয়া লোক মাতাইতে তাহার মত দ্বিতীয় কেহ নাই। তাহার উপর শরীরে দয়ামায়া আছে—চিকিৎসা করিতে গিয়া আত্মপর মনে না করিয়া কি যে প্রাণ দিয়া সেবা করে—দেবতা আর কি! এই সমস্ত বয়সে সোহাগী যদি তাহাকে দেখিয়া—

জগত্তারণ হঠাৎ ছিটকাইয়া উঠিয়া হন্‌হন্ করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। বাড়ীর দরজায় পা দিয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া ডাকিল, সোহাগী—সোহাগী—সোহা—

ঘরের ভিতর সোহাগী বোধ হয় কি একটা কাজ করিতেছিল। বাহির হইয়া আসিয়া একগাল হাসিয়া কহিল, সারারাত কাটিয়ে সকালে বুঝি সোহাগীকে মনে পড়ল? বেশ!…সারারাত আমি একা কি করে থাকি বলোত?

জগত্তারণ সোহাগীর মুখের দিকে বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া রহিল। এই হাসি—এমন সরল মধুর কথা—এমন স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি—

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সোহাগী আর একটু আগাইয়া আসিল। নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিতেই চমকিয়া উঠিয়া পরম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, ও কি, অসুখ করেছে না কি? চোখ লাল—মুখই বা অত শুক্‌নো কেন? আজ আবার জ্বর আসেনিত? দেখি। বলিয়া আগাইয়া গিয়া স্বামীর কপালে হাত ছোঁয়াইল।

জগত্তারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সোহাগীর উদ্বেগ-ব্যাকুল স্পর্শ তাহার মনের সঞ্চিত ক্লেদ যেন নিমেষে মুছিয়া ফেলিল। তাহার ব্যথা-কাতর চোখের দৃষ্টি—তাহার শঙ্কা-ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসু কথাগুলি অসীম অনুশোচনায় জগত্তারণের বুকে আঘাত করিল। হায়, পরের কথায় সে ইহাকেই অবিশ্বাস করিতে গিয়াছিল!…শুষ্ককণ্ঠে জগত্তারণ কহিল, সারা রাত জাগতে হয়েছে কি না।

সোহাগী ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, তাও একটু সকাল করে আস্‌তে যদি। এমনি করে করে অসুখে পড়লে, আর তোমায় বাঁচাতে পারব না কি! তোমার মনের কথাটা কোনদিনই বল্‌বে না বুঝি? এত আমাকেই শাস্তি দেওয়া। তার চেয়ে গলা টিপে মেরে ফেল্লেইত হয়। পথের কাঁটা আমি…জান আমি ও সব সহ্য কর্‌তে পারি না, তবু—সোহাগী অকস্মাৎ চোখে মুখে আঁচল চাপা দিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমূঢ় জগত্তারণ তখন দিশাহারার মত আর একবার নিজের অপরাধের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিল।

•

দিন যায়। সোহাগীর ভালবাসা যেন অসীম হইয়া উঠে। তারণ বুঝিতে পারে না এই অতল অচ্ছিদ্র ভালবাসায় কোথাও কৃত্রিমতা থাকিতে পারে কি না। এই প্রাণঢালা ভালবাসায় পাপ থাকিতে পারে কি না। তারণ ভাবে—ভাবে—ভাবে। এক এক সময় পাগল হইয়া উঠে, আচ্ছন্ন অভিভূতের মত জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখে,—সোহাগী দেবী—স্বর্গ হইতে খসিয়া পড়া একটা অমূল্য মুক্তার দানা। শুধু শাপে আজ তাহার ঘর আলো করিয়া আছে। তাহার ভিতর কি মালিন্য থাকিতে পারে—না তাহারই অবিশ্বাস করা উচিত? এমনই করিয়া অবিশ্বাস করিলে হয়ত একদিন—তারণ চমকিয়া শিহরিয়া উঠে।

তবুও তাহার কাণে কত কি বাজে। সেদিন সুবলকে

শাসন করিয়াছিল, আজ কাহাকে কি বলিবে? সারা গ্রাম সোহাগীর নামে কত কি অশ্লীল কলঙ্ক লইয়া মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তারণ হাঁপাইয়া উঠে। প্রতিবাদ করিতে চায়—পারে না। একটা অপরিসীম লজ্জা, ঘৃণ্য কুণ্ঠা তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে। মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা! সে মনে প্রাণে জানে—এ মিথ্যা! সোহাগী ভাল, বড় ভাল—গরীবের ঘর আলো করিয়া আছে বলিয়াই লোকের এত ঈর্ষা। কোনরূপ কলুষ ওকে স্পর্শ করে নাই বলিয়াই কতকগুলা দুষ্ট লোকের এই বিশ্রী রটনা। তারণ বিশ্বাস করে, তবুও মনের ভিতর মেঘ জমে, ঝড় উঠে।... শান্তির ঘরখানা ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়।......তারণ আশ্রয়হীন হইয়া খোলা আকাশ তলে কাঙালের মত আসিয়া দাঁড়ায়।

অথচ সোহাগীকে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—অবিশ্বাস করিতে পারে না। সোহাগী যেন একটা প্রহেলিকা! তাহার সুখ দুঃখে সমব্যথী সোহাগী—কি করিয়া তাহাকে অবিশ্বাস করিবে।......একবার মনে করে সকলের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করিবে—এত বড় দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা কঠিন কিছু সে করিবেই—করিবে! অকস্মাৎ সে জলিয়া উঠে—কিছু পরক্ষণেই কি একটা অবসাদ অপরিসীম ক্লান্তিতে তাহাকে অবসন্ন করিয়া দেয়।...... কি-ই বা প্রয়োজন? বাহিরের ঝড়ে কি করিবে তাহাদের? যাহা মিথ্যা—তাহা মিথ্যাই। ঘরে বাহিরে যখন তাহারা ঠিক আছে, তখন গায়ে পড়িয়া বাহিরের ধূলা মাখিয়া কেন সে নোংরা হইতে যাইবে? সেত জানে সোহাগী কত ভাল।

তথাপি কি একটা ব্যথা ক্রমাগত বাড়িয়া বাড়িয়া তাহার অন্তর বাহির ছাইয়া ফেলে।.........

তারণ বিপন্নের মত, বিহ্বলের মত বসিয়া থাকে। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র অপরাহ্ণের অলস কোলে ঢলিয়া পড়ে। সূর্য্য অস্ত যায়। সন্ধ্যার শীকরস্নিগ্ধ মন্দ মধুর বাতাস ধরিত্রীর তাপদগ্ধ বুকে স্নেহের কোমল পরশ বুলাইয়া দিয়া যায়। ঘরে ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে—কুলবধূর মঙ্গল দীপ মধুর আরত্রিক গায়—কম্র দেহে নম্র পদে লজ্জাবগুণ্ঠনা ঘন কৃষ্ণ নিশা ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। বন বিহগেরা ঘুমাইয়া পড়ে। নিস্তব্ধ পৃথিবীর বুকের উপর অলস শিহরণের মধুর আবেশে বন উপবনে পুষ্প কলিকা ফুটিয়া উঠে—গন্ধমুগ্ধা পৃথিবী চেতনা হারাইয়া ফেলে। আকাশের কোলে সারি সারি তারকারাজি জাগিয়া জাগিয়া পাহারা দেয়—ঘুমন্ত পৃথিবীকে কেহ না জাগায়। অন্ধকারের কোলে কখন চাঁদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়া কখন নিবিয়া যায়। তারণ বসিয়া বসিয়া দেখে। ভাবে, জীবনের এই একান্ত পরিচিত দিক্‌টাই আজ কত অপরিচিত। যাহাকে লইয়া তাহার জীবন, তাহার পরিচয় লইতে হয় কি না অন্যের মুখে! বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ আটটি বছরের প্রতিটি ক্ষণ যাহার স্পন্দন দিয়া অভ্যর্থিত, আজ সেও তাহার কাছে প্রহেলিকা! নিদ্রার অসহায় ক্ষণগুলি যাহার বক্ষের একান্ত সন্নিহিত স্থানে থাকিয়া সুখ স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইতেছে, অত্যন্ত বেদনায় আজ তাহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে—একটা ছল অভিনয় মাত্র। সোহাগীর হাসি, কথা, চোখ বহিয়া ঝরিয়া পড়া মধুর দৃষ্টি—বেসাতির পসরা মাত্র! হাঃ হাঃ হাঃ—এও তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে? নিজে তাহার স্ত্রীকে চিনিতে পারে নাই—চিনিতে হইবে আজ নূতন করিয়া পরের চোখে? পাগল আর কি!

...তবুও সোহাগীর নিকট গেলে তারণ কি রকম বিপন্ন হয়। শঙ্কিত হয়—বুঝি বা মনের ক্লেদ সহসা সোহাগী ধরিয়া ফেলে। তারণ কাঁপিয়া উঠে—শেষটায় স্ত্রীর নিকটও বুঝি অবিশ্বাসী হইতে হয়। সোহাগীর এমন ভালবাসার প্রতিদান বুঝি বা এমন করিয়াই এই দুরপনেয় কলঙ্কের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শোধ দিতে হয়।

সোহাগী তারণকে বুঝিতে পারে কি না বোঝা যায় না। কিন্তু অনুযোগ করে। সহস্র আবদারে পীড়িত করিয়া তুলে। বলে, তুমি আর আমায় ভালবাস না।...

তারণ বিহ্বলের মত অনিমেষ নয়নে সোহাগীর দিকে দিকে চাহিয়া থাকে—মুখে কথা সরে না।

সোহাগীর পাতলা ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলিয়া যায়—চোখের দৃষ্টি বহিয়া বিদ্যুতের শিখা তারণকে অবশ উন্মাদ করিয়া তুলে। তারণ অনেক করিয়া কি বলিতে চায়—কণ্ঠ জড়াইয়া আসে।

সোহাগী ঘাড় দুলাইয়া তেমনি দুষ্টামি করিয়া বলে, বুড়ী হয়েছি, চুলেও পাক ধরেছে, গাল দুটোরও আর সে রং নেই—

তারণ পাগলের মত সোহাগীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঘামিতে থাকে।

কতক্ষণ সোহাগী চুপ করিয়া থাকে। তারপর এক সময় তারণের হাত সরাইয়া দিয়া সারা দেহে উন্মত্ত যৌবনের লেলিহ বিদ্যুদ্দাহ ফুটাইয়া আর একটু রং দিয়া বলে, অথচ দুলালী—

তারণ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। তাহার নীরব চোখের কাতর দৃষ্টি বহিয়া মৌন বেদনা ঝরিয়া পড়ে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, তুমিও বিশ্বাস কর—

সবটা বলিতেও পারে না। অর্দ্ধপথে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে চায় সোহগী কি বলে। বুকের শব্দটা বাড়িয়া উঠে—দোলাটা আর থামানো যায় না।

সোহাগী যেন ক্ষেপিয়া যায়। হাসির লহর তুলিয়া বলে, দুলালী সুন্দরী-ভরা বয়েস—ভুলবে তার আর আশ্চর্য্য কি—

তারণ ভাঙিয়া পড়ে। কাতর কণ্ঠে শুধু একটা আর্ত্তনাদ ফাটিয়া পড়ে, সোহাগী—সো—হা—মুখের ভিতর কথাগুলি অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়—চোখ দুইটী জলে ভরিয়া আসে।

সোহাগী চট্ করিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরে। চোখ দুইটা আঁচল দিয়া মুছিয়া দিয়া অতি ছোট করিয়া বলে, ছাই ঠাট্টাও বোঝ না। বোধ করি তাহারও গলা ভারী হইয়া উঠে।

তারণের বুকের পাহাড় নামিয়া যায়। আনন্দে উন্মাদের মত সোহাগীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অবাধ্য চোখ দুইটাকে বারবার মুছিয়া ফেলিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে।...

এইত সোহাগী। অথচ—

যদি পাড়াটাকে সে গুঁড়াইয়া দিতে পারিত!...

কিন্তু বিচিত্র এই মন। কত অপরূপ এর রূপ—না যায় চিনা, না যায় বোঝা। ভিতর বাহিরের সব কিছু গণ্ডগোল, অশান্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মানুষ যখন উৎফুল্ল হয়, তখন কোন্ মুহূর্ত্তে কি বেদনায় আবার তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠে। কি যে চায় সে—কে জানে! অথচ এই ক্ষুদ্র মনকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের কত সুখ, কত দুঃখ।

তারণ তাই সময় সময় উৎফুল্ল হয়। সোহাগীর অছিদ্র ভালবাসার অতলে ডুবিয়া কোন কিছু কাণে তুলিতে চাহে না। মনকে আঁখি ঠারে—তাহাব মত সোহাগীর মনকে কে চিনে? অবুঝ মন একটু হাসে—আবার কখন গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। সমস্ত অন্তর বিষণ্ণ বেদনায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তারণ ব্যাকুল হয়। কি যে ব্যথা, মন কি যে চায়, কিছুই সে বুঝে না। বুকযোড়া গভীর অশান্তি কেবল বাড়িয়াই চলে।

এক একবার মনে হয়, যদি সকলের মত সেও সোহাগীকে অবিশ্বাস করিতে পারিত।...

অসহায় চোখ দুইটী ফাটিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসে।

সেদিন তারণ অবসর পাইয়াছিল। সন্ধ্যার পর আর কোন যাত্রী ছিল না—চা বাগানের সাহেবেরাও আসর জমাইতে আসে নাই। বরাবরই তাহার শরীর ভাল ছিল না—আজ যেন দেহটা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। একটুও আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। বাড়ীই চলিয়া যাইত এতক্ষণ, কিন্তু সেই ব্যথাটা আজ যেন তাহার বুকের উপর জাঁতিয়া বসিয়াছে। কিছুতেই সে আর ভুলিতে পারিতেছে না—সোহাগী—তাহার সোহাগী—শেষটায় সেও—তবুও এতদিন শুধু শুনিয়াছেই, চোখে দেখে নাই। আজ বাড়ী গিয়া যদি—ঘৃণায় তারণ ভাঙিয়া পড়িল।......

অন্যদিনের মতই সে নিজের জড়ান বিছানাটা পাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিল। ঠিক্ সেই সময় সুবল কোথা হইতে আসিয়া এক গাল হাসিয়া কহিল, সেদিন বড় তেড়ে উঠেছিলে—কিন্তু আজ? তোমার সতী সোহাগীকে দেখ্‌বে না?

তড়িত-স্পৃষ্টের ন্যায় তারণ লাফাইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, সাবধান!

সুবল শুধু মুচকিয়া হাসিল। তারপর নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত কহিল, নিজের চোখ দুটো থাক্‌তেও—

তারণের মাথার ভিতর সেই দীর্ঘ দিনের নিরঙ্কুশ সন্দেহ অকস্মাৎ নিদারুণ ঘৃণায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই মিথ্যাবাদী, আর সেই শুধু সত্যকে অভ্রান্তরূপে চিনিয়াছে। তাহারা যদি দেখিয়াই থাকে—সত্যইত—চোখ থাকিতেও সে কি না—না, আজ তাহাকে দেখিবেই সে। এমনই করিয়া মনের মধ্যে আগুন চাপিয়া রাখিয়া তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরার চেয়ে একবারে মরাই ভাল। তাই ভাল—তাই ভাল! আজ হয় সোহাগী, না হয় তাহাকে মরিতেই হইবে!...

সর্ব্বহারা চোখের অগ্নিদৃষ্টিতে সুবলকে পুড়াইয়া দিয়া একটা মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদের মত তারণ কহিল, চলো।—বলিয়া সুবলের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ীর পথ ধরিয়া সে হন্‌হন্ করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

সমস্ত রাস্তা আগুনের গোলার মত ছুটিয়া আসিয়া অঙ্গনে পা দিয়া সে বোমার মত ফাটিয়া পড়িল। নিজের চোখ দুইটাকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না—সোহাগীর এতদিনের প্রাণঢালা দরদ, তাহার মুখের স্নিগ্ধ মধুর হাসি যেন পলকে একটা মিথ্যা ঘৃণ্য অভিনয়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

এই তাহার সোহাগী!...

একটা নিদারুণ উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।...

সোহাগী!......

তখন ওধারের বারান্দায় ছোট একখানা পিঁড়ির উপর বসিয়া সেই ছোকরা ডাক্তার বোধ করি সমস্ত একাগ্রতা দিয়া সম্মুখের থালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং একান্ত সন্নিকটে বসিয়া সোহাগী পরম আগ্রহে সহস্র রকম আবদার-অনুযোগ করিয়া তাহার আহারের খুঁটিনাটি ধরিয়া তরল হাস্য-পরিহাসে সমস্ত স্থানটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে। অকস্মাৎ বোমা ফাটার ন্যায় শব্দে সে চমকিয়া মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কয়েক মিনিট বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। পরক্ষণেই সমস্ত মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত করিয়া তরল কণ্ঠে কহিল, তবুও যা' হোক্—ভাগ্যি সুবল দা'কে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম আসবেই না—কত কাজ তোমার! গজেনতো সেই থেকেই যাই যাই করছে।

তারণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, গজেন!...

সোহাগীর দুষ্টামিভরা চোখ দুইটা অকৃত্রিম আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কহিল, আ ছাই, আমিই জানতাম না কি! সেই যে তোমার চিকিচ্ছে করেছিল, সেদিন দেখে কেমন সন্দেহ হয়। কুসুমের বের সময় তুমিতো ছিলে না। কুসুমকে চিন্‌লে না? আমার মামাত বোন্ কুসুম—সেই হরিপুরের। সেই বিয়ের দিন মাত্র দেখা আর ত দেখি নি। কাল রাত্তিরে কোন্ দূর গাঁ থেকে ফিরতে বিপদে পড়ে গজেন এইখানেই উঠেছিল। সেতো আর আমাকে চেনে না। কথায় কথায় তাই নেমন্তন্ন করেছিলাম। ও আবার বদলী হয়েছে, কাল সকালেই চলে যাবে। সুবল দা'কে দিয়ে তাই তোমাকে—

গজেন এই সময় আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া কহিল, কেউ কাউকে চিনি না জানি না—অথচ পাশাপাশি কতদিন থেকেই না আছি—

তারণ প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সোহাগী ডাকিল, ওরে, ও কুসুম, এই দেখ্ কে এসেছে। তোর দাদাবাবুকে পেন্নাম করে যারে—তীর্থ ফল পাবি।

সুবল এতক্ষণ দরজার পাশে প্রচণ্ড বিস্ময় ও অপরিসীম কুণ্ঠায় হতবাক্ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই সোহাগী আবদারের সুরে কহিল, বাবে, যাচ্ছেন যে বড় সুবল দা'? আপনাকেও যে নেমন্তন্ন করেছিলেম—খেয়ে তবে যেতে পাবেন।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

শিক্ষিতা

ডাক্তার অনিলচন্দ্র দত্ত, এল্-এম্-এফ্

"এই রকম ক'রে কি ঝোল রাঁধে বৌমা? পটল কোটবার ছিবি দেখো—যেন ডানলার পটল। গড় করি মা তোমার লেখাপড়ায়! এমন পাঁচন সেদ্ধ ত আর খাওয়া চলে না বাছা।"

গৃহিণী দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া বধূর রন্ধনের সমালোচনা করিতেছিলেন—মেয়েমানুষের বি-এ পাশ করা যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন তাহারই কথা হইতেছিল। বধূ রাণুবালা বি-এ পাশ করিয়া ফেলিয়াছে—উপায় কি?

"তোমাকেও বলিহারি যাই মা! তুমিই বা কোন্ আমায় বল্লে, আমি কি আর তোমার নিরমিষ ঝোল একটু রেঁধে দিতে পারতাম না। জানই ত বৌয়ের রান্না।"

বিধবা ননদ হেমাঙ্গিনী দেবী এই বলিয়া রান্নাঘর হইতে একটু ঘন দুধ আনিয়া মাতার নিকট রাখিয়া বলিলেন, "নাও, এই দিয়ে এখন গেলো। কাল থেকে তোমার রান্না আমাকেই রাঁধতে হবে দেখ্ছি। আর তোমাকেও বলি বউ, গেরস্তর সংসারে রান্না-বান্না শেখাটাও একটু দরকার বলে মনে কর না কি? চশমা এঁটে, সোফায় শুয়ে নভেল পড়লেই কি দিন যাবে—হিঁদুর মেয়ে পটের বিবি সেজে থাক্লে ত চলে না।"

"চল্বে নাই বা কেন হেমা—ছেলে যখন পছন্দ করে রাঙা মূলো ঘরে এনেছে, তখন দিনের বাবা চলবে। এ সব খৃষ্টানী যুগে কি আর আমাদের সে কালের নিয়ম চল্বে বাছা—নিরমিষ ঝোলে যে দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে দেয় নি, এই আমার বাবার ভাগ্যি।"

"তাই না তাই। সুক্তো রাঁধতে সেদিন যে কাণ্ডটাই বাঁধিয়েছিলে বউ, অপর বাড়ী হ'ত ত ধ'রে সোজা করে দিত। মা নিতান্ত ভালমানুষ, তাই। পড়তে যদি আমার শাশুড়ীর হাতে ত লেখাপড়া ভুলিয়ে ছাড়ত।"

"তা' সে কথা নিতান্ত মিছে বলিস নি হেমা। আমি তোদের সংসারে আছিও বটে, নেইও বটে। বেশী বাড়াবাড়ি দেখ্লেই বলতে হয়; না হলে আমি আমার পূজো-অর্চ্চা নিয়েই পড়ে থাকি—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। তোমাদের ভালর জন্যই যা' কিছু বলি। বয়স ত কমছে না, শিখ্বে কবে মা।"

"তুমি নিতান্ত ঠাণ্ডা মানুষ, তাই বউয়ের রক্ষে। তা' নইলে তেইশ বছরের ধেড়ে মাগী হয়েছেন, এখনও ভাতের ফেন গালতে জানেন না, এদিকে হুমদো হুমদো মিনসেদের সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসে গল্প করতে, হাসি-মসকরা করতে ত খুব ওস্তাদ। কতই দেখ্ব মা, কতই দেখব!"

"তা' তোর দাদার যেমন সখ—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঘরের ঝি-বউকে নিয়ে সে চা খেতে যায় কেন? বউ-মা ত নিজে সখ করে যায় না।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি ত তা' বল্বেই। বউয়ের রূপে ভুলেছ তাই বল্ছ—যখন কুলে কালি পড়বে, তখন বুঝ্বে এই হেমাটা খাঁটি কথাই বলেছিল। হিঁদুর ঝি-বউয়ের অত বাড়াবাড়ি কিসের গা, ঘেন্না হয় আমাদের!"

রাণুবালা এতক্ষণ একটিও কথা বলে নাই। গৃহিণীর আহারাদি শেষ হইলে পর তাঁহাকে পান সাজিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথার উত্তর দেবে মা?"

"কি কথা বাছা?"

"ঝোলের পটল ও ডানলার পটল একরকম কুটলে কি দোষ হয়, আর কেন দোষ হয় মা?"

"অবাক কল্লে বাছা! ধেড়ে মেয়ে হয়েছ, এক কাঁড়ি বইও পড়েছ, ঝোলের পটল গোল করে কুটতে নেই এটা কোথাও লেখা নেই গা! অমন লেখাপড়া শেখ্বার দরকার কি ছিল। আলু ভাজা খেতে হলে সমস্ত আলুটাকেই ভেজে খায় না কেন; এটা কেন, ওটা কেন তার ত দরকার নেই—যা' হয়ে আসছে চিরকাল, তাই

হবে। লেখাপড়া না শিখেও ত আমরা এতদিন সংসার চালিয়ে এলাম—এত কেন কেন ত জানি না মা।"

"এ বড় শক্ত ঠাঁই, আমাদের মত মুখ্যু-সুখ্যু মেয়ে নয় যে, যা' বোঝাবে, তাই বুঝ্‌বে। একেবারে জজসাহেব—জবাব দাও, তবে রেহাই পাবে। পাশকরা বউ খুঁজে-ছিলে, এখন ঠেলা সামলাও—এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী দেবী ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বউ, হাঁচি-টিকৃটিকি মান, না, তাও পুড়িয়ে খেয়েছ। যে তোমাদের জুতো, মোজা, ব্লাউসের যুগ চলেছে, এখন কি আর ওসব মান্‌তে গেলে চলে। পুজো-টুজোই বা কি দরকার—ঠাকুর-দেবতা পাথর-নুড়ি বই ত নয়—কি বলো?"

"আমার ভুল হয়েছে ভাই, প্রশ্ন না করাই আমার ভাল ছিল। পাথরের পুজোই বোধ হয় আমরা বেশী ভাগ লোকই করে আসছি—প্রাণের পুজো কোথায় করি?"

গৃহিণী বলিলেন, "থাক্ বাছা, ও সব থাক্, বকাবকিতে কাজ নেই। তুমি বরং আমায় রামায়ণখানা দাও একটু, পড়ি। হাতটা পরিষ্কার ত?"

রাণু বলিল, "আমি পড়ব মা, ম্যাপ্ থেকে তোমায় বেশ বুঝিয়ে দেব হনুমান সাগর ডিঙিয়ে যে স্বর্ণ লঙ্কায় গিয়েছিলেন, সে লঙ্কা দ্বীপ হিমালয়ের উত্তর দিকে নয়।"

"অত শত বুঝি না বাপু। হেমা ত আমায় বলে যে, হনুমান হিমালয় পাহাড় ডিঙিয়ে লঙ্কায় সীতার সন্ধান পেয়েছিলেন।"

"বলে কেন, এখনও তাই বল্‌ছে। ইংরিজী পড়া বউ তোমার এ সব কি জান্‌বে মা। ম্লেচ্ছাচারই শিখেছে, শাস্ত্রের কি জানে। লেখাপড়া শিখি নি বলে রামায়ণ, মহাভারত জানি না আমরা, না।"

"না বাপু, তোরা দু'জন সমবয়সী, কোথায় ভাব-ভাল-বাসা থাক্‌বে, না কেবল কথা কাটাকাটি। আর তোমাকেও বলি বউ-মা, রামায়ণ, মহাভারতের কথা তুমি আর আমাদের চেয়ে বেশী কি জানবে—ও সব ত আর কলেজে পড়ান হয় না তোমাদের। দাও, বইখানা আমাকেই দাও, আমিই 'র' 'ঠ' করে পড়ব 'খন। হেমা, ঠাকুর-ঘর থেকে আমার চশমাটা নিয়ে আয় ত মা।"

দুই

রাণুবালার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় কাছারী হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া এক কাপ্ চা লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "শুনেছ ব্যাপার, আর ত এখানে থাকা চলে না—কলেরায় সব উজাড় হয়ে গেল—দেশের অর্দ্ধেক লোক পালিয়েছে। সন্ধ্যের সময় চায়ের আড্ডা জম্‌ছে না আমার।"

"কেন কি হয়েছে? যতীনবাবু, রেণু, রেখা এরা আর আসছে না বলে ভাবছ—হয় ত তাদের কোন কাজ পড়েছে।"

"কাজ, ছাই কাজ! মেয়েমানুষ তোমরা, লেখাপড়া যতই শেখো, সেই মেয়েমানুষই থাক্‌বে—দেশের সংবাদ ত কিছুই রাখ্‌বে না কখনও।"

হাসিতে হাসিতে রাণু বলিল, "মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে পুরুষ কি করে হবে বলো—পুরুষ লেখাপড়া শিখে বরং মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আর দেশের খবর—তা' তোমারা বক্তৃতা করছ, নাম কিনছ, এ সব সংবাদ তোমরা রাখবে না ত কি আমরা রাখ্‌ব।"

"না, না, সত্যি বল্‌ছি গো, দেশটা যে সব মরতে চল্‌লো, বক্তৃতা শোনবার যে লোক থাক্‌বে না।"

"ভাববার কথা। লোকই যদি না রইল ত উদ্ধার হবে কারা। উদ্ধার না হয়েই সব ফাঁকি দিয়ে মরবে। কেন, ডাক্তারেরাও বাঁচাতে পারছে না। হয়েছে কি, সব খুলেই বলো না ছাই।"

"বল্‌ছি। এবার তল্পিতল্পা বাঁধ, পালাতে হবে এদেশ থেকে। ভাবছি পাটনা ছেড়ে কিছুদিন মধুপুরে যাই, সেখানে কলেরা নেই।"

"তার চেয়ে এমন দেশে চলো, যেখানে মানুষ মরে না। বলি, আজ এত উতলা হলে কেন—কাছারীতে কিছু জোটে নি বোধ হয়—বলিয়া হাসিতে হাসিতে রাণুবালা স্বামীর হাতে এক খিলি পান আনিয়া দিল।

দেবেনবাবু বলিলেন, "সে সব পাট ত অনেক দিন উঠে গেছে রাণু। মক্কেলের আক্কেল বেড়েছে, এখন সস্তার

উকিল খোঁজে। তা' মরুক। ব্যাপারটা কি জানো, আশু উকিল আজ মারা গেছে।"

"এ্যাঁ! আহা, খুব নাম করছিলেন তিনি! বড় ভাল লোক! তাঁর স্ত্রী পুত্র? তাঁরা কোথায়, কোলকাতায় না?"

"তা' যেখানেই থাক্, আমি সে কথা বল্‌ছি না। গত সপ্তাহের রির্পোট দেখেছ? একশ' আটান্ন জন লোক আক্রান্ত হয়েছিল, আর প্রায় পঞ্চান্ন জন লোক মারা গেছে—ভয়ঙ্কর কথা! কেউ কারও সাহায্য করছে না, কেউ কাকেও দেখছে না—অথচ মানুষ সকলেই।"

"আশুবাবুর রোগ হয়েছিল কবে—কবে তিনি মারা গেছেন?"

"কাল না পরশু রোগ হয়, আর আজ কাছারীতে শুন্‌লুম তিনি মারা গেছেন। কালী বাড়ুয্যে বল্‌লেন। কালীবাবু উকিলকে জান ত? যিনি খুব টেনিস খেলেন—পসার ঐ পর্য্যন্ত। আশুবাবুর বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী।"

"তুমি দেখ্‌তে যাও নি আশুবাবুকে?"

"দেখ্‌তে গিয়ে কি করতাম, ডাক্তার ত নই।"

"মানুষ ত—যাওয়া উচিত ছিল না কি?"

দুইজনের কথায় হঠাৎ বাধা পড়িল। পাশের বাড়ী হইতে অকস্মাৎ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিল। রাণুর মুখের ভাব চকিতে বদলাইয়া গেল। রাণু বলিল, "ছায়া দি'র গলা, আমি যাই দেখি, তুমি আস্‌বে কি?"

"ছায়া দি'—বিমলের স্ত্রী ছায়া, পাশের বাড়ীতেই যারা থাকে, কি হয়েছে তাদের? রোগ নয় ত?"

"এ সব ত তোমার কাগজে লেখে নি, কাজেই জানো না। পুরুষ দেখে পরের চোখে, মেয়েরা দেখে প্রাণের চোখে। বিমলবাবুর কলেরা হয়েছে তা' জান্‌বে কেন। এখন আমার সঙ্গে যাবে কি না তাই বলো?"

"আমি!" দেবেনবাবু বলিলেন, "না না, তোমারও এরকম ভাবে যাওয়া ঠিক নয়—বড় ছোঁয়াচে রোগ! মায়ের মত না নিয়ে আমারও যাওয়া উচিত নয়।"

"বেশ ত, চলো মাকে বলি।"

কিন্তু মাকে বলিতে হইল না। তিনি সে সময় পূজায় বসিয়াছিলেন এবং পাশের বাড়ীর চীৎকার শুনিয়া নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছিলেন। রাণুকে ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "ছায়া কাঁদছে না।"

"হাঁা মা। একবার দেখে আসি, তুমি যাবে?"

"আমি! নাও কথা। তিন সন্ধ্যে এক হ'ল, একটু পুজোয় বসেছি, পুজো ফেলে এখন ছুটব ওই বেনেদের বাড়ী। বামুণের বিধবা আমি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলে একটা জিনিষ ত আছে বাছা—তোমাদের মত ত খৃষ্টান হই নি যে, ধিঙ্গি নাচ নাচতে যাব এ সময়। হেমাকে নিয়ে যাও না।"

"না, থাক্, আমরা যাব কি মা?"

"তোমার ইচ্ছে বাছা। তোমরা খৃষ্টানী পথ নিয়েছ, তোমাদের কে মানা করবে বলো। তবে কলেরা রোগ, তুমি যাও ক্ষতি নেই, দেবু যেন না যায়। এত নাচা-নাচি, লোক দেখান ঢং আমরা পছন্দ করি না কিন্তু—ভদ্র ঘরের ঝি-বউয়ের এরকম আচরণ হওয়া উচিত নয়। সকালে একবার দেখ্‌তে গিছলে, ব্যস—আবার বারবার যাবার কি দরকার—এত নাচন-কোঁদন ত ভাল দেখায় না।"

"এ কি নাচন-কোঁদন মা?"

"তা' নয় ত কি। ছায়া তোমার কোন্ কুলের কে যে, এত টান। এ সব রোগে আপনার লোক ছেড়ে পালায়, ওরা ত পর—এত দরদ কিসের বাছা?"

"মানুষের বিপদে মানুষ হয়ে তাকে দেখ্‌ব না আমরা।"

গৃহিণী বিরক্ত হইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখো বাছা, তোমাকে এনেই আমি ভুল করেছি। এ সব মুখের ওপর কথা কওয়া বিবি-বউ হিন্দু গেরস্তর ঘরে না আনাই ভাল ছিল—হাড়ে হাড়ে জ্বলছি এখন তাই। তা' তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমায় পুজো করতে দাও। তোমার যদি যাবার সখ হয়ে থাকে, যাও—গিয়ে ছায়ার মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আন। তুমি যাও, যা' খুসী কর, দেবু যাবে না। ব্যস, এক কথা।"

হেমাঙ্গিনী দেবী নিকটেই ছিলেন। বলিলেন, "সব তাতেই বাড়াবাড়ি। উনি মনে করেন ওঁর মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দরদী ভূভারতে আর কেউ নেই। আমাদের ও বাড়ীর সারদা দিদিও 'ছাত্তবিত্তি' পাশ ক'রে জলপানি পেয়েছিল—লাটসাহেব তার কত সুখ্যাতি করলেন। তারও ত এমন উল্‌টো ছিরি দেখি নি। সব বিষয়েই এঁর ন্যাকামী—গা জ্বলে যায় বাপু!"

তিন

"ছায়া, কাঁদছিলি!"

ছায়ার নিকট রাণু আসিয়া দাঁড়াইল। শ্বাশুড়ী স্বামীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ঔদ্ধত্য দেখাইয়াছে সে, ননদের বিদ্রূপ মাথায় লইয়াছে সে, তবু আসিয়াছে সে ছায়ার ভাঙা হাটে—ব্যথার ব্যথী হইয়া আকুল হৃদয়ে ছুটিয়া।

স্তিমিত জীবন দীপ, স্তিমিত শোকোচ্ছ্বাস, অস্তমিত আশা লইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে শোকাকুলা ছায়া বসিয়াছিল করাল মৃত্যুর পদতলে। ভিখারিণী সে, করুণা ভিক্ষা করিতেছিল নির্ম্মমেরই কাছে।

ম্লানমুখে রাণু বলিল, "ছায়া, কাঁদছিলি!"

ছায়া চাহিয়া দেখিল। জলভরা চোখে বলিল, "কাঁদছিলাম, হাঁা রাণু দি', কাঁদছিলাম। পাড়ার লোকের কষ্ট হয়েছে কি, তোমাদের অসুবিধা হয়েছে কি? বলো ভাই, বলো, আর ত কাঁদি নি, আর ত কাঁদব না, এই একবার—এই একবার—" বুকভরা ব্যথায় সে কাঁদিয়া উঠিল।

"চুপ কর ভাই!" ছায়ার হাত ধরিয়া রাণু জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন উনি?"

"ওই দেখো, দেখ্‌ছ না! তুমি দেখো, আমি জানি না কেমন আছেন কি নাই! ওই দেখো, আমার ছেলে, আমার মেয়ে সব পড়ে আছে! ঘুমুচ্ছে মনে করছ—ঠিক্ তাই—ঘুমোতোও—ঘুমোতে দাও!"

"এ কি, সকলেরই রোগ হয়েছিল না কি! আমায় জানাস নি কেন ভাই! সকালে যখন এসেছিলাম, তখন ত ভালই ছিল সব।"

"ছিল তখন—আছেও এখন—কাল দেখ্‌বে আরও ভাল—ঘর সব পরিষ্কার! ছায়া থাকবে শুধু স্মৃতির ছায়া নিয়ে!"

"কি পাগলের মত বকছিস তুই—" বলিতে বলিতে ত্বরিতে একবার সকলকে দেখিয়া লইল। গভীর দীর্ঘশ্বাস সবলে চাপিয়া শান্তস্বরে বলিল, "অধীর হোস্ নি বোন্ এখনও সবাই বেঁচে আছে। "দাঁড়া, আমি ডাক্তার আনাই।"

"বাড়ীতে কেউ নেই—আত্মীয়-স্বজন এল না এ বাড়ীতে—কে ডাক্তার আনবে ভাই—টাকা দেবে কে?"

"বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই বলেই এ তিনটে প্রাণ এমনি করে অদৃষ্টের পায়ে বলি দেওয়া যায় না বোন্! আমি আনছি, তুই একটু স্থির হয়ে থাক্ ভাই।"

তখনই রাস্তায় বাহির হইয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া সে একজন প্রবীন চিকিৎসকের সন্ধানে গাড়ী লইয়া ছুটিল।

স্বামী দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল্ ও তাঁহার ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবী জানালা হইতে সমস্তই লক্ষ্য করিলেন।

ভগ্নী বলিলেন, "বউয়ের বাড়াবাড়ি দেখলে দাদা। ঘরের বউ একটা হুমদো পাঞ্জাবীর সঙ্গে একা একা কোন্ সাহসে এই রাত্তিরে হাওয়া খেতে যায় বাপু। লেখাপড়ার কপালে আগুন—ছিঃ ছিঃ!"

"দেখ্‌লাম। যে সাহসে ও গেছে, ও রকম সাহসে আমারই যাওয়া উচিত ছিল হেমা—আমি পারলাম না!"

"তবে যাও, বউয়ের পেছু নাও এবার।"

"তাই ভাবছি।"

চার

"আপনি, আপনি যে! রাণু দি'কে আমি ডাক্তার আন্‌তে মানা করেছিলাম, তিনি শুন্‌লেন না, নিজেই গেলেন, দোষ আমারই।"

দেবেন্দ্রবাবুর অসাড় প্রাণে সাড়া জাগিয়াছিল। বিবেকের কাছে পরাজিত হইয়া তিনি কলেরা-রোগাক্রান্তের ঘরে আসিয়াছিলেন। ছায়ার কথায় ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া রোগীদের তিনি এক-একবার দেখিয়া লইলেন এবং নিমেষেই বুঝিলেন—তাঁহার স্ত্রী যে পথে গিয়াছে, তাহাই মানবের প্রধান ও পরম ধর্ম্ম।

মোটর আসিয়া পড়িল। রাণুবালা ডাক্তারকে রোগীদের নিকট লইয়া গেল। প্রবীন ডাক্তার অবিলম্বে রোগীদের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "সারারাত্রির কঠিন পরিশ্রম ও চিকিৎসায় সকলেই ভাল হ'তে পারে—কিন্তু খরচ অনেক।"

"খরচের জন্য ভাববেন না আপনি, এ তিনটি প্রাণ রক্ষা করা চাই-ই আপনার!—বলিয়া দেবেনবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে খানকয়েক নোট বাহির করিয়া ফেলিলেন।

রাণুবালা এতক্ষণ স্বামীর আগমন লক্ষ্য করে নাই। গলার স্বর শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি এসেছ!"

পরম উল্লাসে তাহার মুখে শান্তির ছবি ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর হাত হইতে নোট লইতে লইতে সে চাপাস্বরে বলিল, "জান্‌তাম তুমি আসবেই—না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

রাণুর বুকের বোঝা হালকা হইয়া উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া গেল।

* * *

সমস্ত রাত্রি কঠোর পরিশ্রমের পর জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হইল প্রভাতে—যখন তিনটি রোগীকে টানিয়া ডাক্তার পরাজয়ের সীমার বাহিরে আনিয়া জয়ের রাজ্যে পৌছাইয়া দিলেন। মরিল না কেহই—মরিল শুধু নিষ্ঠুর নিয়তি। জয়ের রাণী রাণুবালার পায়ের উপর পড়িয়া আনন্দের অতিশয্যে ছায়া মূর্চ্ছিতা—আত্মবলির উপকরণ লইয়া সে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল মূর্চ্ছার ভিতর দিয়া। শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যা কিন্তু তখনই টানিয়া লইয়াছিল অশিক্ষিতা শূদ্র কন্যাকে আপনার বুকের উপর—পরম প্রীতিভরে, প্রণয়ের অনাবিল আনন্দে।

হেমাঙ্গিনীকে লইয়া প্রভাতে মাতা ছায়াদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িলেন। পুত্র ও বধূর গতরাত্রের ব্যবহারে তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কিছু কড়া কথা বলিতেই আসিয়াছিলেন—কিন্তু বধূর মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার মনের সমস্ত ময়লা নিমেষে কাটিয়া গেল। হিন্দুনারী, হিন্দু মাতার যে পরদুঃখ কাতরতার নির্ম্মল ধারা আচার-বিচারের পঙ্কিলতায় অবরুদ্ধ হইয়াছিল, সেই পবিত্র ধারা হঠাৎ শতমুখে প্রবাহিত হইল—আচার-বিচার কোথায় ভাসিয়া গেল!

ছায়াকে কোলে টানিয়া মুখ চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ করি সতী সাবিত্রী হও, সুখে সংসার কর! আর বউ-মা, তুমি এস মা, বুকে এস! তোমায় বল্‌বার আমার কিছু নেই—নিজের গুণে তুমি দেবীপদ লাভ করেছ! তবুও আশীর্ব্বাদ করি—জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে হিঁদুর মেয়ের প্রকৃত আদর্শে চালিত হও! হেমা,হেমা, দেখ্ দেখি আজ আমার মায়ের জগদ্ধাত্রী রূপ একবার! রান্না-খাওয়াটাই কি শুধু সব চেয়ে বড় রে!"

"ঢের ঢের ন্যাকামি দেখেছি বাপু, তোমাদের এ সব ঢং দেখলে গা জ্বলে ওঠে!"—বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনী দেবী ফর্‌ফর্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

মাঝের তলার ভাড়াটে

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টচার্য্য

হলধর ঘোষ একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। জাতিতে গোয়ালা। পূর্ব্বে বড় রকম দুধের কারবার ছিল; মাহিনা করা লোক রাখিয়া দশ-বিশটা গরু পুষিত। গাড়ী গাড়ী খড় বিচালী ভুষি খইল সর্ব্বদাই বাড়ীতে মজুত থাকিত। বালতি বালতি দুধ বেচিয়া নিত্য নগদ অর্থ যথেষ্ট রোজকার করিত। উপরন্তু সুদী কারবারও ছিল; তাহারও আয় মোটা রকমের। বাজে খরচও ছিল—জাত গোয়ালা, সে দোষ ধরা চলে না; বরং না থাকাই দোষ। পানদোষ ও তাহার আনুসঙ্গিক আর একটি যাহা না থাকিলে পুরুষের আত্মজন মধ্যে ইজ্জত বজায় থাকে না, হলধরের সে দু'টী দোষ বরাবরই ছিল।

বাড়ীখানি, যাহাতে হলধর বাস করে, তাহা নিজ নামে খরিদ করা। তিনতলা বাড়ীখানিতে অনেকগুলি ঘর। সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণী। হলধর নিজে, পরিবার, আর পুত্র কীর্ত্তি। পুত্রটি আঠার উনিশ বছরের ছোকরা। গয়লার এক মাত্র সন্তান, দুধ ঘি যথেষ্ট ভক্ষণ করে, দেহখানি বেশ হৃষ্টপুষ্ট করিয়াছে, আবার কসরতেরও অভ্যাস আছে, বুক চওড়া, গর্দ্দান মোটা, কাঁধের ও হাতের গুলির মাংস পেশী ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। কাজকর্ম্ম কিছুই সে করে না; কেবল ছাতের উপর পায়রা ওড়ায়, আর এদিক-ওদিক আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশীদিগের গৃহের দিকে লক্ষ্য করে। বিবাহ হয় নাই।

দুধে ও সুদে এবং কশাইকে গরু বেচিয়া হলধর অনেক পয়সা উপায় করিয়াছে। ইদানী গোয়ালে গরু কমিয়া গিয়াছে, কতক মরিয়াছে, কতক সে কশাইকে বেচিয়াছে। লোক দু'-চারজন ছাড়াইয়া দিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হলধর বলে, বয়স হয়েছে, একা সাম্‌লাতে পারি না। বছর দুই যাক্, কীর্ত্তির বে দিই, তখন ওই আবার জাত-ব্যবসা ভাল করে ফেলাও করবে।

হলধর তিনতলায় বাস করে। মাঝের তলাটা ভাড়া দেয়। এক গৃহস্থ পরিবার একাদিক্রমে অনেকদিন যাবৎ ভাড়া ছিল। লোকটি ভাল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বিস্তর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সর্ব্বদাই চেঁচামেচি করে, দুপোদুপি করে, ঘর-দোর ভাঙিয়া ফেলে, হলধরের বরদাস্ত হয় না, তাহাকে উঠাইয়া দিয়াছে। দু' তলাটা খালি পড়িয়া আছে। হলধর 'ভাড়া দেওয়া যাইবে' লিখিয়া বাহিরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। অনেক বাসাড়ে ভদ্রলোক ভাড়া লইবার জন্য আসিয়াছেন। সকলেই ছেলেমেয়ের বাপ জানিয়া হলধর ভাড়া দিতে রাজী হয় নাই।

একজন একদিন ভাড়ার জন্য আসিল। হলধর মাঝের তলার ঘর দেখাইল। ছোট ছেলেমেয়ে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। লোকটি বলিল—একেবারেই না, আমি আমার বউ, আর দু'টী মেয়ে, তারা ডাগর। লোকটি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে বাড়ীওয়ালা ছোট ছেলেমেয়ে পছন্দ করে না। তবুও হলধর জিজ্ঞাসা করিল—কত বড়? মেয়েদের বয়স কত?

লোকটি বলিল—ষোল আঠারো হবে।

হলধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—বিয়ে হয়েছে?

লোকটি এবার হাসিয়া বলিল—আরে না মশয়, কলেজে পড়তেছে, এখনি বিবাহ?

হলধর কথা কহিয়া বুঝিতে পারিল লোকটি পূর্ব্ববঙ্গের। জিজ্ঞাসা করিল—মশায় করেন কি?

লোকটি বলিল—দালালী করি।

হলধর জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ী কোথায়, কি নাম?

লোকটি বলিল—বারী বরিশাল জিলায়। নাম চিত্তহরণ দাশগুপ্ত।

হলধর কি ভাবিয়া বলিল—ভাড়া পঁচিশ টাকা।

চিত্তহরণ বলিল—ক্যাবল দুইটা গর, দশ টাকা দিমু।

অনেক দর কষাকষির পর ভাড়া পনের টাকায় রফা হইল। চিত্তহরণ পরিবার আনিতে চলিয়া গেল। আজই উঠিয়া আসিবে।

চিত্তহরণ চলিয়া যায় দেখিয়া হলধর এক মাসের ভাড়া আগাম চাহিল। তাহাতে চিত্তহরণ বলিল—ব্যাভর করুন মশয়, এখানডায় আগে না আসি, যথাসর্ব্বস্ব আপনাদের গরের মধ্যি না পোরা থাকবে? ভারা যাবে কনে?

ঘণ্টাখানেক পরে চিত্তহরণ সপরিবারে হলধরের দু' তলায় আসিয়া উঠিল। স্বামী, স্ত্রী, দুইটী মেয়ে, গোটা তিনচার সুটকেশ, বিছানা কয়সম, মাত্র দু'-একটা এলুমিনিয়ামের থালা ঘটী বাটি গেলাস, শিল নোড়া প্রভৃতি অতি যৎসামান্য তৈজস-পত্র। বউটি কিছু কাহিল, কপালে এতখানি সিঁদুরের টিপ, মেয়ে দু'টী চসমা আঁটা, এলো খোঁপা বাঁধা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাড়ী সেমিজ পরা, পায়ে সাণ্ডেল। দু'জনেরই হাতে চারগাছি সোণার চুড়ী। ভারি চকচকে ঝকঝকে ভরাট দেহ। চক্ষু চারিটী সর্ব্বদাই চঞ্চল, ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি চারিদিক দেখিতেছে। সকলে দু' তলার ঘর দু'খানি অধিকার করিয়া বসিল। খাওয়া-দাওয়া করিয়া খানিক বিশ্রাম করিল। বৈকাল হইতেই মেয়েরা বাহির হইল; চিত্তহরণও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। হলধরের বউ নীচে নামিয়া চিত্তহরণের বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিল। মেয়েরা কোথায় জানিতে চাহিলে বাঙাল বউ বলিল—তারা মেইয়া পারাতে বেরাইচে। রাত নয়টা দশটা বাজাইয়া তবে না ফিরবান। মেয়েদের নাম কুরঙ্গিনী ও তরঙ্গিনী তাহাও বলিল।

হলধর পরিবারের কাছে সকল শুনিয়া খানিক বসিয়া ভাবিল। শেষে স্ত্রীকে বলিল—ভাড়া দেবে, থাকবে, দেখাই যাক্ না হালচাল।

পরদিন সকালে কীর্ত্তি একতলার সিঁড়ির নীচে ব্যায়াম করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। নীচেটা অন্ধকার। বড় মেয়েটী একটা ঘটী হাতে সেখানে নামিয়া আসিল। আলো আঁধারে কীর্ত্তিকে দেখিতে পাইয়া বলিল—কে ওখানে?

কীর্ত্তি বল্‌লে—আমি কীর্ত্তি।

কুরঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলে—কীর্ত্তি আবার কে?

কীর্ত্তি বলিল—আমি বাড়ীওলার ছেলে।

কুরঙ্গিনী—কি করছো ওখানে?

কীর্ত্তি—একসাইজ করবো।

কুরঙ্গিনী পায়ে পায়ে কীর্ত্তির দিকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি নিয়ে একলা একসাইজ করবে?

কীর্ত্তি—এই যে সিঁড়ির নীচে সব আছে, এসে দেখো না।

কুরঙ্গিনী কীর্ত্তির আরও নিকটে আসিয়া বলিল—কই দেখি?

কীর্ত্তি ডাম্বেল, মুগুর প্রভৃতি ব্যায়ামের সাজ-সরঞ্জাম দেখাইল। কুরঙ্গিনী খুব যেন আশ্চর্য্য হইয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া, আপন গণ্ডে একটা আঙুল ঠেকাইয়া, ঠোঁট উল্টাইয়া ঘাড় বেঁকাইয়া বলিল—ও মা, কি হবে! এই সব ভারী ভারী জিনিষ নাড়বে চাড়বে?

কীর্ত্তি বুক ফুলাইয়া বলিল—নাড়ব কি। উঁচুতে তুলবো, রীতিমত ভাঁজবো, দর দর ক'রে ঘাম বেরুবে তবে ছাড়ব, একসাইজ করা অমনি মুখের কথা কি না।

কুরঙ্গিনী মধুর হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কীর্ত্তিবাবুর বিয়ে হয়েছে?

কীর্ত্তি বলিল—না, হবে বলেছে।

কুরঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া কহিল—সে কি গো, হবে কি গো! শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়ে করে ফেলো, মোটে দেরি করো না—এরপর একটা বিতিকিচ্ছি হতে পারে তা' জানো?

কীর্ত্তি বলিল—অসাধ কার? বিয়ে দেয় না কেন?

কুরঙ্গিনী বলিল—রসো, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু আপাততঃ একটু দুধের কি করা যায়? সকালে চা হয় কি ক'রে বলো দেখি?

কীর্ত্তি—রাস্তায় এখনি গয়লা যাবে, রাস্তায় বেরিয়ে ধরতে হবে।

কুরঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—অবাক করলে কীর্ত্তিবাবু! তোমাদের শুনেছি বালতি বালতি দুধ হয়। তোমাকে ছেড়ে আমি যাব কি না রাস্তায় গয়লা ধরতে —একটু লজ্জা হ'ল না বল্‌তে?

কীর্ত্তি—আমাদের যোগানে দুধ, বেচবে কেন?

কুরঙ্গিনী—ঘরের দুধ আবার কি লোকে কেনে, না বেচে? তুমি ঘটী ডুবিয়ে এক ঘটী দুধ তুলে এনে দেবে। আমি চা ক'রে দেবো, মজা ক'রে খাবে, আমরাও খাবো।

কীর্ত্তি—দুধ কমে যাবে, চুরি ধরে ফেলবে যে?

কুরঙ্গিনী কীর্ত্তির আরও নিকটে আসিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি বলিল—ঘটা ডুবিয়ে যতটা দুধ তুলবে, ঠিক ততটা কলের জল মিশিয়ে দেবে —কার বাবার সাধ্য ধরে? কই, ধরুক দেখি?

কীর্ত্তি কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া হাসিল। বলিল— ঘটীটা সিঁড়ির নীচে রেখে যাও।

কুরঙ্গিনীর মিষ্ট কথায় তাহার মন ভিজিয়া ছিল।

কুরঙ্গিনী হাতের ঘটী নীচে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— তোমাদের কল-ঘরটা কোথায় কীর্ত্তিবাবু?

কীর্ত্তি আঙুল বাড়াইয়া দেখাইল। বলিল—ওই যে সাম্‌নে দেখা যাচ্ছে।

কুরঙ্গিনী বলিল—এস না আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দাও না। আজ চিনে রাখি, এরপর আপনি আস্‌ব।

কীর্ত্তি কুরঙ্গিনীকে লইয়া ছোট উঠানটি পার করিয়া কল-ঘর দেখাইল। কুরঙ্গিনী কল-ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দুধ রেখো, ওপরে নিয়ে যাব।

কীর্ত্তি সিঁড়ির নীচে ফিরিয়া আসিয়া একসাইজ জুড়িয়া দিল। কুরঙ্গিনীর ছোট বোন্ তরঙ্গিনী সিঁড়িতে নামিবার সময় কীর্ত্তির ল্যাংঙট আঁটা ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ভয় পাইয়া সে বলিল—কেরে মিন্‌সে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে?

কীর্ত্তি মুখ বুজিয়া দম করিতেছিল। চাপাগলায় সাড়া দিল।

তরঙ্গিনী চোর ডাকাত ভাবিয়া বলিল—রসো, মজা দেখাচ্ছি।

সে তরতর করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে যাইতেছে, দিদি কল-ঘর হইতে বলিল—ওরে, ও কীর্ত্তি, আমাদের বাড়ীওলার ছেলে। কিছু বলিস্ নি, একসাইজ করচে।

শুনিয়া তরঙ্গিনী পুনরায় নীচে নামিল। কীর্ত্তি তখন ডাম্বেল ভাঁজিয়া হাঁপাইতেছিল। তরঙ্গিনী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কীর্ত্তির একসাইজ দেখিল। কল-ঘরে ভগিনীর নিকট আসিলে, কুরঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল— কীর্ত্তিকে দেখ্‌লি, কিছু বলে?

তরঙ্গিনী মুখ বেঁকাইয়া বলিল—কি আবার বল্‌বে! কে কথা কয় ওই চোয়াড়টার সঙ্গে।

কুরঙ্গিনী বলিল—নিন্দে করিস কেন? কেমন তাজা শরীরটি বল্ দেখি? ওই রকমই ত পুরুষের শরীর হওয়া উচিত। তা' নয়, যত সব গলা সরু, মুখ বসা, চুল ওল্টানো, চোখে ঠুলি দেওয়া, গোঁপ কামানো ভেড়ার দল! যারা না কি পাতলা ডিগ্‌ডিগে, কোন যোগ্যতা নেই, একটুতে হাঁপিয়ে পড়ে, পথে দেখা হ'লে দাঁত ছিরকুটে নাকীসুরে ঘাড় নেড়ে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করে, তারা আমার দু' চক্ষের বিষ! পুরুষ বল্‌তে গেলে কীর্ত্তিই একজন যথার্থ সুপুরুষ।

তরঙ্গিনী ঘৃণার সহিত বলিল—তোমার পছন্দকে বলিহারী! তা' হ'লে প্রেম জুড়ে দাও না কেন ওই দারোয়ানটার সঙ্গে।

কুরঙ্গিনী হাসিয়া বলিল—এর মধ্যে প্রেমে পড়ে গেছে তা' জানিস?

তরঙ্গিনী বলিল—ও মা, কি ঘেন্না! সে আবার কি কথা!

কুরঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—ঘটী রেখে এসেছি, ঘরের দুধ চুরি করবে।

তরঙ্গিনী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দিদিকে

বলিল—তাই না কি ? তবে ত ভাল, এরই মধ্যে এত ভাব করে ফেলেছ।

দুই ভগ্নী কাপড় কাচিয়া কীর্ত্তির কাছে আসিলে সে দুধশুদ্ধ ঘটীটা সিঁড়ির নীচু হইতে বাহির করিয়া আগাইয়া দিল।

কুরঙ্গিনী পূরাপূরী এক ঘটী, প্রায় সেরটাক দুধ দেখিয়া ভারী খুসী হইল। হাসিয়া বলিল—দেখ্‌লে কীর্ত্তি-বাবু, বুদ্ধি খরচ করলে সব জিনিষ আপনি যোগাড় হয়। চা করলে তুমি খেয়ে যেও।

কীর্ত্তি বলিল—না দেখ্‌তে পাবে।

কুরঙ্গিনী বলিল—দেখ্‌লেই বা তুমি চুরী কর্‌তে গেছ না কি, ভয় কিসের ? শুধু চা খাবে বই ত নয় ? মাথা খাও, যেও।

কীর্ত্তি হাসিতে লাগিল। ভগিনীদ্বয় ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

উপরের দুইটা ঘরের একটা দুই ভগিনী দখল করিয়াছে, অপরটি চিত্তহরণের। কুরঙ্গিনী কাপড় ছাড়িয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া চা তৈয়ারী করিল। কীর্ত্তি আসিতে পারে নাই। তাহার আসিবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; কিন্তু কার্য্য-কালে সাহসে কুলায় নাই।

হলধরের বাড়ীর নীচের তলাটা বড় অন্ধকার, কারণ, বাড়ীখানি অত্যন্ত সরু গলির ভিতর অবস্থিত। নীচের তলা গুদাম ঘরের মত ; কেহ বাস করে না। খড়-বিচালী প্রভৃতি রাখা হইয়া থাকে। বাড়ীর পাশে একখানি টিনের চালায় গোয়াল-ঘর, সেখানে চাকরেরা গরুর কাজকর্ম্ম করে।

পরদিন প্রত্যূষে কুরঙ্গিনী পুনরায় কীর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইল। পূর্ব্বদিনের মত আজও কীর্ত্তিচন্দ্র অন্ধকার সিঁড়ির নীচে একসাইজের যোগাড়ে ছিল। উপর হইতে স্যাণ্ডেলের শব্দ শুনিয়া সে কাণ খাড়া করিয়া রহিল।

কুরঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া বলিল—কি গো কীর্ত্তিবাবু, কাল দুধ খাওয়ালে, কই চা খেতে এলে না ত ? তোমার প্রত্যাশায় বসে বসে শেষটা ঘটীশুদ্ধ তৈরী চা ঢেলে দিতে হ'ল। ভারী রাগ হয়েছিল কিন্তু—

কীর্ত্তি বলিল—যাবার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, পা মোটে এগুলো না, ভয় হ'ল।

কুরঙ্গিনী—কিসের ভয় ? পুরুষ মানুষ সাহস করবে। আমি তোমার জন্য কি না ভেবে ভেবে সমস্ত রাত একটুও ঘুমুতে পারলুম না—এমনি দুর্গতি !

কীর্ত্তি আহ্লাদে গলিয়া গেল। ভাবিল, দুধ চুরি তাহা হইলে তাহার সার্থক হইয়াছে। সে একসাইজ ভুলিয়া কুরঙ্গিনীর হাসিভরা মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

দুধের গোপাল কীর্ত্তিচন্দ্রের মুণ্ডপাত আসন্ন বুঝিয়া কুরঙ্গিনী কলঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে চলিয়া যায় দেখিয়া কীর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিল—ঘটী আন নি কেন ? কিসে দুধ নেবে ?

কুরঙ্গিনী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—রোজ রোজ দুধ খাওয়াবে, মাসের শেষে তোমার বাবা বলবে ঘরভাড়ার টাকা দাও, তুমি চাইবে দুধের দাম, আমরা গরীব, এত পাব কোথায় ?

কীর্ত্তি বলিল—দুধ অমনি। তোমার কাছে কি দাম চাইতে পারি ? ঘটী আন।

কুরঙ্গিনী বলিল—কেন দাম চাইতে পার না ?

কীর্ত্তি বলিল—একটু দুধ খাবে, তার আবার দাম কি ? এত ছোট নজর ভেবো না।

কুরঙ্গিনী শীকারের আশায় জাল ফেলিয়াছিল। এখন কীর্ত্তির মুখের উপর বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া সে বলিল—যদি খাই ত পেট ভরে খাব ; শুধু একটু দুধে কি পেট ভরে ? হোটেলে নিয়ে চলো, বায়স্কোপ দেখাও, তবে ত জানব কীর্ত্তিচন্দ্র একজন মানুষের মত মানুষ—নয় ত শুধু একফোঁটা দুধ ! ভারী উঁচু নজর দেখাচ্ছ, নয় ?

কীর্ত্তি উচ্চশিক্ষা অতি দূরের কথা, সামান্য শিক্ষাও পায় নাই। জীবনে শিক্ষিতা নারীর ছায়া মাড়াইবারও সৌভাগ্য সে লাভ করে নাই। চশমা চোখে, জুতা পায়ে সুন্দরী যুবতীদ্বয় কীর্ত্তিকে দেখিয়া লজ্জামাত্র করে নাই ; বরং আপনারা উপযাজিকা হইয়া আলাপ করিয়াছে—তাহাতে কীর্ত্তির আত্মাভিমান জাগিয়াছে। হোটেলে খাওয়ান কিংবা বায়স্কোপে লইয়া যাওয়া তু কীর্ত্তি, তুচ্ছ

কথা, চুরি-বাটপাড়ি বা উহাদের কোন শত্রুপক্ষকে মারিতে বলিলে সে এখন একটা কথায় খুন পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিতে পারে। কুরঙ্গিনী শুধু সুন্দরী নয়, কথাগুলিও কেমন মিষ্ট। কীর্ত্তির মহা ভাবনা আসিয়া উপস্থিত—সে এখন করে কি? তাহার নবীন যৌবন, অদম্য উৎসাহ, অতৃপ্ত ভোগ পিপাসা। তাহার সব আশা বুঝি ব্যর্থ হয়। যদি যথার্থ পিতার পুত্র হয়, কিছুতেই সে পরাভব স্বীকার করিবে না। যদি সত্য-সত্যই পিতৃপুরুষের নাম বজায় রাখিতে হয়, কিছুতেই এ মহামূল্য রত্ন পায়ে ঠেলিতে পারিবে না। যদি মূঢ়তাবশতঃ এ রত্ন হেলায় হারায়, তাহা হইলে তাহাকে বলিয়া হায় হায় করিতে হইবে একথা নিশ্চয়।

যত দিন যাইতে লাগিল, কীর্ত্তির স্বভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া গেল। আজকাল ভাল কাপড়-জামা না হইলে আর সে পরিতে চায় না। কস্মিনকালে কদাচ কখনও যে দাঁত মাজিত, এখন সে নিত্য দিনে তিন-চারবার উত্তম সুগন্ধি দন্ত মঞ্জন দিয়া দাঁত মাজিয়া থাকে। পূর্ব্বে মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটিত, কখনও চিরুণী লাগাইবার প্রয়োজন বোধ করিত না—এখন সে খুব বড় বড় চুল রাখিয়াছে। আর্শী ও বুরুশ যোগে রীতিমত কেশের পারিপাট্যে যত্ন করে—দর্পণে ঘন ঘন মুখ দেখে। মুখের মধ্যে জিহ্বা উল্টাইয়া, ঠোঁটে দুই আঙুল চাপিয়া পায়রা উড়াইবার প্রচণ্ড শীস্ দেওয়া প্রায় সে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন শীস্ দেয় বটে, কিন্তু ভিন্ন রকমের—মুখ সূচের মত করিয়া অতি মিষ্ট বাঁশীর স্বরে। সে তাহার মায়ের অন্ধের নড়ি, বুকপোরা ধন, শিবরাত্রের শলিতা। ছেলে এতদিন পরে ভদ্র হইতে শিখিয়াছে, তাহাতে তাহার আনন্দের অবধি নাই। কীর্ত্তি যাহা কিছু আবদার করে, বিনা ওজর-আপত্তিতে মা সমস্ত যোগাইয়া থাকে। সাবান, সেণ্ট, গন্ধতৈল, হেজ্‌লীন্ হিমানী প্রভৃতি যাবতীয় প্রসাধনের সামগ্রী মায়ের ঘাড় ভাঙিয়া টাকা আদায় করিয়া কীর্ত্তি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। যৎসামান্য নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া সকলগুলি দিনের পর দিন সিঁড়ির নীচে কুরঙ্গিনী ও তরঙ্গিনীকে উপঢৌকন দিয়াছে। তাহারা একবাক্যে তাহার কতই না প্রশংসা করিয়াছে! কীর্ত্তির আনন্দের সীমা নাই।

যেদিন দুই ভগ্নীর সহিত লুকাইয়া সে বায়স্কোপ দেখিতে আসিয়াছিল, হোটেলে একত্র টেবিলে বসিয়া যে মাংস চপ কাটলেট ইত্যাদি খাইয়াছিল, সেদিন যে সুখ, আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তেমন তাহার উনিশ বছর বয়সের মধ্যে একটি দিনও করে নাই। বায়স্কোপে পাশা-পাশি গায়ে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া অন্ধকারে তাহার কাণের উপর মুখ রাখিয়া কুরঙ্গিনী গান শুনাইবে অঙ্গীকার করিয়াছে। সে কীর্ত্তির একখানি হাত নিজ হাতে তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে, কখনও চাপিয়া ধরিয়াছে। সে স্পর্শসুখ অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয়! কীর্ত্তির সর্ব্ব অঙ্গ তখন কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল। হোটেলে আসিয়া কীর্ত্তি দেখিল ভগিনীদ্বয় সকলেরই বিশেষ পরিচিতা। বহুবার যে তাহারা এখানে আসিয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

আহারের পর কুরঙ্গিনী হোটেলের পাওনা মিটাইবার জন্য কীর্ত্তিকে বলিল—দশটা টাকা দাও।

কীর্ত্তি তৎক্ষণাৎ একখানা নোট কুরঙ্গিনীর হাতে দিয়া দিল। সে নোট লইয়া হোটেলের ম্যানেজারের ঘরের দিকে উঠিয়া গেল। ফিরিয়া পুনরায় কীর্ত্তির পার্শ্বে বসিতে গেলে, তাহার শাড়ীর মধ্য হইতে টাকার ঝঞ্চনা মৃদুভাবে বাজিতেছিল। তরঙ্গিনী দিদির মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিলেও কীর্ত্তি সেদিকে খেয়াল করে নাই। রাত্রি দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। দুই ভগ্নী বাটী পৌঁছিবার আধঘণ্টা পরে কীর্ত্তি গৃহ প্রবেশ করিল।

কীর্ত্তি নিয়মিত অতি ভোরে একসাইজ করিতে সিঁড়ির নীচে নামিয়া আসে, কিন্তু এখন আর একসাইজ করে না, কুরঙ্গিনীর জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। সে আসিলে আনন্দ-কৌতুকে হাসি-তামাসায় অনেকটা সময় কাটাইয়া দেয়। ডাম্বেল মুগুর ভিজা মেজের উপর পড়িয়া থাকিয়া উই ও মরিচায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহার সখের ভাল ভাল দামী পায়রা সময়ে দানাজল না পাইয়া একে একে

মরিতে সুরু করিয়াছিল। তখন বুদ্ধির কার্য্য করিয়া বাকীগুলিকে বেচিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিল। এইরূপে পূরা দুইটি মাসে হলধরের আদরের দুলাল কীর্ত্তিচন্দ্র অনেক বিষয়ে পরিপক্ক হইয়া উঠিল। কুরঙ্গিনী ও তরঙ্গিনী যখন যেটি করিতে বলে, সে কায়মনোবাক্যে তাহা পূরণ করে।

নিত্য এত টাকা লইয়া পুত্র করে কি? কথাটা প্রথমে কীর্ত্তির মায়ের মনে উদয় হইল, পরে হলধরেরও কাণে গিয়া পৌঁছিল। পুত্র শরীর-চর্চ্চা করে, স্বভাবে কালি পড়ে নাই, হঠাৎ তাহার চাল-চলন বদলায় কেন?

কীর্ত্তির মা স্বামীকে বলিল—ভয় হয়, ছেলেটা এই বয়সে বোধ হয় বাপের রোগ পেলে।

হলধর রাগিয়া গেল। বলিল—বাপ কখনও বাবু সাজে, না এত পয়সা খরচ করে আতর-গোলাপ মাখে? শরীর রাখ্‌বার জন্য রাত্রি হলে একটু খাই—এতে দোষ?

কীর্ত্তির মা একটু হাসিয়া বলিল—কিছু নয়।

হলধর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল—মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি!

কীর্ত্তির মা—তোমার যা' খুসী কর গে। তোমার ওপর কথা কয় কে? কথা হচ্ছে আমরা থাকতে ছেলেটা যদি সত্যি সত্যি বয়ে যায়—বড় দুঃখের কথা। এর একটা উপায় কর। শীগ্‌গির একটা বে দাও ছোঁড়ার। ছেলের আকার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ কি?

হলধর মুখে যাহাই বলুক, অন্তরে চিন্তাযুক্ত হইল। তখন হইতে সে পুত্রের উপর চোখ রাখিয়া চলিতে লাগিল। কয়দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কীর্ত্তি উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। হলধরের মনে সন্দেহ জাগিল। ভাবিল—এতবড় কোলকাতা সহরে ঘুরিয়া কোথায় পুত্রের সন্ধান পাইবে? রাত্রে কি অবস্থায় সে ফিরিয়া আসে, প্রথমে সেইটা লক্ষ্য করা যাক্‌। হলধর তাহার অতিপ্রিয় ঔষধের শিশিটা সঙ্গে লইয়া একতলার অন্ধকারে একধারে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। মশার কামড়ে যতই অস্থির হয়, ঘন ঘন পাত্র ভরিয়া সর্ব্বসন্তাপনাশক ঔষধ ততই সেবন করে।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে হলধর দেখিতে পাইল—সদর দ্বার খুলিয়াছে। অন্ধকারে তিনটি মূর্ত্তি তখন ধীরে ধীরে গৃহ প্রবেশ করিতেছে। অস্পষ্ট হইলেও হলধর চিনিতে পারিল তাহারই কীর্ত্তিমান পুত্র কীর্ত্তি এবং মাঝের তলার ভাড়াটিয়ার কলেজে পড়া দুই কন্যা একত্রে নিঃশব্দে বাহির হইতে দোর ঠেলিয়া ভিতরে আসিতেছে।

ভাড়াটিয়ার একটা মেয়ে স্বর খাটো করিয়া বলিল—আজকের মত তা' হলে ছাড়াছাড়ি। খুব আমোদ হয়েছে, নয়?

কীর্ত্তি উত্তর দিল—হ্যাঁ। তোমরা ওপরে যাও, আমি খানিক এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

ভাড়াটিয়ার কন্যারা অগ্রসর হইয়া সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল।

অপর একটা মেয়ে বলিল—থাকো না একলা অন্ধকারে, ভূতে ঘাড় মট্‌কে দেবে।

তিনজনের হাসির শব্দ হলধরের কাণে গেল। মেয়েরা উঠিয়া যাইবার কিছু পরে কীর্ত্তিও উপরে উঠিল।

হলধর লুকাইয়া বসিয়া থাকিয়া সমস্ত দেখিল। ব্যাপার বুঝিতে তাহার আর কিছুই বাকী রহিল না। কীর্ত্তির মা ছেলের বাপের রোগের কথা তুলিয়াছিল। হলধর বুঝিল, বাপের রোগ ত বটেই, উপরন্তু ছেলের রোগটি আরও সাংঘাতিক—দু'টা সাজোয়ান পেত্নী পুত্রকে আশ্রয় করিয়াছে। রোগ সারাইতে হইলে প্রথমেই ভাড়াটিয়াকে উঠাইয়া দিতে হয়। ভাড়াটিয়া দুই মাস মাঝের তলা ভাড়া লইয়াছে, এখনও এক পয়সা ভাড়া দেয় নাই। ভাড়া চাহিলেই বলে—কি মুস্কিল, তাগাদা করেন ক্যান্, একেবারে সব টাকা দিয়া দিমু।

হলধর তিনতলায় আসিয়া শুনিতে পাইল, কীর্ত্তির মা পুত্রকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে—রাত করে বাড়ী আসিস, মুটো মুটো টাকা খরচ করছিস, এসব ত ছিল না, এমন হলি কেন? কাঁচা বয়েস, কি করে বসবি, বে-থা কর, ও সব দোষ আপনি চলে যাবে।

কীর্ত্তি তর্জ্জন করিয়া মাকে বলিল—ও সব বিয়ে-থার কথা মুখে এনো না বলে দিচ্ছি—বিয়ে আমি করবো না।

কীর্ত্তির উক্তি শুনিয়া হলধর গৃহিণী ও পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রোধে সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছিল। চীৎকার করিয়া পুত্রকে বলিল—তোর বাবা যে, সে বিয়ে করবে! মনে করেছ বাবা বুড়ো, কিছুই বোঝে না? বল্ দেখি শুয়োর, নীচের তলার বাঙাল ছুঁড়ী দুটোর সঙ্গে কোন্ আড্ডা থেকে ফিরে এলি? কাল সকাল হোক্, একশ' গয়লা এক ঠাঁই করবো, কত বড় ছত্রহরণ একবার বুঝে নেব। বাপ বেটী ওদের গুষ্টিশুদ্ধের যদি বেইজ্জত না করি, আমি গয়লার ছেলেই নই ব'লে রাখ্‌ছি।

চিত্তহরণ আপন কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিল। হলধরের চীৎকার শুনিয়া তিনতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়া সে সকল কথাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এবং পরদিন প্রভাত হইলে হলধর যে গোলযোগ বাধাইবে বলিতেছে তাহার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিল। চিত্তহরণ তখন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া মেয়েদের ডাকিয়া বলিল—গয়লা হালা কাল হক্কাল অইলে হুজ্জৎ বাধাইবে। তোরা না কি ওডার পোলারে খারাপ করচস্—এডা কি বল্ দেহি? তোদের জন্য কোথাও দু'দিন হাঁপ্ ছারতে পারলাম না!

কন্যাদ্বয় তখন ভয়ানক চটিয়া গেল। কুরঙ্গিনী বলিল—তুমি বাপ, তোমার সরম কই? তখনি না তোমারে সাবধান করলাম, বল্‌লাম—গয়লা ছোটলোক, ওর গর অমনি দেলেও যায়ো না—কথা শুন্‌লে কই? এখন আমাগোর মুখ পোরাইলে—আজ রাতির মধ্যি এঁর ছারায়ে দাও।

চিত্তহরণ বলিল—গর ছারি দিতে ত কও। রাত্রিকাল, যাবে কনে?

কুরঙ্গিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ভাবনা কিসের, ডিমের ভাবনা! মেইসা যাইয়া না উঠ্‌মু। হরবিলাসেরে চেনো, দেখ্‌বান কত না যত্ন করে—আমরা যাইলে আপন গর ছাইরে ফাঁকে শুইবে।

রাত্রের আহার পূর্ব্বেই শেস হইয়াছিল। চিত্তহরণ তখন সপরিবারে মোটঘাট বাঁধিতে সুরু করিয়া দিল। ঘণ্টাখানেক পরে দুইখানা রিক্স ডাকিয়া চুপিচুপি সকলে হলধরের অজ্ঞাতসারে গা ঢাকা দিল।

পরদিন প্রভাত হইলে নীচে নামিবার সময় কীর্ত্তি মাঝের তলার ঘরদোরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিল—বিহঙ্গ পলাইয়াছে; শূন্য খাঁচা খাঁখাঁ করিতেছে। সে মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রণয়-কাহিনী

১

শ্রীহরিপদ গুহ

> Love has no thought of shelf.
> Love sacrifices all things to bless the thing it loves.
> —Lord Lytton.

সেই পুরাতন প্রেমের কথা।

প্রেম পুরাতন হইলেও চির নূতন, ইহার মধ্যে বেশ একটু অভিনবত্ব আছে।

অবশেষে বেলা ধীরাজকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়া মত দিল।

ধীরাজ বিবাহিত। তাহার প্রথমা স্ত্রী সুধীরা এবং দুইটী পুত্র বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সে বেলাকে আবার বিবাহ করিয়া বসিল।

কেমন করিয়া তাহাই বলিতেছি :

ধীরাজের বাড়ী বালীগঞ্জ। ধনীর দুলাল সে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া সে সকল ভায়েদেরই খুব স্নেহের পাত্র। লেখাপড়া তাহার বেশী দূর পর্য্যন্ত হয় নাই; বহুকষ্টে সে ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিল। তারপরই ভায়েরা দিল তাহার বিবাহ। পাত্রী সুধীরা রূপবতী না হইলেও খুব কু-শ্রী নয়। তাহার স্বভাবটী কিন্তু বড়ই সুন্দর। অবশ্য রূপ হিসাবে সে মোটেই ধীরাজের যোগ্যা নয়; কারণ, ধীরাজ অতি রূপবান যুবক—যেন পাকা আপেলটি। ছেলেবেলা হইতেই তাহার অভিলাষ ছিল যে, তাহার জীবন গতি হইবে রঙীন প্রজাপতির মত। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়াই তাহার দিন কাটিয়া যাইবে। সংসারের কোনপ্রকার বন্ধনেই সে আবদ্ধ হইবে না। কাজেই দাদাদের মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিল না; অথচ, মুখ ফুটিয়া তাঁহাদের বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করিল না। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। সে দুইটী সন্তানের জনক হইল। তখনও কিন্তু সে সুধীরাকে লইয়া সুখী হইতে পারিল না। তাহার বুকে একটা ব্যথার কাঁটা ফুটিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে বেদনায় অস্থির করিয়া তুলিল।

তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে একটা ফাঁকা জায়গা পড়িয়া ছিল অনেক দিন ধরিয়া। হঠাৎ দেখা গেল একদিন সেখানে একখানি চমৎকার একতলা বাড়ী হইতেছে। দেখিতে দেখিতে বাড়ীর কাজ শেষ হইয়া গেল। বাড়ীখানি দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন ফ্রেমে বাঁধান একখানি ছবি। এই বাড়ীর মালিকের নাম মিঃ দেব দত্ত, কি একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ভারী চমৎকার লোক তিনি। শীঘ্রই পাড়ার সকলের সঙ্গে তাঁহার বেশ ভাব হইয়া গেল। বেলা তাঁহারই কন্যা। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই এ পড়িতেছে। বছর আঠারো বয়স তাহার; বেশ সুশ্রী গড়ন।

ধীরাজদের সঙ্গেই দেব দত্ত-বাবুর আলাপ হইল সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে। দুই বাড়ীর মেয়েরাই উভয় গৃহে যাতায়াত করিত। ধীরাজের স্ত্রী সুধীরা তখন ছিল পিত্রালয়ে; কাজেই সে ব্যতীত অপর সমস্ত বধূর সহিত বেলার আলাপ হইল। শুধু তাহার সম্বন্ধেই সে কিছু জানিতে পারিল না।

ধীরাজের যাহা বয়স, সে বয়সে সাধারণতঃ কাহারো বিবাহ হয় না। সুতরাং বেলা যদি তাহাকে অবিবাহিত বলিয়াই ধরিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

প্রথম দর্শনেই বেলা ধীরাজের প্রেমে পড়িল। ইংরাজীতে যাহাকে বলে—'লভ্ এ্যাট্ দি ফার্ষ্ট সাইট্।' আর বেলাও শিক্ষিতা, 'আপ টু-ডেট' সুন্দরী তরুণী—কাজেই তাহার উপর ধীরাজের আকর্ষণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

নির্জ্জন মধ্যাহ্নে যখন সকলে নিজ নিজ ঘরে শুইয়া দিবানিদ্রার সুখভোগ করিত, তখন এই দুইটী তরুণ তরুণী ধীরাজদের নীচের ঘরে বসিয়া নিভৃত প্রেমালাপে একেবারে বিভোর হইয়া থাকিত—ভুলিয়া যাইত সমস্ত বহির্জগতের কথা। দুইজনের ভালবাসা দিন দিনই গভীরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বেলা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই কলেজ কামাই করিয়া এই মধ্যাহ্ন অভিসার আরম্ভ করিয়া দিত। তাহার পিতামাতা ধীরাজকে পুত্র নির্ব্বিশেষেই স্নেহ করিতেন; কাজেই বিনা দ্বিধায় তাহার সহিত কন্যাকে সিনেমা কিংবা থিয়েটারে যাইতে ছাড়িয়া দিতেন। অবশ্য সমস্ত ব্যয় বহন করিত ধীরাজ নিজে। মাঝে মাঝে সে বেলাকে নানাপ্রকার উপহারও পাঠাইয়া দিত।

বেলার পিতামাতা খুবই সরল। দু'টী হৃদয়ে ভালবাসার কি যে ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে, তাহার কোন সংবাদই তাঁহারা রাখিতেন না।

ঘটনাটা কিন্তু একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া তাহাই বলিতেছি:

সেদিন দুপুরবেলা বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শুধু ধীরাজের সেজ বৌদিদি নীহার কল চালাইয়া কতকগুলি বালিসের ওয়াড় শেলাই করিতেছিল। ঠিক্ সেই সময় বেলা ধীরাজদের বাড়ী প্রবেশ করিল। বাড়ীর সকলে কে কি অবস্থায় আছে তাহা দেখিবার জন্য সে সটান একেবারে নীহারের ঘরে গিয়া উঠিল।

নীহার আদর করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল, 'এস ভাই বেলা, বসো।'

বেলা কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে বসিতে পারিল না; ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। নীহার খুব চতুরা। অনেক দিন হইতেই সে বেলাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখিয়া আসিতেছিল। তাহার এ চাঞ্চল্য কিন্তু তাহার শ্যেনদৃষ্টি এড়াইল না।

বেলা প্রশ্ন করিল—'আর সবাই কোথায় গেল?'

নীহার কল চালাইতে চালাইতে বলিল—'ওঘরে সব ঘুমুচ্ছে।'

'আজ তবে উঠি ভাই'—বলিয়া বেলা উঠিয়া পড়িল।

নীহার একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—সম্মুখের জানালার দিকে। সেখান হইতে বেলাদের বাড়ীর দরজা স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবু বেলাকে বাড়ী ঢুকিতে না দেখিয়া তাহার মনের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। সে কল বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পিছনের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। পা টিপিয়া টিপিয়া সে সিঁড়ির নিকটের ঘরটার কাছে গিয়া কান পাতিল। প্রেমালাপের দু'-একটা কথা কানে আসিতেই মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানি খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে অতি সন্তর্পণে দ্বারের শিকলটা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে পিছন ঘুরিয়া একেবারে বেলাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। বেলার মা তখন শুইয়া শুইয়া একখানি মাসিকের পাতা উল্‌টাইতেছিলেন।

নীহার গিয়া ব্যস্তভাবে ডাকিল—'শীগ্‌গির আসুন আমাদের বাড়ীতে, দেখে যান আপনার মেয়ের কাণ্ডখানা'—বলিয়া তাঁহাকে একপ্রকার জোর করিয়াই টানিয়া আনিল। শিকলটা খুলিয়া দিয়াই সে হন্‌হন্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—'দেখুন, স্বচক্ষে আপনার মেয়ের কীর্ত্তি দেখে যান।'

দরজাটা খুলিয়া যাইতেই দেখা গেল—ধীরাজ তক্তাপোষের উপর দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে; আর অদূরে একখানি চেয়ারে ফাগমাখা মুখে বসিয়া বেলা। তাহার চক্ষু দু'টী অশ্রুভারে টলটল করিতেছে। মাতা কিছুক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'যাও বেলা, বাড়ী যাও।'

বেলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

মাতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—'ছিঃ ধীরাজ, তোমায় আমি সন্তানের মত স্নেহ করতুম!' তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বেলা ও ধীরাজ উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ এবং পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। মধ্যে মধ্যে কিন্তু তাহাদের মধ্যে গোপন প্রেম-পত্রের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। ধীরাজ বেলাকে পাইবার জন্য একেবারে উন্মাদ হইয়া উঠিল। সেই হইল তাহার একমাত্র চিন্তা। যেমন করিয়া হউক, তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিতেই হইবে। নহিলে তাহার জীবনটা মরুভূমি হইয়া যাইবে—অথচ কি করিলে যে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না।...

ইহার কিছুদিন পরই সুধীরা পিত্রালয় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামী এবং বেলার প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে স্বামী-সুখ-বঞ্চিতার কানে গেল। সে ঈর্ষার আগুনে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

সেদিন বিকালে সুধীরা একাকী তাহাদের বাড়ীর ছাদে বেড়াইতেছিল। ঠিক্ সেই সময় বেলাও তাহাদের ছাদে একখানি বই হাতে লইয়া পদচারণা করিতেছিল। স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা সুধীরার তখন সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল বেলার উপর। মুহূর্ত্তে এক ঝলক রক্ত উঠিল গিয়া তাহার মাথায়—সে কিছুতেই আর নিজেকে ঠিক্ রাখিতে পারিল না। বেলার চোখে চোখ পড়িতেই সে তাহার দিকে অনলবর্ষী-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর সহসা পায়ের স্যাণ্ডেলটা খুলিয়া লইয়া সে উঁচু করিয়া বেলাকে দেখাইল।

মুহূর্ত্তে বেলার মুখখানা একেবারে কালীমাখা হইয়া গেল। এতবড় অপমান সে জীবনে হয় নাই। তাহার দুই চোখ ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু বাহির হইল। একবার ভাবিল—সেও ইহার প্রতিশোধ লয়। আবার কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

সুধীরা এতদিন যদিও বা স্বামীর দর্শন পাইয়াছে, এই ঘটনার পর হইতে সে সে সুখ হইতেও বঞ্চিত হইল।

দেব দত্ত-বাবু মনে করিয়াছিলেন—কিছুদিন কন্যাকে দূরে রাখিলে, দুইজনের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ না হইলে বেলার এই মোহ কাটিয়া যাইবে। তারপর একটি উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিলেই চলিবে। এই চিন্তাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বেলাকে এলাহাবাদে তাঁহার ভ্রাতা অমিতাভ দত্তের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সেখানকার ডাক্তার।

এদিকে ধীরাজের অবস্থা হইল একেবারে সাংঘাতিক। বেলাকে না পাইলে যে কোন মুহূর্ত্তে সে আত্মহত্যা করিতে পারে। তবে বেলার নিকট সে আশা পাইয়াছে এই যা' তাহার ভরসা।...

মাসখানেক পরেই বেলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তাহার পিতামাতা মনে করিলেন—কন্যা এইবার ঠিক্ হইয়া গিয়াছে, আর কোন চিন্তার কারণ নাই। বেলা বেশ ভাল করিয়া লেখাপড়ায় মন দিল। নিয়মিত কলেজে যাইতে এবং আসন্ন আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনে করিল—তাহার মোহ এখন একেবারে কাটিয়া গিয়াছে।

এখানে আসিয়াই বেলা ধীরাজকে একখানি পত্রদ্বারা জানাইল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে। আই-এর শেষ পরীক্ষা দিয়াই সে তাহার নিকট যাইবে। সেদিন যেন সে 'সিনেট হাউসে'র নিকট গাড়ী লইয়া উপস্থিত থাকে এবং ইতিমধ্যে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখে। ইতিমধ্যে পত্রাদি লিখিয়া যেন সে তাহার পিতামাতার মনে কোনপ্রকার সন্দেহ উৎপাদন না করে। এ বিষয়ে সে তাহাকে বারবার সাবধান করিয়া দিল।

দেব দত্ত-বাবু নানাস্থানে কন্যার জন্য সু-পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। যে কয়টা সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে কেহ সিভিলিয়ান, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ মুন্সেফ্, কেহ বা প্রফেসর। মনোমত পাত্রের জন্য তিনি দশ সহস্র টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা বেশ ভাল করিয়াই তিনি ঘটকদের বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আই এ পরীক্ষায় দিন আসিয়া পড়িল। বেলার ব্যবস্থামতই কার্য্য হইল। ধীরাজ চেতলায় একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া ঠাকুর চাকর ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিল। বিবাহ সেখানেই হইবে, তাহার সমস্ত আয়োজনও সে করিয়া রাখিল।

শেষ আই-এ পরীক্ষার দিন নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বেই ধীরাজ ট্যাক্সি লইয়া সিনেট হাউসের নিকট উপস্থিত রহিল।

যথাসময় বেলা আসিয়া ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল। ড্রাইভার 'ষ্টার্ট' দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বেলাদের ড্রাইভার শূন্য গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—দিদিমণি সেখানে নাই। সে হলের কপাট বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

কথাটা শুনিয়াই দেব দত্ত-বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বুঝিলেন—কন্যা নিশ্চয়ই ধীরাজের সহিত উধাও হইয়াছে। এতদিন তাঁহারা ভুল ধারণা করিয়াছিলেন—বেলা তাহা হইলে ধীরাজের কথা ভুলিতে পারে নাই। গৃহিণী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দেব দত্ত-বাবু তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন—'এখন কাঁদ্‌তে হবে না। যাও, ওর ক্যাস বাক্সটা খুলে দেখো, কোন চিঠি-পত্র পাও কি না।'

গৃহিণী তখনই চলিয়া গেলেন।

বেলা টেবিলের উপরই চাবি ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহা দিয়া ক্যাস বাক্সটা খুলিয়া ফেলিতেই একতাড়া চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। সবগুলিই ধীরাজের লেখা। তিনি পত্রগুলি লইয়া স্বামীর কাছে যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল টেবিলের উপর পেপার ওয়েটের নীচে একখানি চিঠির উপর। পরম আগ্রহে তিনি সেখানি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন—স্বামীর নামে লেখা। লিখিয়াছে—বেলা। তিনি তাড়াতাড়ি পত্রগুলি লইয়া স্বামীর নিকটে গেলেন।

দেব দত্ত-বাবু তাড়াতাড়ি কন্যার চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বেলা লিখিয়াছে:

'বাবা, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি জানি, তোমায় কত বড় আঘাত দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি একবার যে ভুল করেছি, সে ভুল সংশোধন কর্‌তে হলে এ ছাড়া আর কোন উপায়ই ত ছিল না। তোমার সিভিলিয়ান পাত্রদের পেয়ে বাইরের সুখ হলেও অন্তরের সুখ কি সত্যই হতো? আমি ধীরাজবাবুকে মনে প্রাণে ভালবেসেছি—আর বুঝতে পেরেছি, তিনিও আমাকে সত্যই খুব ভালবাসেন। তুমি কি আমাকে সব জেনে শুনে দ্বিচারিণী হতে বলো? তোমরা ত কিছুতেই ধীরাজবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে না—তাই আমি স্বেচ্ছায় তাকে বরণ কর্‌তে চল্‌লুম। আশীর্ব্বাদ করো, যেন সুখী হই। যদি ক্ষমা কর, আবার গিয়ে তোমাদের পায়ের ধূলো নিয়ে আস্‌ব। ইতি,

হতভাগিনী

বেলা'

পত্রখানি পড়িয়া দেব দত্ত-বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'যাক্, ভালই হয়েছে।'

বেলার সঙ্গে ধীরাজের বিবাহ হইয়া গেল।

পরদিন বেলা স্বামীকে বলিল—'আগে চলো, মা, বাবা ও তোমাদের বাড়ীর গুরুজনদের প্রণাম করে আসি। আমরা ত কোন অন্যায় করি নি, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করবেন।'

ধীরাজ সহাস্য বদনে বলিল—'নিশ্চয়ই!'

বালীগঞ্জে দত্ত গৃহিণী বসিয়া কন্যার দুর্ভাগ্যের কথাই আপন-মনে ভাবিতেছিলেন। সহসা বেলা ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধীরাজও। মাতা শুষ্কমুখে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিলেন—'সুখী হও!'

বেলার ছোট বোন্ চামেলী ছুটিয়া গিয়া পিতাকে সংবাদ দিল—'বাবা, দিদি, জামাইবাবু তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।'

দেব দত্ত-বাবু ভাল করিয়া চক্ষুটা মুছিয়া লইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আজ আস্তে বারণ কর। আমি তাদের খবর দিলে যেন তারা আসে।'

চামেলীর মারফৎ এ সংবাদ পাইয়া বেলা ও ধীরাজ ধীরে ধীরে মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিল।

* * *

ধীরাজের দাদারা তাহার এই কার্য্যে দুঃখিত হইলেও তাহাকে কিছুই বলিলেন না। যাহা করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার আর কোন উপায় নাই; তা' বলিয়া ছোট ভাইটীকে তো ত্যাগ করা যায় না। এমনই কত কি বলিয়া নিজেদের প্রবোধ দিলেন। দু' দিনেই সব ঠিক্ হইয়া গেল। যাহারা নববধূ বেলাকে দেখিল, সকলেই একবাক্যে বলিল—এমন শান্ত, সুন্দর, শিক্ষিত বধূ ইহাদের বংশে আর একটীও আসে নাই।

বেলা দু'দিনেই সকলকে একান্ত আপনার করিয়া নিবিড় বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

সুধীরাকে একদিন নিরালায় পাইয়া সে তাহার পায়ের ধূলো লইয়া হাসিয়া বলিল—'দিদি, তোমার সেই স্যাণ্ডেলটা কই? দাও না আজ আমার পিঠে এক ঘা বসিয়ে।' তাহার বলিবার রকম দেখিয়া গম্ভীর প্রকৃতি সুধীরাও 'ফিক্' করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

* * *

সেদিন দুপুরে পাশের বাড়ীর লীনা আসিয়া সেজ বউ নীহারের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এ কথা সে কথার পর সে বলিয়া বসিল—'তা' বাপু সত্যি কথা বল্তে কি, সুধীরা বেলার পায়ের নখের যোগ্যও নয়। ওর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, দেখে নিও তুমি।'

নীহার হাসিয়া বলিল—'না বে না। বেলা সে রকম মোটেই নয়। শিক্ষিতা মেয়ে, এরা সব ঠিক্ মানিয়ে নেবে। সুধীরাকে আদপেই স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। এ ক'দিনেই সে সুধীরার সঙ্গে একেবারে গঙ্গা-যমুনার মত মিশে গেছে।'

লীনা বলিল—'তাই না কি! তা' তো হবেই। নইলে কি আর আই-সি-এস্ ফেলে থার্ড ক্লাসে পড়া স্বামীকে বরণ করে নেয়। এটা বেলার কম মহত্ত্ব নয় কিন্তু।'

নীহার বলিল—'নিশ্চয়!'

শ্রীহরিপদ গুহ

ভৌতিক গল্প
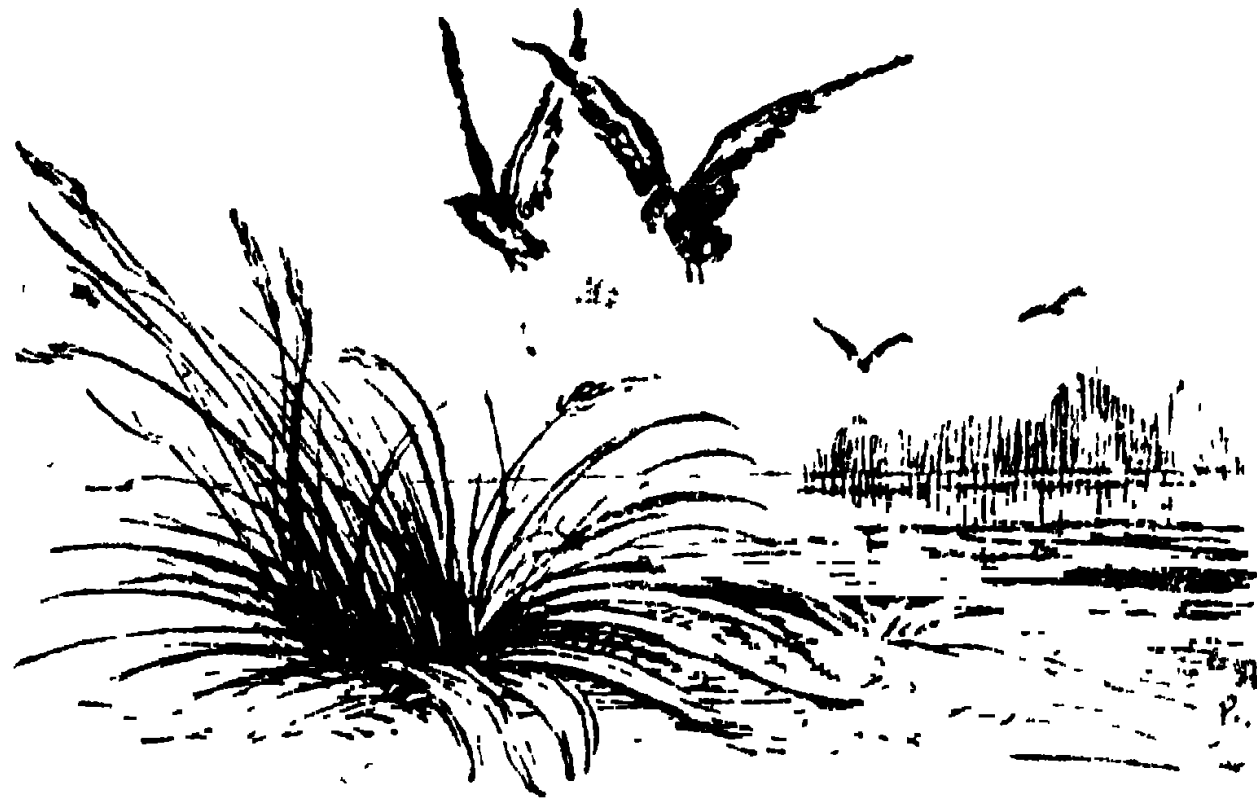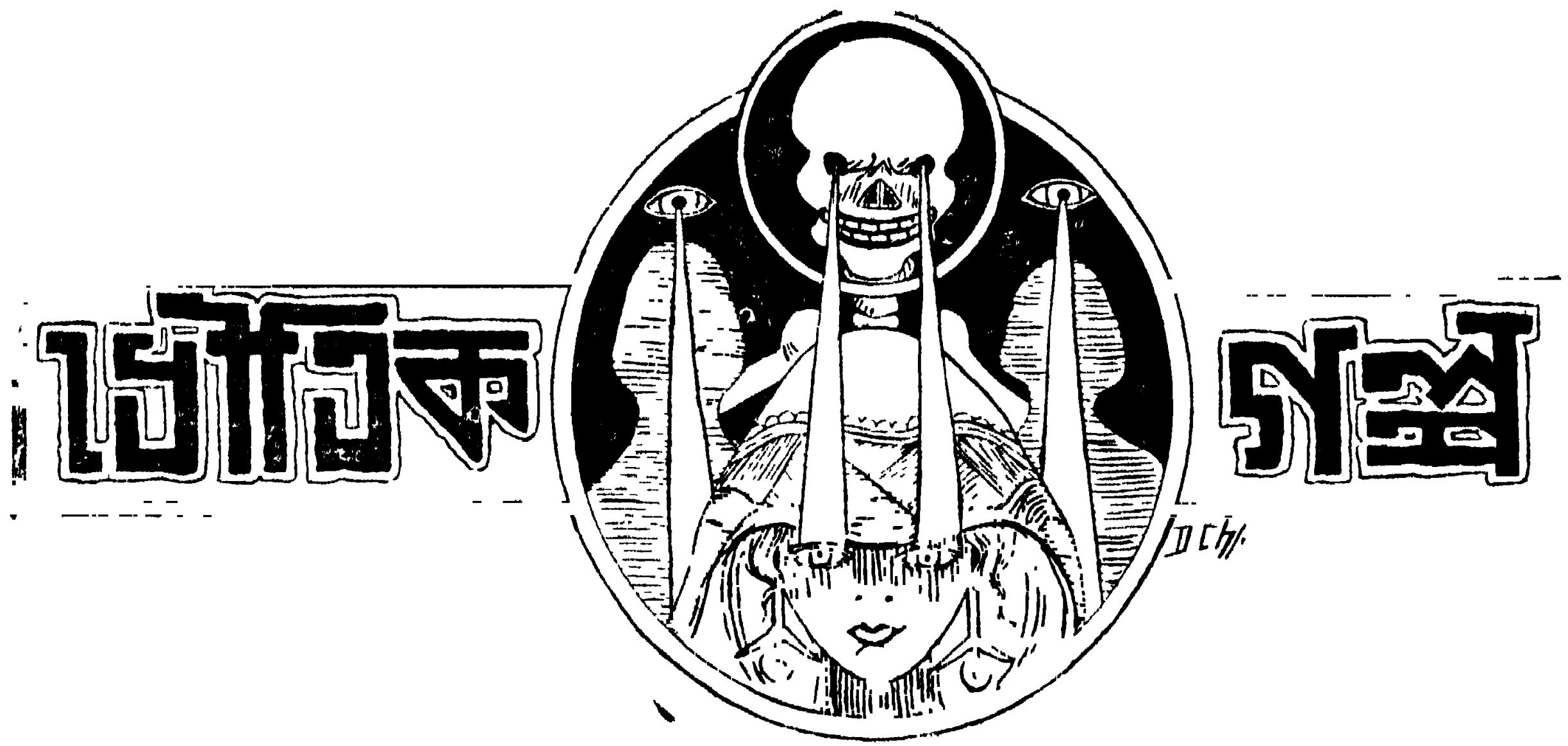
বাসর-ঘরে

শ্রীমতী সরযূবালা গুহ

গত চৈত্র মাসের 'গল্প-লহরী'তে 'বিয়ের রাতে' নামে যে গল্পটী বেরিয়েছে, এটা হচ্ছে তারই উপসংহার। সে গল্পটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে মগরার চারুবাবুর মেয়ে কমলার সঙ্গে যোগেশবাবু তার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছেন। বিয়ের দিন তিনি বর ও বরযাত্রী নিয়ে ট্রেণে করে মগরায় চলেছেন। কিছুক্ষণ চল্‌বার পরই একখানা মাল গাড়ীর সঙ্গে ট্রেণখানার ভয়ানক 'কলিশন' হয়। সেই ভীষণ ধাক্কায় তাঁদের গাড়ীখানা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কি কুক্ষণেই না তাঁরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন! একজন লোকও রক্ষা পেলে না। ওদিকে মগরায় কন্যা-পক্ষীয়েরা বরপক্ষদের বিলম্ব দেখে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। ষ্টেশনে সকলে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছেন। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে 'কলিশনে'র এই দুঃসংবাদটা শুনে মেয়ের বাপ একেবারে ভেঙে পড়লেন। দেরী দেখে সকলেই ষ্টেশনে এসেছিলেন, শুধু চারুবাবুর একজন জ্ঞাতি খুড়ো স্বরেনবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি চাকর পাঠিয়ে সকলকে ষ্টেশন থেকে ডেকে পাঠালেন; কারণ, বর এবং বরযাত্রীর দল তখন বড় একটা 'বাসে' করে সেখানে এসে পৌঁচেছেন। সংবাদ শুনেই সকলে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন। ছেলের বাপ ট্রেণ 'কলিশনে'র কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে বল্‌লেন যে, পরের ট্রেণ কখন আসবে তার কিছু ঠিক নেই, তাই তারা বাধ্য হয়ে একশ' টাকা ভাড়া দিয়ে 'বাসে' করে এসেছেন। চারুবাবু জানালেন—বেশ ভালই হয়েছে; 'বাস' ভাড়া তিনি দিয়ে দেবেন। তারপর বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হলো এবং বরের সঙ্গে কমলার বিয়েও হয়ে গেল। শুভ-দৃষ্টির সময় সে বরের দিকে ভাল করে চাইতে গিয়ে যেন তার কঙ্কালটাই শুধু দেখ্‌তে পেলে—সে ভয়ে একেবারে আঁতকে উঠে চোখ্ বুজলে। তারপর বর-কনেকে নিয়ে বাসর-ঘরে খুব আমোদ-আহ্লাদ চল্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে স্বরেনবাবু বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছাতের ওপর বরযাত্রীদের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। এরা সকলেই যে অশরীরি, তা' বুঝতে আর তাঁর বাকী রইল না। তারপর রাত গোটা চারেকের সময় যোগেশবাবু এসে কনের বাপ চারুবাবুকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিলেন। তিনি বল্‌লেন—ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই বর কনেকে নিয়ে যাবেন। চারুবাবু কিংবা তাঁর স্ত্রী কেউ এ অন্যায় প্রস্তাবে রাজী হলেন না। যোগেশবাবুও তাঁর জেদ ছাড়লেন না।

চেঁচামেচি শুনে বাসর-ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে বাইরে এল। কমলার হাতে একটা মাদুলী ছিল। বর সেটা খুলে ফেল্‌বার জন্য তাকে বারবার অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। কমলা কিছুতেই সেটা খুলতে রাজী হলো না। এদিকে পূর্ব দিক্‌টা তখন পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে। যোগেশবাবুও ছেলেকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিয়েছেন। বর তখন জান্‌লার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে একটা সরু লম্বা পা বাড়িয়ে রাস্তায় পড়ে একবারে ধোঁয়া হয়ে মিশিয়ে গেল। তার-পরের ঘটনা থেকে আমাদের এই গল্পের সুরু।

রাত্রের ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন বলে চারুবাবুর মনে হচ্ছিল। একটী মাত্র মেয়ে কমলা, তার বিয়ে এভাবে একটা প্রেতাত্মার সঙ্গে হওয়ায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়্‌লেন। স্ত্রী আকুল স্বরে বিলাপ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন। কমলা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যেতে লাগ্‌ল। বাসর-ঘরে যে সব মেয়েরা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বরের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিল। সকাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা চারদিকে এই অতি আশ্চর্য্য ঘটনাটা রটিয়ে দিলে। তখন ক্রমে ক্রমে পাড়ার লোকজন এসে চারুবাবুর বাড়ীতে জড়ো হতে লাগ্‌লেন। যার যা' মনে এলো মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। একজন বল্‌লেন—বেশ ভাল ওঝা এনে কমলাকে একবার দেখান। কথাটা কমলার মায়ের মনে খুব লাগ্‌ল, তিনি স্বামীকে বল্‌লেন—সত্যি, একবার ওকে দেখান দরকার। যে ভাবে ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে, শেষে কোন অকল্যাণ না হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেঁদে উঠ্‌লেন। আকস্মিক এই সব ব্যাপারে চারুবাবু কেমন যেন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কি যে করবেন, ভেবে কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পার্‌ছিলেন না। চাকরটাকে বল্‌লেন—তাঁর খুড়ো সুরেনবাবুকে একবার ডেকে দিতে। মনে মনে ভাব্‌লেন—তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, হয় তো কিছু সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন।

চাকরটাকে কিন্তু আর যেতে হলো না, সুরেনবাবু নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। সারা রাতের মধ্যে তিনি একটুও ঘুমুতে পারেন নি; চোখ মুখ একেবারে বসে গেছে। চারুবাবু তাঁকে ঘরে বসিয়ে যোগেশবাবুর এবং বর ও বরযাত্রী নিয়ে তাঁর বেগে চলে যাওয়ার কথা সমস্তই খুলে বল্‌লেন। তারপর বর কেমন করে লম্বা পা বাড়িয়ে বাসর-ঘর থেকে রাস্তায় পড়ে ধোঁয়া হয়ে মিশিয়ে গেল সে কথাও বল্‌তে ভুল্‌লেন না।

সুরেনবাবু হাস্‌লেন। বল্‌লেন—এ তবু ভাল, আমাকে তো একেবারে মেরে ফেল্‌তেই বসেছিল। ঘুম হচ্ছিল না; বিছানায় পড়ে ছট্‌পট্ কর্‌ছিলুম। উঠে বারাণ্ডায় এসে তোমাদের বাড়ীর ছাতের দিকে চেয়ে যা' দেখ্‌লুম, তা'তে ত আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তারপর দেখি বিকটাকার কতকগুলো মূর্ত্তি তোমাদের ছাতে দাঁড়িয়ে। প্রথমটা মনে হলো—হয় তো আমারই কোনরকম দৃষ্টি-বিভ্রম হয়ে থাক্‌বে। ভাল করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার দেখ্‌লুম—না, আমার দৃষ্টি-বিভ্রম তো নয়, একেবারে জলন্ত সত্য। একটা মূর্ত্তি আকাশ-প্রদীপের বাঁশের মাথায় উঠে লম্বা হাত বাড়িয়ে কি একটা পাখী ধরে তার রক্ত খেলে। এই না দেখে আমার বুকটা থরথর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মনে মনে আমি রাম নাম জপ কর্‌তে লাগ্‌লুম। ওদের মধ্যে কেউ হয় তো আমায় দেখে থাক্‌বে। একটু পরেই দেখি—ওরা লাফিয়ে আমার বাড়ীর ছাতে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি ভয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেল্‌লুম। তখন আমার যে কি অবস্থা ধারণাই তো কর্‌তে পারছ?

তারপর একটু পরেই বুঝ্‌লুম—আমাকে কে একজন পাঁজাকোলা করে উঁচুতে তুলে ধরেছে। তখন পেছন থেকে আর একজন বল্‌লে—দে শালাকে পুকুরে ফেলে।

আমি তো ভয়ে একেবারে হিম হয়ে গেলুম। পুকুরে আমায় ফেল্‌লে না বটে, কিন্তু এমন জোরে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলে যে, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে রইলুম। পিঠটা আমার এখনও বেদনায় টন্‌টন্ করছে।

সমস্ত ঘটনা শুনে চারুবাবু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে হতবাক্ হয়ে রইলেন। তারপর তিনি সুরেনবাবুকে

প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, আপনি ব্যাপারটা কিছু বুঝ্তে পারছেন ?

সুরেনবাবু একটু হেসে জোর দিয়ে বললেন—নিশ্চয়। ট্রেণ 'কলিশনে' ওরা সবাই মারা গেছে। মনে মনে খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল—তারই ফলে ভূত হয়ে এই সব কাণ্ড করে বসল।

চারুবাবু ললাটে করাঘাত করে বললেন—আমার এ সর্ব্বনাশ কেন করলে ওরা—আমি ত ওদের কোন ক্ষতি করি নি!

সুরেনবাবু দুঃখিত হয়ে বললেন—কি করবে, সবই অদৃষ্ট!

ঠিক সেই সময় কমলার মা ঘোমটা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে সুরেনবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—কাকাবাবু, আমার এ কি সর্ব্বনাশ হলো! মেয়েটার যে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হচ্ছে। যাতে ওর প্রাণটা রক্ষে হয়, সে চেষ্টা আপনারা করুন। যা' হবার তা' তো হয়ে গেছে।

সুরেনবাবু তাঁর সঙ্গে উঠে বাইরে গেলেন। কমলাকে ভাল করে দেখে, তার চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগলেন। তারপর তার জ্ঞান হ'তে বললেন—এখন কেমন লাগ্ছে দিদি ?

কমলা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চারিদিকে চাইতে লাগ্ল; তাঁর কথার কোন উত্তর দিলে না।

তিনি আবার বললেন—ভয় কি দিদি? তারা সব চলে গেছে।

কমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—গেছে? আঃ!

সুরেনবাবু তখন কমলার মাকে লক্ষ্য করে বললেন—যাও বৌমা, এবার একে ভাল করে চান করিয়ে দাও গে। যা' ব্যবস্থা করবার আমরা সব করছি।

চারুবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তখনই গ্রামের বিখ্যাত ওঝা নীলাম্বরকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

নীলাম্বর তখন দূরবর্ত্তী অন্য এক গাঁয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তার ফিরে আস্তে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর খবর পেয়ে বিকেলের দিকে সে চারুবাবুদের বাড়ী এসে উপস্থিত হলো।

সুরেনবাবু তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। যা' যা' ঘটেছিল, সব তিনি নীলাম্বরকে খুলে বললেন। সমস্ত শুনে সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল। সে ভাল করে মন্ত্র পড়ে কমলার গায়ে জল ও সর্ষে পড়া দিয়ে ঝেড়ে বললে—তার আকর্ষণ আর নেই এখন। তবে ভবিষ্যতে যাতে আর কোন উপদ্রব না হয়, সে চেষ্টা করা ভাল। তখন কি কতকগুলো ওষুধ বার করে একটা মাদুলীতে ভরে সেটা কমলার হাতে বেঁধে দেওয়া হলো।

তারপর কিছুদিন বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল। একটা দুঃস্বপ্নের মত সকলেই ব্যাপারটা ক্রমে ভুলে যেতে লাগ্ল। কমলার মুখেও আবার হাসি ফুটে উঠ্ল।

সুরেনবাবুকে তাঁর বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে কাশী যেতে হয়। সেখানে তাঁর একখানা দোতলা বড় বাড়ীও আছে। এ ঘটনার কিছুদিন পরে আবার তাঁর কাশীতে দরকার পড়ল।

যাবার আগের দিন তিনি নিরালায় বসে চারুবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলেন। একথা সে কথার পর বললেন—দিদির আমার বিয়ের কি করছ ?

চারুবাবু চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—ক'দিন থেকে আমিও সে কথা প্রায়ই ভাবছি। কি করা যায় বলুন তো?

সুরেনবাবু বললেন—বিয়ে তো হয় নি, ও একটা মিথ্যে স্বপ্নমাত্র। ধর্ম্মের দিক দিয়ে দেখ্তে গেলে ভূত এবং মানুষের সঙ্গে বিয়ে তো হতে পারে না। কাজেই সে বিয়ে একদম বাতিল। দিদির জীবনটা তো আর এ ভাবে নষ্ট করা চলে না। একটি সুপাত্র দেখে তার আবার বিয়ে দেওয়া যাক্।

চারুবাবু বললেন—বিয়ে কিন্তু এখানে হতে পারবে না; কাশীতে আপনার ওখানেই হবে। পাত্রকে কিন্তু আপনি আগেই ব্যাপারটা জানাবেন। পরে যেন এ নিয়ে কোন প্রকার কথা বা গোলোযোগ না হয়।

সুরেনবাবু বললেন—বেশ, তাই হবে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে।

সুরেনবাবু মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে এখানকার সংবাদ লন্ ও সেখানকার খবর দেন। তিনি যে একটা ভাল ছেলের সন্ধানে আছেন, তাও জানাতে ভোলেন না।

চারুবাবুর স্ত্রী মাঝে মাঝে স্বামীকে অনুযোগ করেন। বলেন—বুড়ো মানুষের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত না থেকে, নিজেও একটু-আধটু চেষ্টা কর। আমি যে আর মেয়ের মুখের দিকে চাইতে পারি না!

তারপর হঠাৎ একদিন সুরেনবাবুর চিঠি এলো। তিনি জানিয়েছেন—খুব ভাল একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটী বেনারস ইউনিভারসিটিতে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। তাকে সব কথা খুলেই বলেছি। সে কমলাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বিয়ের দিন এখনো স্থির করি নি। পত্রপাঠ মাত্র তোমরা সকলে এখানে চলে আস্‌বে। তারপর পরামর্শ করে সব ঠিক্ করা যাবে।

চিঠিখানি পড়ে খুসীতে চারুবাবুর বুক ভরে উঠ্‌ল। তিনি তাড়াতাড়ি গৃহিণীকে এ সংবাদটা শোনালেন। তাঁর মনেও আনন্দ আর ধরে না! সব বাঁধা-ছাদা হতে লাগ্‌ল। তারপর একটা ভাল দিন দেখে তাঁরা কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ছেলে দেখে চারুবাবুদের খুব পছন্দ হলো। সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল তাঁদের, ছেলেটীর বিনয় নম্র বচন। চেহারাও যেমন তার হৃষ্টপুষ্ট, তেমনই সে শক্তিশালী। নাম বিকাশ।

চারুবাবুও তাকে কমলার বিয়ের রাত্রে যা' যা' ঘটেছিল সব অকপটে জানালেন। বিকাশ হেসে বল্‌লে—সুরেনবাবুও আমাকে সব বলেছেন। তা'তে আমার দিক্ থেকে কোন আপত্তি উঠ্‌বে না। কিন্তু ভূতের সঙ্গে মানুষের বিয়ে, ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

তার চোখে মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি।

চারুবাবু গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—ঠাট্টা নয় বাবাজী, সত্যই ঐ রকম ব্যাপার ঘটেছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকের যে আকাঙ্ক্ষা থাকে, অনেক সময় মরণের পরও সেই বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে।

বিকাশ হাসি-হাসিমুখে বল্‌লে—আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু ভূত বর সেজে এসে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করে গেল, এ যেন কেমন আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তারপর বিয়ের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়ে দিন স্থির হয়ে গেল।

এই বিয়েতে কমলার মনে কিন্তু কোন আনন্দই হচ্ছিল না। ক্ষণে ক্ষণে সেই প্রথম বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ায় সে একটা কল্পিত আশঙ্কায় কেমন যেন কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ছিল। তার বুকটা কেন যে দুরদুর করে কাঁপ্‌ছিল তা' সে কিছুতেই বুঝ্‌তে পারছিল না। তার মুখখানি একেবারে কালিমাখা হয়ে গিয়েছিল। সকলে মনে মনে ভাব্‌লে—সারাদিন উপোসের জন্যেই বোধ হয় এমন হয়েছে, মুখখানা অত শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

নির্ব্বিঘ্নেই বিকাশের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। দু'-একজন ছাড়া প্রায় সকলেই খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেছে।

বাসর ঘরে তখন খুব আমোদ-আহ্লাদ চল্‌ছিল। তরুণীর দল বরকে নিয়ে গান ও হাসির প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিয়েছিল। কমলার মনটা তখন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এসেছিল। সে এখন স্বাভাবিকভাবেই সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা কইছিল।

বিকাশ বেশ ভাল গান গাইতে পারে। তার কয়েকখানা গানের পর তরুণীর দল তখন কমলাকে গান গাইবার জন্য ধরে বস্‌ল। সেও গাইবে না, তারাও কিছুতেই ছাড়বে না। অনেকক্ষণ হুটোপুটি গোলমাল চল্‌ল। বহু সাধাসাধনায় কমলা তখন একখানা গান গাইতে রাজী হলো।

কমলা বেশ ভালই গাইতে পারে। বিকাশ মুগ্ধ নেত্রে তার দিকে চেয়ে গান শুন্‌ছিল। হঠাৎ ঘরের গ্যাস লাইটটা 'ফস্' করে নিবে গেল। কে যেন অকস্মাৎ বিকাশের গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলে।

কাশীর মেয়েগুলো যে এ রকম অসভ্য তা' সে ভাবে নি। তার খুবই লেগেছিল। সে গালে হাত বুলুতে বুলুতে

বল্‌লে—ছিঃ, এ রকম অসভ্যতা করা কোন প্রকারেই আপনাদের উচিত হয় নি!

কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই কে আবার তার অপর গালে আর একটা চড় বসিয়ে দিলে। বিকাশ রাগে একেবারে ফেটে পড়তে লাগ্‌ল। বেশ একটু গম্ভীর কণ্ঠেই সে বল্‌লে—এ কিন্তু আপনাদের ভারি অন্যায় হচ্ছে।

তখন একটা ভীষণ অট্টহাসি শোনা গেল। সে হাসি যেন আর থাম্‌তে চায় না। তরুণীর দল হুড়মুড় করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বিকাশ সেই অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট দেখ্‌লে—একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে খিল্‌খিল্ করে হাস্‌ছে। তার চোখ দিয়ে যেন ছুটো আগুনের গোলা ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে। বুকের পাঁজরাটা একেবারে চূর্ণ—সেখান দিয়ে লাল টক্‌টকে রক্ত ঝরে পড়ছে। অত বড় সাহসী বিকাশেরও বুকটা যেন একেবারে ভয়ে অসাড় হয়ে এলো। সহসা কমলা—ও মা গো!—বলে একটা আর্ত্ত চীৎকার করে বহুদিন পরে আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল।

সকলে আলো নিয়ে ছুটে এল। তারপর কমলার চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতেই একটু পরে তার জ্ঞান ফিরে এলো। সে ভয়-বিহ্বল-নেত্রে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌ল। তার মা এগিয়ে এসে মেয়ের গায়ে মাথায় স্নেহের পরশ দিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগ্‌লেন—কি হয়েছে মা, কি হয়েছে?

অনেকক্ষণ পর কমলা আস্তে আস্তে বল্‌লে যে, সেবারের সে এখানে এসে তার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়েছিল।

অনেকে বল্‌লেন—ও সব বাজে কথা, দুর্ব্বল মস্তিষ্কে চিন্তার ফল।

সুরেনবাবু এসে বরের পাশে বস্‌লেন। বিকাশ সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌লে। তার দু' গালে স্পষ্ট আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেই দাগ দেখে কেউ আর তার কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

আরো গোটা দুই আলো জালিয়ে তখন সকলে মিলে বর-কনেকে ঘিরে বস্‌ল। বাসর-ঘরের সেই আনন্দটুকু কিন্তু আর ফিরে এলো না। কিছুতেই কমলার মুখে আর হাসি ফুট্‌ল না।

শেষ রাত্রের দিকে যে যেখানে বসেছিল, সেখানেই কেউ শুয়ে পড়্‌ল, কেউ বা বসে বসে ঢুল্‌তে আরম্ভ করে দিলে। দু'-একজনের বেশ জোরে জোরেই নাক ডাক্‌তে লাগ্‌ল। গ্যাসগুলোর বোধ হয় জল কিংবা কারবাইড্ ফুরিয়ে এসেছিল; সে গুলো শোঁ শোঁ করতে করতে হঠাৎ একসময় একেবারে নিবে গেল।

হঠাৎ বিকাশের ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় তার মনে হলো—কে যেন দু' হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। সে তড়াক করে উঠে বস্‌ল। স্পষ্ট সে অনুভব কর্‌লে—বরফের মত দু'খানা শক্ত হাত। তখন জোরে একটা ঝট্‌কা মেরে সে হাত দু'খানা দূরে সরিয়ে দিলে। একটু পরেই অদূরে দুটো আগুনের গোলা জলে উঠ্‌ল। বিকাশ স্পষ্ট দেখ্‌লে—সেখানে একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। তার চোখের কোটর থেকে দুটো আগুনের শিখা বেরিয়ে তাকে যেন পুড়িয়ে মার্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

বিকাশ সাহস সঞ্চয় করে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—কে তুমি? কি চাও এখানে?

কঙ্কালটা বিকট হাসি হেসে বল্‌লে—কে আমি? কি চাই? কার স্ত্রীকে তুমি বিয়ে করেছ জানো শয়তান! আজ দুটোকেই শেষ করে ফেল্‌ব—বলে সে আবার বিকট হাসি হেসে উঠ্‌ল।

সেই সময় বোধ হয় কমলারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সেও ওই কঙ্কালটা দেখে—ও মা গো!—বলে চেঁচিয়ে উঠে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল।

তার চীৎকারে অনেকেরই নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। তারা উঠে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। সুরেনবাবুর কাছে একটা 'টর্চ্চ' ছিল, তিনি সেটা জালিয়ে ধর্‌লেন। চারুবাবু ভেতরে ছিলেন, তিনি একটা হ্যারিকেন নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। ইতিমধ্যে গ্যাসগুলোতে জল এবং কারবাইড্ ভরে আবার সেগুলো জালান হলো।

বিকাশ সুরেনবাবুকে কঙ্কালের কথা সব বল্‌লে।

সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়্লেন। কমলার চোখে মুখে জল দিয়ে একটু বাতাস করতেই তার জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে এলো। ভয়-ব্যাকুল-দৃষ্টিতে সে চারদিকে যেন কা'কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

পরদিন কালরাত্রি। বর-কনেতে সেদিন দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে নেই। বিকাশ শুলে সুরেনবাবুর ঘরে, আর কমলা শুলে তার মায়ের কাছে। সে রাতটায় আর কোন উপদ্রব হলো না; বেশ ভালয় ভালয়ই কাট্‌ল।

আজ ফুলশয্যা।

ভাবী মিলন-আকাঙ্ক্ষায় বিকাশের হৃদয়ে আনন্দের তুফান উঠেছিল। সে আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করে মনে মনে বেশ একটা মায়াপুরী রচনা করছিল। কমলার মনে কিন্তু আদৌ সুখ ছিল না। কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে মাঝে মাঝে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

দোতলার একটা ঘরে বর-কনের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ঘরের দু' পাশের দু'খানি কোঠায় আর সকলের শোবার ব্যবস্থা হলো। বিকাশদের ঘরে বেশ ভাল একটা 'ডে লাইট্' খুব বেশী করে তেল ভরে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো—যেন রাত্রে ওটা নিবে না যায়। সুরেনবাবু তার বড় 'টর্চ্চ'টাও বিকাশকে দিলেন। বল্লেন—এটা বালিশের নীচে রেখে দাও—কি জানি যদি কোন দরকার হয়।

তারপর তিনি নিজে বেছে ভাল ভাল ফুল কিনে এনে বর-কনের বিছানাটি বেশ করে সাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বর-কনে যখন ঘরে শুতে এল, তখন দেখা গেল—শয্যায় একটাও ফুল নেই—তার পরিবর্ত্তে কে যেন কাঁটা দিয়ে সমস্ত বিছানা ভরিয়ে রেখেছে।

তখন সকলের মুখ ভয়ে একেবারে পাংশু হয়ে গেল। কমলার মা কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে দিলেন। তিনি বল্লেন—সময় থাকতে কেউ কিছু করছে না, ভূতটা এরপর যদি দু'জনকে মেরে ফেলে, তখন কি হবে?

সুরেনবাবুর বাড়ী হ'তে কিছু দূরেই একটা বস্তিতে কতকগুলো চীনাম্যান থাকত। তাদের মধ্যে কেউ মিস্ত্রীর কাজ করত, কেউ সিল্কের কাপড় বেচ্‌ত, কেউ বা অন্য কোন কাজ করত। সুরেনবাবুর পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক বল্লেন—শুনেছি ওখানকার একজন চীনাম্যান ভাল ভূত ছাড়াতে পারে। ভূতেরা না কি তার কাছে খুব জব্দ—সে একজন ওস্তাদ গুণীন্। একবার তাকে দেখালে হয় না?

চারুবাবু তখনই তাঁকে সঙ্গে করে সেই চীনাম্যানকে আন্‌তে গেলেন। তার নাম চঙ্‌থাই। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। খুব ভাল মানুষ। তখনই সে চারুবাবুর সঙ্গে চলে এলো। তারপর একেবারে তাকে বর কনের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হলো। পথে তাকে সমস্তই খুলে বলা হয়েছিল।

চঙ্‌থাই বেশ ভাল বাঙ্‌লা বল্‌তে পারে। সে বিকাশকে হেসে বল্লে—এ্যা, তুমি এমন জোয়ান হয়ে সে ক'খানা হাড়ের সঙ্গে লড়তে পারলে না! তারপর কমলার দিকে চেয়ে বল্লে—কি গো দিদিমণি, তুমি কোন্ বরটা চাও—সেটি, না এটি?

তার কথা বল্‌বার ধরণ দেখে সকলেই হোহো করে হেসে উঠ্‌ল।

চীনাম্যানটা তখন তার বাক্স খুলে অনেক রকম জিনিষ-পত্র বার করে বিড়বিড় করে তাদের ভাষায় কি সব মন্ত্র আওড়াতে সুরু করলে; আর হাতে দুটো মড়ার খুলি নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে ঠুকতে লাগ্‌ল। একটু পরেই ঘরের কোণ থেকে একটা কাতর ধ্বনি শোনা গেল—আঁ—আঁ।

চঙ্‌থাই সমানে সেই খুলি দুটো বাজাতে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে ওই গোঁয়ানীটাও যেন ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। সে তারপর একটা ছোট বেতের লাঠি বার করে অনবরত মেঝেতে পিটুতে সুরু করে দিলে। ঘরের কোণ থেকে তখন একটা বিকট চীৎকার উঠে বাড়ীটা কাঁপিয়ে দিতে লাগ্‌ল। সে যতই মেঝেতে আঘাত করে—চীৎকারটাও সমানে চল্‌তে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় সব

থেমে গেল। কে আকুল স্বরে বলে উঠ্ল—ছাড়, ছাড়, যাচ্ছি এখান থেকে—আর কখনো আমি আস্‌ব না!

চণ্ড্‌খাই তখন লাঠিটা তুলে রেগে আবার বিড়বিড় করে কি বল্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরেই দেখা গেল—ঘরের মেঝে থেকে একটা ধোঁয়া লম্বা হয়ে উঠে জান্‌লা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে মিশে গেল।

সে তখন হেসে বল্‌লে—এত সহজে যে ও চলে যাবে তা' আমি ভাবি নি কিন্তু।

সকলে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে তখন দুটো মাদুলীতে ওষুধ ভরে বিকাশ ও কমলার হাতে বেঁধে দিয়ে বল্‌লে—যাক্, আর তোমাদের কোন ভয় নেই; এবার তোমরা খুব আনন্দ কর।

চারুবাবু খুসী হয়ে চণ্ড্‌খাইকে দশ টাকার দু'খানা নোট উপহার দিতে গেলেন। সে জিব কেটে বল্‌লে—আমি তো এ জন্যে কোন টাকা নিই না বাবু—আমার গুরুর নিষেধ আছে।

এরপর থেকে আর কখনো কোন উপদ্রব হয় নি।

কমলার মা একদিন চণ্ড্‌খাইকে নিমন্ত্রণ করে এনে যত্ন-সহকারে তাকে নানারকম পিঠে খাইয়ে দিলেন।

কমলার মুখে আবার নতুন করে হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

শ্রীমতী সরযূবালা গুহ

দ্বাদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

য়্যাড্‌ভেঞ্চার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দু'খানা মোটরই প্রস্তুত।

স্বামী যুগকল্যাণ সহাস্য-মুখে বলিলেন, "যাত্রা পথটা যদিও বিভিন্ন, তথাপি মান্‌তে হবে অরু, আজ আমাদের রাজযোটক।"

অরুণিমা বিকশিত মুখে বলিল, "এ যোগাযোগ খুব সোজা; কারণ, সময় পেলে তুমি বা আমি নিজেরাই এটা তৈরী ক'রে নিতে পারি। ফেরার বেলায় যদি দু'খানাই একত্র গেটে এসে পৌছায়, তখন হ্যাঁ, বল্‌তে পার বটে।"

কল্যাণ মাথা দোলাইয়া বলিল, "না, তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই! যদিই বা এসে পড়ি, বল্‌বে 'মারকেটিং' সেরে সভার দোরে এসে ওঁৎ পেতে বসেছিলে—নয়, এমনি একটা কিছু।"

অরুণিমা বেশ একটু গম্ভীর হইতে চাহিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "চুরী যখন নিজের মুখেই ব্যক্ত, তখন আর ডিটেক্‌টিভের প্রয়োজন হয় না—কি বলো?"

কল্যাণ গোঁজ হইয়া মোটরে গিয়া 'ষ্টার্ট' দিল। অরুণিমা কুন্দ দন্তে অধর চাপিয়া বহুকষ্টে হাস্যরোধ করিয়া বলিল, "রাগ হ'লে ত তোমার নতুন কিছু রান্নার ফরমাস হয়—আজ কি?"

কল্যাণ গম্ভীর মুখে বলিল, "ফিরিই আগে, তবে ত খাওয়া।"

অরুণিমা বলিল, "অভিমান হ'ল, বেশ! এখন ত সময় নেই, বলে যাও—কোথায় গিয়ে মানভঞ্জন করব?"

গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া কল্যাণ বলিল, "কোথায় আর, হাসপাতালে।"

'ভোঁৎ' করিয়া মোটর বাহির হইয়া গেল। অরুণিমা এবার নিজের গাড়ীর 'ষ্টার্ট' দিয়া বেগে পূর্ব্বগামীর পথানুসরণ করিল। মোড়ের কাছ বরাবর আসিতে একটা মুটেকে ধাক্কায় ফেলিয়া, দুটো বিড়ালকে খোঁড়া করিয়া, শেষ বেশ একটা রুগ্ন কুকুরের বুকের উপর দিয়া স্বামীর গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া গলা বাহির করিয়া বলিল, "আমার জন্যে তুমিই যদি পার আরোগ্যশালাগুলো খুঁজে দেখো।"

বলা শেষ হইয়াছে, কাজেই আর দাঁড়াইবার আবশ্যক নাই। অরুণিমার গাড়ী প্রগতি-সভার উদ্দেশে ছুটিল।

কল্যাণ আপন-মনে বলিল, "যা' হোক্, নারীর জয় সর্ব্বত্রই।"

তবু তার কথাটা বাতাসেই শেষ হইয়া গেল; শেষের দিক্‌টা আমাদের কর্ণগোচর হইল না।

দুই

অরুণিমার বাড়ী আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। চঞ্চল উৎকণ্ঠায় সে গৃহে ফিরিতেছিল; কারণ, সভাগৃহ হইতে তাহাকে এক বান্ধবী টানিয়া নিজের নূতন আবাস দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। সেথায় প্রয়োজনীয় দু'-একটী খুঁটি-নাটি দেখাইয়া দিতে এবং তৈরী বাড়ী বিশেষ কোন ভাঙচুর না করিয়াও যে অতি প্রয়োজনীয় এ ক'টীর সমাধান হইতে পারে, তার 'প্ল্যান' প্রস্তুত করিতে রাত আটটা বাজিয়া গেল। কাজেই স্বামীর রহস্যচ্ছলে আসিবার মুখের কথাটা ও নিজের জবাব স্মরণ করিয়া সে বিশেষ একটু চিন্তিত হইয়াই ছিল।

বাড়ী ঢুকিয়া এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটি করিয়া সে কতই খুঁজিল, কিন্তু কোথাও যুগকল্যাণকে দেখিতে পাইল না। তখন রাজুয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যারে, বাবু আসে নি?"

রাজুয়া মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "কই, না ত, আমি ত দেখি নি।"

অরুণিমা বিশেষ একটু চঞ্চল হইল; বলিল, "গ্যারেজে দেখে আয়, নীল মোটরখানা এসেছে কি না।"

ছোকরা চাকর রাজুয়া তার প্রাণের খবর বুঝিল না; বলিল, "ঘরে বাবুই যখন এলেন না, মোটর আস্‌বে কোত্থেকে—সোফার ত সঙ্গে যায় নি।"

কথাটা অতি সত্য, কিন্তু অরুণিমার পক্ষে বিশেষ তীক্ষ্ণ লাগিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "তোকে যা' বলা হচ্ছে শুন্‌বি, না কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়োমী করবি? যত সব হয়েছে আপদ নিয়ে পোষা! দূর করে দেব সবাইকে একে একে।"

রাজুয়া তার নিজের ভুল বুঝিতে পারিল না; তথাপি গৃহিণীর রাগের মুখেও দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিল না—ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অল্প কতক্ষণ পরে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "মা মা, দেখে এলুম পুলিশের লোক বাবুর মোটরখানা কুলী দিয়ে ঠেলে নিয়ে আস্‌ছে।"

অরুণিমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তবে কি—ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সে নিজে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, রাজুয়ার কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই পথ দিয়া পুলিশ প্রহরী কুলীর সাহায্যে মোটরখানা ঠেলিয়া লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। বুকের ভিতর কি যেন এক আলোড়ন উপস্থিত হইল। অশ্রু সমুদ্র চোখের বালিয়াড়ির বাধা মানিতে চাহিল না, হুহু শব্দে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু পর লোকের সম্মুখে এ দুর্ব্বলতা সে বহুকষ্টে সাম্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিশ পদাতিক রামভজন আসিয়া দূর হইতে মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সাহাব 'মার্কেট'মে ঘুসা, বাকী নিকালা নেহি। বহুৎ দের দেখ্‌কে চারো তরফ ঢুঁড়া, বাকী মিলা নেহি।"

বহুকষ্টে গলা ঝাড়িয়া অরুণিমা প্রশ্ন করিল, "মার্কেট'সে কোন 'এ্যাক্‌সিডেণ্ট'কা খবর—"

মাথা নাড়িয়া পদাতিক বলিল, "নেহি সরকার। এইসা কোন খবর হোনেসে হল্লা উঠ্‌ যাতা। হাম্ কুছ্ শুনা নেহি।"

অরুণিমা তথাপি কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিল না। আপাততঃ বকশিস্ দিয়া লোকগুলাকে বিদায় করিয়া সে ফোনের নিকটে আসিয়া 'গাইডে'র পাতা উল্টাইতে

লাগিল। ইচ্ছা, বিভিন্ন হাসপাতালে খবর লইয়া জানিবে স্বামীর সংবাদ তারা রাখে কি না।

তিন

অরুণিমা দ্বিতীয় বার বাহির হইয়া যাইবার পর যুগকল্যাণ বাড়ী আসিল। চুলগুলা অসম্ভব রকম রুক্ষ, পোষাকে ধূলা—ঠিক যেন পাগলের চেহারা।

রাজুয়া গেটের সম্মুখে হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়াছিল। বাবুকে এ ভাবে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি কোথায় ছিলেন, মা-জী আপনাকে কত খুঁজ্‌লেন।"

যুগকল্যাণ চঞ্চল হইয়া বলিল, "তিনি কোন্ ঘরে?"

ছোকরা মাথা নাড়িয়া বলিল, তিনি ত বাড়ী নেই, আপনাকে খুঁজ্‌তে গেছেন।"

"আমায় খুঁজ্‌তে! কোথায়?"

"তা' ত জানি না বাবু, আপনি এলেন না দেখে কত ভাবলেন, তারপর কা'কে যেন ফোন্ করলেন, শেষে বেরিয়ে গেলেন।"

হঠাৎ বিস্মৃতি ঠেলিয়া বৈকালের পরিহাস উক্তির কথাটা স্মরণে আসিল। যুগকল্যাণ ফিরিয়া চলিল। রাজুয়া বলিল, "আবার কোথায় যাবেন, মা ফিরে এলে আবার কত ভাব্‌বেন হয় ত।"

যুগকল্যাণ ধমক দিয়া বলিল, "চোপ্ রও।"

রাজুয়া ভয়ে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যুগকল্যাণ আবার ফিরিয়া আসিল। রাজুয়ার দিকে একটা আধুলী ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এবার ফিরে এলে বল্‌বি আমি তারই খোঁজে হাসপাতালে যাচ্ছি। আর—"

'ভোঁ'ৎ' করিয়া অরুণিমার মোটর গেটের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। সোফার সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওই যে মা—বাবু।"

ক্রন্দমানা অরুণিমা ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া মেঘ ও রৌদ্রভরা মুখে বলিল, "কোথায় ছিলে? ছি, এমনি ক'রে আমায় কাঁদাতে হয়!"

যুগকল্যাণ বলিল, "চলো বসি গে, পরে সব বল্‌ছি। ভয়ানক পিপাসা, আগে এক কাপ চা নিয়ে এস।"

চার

উভয়ে ড্রইংরুমে একখানা সোফার উপর মুখোমুখী করিয়া বসিলে, যুগকল্যাণ বলিতে লাগিল, "মার্কেটিং' সেরে মোটরে জিনিষ-পত্র রেখে মনে পড়ল আমার চুরুট ফুরিয়েছে, তাই ফিরে আর একবার 'মার্কেটে' ঢুক্‌লুম।"

অরুণিমা হাসিয়া বলিল, "ও চুলোর ছাইগুলো ছেড়ে দাও। ওর জন্যেই ত আজকের দিনটা এমন উৎকণ্ঠায় কাট্‌ল।"

মুখের চুরুটটা দূরে ফেলিয়া দিয়া যুগকল্যাণ বলিল, "এই দিলাম, আর কখন এ ছাই খাবো না।"

অরুণিমা হাসিয়া বলিল, "তা' বলে রেগে আমার ঘর-দোর পুড়িও না।"

ধূমায়মান চুরুটটাকে কার্পেটের উপর হইতে তুলিয়া পিক্‌দানে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া অরুণিমা আবার বলিল, "থাক্, তারপর কি হ'ল?"

"মার্কেটে প্রফেসার ভবেশবাবুর সঙ্গে দেখা। সস্ত্রীক 'মার্কেটিং'-এ এসেছিলেন। যেমন পাগল তিনি, তেমান পাগল তাঁর স্ত্রী। কিছুতেই ছাড়লেন না, বল্‌লেন, 'না, ফাঁকী দেবার চেষ্টা করো না যুগকল্যাণ, আমরা তোমায় নিয়ে যাবই যাব'।

"বল্‌লুম, 'আমার মোটর রয়েছে, ঘুরিয়ে আনি। আপনি বল্‌ছেন, যাব। এত আমার সৌভাগ্য।'

"কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমাকে কয়েদ ক'রে স্বামী স্ত্রী পরম আনন্দে মোটরে গিয়ে চড়লেন। স্ত্রীটী আরও পাকা। বল্‌লেন, 'তোমায় ছেড়ে দিই, আর তুমি পালিয়ে বাঁচো। ও সব হবে না; এখুনি আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতেই হবে।'

"ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলে বল্লুম, 'কিন্তু আমার গাড়ীভরা জিনিষ-পত্র, অন্ততঃ গিয়ে সেখানা নিয়ে আসি।'

"প্রফেসার বাধা দিলেন। বল্লেন, 'সে যাবে না হে, যেমন রেখে যাচ্ছ, ফিরে এসে তেমনি পাবে—পুলিশ রয়েছে কি করতে।'

"বুঝ্লুম, এদের বোঝাতে যাওয়া নিষ্ফল। আমাদের চেনা সেপাই, যে প্রতি পার্ব্বণে পার্ব্বণী নিতে আসে, সে 'বিটে' রয়েছে। কাজেই অগত্যা—

"বাড়ীতে তাঁর একমাত্র মেয়ে শান্তা। বেশ 'এক্সপার্ট' —যেমন গান-বাজনায়, তেমনি বুদ্ধি-চাতুর্য্যে। দেখ্লুম, মা-বাপকে সেই চালিয়ে নিয়ে ফেরে।

"প্রফেসার দুঃখ করে বল্লেন, 'এমন মেয়ে, এর বর জোটাতে পাচ্ছি না। 'তিয়াত্তর', আর কি বল্‌ব।'

"আমার কলেজে তাঁর কাছে পড়বার সময়ের রোল নম্বর ছিল 'তিয়াত্তর'। দেখ্লুম, তিনি এখনও সেটা ভোলেন নি।

"প্রফেসার গৃহিণী বল্লেন, 'পাত্র একটী জুটিয়ে দিতে পার কল্যাণ। আমাদের যা' কিছু সবই ত শান্তার; তা' ছাড়া, রূপে-গুণে, বিদ্যায় কিছুতেই শান্তা আমাদের অনুপযুক্ত নয়।'

"বহুকষ্টে আমি বিবাহিত জানিয়ে পালিয়ে এলুম। দেখলুম, গাড়ী নেই। মাথা ঘুরে গেল। ছুটে পুলিশ-ষ্টেশনে গেলুম। সেখানে সেপাই তখন ছিল না। ডায়েরী করিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরেছি। তারপর তোমার সব জানা।"

অরুণিমা বলিল, "তা' বিয়ের প্রস্তাবটা নিজেই করে এলে পারতে। শান্তা পর ত নয়, আমারি মামাত বোন্। কিছুদিন তার হাতে তোমায় ছেড়ে দিয়ে আমি পেন্সন নিতুম।"

স্বামী স্ত্রীর গালে একটা টোকা মারিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

অরুণিমা বলিল, "এ দিকে আমার বিপদ জান না। তোমার গাড়ী সেপাই যখন পৌঁছে দিয়ে গেল, ভাব্লুম—নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে; তাই তোমার কথানুযায়ী হাসপাতালে সন্ধান নিলুম। তারা খবর দিলে, 'আপনি নিজে এসে দেখে যান—'এক্সিডেণ্টে'র রোগীর নিজের নাম-ধাম বল্‌বার মত চৈতন্য অনেক সময় থাকে না।'

"গিয়ে দেখলুম, তোমার মতই একজন বেডিং-এ পড়ে আছে। শুনলুম, 'রান্ ওভার'; সাত জায়গায় আঘাত। শুনলুম, আশা বড় কম। হয় ত আসতুম না, কিন্তু সেখানকার 'এটেণ্ডিং সার্জ্জেন' কিছুতেই শুনলেন না, জোর করে গাড়ীতে এনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন।"

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
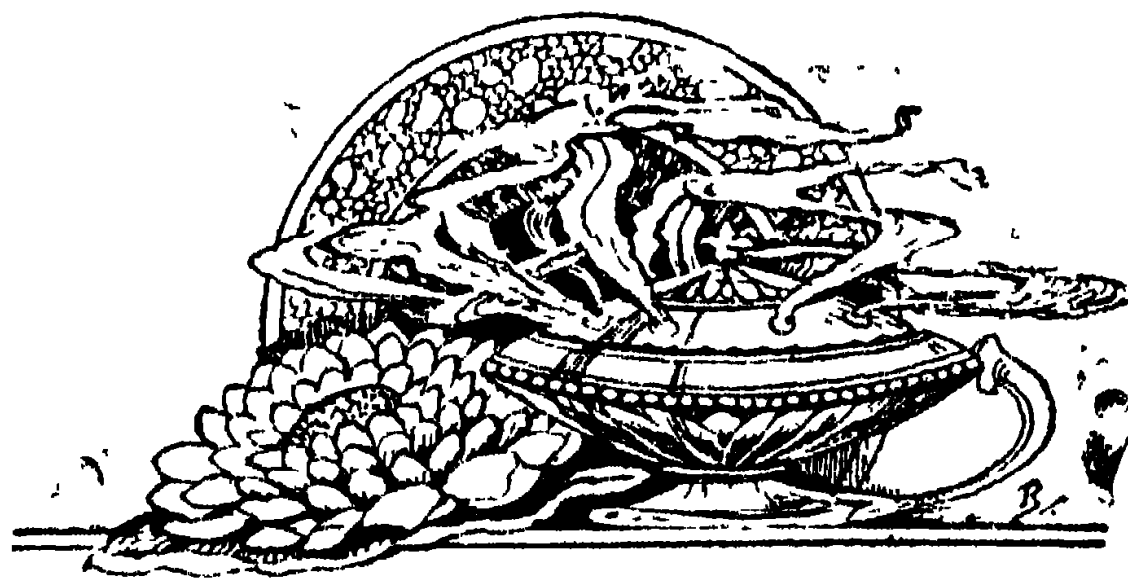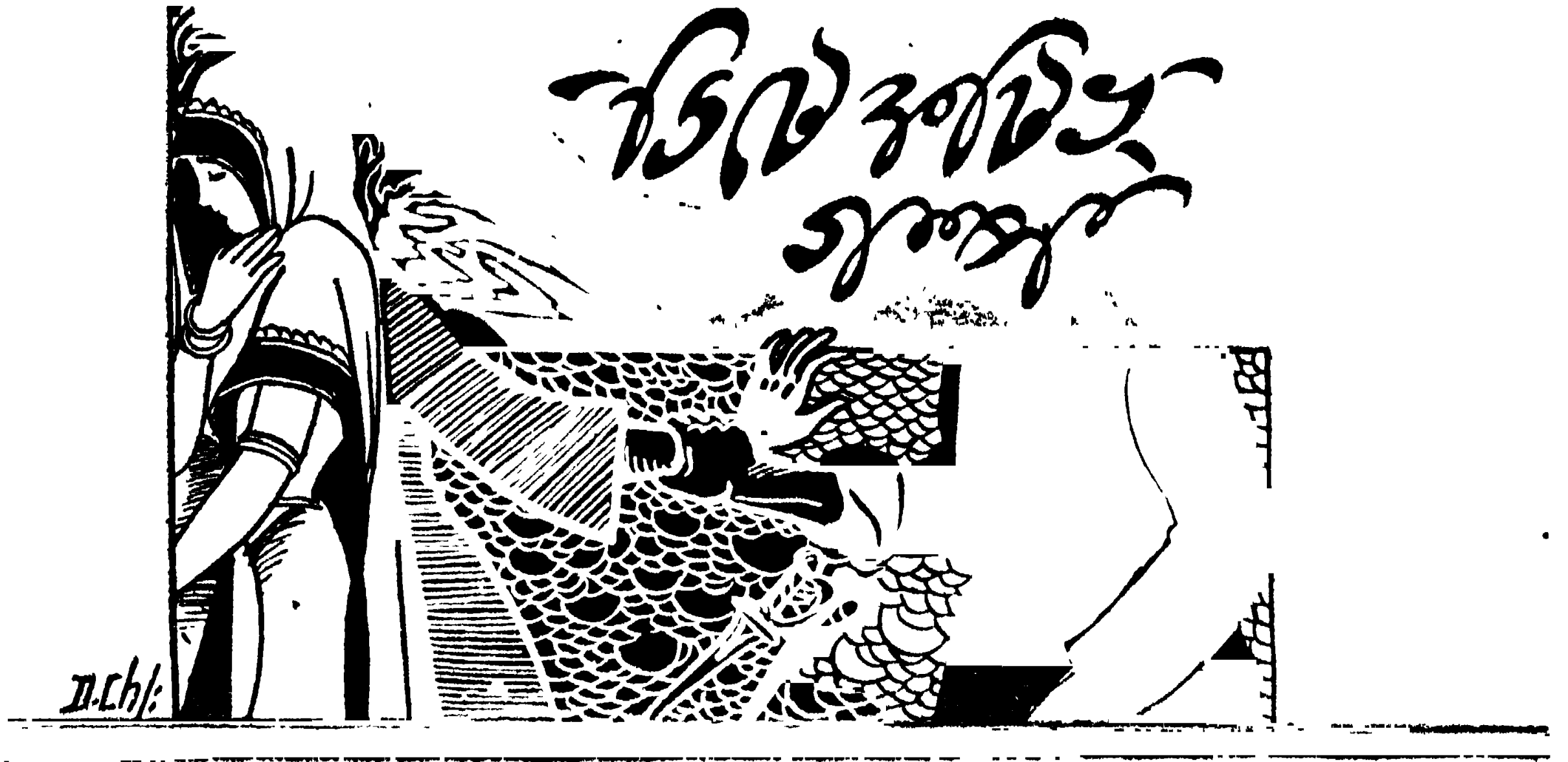
পদ্মদহ বিল

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

প্রভাতের আলো তখনও পরিস্ফুট হইয়া বিশ্ব বক্ষ স্পর্শ করে নাই। ঘুম ভাঙ্গাইয়া পত্নী উষা, আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ্ মিহিরকিরণের উপস্থিতির সংবাদ জানাইল। তন্দ্রা-বিজড়িত চক্ষু দুইটা মুছিতে মুছিতে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম। পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কতক্ষণ এসেছে সে?

—এই ত মিনিট কতক হলো। মধু তাঁকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে আমায় খবর দিলে। এত সকালেই যখন এসেছেন, তখন দরকার বোধ হয় খুব বেশী।

—নিশ্চয়ই! কোথায় হয় ত কি ঘটেছে, তারই সন্ধানে যাচ্ছে, তাই আমায় ডাকতে এসেছে। এ সব কাজে এতদিন ধরে আমিই ত ওর সঙ্গে ঘুরেছি, এই ক'টা মাস শুধু আলাদা বাড়ীতে থাকার দরুণ আর বড় একটা যাওয়া হয়ে উঠে নি। আর এর জন্যে দায়ী হচ্ছ শুধু তুমি।

মৃদু হাসিয়া উষা বলিল—তা' ত বলবেই। বন্ধুর মত চিরকুমার থাক্‌তেই পারতে, নিঝঞ্ঝাটে তা' হ'লে এই সব করে সারা জীবন কাটত। সত্যি, ভালও লাগে তোমাদের এই সব কাজ? কোথায় কে খুন কর্লে, কোথায় কে চুরী কর্লে কেবল তাদের খবর নিয়ে বেড়াতে? আর যেন সংসারে কোন কাজ নেই।

কি যেন বলিতে যাইতেছিলাম, দ্বারপ্রান্তে ভৃত্য মধু মিহিরের ত্রস্ত আহ্বান জানাইল; অনুচ্চারিত বাণী ওষ্ঠের বাহিরে না আনিয়াই কক্ষের বাহিরে আসিলাম। চলিতে চলিতে একবার ফিরিয়া পত্নীর প্রভাত আলোক স্পর্শে জাগ্রত কমলের মত সদ্য ঘুমভাঙ্গা মুখের দিকে চাহিলাম।

—উষা, চা-টা একটু শীগ্‌গির পাঠাও, হয় ত এখনি বেরোতে হবে।

খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে অন্যমনে চাহিয়া মিহির সিগার টানিতেছিল। প্রভাতের শুভ্র আলোক তার সুশ্রী সুন্দর ছিপছিপে দীর্ঘ ঋজু দেহটীর উপর পড়িয়া তাকে দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই সিগারটা মুখ হইতে নামাইয়া কহিল—সুপ্রভাত! অনেকক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছি। বৌদি'র আঁচলের ছায়ায় ঢাকা পড়ায় আজকাল অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে আস্‌তে তোমার কিছু সময় বেশী লাগে দেখ্‌ছি। এ রকম ত আগে কখনও হয় নি।

কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। সত্যই বিবাহের পর হইতে

এই কয়টা মাস তাহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূরে থাকায় আমার পুরাতন অভ্যাসের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার কথার উত্তরে কিছু জানাইবার আগেই সে বলিল—একটা কাজে এখনি আমায় বাইরে যেতে হবে; তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পার্বে? দু'-চারদিন সেখানে থাক্‌লে তোমার কাজের কোন ক্ষতি হবে কি? তা' হলে অবশ্য—

—তা' হলের দরকার হবে না মিহির। আমি তোমার সঙ্গে যাব। উপস্থিত যে ক'টা 'কেস্' আমার হাতে আছে, তারা সব সাধারণ রোগী, অবস্থা কারোই মারাত্মক নয়। কমলবাবুকে বলে যাব, তিনিই তাদের দেখ্‌বেন।

মিহির কহিল—বেশ, কিন্তু সময় বেশী নেই আর। এক ঘণ্টা পরেই ট্রেণ। এর মধ্যে তৈরী হতে পারবে ত?

—নিশ্চয়! এই ক'টা দিনে কি আমি এতই অপদার্থ হয়ে পড়েছি এই তোমার ধারণা?

—মোটেই নয়। কিন্তু আর কথা নয়, তুমি যাও, তৈরী হয়ে এস। আমি ততক্ষণ আজকার কাগজটা দেখে নিই—যেটা এইমাত্র পাওয়া গেল।

ক্ষণ পূর্ব্বে ভৃত্য আসিয়া সদ্য-আগত সংবাদ-পত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছিল। মিহির আগ্রহভরে সেখানা দেখিতে লাগিল। আমি ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

দুই

কিসের অনুসন্ধানে চলিয়াছি, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। ট্রেণ ষ্টেশনের সীমা ছাড়াইলে বন্ধুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপারটা কি, এইবার শুনি।

মিহির তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল। এই গাঢ় চিন্তা-শীলতা ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনই ভাবে চিন্তায় কাটাইয়া দিয়া তারপর যখন অতি সহজে সে গভীর রহস্যপূর্ণ ব্যাপারগুলার সমাধান করিয়া দিত, তখন বিস্ময় এবং সম্ভ্রমপূর্ণ চিত্তে বহুদিন ভাবিয়াছি, কি করিলে এই মস্তিষ্ক, এই প্রতিভার অধিকার পাওয়া যায়—আর ঐ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিবেচনা শক্তি! এ-পর্য্যন্ত সর্ব্ব কার্য্যে ছায়ার মত আমিও ত তাহার সাথী, কিন্তু তবুও তাহার মধ্যকার এই অনন্যসুলভ বস্তুগুলার কণিকামাত্র লাভেও ত সক্ষম হইলাম না। কিন্তু না, এই যে অপূর্ব্ব ক্ষমতা এ ভগবানের দান—সকলে তাহা পাইবার অধিকারী হইতে পারে না। জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফলে এক-একটা বিশেষ শক্তি সঙ্গে লইয়া কেহ কেহ জগতে আসে। এ পার্থক্য তাঁরই সৃষ্ট।

আমার কথায় চকিত হইয়া মিহির চাহিল—ও তোমায় বুঝি সে কথা এখনও জানাই নি। আচ্ছা, শোন তা' হলে।

ইচ্ছা করিয়াই আমরা দুইজন এই জনহীন কামরাটায় উঠিয়াছিলাম। তথাপি স্বভাবসুলভ সতর্কতায় মিহির একবার তৃতীয় প্রাণীহীন সেই কামরাটার চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া লইল। তারপর বলিল—এখান থেকে ক'টা ষ্টেশন পরে জামনগর বলে একটা জায়গা আছে। বছর দশ বার আগে নগেন্দ্র চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক সেখানে বাস কর্ত্তে আরম্ভ করেন। শোনা যায়, আগে ইনি বেহার অঞ্চলে কোথায় কি কাজ কর্ত্তেন। লোকটী বেশ ধনী। সংসারে একটী মাত্র মেয়ে ভিন্ন তাঁর আর কেউ নেই। মেয়েটীর বয়স এখন বছর সতের হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তাঁর? সেইখানেই যাচ্ছ ত?

—সেখানেই। কিন্তু কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মাথা দুলাইয়া মিহির পুনরায় বলিল—হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি সেখানেই। হয় ত আরও একটা জায়গায়ও যাব। কিন্তু কথাটা আমার এখনও শেষ হয় নি। যা' বল্‌ছিলুম—

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিলাম—আর বাধা দেব না, বলো।

—হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক ওখানে বাস কর্ত্তে আসবার আগেই ঐ গ্রাম এবং তার সংলগ্ন আর ক'টা গ্রামের তিনি ভূস্বামী হয়েছিলেন। মানে, বাকী খাজনার দায়ে ঐ সম্পত্তিটা যখন নীলাম হয়, সেই সময় কিছু সস্তা দরে নগেন চৌধুরী ওটা কিনে নেন। তারপর থেকে তিনি ওখানেই বাস কচ্ছেন।

—কিন্তু তাঁর কি হয়েছে তা' ত বল্‌লে না ?

স্মিতমুখে একবার ভাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া মিহির বলিল—অশোক, ব্যস্তবাগীশ স্বভাবটা আর তোমার বদলাল না দেখ্‌ছি। শেষ পর্য্যন্ত বল্‌তে দাও।

আমরা দু'জনেই হাসিলাম। মিহির তাহার কাহিনী আবার আরম্ভ করিল—নগেনবাবু ওখানে থাক্‌বার বছরখানেক পরে হঠাৎ তাঁর এক বন্ধু তাঁর বাড়ীতে আসেন। হয় ত তিনি ক'দিনের জন্য অতিথি হয়েই এসেছিলেন। কিন্তু কেন বলা যায় না, তিনিও ওখানকার অধিবাসী হয়ে গেলেন। নগেনবাবু তাঁর সম্পত্তির কতকাংশ এই লোকটীকে ভাগে বন্দোবস্ত করে দিয়ে কাছেই একটী বাড়ীতে তাঁকে রাখলেন। নগেনবাবুর মত তাঁর এ বন্ধুটীও বহুদিন হতে বিপত্নীক। এই লোকটীর নাম জীবন দত্ত। হত হয়েছেন তিনি, আর হত্যাকারীরূপে ধরা পড়েছে তারই একমাত্র সন্তান রমেন্দ্র দত্ত।

—তাঁরই সন্তান, আশ্চর্য্য ত !

—খুবই আশ্চর্য্য। তার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা'তে সেই যে প্রকৃত দোষী এটা সকলেই বুঝ্‌বে, কিন্তু—

সাগ্রহে প্রশ্ন করিলাম—কিন্তু কি মিহির ?

অল্প হাসিয়া মিহির কহিল—কিন্তু তুমি ত জানো, সাধারণ লোকের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার সব সময় মিল হয় না। জিনিষটা অন্যে যে ভাবে দেখে, আমি ঠিক্ সে ভাবে দেখতে পারি না। তারপর আর একটা কথা—যে সব ব্যাপারগুলো বাইরে থেকে খুব সহজ সরল বলে মনে হয়, আমি জানি সেগুলোই হয় সব চেয়ে জটিল, দুর্ব্বোধ্য। অপরাধী বলে যাদের ধরা হয়, যাদের বিপক্ষে প্রমাণ খুব সহজেই পাওয়া যায়, অনেক সময় তারা হয় একেবারেই নির্দ্দোষ। এই যে ছেলেটীকে পিতৃহন্তা বলে ধরা হয়েছে, ঘটনা শুনে একে সকলেই দোষী বলে স্থির করে নেবে—কিন্তু ভেতরে কি রহস্য আছে, কে জানে! যাই হোক্, ঘটনাটা এখনও সব বলা হয় নি তোমায়।

—হ্যাঁ, বল্‌তে আরম্ভ কর। কবে হয়েছে এটা ?

—কাল। কাল বিকেলে। কি কাজে বাইরে থেকে এসে জীবনবাবু সঙ্গী চাকরটীকে বলেন—তাঁর আর একটা কাজ আছে, সেটা শেষ করে একবারে বাড়ী ফিরবেন—এই বলে বাড়ীর দরজা হতেই তিনি আবার ফিরে যান। সেই সময় তাঁর ছেলেও বাড়ীর মধ্যে থেকে বাইরে আসে, আর তার বাবা যেদিকে গেছে, সেই দিকে চল্‌তে আরম্ভ করে। তাদের চাকর রাঘব বলেছে যে, দেখে তার বোধ হয়েছিল, সে তার বাবাকে অনুসরণ করেই চলেছে। ছেলেটীর হাতে একটা বন্দুক ছিল।

—বন্দুক ?

—হ্যাঁ, বন্দুক। কিন্তু এটাও জানা গেছে, ঐ রমেন ছেলেটির শিকারের সখ খুব বেশী। বন্দুক হাতে পাখী মেরে বেড়াতে তাকে প্রায়ই দেখা যায়।

—তারপর ? খুন হয়েছে কোথায় ?

—খুন হয়েছে যেখানে, সেখানটাকে ওখানকার লোকেরা পদ্মদহ বলে। একটা জলা জায়গা। খুব বড় একটা বিল। নগেন চৌধুরী আর জীবন দত্ত দু'জনকার বাড়ীর খুব কাছেই এই বিলটা। এই বিলের ধারে কাল সূর্য্যাস্তের কিছু আগে ঐ পল্লীরই একটী মেয়ে একটা বকুল গাছতলায় ফুল কুড়োচ্ছিল। হঠাৎ কথার শব্দ পেয়ে সে চেয়ে দেখে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জীবনবাবু আর তাঁর ছেলের মধ্যে খুব ঝগড়া হচ্ছে। এমন ভাব তাদের যে, ঝগড়া থেকে মারামারি হওয়াও অসম্ভব নয়। তারপর ছেলের হাতে রয়েছে বন্দুক। মেয়েটী এই দেখে ভয় পায়। কাছেই তাদের বাড়ী; সে বাড়ী চলে আসে। এসে তার মাকে এই কথা বলে। ঠিক্ সেই সময়ই রমেন বাইরে থেকে তাদের ডাকে। মেয়েটীর বাবা ভুবনবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন—রক্তাক্ত হাতে রমেন দাঁড়িয়ে। ভুবনবাবুকে সে বলে—তার বাবা ভয়ানক আহত হয়ে বিলের ধারে পড়ে আছেন। সে একা তাঁকে নিয়ে যেতে পারছে না। ভুবনবাবু যদি তাকে একটু সাহায্য করেন।

তারপর তাঁরা দু'জনে বিলের নিকটে আসেন।

জীবনবাবুর দেহে গভীর আঘাতের দাগ। বন্দুকের তলা দিয়ে আঘাত কর্লে সে রকম দাগ হওয়া বিচিত্র নয়। এই আঘাতেই তিনি মারা গেছেন। পুলিশ রমেনকেই হত্যা-কারী বলে ধরেছে।

কয় মুহূর্ত্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম—তোমার ধারণা ছেলেটী নির্দ্দোষ?

হস্তস্থিত সিগারটা ধরাইয়া লইয়া মিহির কহিল—যতক্ষণ না সেখানে যাচ্ছি, ততক্ষণ কোন কথাই বল্‌তে পাচ্ছি না। তবে ওখানকার অনেক লোক, যেমন চৌধুরী, তারপর তাঁর মেয়ে লেখা দেবী, এঁদের সকলের ধারণা রমেন্দ্র নির্দ্দোষ। আমাদের ইনস্‌পেক্টর বন্ধু মণি রায় এখন ওখানেই আছে। জমিদার কন্যা লেখা দেবীর অনু-রোধে সেই আমাকে ওখানে যেতে বলেছে। আজ বেলা দশটার পর 'করোনার' কোর্ট হবে। আমার ইচ্ছে, তার আগেই সেখানে উপস্থিত হওয়া। রমেন কি বলে সেটা আমার শোনা দরকার।

—ট্রেণ ক'টায় পৌছবে সে ষ্টেশনে?

—ন'টা পঞ্চাশ। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমাদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব বোধ হয়। শুনেছি ষ্টেশন থেকে ও জায়গাটা বেশী দূর নয়।

তিন

আমরা যখন 'করোনার' কোর্টে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দশটা বাজিয়া কয় মিনিট মাত্র হইয়াছে। অপরাধীর কাঠগড়ায় অবস্থিত রমেন্দ্রকে তখন সর্ব্ব প্রথম প্রশ্ন করা হইতেছে—কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এই মৃত ব্যক্তির অনুসরণ কর?

জনতাবহুল স্থানটীর মধ্যে কোনও মতে একটু জায়গা করিয়া লইয়া দুই বন্ধু বসিয়া সোৎসুক নয়নে রমেন্দ্রের দিকে চাহিলাম। ছেলেটীর বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী নয়। সবল সুস্থ দেহ। সুশ্রী আকৃতি। উদ্বেগও দুশ্চিন্তার সংঘাতে কিছু ম্লান।

প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া সহজভাবে সে উত্তর দিল—না, তাঁকে অনুসরণ আমি করি নি—এমন কি, তাঁকে দেখতেও পাই নি। আমি তার আগের দিন রাত্রে কোলকাতা যাই আমার একটী বন্ধুর কাছে। কথা ছিল সাত-আটদিন সেখানেই থাকব; কিন্তু গিয়ে দেখি সে বন্ধু বাড়ী নেই। দু'দিন আগে তার অসুস্থ মাকে নিয়ে পুরী চলে গেছে। আমি তার পরদিনই ফিরে আসি। বাবা তখন বাড়ী ছিলেন না। আমি ফিরে এসেছি, এও তিনি জান্‌তেন না।

প্রশ্ন হইল—তারপর?

—বাড়ী ফিরে একটু চা খেয়ে বন্দুক নিয়ে আমি শিকারে যাই। বিলের ধারে এসে একটা শিস্ শুনতে পেয়েছিলুম—আমার বাবা ও আমার মধ্যে দূর হতে পরস্পরকে ডাকবার জন্য এটা ছিল একটা সাঙ্কেতিক শব্দ।

প্রশ্ন হইল—এর কারণ?

—সে আমি জানি না। কিন্তু বাবা আমায় বলে রেখে-ছিলেন—এই রকম শিস্ শুন্‌তে পেলেই আমি যেন তখনই শব্দ লক্ষ্য করে যাই, আর আমার কখন দরকার হলে যেন ঐ রকম শিস্ দিয়ে তাঁকে ডাকি।

—ভাল। তারপর?

—তারপর শিসের শব্দ পেয়েই আমি ছুটে বিলের দিকে যাই। বাবা কাছেই ছিলেন। আমি জানতুম, তিনি আমাকেই ডাক্‌ছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, আমায় দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন—তুমি কেন এলে?

আমি বল্লুম—আপনি কি আমায় ডাক্‌ছেন না?

তিনি বললেন—না, তোমায় নয়।

তারপর সেখানে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। ক্রমে সেটা বেশ একটা ঝগড়ায় পরিণত হয়। দু'জনেই আমরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলুম।

প্রশ্নকারী বলিলেন—তুমি স্বীকার কর্‌ছ তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়?

—হ্যাঁ হয়।

—এর কারণ কি?

—সে কথা আমি বল্‌ব না।

—তুমি জান একথা তোমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

—জানি, কিন্তু বলতে পারব না।

—তারপর কি হ'ল বলো।

—তারপর আমি ফিরে আসি। কিন্তু একটু এসেই একটা ভয়ানক চীৎকার শুন্‌তে পাই। মনে হয় সেটা আমার বাবারই গলার স্বর। আমি ছুটে তাঁর কাছে আসি। দেখি, তিনি রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছেন। আমি দু'হাতে তাঁকে ধরে তুলি। আমার হাত রক্তে লাল হয়ে যায়। কি ভয়ানক!

উচ্ছ্বসিত অশ্রু প্রবাহে রমেন্দ্রের কথা যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

—তারপর?

কণ্ঠ সংযত করিয়া কয় মুহূর্ত্ত পরে সে আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—বাবার অবশ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমি ভয় পেয়ে ছুটে চলে আসি কা'কেও ডাক্‌বার অভিপ্রায়ে। ওখান থেকে আসতে সব প্রথমেই পড়ে ভুবনবাবুর বাড়ী। আমি তাঁকেই ডেকে নিয়ে ফিরে যাই—কিন্তু তখন বাবার মৃত্যু হয়েছে।

—তুমি প্রথম যখন গেছলে, তখন কি তিনি বেঁচে-ছিলেন, কোন কথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ বলেছিলেন, কিন্তু কথাটা আমি বুঝতে পারি নি—শুধু 'তান' এই কথাটা শুনতে পেয়েছিলাম।

—তুমি তখন সেখানে কিছু দেখেছিলে?

—হ্যাঁ। প্রথম যখন আসি, তখন খানিকটা দূরে কি একটা জিনিস, সম্ভবতঃ একটা জামা, সবুজ রং তার, পড়ে আছে দেখি। কিন্তু তখন সেদিকে লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা আমার নয়—তাই ভাল করে দেখি নি। তারপর যখন ভুবনবাবুকে নিয়ে আসি, তখন আর সেটা দেখ্‌তে পাই নি। হয় ত কেউ সেটা সরিয়ে ফেলে থাক্‌বে।

রমেন্দ্রকে এরপর আর কোন প্রশ্ন করা হইল না। পুলিশ তাহাকে বাদীরূপে সহরে লইয়া চলিল। বাহিরে আসিতেই ইনস্‌পেক্টর মণি রায়ের সহিত মিহিরের দেখা হইল। মিহিরকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে কাছে আসিয়া মণিবাবু বলিলেন—তোমারই প্রতীক্ষা কচ্ছি। চলো, হোটেলে যাই।

—কোথায় হোটেল?

—কাছেই। আমি সেখানেই আছি; তোমার জন্যে একটা ঘরও ঠিক করে রেখেছি।

—ধন্যবাদ বন্ধু! তারপর খবর কি বলো?

বিজ্ঞভাবে মণীন্দ্র কহিল—খবর আর কি, 'কেস'টা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—ছেলেটাই মেরেছে ওর বাপকে, যে কোন কারণেই হোক্। আমি প্রথম থেকেই বল্‌ছি সেই কথা। কিন্তু মেয়েদের স্বভাব জান ত—কারও কথা তারা কাণে তুল্‌তেই চায় না, তাদের ধারণা তারা যা' বুঝছে সেটাই ঠিক, আর যা' কিছু সবই ভুল।

সল্প হাসিয়া মিহির কহিল—হ্যাঁ, মেয়েদের ঐ একটা ভয়ানক দোষ—কিন্তু উপস্থিত কোথায় এটা তোমার চোখে পড়ল?

—সেই কথাই ত বলছি। এখানকার জমিদারের মেয়ে লেখা দেবী, তার ধারণা রমেন্দ্র কখনই দোষী নয়, যে করে হোক্ তাকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন কর্ত্তে হবে। আবদার দেখো।

আমি এতক্ষণ নীরব ছিলাম। মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া এবার কহিলাম—বড় মানুষের মেয়ে কি না, আবদার একটা ধরলেই হ'ল। তিনিই বুঝি মিহিরকে আনিয়েছেন?

—হ্যাঁ। তাঁর ধারণা মিহির সর্ব্বশক্তিমান ভগবানেরই প্রায় সমান। সে একবার চেষ্টা কল্লেই ছেলেটার নির্দ্দোষিতা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে পড়বে।

খানিকটা দূরে কয়েকটা উচ্চশীর্ষ দেবদারু গাছের ঘন পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া একখানা অনতিবৃহৎ দ্বিতল বাড়ী দেখা যাইতেছিল। মিহির বলিল—ঐ বুঝি সেই হোটেল? বাঃ, বেশ বাড়িটা ত! এ রকম জায়গায় এমন হোটেল মিলবে, এ আমি আশা করি নি কিন্তু।

—হ্যাঁ, হোটেলটা মন্দ নয়। জামনগর জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসেন। হোটেলের ব্যবস্থা তাই ভাল।

আমরা তখন হোটেলের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। দ্বার সান্নিধ্য হইতে একবার ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মিহির বলিল—আমরা এখানে আসবার আগেই দেখছি

লেখা দেবী এখানে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বিস্মিত মণীন্দ্র প্রশ্ন করিল—কি করে জান্‌লে তিনি এখানে এসেছেন ?

—ঐ দরওয়ানটীকে দেখে, যে তাঁর সঙ্গে এসেছে।

হোটেলের বারান্দায় উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ হিন্দুস্থানীর দিকে মিহির অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

মণীন্দ্র বলিল—ও যে জমিদার বাড়ীরই দরওয়ান হবে এ কি করে বুঝ্‌লে ? ও ত অন্য কেউও হতে পারে।

—সম্ভব নয়। ওর পোষাক দেখেই বোধ হচ্ছে, ও কোন বড়লোকের বাড়ীর চাকর। এ গ্রামে সে রকম সম্ভ্রান্ত লোক আর কেউ নেই—যার বাড়ীর চাকর-দরওয়ানের পোষাক এ রকম জমকাল হওয়া সম্ভব।

—কিন্তু ও যে লেখা দেবীর সঙ্গে এসেছে, এই বা তুমি জান্‌ছ কি করে ? হতে পারে ও আমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে এসেছে।

—তা' হলে আমাদের দেখ্‌তে পেয়েও ও এতক্ষণ চুপ করে বসে থাক্‌ত না। যে খবর এনেছে, সেটা কাছে এসে বল্‌ত। চলো, ভেতরে যাওয়া যাক্।

আমাদের সাড়া পাইয়া হোটেলের ম্যানেজার বাহির হইয়া আসিলেন। মিহিরের পরিচয় মণীন্দ্রের মুখে পূর্ব্বেই তিনি জানিয়াছিলেন। সমাদরে আমাদের পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া চলিলেন। মিহির প্রশ্ন করিল—ওপরে কেউ কি আমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন ?

সচকিতে তাহার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে ম্যানেজার বলিলেন—এ কথা আমার আগেই আপনাকে জানান উচিত ছিল ; কিন্তু একবারেই ভুলে গেছি। ক্ষমা কর্ব্বেন। এখানকার জমিদার চৌধুরী-মশায়ের—

—মেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন ত ? চলুন, তাঁর কাছে যাই।

গভীর বিস্ময়ে ম্যানেজার একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া নীরবে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

আমাদের জন্য যে ঘরখানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সম্মুখের বারাণ্ডায় একখানা হাল্‌কা বেতের চেয়ারে বসিয়া নিতান্ত বিমর্ষভাবে যে তরুণীটী অদূরস্থ সোপানের দিকে চাহিয়াছিল, সেই যে লেখা দেবী ইহা বুঝিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। আমাদের দেখিয়াই চেয়ার ছাড়িয়া মেয়েটী উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার আমার, একবার মিহিরের মুখের দিকে চাহিয়া সুকোমলকণ্ঠে কহিল—আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে মিহিরবাবু, কে অশোকবাবু আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

অল্প হাসিয়া আমি কহিলাম—অশোকবাবুকেও আপনি জানেন ?

ব্যগ্রভাবে মেয়েটী কহিল—জানি বই কি। মিহিরবাবুর প্রত্যেক কাজের সঙ্গেই যে তাঁর নাম জড়ান থাকে।

—ঠিক বলেছেন আপনি, অশোক আমার ডান হাত, কিম্বা তার চেয়েও বেশী। ও না হলে আমার—

মিহিরের কথা শেষ হইবার আগেই সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লেখা কহিল—আপনিই তা' হলে মিহিরকিরণ রায়—এখনকার মধ্যে সব চেয়ে কার্য্যক্ষম খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ ? আর ইনিই নিশ্চয়—

—অশোক বসু, আমার প্রিয় বন্ধু, সংসারের মধ্যে সব চেয়ে আপনতম। কিন্তু মিস্ চৌধুরী, ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্ত্তা বল্লেই বেশ ভাল হ'ত না কি ?

সংকোচ বিজড়িত কণ্ঠে লেখা কহিল—আমার অন্যায় হয়ে গেছে এখানে আপনাদের আটকে রাখা। আসুন, ঘরে আসুন।

তাহার অনুসরণ করিয়া অদূরস্থ যে কক্ষে আমরা প্রবেশ করিলাম, তাহার চারিধারে একবার চোখ বুলাইয়া লইতেই এই ছোট সহরটীতে অবস্থিত এই নিতান্ত ক্ষুদ্র হোটেলটীর অধ্যক্ষের রুচি ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। কিছু আশ্চর্য্যই হইলাম। এ রকম স্থানে যে এমন একটী ঘর পাওয়া যাইবে, কল্পনাও করিতে পারি নাই। প্রয়োজনীয় মূল্যবান আসবাব-পত্রে গৃহটী সুন্দররূপে সজ্জিত। এ বাড়ীটীর চারিধারে মুক্ত প্রান্তর। জানালা দিয়া চাহিলেই তাই শুধু চোখে পড়ে নয়ন-জুড়ান শ্যামলিমার রাশি। মাঠের পর ঘন বনানী। একধারে সেই পদ্মদহ বিল। স্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট অগণিত শতদলে সমাচ্ছন্ন রহিয়া সে তাহার

পদ্মদহ নাম সার্থক করিয়াছে। দীপ্ত রবিকরে উহা বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মুগ্ধ নয়নে সেইদিকে চাহিয়াছিলাম। মিহিরের সহাস কণ্ঠস্বর আমার চমক ভাঙ্গাইল—অশোক, তোমার কৈশোর জীবনে তোমার মধ্যে যে কবিত্বের বিকাশ দেখা গেছল, এখনও সেটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি মনে হচ্ছে। তুমি ডাক্তারের কাজ ছেড়ে দিয়ে যদি কাব্যচর্চ্চা কর, তা' হলে তোমার খুব নাম হবে এ আমি জোর করে বল্‌তে পারি।

ফিরিয়া তাহার প্রফুল্ল দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম—না বন্ধু, তোমার এ ধারণা ভুল। এত কাল ধরে তোমার সহকারী হয়ে থাকায়, আর নিজের ডাক্তারী বিদ্যার আওতায় চাপা পড়ে, কাব্যলক্ষ্মী আমার মধ্য হতে অনেক দিন আগেই বিদায় নিয়েছেন। তবু এ স্থান এত সুন্দর যে, দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। তোমার ডিটেক্‌টিভ প্রাণও হয় ত এ জায়গার সৌন্দর্য্য দেখে তৃপ্ত না হয়ে পারবে না।

—তৃপ্ত আর মুগ্ধ দুটো শব্দের অর্থ এক নয় বন্ধু। কিন্তু থাক্‌ এখন এ সব কথা। মিস্‌ চৌধুরী আমায় কি বল্‌তে চান, তাই শুনি।

আমরা উভয়েই অদূরে উপবিষ্টা তরুণীর দিকে চাহিলাম। মেয়েটী সুন্দরী। বেশভূষা অনাড়ম্বর হইলেও যথেষ্ট মূল্যবান। দেখিলেই তার পিতৃ-ঐশ্বর্য্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মিহিরের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সে কহিল—আমি আপনাকে আমার রমেন দা'র সপক্ষ হয়ে কাজ কর্ত্তে অনুরোধ করছি। মিষ্টার রায়, যে যাই বলুক, আমি জানি সে কখনও এ কাজ করে নি! এ সে কিছুতেই কর্ত্তে পারে না!

—কিন্তু প্রমাণ যে সবই তার বিপক্ষে।

ব্যাকুল আগ্রহে লেখা কহিল—সেই জন্যেই ত আপনার সাহায্য চাই। আমার বিশ্বাস, আপনি চেষ্টা কর্লে'ই সে যে নির্দ্দোষ, এ কথা প্রমাণ কর্ত্তে পারবেন। এ আপনাকে কর্ত্তেই হবে মিষ্টার রায়। আমি জানি, আপনাকে পেয়ে অনেক সময় অনেক নির্দ্দোষী শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

কিছুক্ষণ মিহির কথা কহিল না। কয় মিনিট ধরিয়া কি ভাবিয়া তারপর লেখার দিকে চাহিয়া কহিল—সে যে এ কাজ করে নি, এ কথা এত জোর করে আপনি বল্‌ছেন কি বিশ্বাসে? নিশ্চিত কিছু ত আপনার জানা নেই। তবে—

তার সপ্রশ্ন নয়নের দিকে চাহিয়া সহজ দৃঢ়স্বরে লেখা কহিল—না, নিশ্চিত কিছু জানি না; তবে তাকে আমি খুব ভালরকমই চিনি। আজ দশ বছর হতে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী। তার প্রকৃতির কোন কিছু আমার কাছে অজানা নেই। আবার বল্‌ছি—সে এ রকম ভয়ানক কাজ কিছুতেই কর্ত্তে পারে না! তারপর খুন হয়েছেন যিনি, সেই জীবন কাকাকে রমেন দা' যে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত। জগতে ঐ কাকা ছাড়া তার ত আর কেউ ছিল না। তাঁকে সে খুন কর্বে—অসম্ভব!

—যেটা লোকে অসম্ভব বলে মনে করে, সংসারে সেই জিনিষটাই বেশী সম্ভব হয় মিস্‌ চৌধুরী। রাগের বশে মানুষ তার একান্ত প্রিয়তমকে হত্যা করেছে, এমন ঘটনা কিছু বিরল নয়। এঁদের দু'জনকার মধ্যে খুব একটা ঝগড়া হয়েছিল এ কথা ত রমেন অস্বীকার কর্ত্তে পারে নি। তা' ছাড়া, সে বিবাদ কেন হয় এই বা সে বলে না কেন?

—আমি জানি, আমি জানি মিষ্টার রায়, কেন ওঁদের বিবাদ। কেনই বা রমেন দা' সে কথা প্রকাশ কর্চ্ছে না, আমি জানি।

সজল চোখে মেয়েটী কথা কয়টা উচ্চারণ করিল।

—আপনি জানেন মিস্‌ চৌধুরী?

—জানি। আমাকে নিয়েই তাঁদের এ ঝগড়া। আর এ নূতন নয়, আজ ক' বছর ধরেই চলে আসছে।

অন্ধকার-বিজড়িত মুখে মণীন্দ্র বলিল—এ কথা ত আপনি আমায় বলেন নি মিস্‌ চৌধুরী। পুলিশের কাছে কথা গোপন করা আপনার খুবই অন্যায় হয়েছে।

মণীন্দ্রের কথায় লেখা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। উদ্বেগের

ছায়'পাতে তাহার সুশ্রী মুখখানি ম্লান দেখাইতে লাগিল। মিহির কহিল—আপনি বলে যান মিস্ চৌধুরী। মণি, ওঁকে বলতে দাও।

ত্রস্ত নয়নে একবার মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে বলিতে লাগিল—আমি জানি, এই একটা বিষয় ছাড়া তাঁদের দু'জনের মধ্যে আর কোন বিষয়ে কখনও কথান্তর মাত্র হয় নি। শুধু এই একটা বিষয়। আমি জানি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সেদিনও এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বচসা হয়, আর সেই জন্য রমেন দা' ঝগড়ার কারণ কি, সে কথা প্রকাশ করে নি—তার মধ্যে আমার নাম আছে শুধু এই জন্যে।

—বুঝ্তে পাচ্ছি, কিন্তু ঝগড়ার হেতুটা আপনি এখনও ত বলেন নি মিস্ চৌধুরী।

লেখার সুগৌর মুখখানা ক্ষণেকের জন্য রক্তিম হইয়া উঠিল, হয় ত কোন নিগূঢ় কুণ্ঠায়। মুহূর্ত্ত দ্বিধার পর বেশ স্পষ্টভাবেই সে কহিল—জীবন কাকার ইচ্ছে ছিল তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু রমেন দা' তা'তে একবারেই অসম্মত। এই নিয়েই কিছুকাল হতে তাঁদের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে।

মণীন্দ্রের মুখে বিস্ময়ের রেখা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কি একটা বলিলও যেন। সেদিকে কাণ না দিয়া পূর্ব্বের মতই প্রশান্ত সহজভাবে মিহির কহিল—আপনার রমেন দা'র এ আপত্তির কারণ কি জানেন?

—জানি। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে থাকায় আমরা দু'জন দু'জনকে ঠিক আপন ভাই-বোনের মতই ভালবাসি—অন্য ভাব কখনও আমাদের মনে আসে নি। তা' ছাড়া, বয়সও আমাদের প্রায় এক।

—এ জেনেও জীবনবাবু তাঁর ছেলেকে বিয়ের জন্য বল্তেন, এত বড় অদ্ভুত!

মিহিরের দিকে চাহিয়া লেখা বলিল—ঠিক বলেছেন আপনি, এ তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল! হয় ত আমায় বড় বেশী স্নেহ কর্ত্তেন বলেই এ ইচ্ছা তাঁকে এত অধীর করে তুলেছিল।

—আপনার বাবা? তাঁরও কি এই রকম ইচ্ছা?

—না না, তিনি এতে একটুও সম্মত ছিলেন না। জীবন কাকার সঙ্গে একথা তাঁর অনেকবার হয়ে গেছে। তবুও কাকা তাঁর ছেলেকে এ জন্যে বারবার বল্তেন। তাঁর বোধ ধারণা ছিল যে, শুধু রমেন দা'র অসম্মতিই এ বিয়েতে একমাত্র বাধা।

মিহির আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বলিল—বেলা যথেষ্ট হয়েছে মিস্ চৌধুরী। আপনি তবে এখন ফিরে যেতে পারেন। আজ আপনাকে আমি শুধু এইটুকু বল্তে পারি যে, আপনার রমেন দা'র যে দোষ নেই তা' আমি প্রমাণ করে তাকে শীঘ্রই আপনাদের কাছে ফিরিয়ে এনে দিতে পারব।

—সত্যি, সত্যি বলছেন মিষ্টার রায়?

ব্যাকুলভাবে চেয়ার ছাড়িয়া লেখা মিহিরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধকণ্ঠে মিহির কহিল—মিথ্যা আশ্বাস আমি কা'কেও দিই না মিস্ চৌধুরী।

মেয়েটীর ঘন পক্ষ্মবেষ্টিত দীর্ঘায়ত চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল। অন্তর্নিহিত উচ্ছ্বাসের আঘাতে হাওয়ায় কাঁপা গোলাপ পাপড়ীর মত তার আরক্ত ঠোঁট দু'টা কাঁপিতে লাগিল। কোমল কণ্ঠে মিহির বলিল—আমি আপনাকে বৃথা আশ্বাস দিই নি, নিশ্চিন্ত হয়ে আপনি বাড়ী যান। হাঁ, আপনার বাবার সঙ্গে কখন দেখা হবে বল্তে পারেন?

মাথা দুলাইয়া লেখা কহিল—না, ডাক্তার বোধ হয় সে অনুমতি দেবেন না।

—ডাক্তার! ডাক্তার কেন? তিনি কি অসুস্থ?

—খুবই অসুস্থ। অনেকদিন হতেই তাঁর শরীর খারাপ। কিন্তু কাল এই ঘটনাটা শুনে পর্য্যন্ত যেন একবারেই ভেঙে পড়েছেন। জীবন কাকা তাঁর খুবই বন্ধু ছিলেন। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু, এতে বাবার কষ্ট যে অত্যন্ত বেশী হবে এ অসম্ভব নয়। তবু কাল থেকে তিনি যে রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, দেখে আমার বড় ভয় হচ্ছে।

লেখার চোখ দু'টী আবার আর্দ্র হইয়া উঠিল।

—ও, আমি এ কথা জান্তুম না। আচ্ছা, এখন আর

তবে তাঁকে বিরক্ত করব না মিস্ চৌধুরী। আপনি এবার যেতে পারেন। নমস্কার।

—নমস্কার। আপনার কথার ওপর নির্ভর করেই আমি চললুম মিষ্টার রায়।

লেখাকে বিদায় দিয়া আমরা পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিলাম। মিহিরকে উদ্দেশ করিয়া মণীন্দ্র কহিল—এ কি অন্যায় তোমার মিহির, অকারণ মেয়েটীকে আশ্বাস দিলে কেন? জানো যখন কিছু কর্ত্তে পারবে না—

—কে বল্লে কিছু কর্ত্তে পারব না?

ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মণীন্দ্র কহিল—আমি বল্ছি! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রমেন খুনী—তুমি ত গায়ের জোরে তাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ কর্ত্তে পারবে না। হ্যাঁ, অনেক 'কেসে' তোমার অনেক শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে জানি—কিন্তু সব সময় যে তোমার ধারণা অভ্রান্ত হবে, এও ত সম্ভব নয় মিহির।

—নিশ্চয় নয়! ভুল সকলেরই হয়—তবে এবার হয় নি। আমি বলছি—ছেলেটী নির্দ্দোষ।

—এইখানে ঘরের মধ্যে বসেই তুমি ঠিক কর্লে যে, নির্দ্দোষ। মিহির, এবার থেকে তুমি জ্যোতিষী হয়ে পড়ো, আরও নাম কর্ত্তে পারবে।

আমার সারাদেহ জ্বলিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের বিদ্রূপের হাসিতে ভরা মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা কঠিন কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মিহির কহিল—জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করবার সুযোগ পাই নি, কাজেই জ্যোতিষী হয়ে নাম কর্ত্তে পারব এ কথাটা তোমার ঠিক্ বলা হ'ল না মণি। কিন্তু ঘরে বসেই আমি অনেক কিছু দেখ্‌তে পাই। আমি যা' কিছু করি, তা'তে আমায় ঘরের বাইরে খুব অল্পই যেতে হয়। কিন্তু যাক্ এখন এ সব। চলো, নীচেয় গিয়ে দেখি এখানকার খাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম।

টেবিলের উপর হইতে হ্যাট্‌টা তুলিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে মণি কহিল—কাল সকালের আগে আর আমি এখানে আস্‌তে পার্‌ব না। আমার অন্য কাজ আছে।

—বেশ্। মণি, তোমার ক্ষুরখানা বড় খারাপ হয়ে গেছে, সারতে দিও কিম্বা নতুন ক্ষুর একটা কিনে নিও।

মণিবাবু কয় পা আগাইয়াছিলেন, মিহিরের কথায় সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—কে বল্লে আমার ক্ষুর খারাপ হয়ে গেছে?

আমিও আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম; তবে খুব বেশী নহে। আমার বন্ধুর সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা যে কত বেশী, তাহা আমার অজানা নহে। মণীন্দ্রের বিস্ময়-ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া অল্প হাসিয়া মিহির কহিল—তোমার 'সেভ' করবার ভঙ্গী দেখেই বল্‌ছি। না, ত্রুটী কিছু হয় নি; তবু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে, এক টানে কাজ নির্ম্মল হয় নি। অনেক বার ক্ষুর টানা হয়েছে, দু'এক জায়গা তা'তে অল্প ছড়েও গেছে। তারপর যেখানে বসে 'সেভ' করেছিলে, তার ডান দিকে ছিল একটা জান্‌লা, সেই জন্যে ডান দিক্‌কার গাল যেমন পরিষ্কার হয়েছে, বাঁ দিক্ তেমন হয় নি। তোমার মত পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির লোক ইচ্ছে করে এটা করে নি; বাঁ পাশে আলো পায় নি বলে না দেখ্‌বার দরুণই এটা হয়েছে।

বিস্ময়ের আতিশর্য্যে কয় মুহূর্ত্ত মণীন্দ্র বিমূঢ়ভাবে মিহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হয় ত অনিচ্ছাতেই উচ্চারণ করিল—আশ্চর্য্য তোমার দেখ্‌বার শক্তি!

পরক্ষণেই ত্রস্তপদে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমরাও খাইতে চলিলাম।

চার

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শুক্লা-একাদশী। চন্দ্রকিরণের গলিত রজত ধারায় বিশ্ব স্নাত। আমি হোটেলের কক্ষে বিছানায় শুইয়া অতৃপ্ত নয়নে বাতায়ন-পথে চাহিয়াছিলাম। বিলের জলে, শ্যামল বনে, প্রান্তরে, জ্যোৎস্নার হাসি ঝরিয়া যেন একটা মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। মৃদু বাতাসে পার্শ্বস্থ দেবদারু গাছের পাতা কাঁপিতেছে। কি একটা নাম না জানা পাখী কোথা হইতে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। মিহির তখন উপস্থিত ছিল না। মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সেই যে বাহির হইয়াছে, তখনও তাহার ফিরিবার নাম নাই। কোথায় গিয়াছে তাহাও জানি না। কি

করিতেছে, কোথা হইতে কি সূত্র লইয়া কি ভাবে সন্ধানে ব্যাপৃত আছে তাহাও আমায় বলে নাই। তাহার শক্তি ও প্রতিভার উপর আমার অসীম বিশ্বাস থাকিলেও এখানকার এই ঘটনা দেখিয়া কেবলই মনে হইতেছিল বন্ধু হয় ত ভ্রান্তিরই অনুসরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে শঙ্কাও অন্তরে ছায়া ফেলিতেছিল—তাহার চতুর্দ্দিকব্যাপী খ্যাতি, যশ হয় ত এবার আহত হইবে। তখন চিন্তা-বিজড়িত চিত্তে নিম্নতল হইতে আনীত পুস্তকখানা, যাহা অবহেলায় এতক্ষণ একপাশে পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইলাম। দু'-একপাতা দেখিয়াই বইখানা রাখিয়া দিলাম। কি যে মাথা-মুণ্ড, ছাই-ভস্ম লিখিয়াছে—এই সব বই আবার ছাপান হয়, আর লোকেও পয়সা দিয়া কিনিয়া পড়ে! আজকাল লেখক হইতে আর কোন বাধা নাই। যদি কিছু অর্থ-সংস্থান থাকে, তাহা হইলে যাহা হউক লিখিয়া বই ছাপাইলেই হইল, আর কিছু খরচ করিয়া—

—কি হে অশোক, ঘুমোচ্ছ না কি?

বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সানন্দে উঠিয়া বসিলাম। সার্টের উপর গলায় জড়ান চাদরখানা খুলিয়া আলনায় রাখিতে রাখিতে মিহির কহিল—খুব ঘোরা হয়েছে। এইবার চাই দীর্ঘ বিশ্রাম—কিছু খেয়ে নিয়েই একটা লম্বা ঘুম। কাল সাতটার আগে আর বিছানা ছাড়ছি না।

—বাঃ, কি হ'ল না হ'ল সে আমায় বল্‌বে কে?

—বল্‌ব আমি। কিন্তু আজ তোমায় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। রহস্যের প্রায় সমাধান হয়েছে। কাল সব জান্‌তে পার্‌বে। আজ আর কোন কথা নয়।

কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠিলেও তাহার ক্লান্তদেহ লক্ষ্য করিয়া আর কিছু বলিলাম না।

পাঁচ

পরদিন সাতটার আগে শয্যা ছাড়িব না বলিয়া রাখিলেও ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই মিহিরকে উঠিতে হইল; কারণ, পাঁচটার কিছু পর হইতেই মণীন্দ্র আসিয়া হোটেলে 'হানা' দিয়াছিল। তাহার ডাকাডাকিতে অনিচ্ছাতেই আমরা উঠিয়া পড়িলাম। মিহিরকে লক্ষ্য করিয়া মণি বলিল—চলো একবার সেইখানটায়—যেখানে লোকটা খুন হয়েছেন, সেখানটা তোমায় দেখিয়ে আনি। কাল ত শুনলুম, সহরে গিয়ে হাজতে রমেনের সঙ্গে দেখা করেছ। কি হ'ল—জানতে পার্লে কিছু?

—বিশেষ কিছু নয়। তবে ওদের বিবাদের কারণটা জেনেছি। লেখা দেবী যা' বলেছেন, তাই সত্যি। কিন্তু মণি, তোমার কাছে এটা কি খুব আশ্চর্য্য লাগছে না যে, জীবনের মত সামান্য অবস্থাব লোক একজন, চৌধুরীর মত ধনীর একমাত্র সন্তানকে ছেলের বউ কর্ত্তে চান?

ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছু থাকিতে পারে, এমন ভাব মণীন্দ্র দেখাইল না। সহজ কণ্ঠেই সে কহিল—ওদের বন্ধুত্ব খুব বেশী ছিল, তাই হয় ত তিনি এ আশা কর্ত্তে পেরেছিলেন এ আর আশ্চর্য্য কি?

চায়ের টেবিলে বসিয়া আমাদের কথা চলিতেছিল। শূন্য কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মিহির বলিল—আর একটা খবর পেলুম, নগেন চৌধুরীর কাছ থেকে এই যে সম্পত্তিটা জীবনবাবু পেয়েছিলেন, এর জন্যে একটা পয়সা কখনও তিনি নগেনবাবুকে দেন নি। বিনা সর্ত্তে এতবড় সম্পত্তিটা চৌধুরী তাকে দিয়েছেন—কেন?

বিরক্তভাবে মণীন্দ্র কহিল—তোমার ও কেনর উত্তর কেউ দিতে পারবে না। শুন্‌ছ ত দু'জনের বন্ধুত্ব বড় বেশী ছিল—বন্ধু আর বন্ধুকে এটুকু দিতে পারে না? তুমি কি অশোককে—

—থাক্ আমাদের নিয়ে এ উপমা। এখন কোথায় যাবে চলো। এস অশোক।

কয়জনে পথে বাহির হইলাম। প্রথমেই মণীন্দ্র তাহার পদোচিত মর্য্যাদা পদক্ষেপে ফুটাইয়া ছড়ি ঘুরাইয়া চলিতে লাগিল। তারপর আমরা দুইজন। মিহিরের মুখের দিকে একবার চাহিলাম—সে যে কিছু জানিতে, কোন অনুসন্ধান করিতে চলিয়াছে দেখিয়া উপলব্ধি করা যায় না।

আমরা বিলের ধারে আসিলাম। অদূরে একটা স্থান দেখাইয়া মণীন্দ্র বলিল—এখানে খুন হয়। কাছে গিয়ে দেখতে পার—তবে নতুন কিছু পাবে না, এ আমি আগেই বলে রাখ্‌লুম। তা' ছাড়া, আর একটা কথাও

বলে দিই—ওখানে গিয়ে একবার ভাল করে চাইলেই বুঝতে পারবে, তোমার ধারণা কতটা ভুল।

ব্যঙ্গের হাসি তার ওষ্ঠে ঝলসিতে লাগিল।

প্রশান্তভাবেই মিহির কহিল—ওখানে হত জীবন দত্ত আর তাঁর ছেলের পদচিহ্ন ভিন্ন আর কারো পায়ের দাগ নেই, এই কথাই তুমি বোধ হয় বলছ মণি ?

—ঠিক তাই। হত্যাকারী যদি অন্য কেউ হ'ত, বিলের ধারের ভিজে মাটীতে তার পায়েব চিহ্ন থাকৃত না কি ? এ ত বন্দুকের গুলিতে মারা নয় যে, দূর থেকেই খুনী তার কাজ শেষ করেছে। এতে কি মনে হয়—হত্যাকারী অন্য লোক ?

মিহির অল্প হাসিল ; কোন উত্তর দিল না। কয় মুহূর্ত্ত অদূরস্থ স্থানটার দিকে চাহিয়া সে একটু ঘুরিয়া শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া বিলের ধারে অন্য একটা স্থানে পৌছিল। কতকগুলা ছোট বড় গাছ একত্র হইয়া সেখানে একটা জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুক্ষণ গাছগুলার মধ্যে ঘুরিয়া সে কি দেখিল, তারপর একটা গাছের তলা হইতে ধূলার মত কি কতকটা অতি সন্তর্পণে তুলিয়া লইল। আমি ও মণীন্দ্র তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়া তাহার কাজ দেখিতেছিলাম।• মণীন্দ্র বলিল—তুমি ঐ ধুলোই কুড়োও।

মিহির হাসিয়া উঠিল। তারপব মণীন্দ্রকে ডাকিয়া মাটির দিকে দেখাইয়া বলিল—দেখ ত এটা কি ?

—দেখছি, পায়ের দাগ। হয় ত অন্য কেউ এখানে এসেছিল—কিন্তু এই বিশ ত্রিশ হাত তফাৎ থেকে লাঠি মেরে সে যে জীবনের মাথা ভাঙে নি পায়ের দাগ অনেকটা মুছে এলেও তা' স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমিও দেখিয়া ভাবিয়া পাইলাম না এই যাহার পদচিহ্ন সেই যদি সত্য হত্যাকারী, তবে এতদূর হইতে সে খুন করিল কিরূপে ? না, এ নিশ্চয় আর কেহ। মিহির খুব ব্যগ্রভাবে কি যেন দেখিতেছিল। সহসা তার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—অশোক, দেখছ, কিছু বুঝতে পারছ ?

দেখিলাম, খানিকটা তৃণাচ্ছাদিত ভূমির একটা স্থানে ঘাসের রং কিছু অন্যরূপ। দেখিয়া বোধ হয়, উহার উপর কোন একটা ভারী বস্তু ছিল ; যাহার চাপে পড়িয়া ওখানকাব ঘাসগুলি তাহাদের সহজ বর্ণ হারাইয়াছে।

বলিলাম—দেখে আমারও মনে হয়, এর ওপর কিছু ছিল।

—ঠিক। কিন্তু সেটা কোথায় আমায় খুঁজে নিতে হবে। ও, ঐ যে ওখানে একখানা পাথর পড়ে রয়েছে না।

পুনরায় অনেকটা পথ ঘুরিয়া শুষ্ক লতাপাতার রাশি সরাইয়া মাঝারী আকারের একটা পাথর সে কুড়াইয়া লইল। তারপর কিছু দূরে দেখাইয়া বলিল—দেখছ ঐখানকার দাগটা—খালি পায়ে বুড়ো আঙ্গুলে ভর রেখে কেউ ওখানে এসেছিল। হয় ত সেই জামাটা—যা' রমেন একবার দেখেছিল, সেইটা নিযে যাবার জন্যে। ঠিক তাই।

নির্ব্বাক হইয়া আমি শুধু তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম।

মিহির বলিল—চলো, ফেরা যাক্ ; আমার কাজ শেষ হয়েছে।

পাথবখানা হাতে লইয়াই সে চলিতে আরম্ভ কবিল। মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—ও জিনিসটা কি হবে হে ?

—মোকর্দ্দমা যেদিন উঠবে, সেদিন কোর্টে এটা দাখিল কর্ত্তে হবে। এইটা দিয়েই এ হত্যা হয়েছে।

আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। গভীর অবিশ্বাসেব সহিত মণীন্দ্র বলিল—প্রকাণ্ড আবিষ্কার ! তারপর আর কি জানলে ?

—আর জানব কি ? সবই জেনেছি মণি। জেনেছি হত্যাকারী যে, সে লোকটার আকার বেশ লম্বা। একটা পা একটু খোঁড়া। সে খায় খুব দামী বর্ম্মা সিগার ; পাইপ ব্যবহার করে। তারপর তার কোট বা সার্টের রং যা', তা', ত রমেন দেখেছিল—সবুজ রং।

—ভাল। তার বর্ণনা না হয় পাওয়া গেল—কিন্তু সে কোথায় ? তাকে তুমি খুঁজে বার কর।

—এইটুকু একটা জায়গার মধ্যে এরকম একটা লোককে খুঁজে নেওয়া খুব বেশী কঠিন কি ? সে লোক এখানেই আছে—এখানকারই লোক এও বলে দিচ্ছি।

আমরা তখন কথা বলিতে বলিতে রাজপথে আসিয়া

পড়িয়াছিলাম। হাতের ছড়িটা ঠুকিয়া রুক্ষভাবে মণীন্দ্র কহিল—তোমরা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্, কল্পনার খেয়ালে অনেক কিছু জিনিষ দেখেই তোমাদের চল্‌তে পারে—কিন্তু আমরা গভর্ণমেণ্ট সারভেণ্ট, আমাদের শুধু স্বপ্ন দেখ্‌লেই চলে না, কাজ কর্ত্তে হয়।

মিহির তাহার এ কথায় একটুও উষ্ণ না হইয়া কহিল—এই লোককে খুঁজে বার কর্ত্তে পারলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। মাপ কর ভাই, নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। নির্দ্দিষ্ট বস্তু ছেড়ে অনির্দ্দিষ্টের পেছনে ছুটব এ রকম মনোবৃত্তিও আমার নয়। তুমি তোমার কাজ কর, আমিও আমার কাজ করি।

মণীন্দ্র এ কথার কোন উত্তর দিল না। ছড়িটা কপালে ছোঁয়াইয়া একটা অভিবাদন জানাইয়া পথের অন্যদিকে চলিতে লাগিল। খানিকটা পথ আসিয়া মিহির কহিল—অশোক, তুমি হোটেলে যাও, আমার আর একটা কাজ আছে। শেষ করেই ফিরছি।

—কি এমন কাজ যে, আমি সঙ্গে থাকৃতে পারব না ?

স্নেহভরে আমার পিঠে একটা করাঘাত করিয়া সে বলিল—অকারণ ঘুরে ত লাভ নেই ভাই, তুমি ততক্ষণ ফিরে আমাদের 'সুটকেস্' দুটো গুছিয়ে ফেল। আজ দুপুরেই আমরা কোলকাতা যাব। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

আর কিছু না বলিয়া সে অন্য একটা পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

ছয়

মিহির ফিরিয়া আসিতেই বলিলাম—কি জান্‌লে বলো মিহির।

—বলছি।

আমার পাশেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া সে বসিল। তাহাকে দেখিয়া কিছু চিন্তিত বলিয়াই বোধ হইতেছিল। একটা সিগার ধরাইয়া মিহির বলিল—পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যায় লোকটা বেশ লম্বা। দুটো পা যে রকম দূরে দূরে পড়েছে, সেই অনুপাতেই তার দৈর্ঘ্য হবে। তারপর সে একটু খোঁড়া। হ্যাঁ, খোঁড়া—কারণ, তার একটা পায়ের দাগ খুব গভীরভাবে মাটিতে বসেছে, অন্যটা তত গভীর হয় নি। সে বর্ম্মা সিগার খায়। গাছতলায় সেই সিগারের ছাই, আধপোড়া একটা টুকরো আমি পেয়েছি। আর ঐ জঙ্গলে অন্য লোক কেউ যে গিয়ে বসে থাকবে, এও সম্ভব নয়। কাজেই হত্যাকারী এই লোক না হয়ে যায় না।

নিস্পলক নেত্রে মিহিরের মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। সে বলিতে লাগিল—আর একটা কথা। রমেন বল্‌ছিল তার বাবা কি একটা কথা বলে যা' সে বুঝতে পারে নি, শুধু 'তান' এই কথাটা তার কাণে যায়। আমাদের বন্ধু মণিবাবু বল্‌ছেন—ওটা 'ডিলিরিয়াম'।; কাজেই কথাটার কোন অর্থই নেই। কিন্তু সেটা ঠিক্ নয়। আঘাত পেয়ে যে লোক দু' মিনিটের মধ্যে মরে, তার 'ডিলিরিয়ম' হয় না। তুমি ডাক্তার, সেটা বেশ ভালই বুঝ্‌বে। এখন ভাব্‌ছি—সেই 'তান' কথাটা যা' জীবনবাবুর ছেলে বুঝ্‌তে পারে নি, সেটা কি ?

মিহিরের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলিলাম—সেটা কি ?

—ও, এবার হয়েছে। অশোক, তুমি ত জানো পৃথিবীর মধ্যে যে সব দেশের খবর জান্‌তে পারা যায়, সেই সেই দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদই আমি আমার ডায়েরীতে লিখে রাখি। এখন যেখানে যা' হয় তাও যেমন লিখি, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কোথায় কি হয়েছিল, সেগুলোও তেমনি অন্য একটা খাতায় টুকে রাখি। এই সব পুরানো কাহিনী আমার অনেক উপকারে লাগে। কাল আমি কোলকাতায় ফিরে গিয়ে সেই খাতা দেখে জেনেছি, পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে বেহার অঞ্চলে 'কালো শয়তান' বলে এক দুর্দ্দান্ত ডাকাত ছিল। তার সম্প্রদায়কে লোকে বল্‌ত—'শয়তানের দল।' পুলিশ বহু চেষ্টায়ও তার কিছু কর্ত্তে পারে নি। কিন্তু ক' বছর পর হঠাৎ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কেউ কিছু জান্‌তে পারে নি। লোকের ধারণা হয়েছিল 'কালো শয়তান' মরে গেছে, আর তার দল ভেঙে গেছে। আর একটা খবর এই—জীবন দত্ত তাঁর জীব-

নের অধিকাংশ সময় যে বেহারেই কাটিয়ে এসেছেন, এও জানা গেছে।

—তা' হলে তুমি কি বল্‌তে চাও ?

—হাঁা, আমি বল্‌তে চাই যে, জীবন দত্ত 'কালো শয়তান' এই কথাই উচ্চারণ করেছিলেন। হয় ত সেই তাঁর হত্যাকারী।

—কিন্তু সে কে ?

—জমিদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

আমি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম। হোটেলের যে ভৃত্যটা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, আমাদের লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—জমিদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এখানে আসতে চান্।

—তাঁকে নিয়ে এস।

ক্ষণপরেই ভৃত্যের সঙ্গে দীর্ঘকায় একব্যক্তি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিহির তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিল—বসুন চৌধুরী-মশায়। অসুস্থ শরীরে আপনাকে এতদূর আসতে হ'ল কষ্ট করে—কিন্তু কি করব উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসিলেন। কি আশ্চর্য্য, দেখিলাম তাঁহার একটা পা ঈষৎ খঞ্জ! একটু টানিয়া চলিতে হয়। ব্যাধির রেখা তাঁহার সারাদেহে সুপরিস্ফুট। আমি চিকিৎসকের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখিয়াই বুঝিলাম—তাঁহার ধরা-বাসের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। বয়স অধিক না হইলেও জরা এই বয়সেই তাঁহার দেহে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। মাথার কেশ অধিকাংশই শুভ্র। দেহ সম্মুখের দিকে কিছু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাঁহার দেহের গঠন পূর্ব্ব সামর্থ্যের কিঞ্চিৎ আভাস এখনও দেয়।

আসন গ্রহণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—আপনি আমায় ডেকেছেন কেন ?

একাগ্রচিত্তে মিহির এতক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। কথার উত্তরে কোমল কণ্ঠে কহিল—কেন যে ডেকেছি, এ ত আপনি বুঝতেই পেরেছেন চৌধুরী-মশায়। আমার ইচ্ছে নয় আপনার বাড়ীর লোক, বিশেষ করে আপনার কন্যা এ সম্বন্ধে কিছু শোনেন। সেই জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এত দূর এনেছি। এখন আমার কথা—আপনার কাজের ফলে একজন নিরপরাধ লোক শাস্তি পাবে, এ বোধ হয় আপনি চান না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ মিহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভয় ও বিস্ময়ের সংমিশ্রনে তাঁহার মুখ চোখে এক অপূর্ব্ব ভাব ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন—আপনি তা' হলে সব জেনেছেন।

—হাঁা নগেনবাবু, সবই আমি জেনেছি। এখন আইনের হাত থেকে এ নির্দ্দোষী ছেলেটীকে বাঁচাবার জন্যে যা' করা কর্ত্তব্য, আশা করি সেটা নিশ্চয় আপনি কর্ব্বেন।

ক্লিষ্টকণ্ঠে নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—হাঁা, তাকে আমি বাঁচাব। এ আমি করতুমই। যদি দেখ্‌তুম—তার রক্ষার আর কোন উপায়ই নেই, তা' হলে তখনিই আমি কোর্টে গিয়ে সব কথা খুলে বল্‌তুম। তার বাপের সম্বন্ধে আমার মনোভাব যাই হোক্, তাকে আমি নিজের সন্তানের মতই ভালবাসি। এই ব্যাপারে তাকে দোষী বলে ধরা হয়েছে—এর জন্য আমি যে কি মনোকষ্টে আছি, সে শুধু আমার অন্তর্য্যামীই জানেন। আমি পূর্ব্বেই সব কথা প্রকাশ করতুম, পারি নি শুধু আমার মেয়ের জন্যে। এ কথা শুনলে লেখা—ফুলের মত নিষ্পাপ পবিত্র লেখা আমার বাঁচবে না! আর মিষ্টার রায়, আপনি যে এই ব্যাপার আমার বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে না গিয়ে দূরে রেখেছেন, এর জন্যে আপনার নিকট আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু কি করে আপনি আমায় প্রকৃত দোষী ঠিক করলেন, সেটা বল্‌বেন কি ?

অল্প হাসিয়া মিহির কহিল—এর মধ্যে আমার কৃতিত্বের পরিচয় খুব বেশী নেই মিষ্টার চৌধুরী। এই এত বড় সম্পত্তিটা বিনা সর্ত্তে আপনি জীবনবাবুকে দিয়েছিলেন, আপনার একান্ত অনিচ্ছা জেনেও তিনি আপনার কন্যাকে তাঁর পুত্রবধূ কর্ত্তে চান্, এ সব দেখে সহজেই মনে হয় না কি যে, আপনি কোন কারণে একেবারে জীবনবাবুর হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। তারপর হয় ত তাঁর অত্যাচার আপনার অসহ্য হয়েছিল, তাই তাঁকে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিয়েছেন।

—ঠিক্, ঠিক্ তাই, মিষ্টার রায়। আমি যা' করেছি, তার জন্যে এতটুকুও অনুতপ্ত নই। আপনারা জানেন না, এই লোকটা কি ভীষণ প্রকৃতির ছিল, আর কি ভাবে আমায় শোষণ করেছে! আমার বয়স খুব বেশী হয় নি; তবুও আমি যে মরণের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, এ শুধু তারই অত্যাচারে।

আহত হিংস্র পশুর মত দুঃসহ ক্রোধে নগেন্দ্রনাথের নিষ্পলক চক্ষু দুইটা মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। শান্তকণ্ঠে মিহির বলিল—মিষ্টার চৌধুরী, দয়া করে ঘটনাটা প্রথম থেকে বলুন। আমি কথা দিচ্ছি—যদি রমেনকে অন্য কোন-রকমে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন কর্ত্তে পারি, তা' হলে এ কথা আমরা তিনজন ছাড়া জগতের আর অন্য কেউ জানবে না। আপনি বলে যান, আমি কাগজে লিখে নিই। শেষে আপনার নাম স্বাক্ষর করে দেবেন, আর এর সাক্ষ্য থাকবে আমার এই বন্ধু ডাক্তার অশোক বসু। বলুন এবার।

মিহির তাহার কাগজ কলম লইয়া বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নগেন্দ্রনাথ কহিলেন—আপনি যখন সব জেনেছেন তখন বল্‌তে আমার আপত্তি নেই। গাঢ়কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—আমার বাবা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু আমি তার যোগ্য সন্তান হতে পারি নি। অল্প বয়স হতে অসৎ সংসর্গে মেশায় শিক্ষাও বেশী দূর এগোতে পারে নি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর কাছ থেকে যে টাকা ও সম্পত্তি পাই, বদখেয়ালে অল্পদিনের মধ্যেই সে সব আমি নিঃশেষ করে দিই। আমি তখন নিঃস্ব, অথচ অর্থের আবশ্যক ছিল খুব বেশী। তাই বাধ্য হয়ে যে পথ আমি ধরলুম, তাকে আপনারা বলেন ডাকাতী।

—বেহার অঞ্চল ছিল আপনার কার্য্যস্থল; সে দেশে আপনার নাম হয়েছিল 'কালো শয়তান।'

বিহ্বলভাবে কয় মুহূর্ত্ত মিহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নগেন্দ্রনাথ কহিলেন—তা' হলে এও আপনি জেনেছেন। সত্যই আমি ছিলুম 'কালো শয়তান' নামে ওদেশে পরিচিত। আর এই জীবন ছিল আমার দলের একজন। আমি নিজে সাধু নই সত্য, কিন্তু এ লোকটা ছিল আমার চেয়েও শতগুণে ভয়ঙ্কর। ক' বছর এইভাবে কাটবার পর নিজের কাজের জন্যে আমি বড় অনুতপ্ত হই। তারপর দল ছেড়ে আমি বাঙ্‌লায় ফিরে এসে ভদ্রভাবে জীবন যাপন কর্ত্তে আরম্ভ করি। টাকার অভাব ছিল না এবং আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতও না, কাজেই একজন সম্ভ্রান্ত লোকের উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা এ অবধি বরাবরই আমি পেয়ে এসেছি। আমার বিবাহ হয়েছিল আভিজাত্য গৌরবপূর্ণ এক ধনবানের কন্যার সঙ্গে। কিন্তু আমার স্ত্রী বেঁচেছিলেন খুব অল্পদিন। আমার লেখা তাঁরই পবিত্র দান। তাকে চার বছরেরটী নিয়ে আমি এখানে এসে বাস কর্ত্তে আরম্ভ করি। সেই সময় আমার শান্তিময় জীবনের শনিরূপে এই লোকটা এসে দেখা দেয়। কি করে যে সে আমায় খুঁজে বার করেছিল জানি না। এসেই সে আমায় ভয় দেখায়—আমি যদি তাকে সমস্ত রকমে সাহায্য না করি তা' হলে সে তখনই আমার ভূতপূর্ব্ব জীবনের কথা পুলিশকে ও লোক-সমাজে জানাবে। আমার অপরাধের প্রমাণজনক কতকগুলা কাগজ-পত্রও তার কাছে ছিল। তার মুখ বন্ধ রাখবার অভিপ্রায়ে আমি প্রথমেই আমার সব চেয়ে ভাল ও আয়কর সম্পত্তিটা তাকে দান করি। তারপর আরও যথেষ্ট টাকা দিই। কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট হয় না। শেষে দাবী করে বসে আমার মেয়েকে—অবশ্য তার ছেলের জন্যে।

—তারপর?

—আমার লেখা হবে ঐ নরপিশাচের সন্তানের স্ত্রী! এতে আমি কিছুতেই সম্মত হতে পারি নি; কিন্তু সেও তার দাবী ছাড়ে নি। এই বিষয়ে একটা শেষ কথা বল্‌বার জন্যই সেদিন ঐ বিলের ধারে আমাদের দেখা করবার ব্যবস্থা হয়।

—সে আপনাকে ডাকৃতেই শিস্‌ দিয়েছিল তা' হলে?

—হ্যাঁ। ওটা ছিল আমার 'শয়তান দলে'র একটা সাঙ্কেতিক শব্দ। তার শিস্‌ শুনে আমি যখন যাই, তখন সে তার ছেলেকে খুব বকৃছিল—আমার মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে সে সম্মত নয় বলে। তার সেই কথা আমায় উন্মাদ হিতাহিত বোধশূন্য করে তোলে। যে দুর্দ্দান্ত হিংস্র প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটা হঠাৎ জেগে ওঠে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি আমার কোন আপত্তি টেঁকৃবে না—লেখাকে সে তার কাছে টেনে নেবেই। আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য দু' দিন পরে লেখার হবে, এ কথা সে কিছুতেই ভুল্‌তে পারছে না। যে করে হোক্‌ লেখাকে তার মত পশুর সংস্রব হতে রক্ষা কর্ত্তেই হবে, এই হয় তখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—কি কচ্ছি না কচ্ছি সে জ্ঞান ছিল না। আমার রুগ্ন দেহে কোথা হতে একটা দানবী শক্তি যেন এসে পড়ল। আমার হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। একটা পাথর কুড়িয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়তেই সে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌ল। মিষ্টার চৌধুরী, দিন্‌ কাগজখানা, এইখানে আমার নাম স্বাক্ষর করে দিই।

রমেন্দ্রনাথের বিচারের সময় মিহির তার সপক্ষে এমন কতকগুলা প্রমাণ উপস্থিত করিল, যাহাতে বিচারক হইতে জুরীরা সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মুক্তি পাইয়া সে গৃহে ফিরিল।

নগেন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত কাগজখানা মিহিরকে ড্রয়ার হইতে আর বাহিরে আনিতে হয় নাই। এ ঘটনার পর নগেন্দ্রবাবু কয় মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। শুনিয়াছি লেখা দেবী ও রমেন্দ্রনাথ উভয়েরই জীবন বেশ সুখ-শান্তির মধ্য দিয়া কাটিতেছে। লেখা বিবাহিতা। রমেন্দ্র এখনও কুমার। পদ্মদহ বিলের এ হত্যা রহস্যের স্মৃতি দীর্ঘদিন আমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়াছিল।*

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

* বিদেশী গল্প অনুসরণে

ভৌতিক গল্প

তাই ত!

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
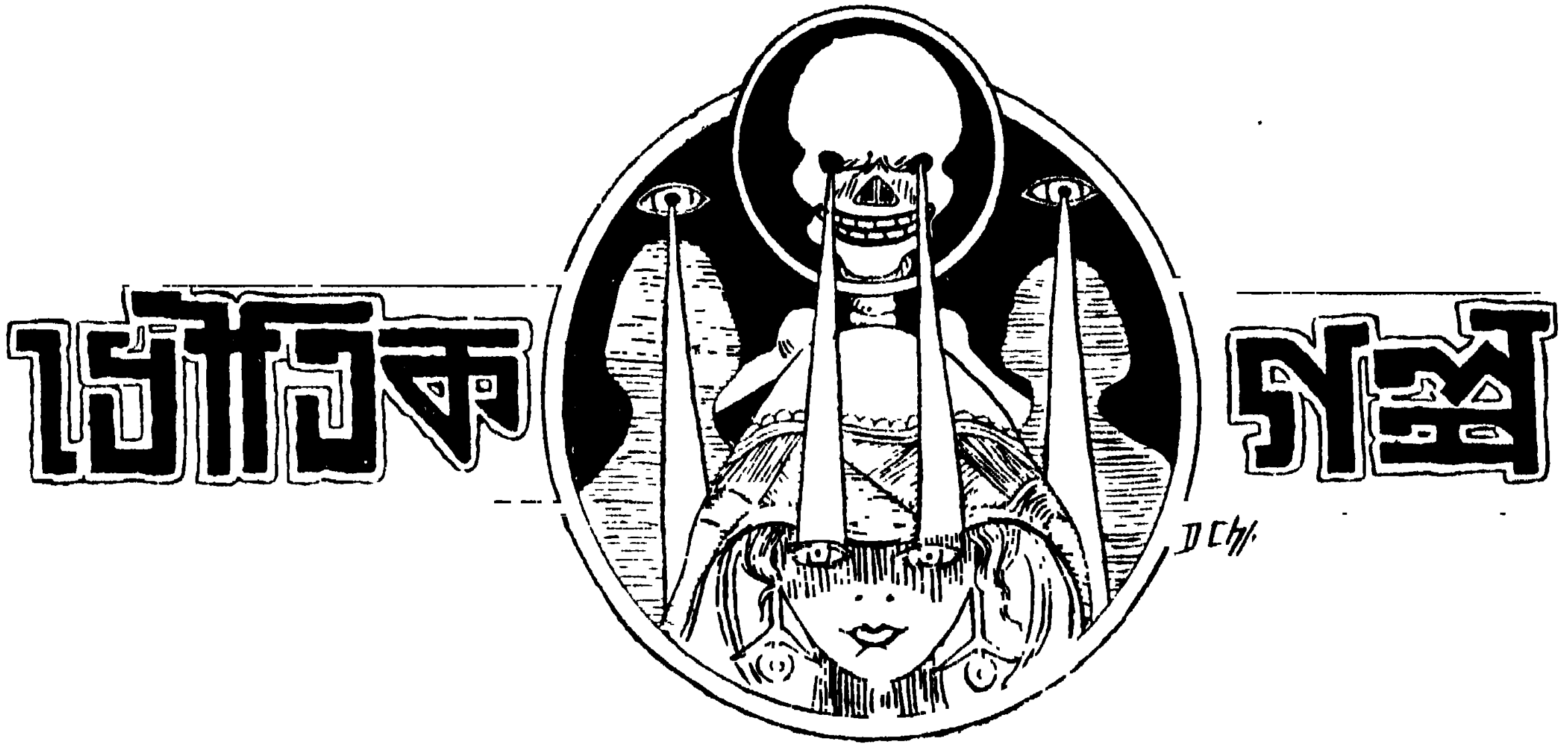
নিজ্জন প্রান্তবের বুকে একটা নতুন বেল লাইন বসবে, আর তার পত্তন না কি আমাকেই কবতে হবে। সবকাব একখানা চিঠি দিয়ে আমায জানিয়ে দিলেন—আমি যেন অবশ্য অবশ্য অমুক তারিখেব মধ্যেই রওনা হয়ে পড়ি।

ভৃত্যকে ডেকে ভাল দেখে একটা বিশ্বাসী লোক খুঁজতে বল্‌লাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবার দিন এসে গেল; কিন্তু মনেব মত লোক আর পাওয়া গেল না। সেই নির্জ্জন বনবাসে নিজের আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সামান্য ক'টা টাকার জন্য কে যেতে চায় বলো? কিন্তু আমার যে সরকারী চাকরী। অগত্যা একদিন দু'-চারটে আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র নিয়ে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে গাড়ীতে চেপে বসা গেল।

পরের দিন রাত প্রায় একটার সময় বেলগাড়ীখানা আমায় নিতান্ত নির্দ্দয়ের মত একাকী সেই গভীর রাত্রে ছোট এক নির্জ্জন রেল ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে সে তার গন্তব্য পথে চলে গেল। আমার জন্য দু'জন কুলী ও একজন চাপরাশী ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল। খোঁজ করতেই তাদের সন্ধান পাওয়া গেল। তাদের মুখে শুনলাম—আমায় যেখানে যেতে হবে, সে স্থান এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। যেতে হবে গরুর গাড়ী করে কিম্বা হেঁটে। এই রাত্রে ঐ দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবার সাহস থাক্‌লেও, উৎসাহ আমার একটুও ছিল না। একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে তা'তেই উঠে বসা গেল। গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমাব সঙ্গের সেই লোকগুলোও গাড়ীর পেছনে উঠে বস্‌ল। গাড়ীর দোলায় নিজের দুরাদৃষ্টের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; চাপরাশীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি—রাতের আঁধার কেটে গিয়ে ভোরের আলো প্রকৃতির বুকে লুটিয়ে পড়েছে।

চাপরাশী বল্‌লে—বাবু, নেমে আসুন, আমরা পৌঁছে গেছি।

চারিদিকে ধূধূ করছে খোলা মাঠ। মাঠের কোল ঘেঁসে ওই দূরে শৈলশ্রেণী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাল উই ঢিপির মতই একটার গায়ে একটা লেগে আছে।

প্রান্তরের একপাশ দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী তরতর করে দুষ্ট মেয়ের মত ছুটে উপল খণ্ডের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই খানেই বস্‌বে আমাদের নতুন লাইন। প্রকৃতির এই উদার উন্মুক্ত চিত্রখানি আমার মনকে ভুলিয়ে দিলে।

একধারে সব ছোট ছোট টিনের 'সেড' তুলে কুলীরা আপাততঃ তাদের বাসস্থল গড়ে তুলেছে। তারই একটায় আমারও থাক্‌বার স্থান ঠিক হয়েছে।

ঘুরে ঘুরে সব ভাল করে দেখ্‌তে শুন্‌তে অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেল। তারপর নদীতে স্নান সেরে ষ্টোভে কোন রকমে চারটী ফুটিয়ে ক্যাম্প খাটের উপর গা এলিয়ে দিলাম। তখন শীতকাল। বেলা খুবই ছোট। ঘুম থেকে

উঠে দেখি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এক সময় সুয্যি-মামা ঘুমের দেশেই বুঝি পালিয়ে গেছেন।

চাপরাশী রামলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে রাঁধুনী মিলবে কি না?

সে বল্‌লে—কেন পাওয়া যাবে না, সহর এখান হতে অল্পই দূর; বোধ হয় ক্রোশ চারেক হবে। সে কালই গিয়ে একজনকে যোগাড় করে আন্‌বে।

আমি তাকে বল্‌লাম—লোকটা যেন বেশ ভাল হয়। মাইনের জন্ম আটকাবে না।

পরের দিন ভোরবেলাই রামলাল একজন রাঁধুনীর সন্ধানে বেরিয়ে গেল। আমি কুলীদের নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। কুলীদের মধ্যে সবই প্রায় সাঁওতাল এবং কোল জাতীয়।

দুই

সমস্ত দিন পরিশ্রম করার পর বিকালের দিকে নদীতে স্নান সেরে মাঠের দিকের বড় জান্‌লাটা খুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে চুপ করে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে পড়েছিলাম। ওই দূরে মাঠের কোল ঘেঁষে সূর্য্য পাটে বসেছেন। মাঝে মাঝে আকাশের বুক বেয়ে এক এক ঝাঁক বন টিয়া কিচিরমিচির করে ডাকৃতে ডাকৃতে উড়ে চলেছে। এর মধ্যেই বেশ শীত শীত করছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাঁঝের আঁধার চারিদিকে ঘনিয়ে এল তার কাল ঘোমটা টেনে। একটা কুলী এসে টেবিল-ল্যাম্পটা জেলে দিয়ে গেল। তাকে শুধালাম—রামলাল আয়া?

সে বল্‌লে—আভি নেহি আয়া হুজুর।

সে নিজের কাজে চলে গেল। ধীরে ধীরে উঠে জানলাটা এঁটে দিয়ে একটা ইংরিজী গল্পের বই নিয়ে আলোটা একটু উস্‌কে দিয়ে পড়তে বস্‌লাম। গল্পটা বেশ জমে এসেছে, এমন সময় শুন্‌লাম কে যেন ডাকৃছে—বাবু।

—কে রে?

—হামি রামলাল হুজুর।

উঠে বসে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—আদমী মিলা?

সে বল্‌লে—জি।

বল্‌লাম—কই দেখি?

প্রথম দৃষ্টিতেই একটা অজানিত ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল।...উঃ, জ্যান্ত মানুষ এমনি ভীষণ দর্শন! এমনি ভয়ঙ্কর! এমনি কুৎসিত!...লোকটার মাথার একটা দিক্ আর ডান গালের খানিকটা পুড়ে গেছল বোধ হয়। রুগ্ন কঙ্কালসার দেহ, যেন এই মাত্র সে কোন অন্ধকারের অন্ধকূপ থেকে শতবর্ষের ক্ষুধার জ্বালা বুকের মাঝে পুষে, মূর্ত্তিমান দুর্ভিক্ষের মতই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এত রুগ্ন, এত ক্লিষ্ট যে, বোধ হয় একটা জোর হাওয়ারও ভর সইবে না।...সবার চাইতে ভীষণ তার চোখ দুটোর চাউনি—মড়ার মতই প্রাণহীন, ফ্যাকাসে, স্থির, অকম্পিত। আলোর ম্লান রশ্মিগুলি যেন সেখানে একটা ভীষণ মৃত্যুর ছবি দেখে শিউরে শিউরে উঠছে। প্রথমটায় গলা দিয়ে আমার স্বরই বেরুল না।...কেন জানি না, অত শীতেও সর্ব্বাঙ্গ আমার ঘেমে উঠ্‌ল।...অনেক কষ্টে রামলালকে শুধালাম—এর নাম কি?

—জি, ভুখ্‌না।

সে রাত্রে আমার চোখে এতটুকুও ঘুম ছিল না। চোখ বুজলেই শুধু ভুখ্‌নার সেই মৃতের মত ভীষণ ভয়াবহ চাউনি আমার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠ্‌ছিল। সকালে উঠে আমি রামলালকে নিভৃতে ডেকে বলে দিলাম—ও লোক আমার পোষাবে না।

জামা জুতো পরে কাজে যাব বলে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি, সেই সময় ভুখ্‌না ঝড়ের মত ছুটে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। প্রথমটা আমি অত্যন্ত চম্‌কে উঠেছিলাম; পরে নিজেকে কতকটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লাম—এ কি, এ কি, পা ছাড়, পা ছাড়!

রামলালের মুখে তার চাকরী মিল্‌ল না শুনেই সে আমার কাছে ছুটে এসেছে। সে বল্‌লে—নকৃরী না মিল্‌নেসে গোড় নেই ছোড়ে গা বাবু।...হাম বহুৎ গরীব আদমী হ্যায়।

তখন আর কি করা যায়; তাকে চাকরীতে বাহাল কোরবো বলায় সে আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল। কাল রাত্রে ম্লান আলোতে তাকে যেমন ভীষণ বলে মনে হয়ে ছিল, সকালে সূর্য্যের আলোয় আর তাকে ততটা ভয়ানক বোধ হ'ল না। বরং মনে মনে আমার হাসিই এল, বোকার মত কাল রাত্রে ভয় পেয়েছিলাম বলে।

তিন

ভুখ্‌না আমার কর্ম্মে বাহাল হলো।

দেখ্‌লাম, লোকটা সত্যিই খুব কাজের। এই অজানা অচেনা বিভূঁয়ে কিসে কেমন করে আমার সুবিধা হবে, সেই দিকেই তার প্রখর দৃষ্টি। লোকটা কথা বল্‌ত কিন্তু খুবই কম। আমার কাজ-কর্ম্ম সেরে যেটুকু সময় সে হাতে পেত, দেখ্‌তাম সে কখনও আমার ঘরের বারান্দায়, কখনও বা বাইরে যেখানে রেল লাইনগুলো এনে স্তূপাকার করা হয়েছিল, তার ওপর বসে একমনে

ধকি চিন্তায় একেবারে বিভোর হয়ে আছে। তাকে প্রথম দর্শনে তার ওপর অহেতুক বিরাগের জন্য সত্যই পরে আমার যথেষ্ট অনুতাপ হয়েছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় দশটা দিন কেটে গেল।

সেদিন শরীরটা তেমন না ভাল থাকায় সন্ধ্যার আগেই ভুখ্‌নাকে জানিয়ে দিলুম, রাতে আর কিছু খাব না। অন্য দিনকার চাইতে অনেক আগেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লুম। ভুখ্‌না এসে মাথার কাছে একটা টুলে ল্যাম্পটা বসিয়ে দিয়ে গেল। একখানা গল্পের বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ কর্‌লাম।

পড়তে পড়তে বোধ হয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম। শরীরের ওপর একটা অস্বস্তিকর চাপে সহসা আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আলোটা কখন নিবে গেছে। মৃত্যুর মতই স্তব্ধ ঘন অন্ধকার ঘরের মধ্যে চাপ বেঁধে বসে আছে। দেহের ওপর কে যেন একটা ভারী বস্তু চাপিয়ে দিয়েছে। ক্রমে সেই ভারী বস্তুটাকে আরও বেশী ভারী বলে বোধ হতে লাগ্‌ল। এতে শীতেও আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে জল হয়ে গেল। অভাবিত এই ব্যাপারে এতটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, সেই ভারী বস্তুটা ঠেলে গায়ের ওপর হতে ফেলে দেব, এমন ক্ষমতাও ছিল না। চীৎকার করতে গেলাম, এমন সময় লোহার মত শক্ত ও ঠাণ্ডা সাঁড়াসীর মত দুটো হাত আমার কণ্ঠনালীটা চেপে ধরল। উঃ, কি সে চাপুনী! প্রাণ বুঝি বেরিয়ে গেল!...প্রাণপণ শক্তিতে সে হাতের নির্ম্মম চাপ থেকে নিজের গলাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম, কিন্তু সে কি অমানুষিক কঠিন চাপ! সেই অদৃশ্য শক্তির সাথে লড়তে গিয়ে শীঘ্র শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়লাম। এমন সময় আপনা থেকেই সেই হাত দুটা আলগা হয়ে এল। আপ্রাণ শক্তিতে একটা ঝাঁকানী দিতেই মনে হ'ল, যেন আমার দেহ থেকে একটা ভারী বস্তু অন্ধকারে মেঝের ওপর গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল। তারপরেই মনে হ'ল একটা মস্ত বড় ছায়া যেন দুল্‌তে দুল্‌তে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চীৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম—রামলাল, ভুখ্‌না!..

আমার চীৎকারে রামলাল আলো নিয়ে ছুটে এল। একটু একটু করে সব তাকে খুলে বল্‌লাম। সে বল্‌লে—কই ডাকু আয়া।

গোলমালে দু'-একটা সাঁওতাল কুলীও ছুটে এল। নিজে সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের চারপাশ ভাল করে খুঁজে এলাম—কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না।...ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি সেই শীতের মধ্যে একটা মাত্র চাদর গায়ে জড়িয়ে ভুখ্‌না বারান্দায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এত গোলমালেও লোকটা দিব্যি ঘুমোচ্ছে।...

আশ্চর্য্যের বিষয় ঘরের কোন জিনিষ-পত্রই খোয়া যায় নি। যেখানকার যেটি, সেটি ঠিক্ তেমনিই আছে।... ভাব্‌তে ভাব্‌তে এসে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লুম। তবে কি ব্যাপারটা আগাগোড়াই স্বপ্ন!...কিন্তু তখুনি আবার গলায় হাত দিতেই সেখানটা বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠল। সে রাত্রের বাকীটুকু জেগেই কাটিয়ে দিলুম।

ভোরবেলা ভুখ্‌না যখন চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌ল, তাকে দেখে আমি হঠাৎ অত্যন্ত চম্‌কে উঠ্‌লাম!...কি করুণ ও বিষণ্ণ মুখখানা!...একেই ত তার মুখ অত্যন্ত কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর ছিল, তার ওপর আবার আজকে যেন আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল। আমি শুধালাম—তোর কি হয়েছে ভুখ্‌না, কোন অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

সে নীরবে শুধু মাথাটা একবার হেলিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। আমিও নানা কথা চিন্তা করতে করতে কাজে বেরিয়ে গেলাম।

চার

সেদিন ভাল করে দরজা এঁটে, চারিদিক দেখেশুনে, বিছানায় শুয়ে পড়া গেল। আগের দিন নানা কারণে নিদ্রা হয় নি বলে ঘুমটাও শীগ্‌গির এসে গেল। সেদিন রাত্রে আর বিশেষ কিছুই ঘট্‌ল না। মনে মনে ভাব্‌লাম—গত রাত্রে নিশ্চয় কোন্ বেটা চোর-টোর আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল। কিন্তু তখুনি আবার ভাব্‌লাম—তাই যদি হবে, তবে সে বেটা কোন জিনিষ-পত্র না সরিয়ে আমার গলা টিপে মারবার চেষ্টা করছিল কেন? এতে তার লাভ কি?...মনের মাঝে একটা সন্দেহ অদৃশ্য কাঁটার মতই সর্ব্বক্ষণ খচ্‌খচ্ করতে লাগ্‌ল।...

দিন দুই বাদে রামলাল এসে জানাল—গত রাত্রে কে না কি তার ঘরে ঢুকে তাকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেছিল। সে বল্‌লে—বাবু, এখানে নিশ্চয়ই ভূত-টুত আছে। নইলে—

তার পরের দিন দেখি কুলীদের মধ্যে ভীষণ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কাল না কি রাত্রে তাদের সর্দ্দারের ঘরে ঢুকে একটা মস্তবড় ভূত তার গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেছিল। সাঁওতালরা একেই ত অত্যন্ত ভীতু জাত; তার ওপর আবার এই ঘটনায় তারা খুব চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। মনে মনে আমিও বেশ চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। তাই ত, সত্যই কি তবে ভূতের উপদ্রব এখানে আরম্ভ হলো!...

পরের দিন রাত্রে হঠাৎ আবার একটা ভীষণ চেঁচামেচি

শুনে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি, মশাল জেলে কুলীরা সব ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। একটা হৈচৈ, কান্নাকাটি বেধে গেছে। ব্যাপার কি?...শোনা গেল, সেদিনকার সেই ভূতটা আজ আবার তাদের একজনের গলা টিপে ধরেছিল। লোকটা ভয়ের চোটেই অজ্ঞান হয়ে গেছে; এখনও জ্ঞান হয় নি। সকলে মিলে তাকে ধরাধরি করে বাইরে এনে শুইয়েছে। তার বয়স বোধ হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। মুখ দিয়ে তখনও তার ফেনা উঠ্‌ছিল। বুঝ্‌লাম—লোকটা আর বাঁচবে না। হলোও তাই। পরের দিন সকালে উঠে শুন্‌লাম লোকটা মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলীদের মধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিলে। তারা কেউ আর এখানে কাজ করবে না। সকলেই এখান থেকে চলে যেতে চায়। আমি ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। এখন কি করি? ওপর-ওয়ালাকেই বা কি জানাই? তারা ত এ সব কথা শুন্‌লে হেসেই উড়িয়ে দেবে। নিজে গিয়ে কুলীদের মধ্যে অনেক বলে-কয়ে সেদিনকার মত তাদের ত ঠাণ্ডা করলাম। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল—এমনি ভাবে আর একদিনও চল্‌বে না।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ একটা করুণ কান্নার শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। কে যেন বুক-ভাঙা বেদনায় ফুলে ফুলে কাঁদছে, আর কাঁদছে!...এই রাত্রে কে এমন করে কাঁদে?...ভাল করে কান পেতে শোন্‌বার চেষ্টা করলাম। ধীরে ধীরে কান্নাটা যেন থেমে গেল।

পরের দিন ঘুম হতে উঠে খবর নিলাম, সে রাত্রে আর কোন কিছু হয় নি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে কাজে লেগে গেলাম।

সেদিনও রাত্রে কিন্তু সেই কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অস্পষ্ট চাঁদের আলো প্রান্তরের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।... থম্‌থমে রাত্রির বুক বেয়ে যেন সেই কান্নার ধ্বনি মৃত্যুর ভয়াবহ শীতলতা এনে দিচ্ছিল।... মাঝে মাঝে প্রান্তর হতে শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হুহু করে ছুটে এসে হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছিল।... গা-টা যেন অকারণেই ছম্‌ছম্ করে উঠ্‌ল।...বারান্দার এককোণে ভুখ্‌না যেখানে শুয়ে থাকত, সেখানে এসে একটা অভাবনীয় দৃশ্যে চম্‌কে উঠলাম! মাথার বালিশটার ওপর চেপে বসে ভুখ্‌না প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাতের মুঠোর মধ্যে কি যেন ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার সমস্ত শরীর কি এক গভীর উত্তেজনায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে।...সেই স্তিমিত চন্দ্রালোকে তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। সহসা সে সেই বালিশটা ছেড়ে দিয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল। উঃ, সে কি কান্না!... যেন তার সর্ব্ব শরীর ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগ্‌ল।... ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে ডাকলাম—ভুখ্‌না।

প্রথমটায় সে কোন জবাব দিলে না। কিন্তু তিন-চারবার ডাকার পর সে আস্তে আস্তে উঠে বস্‌ল।

আমি বল্‌লাম—কাঁদছিলি কেন? কি হয়েছে?

সে কোন জবাব না দিয়ে নীরবে শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমিও ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু বাকী রাতটুকু আর ঘুম এল না। নানা চিন্তাতেই অতিবাহিত হয়ে গেল।

পাঁচ

কিন্তু পরের দিন আবার কুলীদের মধ্যে আর একটা লোক ভয় পেয়ে মারা গেল। এবার আর কোন উপায়েই তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না—তারা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল। আমি আর উপায়ান্তর না দেখে সবিশেষ জানিয়ে ওপরওয়ালার কাছে 'তার' করে দিলাম।

কুলীদের অনেক বলে-কয়ে থামিয়ে ছুটো দিনের সময় নিয়েছিলাম। সর্দ্দার মানুষটা ভাল; সে চেষ্টা করে তার লোকদের থামিয়ে রাখ্‌লে।

পরের দিন দুপুরের দিকে কোম্পানী থেকে একজন সাহেব 'সুপারভাইজার' এসে উপস্থিত হ'ল। সে আমার মুখে সব কথা শুনে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বল্‌লে—তোমরা বাঙ্গালী আদমী, এমনিই ভীতু ও অপদার্থ বটে!

আমি মনে মনে ভাব্‌লাম—সে হাতের চাপ ত খাও নি; তা হ'লে বাছাধন টেরটা পেতে। দেখ্‌তাম—এত লম্বা লম্বা বুলি কোথা থেকে আসে। যা' হোক্, আপাততঃ তার কথা মেনে নিয়ে চুপ করে গেলাম।

গভীর রাত্রে সহসা একটা ভীষণ গোলমাল শুনে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

শোনা গেল সেই ভূতটা না কি রাত্রে কিছুক্ষণ আগে সাহেবের ঘরে ঢুকেছিল। রামলাল সেই ঘরেই শুয়ে ছিল; হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ শুনে আলো জাল্‌তে যাবে, এমন সময় কে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পড়ে গিয়েও রামলাল তাকে জড়িয়ে ধরে রাখবার অনেক চেষ্টা করে;

কিন্তু সফল হয় নি। সে পালিয়ে গেছে। তখন সে চীৎকার করে ওঠে। তার চীৎকার শুনে সকলে ছুটে এসে দেখে—সাহেব বিছানার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আর মেঝের উপর আচ্ছন্নের মত বসে রামলাল। প্রবল রক্তের স্রোতে তার চোখ মুখ সব ভেসে যাচ্ছে।...ওষুধ-পত্র দিয়ে রামলালের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, সাহেবের কাছে দু'জন কুলীকে বসিয়ে আমার ঘর থেকে একটা ওষুধ আন্‌তে যাচ্ছি, সহসা বারান্দার ওপর শায়িত ভুখ্‌নার ওপর নজর পড়তেই আমি আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লাম! তার পরিধেয় বস্ত্রখানা রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে।...

চকিতে ক'দিন আগেকার রাত্রের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। আমি আর কোন কথা না বলে সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওষুধ আন্‌তে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

সাহেবের আর জ্ঞান হলো না। ভোর রাত্রের দিকেই এই অপদার্থ ভীতু বাঙালীদের মতই তার শেষ নিশ্বাস এই নির্জ্জন, স্বজনহীন প্রান্তরে চিরসমাধি লাভ করলে।...

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সকালে অনেক খোঁজাখুজি করা সত্ত্বেও ভুখ্‌নাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আমার মনে যে সন্দেহটা এতদিন অস্পষ্ট ছিল, আজ সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

দুপুরের দিকে সমস্ত কুলীরা পায়ে হেঁটে আমার সকল ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করে সহরের দিকে চলে গেল। পড়ে রইলুম এখানে শুধু আমি, রামলাল আর সাহেবের মৃত দেহ। কেন না, তার আত্মীয়-স্বজনকে আসার জন্য 'তার' করা হয়েছিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে করুণ বিভীষিকার মতই আমাদের চোখের ওপর রাত্রি নেমে এল। কি একটা ভয়ে গা'টা ছমছম্ করে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কেবলই মনে হচ্ছিল—রাত্রির অন্ধকারে ঘাপটি মেরে চুপিসারে যেন কারা সব ছায়ার মত যাতায়াত করছে।...তাদের পায়ের শব্দ বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা বরফের মতই জমিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।...

মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত প্রান্তরের বুক হতে রাত্রির হিম-শীতল বায়ু বাইরের বন্ধ দুয়ার-জান্‌লাগুলোয় এসে করাঘাত হেনে যাচ্ছে।...ঘরের মধ্যে আলো জেলে সাহেবের শব আগ্‌লে আমরা দু'টি প্রাণী যেন পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।...

ভয়ে আতঙ্কে ঝিমুতে ঝিমুতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সহসা একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই চম্‌কে চেয়ে দেখি, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভুখ্‌না। তার দু' চোখের ভেতর দিয়ে যেন একটা মৃত্যু-ক্ষুধা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।.. সহসা সে লাফ্ দিয়ে এসে আমার গলাটা চেপে ধরল। উঃ, কি সে চাপুনী! প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যায়।..

কিছুক্ষণ ঝটাপটি করার পর তার হাত দুটো আল্‌গ হয়ে এল। অনেকক্ষণ পরে মিটমিটি করে তাকিয়ে দেখি, রামলাল—হ্যাঁ, রামলাল। সাহেবের মৃতদেহটার ওপর বসে সে তার গলাটা প্রাণপণে চেপে ধরেছে। আমি চীৎকার করে ডাক্‌লাম—রামলাল, রামলাল!...

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন চেয়ে দেখি বন্ধ দরজাটা হাহা করছে খোলা, আর ঘরের মধ্যে সাহেবের শবের পাশে রামলালের দেহটা অসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। গায়ে হাত দিয়ে বুঝ্‌লাম—দেহে তার প্রাণ নেই; সে মারা গেছে। খোলা জান্‌লা দিয়ে ভোরের সোনালী আলো মুখের ওপর পড়ে তাদের মূর্ত্তি বীভৎস করে তুলেছে।... আমি সভয়ে চোখ বুজ্‌লাম।...হঠাৎ বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠ্‌ল। একদৌড়ে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলাম। শূন্য শূন্য—সব যেন খাঁ খাঁ করছে।.. ছোট বড় টিনের সেডগুলো শূন্য গর্ত্ত হয়ে যেন পরিত্যক্ত জনহীন প্রান্তরের বুকে মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মতই সব এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।...আর পিছন দিকে না চেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ক্লান্ত হয়ে প্রায় সন্ধ্যার দিকে আমি সহরে এসে পৌছালাম। সেখানে রাত্রের মত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া গেল।

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যেতেই চমকে চেয়ে দেখি মেঝের ওপর দুটো লোক ঝটাপটি করছে। একবার এ ওর বুকের ওপর চেপে গলা টিপে ধরছে, আবার ফিরে অন্যজন আগের জনের বুকে চেপে গলা টিপে ধরছে।

ঘরের আলোয় তাদের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠ্‌লাম এ কি, এ যে রামলাল আর ভুখ্‌না !...

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, দুটো মৃতদেহ ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে—একটা রামলালের, অন্যটা ভুখ্‌নার। বারবার চোখ মুছ্‌লাম। কিন্তু ভুল নয়, সত্যিই তারা রামলাল আর ভুখ্‌না এবং দু'জনেই মৃত। অথচ নিজের চোখে কাল রামলালের মৃতদেহ সেখানে পড়ে থাক্‌তে দেখে এসেছি !...

এমন সময় যাঁর বাড়ীতে ছিলাম, সেই ভদ্রলোকটী আমার ঘুম ভেঙেছে কি না দেখতে এলেন। আমি কোন কথা না বলে নীরবে আঙুল তুলে রামলাল ও ভুখ্‌নার মৃতদেহ তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি সভয়ে একটা আর্ত্তনাদ করে এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে এলেন। তিনি বল্‌লেন—এ কি !

আমি বল্‌লাম—আপনিও যা' দেখ্‌ছেন, আমিও তাই দেখছি এবং আপনি যা' জানেন, আমিও হয় ত ঠিক্ তাই জানি, তবে—বলে আমার এখানে আসার পূর্ব্বেকার কয়েক রাত্রের অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করলাম।

এমন সময় ভুখ্‌নার মুখের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তিনি বল্‌লেন—এ কি, ও যে যোগেনবাবু ইঞ্জিনিয়ারের চাকর ভুখ্‌না। কিন্তু ও এখানে এল কি করে! ও যে কিছুদিন আগে খুন হয় এবং যে লোকটা ওকে গলা টিপে দম বন্ধ করে মারে, তার যে কোর্টে এখনও বিচার চল্‌ছে।

—গলা টিপে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, বলেন কি!

—হ্যাঁ, তাই। যে লোকটা ওকে মারে, সে লোকটা একজন বিদেশী। হঠাৎ একদিন সে সন্ধ্যাবেলা যোগেনবাবুর বাড়ীতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেই রাত্রে সেই লোকটার সঙ্গে ওর কি কথা নিয়ে না কি ভীষণ তর্কাতর্কি হয়। সেদিন আবার রাত আড়াইটার ট্রেণে যোগেনবাবুর কোথায় যাবার কথা ছিল। তিনি ওর ঘরের সাম্‌নে দিয়ে যখন যান্, তখন একটা ঝটাপটির সঙ্গে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন, এবং তখন দেখ্‌তে পান সেই লোকটা ওর বুকের উপর চেপে বসে দু' হাত দিয়ে প্রাণপণে ওর গলা টিপে ধরে মারবার চেষ্টা করছে।... যোগেনবাবু চেঁচামেচি করে লোকজন ডেকে এনে যখন সেই লোকটার হাত থেকে ওকে মুক্তি দেন, তখন ওর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। সে লোকটাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হ'ল, আর লোকজন দিয়ে দাহ করার জন্য ওর শব শ্মশান-ঘাটে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলুম। তিনি বলেন কি !...

আমি বল্‌লাম—আপনি ঠিক্ বলছেন এ সেই লোক ?

ভদ্রলোক আমার কথার উত্তরে বল্‌লেন—ঠিক্‌ই বল্‌ছি। ওই ত তার মুখের একটা দিক্ পোড়া। যদি না বিশ্বাস হয়, আমার ছেলেকে ডেকে আন্‌ছি। সেও দেখেছিল।

সেই রাত্রেই আমি বাড়ী ফিরে এলাম। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপার নিয়ে সেখানে খুব একটা হৈচৈ পড়ে গেল। কিন্তু আজও আমি এই ব্যাপারটার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। মনে মনে শুধু ভাবি—তাই ত !...

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দেবতা

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

(সহরের উপকণ্ঠে সংস্কারবিহীন বহুকালের পুরাতন একটা বাড়ীতে যে সরাইখানাটী রহিয়াছে, আসলে সেটি কিন্তু দস্যুদলের একটা আড্ডাবাড়ী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

শ্রাবণের এক দুর্য্যোগময় রাত্রি। আকাশে বিদ্যুতের চমক—বজ্রপাত—ঝড়-বাদলের মাতামাতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এমনি সময় এই সরাইখানাটীতে দস্যু-দলের প্রায় সকলেই আসিয়া জমাট বাঁধিয়াছিল। তাহা-দের মধ্যে কেহ কেহ পানাহারে মত্ত, কেহ খেলিতেছে জুয়া, কেহ বা করিতেছে গল্প। এককোণে একটী লোক সারেঙ্গী বাজাইয়া গাহিতেছে বিরহের গান—বাদল রাত্রে বুঝি বা তার কোন প্রিয়াকে সে হারাইয়াছে—

বাদল ঝরা কাজল রাতে
মনরে আমার করছে পাগল,
উদাসী মোর গানের পাখী
সুরের ব্যথায় হয়রে উতল।
আজকে ভাবের দুয়ার খুলি'
কাঁদছে গোপন বেদনগুলি;
মিলন জাগা সুখের ঘরে
আস্‌লে মরণ হিমেল শীতল।
হায় গো আজি কাঁদছে বাতাস, কাঁদছে আঁধার,
কাঁদছে দেয়া গো,
শাঙণ সজল নয়ান আমার বেদন ঝুরায়
বাঁধনহারা গো;
আজ নিশীথের বিরহ ব্যথা,
জাগায় পিয়ার বিদায় কথা;
হিয়ার মাঝে চাইলে তারে
স্মৃতির স্বপন জাগছে কেবল।

গৃহের মাঝখানে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আসনে অর্দ্ধশায়িতভাবে যে লোকটী ধূমপান করিতে করিতে ইহার এই গান শুনিতেছিল, সে এই দলের নায়ক—নাম তার দীপক। কিন্তু আশ্চর্য্য, বয়সে সে দলের সকলের চাইতে ছোট, আর রূপে সে ইহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ।

যে তিনজন বসিয়া গল্প করিতেছিল, একটা দমকা হাওয়ায় তাহাদের মাথার উপরের জানালাটা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মাঝে জলের ঝাপ্টা আসিতে লাগিল। তাই জানালাটা বন্ধ করিবার জন্য একই সময়ে তিনজনে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িতে কহিল)

প্রথম—আকাশে কি কালো মেঘ—

দ্বিতীয়—মেঘের কি গর্জ্জন—

তৃতীয়—বিদ্যুতের কি চমক—

প্রথম—হ্যাঁ, একটা রাতের মত রাত আজকের এই রাতটা।

দীপক—ঠিক বলেছিস্, একটা রাতের মত রাত আজকের এই রাতটা...কিন্তু কি চাই...কিসের প্রয়োজন এমনি রাত্রে?...

প্রথম—নারী...

দ্বিতীয়—তরুণী...

তৃতীয়—সুন্দরী...

দীপক—কিন্তু যখন সেই তরুণী সুন্দরী নারীর হয় একান্ত অভাব—তখন?...

প্রথম—তখন সুরা।

দীপক—সুরা...হ্যাঁ, তখন চাই সুরা। তাই—

(সুরা আনিবার ইঙ্গিত করিল। তাহার সেই ইঙ্গিতে একজন সুরার পূর্ণ পাত্র তাহার সম্মুখে ধরিল)

দীপক—(গ্রহণ করিয়া) হ্যাঁ, তখন এই সুরা...(পান

করিয়া) আঃ—(পান শেষে পাত্রটা একজনের দিকে ছুঁড়িয়া দিল, সে ব্যক্তি পাত্রটা লুফিয়া লইল)

—এবার তোরাও।

(যেমন সকলে মিলিয়া সুরা পানে মত্ত হইল, ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে হইল শব্দ। তাহাতে সকলেই একসঙ্গে দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখা গেল একটী তরুণীর সংজ্ঞাহীন দেহ দুই হাতের উপর বহন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে এক ব্যক্তি, তাহার পশ্চাতে আসিতেছে আরও দুইজন। তাহাদের দেখিয়া দীপক তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল এবং তরুণীটীর মুখের পানে চাহিল। চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল লালসার সুতীব্র ক্ষুধা…)

—ওরে, আসমানের এ চাঁদ তোরা ধরার বুকে আজ আনলি কি করে?

যাহারা আনিয়াছিল, তাহাদের একজন কহিল—এ চাঁদ এনেছি তোমারই জন্য রাজা, এনেছি বহুক্লেশে।

দ্বিতীয়—ওকেই করব আমাদের রাণী—

দীপক—গ্রহণ করব—তোদের এ উপহার আমি আনন্দেই গ্রহণ করব…কিন্তু রাহুর মত তোরা ওকে গ্রাস করছিস কেন—তোদের ঐ হাতের স্পর্শে চাঁদের গায়ে আর কলঙ্ক ঢালিস না—রাখ ঐখানে—রাখ—

(নিজের আসনখানা দেখাইয়া দিল, তাহারা মেয়েটীকে সেই আসনে শোয়াইয়া দিল। দীপক মেয়েটীর একান্ত সন্নিকটে আসিয়া কহিল)

দীপক—চাঁদ…চাঁদই বটে…আমি খুসী হয়েছি… তোদের এই উপহার পেয়ে আমি যথার্থই খুসী হয়েছি, তাই দিচ্ছি তোদেরও এই উপহার—

(কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা তাহাদের দিকে ছড়াইয়া দিল। তাহারা কুড়াইতে লাগিল) বাহিরে হচ্ছে বৃষ্টি—মেঘের উপর মেঘ জমে আকাশটা দিয়েছে একেবারে কালো করে, কিন্তু ঘরে আজ আমার উঠেছে পূর্ণমাসীর চাঁদ—হয়ত ভেসে উঠবে আমারই হৃদয়াকাশে…তাই আজ এই রাত্রে? —হ্যাঁ, আজ এই রাত্রে আমি করব উৎসবের আয়োজন। ওরে, তোরা উৎসবের বাজনা বাজা, তোরা কর নৃত্য, কর উল্লাস, তোরা যা' ছুটে—এনে দে আমায় ফুলের মালা।

(উৎসব আরম্ভ হইল, তাহারই কোলাহলে তরুণীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিল এবং চারিদিকে মোহাচ্ছন্নভাবে চাহিতে লাগিল। একরাশ শুভ্র ফুলের মত সুন্দর তার মুখখানি, কোশল নগরের তরুণ শ্রেষ্ঠী পুরন্দরের নব-পরিণীতা পত্নী—নাম তার বাসন্তিকা।)

বাসন্তিকা—এ আমি কোথায়?

প্রথম—স্বর্গে।

(একজন আসিয়া দীপকের হস্তে দিল রজনীগন্ধার এক গাছা মালা।)

দীপক—দীপকের অভিবাদন গ্রহণ কর দেবী।

(মালা গাছটী বাসন্তিকার পায়ের কাছে রাখিল।)

বাসন্তিকা—(বিস্ময়ে প্রথমে চাহিল তাহার দিকে, পরে কহিল) তুমি—তুমি কে?

দ্বিতীয়—এই স্বর্গের দেবতা।

বাসন্তিকা—(আর সকলের দিকে চাহিয়া লইয়া) তোমরা—

তৃতীয়—আমরাও এই স্বর্গরাজ্যের একজন ছোটখাট দেবতা।

(ইহার এই কথায় সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সেই অট্টহাসিতে বাসন্তিকার মোহাচ্ছন্নের ভাব কাটিয়া গেল। সে বুঝিল তাহার উপস্থিত অবস্থা, বুঝিয়া সে উঠিল চঞ্চল হইয়া, তথাপি সে সাহসের ভরে কহিল)

বাসন্তিকা—তোমরা আমায় এখানে এনেছ কেন?

প্রথম—তোমাকে আজ আমরা বরণ করে নেব—

দ্বিতীয়—আমাদেরই রাণী বলে।

বাসন্তিকা—(সভয়ে) রাণী করবে—আমাকে?

দ্বিতীয়—তোমাকেই—ঐ আমাদের রাজা—দেখছ না তোমারই মত ওর রূপ, তোমারই মত ওর রং, তোমারই মত ওর ঐ টানাটানা চোখ দুটো, সুন্দর আমাদের রাজা, তাই যে হবে তার রাণী, তারত তোমারই মত রূপ থাকা চাই। রাণী—রাণী—হ্যাঁ, তুমিই হবে আমাদের রাণী।

বাসন্তিকা—(ভয়ে ভয়ে কহিল) কিন্তু দেখ্‌ছ না আমার

আমার সীমন্তে রয়েছে সিন্দুরের রেখা, বুঝ্‌ছ না যে, আমি বিবাহিতা?

তৃতীয়—ও সিন্দুরের চিহ্ন আমরা মুছে ফেলে দেব।

চতুর্থ—তারপর আর সিন্দুরের চিহ্ন নয়—

দীপক—আমারই বুকের রক্ত দিয়ে এঁকে দেব ঐ সীমন্তে—সিন্দুরের রেখা নয়—রক্ত রেখা, হবে টক্‌টকে লাল, উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন আমাকেই স্মরণ করে।

বাসন্তিকা—(স্থির দৃষ্টিতে দীপকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া) ওরা তোমায় দেবতা বল্‌ল...এখানে এসে তোমায় যখন প্রথম দেখলাম, ঐ কথা আমারও মনে হয়েছিল··· কিন্তু এখন দেখছি তা' ত তুমি নও, নারীর সম্মান যে ক্ষুণ্ণ করে, সে দেবতাও নয়, মানবও নয়·· পশু—পশু—সে শুধু পশু—

দীপক—(বাসন্তিকার কথায় একবার তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল) দীপকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যদি আর কোন নারী এই কথা উচ্চারণ করত, তা' হ'লে এর জন্য তাকে কি শাস্তি পেতে হ'ত জান? (দলের সকলকে দেখাইয়া) এদের মধ্যে যে সব চেয়ে কুৎসিৎ, তাকেই আমি দান করতাম সেই প্রগলভা নারীকে, এমন দান আমি করেছি বহু, কিন্তু নারী শুধু এইবার—এই সর্ব্বপ্রথম হ'ল তার ব্যতিক্রম। (দীপক অন্যদিকে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আবার বাসন্তিকার সম্মুখে আসিয়া বেশ একটু অনুনয়ের সুরেই কহিল) আমার ঐ মালা...ও তোমার পায়ের তলায় পড়ে আছে, ঐ মালা তুমি গ্রহণ কর, তোমার কণ্ঠে ঐ মালা ঝুলিয়ে দাও—তোমার শুভ্র বক্ষ ও চুম্বন করুক, বাড়ুক ওর গৌরব। গ্রহণ কর—গ্রহণ কর ঐ মালা—

(বাসন্তিকা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল দীপকের মুখের পানে, ধীরে ধীরে তাহার সারামুখে ফুটিয়া উঠিল ক্রোধের চিহ্ন, মালা গাছটী তাহার পায়ের তলায় দলিতে দলিতে কহিল)

বাসন্তিকা—এই মালা—রজনীগন্ধার ঐ শুভ্র মুখ লজ্জায় আর ঘৃণায় আজ উঠ্‌ল কালো হয়ে। ও মালাত আজ আমার কণ্ঠে দুল্‌বে না, ওর স্থান পায়ের তলায়।

দীপক—(দেওয়াল হইতে একগাছি চাবুক লইয়া বাসন্তিকার সম্মুখে আসিয়া) সাধারণ নারী হতে তোমার স্থান একটু উপরে—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি তোমার সাহস আছে, তুমি বক্তৃতা দাও-ও ভাল। এই চাবুক—ঠিক তোমাদের মত নারী যারা, তাদের আমি সায়েস্তা করি এই চাবুক দিয়ে। খুলে ফেলে দেব তোমার গাত্রের ঐ আবরণ—নগ্ন গাত্রে চাবুকের পর চাবুক মেরে চিত্র বিচিত্র করে দেব তোমার সারা দেহ। সে এমন ভীষণ হবে যে, ভবিষ্যতে তুমি তোমার নিজের দেহের পানে চাইতে শিউরে উঠ্‌বে...দীপকের জীবনে সে কখনো কোন নারীকে দেখে মুগ্ধ হয় নি—কোন নারীর কাছে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা করে নি। অথচ দীপকের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে কত নারী—দীপকের একটু কৃপলাভের জন্য সানুনয়ে প্রার্থনা করেছে কত ষোড়শী—দীপক তাদের প্রার্থনায় ভোলে নি, তাদের রূপের মোহে দীপক তার বৈশিষ্ট্যও হারায় নি—তারা শুধু মিটিয়েছে দীপকের ক্ষুধা—দীপকের লিপ্সা। সেই দীপক আজ হ'ল মুগ্ধ—হ'ল মোহাচ্ছন্ন—এক নারীর কাছে সানুনয়ে ভিক্ষা চাইলো প্রেম—বিনিময়ে হ'ল সে হতমান। আঘাত তুমি দিয়ে আজ তাকে করেছ ক্ষিপ্ত, তাই আজ তোমাকে পেতে হবে প্রেমের পরিবর্ত্তে শাস্তি। (একজনকে লক্ষ্য করিয়া) ওরে, খুলে ফেলে দে ওর গাত্রের ঐ আবরণ···নগ্ন কর—নগ্ন কর—পুরুষের লালসাময় দৃষ্টির সম্মুখেই—ঐ নারীর—ঐ সুন্দরীর নগ্নরূপ হোক্ আজ প্রকাশিত—হোক্—

(একজন আসিয়া বাসন্তিকার গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিবার জন্য তাহার অঞ্চল স্পর্শ করিল, বাসন্তিকা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় রক্ষীসহ সহর কোতয়াল আর বাসন্তিকার স্বামী পুরন্দর সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিবামাত্র বাসন্তিকা ছুটিয়া গিয়া তাহার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল এবং আনন্দাতিশয্যে সে তাহার সংজ্ঞা হারাইল।)

(ইহাদের দেখিবামাত্র সুদক্ষ অভিনেতার মত মুহূর্ত্তের মধ্যে দীপক নিজেকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। যে লোকটী আসিয়া বাসন্তিকার অঞ্চল ধরিয়াছিল, দীপক

অতি নিষ্ঠুরভাবে তাহারই উপর উপর্য্যুপরি চাবুকের আঘাত করিতে করিতে কহিতে লাগিল)

দীপক—এই শাস্তি—এই শাস্তি—নারী—জননী, যে হীন, সে নারীকে, সেই জননীকে করে অপমান, এমন করেই আমি দিই তাকে শাস্তি। মূর্চ্ছিতা ঐ নারী—তা' হোক্, তথাপি মূর্চ্ছিতা ঐ নারীর পদতলে নতজানু হয়ে তোকে চাইতে হবে তার ক্ষমা, বলতে হবে, দেবী কৃপা কর, মার্জ্জনা কর এই অধমকে। নতজানু হয়ে প্রার্থনা কর্ ঐ দেবীর মার্জ্জনা—কর্—

(দীপকের আদেশে লোকটা তাহাই করিল)

(কোতয়ালের সম্মুখে আসিয়া) কোতয়াল সাহেব, শাস্তি ওর যথেষ্টই হয়েছে, তথাপি আমার মনে হয় ওর আরও শাস্তি হওয়া উচিত রাজদ্বারে। হ্যাঁ, তাই ওর প্রাপ্য। (লোকটীর সম্মুখে আসিয়া) আমি নিজেই রাজদ্বারে আনব এই অভিযোগ। প্রচার করব লোকালয়ে তোর এই জঘন্য প্রকৃতির কথা।

লোকটী কহিল—এবারের মত আমায় ক্ষমা কর—শুধু এইবারের মত—

দীপক—আমি পারি না, আমি স্বচক্ষে দেখেছি তোর অপরাধ, মাপ আমি তোকে করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, এই তোর প্রথম অপরাধ বলে মাপ তোকে করতে পারেন ঐ দয়ালু কোতয়াল সাহেব—আমি নই—মাপ চাইতে হয়—ক্ষমা চাইতে হয় যা' ওঁর কাছে, আমার কাছে নয়।

(লোকটী এবার কোতয়াল সাহেবের পায়ের তলায় পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল)

দীপক—(পুরন্দরের সম্মুখে আসিয়া) শ্রেষ্ঠীবর, ভগবানের দয়ায় আপনি আপনার অপহৃতা পত্নীকে আবার ফিরে পেয়েছেন, পবিত্রা ঐ নারী, এদের কুৎসিৎ দৃষ্টির সম্মুখে ওঁকে আর রাখবেন না। এখানকার বিষাক্ত নিশ্বাসে ওঁর নিশ্বাস হয়ত বন্ধ হয়ে আসবে, তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ শ্রেষ্ঠীবর, ঐ দেবীকে নিয়ে আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান। ওঁর ঐ মূর্চ্ছা ভাঙ্গুক গৃহে গিয়ে—ওর মুখ—নরাধমের ঐ মুখ মূর্চ্ছা ভঙ্গের [illegible]কে যেন আর না দেখতে হয়।

কোতয়াল—শ্রেষ্ঠীবর!

পুরন্দর—হ্যাঁ, তাই চলুন কোতয়াল সাহেব, গৃহেই ফিরে। রাজদ্বারে অভিযোগ আর আমি আনব না। সত্য, শাস্তি ওর যথেষ্ট হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, সুখী হয়েছি আমার স্ত্রীকে আবার ফিরে পেয়ে, তাই ওকে আজ আমি ক্ষমাই করলাম।

কোতয়াল—(লোকটীর পানে চাহিয়া) অভিযোগ ওঁর, উনি যখন সে অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন, ক্ষমা করে উদারতা দেখালেন, তখন সে ক্ষমার সম্মান রক্ষা করবার জন্য ক্ষমা তোমাকে আমিও কোরলাম বটে, কিন্তু তোমাকে আমার মনে রইল, ভবিষ্যতে যদি তোমার সম্মুখে আবার আমার এমনি ভাবে কখনো দেখা হয়, তখন বুঝবে ক্ষমা করা আমার ধর্ম্মও নয়—পেশাও নয়।

(তাহারা চলিয়া গেল)

দীপক—(দৃষ্টির পথ হইতে উহারা অদৃশ্য হইতেই সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, পরে সংযত হইয়া কহিল) মূর্খের দল—সব মূর্খের দল—তরুণী রূপসী পত্নীর রূপমুগ্ধ স্বামী...বাইরের দৃষ্টির পথ তার হয়েছে রুদ্ধ···দাম্ভিক, অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্মচারী, ও ত চিরদিনই অন্ধ—চিরদিনই অন্ধ—(চাবুকের আঘাত যাহাকে করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে আসিয়া) সুখী হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি তোর সহিষ্ণুতায়, তোকে আঘাত করেছি সত্য, কিন্তু সে আঘাতের যন্ত্রণা আমার এই বুকে একটুও কম বাজে নি। তোর সহিষ্ণুতা, তোর প্রভুভক্তির পুরস্কার এই স্বর্ণমুদ্রা—গ্রহণ কর্ তোর পুরস্কার।

(হাসিমুখে সে এই পুরস্কার গ্রহণ করিল)

দীপক—(পূর্ব্ব কথা মনে হইতেই) ওরা এসে দাঁড়ায় দীপকের সম্মুখে—এসে দাঁড়ায় তাকে জয় করে নিয়ে যেতে? (কি ভাবিয়া)...কিন্তু জয়ইত করে নিয়ে গেল, আমার বিজয় মুকুট ওরাত আজ জয় করেই নিয়ে গেল, আমার পরাজয়—এ আমার পরাজয়ই—

একথা মনে হইতেই পরাজয়ের বেদনায় সে যেন

অ্যান ডোভার্ক

অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল···দীপকের চিন্তিত মুখে বেদনার চিহ্ন দেখিয়া দু'-তিনজনে কি পরামর্শ করিল, একজন গিয়া লইয়া আসিল এক নটীকে। ইচ্ছা ইহার নৃত্যগীতে দীপকের চিত্ত বিনোদন করিবে। নটী দীপকের সম্মুখে আসিয়া লাস্যময়ী ভঙ্গীতে নৃত্য সুরু করিল এবং তাহারই তালে তালে গাহিয়া চলিল—

ওগো তোমায় পেলাম স্বপন বঁধু নয়ন দু'টীর মাঝ ;
দিলে রূপ-মহলার দিল্ খুলে কি রূপ-গরবী আজ।
কিবা রূপ-সায়রে চাঁদের হাসি,
আজি নীল কুমুদীর প্রাণের বাঁশী,
মাতি হাসির গানে মর্ম্মরিয়া ভাঙ্গ্‌ল মনের লাজ।
এল মোর এ কি গো স্বপন !
ঝুমুর ঝুমুর নাচের তালে বাজ্‌ছে ঘুমুর আকুল করিয়া,
কত সোহাগ ঢালিয়া।
উতল প্রাণের যৌবন উন্মন !
তরুণ মনের রঙ্গীন দ্বারে প্রেম-পিয়াসী পরাণ ভরিয়া—
রঙ্গীন নেশায় মাতিয়া।
দিলে প্রাণের বঁধু প্রেম বিলায়ে
এল ফুলেল হাওয়া মন ভুলায়ে,
বাজে আমার প্রাণের সুরবাহারে প্রেমগীতি নিলাজ !

(স্থির দৃষ্টিতে দীপক এই নবাগতা নটীটির পানে চাহিয়া রহিল। নটী তরুণী, সুন্দরী, যৌবনের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে সারাদেহে। তথাপি তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীপকের সারা অন্তর দারুণ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ইঙ্গিতে নটীকে সে তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ দিল। নটী চলিয়া গেলে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিল)

দীপক—এই নারী ! দৃষ্টির মাঝে ভেসে ওঠে কামনার ইঙ্গিত, রূপের উপর এসেছে যে পাণ্ডুরতা, প্রসাধনে করতে চায় তা' উজ্জ্বল, যৌবনের কমনীয়তা দিয়েছে বিসর্জ্জন, বরণ করে শুধু নিয়েছে তার তীক্ষ্নতা। ঠিক...এদের দলই দীপকের চরণ তলে নিজেদের লুটিয়ে দিয়েছে—আর আত্মপ্রসাদে দীপক শুধু ভেবেছে যে, দীপকের রূপবহ্নি শিখায় পতঙ্গের মতই ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই নারী, যাকে দীপক করবে কামনা...এতদিন সত্য বলে যা' মেনে নিয়েছিলাম, আজ হ'ল তা' অসত্য... অপরূপ রূপ মাধুর্য্য নিয়ে চোখের সম্মুখে দাঁড়াল এক নারী, তার রূপের স্নিগ্ধতায়, দৃষ্টির গভীরতায়, যৌবনের কমনীয়তায় দীপকের জীবনের উপর এনে দিল বিপর্য্যয়। তাই শুধু দীপকের সারা অন্তর আজ শুধু কামনা করছে সেই নারীকে, জীবন-যাত্রার পথ বেয়ে ঐ নারীকে নিয়েই আমায় চলতে হবে···আমি ওকে ভালবাসব—পূজা করব—ঐ নারী, ও দীপক প্রণয়িনী হবে না—হবে দীপক বিজয়িনী।

(কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া সকলকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিল, সকলে আসিয়া দীপকের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

দীপক—কালো আকাশের কোলে ভেসে উঠ্‌ল যে আলো, সে আলো যে দিল নিভিয়ে—

প্রথম—তাকে আমরা হত্যা করব।

দীপক—কিন্তু আকাশ ত কালো মেঘেই ছেয়ে রইল—

দ্বিতীয়—কালো আকাশে আবার আমরা জ্বাল্‌ব আলো—

তৃতীয়—ঐ নারীকেই আমরা আবার আনব লুণ্ঠন করে—

চতুর্থ—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এবার তার স্বামীকেও।

পঞ্চম—এবং তা' আজই—

ষষ্ঠ—আজই নয়, এখনই—

দীপক—তোদের যাত্রা জয়যুক্ত হোক্। বাইরের ঐ সূচীভেদ্য অন্ধকার—বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রের খেলা—বাতাসের ঐ হুঙ্কার—ওরাই হবে তোদের পথের সাথী···যদি আন্‌তে পারিস্—যদি ঐ নারীকে তোরা আবার লুণ্ঠন করে আনতে পারিস্—তবে দীপক তোদের ঐ দয়ার কথা কোনদিনই ভুলবে না। দীপক রইবে চিরদিন তোদের—

প্রথম—মাথার মণি হয়ে—

দীপক—মাথার মণি হয়ে—দীপক রইবে তোদের ভৃত্য হয়ে—তোদের বন্ধু হয়ে—

সকলেই—আনবই ঐ নারীকে—

(প্রায় সকলেই বাসন্তিকার লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল)

দীপক—কেন এল এই অমানিশার নিশি—কেন এসে দাঁড়াল ঐ নারী আমার সম্মুখে—হৃদয় কি আমার চিরদিনই অমানিশার অন্ধকার দিয়েই ছেয়ে রাখ্‌তে হবে—আজ আমার এ কি চঞ্চলতা···নারীকে শুধু কামনা করেছি চিরদিন মনের ক্ষুধা মেটাতে...কিন্তু আজ আমার শুধু ইচ্ছা করছে নারীকে ভালবাসি—শ্রদ্ধা করি।

(দীপক আপন আসনে আসিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। পূর্ব্বে যে সারেঙ্গী বাজাইতেছিল, সে তাহার সারেঙ্গীটি লইয়া দীপকের সম্মুখে আসিয়া বসিল। দীপকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সারেঙ্গী বাজাইয়া সে আবার ধীরে ধীরে গাহিয়া চলিল)

বিরহ কুহেলী নাশি
যৌবন ফুলবনে মিলন উঠিবে হাসি।
চাঁদের সহচরী
আসিবে কোজাগরী
সুখের স্বপন ধরি
পাপিয়া বাজাবে বাঁশী।
ওগো ফুল মালি, ভরিবে শূন্য সাজি,
মিলন নিশি মালা হিন্দোল দেবে আজি।
তব বিরহ মরু
পাবে গো ছায়া তরু,
বাদল ঝুরুঝুরু
নয়নে আন গো হাসি।

(ইহার এই গান শুনিতে শুনিতে দীপক তন্ময় হইয়াছিল, এমনি সময় দস্যুরা পুরন্দর আর বাসন্তিকাকে বন্দী অবস্থায় সেখানে লইয়া আসিল। ইহাদের দেখিয়া দীপকের তন্ময়তা কাটিয়া গেল, সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। বাসন্তিকার সম্মুখে না গিয়া সে প্রথম আসিয়া দাঁড়াইল পুরন্দরের সম্মুখে এবং তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু ব্যঙ্গস্বরে কহিল)

দীপক—খুবই আশ্চর্য্য হয়েছ, না? কিন্তু আশ্চর্য্য হবার এতে কিছুই নাই শ্রেষ্ঠীবর! তখনকার আমাকে দেখে তুমি হয়েছিলে অতিশয় মুগ্ধ, আর এখন হয়ে উঠেছ তুমি রীতিমত বিস্মিত—এইত? কিন্তু শ্রেষ্ঠীবর! তখন যা' দেখেছিলে, তা' শুধুই অভিনয়, আর এখন যা' দেখছ, এ হচ্ছে যথার্থ সত্য। সত্য কি জান শ্রেষ্ঠীবর; সত্য এই যে, আমি তোমার পত্নীর অসামান্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি বলেই—

একব্যক্তি—তাকে চাই—

দীপক—হ্যাঁ, তাকে চাই, তাকে চাই আমার কামনার আগুনে ইন্ধন দেবার প্রয়োজনে নয়, তাকে চাই দেবীর আসনে বসিয়ে ভালবাসবার অভিপ্রায়ে।

পুরন্দর—যদি আমার হস্ত শৃঙ্খলিত না হ'ত, তবে যে মুখ দিয়ে তুমি অনায়াসে বিষ উদ্গীরণ করছ, মুষ্ঠাঘাতে তোমার ঐ মুখ দিতাম আমি বিকৃত করে।

দীপক—বন্ধুর বন্ধন উন্মোচন কর। (একজন তাহার শৃঙ্খল খুলিয়া দিল) বাঞ্ছা তোমার অপূর্ণ রাখব না বন্ধু। (নিকটে আসিয়া) এই মুখ তোমারই সম্মুখে নিয়ে এসেছি। যদি পার বিকৃত কর একে—কর—(কণ্ঠে তাহার ক্রোধের স্বর ফুটিয়া উঠিল) কর বন্ধু—

(পুরন্দর শুধু বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল)

দীপক—তুমি কেন বন্ধু, মুষ্ঠাঘাতে দীপকের মুখ বিকৃত করতে পারে এমন লোক কোশলে কেউ কি আছে? (সকলের দিকে চাহিয়া) আছে?

সকলে—কেউ নেই।

বাসন্তিকা—(অতি সহজ কণ্ঠে) আমার এই শৃঙ্খল?

দীপক—খুলে দিতে হবে? ভুল হয়ে গেছে দেবী, তোমায় উন্মোচন করা উচিত ছিল আমার বহু পূর্ব্বে। ঐ হাতে এই লৌহ শৃঙ্খল মোটেই শোভা পায় না। তোমায় বাঁধব প্রেমের শৃঙ্খল দিয়ে। (বাসন্তিকার হাত হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া লইয়া পুরন্দরকে নির্দ্দেশ করিয়া) এবার বন্ধুকে শৃঙ্খলিত কর, ওকে আরও একটু সম্মান দেখাও—শৃঙ্খলিত হবে হস্ত—শৃঙ্খলিত হবে পদদ্বয়—হা-হা-হা...

(পুরন্দরের হস্তপদ শৃঙ্খলিত হইল। বাসন্তিকা দীপকের পানে সরিয়া আসিতে লাগিল। দেখিয়া দীপক বাসন্তিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

বাসন্তিকা—কোশলের পুরুষ যা' পারে না, কোশলের নারী তা' পারে। (এই বলিয়া বাসন্তিকা দীপকের মুখের উপর সজোরে একটী মুষ্ঠাঘাত করিয়া বসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই পার্শ্ব দিয়া দুইজন আসিয়া বাসন্তিকার দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিল)

দীপক—(একটু হাসিয়া) একটী ফুলের আঘাত মুখের উপর যতখানি অনুভব করা যায়, তোমার মুষ্ঠাঘাত ঠিক ততখানি অনুভব করেছি। (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু তোমার অসহনীয় স্পর্দ্ধায় আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছি। তোমার ঐ প্রগলভতার শাস্তি আমি ভাল করেই দিতে পারতুম...আমার ঈপ্সিত অভিলাষ যে কোন মুহূর্ত্তে পূর্ণ করতে পারি···কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা' হবে না... যে রজনীগন্ধার মালা দর্পভরে তুমি তোমার পায়ে দলেছ, সেই মালাই সযত্নে তুলে এনে স্বইচ্ছায় আমার কণ্ঠে তুলে দিতে হবে—শাস্তি তোমার এই—না দিলে শাস্তির ধারা যাবে একটু বদলে এবং তা' হবে বেশ একটু বৈচিত্র্যময়।

(অজ্ঞাত আশঙ্কায় বাসন্তিকা ভীতভাবে দীপকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল)

দীপক—সে বৈচিত্র্য হবে তোমার মৃত স্বামীর বক্ষ-রক্তে আমার ললাটে তোমার স্বহস্তে জয়টীকা এঁকে দেওয়া।

(বাসন্তিকা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)

দীপক—কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না, যদি তুমি স্বইচ্ছায় আমার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিতে পার, নইলে—

(বাসন্তিকা আরও উৎকণ্ঠিত চিত্তে দীপকের পানে চাহিল)

—নইলে শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

বাসন্তিকা—উঃ—

পুরন্দর—বাসন্তিকা!

বাসন্তিকা—স্বামী!

(তাহার নিকটে আসিতে গেল)

দীপক—(বাধা দিয়া) তা' হয় না। নারী, স্বামীর আসনে ওকে আর তোমার বসান চলবে না। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ঐ শ্রেষ্ঠী, মুক্তি তুমি ওকে দিতে পার, বন্ধন উন্মোচন তুমি ওর করতে পার, ওর মুক্তিই যদি তোমার কামনা হয়, তবে গ্রহণ কর ঐ মালা...

বাসন্তিকা—তুমি কি মানুষ!

দীপক—কে বলে? আমিত স্বীকার করি না, মানুষ যা' পারে না আমি তা' সফল করি, মানুষের যে কামনা অপূর্ণ থাকে তা' আমি করি পূর্ণ, তাই মানুষের উপরেই আমার স্থান।

বাসন্তিকা—মানুষের উপরে নয়—নিম্নে। মানুষের উপরে যে, সে হয় দেবতা। নিম্নে যে, সে পশু...প্রবৃত্তি তোমার পশুরই অনুরূপ, পশু না হলে কেউ কি কখনো করে পর নারীকে কামনা।

দীপক—করে। পর নারীকে কামনা করবার অধিকার তারই আছে, যে ক্লীব নয়। যার সামর্থ্য আছে, শৌর্য্যে বীর্য্যে যে সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারে, সে কেন করবে না শ্রেষ্ঠ নারীকে কামনা? যে হীনবীর্য্য, নারীকে রক্ষা করবার যার ক্ষমতা নাই, বিবাহের গণ্ডী দিয়ে নারীকে বেঁধে রাখবার তার অধিকারও নাই। বিবাহিত স্ত্রী বলেই সর্ব্বপ্রকার অধিকার তার উপর দাবী করা শুধু তার অক্ষমতারই পরিচয়···আমি সুন্দর—ঐ শ্রেষ্ঠীর চাইতে সহস্রগুণে সুন্দর। আমি ধনী, আমি বিদ্বান, যৌবন এখনও আমার সম্পূর্ণ করায়ত্বে, অপরিসীম আমার ক্ষমতা, সুতরাং তোমার মত সৌন্দর্য্যময়ী নারীকে লাভ করবার অধিকার আমার পূর্ণমাত্রাই আছে—আর আমি তা' করবও···

পুরন্দর—তোমার সৌন্দর্য্যে শুধু পলাশের রক্তাভা, সে সৌন্দর্য্য অন্তর স্পর্শ করে না। বিদ্বান দাম্ভিক হয় না, দাম্ভিক হয় মূর্খ। দস্যুর আবার ক্ষমতা! পাহাড়ের জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে যে করে বাস, সেত ফেরুর সমান···

(পুরন্দরের কথায় দীপক একেবারে উন্মত্ত হইয়া

উঠিল। পায়ের পাদুকা খুলিয়া সে একেবারে পুরন্দরের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিল)

দীপক—পাদুকাঘাতে তোর ঐ কণ্ঠ ক'রে দেব চিরদিনের জন্য রুদ্ধ। স্পর্দ্ধা তোর হয়েছে গগনস্পর্শী... নিয়ে যা' ওকে আমার সম্মুখ থেকে, এমনি বন্দী অবস্থায় ওকে রুদ্ধ করে রাখ গুপ্তকক্ষে, শুধু এই নিশিটুকুর জন্য। (পুরন্দরকে লইয়া চলিয়া গেলে বাসন্তিকার নিকটে আসিয়া) এর মধ্যে তুমি তোমার মন স্থির কর নারী, অবজ্ঞায় যে মালা পদদলিত করেছিলে, যদি স্বেচ্ছায় সে মালা দীপকের কণ্ঠে দুলিয়ে দিতে পার, তবে শ্রেষ্ঠীর হবে মুক্তি, নইলে উষার সঙ্গে সঙ্গে তারই বক্ষরক্তে বিজয় টীকা পরিয়ে দিতে হবে দীপকের ললাটে।

(দীপক চলিয়া গেল; তাহার পশ্চাতে দস্যুরাও প্রস্থান করিল। শুধু সেখানে রহিল বাসন্তিকা। সে সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল)

বাসন্তিকা—ভগবান বুদ্ধ! তোমার চরণে ত কোন অপরাধই করি নাই; তবে কিসের জন্য এই শাস্তি··· এ যে ভাবতেও পারি না। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা' ছিল আমার গৌরব, সে গৌরব শুধু কি তুমি লুণ্ঠিত করবে প্রভু, আমার স্বামীকে বাঁচাও, আমাকে নিষ্কলঙ্ক রেখে।

(বাসন্তিকা আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় শুধু দীপক ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল বাসন্তিকার পানে। পরে নিজ মনে কহিল)

দীপক—কেন এমন হয়...কেন এই দুর্ব্বলতা...যা' কোনদিন হয় নি, যা' কোনকালে হবার সম্ভাবনা ছিল না, আজ তাই কেন হয়। নারীর জন্য প্রাণ কেন কাঁদে... ওর দুঃখ কেন প্রাণ দিয়ে অনুভব করি...ঐ নারী... স্বেচ্ছায় যদি না এল, তবে লুণ্ঠিত দেহ নিয়ে কি করব আমি। মন আজ দেহ চায় না, চায় প্রাণ।

(দীপক ফিরিয়া গেল)

বাসন্তিকা—মৃত্যু—মৃত্যু, এ ছাড়া আর আমার অন্য কোন উপায়ই নেই, মৃত্যুই আজ আমার একমাত্র কা...। ভগবান বুদ্ধ! তুমি আমায় মৃত্যু ভিক্ষা দাও—মৃত্যু ভিক্ষা দাও···

(দীপক আবার আসিল)

দীপক—মৃত্যু নয়, অমৃত তোমায় দিতে চাই দেবী, শুধু তুমি প্রসন্ন হও।

বাসন্তিকা—অমৃত নয়, গরল—গরল, হাঁ, তাই এনে দাও, আমি সানন্দে পান করি। দাও এনে—দাও—

দীপক—দেবি!

বাসন্তিকা—আর কোনও কথা নয়। শুধু বিষ এনে দাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না—পারছি না...

(বাসন্তিকার এই কাতরতা দেখিয়া দীপক বোধ হয় দুর্ব্বল চিত্তেই সেখান হইতে পলাইয়া গেল)

বাসন্তিকা—উপায় নেই—পরিত্রাণের বুঝি কোন উপায় নেই—আত্মহত্যা—আত্মহত্যা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই—আত্মহত্যাই করব...হোক্ অন্যায়...হোক্ মহাপাপ, মৃত্যুর পর না হয় সারাজীবন অনন্ত নরকেই বাস করব। তথাপি নারী-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারব না··· স্বামীর মৃত্যুর কারণও হতে পারব না··তাই আত্মহত্যা ছাড়া আজ আমার গত্যন্তর নেই···ভগবান বুদ্ধ! অন্তর্য্যামী তুমি, তুমি সবই দেখ্‌ছ, তোমার চরণে আমার স্বামীকে অর্পণ করে অনন্ত নরকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম···শান্তি দিও প্রভু···শান্তি দিও···

(বাসন্তিকা নিজের কণ্ঠ নিজেই সজোরে চাপিয়া ধরিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দীপক সেখানে আবার আসিয়া দাঁড়াইল এবং বাসন্তিকার আত্মহত্যায় বাধা দিয়া কহিল)

দীপক—কোন প্রয়োজন নেই দেবী—পরাজিত আমি —লজ্জিত আমি—অনুতপ্ত আমি—আমার আজন্ম সংস্কার আজ চূর্ণ হয়ে গেছে···ছিলাম মোহাচ্ছন্ন হয়ে...আজ হয়েছে আমার মোহমুক্তি...চেয়েছিলাম তোমাকে,তোমার মৃত্যু আমার কামনা ছিল না···চাই না তোমার জীবন-কুসুম অকালে নষ্ট করে দিতে...সে কুসুম আপন গৌরবে

আপনি বিকশিত হোক্ (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া) তাই হোক্ তাই হোক্…তোমার মুখের হাসিই আজ আমার কামনা হোক্…সেই হাসি আজ আমার সারা জীবনে পাথেয় হোক্…

(দীপক একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করিল, তাহাদের সকল দস্যু সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপক সম্মুখের এক-জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—বন্দী শ্রেষ্ঠীকে সেখানে লইয়া আসিতে। বাসন্তিকা শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে দীপকের পানে চাহিয়া রহিল। পুরন্দরকে লইয়া আসিতেই দীপক তাহার সম্মুখে গিয়া তাহার শৃঙ্খল খুলিতে খুলিতে কহিল)

দীপক—মার্জ্জনা চাইছি শ্রেষ্ঠীবর ! সত্যই আমি আজ তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইছি, তোমার উপর যেরূপ ব্যবহার করেছি তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি, তোমাকে যে অপমান করেছি তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি। তুমি বিস্মিত হলেও এ কিন্তু অভিনয় নয়—সত্য। (শৃঙ্খল খোলা হইয়া গেল) ব্যঙ্গভরে বন্ধু বলে সম্বোধন করলেও এ মুহূর্ত্তে তোমায় আমি যথার্থই বন্ধু বলে মেনে নিচ্ছি, তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না বন্ধু, তোমার পত্নীকে তোমার করে সমর্পণ করে আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

(পুরন্দর বা বাসন্তিকার কিন্তু দীপকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না, তাহারা শুধু সন্দেহের চক্ষে দীপকের পানে চাহিয়া রহিল)

দীপক—বিশ্বাস কর বন্ধু ! এই মুহূর্ত্তে আমি যা' বলছি সারা জীবনে আমি এতখানি সরল হয়ে কথা বলি নি। স্বচ্ছন্দে গৃহে ফিরে যাও…তোমাদের জীবনে রাহুর মত আর কেউ গিয়ে উদয় হবে না। কোথা হতে বিপদ যদি তোমাদের কখনো আসে, তবে এই নূতন বন্ধুকে স্মরণ করো—তোমাদের সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে বন্ধু তোমাদের একটুও ইতস্ততঃ করবে না।

পুরন্দর—বন্ধুর কথা কি বন্ধুর মতই বিশ্বাস করিতে পারি ?

দীপক—নিশ্চয়ই পার। তোমাদের কাছে বলতে ত দ্বিধা করি নি। তোমার পত্নীর রূপে হয়েছিলাম মুগ্ধ, কিন্তু এখন মুগ্ধ হয়েছি তোমার উপর তার ভালবাসার গভীরতা দেখে…স্বামীকে নারী ভালবাসে জানি, কিন্তু যে নারী সেই ভালবাসার সম্মান রক্ষা করবার জন্য অবাধে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না—দ্বিধা করে না—মুহূর্ত্তের জন্য একটুও শঙ্কিতা হয় না, তার সেই ভাল-বাসার সম্মান না রেখে পারলাম না…তাই তোমরা আজ মুক্ত।

পুরন্দর—তোমায় ঠিক বুঝলাম না। তোমার নব নব রূপে ক্রমেই আমার বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে…যখন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম, তোমার কথার মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে তোমায় দেবতা ভেবেছিলাম…তারপর আবার যে নবরূপে তোমার দেখা পেলাম, তখন শুধু মনে করলাম তুমি শুধু শয়তান… তোমার এখনকার রূপে আমায় আবার করেছে বিস্মিত…আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু সে আনন্দ যেন পরি-পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারছি না, তুমি যেন ক্রমেই আমার কাছে এক রহস্যের আধার হয়ে উঠ্‌ছ।

বাসন্তিকা (দীপকের নিকটে আসিয়া)—তোমার চোখের দৃষ্টিতে তোমায় আমি এবার ঠিক চিনতে পারছি যে, তুমি দেবতা…তোমার চোখের যে দৃষ্টি দেখে আমি শঙ্কিতা হয়ে ছিলাম, কিছুতেই তোমার সেই দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না, সেই ভীষণ দৃষ্টি তোমার চক্ষে আর ত নেই। দৃষ্টি তোমার সহজ, সরল, প্রশান্ত, তাই তোমাকে দেবতা বলে সম্বোধন করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করতে পারছি না—সত্যই তুমি দেবতা…

দীপক—দেবতা নই—ছিলাম পশু—আজ আমি হয়েছি মানুষ…তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল এক নাটকীয়ভাবে, তার গতিও চলেছিল সেই নাটকীয়ভাবে, কিন্তু এর পরি-সমাপ্তি আমি নাটকীয়ভাবে সম্পন্ন করতে পারলাম না। করতালির লোভ নেই…তাই তোমাকে ভগ্নী বলে সম্বো-ধন না করে তোমাকে আজ আমি গ্রহণ করলাম আমার বান্ধবী বলে—তোমরা আমার বন্ধু আর বান্ধবী।

(দূরের কোতয়ালির ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। শুনিয়া দীপক কহিল)

—রজনী শেষ হবার আর বিলম্ব নেই, এই রাত্রিটুকুর মধ্যে তোমরা গৃহে ফিরে যাও বন্ধু…প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আজিকার এই বিষাক্ত রজনীর কথাটুকু শুধু বিস্মৃত হয়ো, তোমাদের কাছে আজ আমার এইটুকু মাত্র অনুরোধ…

পুরন্দর—তোমার বন্ধুত্ব আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম, এ আমাদের শ্লাঘা নয়—গৌরব…উপদেশ দিতে চাই না, বন্ধু বলে শুধু বন্ধুর কাছে এইটুকু অনুরোধ করে যাই, এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজেকে দশের মাঝে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত কর…

বাসন্তিকা—মনের আসনে তোমাকে আজ বসিয়ে নিয়ে গেলাম, মানুষের উপরে যাঁর স্থান, সেই দেবতা রূপেই…

(বাসন্তিকার হাত ধরিয়া পুরন্দর অগ্রসর হইল, তাহা-দের গমনের পথ পানে যতদূর দৃষ্টি যায় দীপক শুধু চাহিয়া রহিল—ধীরে ধীরে চক্ষু দুইটী তাহার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল…)

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

জাল উইল

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষ মাস। দেওঘরের শীতটা লোকে বলিতেছে, দশ বৎসরের মধ্যে এত জোর পড়ে নাই, তাহার উপর বৃষ্টি হইয়া গতরাত্রে বর্ষার বেহদ্দ করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া রাস্তায় আজ জনপ্রাণী বাহির হয় নাই।

অলকনাথ কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহে, কাজেই একটু রোদ উঠিয়াছে কি উঠে নাই একেবারে ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ওভারকোটটা গায়ে আছে, গায়ের কাপড় বড় একটা সে পছন্দ করে না, আজও করে নাই, সরু ছড়িখানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পথ চলিয়াছে, বুঝি সারা সহরটাই আজ সে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবে। কিন্তু বেশী দূর সে গেল না, 'উইলিয়াম টাউনে'র 'রক ভিলা' বাড়ীখানার সামনে আসিয়াই তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সে একবার কি ভাবিয়া গেট্‌টার সামনে দাঁড়াইল ও পরক্ষণে সরাসর প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

নূতন ফ্যাসানের সুন্দর বাড়ীখানি। চারদণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সে ইচ্ছা কিন্তু তাহার হইল না, সে সরাসর সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গিয়া 'কলিং বেল'টা টিপিয়া দিল।

চাকরগুলা কি আজ মরিয়াছে না কি? অলকনাথ আর একবার 'কলিং বেল'টা টিপিবে কি না ভাবিতেছে, দরজা খুলিয়া গেল, এবং চাকরের কদাকার মুখের পরিবর্ত্তে এমন একখানি সুন্দর মুখ দরজার পাশে বাহির হইল যে, অলকনাথ বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া কথা বলিবার ভাষা হারাইয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাথা ঘুরাইবারই মত রূপ বটে। বিধাতা স্বর্গের জন্য গড়িতে গড়িতে ভুল করিয়াই যেন পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সদ্য ঘুমভাঙা চোখ দু'টি এখনও তন্দ্রাতুর। তাহার মধ্যেই যেন সারা পৃথিবীর সব কিছু রহস্য নিজেকে অসহায় বোধে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ভিতর হইতে কে বলিলেন—কে ডাকছে মালতী?

এবার কথা না কহিলে নয়, তাই আমতাআমতা করিয়া অলকনাথ বলিল—মাপ করবেন, এখানে আমার এক বন্ধু ছিলেন, ক'দিন আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেছি, আজও তাই এসেছিলাম, কিন্তু তাঁরা যে চলে গেছেন জানতুম না বলেই—

কিন্তু তাহার এই কষ্টে বলা কথাগুলা শেষ করিতে হইল না। মালতীর কোন উত্তর না পাইয়া একটী প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন—বিলক্ষণ তাঁরা না হয় চলেই গেছেন, কিন্তু আমাদের আচমকা শত্রুই বা ধরে নিলেন কেন? আসুন, আসুন, তুমি ততক্ষণ চায়ের যোগাড় কর ত মা, আমি এঁর সঙ্গে গল্প করি বলিয়া ভদ্রলোক অলকনাথকে সম্বর্দ্ধনার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন।

অলকনাথ কি বলিবে বুঝিয়া না পাইয়া ভদ্রলোকের সহিত তাঁহাদের বৈঠকখানায় আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ভদ্রলোকও তাঁহার সামনের একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—দু'দিন হ'ল আমরা এসেছি, কিন্তু ভাল লাগ্‌ছে না। আচ্ছা মজার জায়গা কিন্তু, কেউ কথাই কইতে চায় না। বোধ হয় আমার এই ট্রাউজার পরা চেহারা দেখে সাহেব অবশ্য ভাবেে না, ফিরিঙ্গী-টিরিঙ্গী ঠাউরে নিয়েই বয়কট করেছে আমায়। কি বলেন? বলিয়া ভদ্রলোক হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

এই সরল প্রাণখোলা ব্যবহার অলকের কুণ্ঠা মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। সে হাসিয়া বলিল—ফিরিঙ্গী ভাবলে তাদের চোখের দোষ আছে বলতে হবে। এমন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন চেহারা—

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

[illegible]কের মত চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—মালতী, ও মালতী [illegible] যা' শীগ্‌গির, ইনি ভারী একটা মজার কথা বলেছেন [illegible]...

মাল[illegible] ধীরে ধীরে আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। ফাগমাখা মুখে [illegible]লিল—কি কথা ?

—আর কি কথা, ভদ্রলোক আমাকে একেবারে ভট্‌চায্যি বানিয়ে তুলেছেন। হাঁ মা, সত্যি বলত অমনি ধারা দেখায় না কি আমায় ? মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।

—তা'তে আর মুস্কিল কি বাবা, ব্রাহ্মণ ত বটেই, না হয়—

—না হয় কি মা, প্রায়শ্চিত্ত করি নি বলে আজও যে অনেকে আমার ছায়া মাড়ায় না।

মেয়েটী কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অলকনাথ তাহার হইয়া উত্তর দিল। কহিল—আপনার ছায়া মাড়াবার স্পর্দ্ধা তাদের হবে কোথা থেকে, অত বড় ভাগ্য করে তারা জন্মায়ও নি। দুঃখ করলে চল্‌বে কেন ?

—আপনি দেখছি, আমায় নেহাৎ অবতার পুরুষ না বানিয়ে ছাড়বেন না বলিয়া প্রৌঢ় হোহো শব্দে হাসিতে লাগিলেন।

মালতী এইটুকু কথার ফাঁকেই চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল—আপনি চিনি বেশী খান না, কম খান বলুন ত ?

অলকনাথ হাসিয়া উত্তর দিল—ঠিক বল্‌তে গেলে চা-ই আমি খাই না, তবে মিষ্টিটা বেশী ভালবাসি এইটুকু বল্‌তে পারি।

প্রৌঢ় লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—বলেন কি, এ বিংশ শতাব্দীতে এমন লোক এখনও আছে না কি যাঁরা চা [illegible] শুনেছ মালতী ?

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল—শুনলাম বই কি বাবা। তবে লোক যে আছেন, তা'তে আর সন্দেহ কি, এই ত ইনিই সামনে রয়েছেন আমাদের। বেশ ত চা নাই খেলেন, মিষ্টিও ত একটু মুখে দিতে পারেন, তাই আনছি আমি।

মালতী বাহির হইয়া যাইতেছে, অলকনাথ বাধা দিয়া বলিল—থাক্ না, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, সকালে খাওয়াটা আমার—

মালতী সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল—তবে থাক্, আমাদের এখানে খেতে যদি আপনার আপত্তি থাকে—

কথাটা কোন্‌খানে গিয়া দাঁড়াইল, অলকের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে অপ্রস্তুতের কণ্ঠে বলিল—মাপ করবেন, খেতে আমার আদৌ আপত্তি ছিল না, কিন্তু সকালে পূজা-অর্চ্চা না করে কিছু খাই না আমি। বেশ ত, বিকালে এসে যা' বলবেন, তাই খেয়ে যাব 'খন, এখনকারটাও তুলে রেখে দিন বরং।

মালতী এবার হাসিয়া ফেলিল। প্রৌঢ় বলিয়া উঠিলেন—সে একরকম মন্দ নয় মা, বেশ হবে, ওঁর সঙ্গে একবার চারদিকটা দেখেও আস্‌ব 'খন আমরা। তুমি ত বল্‌ছিলে নন্দন পাহাড় যাবার কথা, সেইদিকেই যাওয়া যাবে 'খন না হয়।

অলকনাথ বলিল—বেশত, তাই হবে। এখন তা' হলে উঠি আমি, কি বলেন ?

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—কাজেই, আপনার পূজোর সময়টা ত আর নষ্ট করতে পারি না।

অলকনাথ হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না।

দুই

পাশকুড়া গ্রামের শিরোমণি, বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত যদুপতি তর্কালঙ্কারের নাম সে যুগে যে জানিত না, তাহাকে সকলেই কৃপার পাত্র মনে করিত। তাঁহার সাত পুত্র, এক কন্যা। ব্রজবল্লভ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পিতার সহিত কিন্তু তাহার ছেলেবেলা হইতেই মতের মিল হইল না। তিনি যখন জগৎটা মিথ্যা মায়া এবং একমাত্র ভগবানই সত্য ভাবিয়া লইয়া তর্ক-শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিতেন, সে তখন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বাগানের ধারে বসিয়া জগৎটা সত্য

এবং এই গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর—কোনটাই মিথ্যা হইতে পারে না ভাবিতে সুরু করিয়া দিত।

ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একদিন সত্য-সত্যই বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তর্কালঙ্কার-মহাশয় চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন। গৃহিণী অকারণ বকুনী খাইলেন। ছেলে-পুলেরা বাবার হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তির কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আড়ালে গিয়া এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

খবর পাওয়া গেল—ব্রজবল্লভ কাহারও অনুমতি না লইয়াই বিলাত চলিয়া গিয়াছে। এবং সেখান হইতে ব্যারিষ্টারীটা পাশ না করিয়া ফিরিবে না। তাহার যাওয়া-আসার সমস্ত ব্যয়ই তাহার এক বন্ধু বহন করিবে। ইত্যাদি...

সাত পুত্রের মধ্যে একটীর ভার কমিয়া গেল বলিয়া তর্কালঙ্কার আনন্দ অনুভব করিলেন। পত্নী মোক্ষদাসুন্দরী যতক্ষণ না প্রতিজ্ঞা করিলেন জীবনে অমন কুলাঙ্গারের মুখ দেখিবেন না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ রহিল। দোষ তাঁহারই; কেন না, তিনিই জেদ করিয়া পুত্রকে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। অন্য পুত্রগুলিকে সংস্কৃত সমুদ্রে চুবাইয়া রাখিয়া তিনি কতটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তাহা জানিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, তবে বিলাত হইতে ফিরিয়া ব্রজবল্লভ বাড়ীতে ঢুকিবার অনুমতি পাইল না।

মা গোপনে চোখের জল ফেলিলেন। বাপের লাঠির বল এতটা প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে সেইদিনই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তারপর আবার বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসা যাক্। পত্নী সুষমাকে হারাইলেও তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ মালতীকে লইয়া সেই ব্রজবল্লভ এখন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। উপার্জ্জন যথেষ্ট করিয়াছেন, এখনও উপায় করিতে কোন শৈথিল্য নাই। কিন্তু বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে মালতীর জন্য বার লাইব্রেরীর মায়া কাটাইতে হয়। এবারও হইয়াছে। পৃথিবীর সব কিছু তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মালতীর একটী মুখের কথা না শুনিবার যো তাঁহার নাই। কলিকাতায় বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব হইতেই মালতী ধরিয়া বসিল—চলুন বাবা, ক'দিনের ঘুরে আসি কোথাও।

আর কথা নয়, দেখা গেল দেওঘরের 'রক ভিলা' বাড়ীখানিতে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের কোন স্থানই মালতীর অদেখা নাই; সুদূর ইউরোপেরও সব স্থান একাধিকবার সে ঘুরিয়া আসিয়াছে। কাছে পিঠের দেওঘরকে এতদিন সে করুণারই চক্ষে দেখিত, হঠাৎ কি খেয়ালে এবার সে তাহাকেই পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে।

অলকনাথ চলিয়া গেলে প্রৌঢ় বলিলেন—বিদেশে তবু একজন লোক পাওয়া গেল, না মা?

মালতী হাসিয়া বলিল—পাওয়া গেল বটে, কিন্তু টিকৃলে হয়।

—টিকৃলে হয়! কেন মা?

—দেখলেন না এই বয়সেই যে পূজোর হিড়িক। নিশ্চয়ই মাথার ছিট্ আছে।

কন্যার এ কথায় প্রৌঢ়ের কিন্তু সমর্থন বুঝা গেল না। তিনি যেন অপ্রসন্ন হইয়াই কতকটা হাসিলেন।

বৈকালের দিকে অলকনাথ যখন আসিয়া উপনীত হইল, তখন মালতী সবে তাহার প্রসাধন শেষ করিয়া আসিয়া ড্রয়িংরুমে বসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আসুন, আপনার পূজোর ব্যাঘাত হয় নি ত সকালবেলা।

অলকনাথ একটা চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিল—ব্যাঘাত! ব্যাঘাত হবে কেন? আমি ত ঠিক সময়েই বাড়ী পৌঁছেছিলুম। শিব-গঙ্গায় স্নান করে—

মালতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—এখানেও গঙ্গা আছে না কি?

অলকনাথ হাসিয়া বলিল—না, তবে বাবার বাড়ীর কাছেই একটা পুকুর আছে, তারই নাম শিব-গঙ্গা। বোধ হয়, গঙ্গারই মত পবিত্র জল মনে করেই ওঁরা ওটার নামকরণ করেছেন।

মালতী বলিল—গঙ্গা বুঝি আপনাদের খুব পবিত্র জল?

অলকনাথ মুখ তুলিয়া একবার মালতীর মুখের পানে চাহিল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—তাইত শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে, অবশ্য ইংরাজদের পুথিতে তা' লেখে না। জর্ডনের জলই তাদের একমাত্র পবিত্র বলেই শুনেছি।

কথাটার মধ্যে একটা এমনই খোঁচা ছিল যে, মালতীর মুখ মুহূর্ত্তে কঠোর হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু বাহির হইয়া আসায় সে কথা চাপা পড়িয়া গেল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই যে আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন, মালতী মা, আমাদের জলখাবারগুলো—

মালতী উঠিয়া গেল। যাইবার সময় একবার অলকনাথের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। সে মনে মনে ধরিয়া লইয়াছিল—এতক্ষণে অলকনাথ তাহাকে খোঁচা দিয়া অনেকটাই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে; হয়ত তাহার পানে চাহিয়া জয়ের হাসি হাসিতেও ছাড়িতেছে না। কিন্তু সে ভাবের বাষ্পও তাহার ব্যবহারে ধরিতে পারিল না। বরং তাহাকে অস্বীকার করিয়াই যেন সে ব্রজবল্লভবাবুর সহিত কথায় মাতিয়া গেল দেখিয়া মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। ইহার অপেক্ষাও যেন তাহার জয়ের হাসি তাহার নিকট সহজ বলিয়া মনে হইল।

তিন

পথে বাহির হইয়া প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু বলিলেন—এতক্ষণে আপনার নামটা পর্য্যন্ত জানবার অবসর হয় নি আমাদের। নিজের কথাটাই আগে বলি, তবে আপনার পরিচয় নেব। আমি ব্রজবল্লভ রায়, ব্যারিষ্টার। বাড়ী এলগিন রোড, ভবানীপুর। এটী আমার মেয়ে মালতী, একটী মাত্র সংসারের যষ্টি আমার। বি-এ পড়ে, কিন্তু এমন ভাল—

মালতী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—থাক্, আর বাড়িয়ে পরিচয় দিতে হবে না বাবা। আমার পরিচয় উনি যা' পেয়েছেন তাই যথেষ্ট, কি বলেন?

অলক হাসিল। বলিল—ঠিকই বলেছেন, সত্যকার পরিচয় ত ব্যবহারেই ধরা যায়। উনি ত একটুও বাড়ান নি, আপনার মত—

—যান্, আর লজ্জা দিতে হবে না বলিয়া রুমালখানি দিয়া মুখ মুছিয়া মালতী মুখের উপরকার পড়া এবং না পড়া চুলগুলা ঠিক করিতে লাগিল।

অলকনাথ ধীরকণ্ঠে বলিল—আমায় কিন্তু মুস্কিলে ফেল্‌লেন। সত্যিকার দেবার মত পরিচয় আমার নেই। বাবা সওদাগরী অফিসে চাকরী করতেন। 'প্লুরেসি'তে ভুগ্‌ছেন। প্রাণটা যদি থাকে, হয়ত চাকরী থাক্‌বে না। নিজের লেখাপড়াও তেমন হয় নি যে—

উৎকণিত হইয়াই মালতী এতক্ষণ তাহার কথাগুলা শুনিতেছিল, কিন্তু লেখাপড়ার কথা শুনিবার পর আর দাঁড়ান সে আবশ্যক বিবেচনা করিল না, আগাইয়া চলিল। অলক লক্ষ্য করিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না। ব্রজবল্লভবাবুকে নিজের পরিচয় দিয়া যাইতে লাগিল।

ব্রজবল্লভবাবু দীর্ঘনিশ্বাস্ ফেলিয়া বলিলেন—তাইত বড় ভাবনার কথা দেখ্‌ছি। আপনার বাবা কেমন আছেন এখন?

—মন্দ না, তবে জর এখনও একটু একটু রয়েছে বলেই ভাবনা। বাবা বৈদ্যনাথ যা' করবেন তাইত হবে, আমরা কি করতে পারি বলুন।

—তা' বই কি বলিয়া চিন্তিত মনে বৃদ্ধ আগাইয়া চলিলেন।

অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। সকলেই নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

মালতীর মনটা যেন অনেকটা হাল্কা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও অলকনাথের কথাগুলা মাঝে মাঝে তাহার মনঃপীড়ার কারণ হইতেছিল, এখন আর সেটাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। একটা অশিক্ষিত, বড় জোর অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীকে সে মানুষ বলিয়াই মনে করে না, তাহার কথা ধরিয়া দুঃখ অনুভব করিবার মত ভূতে এখনও তাহাকে পায় নাই। তাই মুহূর্ত্তে তাহার অসংযত জিহ্বা আবার একটা ব্যঙ্গ করিবার

জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে কোন উপায়ে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল।

প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবুই আবার কথা কহিলেন। বলিলেন—একদিন আমি আপনার বাবাকে দেখে আস্‌ব, কেমন অলকবাবু?

অলকনাথ বলিল—বেশ। কবে যাবেন বলবেন আমায়, আমি নিয়ে যাবো। কিন্তু 'বাবু' বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না, আপনি আমার পিতার সমান, আমাকে তুমি বললেই আমি খুসী হবো।

প্রৌঢ়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তাই হবে বাবা, অলক বলেই ডাক্‌ব তোমায়।

নন্দন পাহাড় ছোট্ট হইলে কি হয়, ব্রজবল্লভবাবু কিন্তু তাহাতে উঠিতে চাহিলেন না। বলিলেন—আমায় বাদ দিয়ে তোমরাই দেখে এস দু'জনে। ওইটুকু উঠ্‌লে যে দম আমার বেরিয়ে যাবে, সাতদিনেও তা' জমা করতে পারব না।

মালতীরও কেমন উঠিবার উৎসাহ হইতেছিল না। সে বলিল—কাজ নেই, থাক্‌ গে। চলুন, ফিরে যাই।

অলকনাথ ধীরকণ্ঠে বলিল—তবে একটু দাঁড়ান, এখনই ঘুরে আস্‌ছি আমি।

মালতীর মুখে অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—কেন বলুন ত, ওখানেও ঠাকুর-টাকুর আছে না কি?

অলক লজ্জিত হইয়া বলিল—অনুমান আপনার মিথ্যা নয়, ঠাকুরই আছেন বটে, শিব-প্রতিষ্ঠা আছে। এতটা এসেও একবার না গেলে মন খারাপ হয়ে যাবে। একটু দাঁড়ান না, আমি এখনই এলুম বলে। না হয় আপনারা আস্তে আস্তে এগোন, আমি ঠিক ধরে নিতে পারব।

প্রৌঢ় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। বলিলেন—না না, এগোব কেন? তুমি ঘুরেই এস না বাবা।

অলক অগ্রসর হইয়া গেল। রমণীসুলভ কৌতূহল কিন্তু মালতী এখনও জয় করিতে পারে নাই। খানিক দাঁড়াইয়া তারপর সে বলিল—চলুন, পাহাড়টাও অন্ততঃ ঘুরে আসি।

পাহাড়ের উপর ছোট একখানি মন্দির, সামনের খানিকটা জায়গা যাত্রীদের বসিবার জন্য পড়িয়া আছে, তাহার পর একটা দরজা পার হইলেই শিবের বেদী। এদিক ওদিকে দু'-একখানি পূজোপকরণ পড়িয়া আছে। দরজার বাহিরে পূজারী বোধ করি যাত্রীদেরই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

অলকনাথ আসিতেই তিনি অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইলেন। মালতীকে বসিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেনও, কিন্তু মালতী সে কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। মন্দিরের পানে চাহিল না পর্য্যন্ত। এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

অলক যখন মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার কপালে পূজারীর দেওয়া একরাশ সিন্দুর জ্বলজ্বল করিতেছে। হাতের চরণামৃত পান করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল—একটু দেরী হয়ে গেল আমার, উনি কিছুতেই ছাড়লেন না, কাজেই...

মালতী সে কৈফিয়তে কাণ দিল না। দিবার সময়ও বুঝি ছিল না। সোৎসুকে প্রশ্ন করিল—ও কি খেলেন আপনি?

—চরণামৃত।

—চরণামৃত! কার?

মালতীর এ প্রশ্ন শুনিয়া অলকের হাসি পাইল, কিন্তু সে না হাসিয়াই ধীরকণ্ঠে কহিল—দেবতার। পূজার পর তাঁর ফুল-বিল্বপত্র ধোয়া জলকেই আমরা চরণামৃত বলি।

—ওঃ বলিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া মালতী অগ্রসর হইয়া চলিল।

প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু বলিলেন—কেমন মন্দির দেখলে মা, বিগ্রহ—

মালতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ওসব দেখবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। দেখেছেন অলকবাবু—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন বাবা, কেমন দেখেছেন। মা গো, নোংরা

জলগুলো কেমন করে উনি খেলেন, এখনও আমার গা ঘিন্‌ঘিন্ কর্‌ছে কিন্তু!

প্রৌঢ় সবিস্ময়ে বলিলেন—নোংরা জল!

মালতীকে উত্তর দিতে হইল না, অলকই হাসিয়া তাহার হইয়া জবাব দিল—উনি চরণামৃতর কথাই বল্‌ছেন হয় ত। তা' নেহাৎ মিথ্যে বলেন নি কাকাবাবু, *যাঁরা কখনও ওসব খান নি, তাঁদের কেমন লাগাই ত সম্ভব।*

প্রৌঢ়ের মুখখানি কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মলিন হইয়া গেল। তিনি ভাল করিয়া একবার মালতীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া হাসিতে চাহিলেন, কিন্তু ঠিক হাসি আসিল না, কাশিতে কাশিতে তিনি যেন কন্যাকে সমর্থন করিয়াই পথ চলিতে লাগিলেন।

চার

বাড়ী ফিরিয়াই কিন্তু মালতী ব্রজবল্লভবাবুকে ধমক দিয়া উঠিল। বলিল—আপনার কি একটুও বুদ্ধি নেই বাবা, শুন্‌লেন অমন বিশ্রী রোগ, তবু কেমন করে বল্‌লেন ওদের বাড়ী যাবেন বলুন ত?

ব্রজবল্লভবাবু হাতের লাঠিটা ঘরের এককোণে রাখিতে রাখিতে বলিলেন—কাদের বাড়ী যাব বল্‌লুম মা?

মালতী ঝাঁজিয়া উঠিল—কাদের বাড়ী আবার, অলক-বাবুর বাড়ী।

—ওঃ, মনে পড়েছে বটে, কিন্তু গেলে ক্ষতি কি হ'বে মা, বলা উচিত নয়, যদি কখন আমারই ও রোগ ধরে তুমি কি—

মালতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—বাবার যেমন কথা! আপনার সঙ্গে কার তুলনা কর্‌ছেন আপনি। ওরা আমাদের কে? ওদের জন্যে কেন আমরা স্বেচ্ছায় বিপদকে ডেকে আন্‌ব? আর যদি কখনও ও কথা মুখে আন্‌বেন, মস্ত ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু বলিতে বলিতে সে একেবারে প্রৌঢ়ের বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

পরম যত্নে তাহার মাথাটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রৌঢ় বলিয়া উঠিলেন—তাই হবে মা, দেখ্‌ব কতদিন এই বুড়োকে ধরে রাখ্‌তে পারিস তুই। আমি না হয় নাই গেলুম। কিন্তু আমার ইচ্ছে অনিচ্ছার ওপরওয়ালা যখন ডাক দেবে, তখন কেমন করে তাকে ফেরাবি বল্‌ত?

—যেমন করে পারি ফেরাব, সে ভাবনা এখন ভাবতে *হবে না, দেখ্‌তে পাবেন তখন বলিয়া বিদ্যুৎগতিতে মালতী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।*

যত বড় বিরুদ্ধ ভাবই থাকুক না কেন, অধিক দিন মেলামেশার ফলে সেটুকু একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও সহনযোগ্য হইয়া যায়-ই, না হইলে সংসারে টিকিয়া থাকাই দুর্ঘট হইয়া উঠিত। তাই অলকনাথকে খুব ভাল না লাগিলেও দিনের পর দিন মেলামেশার ফলে ক্রমশঃ মালতীর নিকট নেহাৎ তাহাকে মন্দ লাগিত না। মনের ভুলে অনেক সময়ই সে ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে অলকনাথকে প্রশ্ন করিয়া বসিত। কিন্তু পরক্ষণেই সে প্রশ্ন প্রত্যাহার করিয়া লইতেও ভুলিত না। আহা! লেখা-পড়া যে জানে না, তাহাকে এত বড় লজ্জায় ফেলা উচিত হয় নাই বলিয়া সে সময় সময় ক্ষমা চাহিতেও ভুলিত না। অলকনাথ মাথা নীচু করিয়া তাহার এই মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইত। এমন কি, অপদস্থ হইবার ভয়ে অনেক সময় সে মালতীর সঙ্গে মিশিতেও যেন সে কিন্তু কিন্তু বোধ করিত। তাহার এ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিয়া মালতী মনে মনে হাসিত। অনুকম্পায় তাহার সারা অন্তর ভারী হইয়া উঠিত।

প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু কিন্তু কোন কথাই বলিতেন না। যখন মালতী অলকনাথের সহিত ভাল ব্যবহার করিত, তখন তাহার মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আবার যখন সে ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিত, তখনও তিনি হাসিতেন; তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, তাহার মধ্যে প্রাণের যেন কোন যোগ নাই। যেন...

এই একঘেয়েত্ব বোধ করি অদৃষ্ট পুরুষের ভাল লাগিল না।

দিন দুই হইল অলক আসে নাই, প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু ভিতরে এবং বাহিরে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। মালতীও

একটু যেন অসুবিধা মনে মনে অনুভব করিতেছিল, কিন্তু মুখে বলে নাই।

এমনই এক সময় একটী কেতাদুরস্ত যুবক শিস্ দিতে দিতে একেবারে ঘরের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'মে আই কাম্ ইন্?'

প্রৌঢ় সবিস্ময়ে কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। কন্যা কিন্তু কণ্ঠস্বরেই চমকিয়া উঠিয়াছিল। চঞ্চল চরণে ঘর হইতে বাহির হইতে হইতে বলিল—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াই মালতীর সহিত 'হ্যাণ্ড সেক্' করিতে করিতে যুবকটী বলিয়া উঠিল—'হাউ আর ইউ মিস্ মালতী, আই এম্ ভেরী প্লিজ্ড্ টু সি ইউ।'

প্রৌঢ়ের কাণে কিন্তু এই ইংরাজি কথাগুলা বিশ্রী ঠেকিল। কি জানি কেন তিনি অসচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে লাগিলেন। মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ভাল আছ বাবা?

এতক্ষণে যুবকটীর হুঁস হইল—ঘরের মধ্যে আর একজন রহিয়াছেন বটে। কিন্তু 'ভাল আছ বাবা'টা শুধু তাহারই কাণে যে শুধু আঘাত করিল তাহা নহে, মালতীর নিকটও কেমন বিসদৃশ ঠেকিল। যাহা হউক, ইহাকেও ত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কাজেই যুবকটী মুখ কাচুমাচু করিয়া কহিল—হ্যাঁ, আপনি—

প্রৌঢ় হাসিলেন। বলিলেন—ভালই ত আছি বলে মনে হয়। কবে ফিরলে?

—দিন পাঁচেক হ'ল। ফিরেই আপনাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম এখানে এসেছেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 'এনগেজ-মেণ্ট' মেটাতে ক'দিন কেটে গেল। আজ জোর করেই বেরিয়ে পড়েছিলুম বলিয়া সে ডান হাতখানি ব্রজবল্লভ-বাবুর দিকে 'সেকহ্যাণ্ড' করিবার জন্য বাড়াইয়া দিল।

পাঁচ

বিকালের দিকে জলযোগ শেষেও ব্রজবল্লভবাবুর বেড়াইতে যাইবার গা নাই দেখিয়া মালতী বিস্ময় অনুভব করিল। বলিল—চলুন বাবা। বেলা হ'ল, বেরুবেন না?

ব্রজবল্লভবাবু বলিলেন—একটু থাক না মা, চাকরটা এলেই...

—ও, অলকবাবুর খবর না পেয়ে বুঝি যেতে চাচ্ছেন না। বেড়িয়ে এসে শুনবেন 'খন, তার জন্যে ক হয়েছে। কোথাও পূজো-টুজো—

যুবকটী চশমাখানি একবার চোখ হইতে খুলিয়া মুছিয়া আবার চোখে দিয়া বলিল—অলকবাবু!

—তার কথা আর বলবেন না। 'আন্‌ক্যালচার্ড পিপ্‌লস্' যা হয়, একেবারে তাই। তবু বিদেশে লোক নেই বলে ক'দিন মিশতে হয়েছিল। কিন্তু হেসে বাঁচি নি! পথে বেরুলে আর রক্ষা নেই, কেবল হাত মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে চলেছে। বললুম—কি হ'ল অলকবাবু?

—আজ্ঞে, ওখানে শিবের মন্দির রয়েছে, তাই—

—চেয়ে দেখলুম এক গাদা ভাঙা ইট, বুঝি কোনকালে এখানে কোন মন্দির-টন্দির ছিলও বা, তারও ওপর মাথা ঠোকা হচ্ছে।

যুবকটী একটী সিগারেট মুখে দিয়া আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিল—'ইডিয়ট!' তার জন্যে আবার ব'সে থাকতে হবে না কি? চলুন, আমরাই না হয় বেরিয়ে পড়ি। উনি ততক্ষণ—

মালতী একবার বাবার মুখের পানে চাহিল। বলিল—যাবেন না বাবা?

ব্রজবল্লভবাবু হাসিয়া বলিলেন—বললুম ত মা, একটু পরে বেরুব। বেশ ত, তুমি যদি ইচ্ছা কর, ঘুরে আসতে পার।

মালতী বলিল—তবে তাই যাই। আপনি আসবেন 'খন বলিয়া যুবকটীকে লইয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ড্রয়িংরুমে ঢুকিয়া দেখিল ব্রজবল্লভবাবু নাই। সবিস্ময়ে মালতী ডাকিল—বাবা!

চাকরটা সংবাদ দিল, তিনি বাড়ী নাই। তাহারা বাহির হইয়া যাইবার পরই বুধন ফিরিয়া আসিয়া কি বলিতেই তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

কি জানি কেন মালতীর বুকে গিয়া কথাগুলা 'খচ্'

করিয়া বিঁধিল। কিন্তু সেভাব প্রকাশ না করিয়া সে চায়ের সরঞ্জাম আনিতে বলিয়া যুবকটীর সহিত গল্প করিতে লাগিল।

বিলাতের কোন কথাই মালতীর অজ্ঞাত নাই, তথাপি ছেলেটীর মুখে সেখানকার সব ভাল এবং আমাদের এখানকার সব মন্দর গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল। এক সময় ছেলেটী বলিয়া বসিল—আপনার বাবাকে কিন্তু আর একবার বিলেত ঘুরিয়ে আনা দরকার। কিছু মনে করবেন না, তাঁর মধ্যে যেন কেমন একটা 'ড্যাল্‌নেস্‌' এসে পড়েছে।

মালতীর মনের কথাও বুঝি তাহাই। সে বলিল—মনে করব কি, আমারও তাই মত। এই দেখুন না, কোথাকার কে একটা বাঙালীর জন্যে তার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বারবার বারণ করে দিয়েছি, ওদের ওখানে যাবেন না। সে কথা পর্য্যন্ত শোনা হ'ল না। জানেন, তাদের বাড়ী কি শক্ত অসুখ—'প্লুরেসি।'

যুবকটী লাফাইয়া উঠিল। বোধ করি চোখের চশমাখানি তাঁহার পৈত্রিক পুণ্যবলেই রক্ষা পাইয়া গেল। সেখানি ধরিয়া ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল——প্লু—রে—সি! বিলেতে বলে—

কিন্তু তাহার কথা সমাপ্ত হইবার সুযোগ পাইল না। প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—বিলেতে কি বলে নির্ম্মলবাবু?

যুবকটী মাথার চুলগুলায় হাত বুলাইতে লাগিল। মালতী জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গিয়েছিলেন বাবা?

—অলকের শরীর খারাপ হয়েছে শুনে একবার দেখে এলুম মা। না, বেশী কিছু নয়, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই হবে বোধ হয়। ঠাণ্ডা লেগে ক'দিন ভুগ্‌ল বেচারী।

—ভুগুন গে। কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমি কি কর্‌ব বলুন ত? পইপই করে বারণ করে দিলুম ওদের ওখানে যাবেন না, বলা যায় না, যদি—

—অসুখ ধরে। ধর্‌লই বা মা, বুড়ো বাপের সেবা কি আর কর্‌তে পারবে না তুমি, খুব পারবে বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

নির্ম্মল ও মালতী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

ছয়

ব্রজবল্লভবাবুর অনুমান মিথ্যা নয়। দু'-একদিনেই অলকনাথ নিজেকে সামলাইয়া লইল। সেদিন যখন সে ব্রজবল্লভবাবুদের সহিত দেখা করিতে আসিল, তখন ব্রজবল্লভবাবু ভিতরের ঘরে কি সব লেখাপড়া করিতেছিলেন। ড্রয়িংরুমে বসিয়া বসিয়া নির্ম্মল ও মালতী গল্প করিতেছে। অলকনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়াই 'হক্‌চকিয়া' গেল। নির্ম্মল বিলাতী বুল ডগেরই মত খিচাইয়া উঠিল—'হোয়াট্‌ এ ফুল ইউ আর!'

বোধ করি এটুকু ইংরাজিটা বুঝিবার মত বিদ্যাও অলকনাথের নাই। সে অপ্রতিভের দৃষ্টিতে মালতীর মুখের পানে চাহিতেই মালতী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—অলকবাবু ভয় পেয়ে গেছেন। ভয় নেই, বসুন। উনি বল্‌ছেন—আপনার বুদ্ধি নেই, কারও বাড়ীতে ঢুক্‌তে গেলে আগে থেকে সাড়া দিয়ে তারপর তার অনুমতি নিয়ে তবে ঢুক্‌তে হয়। এমন কি, নিজের স্ত্রীর কাছে হলেও। বিলাতে এ যে না করে, তাকে মূর্খ বলে। কিন্তু আপনার বৃথা রাগ মিঃ বটব্যাল, শুধু অলক নয়—অলকবাবু বলিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল—বাঙালী মাত্রেই বোধ করি এমনই 'আন্‌সিভিলাইজ্‌ড।' দুঃখ হয়, এরাই আবার শিয়ালের মত চীৎকার করেন—স্বাধীনতা চাই বলে।

অলকনাথ ভয়ে ভয়ে সাম্‌নেরই একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মল তাহার চেয়ারের হাতলটায় পা তুলিয়া দিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—তা' যা' বলেছেন। এই নিয়ে যে কত হাসাহাসি হ'ত আমাদের মধ্যে তার আর কি বল্‌ব! মিস্‌ লোবো ত আমাকে দেখ্‌লেই বল্‌তেন—কি খবর ব্যাটবল, তোমাদের স্বরাজের কতদূর? বল্‌তুম—আমাদের বলবেন না। আমাদের স্বরাজ এই বিলেতে। যতগুলো...

দুইজন হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। অলক সহাস্যে

বলিল—তা' যা' বলেছেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছেও অনুমতি নিয়ে কেন ঘরে ঢুকতে হবে বলুন ত? তাঁরা এমন অবস্থায় থাকেন বোধ হয় যার জন্যে স্বামীরও যাওয়া উচিত নয় সেখানে?

—নন্‌সেন্স। বলিয়া নির্ম্মল মুখ বাঁকাইল।

মালতীও মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—'হোপ্‌লেস্ কণ্ডিসন্।' এঁদের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়াও ভুল দেখ্‌ছি। চলুন, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গেই কথা বলুন বরং বলিয়া মালতী সত্যসত্যই উঠিয়া পড়িল এবং পিতাকে সংবাদ দিয়া নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা যখন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু আর অলক দুইজনে বসিয়া কি কথা কহিতেছে কে জানে!

তাহাদের দেখিয়াই অলক একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। দুইজনে দুইখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে মালতী বলিল—আজও আপনার বেড়াতে বেরুন হ'ল না বাবা?

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন—কই আর হ'ল মা। দু'জনে মিলে গল্প করতে করতেই সময় কেটে গেল। কতদূর গিয়েছিলে তোমরা?

—কোথায় আর যাব বলুন, মন্দিরেত আর আমাদের স্থান নেই, কাজেই বাহান্ন বিঘাটাই ঘুরে এলুম।

অলক হাসিয়া বলিল—মন্দিরে আপনাদের স্থান নেই কে বল্‌লে মালতী দেবী, তবে বাহান্ন বিঘাতেও ত ভগবান আছেন।

—রক্ষে করুন! বাহান্ন বিঘায় আর তাঁকে থাকতে হবে না। আপনাদের ভগবানের ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ! অমন করে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে শেষটা ঘাড়ের ব্যামো দাঁড় করাতে চাই না আমি।

নির্ম্মল হাসিয়া উঠিয়া তাহার কথাটাকে মূল্যবান বলিয়াই প্রমাণ করিয়া দিল। বলিল—আপনার কথাটা কিন্তু ভাল হ'ল না। ভগবান কি ঘোড়া যে, তাঁর ক্ষুর থাকবে? এখনই অন্য লোকে হয় ত রেগে আগুন হয়ে যাবে।

যাহাকে 'ঠেস্' দিয়া নির্ম্মল এই কথাগুলা বলিল, সে কিন্তু তাহা গায়ে মাখিল না। বলিল—ঠিকই বলেছেন নির্ম্মলবাবু, রাগ করব কেন, ঘোড়ার ক্ষুরেও ত তিনি আছেন। তিনি যে—

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। ও সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার। বসুন নির্ম্মলবাবু, একটু চার যোগাড় দেখি আমি বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল। লোকটাকে ঠিক্ সময়ে আঘাত করিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার ভারী আনন্দ হইতে লাগিল। দরজার পাশ হইতে সে একবার তাহার পাণ্ডুর মুখখানি দেখিতেও চাহিল, কিন্তু সেখান হইতে তাহাকে দেখা যাইতেছিল না বলিয়া বাধ্য হইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অলক চলিয়া গিয়াছে।

প্রৌঢ় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—অলকের একটা বিশেষ কাজ আছে বলেই সে চলে গেল, তোমায় বল্‌তে বলে গেল মা, তুমি যেন না কিছু মনে কর।

মালতী মুখ ঘুরাইয়া সে কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়াই চায়ের পেয়ালা লইয়া চা প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—ওর জন্যে মনে করবার আছে এতটা। ভাবতে পারে—লোকটা আচ্ছা আহাম্মক ত!

সাত

সেদিন বৈকালিক ভ্রমণ শেষে মালতী ও নির্ম্মল যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতির মত উভয়েরই অন্তর জমাট বাধিতে সুরু করিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া আজ আর ড্রয়িংরুমে বসিবার প্রবৃত্তি হইল না। মালতী সরাসর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেল। নির্ম্মল বাহিরের কম্পাউণ্ডটায় ঘুরিতে লাগিল।

প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবু তখন ভিতরে একটা ঘরে ইজি-চেয়ারটার উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন। মালতী ধীরে ধীরে তাঁহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। খানিক চুপ করিয়া কি ভাবিয়া সে ডাকিল—বাবা।

প্রৌঢ় উত্তর দিলেন—কি মা?

প্রথমটা কিন্তু চেষ্টা করিয়া মালতী আর কথা কহিতে পারিল না। শেষে বহুকষ্টে বলিল—এ কি সত্যি?

—কি সত্যি মা?

—নির্ম্মলব বুকে সাক্ষী হিসাবে আপনার যে উইলে সই করতে বলেছেন, তা'তে সমস্ত সম্পত্তি থেকেই আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

প্রৌঢ় চোখ চাহিলেন না, পা দুইটা নাড়িতে লাগিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন—নির্ম্মলবাবু মিথ্যা বলে নি মা।

ইহার পর যে কি কথা বলা উচিত মালতী খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কান্নার ভারে যেন তাহার সারাদেহ ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

—জানতে পারি কি বাবা, এতবড় অন্যায় করবার প্রবৃত্তি আপনার কেন হ'ল? এই যদি আপনার মনে ছিল, আমাকে ছেলেবেলায় বিষ খাইয়ে মারলেন না কেন আপনি।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন—বিষ খাইয়ে মারার সম্পর্ক নয় বলেই মারি নি মা। তা' ছাড়া, যে বাংলার লোকের গড়পড়তা আয় দিন একআনা পয়সাও নয়, যেখানে মাসে তোমার জন্যে ত্রিশ টাকা মাসোহারা কিছু অন্যায় হয় নি বলেই আমি মনে করি।

আর কথা কহিবার প্রবৃত্তি মালতীর হইল না। সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেই বোধ করি পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রৌঢ় একবার চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তারপর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

রাত্রি তখন কয়টা কে জানে!

নির্ম্মলেরও বোধ করি ঘুম হয় নাই। মালতী তাহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইতেই নির্ম্মল উঠিয়া বসিল। বলিল—এত রাত্রে?

মালতী হাসিল। ধীরকণ্ঠে বলিল—আপনার একটা অনুরোধের জবাব মনে পড়ে গেল, তাই ছুটে এলুম। আমি আর এখানে একদণ্ডও থাকতে চাই না, আমায় নিয়ে চলুন আপনি। আপনি আমার জন্যে বাবার অনুমতি চাইবার প্রার্থনা করেছিলেন, তার আর দরকার হবে না। আমি মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছি।

নির্ম্মল একবার তাহার সুন্দর মুখখানির পানে চাহিল। মনে হইল অনেক কথাই, কিন্তু সব চেয়ে বড় চিন্তাটাই তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, পূর্ব্বের মালতী আর এখনকার মালতীতে আসমান্ জমিন্ তফাৎ। তখন তাহারই গলগ্রহ হইয়া সে দিব্য আরামে বার লাইব্রেরী আর ঘর করিতে পারিত। কিন্তু এখন মালতীরই বোঝা বহিবার জন্য তাহাকেই ঘর বাহির করিতে হইবে। ব্রজবল্লভবাবুকে সে মনে মনে জানিত—যাহা তিনি একবার সঙ্কল্প করেন, তাহা হইতে কোনো কিছুতেই আর তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। বিবাহের পর যে উইল রদ হইবে, তাহা ত নয়ই, তাড়াতাড়ি উইল রেজিষ্ট্রী হইয়া যাইবে বটে।

তাহার এ মৌনতা কিন্তু মালতীর মনে সংশয়ের পাহাড় খাড়া করিয়া দিল। সে একবার ভাল করিয়া নির্ম্মলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—চুপ করে রইলেন কেন নির্ম্মলবাবু? ও, বুঝেছি। তা' হলে আপনি আমাকে চান নি, চেয়েছিলেন আমার বাবার টাকাকে—না? বলিতে বলিতে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত মালতী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার নিজের ঘরে গিয়া শয্যাশ্রয় করিল।

নির্ম্মল নিজের বোকামীর জন্য বিধিমতেই আপনাকে পীড়ন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় এ সে কি করিল। এমন একজন সুন্দরী—কিন্তু সর্প দৃষ্টে যেমন মানুষ শিহরিয়া উঠে, নিজের শয্যায় প্রৌঢ় ব্রজবল্লভবাবুর দেওয়া টেলিগ্রামখানি দেখিয়া তেমনই সে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে লেখা রহিয়াছে—তোমার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। কতদিনে তুমি আমায় লইয়া যাইবে প্রিয়তম! আর একটা নূতন খবর দিতেছি—আমাদের ঘরে নবাগত অতিথি আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কিছু টাকা পাঠাইতে ভুলিও না। ইতি,

তোমার—

বে

সে ধীরে ধীরে আবার শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মাথাটা ঘসিতে লাগিল।

আট

মালতীর পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন রৌদ্র জোর করিতে সুরু করিয়াছে। তথাপি সে শয্যা-ত্যাগ করিল না। চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল।

আর যাহাই হউক, এ বাড়ীর অন্ন সে আর গ্রহণ করিবে না। কাল রাত্রি হইতে একফোঁটা জল পর্য্যন্ত সে মুখে দেয় নাই। তৃষ্ণায় তাহার জিহ্বাটা নীচের দিকে টানিতেছে, তবু সে একবিন্দু জল স্পর্শ করিবে না। কিন্তু কোথায় যাইবে?

আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে আজ আর একটা লোকের কথাও তাহার মনে হইল না, যে তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে, দুইদিন খাইতে দিতে পারে।

নির্ম্মলের নিকট মুখ দেখাইতেও তাহার গাটা ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া উঠিল—ছি ছি, সে কি মনে করিল তাহাকে! হয়ত এই লইয়া সে তাহার বন্ধুবান্ধবের কাছে কত হাসিই না হাসিবে। যে দেহটাকে সে নিজের একান্ত গৌরবের বস্তু মনে করিয়া এতদিন নানা ছাঁদে নানা রঙে সাজাইয়াও তৃপ্তি পায় নাই, আজ সেইটাকেই যেন তাহার সব চেয়ে অপরাধের বলিয়া মনে হইল। তাহার শয্যার ঠিক্ সামনেই একখানি আরসী ঝুলান ছিল; এমন ভাবে—যেখান হইতে সে বিছানায় শুইয়া শুইয়াও নিজের প্রতিবিম্বটা তাহার মধ্যে দেখিতে পায়। আজও সে দর্পণ তাহাকে বুকে করিয়া আছে, কিন্তু ইহা যেন তাহার নিকট অসহ্য ব্যঙ্গ বলিয়াই মনে হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে সেখানি উল্‌টাইয়া দিয়া আবার আসিয়া শুইয়া পড়িল।

কাল হইতে হয়ত বাবারও খাওয়া হয় নাই মনে পড়িতেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তা' ক্ষণিকেরই জন্য। আজ না হয় সে বাবার চিন্তা করিতেছে, কিন্তু কাল···

বাহিরে কাহার কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অলক আসিয়াছে না? কিন্তু সে আসিয়াছে বলিয়া তাহার এত উল্লাস কেন? মৃদু হাসিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। মনের অন্তরালে লুকান অনেক দিনের অনেক কথাই বায়স্কোপের ছবির মত তাহার সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। কতদিন কত রকমেই না সে ওই লোকটাকে অপদস্থ করিয়াছে। ধনের গদীতে বসিয়া মনের দেবতাকে গ্রাহ্যই করে নাই। আজ সেও তাহারই মত দরিদ্র। শুধু তাহাই নহে, হয়ত তাহারও অনুকম্পার পাত্র। অলক যখন তাহার অবস্থার কথা শুনিবে, সেও হয়ত খুব একচোট হাসিবে। কিন্তু মন সায় দিল না। আর যাহাই হউক, আর যে যাহাই করুক, সে নিশ্চয়ই হাসিতে পারিবে না। সে যে দুঃখী, দুঃখের বেদনা তাহার নিকট উপহাসের বস্তু হইতে পারে না।

অলক তাহার দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—মালতী দেবী!

এ স্বর যেন অমৃত বর্ষণ করিল বলিয়াই মালতীর মনে হইল। সে কাণ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া ওই মধু সঞ্চয় করিয়া লইতে লাগিল। আবার অলক ডাকিল—মালতী!

মালতী আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল।

অলক তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল—এ কি হয়েছে আপনার! অসুখ করেছে? এখনি ডাক্তার ডেকে আনি আমি বলিয়া সে বাহিরের দিকে পা বাড়াইল।

কিন্তু মালতী তাহাকে যাইতে দিল না, আপনার শয্যার উপর বসাইয়া বলিল—ডাক্তারে এ অসুখ সারাতে পারবে না অলকবাবু। বসুন, কথা আছে আমার।

অলক সবিস্ময়ে মালতীর মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

মালতী বলিল—ইচ্ছে হলে যে অপরাধ আপনার কাছে করেছি, স্বচ্ছন্দে তার প্রতিশোধ নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু—

বাধা দিয়া অলক বলিল—কি বাজে বক্‌ছেন আপনি!

—বাজে বকি নি অলকবাবু। বাজে অনেক বকেছি, কিন্তু আজ আর বক্‌ব না, বক্‌বার সময় নেইও। আজ আমি ভিখারী। জগতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আমার বোঝা আপনি নেবেন? আমাকে আশ্রয় দেবেন

আপনি? বলিতে বলিতে সে 'খপ্' করিয়া অজয়ের পা দু'টা ধরিয়া ফেলিল।

অলকের চোখে জল দেখা দিয়াছিল। সে পরম স্নেহে তাহাকে তুলিয়া বলিল—ছি, অমন করে বলে না! তোমার স্থান ত ওখানে নয় মালতী, তুমি যদি সত্যিই আমাদের ঘরে আস্‌তে চাও, এর চেয়ে আনন্দের কথা, গর্ব্বের কথা আর কি থাক্‌তে পারে। তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাবো আমি। কিন্তু—

মালতী রুদ্ধশ্বাসে বলিল—কিন্তু কি?

—আমাদের সংসারে এখনও বাবা আছেন, মা আছেন, তুমি যদি তাঁদের কাছে এ প্রার্থনা জানাও, সত্যি বল্‌ছি মালতী, এতে তোমার কোন অগৌরবই হবে না, বরং আমরা এই সুযোগে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে সংসারে জয়ী হ'তে পারব।

মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—আর কোন অপমান বোধ আমার নেই অলকবাবু। এ বাড়ী আমাকে ছাড়তেই হবে, আমায় নিয়ে চলুন, আমি এখনই তাঁদের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে আশ্রয় চেয়ে নেব।

—ছি, আশ্রয় কেন, অধিকার ছিনিয়ে নেবো বলো মালতী!

* * *

মালতী যখন অলকনাথের পিতার চরণে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, তখন কথা তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার হইয়া প্রৌঢ় ব্রজবল্লভই কিন্তু পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—মা আমার আপনার পায়ে আশ্রয় নিতে এসেছে, ওকে আশ্রয় দিন। বেয়াই, বুড়ো বাবার সংসারে ও আর কিছুতেই থাকৃতে রাজী হ'ল না, তাই আমাকেও আপনার ঘরে আশ্রয় নিতে হ'ল। যতদিন বেঁচে থাকব, তাড়াতে পারবেন না কিন্তু।

অলকনাথের পিতা সশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—থাক্ থাক্, পায়ের কাছে কেন মা! ও গো, বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করবে এস, বেয়াইকে একটু শাসন করবে এস, বলেন কি না আশ্রয় দিতে হবে। নিজের বাড়ীতে কেউ কখন অমন কথা বলে।

অলকনাথের মা আসিয়া মালতীকে বুকে টানিয়া লইলেন।

মালতী চোখের জলে তখন সারা স্থানটা ঝাপ্‌সা দেখিতে সুরু করিয়াছে। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাঁহার পা দু'টা ধরিতে গেল, কিন্তু তিনি তাহা দিলেন না। তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—পাগ্‌লী! মার পায়ের ধুলো নিলেই কি আশীর্ব্বাদ করব বলে মনে করেছিস্। আমি এমনই আশীর্ব্বাদ করি, তোরা সুখী হ'।

ব্রজবল্লভবাবু একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন—এখানা যত্ন করে তুলে রেখে দিন বেয়াই। ওটা আসল উইল। নকলখানা কোলকাতা গিয়েই রেজেষ্ট্রী করিয়ে দেব। ওই উইলখানা করিয়েছিলুম বলেই যদুপতি তর্কালঙ্কারের পৌত্রীকে আবার ফিরে পেয়েছি। বিদেশী শিক্ষা ভাল, কিন্তু বিদেশী অনুকরণ করার দুর্ভোগ যে কত বড়, তা' আমার মত খুব কম লোকই বুঝ্‌তে পেরেছে। শেষে মেয়েটার জন্যে বড় ভাবনায় পড়েছিলুম। যোগ্য পাত্রের হাতে না দিলে মরণেও সুখ পাব না। শেষটা ঠিক্ করলুম, ত্যাগ দিয়েই মানুষ যতটা যাচাই হয়, এতটা কিছুতেই হ'তে পারে না। তাই সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়েছি বলে এক উইল করতেই যে মেকী সে ভেসে গেল, যে আসল তাকেও খুঁজে পেতে দেরী হ'ল না।

অলকের পিতা হাসিলেন। বলিলেন—ব্যারিষ্টারী বুদ্ধি খুব চালিয়েছিলেন দেখ্‌ছি। কিন্তু আমারও একটা দাবী আছে বেয়াই। এ নকল উইল নয়, এই আপনার আসল উইল। আপনার সম্পত্তি দরিদ্র নারায়ণের সেবাতেই ব্যয় হোক্। গরীব হ'লেও আমি আমার বৌমাকে দু'টি শাক ভাত দিতে পারি যেন এই আশীর্ব্বাদই করুন। অলক কিছুদিন হ'ল বিলাত থেকে আই-সি-এস্ পাশ করে এসেছে। পোষ্টও হয়ে গেছে। বিয়েটা যাতে এই মাসেই হ'তে পারে, সেইটুকু করে ফেলুন আপনি।

মালতী একবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু 'ইডিয়ট্'টা তখন ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া মালতীর অবস্থা দেখিয়া হাসিতে সুরু করিয়াছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌

মনিবের কাছে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করাতেও যে বিপদ আছে সেটা বেশ ভালভাবেই বুঝ্‌তে পাল্লুম, যখন কলম ছাড়িয়ে তিনি আমায় জাহাজে পাঠালেন।

জাহাজে রসদ যোগানর অফিসে চাকরী করি,—ইংরাজীতে যাকে বলে 'সিপ্‌ চ্যাণ্ডেলার।' মাইনে দিত মাসিক চল্লিশ টাকা। এগারটা থেকে পাঁচটা অবধি বসে বসে অফিসের যাবতীয় কেরানীগিরি, চিঠি লেখা, টাইপ করা এবং অবসর সময় খোসগল্প এই সব কর্ত্তে হোত। মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকম বিদেশী লোক সব আস্‌তেন,—তাঁদের সব বিকৃত উচ্চারণের ইংরেজী শুনে তার অর্থ করে মনিবদের বোঝাতে হোত; সরকার না থাকলে ঐ সব আগন্তুকদের গেলাসে হুইস্কি ঢেলে দিতে হোত; হঠাৎ সিগারেট ফুরিয়ে গেলে নিজেকেই সেটা কিন্‌তে ছুটতে হোত—ঝালে-ঝোলে, অম্বলে-টকে; তবে কাঁচা খেতে আজও পর্য্যন্ত হয় নি—কিন্তু আজ সেই কাঁচাই খেতে হোল; অর্থাৎ, আজ পর্য্যন্ত যা' কিছু করিছি, আমার সেই ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ছোট্ট ঘরটীর মধ্যে বসেই করেছি, কিন্তু আজ আমাকে জাহাজ ধরবার জন্য মনিবের হুকুমে ঘাটে ছুটতে হোল; চাকরীর মজাই এই—'অপরম্বায়' যে কি 'ভবিষ্যতি' তা' স্বয়ং ভগবানও জানেন না; কারণ, ভগবান সর্ব্বদ্রষ্টা হলেও বাঙালী বণিক-মহলে তাঁর বোধ হয় কোন রকম গতিবিধিই নেই।

দুই

প্রত্যেক বছর বড়দিনের সময় দু'খানা করে যুদ্ধের জাহাজ—ইংরাজীতে যাকে বলে 'ম্যান্‌ অফ্‌ ওয়ার' এবং তারই বাংলায় আমাদের ভাষায় 'মানোয়ার'—এই কোল্‌-কাতার বন্দরে আসে। এর মধ্যে কতকগুলো আছে 'এচ্‌ এম্‌ এস্‌', আর কতকগুলো 'এচ্‌ এম্‌ আই এস্‌।' যেগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে সেগুলো 'এচ্‌ এম্‌ এস্‌'; অর্থাৎ, 'হিজ্‌ ম্যাজেষ্টিস্‌ সার্ভিস',আর যেগুলো কেবলমাত্র ভারতের জন্য সেগুলো 'হিজ্‌ ম্যাজেষ্টিস্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ সার্ভিস' নামে পরিচিত—যেমন কি না 'এচ্‌ এম্‌ এস্‌ এমারেল্ড', 'এচ্‌ এম্‌ এস্‌ কলম্বো', ইত্যাদি। আর ভারতীয় রণ-তরী—যেমন 'এচ্‌ এম্‌ আই এস্‌ ক্লাইভ।'···আমার মনিবেরা সেবার 'এচ্‌ এম্‌ এস্‌' জাহাজের যাবতীয় খাবার দেবার অর্ডার পেয়ে অত ব্যস্ত এবং তটস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

তিন

মানোয়ারী জাহাজ এসে কেল্লার সাম্‌নে প্রিন্সেস ঘাট 'মুরিং'-এ দাঁড়ায়—যে কোন জাহাজই কোলকাতায় আসবার অন্ততঃ বারো ঘণ্টা আগে আমরা খবর পাই টেলিগ্রাফ অফিসের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে—তাই দেখে আমরা আন্দাজ কল্লুম যে, জাহাজ ঘাটে আসবে সকাল দশটায়।

ঘাটে গিয়ে দেখি জাহাজ প্রায় জেটির ধারে এসে ভিড়েছে।

প্রকাণ্ড শাদা রঙের লম্বা একটা জাহাজ। শাদা রঙের গলুয়ের ধারে পেতলের অক্ষরে জাহাজের নাম লেখা আছে। জল থেকে জাহাজের মাঝখানটা হবে পনের ফুট উঁচু, আর প্রান্ত দুটো আন্দাজ পঁচিশ ফুট উঁচু। জল থেকে খানিকটা ওপরেই জাহাজের খোলের মধ্যে হাওয়া যাবার জন্যে একসারি গোলাকার জান্‌লা, সেগুলো হবে জল থেকে দশ বার ফুট উঁচুতে। তার ওপর কোথাও কোথাও আর একসারি জান্‌লা আছে, সেগুলো আবার ওদের থেকে আরও দশ ফুট উঁচুতে। জাহাজের ডেকের

ওপর ঠিক মাঝখানে চারটে 'টর্পেডো সিলিণ্ডার', ও দুটো করে 'স্যালুটীং' কামান। সাম্‌নে পেছনে চকচকে ঝক্‌ঝকে অনেকগুলো কামানের মুখ দেখা যাচ্ছে। ডেকের ওপর সাম্‌নে পেছনের অংশটা ক্যাম্বিস দিয়ে ঢাকা দেওয়া, আর মাঝখানে জাহাজের ব্রিজ, তারই ওপর থেকে জাহাজকে চালানো হয়। জাহাজের সাম্‌নে পেছনে দুটো খুঁটি এবং সেই খুঁটি দুটোর ওপর বিনা তারে টেলিগ্রামের যন্ত্রপাতি, আর জাহাজের মাঝখানে সব উঁচুতে ফড়িং-এর মতন পক্ষ বিস্তার করে একখানা উড়ো জাহাজ বাঁধা আছে। কামান এবং উড়ো জাহাজ সবগুলোই ধোঁয়া রঙের মোটা কাপড় দিয়ে মোড়া।

আমরা যখন ঘাটে গেলুম, তখন সেই বিরাট্ জাহাজখানাকে জেটিতে ভিড়িয়ে ঠিক করে বাঁধবার জন্যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা বিশেষ ব্যস্ত ছিল। জাহাজখানা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে সংকেত কচ্ছে, আর পোর্ট কমিশনারের 'টাগ্' নৌকা জাহাজের শেকল নিয়ে বয়াতে বাঁধবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠ্ছে, জাহাজ এবং নৌকার ভিড়ে আমার জননী ভাগিরথী দেবী তলা থেকে ঘুলিয়ে উঠ্ছেন।

জাহাজের ডেকের ওপর অসংখ্য সেনানী এবং নাবিকের দল তখন 'হাঁ' করে কোল্‌কাতাকে দেখ্ছে আর নিজেদের মধ্যে খুব তীক্ষ্ণভাবে বোধ হয় এই সম্বন্ধেই গবেষণা করছে। কোল্‌কাতার মাঠের যে অংশটা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জীবনের কোন কাজেই লাগে না, তারা বোধ হয় সেই অংশটাকেই সমগ্র কোল্‌কাতা বলে ধরে নিয়েছে এবং যে কোঁচা আর পাঞ্জাবীর কথা আমাদের মনেও পড়ে না, ওরা বোধ হয় সেইটাকেই পরম আগ্রহ-সহকারে দেখ্ছে, যেমন আগ্রহভরে আমরা আলিপুরের বাগানে গিয়ে নবাগত জন্তুদের পর্য্যবেক্ষণ করি।

জেটিতে জাহাজ বাঁধার সঙ্গে-সঙ্গেই কোন একজন জাঁদরেল সাহেব তীর থেকে এলেন জাহাজে ওঠবার জন্যে; সঙ্গে সঙ্গে 'স্যালুটীং গ্যান্' থেকে কামানের শব্দ করা হোল—সেই হোল তাঁর মান্য। এদিকে সাম্‌নের ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তার অতিথি জাহাজ-বন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা করে তোপ ছুঁড়তে লাগ্‌লো। শব্দ শুনে নিরীহ বাঙালী আমরা ত ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি। অত সাড়া-শব্দ করে সেলাম করা কি আমাদের ধাতে সয়—আমরা জানি মেঝে অবধি লুটিয়ে প্রণাম করা। নিজেকে ছোট করে পরকে মান্য দেওয়াই হোল আমাদের নিয়ম—আমরা অতিথির পায়ের তলায় আমাদের মাথাকে নত করে দিই। কিন্তু যারা জীবনের রসে আবক্ষ ভরপুর, তারা কামান ছুঁড়ে 'অফার ইউর আর্মস্' করে বড়দের মান দেয়। রাজপুতেরাও না কি তরোয়াল উঁচিয়ে ধরে সেলাম দিতো।

সেলামী তোপের হ্যাঙ্গাম চুক্‌লে জাহাজ থেকে মাতব্বর সাহেবেরা সব অনেকেই যাতায়াত কল্লেন। প্রহরীদের মধ্যে তখন 'য়্যাটেন্‌সন্' এবং 'স্যালুট'-এর ধুম পড়ে গেছে।

বড়দের এই সব বড় কারবার যখন চুক্‌লো, তখন ষ্ট্রাণ্ড রোডের যে সার্জ্জেন্ট পাহারায় ছিল, সে হুকুম দিলে আমাদের মতন ব্যবসায়ীদের জাহাজে উঠ্‌তে।

কিন্তু সেখানেও আবশ্যকতার তারতম্য অনুসারে অগ্রপশ্চাৎ সব নির্দ্ধারিত করাই আছে। 'বেঙ্গল টেলিফোন্'-এর লোক যাবে আগে; টেলিফোনের কয়েক জন মিস্ত্রী সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল—তারা তাদের দড়াদড়ি নিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলো নতুন লাইন করবার জন্যে—জাহাজ যতদিন বন্দরে থাক্‌বে, ততদিন একটা টেলিফোন্ সেই জাহাজে অস্থায়ীভাবে রাখতে হয়। পেছন পেছন গেল 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কাগজের পিয়ন, একবোঝা কাগজ মাথায় করে নিয়ে—জাহাজ যে ক'দিন থাক্‌বে, সে ক'দিন জাহাজে নিয়মমত 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' কাগজখানাই লওয়া হয়।...তারপর আর পাঁচজন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও গিয়ে জাহাজে উঠলুম।

চার

জেটি থেকে জাহাজে ওঠবার জন্যে যে সিঁড়ি বা বিট্ দেওয়া তক্তা ফেলা থাকে, তাকে ওরা বলে 'গ্যাঙ্‌ওয়ে।' 'গ্যাঙ্‌ওয়ে'র মুখে ওদের একজন করে 'সেন্ট্রি' বা পাহারা থাকে।

জাহাজের কাজ চুকিয়ে আমরা সব বেরিয়ে আস্‌ছি, এমন সময় আমার এক আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হোল—সে বেচারা কোন এক ধোপা'র প্রতিনিধি হয়ে কাজ যোগাড় করবার চেষ্টায় এসেছে। জেটীর মুখে যে পুলিশ পাহারা ছিল, সে তাকে এতক্ষণ কোন এক অজ্ঞাত কারণে আটক রেখেছিল; ছাড়্‌তেই সে বেচারা হাঁপাতে হাঁপাতে জাহাজে এসে উঠ্‌লো।

আমাকে দেখেই বল্লে—'একটু দাঁড়িও ভাই, একসঙ্গে যাব।'

বল্লুম—'আচ্ছা।'

'গ্যাঙ্‌ওয়ে'র মুখে দাঁড়িয়ে আছি। সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে আমরা যে রকম ভয় পাই, সেই রকম ভয় এবং একরাশ কুণ্ঠা নিয়ে 'গ্যাঙ্‌ওয়ে'র সেই পাহারাটি আমার কাছে এল, এবং মৃদুস্বরে কি যেন বল্লে।

বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—ওদের সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত কথা হয়, তার মধ্যে বুঝ্‌তে না পারার অংশটাই বেশী, কাজেই এই কথাটা বুঝ্‌তে না পারার মধ্যে আশ্চর্য্য বা বিরক্ত হবার কিছুই নেই।

তখন সে খুব স্পষ্ট করে আমাকে বল্লে—'তোমাদের দেশে 'খায়্‌বল্‌গ্রঁ' আছে?'

'খায়্‌বল্‌গ্রঁ' জিনিষটা যে কি, সেটা আমি ত দূরের কথা, আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেরও নির্ণয় করার সাধ্য নেই; কিন্তু আমি জানি আমাদের বাজার সরকার এমনই চতুর যে, সে আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত নামিয়ে আন্‌তে পারে।

বল্লুম—"হ্যাঁ, সে তুমি পাবে, কিন্তু তোমার কাছে ঐ জিনিষটির নমুনা আছে ত?'

নমুনার কথা শুনে সে একটু বিরক্ত হোল। বল্লে—'খায়্‌বল্‌গ্রঁর আবার নমুনা কি? নমুনা-টমুনা নেই।'

এবার বড় শক্ত কথা—নমুনা দেবে না, অথচ জিনিষ দিতে হবে, সেটা কি রকম করে পারবো। ইতস্ততঃ করে বল্লুম—'আচ্ছা, জিনিষটা কি তুমি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারবে?'

সে বল্লে—'হ্যা, তা' পারি। সেটা হচ্ছে কি জানো—এই বড় বড় নল সমুদ্রের তলা দিয়ে ফেলা আছে, সেই সব নলের ভেতর দিয়ে তার আছে, সেই তারের একটা দিক্ আছে বিলেতে, আর একটা দিক্ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আছে, তা' সে কি তোমাদের দেশে নেই?'

কথাগুলোর কতক বুঝ্‌লুম, আর কতক আন্দাজে ধরে নিলুম, কিন্তু এটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না যে, সমুদ্রের তলার পাইপ দিয়ে ঐ 'সেণ্ট্রি' ছেলেটি কি করবে—সমুদ্রের মাছই ত ওরা খায়, পাইপও কি খাবে না কি?

হবেও বা—জাহাজী খেয়াল! লোক কথায় বলে—কাপ্তেনী মেজাজ। কিন্তু কোন ভাব প্রকাশ না করে শুধু বল্লুম—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর?'

তখন সে আরও ভালো করে বোঝাতে সুরু কল্লে। বল্লে—'সেই তারের একদিকে'—হঠাৎ খট্ করে পা ঠুকে জোড়া করে দাঁড়িয়ে গেল।

ডেকের ওপর সৌম্যদর্শন বুড়ো এক সাহেবকে দেখা গেল। সাহেব সোজা হয়ে ত্রিশ ইঞ্চি ধাপ ফেলে ডেকের ওপর দিয়ে এসে 'গ্যাঙ্‌ওয়ে' দিয়ে নেমে জেটিতে গিয়ে পড়লো, তারপর জেটি বয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোডে চলে গেল।

ছেলেটি আবার বল্‌তে সুরু কল্লে। বল্লে—'সেই তারের একদিকে 'টরে টক্' করে শব্দ করে খবর পাঠানো হয়, আর অপর দিকে সেই রকমের 'টরে টক্' করে তারা খবর পায়—কিছু টাকা দিলে এই রকম খবর পাঠানো যেতে পারে। আমরা তাকে বলি—'খায়্‌বল্‌গ্রঁ'।'

জিনিষটা মাথায় ঢুক্‌লো। বল্লুম—'ও, তুমি 'কেবল্‌-গ্রামে'র কথা বল্‌ছো। হ্যাঁ, সে আমাদের কোল্‌কাতা থেকে করতে পারো।'

হায়রে, এই—আমারই কলেজে ইংরাজী পড়া এবং বোঝার বিশেষ খ্যাতি ছিল, আমার উচ্চারণ না কি খুব ভাল বলেই জানতুম এবং বিশ্বাস ছিল যে, সাহেবের মুখের ইংরাজী আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারি।

সাহেব বল্লে—'মাকে একটা খবর পাঠাবো এখানে এসে পৌঁচেছি বলে।'

বল্লুম—'বহুৎ আচ্ছা।'

পাঁচ

সেদিন যে 'কেবল্‌গ্রামে'র কথা বলেছিল, তার নাম টমাস্। এই টমাস্ ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগে। ওর বয়স হবে আন্দাজ ষোলো; অর্থাৎ, যে বয়সে আমাদের বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উৎরে গেলে মায়েরা ভেবে অস্থির হয়, আর দাদারা খুঁজ্‌তে বেরোয়। টমাস্ কিন্তু সেই বয়সেই বেরিয়েছে রণ-তরীতে বিপজ্জনক চাকরী নিয়ে।

ইংলণ্ডের মার্স'টন মুরে ওদের বাড়ী—সেখানে ওর মা আছেন, তিনটী বোন্ আছে, আর ওকে নিয়ে তিন ভাই ওরা। ভায়েদের মধ্যে ওই হোলো সর্ব্বকনিষ্ঠ—তবে ওর পরেই ওর একটী ছোটো বোন্ আছে। বছর চারেক আগে টমাস্ না কি গ্রামার স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে এক দর্জ্জির দোকানে কাজ শিখ্‌তে সুরু করেছিল। ইয়র্কসায়ারের সেই দর্জ্জি ছিল ওর মায়ের বন্ধু। তারপর ওর বোনের ভাবী স্বামী-মহাশয় দয়া করে ওকে এই জাহাজে এনে 'ক্যাডেট্' হিসেবে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর মেজ বোনের বিয়ে কিন্তু হয় নি; কারণ, সেই বোন্ বড় একরোখা মেজাজের মেয়ে, তার ওপর তার দাম অনেক—সে খুব ভালো চুল কাট্‌তে পারে বলে' লণ্ডনের 'হেয়ার ড্রেসার'রা তাকে বেশী মাইনে দিয়ে কাড়াকাড়ি করে নিযুক্ত করে—এখন সে 'হার্ব্বির কোম্পানী'র 'চীফ্ হেয়ার ড্রেসার।' ওর বড় বোনেরও অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। সে দেখ্‌তে খুব ভাল বলে এক সুইডিস্ 'পাইলট' তাকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। ওর সেই ভগ্নীপতি ক্যানাডা লাইনের 'এয়ার মেল' চালায়। ছোট বোন্ ষ্টেলা এখন মায়ের কাছেই আছে। গ্রামার স্কুলে পড়ে এবং মায়ের মুর্গী শুয়োরের কাজে সাহায্য করে। ফুলের বাগানের ওপর তার খুব ঝোঁক—তার হাতের তৈরী গাছ থেকে পলিনোর গোলাপ নেবার জন্য ইয়র্কসায়ারের কোন এক ধনীর ছেলে প্রায়ই ওদের বাড়ীতে যায় আসে। ওর ছোট বোন্‌কে দেখ্‌তে খুবই ভাল। কি জানি হয়ত বা—এমনিধারা সন্দেহ করে ও বড় সুখ পায়। বড় ভাই এলবার্ট টমাস্ তের বছর পূর্ব্বে, অর্থাৎ গ্রেট ওয়ারের ঠিক্ আগেই অষ্ট্রেলিয়ায় গিছ্‌লো সোনার খনিতে। বছরখানেক চিঠিপত্র এসেছিল—কিন্তু তারপর যে সব ডাকের গোলমাল হয়, সেই থেকে আর তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তার জন্যে ওর মা এখনও কাঁদে। তারপর ওর বাপের কথা। উনিশ শ' পনের সালে ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্টে তিনি 'কর্পোরাল' হয়েছিলেন। তারপর খবর পাওয়া যায় যে, তাঁর বাহিনী এণ্টওয়ার্পের পাশ দিয়ে জার্ম্মানীর দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু শেষে তাঁর 'ব্যাটালিয়ান' বুঝি ধরা পড়ে। যুদ্ধের বন্দী—কিন্তু জার্ম্মানীরা কোনরকম ভদ্রতা করে নি। শোনা যায়—তাঁদের না কি কলোনে নিয়ে কিছুদিন আট্‌কে রেখে শেষে হাত পা বেঁধে রাত্রে মাঠের মধ্যে শীতকালে ফেলে রেখেছিল। হতভাগ্য সৈনিকেরা দলকে দল 'ফ্রষ্টবাইটে'—ওর গলাটা ধরে আসে, চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তাদের কোন সংবাদ নেই। মেজো ভাই বার্ম্মিংহামে এক মোটর তৈরীর কারখানায় 'মেটালার্জ্জি'র কাজ করতো; তা'তে তার বেশ দু'পয়সা আয়ও ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ—হঠাৎ 'প্যান্' থেকে জ্বলন্ত লোহা তার দুই পায়ের হাঁটুর ওপর পড়ে গিয়ে সেই যে সে অকেজো হয়ে গেল, তারপর আর কোনদিন সে দাঁড়াতে পাল্লে না। কোম্পানী থেকে নামমাত্র যা' টাকা পেয়েছে, তাই দিয়ে সে একটা 'টুরিষ্ট'দের দোকান খুলে ক্রশ্ কান্ট্রি রোডের ওপর বসেছে। মোটারিষ্টরা তার দোকান থেকে পেট্রল, মবিল থেকে সুরু করে নিজেদের খাবার, চিউংগাম্ বা সিগারেট সবই পায়। দোকানের আজকাল আয় খুব কম—সপ্তাহে গড়পড়তা গিনি তিনেক মাত্র লাভ থাকে। আর সে হোল ছোট ভাই। দেশে কোথাও কোন চাকরী না পেয়ে অগত্যা বোনের ভাবী স্বামীকে ধরে এই চাকরীটা সংগ্রহ করেছিল—কিন্তু এখন আর এই চাকরী ওর ভালো লাগে না। এই তার সংসারিক খবর।

জাহাজের আর পাঁচটা লোকের মধ্যে টমাস্‌কে আমার ভাল লাগে তার চেহারার জন্যে—রঙটা ওর লাল হলেও বাকী চেহারাটা আমাদের বাঙালীদেরই মত। ভোঁতা নাকের দু'পাশে দুটো নিরীহ চোখ—তা'তে এমন একটা আবেশ-মাখানো ভাব আছে যে, দেখ্‌লে প্রথমেই মনে হয়, ও বুঝি নিজের মধ্যেই নিজে আবিষ্ট হয়ে আছে।

ছয়

সেদিন আমাদের খাবার দেওয়ার কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। জাহাজ থেকে আমাদের অফিসের টেলিফোনে ডাক্ পড়্‌লো। রাত তখন দশটা।

অফিসে কেউই ছিল না—একা আমিই তখন শ্মশান জাগিয়ে বসেছিলুম। ডাক্ শুনে দরোয়ানকে অফিসের খবরদারীতে নিযুক্ত করে সেই রাত্রেই রওয়ানা হলুম মাঠের দিকে।

'ষ্টুয়ার্ড' ত চটেই লাল। বলে—'তোমাকে আমি এক শ' পাউণ্ড 'স্পিন্যাক্ শাক' দেবার কথা বলেছি, আর তুমি কি না দিয়েছ আশী পাউণ্ড। এ রকম করলে আমি তোমাদের অর্ডার কেটে সমস্ত দাম বাজেয়াপ্ত করে দেবো।

এই ধমকটুকু দেবার জন্যেই এতরাত্রে সে আমায় ডাক দিয়েছে।

স্পষ্ট বুঝলুম, আমাদের শ্রীমান্, সরকার-মশায় এই দশ সের শাক চুরী করে পয়সটা সরিয়েছে—কিন্তু সে কথা ত আর সাহেবকে বলা যায় না।

'চট্' করে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ঘটনাটা যেন কিছুই নয় এইভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে সাহেবকে উত্তর দিলুম যে, এইরূপ ঘটনা হওয়া স্বাভাবিক।

উত্তর শুনে সাহেব আরও বেশী করে চট্‌লো।

তখন তাকে বোঝালুম—'সাহেব, এসব টাট্‌কা সব্জি আজ ভোর রাত্রে আমরা বাগান থেকে তুলে ওজন করে তোমার জাহাজে দিয়ে গেছি সকালে। তারপর এই সারাদিন ওগুলো তোমার এই ঘরে পড়ে রয়েছে, পাশে 'ডায়নামো' চলছে তার একটা গরম আছে, এখানকার হাওয়াও দারুণ শুক্‌নো, এই সব কারণে সারাদিনে ওই শাকের মধ্যে যা' কিছু জলীয় অংশ ছিল, সেটা শুকিয়ে গিয়ে মোটের ওপর ওজন কমে গেছে। এতে কিছু অন্যায় হয় নি। এর পরে তুমি যখন কোন জিনিষ ওজন করবে, দয়া করে মাল দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা করে নিও।

ঘাড় হেঁট করে কথাটা সে ভাবলে, তারপর লজ্জিত হয়ে নিজের ভুলটা স্বীকার করে নিলে। এই সব ভুল এরা স্বীকার করবার সময় সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকার করে থাকে।

তার ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে এলুম দুর্গা বলে।

জাহাজটা তখন প্রায় চুপ্‌চাপ্ হয়ে এসেছে—কেবল একটা 'ডায়নামো'র সামান্য শব্দ যা' কানে এসে পৌঁছায়—আর সেই সঙ্গে কানে এলো একটা বাঁশীর সুর।

সিঁড়ির ওপর আমার পরিচিত এক 'ক্যাডেট' আমায় দেখে বল্লে—'খবর কি, এত রাত্রে যে?

বল্লুম—'কাজ ছিল।'

সে বল্লে—'তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

বল্লুম—'না, কোথায় সে?'

—'ঐ যে বাঁশী বাজাচ্ছে এই বলে সেই ছেলেটি আঙুল দিয়ে টমাস্‌কে দেখিয়ে দিলে।

বাঁশীর শব্দ লক্ষ্য করে জাহাজের সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এলুম।

আকাশে তখন বড় একখানা চাঁদ উঠেছে। জাহাজের ডেকের উপর ছোট একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোর দিকে পেছন করে গঙ্গার ওপারের দিকে মুখ রেখে ডেকের একটা বেঞ্চের ওপর বসে টমাস্ তখন আপন-মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল।

সুরটা বড় করুণ। পৌষমাসের শীতের রাত্রে খোলা গঙ্গায় যুদ্ধের জাহাজে বিদেশীর মুখের এই করুণ সুর আমার মন যেন কি একটা ঔদাস্যে ভরে দিলে। দূরে গঙ্গার বয়াতে জাভা-বেঙ্গল-লাইনের বড় বড় জাহাজ সব বাঁধা রয়েছে, আর গঙ্গার পাড়ের ওপর ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সরকারী বাড়ীগুলি সারি বেঁধে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। তীরের কাছে ছোট নৌকার মাঝিরা কেরোসিনের কুপি জ্বেলে আপন আপন সান্ধ্য-ভোজন শেষ করছে কেউ বা তার নৌকার খোলের ভেতর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমনি ধারা সম্পূর্ণ বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে আমার বন্ধু প্রবাসী তরুণ বুঝি তার বুভুক্ষু আত্মাকে তরল করে ঐ বাঁশীর সুরের সঙ্গে নিজের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে সেখানে—যেখানে পাহাড়ের নীচে উঁচু-নীচু রাস্তার ধারে পাতাহীন বড় বড় পাইন এবং দেওদার বৃক্ষের অন্তরালে কঙ্কালসার আইভি ও দ্রাক্ষালতায় ঘেরা একখানি ছোট একতলা বাড়ী—টালিখোলার ছাতের মাঝখান দিয়ে চিমনীর ধোঁয়াবাহী নল উঠেছে লাল রঙের টালিখোলাকে ভেদ করে। সে গ্রাম এখন কুয়াসা ও বরফে ঢাকা। সেখানে এখন ধূসর বর্ণের সকাল। বাইরে কাঁকর দেওয়া 'পোর্টিকো'র ওপর শাদা বরফের ফেনা জমেছে; ঘরের ছাঁচ থেকে সাবানের ফেনার মত তুষারের কতক-গুলো খণ্ড ঝুলছে, আর কতক এসে জমেছে মাটীতে। হিম-শীতল প্রভাতের প্রথম জাগরণী বাজে কুক্কুটের কণ্ঠে—বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী মন ঐ প্রবাসী টমাস্‌কে তার স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

গৎটা শেষ করে টমাস্ আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে একটা কুশল-সংবাদ নিলে।

আমি তাকে আর একটা গৎ বাজাতে অনুরোধ কর্‌লুম।

তখন সে আরও কয়েকটা গান তার বাঁশীতে বাজালে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে পারের দিকে চেয়ে রইলো—যেখানে শালিমারের কারখানার অসংখ্য আলো সতর্ক প্রহরীদের দৃষ্টি নিয়ে সারারাত অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। নিশীথ রাত্রে প্রিন্সেস ঘাট বন্দরের আলোর খেলা বড় মধুর; দক্ষিণের শেষ কোণে গঙ্গা যেখানে একেবারে বেঁকে গেছে, সেইখানে তক্তাঘাটের ওদিকে লাইট্ হাউসের আলোগুলি একবার জ্বল্‌ছে, একবার নিব্‌ছে। একখানা ষ্টীমার আস্‌ছে। ষ্টীমারখানি ছোট, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ আলোয় গঙ্গা যেন শিউরে উঠছে। গেরুয়া রঙের জলের ওপর সার্চ্চ লাইট্ পড়ায় মনে হচ্ছিল, যেন গঙ্গার মাঝখান দিয়ে পশ্চিমের এক ধূলি-ধূসর পথ তৈরী হয়েছে; পথিকের পায়ে পায়ে সেই পথ যেন

অমসৃণ। মাঝে মাঝে সেই জাহাজ থেকে বাঁশী দিচ্ছে; তারই প্রতিধ্বনি আস্‌ছে দিগন্ত থেকে।

টমাস্‌ কথা কইতে সুরু করলে। বল্লে—'দেখো, দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আছে আমার মা, সেই মা ছাড়া আর আমার আপনার কেউ নেই। বল্লে তুমি বিশ্বাস করবে না বন্ধু, কিন্তু এমন ধারা মা কখনও কারুর হয় না।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বল্লে—'কি জানি ভাই, তুমি আমার কথা ঠিক বুঝবে কিনা জানি না। আমার কিন্তু মনে হয়, এই পৃথিবীতে মাত্র আমরা দু'জন আছি—আমি আছি, আর আছে আমার সেই বুড়ো মা, আর আমাদের কেউ নেই। এই যে বিশাল পৃথিবীর লোকগুলোকে আমার চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এরা সব আমার শত্রু, এরা আমার অনিষ্ট ক'রে নিজের উন্নতি কর্ত্তে পারলে কেউই ছাড়বে না। আমি মায়ের কাছে শুনেছি, মা বলে—'মানুষের সঙ্গে মানুষের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কর্ত্তে হয় এক হাত তার পায়ে রেখে, এক হাত তার গলায় দিয়ে। দরকার হলে দু'হাত দিয়ে পা ধরবে, দরকার হলে, দু'হাত দিয়ে গলা টিপ্‌বে।' এই মানুষ, তার চেয়ে—'

টমাস্‌ যেন কথা বল্‌তে বল্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে গেল; খানিক পরে আবার সেই কথাগুলো মনে করে নিয়ে বলে চল্লো। বল্লে—তার চেয়ে এই যে আকাশে অসংখ্য তারা রয়েছে, ওর কোনো একটায় যদি আমরা থাক্‌তে পেতুম, আর সেখানে যদি আবশ্যকতার বালাই কিছু না থাক্‌তো, শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যদি কোন দুর্লভ আহার্য্যের আবশ্যকতা না হোত, তা' হলে—'

—আমি বল্লুম—'তা' ত বটেই, টমাস্‌, শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দুর্লভ আহার্য্য কষ্ট করে সংগ্রহ করা ত আমাদের সভ্যতার শাস্তি—কেন না, অসভ্য মানুষ বা জন্তুরা ত কোন রকম দুশ্চিন্তা না করেই দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায়।'

সাগ্রহে কথাটাকে নিয়েই সে বল্লে—ঠিক বলেছ বন্ধু, মা'ও ঠিক ঐ রকম কথাই বলে। মা বলে কি জানো—

কতদিন সে মায়ের কাছ ছাড়া সেটা জান্‌তে বড় ইচ্ছা হোল। তার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বল্লুম—'আচ্ছা, তুমি মাকে কতদিন দেখো নি।'

কথা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়্‌লো। বল্লে—'সে কি কথা বন্ধু, আমি তাকে দেখি নি, তাও কি হয়—আমি যে সব সময়ই দেখ্‌ছি—এই তুমি যখন এলে, তখনই ত আমি মাকে বসে বাঁশী বাজিয়ে গান শোনাচ্ছিলুম। ব্যানার্জ্জী, তুমি জানো না, আমি আজ তোমায় সব বল্‌বো। আমার যখনই ইচ্ছা হয়, আমি তখনি মাকে দেখ্‌তে পাই। ঐ সুদূর পশ্চিমের দিকে চাইলেই আমি মার সাক্ষাৎ পাই, তার গান শুন্‌তে পাই, তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সবটাই ঐ পশ্চিমকে জুড়ে আছে। সে কি ঘুমোয়—না, সে এই পূব দিকে চেয়ে আছে; কারণ, আমি যে পূব দিকে এসেছি। তাই আমিও পশ্চিমের দিকে মুখ করে বাঁশী বাজাই—আমার বাঁশীর সুর তার কাণে গিয়ে লাগে। তুমি জানো বন্ধু, ইংরাজীতে আমাদের একটা কথা আছে—'হোয়াট্‌ মাই লিপ্‌স্‌ কান্ট সে ফর্‌ মি, মাই ফিংগার টিপস্‌ উইল্‌ প্লে ফর্‌ মি'।' আমার কথা সেই সাগর পারে না গেলেও আমার সুর যে সেখানে যায়।...

তারপর যেন সে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়্‌লো। বল্লে—'হ্যাঁ, আমি এই বছর দুই হোল আমার মাকে দেখি নি—শুধু মাকে কেন, এই দু'বছরের মধ্যে আমার নিজের লোক কাউকে দেখি নি। এখনও ছ'মাস্‌ আমি কাউকে দেখ্‌তে পাব না। ছ'মাস পরে এই জাহাজ আবার পোর্টস্‌মাথে ফিরবে—জুন মাসের আটই নাগাদ। জাহাজ ডকে গিয়ে লাগ্‌লে আমরা দু' সপ্তাহের ছুটী পাবো। পোর্টস্‌মাথ্‌ থেকে বেরিয়েই ট্রেণ ধরবো। আমার বন্ধুরা হয় ত লণ্ডন ঘুরে জিনিষ-পত্র কিনে-টিনে দেশে যাবে; আমি কিন্তু কোথাও দেরী করবো না। তাদের প্রত্যেকেরই 'ফিঁয়াসে' আছে; তারা চায় ভাল-মন্দ জিনিষ। আমার কিন্তু সে সব ফ্যাসাদ ত নেই। আমার মা জিনিষ চায় না—চায় আমাকে। সন্ধ্যের সময় সোজা অক্সফোর্ড বার্ম্মিংহামের মধ্যে যে ট্রেণটা যায়, সেইটে ধরে পরদিন ভোরে গিয়ে সেফিল্ডে হাজির হব। সেখান থেকে ট্রেণে করে দেশে যাওয়া বড় অসুবিধে—মাঞ্চেষ্টার ও লীড্‌সে গাড়ীখানা অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। তার চেয়ে ওয়েক্‌ফিল্ডের ক্রশ রোড দিয়ে যে বাস যায়, তাই ধরে সোজা গিয়ে নাম্‌বো আমি ইয়র্কের মার্কেটে—যাকে বলে এস্‌প্লানেড। সেখান মাস টন মুর, অর্থাৎ আমার বাড়ী মাত্র দেড় মাইল। অন্য সময় হেঁটেই যাই, কিন্তু আর তা' যাব না; ট্যাক্সিতে ছ' পেনী দিয়ে একেবারে গিয়ে নাম্‌বো আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে। বাস্‌ এবং ট্যাক্সীতে গেলে আমি বাড়ী গিয়ে হাজির হব ঠিক ব্রেক্‌ফাষ্টের সময়। তুমি জানো বন্ধু, মা আমার অন্য মায়ের মতন নয়; সে কোনরকম ব্রেকফাষ্ট না খেয়ে দরজার কাছে—যেখানে আমার নিজের হাতে তৈরী কাঠের ল্যাম্প পোষ্ট আছে, ঠিক সেইখানটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। ট্যাক্সী থেকে নাম্‌লেই মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবে এবং তারপর হয় ত—হয় ত বা কেঁদেই ফেল্‌বে। তখন আমি তার চোখ মুছিয়ে দেবো। বল্‌বো—কেন মা, এই ত আমি এসেছি।...

কথাগুলো বলতে বলতে তার চোখ ভিজে উঠলো। জাগ্রত স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে টমাস্ চুপ করে রইলো। খানিকক্ষণ পরে সে বল্লে—'ও তুমি আমার মাকে দেখো নি। তা' তুমি একটু বসো বন্ধু, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।'

একরকম ছুটতে ছুটতেই সে সেই বেঞ্চ থেকে উঠে চলে গেল। হাতে বাঁধা ঘড়িতে আমি দেখ্‌লুম, রাত্রি সাড়ে বারোটা।

ফিরে এল অনেক টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে—একখানা এলবাম্, একটা রুমাল, একটি ক্রশ, আর একটা কাগজের মোড়ক।

এলবাম্‌খানা খুলে বল্‌লে—'এই দেখো, এতে সব আমাদের ছবি আছে।'

তারপর এলবামের প্রত্যেক পাতাখানি উল্টে-পাল্টে প্রত্যেক ছবির ইতিহাস দিয়ে কত দিনের কত কাহিনীই সব বল্‌তে লাগ্‌লো। আজ যেন তার মনের কবাট কে খুলে দিয়েছে—তার কথার ভেতর কোনো জড়তাও নেই, দ্বিধাও নেই।

রুমালখানি দেখিয়ে বল্লে—'এটা আমার ছোট বোন্ ষ্টেলা আমার জন্যে বুনে দিয়েছিল। এ আমি ব্যবহার কর্ত্তে পারি নি—আমি যেদিন চাকরী নিয়ে চলে আস্‌বো তার আগের দিন সারারাত ধরে সে এই রুমালখানিতে ফুল তুলেছে। এই রুমালখানি দেখ্‌লে আমার এখনও সেই কথা মনে পড়ে। আর দেখো বন্ধু, এই যে ক্রশটি দেখ্‌ছো, এটা আমি আসবার দিন মা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে বলে দিয়েছিল—আমি যেন কখনও মদ না খাই, আর বিদেশে এসে কখনও যেন বেশ্যার কাছে না যাই। এই দেখো না ভাই, জাহাজের সবাই প্রায় এখন বেরিয়েছে, কিন্তু আমি যাই নি; আমার ও সব ভাল লাগে না। একদিন এই জাহাজে এক বন্ধু আমায় মদ দিলে এবং খাবার জন্যে অনেক করে অনুরোধ কল্লে; খেয়েও ফেল্লুম, কিন্তু বড় ভাল লাগ্‌লো না। তারপর মনে হোল মা যেন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে—যেমন আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, ঠিক্ তেম্‌নিভাবেই মা আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু কথাও কইলে না, কেবল চোখে রুমাল দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে আস্তে আস্তে কেমন যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে গেল। তারপর আমি তিন দিন উপবাস করেছিলুম। শেষে মাকে সব খুলে লিখ্‌লুম। জানালুম—'মা, আমি তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি বলে তুমি আমায় ক্ষমা করো। তার জবাবে মা আমার লিখেছে—আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলুম; কিন্তু এর পরের বারে আর এ রকম ক্ষমা কর্‌বো না। আমার এই জাহাজের বন্ধুরা সব চিঠি দেখে হাসে, কিন্তু আমি আর ওদের সঙ্গে একেবারে মিশি না। ওরা সবাই মদ খায়, বেশ্যার কাছে যায়, শপথ করে এবং সব চেয়ে যা' বড় দোষ, সেই মিথ্যে কথাও বলে।'

আমি তার কথা শুন্‌ছি কি না শুন্‌ছি সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। হঠাৎ সে আমার হাতটা ধরে বল্লে—'বন্ধু, আজ আমি তোমায় একটা জিনিষ খাওয়াব—এক টুক্‌রো 'কেইক্'—বড় দিনের আশীর্ব্বাদ বলে মা আমার এই 'কেইক্' আমায় পাঠিয়েছে।'

তারপর সেই কাগজের মোড়কটি খুলে আধখানি 'কেক্' বার করে তাই থেকে একটুখানি ভেঙে আমায় দিলে, আর একটুখানি নিজে নিয়ে খেলে। তারপর কাগজটি আবার মুড়ে রেখে দিলে।

বাধ্য হয়ে রাত দুপুরে 'কেকে'র অংশটা মুখে দিতে হোল।

অত্যন্ত আগ্রহ এবং প্রীতিভরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আমার হাতটা সে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—'খেলে ত বন্ধু, বেশ ভালও লাগলো, কিন্তু এই জাহাজের অপর সব লোকেরা বলে থার্ড ক্লাশ 'কেইক্'—আমি কিন্তু ভাই জীবনে যত 'কেইক্' খেয়েছি, এত সুন্দর আমার কখনো লাগে নি।

প্রকৃতপক্ষে 'কেক্'টা আমারও তেমন ভাল লাগে নি।

সাত

পরের দিন সকালে দেখি 'গ্যাঙওয়ে'র মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন তার ডিউটি। আমার দিকে চেয়ে সে শুধু একটু হাস্‌লে।

কাজকর্ম্ম চুকিয়ে আমি চলে আসবো,—জাহাজের 'চীফ্ ষ্টুয়ার্ড', অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার কাজ, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় এই কথা আমায় বলে পাঠালে।

তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি 'গ্যাঙওয়ে'র মুখে দাঁড়িয়ে।

কথায় কথায় টমাস্ বল্লে—'বন্ধু, তিনদিন পরে আমরা চলে যাচ্ছি। এ জীবনে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

বল্লুম—'কেন, আর আস্‌বে না?'

সে বল্লে—'না, আর আমার আসবার ইচ্ছে হয় না। আমি ত দর্জ্জির কাজ কিছু শিখেছি, দেখে-শুনে তাই একটা ঠিক্ করে নেবো।'

বল্লুম—'কেন, এখানে ত দর্জ্জির চেয়ে ঢের বেশী 'প্রস্পেক্ট'।'

বল্লে—'হ্যাঁ, 'প্রস্পেক্ট' বটে, কিন্তু এ আমার ভাল লাগে না। এখানে কি মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে? জাহাজ-

খানাও যেমন একটা প্রাণহীন যন্ত্র,এখানকার মানুষগুলোও তেমনি। এরা যেন সব দম দেওয়া পুতুল।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বল্লে—'সত্যি বল্‌ছি ভাই, আমার এক-এক সময় এমন অসহ্য ঠেকে যে, মনে হয় এই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে বাড়ী চলে যাই।'

আর তেমন কিছু কথা হয় নি, তবে শেষে কি কথার উত্তরে সে বল্লে—সেবার আমি মেথডিষ্ট চার্চ্চে গিয়ে ছিলুম এক 'স্পিরিচুয়েলিষ্টে'র বক্তৃতা শুনতে। সে বল্লে কি জানো। বল্লে—'মানুষ মরে গেলে তার স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে যে কোন স্থানে এক মুহূর্ত্তে পৌঁছতে পারে।' আমার এক-এক সময় তাই মরতে বড় ইচ্ছে হয়। মরে গেলে এই 'নেভি'র আইন আর আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না—আমি আমার আপন ইচ্ছামত যেখানে খুসী এক নিমেষে যেতে পারবো।'

টমাসের উচিত ছিল বাংলা দেশের পল্লীতে ব্রাহ্মণের বংশে এসে জন্মান।.

আট

জাহাজ ছেড়ে চলে যাবার আগে আমাদের কাজ খুব বেশী থাকে; অর্থাৎ, দশ পনের কি কুড়ি দিনের আবশ্যকমত জিনিষ-পত্র জাহাজে ঠিক করে তুলে দিতে হয়—তাকে বলে 'সি ষ্টক্।' শেষ দু'দিন আমি সেই 'সি ষ্টক্' নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম, টমাসের খবর নিতে পারি নি।

জাহাজ ভাসবার আগের দিন বিকেলে ঘাটে গিয়ে দেখি—আগাগোড়া কালো পোষাক পরে ডেক্ এবং জেটিতে সারবন্দী হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের যত কর্ম্মচারী, সৈনিক, এমন কি অফিসার পর্য্যন্ত—আর তাঁদের মাঝখান দিয়ে একটা 'কফিন্' নিয়ে ছ'জন সৈনিক ধীরপদে জেটি দিয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোডের দিকে উঠে আস্‌ছে।

না জানি কোন্ হতভাগ্যের এই বিদেশেই মাটী কেনা ছিল!

একজনকে কানে কানে জিজ্ঞাসা কল্লুম—'কফিন্'টি কার?'

সে কোন উত্তর দিলে না। বোধ হয় এ সময় কথা বলা নীতিবিরুদ্ধ।

'কফিন্'টি ধীরে ধীরে চলে গেল। কালো পোষাক পরা লোকগুলি নীরবে কে কোথায় যেন সরে গেল; আমিও ধীরে ধীরে জাহাজে গিয়ে উঠ্‌লুম।

কাজকর্ম্ম প্রায় চুকিয়ে এনেছি, একটি 'বয়' এসে বল্লে—'যাবার সময় একবার আমাদের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

এই ডাক্তারকে আমি চিনতুমই না, সে আমায় ডাক্‌বে তা' আন্দাজই কর্‌তে পারি নি।

যা' হোক্, তার ঘরে গেলুম।

ডাক্তার বল্লে—'ব্যানার্জ্জী, তোমার বন্ধু তোমার ওপর একটি ভার দিয়ে গেছে—আমরা তার দেশের লোক হলেও আমাদের ওপর বিশ্বাস না করে তোমার ওপরই তার বিশ্বাস।'

তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে—'ব্যাসিলিক ডিসেণ্ট্রি' হয়ে 'ক্যাডেট্' একান্ন, অর্থাৎ, টমাস্ কাল রাত্রে মারা গিয়েছে। তার জিনিষ-পত্র যা' কিছু আছে, সে সব আমরা তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কচ্ছি—কিন্তু তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে একখানা চিঠি সে নিজে লিখ্‌তে আরম্ভ করে; শেষ কর্‌তে না পেরে লেখার ভারটা তোমার ওপরই দিয়ে গেছে। তার বিশ্বাস—তুমি ছাড়া আর কেউ সে চিঠি লিখ্‌তে পার্‌বে না।'

ডাক্তার তখন নিজের ড্রয়ার থেকে কাগজে লেখা একটা ঠিকানা আর টমাসের আরব্ধ পত্রখানা আমার হাতে দিলে।

* * *

তার মাকে লেখ্‌বার জন্যে অনেকদিনই কলম নিয়ে বসেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটা অক্ষরও আমার কলম থেকে বেরোয় নি।...

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

———

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাব্বিশ

নিজের অন্তর বিপ্লবের তাড়না অপেক্ষাও যে অন্য এক বিপ্লবের মেঘ মাথার উপর একটু একটু করিয়া জমা হইয়া উঠিতেছিল, এ খবর অমর জানিতেও পারে নাই; তাই যখন জানিতে পারিল, তখন নিজের কোন চিন্তাই আর মনে রহিল না। একান্ত নিরুপায় হইয়াই সে অসহায়ের মত শেফালীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাহার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভগবানের নিকট তাহাকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে সুরু করিয়া দিল।

ব্যাপারটা যতটা অপ্রত্যাশিত, তেমনই অকস্মাৎ বলিয়া মনে হইলেও কার্য্যতঃ কিন্তু ততটা নহে। বাড়ীতে পাকা কোন গৃহিণী থাকিলে অবশ্যই এ বিপদের পূর্ব্বেই সাবধান হইতে পারিতেন, কিন্তু সংসার অনভিজ্ঞ দুইটী প্রাণীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইল না। বরং গর্ভাবস্থায় নানারূপ অশান্তির মধ্যে থাকিয়া তাহারা বিপদকে আরও গভীর করিয়া তুলিল। শেফালী অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুসারে হার্টও কম জোর হইয়া পড়িতেছিল। কোন্ সময় রক্তের সল্পতা আসিয়া তাহাতে যোগ দেওয়ায় একদিন বসিয়া বসিয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তাররা জীবনের আশাই ছাড়িয়া দিলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় অমরও নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল।

হঠাৎ অদৃষ্ট-দেবতার কি জানি কেন দিক্‌ভ্রম হইয়া গেল। তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র দৃষ্টি দিলেন। দীর্ঘদিন মরণ বাঁচনের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেফালী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। হাসপাতাল হইতে বাড়ী আনিয়া অমর চেঞ্জে যাইবার উদ্যোগ করিতেই শেফালীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন কেমন আছ শেফা?

শেফালী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—বড় ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলুম, না গা? ভালই আছি। তুমি কি আজও কোর্টে যাবে না না কি?

অমর বলিল—আজ কেন, যতদিন না একেবারে সেরে উঠবে, ও মুখো হবো না।

শেফালীর মুখে জয়ের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল—তাও না কি হয়। লক্ষ্মীটি, একমাস হয়ে গেছে আরও ঘরে বসে থেকো না। বেটাছেলে চুপচাপ বসে থাক্‌লে মন শরীর দুই খারাপ হয়ে যাবে। আমার কোন কষ্ট হবে না, তুমি কাজে বেরুতে আরম্ভ কর।

অমর কহিল—আচ্ছা, তাই হবে, আগে ত তোমায়

নিয়ে দিনকতক ঘুরে আসি বাইরে থেকে। সারা জীবন ত কাজ রইল শেফা।

শেফালী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—খোকা এখন কি করছে, তাকে কি আজও একবার কোলে করতে পারবো না ?

অমর হাসিয়া বলিল—তোমার কোলের জিনিষকে কার সাধ্যি দূরে রাখবে শেফা, ক'দিন তোমার কষ্ট হবে বলেই দিই নি। বেশ ত, এখনই এনে দিতে বলছি তাকে—বলিয়া দরজার নিকট গিয়া অমর মুখ বাড়াইয়া বলিল—খোকাকে নিয়ে আসুন ত এ ঘরে।

সতৃষ্ণ নয়নে খোকার আগমন-পথটীর পানে শেফালী চাহিয়াছিল। একটী ফুটফুটে শিশুকে বুকে করিয়া একজন প্রৌঢ়াগোছের ভদ্র মহিলা ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

শেফালীর চোখ দুইটী অস্বাভাবিক বড় হইয়া উঠিল। সে দূর হইতে ছেলেটিকে দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—আপনি ওকে ও ঘরেই নিয়ে যান।

স্ত্রীলোকটী খোকাকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অমর বলিল—ফিরিয়ে দিলে কেন শেফা ?

—কি জানি কেমন ভয় করতে লাগল। ও বেশ আছে, ওঁর কাছেই থাকুক। হ্যাঁ গা, সত্যিই আমার বাঁচবার আশা ছিল না ?

—ও কথা আবার কেন জিজ্ঞাসা করছ। বললুম ত, শতকরা কেন, হাজার-করাও এমন একজনও বাঁচতে দেখা যায় না। আমার বরাৎ ভাল, তাই তোমাকে ফিরে পেয়েছি।

—আমার ক'দিন জ্ঞান ছিল না ?

—সাতদিন। কিন্তু সেকথা শুনে কি হবে শেফা ?

—তা' হোক্, বলো তুমি—বলিয়া শেফালী অমরের মুখের পানে চাহিল।

অমর বলিল—সেদিন কোর্ট থেকে এসে দেখি, তুমি অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে বিছানার ওপর পড়ে আছ; ঝি মাথায় জল দিচ্ছে, আর কাঁদছে। বামুন-ঠাকুর ডাক্তার ডাকতে গেছে।

—আমায় আর ছুটতে হ'ল না, তখনই ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। নাড়ী দেখে মুখ বাঁকালেন। বললেন—একেবারেই 'হোপলেস্' হবেন না; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এখনই এঁকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান; বাড়ীতে এঁর চিকিৎসা সম্ভব নয়।

—মাথায় যেন হঠাৎ বাজ পড়ল। তখুনি ছুটে গিয়ে কলেজে হাজির হলুম তোমাকে নিয়ে। শুনলুম, একে মোটা মানুষ, তায় শরীরের যত্ন না নিয়ে একেবারে 'ব্লড লেস্' হয়ে গেছে। বাঁচে ত পুনর্জন্ম।

—দেখতে দেখতে এক শ' পাঁচ জ্বর এসে গেল। ডাক্তাররা বরফের বিছানা করে তোমাকে শুইয়ে রেখে দিলেন। মাথায়ও 'আইসব্যাগ' চলতে লাগল। মাঝে মাঝে শুধু গোঁঙানীর শব্দ ছাড়া তোমার মুখ থেকে কোন কথাই শোনা গেল না।

চাপা একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া শেফালী বলিল—হ্যাঁ গা, কখন শিউরে শিউরে উঠি নি ?

—উঠেছিলে বই কি, পাঁচ দশ মিনিট অন্তরই ত শিউরে উঠছিলে। ওঃ, কি বিপদই গেছে ! কিন্তু ওসব চিন্তা মাথায় এনো না শেফা, এখন খুব সাবধানে মনের আনন্দে থাকতে হবে তোমায়—আবার যদি 'রিল্যাপ্স' করে, কোনমতেই বাঁচান যাবে না। কিন্তু শিউরণর কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে বলো ত ?

শেফালী হাসিল। বলিল—এমনই। সে কথা শুনে কাজ নেই, তুমি হাসবে। বলবে—পাড়াগাঁয়ে ভূত। তবে আর আমি মরব না, এ তুমি দেখে নিও।

অমর শেফালীর শীর্ণ মুখখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তাই হবে শেফা, তুমি বেঁচে থাকো, আর কিছু চাই না আমি। পাড়াগাঁয়ে ভূত বলব কেন, আমিও ত পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। কি বলবে, বলো না শুনি।

শেফালীর সারা মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে অমরের বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিল—হাসতে পারবে না কিন্তু।

—সেদিন তুমি খেয়ে-দেয়ে আদালতে চলে গেলে আমিও খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়তে বসেছিলুম—কিন্তু কেমন ভাল লাগল না; বইখানা রেখে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না; হঠাৎ একটা কিসের শব্দে চেয়ে দেখি—সামনে এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এক হাতে কমণ্ডলু, অন্য হাতে ত্রিশূল। গলায় একরাশ রুদ্রাক্ষীর মালা। বড় বড় চোখ দু'টা দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—তোকেই খুঁজছিলুম এতদিন। আয়, উঠে আয়।

—ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। বললুম—আমায় খুঁজছিলেন কেন ? কোথায় যাব আমি ?

—কোথায় আবার, যেখান থেকে এসেছিস, সেইখানে, উঠে আয়।

—বললুম—এখান থেকে আমি এক পাও নড়ব না। স্বামীর ঘর থেকে হিন্দুর মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চান, কেমন সাধু আপনি ?

—সন্ন্যাসী হেসে উঠলেন। ওঃ, সে কি ভয়ানক হাসি ! ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

মনে হ'ল সারা দেহ অবশ হয়ে গেছে। চোখ চাইতে চাইলুম, কিন্তু তাও পারলুম না।

—রুক্ষকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—স্বামীর ঘর! তোর আবার স্বামীর ঘর কোথা'? জোর করে একজনকে তাড়িয়ে তার আসন দখল করে আবার বলা হচ্ছে স্বামীর ঘর। ভাল চাস্ ত একটী কথাও নয়—আয়, এখনি চলে আয়।

—হেসে বল্‌লাম—আপনি সন্ন্যাসী, আপনার দেবতা আলাদা, আপনার পথ আলাদা। সংসারীর কথা, তাদের দেবতার কথা নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার আপনার নেই। আপনার কথার আমি জবাব দেব না। আপনি ফিরে যান।

—সন্ন্যাসীর গলার স্বর যেন একটু নরম হয়ে এল। তিনি বল্‌লেন—হয় ত তোমার কথা সত্যি মা। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী নই, গৃহীও নই, আমি স্বতন্ত্র, আমার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র।

—আমি চোখ চাইতে চাইলুম, কিন্তু পারলুম না। বল্‌লুম—তবে আপনি কে বাবা?

—আমি নিয়তি।

—নিয়তি! নিয়তি ত শুনেছি স্ত্রীলোক।

—সন্ন্যাসী হাস্‌লেন। বল্‌লেন—নিয়তির কি কোন রূপ আছে মা! সে কখন আসে সুন্দরের বেশে, কখন সুন্দরীর সাজে, কখন তার প্রকাশ হয় হাঙ্গরের মূর্ত্তিতে, আবার কখন সে বিকট দৈত্যের মত রেলের রূপ ধরে মানুষকে ধ্বংস করে।

—খানিক চুপ করে পড়ে রইলুম। তবে কি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখনও যে আমার কোন আশাই পূর্ণ হয় নি ঠাকুর! আমার গর্ভে রয়েছে আমাদের বংশধর। আমার মুখে চেয়ে রয়েছেন আমার স্বামী। না না, আপনাকে ফিরতে হবে। আমি যাব না, যেতে পারব না। কিছুতেই আপনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না।

—সন্ন্যাসী ধীরকণ্ঠে বল্‌লেন—ছেলেবেলার সব কথা ভুলে গেলে মা। দিনের পর দিন শিবপূজা শেষে তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে যে প্রার্থনা করেছিলে শিবের চরণে স্থান পাবার, সে প্রার্থনা তোমার নিষ্ফল হয় নি। শিবলোকে তোমার স্থান হয়েছে —স্বয়ং দেবাদিদেবের সেবিকার অভাব হয়েছে বলেই তোমাকে স্মরণে এনেছেন। বেশ, গর্ভের সন্তান তোমার দীর্ঘজীবি হোক্—প্রসবান্তেই তোমাকে নিয়ে যাব। আমি আজ থেকে ঠিক্ সাতদিন পরেই আস্‌ব। প্রস্তুত থেকো—বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

—চোখ কিন্তু চাইতে পারলুম না। তোমাকে ছেড়ে যাবার ভয়ে মাঝে মাঝে শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। মনে মনে খুব হাস্‌ছ, না গা?

অমর ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল—কেউ হাস্‌লেই বা ক্ষতি কি শেফা? আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরের সব কিছুকেই ত আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকি; তাই বলে সে সব ত হাসির বস্তু হ'য়ে যায় না। তারপর?

—তারপর কেমন করে জানি না, ক'দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। বোধ হয় ঠিক্ সাত দিনের দিনই আবার সন্ন্যাসী এসে হাজির হ'লেন। বল্‌লেন—সময় হয়ে এলো, প্রস্তুত হয়েছ ত মা?

—প্রাণটা তোমার জন্যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লুম—আমি যেতে পার্‌ব না। আমায় মুক্তি দিন।

—সন্ন্যাসী হাসলেন—সে হাসি গতদিনের মত ভয়ঙ্কর নয়—যেন সহানুভূতি মেশান। বল্‌লেন—মুক্তি দেবার জন্যেই তোমায় নিতে এসেছি মা। সহস্র জন্ম তপস্যা করলেও এ সৌভাগ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দুঃখ কি?

বল্‌লুম—দুঃখ অনেক ঠাকুর। সেদিন আমার সাম্‌নে দেবতা ছিল না, তাই শিবলোকের কামনা করেছিলুম। আজ আমি আমার দেবতা পেয়েছি, দেবতার আশীর্ব্বাদ পেয়েছি, আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। আমার নিজের হাতে গড়া স্বর্গের চেয়ে কোন লোক আমি চাই না, আমায় এইখানেই থাকৃতে দিন। এর জন্যে যদি আর শত সহস্র বর্ষ শিবলোক থেকে বঞ্চিত থাকৃতে হয়, দুঃখ করব না।

—সন্ন্যাসী চিন্তিত কণ্ঠে বল্‌লেন—তাই ত মা, কিন্তু শুধু হাতে ত ফেরবার উপায় নেই। তোমার পরিবর্ত্তে কোন পুণ্যবতীকে যদি পাই, দেবতার কাজের উপযোগী হয়, হয় ত ফিরতে পারি।

—কে যেন বল্‌লে—পুণ্যবতী কি না জানি না; তবে যদি আমায় নিলে হয়, আমায় নিন্ ঠাকুর!

—চাইতে তবুও পারলুম না। সন্ন্যাসী বল্‌লেন—তুমি কে মা, সংসারে এত বীতশ্রদ্ধই বা হয়ে পড়েছ কিসের দুঃখে?

—হাসির শব্দ স্পষ্ট আমার কাণে এসে বাজ্‌ল। কে বল্‌লে—সংসারে বীতশ্রদ্ধ হই নি; দুঃখও নেই আমার। উপভোগ শক্তি ত সবার এক রকমের হয় না; ওর যাতে আনন্দ, আমার হয় ত আনন্দ তা'তে নাও থাকৃতে পারে। নেওয়াই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তা' হলে নির্ব্বিচারে আমাকে নিয়ে চলুন।

—প্রাণপণে চুপ করে মড়ার মত পড়ে রইলুম। তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ এত বড় বলে মনে হ'ল

যে, মুখ ফুটে একবার বলতেও পারলুম না। কেন তুমি আমার জন্যে দেহত্যাগ করবে।

সন্ন্যাসী বল্লেন—তবে তাই হোক্, তুমি মুক্ত!

—চোখ চাইলুম। চেয়েই আবার চোখ বুজে ফেল্লুম। সামনে দেখলুম—হাড়-পাঁজরা বার করা একটা স্ত্রীলোক। বুকে তার সন্ন্যাসীর ত্রিশূল বসান রয়েছে। রক্তে সমস্ত জায়গাটা ভরে উঠেছে।

—আবার চাইলুম। কে ইনি? কিন্তু ভাল করে দেখেও চিন্‌তে পারলুম না। মেয়েটার মুখে হাসি লাগান রয়েছে। এ হাসি যেন কবে দেখেছি। কবে, কোথায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার চোখ বুজলুম। কিন্তু কিছুতেই চিন্‌তে পারলুম না।

—যখন ঘুম ভাঙল, দেখ্‌লুম হাসপাতালের লোহার খাটে শুয়ে আছি। কোথায় সন্ন্যাসী, আর কোথায় কে! সাম্‌নে বসে শুক্‌নো মুখে তুমি আমার পানে চেয়ে আছ।

—ক'দিন শুয়ে শুয়ে ও কথা ভুল্‌তে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। তাই বারবার অত করে রোগের সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম। হ্যাঁ গা, এ কি বল্‌তে পার?

অমর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—না। কিন্তু যাই হোক্, তা'তে আমাদের ভাব্‌বার কি আছে শেফা,? যাঁরই দয়ায় হোক্ তোমাকে ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট। কালই এখান থেকে বেরুব ঠিক করেছি। কোথায় যাবে বলো ত।

—কালই যাবে? বেশ ত, পুরী যাই চলো না। সমুদ্র দেখি নি, দেখ্‌তে ভারী ইচ্ছে করে আমার।

অমর বলিল—তাই হবে শেফা। আজই দু'খানা 'বার্থ' রিজার্ভ করে আসি।

শেফালী বলিল—'বার্থ' রিজার্ভ কেন, এমনই চলো না। নাহক্ খরচ বাড়িয়ে লাভ?

শেফার গাল দু'টিতে টোকা মারিয়া অমর বলিল—লাভ আছে বই কি। যদি কখন তোমার ভাগ্যের জোরে শিবলোকে যেতে পারি—কৈফিয়ৎ দেবার মুখ থাক্‌বে। তা' ছাড়া, ক'টা টাকার জন্যে তোমার অযত্ন করে কি শেষটা পাগলা শিবের কুনজরে পড়্‌ব।

শেফালীর মুখখানি আঙুর-রাঙা হইয়া উঠিল। সে অমরের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—যাও, তুমি বড় ই'য়ে—

অমর কথা কহিল না। শেফালীর মাথার চুলগুলি লইয়া আপন-মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সাতাশ

সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে যৌবন ধর্ম্ম যে কত শক্তিশালী, তাহা বুঝিতে অপূর্ব্বের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। তাই শয্যায় পড়িয়া অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া অবশেষে সে বৌদি' এবং শোভার সংস্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়তর পথ ধরিয়া লইয়া নিরুদ্বেগে সে রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল। তার-পর ভোরবেলা এক টুকরা কাগজে নিজের বিদায় সংবাদটা লিখিয়া রাখিয়া সরাসর একেবারে দেশে আসিয়া উঠিল।

স্কুল-বাড়ী তৈরী করিতে যদি বা কিছু বিলম্ব হইত, অপূর্ব্বের চেষ্টায় দেখিতে দেখিতে ভিতকাটা হইতে ঘর তোলা অবধি অল্পদিনের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল।

স্কুলের আনুসাঙ্গিক কতকগুলা জিনিষ কিনিতে কলি-কাতায় আসিবার পূর্ব্বে উদ্বোধন দিন পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। এত তাড়াতাড়ি আয়োজন শেষ হইয়াছিল যে, অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও অসীমের ছুটি লইয়া এ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হইল না। ভূপালী পত্র দিয়া জানাইয়াছিল তোমাদের উদ্বোধন দিবসে হাজির হইতে পারিলাম না—সত্য, সামনের ছুটীতে গিয়া সুদ সমেত সমস্ত উসুল করিয়া লইব। চাই কি আর একটা বড়সড় অনুষ্ঠানের জন্য তোমার দাদাকে দু'-একমাস ছুটী লওয়াইতেও পারি। ইত্যাদি।

সে পত্রের জবাব দেওয়া হয় নাই। অজয় ও সরযুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব প্লাটফর্ম্ম হইতেই ভূপালীকে পত্র লিখিয়া দিল—আপনার পত্র পাইয়াছি, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর জন্য মনে মনে একটু ভাবনা ছিল।

সে ভাবনা দূর হইয়াছে। যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি; তাহাদের লইয়াই চলিলাম। আপাততঃ মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পাঠাইবেন। ইতি।

রেলওয়ে বাক্সে চিঠিখানি ফেলিয়া দিয়া আসিয়া সে বেঞ্চের উপর বসিতেই অজয় বলিল—একেবারে তাড়া-হুড়ো করে কোথায় লেখা হ'ল অপূর্ব্ব ?

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—ব্যাঙ্কে 'ইন্টিমেশান দিলাম অজয় দা'। টাকা চাই ত ?

অজয় হাসিল, উত্তর দিল না।

সরযূ একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এদিকে লক্ষ্য করিবার অবস্থা তাহার ছিল না। অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনায় সে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের এতবড় দুর্দ্দিনে অভাবনীয়, অচিন্তনীয়রূপে যে সাহায্য মিলিয়া গিয়াছে, ইহাকে নির্ব্বোধের মত অবহেলা করিবার দুঃসাহস তাহার হয় নাই। বরং সে গোপনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু অজানা-পথে পা দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অহেতুক একটা উদ্বেগ সব মানুষেরই মত তাহার মনকেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল—দুঃখের হউক দুর্ভাবনার হউক পরিচিত জীবন-পথটা যেমন করিয়াই হউক তাহারা পার হইয়া যাইত। এ নূতন অজানা-পথে পা দিয়া সে হয় ত ভাল করে নাই।

কিন্তু ফিরিয়া যাওয়াও ত সম্ভব নয়। অপূর্ব্বের মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহাকে উপেক্ষা করিবার শক্তি আর যাহারাই থাকুক, সরযূর নাই।

অপূর্ব্ব যেন কী ! তাহার বলিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র', কাজ করিবার ধারা স্বতন্ত্র। মানুষের মধ্যে বাস করিয়াও যেন সে তাহাদের স্ব-গোষ্ঠীর কেহ নয়, অথচ পর বলিয়া চিন্তা করিতেও প্রাণে বাজে। সরযূ তাহার কথা মনে মনে যত আলোচনা করিয়াছে, ততই এক অদৃশ্য বাঁধনে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের হাত পা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। তাই কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অপূর্ব্ব যখন তাহার নিকট হইতে গোটা ত্রিশ টাকা চাহিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া বিনা জিজ্ঞাসায় যেখানের যত কিছু মোট ঘাট লইয়া একলাই বাঁধিতে বসিয়া গেল তখনও একটা প্রতিবাদ করা দূরের কথা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রইল।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—কি দেখ্‌ছ দিদি, পাগ্‌লা কি করে, না ? স্কুল খুল্‌তে হাতে মাত্র পাঁচটা দিন বাকী, এর মধ্যে যা' যোগাড়-যন্ত্র করতে হ'বে। পাড়াগাঁয়ে মেয়ে জোটানও ত কম হাঙ্গামা নয়, চাই কি দু'-দশটা ফৌজদারী মোকর্দ্দমাও হ'তে পারে।

সরযূ সবিস্ময়ে বলিল—ফৌজদারী মোকর্দ্দমা!—স্কুল খুল্‌তে মামলা হবে কেন অপূর্ব্ব ?

অপূর্ব্ব কপালে হাতটা ঠেকাইয়া বলিল—আর কেন, অদৃষ্ট দোষে দিদি। এখনও বুড়ো কর্ত্তারা বেঁচে আছেন, বর্ণ পরিচয়ের ধার দিয়ে যান নি এমন মেজো কর্ত্তা ছোট কর্ত্তার দলও নির্ব্বিবাদে বসে তামাক টানছেন, তাঁরা এত সহজেই মেয়েদের 'খৃষ্টান' হ'তে দেবেন মনে কর ?

সরযূ এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তাই বলে লাঠালাঠি করতে হবে না কি ?

—নিশ্চয় ! নইলে ভগবানকে কি মুখ্যু ঠাউরেছ দিদি, যে, শত্রুভাবে তিনজন্মে মুক্তি দেবার মতলব করে দিলেন। আমরা অতটা সহ্যও করতে রাজী নই। কতকগুলো ছেলেতে মিলে ঠিক করেছি—যে, বাড়ীর মেয়ে না স্কুলে পড়তে পাঠাবে, তাদের বাইরে বেরনো বন্ধ করে দেব। হয় হোক্ দু'-পাঁচটা জেল জরিমানা। সে আমরা বুঝে নেবো। তোমার ভার রইল শুধু মেয়ে গুলোকে বশ করে নেবার। সে তুমি খুব পারবে। বছর দুই আগে এই করেই ত ছেলেদের পড়ান ধরিয়ে ছিলুম। দুঃখের কথা বল কেন—পড়ুয়া অভাবে স্কুলটা উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল।

সরযূ হাসিয়া বলিল—শেষে একদিন রাত্রে দিক্ তারা জোট বেঁধে ঘরে আগুন ধরিয়ে।

অপূর্ব্ব বলিল—তা' দিতেও যে না পারে এ কথা জোর করে বল্‌তে পারি না দিদি। মরতে ত হবেই একদিন, না হয় একটা ভাল কারণের জন্যেই প্রাণটা গেল। সে জন্যে ভাবনা কি আছে।

এ কথার প্রতিবাদ করা চলে না, কাজেই সরযূও মুখ টিপিয়া বসিয়া মালপত্র গুছাইতে লাগিয়া গিয়াছিল। তখন সময় থাকিতে যাহা করিতে পারে নাই অসময়ে গাড়ীতে বসিয়া তাহার প্রতিবিধান করা সম্ভব নয়, কাজেই সরযূ চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

গাড়ী ছাড়িল। ক্রমে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া অবশেষে অপূর্ব্বদের গন্তব্য স্থানের সীমানায় আসিয়া দাঁড়িয়ে পড়িল।

অপূর্ব্ব অজয়কে ধরিয়া নামাইয়া লইল। সরযূ আপনিই নামিয়া পড়িল ততক্ষণে লছমণের মালপত্র নামান হইয়া গিয়াছে। গাড়ী আবার গন্তব্য পথে ছুটিল।

একবার চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া শেষে—লছমন বানান করিয়া করিয়া ষ্টেশনের সাইনবোর্ডটা পড়িল—ললিত গড়।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—গড় নয়রে, নগর। তুই কি যুদ্ধক্ষেত্র করে তুলবি না কি এটাকে? আমার আপত্তি নেই; কিন্তু বাবা ভয়ানক রেগে যাবেন—কেন না, তাঁর বাবার নামে এ ষ্টেশনের নামকরণ হয়েছে, বুঝ্‌লি?

ঘাড় নাড়িয়া লছমন জানাইল, বুঝিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া অপূর্ব্বকে নমস্কার করিল। যে দেখিল সেই সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিল।

অজয় হাসিয়া বলিল—ব্যাপার কি হে অপূর্ব্ব? তোমরা যে রাজা লোক দেখ্‌ছি! ভাবিয়ে তুল্‌লে। আমরা গরীব—

অপূর্ব্ব বাধা দিয়া বলিল—ও কথা বল্‌বেন না অজয় দা', ছোট ভায়ের অকল্যাণ হবে। দাদা গরীব হলে, ভাই আবার বড়লোক হয় না কি!

—তা' বটে—বলিয়া হাসিয়া অজয় সব ভাবনাই ভুলিয়া গেল। কিন্তু সরযূর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। অপূর্ব্বের বিশেষ কোন পরিচয় লওয়া হয় নাই; অবশ্য তাহা সে প্রয়োজনও বোধ করে নাই। কেন জানি না অপূর্ব্বও যেন পরিচয় পর্ব্বটাকে দূরে দূরেই রাখিয়াছিল। এতক্ষণে সেই দূরে রাখার অর্থটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। অপূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যের কথা জানিলে তাহাদের মত সহায়-সম্বলহীন হয় ত ভাল করিয়া তাহার সহিত মিশিতেই পারিত না, তাই সযত্নে সে আপন ঘরের কথা গোপন করিয়াছিল।

কিন্তু এ গোপন রাখা যে কতদূর অন্যায় হইয়াছে ইহা যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিবার চিন্তাও তাহার মাথায় আসিল না। সে সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

অপূর্ব্ব বলিল—এখন কোথায় গিয়ে উঠবে বলো দিদি? বাড়ীতে নিয়ে না গেলে মা দুঃখ করবেন। বাবা অবশ্য কি করবেন জানি না; কেন না, বকাটে ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই আজ কতদিন, তা হিসেব করে বল্‌তে হয়। সেখানে যাবে, না তোমাদের জন্যে স্কুল-বাড়ীর সঙ্গে যে ছোট বাড়ী তৈরী করে দিয়েছি, সেইখানেই উঠ্‌বে?

সরযূ যেন আসন্ন ফাসীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—স্কুল-বাড়ীতেই চলো অপূর্ব্ব মার সঙ্গে শেষে ধীরে-সুস্থে দেখা করলেই চলবে 'খন।

—বেশ তাই চলো—বলিয়া অপূর্ব্ব অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপূর্ব্বের পিতা শিক্ষয়িত্রীর বয়স দেখিয়া নাক সিটকাইলেন। উদ্যোক্তাদের অনেকের মনেই যেন কেমন অসন্তোষের ভাব দেখা গেল। তবে মুখে কেহই অপূর্ব্বের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না।

উদ্বোধন দিবসের অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলারই সহিত সমাধা হইয়া গেল। সপ্তাহকাল উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতেই কিন্তু সকলে অপূর্ব্বের মানুষ চিনিবার শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিল।

জেল জরিমানা দূরের কথা, সরযূর আন্তরিক স্নেহ-স্পর্শে যে মেয়েটি একদিন স্কুল-বাড়ীর মধ্যে মাথা গলাইল, সে মাথা আর সহজে বাহির করিতে চাহিল না।

বরং দুপুরবেলা সময় কাটাইবার সঙ্গীর অভাবে যে অসুবিধাটুকু অনেক সময় তাহাদিগকে মনমরা করিয়া রাখিত, তাহার প্রতীকার এমন সহজে হইল দেখিয়া তাহারা মনে মনে আনন্দিতই হইল। দিদিমণির সুখ্যাতিতে পাড়া মুখর হইয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—কেমন দিদি, দেখলে ত আমি মানুষ চিনি কি না ?

—খুব চেনো। এখন আমার ঘরে কবে আগুন ধরবে তাই বলো ত শুনি ?

—ও সৌভাগ্য এ যাত্রা হ'ল না বোধ হয়। বাবা গাঁয়ের জমিদার, তিনি যখন স্কুল খুলেছেন তখন সামনা-সামনি কেউ লাগ্‌তে সাহস করছে না। তবে এখনও অনেকের বাড়ীতেই মেয়েদের বিশম রোগের 'এপিডেমিক' লেগে গেছে। দেখি কতদিনে তা' সারে !

—না সারলে ত তোমাদের মোক্ষম ওষুধ আছেই, ভাবনা কি অপূর্ব্ব ?

অপূর্ব্ব হাসিল। বলিল—সে নিদান অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না দিদি। তোমার অন্তরের টানে তারা আপনি এসে ধরা দিতে সুরু করেছে, দেবেও। এদিকে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি।

—বেশী নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ভালর লক্ষণ নয় অপূর্ব্ব, একটু চিন্তিতও মাঝে মাঝে হয়ো—বলিয়া সরযূ হাসিল !

অপূর্ব্বও সে হাসিতে যোগ দিল, কিন্তু মুখে আর কোন কথা বলিল না।

মাস কয়েক যাইতে না যাইতেই গ্রামের প্রায় সব বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াই স্কুল-ঘর ভর্ত্তি করিয়া তুলিল। প্রসন্নময়ী একদিন স্কুল দেখিতে আসিয়া প্রসন্ন-মনেই ফিরিয়া গেলেন। অপূর্ব্বের পিতাও অন্তরে যে বিরুদ্ধ মেঘ জমাইয়া তুলিয়াছিলেন, বাড়ী যাইবার পথে তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রসন্নময়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—মেয়েটী বেশ না গা ? এরই মধ্যে কেমন সব মেয়েদের শিখিয়ে তুলেছে দেখ্‌লে ? ভগবানের স্তব এত চমৎকার বল্‌লে যে, আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল !

প্রসন্নময়ী বলিলেন—আমারও। আবার সেলাইয়ের কাজ কেমন শেখাচ্ছে দেখেছ। রান্নাবান্নার বিষয় এত সুন্দর করে শেখাচ্ছে যে, আমরা বুড়ো হয়েছি তবু পারি নি। এত শিখ্‌লে কোথা থেকে কে জানে! অপূর্ব্ব মানুষ চেনে বটে ! হাজার হোক্ শিক্ষিত ছেলে ত ! অসীম এলে আরো ভাল করে বুঝ্‌তে পারবে। ভূপালীও একে দেখে কম খুশী হবে না, কি বলো ?

—নিশ্চয়—বলিয়া বৃদ্ধ তাহার সমর্থন করিলেন।

এদিকে যেমনই স্কুল ভর্ত্তি হইতে লাগিল, ওদিকে তেমনই অপূর্ব্বের আনাগোনা কমিতে সুরু করিল। শেষে একদিন অপূর্ব্বের পরিবর্ত্তে তাহার একখানি ছোট চিঠি লইয়া অজয় বিষণ্ণ অন্তরে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল—অপার কাণ্ড দেখেছ সরযূ ?

সরযূ হাসিয়া বলিল—না। কি করেছে অজয় দা ?'

—সাতদিন ধরে বাবুর এদিকে মাড়াবার সুবিধা হয় নি ; আজ মনে করলুম, স্কুলের ফেরতা ঘুরে আসি তার বাড়ী থেকে। গিয়ে দেখি—বাবু উধাও হয়েছেন। আমাকে একখানা ছোট চিঠি লিখে গেছেন, তার অর্থ বিশেষ কাজে পড়ে যেতে হ'ল, দিদির সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না। সামনের ছুটীতে ষাণ্মাসিক পুরস্কার-বিতরণ-সভা ডাক্‌বেন। আমার বড় দাদা ও বৌদি'কে সেই সময় নিয়ে আমি ফিরব। তারাই সভাপতি সভাপত্নী না কি সব হবেন। ইত্যাদি...

—তার বাপ বেচারী ত রেগেই লাল ! বল্লেন—দেখুন মশাই, আক্কেলটা একবার দেখুন ! ওর বিশেষ কাজ কি জানেন—পাঁচভূতের বেগার খাটা। কোথায় কেউ ভিজে চোখে নিশ্চয়ই ঠকাতে ডেকেছে, অম্‌নি ছুটেছে। পারিও না আর !

—না পারার কথাই বটে ! তা' গেছে যাক না অজয় দা, তুমি আর একটা উৎসবের যোগাড় করে তুল্‌তে পারবে না ? খুব পারবে। অপূর্ব্বকে দেখিয়ে দিতেই হবে যে, সে না বলে পালিয়েছে বলে আমরা ভয় পাই না। সে না থাকলেও আমরা একটা কেন, অমন অনেক উৎসব করতে পারি।

অজয় হাসিয়া বলিল--তোর যেমন কথা ! উৎসব করতে পারব না কেন ? ভয়ই বা পাব কোন্ দুঃখে ? তবে দু'জনে থাক্‌লে যেমন করে করা সম্ভব হ'ত, তা' কি—

সরযূ হাসিয়া উঠিল। বলিল—ভয় ত ওকেই বলে দাদা। কোন চিন্তা নেই, এখনো অনেক সময় রয়েছে। ছুটো খুব ভাল দেখে কবিতা তৈরী কর দিকি, মেয়েদের মুখস্থ করিয়ে সভায় শুনিয়ে দেব। আর কিছুব দরকারই হবে না। ওতেই তোমার বোনের ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

—না, তুইও পাগল হ'লি দেখছি সরযূ। কবিতায় ধন্য ধন্য পড়্‌বে না হাতি! যে আস্‌বে, শুন্‌ছি সে কোথাকার হাকিম। তাদের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তোর ফকুরে দাদার অমন ফকিরী লেখাব জন্যে যেন তাদের ঘুম হচ্ছে না।

—না হয় জলই একঘাটে খাবো। হাকিমে অত ভয় পাচ্ছ কেন? ভূপালীর স্বামীও ত হাকিম ছিল। তার কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

অজয় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাব কথা কি ভোলা যায় রে!—সে হাকিম ছিল আধা—কেন না হুকুম ছিল ভূপালীর হাতে। কাজেই ভয় ছিল না। কিন্তু তাদের খবরও ত একবার নিলি না সবযূ?

সরযূ সে কথার উত্তর দিল না। বলিল—আচ্ছা অজয় দা' এ হাকিম যদি সেই-ই হয়, কেমন হয় বলো ত?

অজয় লাফাইয়া উঠিল। বলিল—খবর পেয়েছিস না কি সরযূ? সত্যি, সত্যি যদি হয় আমি স পাঁচ আনার হরির লুট এখনই তোর হয়ে তোদের তুলসীতলায় দিয়ে আসি।

সরযূ হাসিয়া বলিল—তুলসীতলার বরাৎ এতটা সুপ্রসন্ন হয় নি অজয় দা' যে, তোমার পয়সা লুট করবে। এমনই কথার কথা বল্‌ছিলুম। কোথায় তারা, আর কোথায় আমরা।

—তা' বটে—বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অজয় চুপ করিয়া গেল।

আটাশ

দিন সাতেক উপর্য্যুপরি বৃষ্টির পর আকাশটা সবে একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়াছে। দুরন্ত ছেলে বাপ-মায়ের কঠোর শাসনে আবদ্ধ থাকিলেও একটু ফাঁক পাইলেই যেমন 'সট্' করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, মেঘ-লোকের যড়যন্ত্র জাল ভেদ করিয়া সূর্য্যদেবও তেমনই মাথা বাহির করিয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছিলেন।

কাল আদালত খুলিবে, তার কতক্ষণ হইল অসীম ও ভূপালী দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি খোলা হয় নাই। অশ্রুমুখী শোভার মুখখানি মুছাইয়া দিতে দিতে ভূপালী বলিল—কেউ ত অমর হয়ে আসেন না শোভা, কেঁদে কি করবি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্—যেন তাঁর আত্মার তৃপ্তি হয়। কবে এতবড় সর্ব্বনাশটা হ'ল?

শোভা অশ্রুভাঙা কণ্ঠে বলিল—আপনারা যাবার দু'দিন পরেই। আপনাব যাবার দিন রাত্রেই হঠাৎ কেমন শরীর খাবাপ হয়েছিল—পরেব দিন কাট্‌ল বটে। কিন্তু আর তাঁকে বাঁচান গেল না। অপূর্ব্ববাবু এসে পড়েছিলেন তাই রক্ষে। নইলে—

সবিস্ময়ে ভূপালী বলিয়া উঠিল—কে ঠাকুবপো? ঠাকুবপো এসেছ নাকি? কই কোথায় গেল?

—কোথায় বেরিয়েছেন, আসবেন এখনই। আপনাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে উনি এসেছিলেন। কিন্তু যেদিন উনি এলেন, তাব আগেব দিনই আপনারা রওনা হয়ে গেছেন। সেইদিনই উনি চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যাওয়া হ'ল না; হতভাগিনীর জন্যে আট্‌কা পড়ে গেলেন। স্কুলের কাজ বেশ ভালভাবেই হয়ে গেছে ত দিদি।

ভূপালী বলিল—হাঁ ভালভাবেই বল্‌তে হবে বই কি শোভা। সামনের ছবিতে হয়ত ভাল না হ'তে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে যে খুব ভালভাবেই কাজ করে এসেছি তা'তে আর সন্দেহ কি?

শোভার চোখ দু'টী বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে বলিল—কি করে এলে দিদি?

—বেশী কিছু নয় শোভা। দুটো ঠক্ মিলে আমার ঠাকুরপোকে ঠকিয়ে খাচ্ছিল, তাদের বিদায় করে এলুম। ভণ্ড চরিত্রহীনকে দিয়ে আর যাই হোক্, মেয়েদের শিক্ষা

দেবার কল্পনাও মাথায় আনা উচিত নয়, এ কথা কে না মানবে বলো?

শোভার মুখখানি ছায়ের মত হইয়া গেল। সে বলিল—কি করলে দিদি, সরযূ দি'কে তাড়িয়ে দিলে?

ভূপালী সবিস্ময়ে শোভার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। বলিল—ঠাকুরপোর কাছে শুনেছিস্ তবে? এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ত ছিল না শোভা। আমার অবস্থায় পড়লে তুইও কি তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারতিস? সংসারের কাছে তারা যে অপরাধ করেছে, তার শাস্তি সংসারেরর কাছ থেকেই যে নিতে হবে।

শোভার শুষ্ক নয়ন কোণে আবার জল রেখা দেখা দিল। সে বলিল—সংসারের কাছে শুধু অপরাধীরই শাস্তি হয় না দিদি, বিনা অপরাধীর শাস্তিও হয়ে থাকে। নইলে দিদির—

ভূপালীর বুকের কোন গোপন তন্ত্রীতে গিয়া এই কথাগুলা আঘাত করিয়া তাহার অভিমান স্তব্ধ অন্তরটাকে খান খান করিয়া দিল। তথাপি নিজেকে অমিত বলে সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল—নইলে কি বলছিস্ শোভা, নিরপরাধী দিদিকে এতবড় শাস্তি মাথা পেতে নিতে হ'ত না, না? কিন্তু ও তোর ভুল কল্পনা। আমারই মত বাইরেটা দেখে তুই ভুলেছিস্, অন্তরটার খোঁজ নিস্ নি বলে চোখে জল এসে গড়াচ্ছে। জল কি ছাই আমারই আসে নি, এখনও আসে, এখনো মনে হয়, যদি একবার সে আমায় বলত—যা' শুনেছি—সব মিথ্যে, সব ভুল, আমি পৃথিবীর সবার বিপক্ষে তার হয়ে লড়তে পারতুম। কিন্তু যা' হবার নয়, তা' হয় না; পঙ্কজিনী সে হ'য়ে উঠতে পারে নি পাঁকের জয় হয়ে গেছে, শোভা।

ভূপালীর অন্তরটা যেন মুহূর্ত্তে শোভার নিকট উন্মুক্ত হইয়া গেল। সমব্যথীর বেদনা বুঝিতে তার একটুও বিলম্ব হইল না। সে দিদির বুকের মধ্যে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। ভূপালী বলিল—যখন স্কুলে গিয়ে প্রথম তাকে দেখলুম, পায়ের তল থেকে মাটীগুলো যেন খসে খসে যেতে লাগল। পড়েই যেতুম, কে আমাকে ধরে ফেললে। নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখি তার হাত দুটো আমায় ধরে রয়েছে। অসহ্য! এ একেবারে অসহ্য!—আস্তে আস্তে সরে গেলুম। শাশুড়ী বললেন—কি হ'ল বৌমা, ভাগ্যিস্ উনি তোমাকে ধরে ফেলেছিলেন, নইলে বিপদ হয়েছিল আর কি! বসে পড়ো। একে গাড়ীর ধকল, তা'তে না নাওয়া, না খাওয়া শরীর টেঁকে কখনো? বললুম—আজ যাক কাল এস। তা' ত শুনলে না, বললে—স্কুল বাড়ী দেখবে, ওঁর সঙ্গে আলাপ করবে, কাজেই আসতে হ'ল। এখন কি ফ্যাসাদ দেখো ত?

—বললুম—হঠাৎ মাথাটা কেমন করে ঘুরে গেল, এখন ভাল আছি মা।

—মুখে বললুম বটে, কিন্তু এক পাও এগুবার ইচ্ছে হ'ল না। চুপ করে একটা চেয়ারে বসে রইলুম। খানিক পরে মা—কি একটা কাজে কোথায় উঠে যেতেই ওর দিকে চেয়ে বলে উঠলুম—যা' শুনেছি সব সত্যি?

—ও হেসে বললে—কি শুনেছ ভূপা? না বললে ত বলতে পারি না কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে?

—রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। বললুম—তুমি তাই কি না যা' শুনলেও কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। বলো শীগগির বলো, নইলে তোমার সংস্পর্শও আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

—মাথাটা তার একবার নেমে গেল। তারপর সে মুখ তুলে কি বলতে গেলও যেন, কিন্তু মাকে দূরে আসতে দেখে চুপ করে গেল। বললুম—কাল সকালের মধ্যে তোমার সত্যি পরিচয় তুমি আমায় জানাবে। যদি সত্যিই অপরাধী হও, আর একদিনও এ গাঁয়ে থাকতে পাবে না। থাকলে সমস্ত লোকের সামনে স্কুলের সভায় আমি তোমাকে অপমান করতেও পেছুব না। ঠকেছি অনেক, কিন্তু আর নয়! চরিত্রহীনকে চরিত্র তৈরী করাবার ভার দেওয়ার মত দুর্বুদ্ধি নেই আমাদের।

—মা এসে পড়লেন! বললেন—আলাপ হ'ল দুজনের? কর্ত্তাতে আমাতে ক'দিন বলাবলি করছিলুম বৌমা এলে এঁকে দেখে ভারী খুসী হবে।

—বললুম—খুব আনন্দ হ'ল। এখন বাড়ী চল মা, শরীরটা ভাল নেই আমার।

—মা ব্যস্ত হয়ে তখনই বাড়ী ছুটলেন।

শোভা ভূপালীর বুক হইতে মুখ তুলিয়া কতক্ষণ তাহার কথাগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল বলিল—তারপর।

ভূপালীর জবাব দিবার আবশ্যক হইল না। পিছন হইতে কে বলিল—তারপর, পরদিন সকালে আব তাঁদের কাউকে সে গ্রামে দেখা গেল না, কেমন এই ত বল্‌বে বৌদি'?

ভূপালী ফিরিয়া দেখিল—বক্তা অপূর্ব্ব। সে বলিল—সত্যিই তাই, কিন্তু কেমন করে তুমি খবর পেলে ভাই? কে বললে তোমায়?

অপূর্ব্ব ধীরভাবে কহিল—কেউ খবব দেয় নি বৌদি' তোমার কথা শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি। গ্রামেব দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁদের ধবে রাখতে পাবলুম না। কিন্তু—

—কিন্তু কি ঠাকুর পো?

—না, কিছু না। বলিয়া অপূর্ব্ব আবার ঘব হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

ভূপালী বলিল—না কিছু না নয় বল, বলতেই হবে তোমায়! ও কি কোথায় যাচ্ছে আবার?

অপূর্ব্ব হাসিল। বলিল—দিদিকে দেখতে চলেছি বৌদি এতবড় নিষ্পাপ চরিত্রবানদের আরও কত শাস্তি সংসার দিতে পারে তা' দেখতেই হবে যে।

—নিষ্পাপ! চরিত্রবান! তুমি কি বলছ ঠাকুর পো?

অপূর্ব্ব এবারও হাসিল। বলিল—হয় ত ঠিকই বল্‌ছি। কিন্তু পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলায় যে দেশের মেয়েদের জাত যাওয়ার ভয় ষোল আনা, বাস করলেই যে কোন গোময়ই আর তাকে উদ্ধার করতে পারবে না এত জানা কথাই বৌদি'। দুঃখ করলে চলবে কেন? এর জন্যে পুরুষদের কাছে অভিযোগ করাও নিষ্ফল। কিন্তু তখনই দুঃখ যখন দেখি মেয়ে হয়েও মেয়েদের ছোট ভাব্‌তে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। পুরুষদের সূক্ষ্ম বিচারে মেয়েদের অশেষ লাঞ্ছনা ত ইতিহাসের গোড়ার দিন থেকে শেষ দিন অবধি রইলই—নিজেরা যদি নিজেদের দিকে দেখ্‌তে না চায় কে তাদের বাঁচাবে বলোত?

ভূপালী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তোমার উপদেশ শোন্‌বার আমার এখন সময় নেই ঠাকুরপো, শুধু তুমি আমায় বলো, একটিবার বলো, তবে তারা পালাল কেন? কেন সে স্পর্দ্ধার সঙ্গে আমায় বল্‌লে না তার স্পর্দ্ধিত জীবনের কথা।

অপূর্ব্ব হাসিল। তেমনই প্রাণ খোলা হাসি। এতটুকু কপটতা নাই, এতটুকু আবিলতা নাই। সে বলিল—সত্য যুগের অগ্নি পরীক্ষায় সীতার যে কলঙ্ক দূর হয় নি, তাঁর একটা মুখের কৈফিয়তে তা' কি হয় বৌদি'? কেন তিনি চলে গেছেন জানি না—তবে এ যাওয়াতে তাঁর চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই কথাই বলিতে পারি। গোটা মানুষটাকে দেখে, তাঁর সঙ্গে বাস করেও যা' ধরা যায় নি, একটা মুখের কথায় তা' ধরা পড়েবে, এমন দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে দিদি ভালই করেছেন। শুধু কথায় যদি বিশ্বাস হয়, আমাব কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পার বৌদি, বন্ধুব স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই শুধু সহজ বলে সত্যি নয়, কঠিন হলেও এও তেমনই সত্যি...

—মা ও ছেলে, ভাই ও বোনের সম্পর্ক ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোন পরিচয়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করে নি, দিদির নিষ্ঠা, দিদির আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে একদিন অনুতাপে অজয় দা নিজের দুটো হাত দিয়েই তাঁর মুহূর্ত্তেব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

ভূপালীর চোখে জলের ধারা বহিয়া চলিয়াছিল, বলিল—আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমি সব বুঝেছি। যেমন করে পার দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে এস ঠাকুরপো! যেখান থেকে পার নিয়ে এস তাকে।

অপূর্ব্ব হাসিল, কথা কহিল না।

—দাঁড়াও, এখনই আসছি আমি—বলিয়া ভূপালী ঘরের ভিতর হইতে কতকগুলা নোট আনিয়া অপূর্ব্বকে দিতে দিতে বলিল—কত খরচ হবে জানি না, আরো যদি লাগে চিঠি লিখো আমায়।

অপূর্ব্ব টাকাগুলা হাত হইতে লইয়া পকেটে পূরিতে

পূরিতে পথে নামিয়া পড়িল। আর একদিন একগাদা টাকা অপূর্ব্বের হাতে তুলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব আনন্দে ভুপালী অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। আজ কিন্তু চোখের জলে সে পথ দেখিতে পাইল না।

পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া অসীম তখন কি করিতেছিল, কে জানে! তবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইত—বাহিরের কথাবার্ত্তা শুনিবার আগ্রহ তাহার কম নহে।

সরযুর পরদিন ভোরে পলাইবার কৈফিয়তে অপূর্ব্বের উত্তর তাহার নিকট কেমন লাগিল বুঝা গেল না। তবে সে পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া দেখিল, তাহাতে লিখা রহিয়াছে।—

মাননীয় শ্রীযুক্ত অসীমকুমার মিত্র মহোদয় সমীপে—

এইমাত্র আপনার চাকরের প্রেরিত অজয়বাবুর নামীয় পত্র পাইলাম। আপনার আদেশ মত কল্য প্রাতেই আমরা এ গ্রাম ছাড়িয়া যাইব ইহার প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আশা করি এই কয় ঘণ্টার জন্য অবকাশ দিয়া আপনি আমাদের ধন্যবাদার্হই হইবেন। আর একটী ক্ষুদ্র অনুরোধ,আপনাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যখন একটি কথাও আমাদের বলিবার নাই এবং আদেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত রহিয়াছি, তখন এই কয় ঘণ্টার মধ্যে অজয়বাবুকে আর এসব বিষয় কোন কথা না জানাইলে অত্যধিক উপকৃত হইব। তিনি অসুস্থ, অধীর মস্তিষ্ক এই কারণ অনুরোধ করিতেছি। বিশ্বাস, এ অনুরোধ উপেক্ষিত হইবেন না। ইতি,

ভবদীয়

শিক্ষয়িত্রী

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পত্রখানি সে আবার পকেটে রাখিয়া দিল।

আগামী বারে সমাপ্য

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৩ { তৃতীয় সংখ্যা

পথে পাওয়া

শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবী

ছুটী শেষে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে, কাজেই সুধন্যুর বেগবান 'বিউইক্' গাড়ীখানা অন্ধবেগেই ছুটিয়া চলিতেছিল। গন্তব্য পথ এখনও ক্রোশ ছয়েক; হাতে মাত্র আধঘণ্টা সময়।

ভোর রাত। সূর্য্যের অস্পষ্ট আলোক তখনও আকাশের গায়ে নিজের অধিকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয় নাই। পল্লী-পথ সহরের আবহাওয়ায় গঠিত হইলেও এখন জনশূন্য। পথি নিদ্রিত দু'-একটা মালিকহীন কুকুর পাবের জঞ্জাল আসন দখল করিয়া সুখস্বপ্ন মগ্ন। কচিৎ দু'-একখানি ধান বা আনাজ বোঝাই গাড়ীর মৃদু মন্থরগতি সুধন্যুর পথে বাধাস্বরূপ আসিয়া দাঁড়াইতেছে। চালক নিদ্রিত; কাজেই দুইটী ভারবাহী পশুর ইচ্ছার উপর গাড়ীর যেমন শৃঙ্খলায় চলা সম্ভব তার ব্যতিক্রম হইতেছে না। সুধন্যুর গাড়ী জোরে চলিবে কি, পথের মাঝে কখান কথায় বৃদ্ধ যাত্রীর মত হাঁপ্ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে।

এরপর অনেকটা পথই বিনা বাধায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিয়া সুধন্যু মনে মনে আশ্বস্ত হইল। না, পথ আর শত্রুতা করিবে না, আর তা' যদি না করে, তবে বৃদ্ধা মায়ের নিকট অন্ততঃ কৈফিয়তের অজুহাতে মিথ্যার অবতারণা করিতে হইবে না এটা নিশ্চয়।

হঠাৎ বাঁ পাশের ফটক খুলিয়া একটি চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে ছুটিয়া আসিল। এত অতর্কিত যে, সুধন্যু তাল সাম্‌লাইতে পারিল না। গাড়ীর ধাক্কায় মেয়েটী ছিট্‌কাইয়া একটা গাছের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

গাড়ী থামাইয়া সুধন্য ছুটিয়া আসিল অপরিচিতা

নারীকে সাহায্য করিতে। বাহ্যিক আকার-প্রকার দেখিয়া মনে হইল বুঝি সে সাহায্যের বাহিরে। হঠাৎ একটা আতঙ্ক আসিল। মনে হইল, এ বিপদে আর জড়াইয়া কাজ নাই; গাড়ী ছুটাইয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তা' মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই মেয়েটীকে সযত্নে তুলিয়া সে পরীক্ষা করিতে লাগিল। মাথার ডান দিক্‌টায় একটা গভীর ক্ষত; ক্ষতমুখ দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। না, মৃত্যু দ্বারে আসিলেও এখনও নিজের রাজ্যের অতিথি করে নাই।

সুধন্ম নিজে ডাক্তার। গাড়ীতে প্রথম সাহায্যের অনুরূপ ঔষধ-পত্রের অভাব ছিল না। দেখিতে দেখিতে মেয়েটীর ক্ষতস্থান পরিস্রুত জলে ধৌত ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া তাহাকে নিজের গাড়ীতে আনিয়া শোয়াইয়া দিল; তারপর গেটের দ্বারে আসিয়া ডাকাডাকি সুরু করিল।

এ বাগান-বাড়ীতে যে মানুষ আছে, তার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। উপায়বিহীন সুধন্ম তখন বাধ্য হইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাসপাতালের কোয়ার্টারে আসিয়া সে একবার ইতস্ততঃ করিল; তারপর দৃঢ়হস্তে মেয়েটীকে দুই বাহুর মধ্যে তুলিয়া লইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

"এই ফিরলি সুধন্ম, রোগী কি বড়ই বিপন্ন রে! ও মা, এ কি!"—বলিয়া মাতা কয়েক পদ পিছাইয়া গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই কিন্তু স্নেহভরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আহা, কার বাছারে! কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিলে তারা! কি অসুখ ওর?"

সুধন্ম সংক্ষেপে শুধু বলিল, "চাপা দিয়েছি মা।"

পরক্ষণেই ঘরে ঢুকিয়া মেয়েটীকে নিজের বিছানার উপর সযত্নে শোয়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি কি একটা ঔষধ বাহির করিয়া ইঞ্জেকসন্ করিল; তারপর বাহিরে যাইবার মুখে বলিল, "আমি গিয়েই একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি মা, যা' যা' দরকার সব তাকেই বুঝিয়ে দেব।"

মা বলিলেন, "না বাপু, ও সব ধার-করা মাগীকে বাড়ী ঢোকাতে হবে না।"

সুধন্ম কাতর-কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ওকেও ত দেখ্‌বার একজন চাই মা।"

মা বলিলেন, "সে হবে 'খন, তুই সকাল সকাল আয় গিয়ে, কাল সারারাত জেগেছিস। হ্যাঁরে, তা' না বেরুলে কি আজ চলেই না?"

সুধন্ম শুধু হাসিল, মুখে কিছু বলিল না।

মা নিজেই কিন্তু নিজের কথার প্রতিবাদ তুলিয়া বলিলেন, "ওই দেখ্ ভুলে গেছি, কত বাছারা অসহায় হ'য়ে হাসপাতালে পড়ে আছে—না না, তুই আয় গিয়ে, ওষুধ কিছু পাঠিয়ে দিস্ এর জন্যে।"

দুই

শুক্লা নাম ইহারা যে কি করিয়া আবিষ্কার করিলেন, তা' শুক্লারও অজ্ঞাত। ওই নামে ডাকিলে তাহাকেই যে আহ্বান করা হইতেছে এটা সুস্পষ্ট বুঝা যায়; তার কারণ, এ বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়ে আর কেহই নাই।

মা ছেলেকে ডাকিয়া অনুযোগ করিলেন, "কোত্থেকে এক পথের মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলি বল্ ত সুধন্ম, আমি আর পারি না যে!"

ছেলে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "পরের মেয়ের জন্যে এত দিন ত জ্বালাতন করেই আস্‌ছিলে মা, এখন ও কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন?"

মা বলিলেন, "কথার ছিরি দেখো! আমি কি এমনি পরের মেয়ে চেয়েছিলুম? হ্যাঁ বাবা, তা' ওর কে কোথা' আছে খোঁজ নিলি?"

ছেলে উত্তর দিল, "আমি কার কাছে খোঁজ নেব মা, বলেছি ত সে বাড়ীতে তখন বা পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি ও ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ সেথা নেই। ওই ত কাছে রয়েছে, জান্‌তে হ'লে আমার চেয়ে তুমিই ত বেশী জান্‌বে।"

মা বলিলেন, "জিজ্ঞেস ত করি, ও শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়েই থাকে। ভাবে, তবু বল্‌তে পারে না।"

ছেলে বলিল, "তা' হয় মা, মাথার চোট কি না; অনেক সময় এ রকম চোট পেলে আগের কথা বিস্মরণ হ'য়ে যায়। এদিকে ব্যবহার কেমন?

"গতর খুব বাবা, ঘরের সব কাজ নিজে হাতে করে। ভুখন্, গিরিধারীকে কিছু করতে দেয় না। আমার

পূজোর যো যা' করে, মনে হয় কে যেন থরে থরে ফুল দিয়ে পূজোর আগে পূজো করে রেখে গিয়েছে। দুর্ভাগ্য, অমন মেয়ে কোন্ জাতের তা' জান্‌তেও পার্‌লুম না!

সুধন্যু হাসিয়া বলিল, "জান্‌লে কি করতে মা? ধর্‌লুম স্বজাত; হাতে খেতে পারতে কি ওর—ঘেন্না হ'ত না?"

মা আগ্রহভরে বলিলেন, "সত্যি, সত্যি, তুই জেনেছিস ও আমাদের স্বজাত। আহা, তাই যেন হয়! অমন পাগ্‌লাটে ভাব থাক্‌বে নারে, দেখিস তুই। আমি সব ঠিক্ ক'রে নেব। শুক্লা, কোথা গেলি, শোন্ ত।"

ছিন্ন মলিন বসন পরিহিতা, রুক্ষকেশা শুক্লা তার নিরাভরণ অপূর্ব্ব শ্রী লইয়া আগাইয়া আসিল। ও যেন বন কুসুম। যেখানে ফুটিয়াছে, ঠিক্ সেইখানে রাখিলেই শোভা পায়। তুলিয়া উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি করিতে গেলে ছোঁয়াচ লাগে, আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়, অল্পেই মলিন হইয়া যায়।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছিলি মা, কোথা থেকে কালী মেখে এলি, এমন মুদ্দফরাসের মেয়ের মত থাক্‌তেও ভাল লাগে তোর?"

আন্দুর-রাঙ্গা মুখে শুক্লা বলিল, "ছবিগুলোয় ময়লা জমেছিল, চূণ দিয়ে তাই সাফ্ করে ফেল্‌লুম। একটা 'মেটাল পলিস' এনে দিতে বলুন না। রূপোর রেকাব, ফুলদান, গোলাপপাশগুলো সাফ্ করে ফেল্‌ব।"

সুধন্যু হাসিয়া বলিল, "তার চেয়ে একটু নিজেকে সাফ্ করে ফেলো ত শুক্লা, মা ত তোমায় নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। লোকের কাছে কি যে পরিচয় দেবেন—"

হয় ত এতক্ষণ সুধন্যুকে সে দেখে নাই। গলার আওয়াজে শিহরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। তার অবস্থা দেখিলে দয়া হয়। ঘামিয়া নাহিয়া যাইতেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখিতে গিয়া সে অধীর ও সিন্দুর-রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে।

মা হাসিয়া বলিলেন, "ও কারুর বকুনি সহ্য করতে পারে না ধন্যু, বেশী বল্‌লে হয় ত কেঁদেই ফেল্‌বে। তুই যা', আমি ঠিক করে নেব 'খন।"

সুধন্যু যাইবার পথে একবার ফিরিয়া চাহিল; তারপর পরিহাস-জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "অমন ডোমনীর মত থাক্‌লে আমি কিন্তু ওকে ফের সেই পোড়ো বাগানে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌ব মা।"

আতঙ্কে শিহরিয়া শুক্লা সুধন্যুর মাতাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। মাতা সরলা দেবী বলিলেন, "তুই ক' যোড়া কাপড় ওর জন্যে এনে দিয়েছিস ধন্যু, যে দুষ্‌ছিস্। সত্যই ত, একদিক্ থেকে একজনকে বিনা দোষে দোষী করলে চলে, না তা' ভাল দেখায়?"

তিন

বাগানে শেফালী ফুলের রাশ কার্পেটের আসন বিছাইয়া পড়িয়া আছে। শুক্লা অত ভোরে একা সাজি হাতে ফুল তুলিতে বাহির হইয়াছে। নির্জ্জন বাগান কেবল পক্ষী কূজনে মুখরিত। দূরে দয়েল শিস্ দিতে দিতে যেন বনদেবীর প্রথম বন্দনা-গীত গাহিয়া উঠিল।

শুক্লা থমকিয়া দাঁড়াইল। সে গীতের অনুকরণ তার কণ্ঠে হয় ত অজ্ঞাতেই ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আতঙ্কে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। সে সুধন্যুর খোলা বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল—বড় চুরী করিয়া চাওয়া। পরক্ষণে অতি সন্তর্পণে চুপে চুপে সে সেদিক হইতে সরিয়া পলাইতে গেল—হঠাৎ কে একজন আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "যেতে হবে, চলো।"

এক হাতে সাজি, অন্য হাত লোকটার হাতের মধ্যে আবদ্ধ। নিরুপায় বালিকা হয় ত একবার চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া প্রাণপণ যত্নে কণ্ঠরোধ করিল। তারপর অসীম বলে লোকটার ধৃত হাতটার উপর কামড়াইয়া ধরিল।

যন্ত্রনা পাইয়া লোকটা তাহাকে ছাড়িয়া দিল; তারপর দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "মনে করেছিস কি, যাবি না, আমি তোকে নিয়ে যাবই! অতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে কিছুতেই আমি পারব না! তোকে যেতেই হবে! বল্, যাবি কি না?"

উত্তরে শুক্লা হাতের পিতলের সাজিটা শুধু লোকটার

নাকের উপর ছুঁড়িয়া দিল। রক্তের সহিত ফুল ছিটাইয়া সমস্ত স্থানটীকে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিল।

লোকটা হয় ত কিছু বলিত, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে দূরে পদ-শব্দ পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

মা আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এত ভোরে একা বাগানে—কি ডাকাবুকো মেয়ে মা তুই! ভয়-ডর নেই!"

শুক্লা জবাব দিল না। তাড়াতাড়ি সাজিটা মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া ফোয়ারার একপার্শ্বে সেটি মাজিতে বসিল।

মা স্নেহভরা-কণ্ঠে বলিলেন, "আ, আহম্মুকের মেয়ে এত ভোরে নিজে বস্‌লি আবার বাসন নিয়ে—কেন বাড়ীতে কি চাকরের অভাব হয়েছে?"

"তার চেয়ে আমি—"গলাটা কাঁপিয়া গেল; অসমাপ্ত কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল—বলা হইল না।

মা ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "আমি রামফলকে মোটর তৈরী করতে বলেছি, গঙ্গাস্নান যাব। যদি সুধন্ম্ খোঁজে, বলিস। তার যা' যা' ভাল লাগে তা' ত জানিস? সাম্‌নে সেইগুলো এগিয়ে দিস্। যেন আমি থাক্‌ছি না বলে কষ্ট না পায়।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুক্লা তার মুখের দিকে চাহিল। যেন সে কি বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না। গৃহিণী সরলা দেবী ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

ছুটিয়া নিকটে গিয়া শুক্লা কাতর-জিজ্ঞাসু-কণ্ঠে বলিল, "তোমার শিবপূজো মা, মালা?"

"মালা আমি নিয়ে যাচ্ছি। শিবের মাথায় তুই-ই একটু জল দিস্।"

অস্ফুট আতঙ্কে শিহরিয়া শুক্লা বলিল, "আমি!"

গৃহিণী মৃদু হাস্যে বলিলেন, "কেন, পারবি না? আমার ত মেয়ে তুই; মায়ের এ কাজটুকু কি এতই ভারী হবে না কি তোর?"

"না, ভারী নয়, কিন্তু আমি—তা'তে পূজো হবে?"

"হবে লো হবে। বরং ঘটা করে একটু কাঁদিস, তা' হ'লে শিব বেশী করেই সন্তুষ্ট হ'য়ে সুধন্মুর মত—"

শেষটা দাঁড়াইয়া শুনিবার মত অবস্থা বুঝি শুক্লার ছিল না; সে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিল।

মা বাহিরে আসিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দেখ্‌তে পেলে রামফল?"

রামফল যোড়হাতে নমস্কার করিয়া বলিল, "পেয়েছি মা। গলায় পৈতে, নাক দিয়ে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে, মুখে বল্‌ছে—"

গৃহিণী মুখে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, "চুপ্, এখানে নয়।"

'ভেঁ্যাৎ' করিয়া গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

চার

সুধন্ম্ নিকটে আসিয়া বলিল, "মা কোথায় গেলেন শুক্লা?"

শুক্লা ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "গঙ্গাস্নানে। আপনার চা দেওয়াব?"

সুধন্ম্ ধীর চক্ষু তুলিয়া শুক্লার দিকে চাহিল। হয় ত প্রভাত অরুণের আরক্তিমায় কিছু মোহ ছিল, তাই হঠাৎ সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

শুক্লা অস্পষ্ট স্বরে আবার বলিল, "চা কি—"

বাধা দিয়া সুধন্ম্ বলিল, "না, তুমি পূজো সারো; আমি হাসপাতালে খেয়ে নেব 'খন।"

শুক্লা বহুকষ্টে বলিল, "পূজোটা আপনি করুন না, আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি।"

একসঙ্গে দাঁড়াইয়া সুধন্মুকে এত কথা সে কোনদিন বলে নাই। আজ কিন্তু উপায়হীন হইয়া ক্রমাগত ঢোক্ গিলিতে লাগিল।

সুধন্ম্ বলিল, "রাম বলো! আমায় কোনদিন করতে দেখেছ। ও সব মেয়েদের কাজ, তোমরাই কর।"

শুক্লা বলিতে গেল, আমাকেই কি কোনদিন পূজো করতে দেখেছেন—কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবল আমতাআমতা করিয়া কহিল, "যদি ঠাকুর পূজো না নেন্?"

সুধন্ম্ হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "শুনেছি সে নিজে ভাঙ্গড় শুক্লা। বিকার যার নিজের নেই, পরের বিচার সে করবে কোন্ হিসেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তিনি নেবেনই।'

দুপুরবেলা স্নানের জল লইয়া শুক্লা বসিয়াছিল। সুধন্ন আসিয়া বলিল, "এই যে তোয়ালে গামছা সাবান সব গুছিয়ে রেখেছ, মায় ক্ষুরটী পর্য্যন্ত। না, এ ভাবের সেবা পেলে আমাকে দেখ্ ছি—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া সে ঘরে গিয়া ঢুকিল। পরক্ষণে বাহিরে আসিয়া বলিল, "আজকের রান্নাটা কি করেছ বলো ত?"

শুক্লা পরম বিস্ময়ে বলিল, "রাঁধব আমি, আপনি খাবেন!"

সুধন্ন হাসিয়া বলিল, "কেন জাত যাবে আমার? জাতটা এত পলকা নয়, বুঝেছ? আর যদি যায়ই—চিরদিন তোমার আমার জাত একই যদি হ'য়ে যায়, তা'তেই বা ক্ষতি কি? এখনকার চেয়ে তা'তে কিন্তু বেশী করেই আনন্দ পাব।"

শুক্লা বলিল, "মা ফিরে এসে ত খাবেন, আমি কি ক'রে রাঁধি?"

সুধন্ন পরিহাসভরে চক্ষু তুলিয়া বলিল, "তা' হ'লে তিনি কি হাসপাতালের করিম মিঞা বাবুর্চ্চিকে দ্রৌপদী হবার ভার দিয়ে গেছেন। যাক্, বুঝেছি। তা' হ'লে রাঁধ নি। আমি খাব কি? সারাদিনটা কি উপোস করেই কাটবে? আচ্ছা লোক ত!"

শুক্লা বলিল, "সব গুছিয়ে রেখেছি, তেওয়ারীকেও খবর পাঠিয়েছি, সে এল বলে।"

সুধন্ন চক্ষু তুলিয়া বলিল, "কি বল্লে, শেষকালে ওই ভাড়াটে লোকের রান্না খেয়ে আমায় দিন কাটাতে হবে! জানো কি তুমি, আমি ও সব কত ঘৃণা করি। যাদের নিজের কেউ নেই, তারা যা' করে কাটান, আমায় কি সেই—তুমি রয়েছ, মা রয়েছে, তবু পর ধরে করা বিদেশীর রান্নার বোটকা গন্ধ—যাও, আমি খাব না, আমায় ডেকো না। আমি—"

ছুটিয়া সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই দ্বারের নিকট হইতে মুখ বাড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "তুমি রাঁধ্ বে কি না বলো, আমি তাই শুন্ তে চাই। মা আমার সকল ভার তোমার ওপর দিয়ে গেছেন—ও কি কাঁদছ!"

"কিন্তু আমার যে দেবার যো নেই।"

"কেন?"

"আমি পতিতা।"

সুধন্ন হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমি বিশ্বাস করি না। আমার কাছে সীতা সাবিত্রীর আসনের চেয়ে তোমার আসন একটুও নীচে নয়। আমি—"

"বল্ তে নেই, ও গো বল্ তে নেই, ওতে পাপ হয়!"

"কিসে?"

"মামা আমায় বেচেছিল এক জমীদারের হাতে।"

"জানি, আর এও জানি, তুমি সে জমীদারের মুখে লাথি মেরে পালাবার পথে আমার মোটরের ধাক্কা পাও, আর সে মামা আজ—"

"তবু তুমি আমায় ঘৃণা কর না—আশ্চর্য্য!"

"না করি না, করবার ক্ষমতা তুমিই আমার কেড়ে নিয়েছ যে। আমি জানি, তুমি কেন নিজেকে ভাল সাজ-গোছের হাত থেকে তফাতে রাখ্ তে চাও। জানি, কেন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াও। কিন্তু বলো ত পেরেছ কি? আমি ত দেখ্ ছি সব উল্টে দিয়েছ; বরং ধরা না দেবার কৌশলে বেশী করে আমার কাছে এগিয়ে এসেছ।"

হাতযোড় করিয়া শুক্লা যেন কি বলিতে গেল, সুধন্ন হাসিয়া বলিল, "বেশ, আর বল্ ব না; চল রাঁধ্ তে। আমি কিন্তু অমনি ছাড়ব না; ভুল-ভ্রান্তি সব কিছু খাতা পেন্সিল নিয়ে টুকে রাখ্ ব—মা এলে বলে দেবো।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গৃহিণী মোটর হইতে নামিয়া প্রথম আদরের সম্বোধন করিয়া বাড়ী ঢুকিলেন, "বৌমা!"

শুক্লা দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল, "আমার দোষ নেই মা, উনিই জোর করে রাঁধিয়েছেন। আমি চাইছিলুম না কিছুতেই—"

"বেশ করেছ। দাঁড়াও, কাপড়টা ছেড়ে নিই—খাবো। নিজেকে এমনি করে গোপন করতে হয় মা, আর ত ছাড়ছি না। এবার আমার ঘরের লক্ষ্মী কুলের লক্ষ্মী হয়ে—"

"মা, আমি—"

"আমি জানিরে বেটী, সব জানি। পাপ তোর গা ঘেঁসেও যেতে পারে নি। উল্টে—থাক্। আজ শাঁক জোর করে বাজা গো নবীনের মা! এ মঙ্গল চিরদিনের জন্যে ঘরে ঘরে জানিয়ে দিক্—আজ আমার কি আনন্দের দিন!"

"আমি আজ মেয়ে নয়, বধূ নয়, আমার চিরদিনের অভিলষিত আকাঙ্ক্ষিতকে আমার বলে পেয়েছি!"

শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবী
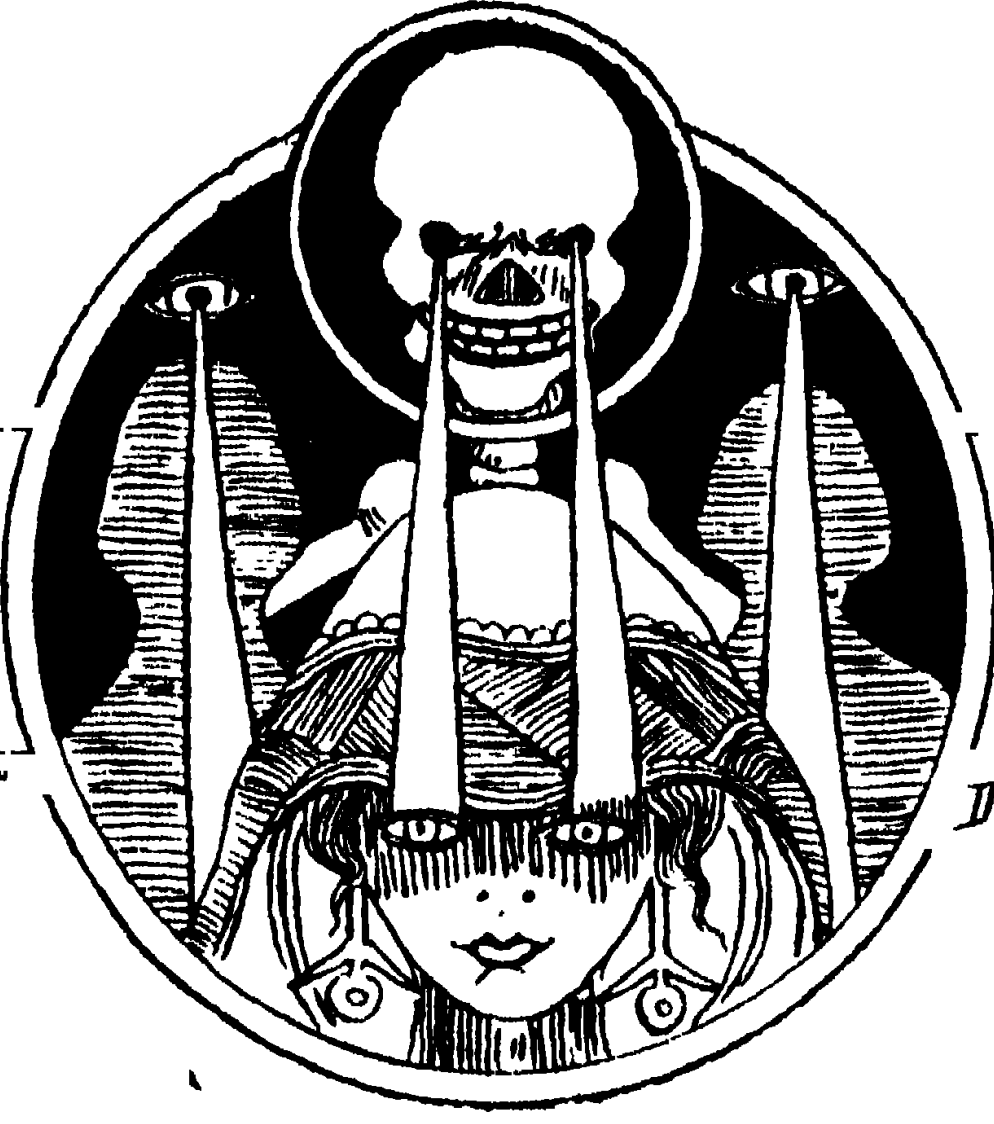
ভৌতিক গল্প

বিয়ের পরে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি এল্‌

বাইরে বান্ধবদের ভীড় কাটিয়ে বিকাশ যখন ওপরে এসে কমলাকে আবিষ্কার করলে, তখন তার চুল বাঁধা শেষ হয়েছে।

একটু ভেবে দেখলে এই বিকাশ এবং কমলাকে মনে পড়বে। কমলাই মগরার জমীদার চারুবাবুর একমাত্র কন্যা, এবং এরই প্রথম বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে, সে ছিল মনুষ্য বেশী ভূত।

বিয়ের পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূত-স্বামী হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেও সে অনেকদিন পর্য্যন্ত কমলার ওপর অত্যাচার করতে ছাড়ে নি; শেষে কাশীর যুবক-জমীদার নব্য-শিক্ষিত বিকাশের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পর চঙ্‌থাই নামক এক চীনা ওঝার মন্ত্র-তন্ত্রে ঐ ভূত পলায়ন করে। সে আজ প্রায় এক বছরের কথা। কমলা এবং বিকাশ দু'জনেই সেই ভূতের কথা এখন একরকম ভুলে গেছে।

বিকাশ এসে কমলার সিঁথিতে হাত দিয়ে বল্লে—'এই যা', তোমার চুল যে খারাপ হয়ে গেল।'

কমলা বল্লে—'বারে, খারাপ করলে আর খারাপ হবে না!' তারপর বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বল্লে—'না, তুমি ওরকম করে উস্‌কে দিও না বল্‌ছি!'

বিকাশ বল্লে—'সে কি গো, আমি আবার কোথায় ওস্‌কালুম। আমি ত—আমি ত—'

বিকাশের কথার কোন জবাব না দিয়ে কমলা তার আরসী এবং সিঁদুর কৌটা ঠিক্ করে গুছিয়ে রেখে, চট্‌পট কাপড় এবং তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে, আঙুলের সিঁদুরটুকু ভোঁ করে বিকাশের গালে লাগিয়ে দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রসাধনে চলে গেল।

বিকাশ বল্লে—'বাঃ, তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে!'

কমলা তার কাপড়ের আঁচলে ক্রচ্‌টা লাগাতে লাগাতে বল্লে—'হ্যাঁ, খুবই চমৎকার দেখাচ্ছে, নয়?'

বিকাশ বল্লে—'হ্যাঁ, দেখাচ্ছে; তবে খুবই যে, তা নয়।'

বিকাশের পরীক্ষু চোখের দিকে বক্র কটাক্ষ দিয়ে

কমলা বল্লে—'হ্যাঁ, তা' বটে। আমি যদি তোমার বউ না হয়ে পাশের বাড়ীর কোন বউ হতুম, তা' হলে হয় ত আমাকে খুবই চমৎকার দেখাত, নয় গো?'

চীৎকার করে বিকাশ বল্লে—'ব্রেভো! এই এতক্ষণে যা' বল্‌লে, এইটাই হলো কথার মত কথা। বাস্তবিক তুমি যদি আমার কোন বন্ধুর বউ হতে,—না না, তুমি যদি কোন অজানা অচেনা লোকের বউ হতে, তা' হলে তোমাকে আমার আরও বেশী ভাল লাগ্‌তো।'

তিরস্কারের স্বরে কমলা বল্লে—'ছিঃ, কি যে চেঁচাও! মাসীমা ঐ বারাণ্ডায় বসে আছেন, শুন্‌লে কি ভাব্‌বেন বলো-ত!'

বিকাশ বল্লে—'ভাববেন—ভাব্‌বেন এমন কিছুই নয়; হয় ত নিজের জীবনের পুরোনো কথাগুলো সব মনে পড়বে।'

হতাশ হয়ে কমলা বল্লে—'নাঃ, তুমি বড় বেহায়া!'

চড়া গলায় বিকাশ বল্লে—'আহা, বেহায়াপনা করবার জন্যে একটা মেয়েমানুষ চাই বলেই ত তোমাকে বিয়ে করেছি, আর তোমার বাবাও যে খুঁজে খুঁজে একটা স্বাস্থ্যবান বেটাছেলেকে নিমন্ত্রণ করে তোমাকে তার সঙ্গে একঘরে থাক্‌তে দিয়েছেন, সেটাও ত এই বেহায়াপনাটার দরকার বলেই দিয়েছেন। আরে বাপু—'

—'আর থাক্!' কমলা এসে বিকাশের মুখটায় হাত চাপা দিয়ে বল্লে—'থামুন গুরুমশায়, থামুন, আর বক্তৃতা দিতে হবে না।'

বিকাশ বল্লে—'কমলা, চলো আজ তোমাতে আমাতে বেড়িয়ে আসি।'

—'কোথায়?'

—'চলো না, সারনাথে একটু ঘুরে আসি। আজকের দিনটা বেশ লাগ্‌ছে—যাবে?'

কমলার ষোল আনা যাবার ইচ্ছে নেই; তবুও সে বিকাশের উৎসাহ দেখে বল্লে—'চলো।'

—'ঠিক্?'

—'ঠিক্।'

দুই

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে বিকাশের নতুন টু-সিটার ডজ্ গাড়ীখানা সারনাথের পথে ছুটেছে। পীচ্ দেওয়া রাস্তা শেষ করে তারা সুরকীর রাস্তায় গিয়ে পড়লো। ঝড়ের বেগে গাড়ীখানা ছুট্‌তে থাকে—পেছনে আসে লম্বা হয়ে ধূলোর আঁচল।

উটের গাড়ী দেখে কমলার বড় স্ফূর্ত্তি হয়। মোড়ের মাথায় কপিকল দেওয়া কূয়া থেকে ধূলোমাখা ছেলেরা জল তোলে। কমলা তাই হাঁ করে দেখে। ষ্টীয়ারিং থেকে হাত তুলে আঙুল দিয়ে বিকাশ দেখিয়ে দিলে ধানক্ষেত-গুলোর ওপারে সারনাথের বড় স্তূপটা—চৌখণ্ডী বলে এরা যেটার নামকরণ করেছে।

কাশী থেকে সারনাথ সাত মাইল। সারনাথ রেলওয়ে ষ্টেশন ডাইনে রেখে টিউবার ক্লোসিস্ হাসপাতালের সাম্‌নে দিয়ে চৌখণ্ডী স্তূপের ধার ঘেঁসে গাড়ীখানা ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালো সারনাথ মিউজিয়মের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে মূলগন্ধকুটী বিহার দেখে কমলার আনন্দ আর ধরে না! বিহারের পাশে ধামেকা স্তূপ, ইসিপাতান* তাদের সাম্‌নে ইসিপাতানের লাইব্রেরী, সারনাথ পোষ্ট-অফিস, দূরে রামের মন্দির সবই যেন কমলার কাছে কি এক অপূর্ব্ব রহস্যে ভরে' উঠ্‌লো। পড়ন্ত সূর্য্যের লাল আলো এসে পড়েছে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা শ্বেত পাথরের অশোক স্তম্ভের ওপারে এবং মিউজিয়ামের হলদে রঙের বাড়ীর দেওয়ালে। সাম্‌নের লনে যাদুঘরের কিউরেটার টি বি হাসপাতালের এক ডাক্তারের সঙ্গে টেনিস খেল্‌ছিলেন।

মিউজিয়ামের টিকিট হলো দু' আনা করে। বিকাশ এবং কমলা দু'জনে মিউজিয়ামে গিয়ে ঢুক্‌লো। সাম্‌নেই ছিল শাদা পাথর নির্ম্মিত অশোকের সিংহস্তম্ভের চতুঃসিংহ সমন্বিত মাথাটুকু। তারই পেছনে লাল পাথরের প্রকাণ্ড এক রথচক্র; তার গায়ে কত কি আঁকা! পাশের গ্যালারীতে পাথরের তৈরী অসংখ্য রকমের মুণ্ড, কত

* ইসিপাতান অর্থে ঋষিপত্তন। সারনাথ ঋষিপত্তনে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু বাস এবং বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা করেন।

বিচিত্র তাদের রঙ্! কালী দিয়ে সেই সব মুণ্ডগুলির গায়ে তারিখ এবং নম্বর লেখা। মিউজিয়াম দেখে ওরা বেরিয়ে এল বাইরের ফাঁকায়।

মূলগন্ধকুটী বিহারের হল্‌টি কমলার সব চেয়ে ভালো লাগ্‌লো। সবগুলি দরজা খুলে দিলে এই ঘরখানিতে মাঠের সমস্ত আলো এবং হাওয়াই আসে। এমন নিখুঁত এবং পরিষ্কার একটি ঘর হিন্দু দেবালয়ের কোনখানেই মেলে না। বৌদ্ধ-বিহার এবং ব্রাহ্ম-সমাজ-ভবন গির্জ্জার অনুকরণে তৈরী বলেই বোধ হয় এত ছিম্‌ছাম্। হিন্দু মন্দির সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্যময় অন্ধকারে পচা ফুল এবং কাদা জলের অন্তরালে অসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যতা ও গুপ্ততার আভিজাত্য নিয়েই অবস্থান করে।

ধামেকা স্তূপের পাশ ঘেঁসে প্রাচীন স্থবিরদের ধ্যান-পীঠের ধার দিয়ে বিকাশ কমলার হাত ধরে সুড়ঙ্গের কাছে নিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে দু'জনে ওধার দিয়ে বেরিয়ে এসে মৃতপ্রায় অঞ্জনা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। নদীজলে অসংখ্য পানফলের গাছ। কমলার বড় ইচ্ছে হলো সেই পানফল নিতে। বিকাশ ও কমল দু'জনে জুতো খুলে জলের ধারে নেমে গিয়ে পানফল নিলে। পশ্চিম দিকে সূর্য্য অস্ত গেল।

ঢালু ঘাসের ওপর বসে দু'জনে কত সব বাজে গল্প করতে করতে পানফল খেলে। একটা লাল রঙের পানফলের লোভে এক হাঁটু জলে নেমে লতা ধরে টেনে টেনে বিকাশ সেই নদীর অর্দ্ধেকটা পরিষ্কার করে ফেল্লে; কিন্তু অবশেষে সেই পানফলটা যখন হাতের কাছে এলো, তখন কমলা সেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে খোলা শুদ্ধই খেয়ে ফেল্লে। সেই নিয়ে বিকাশ খুব রাগ দেখালে। শেষে কমলা সেই পানফলের খোলাটা মুখ থেকে বার করে কত যেন অভিমান করে জলে ফেলে দিলে।

এদিক ওদিক বাজে কথার পর কমলার পিঠে হাত দিয়ে বিকাশ বল্লে—'শ্রীমতী কমলা দেবীর কি আজ বাড়ী ফেরবার ইচ্ছে আছে?'

বিকাশের চোখে চোখ রেখে গম্ভীরভাবে কমলা বল্লে—'যদি বলি, না, ইচ্ছে নেই, তা' হলে—'

—'তা' হলে শ্রীমান্ বিকাশ তার গাড়ী নিয়ে রওনা দেবে ঘর মুখে। তুমি তোমার প্রথম পক্ষের ভূতানন্দ স্বামীকে নিয়ে এই ঐতিহাসিক, অর্থাৎ ভৌতিক ঢিবির ওপর বসবাস করবে।'

এই কথায় কমলার সমস্ত আনন্দ যেন এক মুহূর্ত্তে নিবে গেল। মুখ কালী করে সে বল্লে—'দেখো, বড় ভুল হয়েছে—'

কোন একটা বিভীষিকার আশঙ্কায় বিকাশ বল্লে—'কি?'

কমলা তার নিজের কনুয়ের কাছে হাত দিয়ে বল্লে—'আজ দুপুরে হঠাৎ আমার মাদুলী বাঁধা সুতোটা ছিঁড়ে গেল, আর আমি ঘুমের ঘোরে তাকে নিয়ে আমার বালিশের তলায় রেখে দিলুম। কিন্তু ঘুম ভাঙতে আর মনে পড়লো না। সে ত আমার পরা হয় নি—বড় অন্যায় হয়েছে, নয়?'

বিকাশ কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই কমলা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—'না, তুমি চলো, আর বাইরে থাক্‌বো না। আমার গায়ের ভেতর কেমন যেন রিবি করছে।'

বিকাশ একটু হেসে বল্লে—'তা' হলে তোমার ভয়টা এখনও কাটে নি দেখ্‌ছি।'

কমলা এর কোন জবাব দিলে না; বিকাশের ডান হাতটা ধরে আস্তে আস্তে নদীর তীর থেকে ওপরে উঠে এলো।

তিন

দু' ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টার পরেও বিকাশের নতুন ডজ্ গাড়ী কিছুতেই ষ্টার্ট নিলে না।

মোটরের কলকব্জা বিকাশের জানা ছিল। অয়েল পাম্প, কারবুরেটার, ব্যাটারী, স্পার্কপ্লাগ্, ইগ্‌নিসন্ সমস্তই একে একে তন্ন তন্ন করে দেখেও গাড়ীর কোন অংশেই কোন ত্রুটী আবিষ্কার করা গেল না। এদিকে রাতও বেড়ে চলেছে। গাড়ীর মধ্যে কমলা ত কান্নার যোগাড়! সারনাথের মুষ্টিমেয় লোকজনের মধ্যে অনেকেই এসে

হাজির হয়েছে গাড়ীর কাছে; কিন্তু গাড়ীর সেই একই অবস্থা। শেষে কতকগুলো লোক মিলে গাড়ীকে ঠেল্‌তে সুরু করলে। ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে চলে গেল অনেকটা; কিন্তু চাবী খুলে ফার্ষ্ট গিয়ারে লাগিয়েও যখন ষ্টার্টের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বিকাশ হতাশ হয়ে মিউজিয়মের কিউরেটার মিঃ রাওয়ের পরামর্শই গ্রহণ কর্ত্তে বাধ্য হলো। আজ রাত্রিটা কোনমতে সারনাথেই কাটাতে হবে।

কমলার এতে ঘোরতর আপত্তি। বল্লে—'যে রকম করে হোক্ আমি এখুনি বাড়ী যেতে চাই।'

কিন্তু সারনাথে আর দ্বিতীয় গাড়ী নাই। কোনরকম ভাড়া গাড়ীও এখানে মেলে না। এদিকে সারনাথ থেকে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টের শেষ ট্রেণও চলে গেছে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। তখন কে জান্‌তো যে, এই গাড়ী নিয়ে এত বিভ্রাট হবে। নতুন গাড়ী—আজও পর্য্যন্ত কোন রকম গোলমালই ত হয় নি, কিন্তু সারনাথে এসে এ কি বিপদ!

কমলা বিকাশের কাণে কাণে বল্লে যে, সে হেঁটেই বাড়ী যাবে। চোখে তার জল তখন উপ্‌ছে পড়্‌ছে।

কথাটা যে শুন্‌লে, সেই হাস্‌লে। বল্লে—'মায়িজী, ডরো মৎ।'

তারপর মিউজিয়মের কিউরেটার বল্লেন—'আমার কোয়াটার্সে একটা ঘর দিচ্ছি—থাকুন।'

ডাক্তার বল্লেন—'আমার বেডরুমটাই আমি আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি। আমি না হয় হস্‌পিটালেই আজ রাত্রিটা কাটিয়ে দেব। আপনাদের কোন অসুবিধাই হবে না।'

হাসপাতালের সেক্রেটারী বল্লেন—'আমার লাইব্রেরী হলে আজকের মত রাতটা আপনারা কাটিয়ে দিতে পারেন। ও ঘরে আপনাদের কোন কষ্টই হবে না।'

বর্ম্মী ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ থেরো বুদ্ধপাল এসে পরিষ্কার ইংরেজীতে বল্লেন—'হে পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা, যদিও আমার ধর্ম্মশালায় আমি মেয়েদের বড় একটা থাকতে দিই না, তবুও আজ রাত্রে আমি আমার প্রজ্ঞাপারমিতা-মায়ের জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করেছি। আজ আপনারা আপনাদের এই ধর্ম্মের কুটীরেই আতিথ্য স্বীকার করুন।'

বুড়ো বুদ্ধপালের অনুরোধ কাটানো বড়ই শক্ত! আর কমলারও ইচ্ছা—যদি রাত এখানে কাটাতেই হয়, তা' হলে ধর্ম্মশালাতেই থাকা ভাল। যে ধর্ম্মশালার প্রতি ঘরেই ঠাকুর আছেন, সেই ধর্ম্মশালাটা ভূতানুগৃহিতার পক্ষে নিরাপদ বলেই মনে হয়।

রাত্রির আহারাদি সম্বন্ধে ওদের ভাব্‌তে হলো না। বিকাশ যদি একা এই গাড়ীটা করে সারনাথে এসে এইরূপ বিপদে পড়তো তা' হলে হয় ত কেউ এতটা সাহায্য করতে এগিয়ে আস্‌ত না; কিন্তু সঙ্গে রয়েছে মহিলা—তায় আবার সুন্দরী এবং যুবতী, একেবারে আপ-টু-ডেট। যেখানে যত লোক আছেন, সকলেই এই গাড়ী-বৈকল্যের সুযোগে এদের সাহায্য করবার জন্য প্রাণপণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—যায় সন্ন্যাসীরাও। ফ্রয়েড্ সাহেবের জয়-জয়কার হোক্!

ধর্ম্মশালার দোতলার একখানি ঘরে এদের শোবার যোগাড় করা হলো। কেবল আশ্রম বলে সন্ন্যাসীরা এদের দুটো আলাদা বিছানায় শুতে অনুরোধ কল্লেন এবং দুটো বিছানা আলাদা করে তৈরী করাও হয়েছিল; তবে আমার সন্দেহ হয়, একটা বিছানা সে রাত্রে খালিই ছিল।

চার

রাত্রি তখন বোধ হয় একটা কি দেড়টা, বিকাশের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

মনে হলো কে যেন ঘরের বাইরে চলাফেরা কর্চ্ছে।

হবেও বা, কেউ হয় ত কোন ঘর থেকে উঠেছে। বাইরের বারাণ্ডাটা ত সকলেরই চলন-পথ।

তারপর বিকাশ শুন্‌লে কে যেন দরজায় ঘা দিলে। বিকাশ চুপ করে বিছানার ওপর উঠে বস্‌লো।

অন্ধকার রাত। গাঢ় তমিস্রায় সমস্ত সারনাথ এখন মগ্ন হয়ে আছে—কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুর মরা অঞ্জনার তীর থেকে সমস্ত পল্লীকে মুখর করে রেখেছে।

দরজায় ঘা দিয়ে আগন্তুক স্পষ্ট বাংলায় বিকাশের নাম ধরে ডেকে বল্লে—'দরজাটা একবার খুল্‌বেন ত।'

বিকাশ তার বিছানার ওপর চুপ করে বসেই রইলো। কমলা তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

বাইরে থেকে আব একবার ঘা পড়লো। বল্লে—'দরজাটা খুলুন না।'

খানিকটা সাহস সংগ্রহ করে বিকাশ বল্লে—'কে, কে আপনি ?'

নেপথ্যে উত্তর এলো—'খুলুন; খুল্‌লেই বুঝ্‌বেন।'

বিকাশও তখন সতর্ক হয়েছে। বেশ জোরের ওপরেই সে উত্তর দিলে। বল্লে—'পরিচয় না দিলে আমি দরজা খুল্‌তে রাজী নই। কাল সকালে আসবেন।'

উপেক্ষার হাসি হেসে সেই অজ্ঞাত লোকটা নেপথ্যেই উত্তর দিলে। বল্লে—'আমি আমার নিজের সুবিধেমতই আসি; পরের হুকুম মত যাওয়া-আসা আমার পোষায় না। এই সঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন যে, আপনাকে দরজা খোলার অনুরোধ করেছি নেহাৎই ভদ্রতার খাতিরে—নচেৎ বন্ধ ঘরের মধ্যেও প্রবেশের ক্ষমতা আমার আছে।'

অন্ধকারের মধ্যে বিকাশ দেখ্‌লে তার শয্যার সাম্‌নেই নেপথ্যের সেই মনুষ্য মূর্ত্তি—দিব্য সুপুরুষ।

'কে ?' ত্রস্ত হয়ে বিকাশ তার বালিসের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে আগন্তুকের দিকে লক্ষ্য করে ধর্‌লে। এই রিভলভারটা বিকাশের চিরসঙ্গী।

নবাগন্তুক পুরুষটা বিকাশের হাতের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—'ওটা আর কেন বিকাশ, ওটা দিয়ে কোন অনিষ্ট করবার অনেক দূরে আমি চলে এসেছি। তুমি বরং ওটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।'

আগন্তুকের সৌম্য মূর্ত্তি এবং ধীর কথায় বিকাশের ভয় যেন অনেকটা কেটে গেল। সে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে মূর্ত্তির মুখের দিকে চোখ রেখে বল্লে—'বলুন।'

আগন্তুক ঘরের কোণ থেকে একটা চৌকী নিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে এসে বসে বল্লে—'বিকাশ, তুমি কি ভদ্রতাও জানো না। ঘরে কেউ এলে তাকে যে আগে বসতে বলা উচিত এই সহজ শিষ্টাচারটুকু ভুল্‌লে ত তোমার চল্‌বে না।'

বিকাশের সাহস তখন বেড়ে গেছে। সে বল্লে—'হ্যাঁ, সেটা ঠিক্ বটে। কিন্তু মানুষের ঘরে আস্‌বার একটা সময়-অসময় ত আছে। অসময়ে যে আসে, তাকে শিষ্টাচার দেখাতে আমি অভ্যস্ত নই।'

লোকটি বল্লে—'উত্তম, তোমার উত্তর বড় চমৎকার হয়েছে। আমি তোমার স্পষ্ট কথায় ভারী খুসী হয়েছি। কিন্তু বিকাশ, তোমার পাশে শুয়ে ও কে বল্‌তে পার্‌বে কি।'

বিকাশ তখন রীতিমত বিরক্ত হয়েছে। বল্লে—'এ প্রশ্ন তোমার পক্ষে অবান্তর। এর উত্তর আমি দেবো না। তুমি আমার এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।'

আগন্তুক সুস্থির চিত্তে বসে একটু হাস্‌লে। হাসির পর বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—'আমার ঘর, এঁ্যা! আচ্ছা বিকাশ, এ ঘর তোমার হলো কবে থেকে ?'

গম্ভীরভাবে বিকাশ বল্লে—'এর উত্তর আমি দিতে রাজী নই। তুমি উঠবে ত ওঠো, নইলে আমি তোমায় গুলি কর্‌বো।'

আগন্তুক মাটীর দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেল্লে। বল্লে—'বিকাশ, গুলি করার ভয় তুমি আমায় দেখাতে পার বটে, কিন্তু আমি তোমার গুলির অতীত। আর এটা মনে রেখো, যেটা তুমি আমার ঘর বলে গর্ব্ব কর্‌ছো, সেটায় আমার অধিকার বহু পূর্ব্ব থেকে এবং এই সঙ্গে এটাও শুনে নাও যে, যাকে তুমি আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দাও, যুগ-যুগান্তর ধরে আমি তার প্রার্থী। কল্পকাল পূর্ব্বে আমি তার স্বামী ছিলুম এবং এজন্মেও তার প্রথম পাণি-গ্রহণ আমিই করেছি। এখন কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো—আমি কে ?'

কমলা তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার দিকে একবার চেয়ে দেখে বিকাশ বল্লে—'আচ্ছা, ও কথা এখন থাক্। তুমি শুধু আমার কাছে কি চাও, তাই বলো।'

আগন্তুক বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—'চাই—আমি চাই আমার স্ত্রীকে।'

এ কথার কোন উত্তরই বিকাশের মাথায় এল না। আগন্তুক বলে চল্লো—'বিকাশ, তুমি আজ যাকে তোমার স্ত্রী বলে যত্ন করছো, আদর করছো, সে যে যুগ যুগ আমার আকাঙ্ক্ষিত, তা' কি তোমার মনে নেই। অনন্ত-কাল ধরে আমি আমার কমলাকে পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছি—কিন্তু আজও পর্য্যন্ত আমি তাকে পাই নি। হাতের কাছে পেয়েও যে আমি তাকে পাই না এ দুঃখ আমি আজ মেটাবো, আর সেটা মেটাবার জন্যেই আমি আজ তোমার কাছে এই অসময়েই এসেছি। তুমি কি শুনবে সেই কথা। তবে আগের কথা বলি।

—'যক্ষ হয়ে আমি যখন জন্মেছিলুম কৈলাসের উপত্যকায়, তখন শিব আমায় বড় ভালবাসতেন। একদিন হরপার্ব্বতী সুমেরু শিখরে বসে যখন নিজেদের কথায় নিজেরা বিভোর হয়েছিলেন, তখন আমি দুর্ব্বুদ্ধির বশে ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিই যে, ত্রিপুরাসুর হঠাৎ জীবন লাভ করে এদিকে ধেয়ে আসছে কৈলাস জয় করবার জন্য। শুনেই ত শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধরে ত্রিশূল নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এসে দেখলেন—অসুরও নেই, কিছুই নেই। তখন তিনি আমায় ভস্ম করতে উদ্যত হলেন। আমি বল্লুম—'প্রভু, আপনি সেদিন আমায় বলেছিলেন যে, আপনি ত্রিকালজ্ঞ এবং সর্ব্বদ্রষ্টা, কিন্তু আজ আমি প্রমাণ করে দিলুম যে, আপনার এ গর্ব্ব অমূলক, আমার মত সামান্য যক্ষের মিথ্যায় আপনি প্রবঞ্চিত হয়ে থাকেন। আমি আপনার সর্ব্বদর্শী দর্পকে নষ্ট করেছি; এখন আপনি ইচ্ছা করেন আমাকে ভস্ম করতে পারেন। আপনার তৃতীয় নেত্র রশ্মিতে ভস্ম হলে আমার বরং ভালই হবে'।

—'আমার এই কথা শুনে শিব লজ্জিত হয়ে আমায় ক্ষমা কল্লেন। কিন্তু শিব ক্ষমা কল্লেও পার্ব্বতী আমায় অভিশাপ দিলেন। বল্লেন—'তুমি আমাদের এই প্রিয়-মিলনে যখন বাধা দিয়েছ, তখন তুমি লক্ষ জন্ম ধরে ব্যর্থ প্রণয়ী হয়ে ঘুরবে; তোমাদের পুনর্মিলন হবে লক্ষ জন্ম পরে'।

—'সেই থেকে আমি এইভাবেই ঘুরি। লক্ষ জন্ম হতে আমার এখনও আমার অনেক বাকী—কিন্তু আমি আর পারি না, আর সহ্য করতে পারবো না! আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই পার্ব্বতীর শাপের জোর বেশী, কি আমার পুরুষাকারের শক্তি অধিক। আমি আমার কমলাকে আজ গ্রহণ করবোই!'

শুষ্কমুখে খানিকটা অর্থহীন হাসি এসে বিকাশ বল্লে—'বাপু হে, তুমি ত খুব বড় একটা পৌরাণিক উপাখ্যান আমাকে শোনালে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—হর-পার্ব্বতীর সঙ্গে ঝগড়া করে শেষটা তুমি আমার পেছনে এসে লাগলে কেন বলো দেখি। কৈলাসে যাও কি যক্ষপুরীতে যাও, সেইখানেই তোমার স্থান—এখানে কেন।'

নিদ্রামগ্ন কমলার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে আগন্তুক বল্লে—'সে কথা কি তুমি শুনতে চাও বিকাশ, তবে শোনো—ঐ যে তোমার পাশে কমলাকে তুমি দেখছো, আমার সেই যক্ষজন্মে ঐ ছিল আমার স্ত্রী, আর তুমি ছিলে সে জন্মে এক যাযাবর তৈর্থিক।* দেশ-দেশান্তর ঘুরে তুমি গেছলে আমার যক্ষপুরে এবং সেখানে তুমি আমার বাড়ীতেই আতিথ্য নিয়েছিলে। আমার স্ত্রী, সে জন্মে ওর নাম ছিল শ্রীলেখা। ও তোমার কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের কাহিনী শুনে মনে মনে তোমাতেই আকৃষ্ট হয় এবং আমাদের গৃহ-দেবতার নিকট তোমাকে পতিরূপে পাবার জন্যে প্রার্থনা করে। এদিকে তুমিও পথশ্রান্ত হয়ে আমার গৃহসুখ দেখে গৃহস্থ হবার কামনায় আমার শ্রীলেখাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করে সংসার করবার জন্যে তোমার ঈশ্বরের নিকট কামনা কর। তোমাদের দেবতা তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। তোমাদের বরলাভ ও আমার ওপর পার্ব্বতীর অভিশাপ এই দুয়ের সমন্বয়ে আজ পর্য্যন্ত তোমারা মিলিত, আর আমি অসহায়। হাজার হাজার বছর ধরেও আমাদের এই কর্ম্মফল আমাদের এম্নি করে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এইখানে আমি তোমাকে এইটুকু শুনিয়ে দিই, যে কোন জন্মেই

* পুরাকালে একদল লোক সন্ন্যাসীর ন্যায় তীর্থে তীর্থে দেবদর্শন করে জীবন অতিবাহিত করত। তাদেরই বলত—যাযাবর তৈর্থিক।

তোমাদের মিলন স্থায়ী হয় নি—এবং তার কারণ হচ্ছি আমি।

—'শোনো বিকাশ, ব্যস্ত হয়ো না। যক্ষের পর তোমার প্রথম মানবজন্ম হয় মগধরাজ্যে লিচ্ছবীদের ঘরে এক শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে। ঐ কমলাও সেই লিচ্ছবী বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলো। মহা-সমারোহেই সে জন্মে তোমাদের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরেই তোমায় বাণিজ্য উপলক্ষে যেতে হয়েছিল বাবেরু দেশে।* ফেরবার পথে নৌকোডুবীতে তোমার মৃত্যু হয়। জেনে রাখো—সমুদ্রের মাঝখানে তোমাদের সে নৌকোকে আমিই ডুবিয়েছি এবং আমিই তোমাদের সে মিলনকে ব্যর্থ করেছি। সে মিলন তোমাদের স্থায়ী হয় নি।

—'তারপর যখন তুমি হস্তিনাপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বকালে, তখন তুমি ছিলে কৌরবের দলে। কমলাও সে জন্মে এক কুরুপক্ষীয় সেনানায়কের কন্যা হয়ে জন্মেছিল। আর আমি ছিলুম রাজা দ্রুপদের এক অমাত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। সে জন্মেও আমার সঙ্গেই কমলার বিবাহের ঠিক্ হয়েছিল। এমন সময় কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘোষণা হয়। রাজা দ্রুপদ গেলেন পাণ্ডবদের পক্ষে; কাজেই কমলার সে জন্মের পিতা আর শত্রুকে জামাতারূপে গ্রহণ না করে তাঁর বাগ্‌দত্তা মেয়েকে তোমার হাতেই অর্পণ করেন। কিন্তু সে জন্মেও তুমি কমলাকে নিয়ে ঘর করতে পারো নি। বিয়ের পর তোমাকে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়েছিল এবং আমিই আমার এই হাত দিয়ে কুরুক্ষেত্রের মাঠে যুদ্ধের পঞ্চম দিবসে তোমায় বধ করি। থানেশ্বরের মাঠে তোমার দ্বাপরের প্রাচীন কঙ্কাল খুঁজ্‌লে হয় ত এখনও বেরুতে পারে।'

কি জানি কেন, এই কথাগুলো বলে ঐ আগন্তুক একবার চোখ বুজ্‌লো।

অন্ধকার নিশীথ রাত্রের সংজ্ঞাহীন সুপ্তির মধ্যে নীরব নিস্তব্ধ এই সারনাথের ধর্ম্মশালা।

পাঁচ

—'তোমার কি মনে পড়ে বিকাশ, কপিলবস্তুর রাজ-সন্ন্যাসী শাক্যসিংহ যখন সংসার ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বাহির হন, তখন তুমি ছিলে কপিলবস্তুর এক নগরপাল। রাজা শুদ্ধোধনের আদেশে তোমার মত সহস্র নগরপালকে দিকে দিকে যেতে হয়েছিল কুমারের সন্ধানে, এবং রাজার আদেশ ছিল কুমারের সন্ধান না নিয়ে যে দেশে ফিরবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। তোমার সে জন্মের নব-বিবাহিতা এই কমলাকে ঘরে রেখে তুমি বাধ্য হয়েছিলে দাসত্বের নির্ব্বাসন গ্রহণ কর্‌তে। কিন্তু এই নির্ব্বাসনের শেষ তোমার হয় নি। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পাদদেশে অনার্য্য ব্যাধের শরে তুমি প্রাণ দিয়েছিলে। তোমার কিছু মনে নেই; কিন্তু আমি জানি তুমি কোন জন্মেই কমলাকে নিয়ে ঘর কর্‌তে পারো নি। তোমার সে জন্মের ঘাতক সেই অনার্য্য ব্যাধ ছিলুম আমি।

—'বিকাশ, তুমি আরও শোনো। আজ যখন তোমায় বল্‌তে সুরু করেছি, তখন সবই বল্‌বো। তুমি একবার কি যেন পাপ করেছিলে। সেই পাপে তুমি কৃষ্ণসার হয়ে রাজপুতানার আরাবল্লী পর্ব্বতের উপত্যকায় সেবার জন্মেছিলে। সেবার আমি হয়েছিলাম মৃগ, আর ঐ কমলা মৃগীরূপে জন্মেছিল। চম্বল নদীর তীরে ঐ মৃগীরূপী কমলার সঙ্গে আমার মিলনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই তুমি কৃষ্ণসাররূপে আমাদের কাছে এসেছিলে এবং আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঐ মৃগীকে গ্রহণ করেছিলে। কিন্তু সে মিলনও তোমাদের স্থায়ী হতে আমি দিই নি। অরণ্যের এক বাঘ আমার নধর মাংসের লোভে আমার পেছন পেছন এসে তোমাদের যুগ্মকে দেখ্‌তে পায় এবং তোমাদের বধ করে তার আহার্য্য সংগ্রহ করে। এখন শুন্‌লে ত, সে জন্মে আমি তোমার অপেক্ষা অল্পশক্তি হয়েও কেমন করে তোমায় নাশ করি। এমনি করে যুগ-যুগান্তর এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমরা তিনজনে এই পৃথিবীর মধ্যে ঘুরে মর্‌ছি।

—'আরও একটা কথা বল্‌বো বিকাশ, তুমি শোনো—তোমার কিছু মনে নেই, কিন্তু আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে

* আধুনিক ব্যাবিলন। ভারতীয় লিচ্ছবীগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ব্যাবিলনে বাণিজ্য কর্‌ত।

পাচ্ছি, তুমি একবার চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলে এক রাজবংশে। কমলা সেবার কোন এক চীন ভূস্বামীর কন্যারূপে জন্মায়। সেই চীন ভূস্বামীই এ জন্মে চঙ্‌থাই হয়ে জন্মেছিল, এবং কমলাকে সেই মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেছে। তবে এইখানে এইটুকু শুনে রাখো—তোমাদের সেই চঙ্‌থাই আজ তিনমাস হলো পর-পৃথিবীতে চলে গেছে, আর চঙ্‌থাইয়ের দেওয়া সেই মাদুলী যা' কি না কমলা তার বালিসের নীচে রেখে এসেছে, তা' আর কোথাও পাওয়া যাবে না—সে মাদুলী চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে।'

আশ্চর্য্য হ'য়ে বিকাশ বল্লে—এ্যাঁ, সে কি, তা' হলে ত বড় বিপদ হলো।

আগন্তুক হেসে উঠ্‌লো। বল্লে—'হ্যাঁ, তোমাদের পক্ষে বিপদ বই কি। কিন্তু তুমি কি আমায় এমনই গর্দ্দভ ঠাওরাও যে, আমি আমার মৃত্যুবাণকে তোমাদের হাতে রেখে দেবো? এ কথা যাক্। এখন যা' বল্‌ছিলুম, তাই শোনো—সে জন্মে আমি ছিলুম কমলার পিতার এক ক্রীতদাস। মনে মনে আমি কমলার প্রার্থী ছিলুম; যদিও আমি কোনদিন আমার সে ইচ্ছাকে প্রাণ-ভয়ে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি নি। তুমি এসে কমলাকে বিবাহ করো। ঈর্ষায় জ্ঞানহীন হয়ে আমি তোমায় হত্যা করি; কিন্তু তারপর প্রাণভয়ে বাধ্য হয়ে চীন থেকে আমায় পালাতে হয়। বহু দেশ ঘুরে ঘুরে অনাহারে অনিদ্রায় শেষে আমি তক্ষশীলায় এসে হাজির হই। সেখানে কোনো এক উপাধ্যায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে সমস্ত উত্তর ভারত ভ্রমণ করে শেষে এই মৃগদাবের * বিহারে এসে ঠিক্ যেখানে এই ধর্ম্মশালা স্থাপিত হয়েছে, এইখানে আমার কুটীর নির্ম্মাণ করে' বসবাস করি। রাজা অশোক সে সময় জীবিত। তিনি তখন দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে † একদল ভিক্ষুর সঙ্গে দক্ষিণে পাঠাচ্ছিলেন। কাজের লোক দেখে তিনি আমাকেও সেই সঙ্গে যেতে বল্লেন। শুধু তাই নয়, গয়া থেকে বোধিদ্রুমের যে শাখা নিয়ে সম্রাট অশোক তার সঙ্ঘ-মণ্ডলীর সকলকে সাক্ষী রেখে মহেন্দ্রর হাতে দিয়েছিলেন দক্ষিণে রোপণ করবার জন্যে,—মহেন্দ্র সেই শাখাই আমার হাতে দিয়েছিলেন সারা পথ বহন করে নিয়ে যেতে। প্রিয়দর্শী রাজা অশোক আমার পিঠে হাত রেখে সকলের সাম্‌নেই বলেছিলেন—'একমাত্র তুমিই এই গুরুভার বহন করবার উপযুক্ত লোক। বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ তোমার পথকে কল্যাণময় এবং জয়যুক্ত করুন'।

'তুমি হয় ত শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে বিকাশ, সেই শাখাকে আমি বরাবর বহন করে নিয়ে গেছি এবং সিংহলে সেই বোধিবৃক্ষকে বপন করার জন্য প্রথম যে মাটী তৈরিকরা হয়, তা' আমিই করেছি। সেই বোধিবৃক্ষ এখনও সিংহলে বর্ত্তমান, এবং তারই এক শাখা এনে এই সারনাথে ঐ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় বসান হয়েছে। সম্রাট্ অশোকের সময় এই জমীতে আমার ঘর ছিল। আমি ছিলুম এই জমীর মালিক—আর তোমাকে এই ধর্ম্ম-শালায় আজ রাত্রির মত থাক্‌তে দিয়েছে বলে তুমি বল্‌লে এ ঘর তোমার। এ ঘরের সঙ্গে তোমার পরিচয় দু' দণ্ডের, আর আমার সঙ্গে এই জায়গার পরিচয় দু' হাজার বছরেরও বেশী। এখন বলো বিকাশ, এই ঘরের ওপর কার অধিকার বেশী।'

বিকাশকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আগন্তুক বলেই চল্লো। বল্লে—'বিকাশ, কত কথাই তোমায় বল্‌বো, কতটুকু সময়ই বা আছে। গ্রীসদেশের মাসিদন সহরে আমি জন্মেছিলুম বাইশ শ' বছর পূর্ব্বে। দিগ্বীজয়ী আলেকজান্দারের বাহিনীতে আমি ছিলুম এক ধনুর্দ্ধারী। সে জন্মে আমার মৃত্যু হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন এক গিরিসঙ্কটে। আমি ছিলুম সিজারের বিজয়-বাহিনীর এক অন্যতম যোদ্ধা। সিজারের বিজয়-ঘোষক যে টাওয়ার এখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে, সেই টাওয়ার নির্ম্মাণের সময় যে সহস্র শত্রু বলি দেওয়া হয়েছিল, আমি ছিলুম সেই বলি-কার্য্যের এক ঘাতক। ঐ টাওয়ারের প্রথম ভিত্তি যে আমারই হাতে স্থাপিত

* সারনাথের প্রাচীন নাম মৃগদাব।

† মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন।

হয়েছিল। এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে বিকাশ, যে, কাবার প্রাচীন মসজিদে আমি ছিলুম পঞ্চম পুরোহিত—একত্র উপাসনা করার প্রথম মন্ত্রকে আমিই সে দেশে প্রচলিত করি সকলের আগে। সেই আমি এখন বায়ুভুক্ এবং নিরালম্ব হয়ে প্রেতলোকে এসে অসহায়ের মত ভেসে বেড়াচ্ছি এবং কমলার স্মৃতি আমার সমস্ত বিশ্বকে অন্ধকার করে দিচ্ছে! কমলা—কমলা—কমলা—এ নাম যে আমি ভুলতে পারছি না! কমলার রূপ আমার চোখের সাম্‌নে রাত্রিদিন ভেসে বেড়াচ্ছে! আমার সেই যক্ষ-জন্মের শ্রীলেখাকে মনে পড়ে—ফুলের সাজে সাজিয়ে আমার শ্রীলেখাকে নিয়ে আমি যখন বস্‌তুম কৈলাসের শিখরে, পাগলা ঝোরার জল এসে আমার ও শ্রীলেখার পা ধুইয়ে নেমে যেত—ওঃ, কেন আমি হর-পার্ব্বতীর সঙ্গে তামাসা করতে গিয়েছিলুম! কেন আমি তাদের প্রবঞ্চনা করেছিলুম! কেন—কেন—!'

আগন্তুক হাতের ভেতর মুখ বেখে ছোট ছেলের মতন উদ্বেল হয়ে কেঁদে উঠলো।......বাক্যহীন হতভম্বের মত বিকাশ তার রিভলভারটা হাতের ভেতর নিয়ে চুপ করে বসেই রইলো।

গভীর রাত্রি তখন সন্‌সন্ করে আপন-মনেই ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছে। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আগন্তুক আবার বল্‌তে সুরু কল্লে। বল্লে—'বিকাশ, এমনি করে হাজার হাজার বছর আমি কাটিয়েছি। পার্ব্বতীর অভিশাপে আমি চিরদিনই তোমার কাছে পরাজিত, আর তুমি হয়েছ বিজয়ী—কিন্তু এবার আমি এই অত্যাচার আর সহ্য করবো না। নীরবে যারা চির-দিন ধরে ভাগ্যবানের নিকট অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, আজ পৃথিবীতে সেই সব পরাজিতের দলই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিজিতের বিপক্ষে ঘোষণা করছে তাদের বিদ্রোহ। এখন এই পূর্ণ কলির মধ্যে পার্ব্বতীর অভিশাপ মনে করে আমি হতাশ হবো না। আজ আমি আমার সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করবো আমার এই শ্রীলেখাকে আবার ফিরে পাবার জন্য—আমার বাগ্‌দত্তা কমলাকে গ্রহণ আমি করবোই! জীবন আমায় যে জিনিষ দিতে পারে নি, একান্তপক্ষে আমি তাকে মরণেও গ্রহণ করবো! রক্তমাংসের দেহ নিয়ে মিলন যদি আমাদের নাও হয়, তবে নাই হোক্—আমরা অদেহী হয়ে সূক্ষ্মমার্গেই মিলিত হবো!

—'কিন্তু বিকাশ, এ জন্মে তোমায় তৈরী হতে হবে,—প্রতিজন্মেই তুমি আমার শ্রীলেখাকে ছিনিয়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে এবং প্রতি জন্মেই তুমি আমার বধ্য হয়েছ। আমাদের এই পূর্ব্ব-বধ্য-ঘাতক-সম্পর্কের কোন ব্যতিক্রম এ জন্মেও হবে না, আমার এবং কমলার মধ্যে তোমার কোন চিহ্নই আমি রাখ্‌বো না।'

বিকাশের চোখ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, চেষ্টা করেও সে এর কোন উত্তর দিতে পাল্লে না।

একটু চুপ করে আগন্তুক আবার বল্‌তে সুরু কল্লে। বল্লে—'বিকাশ, তোমাকে যদি আজ আমি হত্যা করি, তা' হলে আমার কোন পাপই হবে না; কারণ, তুমি এখন যেখানে পেরেছ আমার ওপর অপরিসীম অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হও নি। তবে আর এক জন্মের কথা শোনো—সে জন্মে আমি ছিলুম কাশীর এক ভাস্কর। দেবদত্ত ছিল আমার নাম। আর ঐ কমলা ছিল কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের এক দেবদাসী—ওর নাম ছিল সুতানকা। ওঃ, সে কি সুখেই না আমাদের জীবনটা কেটেছে! আমি ছবি আঁকতুম, ও গান গাইতো; ও গান গাইতো, আমি ছবি আঁকতুম। সে বারে তুমি জন্মেছিলে কাশীরাজার অমাত্যের মধ্যম পুত্র হয়ে। তোমার নাম ছিল দেবভূতি।'

বক্তার কণ্ঠস্বর সহসা কর্কশ হয়ে উঠ্‌লো। বল্লে—'বিকাশ, তুমি আমাদের সেই সুখের জীবন বিষময় করে দিয়েছ। সিংহাসনের পরিবার থেকে নেমে এলে তুমি উল্কার মত। যক্ষজন্মের শ্রীলেখাকে দেখে যেমন তুমি লোলুপ হয়েছিলে, সে জন্মের সুতানকাকে দেখেও তুমি তেমনি উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লে। চক্রান্ত করে আমায় দিলে বনবাস। কিন্তু তারপরও সুতানকাকে নিয়ে তুমি ঘর করতে পাও নি—সুতানকা আমার নাম করে কাশীর কলনাদিনী গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার দিকে ত কেউ ফিরেও দেখো নি। সরগুজার রামগড় পাহাড়ে আমি তেইশ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছি। পাহাড়ের শিখরে সুতানকার জন্যে কতই না কেঁদেছি। আমার চোখের জলে রামগড় পাহাড়ের গুহাগুলো পূর্ণ হয়েছিল। শেষে একদিন মনের দুঃখে কোন উপায় না পেয়ে যোগীমার গুহার পাথর কেটে আমি সেদিনের ভাষায় লিখেছিলুম—'সুতনকা আমার'।

—'সে জন্মের সে লেখা আমার এখনও সেই অবস্থায় সেইখানেই আছে। ইচ্ছে হয়, গিয়ে তুমি দেখে আস্‌তে পারো। সেখানে লেখা আছে—

'শুতানকা নাম দেবদাশিক্যি
তম্ কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নাম লুপদখে।' *

* Annual report Arch survey of India 1903—04 P P 128 ff.

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ও শ্রীমতী ছায়া দেবী

অর্থাৎ, শয়তানক্লু নামক দেবদাসী তাহার প্রণয়ী বারানসীর রূপদক্ষ দেবদত্ত।

—'সেইখানেই আমি বাধ্য হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলুম। তেইশ বৎসর ধরে তিলে তিলে, পলে পলে সেখানকার প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তই ছিল আমার মৃত্যুর ছুরী।'

আগন্তুকের সমস্ত শরীর বিকট হয়ে উঠ্‌লো—চোখ দিয়ে আগুন যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো—কপালের সমস্ত শিরা উপশিরা যেন মোটা মোটা দড়ির মত ফুলে উঠ্‌লো। সে তার বীভৎস দন্তরাজি ব্যাদান করে [illegible] হয়ে এগিয়ে এল বিকাশের দিকে। চীৎকার করে বল্লে—বিকাশ, মৃত্যুর জন্তে প্রস্তুত হও। আমি তোমায় এখুনি—'

ডুড়ুম্—ডুড়ুম্—ডুড়ুম্—ডুড়ুম্—! ছ' নলা রিভলভারটী হাতে তুলে বিকাশ প্রাণপণ শক্তিতে তার বোতামটা টিপে গেল্‌।

ছয়

দরজা ভেঙে ধর্ম্মশালার অন্যান্য লোক যখন ঘরে এসে ঢুক্‌লো, তখন দেখ্‌লে মূর্চ্ছিতা কমলা খাটের একপাশে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। বিকাশের মুখখানা একেবারে নীল হয়ে গেছে। তার গলায় পাঁচটা আঙুলের দাগ মাংসের ভেতর গভীর হয়ে বসে গেছে। সমস্ত শরীর যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। প্রাণের কোন চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া, সাম্‌নের দেওয়ালে যে ক'খানা ছবি ছিল, সেগুলো ভেঙে মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। দেওয়ালের বালি খসেছে। জান্‌লার কাঁচ ভেঙে রিভলভারের গুলি খড়খড়ির কাঠে গিয়ে বিঁধেছে।

মহাস্থবির * এসে বিকাশের পিঠে হাত দিয়ে তার শিষ্যদের দিকে চেয়ে বল্লেন—'দেখো, এ এখনো জীবিত আছে। কেবল 'মারে'র† কোন দুষ্ট অনুচরের মোহে এম্‌নিধারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। তোমরা এই দেহটিকে নিয়ে আমার বেদীর কাছে এসো।'

শিষ্যবর্গ তখন বিকাশের দেহটিকে নিয়ে স্থবিরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। স্থবির কি সব ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিকাশের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আন্‌লেন।

ততক্ষণে সকাল হয়ে এসেছে।

...নিতান্ত নির্জ্জীবের মত বিকাশ তার খাটের ওপর বসেছে। কমলা একান্ত অসহায়ের মত মেঝেয় স্থবিরের পিঁড়ির তলায় বসে বসে মগরার বিবাহ-রাত্রি থেকে আরম্ভ করে আদ্যোপান্ত ভূতের অত্যাচারের কথা বিবৃত করে শেষে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—'বাবা, এ বিপদে আপনি ছাড়া আর আমায় রক্ষা করবার কেউই নেই!'

নারীস্পর্শে স্থবির যেন একটু বিরক্ত হয়ে সরে বস্‌লেন। তিনি বাংলাভাষা বুঝ্‌লেও তা'তে কথা বল্‌তে পার্‌তেন না। পরিষ্কার ইংরাজীতে বিকাশকে লক্ষ্য করে বল্লেন—'দেখো, ধ্যানস্থ হয়ে তোমার এই শত্রুস্থানীয় অতৃপ্ত আত্মার সংবাদ আমি সবই পেয়েছিলুম; তোমরা আমার শরণাগত বলে তোমাদের যাতে এ বিপদ আর না হয় সে বিহিতও আমি করে দিলুম। এখন আমার মন্ত্রপ্রভাবে 'মারে'র সেই অনুচর তোমাদের ছায়াও আর স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু কি জানো, আমরা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী। আমাদের মন্ত্র তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য অববস্থাতেই বলবৎ থাকবে। যদি কোনোদিন তুমি তোমার স্ত্রীকে স্পর্শ কর, বা উনি যদি মনে মনেও তোমায় কোনদিন কামনা করেন, তা' হলে সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমার মন্ত্র নিস্তেজ হবে এবং তারপরে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে সেজন্য আর আমি দায়ী থাক্‌বো না।'

বাংলা করে বিকাশ সেই কথাগুলো কমলাকে বুঝিয়ে দিলে। মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল এই আশীর্ব্বাদে দু'জনের কেউই যেন বিশেষ সন্তুষ্ট হলো না; তবে উপস্থিত একটু আশ্বস্ত হলো বই কি।

বেলা ন'টার সময় ট্রেণে করে মোটরের এক মিস্ত্রী এসে হাজির হলো। মোটরখানা নাড়াচাড়া করে সে বল্লে—'না, গাড়ী ত ঠিকই আছে।'

বিকাশের গাড়ীখানা সেদিন সেই হাঁকিয়েছিল। বিকাশ ও কমলা দু'জনে পাশাপাশি সেই মোটরে বসে বসে কি যে ভাবছিলো, তা' তারাই জানে!......

বাস্তবিক, আমিও তাই ভাবি। হতভাগ্য আমার হাতে বেচারা কমলা একবার ভূতের উপেক্ষিতা হয়ে বাসরে পড়ে কেঁদেছিলো। তারপর কল্যাণময়ীর করস্পর্শে 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না' আরম্ভ করে; আবার আমার হাতে পড়ে সধবা হয়েও বিধবার মত থাক্‌তে বাধ্য হলো।

কিন্তু কি করবো, আমরা যে উড়নচড়ে। দেখি, এই দুর্দ্দিনে কমলার কোন বন্ধু যদি তাকে কোনরকম সাহায্য করতে সমর্থ হয়।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* বৌদ্ধদের প্রধান পুরোহিতকে মহাস্থবির বলে।

† বৌদ্ধধর্ম্মে শয়তানের নাম মার।

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনত্রিশ

অদৃষ্ট-লিপিকে অর্দ্ধচন্দ্র দেখান হয় ত সম্ভব; কেন না, তাহাকে দেখা যায় না। কিন্তু দৃষ্ট-লিপির হাত এড়াইবার কল্পনা বাতুলতারই নামান্তর। তাই দিদির খোঁজ করিতে অধিক দূর অপূর্ব্বকে অগ্রসর হইতে হইল না। গ্রামের দারোগা গভর্ণমেণ্টের ছাপ দেওয়া নিমন্ত্রণ-পত্র দেখাইয়া তাহাকে রাজ-অতিথি করিয়া লইলেন।

কেন এ অনুগ্রহ হইল তাহার অনুসন্ধান করিয়া খবর লইবার ধৈর্য্য অপূর্ব্বের ছিল না। সে নির্ব্বিবাদেই লৌহ-গরাদের অন্তরালে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।

আদালতের বিচারের কি একটা ধারা অনুযায়ী তাহার ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল। কয়দিন পূর্ব্বে ধরমপুরের স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর বাৎসরিক উৎসবে সে যে বক্তৃতা দিয়াছিল, ইহা তাহারই পুরস্কার।

অপূর্ব্ব প্রতিবাদ করিল না—কেন, তা' সেই জানে! বাড়ীতে খবর দেওয়াও আবশ্যক বিবেচনা করিল না। খবরের কাগজে সংবাদটা গ্রেট্ অক্ষরে ছাপাইবার উৎসাহও তাহার হইল না। সে যেমনই নীরবে ধরা পড়িয়াছিল, তেমনই নীরবে জেলের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

ছয়মাস একটা জীবনের পক্ষে এমন কিছু নয়। বিশেষ —অকেজোর পক্ষে। দেখিতে দেখিতে মুক্তির দিন ছয় মাস কোথা দিয়া অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন প্রভাতে সে ক্ষুদ্র বেষ্টনীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথাও কোন পরিবর্ত্তন নাই। রেলের লাইন তেমনই পাতা রহিয়াছে। গাড়ী তেমনই ছুটিয়া চলিয়াছে। পথিপার্শ্বের হিঙ্গুল গাছটাও পূর্ব্বেরই মত দাঁড়াইয়া আছে। বসন্ত বাতাস তাহার নবোদিত পত্রগুলিকে দুলাইয়া দুলাইয়া কোন্ দূর পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

থানায় বসিয়া বিশ্রাম সুখমগ্ন পাহারাওয়ালার দল 'খইনি' টিপিয়া মুখে দিতে দিতে দেশওয়ালী সুরে গান ধরিয়াছে—সেঁইয়া হো হো—

অপূর্ব্ব দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। এ সমস্ত চিন্তা কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া একখানি হাস্যময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কে জানে তাহার দিদি আজ অঙ্গহীন ভাইটীকে লইয়া কোথায় কেমন অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন।

কাশীর সেই ক্ষুদ্র গৃহটার কথা মনে পড়িল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি বাঙালীর সংস্পর্শ শূন্য হইয়া দিদির কি দুঃখে দিন কাটিত ভাবিয়া একদিন যেমন সে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ মনে হইতে লাগিল তার চেয়ে শান্তির স্থান, কাম্যের স্থান ভূ-ভারতে আর কোথাও নাই। দিদি নিশ্চয়ই আবার সেইখানে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেখানে গেলেই সে তাঁহাদের ফিরিয়া পাইবে।

কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের সামঞ্জস্য খুব কমই ঘটে। কাশীতে আসিয়া অপূর্ব্বকে নিরাশ হইতে হইল। কোথায় কে! সে বাড়ীতে থাকা দূরের কথা, সদর দরজার জীর্ণ তালাটা জল পাইয়া পাইয়া মরিচা ধরিয়া যাইবার দাখিল হইয়াছে। বদ্ধ দরজা জানালাগুলায় রাজ্যের ধুলা জমিয়া 'পড়ো বাড়ী' প্রমাণ করিয়া দিতেছে। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া অপূর্ব্ব সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বেলা তখন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু অপূর্ব্বের সেদিকে লক্ষ্য নাই। এলোমেলো ভাবে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দূর হইতে কাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—লছমন, ও লছমন!

সে ডাক উদ্দেশিত লোকটীর কাণে গেল না। রেজেষ্টি অফিসের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া সে তখন কোমরের কসিটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইতেছিল। অপূর্ব্ব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া একবার হাসিল। কিন্তু ভাল করিয়া লোকটী কে না দেখিয়াও ছাড়িয়া দিতে তাহার মন চাহিল না। একরূপ ছুটিয়া আসিয়াই সে লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সোৎসুকে ডাকিল—লছমন!

লছমনই বটে! সে ডাক কাণে যাইতেই ছোটবাবু বলিয়া লছমন ফিরিয়া দাঁড়াইল। কয় মাসে লছমনকে যেন আর ভাল করিয়া চেনা যায় না। বার্দ্ধক্যের ভারে সে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অপূর্ব্বের হাত দু'টা ধরিয়া সে বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।—কোথায় ছিলে তুমি এতদিন ছোটবাবু, মাকে বুঝি আর বাঁচান গেল না!

—বাঁচান গেল না! কাকে! দিদিকে! কেন কি হয়েছে তাঁর?

অপূর্ব্বের পা দু'টাও যেন মুহূর্ত্তের জন্য বলশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। লছমনও বসিয়া পড়িয়া বলিল—তোমাদের ওখান থেকে এসে ছোড়দাদাবাবু, দেশেই আমরা ছিলুম এতদিন। প্রথমটা ভালই ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে পেটের অসুখ ধর্‌ল, তা' আর ছাড়্‌ল না। ক'দিন হ'ল ডাক্তাররা—

লছমন আর কথা কহিতে পারিল না। অপূর্ব্ব বলিয়া উঠিল—ডাক্তাররা কি বলেছেন লছমন, দিদি বাঁচবেন না—বলো, শীগ্‌গির বলো!

হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে লছমন বলিল—কতকটা তাই। ওঁর কঠিন অম্লশূল হয়েছে, যে কোন সময় মারা যেতে পারেন।

—ভাল বলিয়া অপূর্ব্ব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—কোথায় তিনি?

—জেসিডিতে তাঁকে এনে রেখেছি। ছোড়দাদাবাবু পাগলের মত হয়ে গেছেন। ডাক্তার দেখাবার, চিকিৎসা করাবার কোন ত্রুটীই করেন নি। এতদিন এখন পয়সা অভাবে—

—আমার কাছে গেলি নি কেন হতভাগা?

—তা' কি আর যাই নি ছোটবাবু! তুমি কোথায়, কেউ বল্‌তে পার্‌লে না, তাই—

—তাই নিজের বাড়ী-ঘরগুলো বিক্রী করে পয়সা নিতে ছুটে এসেছিস্, নারে?

মাথা নীচু করিয়া লছমন কহিল—মা-ই যদি নাই রইল, কি হবে বাড়ী-ঘরে, পয়সা-কড়িতে ছোটবাবু? কিন্তু ক'টা টাকাই বা পেলুম, ক'দিনই বা হবে এতে! বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলে—এই খানিক আগে বুড়োর দরজায় মাথা ঠুকে এসেছিলুম ছোটবাবু, আর কখনও ওঁর

মুখ দেখ্‌বে না বলে। ওঃ, বুড়ো ঠিক সময় তোমাকে এনে দিয়েছেন! এখন ক'টায় গাড়ী বলো ত?

—গাড়ী পরে হবে। চলো লছমন, যে বাবার দয়ায় আমাদের মিলন হয়েছে, আর একবার তাঁকে দু'জনে মিলে দিদির জন্যে জানিয়ে আসি।

—তাই চলো ছোটবাবু, তাই চলো—বলিয়া লছমন উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা যখন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে নামিল, তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। তবে স্নানের ঘাটে স্থান নাই বলিলেই চলে। একে সোমবার, তাহাতে কি একটা ছোটখাট যোগও না কি আছে।

অপূর্ব্ব ও লছমন স্নান করিতে নামিল। স্নান শেষ করিয়া তাহারা যখন উঠিল, তখন বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবু উপর সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঘাটের পাণ্ডার নিকট একটী পরমা সুন্দরী যুবতী ও একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কি কথা হইতেই মেয়েটী আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ডাকিল—বাবা!

সম্মুখে বাজ পড়িলেও বোধ করি এতটা চমকান সম্ভব নয়। বৃদ্ধ দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন—কে! কে! আমার ত মেয়ে নেই, সে ত অনেক দিন মরে গেছে! কে তুমি?

যুবতী কিন্তু এতটুকু দমিল না। বলিল—বালাই, ষাট্! আপনার মেয়ে মর্‌বে কেন বাবা, দীর্ঘজীবি হোক্! আমি আপনার আর এক মেয়ে; চিন্‌তে পাচ্ছেন না আমায়?

যুবক আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কেমন আছেন বাবা?

বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন। তারপর তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—ওঃ, অমর! দেখ্‌তেই পাই না আর—ভাল আছ বাবা? ওটি আমার নতুন মেয়ে বুঝি? বেশ, বেশ, আয় মা, আমার কাছে আয়।

শেফালী আসিয়া পায়ের তলায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি তুলিয়া দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন—তোকে চিন্‌তেই পারি নি বেটী, এমন ভুলো হয়ে পড়েছি। ভাল করে শাসন করতে পার্‌বি মা? বাবা থাক্‌তে কোথায় উঠেছিস্ তোরা? মিসিরজীর রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে এসেছে, দুটো খেতে দিবি আমায়?

শেফালীর চোখে হুহু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল—খেতে দেবো বই কি বাবা; শুধু খেতে দেব না, আজ থেকে আর কোথাও যেতে দেব না আপনাকে। নিন্, স্নান করে নিন্।

বৃদ্ধ বারবার শেফালীর মুখখানি দেখিতে দেখিতে বলিল—তাই নি মা, তাই নি।

—হ্যাঁ বাবা, তাই নিন্—আপনার দুষ্টু নাতিকে এখনও দেখেন নি আপনি, ক'মাসেই এমন জ্বালিয়ে তুলেছে যে, আর আমি পারি না। দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই যে, একদণ্ড দেখে তাকে। আপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচব। দুই বুড়োতে মিলে খেলা করবেন 'খন সারাদিন।

বৃদ্ধের চোখেও জল ঝরিতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—সেই ভাল হবে মা, জ্যান্ত ঠাকুরকে নিয়ে ঘর কর্‌ব এবার। পাষাণ দেবতাকে নিয়ে ত এতদিন বৃথাই অপব্যয় করলুম। দেখি, বাকী দিনগুলোয় যদি কিছু জমিয়ে নিতে পারি।

পূর্ব্বাপর ঘটনা না জানিলেও এ দৃশ্যে অপূর্ব্বের চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। লছমনের কিন্তু এতটুকু বিকার নাই। দু'জনে পথ চলিতে চলিতে অপূর্ব্ব বলিল—তুমি ত এখানেই থাকো, ওই বুড়ো কে বলো ত?

লছমন কথা কহিল না।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—কত লোক আসে যায়, সবার সঙ্গেই ত আর চেনা থাকা সম্ভব নয়, তুমিই বা জান্‌বে কেমন করে। কিন্তু বড় দুঃখী বলেই মনে হ'ল তাঁকে।

—হুঁ বলিয়া লছমন চুপ করিয়া গেল। আর কথা কহিল না।

রাত্রের ট্রেণে তাহারা যখন জেসিডিতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সবে রৌদ্রের আভা দেখা দিয়াছে। এক

রকম ছুটিতে ছুটিতেই লছমন বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। অজয় অস্থির চরণে সামনের বাগানটার মধ্যে ঘোরাঘুরি করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া বলিল—কিছু যোগাড় হ'ল লছমন?

লছমন হাসিয়া বলিল—হ'ল বই কি ছোটদাদাবাবু, কা'কে ধরে এনেছি, দেখো।

অপূর্ব্বকে দেখিয়া অজয় মৃদু হাসিল, কিন্তু কহিল না।

অপূর্ব্ব বলিল—এখন দিদি কেমন আছেন অজয় দা'?

অজয় জানি না বলিয়া আবার এলোমেলোভাবে পায়চারী করিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে লছমনের সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

যখন রোগীর ঘরে ঢুকিল, তখন নার্স সবে একদাগ ঔষধ সরযুর মুখে ঢালিয়া দিতেছিল। সে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া সরিয়া গেল।

সরযূ হাসিয়া বলিল—কেমন আছ ভাই?

—ভাল আছি দিদি বলিয়া সরযুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

সরযূ তাহার একখানি হাত নিজের শীর্ণ হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—কাল থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল, তুমি আসবে, তাই আজ ভোরে উঠেই তাড়াতাড়ি ওষুধটা খেয়ে নিচ্ছিলুম। কে জানে, কখন আবার ব্যথাটা উঠবে, হয় ত সারাদিনই আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। লছমন তোমায় কোথায় ধরলে ভাই?

—কাশীতে।

—কাশীতে?

—হাঁ্যা দিদি। বাড়ীতে গিয়ে আমার দেখা না পেয়ে নিজের জায়গা-জমীগুলো বিক্রী করতে ওখানে হাজির হয়েছিল। রেজেষ্ট্রি অফিসের সামনে দেখা। তারপরই এখানে এসে হাজির হয়েছি।

সরযুর চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। বলিল—ওই এক পাগল জুটেছে অপূর্ব্ব! যেদিন থেকে অসুখে পড়েছি, সেদিন থেকে হেন দেবতা নেই যাঁর কাছে না মানৎ করেছে; এমন চরণামৃত নেই যা' না আনিয়ে খাইয়েছে। এই দেখো না, একরাশ মাদুলী কোথা থেকে এনে হাতে পরিয়ে দিতেও কসুর করে নি। আবার আমারই জন্যে ঘরবাড়ীগুলোও খোয়ালে। আর জন্মে—

লছমন বাহিরের বারান্দাটার উপর এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আর থাকিতে পারিল না; ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—আবার বাজে বকৃতে সুরু করেছ ত! ছোটবাবু এল, দুটো ভাল-মন্দ কথা কও, না, ওই সব ভেনরভেনর।

সরযূ হাসিল, কোন জবাব দিল না।

ঠিক্ সেই সময় দরজার পাশ হইতে অজয় ডাকিল—অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব বলিল—ভেতরে আসুন না অজয় দা'।

—না ভেতরে যাবার আমার সময় নেই, সরযূ কেমন আছে বলো ত?

—ভাল।

—ভাল! অজয় সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—ঠিক্ বলেছ, না? আমিও জানি ও ভাল হয়ে উঠ্‌ছে। মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে বটে—আচ্ছা, কতদিনে আবার ও মুখ আগেকার মত ঢলঢলে হয়ে উঠ্‌বে বলো ত?

সবিস্ময়ে অপূর্ব্ব সরযুর মুখের পানে চাহিল। সরযূ অতি মৃদুস্বরে বলিল—বলো, দু'-চারদিন আর।

অপূর্ব্ব পাখী পড়ার মত বলিয়া গেল—দু'-চারদিন আর।

—দু'-চারদিন আর! আজ কি বার? বুধবার না? আসছে শুক্রবার। ক'দিনই বা—বলিয়া শীস্ দিতে দিতে অজয় আবার বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব বলিল—এ কি দিদি!

সরযূ হাসিল। কি অপরূপ সে হাসি! অতি করুণ কণ্ঠে সে কহিল—আজ এক মাসের ওপর অজয় দা' এ ঘরে ঢোকেন নি অপূর্ব্ব। যেদিন থেকে আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, সেদিন থেকে উনি ঘরের সামনে দিয়ে গেলেও চোখ বুজে চলে যান। কেউ এলে, আড়াল থেকে জেনে যান—কবে আমি আবার আমার আগের শ্রী ফিরে পাব;

কবে আবার তিনি আমার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারবেন। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওই বাগানটায় রাত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। জানি না, কোন্‌দিন আবার শক্ত অসুখে পড়ে কি সর্ব্বনাশ করবেন!

শেষের দিকের কথাগুলা বলিবার সময় চেষ্টা করিয়াও সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। চোখের জলে তাহার সারা মুখখানি সিক্ত হইয়া উঠিল।

অপূর্ব্বের নয়নও শুষ্ক রহিল না। সে কোঁচার খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

ত্রিশ

সেদিনের সকালটা যেন ভগবানের সমস্ত প্রশান্তভাবটুকু চুরি করিয়াই নামিয়া আসিয়াছিল। তখনও পশ্চিমা বাতাস মাতালের মত এলোমেলো গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করে নাই। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পত্রপল্লবকুল অস্ফুট কণ্ঠে বোধ করি অদেখা দেবতারই সম্বর্দ্ধনা গানে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

নন্দন পাহাড়ের প্রায় ধারেই একটা বাড়ীর একাংশ ভাড়া করিয়া দিন দুই হইল অপূর্ব্ব সরযূকে লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে। বাড়ীখানি একদম পূবে এবং খুব ফাঁকার উপর বলিয়াই সে পছন্দ করিয়াছে। অন্য অংশের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রবই নাই। শুধু দুইজনের দরজা আলাদা নহে, দুইটা পথে বলিয়া কেহ কাহাকেও দেখিবার সম্ভাবনাও নাই; অথচ, প্রয়োজন হইলে মধ্যের একটা দরজা খুলিয়া দিলেই এক বাড়ী হইয়া যায়।

জেসিডির জলবায়ু ভালই। কিন্তু সরযূর অবস্থায় ডাক্তারের সাহায্য সর্ব্বদা প্রয়োজন; তাই সে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে বাধ্য হইয়াছে।

এ স্থান পরিবর্ত্তনের ফলও যেন কতকটা ভালই দেখা দিয়াছে। এ কয়দিন সরযূর কোন বেদনা হয় নাই। একটু-আধটু খাইতে পারিতেছেও যেন। নার্সের হাতে সকল ভার তুলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই; খাওয়া-দাওয়ার অনেক কাজই সে নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ চেয়ারে বসিয়া বেদানার রস করিতেছিল। এইবার উঠিয়া আসিয়া সেটুকু সরযূকে খাওয়াইয়া দিতে দিতে বলিল—আজ কেমন মনে করছ দিদি?

—ভালই মনে হচ্ছে ভাই। তুমি যেদিন থেকে এসেছ, সেদিন থেকে কোন রোগই যেন আর নেই। এবার আমি নিশ্চয় সেরে উঠ্‌ব, কি বলো?

—না উঠ্‌লে তোমায় ছাড়ছে কে দিদি! কোল্‌কাতা থেকে ডাঃ রায়কে কল দিয়েছি। দিন দুই-তিনের মধ্যে তিনি এসে পড়্‌বেন। তিনি যদি বলেন, তোমাকে মেডিকেল কলেজে 'ট্রপিক্যালে' ভর্ত্তি করিয়ে দেব।

একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সরযূ বলিল—কলেজে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে নিয়ে গিয়ে কি কর্‌বে ভাই! এ রোগ শুনেছি শিবের অসাধ্য। তাঁরা সারাতে পার্‌বেন?

—তোমার এ যদি শিবের অসাধ্য রোগ হয়, তা' হলে আর বুড়ো শিবকে অন্ন করে খেতে হবে না। এর চেয়ে অনেক কঠিন অসুখ তাঁরা অনায়াসে সারিয়ে দিয়েছেন—এ আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি দিদি।

—তাই যেন হয় ভাই, যেমন করে হোক্‌ আমাকে বাঁচাও! আমি মরতে চাই না! আমি না থাক্‌লে অজয় দা'—কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। উৎকর্ণ হইয়া কিসের শব্দ চুপ করিয়া শুনিয়া সরযূ মৃদুস্বরে বলিল—ও বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে বুঝি অপূর্ব্ব? কাদের গলা শোনা যাচ্ছে না?

—হ্যাঁ, এসেছেন ওঁরা।

—ঘরে আর ভাল লাগ্‌ছে না, একটু দাওয়াটায় বস্‌বো অপূর্ব্ব?

—বসো না দিদি।

সরযূ উঠিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। মলিন হাসি হাসিয়া বলিল—একা পার্‌ব না ভাই। যদি কেউ ধরো, তা' হলে কোনরকমে যেতে পারি।

—একা তোমার যেতেও হবে না দিদি, নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে ওঠো তুমি।

নার্সের কাঁধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সরযূ বারান্দার ইজিচেয়ারটার উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল।

মাঝের দরজটা ভেদ করিয়া ও বাড়ীর কথাবার্ত্তাগুলা স্পষ্ট হইয়া আসিয়া সরযূর কাণে বাজিতে লাগিল। সরযূ একবার চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মৃদু হাসিয়া আবার ঘাড় এলাইয়া দিয়া শুইয়া শুইয়া ও বাড়ীর কথা-গুলা শুনিতে লাগিল।

নারীকণ্ঠে কে যেন বলিল—কেমন দেখ্‌লেন ত বাবা, সত্যি-সত্যিই দাদুটী আপনার কাশীবাস ঘুচিয়ে দিলে কি না। কিন্তু সব জিনিষ-পত্র ত এল—কই, আপনার রামায়ণ-মহাভারতগুলো ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কা'কে দিয়ে এলেন সেগুলো?

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—বড্ড মনে করিয়ে দিয়েছিস্ মা। কিন্তু সেগুলো আর আনা হ'ল কই? ভাবলুম, মিসিরজী যাই রাঁধুক, এতদিন ত খাইয়েছে, ওকেই দিয়ে দিই। দিলুমও তাই। তবে গীতাখানা—

—গীতাখানার কি হ'ল বাবা?

—সে আর বলিস্ কেন মা, তোরা ত দাদুকে আমার কাছে রেখে গেলি, কি সব কিন্‌তে। ছিল বেশ; হঠাৎ বায়না ধরলে—ওই রাঙা মলাটওয়ালা ছোট বইখানার জন্যে। কত বোঝালুম; ভবী ভোলবার নয়—দিতেই হ'ল। খানিকটা মুখে পুরে একেবারে পেটে পোরবার চেষ্টা করে যখন পারলে না, তখন দু'হাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগ্‌ল।

—বলেন কি বাবা!

—আর বলি কি মা। বল্‌লুম, বোঝালুম, শুন্‌লে না ত, আর কি কর্‌ব বলো।

মেয়েটী আর হাসি চাপিতে পারিল না, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—দুষ্টু! তবু খেলে বুঝ্‌তুম, কিছু শিখ্‌লি—ছিঁড়ে ফেল্‌লি শেষকালে। বারে, তুমি যে হাসছ বড়! ছেলে দোষ কর্‌লে, তবু ধমকাবে না বুঝি! তবে রে, আবার মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে হাসা হচ্ছে!

আর একটী পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল। সে বলিল—তাই ত ধমক দিতেই হবে দেখ্‌ছি।

কিন্তু ধমক দিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

মেয়েটী যেন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—ও মা, হাতে ওটা নিয়ে অত কি দেখ্‌ছিস্ খোকা! বারে, বেশ আংটীটা ত! ওটা আবার কখন পর্‌লে তুমি। বিয়ের পর কতদিন বলেছি, কাণে শোনা হয় নি—মার আংটী পর্‌তে নেই বলে রেখে দিয়েছিলে। আজ যে হঠাৎ মতি ফির্‌ল?

লোকটী হাসিয়া বলিল—তেলেপোকা বেশীদিন কাঁচপোকার সঙ্গে থাকলে সেও কাঁচপোকা হয়ে যায়। তোমার মহৎ অন্তরের সংস্পর্শে থেকে আমিও মানুষ হ'তে শিখেছি—মতি ফেরা আশ্চর্য্য কি!

ছোট্ট মেয়েটীর মত আবদার করিয়া মেয়েটী বলিয়া উঠিল—দেখুন না বাবা, কি বল্‌ছে?

বাবাটীও কিন্তু তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন না। বলিলেন—ঠিক্‌ই বল্‌ছে মা, তোর সঙ্গে থাক্‌লে—

—যান্, শুন্‌তে চাই না আমি বলিয়া মেয়েটী বোধ হয় দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তারা ত এখনও এল না বাবা, চলুন না মন্দির ঘুরে আসি। তারপর খাওয়া-দাওয়া ত রইলই।

—তাই চলো মা, কিন্তু দাদুর—

—ওর ব্যবস্থা ভোরে উঠেই করেছি বাবা। যে দুষ্ট, নইলে এতক্ষণ চুপ করে থাকৃত মনে করেছেন। হর্লিক খাইয়ে নিয়েছি। বামুন-ঠাকুর ত রইল, রান্না চড়াক না ততক্ষণ।

কিয়ৎকাল মধ্যেই সব নীরব হইয়া গেল। বোঝা গেল তাহারা মন্দির দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অপূর্ব্বও দিদির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিল। সরযূকে চোখ মুছিতে দেখিয়া বলিল—বেশ সংসারটি, না দিদি? ওই বুড়োকেই সেদিন বোধ হয় কাশীতে দেখেছিলুম।

সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে সরযূ অপূর্ব্বর মুখের পানে চাহিল। অপূর্ব্ব আনুপূর্ব্বিক মণিকর্ণিকার ঘাটের গল্পটা সব বলিয়া গেল। তারপর বলিল—সেদিন আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল দিদি। আহা, বুড়োকে ধরে এনে এরা ভালই করেছেন!

সরযূ মৃদু হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়! তা'তে আর ভুল নেই। কিন্তু ওরা এখানে এল কেন?

—তা' কি জানি। ফিরুক না, আজই জিজ্ঞাসা করব খন—ভারী আলাপ করতে ইচ্ছে করছে আমার।

সরযূ ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল—ইচ্ছা করলেই ত সব জিনিষ করা উচিত নয়। না না, আলাপ করে দরকার নেই ভাই। তোমার অসুস্থ দিদিকে নিয়ে তুমি সারাতে এসেছ, নির্জ্জনে বেশ আছি, আবার হট্টগোলে রোগ বেড়ে যেতে পারে। কাজ কি ও হাঙ্গামে।

অপূর্ব্ব সবিস্ময়ে দিদির মুখের পানে চাহিল। যুক্তিহীন কথাগুলা কেমন যেন ঠেকিলও। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার অসুস্থতার কথা মনে পড়ায় সে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল—তবে থাক্, তুমি সেরে ওঠ আগে। তারপর—

এইবার সরযূ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তা' ত বটেই, তারপর আলাপ করতে কতক্ষণ। যে চেহারা অজয় দা' দেখ্‌তে চান না, সে চেহারা নিয়ে কি কারু কাছে বেরুতে আছে ভাই। কিন্তু—

—কিন্তু কি দিদি?

—দু'দিন এসেছি, কিন্তু বাড়ীটা যেন কেমন ভাল লাগ্‌ছে না। বম্পাস টাউনে যদি পাও—

—পাব না কেন দিদি, তাই দেখ্‌ব 'খন আজ।

—তাই দেখো ভাই। একেবারে নির্জ্জনে—যেখানে শুধু আমরা ক'টি প্রাণী ছাড়া আর কেউ থাক্‌বে না। কেউ আস্‌বে না।

দিদির মানুষ-ভীতি অপূর্ব্বের বেশ লাগিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল—তাই হবে দিদি।

কিন্তু দরজার ঠিক্ ওপারে দেওয়ালে মাথা দিয়া আর একটী লোক যে নির্জ্জীবের মত দাঁড়াইয়া তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এদিকের কেহই তাহা টের পাইল না। লোকটী বাহির হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু ব্যাগ লইতে ভুলিয়া যাওয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে দাওয়ায় বাহির হইতে পারিল না। কে যেন বিশ মণ পাথর তাহার পা দু'টায় বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে অচল করিয়া দিল। বহুকষ্টে টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিয়া সে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। বামুন-ঠাকুর বলিল—কি হ'ল বাবু?

—কিছু না বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্য সকলে বাড়ী ফিরিতেই হৈহৈ পড়িয়া গেল। মেয়েটী চীৎকার করিয়া উঠিল—ও কি, অমন করে শুয়ে পড়েছ কেন তুমি! কি হ'ল তোমার? আমি তাই বলি, টাকার ব্যাগ নিতে গিয়ে যে মানুষ বাড়ী ঢুক্‌ল, সে আর ফিরল না কেন? পাণ্ডাজী, এখনি একজন ডাক্তার নিয়ে আসুন আপনি।

ঘরের ভিতর হইতে কি কথা হইল শুনা গেল না। মেয়েটী ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কিছু নয় নয়, আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না! যান পাণ্ডাজী, এখনই নিয়ে আসুন যাঁকে হোক্। বল্‌লুম—এক বছর ত বাইরে বাইরে ঘুরলুম—দুটো বাঘে খেতে পারে না এমন শরীর হয়েছে; বাড়ী ফিরে যাই চলো। তবু মোটা করতে হবে বলে এখানে এসে উঠ্‌লে—কি করি বলো ত? কেউ নেই আমার যে, ডেকে দুটো ভরসা দেয়!

পাণ্ডাজী বলিলেন—ভয় কি মা, এখনই সেরে উঠ্‌বেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না; আমি ডাক্তার নিয়ে এলুম বলে।

দরজার এ পাশে অপূর্ব্ব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সরযূর মুখের পানে চাহিতেই সে আরও চঞ্চল হইয়া পড়িল—কি হ'ল দিদি?

সরযূর মুখখানি উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে কহিল—আমায় ঘরে শুইয়ে দিতে পার অপূর্ব্ব, আর আমি এখানে থাক্‌তে পাচ্ছি না।

—তাই দি'; পারব না কেন দিদি, এখনই দিচ্ছি আমি বলিয়া নার্সের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া সরযূকে ঘরে আনিয়া তাহাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। বলিল—এখন কি খুব ব্যথা বাড়ল দিদি?

—ব্যথা! না ভাই। ওদের বাড়ী ডাক্তার ডাক্‌তে গেল না? ডাক্তারবাবুকে একবার—

—ডাকব দিদি? তার দরকার কি, আমি এখনই সুরেনবাবুকে ডেকে আন্‌ছি।

—না, থাক্ গে, তার আর দরকার হবে না ভাই বলিয়া সরযূ পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু সে ভাবেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না; খানিক পরেই আবার পাশ ফিরিল। ডাকিল—অপূর্ব্ব ?

অপূর্ব্ব পাশেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি দিদি ?

—হঠাৎ মানুষের অসুখ করে কেন ? এই খানিক আগেই ত ওদের বাড়ীর সব বেশ ছিল, এ কি বিভ্রাট !

—উপায় কি দিদি, শরীর থাক্‌লেই তার ভোগ মানুষকে ভুগ্‌তেই হবে।

—তা' বটে বলিয়া সরযূ আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। পরক্ষণে ফিরিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু এলে এখানে একবার ডেকে এনো। না না, জেনেই এস—কি অসুখ ওঁদের।

অপূর্ব্ব এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল—না দিদি, সত্যি আজ তোমার মাথার ঠিক্ নেই। যাদের হট্টগোলের ভয়ে এই কতক্ষণ আগে এখান থেকে পালাতে চাচ্ছিলে, তাদেরই চিন্তায় যে এখন সুস্থির হ'তে পারছ না। ব্যাপার কি বলো ত ?

সরযূর মুখ অকারণে ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল—ব্যাপার আবার কি ভাই, নিজে ভুগে ভুগে অসুখ শুন্‌লে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়, তাই—নইলে ওরা আমার কে যে ছটফট কর্‌ব। বেশ, আর জিজ্ঞেস করব না—কেমন হলো ত ? বলিয়া সরযূ পাশ ফিরিয়া শুইল।

অপূর্ব্ব বলিল—কিন্তু বেশীক্ষণ থাক্‌তেও পার্‌বে না আমি হলপ করে বল্‌তে পারি দিদি। প্রাণ তোমার কেঁদেছে যখন, তখন যতক্ষণ না ডাক্তারের খবর আসে স্থির হতে পার্‌ছ না।

সরযূ সেই অবস্থাতেই বলিল—তাই যদি ধরেছ, তবে তর্কে কাজ কি ভাই, খবরটা এনেই দিও।

—তাই যাই দিদি বলিয়া অপূর্ব্ব বাহির হইয়া গেল। আধঘণ্টাটাক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কেস্ সিরিয়াস্ নয় দিদি, হঠাৎ কোন রকম 'সক্' পেয়ে ভদ্রলোকের হার্টটা একটু কমজোর হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু একেবারে 'পারফেক্ট রেষ্ট' নিতে বলে গেলেন। দু'দিনেই সেরে উঠবেন। ভয় নেই, ও বাড়ীর কেউ জানেন না দিদি, আমি অনেক দূরে গিয়েই তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি।

সরযূ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—না, তুমি জ্বালালে। ভয় পাব কেন ? ভারী ত অসুখ ! মেয়েটা মিছিমিছি চীৎকার করে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছিল, তাই। বাড়ী কিন্তু আজই ঠিক্ করা চাই ভাই।

অপূর্ব্ব আচ্ছা বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাড়ী ঠিক করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অপূর্ব্ব জামা পরিতেছিল, পাশের বাড়ীর উঠানে কাহারা আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—ঠাকুরপো !

এ স্বর বুঝিতে অপূর্ব্বের বিলম্ব হইল না। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল—ও বাড়ী নয় বৌদি', বেরিয়ে এস, আমাদের দরজা অন্যদিকে। 'মিলন-কুটীর' দেখে ঢুকে পড়লেই হলো না।

সেই স্বভাবদত্ত হাসি !

ভূপালী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—ঢুকেই যখন পড়েছি, তখন আর বেরুচ্ছি না ঠাকুরপো। এ কি 'মিলন-কুটীরে' অমন দরজা দেওয়া কেন, ওইটা খুলে দিলেই ত বেশ এক হয়ে যায়। ও খোকা, তোমার মা কই ? তাঁকে ডাকো না, লক্ষীটি ! ঘরের কুনো হয়ে থাকা আমি পছন্দ করি না। রাগই করুন, আর যাই করুন বলিয়া বোধ করি সে ঘরের উপরই চড়াও করিতেছিল। একটী সুন্দরী সুশ্রী রমণী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই ভূপালী চীৎকার করিয়া উঠিল—সই ! তুই এখানে !

অপর স্ত্রী লোকটীর মুখ ছায়ের মত শাদা হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া ভূপালী খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—মাসী হই, কেঁদে ফেলে অপদস্ত করো না যেন বাবা। তারপর, কর্ত্তাটী কই লো ? আর ভয় নেই ঠাকুরপো, 'মিলন-কুটীরে'র দ্বার খুল্‌লো বলে বলিয়া নিজেই সে গিয়া হড়াৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল।

পরক্ষণে মেয়েটীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ও বাড়ীতে গিয়া হাজির হইয়া বলিল—দিদি কোথায় ঠাকুরপো ? এখন কেমন আছেন তিনি ?

বলাই সার। উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই সে একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরই তাহার সকল চঞ্চলতা স্তব্ধ হইয়া উঠিল। পাষাণ প্রতিমার মত সে সরযুর রোগশীর্ণ মুখখানির প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

অপর মেয়েটী ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া খানিক শয্যাগতার পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইল—এ মুখ কবে যেন সে দেখিয়াছে। কবে ? বুকে ও কি! ত্রিশূল কে বিঁধিয়া দিল—রক্তে যে সমস্ত স্থানটা ভাসিয়া যাইতেছে ! ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত সরযুর শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—দিদি ! দিদি !

সরযূ পরম যত্নে শেফালীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ছি, কাঁদে না শেফা ! ওঠ্, উঠে বস্। আবার ভাল হয়ে উঠ্‌ব আমি।

কিন্তু তাহার উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সরযূ ভূপালীর দিকে চাহিয়া বলিল—পাগ্‌লী ক্ষেপেছে ভূপা। ওকে অন্ততঃ আজকের দিনটা থামা তোরা।

কিন্তু থামাইতে তাহাকে হইল না ; সেই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। বলিল—মার্‌তে যখন চেয়েছি, মরণও দেখ্‌তে পার্‌ব। ওকে তুল্‌তে হবে না আমায়।

সরযূ তাহার একটা হাত বুকের উপর টানিয়া বলিল—ও কি বল্‌ছিস পাগ্‌লী ! তুই আমার মরণ চাইবি কেন, আর চাইলেই বা আমি মর্‌ব কোন্ দুঃখে ? বসো না ভূপা।

ভূপালী শেফালীর পাশেই বসিতে যাইতেছিল, সরযূ তাহাকে অপর পার্শ্বে বসাইয়া বলিল—দু'দিকে আমার দু'টি বোন বোস্ তোরা। শোভা, আমার মাথার কাছে বসো না ভাই। ঘরে অতি প্রিয় অতিথি, কিন্তু অশক্ত গৃহস্থ কোন অভ্যর্থনাই তোদের করতে পারলুম না। অসীম কই, খোকাকেই বা কোথায় রেখে এলি ভূপা ?

—তোমার কাছে লজ্জায় আস্‌তে পারছেন না দিদি, বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। খোকাকেও আটকে রেখেছেন—তবু যদি ওর জন্যে ওঁকে ক্ষমা করে ডাক বলে।

সরযূ মৃদু হাসিয়া চঞ্চল কণ্ঠে বলিল—পাগল কি তুইও হলি ভূপা। যা' যা', এখনই ধরে নিয়ে আয় তাকে। বোন্ তুই, তোর জন্যে ভাবি না—কিন্তু ভগ্নীপতির কি অখাতির কর্‌তে আছে, নিন্দে হবে যে।

অসীম সত্যই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—ও ঠিক্ই বলেছে দিদি। বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা কর্‌লেন—নইলে কোনমতেই স্থির থাক্‌তে পারব না আমি।

সরযূ জিব কাটিয়া বলিল—ছি, ও কথা তুলে দিদিকে অপরাধী করো না। তুমি যে আমার ভগ্নীপতি, ভূপার বর, তোমার ওপর কি কোন ক্ষোভ রাখ্‌তে পারি ভাই !

অসীম কথা কহিল না। তাহার চোখ দুইটী বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। সরযুর লক্ষ্যে তাহা এড়াইল না। সে অতি দরদভরা কণ্ঠে কহিল—আমার জন্যে দুঃখ কি ? শেফালী ভূপালীর মত বোন্, অপূর্ব্বের মত ভাই, তোমার মত ভগ্নীপতি, অজয় দা'র মত জগতে একান্ত দুর্ল্লভ চরিত্রবান দাদা এক জীবনে পাওয়া কার ভাগ্যে সম্ভব হয়েছে বলো ত ? এততেও ভগবানের তৃপ্তি হয় নি ; আবার কোথা থেকে এক লছমনকে এনে দিয়েছেন—যার জন্যে সাব প্রাণ দেওয়াও এতটুকু আশ্চর্য্যের নয়।

ভূপালী বলিল—কথা কইতে তোমার কষ্ট হচ্ছে দিদি, তুমি চুপ কর। ভাল হয়ে যত পার কথা বলো, আমরা শুন্‌ব'খন।

সরযূ হাসিল। বলিল—কষ্ট ! কষ্ট কিসের ভূপা, আজ আমার আনন্দের দিন ! আজ আমার ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন ! আজ আমার জীবনের একমাত্র প্রার্থনার দিন এসে উপস্থিত হয়েছে ! একে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়েই যে গ্রহণ কর্‌তে হবে ভাই !

ভূপালী আর প্রতিবাদ করিল না।

সরযূ আপনার মনে বলিয়া চলিল—তাই বলে মনে করিস নি, তোদের দিদি ইচ্ছা করেই এ দিনটীকে ডেকে এনেছে। বাঁচ্‌বার জন্যে কোন চেষ্টারই আমি ত্রুটী করি নি। অজয় দা'র শেষ সম্বল হাত কাটার খেসারতি

টাকাগুলো পর্য্যন্ত চিকিৎসার জন্যে বিনা দ্বিধায় বার করে দিয়েছি। লছমনের বিষয় বেচাতেও কাতর হই নি। কিন্তু শেষের ডাক যাকে ডাকে, কে তাকে ধরে রাখবে বলো?

—কে বললে শেষের ডাক তোমায় ডেকেছে দিদি, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

সরযূ হাসিল। বলিল—হুঁই, সে ত ভাল কথাই ভূপা। না হলেও অভিযোগ করবার দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে ভাই। অজয় দা' একটা কথা বলেন ভারী সুন্দর। প্রকৃতিও বুঝি গল্প-পাগল। তাই প্রতিনিয়ত সে সম্ভবকে অসম্ভব, আবার অসম্ভবকে সম্ভব করে নিয়েই তার পথ এগিয়ে চলেছে। তা' না হ'লে কোথায় ছিলুম আমরা, কোথায় এসে হাজির হয়েছি বলো ত।

কেহ কোন কথা কহিল না। সরযূ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পৃথিবীতে দুটো চিন্তা আমার বুকে ভারী হয়েছিল। একটা শেফা ঘুচিয়ে দিয়েছে, বাবাকে বুকে টেনে নিয়ে। তুই অজয় দা'র ভার নে ভাই! যদি মরতেই হয়, সে মরণকে আমি আনন্দের করে নিয়েই মরি।

ভূপালী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার সে অবসর মিলিল না। শোভা ডাকিল—দিদি।

সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া সরযূ তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—কি বোন্?

মাথা নীচু করিয়া সরযূর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া শোভা বলিল—বইবার যোগ্যতা আমার আছে কি না জানি না; তবে তুমি যদি ওঁর ভার আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারো, আমি তা' মাথায় করে নিতে পারি দিদি।

সরযূ বলিল—অপূর্ব্বের কাছে তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তা'তে তোমার হাতে অজয় দা'কে তুলে দিয়ে যেতে একটুও আমার বাধে না বোন্। কিন্তু—

বাধা দিয়া শোভা মৃদু হাসিয়া বলিল—কিন্তু কি? আমি বুঝেছি। তুমি মনে করো না দিদি যে, এ আমার হঠাৎ জাগা কল্পনা। যেদিন থেকে তোমাদের কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই মনের সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া চলেছে। তোমার অসুখের খবর পাওয়ার পর থেকে ঠিক করে বসে আছি, ওঁর পায়ের তলায় বস্‌বার অনুমতি আমি তোমার কাছে চেয়ে নেবো। অতবড় সংযমীর স্ত্রী হবার যোগ্য আমি নই জানি, তবু আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওঁর উপযুক্ত হ'তে পারি।

ঘরের ভিতর বাজ পড়িলেও বুঝি এতটা স্তব্ধতা সম্ভব নয়। সরযূ পর্য্যন্ত কথা ভুলিয়া শোভার হাতখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। শোভা বলিল—তুমি হয় ত একটু ক্ষুণ্ণ হবে ভূপা দি', কিন্তু কি করব? কোন উপায়ই ত খুঁজে পেলুম না। অপূর্ব্ব দা'কে নিয়ে পূজো করা চলে; কিন্তু ঘর করা চলে না। তা' ছাড়া, উনি আমার গুরু, আমার সাধনার বস্তু! ওঁর অনুমতি আমি না জিজ্ঞাসা করেও অন্তর থেকে পেয়েছি। তোমরাও আমাকে অনুমতি দাও।

সরযূর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া চলিয়াছিল। পাশের বাড়ী দিয়া আসায় অজয় যে ঘরে আছে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে নাই। ঠিক্ এই সময় দরজার ধারে আসিয়া সে আপন-মনে বলিয়া উঠিল—অপূর্ব্ব, সরযূ আজ কেমন আছে? তুমি বলেছিলে—দু'-চারদিনের কথা। আজ শুক্রবার। আজ নিশ্চয়ই আগের মত মুখখানি তার ঢলঢলে হয়ে উঠেছে, না? এখন তাকে দেখ্‌তে পারি আমি—কি বলো?

অপূর্ব্ব একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, কথা কহিল না। সরযূ ডাকিল—অজয় দা'!

অজয়ের কণ্ঠ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—কি বল্‌ছিস্ সরযূ, ভাল হয়ে গেছিস্ ত—আমি জানি, তুই ভাল হয়ে যাবি।

সরযূ হাসিল। বলিল—তুমি আমার কাছে এস অজয় দা', কতদিন তোমায় দেখি নি, দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না?

—আমারই কি দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না বোন্, কিন্তু কি কর্‌ব, তোর ও চেহারা আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। তোর অমন শ্রী হবে যদি জানতুম—হাত দুটোর বদলে চোখ দুটোই দিয়ে দিতুম রে! তা' হ'লে হাত দিয়ে সেবা কর্‌তে পারতুম, কিন্তু চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হ'ত না।

বলিতে বলিতে অজয় ঘরে ঢুকিয়াই ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। সরযূ ডাকিল—যেও না, এস অজয় দা'।

অজয় মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সরযুর শয্যার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সরযূ মৃদু হাসিয়া বলিল—মুখ তোল অজয় দা', তুমি যে কবি! মৃত্যুর মধ্যে যে অমৃতের সন্ধান তোমাকেই দিতে হবে। কাতর হ'লে চলবে কেন ভাই!

অস্ফুট কণ্ঠে অজয় আপন-মনে বলিতে লাগিল—কবি! কবি!

—হাঁ অজয় দা', তুমি কবি। সুন্দরের উপাসক। তাই সুন্দর দেবতা তোমাকে বঞ্চিত করতে কিন্তু হয়েছিলেন বলে শোভাকে পঠিয়ে দিয়েছেন। একে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ কর।

অজয় শিহরিয়া উঠিল। বলিল—সরযূ, সরযূ তুই কি পাগল হ'লি বোন! কি বলছিস্!

সরযূ চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। বোধ করি কোন্ সময় দুঃসহ বেদনা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। অমিত বলে সে এতক্ষণ সহ্য করিয়াও ছিল, কিন্তু আর পারিল না। তাহার মুখখানি কিরূপ হইয়া গেল। তবু সে হাত তুলিয়া কি বলিতে গেলও, কিন্তু হাত উঠিল না।

শেফালী পাষাণ প্রতিমার মত এতক্ষণ বসিয়াছিল। এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল—ও গো, আমাকে বাঁচিয়ে দিদি বুঝি চল্‌ল! এখন আর অভিমান রেখো না—একবার ছুটে এস! একবার বলো—তুমি দিদিকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছ; তার সব অধিকার স্বীকার করে নিয়েছ!

অমর দরজার সামনে টলিতে টলিতে আসিয়া কোন্ সময় দাঁড়াইয়াছিল। বলিল—চীৎকার করে বল্‌বার দরকার নেই শেফা, তোমারই মধ্যে তোমার দিদিকে খুঁজে পেয়েছি আমি, কোথায় পালাবে সে!

বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবুও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন—ঠিক্ বলেছ অমর, তাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা—কোথায় পালাবে সে! মা সরযূ!

সরযুর মুখে যেন একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। যেন সে এ মুক্তি সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করিয়া লইল বা। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার দেহ আড়ষ্ট হইয়া গেল।

ঘরে একটা চীৎকার উঠিল—দিদি, দিদি, কথা কও, কথা কও!

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, সে বুঝি অভিমান করিয়াই আর কথা কহিল না।

আলো নিভিয়া তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। লছমন সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না।

শেষ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহ্বারম্ভে
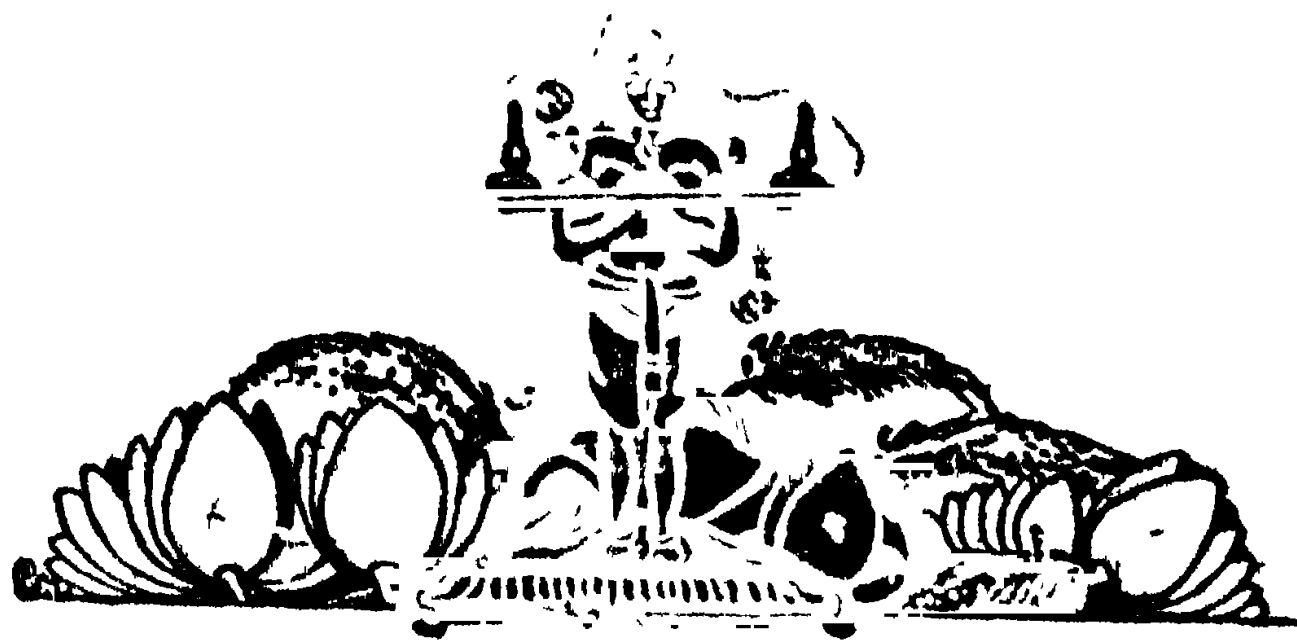
শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম্‌-এ

[স্থান বালীগঞ্জ। সময় বেলা নয়টা। রাস্তার ধারে একটী ছোট দোতলা বাড়ী। গেট্‌ পার হইয়াই কম্পাউণ্ড। মধ্যে লাল কাঁকরের পথ একেবারে বৈঠকখানার সিঁড়ির কাছে গিয়া পৌছিয়াছে। পথের দু'ধারে ক্রোটন ও অন্যান্য ফুলগাছের সারি। লম্বা লম্বা পাঁচটী সিঁড়ির ধাপ; তারপর একটু বারান্দাওয়ালা দালান। তারপর বৈঠকখানা। ঘরটী বেশ সাজান গোছান; পরিষ্কার তক্‌তকে ঝরঝরে। দেওয়ালে খানকয়েক ছবি। একপাশে একটী খাটে বিছানা। দক্ষিণে একটী জানালা। ঘরের দুইদিকে দ্বার—বাহির ও অন্দরে যাইবার। ঘরের মধ্যস্থলে একটী দেরাজওয়ালা টেবিল; চারিপাশে চারখানি চেয়ার। বাঁদিকে একটী আলমারি; তাহাতে, নানাবিধ পুস্তক পরিপূর্ণ। টেবিলের উপর লেখার সরঞ্জাম। ইতস্ততঃ ছড়ানো খানকয়েক কাগজ ও দু'-একখানা পুস্তক। দেখিলেই মনে হয় যেন কোন লেখকের লিখিবার ঘর।

[যবনিকা উঠিতে দেখা গেল—ঘরের দুইটী দ্বারই বন্ধ। লেখক টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া লেখা কাগজগুলি গণিয়া গণিয়া সংগ্রহ করিতেছে। লেখকের নাম অরবিন্দ। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। বেশ সুপুরুষ। মাথার চুল কোঁকড়ান। চোখে চশমা। গায়ে চিলাহাতা পাঞ্জাবী। পায়ে বার্ণীজ স্লিপার।]

অরবিন্দ—দুই, তিন, চার, পাঁচ—হ্যাঁ, এই পাঁচখানা-সিট-এ লেখা ছোট গল্প। এতে হবে না ?...তা' হবে 'খন। তবে লেখাটা কেমন যেন খাপছাড়া বোধ হচ্ছে !...আর একটু লিখ্‌ব না কি ?...না হয়, আরও দু'খানা সিট্‌ বাড়্‌বে।...তা' হোক্‌।

[সে চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং দোয়াতে কালী ডুবাইয়া লইয়া লিখিয়া চলিল ও নিজের মনে পড়িতে লাগিল]—নমিতার কাছ হ'তে প্রত্যাখ্যানের ব্যথা বুকে নিয়ে প্রতুল রাস্তায় এসে দাঁড়াল। পৃথিবী যেন তার চোখে তখন বদ্‌লে গ্যাছে -রূপ-রস-গন্ধ-ভরা এই ধরণী !...তার মনে হচ্ছে সংসার যেন একটা মরুভূমি।...শুধু ধূ ধূ বালুরাশি—কোথাও এতটুকু ছায়া নেই, শ্যামলতা নেই—আছে শুধু রুক্ষতা।

[সে উঠিয়া দাঁড়াইল। লেখা কাগজখানি চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া মনে মনে একবার পড়িল; মুখে একটা হাসিও যেন ফুটিয়া উঠিল। তারপর চেয়ারে বসিয়া আবার কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় অন্দরের দিকে দরজায় করাঘাত শোনা গেল। সে বিরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর হাতের কলম নামাইয়া রাখিয়া]—আঃ, কি জ্বালাতনেই পড়া গেছে—ধীরে-সুস্থে যদি একটু লিখ্‌তেও দেবে ! এ নিশ্চয়ই প্রতিমা—সে ছাড়া আর কেউ নয়। নাঃ, এর একটা বিহিত কর্‌তেই হচ্ছে !

[রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে দ্বার খুলিয়া দিয়া সে আবার চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িল ও কলমটা তুলিয়া লইয়া ঠোঁটে লাগাইয়া যেন গম্ভীরভাবে কি ভাবিতে লাগিল। অন্দরের দিকে দ্বার খুলিলে, পরদা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল এক তরুণী। সে লেখকের স্ত্রী। নাম প্রতিমা। বয়স উনিশ-কুড়ি। খুব সুন্দরী। পরণে দামী শাড়ী। গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার।

[প্রতিমা টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া]—দু' দোরে খিল এঁটে কর্‌ছো কি ? বলি, নোট-টোট জাল কর্‌তে শিখ্‌ছো না কি ?

[অরবিন্দ রাগতভাবে]—একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে লেখাটা শেষ করতে চাইছিলাম। দরজা বন্ধ করেই রক্ষে নেই—খোলা থাকলে ত এক লাইনও লেখা হবে না। তা' ছাড়া, ভাবগুলো—

প্রতিমা—হ্যাঁ, তা' বেশ করেছ, ভাল ক'রে বন্ধ কর। বলো ত ফাঁক-টাঁকগুলোও না হয় ন্যাকড়া দিয়ে বুজিয়ে দিই—কি জানি, যদি 'ইন্‌স্পিরেসন্'টা ফাঁক দিয়ে গলে যায়!

[অরবিন্দ গম্ভীরভাবে]—থাক্, আর ঠাট্টায় কাজ নেই। বলি, এ সময় এখানে কি কর্‌তে এলে?

প্রতিমা—প্রেমালাপ কর্‌তে আসি নি, এটা নিশ্চয়ই!

[একটু হাসিল]

অরবিন্দ—এভাবে আমার লেখায় বাধা দেবার কি দরকার ছিল, তা' শুনি?

প্রতিমা—দরকার? দরকার টাকা। আজ মাসের পয়লা, তা' মনে আছে? এ মাসের খরচটা দাও। বিশুকে দোকানে পাঠাতে পাচ্ছি না।

অরবিন্দ—কেন, টাকা কি নেই? এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে ফেলেছ?

প্রতিমা—হ্যাঁ, ফুরিয়ে ফেলেছি। কত দিয়েছ যে, নেই ব'লে আশ্চর্য্য হচ্ছ?

অরবিন্দ—বেশ, এ হয়েছে মন্দ নয়! মাস পড়ে, টাকা দিই; মাস শেষ হয়, টাকা উড়ে যায়; একটা কাণা-কড়িও থাকে না। কিন্তু—

প্রতিমা—কিন্তু-টিন্তু জানি না। এতবড় সংসার এক শ' টাকাতে যে চালাই, এই আমার বাহাদুরী।

অরবিন্দ—বাহাদুরী! বাঃ, বেশ আছ! আচ্ছা, বাহাদুরী বের কচ্ছি।

[রাগতভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। প্রতিমা অবাক্ হইয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

[অরবিন্দ পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে]—হ্যাঁ, কত টাকা তোমার দরকার?

প্রতিমা—কেন জানো না? যা' প্রতিমাসে দাও—এক শ' টাকা।

[অরবিন্দ টেবিলের কাছে আসিয়া ড্রয়ার টানিয়া একতাড়া দশ টাকার নোট বাহির করিল। তারপর সেই-গুলি এক-একখানি করিয়া গণিয়া টেবিলে প্রতিমার সম্মুখে রাখিতে লাগিল]—এক, দুই, তিন—

প্রতিমা—বাড়ী ভাড়ার টাকাটাও এই সঙ্গে দিয়ে দাও।

অরবিন্দ—সে আমি পরে দেবো 'খন। [আবার নোট গণিতে লাগিল]—চার, পাঁচ, ছয়, সাত—ব্যস্, এই নাও।

প্রতিমা—এ কি! এ যে মোটে সত্তর টাকা! আর কই? আর তিরিশ টাকা দাও।

অরবিন্দ—না। এই তোমার খরচের টাকা।

প্রতিমা—এই আমার খরচের টাকা! এতে সারা মাস চল্‌বে?

অরবিন্দ—চল্‌বে।

প্রতিমা—চল্‌বে! তুমি কি পাগল হ'লে না কি! এক শ' টাকাতেই কুলোতে পারি না—এ যে মোটে সত্তর টাকা।

অরবিন্দ—না, সত্তর টাকা নয়, ওই এক শ'।

প্রতিমা—ওই এক শ'! তুমি সত্তর টাকাকে বল্‌ছ এক শ'! নিশ্চয় লিখে লিখে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। না, রঙ্গ রাখো, বাকী টাকাটা দাও। বাজারের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। আজ রবিবার হ'লেও খাওয়া-দাওয়া ত আছে।

অরবিন্দ—না, আর দেবো না। তুমি আমার কাছ থেকে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছো—তাই কেটে নিলাম।

প্রতিমা—আমি ধার নিয়েছি! তিরিশ টাকা! তোমার কাছে! অবাক্ কর্‌লে যে! কবে আবার তোমার কাছে থেকে ধার নিলাম?

অরবিন্দ—না, ধার ঠিক নয়, তবে ও তিরিশ টাকা তোমার সংসার খরচ থেকে তোমায় ফাইন্ দিতে হবে।

প্রতিমা—আমার সংসার খরচ থেকে ফাইন্ দিতে হবে! তার মানে? এমন অদ্ভুত কথা ত কখন শুনি নি! বলি, ব্যাপার কি—সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়েছো না কি?

অরবিন্দ—না, জিনিষটা তুমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছো না।

[প্রতিমা ঝঙ্কার দিয়া]—বুঝে আর আমার কাজ

নেই। আমার ত আর তোমার মত মাথা খারাপ হয় নি। সংসার খরচ থেকে টাকা ফাইন্ দিতে হবে! কেন দিতে হবে, শুনি?

অরবিন্দ—দিতে হবে তোমার দোষে।

প্রতিমা—কি, আমার দোষে!

[রাগে ফুলিতে লাগিল]

অরবিন্দ—তোমার সুগৃহিণীপনায় আমি কোনদিন সন্দেহ করি নি। তবে এমন কতকগুলি দোষ তোমার স্বভাবে আছে, যার জন্য আমায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তে হয়েছে—আর তার জন্য নিরুপায় হয়েই আমায় এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

প্রতিমা—আমার স্বভাবের দোষ! [ক্রোধে ও বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল]—বেশ! আমার আমার দোষগুলো কি শুন্‌তে পাই না?

অরবিন্দ—দোষ কি একটা যে বল্‌বো।

প্রতিমা—ছ'-একটা নমুনা দাও না, শুনি।

অরবিন্দ—বেশ, তাই হোক্। প্রথমে ধরো, যখন তখন সুট্ ক'রে ঘরে এসে আমার ভাবগুলো নষ্ট করে দেওয়া। লেখার সময় বাজে কথা বলা। যেটা চাই না, পছন্দ করি না, ঠিক্ সেইটে করা। নারীর কণ্ঠস্বরে যে একটা মাধুর্য্য আছে—

প্রতিমা—থাক্, খুব হয়েছে, আর তোমায় ফিরিস্তি দিতে হবে না! [ব্যঙ্গস্বরে]—কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য! নয়! বলি, কোনও কোকিল-কণ্ঠীর সংবাদ পেয়েছ বুঝি? এ কণ্ঠস্বর আর বুঝি ভাল লাগ্‌ছে না? এককালে যে—

অরবিন্দ—অতীত নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে রাজী নই। বর্ত্তমানে তুমি আমায় তিক্ত করে তুলেছো। আজ পাঁচ বৎসর আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই পাঁচ বৎসরে তুমি আমায় কতটুকু শান্তি দিয়েছ তার যদি হিসেব কর্‌তে হয়, তা' হ'লে হিসেবের ঘরে শূন্যই বোধ হয় বসে। যাক্ সে কথা। এখন শোনো, কি কি বাবদে তোমার টাকা কেটেছি। গত শনিবারে একটা কবিতা লিখ্‌ছিলাম, তুমি হঠাৎ এসে ভাবটা নষ্ট করে দিলে—তার জন্যে তোমার সংসার খরচ থেকে কাটলাম পাঁচ টাকা। সেদিন বাড়ী আস্‌তে একটু রাত হয়েছিল। তুমি তার কৈফিয়ৎ চাইলে, যা' বল্‌লাম বিশ্বাস হ'ল না, সারারাত গজ্‌গজ্ কর্‌লে—তার জন্য কাটা গেল দশ টাকা। পরশু বল্‌লাম—জামাটা ময়লা হয়েছে, একটু সাবান দিয়ে দাও। তুমি মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলে—ধোবা বাড়ী দাও গে; আমি তোমার দাসী-বাঁদী নই—সেই কথার জন্যে বাদ গেল পাঁচ টাকা। বাড়ী এসে সেদিন একটু চা চাইলাম। বল্‌লে—এমন অসময়ে চা ক'রে দিতে পারবো না—তার জন্য কাটা গেল তিন টাকা। গেল রবিবারে আমার এক বন্ধুর বোন্ বেড়াতে এসেছিল। আমার সঙ্গে হেসে কথা কচ্ছে দেখে তুমি চটে গেলে। সে চলে গেলে যা' মুখে এল, তাই বল্‌লে—এর জন্য তোমার ফাইন্ হ'ল সাত টাকা।

প্রতিমা—বলি, এমন চমৎকার ফন্দীটা মাথায় এল কি করে? আমি কি কিছু বুঝি না? আমায় তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ!

অরবিন্দ—না, তা' ঠিক নয়। তুমি যদি তোমার স্বভাবগুলো একটু বদ্‌লাও, তা' হলেই আমি বাঁচি। আজকাল তোমার হাতটাও একটু দরাজ হয়েছে। অত সিনেমা, শাড়ী, স্যাণ্ডেল, রিলিফ ফাণ্ডের খাতায় মোটা রকমের চাঁদা সই করা, যা' কিছু সৌখীন জিনিষ দেখ্‌বে, তাই কিনে ঘর বোঝাই করা, তার ওপর এই সময় নেই, অসময় নেই আমার লেখাপড়ায় বাধা হওয়া—নাঃ, এ সব আমার অসহ্য হয়েছে! এর একটা ব্যবস্থা না কর্‌তে পার্‌লে—

প্রতিমা—আর চল্‌ছে না, কি বলো? মতলবটা বার করেছো মন্দ নয়! কিন্তু আমার হাতেও এর ব্যবস্থা-পত্র আছে তা' জেনো। হ্যাঁ, সত্তর টাকা দিচ্ছো ত, বেশ! ঐ টাকাতেই সব হবে। চারবারের যায়গায় একবার চা পাবে, ভাতের সঙ্গে দুধটা বাদ পড়বে, বিকেলে লুচির বদলে মুড়ি জলখাবার পাবে, আর—

অরবিন্দ—না তা' হবে না। আমার যা' ব্যবস্থা আছে, তার এক চুলও এদিক-ওদিক হবে না।

প্রতিমা—হয় কি না হয়, সে আমি দেখ্‌বো। তোমাকে জব্দ কর্‌তে কতক্ষণ।

অরবিন্দ—জব্দ! আমাকে! [উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল]—একটা গল্প শুনবে? একবার ছেলেবেলায় একটা দুষ্টু মেয়ে আমার জামার মধ্যে কাঠ-পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছিলো, তাকে বড় বিরক্ত করতাম বলে। তার ফলে কি হয়েছিলো জানো? গায়ের ব্যথায় তাকে চারদিন বিছানা থেকে উঠ্‌তে হয় নি।

প্রতিমা—কি, এতবড় স্পর্দ্ধা! আমায় তুমি মারের ভয় দেখাও! ব্রুট্!

অরবিন্দ—যা' তা' বলে তোমার ফাইনের মাত্রাই বাড়িয়ে যাচ্ছ।

প্রতিমা—কর না ফাইন্‌। তোমার ফাইনের আমি তোয়াক্কা রাখি নে।

অরবিন্দ—রাখো কি না, সে ত বেশ বুঝ্‌তেই পারা যাচ্ছে। যাও, যাও, ঐ টাকাই নিয়ে যাও, আর বিরক্ত করো না। হ্যাঁ, যাবার সময় দরজাটা ভাল ক'রে ভেজিয়ে দিয়ে যেও।

[প্রতিমা কিছুক্ষণ অরবিন্দের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া]—তুমি স্বামী হ'য়ে এতবড় অপমান আমায় করতে পার তা' আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। না, আমার বেঁচে সুখ নেই! আমায় মরতেই হবে! তোমার সংসার আর সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এতবড় অপমান! না, মরতেই হবে—তোমারই চোখের সুমুখে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে!

[দড়ির সন্ধানে সে যেন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

[অরবিন্দ নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া আলমারীর পিছন হইতে খানিকটা দড়ি আনিয়া তাহার হাতে দিতে গেল। প্রতিমা স্থির-দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর কান্নায় ফাটিয়া পড়িয়া চোখে আঁচল চাপা দিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। অরবিন্দ একটু হাসিয়া অন্দরের দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিল এবং লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহার সমস্ত মুখখানি কৌতুক-হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। খানিক পরে বাহিরে যাইবার বেশে সজ্জিত হইয়া প্রতিমা সেখানে প্রবেশ করিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু দুইটি আরক্ত হইয়াছে ও মুখখানি খুব করুণ দেখাইতেছে। সে ধীরে ধীরে অরবিন্দের কাছে আসিয়া নত হইয়া তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিল। অরবিন্দ নিঃশব্দে লিখিয়াই চলিল।

[প্রতিমা উঠিয়া]—আমি চ'লে যাচ্ছি।

[অরবিন্দ নিস্পৃহভাবে]—বেশ।

প্রতিমা—তোমার আমায় কিছু বল্‌বার নেই?

অরবিন্দ—না।

প্রতিমা—কোথায় যাচ্ছি, তা' একবার জিজ্ঞাসাও করবে না?

অরবিন্দ—কি দরকার? যাচ্ছ যখন, তখন ভাল যায়গাতেই যাচ্ছ নিশ্চয়ই!

[প্রতিমা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে]—একটা পাখী পুষ্‌লেও তার ওপর মানুষের মায়া হয়, আর আজ পাঁচ বছর একসঙ্গে আছি, তোমার কি আমার ওপর একটুও মায়া নেই? তুমি কি গো! তুমি কি পাষাণ!

[অরবিন্দ কোন উত্তর না দিয়া নীরবে লিখিয়াই যাইতে লাগিল]

প্রতিমা—তুমি এমনি করে আমায় লাথি মেরে বাড়ীর বার করে দিচ্ছ?

অরবিন্দ—কই, লাথি ত মারি নি, আর বাড়ীর বারও আমি করে দিই নি।

প্রতিমা—সত্যি করে লাথি মারা, বাড়ী থেকে বার করে দেওয়া কি এর চেয়েও বেশী?

অরবিন্দ—তা' তুমি যা' বোঝ।

[প্রতিমা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল]—আচ্ছা, আমি চলে গেলে আমার কথা কি তোমার একদিনও মনে পড়বে না?

অরবিন্দ—তা' এখন কি করে বল্‌বো? পড়লেও পড়তে পারে।

[প্রতিমা থমকাইয়া দাঁড়াইল। তারপর কি ভাবিয়া

টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ওপর ছড়ান নোটগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল]—দাও আর তিন-খানা নোট।

অরবিন্দ—না, আর হবে না।

[প্রতিমা কাঁদকাঁদ হইয়া]—আমি যে তাদের কথা দিয়েছি। ও গো, তোমার পায়ে পড়ি, এবার তুমি দাও! কালই তারা চাঁদার খাতা নিয়ে আসবে—তা'তে যে তোমারই অপমান হবে।

[অরবিন্দ প্রতিমার মুখের দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিয়া] আমার অপমান!

প্রতিমা—তোমার ভরসাতেই তোমার নামে খাতায় সই করেছি। তুমি না দিলে তারা কি ভাব্‌বে?

[অরবিন্দ ক্রুদ্ধভাবে]—কেন আমার নামে সই কর্‌লে?

প্রতিমা—কেন কর্‌ব না? আমি না তোমার স্ত্রী? তোমার টাকায় আমার অধিকার নেই? তুমি আমি কি আলাদা?

[অরবিন্দ প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখ স্বামী-প্রেমের গৌরবে জল্‌জল্‌ করিতেছে। চক্ষু দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ।

[অরবিন্দ মুগ্ধ হইল। তারপর ধীরে ধীরে ড্রয়ার খুলিয়া আরও তিনখানা দশ টাকার নোট টেবিলের উপর রাখিল। প্রতিমা সেদিকে চাহিয়াও দেখিল না; মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরবিন্দ উঠিয়া গিয়া প্রতিমার একখানা হাত ধরিয়া অন্যহাতে তাহার নত মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

[প্রতিমার চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অরবিন্দের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। অরবিন্দ তাহাকে নিজের দিকে আর একটু টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। মুখে তাহার প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল। যবনিকা নামিয়া আসিল।]

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

পৃথিবীর পুত্র

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য

আশুতোষ কলেজে কে একজন নামজাদা প্রোফেসার মারা যাওয়ার দরুণ আমাদের সেদিন একটার সময় ছুটী হয়ে গেল। যদিও ছুটিটা হলো শোক-প্রকাশ করার জন্য, কিন্তু তবুও ছেলেরা কতখানি শোক-প্রকাশ করলে সে শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন। কলেজ থেকে বার হবামাত্র দেখ্‌লাম কতকগুলি ছেলে আনন্দের আতিশয্যে চায়ের দোকানে ব্রীজ খেল্‌তে বসে গেছে, কতকগুলি আবার হোষ্টেলে গান ধরেছে, কেউ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে বল্‌ছে, আরে দাদা সকলেই পৃথিবীতে মারা যাবে, সব নশ্বর।'লজিকই বলে দেখো না, 'অল মেন্ আর মর্টাল।' আবার কেউ বা বল্‌ছে, এই রকম দু'-একটা লোক মরলে তো বাঁচা যায়, ছুটীগুলো জমে ভাল। হায়, শোকের চূড়ান্ত!...

বোধ হয় স্বর্গগত অধ্যাপকের আত্মা এসব দেখ্‌লে আপনা হতেই চম্‌কে উঠবে। আমি কোন দলেই ছিলুম না। সোজা বাড়ী চলে এলুম। না চলে এসেই বা উপায় কি? আর আমার শোক-প্রকাশ করাও সাজে না, কারণ, যাঁকে কখনো দেখি নি, যাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, তাঁর মরণে শোক-প্রকাশ নেহাৎ ভণ্ডামী ছাড়া আর কি ই বা হ'তে পারে। আর আমি ত তেমন নামজাদা লোক নই, যে, 'অমৃতবাজার' বা 'এড্‌ভান্সে'র মারফতে সভ্যযুগের নেতাদের মত অর্থহীন দু' কলম লিখে শোক-প্রকাশ কর্‌বো? আর আমার শোকের দামই বা কি? হতাম যদি রবীন্দ্রনাথ, হতাম যদি সারওয়ার্দ্দি, হতাম যদি সুভাষ বসু তবুও একটা কথা ছিল।

যাক্, বাড়ীর ওপরে ওঠামাত্রই আশ্চর্য্য হলাম। দুপুরবেলা সাধারণত আমার মা, কাকীমা এবং পিসীমারা সকলেই ঘুমোন। কিন্তু এ কি! ও ঘরে অর্গান বাজাচ্ছে কে? কাকীমার গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কেন? ব্যাপারটা ঠিক্ বুঝতে না পেরে ঘরের একটা জানালার কাছে গিয়ে আড়ি পাতলাম। কিন্তু যা' দেখ্‌লাম, সে কি সত্যি? হাঁ, সত্যিই তো! একটা ষোল-সতের বছরের সম্পূর্ণ নব্যা তরুণী গান গাইছে, আমারে ভালবেসে...। বাঃ, গানখানি তো বেশ চমৎকার! এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখ্‌লাম, সকলেই মুগ্ধ, আমার দিকে কারো দৃষ্টি নেই। আমি বুঝ্‌লাম, এ নিশ্চয়ই কোনো অতিথি। নিজের ঘরে চলে এলাম। জামাটা খুলে চেয়ারে বস্‌লাম। একটা নভেল পড়বার ভান কর্‌লাম। কিন্তু নাঃ, পড়া গেল না। এক-একবার যখন মধুর স্বরের সেই মূর্চ্ছনাটী কাণে আস্‌তে লাগ্‌ল, তখনই—

দশ মিনিট কাট্‌ল। মা ঘরে ঢুক্‌লেন। বল্লেন, কিরে, কখন এলি?

আমি বল্লাম, এই খানিকটা আগে আস্‌ছি। কলেজের ছুটী হয়ে গেল, কারণ, একজন মাষ্টার মারা গেছেন।

মা বল্লেন, ও।

আমি আর কৌতূহল চাপ্‌তে পার্‌লাম না। জিগ্যেস্ কর্ল্লাম, মা ও মেয়েটী কে?

মা যা' বল্লেন তার মর্ম্মার্থ এই—আমাদের বাড়ীতে আগে একজন মুখুয্যে-পরিবার ভাড়া ছিলেন। মেয়েটী হচ্ছে সেই মুখুয্যে-গিন্নীর বোন্‌ঝি। ও থাকে ধানবাদে। এখন কোলকতায় বেড়াতে এসেছে, তাই মুখুয্যে-গিন্নী সঙ্গে করে এনেছেন। ওর নাম হচ্ছে জয়তি, এবার ও ম্যাট্রিক দিয়েছে।

আমি বল্লাম, ও।

মা আবার বল্লেন, তোর সেই রমেশকে মনে আছে—যে কিছুদিন এখানে মুখুয্যে-গিন্নীর কাছে ছিল; তোর সব পত্র দেখ্‌ত, গল্প কর্‌ত?

আমি বল্লাম, হাঁ হাঁ, আছে বই কি।

মা বল্লেন, এ হচ্ছে তারই বোন্।

আমি কথাটা এবার বেশ বুঝ্তে পার্‌লাম। মা আবার বল্লেন, জয়তি তোর কবিতাগুলো যে দেখ্তে চাইছিল। আমি বল্লুম, সে তো বাড়ী নেই—কলেজে। তা' দেখ্তে দিবি? ও-ও যে একজন লেখিকা। কাগজে লেখে।

আমি বল্লাম, আমি কবিতা লিখি ও কি করে জান্‌লে?

মা বল্লেন, কেন রমেশ গিয়ে সব বলেছে।

মুস্কিল কর্‌লে আর কি! কবিতা আমি কি রকম করে দেখ্তে দোব? সেগুলো যে সমস্ত 'রাফ্' খাতায়! তা' ছাড়া, আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সেগুলো দেখাই না। ভাব্তে লাগ্‌লাম। মা চলে গেলেন।

হঠাৎ পাশের ঘরে জয়তির অপরিচিত মধুকণ্ঠ শোনা গেল। জয়তি জিগ্যেস কচ্ছে—এটি কার ঘর?

কাকীমা উত্তর দিলেন। আমি সোজা হয়ে বস্‌লাম। দরজার দিকে চেয়ে দেখি কার ছায়া পড়েছে। দেরী হ'ল না। দেখ্‌লাম পিসীমা এবং কাকীমা ঘর চড়োয়া করেছেন। জয়তি তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে। বেশ চমৎকার চেহারা! কবরী-ভ্রষ্ট দু'-চারটী চুল মুখের কোলে দুল্‌ছে। চোখে একটী চশমা—আলোকে ঝিক্‌মিক্ কচ্ছে। পায়ে স্যাণ্ডেল। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। আমারি পানে সে তাকিয়ে আছে। আমি মাথা নত কর্‌লাম। আমার কেমন যেন লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল। যদিও নভেল নাটক মেলাই লিখেছি এবং নারীর 'সাইকলজি' নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি, তবুও নারীর ছায়া দেখ্‌লে কেমন আমার দুর্ব্বলতা আসে, লজ্জা হয়।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জয়তিই আগে বল্‌লে, এটি কার ঘর কাকীমা?

সর্ব্বনাশ, জয়তি যে এরি মধ্যে সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছে! কাকীমা বল্লেন, এটা বড় ঠাকুরের ঘর; এই তাঁর ছেলে।

আমার দিকে কাকীমা আঙুল দেখালেন।

জয়তি একবার আমার পানে চাইলে। চোখোচোখি হ'ল। আমি মুখ নত কর্‌লাম। একটী ফটো ছিল আমার ঘরে। জয়তি সেদিকে এগিয়ে এল। বাঃ, বেশ ফটোখানি তো! বলে সে আবার আমার পানে চাইলে।

আবার সেই লজ্জায় নত হ'লাম। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল। জয়তির হস্তস্থিত রুমালের 'সেণ্টে'র গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়্‌ল। কী চমৎকার গন্ধ! কাকীমারা বোধ হয় হাস্‌ছিলেন। আমি অত লক্ষ্য কর্‌লাম না।

জয়তি এবার আমার কাছে সরে এল। আমার তখন বুকখানা কাঁপছে। জয়তি বল্লে, আপনি কি লিখ্‌ছেন, কবিতা বুঝি?

এই মাটী কল্লে! আমি কোনরকমে উত্তর দিলাম, না।

জয়তি হেসে উঠলো। এতটুকু লজ্জা বোধ হয় তার নেই।...আমার বড় রাগ হ'ল। তারপর মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থেকে জয়তি কাকীমাদের নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। আমিও বাঁচলাম। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য কর্‌লাম, জয়তি সে ঘরে বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না; আমার ঘরের ধার দিয়ে আমারি দিকে চেয়ে আবার সে চলে গেল।

মিনিট দুই-এর মধ্যেই মুখুয্যে-গিন্নী ঘরে এলেন। তাঁর মাথায় সিঁথিভরা সিঁদুর, মুখখানি হাসি হাসি, চোখ দু'টী মাতৃসুলভ শ্রীতে শান্ত ও সমুজ্জ্বল। কোলে একটী ছেলে, তাঁরই। দু' বৎসরের ফুটফুটে সুন্দর খোকাটী। আমি চেয়ার থেকে উঠে পায়ের ধূলো নিতে গেলাম। তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন, থাক্ থাক্—ভাল আছ?

আমি বল্লাম, হাঁ। তারপর, আপনারা এখন আছেন কোথায়?

তিনি বল্লেন, এই কাছেই আছি। আস্‌ব আস্‌ব রোজই ভাবি, কিন্তু সময় পাই না—আর ছেলেপিলে যে দুরন্ত, তাদের একা রেখে বেরুই বা কি করে? আজ হঠাৎ মনটা কেমন হ'ল, তাই বোন্‌ঝিটাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ী এলাম। ও তো তোমার খুব ভক্ত দেখ্‌ছি। রমেশের মুখে তোমার লেখা-টেখার কথা শুনে ও তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে খুব অস্থির। যাক্, পড়াশুনা ভাল হচ্ছে তো?

আমি বল্‌লাম, হ্যাঁ।

পিসীমা এসে মুখুয্যে-গিন্নীকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। আমি ব'সে ভাব্তে লাগ্‌লাম—অনেক কথা। আমার প্রতি জয়তির ভক্তির কারণ কি, কেনই বা আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য তার এত অস্থিরতা, আমার কবিতা দেখ্‌বার কেন তার এত ঔৎসুক্য? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হঠাৎ দেখি আমার ছোট ভাই কাছে এসে বল্‌ছে, দাদা, জয়তি দিদি তোমার একখানা উপন্যাস চাইছে।

কথা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম। জয়তি আবার দিদি কখন হ'ল? আর উপন্যাসই কি আমার ছড়াছড়ি যাচ্ছে না কি যে, যে চাইবে তাকেই দিতে হবে? আমি বল্লাম, বল্ গে যা, আমার উপন্যাস-টুপন্যাস নেই।

সে চলে গেল। কথাটা বলা ভাল হলো না, মনে হতে লাগল।...আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। বাইরে থেকে শোনা গেল জয়তি কাকীমাকে ধ'রে পাখীটার সঙ্গে কথা কইছে। বল্‌ছে, বল্ হরেকেষ্ট, বল্ বল্।

কাকীমা হেসে উঠ্‌ছেন, জয়তিও হোহো ক'রে হাসছে। তারপর কি একটা কথা হলো—আবার জয়তির হাসি। মনে মনে ভাব্‌লাম, বাবা, মেয়েটার কি হাসি, কি নির্লজ্জ! হলোই বা আধুনিক। তাই ব'লে এমনিই। আমার ভাইয়ের কথা শুন্‌তে পেলাম। ভাই তাকে আমার কথাটাই গিয়ে বল্‌ছে। আমার ভয় লাগ্‌ল। বোধ হয় মেয়েটা—

কিন্তু পরক্ষণেই দেখ্‌লাম জয়তি আমার ঘরে এসে পড়েছে। আমি একবার তার মুখের দিকে চাইবামাত্রই জয়তি বল্লে, আপনার কি লেখা আছে দিন তো, আমি কালকেই পড়ে ফিরিয়ে দোব।

কথাটার মধ্যে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচের লেশমাত্র নেই। আমি বল্লাম, লেখা? কি লেখা আছে, আমি তো জানি না।

লেখেন না, মিথ্যা কথা? বলে জয়তি হাস্‌লে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত তাই ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখি জয়তি আমার বিনা অনুমতিতেই আলমারীটা খুলে ফেলেছে এবং 'পৃথিবীর পুত্র' নামক উপন্যাসখানি তুলে নিয়ে বল্‌ছে, আচ্ছা, আসি তা' হ'লে, নমস্কার।

এ কি কথা! যে উপন্যাসখানি আমি আমার 'ডিয়ারেষ্ট্ ফ্রেণ্ডকে'ও পড়তে দিই নি, সেখানা কি না জয়তি নেবে? আমি বল্লাম, শুনুন।

জয়তি বল্লে, আমি একটু কালা আছি, সব কথা শুন্‌তে পাই না। বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি হতাশ হয়ে বসে রইলাম। উপায়ই বা কি? মেয়েছেলের সঙ্গে তো আর যুদ্ধ করতে পারি না।

বিকালবেলা বসে ভাবতে লাগ্‌লাম, জয়তি বইটা পড়লে কতই না খুসী হবে! যে বইখানি আমাদের কলেজের অর্দ্ধেক অধ্যাপকের প্রশংসা পেয়েছে, না জানি জয়তির কাছ থেকে সে কতখানিই না প্রশংসা গাবে! আচ্ছা, বইখানি ছাপালে হয় না—কিন্তু পয়সা কোথায়? যাক্, অনেক ভাব্‌লাম। ভাব্‌লাম, জয়তি বোধ হয় কালই একখানা পত্র দেবে। বোধ হয় লিখ্‌বে, আমি আপনার বইখানি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আচ্ছা, কবিতা মেয়েটির অমন চরিত্র করলেন কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু কাল যখন এল, দেখ্‌লাম একজন চাকর এসে 'পৃথিবীর পুত্রখানা' ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

সমস্ত পাতা ওল্টালাম—কিন্তু কোথায় চিঠি? আমার রাগ হলো। একখানি পত্র দেওয়া কি তার উচিত ছিল না? এমনি বেইমান!...

দু'দিন পরে শুন্‌লাম জয়তি ধানবাদে চলে গেছে।

* * *

দু'মাস কেটে গেছে।

একদিন একখানা পত্রিকা পড়্‌তে গিয়ে পুস্তক-পরিচয়ের পাতে নজর পড়্‌ল। দেখ্‌লাম এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

"পৃথিবীর পুত্র—কুমারী জয়তি দেবী প্রণীত। প্রকাশক —এল্ এম্ সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ধানবাদ। দাম এক টাকা বার আনা।

"বইখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দেওয়া যায় না। এই পুস্তকখানির প্লট এত সুন্দর এবং এত নূতন যে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই আজ পর্য্যন্ত এরূপ কোন বই বাহির হয় নাই। প্রত্যেক চরিত্রটী নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা লেখিকাকে ইহা ইংরাজিতে অনূদিত করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। আমরা মনে করি, এই পুস্তকখানির জন্য কুমারী জয়তি দেবী নোবেল প্রাইজও বোধ হয় পাইতে পারেন।"

পড়ে আমার পড়ে মাথা ঘুরে গেল। আমারি খাতাখানা নকল করে ছাপায় নি তো? সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরীতে গেলাম। বইখানা এনে সারারাত্রি পড়ে শেষ করলাম। সর্ব্বনাশ, এ যে আমারি প্লট—আমারি চরিত্র সৃষ্টি—আমারি নায়িকার নাম! হ্যাঁ, ভাষাটা শুধু জয়তি দেবীর বটে। কাকার কাছে গেলাম। তাঁকে সব খুলে বল্লাম। তিনি বল্লেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি! তুমি কি জানো না যে, সাহিত্যিকদের মতো চোর আর জগতে নেই!

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য

হারাধনের হয়রানী

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্

[পূর্ব্বাভাষ—হারাধনের কয়েক মাস হইল বিবাহ হইয়াছে। তাহার পিস্তুতো শালী অনিমার শ্বশুরবাড়ী কলিকাতা। তাহার কর্ম্মস্থল পশ্চিমে। পূজার ছুটীতে হারাধন যেন একবার অনিমার বাড়ী যায় এই মর্ম্মে অনুরোধ, উপবোধ এবং শেষ পর্য্যন্ত আদেশ জারি হইয়াছে। হারাধনের এক মাসীমা শ্রীরামপুরে বার মাস বসবাস করেন। আগে শ্রীরামপুরে গিয়া উঠিবে এবং পরে কলিকাতায় শালীর বাড়ী যাত্রা করিবে এইরূপ ঠিক করিয়া সে পূজার ছুটীতে বাহির হইয়াছে।]

[মাসীমার বাড়ী]

মাসীমা—হ্যাঁরে, তা' হলে আজই কোলকাতায় চল্লি। আর দিনকতক থেকে গেলে হতো না ?

হারাধন—না মাসীমা। বিয়ে হওয়া অবধি তারা বড় ধরেছে, একবার যেতেই হবে।

মাসীমা—যা' ভাল বোঝ কর বাছা। মাসীর বাড়ী কি আর শালীর বাড়ীর চেয়ে মিষ্টি লাগ্‌বে!

হারাধন—কি যে বলো তুমি মাসীমা, তার ঠিক্ নেই।

[মাসীমার প্রস্থান]

[মাস্তুতো বোন্ সুলতার প্রবেশ]

সুলতা—হারু দা'র সাজগোজ যে আর হয় না দেখ্‌তে পাই!

হারাধন—এই যে, হলো বলে। বলি হ্যাঁরে লতা, দেখ্‌তো ভাই, পাঞ্জাবীর ঝুলটা কি নেহাৎ কাবলীওয়ালাদের মত হলো।

সুলতা—কি জানি দাদা, তোমাদের ফ্যাসান্ তোমরাই জানো। কখনও দেখি পাঞ্জাবীর ঝুল সেমিজের মত হচ্ছে, আবার কখনও দেখি ফতুয়ায় দাঁড়াচ্ছে।

হারাধন—কিন্তু এই কাপড়টা—এত করে কোঁচালুম, তবু যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে।

সুলতা—কেন কাপড় কোঁচান খারাপ হলে কি শালীর বাড়ী ঢুক্‌তে না পাবার আশঙ্কা আছে না কি ?

হারাধন—আরে তা' নয়, তা' নয়—একটু 'ডিসেন্ট' দেখায় এই আর কি।

সুলতা—শুধু জামা-কাপড়ের বেলা 'ডিসেন্ট' হলে তো হবে না—'ডিসেন্ট' হতে গেলে তোমার ঐ গোঁফ্‌টারও একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হয়।

হারাধন—কেন বল্ দেখি, গোঁফ্‌টা কি বড্ড বড় দেখাচ্ছে না কি ? তা' হলে উপায় ? ইস্, এদিকে সময়ও নেই! ট্রেণের টাইম যে হয়ে এলো। একটু আগে বল্‌তে পারিস নি—এত তাড়াতাড়ি কি আর গোঁফ্ ছাঁটাই করে ট্রেণ ধর্‌তে পার্‌বো ? যা' থাকে কপালে—তা' বলে তো আর এই গোঁফ্ নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুনো যায় না।

[কাঁচি লইয়া গোঁফ্ ছাঁটিতে বসিল]

সুলতা—তুমি নিজে ছাঁট্‌তে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ঐ মণি দা' আস্‌ছে, ওকে দাও।

[মণির প্রবেশ]

হারাধন—এই মণি, দে তো ভাই গোঁফ্‌টা একটু মানানসই করে ছেঁটে। জল্‌দি দিতে হবে কিন্তু। আমার ট্রেণের টাইম হয়ে আস্‌ছে।

মণি—তোমার ও গোঁফ্ কোদাল দিয়ে কোপাতে হবে হারু দা', কাঁচির কর্ম্ম নয়।

হারাধন—তুই ভারী ফাজিল হয়েছিস। ইয়ারকী রেখে দে দেখি চট্ করে ছেঁটে।

মণি—এক কাজ করি না হারু দা', তোমার ঐ

গোঁফের দু' ধারটা একটু কামিয়ে দিয়ে মধ্যিখানটা ছোট করে ছেঁটে দি'।

হারাধন—তা' যা' ভাল হয় কর্ বাপু। ট্রেণের টাইমটা—

[মণি ক্ষুর দিয়া গোঁফের দু' ধার কামাইতে গিয়া ছোট বড় করিয়া ফেলিল]

হারাধন—আরে, এ যে ছোট বড় করে ফেল্‌লি। ভাল ফ্যাসাদে পড়লাম যা' হোক্! দে দে, এদিকটা আর একটু টেনে দে।

[মণির তথাকরণ]

হারাধন—আরে, এ যে একেবারে 'হিট্‌লার' বানিয়ে দিলি—এ্যা!

মণি—তবে এক কাজ করা যাক হারু দা'। গোঁফ্‌ ছাঁটাই যখন তোমার পছন্দই হচ্ছে না, তখন ওটা একেবারে নাবিয়েই দি'। ল্যাটা চুকে যাক্!

[হারাধন হতভম্ব হইয়া]—একেবারে নাবিয়ে দিবি, তাই না হয় দে।

[মণির তথাকরণ]

হারাধন—যাক্, এ একরকম যাত্রাদলের সখী সাজা গেল মন্দ নয়! যাই, এখন ট্রেণটা পেলে হয়।

[প্রস্থান]

[পথ। হারাধন হন্‌হন্ করিয়া চলিতেছে। ট্রেণের আওয়াজ যতই নিকটে আসিতেছে, ততই সে জোরে চলিতেছে। মাঝে মাঝে ছুটও দিতেছে।]

প্রথম ব্যক্তি—আরে হারাধন যে—

[হারাধন পথ চলিতে চলিতে]—হ্যাঁ ভাই।

প্রথম ব্যক্তি—এলেই বা কবে, আর এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছই বা কোথায়?

[হারাধন ব্যস্ততাসহকারে]—আস্‌ছি ভাই, আস্‌ছি, বড্ড তাড়া।

[ক্ষণেক পরে আর একজনের সহিত দেখা]

দ্বিতীয় ব্যক্তি—কে যায়, হারু না?

[হারাধন উত্তর দিল না। পথ চলিতে লাগিল।]

(স্বগতঃ)—যতো চেনা লোক কি সব এই সময়েই দেখা কর্‌তে বেরিয়েছে!

[তাড়াতাড়িতে হারাধন একজনের ঘাড়ে গিয়া পড়িল]

ব্যক্তি—আরে মশায়, ঘাড়ে পড়েন যে—

[হারাধন পথ চলিতে চলিতে]—কি করবো মশায়, ট্রেণের টাইম—

ব্যক্তি—তা' বলে ধাক্কা কি দিয়ে যাবেন না কি?

[ষ্টেশন। টিকিট-ঘর ভীড়ে ভীড়। গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে—ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে। হারাধন কোনরকমে একখানা টিকিট করিয়া যখন প্ল্যাট্‌ফর্মে পৌঁছিল, তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। সে চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। যে কামরায় উঠিল, সেটি মেয়েদের। সেটায় একজন তরুণী ছাড়া অপর কেহ ছিল না।]

তরুণী—কে মশায় আপনি?

হারাধন—আজ্ঞে, আমি কোলকাতায় যাচ্ছি।

তরুণী—কোলকাতায় যাচ্ছেন বলে কি মাথা কিনেছেন না কি! দেখ্‌ছেন না, এটা মেয়েদের গাড়ী।

হারাধন—তা' কি করবো বলুন, তাড়াতাড়িতে হয়ে গেছে।

তরুণী—ও কি, আপনি যে দিব্যি বসে পড়্‌লেন দেখ্‌ছি!

হারাধন—আপনার কি অভিপ্রায়, আমি চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণটা খোয়াই।

তরুণী—নেমে যান্ বল্‌ছি শীগ্‌গির।

হারাধন—আপাততঃ সে ইচ্ছা নেই।

তরুণী—জানেন ব্যাটাছেলে এ গাড়ীতে উঠ্‌লে কি হয়?

হারাধন—আমার তা' জান্‌বার দরকার নেই।

তরুণী—দেবো তবে চেন্‌টা টেনে—মজা দেখ্‌বেন?

হারাধন—আজ্ঞে, দোহাই আপনার, অমন কাজটি

করবেন না! সত্যি বল্‌ছি—আমার কোন খারাপ মতলব নেই। বলেন তো আমি না হয় আপনার দিকে পেছন ফিরেই বসে থাকি।

তরুণী—কোলকাতায় কোথায় যাচ্ছেন শুনি?

হারাধন—আজ্ঞে, আমার পিস্‌তুতো শালীর বাড়ী।

তরুণী—আপনার পিস্‌তুতো শালীকে আপনি চিন্‌তে পারেন, তা' বলে তো সবাই চিন্‌বে না। বলি, শালী থাকেন কোথায়? ঠিকানাটা কি?

[হারাধন পকেট হইতে একটা কাগজে লেখা ঠিকানা বাহির করিল। তরুণী তাহা পড়িয়া ভয়ে 'কাঠ' হইয়া গেল।]

তরুণী—এ্যাঁঃ, আপনি তা' হলে আমায় 'ফলো' কর্‌ছেন বলুন! এ যে আমারই বাড়ীর ঠিকানা। বলি, ব্যাগে ওটা কি—ছোরা না কি? [ক্রন্দনের সুরে] দোহাই মশায়, আমার কাছে কিছু নেই। এই যে চুড়ি আর মফ্‌চেন দেখ্‌ছেন এ সব গিল্টি করা—মনে করবেন না যেন, এগুলো সোনার। [অনুনয়ের সুরে] আপনি গাড়ী থেকে নেমে যান দয়া করে। আমার বড্ড জল পিপাসা পেয়েছে।

হারাধন—আপনি এ সব কি বল্‌ছেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! ঐ ঠিকানার দোতলার 'ফ্ল্যাটে' আমার ভায়রা-ভাই ডাক্তার অনিমেষবাবু থাকেন।

[তরুণী আশ্বস্ত হইয়া]—ও, অনিমেষবাবুর কাছে যাচ্ছেন আপনি! তাই বলুন। আমি ভাব্‌লাম বুঝি—

হারাধন—চোর কিম্বা ছাঁচোড়, এই তো?

তরুণী—না না, আপনি কিছু মনে করবেন না—আমি বড্ড ভয় পেয়ে গেছ্‌লাম কি না। কিন্তু এখন কি উপায়—আপনি এই গাড়ীতে উঠেছেন যদি কেউ দেখে ফেলে?

হারাধন—তাই তো, এটা তো আমার মাথায় ঢোকে নি! তা' হলে এখন কি করি?

তরুণী—আপনি না হয় আমার একখানা শাড়ী পরুন। পরে কোনরকমে ষ্টেশনটা পার হয়ে একখানা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ুন।

হারাধন—তাই না হয় করা গেল, কিন্তু শাড়ী পরে আমি সটান অনিমেষবাবুর ওখানে উঠিই বা কি করে? ওঁরাই বা কি মনে কর্‌বেন?

তরুণী—তা' হলে এক কাজ করুন। অনিমেষবাবুর 'ফ্ল্যাটে' যাবার সিঁড়ির তলাটা বেশ নিরিবিলি আছে। সেইখানেই না হয় বেশ পরিবর্ত্তন করে নিয়ে তবে ওপরে উঠ্‌বেন।

হারাধন—অগত্যা তাই কর্‌তে হবে। এখন আপনার শাড়ী একখানা তো দিন্।

[ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। নারীবেশে হারাধন কোনরকমে ভীড় ঠেলিয়া একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিল। গাড়ী তাহাকে লইয়া অনিমেষবাবুর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে তরুণীর কথামত বেশ পরিবর্ত্তনও হইল। উপর হইতে কিন্তু অনিমেষবাবুর দরোয়ান তাহা দেখিয়া ফেলিল।]

[হারাধন উপরে উঠিয়া]—এই, অনিমেষবাবু হ্যায়?

দরোয়ান—কাহেকো?

হারাধন—হামলোক্‌কা প্রয়োজন হ্যায়।

দরোয়ান—কুচ্ রাহাজানিকা মতলব বা?

হারাধন—কাহে এ্যায়সা সন্দেহ কর্‌তা হ্যায়। পথ ছোড়ো।

দারোয়ান—কেয়া, ভিতর ঘুসে গা?

হারাধন—আলবৎ!

দরোয়ান—আলবৎ?

হারাধন—অনিমেষবাবু হামকো ভায়রা-ভাই লাগ্‌তা হ্যায়।

দরোয়ান—ডাকু! আবি তোম আওরাৎ থা, মরদ বন্ গিয়া—ফিন্ বোল্‌তা হ্যায় ভিতর যায়েগা।

[দুইজনে ধস্তাধস্তি চলিতেছে, এমন সময় অনিমেষবাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

অনিমেষ—কেয়া হুয়া খট্টমল্ সিং?

দরোয়ান—আরে বাবু, দেখিয়ে তো ডাকুকা কারখানা!

আবি আওবৎ হোকে টিক্সিসে উতাবা—নীচুমে কাপড়া বদলকে মবদ বন্ গিয়া—হাম খোদ দেখা। ফিন্ উপর আঁকে বোল্‌তা হ্যায় ভিতব ঘুসে গা—

অনিমেষ—কে মশায় আপনি—কা'কে চান ?

হাবাধন—দাদা, আমায় চিন্‌তে পারছেন না ?

অনিমেষ—আপনি লোক সুবিধে বলে তো মনে হচ্ছে না মশায়। শুনছি না কি মেয়েমানুষ সেজে ট্যাক্সি ক'বে এলেন। তারপর বেশ পরিবর্ত্তন কর্‌লেন। আবার দাদা সম্বন্ধও পাতালেন। এখন সোজা ভেতরে যেতে চান। বলি, মতলবখানা কি—দলে ক'জন আছেন ?

হারাধন—সে কি দাদা, অনিমা দিদি যে আমায় আস্‌তে লিখেছেন। এই দেখুন না তাঁব চিঠি।

[পত্র প্রদান]

[অনিমার প্রবেশ]

অনিমা—ও গো, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এ যে আমাদেব হাবাধন—ছোট মামাব জামাই—সেদিন বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে এলে, মনে নেই ?

অনিমেষ—তাই না কি ! কি বিপদ ! আবে, তখন তো তোমার বেশ পালোয়ানী গোঁফ্ ছিল দেখেছিলাম—তাই তো একদম চিন্‌তে পাবি নি তোমায়। কি মুস্কিল ! আবে খট্টমল্ সিং।

দবোয়ান—হুজৌব !

অনিমেষ—যা' বাবা যা'—এ জামাইবাবু হ্যায়। বাজারসে আচ্ছি দেখ্‌কে মিঠাই—

দরোয়ান—আরে, এ তো ভারী জোর তামাসা বা ! সেলাম জামাইবাবু, সেলাম।

[প্রস্থান]

হাবাধন—আব বাবা সেলাম—উঃ, বদ্দাব কি চোট্টরে বাবা !

অনিমা—এসো ভাই এসো, কিছু মনে কবো না। যেমন মনিব—তার তেমনি দবোয়ান।

হারাধন—আজ্ঞে, দাদাব আব কি দোষ বলুন। সেই কবে বিয়েব বাত্রে একদিন দেখেছিলেন বই তো নয়; তা' ছাড়া, গোঁফ্‌টা—

অনিমেষ—না হয় কামিয়েছ, কিন্তু মেয়েমানুষ সেজে ট্যাক্সি থেকে নাম্‌লে কেন শুনি ? এব মানে তো আমি কিছুই বুঝ্‌লাম না।

হাবাধন—সে অনেক কথা দাদা। আমাব হয়রানীব ইতিহাস শুনলে একটা বায়স্কোপেব গল্প শোনাব কাজ হবে। সে তখন পরে শুনবেন 'খন। এখন এক কাপ্ চা না পেলে আব নড়্‌তে পারছি নি আমি।

অনিমা—তুমি ভেতবে এস ভাই, আমি চা কবে দিচ্ছি। ও গো, এখন থাক্ থাক্, কথা পবে হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
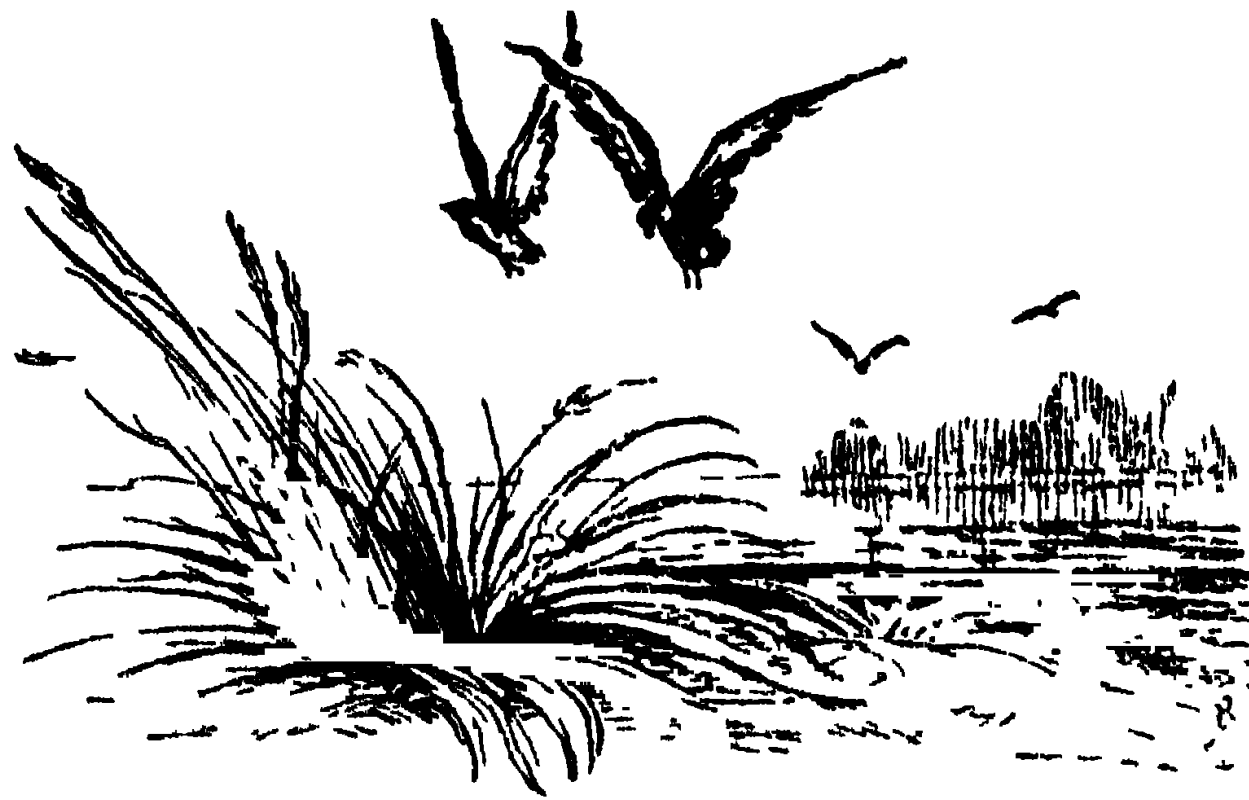
আগুনের দয়া

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

স্বামী রোগশয্যায়, পদতলে বসিয়া শীর্ণা কঙ্কালসার সেবানিরতা স্ত্রী। চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্য, অনশন ও মৃত্যুর করালগ্রাসের প্রতিচ্ছবি—সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া গৃহস্বামী নরেন্দ্রনাথ, নরকের পথ প্রদর্শক, পাপের প্রতিমূর্ত্তি।

চেড়ী-বেষ্টিতা সীতার সম্মুখে রাক্ষসরাজ দশানন। রাম স্বয়ং ভগবান, সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বনের বানরও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু এখন! উদ্ধার হইতে হইবে নারীকে নিজ বলে, আত্মশক্তিতে—ভগবান আসিবেন কি? বানর আসিয়াছিল, মানুষ আজ সাহায্য করিবে কি?

এমনই হয়। মধু ভটচায গ্রামের মোড়ল, বয়সে প্রবীণ। সন্ধ্যায় পাশার মজলিসে বসিয়া কথা তুলিল, "আজ স্বচক্ষে দেখে এলাম হে ছুঁড়ীটার কাণ্ড! কি দিনকালই পড়েছে আজকাল—স্বামী শুয়্‌ছে, আর তুই মাগী কি না ঐ নরেন ছোঁড়াটার সঙ্গে বসে মস্‌করা কর্‌ছিস! হরি হে, কালে কালে কতই দেখাবে!"

যদু চাটুয্যে বলিল, "আর বলো না ভটচায, বলো না। ছোঁড়াটা এক নম্বরের বখাটে—তার উপর বাপের জমিদারী ও বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে এখন ত ধরাকে সরা দেখে। আর ছুঁড়ীটারও রকম সকম ভাল নয়।"

"রকম সকম বলছ কি চাটুর্য্যে" বলিয়া হুঁকায় টান দিয়া দত্তজা বলিল, "সোণাগাছিতে নাম লেখাতেই যা' বাকী। পাড়ায় এসে পাড়াটারও বদ্‌নাম করে গেল, দূর করে দিতে হয় অমন বদ্‌জাতকে।"

ভটচায হাসিয়া বলিল, "যার বাড়ী, তারই যখন নেক্‌ নজরে পড়েছে, তুমি তাকে বাড়ী হতে দূর করবার কে হে বাপু?

হাসিয়া ঘোষজা বলিল, "শুন্‌ছি না কি পাঁচ মাসের বাড়ী ভাড়াও বাকী, আমি হলে তুলে দিতাম।"

"বুড়ো হয়েছ, তাই ও কথা বলছ ঘোষজা, কিন্তু বিশ বছর আগের কথাটা মনে ভাব দেখি। সেই নিস্তারিণীর কথা—দু' বছর ত ভাড়া দেয় নি, তাকে তুলেছিলে? আমরা আজকের নই হে। বলিয়া চাটুর্য্যে শেষটান দিয়া হুঁকাটী রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

গ্রামের প্রবীণ নেতা, মনস্তত্ব যে তাঁহাদের এই-রূপই! প্রাণের সাড়ার এইখানেই পরিসমাপ্তি। পশু সাহায্য করিয়াছিল ত্রেতাযুগে—আজ মানুষ—এই মানুষ, এই প্রবীণ জ্ঞানের দাবীকর্ত্তার দল উপহাস করে, কুৎসা রটনা করে, সাহায্য করে না।

নিজ কুৎসা ঢাকিবার জন্যই কি লোকে পর কুৎসায় আনন্দ পায়।

দুই

নরেন্দ্রনাথ বলিল, "শোন নীহার, আমাকে দেখে তুমি ভয় পাও কেন জানি না—আমি মানুষ। আমার দ্বারা তোমার এ বিপদে যতটুকু সাহায্য হওয়া সম্ভব তা' আমি করব। ভাড়া চাই না—চাই শুধু তোমাকে—চাই তোমার একটু সহানুভূতি।

স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে স্ত্রী নীহারবালা ধীরস্বরে উত্তর করিল, "আমার সহানুভূতিতে আপনার কোনই উপকার দেখি না। আপনার সঙ্গে আমার ভাড়ার সম্পর্ক মাত্র। ভাড়া দিতে পারি না বলে আমি লজ্জিতা, কবে পারব তাও জানি না। যে কাল রোগ ধরেছে এঁর, তা'তে—তা'তে—

নীহারের মুখে আর কথা ফুটিল না, ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া চোখ দিয়া জল ঝরিয়া স্বামীর পদধৌত করিতে লাগিল। নতমস্তকে নীহার কাঁদিতে লাগিল।

"কাঁদবার কারণ নেই নীহার। আমি জানি তোমার স্বামীর যক্ষ্মারোগ হয়েছে। উনি বাঁচবেন না—আজ হোক্, কাল হোক্ ওঁর যন্ত্রণা সব শেষ হবে। তখন—তখন তোমার নিজের কথা কি ভেবে দেখেছ একবার ?"

"বল্‌বেন না—পায়ে পড়ি আপনার, বল্‌বেন না ও কথা। আমি জানি, তবুও শুন্‌তে চাই না—বাঁচতেও ত পারেন, ভগবান কি এতই কঠোর !"

"ভগবান! কোথায় ভগবান নীহার? ভগবান এখন অর্থবলের কাছে মাথা নত করেছেন, টাকাই এখন ভগবান। আমার খরচায় তুমি চিকিৎসা করাও নীহার—কিন্তু তাও শুন্‌লে না কখনও। চিকিৎসার দরকার ছিল।"

"চিকিৎসা! অর্থহীনা বিপন্না চিকিৎসা করে আজ রিক্তহস্তা, ভিখারিণী হয়েছে। চিকিৎসা করবার আর ত শক্তি নাই আমার। দৈনিক দু' পয়সার দুধের দামও যে দিতে পারি না আমি—ওঃ!"

মুখে কাপড় দিয়া নীহার বুকফাটা চীৎকার রোধ করিল। চোখের বন্যায় সে কাপড় ভিজাইয়া দিল।

"কেঁদ না নীহার, বিনয়বাবু এখন একটু ঘুমুচ্ছেন, কাশটাও কম আছে, জাগ্‌লেই আবার কাশ্‌তে আরম্ভ করবেন, যন্ত্রণা বাড়বে।" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া নীহারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল—লোলুপ দৃষ্টিতে নীহারের রূপসুধা পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর চাঁদ—পূর্ণিমার সে গৌরবোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য কোথায়! কিন্তু সে নারী—উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ নারীকেই দেখিতে লাগিল।

নীহার কাঁদিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

ত্বরিতে আত্মসংবরণ করিয়া হাত ঠেলিয়া দিয়া নীহার বলিল, "আপনার এতবড় সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি নরেনবাবু। সান্ত্বনা দেবার জন্য আপনাকে এখানে কেউ আসতে বলে নি, উপদেশ, অনুকম্পাও আপনার চাই না আমি। এই মুহূর্ত্তে এ ঘর থেকে চলে যান না—হলে গ্রামের লোকদের, প্রধান নেতাদের কাছে আপনাকে অপমানিত করব আমি।"

নরেন্দ্রনাথ হাসিল। নীহারের নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "গ্রামের প্রবীণরা কি করবে আমার নীহার! সকলেই আমার জমীদারীতে বাস করে—তা' ছাড়া, আমাদের সম্বন্ধে তারা কি বলে জান?"

"যাই বলুক, আমার তা' শোন্‌বার কোন দরকার নেই। আপনি এখান থেকে যান—এখনই—এই মুহূর্ত্তেই।"

"আচ্ছা যাচ্ছি, রাগ করো না তুমি। সময়ে তোমাকে আমার করবই—তখন দেখ্‌ব এ তেজ কোথায় থাকে নীহার। উপস্থিত কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি রেখে দিও, রুগীর কাজে লাগ্‌বে।" বলিয়া কয়েকখানা নোট ফেলিয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেল।

তিন

গ্রামের লোকেরা নীহার নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কি বলে তাহা না জানিলেও আজ তাহার ঘৃণিত ইঙ্গিতের আভাষ পাইয়া নীহারের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। যাইবার সময় নরেন্দ্রনাথ কি বলিল, কি করিল, সে সংজ্ঞাও যেন তাহার ছিল না। হঠাৎ চমকিত হইয়া দেখিল সে নাই। মেঝের উপর চাহিতেই কয়েকখানি নোট পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সভয়ে সে স্বামীর পদতলে গিয়া বসিল।

মাত্র কয়েকখানি নোট—কিন্তু কি জ্বালা জ্বালিল উহারা এখন ঐ শোকাতুরার প্রাণে! নীহারের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে পৃথিবী অদৃশ্য হইতে লাগিল, পাপের বৃশ্চিক রাজ্য হইতে সহস্র পদে ঐ টাকাগুলা নীহারের স্পর্শ লালসায় যেন অগ্রসর হইতেছিল—কি কলঙ্ক কালিমাময় সে দৃশ্য!

নীহার শিহরিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া নোটগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে গেল—শিথিল পদ, অবসন্ন দেহ তাহা করিতে দিল না—নীহার সশব্দে মেঝের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

পতন শব্দে নিদ্রিত বিনয়বাবু জাগিলেন। মেঝের

উপর স্ত্রীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কোনরূপে বিছানায় উঠিয়া বসিতেই নোটগুলির উপর দৃষ্টি পড়ায় স্তম্ভিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্য করিবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য স্ত্রীর নিকট তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; তাহার চরিত্রের কথাও তিনি জানিতেন।

বিনয়বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। এ অর্থ নিশ্চয়ই নরেন্দ্রের। নীহার আজ এ টাকা লইল কেন? পূর্ব্বে যাহা সে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আজ সে তাহাই বরণ করিয়া লইল? "নীহার, নীহার, কি কর্‌লে, আজ কি কর্‌লে!" বলিতে বলিতে তিনি তক্তাপোষ হইতে টলিয়া পড়িয়া গেলেন।

বক্ষে আঘাত লাগিয়া মুখ দিয়া হঠাৎ এক ঝলক রক্ত বাহির হইল—কাশি আসিল—কাশির পর পুনরায় রক্ত-বমনে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া তিনি মেঝের উপর পড়িয়া রহিলেন।

নীহার সুস্থ হইতেছিল। স্বামীর শেষের কথাগুলি তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল—কিন্তু তখনও সে উঠিতে পারে নাই। পতনের শব্দে তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল। নীহার ক্ষিপ্তার মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর মাথা আপনার কোলে টানিয়া লইল।

বিনয়বাবু একবার চাহিলেন, উদাস-ভগ্ন-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে একবার দেখিলেন—একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার জীর্ণ পঞ্জরাস্থি ভেদ করিয়া বহিয়া গেল। ক্ষীণস্বরে তিনি শুধু বলিলেন, "হতভাগিনী, কাঞ্চন মূল্যে কাঁচ কিন্‌লি!"

আবার রক্তবমন হইল—একটা অস্ফুট শব্দ, একটা কাতর আর্ত্তনাদ—ক্ষীণ বাহুবলে স্ত্রীর গলবেষ্টন করিবার শেষ আকিঞ্চন, শেষ শক্তিতে শেষ সম্ভাষণের মর্ম্মস্পর্শী শোকাকুলতা শতধারে নয়ন-পথে ছুটিয়া আসিল—জীবনের জীবনী-শক্তি গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িল। স্থির নয়ন, উদাস দৃষ্টি, অপলক আঁখিপল্লব—স্থির হইল, ম্লান হইল, আর ত পলক পড়িল না।

নীহার কাঁদিয়া উঠিল, "কোথায় তুমি, কোথায়—ও গো কোথায়!

* * *

সব শেষ! সব শেষ!

মৃত ও জীবিতের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিয়তির অদৃশ্য ভাগ্য-লেখকের কঠোর সত্য, নির্ম্মম ভবিতব্যতাও বুঝি করুণার নয়নজলে কাতরতার বুকে সাগরের সৃষ্টি করিল।

মৃত ও জীবিত—অতীত ও বর্ত্তমান, ব্যবধান শুধু একটা হাহাকার-ভরা শূন্য হৃদয়।

মৃতের লাশ লইয়া যাইতে যক্ষ্মারোগীর ঘরে মানুষ আসিয়া দয়া করে নাই। মানুষ তাহারা, মরিতে যাইবে কেন? অক্ষয় অমর হইবে তাহারা, পরনিন্দায় আপন কুৎসার মুখ বন্ধ করিয়া। মানুষ তাহারা, আসিবে কেন? আসিয়াছিল কেবল সেবা-সঙ্ঘের অকর্ম্মণ্য পঙ্গপালের দল—নীহারের ব্যথা তাহাদের প্রাণ কাঁদাইয়াছিল—কিন্তু তাহাদের প্রাণ—তাহারা ভিখারী, তাহাদের আবার প্রাণ কোথায়? ধনী নয়—পর-প্রত্যাশী ভিক্ষু।

চার

নীহার আজ একাকিনী। ঐ সেই ভাঙ্গা তক্তাপোষ-খানি, ঐ সেই জীর্ণ ছিন্ন অপরিষ্কার শয্যা। তাহারই উপর স্বামীর বস্ত্রাদি সজ্জিত করিয়া ফুল দিয়া সে সাজাইয়াছে। তাহারই নিকট ধূপ দীপ জ্বালিয়া বিধবা নীহার বসিয়া। সেই জীর্ণ পুরাতন আলোকহীন ঘর—সেই শীর্ণা শোকক্লিষ্টা মণিহারা নারী।

অন্ধকার ঘরে সন্ধ্যার সময় কখন নরেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, নীহার তাহা জানিতে পারে নাই। অন্তিম সময় স্বামী যে সন্দেহ লইয়া গিয়াছেন, নীহার সারা জীবনব্যাপী তাহারই প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিয়াছিল—নীহারের আত্মা তখন স্বামীর সহিত পর-পারে। জড় শরীর; মেদ-মজ্জা, অস্থি-মাংসের একটা আংশিক নীহারই তখন পৃথিবীতে বসিয়াছিল।

কিন্তু বাসনা ও লালসা চায় ইহারই অধিকার।

নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া নীহারের হস্তধারণ করিয়া তাহার নিকটে বসিল। নীহার এতক্ষণ তাহাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে নাই—এবার হঠাৎ সে যেন স্বর্গরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল। ক্ষণিকের জন্য নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে নীহার বলিল, "পারবেন আপনি?"

নরেন্দ্রনাথ এতটা আশা করে নাই। নীহারের এই সদয় ব্যবহারে আনন্দোচ্ছ্বাসে সে বলিল, "নিশ্চয় পারব। বলো নীহার, কি করতে হবে আমাকে? তোমার জন্য কি না পারি আমি! বলো, বলো তুমি আমার আশা অপূর্ণ রাখবে না?"

পূর্ব্বেরই মত মৃদুহাস্যে নীহার বলিল, "বলুন পারবেন কি না?"

"কি বলো?"

"ঐ চেষ্টারখামাতে আপনার সেদিনকার নোট সবই আছে; ভিখারিণী আমি, যা' ছিল আমার তার সবই খরচ করে স্বামীর কাজ শেষ করেছি—ঐ নোট আপনি নিয়ে যান এবার।"

"নোট। ও নোট তোমায় দিয়েছি, ওতে আমার কোনই দরকার নেই, আরও দরকার হয় দেব—যা' চাইবে সবই দেব তোমায় নীহার।"

হাসিয়া নীহার বলিল, "এত দয়া আপনার, সবই দেবেন? বেশ কথা।" এই বলিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বিছানার নীচ হইতে ক্ষিপ্রহস্তে একখানা ছোরা বাহির করিয়া সে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "নরেনবাবু, আপনার নোট নিয়ে হয় এখনি এ ঘর ত্যাগ করুন, না হয় আপনার বুকে এ ছোরাখানা আমূল বসাবার একটু জায়গা দিন।"

অল্প আলোকেও ছোরাখানা ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ভয়ে দূরে সরিয়া গেল।

পুরুষ যে, কাপুরুষতা তার কেন? কাপুরুষ বোধ হয় পুরুষ নয়—মানুষও নয়।

নীহার এতক্ষণ অসীম আত্মশক্তিতে আত্মসংবরণ করিয়াছিল, আর পারিল না; তাহার হাত পা কাঁপিয়া উঠিল; ঝন্‌ঝন্ শব্দে ছোরাখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল। টলিতে টলিতে নীহার সেখানা কুড়াইতে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত নরেন্দ্রনাথ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল; ছোরাখানা পা দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল।

এই সেই ঘর, যে ঘরে আজ তিনদিন পূর্ব্বে একটি জীবন-দীপ চিরকালের জন্য নিবিয়াছে, যেখানে নীহারের হৃদয় ভাঙ্গিয়া স্বামীর শেষ নিশ্বাস পড়িয়াছে, হয় ত সে নিশ্বাসের একটু বাতাস এখনও ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যায় নাই—সেই ঘরেই, স্বামীর সেই স্ত্রীকেই আজ স্পর্শ করিয়াছে এক লালসা-পীড়িত উচ্ছৃঙ্খলতা—মানব দেহে পুরুষ মূর্ত্তি লইয়া মানবের মানবত্বে কলঙ্ক রেখা টানিতে। দেবতার স্থানে শয়তান চাহে বাহুবলে আত্মপূজার প্রতিষ্ঠা করিতে।

দেবতা লুকাইয়াছে—বাহিরে নাই—হৃদয়ে আসন পাতিয়াছে—এ অন্তর-দেবতার শক্তি কত?

ক্ষুধিত, পিপাসিত হিংস্র পশুর করাল আক্রমণে হরিণীর প্রাণই যায়—প্রাণ যাইবার জন্যই পাইয়াছিল সে—কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা, কাম-পীড়িত পাশবিকতার নিগ্রহে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের হাতে প্রাণ ত যায় না—যাহা যাইবার নহে, তাহাই যায়।

নীহারের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছিল। দানবের হাতে শীর্ণা নারীর অবসন্ন শরীর মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল। নীহার একবার আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করিল, মৃত স্বামীর চিন্তায় নয়নে জলরাশি ভরিয়া গেল।

জনক-দুহিতা রাজ-নন্দিনী সীতার অন্তরে রাম, বাহিরেও রাম সদলে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিখারিণী নীহারের সে বল কোথায়? বাহিরে ত তাহার রাম আর নাই—হৃদয়-মন্দিরের দ্বারে সে রামের, সে দেবতার পায়ে নীহার কাঁদিয়া পড়িল, "ও গো, তুমি এস, দেবতা এস!"

অকস্মাৎ নীহারের হস্ত সেই বিক্ষিপ্ত ছোরাখানার উপর পড়িল। অল্প আলোকে, বিজয়ের পূর্ণ আনন্দে নরেন্দ্রনাথ তাহা লক্ষ্য করে নাই। নীহার অসীম শক্তিতে ছোরাখানা টানিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া নরেন্দ্রের বক্ষে তাহা সজোরে বসাইয়া দিল। বিকট চীৎকারে নরেন্দ্রনাথ দূরে পড়িয়া গেল। ক্ষিপ্তের মত নীহার দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্ষণিকের জন্য অর্দ্ধমৃত যুবকের শোণিত-ধারা-রঞ্জিত বক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরমুহূর্ত্তে নিজ হস্তের উপর দৃষ্টি পড়িতেই চীৎকার করিয়া ছোরাখানা ফেলিয়া দিল—কাঁপিতে কাঁপিতে সে স্বামীর শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল—জগতের জ্ঞান তাহার নিমেষেই লোপ হইয়া গেল।

ধূপ ধূনার গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিতেছিল। স্তিমিত দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—নীহারের শোক লাঘব করিতেই বোধ হয় তাহার বসনাঞ্চলের একপ্রান্তে অগ্নিদেব আপন স্পর্শে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া উজ্জ্বলালোকে ঘরখানিকেও বিরাট আলোকে আলোকিত করিয়া দিলেন।

রাম আসিয়া পুষ্পক-রথে তাঁহার সীতাকে লইয়া স্বর্গরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

স্বামী কি দেবতা? দেবতাই কি স্বামী?

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

ভাইফোঁটা

রমা দেবী

অনেক দূর—সেই যোধপুর। কোথায় কোলকাতা, আর কোথায় যোধপুর। মায়ের বড় ইচ্ছা ছিল কোলকাতাতে কিংবা তারই আশপাশে সুনীলার বিয়ে দেওয়া। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্য; তাই শত চেষ্টায়ও সুনীলাকে কাছে রাখ্‌তে পারা গেল না। মা চোখের জল মুছে, মেয়েকে নিষ্ফল সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আঁচলে মুখ ঢাকলেন।

সুনীলার সংসারে কেউই নেই। স্বামী বিকাশ মুখোপাধ্যায় যোধপুরে চাকরী করে; সেই জন্যই সুনীলাকে আসতে হ'ল এতদূরে। বিকাশের একটী বোন্ রেখা, তারও বিয়ে হ'য়ে গেছে বছর দুই আগে। সেও আর আসে না। আসবেই বা কা'র কাছে; সংসারে শুধু দাদা একা। বিকাশ প্রায়ই রেখার বাড়ী যায়; তাই বিয়ে হবার পর থেকে তার বাপের বাড়ী আসার পাঠ উঠে গেছে।

অনেক দিন পরে রেখা বাপের বাড়ী এসেছে। তারই সমবয়সী সুনীলা; অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'জনের ভাব হয়ে গেল খুব বেশী। সুনীলাও রেখাকে কাছে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কিছুদিন পরে রেখা শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। তার সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী; সে না হ'লে সংসার চলে কি করে। সুনীলাও চলে এল বাপের বাড়ী।

নতুন বিয়ে; তার উপর একলার সংসার। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রশ্নের উপর প্রশ্নে সুনীলা অস্থির হ'য়ে উঠল। মাসখানেক পরেই সে চলে গেল, আবার সেই সুদূর যোধপুরে।

সুনীলাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে একটী বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে সুনীলার বেশ ভাব হয়ে গেল। আদর করে সে সুনীলাকে ডাকত, দিদি, সুনীলা তাকে বল্‌ত ঠান্ দি'।

দিন কেটে যায়। বিকাশ অফিস গেলে প্রায় সারা দিনটাই ঠান্ দি' সুনীলাদের বাড়ী বসে বসে গল্প করে; চারটে বাজলেই বলে, "চল্‌লুম দিদি, এখুনি উনি আস্‌বেন।"

সুনীলা হেসে বলে, "আসুন, কিন্তু কালও আসবেন, ভুলে যাবেন না যেন। এই দূর প্রবাসে আপনিই শুধু—"

বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দু'টী সজল হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায় কোলকাতার কথা—এতক্ষণে হয় ত মণ্টু আর দেবী জামা কাপড় পরে মাঠে খেল্‌ছে—দাদারা কলেজ থেকে ফিরেছে—মুকুল হয় ত তাই তাড়াতাড়ি চা করছে—আরও কত কি। ঠান্ দি'র অত চোখ নেই, তাই সুনীলার মনের অবস্থা বুঝতে পারে না। হেসে বলে, "সে আমার সৌভাগ্য দিদি। কিসে যে তোমার আমায় এত ভাল লাগে তা' জানি না, সে হয় ত তোমার নিজের চোখের গুণ।"

ঠান্ দি' চলে গেলে সুনীলা চুল বাঁধতে বসে। পাঁচটায় বিকাশ বাড়ী আসে। সুনীলা গা ধুয়ে, চা করে নিয়ে যায় স্বামীর ঘরে। বিকাশ জুতো খুলতে খুলতে বলে, "আজ ঠান্ দি'র সঙ্গে কি গল্প হ'ল ?"

সুনীলা বলে, "কি আবার, যা' রোজই হয়—এই সাংসারিক কথা, 'আজকে কি রান্না হলো' ?"

সুনীলার কথায় বিকাশ হেসে ফেলে। বলে, "ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন, দেখেছ ত ?"

"জানো, ঠান্ দি' বলেছেন যে, আমায় রান্না শেখাবেন; যত রকম যা' শিখ্‌তে চাইব, তাই।"

চায়ে ছোট্ট একটী চুমুক দিয়ে বিকাশ বলে, "বেশ ত, শেখো—চপ্, কাটলেট, মাংস, ডেবিল।"

তার কথায় বাধা দিয়ে সুনীলা বলে ওঠে, "না, আমি আগে শিখ্‌ব কি জান?"

"না বল্‌লে কি করে জান্‌ব বলো?"

"আমি আগে শিখ্‌ব, পোলাও, পায়েস, সন্দেশ—"

"কেন, তুমি কি বৈষ্ণবী না কি?"

সুনীলার চোখ দু'টী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; আনন্দের আতিশয্য ঝরে পড়ে। বলে, "জানো না? সাম্‌নেই যে ভাইফোঁটা—ভাইফোঁটার দিন কি ভায়েদের আমিষ খাওয়াতে আছে? সেদিন যে ভায়েরা দেবতা হয়—তাদের ভোগ দিতে হয় নিরামিষ।"

ভ্রাতৃ-মিলনের আনন্দ তাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

বুধবার ভাইফোঁটা। আজ বৃহস্পতিবার। সুনীলা চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল। কি লিখবে—আনন্দে তার হাত কাঁপতে লাগ্‌ল। সে লিখ্‌লে—

পরম পূজনীয়া—

মা,

বুধবার ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। দাদা, ছোড়্‌-দা', মণ্টু, দেবী ও মুকুলকে পাঠিয়ে দেবেন। দেবী মুকুল যদি আসতে না পারে ত দাদাদের ঠিক পাঠিয়ে দেবেন। মা, এই দূর দেশ থেকে ডাক্‌ছি—নিরাশ কর্‌বেন না।

আপনি আমার প্রণাম নেবেন; দাদাদের জানাবেন। মুকুল, দেবী ও মণ্টুকে স্নেহাশীস্ দেবেন। ইতি,

প্রণতা

সুনীলা

বার দুই পড়ে সুনীলা লাল খামে চিঠিটা মুড়লে। আর ছ' দিন পরেই তার দাদারা আসবে, এই সুদূর যোধপুরে। সে চিঠি হাতে নিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, বুধবার কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না; বৃহস্পতিবার রাত্রের ট্রেণে পাঠিয়ে দেব। দাদাদের খাইয়ে সমস্ত দিনটাই যোধপুরের এখান ওখানে ঘুরে বেড়াব। খামটা রেখে আর একটা কাগজ নিয়ে সে লিখ্‌তে বস্‌ল তার পিসতুত ভাইকে—

প্রণব দা',

বুধবার ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। তুমি আমার ভাই। দূর প্রবাসে পড়ে আছি বলে ঐ দিন নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতে পারবে না। এস, আসা চাই-ই। প্রণাম নিও। ইতি,

প্রণতা

সুনীলা

খাম দুটো হাতে করে সে ডাক্‌লে, মঙ্গলা।

"কি বল্‌ছেন?"

"এই খাম দুটো 'লেটার বক্সে' ফেলে দিও ত।"

"আচ্ছা, আগে চায়ের কেটলীটা ধুয়ে রাখি।"

"না না, আগে তুমি ফেলে এসো; 'লেটার বক্স' জানো ত? আবার অন্য কোথাও ফেলে দিও না যেন।"

"না গো না, অত বোকা আর নই।"

মঙ্গলা হেসে চলে গেল।

এই ক'টা দিন যেন আর কাটতে চায় না। এই ছ'টা দিন যেন ছ'টা বছর। কী ভীষণ দীর্ঘ এর এক-একটী মুহূর্ত্ত! সুনীলার অস্থিরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিকাশ হাসে। বলে, "কি কি রান্না হবে?"

সুনীলার চোখ মুখে আনন্দের ছটা। উচ্ছ্বাসের আবেগে সে বিকাশের গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, "তুমি বলো।"

বিকাশ তাহার আনন্দোদ্ভাসিত সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানির দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে। বলে, "কি কি শিখেছ?"

"পোলাও, পায়েস, আর আলুর চপের কালিয়া।"

বিকাশ হোহো করে হেসে ওঠে, "কি, আলুর চপের কালিয়া! সে আবার কি? আলুর চপই ত শুনেছি।"

সুনীলা বলে, "ওই ত, জানো না ত! একটা নতুন জিনিষ। পৃথিবীতে বোধ হয় শুধু ঠান্ দি' জানেন, আর আমি জানি। দাদারা কখনও খায় নি; বুধবার করব।"

তার মুখখানা মাধুর্য্যে ভরে ওঠে।

বিকাশ বলে, "আমায় খাওয়াবে না?"

"খাওয়াব।"

"কবে? ভাইফোঁটার দিন?"

"তোমায় কাল করে দেব, এখন যাই।"

"কোথায়?"

"আমার কাজ নেই বুঝি?" বলেই সে চলে যায়। যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে বলে, "সেদিন ছানার ডালনা করব; ছোড়্ দা' বড় ভালবাসে।"

বিকাশ তার গমন-ভঙ্গীর দিকে চেয়ে থাকে। সে ভাবে, এই দূর প্রবাসে কতখানি অস্থিরতা, কতখানি আকুলতা নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েরা চলে আসে নিজেদের স্নেহভরা স্থান ছেড়ে। কী অসাধারণ এদের ক্ষমতা নিজেদের সংযত রাখবার! কী অপূর্ব্ব শক্তি ভগবান দেন এদের পরকে নিয়ে শৈশবের স্মৃতি ভুল্‌তে! সুনীলার আকুলতা, আগ্রহ, মিলনানন্দ বিকাশের মনে আর একটী উদ্‌গ্রীব মুখের কথা জাগিয়ে দিয়ে যায়—সেও ত তার জন্যে এমনিই অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। আগের ভাইফোঁটায় সে রেখার কাছে যেতে পারে নি। উঃ, কত কষ্টে, কত দুঃখেই না সে চিঠিখানা লিখেছিল, দাদা এর মধ্যেই কি ভুলে গেলে! আরও কত কি। পিতৃমাতৃহারা বোন্‌টীকে সেই ত লালন-পালন করেছে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার চোখ জলে ভরে যায়। আপন-মনেই সে বলে ওঠে, "না, এবার ছুটী দিক্ আর নাই দিক্, রেখার বাড়ী যেতেই হবে!"

বিকাশ ডাকে, "নীল!"

"কি?"

"তোমার দাদাদের সঙ্গে বোধ হয় আমার দেখা হবে না।"

"কেন?"

"তুমি জানো না? আমাকে ফোঁটা দেবার কি কেউ নেই?

আহত কণ্ঠে সুনীলা বলে ওঠে, "ছি, ও কি কথা! যাবে বই কি—ঠাকুর-ঝি কত আশা করে তোমায় চিঠি লিখেছে, আর তুমি যাবে না—তা' কি হতে পারে? নাই বা দেখা হলো দাদাদের সঙ্গে।"

বোনের অস্থিরতা বোনের বুঝ্‌তে বাকী থাকে না; সুনীলা তাই এত সহজেই রাজি হয়ে যায়। রেখার কথা তার মনে পড়ে। সুনীলা বলে, "কখন যাবে?"

ভাবে, সেও ত তার মতই তাঁর দাদার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"আজই রাত্রের ট্রেণে।"

"আজই।"

"হ্যাঁ, তা' হলে কাল সকাল সাতটার সময়েই পৌঁছে যাব।"

"কবে আস্‌বে?"

"কালই আস্‌ব, দশটা সাড়ে দশটায়। দাদারা এলে বলো যে, সেও ফোঁটা নিতে গেছে—কেমন?"

বিকাশ হাসে।

"বেশ, তাই হবে।"

বিকাশ চলে যায় রেখার বাড়ী।

রাতটা কোনরকমে কাট্‌লে হয়। সুনীলা ভাবে, কাল বেলা এগারটা পর্য্যন্ত লগ্ন আছে; নিজে রেঁধে আর লগ্নের ভেতর দাদাদের খাওয়াতে পারবে না—খুব পারবে। ভোর চারটার সময় রাঁধতে আরম্ভ করলেই হয়ে যাবে।

পায়েস নামিয়ে সুনীলা পোলাও চড়ালে। সাম্‌নে ঝরে-পড়া সিক্ত চুলের রাশ পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়ে সে চন্দন ঘস্‌তে বস্‌ল। চুয়া, চন্দন, মালা সে ঠিক্ করে গুছিয়ে রাখ্‌ছে, এমন সময় কানে এল, "চিঠ্‌টি হ্যায়।"

সুনীলা চম্‌কে উঠ্‌ল। ছুটে গিয়ে খামখানা নিলে। এ কি, এ যে ছোড়্‌দার হাতের লেখা! তবে কি তারা এল না। সুনীলার চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়্‌ল। চোখ মুছে খামখানা সে ছিঁড়ে ফেল্‌লে—

স্নেহের নীল,

যোধপুরে তোমার ওখানে যাবার আমাদের সকলেরই একান্ত ইচ্ছে ছিল; কিন্তু হলো না—দাদা অফিসে ছুটি পেলে না বলে। আমার শনিবার থেকে জ্বর হয়েছে; তাই আমিও যেতে পারলুম না। তুমি দুঃখ করো না। তোমার খুব কষ্ট হবে জানি; কিন্তু কি করব বলো—

নিরুপায়। ভাল হয়ে গেলেই তোমার ওখানে একদিন নিশ্চয়ই যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি,

ছোড় দা'

ছোট চিঠিখানা সুনীলার বুক মোচড় দিয়ে ভেঙে দিলে; তার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল; মাথা ঘুরে উঠ্‌ল; সে লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। অস্ফুট স্বরে বলে উঠ্‌ল—"উ!"

"নীলা।"

সুনীল উঠে পড়ে চোখ মুছে দেখে প্রণব দা'। এভাবে তাকে শুয়ে থাক্‌তে দেখে প্রণব জিগ্যেস করলে, "শুয়ে কেন রে, অসুখ করেছে না কি?"

"না কিছু হয় নি; এমনি শুয়ে আছি। তুমি ভাল আছ ত? পিসীমা, আর বৌদি' সব ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিশ্চয়ই ভাল আছি, না হলে এখানে এসেছি।"

"মায়ের কাছে গেছলে? ছোড় দা' কেমন আছে?"

প্রণব বলে, "আমি ওখানে গেছলুম। অশোকের শনিবার থেকে জ্বর হয়েছে। অলকও ছুটি পেলে না—তাই কেউ আসতে পারলে না।"

সুনীলের চোখ ছাপিয়ে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল; অনেক কষ্টে সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে, "মণ্টু, দেবীকে আন্‌লে না কেন?"

"ওরা আসতে চাইলে না।"

সুনীলা আর কি কর্‌বে? বলে, "তুমি বসো।"

ও ঘরে গিয়ে সুনীলা তিন ভায়ের উদ্দেশে দেয়ালের গায়ে ফোঁটা দিলে। তার মুখের ওপর বিষাদের ছায়া নেমে এল। চোখ অশ্রুতে পূর্ণ; ফোঁটা দিতে হাত কেঁপে উঠ্‌ল। কোথায় দাদাদের সুন্দর প্রশস্ত ললাটে চুয়া চন্দনের ফোঁটা দেবে, গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে পায়ের ধূলো নেবে, না এ কি! শেষে দেয়ালের গায়—চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে পড়্‌ল সাম্‌নে রাখা চুয়ার বাটীতে। কি যেন অমঙ্গল আশঙ্কায় তার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে দাদাদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাকলে, "এস প্রণব দা'।"

প্রণব তার সঙ্গে গেল।

ঘরে চারখানা আসন পাতা। চারখানি আসনের সাম্‌নে চারখানি মিষ্টির থালা। তিনখানি মিষ্টির থালার ওপর তিনটী ফুল। যে থালাটায় ফুল নেই, সেই থালাটা দেখিয়ে সুনীলা বলে, "এইটেতে বসো তুমি।"

অন্য থালাগুলোর দিকে চেয়ে প্রণব বলে, "ওগুলো বুঝি অলকদের জন্যে সাজিয়েছিলি?"

কলাপাতার মোড়াকটা খুলে মালাটা বার করতে করতে সুনীলা ব্যথিত কণ্ঠে বলে ওঠে, "হ্যাঁ।"

প্রণবের গলায় মালা এবং চুয়া চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গলায় কাপড় জড়িয়ে সে প্রণাম করে। প্রণব হেসে পা গুটিয়ে নেয়। বলে, "থাক্ থাক্, এত ভক্তি তোর কবে থেকে হলরে?"

ক্ষীণ হাসি টেনে সুনীলা বলে, "আজকে পায়ের ধুলো দিতে হয়, জানো না। আজ ভায়েরা হয় দেবতা, আর বোনেরা হয় পূজারিণী।" তারপর মিষ্টির থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "খাও।"

প্রণব থালাটার দিকে চেয়ে বলে, "এত কে খাবে?"

সুনীলা অশ্রুভরা চোখে বলে, "কেউ ত এলো না, তুমিও খাবে না!"

তার ব্যথিত কণ্ঠ প্রণবের বুকে গিয়ে বাজে। বলে, "বড্ড দুঃখ হচ্ছে, নয়রে? ভায়েরা না এলে বোনেদের যে এত দুঃখ হয়, তা' আগে জান্‌তুম না।"

সুনীলা জোর করে হেসে বলে, "না এলে আবার কি, তুমি ত এসেছ। তুমি তৃপ্তি করে পেটভরে খাও, তা' হলেই আমার তিন ভায়ের খাওয়া হবে।"

আর বাক্যব্যয় না করে প্রণব মিষ্টির থালাটা টেনে নিলে। সন্দেশের কোণ ভেঙে মুখে দিয়ে বলে, "বাঃ, এখানকার সন্দেশ ত বেশ!"

সুনীলা হেসে বলে, "এখানকার নয়—আমি করেছি।"

বিপুল বিস্ময়ে প্রণব বলে, "তুই! বাঃ, বেশ হয়েছে

ত! এত সুন্দর খাবার তুই কবে থেকে তৈরী করতে শিখ্‌লিরে?"

"আর দুটো দোব না কি?"

"না, আর চাই না। কে তোকে শেখালে?"

সুনীলা আঙুল দিয়ে পাশের বাড়ীটা দেখিয়ে বলে, "ঐ যে বাড়ীটা দেখ্‌ছ না, ঐ বাড়ীর একটী বৌ আমায় শিখিয়েছে। সে আমায় এত ভালবাসে আর কি বলব প্রণব দা'! ঠান্‌ দি' যদি না থাকৃত, তা' হ'লে আমি যে কি করে দিন কাটাতুম, তা' জানি না!"

প্রণব জল খেয়ে বাড়ীর এধার-ওধার ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। বাড়ীর সংলগ্ন ছোট বাগানখানি গৃহকর্ত্তার সুরুচির পরিচায়ক। সাদা গোলাপে-ভরা গাছটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে প্রণব ফুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সুনীলা দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছিল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তার প্রণব দা'কে! আনমনা-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে প্রণব দা'। দীর্ঘ ললাটের ওপর চন্দনের ফোঁটা, তা'তে পড়েছে সূর্য্যের কিরণ। কী উন্নত সবল তার দেহ! যেন স্বর্গের দেবতা নেমে এসেছে মর্ত্তে পূজো নিতে!

"বারে, ঘুরে বেড়াচ্ছ যে, খেতে হবে না বুঝি? সাড়ে দশটা যে বেজে গেছে; এগারটা পর্য্যন্ত লগ্ন। চলো, স্নান কর্‌বে।"

"চল্‌। হ্যাঁরে, বাগানটা কে এমন করে সাজিয়েছে? তা'কে 'ফ্যাসনেব্‌ল্‌' বল্‌তে হবে।"

প্রণব খেতে বসেছে, সুনীলার দেওয়া কাপড় পরে। সুনীলা বলে, "জান প্রণব দা', সবই আমি নিজে রেঁধেছি। ভায়েদের পরের হাতের রান্না খাওয়াতে ইচ্ছে করে না।"

প্রণব বলে, "সত্যি, খুব সুন্দর রান্না হয়েছে! কবে এতবড় রাঁধুনী হলিরে? যেন সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্টু! এমন কি রেঁধেছি যে, দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করছ?"

"সত্যি, বেশ ভাল হয়েছে! তুই খাবি না?"

"খাব, তুমি খেয়ে নাও।"

খাওয়া শেষ করে পান চিবোতে চিবোতে প্রণব বলে, "এখানটা তোর কেমন লাগ্‌ছে; অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ত?"

"না, আলাপ বিশেষ হয় নি; ঐ যা' ঠান্‌ দি'র সঙ্গেই ভাব হয়েছে।"

প্রণব বলে, "খুব বেড়াস্‌ ত?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই যাই। তবে জানো ত, মুকুল ছাড়া আমি কোথাও একলা যাই নি। তার জন্যে মনটা মধ্যে মধ্যে বড্ডই খারাপ হয়ে যায়।"

প্রণব বলে, "বিকাশ কখন আস্‌বে?"

"তার আসতে দেরী হবে—রাত দশটা সাড়ে দশটা। তুমি এখন একটু ঘুমুবে?"

"না।"

গল্প করতে করতে বেলা পড়ে যায়। প্রণব হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলে, "আর না, উঠি—চারটে বাজে।"

সুনীলা ও ঘর থেকে একটী ছোট পুঁটলী এনে প্রণবের হাতে দেয়। বলে, "এটা মাকে দিও।"

"কি আছে ওতে?"

"দাদাদের কাপড় আর মিষ্টি।"

"চিঠি লিখ্‌লি না?"

"কাপড়ের ভেতর আছে। মাকে বলো, ওর ভেতর চিঠি আছে।"

"আর কিছু বল্‌তে হবে?"

"না, সব চিঠিতেই লেখা আছে। ছোড় দা' কেমন থাকে, একটু শীগ্‌গির উত্তর দিতে বলো—বুঝ্‌লে।"

"আচ্ছা, তা' হলে চল্‌লুম।"

"এস।"

প্রণব রাস্তায় পা বাড়িয়ে বলে, "বিকাশের সঙ্গে দেখা হলো না। তাকে আমার কথা বলিস।"

প্রণব চলে।

সুনীলার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে। দাদারা কেউ এলো না। যাক্, তবু প্রণব দা' আসায় সে কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়েছে। তবু যেন তার মন আজ ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে। কোন কাজে মন বস্‌ছে না। ঠান্ দি'ও নেই। কাদের বাড়ী গেছে। বাড়ীতে সে একা। তার আন্তরিক ইচ্ছায় বাধা পড়েছে, তাই মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। চুল বাঁধা হয় নি। জান্‌লার ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে একান্ত অন্যমনস্কের মত। জলভরা চোখ দুটো শূন্য মাঠের ওপর নিবদ্ধ। সে ভাবছে, এত দূরে যদি তার বিয়ে না হ'ত, তবে ত চিঠি পেয়ে নিজেই দাদাদের কপালে ফোঁটা দিয়ে আস্‌তে পার্‌ত—এমন করে দেওয়ালের গায়ে ফোঁটা দিতে হতো না। শ্রান্ত দেহটা টেনে নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কার স্নেহকরস্পর্শে সে জেগে উঠ্‌ল। ধীর-শান্ত-কণ্ঠে বিকাশ ডাক্‌লে, "নীল, অসুখ করেছে?"

"না ত—তুমি কখন এলে?"

"এইমাত্র। অশোক দা' এসেছিলেন, কখন গেলেন?"

সুনীলা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলে, "তারা আসে নি।"

"আসে নি! মন্টু, প্রণব দা'?"

"মন্টু আসে নি, শুধু প্রণব দা' এসেছিল। দাদা ছুটী পায় নি, আর ছোড় দা'র—"

সুনীলা আর বল্‌তে পার্‌লে না; তার দু' চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল বিকাশের হাতের ওপর।

বিকাশ সুনীলাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, "কাঁদছ? ছিঃ, কেঁদো না! আজকের দিনে কেঁদে ভায়েদের অকল্যাণ করো না নীল!"

বিকাশের বুকে মুখ লুকিয়ে সুনীলা কাঁদতে আরম্ভ কর্‌লে। বিকাশ তাকে সান্ত্বনা দেবার একটী কথাও খুঁজে পেলে না। সে তখন ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌ল।

বিকাশের মনে হলো, এই ত খানিকক্ষণ আগে সে রেখাদের বাড়ী ছিল। উঃ, রেখার কি আনন্দ! তাকে কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে, কি করবে, কিছুই ঠিক্ করতে পারছিল না। চোখ মুখ হতে তার আনন্দ ছিটকে বেরুচ্ছিল। আর আগের বছর এই দিন রেখা এমনি করেই দিন কাটিয়েছিল। সে ধীরে ধীরে উঠে আলমারী খুলে, একখানি চিঠি সুনীলার হাতে দিয়ে বল্লে, "পড়ো।"

সুনীলা চোখ মুছে, চিঠিটা পড়্‌তে লাগ্‌ল—

পূজনীয় দাদা,

"তুমি এলে না, এ দুঃখ রাখ্‌বার জায়গা পৃথিবীতে নেই। দাদা, এই ত শ্রাবণ মাসে বিয়ে দিলে, এরই মধ্যে আমায় ভুলে গেলে! দাদা, আমার সাধ আশা সবই যে তুমি! বাবা মাকে হারিয়ে তোমাকে নিয়েই যে ছিলুম! তুমি ছুটী পাও নি। অফিসের বড়বাবু কী নিষ্ঠুর! আজকে ভাই-বোনের মধুর মিলনের দিনে কি না ছুটী দিলে না! দাদা, আমি তোমার কাছ থেকে এখন অনেক দূরে—তা' না হলে, আমি নিজে গিয়ে তোমার কপালে ফোঁটা দিয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে আস্‌তুম। আজ আমার মত হতভাগিনী পৃথিবীতে আর কে আছে! কাপড়খানা পাঠিয়ে দিলুম, পরো। প্রণাম নিও। ইতি,

প্রণতা

রেখা

আগের বছর বিকাশ যায় নি রেখার বাড়ী, তাই সে এই চিঠি লিখেছিল। বিকাশ চিঠিখানি নষ্ট করে নি। সুনীলা পড়ল। তারই মর্ম্মের ভাষা নিয়ে রেখা ওখানা লিখেছে। তার অশ্রুর বাঁধ ভেঙে গেল।

রমা দেবী

গৃহলক্ষ্মী

শ্রীরাণী দেবী

ফাল্গুন মাস। বাসন্তী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিভাসিত নিশীথে অনেকেরই অন্তরে বসন্তের মাদকতা আনয়ন করে। নব-বিবাহিত শুভেন্দুর অন্তরটাও চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল; তরুণী পত্নীর মুখখানি মনের মাঝে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগ্‌ল।

লতিকা পুত্রের আন্‌মনা-ভাব লক্ষ্য ক'রে গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলে প্রকাশ্যে বল্লেন, "একটা কথা শুন্‌বি শুভু? তুই একবার তোর শ্বশুরকে গিয়ে বল্‌ যে, বৌমাকে দু'-চারদিনের জন্য যেন আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেন; আমি বেশীদিন রাখ্‌ব না।"

শুভেন্দুর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে, "মা, তোমার সব কথা আমি রাখ্‌ব, শুধু এই কথাটি আমি রাখ্‌তে পারব না। যারা আমার মাকে অপমান করে, তাদের বাড়ী আমি কিছুতেই যেতে পার্‌ব না।"

লতিকার মুখ পুত্রগর্ব্বে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। পরক্ষণেই বিমর্ষ হ'য়ে বল্লেন, "আজ উনি বেঁচে থাক্‌লে কি অনাথ বোস্ এতবড় অপমান আমাদের কর্ত্তে পার্ত্ত!...সে যাক্, যা হ'য়ে গিয়েছে, তার ত আর চারা নেই। কিন্তু, সেই ছেলেমানুষ বৌটা তার বাবার দুর্ব্বুদ্ধির ফলভোগ কর্ব্বে এও ত ঠিক্ নয় শুভু। তা' ছাড়া, তাকে ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে বিয়ে ক'রে হেনস্থা করা ত উচিত নয়।"

শুভেন্দু বল্লে, "কিন্তু, আমিও ত সে জন্য দায়ী নই। তোমাকে ছেড়ে আমি ঘর-জামাই হ'য়ে থাকতে পার্ব্ব না মা।"

দুই

লতিকা নিজে পুত্রকে সুশিক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামী দিব্যেন্দু বিদেশে অর্থ উপার্জ্জনে রত ছিলেন। দেশে বড় একটা আস্‌তেন না। স্ত্রী-পুত্র বাড়ীতে রেখেছিলেন বৃদ্ধা জননীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য। বৎসরে দু'-একবার ছুটী উপলক্ষে দেশে এসে দশ-বারদিন থেকে আবার কর্ম্মস্থলে চ'লে যেতেন। স্ত্রীকে কোনদিন নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান্ নি—বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে। এমনি করেই তাঁর প্রথম যৌবনের মধুময় দিনগুলি অতীত হয়। দিব্যেন্দুর প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়; কিন্তু, পুত্রের শিক্ষার জন্য তখনও স্ত্রীকে কার্য্যস্থানে নিয়ে যাওয়া ঘটে ওঠে নি। তারপর বিদেশেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

লতিকা কখনও দীর্ঘকাল একসঙ্গে স্বামীর সাথে বাস করেন নি; কাজেই স্বামী সম্বন্ধে তাঁর মনের মাঝে চিরদিন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল। তাই শুভেন্দুর শ্বশুর অনাথবাবু যখন অতি সামান্য কারণ উপলক্ষ্য ক'রে কন্যা-জামাতার মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছিলেন, তখন পুত্রবধূর কমনীয় মুখখানি স্মরণ ক'রে শুধু মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর মনের দোলায় দোল পড়ে নাই।

তথাপি পুত্রের অন্তরের গোপন বেদনা লক্ষ্য ক'রে তিনি আত্মগতই বল্লেন, শুভুর মনটা হয় ত খুবই খারাপ হয়েছে; কিন্তু, এদিকে যে আবার একগুঁয়েমীও আছে। দেখি, যদি বুঝিয়ে কিছু কর্ত্তে পারি।..

তিন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হ'তে সংসারে কত বড় ঘটনার সৃষ্টি হয়, তা' মানুষে সহজে বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

লতিকাও পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারেন নি যে, তুচ্ছ একছড়া

মুক্তার মালা উপলক্ষ্য ক'রে এতবড় একটা 'ট্র্যাজেডি'র সৃষ্টি হবে।

বধূ বরণ ক'রে লতিকা একছড়া মূল্যবান মুক্তার হার তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "বৌমা, এই মালাছড়া আমার শাশুড়ী আমাকে দিয়েছিলেন। তুমি যত্ন ক'রে রেখে দিয়ো—তোমার বৌ এলে আবার তাকে দিয়ো—আজ ক' পুরুষ ধরে এমনি ধারাই চলে আস্‌ছে।"

বধূ শাশুড়ীকে প্রণাম করে মধুর কণ্ঠে বল্লে, "রাখ্‌ব বই কি মা, আমি খুব যত্ন করেই এটা রাখ্‌ব।"

লতিকা খুসী হ'য়ে বধূর চিবুক চুম্বন ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লেন, "বেঁচে থাকো, রাজরাণী হও!"

সেইদিনই বিকেলবেলা লতিকা পুত্রবধূর কণ্ঠদেশ বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্লেন, "এ কি বৌমা, মুক্তার মালাটা খুলে রেখেছ যে?"

বধূর কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই তার দাসী উত্তর দিলে, "খুল্‌বে না ত কি! ভারি ত একছড়া মালা! দিদিমণির অমন আট-দশ ছড়া মুক্তোর হার পড়ে রয়েছে।"

লতিকার হাসিমুখ মলিন হ'য়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন, "বৌমা, তোমার বাবা খুবই বড় লোক স্বীকার কচ্ছি; কিন্তু, তাই বলে শ্বশুর-বাড়ীর জিনিষকে অবহেলা করাও মেয়েমানুষের উচিত নয়। তোমার শ্বশুরও নেহাৎ গরীব ছিলেন না। ঐ মালটার দামও সাত-আটশ' টাকার কম হবে না।"

বধূ অপরাধীর মত কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই দাসীটা বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "তখন অত করে সাবধান কর্‌লে বলেই ত মনে হলো—কি জানি এর দাম কত হাজার টাকাই না হবে—তবু ভাল যে সাত শ' টাকা! তা' দিদিমণির একছড়া হীরের নেক্‌লেস আছে—যার দাম পাঁচ হাজার টাকা।"

লতিকা শুদ্ধ বিস্ময়ে এতক্ষণ দাসীর মুখের প্রতি তাকিয়ে ছিলেন। তাকে নীরব হতে দেখে মনের ভাব গোপন কর্‌বার বৃথা চেষ্টা না করে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লেন, "বৌমা, তোমার ঝিকে বিদেয় করে দাও; তোমার বাবাকে যা' বল্‌তে হয়, শুভু গিয়ে বল্‌বে 'খন।"

চার

অনাথবাবু কয়েক বৎসর হ'ল দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন। সুন্দরী তরুণী পত্নীর কথায় তিনি ওঠেন বসেন। পূর্ব্বোক্ত ঝিটা তাঁর পত্নীর অতি আদরের। কাজেই সে এসে যখন ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করে অনাথবাবুর কাছে প্রকাশ কর্‌লে, তখন কন্যার শ্বশুর-কুলের প্রতি শুধু ক্রোধ প্রকাশ করা ছাড়া তাঁর আর অন্য উপায় রইল না।

পত্নী প্রভা বল্লেন, "এমন দজ্জাল শাশুড়ী যে, বিয়ের কনেকে দশ কথা শুনিয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক করেছে—সঙ্গের ঝিটাকে পর্য্যন্ত গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিয়েছে—ওখানে মেয়ে রাখ্‌লে ত দু' দিনেই সে মরে যাবে—তুমি জামাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানেই রাখ্‌বার চেষ্টা কর।"

শুভেন্দু শ্বশুরালয়ে আসার পরদিনই অনাথবাবু তাকে বল্লেন, "তোমার যদি বিলেত যেতে ইচ্ছে থাকে, তবে আমি খরচ দিয়ে তোমাকে পাঠাব। আজকাল এদেশে থেকে মানুষ হবার আর কোনো আশা নেই।"

শুভেন্দুর বিলেত যাওয়ার প্রলোভন বরাবরই ছিল—শুধু অর্থাভাবেই সে আশা সফল হয় নি; এখন শ্বশুরের কথা শুনে সে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে বল্লে, "তা' হলে কথাটা মাকে একবার জিগ্‌গেস কর্ত্তে হবে। তাঁর বোধ হয় আপত্তি হবে না—তবু আগে তাঁকে জানানো আমার কর্ত্তব্য।"

অনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন, "সে তুমি যা' ভাল মনে কর কর্‌বে। তবে একটা কথা বলে রাখছি—তুমি বিলেত গেলে ইলা এখানেই থাক্‌বে। পরে তুমি ফিরে এসে কোলকাতায় আলাদা বাড়ীভাড়া করে তাকে সেখানে নিয়ে যেও।

শুভেন্দু বল্লে, "মা বুড়ো হয়েছেন, সংসারের কাজকর্ম্ম সব একা করে উঠতে পারেন না—এ অবস্থায় আমার স্ত্রীকে কোনমতে এখানে রাখ্‌তে পারি না।"

অনাথবাবু মনের বিরক্তি গোপন কর্ত্তে না পেরে বল্লেন, "শুন্‌লাম বেয়ান-ঠাকরুণ একটু—কি বলে—

বদরাগী। ইলার কারও কাছে রূঢ় কথা শোনা অভ্যাস নেই। এতে—"

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বল্লে, "আমার মা বদরাগী এ কথা আপনি শুন্‌লেন কোথায়? আপনার মেয়েকে তিনি নিজের কন্যারই মত স্নেহ করেন।"

অনাথবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "তুমি তা' হলে ভেতরের কথা কিছুই জানো না। বেয়ান ঠাকুরুণ ইলাকে কতগুলো শক্ত কথা শুনিয়েছেন; ঝিটাকে যা' তা' বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেটা কি ভাল কাজ হয়েছে তুমি বল্‌তে চাও?"

শুভেন্দু মনের বিরক্তি গোপন করে শান্তভাবে বল্লে, "আমি মায়ের কাছে সব কথা শুনেছি। ঝিটার সত্যই অন্যায় হয়েছে—সে কেন অনর্থক গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্ত্তে গেল? মা ছোটলোকের, বিশেষতঃ ঝি-চাকরের বেয়াদবী একেবারে সহ্য কর্‌তে পারেন না।"

অনাথবাবু জামাতার কথায় রুষ্ট হয়ে উঠলেন। উগ্রস্বরে বল্লেন, "থাক্, ও সব কথায় আর কাজ নেই। আমি যা' বল্‌ছি, সব দিকে বিবেচনা করেই বল্‌ছি। ইলা তোমার মায়ের সাথে ঝগড়া কর্ত্তে পারবে না সেখানে গিয়ে। সে এখানেই থাক্‌বে—বরং বেয়ান-ঠাকুরুণের ইচ্ছে হলে এখানে মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যেতে পারেন। তারপর তুমি বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে ইলাকে নিয়ে যেয়ো।"

শ্বশুরের কথা শুনে শুভেন্দুর সর্ব্বাঙ্গ রাগে রিরি করে জ্বলে উঠ্‌লো। বটে, তার মা ঝগড়াটে বলে তোমরা মেয়ে পাঠাবে না, আর মাকে পরিত্যাগ করে সে শ্বশুরের অন্নদাস হয়ে পড়ে থাক্‌বে।—জীবন থাকতে এমন কাজ কখনও সে কর্ব্বে না।...শুভেন্দু দৃঢ়স্বরে বল্লে, "আপনার টাকায় আমি বিলেত যাব না, ক্ষমতা থাকে নিজের টাকায় যাব। আর—"

তার কথার মাঝখানে অনাথবাবু গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন। বল্লেন, "ক্ষমতা কত সে ত বুঝতে পার্চ্ছি! বলি, এদিকে ত খুব তেজ আছে—বিলেত যাওয়ার খরচ কত জানো? কত টাকা তোমার জমীদারীতে আয় হয় যে, যার জন্য লম্বা লম্বা বুলি আওড়াচ্ছ? রাগ কর আর যাই কর, আমার মেয়েকে সেখানে আমি পাঠাব না। তবে যদি তোমার মাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, তা' হ'লে বরং—"

শুভেন্দু শান্তভাবে বল্লে, "আমার মায়ের কাশীবাসের ব্যবস্থা আমিই কর্ব্ব—সেজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এখন কথা হচ্ছে—আপনি আমার স্ত্রীকে পাঠাবেন কি না? আমি আর একমুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌ব না।"

অনাথবাবু হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, "না, আমার মেয়ে আমি পাঠাব না। তোমার মত ছোটলোক—"

শুভেন্দু আর অপেক্ষা না করে দ্রুতপদে বাইরে এসে রাস্তায় নেমে পড়ল। একবারও আর পেছন ফিরে চাইলে না।

অনাথবাবু শুভেন্দুর গমন-পথের প্রতি তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বল্লেন, "বাঁদরে কি মুক্তোর কদর বোঝে। কোথায় পরের পয়সায় বিলেত থেকে পাশ করে এসে দশ-জনের একজন হয়ে বসবি, তা' নয়—মর্, বুড়ী মাকে আগ্‌লে মর্।"

অন্দর-মহলে আসামাত্র প্রভাবতী স্বামীর উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে বল্লে, "হয়েছে কি, কার সাথে অত চেঁচামেচি কর্চ্ছিলে?"

অনাথবাবুর মেজাজ মুহূর্ত্তে নরম হলো। বল্লেন, "দেখো দেখি জামাই ছোঁড়াটার অন্যায়। তোমার কথামত সব কথা বল্লুম, তা' সে আমার কথা গ্রাহ্যই করলে না। বল্লে, আমার টাকায় সে বিলেত যাবে না—নিজের ক্ষমতা হয় যাবে। আরও বল্লে, ইলাকে সে এখনই নিয়ে যাবে। আমি বল্লুম, তাকে শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া কর্ত্তে আমি পাঠাব না। বাছাধন তাই না শুনে রাগে গরগর কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেলেন। মরুক্ গে ছাই! অমন হতভাগা জামায়ের মুখ দর্শন কর্ব্ব না।"

প্রভাবতী মুখ মচকে বল্লে, "দেখো, জামাই আবার এল বলে। রাগ করে থাকবে ক' দিন? মেয়েটা ত আর কালো কুৎসিত নয় যে, আবার একটা বিয়ে কর্ব্বে। তা' ছাড়া, মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা আছে—সেটার ওপরও ত নজর আছে।"

অনাথবাবু খুসী হয়ে বল্লেন, "তোমার খুব বুদ্ধি আছে

প্রভা, তোমার কথায় বিয়ের সময় জামাইকে টাকা না দিয়ে মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে রেখে ভালই করেছি। যে গোঁয়ার জামাই, দু'-দিনেই টাকাগুলো নষ্ট কর্ত্ত।"

পাঁচ

লতিকা পুত্রকে একা ফিরে আস্‌তে দেখে ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "তুই একা এলি যে শুভু? বৌমার অসুখ-বিসুখ করেছে না কি?"

গম্ভীরভাবে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে শুভেন্দু বল্লে, "তখনি আমি তোমাকে বলেছিলুম মা, বড় লোকেব ঘরে আমার বিয়ে দিয়ো না। তুমি ত তা' শুন্‌লে না, এখন তার ফলভোগ কর।"

লতিকা পুত্রের এ অভিযোগে কর্ণপাত না করে বল্লেন, "সে মিন্সেরই বা কি আক্কেল! আমার সম্বন্ধে বিয়ের সময় খোঁজ নিলে না কেন। আর তোরও অন্যায় হয়েছে শুভু, হাজার হোক্ গুরুজন ত—দু' কথা বল্লেও সয়ে যেতে হয়।"

শুভেন্দুর চোখ দুটো জলে উঠল। সে বল্লে, "আমাকে কিছু বল্লে চুপ করে থাকৃতুম—কিন্তু তোমার অপমান আমি কিছুতেই সইব না। আমার স্বর্গ একদিকে, আর তুমি এক দিকে!"

লতিকার চোখ সজল হয়ে উঠ্‌ল। পুত্রের মাথায় হাত রেখে স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে বল্লেন, "হ্যাঁরে, আমি আর ক' দিনই বা বাঁচব। আমার জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস্ নি। তোর শ্বশুরের কথা শোন্ গিয়ে।"

শুভেন্দু দৃঢ়স্বরে বল্লে, "তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পার্ব্ব না মা, আমাকে তুমি মাপ কর।"

—"কিন্তু বৌমাকে না জানিয়ে তুই চলে এলি কেন? সে খুব লক্ষ্মী মেয়ে; সব কথা শুন্‌লে নিজেই আস্‌তে চাইত। তুই বরং কালকে আবার যা'। বৌমাকে সব কথা বলে বুঝিয়ে সাথে করে নিয়ে আয়। মেয়ে আস্‌তে চাইলে বাপ কি আর না বল্‌বে।"

শুভেন্দু ঘাড় নেড়ে বল্লে, "তুমি যতই বলো না কেন মা, শ্বশুর-বাড়ী আমি আর যাব না। যদি তাঁরা, অর্থাৎ শ্বশুর-মশায় নিজে এসে তোমার কাছে ক্ষমা চান্, আর—". বলেই সে চুপ কর্লে।

পুত্রের অসমাপ্ত কথা লতিকা বুঝতে পার্লেন না, রাগ করে বল্লেন, "যা' খুশী কর গে বাপু। তোমাদের শ্বশুর-জামাইয়ে যুদ্ধ হবে, আর মাঝখান থেকে কচি বৌটার হবে জ্বালা। আমি আর তোকে কিছু বল্‌ব না।"

তিনি রাগ করে উঠে গেলেন।

ছয়

মাস দুই হলো প্রভাবতীর একটি পুত্র হয়েছে। পূর্ব্বে ইলার প্রতি তার একটু স্নেহের ভাব ছিল, এখন কিন্তু সে হয়েছে তার দু' চোখের বালি।

স্বামীকে সে প্রায়ই বলে, "এই যে একটা ধেড়ে মেয়ে ঘাড়ের ওপর রয়েছে, এর জন্য খরচ আছে না? বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ের সাথে আবার সম্বন্ধ কিসের?"

অনাথবাবু বলেন, "কিন্তু, জামাইটার যে রাগ পড়ে নি, সেই যে এক বছর আগে ঝগড়া করে চলে গেছে, আর এ পর্য্যন্ত এমুখো হলো না। তুমি যে বলেছিলে, টাকার লোভে আসবে—তা' কই, এল না ত?"

প্রভা বিরক্ত হয়ে বল্লে, "কবে কি বলেছি, অমনি তাই ধরে বসে আছ। ঘটে যদি তোমার বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে!"

অনাথবাবুর বাইরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, কিন্তু তরুণী পত্নীর নিকট তিনি সর্ব্বদাই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকেন। প্রভার কাছে তিরস্কৃত হয়ে ইলাকে ডেকে রুক্ষস্বরে বল্লেন, "শুভেন্দু তোকে চিঠি-পত্র কিছু দেয়?"

ইলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। অনাথবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন, "চুপ করে রইলি যে? সে নবাবের বেটা বিয়ে করে সেই যে পালালো, আর এদিকে একবারও এলো না ত। বিয়ে কর্লে বৌকে যে খেতে-পরৃতে দিতে হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত তার নেই। তুই শ্বশুর-বাড়ী যেতে চাস্?"

ইলা পিতার প্রশ্নে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পেলে। হায়,

তার কি আর শ্বশুর-বাড়ী যাবার মুখ আছে! অকারণে বাবা তার স্বামীকে অপমানিত করে বিদায় কর্ল্লেন; পাশের ঘর থেকে সব জেনে-শুনেও সে তখন প্রতীকারের কোনো পথই খুঁজে পেলে না! স্বামী, শাশুড়ী তাঁরাও রাগ করে তার আর খোঁজ-খবরও নেন্ না। তাঁদের হয় ত ধারণা—সেই মিথ্যা করে বাপের কাছে লাগিয়েছে। ছি, ছি, কী লজ্জা, কী ঘৃণা! বাবা ছোটমার পরামর্শে তার সর্ব্বনাশ করে এখন আবার তার ওপরই রাগ কর্‌ছেন।

সে বল্লে, "না, শ্বশুর-বাড়ী আমি যাব না।"

অনাথবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন, "তবে কোন্ চুলোয় যাবে—শুনি? এখানে যে লোকে আমাদের দুষ্‌ছে। বল্‌ছে, মেয়ে কেন শ্বশুর-বাড়ী যায় না! তোমার জন্য লোকের কাছে আমি অপদস্থ হতে পার্ব্ব না। ভাল জ্বালা হয়েছে আমার! যা' হয় কর বাপু, আমাকে একটু রেহাই দাও।"

ইলার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে সে বল্লে, "বেশ, আমি যাব। আপনি কালকেই আমার শ্বশুর-বাড়ীতে আমায় রেখে আস্‌বেন।"

অনাথবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লেন, "আমি যাব সেই ছোটলোকটার বাড়ী? কখনই নয়! সরকার তোমায় রেখে আস্‌বে।"

ইলা সেইদিন রাত্রেই নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে ফেল্লে। আবশ্যকীয় কয়েকখানা জামা-কাপড় এবং কয়েকটা টাকা স্যুটকেসে ভর্ত্তি করে পরদিন প্রভাতে বাড়ীর সরকার হরিচরণকে সাথে করে সে মোটরে গিয়ে উঠ্‌ল।

মোটর চল্‌তে আরম্ভ কর্ল্লে হরিচরণ বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, "এ কি মা, তোমার কাপড় গয়না নিলে না?"

ইলা ম্লান হেসে বল্লে, "আপনি ত সবই জানেন কাকা। আমি কত আনন্দে শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছি—সে ত আর আপনার বুঝ্‌তে বাকী নেই! এখন সেখানে গিয়েও যদি আশ্রয় না পাই, তা' হলে অদৃষ্টে কি আছে ভগবানই জানেন!"

সাত

লতিকা বামুন ঠাক্‌রুণকে রান্নার সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমন সময় খিড়কীর দ্বার দিয়ে একটি সুন্দরী তরুণীকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন, "কে গা তুমি? তোমায় চেনা চেনা ঠেক্‌ছে যেন!"

ইলা এগিয়ে এসে লতিকার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "আমি আপনার দাসী, একটুখানি আশ্রয় পাবার জন্য এসেছি।"

লতিকা ইলাকে স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে বল্লেন, "কে, বৌমা? তুমি দাসী হবে কেন মা, তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী! ওঠো মা, পা ছেড়ে ওঠো।"

ইলা লতিকার সাথে ঘরে ঢুকে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বল্লে, "আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না ত মা? আমার কিন্তু আর কোথাও স্থান নেই। বাবাও এখন আমাকে আর দেখ্‌তে পারেন না।"

লতিকা ইলার মুখখানি বুকে চেপে স্নেহভরা কণ্ঠে বল্লেন, "ভয় কি বৌমা, শুভু যদি অসন্তুষ্ট হয়—তবুও আমি তোমায় ছেড়ে দেব না। না হয় শাশুড়ী বৌয়ে মিলে আমরা কাশীবাস কর্ব্ব।"

ইলার মুখ সহসা বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে, "মা, তা' হলে ত এসে আমি ভাল করি নি। আমার ধারণা ছিল আপনারা আমাকে ক্ষমা করেছেন। বিশ্বাস করুন আমাকে—আমি কোন কথা বলি নি। সেই ঝিটা গিয়ে ছোটমাকে দশখানা করে লাগিয়েছিল। এর জন্য আমায় কেন এতবড় শাস্তি পেতে হলো যে, পাড়ার লোক মনে মনে খুসী হয়ে মুখে সহানুভূতি দেখাতে এসে পাঁচ কথা শোনায়। কী যাতনায় যে আমি এতদিন পুড়ে মরেছি, তা' আমার অন্তর্যামীই শুধু জানেন!"

লতিকা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্লেন, "কি কর্ব্ব মা, সবই অদৃষ্ট! শুভেন্দু সেই থেকে তোমার বাবার ওপর ভয়ানক বিরক্ত। তোমাকে আন্‌বার কথা তাকে কতবার বলেছি—সে কিন্তু নানাকথায় তা' উড়িয়ে দেয়। আর তোমারও

বৌমা অন্যায় হয়েছে—একখানা চিঠিও ত লিখ্তে পার্তে ?"

ইলা অস্ফুট কণ্ঠে বল্লে, "কি করব, পোড়া লজ্জাই যে আমায় বাধা দিত মা।"

লতিকা বল্লেন, "তুমি এসেছ শুন্লে হয় ত শুভু খুসী হবে—সে তোমাকে সত্যই ভালবাসে। তবে তোমার বাপের জেদের জন্যে—দাঁড়াও, ওকে আমি শিক্ষা দেব। খবরদার বৌমা, ছোঁড়াটার কাছে এখন দেখা দিয়ো না কিন্তু।"

আট

লতিকা বল্লেন "এতক্ষণে তোর কাজ সারা হ'লরে শুভু ? সারাদিন কোথায় রোদে রোদে ঘুরে বেড়াস বুঝ্তে পারি না—এদিকে বেলা যে একটা বাজ্তে চল্লো।"

শুভেন্দু ললাটের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছে বল্লে, "দাঁড়াও, একটা শুভ-সংবাদ আছে, বল্ছি। আগে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াতে পার ?"

লতিকা ব্যস্ত হয়ে পরিষ্কার একটা কাচের গ্লাসে করে এক গ্লাস সরবৎ এনে ছেলের হাতে দিয়ে মৃদু হাস্লেন।

শুভেন্দু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বল্লে, "হাস্লে যে মা ?"

লতিকা হাসিমুখে বল্লেন, "হ্যাঁরে, আজকের সরবতটা খেতে কি রকম লাগ্ছে বল্ ত ?"

শুভেন্দু নীরবে গ্লাসটা খালি করে মায়ের হাতে দিয়ে বল্লে, "রোজ যে সরবৎ খাই, আজও তাই খেলুম—নতুনত্ব কিছু বুঝ্তে পার্লুম না। তবে হ্যাঁ, একটা মিষ্টি গন্ধ যেন পেলুম মনে হলো।"

লতিকা সহসা বলে উঠলেন, "হ্যাঁরে, এইবার বৌ-মাকে—"

শুভেন্দুর হাসি মুখ সহসা মসী-মণ্ডিত হয়ে উঠ্‌ল। সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্লে, "কেন মা এক শ' বারই ওকথা বলো ? আমি বলেছি ত, বড়লোকের মেয়েরা গরীবের ঘরে এসে থাক্তে ভালবাসে না। তারা স্নেহ-মমতার ধার ধারে না। তারা জানে অর্থই সব। আমি অতি ক্ষুদ্র লোক—তাদের সাথে কি আর আমাদের তুলনা চলে ?"

লতিকা একটু নীরব থেকে বল্লেন, "আচ্ছা, বড়লোকের মেয়ে যদি গরীবকেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসে তা'র কাছেই থাক্তে চায়—তা' হলে তখন সেই বড়লোকের মেয়ের স্থান কোথায় বল্তে পারিস্ ?"

শুভেন্দু হেসে বল্লে, "তখন তার স্থান তোমার পায়ের তলায়।"

লতিকা রাগ ক'রে বল্লেন, "তোর সাথে ঐ জন্যেই কথা বল্তে ইচ্ছে করে না। সকল তা'তে কেবলই ঠাট্টা।"

শুভেন্দু বল্লে, "সেই জন্যই ত বল্‌ছি ও বাজে কথা ছেড়ে দাও। একটা সুখবর আছে শোনো। বাবার এক বন্ধুর কাছে শুনে এলুম—বাবার অনেক টাকার সেয়ার কেনা আছে। এবার না কি তার এক হাজার টাকার মত বোনাস পাওয়া যাবে; এরপর বোধ হয় আরও বেশী পাব। আর একটা খবর আছে মা, একটা চল্‌তি কারবার কিনব ভাব্‌ছি—কিন্তু ও টাকায় ত কুলোবে না; নইলে দু' বছরেই কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা লাভ হতো।"

লতিকা সাগ্রহে বল্লেন, "কত টাকা চাই ? আমার ত ক' হাজার টাকার গয়না আছে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠি সবই ত ফাঁকী দিয়ে নিয়েছে; শুধু গয়নাগুলো এখনো আছে।" তারপর তিনি সহসা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "ওঠ্ এখন; এ সব কথা পরে হবে। তোর গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেছে; এখন চান্ করে আয়। ভাত যে ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে গেল।"

নয়

আহারাদির পর বারান্দায় একটা জাপানী মাদুর পেতে মাতাপুত্র বস্‌লেন। লতিকা একটু হেসে বল্লেন, "একটা কথা সত্যি করে বল্‌বি শুভু ?"

শুভেন্দু প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের প্রতি তাকালো।

লতিকা বল্লেন, "তুই কি আবার বিয়ে কর্ব্বি শুভু ?"

শুভেন্দু ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইলো।

লতিকা সস্নেহে বল্লেন, "কেন, নিজে তুই এত কষ্ট পাচ্ছিস, আর তাকেও কষ্ট দিচ্ছিস ? বৌমার কি দোষ ?

মনে কর্—তার এখনকার অবস্থা!···লোকের অযাচিত সহানুভূতিতে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তা' ছাড়া, তার নিজের মা নেই, সৎমা। তার একটী ছেলে হয়েছে—এখন সে বৌমাকে আর দু' চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। তোর শ্বশুরও স্ত্রীর কথায় ওঠেন বসেন। এ অবস্থায় বৌমাকে এখানে—"

শুভেন্দু তেমনি নত মস্তকে বল্লে, "তুমি ভাব্‌ছ কেন মা, তার নামে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা আছে। সে টাকাতে একটা জীবন বেশ চ'লে যাবে।"

লতিকা রুষ্টস্বরে বলে উঠ্‌লেন, "দিনকে দিন তুই এত ছোট হচ্ছিস কেন শুভু? বৌমার কি তোর মত কঠিন প্রাণ যে, মায়া-মমতা সব ভুলে গিয়ে কেবল টাকা আঁচলে বেঁধে দিন কাটাবে? তার কি সাধ যায় না যে, সে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করে?"

শুভেন্দু একটা নিশ্বাস চেপে বল্লে, "তুমি তা' হ'লে আমায় কি কর্ত্তে বলো?"

লতিকার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন, "এই ত বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছিস। যা' বলবার আমি কাল সকালে তোকে বল্‌ব। এখন আমি একটু শোব। তুই তোর ঘরে যা'।"

শুভেন্দু মায়ের কোলে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ে বল্লে, "দিবা-নিদ্রা ভাল নয় মা। এস, একটু গল্প করি।"

লতিকা পুত্রের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন, কিসের গল্প কর্ব্বি? আচ্ছা, কাজের কথাই বলি—তোর কারবার কিন্‌তে যত টাকা লাগে, আমি দেব; কিন্তু সুদ-সমেত আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া চাই।"

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বল্লে, "ছ' সাত হাজার টাকা লাগ্‌বে, এত টাকা তুমি দিতে পার্ব্বে?"

লতিকা হাসিমুখে বল্লেন, "মা লক্ষ্মী নিজে বাড়ীতে হেঁটে এসেছিল—এ টাকা ত সামান্য—বোধ হয় আরও অনেক বেশী দিতে পারি।"

শুভেন্দু মায়ের কথা বুঝতে পার্লে না; তবে এটা বুঝ্‌লে যে, টাকার জন্য আর তাকে ভাবতে হবে না—মা নিজেই সে ব্যবস্থা কর্ব্বেন। সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসে বল্লে, "তা' হলে আমি এখনই একবার বাইরে যাব মা। সেই লোকটার সাথে কথাবার্ত্তা ঠিক করে আসি গিয়ে—নইলে আবার অন্য লোক নিয়ে নেবে।" এই বলে সে স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

দশ

শুভেন্দু যখন গৃহে ফির্‌ল, তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

লতিকা তাকে অনুযোগ কর্লেন, "ছেলের খেয়াল চাপ্‌লে আর রক্ষে নেই—তখনই সে কাজ শেষ করা চাই।"

শুভেন্দুর ক্ষিদে পেয়েছিল; কাজেই আহার-পর্ব্বটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে সে বাইরে খোলা বারান্দায় এসে একখানা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌ল।

লতিকা সেখানে এসে বল্লেন, "আবার এখানে তুই বসে পড়লি কেন? যা' নিজের ঘরে গিয়ে শো'। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে যে ছিরি হয়েছে! এখন একটু ঘুমো গে যা'।"

শুভেন্দু মিনতি করে বল্লে, "ঘরে বড় গরম। যদি ফ্যান্ থাকৃত মা, তবে বেশ হতো। তা' বাবা মারা যাবার পরই ত খরচ কমাবার জন্য ফ্যান খুলে ফেল্‌তে হলো। উঃ, এ বছর চৈত্রমাসে কী ভয়ানক গরম! না মা, আমি এখন ঘণ্টাখানেক এখানেই থাকি।"

লতিকা গম্ভীরভাবে বল্লেন, "আজকে মিস্ত্রী ডাকিয়ে তোর ঘরে ফ্যান লাগিয়েছি—কাল বৌমা এলে হয় ত তখন মনেই হতো না। নে, তুই এখন ওঠ্, আমি আর বক্‌তে পাচ্ছি না বাপু। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে।"

* * *

শুভেন্দু শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দিলে। 'সুইচ' টিপে কক্ষ আলোকিত কর্‌তেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। তার খাটে দু'জনের শয়নের উপযুক্ত বিছানা করা রয়েছে। আর···আর দেখ্‌লে দেয়ালের গা ঘেঁসে এক নারীমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তার মুখ আবৃত। শুভেন্দু কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা তার সমস্ত শরীরে দ্রুত রক্ত চলাচল আরম্ভ হলো। ক্ষিপ্রপদে

সেইদিকে অগ্রসর হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে সে বল্লে, "কে তুমি, তুমি কি ইলা? না না, সে কেন আসবে!"

ইলা তার মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে অশ্রুসিক্ত মিনতিভরা চোখ দু'টি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আমার ওপর কেন তোমার এত সন্দেহ হচ্ছে—আমি বড়লোকের মেয়ে বলে? কিন্তু, তুমি বোধ হয় জানো না যে, বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তুমি যদি আমাকে আশ্রয় না দাও, আমি তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?...আর যে আমার কেউ নেই!..."

তার চোখ দিয়ে ঝরঝর্ করে জল ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।

শুভেন্দু আদর করে স্ত্রীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন কর্ল্লে, "সে কি, তোমাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন? আমি যখন আন্‌তে চেয়েছিলাম, তখন ত আমাকে ধুলো পায়েই বিদেয় করেছিলেন। এখন বুঝি নিজের অন্যায়টা বুঝ্‌তে পেরে—"

ইলা বাধা দিয়ে বল্লে, "বাবার ওপর রাগ করো না, তিনি সবই ছোটমার কথামত করেন। ছোটমা বুঝিয়েছে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আর বাপের বাড়ীতে থাকা কেন—খরচ হয় না আমার জন্য? আমার জন্য ছোটমার দামী কাপড় গয়না কেন্‌বার উপায় নেই—আমায় না দিয়ে পর্‌লে লোকে যে নিন্দে কর্ব্বে—এম্‌নিতেই ত সবাই এসে কত রকম কথা বল্‌ত। এ সব কথা যাক্। এখন বলো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর্ল্লে ত? নইলে—" সহসা ইলা শুভেন্দুর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "আমি আর কিছু চাই নি—শুধু একটুখানি আশ্রয় আমায় দাও—নইলে তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মর্ব্ব!"

শুভেন্দু সাদরে পত্নীকে তুলে পালঙ্কে বসিয়ে তার নমনীয় একখানি হাত প্রগাঢ় স্নেহের সাথে গ্রহণ করে বল্লে, "আশ্রয় যে তুমি পূর্ব্বেই পেয়েছ ইলা, মায়ের কথার ওপর আমার কথা ত চলে না। তিনি যখন তোমাকে আদর করে কোলে স্থান দিয়েছেন, তখন আমাকে তোমার এত ভয় কেন? তুমি যদি আমার অন্তরটা দেখ্‌তে—পেতে, তা' হলে বুঝ্‌তে—তোমারএই আসার দিনটির প্রতীক্ষায় কত অলস মধ্যাহ্ন, কত সুদীর্ঘ জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী আমার চোখের জলের মাঝে আত্মগোপন করেছে। আমার বাইরের কঠোর ব্যবহারটা তোমার মনে এত ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব—কেবল এই কথাই তুমি ভাব্‌ছ। ইলা, এ বাড়ী যে তোমার! এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্রী যে তুমি! তোমাকে কে এখান থেকে চলে যেতে বল্‌বে? লক্ষ্মী, আর কেঁদো না—মুখ তোল। আমি তোমাকে কত ভালোবাসি, বুক চিরে দেখাবার হলে তা' দেখাতুম!"

তার কথা ভারী হয়ে চোখের কোণ চক্‌চক্ করে উঠ্‌ল।

ইলা অশ্রুসজল চোখে হেসে বল্লে, "তুমি নিজের কথাটাই বল্লে, কিন্তু আমার দিক্‌টা ত বিচার কর্ল্লে না? আমি বুঝি তোমাকে ভালোবাসি না?...আচ্ছা, এখন ঝগড়া থাক্। কাজের কথাই বলি আগে। কাল আমার গয়নাগুলি সব নিয়ে আস্‌ব। আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, তা' আমি সব তোমাকে দেব—তুমি তাই দিয়ে তোমার যা' ইচ্ছা হয় করো।

শুভেন্দু কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই ইলা আবার বল্লে, "না, কোন আপত্তি তোমার শুন্‌ব না। আমার অর্থে প্রয়োজন নেই—টাকা আমি চাই নি। আমার সব চেয়ে প্রয়োজন তোমাকে সুখী করা। আমি যখন তা' করতে পার্ব্ব, তখন আমার জীবন সার্থক হবে। আমার পরিচয়—বড়লোকের মেয়ে নয়। আমার পরিচয়—আমি তোমার স্ত্রী—তোমার সহধর্ম্মিনী—তোমার চরণের সেবিকা—তোমার—"

শুভেন্দু স্ত্রীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্লে, "থাক্, থাক্, খুব কথা শিখেছ যে। যাক্, তোমার কথাটা আমিই এবার শেষ করি—তুমি আমার—সখী, তুমি আমার—প্রিয়া। আমার সুখ—আমার শান্তি—আমার সব তুমি!"

ইলা মুগ্ধ কম্পিত অন্তরে স্বামীর পায়ের কাছে নত হওয়ামাত্র শুভেন্দু তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে গাঢ়কণ্ঠে বল্লে, "আমার গৃহলক্ষ্মীর স্থান পায়ে নয়—বুকে!"

তখন দু'টী প্রতীক্ষিত হৃদয় এক হয়ে মিশে গেল।

শ্রীরাণী দেবী

ভক্তের ভক্তি

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

গঙ্গাধর দোবে গঙ্গাস্নায়ী, নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী। শীত গ্রীষ্ম প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া তিনি নিজের শরীর সুস্থ রাখিয়াছেন। তাঁহার গায়ের বর্ণ উজ্জল শ্যাম; তাহার উপর প্রৌঢ়ত্বের ছাপ মুখে চোখে বেশ একটা গাম্ভীর্য্যের শান্তরেখা টানিয়া দিয়াছে। স্নান সমাপনান্তে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে আর্দ্রবস্ত্রে গৃহে ফেরাই তাঁহার দৈনন্দিন প্রথা। দোবে-ঠাকুরের এই শুদ্ধাচার এবং ভক্তি নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দুই-পরিজন জাতি ভাই তাঁহাকে মনে মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া থাকে।

শীত পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই কলিকাতায় 'ঝিন্‌ঝিনিয়া' 'খরথরিয়া' রোগের প্রাদুর্ভাব প্রবল বায়ুর মুখে খড়্‌কুটার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভয়ে লোকে জড়সড়। আতঙ্কে কাহারো দাঁতি লাগিয়া যাইতেছে—কেহ বা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সবারই মুখে এক কথা: উপায় কি হইবে!...

সেদিন প্রত্যুষে অন্যদিন অপেক্ষা অনেক বেশী ঠাণ্ডা ছিল—কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন। গঙ্গার জল যেন বরফের চাদর দিয়া ঢাকা। দোবে ঠাকুর প্রত্যেক দিনের মত সেদিনও খুব ভোরে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। সেদিনকার শীতটা তাঁহাকে অতিমাত্রায় আকুল করিয়া তুলিতেছিল। কোনমতে স্নান শেষ করিয়া গা মাথা মুছিয়া তিনি 'জয় সীতারাম' মন্ত্র জপ করিতে করিতে ক্ষিপ্রপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে একখানি কাপড় না আনিয়া কতবড় ভুল করিয়াছেন, তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁহাকে বারংবার এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। শীতের প্রকোপে তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণে পর্য্যন্ত যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সোজা দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলেন।

দিনের আলো সবেমাত্র একটু চোখ মেলিয়াছে—পথে দু'-একজন লোক চলাচল সুরু হইয়াছে। স্বাস্থ্যান্বেষী কয়েকজন প্রৌঢ় ওভার কোট, মাফ্‌লার, মোজা পরিবেষ্টিত হইয়া ছড়িহস্তে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দোবের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি কম্পিত কলেবরে জোরে জোরে সীতারামের জয়গান করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন। হঠাৎ উত্তরপথগামী দুইজন ভক্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। এই দুইটী হিন্দুস্থানী শিষ্যই যেন দোবের বেশী প্রিয়। তাঁহার তাহারা জয়গানে সহস্র কণ্ঠ। দোবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই একজন সহাস্যে বলিয়া উঠিল: রাম রাম দোবেজী। এত্‌না জাড়া মে ভি আপ—

তাহার মুখের কথা আর শেষ হইতে পারিল না। তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য দাঁড়াইতেই ঠাণ্ডাটা দোবের বেশী করিয়া অনুভব হইতে লাগিল; তিনি আরো জোরে জোরে কাঁপিতে লাগিলেন।

আগন্তুক শিষ্য দুইটী একবার দোবের এবং একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল: ঠিক্ ত নেহি হ্যায়—জরুর উন্‌কা ঝুনঝুনিয়া'—

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া আর একজন বারবার দোবের মুখের দিকে তাকাইয়া বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

দোবে মহা প্রমাদ গণিলেন। তিনি অনেক বুঝাইলেন—

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে! 'ঝুনঝুনিয়া'র নাম শুনিয়া দলে দলে লোক জড়ো হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভক্ত দুইজন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখের ঘাটে লইয়া গিয়া অনবরত জলে চুবাইতে লাগিল। প্রৌঢ় হাড়ে আর কত সহ্য হয়! শীতের প্রকোপে একেই তিনি বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর ভক্তদ্বয়ের পরিচর্য্যার অনুকম্পায় শীঘ্রই তাঁহাকে জ্ঞান হারাইয়া ঘাটের উপর শুইয়া পড়িতে হইল। তখন সমস্বরে চীৎকার উঠিল: নিয়ে আয় ডাক্তার, নিয়ে আয় বরফ!...

সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন দৌড়িয়া গিয়া দশ মিনিটের মধ্যেই প্রায় আধমণ বরফ আনিয়া হাজির করিল। ভক্তদ্বয়ের উভয়েই হাসিমুখে নূতন উদ্যমে শুশ্রূষায় লাগিয়া গেল। দোবেরই গামছাখানি কোমর হইতে খুলিয়া লইয়া তাহাতেই বরফ বাঁধিয়া মাথায় চাপিয়া ধরিল। শুদ্ধাচারী দোবের কোমল প্রাণ এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না—মিনিট কয়েক পরেই বার দুই নাক মুখ সিঁটকাইয়া তিনি কাঠের মত শক্ত হইয়া গেলেন। লোকের মুখে এবং কাগজে রাষ্ট্র হইয়া গেল: বাবা কী সর্ব্বনেশে ব্যায়বাম—কথা বল্‌বার ফুরসুৎ দেয় না!...

আমরা কিন্তু বলি: ধন্য দোবে, ধন্য তোমার ভক্তের ভক্তি!...

শ্রীমতী প্রতিভা শীল
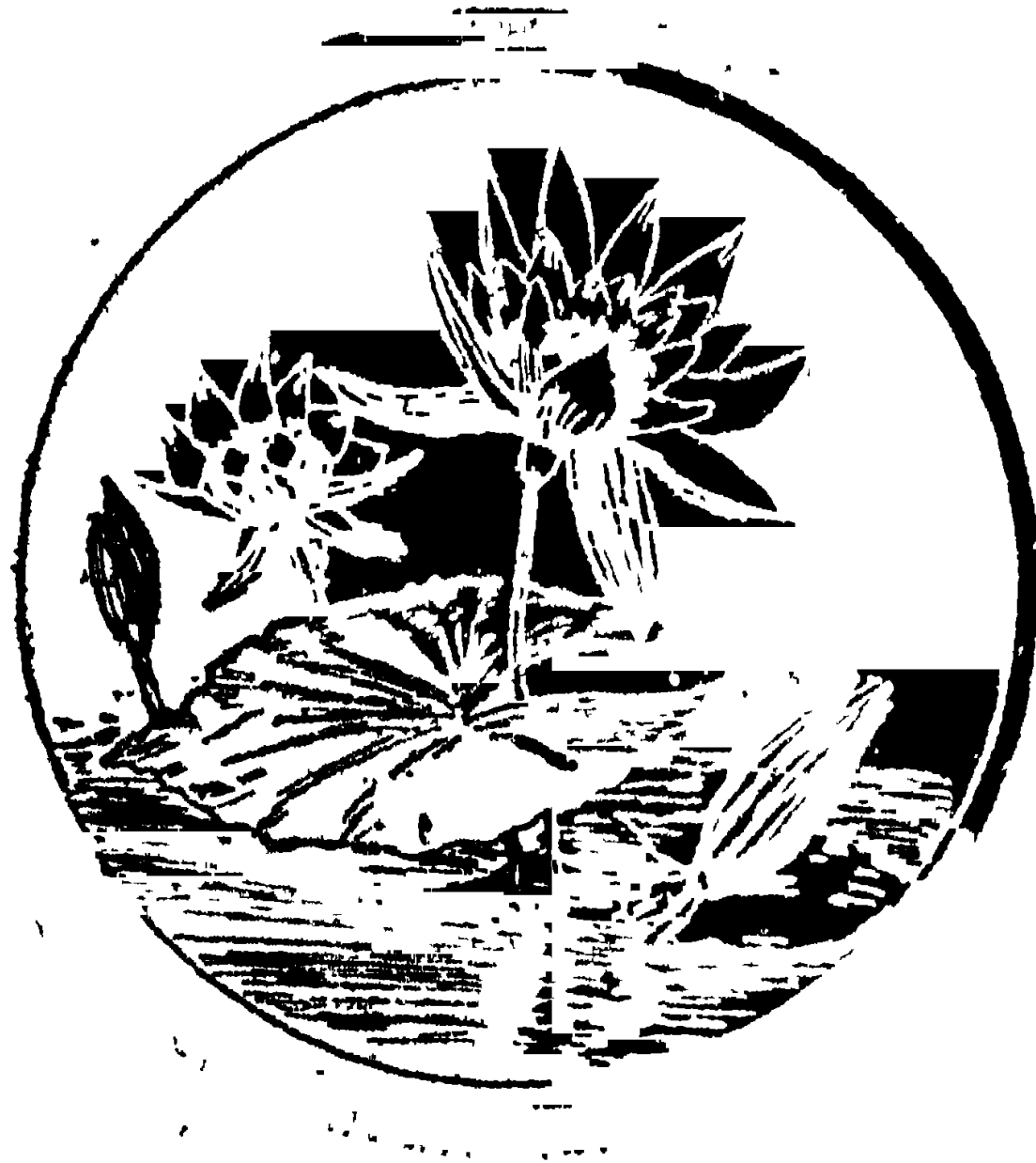
দক্ষিণা-পথ ভ্রমণ

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

আমার প্রতিবেশিনী উষার মা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দেখিতে যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সহযাত্রী হইলাম। পরদিন তিনি তাঁহার বড় ছেলে ও আমাকে লইয়া পুরী হইতে ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলেন। আমরা দু'জনে সেখানে একখানি গোযান ভাড়া করিলাম এবং তিনজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। ক্রমে পুরীর পথ ছাড়িয়া গাড়ী বালুকাময় পথে চলিতে লাগিল। কঙ্করময় তৃণশূন্য ভূমি। পথের স্থানে স্থানে ঘনপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষশাখায় অঙ্গ ঢাকিয়া পক্ষীগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। শকট-চক্রের শব্দে পথি পার্শ্বের মৃগ-মৃগীদল ভীত চঞ্চল পদে ছুটিয়া পলাইতেছে। আমরা মধ্যাহ্ন বারটার সময় উদয়গিরি আসিয়া পৌছিলাম। পাণ্ডা যাত্রীদের অপেক্ষায় সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা উদয়গিরির যাত্রী দেখিয়া সঙ্গে করিয়া আমাদের লইয়া গেলেন ও একটী মাটীর বাড়ীতে বাসা স্থির করিয়া দিলেন।

আমরা সেখানে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া মুখ হাত ধুইয়া লুচি ও আলু ভাজা দিয়া জলযোগ করিলাম। তারপর রাত্রি চারিটার সময় আমরা গোযানে উঠিয়া উদয়গিরি দেখিতে চলিলাম। যে গ্রামে আমরা বাসা লইয়াছিলাম, সেখান হইতে আমাদের দুই মাইল পথ যাইতে হইবে। শকট চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ভোরের আলো তখন সবেমাত্র উঁকি দিতেছে। পূর্ব্বদিক তরুণ অরুণের রক্তিম রাগে রঞ্জিত। মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ লতাপত্র দোলাইয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতেছে। নির্ভয়ে হরিণ ও হরিণীদল যূথে যূথে বিচরণ করিতেছে। বন-কুসুমের সুমিষ্ট গন্ধে দশদিক আমোদিত। পথের দুইধারে ছোট বড় পাহাড়। আমাদের গাড়ী গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ীখানি উদয়গিরির পাদমূলে আসিয়া পৌছিল। গিরি পাদমূল হইতে একটী ক্ষীণা তটিনী মৃদু কলতানে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতেছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে শৈলশিখরে আরোহণ করিলাম। কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখিলাম! শৈল চূড়ার উপর বিচিত্র বর্ণ সুরঞ্জিত মেঘ সকল কি সুন্দর দেখাইতেছে! শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডগুলি ধবল বলাকার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার নীচে গাভী-বৎসগুলি তৃণ-ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। উদয়গিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া কি অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম! মনে হইল, পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব যেন সপ্তাশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে উদয় হইতেছেন। তরুণ অরুণের এই উদয় দৃশ্য কি মনোরম! পর্ব্বত গাত্রে নানা স্থানে বুদ্ধদেবের পাষাণময় ধ্যান-মূর্ত্তি। অতি সুন্দর! প্রশান্ত মূর্ত্তি নগ্নকায় বুদ্ধদেব ধ্যানস্তিমিত নয়নে বসিয়া আছেন। ধ্যানমূর্ত্তিগুলি চমৎকার—যেন সজীব বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বুদ্ধমূর্ত্তির নয়নে যেন করুণা কণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। একস্থানে বুদ্ধদেবের একটী বৃহৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখিলাম। কোন কোন পর্ব্বত গুহার মধ্যে বুদ্ধদেবের ছোট বড় অনেকগুলি তাপস মূর্ত্তি আছে। এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, এক সময় এইস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বড় কম ছিল না। এক-একটী বৃহৎ পর্ব্বত গুহা একেবারেই শূন্য। এই সকল গুহা সমতল; বিশ-পঁচিশ জন লোক একত্রে থাকিতে পারে। পূর্ব্বে এই সকল নির্জ্জন গিরিগুহায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ তপস্যা করিতেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমরা পর্ব্বত স্তূপ ভাঙ্গিয়া নামিয়া আসিলাম। উদয়গিরি হইতে নামিয়া আমরা খণ্ডগিরি দেখিতে গেলাম। এই স্থানে শৈলমালা খণ্ড খণ্ড আকারে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রথমেই পাণ্ডা আমাদের গণেশ গুম্ফা দেখাইতে লইয়া গেলেন। কি চমৎকার গুম্ফাটী! অবিকল গণেশ দেবতার

মুখের ন্যায় শুঁড় ধারণ করিয়া আছে। গণেশ গুম্ফার পরই হস্তীগুম্ফা—ঠিক্ যেন বিশাল মদমত্ত হস্তী শুণ্ড আন্দোলন করিতেছে। এই গুহার মুখ ঠিক্ হস্তী মুখেরই অনুরূপ। তাহার পর ব্যাঘ্র গুম্ফা। গুহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন সত্য-সত্যই একটা ব্যাঘ্র লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বদন ব্যাদান করিয়া আছে। এই সকল গুম্ফাগুলি প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত। এই গুম্ফা তিনটি দেখিলে হৃদয় বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। ভগবানের অসীম সৃষ্টি কৌশল দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্বতই লুণ্ঠিত হইতে চায়। সেই বিশ্বময়ের কি অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য! এ শিল্প-নিপুণতা মানব শিল্পীর অগোচর। খণ্ডগিরির ছোট বড় মাঝারী শৈলশ্রেণী কি বিচিত্রভাবেই না দাঁড়াইয়া আছে! গিরি পাদমূল হইতে ক্ষীণা নির্ঝরিণী কুলুকুলু তানে মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিতা হইতেছে। নির্জ্জন নীরব প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিহগ কাকলী শোনা যাইতেছে। আমরা দুই ঘণ্টা ধরিয়া খণ্ডগিরির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

তারপর আমরা ভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া পুরী প্রত্যাগমন করিলাম। সেখান হইতে আসিয়া শুনিলাম হরনাথ বাবা পুরীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে পাগল হরনাথ বলিত। পুরীর সমুদ্র-তটে তাঁহার একটী আশ্রম প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা কয়েকজন মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম—অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ভক্তমণ্ডলী সেখানে বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে বসিয়া বারংবার 'রাধে রাধে' উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে মিহি কালাপাড় ধুতি। গায়ে গরদের পিরান। পায়ে কার্পেটের জুতা। তিনি মুহূর্মুহূ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন ও ভক্তগণকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রসাদস্বরূপ দিতেছেন ও কৃষ্ণতত্ত্ব শুনাইতেছেন। আমার কন্যার শরীর অসুস্থ। যদি সাধু কৃপায় সে সুস্থ হয় এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। কন্যার অসুখের কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন—আমার আশ্রমের কূপের জল খাওয়াও, ভাল হইয়া যাইবে। খাওয়াইলাম, কোন উপকারই হইল না। তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। হরনাথ বাবার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও আছেন। বিস্তর নারী শিষ্যাও সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি নিত্যানন্দের মত ভাবপ্রেম বিলাইতেছেন। যাঁহারা বড়লোক শিষ্য, বাবা তাহাদেরই কৃপা করেন। দীনহীন সে কৃপার অধিকারী হয় না। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় খোল-করতালসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দও চলিতে থাকিত। আমরা কীর্ত্তন শুনিতাম। কয়েকদিন অতীত হইলে ছোট মাসীমাতা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে আমার নিকট আসিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা—তিনি দক্ষিণ-ভ্রমণে যাইবেন। তিনি সম্বন্ধে আমার বড় হইলেও আমায় সমবয়সীর মত স্নেহ করিতেন ও অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি পুরী আসিলে আমি কিছুদিন তাঁহাকে লইয়া পুরীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। আমি তাঁহাকে অকপটে ভালবাসিতাম; কথন কোন কথাই গোপন করিতাম না। একদিন রাত্রে তিনি বলিলেন—চলো না, সেতুবন্ধটা দেখিয়া আসি। আমি বলিলাম—বেশ, তুমি পাণ্ডা হইয়া আমায় লইয়া চলো। আমার চিরদিনের ইচ্ছা ছিল একবার সেতুবন্ধ দর্শন করিব। কিন্তু কাহার সঙ্গে যাইব? সাহসে কুলাইত না। কিন্তু ছোট মাসীমাতার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তিনি নিশ্চয়ই যাইবেন। এই সময় আমাদের পরিচিতা প্রসন্নবাবুর মাতাও আসিলেন। তিনিও রামেশ্বর যাইতে সম্মত হইলেন। কুসুম নামে একটি মেয়েও আমাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি ভাবিলাম, এ সুযোগ ত্যাগ করিব না। যথন সঙ্গী জুটিয়াছে, নিশ্চয় যাইব। কিন্তু তথন হাতে টাকা কম ছিল। পাণ্ডার নিকট একশত টাকা কর্জ্জ লইয়া রামেশ্বর যাত্রা স্থির হইল। আমার ছোট মেয়ে বীণা ও পৌত্রী কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাদের হাতে পুতুল কিনিতে এক একটা টাকা দিয়া ভুলাইলাম। কর্ত্তাও আমার রামেশ্বর যাওয়ার মত দিলেন। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তিনি বীণা ও কমলাকে লইয়া কাশীপতির বাটীতেই থাকিবেন ঠিক্ হইল। হরনাথ বাবার একটী শিষ্য ছিল। তার নাম ভূতনাথ। তার তরুণ বয়স। সে আমাদের বড় ভালবাসিত। সে ছেলেটী বড় শান্ত

শিষ্ট। আমি তাহাকে বলিলাম—আমরা রামেশ্বর যাইব; তুমি আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিও। সে স্বীকৃত হইল। তারপর আরও দুইজন সঙ্গী জুটিল। আমি কাশীপতিকে বলিলাম—বাবা, আমরা সেতুবন্ধ দর্শনে যাইব। একটী পুরুষ সঙ্গী চাই। তিনি একটী বৈষ্ণব সাধুকে সঙ্গে দিলেন এবং আমায় বাংলায় একখানি কাগজ লিখিয়া দিলেন—আমাদের কোথায় কোন্ ষ্টেশনে নামিতে হইবে, ইত্যাদি। সেই লেখাটী আমার টাইম্‌টেবলের কাজ করিল। আমরা রামেশ্বর যাত্রার দিন স্থির করিলাম। ভূতনাথ আমাদের অনেক সাহায্য করিল। সে আমাদের খুরদা রোড্ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে তুলিয়া দিবে ইহাই স্থির হইল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা কয়টী স্ত্রীলোক ঐ বৈষ্ণব সাধুটীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ব্যাগ লইয়া রাত্রি চারিটার সময় পুরী ষ্টেশনে আসিয়া খুবদা লাইনের গাড়ীতে উঠিলাম। দুই ঘণ্টা পরে আমবা জটনি জংশন ষ্টেশনে নামিলাম। আট-টার পর মান্দ্রাজ মেল আসিল। ভূতনাথ আমাদের টিকিট করিয়া মান্দ্রাজ মেলে তুলিয়া দিল। আমাব ধর্ম্মছেলে কাশীপতি তাহার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার পাণ্ডাকে মান্দ্রাজ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের নামাইয়া লইতে লিখিয়াছিলেন। আমরা দুইদিনের আহারের মত মিষ্টান্ন ও ফলমূল লইয়া মান্দ্রাজ মেল গাড়ীতে উঠিলাম। দ্রুতগামী ডাক্‌গাড়ী বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। আমার স্নেহভাজন পুত্র কাশীপতি আমায় পুনঃপুনঃ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, মাদুরায় মীণাক্ষী দেবীর মন্দির দেখিতে ভুলিবেন না। ভারতবর্ষে এত বড় বিখ্যাত মন্দিব আর কোথাও নাই।

আমরা রেলপথের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে কয়েকটী ষ্টেশন ও কত নদ-নদী গিরি-নির্ঝরিণী পার হইয়া আসিলাম। ট্রেণ ক্রমে চিল্কায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুদূর বিস্তৃত চিল্কার অগাধ জলরাশি। আমাদের গাড়ী চিল্কার ধার দিয়া চলিতে লাগিল। চিল্কার উপরিভাগে ঝাঁকে ঝাঁকে কত বিচিত্র বর্ণের পক্ষী উড়িতেছে। কতকগুলি উড্ডীয়মান জলচর পক্ষী মৎস্য শীকারে ব্যস্ত। দলে দলে শুভ্র বলাকাশ্রেণী উড়িয়া বেড়াইতেছে। হ্রদতটে একটী সুন্দর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। শুনিযাছি, দক্ষিণে চিল্কা হ্রদের মত হ্রদ আর নাই। শুনিলাম—এই স্থান হইতেই পূর্ব্বঘাট গিরিশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের উপর অনেক দেব-দেবীর মন্দির আছে। গঞ্জাম জেলার এখান হইতেই সুরু। আমরা ক্রমে পনসা ষ্টেশনে পৌছিলাম। এখানে 'পালু পালু' বলিয়া মাথায় দুগ্ধের কলসী লইয়া গোয়ালিনীরা দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছে। আমরা দুই আনা পয়সা দিয়া একসের দুধ কিনিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের ট্রেণখানি ওয়ালটেয়ার আসিয়া পৌছাইল। আমরা একদিন সেখানে বিশ্রাম করিব মনে করিয়া এই স্থানেই নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেশনে নামিয়া কুলীদের টার্ণার ছত্রে যাইব বলায় তাহারা একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল।

এ গাড়ীর নাম ব্যাণ্ডগাড়ী। গাড়ীর মধ্যে গদী আঁটা। ষ্টেশন হইতে টার্ণার ছত্র এক মাইল। আমরা গাড়ীতে উঠিলে কুলীরা সমস্ত জিনিষ-পত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিল। ওয়ালটেয়ারের কুলীরা অনেকেই বাংলাভাষা বোঝে না; তাহারা ইংরাজীতে অভ্যস্ত। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা টার্ণার ছত্রে আসিয়া পৌছিলাম। ছত্রের ম্যানেজার একজন দক্ষিণা ভদ্রলোক। তিনি আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে একআনা করিয়া পয়সা লইয়া সেখানে থাকিবার টিকিট দিলেন। ছত্রের দরওয়ান আসিয়া আমাদের জন্য একটী কুঠ্‌রী খুলিয়া দিয়া গেল। ছত্রটি সরকারী ছত্র। দোতলা বাড়ী। নীচে উপরে সারিসারি পনের-কুড়িটী ঘর। ছত্রের প্রশস্ত উঠানের মধ্যে জলের কল আছে। বাহিরের বারান্দায় মুদীখানার দোকান। চাল ডাল নুন তেল আটা ঘি সবই পাওয়া যায়। হাঁড়ি কাঠও আছে। প্রত্যেক কুঠ্‌রীতেই একটী করিয়া উনান আছে। আমরা জিনিষ-পত্র ঘরের মধ্যে রাখিয়া মুখ-হাত ধুইয়া লুচি ও মিষ্টান্নে জলযোগ সারিলাম। তারপর গায়ে শাল জড়াইয়া ওয়ালটেয়ার সহর ও বাজার-হাট দেখিতে গেলাম। ছত্রের বাহিরে আসিয়া পাকা রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। এই স্থানে দক্ষিণী রমণীগণ কাছা দিয়া কাপড় পরে। তাহারা কবরীতে পুষ্পগুচ্ছ দিয়া দেহে নিম আস্তিন বডি পরিয়া দলে দলে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের হস্তে কণ্ঠে নানা প্রকার আভরণ শোভা পাইতেছে। মাসীমাতা বলিলেন—চলো, বাজারে গিয়া কিছু কেনা যাক্। মাইলখানেক আসিয়া দেখিলাম—সম্মুখে অনন্ত সুনীল সাগর ভৈরব কল্লোল তুলিয়াছে। সহরটী ক্ষুদ্র; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাগর কূলে ছোট ছোট বাংলোগুলি চিত্রিত ছবির ন্যায় দেখাইতেছে। ওয়ালটেয়ারের জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। এখানে কয়েকজন রাজা-জমীদারের বাটী আছে। অনেক ধনীলোক এ স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন। ওয়ালটেয়ারে একটী স্বাস্থ্যাবাসও আছে। ষ্টেশনের নিকট দক্ষিণী ব্রাহ্মণের হোটেল অবস্থিত। সেখানে ইচ্ছা করিলে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণীদের হোটেলে মৎস্য মাংস পাক হয় না। এখানে লঙ্কা ও তেঁতুলের ঝোলই দক্ষিণীরা অধিক পরিমাণে খায়। এদেশে দক্ষিণী ও মারহাট্টির সংখ্যাই অধিক। দক্ষিণীরা তামিল ভাষায় কথা বলিতেছিল। আমরা তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। অনেক ইংরাজও ওয়ালটেয়ারে বাস করেন। এখানকার দক্ষিণী পুরুষেরা এবং বাটীর চাকর হইতে মুটে-মজুর পর্য্যন্ত সকলেই ইংরাজীতে কথা কহে। আমরা দোকান বাজার-হাট ঘুরিয়া কিছু তরকারী কিনিয়া রাত্রি সাতটার সময় ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। পরে বিশ্রামান্তে খেচরান্ন ও আলু ভাজা দিয়া ভোজন সমাপনপূর্ব্বক শয়ন করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন—মা, আপনারা কি সীমাচল দর্শনে যাইবেন? আমরা বলিলাম—নিশ্চয়ই যাইব। পাণ্ডা বলিলেন—রাত্রি চারিটার সময় আসিয়া আমি আপনাদের সেখানে লইয়া যাইব; আপনারা ঠিক্ থাকিবেন। পাণ্ডা চলিয়া গেলে মাসীমাতা এবং প্রসন্নবাবুর মাতা সীমাচল যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তারপর কাপড়-গামছা টাকা-কড়ি সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া আমরা শয়ন করিলাম।

রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া আমরা পাণ্ডার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। তিনি আসিয়া ডাকিতেই আমরা উঠিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, পাণ্ডা-ঠাকুর আমাদের জন্য একখানি গাড়ী আনিয়াছেন। এখানকার গাড়ীগুলি মন্দ নয়। কিন্তু এ গাড়ী ঘোড়ায় টানে না। বৃহৎকায় বলশালী বৃষভেরাই উহা টানিয়া থাকে। আমরা কয়টী স্ত্রীলোক বৈষ্ণব সাধুটীকে সঙ্গে করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গাড়োয়ান ওয়ালটেয়ারের বিস্তৃত রাজপথ দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল। তখন সবেমাত্র ভোরের আলো জগতের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উষা সতীর করস্পর্শে জড় ও জীব জগতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শাখায় শাখায় পাখীরা মধুর স্বরে গান করিতেছে। মন্দ মন্দ দক্ষিণানিলে তরুপত্রগুলি দোলায়মান হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নব রবির কিরণে ধরণী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পথের দুই পার্শ্বে ধূসর মেঘের মত গিরিশ্রেণী দেখা যাইতেছে। উন্মুক্ত প্রান্তর হইতে বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। ওয়ালটেয়ারের অপর তীরবর্ত্তী বাংলোগুলি আলেখ্যের মত শোভা পাইতেছে। আমরা আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সীমাচলের পাদদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। পাদমূল হইতে শিখরদেশ এক মাইল। শতাধিক প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া আমরা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, স্থানটী বেশ সমতল। একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে বিষ্ণু-বরাহ দেবের মন্দির। মন্দির দ্বারে একটি বৃহৎ ঘণ্টা রহিয়াছে। তৎকালে বিগ্রহ-মূর্ত্তির পূজা হইতেছিল। মূর্ত্তিটী চন্দন-চর্চ্চিত। দীপের গন্ধে মন্দির সুরভিত। পুরোহিত বলিলেন—চৈত্র মাসে এখানে একটী বড় মেলা হইয়া থাকে। আমরা বিগ্রহ দর্শন করিয়া পূজার সামগ্রীগুলি পূজারীর হাতে দিলাম। তারপর দেবতাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

উইলিয়ম পাওয়েল্

চিত্র-জগতে উইলিয়ম পাওয়েলের নাম খুব বেশী পরিচিত না হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই প্রিয়দর্শন অভিনেতাটী যে একটী বিশিষ্ট স্থান নিজের জন্যে করে নেবেন, তা'তে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অ্যামেরিকায়, পিট্স্বার্গে ২৯-এ জুলাই এঁর জন্ম হয়। এর পিতার নাম এস্ ডব্‌লিউ পাওয়েল্, মাতা নেটী।

ছেলেবেলায় উইলিয়ম একটু বোকাগোছের ছিলেন। একদিন তাঁর মা তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি তাঁকে একটী কপির ভেতর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। উইলিয়ম অবাধ বিস্ময়ে তাই বিশ্বাস করে উক্ত কপিটী দেখ্‌বার জন্যে উতলা হন্। তাঁর মাতার বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন হাস্য-রসিকা তাঁকে কপির বদলে তাঁর মায়ের পেটটী দেখিয়া দেন্। বালক উইলিয়ম শুধু এতেই ক্ষান্ত হন্ নি, কপিটী দেখ্‌বার জন্য রীতিমত তাঁর মাতার জামা ধরে টানাটানি করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকে উইলিয়মের উকীল হবার বিশেষ ঝোঁক্ ছিল। এমন কি, এই জন্যে তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়েছিলেনও। কিন্তু হঠাৎ তাঁর কর্ম্মধারা কি ভাবে একেবারে অন্যদিকে ঘুরে গেল, তা' জান্‌তে কৌতূহল হওয়া বিচিত্র নয়।

তখন তিনি কন্সাস্ সিটিতে একটী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বড়দিনের বন্ধে স্কুলে একটী অভিনয়ের আয়োজন হয়। সেই অভিনয়ে উইলিয়মের একটী নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা হয়। রিহার্সাল-ঘরেই তিনি নায়িকার প্রেমে মুগ্ধ হন। শেষ পর্য্যন্ত অভিনয়ের এই আকর্ষণই তাঁর জীবনধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করে দেয়। তাঁর উকীল হবার বাসনা তখন অগাধ সলিলে ভেসে যায়।

তাঁর পিতামাতা কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হন্ নি। তাঁরা তাঁকে ওকালতী পড়বার জন্যেই বিশেষ করে জেদ করেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের মানুষটা তখন তাঁকে মঞ্চের দিকে ঘন ঘন আহ্বান করতে থাকে। তা' ছাড়া, দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি আর একটী মেয়ের প্রেমে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন্। কিন্তু টাকা ছাড়া বিবাহ হতে পারে না; অথচ, উকীল হয়ে টাকা উপায় করতে বহুদিন সময়ের প্রয়োজন এবং ষ্টেজে নামলে অল্পদিনেই সে কাজ উদ্ধার হতে পারে ভেবে, তাঁর মন বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'আমেরিকান্ একাডেমি অফ্ ড্রামাটিক আর্টস্' স্কুলে ভর্ত্তি হন্। সেখানে ছ' মাস শিক্ষা করে তিনি থিয়েটার-লাইনে চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়ে পড়েন। ফলে তাঁর প্রেম-পাত্রীকে, অর্থাৎ যার জন্যে তিনি এই পথে এলেন, তাকে হারাতে হয়।
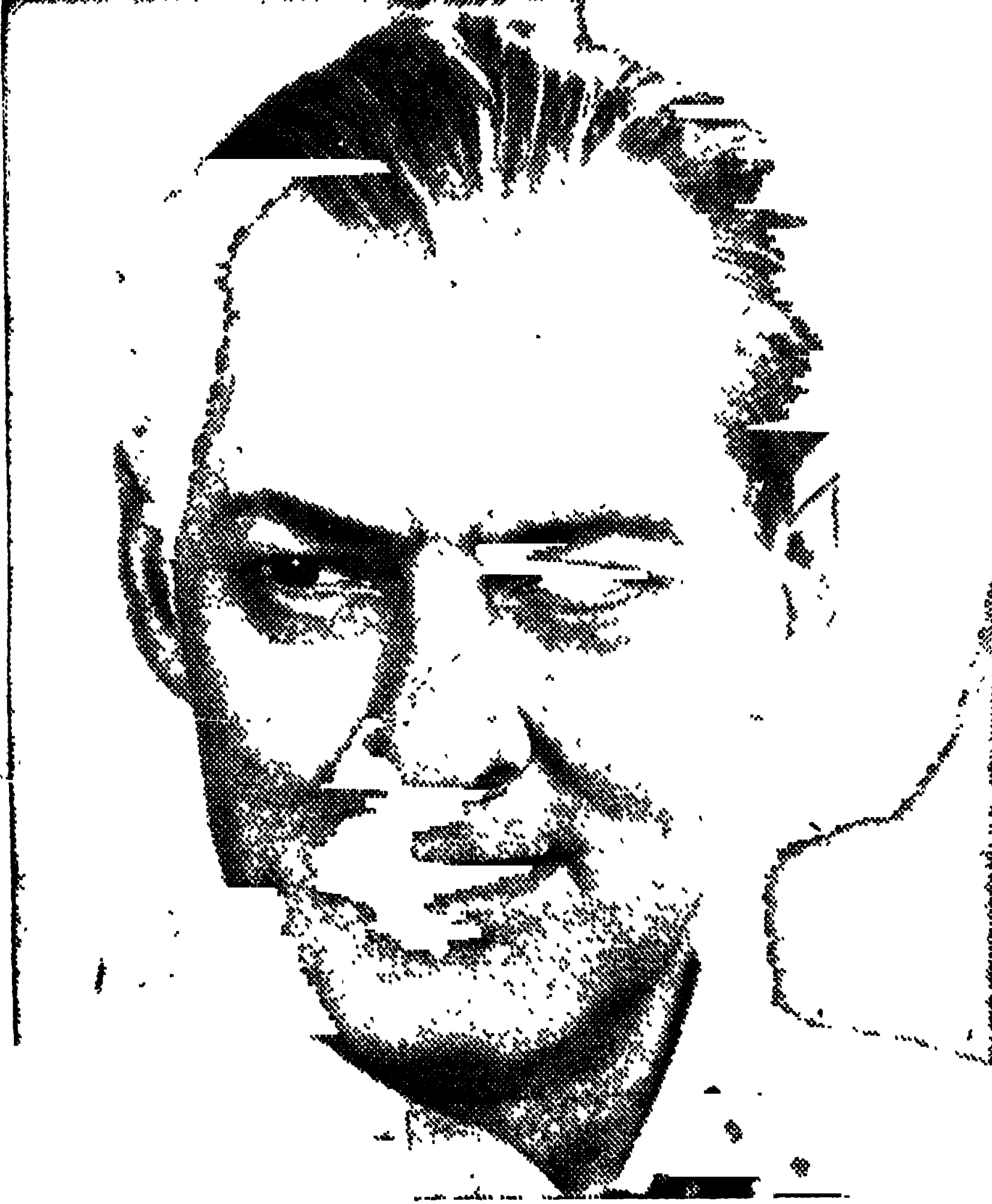
কিছুদিন অক্লান্ত চেষ্টার পর কোনো এক দূর পল্লীতে তিনি একটী থিয়েটারে অভিনয় করবার সুযোগ পান্। 'উইদিন্ দি ল' এই পুস্তকখানিতে সু-অভিনয়ের গুণে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে আর একটী অভিনেত্রী, আইলিন্ উইলসনের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন।

প্রায় সাত-আট মাস পরে কিছু টাকা সংগ্রহ করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় ফিরে আসেন এবং ন' বছর ব্রডওয়েতে অভিনয় করেন। পরিশেষে 'স্প্যানিশ্ লাভ্' নাটকে সু-অভিনয়ের প্রভাবে তিনি চিত্র-শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে, 'শার্লক হোমস্' পুস্তকে তাঁকে একটী ছোট্ট পার্ট দেওয়া হয়। ইহারা পরের পুস্তক-খানিতে নায়কের আকস্মিক অসুস্থতার জন্য তাঁকেই নায়কের ভূমিকায় নাম্‌বার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তিনি সু-অভিনয়ের গুণে নিজের যশ অক্ষুণ্ণ রাখেন। এরপর হলিউডে তিনি রীতিমতভাবে প্রতিষ্ঠিত হন্। তাঁর অভিনীত কয়েকখানি পুস্তকের নাম: 'রমোলা', 'থিন্‌ম্যান্', 'এস্কাপেড্', 'দি কী', ইত্যাদি।

সঞ্চয়

পঞ্চপুষ্প

দ্বাদশ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৩ | চতুর্থ সংখ্যা

বাদল-দেবতা

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার ধোঁয়ার মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেওঘরের ধূলাকে আলিঙ্গন করিবার পর হইতে আশীষ ডাক্তার বালীর রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইল। হোক্ না পাতান বোন্—বোন্ ত বটে। সে বোনের ছেলে ভাগিনেয় ডাক্তার, ঔষধ এবং পথ্য দুই দিতে পারে ভাল রকমেই। উত্তরাধিকার-সূত্রে যখন তাহার ঘাড়ে বসিয়া খাইতে পারার হক্দার, তখন এতদিন আসে নাই বলিয়াই আফ্‌শোষ হইতে লাগিল।

ছুঁৎমার্গের সপ্তম স্বর্গে দিদি স্থানলাভ করিয়াছেন। মালা জপ করিবার অবসর বড় একটা পান না—শুধু এঁটো-কাঁটা বাছিতেই তাঁহার দিন চলিয়া যায়। বৌমাটী নিরীহ; কাজ করিয়া যান, আর মার দুর্গতি দেখিয়া হাসেন। অদৃষ্ট-পুরুষ উপর হইতে ভাবেন—আরও বছর কয়েক হাসিয়া লও, তারপর স্বর্গে যাইতে হইলে এঁটো কাঁটা বাছিতেই হইবে। বাঙ্গালীর ছুঁৎমার্গই ত হইল একমাত্র সাধনার পথ।

পাঠক-পাঠিকা হয় ত এইটুকু ভূমিকাতেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। না, এইবার গল্পই বলি। আশীষ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বেড়ান ছাড়া তাহার কাজও বড় একটা নাই। কোথা হইতে একফালি মেঘ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া সারা আকাশটার উপরই তাণ্ডব-লীলা সুরু করিয়া দিল। আলো নিবিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া সে দ্রুত পদচারণা করিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু চেষ্টা মানুষের হাতে, ফল দিবার কর্ত্তা শ্রীমধুসূদন। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া সমস্ত উদ্যোগই পণ্ড করিয়া দিল।

সাম্‌নের একখানা ছিটাবেড়ার ঘরের দাওয়ায় সে

উঠিয়া দাঁড়াইতে বাধা হইল। মাথায় হাত দিয়া দেখিল—এইমাত্র যেন কুস্তির আখড়া হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। কোন হুঁসিয়ার চাষী অনায়াসে এ মাথার মাটীতে ফসল বানাইয়া লইতে পারে। বৃষ্টি পড়িয়া জমি ঠিক্ হইয়া আছে—শুধু বীজ পোঁতার ওয়াস্তা।

ঘরের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের ক্ষীণস্বর ভাসিয়া উঠিল।—কোথায় গেলেন বল দিকি খোকা, পারিও না এত! হয় ত ভিজতে ভিজতেই বাড়ী ফিরবেন। ওঁর কি, অসুখ হলে ত ভুগ্‌তে হবে আমাকেই।

আশীষের ঘুমন্ত অন্তরের কোন্ তারে কথাগুলা গিয়া আঘাত করিল। মাথাটা ঝাড়া দিয়া ভাল করিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া লইল। কিন্তু কোন ভরসাই পাইল না। এখানে দাঁড়াইতেই হইবে। একে প্লুরেসির রেষারেষিতে বছরখানেক ধরিয়া ভুগিতেছে। এখনও বুকের অবস্থা ভাল নয়। কোন্ দিন এখানের ঝড় ও জলকে উপেক্ষা করিয়া ওপারের জল-ঝড়ের সঙ্গে নূতন করিয়া সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে, কে জানে! বুকটায় অকারণে যেন কেমন চাপ মনে হইতে লাগিল। কাশীটা রোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

ভিতর হইতে কে বলিল—কে, কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

পরিচয় দিবার কি আছে বুঝিয়া না পাইয়া আশীষ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাশিতে লাগিল। সহসা দরজাটা খুলিয়া গেল। হাতে হ্যারিকেনটার উপর দমকা একটা হাওয়া লাগিয়া নিবু নিবু হইয়াও প্রাণপণ শক্তিতে আবার সেটা জ্বলিয়া উঠিল। মেয়েটার এলাইত চুলগুলি লইয়া দুর্দ্দান্ত পবন-দেবের দুরন্তপনা সুরু হইয়া গেল।

একবার সেইদিকে চাহিয়া মুখটা অন্ধকারের দিকে ঘুরাইয়া আশীষ দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের বিদ্যুৎ শিখার মত তাহার বুকের আকাশেও যেন তড়িৎ রেখা খেলা করিয়া যাইতে লাগিল। শিপ্রা! শিপ্রা!

মেয়েটী ধীরকণ্ঠে বলিল—এস আশীষ দা', আমি শিপ্রা, চিন্‌তে পার্‌লে না?

চিনিতে পারে নাই আবার! কিন্তু শিপ্রা এখানে কেন? জীবনের দীর্ঘ দিনগুলা যাহাকে না দেখিয়াও নিরুদ্বেগে কাটিয়া গিয়াছে, শেষ সময় কি সে আমাকে ব্যঙ্গ করিতে আসিল?

ব্যঙ্গই বটে! আকাশে বিদ্যুৎ কড়কড় শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মেয়েটী ডাকিল—আশীষ দা'।

আশীষ উত্তর দিল—কি?

—বাদল-দেবতা তোমাকে আবার আমার কাছে এনে দিয়েছেন। বেশীক্ষণ ধরে রাখ্‌ব না; বৃষ্টি ধরা পর্য্যন্ত—ও কি, বস্‌বে না তুমি?

আশীষ কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। দারিদ্র্যের জ্বলন্ত চিহ্ন সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু লক্ষীর ছোঁয়াচ যেন প্রতি দ্রব্যটাকে স্পর্শ করিয়া দারিদ্র্যতাকেও তুচ্ছ করার ইঙ্গিত করিতেছিল। কখন সে একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল কে জানে! চাহিয়া দেখিল, একটা শুক্‌না কাপড় ও জামা লইয়া শিপ্রা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাথার চুলগুলির মধ্যে হাত দিয়া বলিল—ও মা, ভিজে ত্রিখণ্ডি হয়েছ যে! তুমি কি আজও তেমনইটি রয়ে গেলে। বছর বারই হবে বোধ হয়, এমনই একদিনে তোমার ওমনই ভিজা চুলগুলাকে নিয়ে বিপদে পড়িছিলুম—মনে পড়ে?

ঘাড় নাড়িয়া আশীষ বলিল—না ত।

—অমনই ভোলাই বটে তোমরা! বলিয়া হাসিতে হাসিতে শিপ্রা আশীষের মাথার বিপর্য্যস্ত চুলগুলার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিয়া গেল।

বছর বার আগেরই কথা।

এমনই একটা বর্ষার দিনে কলিকাতার বারিসমুদ্র মন্থন করিয়া আশীষ ইহাকেই আবিষ্কার করিয়াছিল বটে। তখন যৌবনের কোন দেবতাই মেয়েটীর অঙ্গে নিজের পরশ বুলাইয়া যান নাই; কৈশোরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া সে সারা জগতটাকেই একান্ত আপনার ভাবিতে সুরু করিয়াছে। তাই পথের আবর্জ্জনাকে ঘরে কুড়াইয়া তোলার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা লুকান আছে তাহা আবিষ্কার

করিবার ধৈর্য্যও বুঝি তাহার নাই। না হইলে বাড়ীর বারান্দায় একরাশ বই লইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে দেখিয়া তাহাকেই বা কেন জোর করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া হাজির করিবে?

মেয়েটীর অনুরূপ মাও। তাহাকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—বাছারে, ভিজে যে আর কিছু নেই দেখছি! ও খুকী, একখানা—

আশীষ চাহিয়া দেখিল—খুকীটী মার বলার আগেই একখানি শুষ্ক কাপড় লইয়া আসিয়া হাজির হইয়াছে। মা বলিলেন—ও কি লো, তোর কাপড়—

—তোমার কাপড়ের চেয়ে ত ভাল, নাও। ওইটা ছেড়ে দেন দেখি। বলিয়া মেয়েটী আদেশদাত্রীর মত আশীষের পানে চাহিল।

কি জানি তার কথার মধ্যে কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল—প্রতিবাদ না করিয়া তাহারই দেওয়া চওড়া পাড়ওয়ালা কাপড়খানি আশীষ পরিয়া ফেলিল; মাথাটা শুষ্ক তোয়ালে দিয়া সে পুঁছিয়া লইল। কিন্তু এ লওয়া মেয়েটির মনঃপূত হইল না। সে নিজেই তাহার হাত হইতে তোয়ালেখানি টানিয়া লইয়া মাথার ভিতর হইতেও বোধ করি জল বাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

না ফিরিলে নয় বলিয়াই আশীষ ঘণ্টাকয়েক পরে মেসে ফিরিয়া আসিল। সত্য কথা বলিতে কি, মনটা তাহার সেই অসময়ের আশ্রয়স্থলটীরই আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করিয়া মরিতে লাগিল। মেসের নিজের নির্দ্দিষ্ট চৌকীখানির উপর পড়িয়া পড়িয়া আবুহোসেনেরই মত স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়া দিল।

কবে সে মাকে পাইয়াছিল, কতদিনই বা হারাইয়াছে, সে হারান কতখানি ক্ষতিই বা করিয়াছে তাহার, অদ্যাবধি তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর সে পায় নাই, প্রয়োজনও হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে বোর্ডিং-এ থাকিয়া লেখাপড়া করিত; এখন কলেজ-মেসে উঠিয়াছে। বাবা ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নিতান্ত বুদ্ধিমানের মত এক বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট তাহার যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি বেচিয়া-কিনিয়া কোম্পানীর কাগজরূপে জমা দিয়া গিয়াছেন। তাহারই সুদে কোনরকমে তাহার সমস্ত খরচই চলিয়া যাইতেছে। ইহার বেশী সংসারের নিকট প্রত্যাশা করিবার কিছু আছে ইহা তাহার মনেও হয় নাই। কিন্তু আজ তাহার আজন্মলব্ধ জ্ঞান মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মনে হইল, পৃথিবীতে বাঁচার মত করিয়া বাঁচিতে হইলে আরও অনেক কিছু চাই, যাহা হইতে সে নিষ্করুণভাবে এতদিন বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। কি জানি কেন, অদেখা মার উদ্দেশে তাহার চোখ হইতে অবিরল বারিধারা ঝরিয়া পড়িতে সুরু করিল। সে ধারা রোধ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার হইল না।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াহুড়া করিয়া দৈনিক কাজ সারিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কলেজে গিয়াও কিন্তু ভাল করিয়া পড়াশুনায় মন বসিল না। ছুটীর পর মন্ত্রমুগ্ধেরই মত ওই বাড়ীটার উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া চলিল।

কিন্তু বাড়ীর কাছে আসিয়া তাহার পা আর উঠিতে চাহিল না। অনেকক্ষণ রাস্তার একপার্শ্বে সে চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। আজ আর একবার বৃষ্টি আসিলে মন্দ হয় না। তাহা হইলে ছুটিয়া গিয়া সে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া পড়ে—তারপর? কিন্তু আকাশের কোনো এককোণেও আজ সহানুভূতির মেঘ জমা নাই। নাই রহিল জমা, একবার ডাকিলেই বা ক্ষতি কি ভাবিয়া সে অগ্রসর হইতে চাহিল; কিন্তু কে যেন কঠিন নিগড় দিয়া তাহার পা দু'টা বাঁধিয়া দিয়াছে। না, আজ ফিরিয়া যাওয়া ভাল; কাল তখন—

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। আশীষ চাহিয়া দেখিল বেথুনের গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে খুকী চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে—আশীষ দা', ও আশীষ দা', শোন না। পালাচ্ছ কেন অমন ক'রে? ও মা, দেখো তোমার ছেলের—

সে মুহূর্ত্তে মন ওলট-পালট হইয়া গেল। মা ও মেয়ের

স্নেহজালে বন্দী হইয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মাস ছয়ের পরের কথা। খুকীর নূতন নামকরণ হইয়াছে—শিপ্রা।

মা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—দুর্গা, শ্যামা, উমা এমনই একটা নামই রাখা ভাল বলিয়া। আশীষ হাসিয়া বলিয়াছে—এরই মধ্যে পরকালের চিন্তা কেন মা? আগে ত ইহকালের সুখ ভোগ করি, তারপর ও সব ভাবা যাবে। বাঁচতে গেলে নদীর প্রয়োজন সবার আগে—শিপ্রা নদীরই মত করুণাময়ী, ওর ওই নামই থাক্।

না থাকিয়া উপায়ই বা কি। শিপ্রা মার আগেই রায় দিয়া দিয়াছে—করুণাময়ী-টয়ী জানি না বাবু, তবু নামটা দাঁত ভাঙ্গা হলেও ভাল লাগে আমার। মা গো, দুর্গা, উমা, দশভুজা ওসব এ কালে কেউ রাখে না কি?

একালের বিপক্ষে সে কালের মা দাঁড়ান নাই, হাসিয়াই সায় দিয়াছেন।

অগ্রহায়ণ মাস। শীতের দাঁত সকলেরই গায়ে বসিতে সুরু করিয়াছে, কিন্তু কাবু করিতে পারে নাই। আশীষ সন্ধ্যার সময় আসিয়া শিপ্রাকে পড়াইতে বসে। রাত্রের আহার শেষ না করিয়া যাইতে পায় না। এক-জামিন আসন্ন; এ কয়দিন শিপ্রাকে দেখাইয়া শুনাইয়া দিতেই হইবে। বরাবর স্কুলে সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে; আজও সেই স্থান সে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়—কিন্তু কোথা হইতে বাজপাখীর মত একটী মেয়ে আসিয়া সে সম্মান ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইতে উদ্যত। হাফ্ ইয়ারলীতে সেই প্রথম হইয়াছে, শিপ্রা হইয়াছে দ্বিতীয়। এবার—

আপত্তি আশীষ করে নাই, করার অবসরও পায় নাই। জিয়োমেট্রির প্রব্লেম হইতে সুরু করিয়া লণ্ডনের কোথায় কোন চাষার ছেলে জন্মিয়াছিলর ফিরিস্তি লইয়াই সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

শিপ্রা মেধাবী, অধ্যয়নশীলা। কয়দিনেই সে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে যে, ইয়ারলী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা তাহার পক্ষে কঠিন নয়।

সেদিন পড়াইতে আসিয়া আশীষ দেখিল, শিপ্রার পড়ার ঘর অন্ধকার। বাড়ীর কোনস্থানেই যে তাহার থাকা সম্ভাবনা তাহাও অনুমান করা কঠিন। সে ডাকিল—মা।

মারও সাড়া পাইল না। যাহার থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল, সেই উত্তর দিল। বলিল—এস আশীষ দা', বারাণ্ডায় বসে আছি আমি।

আশীষ বিস্মিত হইল। শীতের রাত্রে বারাণ্ডায়, ঠাণ্ডায়! বলিল—ওখানে অন্ধকারে বসে কেন শিপ্রা?

—এমনই, ভাল লাগে না আমার বলিয়া বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বালিয়া দিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া শিপ্রা একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহারই পাশের এক-খানা চেয়ারে বসিতে বসিতে আশীষ বলিল—হঠাৎ এ বৈরাগ্য কেন? ব্যাপার কি, মা কোথায়?

—জানি না। মাঝে মাঝে তিনি বিকালে যান্, ফেরেন রাত্রে। আর কতক্ষণ পরেই ফির্‌বেন। কিন্তু তোমার বুঝি আজ আর আস্‌বার সময় হয় নি এতক্ষণ। মনে করেছিলুম বায়স্কোপ দেখে আস্‌ব—তা' আর হ'ল না।

কি জানি কেন একটা পুলকে অন্তরটা আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আশীষ আসে নাই বলিয়াই তবে শিপ্রার এ বিষণ্ণতা! সে বলিল—কাল ত বলে দিলেই পারতে। না জানলে—

বাধা দিয়া গ্রীবা হেলাইয়া শিপ্রা বলিল—জান্‌তে হবেও না তোমার! ব'লে ক'য়ে উদ্যোগ ক'রে কাজ করা আমার পোষায় না। মমতা এল, কত করে ধরলে যাবার জন্যে। মাও বললেন—যা'। কিন্তু তোমার জন্যে সব, সব মাটি হয়ে গেল আমার! জান্‌তুম শনিবার, নিশ্চয়ই আস্‌বে তুমি সকাল সকাল, কিন্তু—যাক্, ওসব কথা। শুনেই বা তোমার কি লাভ! বলাই ভুল আমার!

তাহার অভিমান-দীপ্ত মুখখানির প্রতি চাহিয়া মুহূর্ত্তে আশীষের সমগ্র হৃদয়টা উতল হইয়া উঠিল। খপ

করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়াই পরক্ষণে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—রাগ করতে তুমি পার শিপ্রা, কিন্তু—

হোহো শব্দে শিপ্রা হাসিয়া উঠিল। বলিল—কিন্তু রাখ্‌তে পারব না, না আশীষ দা'? সত্যই ধরেছ তুমি। রাগ আমি করতে পারি; কিন্তু কতদিন চেষ্টা করেও তোমার ওপর রাগ রাখ্‌তে পারি নি। কালই আমরা বায়স্কোপ দেখে আস্‌ব—কেমন? তা' হ'লেই শোধবোধ হয়ে যাবে।

আশীষ কথা কহিল না, ঘাড় নাড়িয়া এ যুক্তির মূল্য স্বীকার করিয়া লইল।

এক আধদিন নয়, দীর্ঘ কয় বৎসরের পরের কথা। শিপ্রা প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। সেই উপলক্ষে স্কুল-বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সে সভায় হংস মধ্যে বক যথারই মত আশীষ মাথাটা উঁচু করিয়া বসিয়া আছে।

প্রজাপতির মত বিচিত্র শোভায় সুশোভিতা শিপ্রা এক-একবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া তাহার সারা অন্তরটাকে আলোড়িত করিয়া আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তাহার মুখে হাসি, বুকে হাসি, বুঝি সারা অঙ্গেই হাসির বিদ্যুৎ মাখান। জগৎটা পর্য্যন্ত সে আনন্দের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছে যেন!

সেই আনন্দ-ঘন মুহূর্ত্তে আশীষের মনের উপরও বুঝি একটা স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়াছিল; তাই নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের দল যখন চলিয়া গেল, তখনও তাহার হুঁস নাই। চমক ভাঙ্গিল শিপ্রার আহ্বানে। চাহিয়া দেখিল, নানারূপ আহার্য্য সম্ভার লইয়া শিপ্রা তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে তার সেই বিশ্ব-বিজয়িনী হাসি।

আশীষ এতদিন লক্ষ্য করে নাই, কবে যৌবনের দীপ্তি তাহার প্রতি অঙ্গের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ যাদুকর শিল্পী তাহার মোহন তুলিকায় প্রাণের নিবিড়তম আকাঙ্ক্ষায় মিশাইয়া তাহাকে অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে সাজাইয়াও যেন তৃপ্ত হইতে না পারিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ-দৃষ্টিতে হাতের তুলি হাতে রাখিয়াই হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। যেন সব পাওয়ার মধ্যে চাওয়ার একটা আবেশ লাগিয়া তাহাকে আরও মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে।

শিপ্রা হাসিয়া বলিল—কি দেখ্‌ছ, খেয়ে নাও। সবার সঙ্গে তোমায় খাওয়াতে ইচ্ছে হ'ল না, তাই কষ্ট দিলাম এতক্ষণ।

অপ্রতিভ হইয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া শিপ্রার পায়ের দিকে আশীষ চাহিল। তারপর হাসিয়া বলিল—কষ্টই বটে, মা কোথা' শিপ্রা?

—পূজায় বসেছেন। তোমার খাবার নিয়ে তিনিই আস্‌ছিলেন—আমি জোর করে তাঁকে পূজা করতে পাঠালুম। রাতও ত কম হয় নি—কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব না কি? ওঠো, খাবে না বুঝি?

শিপ্রা তাহার পাশটাতেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—বড্ড খিদে পেয়েছিল, না আশীষ দা'? তাই রাগ সাম্‌লাতে না পেরে খাবারগুলোর ওপরই জুলুম চালাতে চাচ্ছিলে। নেহাৎ আমার আনন্দ-উৎসব—তোমাকে নিয়েই—বিশেষতঃ, গুরু-দক্ষিণা না নিলে অধর্ম্ম হয়, তাই খেতে বস্‌লে। কিন্তু বাবা, তুমি কি কম! সেদিনের কথা আজও মনে আছে—তোমায় খেতে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলুম বলে একমাস জলস্পর্শ কর নি এখানে। কত যে কাঁদিয়েছিলে, তা' কি এরই মধ্যে ভুলে গেছি? তাই ত রাগ করবে বলে ভয়ে ভয়ে ওদের সঙ্গে তোমায় খেতে দিলুম না আমি।

আশীষ হাসিয়া বলিল—শুধু আমায় ভয়ই কর বুঝি শিপ্রা?

—করি বই কি। কিন্তু ও কি, মুখ যে এতটুকু হয়ে গেল! না গো না, ভয় আর করি কোথায়? তা' হ'লে কি এত জ্বালাতেও পারি তোমায়! মার পর তোমার মত সহ্য আর কে করে বলো ত? মা বলেন কি জানো—তুমি ধমক না দিয়ে দিয়ে আমাকে এমনই বেয়াড়া করে তুলেছ যে, পরের ঘর আর আমায় করতে হবে না।

—করতে ঠিক্‌ই ত হবে, না শিপ্রা? মা—বলিয়া আশীষ চুপ করিয়া গেল।

শিপ্রা বলিল—মা কি বলে, থাম্‌লে কেন আশীষ দা'?

মনের মধ্যে তখন তাহার ঝড়ো সমুদ্রের মাতন সুরু হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে কি হইয়া গেল জানি না! হঠাৎ এঁটো হাতেই খপ্‌ করিয়া শিপ্রার একখানা হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া আশীষ ডাকিল—শিপ্রা!

সে আহ্বানে শিপ্রা চমকিয়া উঠিল! আপন অজ্ঞাতেই তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—আশীষ দা'!

—তুমি গুরু-দক্ষিণা দেবে বলে ছিলে না?

শিপ্রা এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল—বলেছিলুম কি, এখন ত বল্‌ছিও। তুমি না পড়ালে বুঝি পাশ করতে পার্‌তুম আমি। কি চাও বলো না—অমন করছ কেন?

—তাই দাও শিপ্রা, তাই দাও, তোমাকেই দক্ষিণা চাই আমি! যদি তুমি বলো—আজই, এখনই আমি মার কাছে তোমাকে ভিক্ষা চেয়ে নেবো। তোমাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু চাইবার নেই আমার!

আশীষ স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাতটার মধ্যে শিপ্রার কুসুম কোমল হাতখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সে ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—আবীর-রঙে শিপ্রার সারা অঙ্গই রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ, সে দু'টী চোখ যে কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল তা' আশীষই জানে! তাহার মনে হইল, যুগ-যুগান্তর হইতে এ দৃষ্টির সহিত সে পরিচিত। এ যেন কয়দিনের নূতন দেখা শিপ্রা নয়, কত সহস্র বর্ষ হইতে এ শিপ্রা তাহারই। ইহাকে লইয়াই তাহার জগৎ জাগিয়া উঠিয়াছে— ইহারই মধ্যে তাহার সমস্তই লুপ্ত হইয়া যাইবে।

উচ্ছল-কণ্ঠে শিপ্রা বলিল—বারে, বসে রইলে যে? খাবে না বুঝি? দক্ষিণা ত জোর করেই আদায় করে নিলে, এখন না খেলে অপরাধ আমার হবে না। কিন্তু ও কি রক্ত! রক্ত কোথা থেকে এলো?

আশীষ যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল—ভয় নেই শিপ্রা, বুকটা একটু চিরে ফেল্‌লুম ইচ্ছা করেই। এস আজ আমার বুকের রক্ত দিয়ে এই পবিত্র ক্ষণটুকুকে বরণ করে নি। এ রক্ত সিন্দুরে তোমার আমার মিলন-সূত্র অক্ষয় হোক্‌। বা বা, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়! সিঁথির উপর ও সিন্দুর দেওয়ার সাক্ষী আকাশের চাঁদ, আর—

শিপ্রা এতক্ষণ নীরবে নিশব্দে মাথাটী নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার সপ্রতিভ চোখ দু'টী তুলিয়া বলিল—আমরা! না?

কিন্তু উত্তর শুনিবার জন্য সে দাঁড়াইলও না। ঢিপ্‌ করিয়া আশীষের পায়ের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল।

আশীষ বিহ্বল-কণ্ঠে ডাকিল—শিপ্রা!

—আবার শিপ্রা! না বাবু, এমনই দুষ্ট হয়েছ তুমি যে, আমায় দিয়ে আর চল্‌ল না! মাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাঁর কাছেই জব্দ হবে 'খন। দেখো, এরই মধ্যেই খেয়ে উঠে পড়ো না যেন—তুমি সব পার।

পূর্ণিমা রাত্রির পিছনেই যে অমাবস্যার অন্ধকার উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, কয়জন একথা চিন্তা করে। আশীষও করিতে পারে নাই। যখন পারিল, তখন না পারিলেই বুঝি ছিল ভাল।

মাতালের মত, উন্মাদের মত সে টলিতে টলিতে শিপ্রাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। রাত্রি এগারটা বহুক্ষণ হইল বাজিয়া গিয়াছে; বারটা বাজে—মেসে কিন্তু ফিরিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না। অপ্রস্তুত চরণে সারা সহর সে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

তাই ত! বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার এ দুষ্প্রবৃত্তি তাহার লইল কেন? কেন সে নিজের যোগ্যতা না বুঝিয়া এতবড় কাঙ্গালপনা করিয়া বসিল? শিপ্রা ধনীর কন্যা, শিপ্রা সুন্দরী, শিপ্রা শিক্ষিতা। তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর পাত্রই ত উন্মুখ হইয়া আছে। তাহার পিতামাতা তাহারই মধ্যে একজনকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে চাহিলে দোষও ত দেওয়া যায় না।

আসিবার সময়কার মার কথাগুলো বারবার তাহার মনে হইতেছিল—কিছু মনে করো না বাবা, ভুল বুঝো না, এ হওয়া সম্ভব নয় বলেই আমায় বল্‌তে হ'ল। না হলে—

আবার না হইলে প্রয়োজন নাই। হাত হইতে হঠাৎ ছোঁড়া বাজিরই মত সে ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। কি লাভ ও নিষ্ফল সান্ত্বনায়? এইটুকুই ত সরল সত্য কথা—তাহাকে ভুলিতে হইবে। শিপ্রার চিন্তা মন হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া না লইতে পারিলে উপায় নাই—কোন উপায়ই নাই। জ্ঞানোন্মেষের পর সে যে জগৎকে দেখিয়াছিল—যে জীবনকে রমণীয় মনে করিয়া তৃপ্তি পাইত, তাহাকেই একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় ধরিয়া লইতে হইবে। মধ্যের কয়টা বৎসর যে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া গেল—তাহাকে সেই ব্যঙ্গই ফিরাইয়া দিবার মত মনোবল সঞ্চয় না করিলেই নয়।

হঠাৎ তাহার নিজের বুকের উপর দৃষ্টি পড়িল। এখন ক্ষত স্থানটার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখনও শুষ্ক রক্তের কতকটা অংশ সেখানে জমাট বাঁধিয়া আছে। সেইদিকে চাহিতে চাহিতে সে হাসিয়া উঠিল। প্রবল উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সে একটা নভেলী কাণ্ড করিয়া বসিল মন্দ না। হয় ত তাহার সযত্নে দেওয়া রক্তের চিহ্নই একদিন শিপ্রার মনে হাসির খোরাক যোগাইবে। হয় ত সুখ-সৌভাগ্যময় সংসারের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া সে তাহার সঞ্চিত করুণা কণা অকাতরে বিতরণের ক্ষণেও একটা আহা শব্দও তাহার জন্য অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে। হয় ত—

কিন্তু এ চিন্তাও তাহার নিকট অসহ্য, অসম্ভব বলিয়া বারবার মনে হইতে লাগিল। পরদিন, তার পরদিন, আরও কতদিন কতবৎসর কাটিয়া গেল। আশীষ না ভুলিতে পারিল শিপ্রাকে, না ভোলাইতে পারিল নিজেকে। আগ্নেয়গিরিরই মত ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল।

সেই শিপ্রা, সেই বিগত দিনের মনোহারিণী শিপ্রা, বিজয়িনী শিপ্রা, আজ কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে চায়। প্রশ্ন করে—মনে আছে কি না তাহাকে? আশ্চর্য্য!

আশীষের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মাথাটা তখন বোধ করি নিঃসন্দেহেই জলশূন্য করা হইয়া গিয়াছে, তাই শিপ্রা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—কেমন আছ? হঠাৎ এখানে এমন বেশে তোমায় দেখ্‌তে পাব এ যে আশাও করি নি।

আশীষ মৃদু হাসিয়া বলিল—আমিও না। মা কোথায় শিপ্রা?

—তুমি চলে যাওয়ার পরই তিনি আত্মহত্যা করে-ছিলেন।

—আত্মহত্যা! সে কি! কি বলো শিপ্রা!

—এ ছাড়া উপায় কিছু ছিল না। কিন্তু ও কথা থাক্। তোমার খবর বলো। বৌদি'কে সঙ্গে এনেছ, না? এক-দিন দেখাবে ত তাঁকে?

বৌদি'!

—হ্যাঁ গো, বুঝ্‌তে পারছ না? অমনি ভুলোই বটে! যিনি এত করে তোমার জন্যে প্রাণপাত করেন, তাঁর কথা মনেও পড়ে না? দেখা হ'লে বলে' দেব—খুব ধমক দিয়ে দিতে, একমাস কথা না কইতে, খাব'র সময় কাছে না বস্‌তে। যখন একেবারে কেঁদে পড়বে, তখন যেন ক্ষমা করেন। ভাল কথা, বৌদি'র ক'টি ছেলেপুলে? তাদের সঙ্গে নিয়েও ত বেরুতে পার্‌তে?

এতক্ষণে আশীষের ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইল। সে হাসিয়া বলিল—পারতাম সত্যি, কিন্তু হয় নি বলেই নিয়ে বেরুতে পারি নি।

—ও মা, একটীও ছেলে হয় নি, কি বলো তুমি?

—বলা ছাড়া আর উপায় কি শিপ্রা। এত বছর কেটে গেল, মনের মত একটী বউই যোগাড় করতে পারলুম না যখন, তখন পুত্রমুখ দেখবার আশা বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হ'ল।

অত্যন্ত সুগোপনে শিপ্রার বুক হইতে একটা ছোট

নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। আশীষ সেদিকে লক্ষ্য করিল না। বলিল—পুন্নাম নরকে যেতেই হবে। ওর জন্যে দুঃখও করি না আর। কিন্তু মা কেন আত্মহত্যা করলেন শিপ্রা?

—স্নেহের টানেই বোধ হয়। কিন্তু সে কথা তুলে আজ লাভ কি? বৃষ্টি ধরে এসেছে; আর খানিক পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলেই ত তুমি চলে যাবে—ততক্ষণ তোমার গল্প বলো আমায়। কোথায় এসেছে এখানে? কতদিন থাকবে? কি করছ এখন? সব, সব বলো, একটাও বাদ দিলে চল্‌বে না।

আশীষ শিহরিয়া উঠিল। কথাগুলা যেন ধ্বক্ করিয়া গিয়া তাহার অন্তরের গোপনতম কাঙ্গাল মনটার রুদ্ধ কপাটে আঘাত করিল। মনে হইল, দীর্ঘদিনের ব্যবধানটাই মিথ্যা, স্বপ্ন! তাহারা দু'জনে সেইদিনেরই মত পাশাপাশি চলিয়াছে। এ মিলন তাহাদের অনন্তকালের—অনন্ত লোকের! ইহার ব্যতিক্রম করাইবার ক্ষমতা বুঝি ভগবানেরও নাই!

কিন্তু সে দৃঢ়তা তাহার মুহূর্ত্তে শ্লথ হইয়া গেল। সর্প-দৃষ্টের মত সে শিহরিয়া উঠিল। ঘরের স্বল্প দীপালোকেও শিপ্রার সিঁথির সিন্দুর যেন সদ্য রক্তের মত টলমল্ করিতেছে। তাঁহার মনে হইল, সে রক্তধারা যেন শিপ্রাকে বেষ্টন করিয়া পরমোল্লাসে নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

এখানে তাহার স্থান নাই। তাহাকে বাহিরে যাইতেই হইবে। বৃষ্টি যতই হোক্, এ আশ্রয় তাহার জন্য নয়। পথের জন্যই যাহার জন্ম, ঘরের মায়া তাহার সাজে না। এ নির্বুদ্ধিতা কেন আসিল তাহার?

আশীষ উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—ঠিক্ই বলেছ শিপ্রা, কি লাভ ও কথা তুলে। বৃষ্টি ধরে এসেছে; হয় ত আবার নাম্‌তে পারে—বেরিয়ে পড়াই ভাল। গৃহস্থের বাড়ী এসে গৃহ-কর্ত্তার সঙ্গে না দেখা করে গেলে অপরাধ হয় জানি—কিন্তু উপায় নেই, বাধ্য হয়েই চলে যেতে হ'ল। তাঁকে আমার কথা বলো; সময় পাই ত তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করেও যেতে পারি।

শিপ্রা কোন কথা বলিল না, কোন প্রতিবাদ করিল না, শান্ত সুবোধ বালিকার মত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

আশীষ বাহির হইয়া অন্ধকার পথের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

শিপ্রা সেই পথের পানে চাহিয়া রহিল। ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া তাহার চুলগুলা লইয়া খেলা সুরু করিয়া দিল। দূরের একটা গাছের মধ্য হইতে পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিল। আকাশে কড়কড় শব্দে বাজ ডাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া সারা স্থানটা আলোকিত করিয়া নিবিয়া গেল। শিপ্রা দেখিল—বাদল-রাত্রির অতিথি বাদলের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়াছে—খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া বিপর্য্যস্ত স্থানটাকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল।

সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া কখন আশীষ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কে জানে! যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। কে যেন সারা বুকটায় বিশ মণ পাথর দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। কাশিতে গেলেই কি অসহ্য যন্ত্রণা!

আশীষের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কাল মাথার উপর যে বৃষ্টিধারা আশীর্ব্বাদরূপেই বহন করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল—তাহার ফল দেখা দিয়াছে। আর রক্ষা নাই! বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পৃথিবীর আলো তাহার নিকট কয়দিনেই ম্লান হইয়া যাইবে।

কিন্তু সব কথা আশীষের কাণে গেল কি না সন্দেহ। সে নির্জ্জীবের মত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ঘুম আসিয়াছে মনে করিয়া অমর নীরব হইল। খানিক পরে লেডি ডাক্তার আসিতেই সে উঠিয়া পড়িল।

ভাগিনেয় হাসপাতালের ডিউটিতে গিয়াছিল। ভগ্নী এত বেলায়ও ভাইটী কেন উঠে নাই দেখিবার জন্য সাধ্যমত শুচিতা বাঁচাইয়া যথাসম্ভব গলাটী লম্বা করিয়া

ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বলিলেন—কিরে, এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি তোর?

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলেও না উঠিবার কারণ বলিতেই তাঁহার হাত হইতে মালাটা পড়িতে পড়িতে আটকাইয়া গেল। তিনি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—জ্বর! বলিস্ কি রে! তাও বলি, এ শরীরেও ভেজে। দেখো দিকি, বিদেশে বিভূঁয়ে কি বিপদেই পড়্লি! এখনও আস্তে আস্তে কোলকাতা চলে যা' বরং। সেখানে ভাল ডাক্তার, ভাল কবিরাজ আছে—দুটো বড়ি দিলেই সেরে যাবে। হ্যাঁ, এরাও আবার ডাক্তার, এদের হাতে রুগী থাক্‌লেও বাঁচে কখন!

আশীষ কোন উত্তর করিল না। দিদির এই যে বিপদ এড়াইবার চেষ্টা, ইহা ত স্বাভাবিকই—কে কার হাঙ্গাম লইতে চায়? এ জন্য দোষ দেওয়াও ত চলে না। সেই ভাল। আজই কোন রকমে গাড়ীতে গিয়া চাপিয়া বসিতে পারিলে যেমন করিয়াই হোক্ সেখানেই হোক্ পৌঁছাইতে পারিবে। মরিতে হয়—পথের যাত্রী, পথে মরাই ত ভাল! আশীষ বলিল—তুমি ঠিক্ই বলেছ দিদি, তাই যাবো আমি। অমর আসুক। একটা ক' মিনিটের একখানা গাড়ী আছে না?

দিদি কথা কহিলেন না। আশীষ শুনিল, বৌমা মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন—মাব যেমন কথা! তাও কি হয় না কি। উনি সেরে উঠে—

দিদির কণ্ঠ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—'মা বিয়োল না বিয়োল মাসী,ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া-প্রতিবাসী।' তোমারও হয়েছে তাই বৌমা। আশীষ আমার ভাই, আমার তার জন্যে হ'ল না দরদ, দরদ হ'ল তোমার। আহা, বেচারী বিদেশে বিভূঁয়ে—

আশীষ হাসিয়া ফেলিল। দিদি ঠিকই বলিয়াছেন—পাড়া-প্রতিবাসীর ঝাল খাইয়া মরা নিষ্প্রয়োজন। বৌমা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি অল্প, সাংসারিক জ্ঞান তাহা হইতেও অতাল্প, তাই এ বাজে বোঝাকেও কাজের মনে করিয়া মাথা ঘামাইতেছেন। সে হাসিয়া বলিল—আপনি চুপ করুন বৌমা। দিদির হিসাবে ভুল নেই, মিথ্যাও বলেন নি, যেতেই হবে আমায়।

কিন্তু যাওয়া উচিত হইলেও সে যাইতে পারিল না।

দিন দুই পরে যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। ভাগিনেয় মাথার শিয়রে বসিয়া আছে। ডাকিল—মামাবাবু।

আশীষ চাহিয়া দেখিল হাসপাতালের একটা ঘরেই সে শুইয়া আছে। তাহাকে এদিক-ওদিক চাহিতে দেখিয়া অমর বলিল—আপনাকে এখানে এনেই তুলেছি। জানেন ত মাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। ছুঁই ছুঁই করেই ব্যস্ত। আপনাদের বৌয়েরও আপনাকে ছুঁতে নেই। মা বল্‌লেন—তা'তে তার নরকে বাস হবে। তাই—

সংসারের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা এখন ইহার হয় নাই, এখন হৃদয়টা কুসুমসম কোমল, তাই বেচারী সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। আশীষ তাহার শীর্ণ হাতখানি নিজের বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—এ তুমি ভালই করেছ বাবা, আমার কোন কষ্ট হবে না।

—না মামাবাবু, সত্যিই কষ্ট আপনার হবে না। শিপ্রা দি'—

—শিপ্রা দি'!

—হাঁ মামাবাবু, শিপ্রা দি', তিনি এ হাসপাতালের লেডি ডাক্তার। দয়ার অন্ত নেই তাঁর—গুণেরও না। এত বড় মন আমরা খুব কম দেখেছি। তিনি এই কতক্ষণ হ'ল খেতে গেছেন; এখনই ফিরবেন, আর বাড়ী যাবেন না। আপনার কাছেই ত থাকেন রাতদিন।

—ওঃ বলিয়া আশীষ চুপ করিল।

—তাঁর গুণের কথা বল্‌তে গেলে শেষ হয় না। এই হাসপাতালে এসে প্রসব হ'তে গিয়ে একটা মেয়ে মারা গেল। তার ক'টি কচি ছেলে আর বুড়ো বাপ। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন—নিজের কোয়ার্টার ছেড়ে, বাড়ী-ঘর ছেড়ে তাদের সেই কুঁড়ে ঘরে গিয়ে উঠে তিনি ছেলেপুলে-

গুলিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বল্‌লে বলেন কি জানেন—মেয়েদের কাজই যে হ'ল ছেলেপুলে মানুষ করা। এর চেয়ে বড় গৌরব আর তাদের নেই। যদি একটু সে সুযোগ জুটেই গেল, ছাড়ি কেন বলুন? কাল তাদের বাপ এসে সব নিয়ে গেছে; উনিও আপনাকে নিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু সব কথা আশীসের কানে গেল কি না সন্দেহ। সে নির্জীবের মত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া অমর নীরব হইল। তারপর খানিক পরেই লেডি ডাক্তার আসিতেই সে উঠিয়া পড়িল। বলিল—একটু আগে জ্ঞান হয়েছিল, এখন আবার তন্দ্রা এসেছে। বসুন। আমি খেতে যাই তা' হলে?

নিশ্চয় বলিয়া লেডি ডাক্তার ধীরে ধীরে আসিয়া আশীসের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অত্যন্ত সন্তর্পণে খুলিয়া যাওয়া চাদরখানা গায়ে চাপা দিয়া উঠিয়া আসিতে যাইতেছিল, কিসের আকর্ষণে ফিরিয়া দেখিল—আশীস দৃষ্টি মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে।

আশীস মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—শিপ্রা।

শিপ্রা উত্তর দিল—কি বল্‌ছ? আবার আশ্চর্য্য হয়ে গেছ আমাকে দেখে, না?

—না, আর আশ্চর্য্য হই নি। শুধু ভাবছিলুম কি জানো, মরতে আমার দুঃখ নেই, ভয় নেই, চিন্তা নেই, শিপ্রা।

—ওই কথা শোনবার জন্যেই কি আমায় ডাক্‌ছ তুমি?

—না, বসো, কথা কও।

শিপ্রা বসিয়া পড়িল। বলিল—ভয় কি, তুমি ভাল হয়ে যাবে।

—তাই হয় ত যাব। কিন্তু এখানে আমি থাকতে চাই না। তোমার স্বামীকে বলে আমায় তোমার বাড়ী নিয়ে চলো। আজ আমি ঘর চাই, আমি আশ্রয় চাই, মরতে হলে এমন জায়গায় মরব—

—আবার? আবার যা' তা' বক্‌ছ? বেশ ত, আমার কাছে যেতে চাও, আজই চলো না তুমি। স্বামীর অনুমতি আমার নেওয়া আছে—তাঁর আজ্ঞা আমি পেয়েছি—এখনই তোমাকে নিয়ে যাব আমি। আগেই নিয়ে যেতুম, কিন্তু—

—কিন্তু থাক্, আমায় নিয়ে চলো। এখানের সমস্ত মৃত আত্মাগুলো আমাকে ডাক্‌ছে—আমাকে বল্‌ছে কি জানো—ওরে অসহায় পথের আবর্জ্জনা, তোকে পথেই থাক্‌তে হবে, পথেই মর্‌তে হবে! আয়, চলে আয়! ঘরের মায়া তোর কি সাজে?

—না, আমাকে উঠে যেতে হ'ল। ও গো, তুমি চুপ কর, লক্ষ্মীটী! তুমি ত কখনো আমার কথা অনাদর কর নি, তবে আজ কেন করছ! আমি বল্‌ছি—তুমি ভাল হবে। কে বলে পথের আবর্জ্জনা তোমায়, তোমাকে পাবার জন্যে ঘর যুগ যুগ ধরে তপস্যা করছে, তবু উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি তোমার।

—তাই হোক্ শিপ্রা, তোমার কথাই আজ সত্য হোক! ওরা নির্ম্মম আক্রোশে ঘুরে মরুক! আমায় কখন নিয়ে যাবে তুমি? আচ্ছা শিপ্রা, আজ তুমি গান গাইতে পার? আমার কাছে গাইতে অমত হবে না বোধ হয়। আমি যে আতুর—আতুরের কাছে গাইলে অপরাধও হবে না হয় ত। গাইবে?

শিপ্রা সজল দৃষ্টি তুলিয়া আশীসের মুখের পানে চাহিল। বলিল—গাইব বই কি, কোন অপরাধ হবে না আমার।

আশীস বলিল—তবে সেই গানটাই গেয়ো। ভুলে গেছ, না? সেই যে—

তাই হবে গো, তাই হবে!
নখের মাথা ক্ষয় করে আর গুণ্‌ব না সেদিন কবে?
রইল পায়ে এই মিনতি,
ও গো আমার চরম গতি,
শেষের দেখা পাই যেন নাথ শেষের দেখার দিন যবে!

শিপ্রা বলিল—তাই গাইব। কত গান গাইব। কত কত কথা বল্‌ব। তোমাকে শোনাবার জন্য যে আমি সব সঞ্চয় করে রেখেছি। শুধু ক'টা দিনের জন্যে তুমি স্থির হও। ও শরীরে বেশী কথা কতে নেই, কোন চিন্তা

—করতে নেই, শুধু চুপ করে শুয়ে থাকতে হয়। মিনতি আমার—তুমি চুপ কর।

আশীষ হাসিল, আর কথা কহিল না।

সেইদিন বিকালেই শিপ্রা হাসপাতাল হইতে আশীষকে জোর করিয়া একটা নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে আনিয়াছে। সহরের সমস্ত ডাক্তারকে জড়ো করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু নিষ্ফল প্রচেষ্টা! দিনের পর দিন বুকের অবস্থা খারাপের দিকেই চলিয়াছে। সন্ধিতে বুকের দুইটা ধারই ছাইয়া গিয়াছে। আশীষেরও বুঝিতে বাকী নাই, শিপ্রার ত নয়-ই। সেদিন অসহ্য যন্ত্রণার পর আশীষ যেন কতকটা সুস্থ বোধ করিয়া চুপ করিয়াছিল।

পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদের একটা কিরণ ছটা আসিয়া আশীষের মুখের উপর পড়িয়াছে। বাহিরে হাসনুহানা ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া বাতাস ঘরটাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়া অনাসক্ত সন্ন্যাসীর মত আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছে। আশীষ ডাকিল—শিপ্রা।

তপশ্চারিণীর মত শিপ্রা পার্শ্বেই বসিয়াছিল। বলিল—কি বল্‌ছ?

—ক'দিন তোমার কথা রেখেছি। কিন্তু আজ আমার কথা রাখ্‌তে হবে তোমায়।

—কি কথা বলো?

—বুকে আর কোন কষ্টই মনে হচ্ছে না, কোন চাপও না। আজ শুধু গল্প করব দু'জনে। অনেক গল্প—অনেক। আচ্ছা ক' দিন গেল, তোমার স্বামী কোথায় শিপ্রা? তিনি ত একবারও আমার কাছে আসেন না।

এ ভাল থাকাটা শিপ্রাকে ভীত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—ও কথা ছাড়া কি আর কোন কথা নেই তোমার? নাই বা এলেন তিনি সাম্‌নে, কি এসে যায় তা'তে। কেন আমি ত রয়েছি, এতে হয় না?

—তা' বটে, আর তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করব না। কিন্তু তোমার কথা—মার কথায় সেদিন তুমি বল্‌লে—কি, কি লাভ ও সব জেনে। আমারও মনে হয়েছিল কি লাভ ও সব জেনে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কি জানো শিপ্রা—শুধু লাভ আর লোকসান নিয়েই জগৎ চলে না। আর কিছু আছে—আর কিছু। তা' ছাড়া, যদি এতদিন লাভ খতিয়ে এসেই থাকি, আজ না হয় কিছু বেশী লোকসানই সঞ্চয় হ'ল। বলো তুমি? মা কেন আত্মহত্যা করলেন শিপ্রা।

শিপ্রার মুখখানি মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—একান্তই যদি শোনা তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শোনো—মার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না বলেই তিনি করেছিলেন। মা কে ছিলেন জানো—পতিতা, আর আমি তার পতিতা কন্যা!

—শিপ্রা!

—জানি, এ দুঃখ তোমার কাছে কত বড়, কত কঠিন হবে—তাই না এতদিন বলি নি তোমায়। কিন্তু শুনতে যখন আরম্ভ করেছ, তখন শেষ অবধিই শুনে যাও। মুহূর্ত্তের ভুলে যখন তিনি ভুল পথে পা দিলেন, তখন কত বড় পরাজয় তাঁর হ'ল তা' বুঝ্‌তে পারেন নি—পারলেন সেদিন, যেদিন আমি এসে জন্মগ্রহণ করলুম। প্রথম তাঁর মনে জাগ্‌ল—খুকীর পরিচয়। কি বলে পরিচিত হবো আমি জগতের কাছে?

—তিনি কিছু খুঁজে পেলেন না। কেঁদে কেটে আমাকে তখনই পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে মুক্তি দিতে গলাটায় হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। কেঁদে উঠ্‌লুম। করুণ চোখে তাঁর মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌লুম। তাঁর ভেতরের মাতৃত্ব তাঁকে অবশ করে ফেল্‌লে। হাত খসে গেল গলা থেকে—বুকে তুলে নিলেন।

—মানুষ হ'তে লাগ্‌লুম। যখন জ্ঞান হ'ল, শুন্‌লুম—বাবা সন্ন্যাসী। মার স্নেহের ছায়ায় বাবার অভাব কোন দিন মনে হ'ল না। তারপর কেমন করে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, কেমন করে একদিন ছেলেখেলার মধ্যে দিয়ে তুমি দিলে আমার মাথায় রক্তের সিন্দুর পরিয়ে সে ত জানই? কিন্তু মা এ বিয়েতে রাজী হলেন না। বল্‌লুম—হিন্দুর মেয়ে দু'বার বিয়ে হয় না মা, উনি আমার স্বামী। ওঁকে ছাড়া কোন পুরুষের ছায়া যদি এ বুকে পড়ে, তা' হ'লে আমার সতী-মার মুখ দেখাবার জায়গা থাক্‌বে না। মেয়েরও না। এ ত তোমারই গৌরব মা। আশীর্ব্বাদ কর—যেন তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়। সতী-রাণীর আশীর্ব্বাদ—

—দেখ্‌লুম মা কাঁদছেন। পাগলের মত, ছোট্ট মেয়ের মত। বল্‌লুম—কাঁদছ কেন মা? তুমি ত জানো, পয়সার চেয়ে স্বামী কত বড়। তা' ছাড়া, এ যে যুগ যুগান্তের সম্পর্ক আমাদের! এ কি ভাঙ্গবার? এ কি ভাঙ্গে?

—মা আর কোন কথা কইলেন না, উঠে চলে গেলেন।

—অভিমানে আমিও আর কথা না বলে বাইরের ঘরে এসে দোর দিলুম। পরদিন সকলের ডাকে যখন ঘুম

ভাঙ্গল—তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মার বিছানায় পড়ে আছে একখানি চিঠি—তা'তে তিনি তাঁর পরাজিত জীবনের কথা লিখেছেন—আশীষকে আমি ছেলেরই মত ভালবাসতাম মা। তাকে ঠকিয়ে তোকে তার হাতে তুলে দিতে পারলুম না কোনমতেই। আর তোর কাছে এ মুখ দেখাবার যোগ্যতাও হ'ল না আমার। তোকেও বলা উচিত ছিল আমার—কিন্তু পারি নি মা, কোনমতেই বল্‌তে পারি নি! চল্‌লুম। জানি, ক্ষমা চাওয়া অপরাধ, ক্ষমা করাও সহজ নয়। তবু আশীর্ব্বাদ করি—আমার ভুলের দণ্ড যে তোকে জীবন ভোর বইতে হ'ল এর জন্যে যোগ্য মনোবল যেন তোর থাকে!

শিপ্রা নীরব হইল।

আশীষ ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবে তোমার বিয়ে হয় নি আজও?

শিপ্রা হাসিতে চাহিয়া বলিল—কে বল্‌লে হয় নি! মানুষের সঙ্গে ত বেশ্যার মেয়ের বিয়ে হয় না—হয়েছে বই কি; সে একখানা ছুরির সঙ্গে। তাকেই—

—শিপ্রা!

শিপ্রা চমকিয়া উঠিল।

আশীষ উঠিয়া বসিল। বলিল—মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয় না কে বল্‌লে তোমায়?

—আমার মন।

—ও তোমার মনের ভুল স্বপ্ন শিপ্রা। ভালবাসার কোন জাত নেই, কোন ধর্ম্ম নেই, কোন বিধি-নিষেধ নেই। সে নিজেই শাশ্বত, স্বয়ম্ভূ—সেই ত ভগবানের আসল রূপ। তার কণামাত্র কল্পনায় আন্‌তে পেরেছিল বলেই রাধার স্মৃতি আজ মানুষের মনে জাগরূক হয়ে তাকে ধীরে ধীরে অমরতার পানে টেনে নিয়ে চলেছে। এই ভালবাসার জোরেই নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসুলী ব্যক্তি বিশেষের পূজা পেলেও, সর্ব্ব জাতির, সর্ব্ব ধর্ম্মের মানুষের মনের পূজা পেয়ে চলেছে চণ্ডিদাস।

আশীষ নীরব হইল। শিপ্রা ধীরকণ্ঠে বলিল—তোমার কথা আমি স্বীকার করে নিলুম—কিন্তু দেহ ত জাতের অধীন, সমাজের অধীন, একথা স্বীকার করতেই হবে।

আশীষ হাসিল। বলিল—তা' অস্বীকার করতে চাইও না আমি। কিন্তু সমাজ বলো, জাতি বলো, সবই ও মনকে তৈরী করার জন্যেই প্রয়োজন শিপ্রা। তোমার যে দেহ, যে মন দীর্ঘ তপস্যায় নিজেকে পবিত্র অপাপবিদ্ধ করে তুলেছে, তার জন্যে শাস্ত্র চিরদিনই উদার, উন্মুক্ত। আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম দিয়ে শুধু বইয়ের পাতা খুঁজলেই ত সব খোজা হ'ল না, মনের পাতা খুঁজতেও ত হবে। কিন্তু ও কথা থাক্‌। ও তর্ক মীমাংসার জন্যে রইল সাম্‌নের অসংখ্য অনাগত দিন। অসংখ্য অনাগত জীবন। এক-দিন আমার বুকের রক্তে হয়েছিল আমাদের বিবাহ, আজ জীবনের বিনিময়ে হোক্‌ ফুলশয্যা। এস, আমার কাছে, আরও কাছে সরে এস শিপ্রা! আমি তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না—সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার আমায় ঘিরে ধরেছে! আমায়—

শিপ্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল—ও গো, চুপ কর! তুমি ক্লান্ত, তুমি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম না কর্‌লে—

—বিশ্রাম! শিপ্রা, আজ আমার চির-বিশ্রামের দিন! বিশ্রাম করব বলেই ত প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। পাথেয় সঞ্চয় করে নিচ্ছি। এস, আরও কাছে এস! পায়ের কাছে নয় শিপ্রা, পায়ের কাছে নয়—আমার কাছে এসো। আমি ঘর পেয়েছি, আমি আশ্রয় পেয়েছি, কোন দুঃখ নেই আর —ও কি অমন করে জান্‌লা বন্ধ হ'য়ে গেল কেন? খুলে দাও, খুলে দাও শিপ্রা, দম বন্ধ হয়ে এল আমার।

—জান্‌লা খোলাই আছে। আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি এল বলে। তাই অন্ধকার হয়ে গেছে।

—বৃষ্টি! বৃষ্টি এ নয় শিপ্রা, এ আমাদের মিলনে স্বর্গের দেবতাদের আশীর্ব্বাদ! শিপ্রা, পরজন্ম মান?

—মানি।

—তবে আবার দেখা হবে আমাদের?

—হবে।

আশীষের মাথাটা শিপ্রার বুকের উপর। শিপ্রা তাহাকে ধীরে ধীরে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—আশীষের চোখ দুইটী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। কণ্ঠ নীরব। তবে—তবে কি?…চঞ্চল হইয়া আশীষের বুকে হাত দিতেই শিপ্রা শিহরিয়া উঠিল। স্পন্দন নাই।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ও গো স্বামী, দেবতা আমার, কথা কও, কথা কও! জন্ম মানুষের হাতে নয়, কর্ম্ম মানুষের হাতে—আমি কর্ম্মের দ্বারা তোমাকে ফিরে পাবো বলেই যে এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম! যদি যাবেই, আমায় নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—

কিন্তু সাড়া মিলিল না। আকাশে মেঘ হুঙ্কার করিয়া উঠিল। বৃষ্টিধারা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া করুণা করিয়াই যেন স্বামীর বুকের উপরকার মূর্চ্ছিতা শিপ্রার দেহের উপর সান্ত্বনা ছলেই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেত্রী

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

জীবন স্রোতের মাঝখানে হঠাৎ অনুরাধার সঙ্গে পরাগের দেখা। থিয়েটার থেকে ফেরবার মুখে পরাগের সহসা খেয়াল হ'ল একবার সে অনুরাধাকে দেখ্‌বে। চমৎকার তার অভিনয় চাতুর্য্য! অভিনেত্রীদের গাড়ী আসার প্রতীক্ষায় সে থম্‌কে দাঁড়াল। কোথা দিয়ে কি যে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল তখন তা' সে জানলে না, যখন জানলে তখন সে বিস্মিত নেত্রে চারিদিক চেয়ে দেখে ভাবলে, সে কোথায়! তাকে আর ভাববার অবসর না দিয়ে একটী তরুণী তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে, হাতের গরম দুধের বাটিটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে বল্‌লে—এই যে জেগেছেন দেখ্‌ছি।

পরাগের মনে হ'ল হয়ত বা সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে—আমি কোথায় বলুন তো?

তরুণী হেসে জবাব দিলে—জলে পড়ে নেই নিশ্চয়, এই দুধটুকুন খেয়েই না হয় পরে শুনবেন 'খন, কারণ দুধের উত্তপ্ততার পরমায়ু অতি অল্প।

দুধের বাটিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে—মা গো, বড় আপন-ভোলা মানুষ তো আপনি, এত 'হর্ণ' দেওয়া সত্ত্বেও···আর আমার নতুন সোফারটা একটা আস্ত আনাড়ী!

এই তরুণীকে দেখে পরাগের মনে কি একটা রহস্যের জাল সৃষ্টি করছিল, এমন সপ্রতিভ ব্যবহার সে খুব কম মেয়েদেরই দেখেছে, এ যেন এক রহস্যময়ী। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে তরুণীটির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল।

রংটা ফর্সা না হলেও, দেহের উজ্জ্বল শ্যামলিমা আর দুইটি চোখের স্নিগ্ধ কমনীয়তা তাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেল্‌লে।

হেসে তরুণী বল্‌লে—আর দেরী করবেন না, দয়া করে দুধটুকুন খেয়ে ফেলুন, গায়ে একটু জোর পাবেন।

পরাগ জবাব দিলে—তা' না হয় খাচ্ছি, কিন্তু আমার জন্যে দয়া করে একটা গাড়ী ডাকিয়ে দিলে ভাল হয়।

—গাড়ী! কি হবে? বিস্মিত হয়ে তরুণী প্রশ্ন করলে।

পরাগ উত্তর দিলে—মেসে তো যেতে হবে, আর তা' ছাড়া, রোগ সারার ভরসা করতে গেলে কবে যে যাওয়া হবে, তা' অজানার হাতে।

—না হয় অজানার হাতেই ছেড়ে দিলেন, আপনার থাকার দ্বিধার কারণ কি হতে পারে জানি না, তবে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, কি বলে' আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

সশব্যস্তে পরাগ উত্তর দিলে—ছি ছি, আপনি কি বল্‌ছেন! ইচ্ছে করে আমায় চাপা দেন নি নিশ্চয়! আচ্ছা, আপনার বাবা মা কাউকেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

—হয়তো পরে সবই পাবেন দেখ্‌তে। হেসে অনুরাধা বল্‌লে।

পরাগের মনে রহস্যের জাল যেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

পরাগের মুখের দিকে চেয়ে 'ফিক্‌' করে হেসে তরুণী আবার বল্‌লে—বাপ মা না হয় নাই রইলো, তা' হলেও আপনার সেবার কোন ত্রুটী হবে না।

পরাগ ভাবলে, এ মেয়েটা বলে কি! আবার তরুণী বল্‌লে—পুরুষ দেখ্‌লেই যে 'হাঁ' করে গিলে ফেলবো, আমরা বাঘ না ভালুক, আমাদের কী ভাবেন বলুন তো?

পরাগকে যেন বিহ্বল করে তুল্‌লে। খানিক পরে তরুণী বল্‌লে—আচ্ছা, আপনাকে কি বলে ডাক্‌বো?

—কি বলে ডাক্‌বেন? আমার নাম পরাগ রায়।

বিস্মিত হয়ে তরুণী প্রশ্ন করলে—কোন্ পরাগ রায়, যিনি ঔপন্যাসিক, তিনি কি?

—ঔপন্যাসিক বলে লজ্জা দেবেন না। তবে হ্যাঁ, লেখ্‌বার একটু 'বাই' আছে।

—চমৎকার আপনার উপন্যাসগুলো! তা' হলে আপনার সঙ্গে আলাপ করে ঠকি নি নিশ্চয়—কি বলেন? সেদিন 'প্লে' তো দেখ্‌লেন, কিন্তু কার অভিনয় আপনার ভাল লাগ্‌লো?

পরাগ উত্তর দিলে—অভিনয় দেখ্‌তে ঠিক যাই নি, আমার লেখা 'জীবন-নাট্য' বলে একটা নাটক ওখানে অভিনয়ের জন্য দিয়েছিলুম, 'প্লে'ও হবে। অনুরাধাকে নিশ্চয় চেনেন—চমৎকার তার শিল্প প্রতিভা! আমার নাটকের 'কাষ্টিং'-এ তার নাম দেওয়া হয় নি শুনে গেছলাম ম্যানেজারের কাছে—আমার বই-এ তাকে নামাবার জন্যে অনুরোধ করতে। অমনি তার অভিনয় দেখে এলাম, চমৎকার বলেও যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

মুচ্‌কি হেসে তরুণীটি বল্‌লে—তাই বুঝি সেদিন অমন করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে দেখ্‌তে পাওয়ার আশায়?

অপ্রতিভ হয়ে পরাগ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে। সে যেন ধোঁয়ার মতই কথাটাকে হাল্‌কা করে দিতে চায়। তারপর প্রশ্ন করলে—আমার তো নাম-ধাম সব নেওয়া হ'ল, কিন্তু আপনার?

—আমার নাম অনুরাধা, যার অভিনয় দেখে তারই গাড়ীতে চাপা পড়েছিলেন। বলে সে হেসে উঠলো।

পরাগ হতবাক্ হ'য়ে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরোল—অ-নু-রা ধা!

দিন যায়, অনুরাধাকে পরাগ বুঝ্‌তে পারে না, বিশ্ব-শিল্পী ওকে যেন কী দিয়ে গড়েছে। অনুরাধাকে তার বল্‌বার কত কথাই না আছে, কিন্তু বল্‌তে পারে না, সব কথা তার মনের মধ্যে যেন 'জট' পাকিয়ে যায়, তার আর বলা হয় না। বিনা কারণে সে ডাকে—অনুরাধা!

অনুরাধা দাঁড়াতেই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—জল, হ্যাঁ, এক গেলাস বেশ ঠাণ্ডা জল দাও দেখি।

অনুরাধার হাত থেকে জল নিতে গিয়ে হয়তো আঙুলে আঙুল ঠেকে যায়, ভাল করে ধরবার আগেই গেলাস মাটিতে পড়ে গিয়ে মেঝেটা জলে জলময় হয়ে ওঠে, অমনি অনুরাধা বলে ওঠে—কী অকর্ম্মা বলুন তো, জল তাও নিজে পারেন না খেতে?

হয়তো বা অনুরাধাও বুঝতে পারে তার ভক্ত পরাগকে। সেও যেন কী বল্‌তে যায়, পারে না। জীবনের স্রোতে তো কত পুরুষই না এলো গেলো, কিন্তু একজনও পরাগের মত নয়—সুন্দর পরাগ, তার একনিষ্ঠ ভক্ত পরাগ!

সেদিন পরাগ জ্বরে একেবারে 'বেহুঁস' হ'য়ে পড়েছিল, অনুরাধা তার কপালে 'ওডিকলনে' ন্যাকড়া ভিজিয়ে প্রলেপ দিয়ে মাথায় 'আইস্‌ব্যাগ' ধরে পরাগের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখ্‌ছিল। পরাগের সেবার ভার আর কাউকে সে দেয় নি, এ কাজ নিজে হাতে নিয়েছে। জ্বরের তাপে পরাগের মুখটা যেন লাল হয়ে উঠেছে, আর সেই মুখ দেখার তৃপ্তি অনুরাধার কিছুতেই মিট্‌ছিল না। তার অজ্ঞাতে কখন যে তার মুখটা নীচে নেবে এসেছিল তা' সে জানে না, হঠাৎ পরাগের ডাকে সে চমকে উঠলো।

চোর চুরি করতে এসে ধরা পড়লে যেমন তার অবস্থা হয়, তেমনি প্রাণপণ শক্তিতে অনুরাধা ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

•

ক্রমে এক মাস কেটে যায়। পরাগের ক্ষত প্রায় সেরেই এসেছে। অনুরাধা তার কাছে যেন আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। পরাগ বল্‌লে—আমিও ঠকি নি অনুরাধা, সত্যি সেদিন তোমার জন্যেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু অন্যদিন যাকে দেখ্‌বার জন্য মন

চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আজ তাকে এত কাছে পেয়ে… আচ্ছা অনুরাধা—

অনুরাধা পরাগের দিকে তাকালে, পরাগ বল্‌লে—আর তোমায় অনুরাধা বলে ডাকবো না। তুমি সকলের অনুরাধা, কিন্তু আজ থেকে তুমি আমার কৃষ্ণকলি, বুঝ্‌লে তোমায় কৃষ্ণকলি বলেই ডাক্‌বো।

হেসে অনুরাধা বল্‌লে—রবিবাবুর কৃষ্ণকলি না কি ?

পরাগ জবাব দিলে—হ্যাঁ। বলে সে আবৃত্তি করতে লাগ্‌লো।

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
আর যা' বলে যত গাঁয়ের লোক,
মেঘলা দিনে—

বাধা দিয়ে অমনি অনুরাধা বলে উঠ্‌লো—মেঘলা দিনে নয়। বলে সে আবৃত্তি করল—

"স্টেজের মাঝে দেখেছিলাম আমি
অনুরাধার কাজল মাখা চোখ।"

বলে সে হোহো করে হেসে উঠে বল্‌লে—কেমন মিল হ'ল না ?

পরাগকে সেবা করবার জন্যে অনুরাধা থিয়েটারে দু' মাস ছুটি নিয়েছিল। আরোগ্যের পথে তাকে দেখতে পেয়ে অনুরাধার যে আজ আনন্দ হয় নি তা' নয়, কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যেও তার মনে পরাগকে হারাবার একটা বেদনা যে আঘাত করে নি এ কথা অস্বীকার করলেও মিথ্যা বলা হয়। এমন দিন এল, যেদিন পরাগ শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একদিন সে অনুরাধাকে বল্‌লে—আর কত দিন এমনি করে আট্‌কে রাখবে কৃষ্ণকলি, এখন তো আমি সুস্থ।

ছলছল চোখে অনুরাধা উত্তর দিলে—আটকে রাখার তো কিছু নেই আমার, আর তা' ছাড়া কেনই বা আটকাতে যাবো, আজই কি যাবেন ?

—আজ যেতে দিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তোমার কথায় না হয় একটা দিন থেকেই গেলাম, তা'তে আমার লোকসান হবে না নিশ্চয়।

বলে সে হাস্‌তে লাগ্‌লো। অনুরাধা জবাব দিলে—লাভ লোকসানের অঙ্ক অত খতিয়ে দেখার অবসর নেই, আর আমার কথা রাখ্‌তে গিয়ে যদি সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হয়, তা' হলে নাই বা থাক্‌লেন, অমন অযথা কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই।

সহসা অনুরাধার চোখটা সজল হয়ে উঠ্‌ল, পরাগ মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনুরাধার ঐ কাজল-মাখা চোখ দু'টির দিকে চেয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। নারীর চোখের জল সে বোধ করি এই প্রথম দেখ্‌লে। অনুরাধা কি যেন বল্‌তে গিয়ে পরাগের দিকে তাকিয়ে রইলো, তাদের ঐ দৃষ্টি বিনিময়ে কি যে ছিল, কেবল তারাই জানে, জানবার মত তৃতীয় প্রাণী সেখানে আর ছিল না।

দু'টী তরুণ-তরুণীর বৈচিত্র্যপূর্ণ তরুণ হিয়া যেন পরস্পরকে নিবিড় ক'রে আনে। থিয়েটারে পরাগের নাটকের মহলা পুরোদমে চলেছে। পরাগ থিয়েটারে যায়, অনুরাধার সঙ্গে দেখাও হয়। হয়তো বা কোনদিন পরাগ মেসে যায়, আবার কোনদিন যায়ও না—অনুরাধার ওখানে থাকে। পরাগের মনের মন্দিরে ভেসে ওঠে নায়কের পাশে অনুরাধার নায়িকার রূপ। তার সমস্ত অন্তরে কিসের মেঘ যেন ঘনিয়ে আসে। সে ভেবে পায় না অনুরাধা কেমন করে নায়কের কাছে অমন প্রেম নিবেদন করে, তার তো কোথাও একটুও বাধে না। অনুরাধার ডাকে চম্‌কে সে সাড়া দেয়, কিন্তু তার অন্তরের সাড়া যেন নিবে গেছে। অনুরাধা প্রশ্ন করলে—আমার রিহার্সাল কেমন হ'ল ?

ছোট্ট উত্তর পরাগের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—বেশ।

হয়তো বা অনুরাধার অভিমান হয়। বল্‌লে—ভাল হয় নি, না ?

হঠাৎ পরাগ উৎসাহ-সহকারে বলে উঠ্‌লো—চমৎকার ! তুমিই তো আমার ব'য়ের প্রাণ দিয়েছ।

পরাগ যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। অনুরাধা বল্‌লে—আজ নাই বা গেলে, অনেক রাত হয়েছে।

তাদের 'তুমি' যেন পরস্পরকে আরও নিকট করে এনে ফেলেছে।

পরাগ বল্‌লে—আজ না গেলেই নয়, বিশেষ কাজ আছে।

শাসনের সুরে অনুরাধা প্রশ্ন করলে—কি এমন রাজ-কাজ শুনি? থাকা না থাকা তোমার ইচ্ছাধীন হলেও, যেতে দেওয়া না দেওয়া আমার, বুঝ্‌লে ত? এত রাত্তিরে মেসে না গেলেও চল্‌বে।

পরাগ যেন অনুরাধাকে আজ আঘাত করবার জন্যেই উন্মুখ, বল্‌লে—কাজ পণ্ড করে অকাজ নিয়ে 'মস্‌গুল্‌' হওয়ার চেয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

অনুরাধার চোখ দুটো যেন ছলছলিয়ে এল, নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লে—ভগবান যখন তোমাদের পুরুষ করে পাঠিয়েছেন, তখন আগেই তো কাজ, আর—

হেসে পরাগ বল্‌লে—এ তোমার পুরুষ বিদ্বেষীর মত কথা হ'ল কৃষ্ণকলি। দেওয়ার মালিক তোমাদের কম সম্পদ তো দেন নি? বিশেষ করে তোমার ঐ দুটো চোখ, যেন নীল সাগরের ঢেউ খেলে যায়। ঐ চোখ দুটো নিয়ে তুমি বিশ্বজয় করতে পার—

বাধা দিয়ে অনুরাধা জবাব দিলে—বলুন, বলুন, নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে আর কার না ভাল লাগে। কথাশিল্পী কি না, কথার মালা গাঁথতে তো আপনি কম ওস্তাদ নন।

পরাগ 'তড়াক্‌' করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আজ তবে আসি কৃষ্ণকলি। বলে আর কিছু না প্রশ্ন করে সে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ পরাগের চলে যাওয়ার যে কি কারণ থাক্‌তে পারে অনুরাধা ঠিক্‌ করতে পারলে না।

অনুরাধার ভৃত্য অনাথ এসে প্রশ্ন করলে—বাবুর খাবার কি আন্‌তে বল্‌বো মা?

অশ্রুরুদ্ধ গলায় অনুরাধা জবাব দিলে—তাঁর খাবার আর দিতে হবে না। তিনি চলে গেছেন।

—তবে আপনার খাবার—

—আমার বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, একটা রাত না হয় শুকোই। তোরা সব খেয়ে নি গে বাবা, আর রাত করিস্‌ নে। অনুরাধা বল্‌লে।

অনাথ চলে গেলে অনুরাধা ভাবতে লাগ্‌লো, পরাগ তো তার কথা কখনও অবহেলা করে না, তবে?

তবের উত্তর তাকে কে দেবে। তার অন্তরের নিবিড় বেদনা রাত্রির ঐ ঘনান্ধকারের সঙ্গে বুঝি একাকার করবার জন্যেই বোধ করি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সে শয্যায় লুটিয়ে পড়লো!

কিছু দিন যায়। পরাগ সেই যে গেছে, আর আসে নি, থিয়েটারেও তার সঙ্গে অনুরাধার দেখা হয় নি।

পূব-গগনের তরুণ তপন যখন অরুণ রাগে প্রাতের আকাশের সঙ্গে হোলি খেলে, ফাগের রঙে রঙিয়ে দেয়, তখন অনুরাধার মনে পরাগের আগমনীর সুর বাজে, কিন্তু যখন পৃথিবীর বুক রাত্রির অন্ধকারে জমাট হয়ে আসে, তখন অনুরাধারও বুকে সমস্ত আশার আলো মুছে দিয়ে আসে নৈরাশ্যের তিমিরতা, যা' তার মনের মাঝে বেদনার সঞ্চার করে। একবার সে ভাবে, হয়তো পরাগের অসুখ করেছে, নইলে সে আসতো নিশ্চয়ই। ভেবে পায় না এখন কী করবে!

পরাগকে সে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লো। তার অন্তরের উদগ্র বাসনা দিয়ে চিঠিটা শেষ করে অনাথের হাতে পরাগের মেসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে। সে বসে রইলো উত্তরের আশায়, ভাবতে লাগ্‌লো—পরাগ যদি অসুস্থ না থাকে হয়তো সে নিজেই আস্‌বে, হয়তো বা তার না আসার জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নেবে, কিন্তু যখন অনাথ পরাগের চিঠি নিয়ে দাঁড়াল, তখন তার তাসের প্রাসাদ যেন বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ভেঙে গেল। যন্ত্র-চালিতের মত সে চিঠিটা খুলে পড়তে আরম্ভ করলে। পরাগ তাকে অভিনয় করতে বারণ করেছে...কিন্তু পরশু যে অভিনয়, এত অল্প সময়ের মধ্যেই বা সে কেমন ক'রে জবাব দেবে। কিছু ঠিক্‌ করতে না পেরে সে অনাথকে নিয়ে পরাগের

মেসের অভিমুখে সোফারকে মোটার 'ষ্টার্ট' দিতে বল্‌লে। মেসের কাছে পৌঁছলে পর অনাথকে ডাকতে বল্‌লে। পরাগ আসতেই প্রশ্ন করলে—কী পাগলামি হচ্ছে বলতো? পরশু 'প্লে', আজ কী করে জবাব দিই, জবাব দিলে এখন তাদের ওপর শুধু অবিচার করা হবে না, আমার অভদ্রতার যে সীমা নেই তা' প্রকাশ পাবে না কি?

পরাগ উত্তর দিলে—জবাব যে দিতেই হবে, এ কথাতো বলি নি।

—জবাব দিতে বলো নি, অথচ না দিলেও আমার ওখানে যাবে না, এ কথার যে কি অর্থ হতে পারে বুঝতে পারলাম না, দয়া করে বুঝিয়ে দেবে কি?

পরাগ একটু হাসলে। অনুরাধা বল্‌তে লাগ্‌লো—সত্যিই আমি কথা দিচ্ছি পরশুর পর থেকে আর থিয়েটারে যাব না। এখন গাড়ীর ভেতর আসবে কি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার কথা কইতে লজ্জা না করতে পারে, কিন্তু আমার করে। লক্ষীটি, এস।

বলে পরাগের হাত ধরে একরকম জোর করেই সে যেন তাকে গাড়ীর ভেতর বসালে। তারপর বল্‌লে—'ষ্টার্ট' দাও।

প্রথম রজনীর অভিনয় খুব যোগ্যতার সঙ্গেই অভিনীত হ'ল। কেউ বা অনুরাধার মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়ের প্রশংসা করলে, আবার কেউ বা করলে পরাগ রায়ের লেখনীর। কিন্তু পরাগ কার প্রশংসা করবে—তার নিজের লেখনীর? না, অনুরাধার?

অনুরাধা 'পেন্ট' উঠিয়ে ম্যানেজারের কাছে দাঁড়াতেই ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন—চমৎকার! হ্যাঁ, সুন্দর তোমার অভিনয় হয়েছে অনুরাধা! এ বইটা বেশ 'সাক্‌সেসফুল' হয়েছে, কি বলো? চল্‌বে কিছুদিন আশা করা যায়।

বলে সে অনুরাধার মুখের দিকে তাকাতেই তার সমস্ত উৎসাহ যেন এক মুহূর্ত্তে নিবে গেল। সে বোধ করি ভাবলে, হয়তো অনুরাধা এখনি তার মাইনে চেয়ে বস্‌বে। বল্‌লে—আমায় কি কিছু বলবে না কি অনুরাধা?

ধীরভাবে অনুরাধা বল্‌লে—হ্যাঁ, সেইজন্যেই এসেছি। কাল থেকে আর আমি আসবো না।

ব্যস্ত হয়ে ম্যানেজার প্রশ্ন করলে—কেন, কেন? কি হয়েছে শুনি?

—না হয় নি কিছু, এমনি আস্‌বো না।

ম্যানেজার যেন 'হতভম্ব' হয়ে গেল, বল্‌লে—মাইনের জন্যে ভাবছো? না, না, সেজন্য তুমি ভেবো না, আজ না হয়—

বাধা দিয়ে অনুরাধা জবাব দিলে—ভুল বুঝ্‌ছেন, মাইনের জন্যে ভাবছি না, আমার না থাকার মধ্যে কোন কারণ নেই।

—ও, 'উর্ব্বশী থিয়েটারে'র ম্যানেজার বুঝি ভাল 'অফার' দিয়েছে? কত তারা দেবে শুনি? সেই জন্যে বুঝি এখেনে ঐ হোঁদল কুৎকুতেটা এত দিন ঘন ঘন আস ছিল। ফি মাসে যে কত তারা মাইনে দেবে তা' বুঝেছি। হুঁ, বলো না, আচ্ছা তুমিই বলো না, প্রত্যেক মাসে সমানে মাইনে দিয়ে আসি নি আমরা, না হয় দু' মাসেরই বাকী পড়েছে, কিন্তু—

বাধা দিয়ে অনুরাধা বল্‌লে—মিথ্যে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। শুধু এখানে কেন, কোন থিয়েটারেই যাবো না।

—পঞ্চাশ টাকা না হয় বাড়িয়েই দিচ্ছি, সাড়ে চার শ' হ'ল, কেমন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নতুন বই বুঝলে না—এখন ছেড়ে দিলে আমাদের একেবারে 'দয়ে' বসিয়ে দেবে যে। তা'তেও রাজি না? আচ্ছা, আর পঞ্চাশ—ঐ পুরোপুরি পাঁচ শ', আর কথা নয়—হ্যাঁ হ্যাঁ!

পাঁচ শ' টাকাতেও যখন রাজি হ'ল না দেখলে, তখন তার যেন একটু রাগ হল, বল্‌লে—বেশী মোচড় দিলে শেষে টিঁকবে না অনুরাধা, রাশ ছিঁড়ে যাবে। দু' মাসের মাইনেটা না হয়—কিন্তু দিক্ তো দেখি কোন শালা কোম্পানী আছে নিয়ম মত মাইনে—হেঁ হেঁ। কথাব ঠিক যদি বলো, এ শর্ম্মার মত···হুম্বাবা।

এবার অনুরাধারও যে রাগ না হ'ল তা' নয়, বল্‌লে—যখন আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তখন আর আমার

কি বল্‌বার আছে বলুন। যেতে দিন; পথ ছাড়ুন। বলে সে বেরিয়ে গেল। ম্যানেজার নিষ্ফল আক্রোশে যেন ফুল্‌তে লাগ্‌লো, বল্‌লে—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেটীদের ওসব ঢং জানা আছে, কোথায় কোন কাপ্তেন পাক্‌ড়েছে বুঝি, তাই—

পরাগ আস্‌তেই অনুরাধা বল্‌লে—কাল জবাব দিয়ে এলাম, হ'ল তো এবার? মা গো, কী একগুঁয়ে!

--আমার একটা কথায় ছেড়ে দিলে?

অনুরাধা জবাব দিলে—না ছাড়লে যখন মুখ-দর্শন কর্‌বে না, তখন না জবাব দিলে উপায় কি শুনি?

পরাগ ভাবতে লাগ্‌লো, একটা মুখের কথায় অনুরাধা তার এতদিনকার সঞ্চিত প্রতিভা এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিয়ে বস্‌ল। পরাগ মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বিহ্বল স্বরে সে ডাক্‌লে—কৃষ্ণকলি!

অনুরাধা পরাগের মুখের দিকে তাকালে, পরাগ যেন যাদু জানে।

—আমার নাটকে যেদিন তোমায় নায়কের পাশে দেখ্‌লাম—মনে হ'ল, হয়তো তুমি আমার কাছেও অমনি করে প্রেম নিবেদন কর। সেই জন্য—

বাধা দিয়ে অনুরাধা বল্‌লে—আমরা তো পুরুষ নই, ভালবাসার অভিনয় করাটা তোমাদেরই জন্মগত সংস্কার—নয় কি?

—মিথ্যা দোষারোপ করা অনুরাধা এ—

—তা' বই কি, আর ফোপল দালালী করতে হবে না।

অনাথ এসে জানালে থিয়েটার থেকে লোক এসেছে। অনুরাধা তাকে আন্‌তে বল্‌তেই, সেই লোকটা ঢুকে অনুরাধা ও পরাগকে নমস্কার করে দাঁড়াল, তারপর পকেট থেকে অনুরাধার দু' মাসের মাইনে আর চিঠি বের করে অনুরাধার হাতে দিয়ে বল্‌লে—অনেক করে ম্যানেজারবাবু আপনাকে যেতে অনুরোধ করেছেন, নতুন বইটা—

চিঠি পড়ে অনুরাধা বল্‌লে—ম্যানেজারবাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন, আর তাঁকে বলে দেবেন, পতিতা হলেও তাঁদের থেকে আমাদের কথার দাম কম নয়, এবং আমার কথাকে বিশ্বাস করতে বল্‌বেন। 'প্লে' আর আমি করবো না।

আর দাঁড়াবার প্রয়োজন হ'ল না। লোকটা যেমন এসেছিল তেমনি অনুরাধা এবং পরাগকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জুতো পরতে পরতে পরাগের দিকে চেয়ে সে যেন কিসের একটা হাসি হাস্‌লে। লোকটি চলে গেলে পর অনুরাধা বল্‌লে—জ্বালাতন বাবা, ভ্যালা বিপদে পড়া গেল!

হেসে পরাগ জবাব দিলে—তুমি ছাড়লে কি হবে, কিন্তু 'কমুনি' ছাড়ে কই।

জগতের চিরন্তন প্রথানুযায়ী দিন যায়, মাস যায়,—একে একে বছরও চলে যায়। সংসারের ঘূর্ণীচক্রে পরাগ যেন কোথায় কোন পঙ্কিল পথে ধাপে ধাপে নেমে গেছে; সে পরাগ আর নেই। মাতাল পরাগ, চরিত্রহীন পরাগ বুঝতে পাবে না, আজ সে কোথায়, আগের পরাগ হতে কত দূরে!

অনুরাধা পরাগের কথা ভাবে। সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে, পরাগ শেষে এমনি হয়ে যাবে। পরাগকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনা বোধ করি আজ অনুরাধারও সাধ্য নেই। সে আজ তার নাগালের বাইরে।

সেদিন অনুরাধা তার এক সঙ্গীর বাড়ী দেখা করতে গিয়ে পরাগকে দেখ্‌লে মাতাল অবস্থায়। পরাগের তখন খেয়াল ছিল না, তখন সে নেশায় 'মসগুল' হয়ে আছে। এলোমেলো কত কি সে বকে চলেছে। অনুরাধা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না, টল্‌তে টল্‌তে চলে এল। এই পরাগের জন্যে সে কি না করেছে। তার সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে সেই না একদিন পরাগকে চেয়েছিল আপনার করতে? পরাগ, অকৃতজ্ঞ পরাগ, সেই সব ভুলে আজ কি না—ছি ছি, সাপের জাত ওরা, দুধকলা

খেয়েও দংশন করতে বাধে না! ওরাই না নিজেদের বংশ-গরিমায় গৌরবান্বিত! অনুরাধা ভাবে, সে কিছুই নয়—জীবন-নাট্যে পরাগ একজন মস্তবড় অভিনেতা, অভিনয় হিসেবে সেও তার পায়ের যোগ্য নয়।

অনাথ ঘরে ঢুক্‌তেই অনুরাধা সুপ্তোত্থিতের মত চম্‌কে উঠ্‌লো। দেখ্‌লে অনাথের হাতে পোষ্টাফিসের ছাপ মারা একটা চিঠি। যার তিন কুলে কেউ নেই, তাকে চিঠি লেখ্‌বার কে আছে! খামটা খুলে পড়তে লাগ্‌লো—লিখেছে পরাগের মা। তার কাছে থেকে পরাগকে ভিক্ষা চায়। লিখেছে—

আমাদের গাঁয়ের একটী ছেলে পরাগকে তোমার বাড়ীতে যেতে দেখেছে এবং তার কাছেই ঠিকানাটা পেয়ে তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি। পরাগ যে এমনি হবে তা' আমি কোনদিনই ভাবি নি। টাকাও আজকাল সে পাঠায় না, দয়া করে দরিদ্র পরাগের স্কন্ধ থেকে নেমে বরং কোন ধনীর সন্তানের কাঁচা মাথাটা খেলে লাভ হতো বেশী। রোজা দিয়ে মরা পেত্নী তাড়ান সোজা, কিন্তু জ্যান্ত পেত্নী নিজে থেকে যদি না যায় তা' হলে তাড়ান মুস্কিল।

আরও কত কি। অনুরাধার বুকটা যেন পাথর হয়ে গেছে। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলে উঠ্‌লো।

পরাগ—পরাগ, তার নামটা মুখে আন্‌তেও যেন অন্তর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

অনুরাধা তার মন থেকে পরাগের চিন্তাটা যেন মুছে ফেল্‌তে চায়, কিন্তু চাওয়া যত সহজ, পারা তত সোজা নয়। যতবার ভোলবার চেষ্টা করে, ততবার যেন পরাগকে মনে করিয়ে দেয়। তারপর চিঠিটার কথা মনে হলেই, অমনি তার সব গুলিয়ে জেগে উঠে প্রতি-হিংসার নিদারুণ দাবদাহ। পরাগের বিপক্ষে যেন বিদ্রোহ খাড়া হয়ে তার মনকে নাড়া দিয়ে দেয়।

দরজার কাছে জুতোর শব্দ হতেই অনুরাধা ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লে—পরাগ।

পরাগ প্রথমে কথা কইল—গোটা চারেক টাকা ধার দিতে পার কৃষ্ণকলি, আগের গুলো—

পরাগের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, অনুরাধা তার কথায় বাধা দিয়ে জবাব দিলে—এবার নিয়ে কবার ধার চাওয়া হ'ল, তার হিসেবটা একবার করে দেখেছ কি?

পরাগ থতমত খেয়ে গেল, এমন উত্তর সে অনুরাধার কাছ থেকে আশা করে নি, সে বাধবাধভাবে উত্তর দিলে—কাল সবটা দিয়ে যাব, দয়া ক'রে আজ—

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, অনুরাধা বল্‌লে—শোধ যে কত দেবে তা' জানি। যাদের দোরে তুমি মোসাহেবী করতে যাও, তাদের দোরে পেলে না বুঝি?

পরাগ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো—মোসাহেবী করতে যাই আমি?

অনুরাধার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছিল—হ্যাঁ তুমি, যার বাড়ীতে বুড়ো মা না খেতে পেয়ে ছেলের টাকা পাওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গুণ্‌ছে, তার আবার এ রোগ কেন, লজ্জা করে না মুখ দেখাতে।

পরাগ যেন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, ডাকলে—কৃষ্ণকলি।

অনুরাধা বলে উঠ্‌লো—আর একটা কথাও না।

পরাগের মায়ের চিঠিটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে—যাও, আর নয়, ওনাম আর মুখে এন না, যেদিন ওনাম ধরে ডাকবার উপযুক্ত হবে, সেইদিন ডেকো, আজ নয়।

দারুণ অপমানে পরাগের সমস্ত মুখটা যেন কালো হয়ে গেল।

অনেকদিন পরে 'ডায়মণ্ড থিয়েটারে'র ম্যানেজার অনুরাধাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে, বল্‌লে—ওঃ, সেই চলে গিয়ে আমাদের কী ক্ষতিটাই না করেছ বলো দিকি, এ্যাঁ, একেবারে ডুবিয়ে গেছ অনু-রাধা! তা' হলে 'প্লাকার্ড' ছাপ্‌তে দিই, কি বলো? পরাগবাবুর সেই নাটকটাই ধরি, এ্যাঁ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই তো এক রাত্তির যা' তুমি অভিনয় করেছিলে, তারপর

ক'টা রাত্তির যা' হয়েছিল, একেবারে যমের অরুচি! বেশ বেশ এস তা' হলে, হেঁ হেঁ।

অনুরাধা চলে যাওয়ার পর ম্যানেজারের উৎসাহ দেখে কে! বল্‌তে লাগ্‌লো—কেমন হে, বলেছিলাম না—আস্‌তেই হবে। হুম্বাবা, এমন 'পানচুয়াল পে মাষ্টার'... রেখে দাও তোমার 'উর্ব্বশী।' এতদিন ম্যানেজারী করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেল্‌লাম, লোক চিন্‌তে আর বাকী নেই, হেঁ হেঁ।

পরের দিন প্ল্যাকার্ডে সকলে বিস্ময়ে দেখ্‌লে, অনেক দিন পরে 'ডায়মণ্ড থিয়েটারে'র অনুরাধা আবার সেই থিয়েটারে ফিরে এসে পরাগ রায়ের নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে সকলকে অভিবাদন করবে।

অনুরাধার মোটার যখন থিয়েটারের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুক্‌লে, তখন যাওয়ার মুখে অনুরাধা দেখ্‌লে তার অভিনয় দেখ্‌বার জন্যে যেন একেবারে লো'কে লোকারণ্য। এতে যে তার গর্ব্ব হয় নি তা' নয়, কিন্তু সব চেয়ে তার বড় আনন্দ পরাগকে আঘাত দেওয়ার। নিজেকে 'মেক্‌আপ' করে সে 'উইংসে'র পাশে দাঁড়িয়ে মনকে হাল্‌কা করে নেওয়ার জন্যে সকলের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লো। তারপর যবনিকা তুলতেই, সে মায়া-কাননে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করলে। এমনি করে তার অভিনয় চল্‌তে লাগ্‌লো। কয়েক অঙ্ক হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ সে দেখ্‌লে, একটা 'বক্সে' পরাগ একটি তরুণীকে নিয়ে বসে তার দিকে চেয়ে অভিনয় দেখ্‌ছে, আর মাঝে মাঝে তরুণীটিকে যেন কী বল্‌ছে। অনুরাধার সমস্ত যেন গুলিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে নিজেকে সাম্‌লাতে পারলে না। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল বলা যায় না, 'ড্রপ' পড়ে যেতেই পরাগ যেন তরুণীকে বল্‌লে—অতিরিক্ত মাল টেনে শেষে আর সাম্‌লাতে পার্‌লে না বুঝ্‌লে না, কিন্তু 'হলিউডে'—হুঁ।

সকলেই অনুরাধাকে নিয়ে ব্যস্ত। ম্যানেজার নিজে গিয়ে অনুরাধাকে তার বাড়ীতে দিয়ে এল। অনুরাধা পরাগকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই দারুণ আঘাত পেয়ে ফিরে এল।

অনেক রাত্রে অনুরাধা অনুভব করলে, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন ব্যাথায় টন্‌টন্ করছে। চোখ মুখ তার যেন জ্বালা করতে লাগ্‌লো। সেই ঘরে ঝিটা শুয়েছিল, সে বুঝ্‌তে পারলো না অনুরাধা জ্বরের ঘোরে যেন কী বকে চলেছে। বিস্ফারিত নেত্রে সে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রলাপে অনুরাধা যাকে উদ্দেশ্য করে বকে চলে ছিল, সে তখন কোথায় কি করছিল কে জানে!

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

পুরাতনী

অর্দ্ধেন্দু-প্রসঙ্গ

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর

প্রায় বাইশ-তেইশ বৎসর হইল, কলিকাতা যোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে একটি 'ক্লাব' ছিল—তাহার নাম ছিল 'খামখেয়ালী মজলিস্।' প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন করিয়া যোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর সুধী মহোদয়গণ বন্ধুবান্ধবসহ 'খামখেয়ালীভাবে' সাহিত্যালোচনা, সঙ্গীতচর্চ্চা, নাটকাভিনয় ও হাস্যামোদে সন্ধ্যাযাপন করিতেন। প্রচ্ছন্নভাবে আর একটা উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল—বিলাত-ফেরতগণকে ইংরাজি পোষাক ছাড়াইয়া ধুতি চাদরে সুশোভিত করা—দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া মেঝের উপর আসনে বসিয়া, করাঙ্গুলির সাহায্যে আহার করিতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেওয়া। ঠাকুর-বাড়ীর সে সময়ের আহারের ঘটা এবং আহার্য্য স্থানের বাহার দেখিয়া স্বতঃই মনে হইয়াছিল, উহা ইংরাজি ডিনার এবং বিলাতী ডাইনিং টেবিলের মোহ অনায়াসেই বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

একদিন খামখেয়ালী মজলিসের পক্ষ হইতে কবি-বর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম।

যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, খামখেয়ালী মজলিসে গোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। রবিবাবু বিষণ্ণ মনে চিন্তাযুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন—নিমন্ত্রিত অতিথিগণও সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া যাহা শুনিলাম, তাহার মর্ম্ম এই—

রবিবাবু বঙ্গভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় স্বজাতীয়-দিগের নিকট পত্র লেখেন না। মিষ্টার অমুক তখন একজন ঘোর সাহেব, তাঁহাকেও বাঙ্গলাতেই নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোক এত দিন যে ঠিকানায় বাস করিতেন, কিছুদিন পূর্ব্বে সে বাড়ী হইতে উঠিয়া অন্য বাড়ীতে গিয়াছেন। মজলিসের খাতায় মিষ্টার অমুকের যে ঠিকানা লেখা ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এ সংবাদ মজলিসে তাঁহার দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই। যে দ্বারবান নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিয়াছে, উক্ত ঠিকানায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাস করেন, তিনি নিমন্ত্রণ পত্রখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"ওঃ—রবীন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ? বেশ বেশ। তিনি যে একজন খুব বড় লোক। কিন্তু সে বাবুটি ত এখন এখানে থাকেন না; বাড়ী বদলেছেন। তা' হোক গে, আমিই যাব এখন। আচ্ছা দারোয়ান, রবিবাবুকে বোলো, যে আমি ঠিক সময়ে আসবো।" দারোয়ানজী গোপনে আরও প্রকাশ করিয়াছে—বাবুটি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, এজন্য তথায় কোনও লোকের গতায়াত পছন্দ করেন না। তাঁহার দ্বারবান ছাড়া অন্য কেহও বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না।

রবিবাবু এই সকল কথা শুনিয়া, খোঁজ লইয়া তখন জানিতে পারিলেন যে মিষ্টার অমুক অন্য বাড়ীতে আছেন। সেখানে পুনরায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে লইয়া কি করিবেন, এই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন। যে লোক বিনা দ্বিধায় গায়ে পড়িয়া নিমন্ত্রণ লয়, সে কি রকম ভদ্রলোক? এবারকার মজলিসের আমোদটাই বা মাটি হয়, এই আশঙ্কায় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণও বিষণ্ণ এবং কি উপায় হইতে পারে, তাহারই পরামর্শ হইতেছে।

রবিবাবু তখন নিমন্ত্রিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, "যখন অমুক মহাশয় বাসস্থান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে খামখেয়ালী মজলিসে জানান নাই, তখন এই আপদের জন্য তিনিই দায়ী। শাস্তিস্বরূপ আজ তাঁহাকে 'রবিবাবু' সাজিয়া, হোষ্ট এর কার্য্য করিতে হইবে।

অ—মহাশয় কিছু পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, অগত্যা তিনি রবিবাবু সাজিয়া হোষ্ট এর অভিনয় করিতে স্বীকৃত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বারান্দার নিম্নে এক ছক্কর গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল। আমরা উঠিয়া গিয়া গ্যাসের আলোকে দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর এক ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ময়লা একখানা পুরাতন বালাপোষে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দস্তরমত মুড়ি দিয়া কে একজন তাহার মধ্য হইতে অবতরণ করিয়া, গ্যাসের আলোকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পয়সা গণনা করিতেছে। সেই পয়সাগুলি গাড়োয়ানকে দিবামাত্র তাহার সঙ্গে ঝগড়া বচসা বাধিয়া গেল। সে এক টাকার কমে লইবে না, ইনিও আট গণ্ডার বেশী দিতে চাহেন না। অবশেষে অনেক কষা-মাজার পর গলার জোরে পরাভূত হইয়া গাড়োয়ান আরও কিঞ্চিৎ পাইয়া প্রস্থান করিল। আমরা বুঝিলাম, সেই আপদ আসিয়া পৌছিয়াছে।

চটি জুতা ফটাস ফটাস করিতে করিতে বৃদ্ধ তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। আসিয়াই, তাঁহার ধূলিকণা-শোভিত ছেঁড়া চটি জুতা কোন্ স্থানে রাখিতে হইবে ইহাই উচ্চস্বরে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমুক বাবু অর্থাৎ জাল 'রবি ঠাকুর' তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জুতা সুদ্ধই ভিতরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ এই সুশোভিত বৈঠকখানায় চটি জুতা লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—"রাম বলেন রবিবাবু! এমন সাহেবী বৈঠকখানায় আমার চটি জুতা? ইহা কখনও হইতে পারে না।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, জুতাযোড়াটি দারোয়ানজীর হাওলা করিয়া রাখাই নিরাপদ।

সভায় আসিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বসিয়া অ—অর্থাৎ জাল 'রবিবাবু'র সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমারই নাম রবি ঠাকুর? তা', তুমি বেশ পদ্য লেখ শুনেছি। আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হয়েছিল বল দেখি? আচ্ছা বোধ হয়—অমুক জায়গায় কি?"—বলিয়া বৃদ্ধ কতকগুলি স্থানের ও ঘটনার নাম করিতে লাগিলেন যাহা কখনও রবিবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না—এমন কি তাঁহার জন্মিবার বহু পূর্ব্বের ঘটনা। নিমন্ত্রিতগণ পরস্পরের মধ্যে গোপনে বৃদ্ধের আহম্মুকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে লাগিলেন।

তথাকথিত 'রবিবাবু'কে বৃদ্ধ 'ছিনা জোঁকে'র মত ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার সেকেলে রসিকতার প্রশ্নে ও মন্তব্যাদিতে অ—বাবুকে ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেনই, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা কেহ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছেন, কেহ বা মুখ টিপিয়া টিপিয়া ঘৃণার হাসি হাসিতেছেন। হঠাৎ অ—বাবুর কিঞ্চিন্মাত্র পীত গেলাসটি (হুইস্কি পেগ কি না জানি না) লইয়া বুড়া ঢক্ ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিলেন এবং আরও আনিবার জন্য পরিচারকগণকে আদেশ করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই স্তম্ভিত!

এতক্ষণে অ—বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বিরাগভরে উঠিয়া গিয়া করযোড়ে আসল রবিবাবুকে বলিলেন —"দোহাই আপনার, এ মুস্কিল হইতে আমায় আসান করুন। আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না।" রবিবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তাও কি সম্ভব হয়? আপনি যখন হোষ্ট সাজিয়াছেন, তখন এতদূর আসিয়া সে দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিবেন কি করিয়া? সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই।"

অ—বাবু সেখান হইতে উঠিয়া বৃদ্ধের কাছে আর না গিয়া, গগনেন্দ্রবাবুর নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার আলবোলায় ধূমপান করিতে লাগিলেন।

নাছোড়বান্দা বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিতান্ত অশিষ্টভাবে আলবোলার নলটা অ—বাবুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"এতক্ষণ তামাক না খেয়ে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছে। আঃ—বেশ তামাকটি ত!" গগনবাবু হাসিতে লাগিলেন। আর একটা আলবোলা আনাইয়া অ—বাবুকে দিলেন। ধূমপান করিতে করিতে বৃদ্ধের মাথাটি ঢুলিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, আফিমখোর নিশ্চয়।

ক্রমে 'আহার প্রস্তুত' বলিয়া পরিচারক আসিয়া উপস্থিত হইল। আহারের স্থান হইয়াছিল রবিবাবুদের বাড়ীতে, ড্রয়িংরুমের পাশে। আমরা গগনবাবুর বাড়ী হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছি। অ—বাবু বৃদ্ধের ভয়ে ভিড়ে মিশিয়া আগে আগে নামিতেছেন। তখন বৃদ্ধ ডাকাডাকি স্থরু করিলেন—"ওগো রবি-বাবু, আমায় ফেলে তুমি যাচ্ছ কোথায়? আমি তোমাকে ধোরে ধোরে নীচে নামতে চাই। বুড়োমানুষ সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে মরব?" স্থতরাং অ—বাবুকে দাঁড়াইতে হইল। বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে এই অবস্থায় চলিতে চলিতে, অ—বাবুর প্রতি বৃদ্ধ যে সকল 'বিদ্যাসুন্দরী' রসিকতা ঝাড়িতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বৃদ্ধ সহসা বাত্যাহত কদলীবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। কেবল তাহা নহে। অ—বাবুর শালের অঞ্চল ধরিয়া, মিউনিসিপালিটির রোলারের মত গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়া পৌছিলেন। কোনও মতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, আশ্রিত ব্যক্তিকে এরূপভাবে সিঁড়িতে গড়াইতে দেওয়ার জন্য অ—বাবুকে অতি করুণভাবে বিস্তর অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে আহারের স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং স্ব স্ব স্থানে বসিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ মহাশয় তখনও বারান্দায় দাঁড়াইয়া মুখ ধুইবার জল ফরমাইস করিতেছিলেন। জল পাইয়া সশব্দে মুখ ধুইয়া আহারের স্থানে আসিলেন। তথাকার সজ্জা দেখিয়া তাঁহার মুখখানি আশ্চর্য্য রসের একটি প্রতিমূর্ত্তির মত হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন এবং জাল রবিবাবুকে (অ—বাবুকে) প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। কখনও হাস্য রস, কখনও করুণ রস এবং কখনও দর্প রসের অভিনয় চলিতে লাগিল; "এত ফুল, এত পাতা, এত পাথরের বাটী, গ্লাসের বাটী আর এতখানা পাথরের ঝকঝকি, এ সমস্ত জোগাড় করা কি সোজা কথা।" এইরূপ নানা মন্তব্য প্রকাশের পর তিনি জাল রবিবাবুর পার্শ্বের আসনে আহারার্থ বসিয়া গেলেন।

বসিয়াই উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"গিন্নী বলে দিয়েছেন তাঁর জন্য ভাল খাবার কিছু ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে। একখানা সরা চাই মশায়—এখনই চাই। কোনও জিনিস উচ্ছিষ্ট না হতে হতেই চাই, কারণ গিন্নী রোজ পূজো আহ্নিক করেন কি না!" অ—বাবু তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া এমনি ভাবে কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন যে, আমার মনে হইল তিনি বুঝি চপেটাঘাত করিয়া বসেন।

একজন পরিচারক একখানি সরা লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ উভয় পার্শ্বস্থ অতিথিগণের পাত হইতে টপাটপ মিষ্টান্ন তুলিয়া সরা বোঝাই করিতে লাগিলেন।

সরাটি সামনে নামাইয়া রাখিয়া, বৃদ্ধ তখন নিজ গাত্র হইতে সেই ময়লা বালাপোসখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং যোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়গণ, আমাকে মাপ করবেন। আপনাদের সকলকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছি—আর না। এবার নিজের প্রকৃত পরিচয় দিই—আমি আপনাদের সেই অর্দ্ধেন্দু-শেখর।"

আমরা সকলে দেখিয়া অবাক্—বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ আর কেহ নহেন, কলিকাতা বঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। মেঘের পিছনে 'রবি' আমাদিগকে দিন-কাণা করিয়া দিয়াছিলেন এবং খামখেয়ালী মজলিসকে আজ একটা অভিনব আমোদ দিবার জন্য তিনিই অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া এই অপূর্ব্ব অভিনয়টির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুবাবুর অপরিচিত অ—বাবুকেও, তাঁহার তদানীন্তন সাহেবিয়ানার জন্য একটু জব্দ করার উদ্দেশ্য ছিল। বিলাত-ফেরত ইঙ্গবঙ্গগণকে সুপথে আনয়নও খামখেয়ালী মজলিসের একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া সবেমাত্র অবসর জীবন লাভ করিয়াছেন, তাই অসাধারণ ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গরসের মঞ্চে তিনি প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমরা পঠদ্দশায় মুস্তফী মহাশয়ের রঙ্গরসের সমুদ্রে অনেক ঢেউ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতাম। সেই মুস্তফীকে অদ্য সশরীরে পাওয়া গিয়াছে। তিনি অ—বাবুর নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন; অ—বাবু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পদধূলি পর্য্যন্ত লইলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয়।

সেদিন খামখেয়ালী মজলিসের কি বাহার যে হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। আহারের ঘটা ছিল বাছা বাছা নানাদেশীয় খাদ্য। কাশ্মীর, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রন্ধন ছিল এবং ছোট বড় গ্লাসে মাদক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে নানাদেশীয় সরবতে বরফ সংযোগে শীতল পানীয় ছিল। নানা দেশীয় পুষ্প পত্রের দ্বারা আহার স্থানের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র (মিনিয়েচার) একটি বাগান; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র পুষ্পে সুশোভিত।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আহারান্তে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত 'ডাক্তারখানা' অভিনয় করিলেন। ডাক্তারখানা বিষয়ে বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে অতিরঞ্জিত নহে তদ্বিষয়ে আমি হলফান সাক্ষ্য দিতে পারি।

* * * *

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর

---

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৌষ, ১৩২৭

হয় ত এমনই হয়!

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

উমা গুপ্তা উহার নাম। চেহারা, সাধারণ মেয়েদের চাইতে একেবারে স্বতন্ত্র। মানে, উহার চেহারার মাঝে এমন একটী বৈশিষ্ট্য আছে, যা' সাধারণ মেয়েদের থাকে না। দেহ দীর্ঘ। চলিবার সময় ও মোটেই কুঁজো হইয়া চলে না; চলে একেবারে সোজা হইয়া। তাহাতে উহার মাঝে এমন একটী 'ডিগ্‌নিটী' প্রকাশ পায় যে, মনে হয় ও যেন রাজরাণী হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মারাত্মক উহার চক্ষু দুইটী। সে চোখের দিকে চাহিলে যাহারা অতি বড় ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তাহাদের চিত্তও একবার দুলিয়া উঠে। শাড়ী ও আধুনিক ধরণেই পরে। গায়ে দেয় হাতাবিহীন ব্লাউজ, তাহাতে বাহু দুইটী তাহার বগল হইতে সম্পূর্ণ নগ্নই থাকে। মিটোল আর মসৃণ সে দু'টী বাহু। শুধু সে বাহু দু'টীর মাঝে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, অনেকের সারা অঙ্গেও তা' থাকে না। শাড়ীর আঁচলখানা বুকের উপর দিয়া আধুনিক ভাবেই ফেলিয়া রাখে। মানে, অর্দ্ধ বক্ষ তার উন্মুক্তই রহিয়া যায়। যৌবনের পরিপূর্ণতা উহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। পাতলা ঠোঁট দু'খানির গঠন ভঙ্গী অপরূপ। দীর্ঘ ঘন কালো চুলগুলি যেন কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ। লোভনীয় ওর বয়স। ওর পরিপূর্ণ চেহারার পানে চাইলে মনে হয়, এই সতেরো বছর ধরিয়া ও যেন কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।...

এই উমা গুপ্তাকেই দেবব্রত রায় প্রায় স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন, যে যাকে যতোধিক চিন্তা করে, সে তাকে ততোধিক স্বপ্ন দেখে। সুতরাং, ইহা হইতে সহজেই এই অনুমান করা যায় যে, দেবব্রত উমা গুপ্তাকে কামনা করে।

আর দেবব্রতও বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, এখন পর্য্যন্ত সে উমা গুপ্তার সঙ্গে কথাই বলে নাই। মানে, সে সুযোগ এখন পর্য্যন্ত দেবব্রতের ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেবব্রতর ভারী ইচ্ছা করে কোনপ্রকারে উমার সঙ্গে আলাপ করিয়া লইতে। ওরা উভয় উভয়কে ভাল করিয়াই চেনে। দিনের মধ্যে উভয়ের দেখাও হয় দুই একবার। উমা যখন তাহার স্কুলের গাড়ীর জন্য তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে অপেক্ষা করে, দেবব্রত তখন তাহারই সম্মুখ দিয়া কলেজে চলিয়া যায়। আবার হয়ত কোনদিন সন্ধ্যার মুখে খেলার মাঠ হইতে ফিরিবার পথে দেবব্রতের সঙ্গে উমার হঠাৎ দেখা হয়। উমা চায় দেবব্রতের দিকে···দেবব্রতও চায়···কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

এই ক্ষুদ্র সহরের অনেক যুবকই উমা গুপ্তাকে জানে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রকারের আলোচনাও তাহাদের মধ্যে নিত্যই হয়। তারা দেবব্রতকে ঠাট্টা করে, অনুযোগ করে। বলে, ওটা একটা গাধা। বাড়ীর পাশে অমন একটী মেয়ে, আর ও আজও পারল না তার সঙ্গে একটু আলাপ জমিয়ে নিতে। বলে, ও আবার কবি, ও আবার কবিতা লেখে!

তারপর তাহারা আবার বলে, যদি আমরা হতুম—

কবি বলিয়া বন্ধু-মহলে দেবব্রতর একটুখানি খ্যাতি ছিল। কারণ, ওর লেখা কবিতা মাঝে মাঝে কলিকাতার 'উদয়াচল' মাসিক-পত্রিকায় বাহির হয়। কবি বলিয়াই হয়ত উমার সঙ্গে উপযাচক হইয়া আলাপ করিয়া লইতে তাহার দ্বিধা আসে। ও ভাবে, ও যদি কবি না হইয়া আধুনিক সাহিত্যিক হইত! ও জানে যে, আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বিধা বলিয়া কোন বালাই-ই নাই।

উমাদের বাড়ীর পরের বাড়ীখানাই ছিল দেবব্রতদের। উমার বাবা ইন্দুমাধব গুপ্ত এখানকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। আর দেবব্রতর বাবা প্রিয়ব্রত রায় এখানকার একজন খ্যাতনামা উকীল। হাকিমের সঙ্গে উকীলের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক, আছেও। উভয় বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে

আলাপ-পরিচয়ও যথেষ্ট আছে। শুধু নাই দেবব্রত আর উমার মধ্যে।

বন্ধুদের মতে এইটাই অস্বাভাবিক—অন্ততঃ এই বিংশ শতাব্দীর যুগে। তারা বলে, আলাপ-পরিচয় হওয়া উচিত ছিল সবার পূর্ব্বে দেবব্রত আর উমার। এইটা মুখ্য, আর সব গৌণ—হলেও ক্ষতি নাই, না হলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুখ্য হইল গৌণ, তাই উহাদের মাঝে শুধু চোখের পরিচয় হইয়া রহিল, মুখের পরিচয় আর হইয়া উঠিল না।

এতদিন দেবব্রতই শুধু উমাকে স্বপ্ন দেখিত। কিন্তু গতরাত্রে উমাও দেবব্রতাকে স্বপ্ন দেখিয়া বসিল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, শুধু দেবব্রতই নয়, উমাও দেবব্রতকে মনে মনে কামনা করে।…

নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেই যখন উমার স্বপ্নের কথা মনে হইল, তখন সে শুধু লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। ও স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছে কোন কুমারী মেয়ের হয়ত তাহা ভাবা উচিত নয়। স্বপ্নের কথা মনে করিতেই ও লজ্জায় রক্তিম হইল বটে, কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে যে নব পুলকের আনন্দ পাইয়াছিল মনে মনে তাহাও অস্বীকার করিতে পারিল না।

জাগিয়া থাকিয়াই ও তখন আবার ভাবিতে লাগিল দেবব্রতকে। ওর মনে প্রশ্ন জাগে। মানুষ এমন লাজুক হয় কি করিয়া! ভাবে, যদি দেবব্রতর সঙ্গে তার কখনও আলাপ হয়, তবে তাহাদের সে আলাপের প্রথম দিনেই সে তাহাকে সম্বোধন করিবে লাজুক কবি বলিয়া।

দেবব্রতর কবিতা উমার ভারী ভাল লাগে। শুধু সেই জন্যই সে 'উদয়াচলে'র গ্রাহিকা হইয়াছে। কাগজখানা আসিলেই উমা প্রথমে দেবব্রতর কবিতা খুঁজিতে বসে।…

সত্যকারের কবির মতই সুন্দর দেবব্রতর চেহারা, গায়ের চাদরখানা ও দেহের সঙ্গে এমন চমৎকারভাবে জড়াইয়া রাখে যে, উহাকে দেখামাত্রই কবি বলিয়া চিনিয়া লইতে একটুও বিলম্ব হয় না—অন্ততঃ, উমার তাহাই মনে হয়।

উমা ভাবে স্বপ্ন কি? মনের অতি গোপন অন্তরালে যে কথা আছে অতি সঙ্গোপনে, আছে কি নাই বলিয়া যাহার উপর নিজেরই হয় সন্দেহ, স্বপ্নের মাঝে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা হইয়া যায় এমন স্বচ্ছ যে, তাহার উপর আর কোন সন্দেহই রহে না।…

সত্য, স্বপ্নের মাঝ দিয়া কি অসম্ভবই না সম্ভব হয়, দূরে যে আছে, হয়ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আসিয়া দাঁড়াইল পাশটীতে। পাশে যে ছিল, হয়ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সে চলিয়া গেল এত দূরে যে, তার কোন হদিসই আর রহিল না।…

দেবব্রত—হ্যাঁ, ঐত মুহূর্ত্তের মধ্যে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অকপটে বলিয়া গেল যে, সে তাহাকে ভালবাসে, আর ভালবাসে বলিয়াই সে তাহাকে ওর বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার চোখে মুখে কপালে বারবার চুম্বনের পর চুম্বন দিয়া চলিয়া গেল।…একটী বারের জন্যও ইতস্ততঃ করিল না, দ্বিধা করিল না, সে তাহাকে ভালবাসে কি না একবারের জন্য এ প্রশ্নও করিল না।…বেশত!…

ভাবিতে গিয়া উমার চক্ষু বুজিয়া আসে, চক্ষু বুজিয়াই উমা ভাবিয়া যায় স্বপ্নের মিথ্যা মায়া মোহের কথা। ভাবে, স্বপ্ন ত স্বপ্নই রহিয়া যায়।…

পরদিন আবার যখন দেবব্রতর সঙ্গে উমার দেখা হইল, তখন ওর ভীষণতর ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া সে দেবব্রতর হাত ধরিয়া বলে, এই দুষ্টু…

দেবব্রত! হাঁ, দেবব্রতর তখন কি হইবে?

দেবব্রত কি কহিতে পারে, ভাবিতে গিয়া উমা একটু চক্ষু বুজে।…তারপর যখন চক্ষু খোলে, তখন ও কল্পনা-জগৎ হইতে মর-জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চক্ষু মেলিয়া দেবব্রতকে তাহার সম্মুখে সে আর দেখিতে পায় না। রাস্তার বাঁকের মুখে দেবব্রতর দেহ তখন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া উমার

যেন দেবব্রতর উপর হঠাৎ ভীষণ রাগ হয়। মনে হয়, দেবব্রত যেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গেল।

ঠিক্। শুধু আজই নয়, উমা ভাবিয়া দেখিল, দেবব্রত তাহাকে যেন বরাবরই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এত দিনের মাঝে উমার সঙ্গে আলাপ করিয়া লইতে দেবব্রতর পক্ষে কিছু কষ্ট সাধ্য ছিল না, বা সে আলাপ করাটাও তার পক্ষে কিছু অশোভন হইত না। তথাপি হ্যাঁ, আজ উমা এ কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, দেবব্রত স্বইচ্ছায় ইহা যেন এতদিন প্রত্যাহার করিয়া আসিয়াছে।

স্কুলে সারাটি দিন ধরিয়া উমা কেবল এই কথাই চিন্তা করিয়া গেল। সে চিন্তায় ও এতখানি তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, উহার এই তন্ময়তা ক্লাসের অনেক মেয়েরই চক্ষে ধরা পড়িয়া গেল।

সুতরাং উমার এই তন্ময়তার কারণ আবিষ্কারের মানসে উহারা সব মুহূর্ত্তের মধ্যে এতখানি সচেতন হইয়া উঠিল যে, উমার আর অস্বস্তির অন্ত রহিল না। কিন্তু উমার এই অবস্থা হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করিল সুজাতা সেন, উমার প্রিয় বান্ধবী। সেই উমাকে উহাদের হাত হইতে একপ্রকার ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং একেবারে কমন রুমে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কহিল, আর কেউ এদিকে আস্‌ছে না, বল্ কি হয়েছে?

উমা ভাবে, কি কহিবে! কহিবার মত ইহার মধ্যে কিং-ই বা আছে? যাহা আছে, সেটুকু ত এক নিশ্বাসেই শেষ করা যায়, তবে?

...কিন্তু উমা নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যায় যে, দেবব্রত আর তার এই ছোট কাহিনীটুকু, কাহিনী নামের পর্য্যায়ে ফেলাই যাহাকে চলে না, সেই অতি ছোট কাহিনীটুকুকে সে বিনাইয়া বিনাইয়া সুজাতার কাছে এত দীর্ঘ করিয়া শুনাইল কি করিয়া!

শুনিয়া সুজাতা বলে, উপায়? তোর এতখানি ভালবাসা, তার যদি কোন মূল্যই দেবব্রতবাবু না দেন, তবে?

ঠিক্। উমার মনে এই প্রশ্নই জাগে, তবে?

কিন্তু এ তবের মীমাংসা কে করিবে! উমা ত আর যাচিয়া দেবব্রতর সঙ্গে এ সমস্যার মীমাংসায় রত হইতে পারে না। পারিত দেবব্রত। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেই সুযোগ মিলিতে পারে কি পারে না মুহূর্ত্তের জন্য সে একবার তাহা যাচাই করিয়া দেখিল না। উমার মত সুজাতাও আশ্চর্য্য হইয়া যায় এই ভাবিয়া যে, উমার মত এমন একটী সর্ব্বপ্রকারের বাঞ্ছিত মেয়ের প্রয়োজন কি দেবব্রতর হয় না?

আশ্চর্য্য!...

উমা ঠিক করিল দেবব্রতর চিন্তা সে আর করিবে না, করা তার পক্ষে আর উচিতও নহে। তার নিজের ত একটা আত্মসম্মান আছে, দেবব্রতই যদি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল, তবে সেই বা তাহাকে উপেক্ষা করিতে না পারিবে কেন?

পর পর তিনদিন সে ইচ্ছা করিয়াই দেবব্রতর সঙ্গে দেখা করিল না। মানে, এ তিনদিন সে বিনা অজুহাতেই স্কুল কামাই করিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিল। সুতরাং, দেবব্রতর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু চতুর্থ দিন প্রভাতে 'উদয়াচল'খানা খুলিতেই উমার এই সঙ্কল্পের বাঁধ একবারে ধ্বসিয়া গেল।

ধ্বসিয়া গেল 'উদয়াচলে' প্রকাশিত দেবব্রতর লেখা 'পাষাণী প্রিয়া' কবিতাটী পড়িয়া।

আশ্চর্য্য!...পুরুষকে কি ভগবান চিরদিনই অন্ধ করিয়া রাখিবেন, নহিলে দেবব্রতর মনে এই মিথ্যা বিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিল কি করিয়া?

কবিতাটী যে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লইতে উমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। সারা কবিতার অঙ্গেই দেবব্রত তাহা সুস্পষ্ট করিয়াই আঁকিয়া দিয়াছে। কিন্তু দেবব্রত তাহাকে 'পাষাণী প্রিয়া' বলিয়া সম্বোধন করিল কি করিয়া?

পাষাণী! সে পাষাণী!...দেবব্রতর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে আজ তাহার একান্ত ইচ্ছা হয়। ভাবে, সে যদি কবিতা লিখিতে পারিত, তবে সে

আজই দেবব্রতকে উদ্দেশ করিয়া একটা কবিতা লিখিয়া 'উদয়াচলে' পাঠাইয়া দিত। নাম দিত তাহার—'শুষ্ক কঠিন শিলাস্তূপ।'

ঠিকই হইত, দেবব্রতর শুধু ঐ নামই হওয়া উচিত। শুষ্ক কঠিন শিলাস্তূপই সে।...

উমা কবিতাটীর দিকে শুধু চাহিয়া থাকে। অক্ষর-গুলি যেন তাহার চোখের সম্মুখে কেবল নাচিয়া বেড়ায়।

কবিতা পড়িয়া উমা ভাবে, দেবব্রত যাহা লিখিয়াছে তাহা ভুল। তাহার উপর যে অবিচার সে করিয়াছে,তাহার কোন ভিত্তিই নাই। পাষাণী সে মোটেই নয়, সারা মন তাহার স্নিগ্ধ হইয়া আছে, ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে, কিন্তু সে কথা সে ব্যক্ত করিবে কি করিয়া?

উমা ভাবিয়াই চলে।

উমার হাতের উপর হাতখানি।

সম্প্রদান করিতেছিলেন ইন্দুমাধববাবু।

দেবব্রত উমার হাতখানির উপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

সে স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে যে, তাহার হাতের মধ্যে উমার হাতখানি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে যে উমার আনন্দ শিহরণ, দেবব্রত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারে।...কি চমৎকার উমার হাতের আঙুলগুলি!...যেন পাঁচটী কনক চাঁপা তার হাতের মধ্যে কে যেন রাখিয়া দিয়াছে।...চুড়িগুলা তাহার সুডৌল হাতের সঙ্গে এক-বারে মিশিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে সেগুলি মাঝে মাঝে এক-একবার চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিতেছে। দেবব্রত সত্যই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর সেই মুহূর্ত্তে ও মনে মনে বেশ একটু গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। উমার মত স্ত্রী লাভ করা গর্ব্বের বিষয় বই কি!

সম্প্রদান হইয়া গেল।

হ্যাঁ, উমা এবার শুধু তাহারই। তাহার উপর আর কাহারও কোন দাবী রহিল না। আজ সে জয়ী, এই মুহূর্ত্তে সে জয় করিয়া লইল ঐ মেয়েটীকে—যাহাকে পাইবার জন্ম কতজনই না সচেতন হইয়া থাকে।

উমার মুখ ও স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে। কাণের ঝুমকো দুটা পর্য্যন্ত। ঘোমটার আবরণে মুখখানা ঢাকা থাকিলেও কাপড়খানি এত পাতলা যে, তাহার মধ্য দিয়া উমা যতবারই দেবব্রতর দিকে চাহিয়াছে, ঠিক্ ততবারই দেবব্রত তাহা দেখিতে পাইয়াছে। উমার সজল হাসি-মাখা মুখখানা দেবব্রতর চোখের উপর দিয়া কেবলই যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে।...

বিবাহ-সভায় উৎসব-নিরত যত সব নরনারী। তাহাদের হাস্য-কোলাহলের, কোন কিছুর অস্তিত্বই দেবব্রত যেন এখন অনুভব করিতে পারিতেছে না। সব যেন অচেতন। ...ইহার মাঝে সচেতন শুধু সে আর উমা।

দেবব্রত ছেলেবেলায় পরীদের গল্প শুনিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে মায়ামন্ত্রে সকলকে অচেতন করিয়া রাখিতে পারিত; ইচ্ছা করিলে সকলের সম্মুখে থাকিয়াও নিজেদের সম্পূর্ণ অদৃশ্য করিয়া রাখিতে পারিত। আজ তাহাদেরও যেন সেই অবস্থা—উমা আর দেবব্রত ছাড়া আর যাহারা আছে, তাহারা যেন অচেতন, উহাদের সকলের সম্মুখে থাকিয়াও উমা আর যেন সকলের কাছ হইতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া আছে। সুসজ্জিতা উমার পানে চাহিয়া দেবব্রত ভাবে, উমা যেন সেই ছেলেবেলাকার গল্পে শোনা এক রঙীন পরী। বাসরে দেবব্রত উমাকে আরও কাছে পায়—একেবারে তার সান্নিধ্যে। দুই হাত দিয়া উমার মুখখানি নিজের কাছে টানিয়া আনে। তারপর স্বরের মাঝে যতখানি কোমলতা আনা সম্ভব হয় তাহা আনিয়া খুব আদর করিয়া সে ডাকে, উমা!

উমা সাড়া দেয় না।

দেবব্রত আবার তেমনি করিয়াই বলে, এই!—

এবারও উমা কোন উত্তর দেয় না।

দেবব্রত উমার সারা দেহটা নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলে, কথা বলো, লক্ষ্মীটি!

তথাপি উমা কোন কথা বলে না। কিন্তু দেবব্রত উমার মুখের পানে চাহিয়া দেখে যে, উমার সারা মুখখানা

এক দুষ্টামীর হাসিতে ভরিয়া রহিয়াছে, চোখ দু'টী সে জোর করিয়াই বুজাইয়া রাখিয়াছে।

দেবব্রত উমার মুখখানা নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলে, এই দুষ্টু !

এবার উমা চোখ মেলিয়া হাসিয়া ফেলে।

উমাকে হাসিতে দেখিয়া দেবব্রত হাসিতে থাকে। তারপর বলে, এইবার কথা বলো।

খুব আস্তে আস্তে উমা বলে, কথা বল্‌বো না তোমার সঙ্গে।

দেবব্রত হাসিয়াই জিজ্ঞাসা করে, কেন বল্‌বে না ?

উমাও হাসিয়া উত্তর দেয়, তুমি কেন এত দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলো নাই।

দেবব্রত ভাবে, ঠিক্। উমা ত এ প্রশ্ন করিতে পারে। বলে, আমায় বিশ্বাস কর উমা, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার, তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বার জন্য আমি সর্ব্বদাই কতখানি না উন্মুখ হয়ে থাকৃতুম !...কিন্তু তোমার সাম্‌নে এলেই আমি যেন কি হয়ে যেতুম। ভয় হ'ত যদি তুমি আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ না কর, যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর—তাই ভয়ে ভয়ে কেবল দূরে থাক্‌তেই চেষ্টা করতুম। কিন্তু আমার সারাটা অন্তর কেবল তোমার কাছে দিবারাত্রই পড়ে থাকৃত।

উমা বলে, আমার কিন্তু রাগ হ'ত আর দুঃখ হ'ত। ভাবতাম, তুমি বুঝি আমাকে চাও না।

উমাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে ধরিয়া দেবব্রত বলে, তোমাকে চাই না ! তুমি যে ছিলে আমার সকল কল্পনার উৎস হয়ে ! বলে, জীবন আমার আজ সত্যি [প]রিপূর্ণ। যাকে ভালবেসেছিলাম, যাকে সারা অন্তর দিয়ে [কাম]না করেছিলাম, তাকে আজ আমি শুধু আমার বলেই [পে]য়েছি ! একটু থামিয়া বলে, আজ আমি সুখী, সত্যি !...তারপর উমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি ?

উমা আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, খুব।

...স্বপ্ন ! স্বপ্ন !...দেবব্রত নিদ্রা ভাঙ্গিতেই বুঝিতে [পারে] এ শুধু স্বপ্ন, শুধু মিথ্যা, শুধু মায়া !...সে ব্যথা পায়। [মনে] হয়, সে যেন একেবারে রিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া সে তারপর চক্ষু বুজিয়া থাকে—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কেউ ত আর স্বপ্ন দেখিতে পারে না। তথাপি সে চক্ষু বুজাইয়া থাকে।

এবার স্বপ্ন নয়, সত্য।

কিন্তু উমার সারা মন আজ শুধু বিদ্রোহ হইয়া উঠিতেছে, কে চায় বিবাহ ? কেন, আজ বাড়ীর সকলে তাহাকে এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিবার সম্বন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ বিবাহ ত উমা মোটেই কামনা করে নাই। ভাবে, এ তাহার বলিদান।

উহার সারা মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, বিবাহের মানসে রূপের পরীক্ষা দিতে যাইয়া। লুব্ধ দৃষ্টিতে যাহারা উহার রূপের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহাদের দিকে ও ভাল করিয়া চাহিতেই পারে না। উমার যে বর হইবে, উমা তাহার দিকে একবার চাহিয়া লইয়াছে। নাদুসনুদুস গো-বেচারার মত চেহারা। নাম তার সুলাল সেন। কিন্তু উমা চারিদিকে চাহিয়া ভাবে, নাম ওর নন্দদুলাল হইলেই বেশী শোভন হইত।

নন্দদুলাল উমার মুখের দিকে চাহিয়াই মুখ নীচু করিয়া থাকে—যেন উমাই নন্দদুলালকে দেখিতে আসিয়াছে। দেখিয়া উমার ভারী হাসি পায়। মুহূর্ত্তের জন্য এই নন্দদুলালের পার্শ্বে দেবব্রতর মূর্ত্তিখানি একবার ভাসিয়া উঠে। উমার বুক ভারী হইয়া উঠে। আপনা হইতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসে।

পরীক্ষায় উমা উত্তীর্ণই হয়, মানে, ভাবী বরের সঙ্গে তাহার বন্ধুদেরও উমাকে পছন্দ হয়।

এই শেষ দেখা। বরের অভিভাবক যাঁহারা, তাঁহারা পূর্ব্বেই উমাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। এবার ইহাদের দেখার পরেই শেষ নির্ভর করিতেছিল। সুতরাং এবার আর উমার এ বিবাহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রহিল না।

বর হিসাবে দেবব্রত অপেক্ষা সুলাল সেনই শ্রেষ্ঠ

আসন পায়। দেবব্রতর এই থার্ড ইয়ার, আর সুলাল সেন তাহাদের কলেজেরই প্রফেসর। ঐশ্বর্য্য তাহাদের যথেষ্টই আছে, আভিজাত্যও। কিন্তু তথাপি উমা তাহাকে দেবব্রত অপেক্ষা কিছুতেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারিতেছিল না।

রাত্রির পর রাত্রি বাড়িয়াই চলিতেছিল, আর উমা কেবলই চিন্তা করিতেছিল, দেবব্রতর কথা।...কিছুতেই কি ইহা হইতে পারে না। একসঙ্গে উহার অভিমান হয়, রাগ হয়, দুঃখ হয়। ভাবে, কেন দেবব্রতর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয় না?

উমার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

এই।

উঁ।

উমা।

কি।

আর ঘুমুতে হবে না, ওঠো।

না, সত্যি আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে।

তা' হোক্। ওঠো লক্ষ্মীটি। আমার যে কিছুতেই ঘুম পাচ্ছে না। একা একা কি জেগে থাকা যায়? ওঠো, গল্প করে রাত্রিটা কাটিয়ে দিই।

উহুঁ, তা' হচ্ছে না। যেদিন আমার ঘুম পায় না, সেদিন কি তুমি জেগে থাক? তবে? না, সত্যি আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে।

উমা আবার জোর করিয়া চক্ষু বুজে।

উমার বন্ধ চোখের পাতায় ছোট্ট একটু চুমু খাইয়া দেবব্রত বলে, নাও, আর দুষ্টুমী করতে হবে না। তারপর বলে, আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, যেদিন তুমি বলবে, সেইদিন সারারাত্রি জেগে তোমার সঙ্গে শুধু গল্প করেই কাটিয়ে দেব, কেমন?

শুক্লা-একাদশীর রাত্রি। আকাশে চাঁদ হাসিয়া বেড়াইতেছে—আলোতে সারা পৃথিবী যেন ভরিয়া গিয়াছে। ওদের ঘরের জানালাটা খোলা—তাহারই মাঝ দিয়া খানিকটা আলো বিছানা এবং উহাদের চোখে মুখে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের কি একটা গাছে একটা নিশাচর পক্ষী অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব মিষ্টস্বরে ডাকিয়া চলিয়াছে। মৃদু বাতাসে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ উহাদের কাছে ভাসিয়া আসিতেছে। এমন চমৎকার রাত্রি, এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। এ প্রণয় প্রণয়ীর কাছে বহু মূল্যের। সুতরাং, এই রাত্রিটাকে উহারা অবহেলায় নষ্ট করিল না। দেবব্রত উমাকে আদর করে, চুমু খায়। বলে, চিরজীবন যেন এমনি করিয়াই সে তাহাকে বুকে ধরিয়া রাখিতে পারে।

এই বলিয়া দেবব্রত উমাকে খুব নিবিড়ভাবে তাহার বুকের সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরে।

আবেশে উমার চক্ষু বুজিয়া আসে। দুই হাতে দেবব্রতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া খুব আস্তে আস্তে ও বলে, জন্ম-জন্মান্তর যেন তোমারই শুধু হতে পারি।

কিন্তু উমার এই সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতে মোটে বিলম্ব হয় না। জাগিয়া উঠিয়া ব্যথায় যেন ওর ছোট্ট বুকখানা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। ও এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলে।

আজ কোন প্রকারেই উমা অস্বীকার করিতে পারে নাই, দেবব্রতর প্রতি ভালবাসার কথা। দেবব্রতকে যে মনে মনে ভালবাসে তা' ও জানে। কিন্তু সে ভালবাসার গভীরতা আজ ও নূতন করিয়া অনুভব করিতে পারে।

ইহার জন্য ও মনে মনে মোটেই শান্তি পায় না, বরং অস্বস্তি বোধ করে। ভাবে, পৃথিবীর এ কি নিয়ম! যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পায় না কেন?

দেবব্রত পুরুষ। কিন্তু উমা ভাবে, ভগবান উহাকে নারী করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? এত লজ্জা! ভালবাসিয়া এমনি উদাসীন হইয়া মানুষ কি থাকিতে পারে? দেবব্রতর উপর উহার অভিমান হয়, বিতৃষ্ণা জাগে।

ভাবে, আর এই নিষ্ঠুর উদাসীনের ছবি মনের মধ্যে মিথ্যা গাঁথিয়া রাখিয়া সে তার ভবিষ্যতের সব সুখ শান্তি নষ্ট করিবে না।

এই কথা ভাবিয়া উমা উহার ভাবী বিবাহের জন্য মন বাঁধিতে চেষ্টা করে।...কিন্তু তবু বাকী রাত্রিটুকু সে শুধু দেবব্রতকেই ভাবিয়া কাঁদিয়া মরে।

সুলাল সেনের সঙ্গে উমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া যায়। খবরটা বেশ তাড়াতাড়ি এই ছোট সহরের বুকে ছড়াইয়া পড়ে। এ খবর যাহাদের শোনার প্রয়োজন, তাহারা ঠিক্ সময়েই শোনে। শুনিয়া কেহ হয় ক্ষুব্ধ, কেহ হয় 'জেলাস্', কেহ নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে সুলাল সেনের অদৃষ্ট মিলাইয়া দেখে।

সকলের মত উমার এই বিবাহের সংবাদ শুনিতে দেবব্রতর বাকী থাকে না। শুনিয়া সে প্রথম স্তব্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, যেন আকস্মিক একটা প্রচণ্ড আঘাতে সে তাহার সমস্ত সত্বা হারাইয়া বসিয়াছে। এমনি করিয়া ও কিছুক্ষণ শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে; তারপর বিছানায় গিয়া নিজের দেহ একেবারে এলাইয়া দেয়। এমনি ভাবেই ও বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়ে যে এই পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবার আর কোন সার্থকতাই সে দেখিতে পায় না। শুইয়া শুইয়া ও বহুক্ষণ ধরিয়া কেবল উমা গুপ্তাকে ভাবিয়া চলে। শেষে উঠিয়া আসিয়া ও তার কবিতার খাতা খুলিয়া বসে।

প্রথমেই ও কবিতার নাম লেখে, 'বিদায় পাষাণী প্রিয়া।'

তারপর ও অনেক কথাই লিখিয়া চলে। লেখে, তোমার কাছ হইতে সত্য এবার বিদায় লইলাম প্রিয়া!... ভাল তোমাকে বাসিয়াছিলাম সত্য। তোমার চিন্তায় আমার সারা মন শুধু সচেতন হইয়াই থাকিত।...দিনের পর দিন তোমার উদ্দেশ্যে নীরবে যে অশ্রু ফেলিয়াছি, তাহাতে হয় ত বা পাষাণও গলিয়া যাইত, কিন্তু তোমার মন গলাইতে পারিলাম না।...তুমি চলিয়াছ, তোমার সুখের যাত্রাপথে পিছু ডাকিয়া তোমার সে যাত্রা আর নিষ্ফল করিব না।...তাই তোমার কাছ হইতে নীরবে বিদায়ই লইলাম।...শুধু তোমার স্মৃতিটুকু বুকে লইয়া—

কিন্তু দেবব্রতর এই কবিতা 'উদয়াচলে' ছাপা হইয়া এখানে আসিবার পূর্ব্বেই সুলাল সেনের সঙ্গে উমা গুপ্তার বিবাহ হইয়া যায়। সেই বিবাহের রাত্রেই উমা এবং দেবব্রত পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখে, তাহা অন্যায়ও বটে, অশোভনও বটে।

উমার বিবাহ-রাত্রে দেবব্রত স্বপ্ন দেখে যে, উমা আত্মহত্যা করিয়া বসিয়াছে। সে তাহার সোণার দেহখানি স্বহস্তে চিতায় তুলিয়া দিয়া একেবারে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।...

আর উমা তখনই ঠিক্ তার স্বামীর পাশে শুইয়া থাকিয়াও স্বপ্ন দেখে যে, দেবব্রত আর ইহলোকে বাঁচিয়া নাই। তারপর সে নিজের দেহের দিকে চাহিয়া দেখে যে, কাহারা তাহাকে যেন বিধবার সাজে সাজাইয়া দিয়াছে।...

কিন্তু এই অত্যন্ত অন্যায় ও অশোভন স্বপ্নের মাঝে যে সত্যের ইচ্ছাটুকু রহিয়াছে, তাহাকে ত কোন প্রকারে উপেক্ষা করা চলে না। সে সত্যের ইচ্ছাটুকু এই যে, আজ হইতে উমা আর দেবব্রত পরস্পর পরস্পরের কাছে মৃত।...

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

ফুল-বাগিচায় ভ্রমর

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

নিতান্ত অসময়ে খ্যাতনামা সুরশিল্পী অঞ্জন রায়ের একান্ত নিরালা ঘরখানিতে হঠাৎ বাতি জ্বলে উঠ্‌তেই পাশের বাড়ীর এক তরুণ ডাক্তারের স্ত্রী শিশিরকণা দস্তুরমত আশ্চর্য্য হয়ে উঠলো। ব্যাপার কি? এ সুন্দর গানের সুরের মত মিষ্ট মুহূর্ত্তে সুর-শিক্ষক অঞ্জনের তো ঘরে ফেরা রীতি নয়। তবে? ওর ছাত্রীদের আজ হয়েছে কি? শিশিরকণা সবেমাত্র জ্যোৎস্না ঝল্‌মলে গোধূলীকে অভিনন্দিত করতে পূরবী সুরকে ভরেছিল ওর বাঁশের বাঁশীতে। ত্রস্তে বাঁশী থামিয়ে, ঘরের বাতিটা নিবিয়ে, অতি সন্তর্পণে, একান্ত উৎসুক হয়ে বাতায়ন পাশে গিয়ে সে দাঁড়াল। ওর কক্ষ হতে অঞ্জনের নানারূপ বাদ্যসম্ভারে সুশোভিত ঘরখানা সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। স্বরদ, বেহালা, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রগুলো যেন রাগ-রাগিনীর মূর্ত্তিতে ওর যথার্থই শিল্প মনের পরিচয় দিচ্ছে। নীল ছাপতোলা লক্ষ্ণৌ ছিটে ঢাকা মস্ত অর্গ্যানটা রয়েছে পূর্ব্বদিকের জান্‌লার ধারে—বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মিতালি পাতিয়ে ও গান করে। "এস তোমরা ভেতরে এস" বলে অঞ্জন ঘরে ঢুকে, অর্গ্যানের সামনে টুলে গিয়ে বসলো।

পিছু পিছু গোটাকয়েক ছোট বড় মেয়ে ঘরে ঢুকে ওর সুমুখে জড়োসড়োভাবে এসে দাঁড়ালো। একটী মেয়ের হাতে ছিল একটুক্‌রা গান লেখা শ্লিপ। সে তারই 'পরে গভীর মনোনিবেশে ঝুঁকে পড়লো। এ মেয়ে কয়টী অঞ্জনের ছাত্রী। কয়েকদিনের মধ্যে অঞ্জন ওর সখের থিয়েটার পার্টিটাকে জমকে তুলবে, কি যেন এক 'চ্যারিটি' উৎসবে—এরা গাইবে তার গান। "না, তোমাদের দিয়ে দেখ্‌ছি কিছ্ছু হবে না—এখনও গানই মুখস্থ হ'ল না!" তারপর পাতলা ফর্সা আঙুলগুলো রীডের ওপর চালাতে চালাতে একটী মেয়ের দিকে তাকিয়ে পরম নির্ভরে অঞ্জন বল্‌লে—"শ্রীলেখা, এরা বড় অন্যমনস্ক; তুমি এদের প্রতি একটু লক্ষ্য রেখো।"

শ্রীলেখা মেয়েটী অঞ্জনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয় ছাত্রী। বয়স ওর মাত্র তের কিংবা চোদ্দ—কিন্তু এরই মধ্যে সঙ্গীত-রাজ্যে সে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। নিয়মিত রেডিও এবং রেকর্ডে গান করে। অঞ্জনের স্নেহমাখা আদেশে ওর শ্যামবর্ণ শান্ত বদনখানি অপরূপ হয়ে উঠলো দীপ্তরাগে, মধুর হ'ল শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে। সে সলজ্জ মুখখানি নত করে স্মিতহাস্যে ক্ষমা, রেবা ও দীপ্তির সাথে অঞ্জনের সুমধুর কণ্ঠে ওর মিষ্ট সুর মিশিয়ে দিল—

"বন্দে—মা—তরম্।

সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং, শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

সমস্ত সহর প্রান্তকে চাঞ্চল্যে মুখর করে আত্মবিভ্রমে ওরা গেয়ে চল্‌লো।

"হঠাৎ যে সন্ধ্যেবেলা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি, ব্যাপার কি ভাই, দেশোদ্ধারে চলেছো না কি?"

কিছুক্ষণ পর সঙ্গীত ওদের নীরব হলে, অঞ্জনের পাশে যে একটী যুবক নিঃসাড়ে এসে বসেছিলো, তার কৃত্রিম পরিহাস তরল কণ্ঠে চমকে উঠলো শ্রীলেখারা। মুখ তুলে চাইলো ওর পানে। কিন্তু অঞ্জন তখনও ছিল নীরব, নিরুত্তর, যেন বাক্‌শক্তিহীন। দৃষ্টির উছলিত খুশীতে ও পুরোনো বন্ধু প্রিয় উৎপলকে আনন্দের অভিনন্দন জানালো; কারণ, ওর অন্তর তখনও সুরের মিষ্ট আমেজে পূর্ণ ছিল। উৎপল ওর কলেজের বন্ধু। এখন করে রেলে চাকরী। সম্প্রতি সুদূর বিদেশ হতে বদ্‌লী হয়ে এসেছে ব্যারাক-পুরে। অঞ্জনকে নীরব দেখে উৎপল আবার বল্‌লে মিষ্ট হাস্যে—"কি হে অঞ্জু, চিন্‌তে কি পারলে না আমায়—

তারপর আর সব খবর কি?" হঠাৎ উৎপলের কণ্ঠের উৎস যেন নির্ঝরের মতই বাধা মুক্ত হয়ে উঠ্‌লো—"এদিকে তো বেশ 'ফেমাস' হয়ে পড়লি—রেকর্ডে—রেডিওতে আসর জমকালো করে তুল্‌লি—কাগজে কাগজে নাম ঘুরছে। হ্যাঁ, তারপর কি করা হয় এখন? নিশ্চয় বিয়ে-থা—"

—"ওরে বাস্‌রে, থাম্‌ ভাই পল্‌, একসঙ্গে অত প্রশ্ন তুলিস্‌ নে, মরে যাব।" ওকে থামিয়ে দিয়ে অঞ্জন সহাস্য-মুখে বল্‌লে—"তোর চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু বিশেষ একটা কাজে পড়ে 'রিসিভ' কর্‌তে যেতে পারি নি, ক্ষমা করিস্‌।"

তখন ক্ষমা, রেবাদের চপল প্রাণগুলো উৎপলের ওই কথা বল্‌বার হাস্যময় ভঙ্গিমায় আরও চঞ্চল ও উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। ওরা নতমুখে দুর্দ্দমনীয় হাস্য-উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছিল; কিন্তু দশ বছরের ছোট মেয়ে দীপ্তি হাসিকে কোনমতেই আয়ত্তে আন্‌তে না পেরে সর্ব্বসমক্ষে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ফেল্‌লো। অঞ্জন শ্রীলেখার পানে তাকিয়ে বল্‌লো—"শ্রী, আজ আর আমি তোমাদের ওখানে যাব না, তোমরা সব বাড়ী যাও।—এই হরি সিং, খুকী দিদিলোক্‌কো বহুত সামাল্‌সে ঘরমে পৌঁছায়ে আও।"

ওরা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে উৎপল বল্‌লে—"তা' হলে কি ভাই অনু, সঙ্গীত-চর্চ্চাটাই তোর জীবনের পেশা হ'ল না কি? যদি তাই হয়, তবে আমার বোন্‌টাকে একটু শিখিয়ে দিস্‌।" একটু থেমে রুমালে মুখটা মুছে নিয়ে আবার সে বল্‌লে—"যাবি তো কাল থেকে আমার ওখানে? কারণ, কাজল তো আর তোর স্কুলে হেঁটে আসতে পার-—"

উচ্চ হাসির ধাক্কায় বন্ধুর একান্ত মিনতি উৎসকে ভাসিয়ে দিয়ে অঞ্জন বল্‌লে—"দূর পাগল, এটা কি আমার স্কুল, ওরা একসাথে এক জায়গায় রিহার্সেল দিতে এসেছিল। পরশু কি না আমরা 'চ্যারিটি'র জন্যে 'মানময়ী' প্লেটা করবো, ওরা গাইবে তার উদ্বোধন গান।"

অঞ্জন সম্মতি হাস্যে উৎপলের ভগ্নী কাজলকে ওর নূতন ছাত্রীর পর্য্যায় সাদর অভিনন্দন জানিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলো—"হ্যা পল্‌, এতদিন পর হঠাৎ কাজল গান শিখ্‌ছে কেন? সখ কার? তার স্বামীর না কি?"

—"নারে, সখ্‌ ওর নিজেরই, স্বামী আর জুট্‌লো কই?"

—"তার মানে?"

—"মানে?" উৎপল বল্‌লে—"বুঝ্‌লি ভাই অনু, কাজল হ'ল কবি, অকালে ওর কবি-মধুর প্রাণটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তো আর যার তার হাতে ওকে তুলে দিতে পারি নে; সন্ধানে আছি এমন ছেলের, যে হবে না আদৌ হিসেবী পুরুষ, বেশ অগোছাল হবে, সাধারণ পুরুষের মত একটা কাণা-কড়ির মমতায় অস্থির হয়ে উঠবে না, সংসারে পরিপূর্ণরূপে জমে উঠতে দস্তুরমত অবজ্ঞা করবে, শুধু আর্ট—আর্টের কেন্দ্রেই ওরা—"

—"বুঝ্‌তে পেরেছি ভাই।" প্রচুর হাস্যে অঞ্জন বলে উঠলো—"আমি তোমার মতানুযায়ী আর্টিষ্ট ছেলে এনে দিতে পারি অসংখ্য; যদি তুমি 'প্রেজেন্ট'-এর প্রতিশ্রুতি দাও—একটা ছোটখাটো জমীদারী কিনে দেবে, তবে; কারণ, কাব্যের সহায় তো আর উদরের পূর্ণতা আন্‌তে পারে না।"

ঘর কম্পিত করে হেসে উঠে উৎপল বল্‌লে—"ওরে বাস্‌রে, জমীদারী, তবেই হয়েছে।" একটু কটাক্ষের দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সে বল্‌লে—"আমি সম্প্রতি একটী বেশ দামী ছেলের সন্ধান পেয়েছি।"

"কোথায়?" দৃষ্টির ঔৎসুক্যে অঞ্জন জান্‌তে চাইলে।

—"এইতো আমার সাম্‌নেই বসে।"

উৎপল নিজের হাত-ঘড়িটার পানে তাকিয়ে ভীষণ চঞ্চল হয়ে, আর একবার কৌতুকের ঝলক দৃষ্টি অঞ্জনের ফুল্লমুখে বুলিয়ে অত্যন্ত ত্রস্তকণ্ঠে বল্‌তে বল্‌তে বাইরে বেরিয়ে গেল—"আচ্ছা, আমি আজ চল্‌লুম, কাল তুই যাস্‌ ঠিক্‌।"

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। উৎপলের বাইকখানা হাওয়ার মত মিলিয়ে গেছে—দূরে, কত দূরে, ওই রেল লাইনের ওপারে বন-জঙ্গলে মিশে; বেলের টুংটাং শব্দটাও আর

শোনা যাচ্ছে না। অঞ্জন তখনও পথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একান্ত তন্ময় হয়ে হাতে থাকা প্রায় নিঃশেষিত চুরুটটা টান্‌ছিল। বেশ একটা মিষ্ট আমেজের অনুভূতিতে চিত্ত ওর ভরে উঠেছিল। হয়তো ওর ওই জ্বলন্ত চুরুটের মুখের আলোটা তখন বহুদিন বিস্মৃত এক গোলাপ কিশলয় মুখের শান্ত সুন্দর আভায় পরিবর্ত্তিত হয়েছিল; ওর বুকের পটে মুছে যাওয়া লুপ্ত স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল।—"কাজল, কাজল, কত সুন্দর কাজল!"

সহরতলীর পথ ভীষণ কোলাহলে মুখরিত। সন্ধ্যার বুকে রাত্রের অপরূপ আসনখানি নিবিড় হয়ে আস্‌ছে। রাস্তার দু'ধারে গ্যাসের আলোগুলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বল্‌ছিল ঠিক্‌ অলস মনের মত। ম্লান আলোকে পথিকের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছিল না; কারণ, সারীবাঁধা দোকান ও গৃহের অভ্যন্তর হতে দীপালোক প্রতিফলিত হয়ে পথ অনেকটা উজ্জ্বল করেছিল। ওধারের একটা 'রেস্‌টুরেন্ট' মাংস-পেঁয়াজের বিকট গন্ধে স্থানটাকে বেশ জম্‌কে তুলেছে। হঠাৎ পেয়ালা-চাম্‌চের টুংটাং শব্দে আনুমনা অঞ্জন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে চোখ তুলে হোটেলটার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো উঃ, কি ভীষণ ভীড়! লোকগুলো গোগ্রাসে গিল্‌ছে যেন। প্রত্যহ এমনি সময় অঞ্জন শ্রীলেখাদের বাড়ী চা খায়, কিন্তু আজ ওর সে মধুর মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—আটটা বেজে গেছে। চায়ের নেশায় অভিভূত চিত্ত ওর হঠাৎ হোটেলের প্রতি ভীষণ উৎসুক হয়ে উঠলো। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে চোখের সুমুখে শ্রীলেখার হাতে যত্নে সাজানো চায়ের সুন্দর টেবিলখানা মূর্ত্ত হয়ে উঠতে সে আর ওই 'রেস্‌টুরেন্টে' প্রবেশ করতে পারলো না। বাস্তবিক শ্রীলেখার মা-বাপ আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসায় ওর হৃদয় পূর্ণ করেছিলেন। ও যেন মেয়েদের শিক্ষক নয়—একান্ত আপনার জন। এমনি তাঁদের ভাবখানা।

—"এই যে অঞ্জন, এসেছ বাবা, এত দেরী হ'ল কেন বলো তো?"

ঠিক্‌ গলিটার শেষ প্রান্তে, গঙ্গার কিনারে শ্রীলেখাদের মস্ত বাড়ীখানা। রং তার টুক্‌টুক্‌ করছে লাল। সাম্‌নের বাগানে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটে রয়েছে। ওঃ, কত সুন্দর, অপূর্ব্ব রং-বেরঙের ওই ফোটা ফুলগুলো! যেন ওদের উৎসব ও বাগানে। ঝরা ফুলের সমারোহে সবজে মাঠ রঙীন হয়ে উঠেছে। গেটের মাথায় রাশি রাশি কুঞ্জলতা ফুটেছে—লালের প্রাচুর্য্য যেন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে এক মায়াবনের সৃষ্টি করেছে। লতায় পাতায় ঢাকা আলো ছায়ার অন্তরালে বাইরের রকে শ্রীলেখার বাবা গড়গড়া টান্‌ছিলেন। নিতান্ত অসময়ে অঞ্জনকে পেয়ে অন্তর তাঁর পরম উল্লাসে ভরে উঠলো। উৎসাহের কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—"নাও, আগে দুটো গান শোনাও তুমি, এ যেন হয়েছে আমার আফিঙের নেশা।"

তাঁর হাসিতে স্থানটা মুখরিত হ'ল। সস্মিত হাস্যে তাঁর আদেশকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করে অঞ্জন বাগানের ভেতর প্রবেশ করলো। তখন বাগানের একপ্রান্তে শান-বাঁধানো পুকুর-ঘাটে বসে শ্রীলেখার বড় বোন্‌ সুজলা জ্যোৎস্না-চিক্‌মিকে পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে একান্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে গান গাইছিল—

"যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে,
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে না জানি কি মহা লগনে!
চাঁদ উঠেছিল—"

হঠাৎ শুক্‌নো পাতার গায়ে মর্ম্মরিত যেন কার পদ-শব্দে সুজলা ভীষণ চম্‌কে উঠ্‌লো। পিছন ফিরতে অঞ্জনকে দেখেই ও বড় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। গান ওর তখন নীরব হ'ল।

—থাম্‌লে কেন? বাঃ, বেশতো তোমার গলা মিষ্টি সুজলা!

মুগ্ধহাস্যে চোখ ভরে অঞ্জন তাকালো সুজলার রক্তিম মুখের পানে। আর তখন গলা মিষ্টি, সরম অনুরাগে স্নান করে সুজলা তখন বাড়ীর ভেতর পালিয়ে গেছে।

—"হ্যাঁ, দিদি আবার গান করবে!" ঠিক্‌ সেই মুহূর্ত্তে শ্রীলেখা উপস্থিত হ'ল। বিজ্ঞের মত ঠোঁট উল্‌টে বল্‌লো—

"জানেন অঞ্জন দা', মা এত করে সাধেন, ওকে আপনার কাছে দুটো গান শিখ্‌তে তা' কিছুতেই শিখ্‌বে না।"

বাস্তবিক সুজলার গলা ভারী মিষ্ট! কিন্তু ও বড় লাজুক মেয়ে—সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় ওর কোনও শক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। সুজলার কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে শ্রীলেখা ও অঞ্জন রোজকার মতই সঙ্গীত আলোচনায় নিবিড় হয়ে উঠলো।

কয়েক দিন হ'ল 'চ্যারিটী'র 'মানময়ী' অভিনয় সুন্দররূপে সমাপন হয়ে গেছে। অঞ্জনদের প্রাণপূর্ণ পরিশ্রমকে বিরাট সার্থকতায় ভরে দর্শকবৃন্দের উল্লাস, ওদের যশোগান ও প্রশংসার উচ্ছ্বাসে সমস্ত পল্লী মুখরিত হয়ে উঠলো। কথার ভেতর দিয়ে একদিন অঞ্জনের নূতন ছাত্রী কাজল বল্‌লো—"অঞ্জন দা', আপনাদের প্লে কিন্তু ভারী সুন্দর হয়েছে! 'মানসমোহনে'র পার্টটা বড় চমৎকার লাগ্‌লো! আচ্ছা, আপনি এত সুন্দর অভিনয় করতে—"

—"ওরে বাস্‌রে, থামো কাজল, অত উঁচুতে তুলে দিও না!"

কাজলের কণ্ঠের অজস্র মুগ্ধতায় ভীষণ কুণ্ঠা অনুভব করলে অঞ্জন। সে তার কোঁকড়ানো এক মাথা সাজানো চুলগুলোকে আঙুলের দৌরাত্ম্যে বিশৃঙ্খল করতে করতে নম্র মধুর হাস্যে বল্‌লো—"ও ফিল্মখানা দেখেছ তো, কত সুন্দর হয়েছে?"

—"সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে বুঝি, আমার কিন্তু দেখা ঘটে ওঠে নি।"

—"দেখো নি!"

ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে গেল অঞ্জন। এমন সর্ব্বজন-প্রশংসিত সুন্দর বাংলা ছবিখানি কাজল দেখে নি; অথচ, এই সেদিন সে ওরই কাছে ছুটী নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে 'মেট্রো সিনেমা'য় কি যেন এক বিদেশী ছবি দেখে এলো না। —"না, দেখুন।" কাজল বল্‌লে—"আমার আর বাঙলা ছবিগুলো দেখা ঘটে ওঠে না; বাবার কাছে যা' কিছু 'পকেট মানি' পাই, ইংরেজি ছবিতেই সব খরচ হয়ে যায়।"

—"ছি কাজল, তোমরা বাঙালীর মেয়ে হয়ে যদি এই কথা বলো—!"

একটা আন্তরিক বেদনার সুরে অঞ্জনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। সে অনেক ভাব্‌লো, কিন্তু কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারলো না যে, নিতান্ত সাধারণ স্তরের মেয়ে কাজল বাংলা ছবিকে ভাল না বেসে, বিদেশী চিত্রকে কেন এত ভালবাসে? সত্যি কি ও ভালবাসে? নিজের দেশের সুন্দর, সংযম-মধুর দৃশ্যের চেয়ে ওদের ওই কামনা-মুখর নিছক নগ্ন সৌন্দর্য্যটা—না, ওই ভালবাসাটা ওদের নিছক ষ্টাইল। ওর চিন্তার দুয়ার আগল করে কাজলের মা অপর্ণা এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। হাতে ওঁর চা ও খাবারের থালা। সেগুলো টিপয়ের ওপর রেখে অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে বল্‌লেন,—"বাড়ীতে এই খানকয়েক চিংড়ীর কাট্‌লেট ভেজেছিলুম বাবা। তোমাকে তো কিছুই খাওয়াতে পারি না কোনও দিন।" একটু থেমে তিনি আবার বল্‌লেন—"কাজলা বলছিল তোমার ঠাকুরটা না কি মোটেই—"

—"হ্যাঁ মা, ওদের ওই ধরণ, বাড়ীতে মেয়েছেলে নেই কি না।"

—"বাড়ীতে মেয়েছেলে নেই কি না।" অঞ্জনের এই কথা কয়টী অপর্ণার কোন্ গোপন বাসনার তন্ত্রীতে যেন ঝঙ্কৃত হ'ল, বুকটা দুলে উঠলো সুখে।—"নাও বাবা, চা-টা যে জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।" ওঁর কণ্ঠস্বর প্রচুর উৎসাহে নৃত্য করে উঠলো—"ও, লজ্জা কর্‌ছে বুঝি? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তুমি খাও। কাজল, একটু দেখিস মা।"

তিনি তখনই কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই ওপাশ থেকে ভেসে এল তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি কা'কে যেন বল্‌ছিলেন—"ছেলেটী চমৎকার! রূপে-গুণে সমান। এই কয়মাসের মধ্যে মেয়েটাকে কি সুন্দর করেই না সেতার শিখিয়েছে—দু' দণ্ড শুন্‌তে সাধ যায়!"

বাস্তবিক সেতারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কাজলের হাত এই কয়েক মাসের মধ্যে বেশ সহজ ও সরল হয়ে এসেছে। ওর সুনিপুন ছন্দভরা আঙুলের দিকে একান্ত তৃপ্তির চোখে তাকিয়ে মুগ্ধ অঞ্জন বলে—"সত্যি কথা কাজল, সুরকে শ্রদ্ধা করার শক্তি তোমার আছে। দিন দিন তোমার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে। সত্যিকারের গুণীর এমনই আকর্ষণী শক্তি—"

সপ্ত তন্ত্রীর মধুর ঝঙ্কারে অঞ্জনের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেয় কাজল। ওর সুন্দর মুখখানা তখন রবিদীপ্ত পথের মতই রাঙা আলোয় ঝলমল্ করে ওঠে।

দিন চলে এগিয়ে।

হেমন্তের শান্তিপূর্ণ অলস মধুর এক দুপুর বেলা। সমস্ত পথ-ঘাট প্রায় জনশূন্য নীরব; মাঝে মাঝে দুরন্ত বাতাসের খেলা, ঝরা পাতার খস্‌খসানি। দু'-একটী পথিকের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শান্ত পল্লীকে চকিত করে তুল্‌ছিল। ষ্টীমারের শব্দে এবং তরঙ্গে নদী অশান্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। তখন শ্রীলেখাদের গৃহের অভ্যন্তরে তেতলার ঘরে রেডিওতে বাড়ীর কর্ত্রীদের জন্য ধর্ম্মকথা শোনানো হচ্ছিল। কিন্তু কর্ত্রী শ্রীলেখার মা তখন গভীর ঘুমের কোলে অচেতন। সেদিন ছিল বুঝি শনিবার। সুজলা ও শ্রীলেখার স্কুল বন্ধ। সুজলা নিজের ঘরে শুয়ে একখানি মাসিক-পত্রিকায় তন্ময় হয়ে গেছেলো, আর শ্রীলেখা ঘুমন্ত জননীকে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে জাগাচ্ছিল রেডিওর গল্প শোনানোর অনুনয়ে—"ও মা, মা, ওঠো না, এবারে খুব সুন্দর একটা ভূতের গল্প বলা হবে, ওঠো শীগ্‌গির।"

মেয়ের মিনতি মাকে সজাগ করে তুল্‌লে। কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকা সত্বেও মা উঠে বস্‌লেন। কিন্তু তাঁর মত পরিপূর্ণ সংসার-অভিজ্ঞা সুগৃহিণীকে ভৌতিক-তত্বের অপূর্ব্ব রহস্য কিছুমাত্র আকৃষ্ট করতে পারলো না।—"উঃ, সংসারে এখন সৃষ্টির কাজ পড়ে! যাই, উনি এখুনি এসে পড়বেন—কচুরী ক'খনা ভেজে ফেলি—"

তন্দ্রালস চোখ দু'টী আঁচলে মুছ্‌তে মুছ্‌তে শ্রীলেখার দিকে তিনি তাকিয়ে বল্‌লেন—"তুই রেগুলেটারটা একটু বাড়িয়ে দে শ্রী—আমি নীচে বসে শুনছি।"

জননীর কথানুসারে শ্রীলেখা রেগুলেটার বাড়িয়ে মায়ের পিছু পিছু নীচে নেমে এল গল্পটা তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে।

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে অঞ্জন অত্যন্ত চঞ্চলভাবে বারান্দায় এসে প্রবেশ করলো। শ্রীলেখাকে বল্‌লো—"জানো শ্রী, আজ আর সন্ধ্যের পর আমার আসা হবে না। কাল কাজলের জন্মতিথি-উৎসব। আমি সেখানে নিমন্ত্রিত; তাই 'প্রেজেন্টে'র একটা কিছু কিন্‌তে তিনটের লোকালে কোলকাতায় যাচ্ছি। তুমি বেহাগ সুরটা খুব ভালমত 'প্র্যাকটিস' কোরো আজ।"

—"ও, বেহাগটা আমার খুব ঠিকই আছে অঞ্জন দা'।"

বসেছিল শ্রীলেখা। উঠে দাঁড়িয়ে সে আনন্দে নেচে উঠে বল্‌লে—"আমি যাব আপনার সঙ্গে কোলকাতা।"

শ্রীলেখার মার তখন কচুরীর জন্য সিদ্ধ কড়াইসুঁটী শিলনোড়ায় বাটছিলেন। অঞ্জনের কথা কয়টী কানে যেতে, সহসা অন্তর তার কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল। কাজল 'মেয়েটী কে? সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন উঠলো বড়ই আকুলভাবে। ঔৎসুক্যতা মনে নৃত্য সুরু করে দিল। বিস্ময় মেশানো একান্ত ক্ষোভপূর্ণ দৃষ্টি অঞ্জনের চোখে রেখে অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে তিনি জিগ্‌গেস করলেন—"কাল্‌কে কার জন্মতিথি অঞ্জু?"

—"আমার এক নূতন ছাত্রীর মাসীমা।"

কতকগুলো কড়াইসুঁটী একত্র নোড়াটায় চেপে রেখে, ও বিষয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্য না করে তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে সুজলাকে ডেকে বল্‌লেন,—"ওরে, ও সুজলা, তোর অঞ্জন দা' এসেছে রে, বেতের টিপয়খানা বারান্দায় নিয়ে আয় তো মা।"

তারপর তিনি অত্যন্ত ত্রস্ত হাতে কড়াইসুঁটীর পুর ময়দার নেচীর মধ্যে ভরতে ভরতে অঞ্জনকে গরম গরম দু'খানা খেয়ে যেতে স্নেহের অনুরোধ করলেন। অঞ্জনও তাই চায়। কিছুক্ষণ পর সুজলা যখন একখানি বেতের টিপয় এনে বারান্দায় রাখলো, তখন ওর তন্দ্রালস চোখ দু'টী মিষ্ট ঘুমের নেশায় আকুল হয়েছিল। ফুল্ল হাসিতে অধর ভরে অঞ্জন ওর দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—"ভারী কষ্ট হ'ল তোমার, না সুজলা?"

ততক্ষণে শ্রীলেখা গরদের ব্লাউসের সাথে লাল টুকটুকে পাড়ের চাঁপাফুলের রঙের একখানি খদ্দরের শাড়ী পরে জরীর কাজকরা ভেলভেটের নাগরা পায়ে দিয়ে সেজেগুজে অঞ্জনের চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

রূপান্তর

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

—'ঝরণা! ঝরণা! পড়ে যাবে শীগ্‌গির!..'

নীলাচল তাড়াতাড়ি ঝরণার কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে ফেলে। একপ্রকার জোর করে আল্‌সের কিনারা থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসে। মিনতির স্বরে বলে—'এসো, আমার কাছে বস্‌বে এসো। কেবল হুড়োহুড়ি হুড়োহুড়ি! কখন পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে বস্‌বে—এখনো দুষ্টুমী গেল্‌না! এসো, আমার কাছটীতে বস্‌বে এসো।'

ঝরণার মাথায় কাপড় নেই, দেহের বস্ত্র অসংযত, দৃষ্টিতে কিশোরী-সুলভ চপলতা। নীলাচলের দিকে চেয়ে সে ফিক্‌ করে হেসে ফেলে।

—'হাসলে যে বড়?'

—'বারে, হাসবো না তো কি? আমি বুঝি পড়ে গেলুম যে—'

নীলাচল তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার স্বরে বলে—'আহা, পড়ো নি, কিন্তু পড়তে কতক্ষণ। পড়লে যে আর বাঁচবে না এই তেতলার উঁচু ছাদ থেকে।'

নীলচলেব হাত দু'খানা ঝরণা তখন কোলের উপর তুলে নেয়। আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করে। দিনান্তের শেষ আভাটুকু তার অনুপম মুখখানির উপর পড়ে মুগ্ধ সরমে ছুঁয়ে যায়। ঝরণার লজ্জা হ'ল কি?

নীলাচল হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসকে সংযমের বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। সে গভীর আবেগে ঝরণার মাথাটা বুকের ওপর টেনে নেয়। লাজরক্ত গালে একটী সোহাগ রেখা এঁকে দেয়। ঝরণা নীলাচলের বুকের ভিতর হ'তে ছিটকে বেরিয়ে যায়—মেঘের কোলে চকিত বিদ্যুতের মত। অদূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে ওঠে—'যা—ও! কেবল বুঝি ঐ—দুষ্টু কোথাকার!'

—'ঝরণা!' নীলাচল সংযত-কণ্ঠে ডাকে।

ঝরণা শিউরে ওঠে। ছুটে এসে নীলাচলের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুকের ভিতর তার মাথাটা গুঁজে দেয়—কথা ফোটে না। শুধু চোখের পাতা দু'টা কাঁপতে থাকে, ঠোঁট দুটো একটু নড়ে ওঠে।

নীলাচল অপ্রতিভ হয়ে যায়। শিথিল কবরীর ইত-স্তুতঃ বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তুলে দিতে দিতে ডাকে—'ঝরণা! নির্ঝরিণী।"

ঝরণা মুখ তোলে না

আবার ডাকে—'ঝরণা! লক্ষ্মীটি!'

এবারও তেমনি। জোর করে মুখখানি তুলে ধরবার চেষ্টা করে নীলাচল চম্‌কে ওঠে—'এ কি, কাঁদছো! কি হলো? কান্না কিসের? ঝরণা—সোণা আমার!'

ঝরণা জোর করে নীলাচলের বুকের ভেতর মাথাটা গুঁজে দেয়। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—'নিজে কেবল—'

আবার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। ছোট মেয়েটীর মত তার ঠোঁট ফুলে ওঠে।

নীলাচল বুঝ্‌তে পারে, তার আঘাতটা কোথায়। চোখ মুছিয়ে দিয়ে আদর করে বলে—'আর বকবো না—কোন দিনও না। চুপটী করে লক্ষ্মীটির মত শুয়ে থাকো।"

তারপর ঝরণার মেঘের মত ঘন কালো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে ভাবে—এ কি আশ্চর্য্য মেয়ে! সৃষ্টি-ছাড়া! এই বয়সে মেয়েরা হয়ে ওঠে ঘোর সংসারী। সারা সংসারটাকে তারা চিনে নেবার চেষ্টা করে। আর ঝরণা—সম্পূর্ণ বিপরীত। এখনও চপলা কিশোরীর মত চঞ্চল হাবভাব, সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আশ্চর্য্য! সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টির বৈচিত্র্য! কোন্ দুরন্ত দেবতার সৃষ্টি-প্রসূত ঝরণা! স্বচ্ছগতি অবাধ সলিলা—

অফিস থেকে বাড়ী ঢুকে ওপরে উঠ্‌তেই নীলাচলের কানে আসে—পিসীমার গলা। তাকে দেখে পিসীমা বলেন—'নীলা, বৌমাকে নিয়ে আর পারলুম না বাবা। মেয়েমানুষ যে এমন হয় কখনো শুনি নি বাপু। কেবল ছুটোছুটী আর হুড়োহুড়ি! কোথায় বিকেলবেলা মেয়েরা চুল বাঁধে, গা ধোয়, সাজ-গোজ করে—আমরা এই তো জানি, আর দেখেও আস্‌ছি চিরটা কাল।'

অত লম্বা ভূমিকা শোন্‌বার ধৈর্য্য নীলাচলের ছিল না। উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলে ওঠে—'কি হয়েছে বলো না?'

—'হবে আর কি, আমার মাথামুণ্ড যা' হবার তাই হয়েছে! ভর সন্ধ্যেবেলা বেরালের পেছনে ছুটোছুটি করে ঘরের দোর গোড়ায় পড়ে গেলো। দেখো দেখি, কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! অন্য সময় হ'লে আলাদা কথা, এখন তো আর সহজ অবস্থা নয়।'

নীলাচলের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—কিন্তু সে নিমেষের জন্য। আবার তখুনি নেমে আসে একখণ্ড কালো মেঘ—আশঙ্কা সৃষ্টি করে। তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে সে পা চালিয়ে দেয়।

আল্‌নায় জামা খুলে রাখছে, এমন সময় পিছন থেকে কে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে। চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে—ঝরণা। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে হাস্‌ছে। তার রাগ সীমা ছাড়িয়ে যায়। তবু রাশ টেনে ধরে সংযতভাবে বলে—'সব তাতেই হাসি। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হেসেই গড়াগড়ি। আচ্ছা যা' হোক্‌!'

ঝরণা অপ্রতিভ হয়ে যায়। বিস্মিতভাবে বলে—'হাস্‌ব না কেন, বারে! হাস্‌লেই বুঝি অমনি দোষ হলো। পিসীমা যেমন, একটু পড়ে গেছি অমনি—'

নীলাচল কাছে এসে তার হাত দুটো ধরে জিজ্ঞাসা করে—'লেগেছে কি?'

—'না।' ভয়-কম্পিত স্বর।

ঝরণার দিকে চেয়ে নীলাচল বিস্মিত হয়ে যায়।

এ কি মুহূর্ত্তে মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল! রাজ্যের ভয়-ভীতি সব যেন এসে জড় হয়েছে ওর ঐ সদানন্দ মুখখানির ওপর। ডাকে—'ঝরণা!'

ঝরণা উত্তর দেয় না। নীলাচলের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে তার বুক ঘেঁষে এসে সে দাঁড়ায়। চোখ দু'টী ছলছল করে উঠে। সারা মুখখানায় একটা আসন্ন আশঙ্কার চিহ্ন পরিস্ফুট। অস্ফুটস্বরে বলে—'আর কোন দিন দুষ্টুমী করবো না।'

নীলাচল তার টোল খাওয়া গাল দু'টী টিপে দিয়ে হেসে বলে—'না পাগ্‌লী, আমি তা' বলি নি।

বাধা দিয়ে বলে—'না আমি করবো না।'

—'আমি কি তোমায় কোনদিন বারণ করেছি?'

ঝরণা আর দাঁড়াতে পারে না—পায়ের তলার মেঝেটা যেন টলে ওঠে।

নীলাচলের গলাটা জড়িয়ে ধরে সে আর্ত্তকণ্ঠে বলে ওঠে—'না না, আমি করবো না, কখনো করবো না, আমার খুসী।'

নীলাচলের বুকের ভেতর সে মাথাটা গুঁজে দেয়।

নীলাচল তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আদর করে বলে—'বেশ বেশ, করো না।'

বুঝতে পারে—তার বিরত হবার কারণ কি? কোথায়? এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটালো কে? নারীর সাধনার ধন যে তার দেহে।......

সেদিন শনিবার।

নীলাচল অফিস থেকে বাড়ী এসে ঘরে ঢুকে দেখে—ঝরণা জান্‌লার ধারে চেয়ারে বসে একটা মোজা বুনছে। মাথার কাপড়টা পিঠের দিকে ঝুলে পড়েছে। নীলাচল পা টিপে টিপে পেছনে গিয়ে মোজাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলে—'দাও দাও, ওটা আমায় দাও। তুমি বরং ততক্ষণ বাইরে একটু দৌড়োদৌড়ি করে এসো।'

স্বামীর আকস্মিক আগমনে ঝরণা চম্‌কে দাঁড়িয়ে ওঠে—'মা গো, তুমি যেন কি! এমনি ভয় ধরিয়ে দিলে!'

তারপর মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে বলে—আমি বুঝি আর ছুটোছুটি করি ?'

—'কে তোমায় করতে বারণ করেছে ? স্বচ্ছন্দে করতে পারো—আমার একান্ত অনুরোধ।'

ঝরণা নীলাচলের জামার বোতামগুলো খুলতে খুলতে সলজ্জ হাসি হেসে বলে—'বারণ করো নি, কিন্তু আমি আর করবো না। আমার খুশী।'

—'হঠাৎ এমন খুশী কেন হলো গো। এ তো ভাল কথা নয়।'

ঝরণা তার হাত থেকে মোজাটা ছিনিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেকিয়ে দুষ্ট হাসি হেসে বলে—'জানি নে, যাও। তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু!'

—'আর তুমি ভারী লক্ষ্মী, না ?'

—'বেশ বেশ, আমি দুষ্টু তো দুষ্টু—বাড়ী বয়ে এসে আর ঝগড়া করতে হবে না—এখন শান্ত শিষ্ট ছেলেটীর মত চুপটী করে চেয়ারে বসুন তো মশায়।'

তারপর সে টেবিলের ওপর থেকে হাত পাখাটা টেনে নিয়ে বাতাস করতে থাকে—ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা থাকা সত্বেও।

নীলাচল স্নিগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখে, ঝরণার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানির ওপর এসে পড়েছে—অনাগত মাতৃত্বের একটা সুস্পষ্ট শান্ত-শ্রী ছায়া।

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত 'পৃথিবীর পুত্র' নামক গল্পের লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—ভট্টাচার্য্য নহে।

সম্পাদক

উপন্যাস

D.Ch/.

বন্দিনী নারী

শ্রীমতী সরলা দেবী

তাসখেলা চলিতেছিল। রঙের খেলায় সরস্বতীকে পাশ দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নলিনী কহিল—"এ কি, পাশ! রঙ নেই ?"

জিব কাটিয়া বেরঙখানা তুলিয়া লইয়া রঙ দিতে দিতে স্বরস্বতী কহিল—"ভুল হয়ে গেছে ভাই।"

সজোরে চোদ্দখানা ফেলিয়া পিঠ কুড়াইতে কুড়াইতে চারুশীলা কহিল—"ভুলের আর অপরাধ কি ভাই, সাড়ে দশটা হতে চল্ল, নাগরের এখনও দেখা নেই।"

মৃদু হাসিয়া সরস্বতী কহিল—"দিদির এক কথা!'

নলিনী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল—"দাদা বুঝি এসে নিয়ে যাবে বলেছে ?"

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া চারুশীলা কহিল—"চিরকাল কাঠ মনিষ্যি, দুনিয়ায় কি কারো ওপর একটু মায়াদয়া থাকতে নেই। আর :একটু সকাল সকাল দোকান বন্ধ করলেই হয়; তা' নয়, সেই রোজ রাত এগারটা। তুইও বুঝি খেয়ে আসিস্ নি, না? একসঙ্গে খাবি বুঝি ?"

—"হ্যাঁ। তাকে দোষ দিচ্ছ মিথ্যে দিদি, সকাল সকাল দোকান বন্ধ করলে ক্ষতি ত বড় কম হয় না।"

সরস্বতীর উত্তরে চারুশীলা হাসিল। নলিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"দেখছিস্ ভাই, কানুর নিন্দে রাইয়ের প্রাণে সয় না।"

ভাজের রহস্যে নলিনী যোগ দিতে পারিল না, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিল।

রমা এতক্ষণ কোন কথাই কহে নাই, এইবার সে তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারুশীলাকে ঠেলা মারিয়া কহিল—"উঠে পড় গো, কে ডাকছে।"

সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া চারুশীলা কহিল—"আবার কে, নাগর-মণি রাই-কিশোরীকে নিতে এসেছেন। আমি কিন্তু ভাই সহজে ও নিধি পেতে দিচ্ছি না। একটু কষ্ট দেব, তা'তে তুমি ভাই রাগ করো না।"

ঘরের কোলের দালানটা পার হইয়া দরজা খুলিয়া দিতেই সতীশ ঢুকিল। চারুশীলা সহাস্যে কহিল—"ইস্, আজ যে বড় দয়া করে বাড়ী এলে?"

সতীশ বলিল—"ইয়ে, তোমার—সরস্বতী এসেছে কি ?"

—"আমার নয় তোমার। যাক্ সে কথা। কই না, সে ত আসে নি।"

—"আসে নি। বলেছিল ত আজ এখানে আস্‌বে। আচ্ছা, তবে দরজাটা দাও।"

সতীশ চলিয়া যাইতেছিল, চারুশীলা 'খপ্' করিয়া তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—"যাচ্ছ কোথায়, রাই বিনে কি বৃন্দাবনে মন বসে না? যেতে হবে না, আস্‌ছি।"

ঘর হইতে সরস্বতীকে টানিয়া আনিয়া স্বামীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া চারুশীলা কহিল—"এই নাও রাই-কিশোরী, হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না।"

চারুশীলা ফিরিয়া আসিতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া সরস্বতী কহিল—"দিদি, একটা ঘটি দাও না, চাইছে।"

—"ঘটি। কি হবে?"

—"কি জানি, ওই জানে।"

—"বোধ হয় যাবার পথে অমনি দুধ কিনে নিয়ে যাবে, তাই।"

ঘটি লইয়া সরস্বতী ও সতীশ রাস্তায় নামিয়া পড়িলে চারুশীলা দরজটা ভেজাইয়া দিল। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার কি মনে করিয়া ধীরে ধীরে একটা কপাট খুলিয়া পথের পানে চাহিয়া দেখিল।

অদূরে জ্যোৎস্না-বিধৌত পথের বুকের উপর দিয়া সতীশ ও সরস্বতী নীরবে পাশাপাশি চলিতেছিল। তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চারুশীলা সশব্দে দরজায় হুড়কা দিয়া দিল।

চারুশীলা ঘরে ঢুকিতেই নলিনী দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"বৌদি', তুমি কি!"

ননন্দার কথার উত্তরে চারুশীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ধরা-গলায় কহিল—"বোধ করি সং।"

—"মাইরি বলছি, তোমায় দেখে আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, শ্রীরামচন্দ্র যেমন সমুদ্রের বুকের উপর পাথর বেঁধে পার হয়েছিলেন, তুমিও তেমনি তোমার কান্নার ঢেউগুলো হাসি-ঠাট্টা দিয়ে চেপে রেখে দিন কাটাচ্ছ।"

চারুশীলার অশ্রু এবারে আর বাধা মানিল না, ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল—"ভাই, প্রাণে আজ বড় লেগেছে! আমার নিজের আর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই—কিন্তু ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকালে প্রাণ ফেটে যায়! আজ ওবেলা যখন ভাত খেতে আসে, তখন বলেছিলুম—ছেলেটার আধপো' দুধ নিলে হয় না? যদি দাম দাও ত আর আধপো' করে দুধ না হয় বেশী নিই। তার বেলা সটান জবাব দিলে পয়সা নেই—কিন্তু নিজেদের ফূর্ত্তির রসদ যোগাতে রোজ আধসের তিনপো' দুধ কিন্‌তে পারে।"

পাশের ঘর হইতে নলিনীর মা ডাকিয়া কহিলেন—"হ্যাঁরে, তোরা কি আজ আর শুবি না?"

—"হ্যাঁ মা, এই যে যাচ্ছি।" বলিয়া নলিনী রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"নে রমা, ওঠ্, এইখানে তোর বিছানাটা পেতে নে—ছেলেমেয়েদের পাশে বৌদি'র জায়গা ত রয়েছেই। এবারে শুয়ে পড়ো সব। রাত হয়েছে, আমি যাই।"

শুইয়া শুইয়া চারুশীলা ও রমার কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের কথা হইল। তারপর রমা ঘুমাইয়া পড়িলে কোলের ছেলেটিকে বুকে জড়াইয়া খানিক কাঁদিয়া বুকটাকে হাল্কা করিয়া এক সময় চারুশীলাও ঘুমাইয়া পড়িল।

দুই

আজকালই সরস্বতীর জাত-অজাত নেই, কিন্তু একদিন ছিল। সে সদ্‌গোপের মেয়ে। একে বাল-বিধবা, তাহার উপর শৈশবে মাতৃহীনা। বিধবা হইবার অনতিবিলম্বেই স্নেহময় পিতাকেও সে হারাইয়া বসিল। তাহার মুখ চাহিবার রহিল কেবল ভ্রাতা হরিহর, ও তাহার স্ত্রী কাদু।

শ্বশুর বর্ত্তমানে কাদু ভয়ে বড় একটা কিছু করিতে পারিত না; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সে সরস্বতীকে তাহার স্বামী-পুত্রের সংসারে গলগ্রহ বলিয়াই মনে করিত। সে কারণ সরস্বতীর দুঃখের আর অবধি ছিল না।

ফাল্গুন মাসের শেষ। দুপুরের খরতীব্র রোদের মাঝেও একটা স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া বহিতেছিল। সরস্বতী খাওয়া-দাওয়ার পর বাসনের গোছা লইয়া খিড়কীর পুকুরে বসিয়াছিল। বাসন মাজিতে মাজিতে সরস্বতী থামিল। বাসন ও পোড়ামাজা ক্ষত-বিক্ষত হাতখানির দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ক্ষণকাল সে একমনে নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার বয়স এখন সতের। তাহার ধবধবে শাদা রংটা ও দেহখানি যৌবন-শ্রীতে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। সে যথার্থ সুন্দরী।

—"পিসীমা, একটু সরো, ঠাকুর-মশায় হাত পা ধোবেন।"

সরস্বতী ফিরিয়া চাহিল। দুই চার ধাপ সিঁড়ির উপর প্রায় ত্রিংশবর্ষীয় একটি গৌরবর্ণ যুবার সহিত তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র লালু দাঁড়াইয়া। ভাগ্য চিন্তায় সে এতই ডুবিয়া গিয়াছিল যে, ইহাদের আগমন কিছুই জানিতে পারে নাই। বারেক বিস্মিত দৃষ্টি তাহাদের উপর বুলাইয়া সে শশব্যস্তে হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। লালুকে ইসারায় নিকটে ডাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেরে উনি ?"

—"সেই গেল বছর যে ঠাকুর-মশায় এসেছিলেন, তেনার ছেলে। তিনি মারা গেছেন কি না, তাই উনি এসেছেন।"

সরস্বতী বুঝিল লোকটি দাদার গুরুপুত্র। এই গ্রামে ইহাদের অনেক শিষ্য আছে। সেইজন্য প্রত্যেক বৎসর বেশ মোটা রকমই পাওনা আদায় হয়। বরাবর গোঁসাই-ঠাকুর নিজে আসিয়া শিষ্যদের ভক্তি-শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—পিতার পরিবর্তে পুত্র আসিয়াছেন।

ঠাকুর-মশায় হাত মুখ ধুইয়া স্কন্ধস্থিত গামছায় মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিয়া আসিলে সরস্বতী গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ঈষৎ কাশিয়া গলা ঝাড়িয়া তিনি কহিলেন—"তুমি হরিহরের বোন্, না ?"

সরস্বতী নীরবে ঘাড় নাড়িল। তাহার ব্যথিত সুন্দর মুখখানির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পরদুঃখকাতর হৃদয় দিয়া ঠাকুর-মশায় বুঝিলেন—মেয়েটি বড় দুঃখী। কহিলেন—"আহা, এত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছ, ভগবান তোমায় শান্তি দিন !"

আশীর্বাদ করিয়া তিনি ধীরপদে চলিয়া গেলে, সরস্বতী সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার জ্ঞানে এক পিতা ভিন্ন এরূপভাবে ব্যথার ব্যথী হইয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। সরস্বতীর অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহার শান্তি কোথায়, এবং শান্তি পাইবার ভরসাই বা কাহার নিকট ? সে পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে একটু সস্নেহ ব্যবহারের কাঙাল মাত্র।

দিন দুই পরে রাত্রে আহারাদির পর ঠাকুর-মশায় শয়ন করিলে হরিহর তাঁহার নিকটে বসিয়া দু'-একটা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। হঠাৎ মুদিত নয়ন মেলিয়া ঠাকুর-মশায় কহিলেন—"তোমার বোন্‌টির প্রতি কই তোমার স্ত্রী ত তেমন ভাল ব্যবহার করে না।"

ঠাকুর-মশায়ের আকস্মিক এই স্পষ্ট কথায় হরিহর সহসা কিছু জবাব দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল—"হ্যাঁ, সরুর আমার বড় কষ্ট !"

—"তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা' হলে সরস্বতীকে আমি নিয়ে যেতে চাই।"

হরিহরের হৃদয়ের গোপন কোণে বিধবা ছোট বোন্‌টির প্রতি মায়ার অন্ত ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। কহিল—"আপনার মত মহতের আশ্রয়ে ও হতভাগী যদি জায়গা পায়, শান্তি পায়, সে ত ভাল কথা ঠাকুর।"

কিন্তু কাদু শুনিবামাত্র আপত্তি করিল—"মিন্‌সে বলে কি—এমন বিনা মাইনের ঝিকে বিদেয় করবে ! আর আমি কি না এই ছিষ্টির ঝাঁট্‌-পাট্ নিয়ে মরব বার মাস। এই কাচ্চা-বাচ্চাদের—"

পুনরায় কহিল—"এই সোমত্ত ছুঁড়ীকে কি বলে তুমি

পরের বাড়ী পাঠাবে? তারপর যদি একটা কেলেঙ্কারী করে বসে, তখন লোকে ত তোমার গায়েই থুথু দেবে।"

জিহ্বা দংশন করিয়া হরিহর কহিল—"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই বৌ—ঠাকুর-মশায় দেবতা তুল্যি!"

কিন্তু পরে কাদুর কথাই ফলিল। অধিকতর সুখের লোভ সরস্বতী ছাড়িতে পারিল না। বাঁধা গরু ছাড়া পাইলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটে। ঠাকুর-মশায়ের এক মূর্খ জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁহার সংসারে পালিত হইত। বিবাহিতা পত্নীরূপে অশেষ সুখ-সম্পদের অধিকারিণী হইবার আশায় সরস্বতী তাহার সহিত অকূলে ভাসিল।

তিন

হাতের পাঁচ বদল হইয়া সরস্বতী যখন সতীশের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহার বছরখানেক পূর্ব্বে ফর্ত্তির ফলস্বরূপ অনেক দেনা হইয়া পড়ায় সে তাহার পৈত্রিক বাড়ীখা[নি] বিক্রয় করিয়াছিল।

সরস্বতী সতীশকে কহিল—"তুমি যে মা[...] আনাগোনা করবে তা' হবে না; হরেক র[...] আমি ঘরে জায়গা দোব না। দোক[ানের] সমস্ত ক্ষণ তোমায় এখানেই থাকতে [...]

সতীশ জাতিতে ময়রা [...] নামক প্রসিদ্ধ বারবনিতা[...] দোকান। তিন-চারি[...] ও সরস্বতীর বাসা [...] সময় বাদে সর্ক[...] বাড়ীতে স্ত্রী[...] খরচ দিত [...]

দিন [...] না। এব[...] নিতাইকে [...] "মা, আমা[...]

—"হ্যাঁ [...] দের বাবু ত [...]

পাঠাই তা' তিনি গ্রাহ্যই করেন না। এদিকে আমার সংসার ত অচল হতে বসেছে। বাবু কোথায় থাকেন, সেখানে আমায় একবার নিয়ে যেতে পার?"

বিস্মিত নিতাই কহিল—"আপনি সেখানে যাবেন—কি বল্‌ছেন মা!"

—"কি করবো বাবা, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! তুমি অমত করো না, তোমাদের বাবু যখন দোকানে থাক্‌বেন, সেই সময় তাঁর বাসায় নিয়ে যেও। এইটুকু উপকার তোমায় করতেই হবে।"

সন্ধ্যাবেলা চারুশীলা যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন নলিনী জানিতে পারিয়া কহিল—"[...] খুড়তুতো ননদ বলেই তুমি [...] হলে কখনই এমন [...] কি আমা[র] [...]

করব'? তার চেয়ে নিজে যতটা পারি সহ্য করি। যখন পারব না, তখন তোমরা আছ।"

—"তুমি কি মনে কর, তুমি সহ্য করলেই ওরা পিতৃস্নেহ পাবে?"

"তা' না পাক্, তবু ওরা যদি বাপের পয়সায় খেতে-পরতে পায়, তা' হ'লে ভাল না বাসুক, বাপকে, অন্ততঃ কতকটা মেনে চল্‌তে পার্‌বে। আর তা' না হ'লে ওরা বড় হয়ে আমাকে দুষ্‌বে যে, আমি নিজের অভিমানকে বজায় রাখ্‌তে গিয়ে ওদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি।"

' ...ন বোঝ কর বাপু! তবে এটা কিন্তু জেনে

...নারী, তত দুঃখু দেন হরি'

...মলিন চাদর

...স্নির

খরচ-পত্রও দেন নি, আমার সঙ্গে দেখা না হলে এ কথা বলিই বা কি করে? তবে তুমি যদি ভাই একটু বলো। তিনি যদি খরচ দিতে নারাজ হন্, তা' হলে একটু বুঝিয়ে বলো দিদি, যে, দোকানের কারিগরদের জন্য আলাদা যে রাঁধবার ব্যবস্থা আছে, তাও না হয় আমি রেঁধে দেবো—তার মানে, দু' জায়গায় আলাদা আলাদা খরচ উনি যদি না সাম্‌লাতে পারেন, এক জায়গায় হলে সুবিধে হবে। কারিগরদের জন্যে যদি ত্রিশ টাকা খরচ পড়ে, তার ওপর আর দশটা টাকা খরচ করলেই আমার ছেলেমেয়েদের ভেসে যাবে।"

এক নিশ্বাসে বক্তব্য শেষ করিয়া চারুশীলা অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে সরস্বতীর দিকে চাহিল।

ব্যথা-কোমল-স্বরে সরস্বতী কহিল—"এই কথা বল্‌তে তুমি এখানে এলে কেন দিদি? কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠালেই ত আমি যেতুম।"

—"না না, তা' কি হয়, তুমি যাবে কেন কষ্ট করে। ...কুই বা পথ; নিতাইকে সঙ্গে করে তাই পায়ে পায়ে ...ম।"

' বলি নি। বল্‌ছি কি, এ পাড়ায় এসে তুমি

...া চারুশীলা কহিল—"কেন, বদনাম ...বাটপাড়ের ভয়।' বাচ্ছাদের আমার মান্‌টাই কি বেশী

...হিল—"তোমার আঁকা ছবি!

করিয়া যে

...ন, তাহাতে

করিতে আরম্ভ

করিল। কন্যার উদ্দেশ্যে কহিল—"রাধা, সমুকে বাটি করে গুড়-মুড়ি দিয়ে রোদে বসিয়ে দাও মা, তারপর তুমি পড়তে বসো।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশিরকে কিছু বলিতে হইল না; সে আপনিই নিজের বইখাতা লইয়া রোদে বসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনিধারা চারুশীলা প্রত্যহ করে। ঘর-দুয়ারকে দারিদ্র্য মলিনতার স্পর্শে শ্রীহীন করিয়া রাখিতে পারে না। হউক তাহার প্রিয়হীন গৃহ। তবু ত সে নিজে ছেলে-মেয়ে লইয়া বাস করে। যথাসাধ্য সম্ভব সাজাইয়া-গুছাইয়া ধুইয়া-মুছিয়া ঝক্ঝকে রাখে। বাহিরের লোকের সাধ্য নাই তাহার সাজান-গুছান ঘরকন্না দেখিয়া বা পরিচ্ছন্ন সুশ্রী ছেলেমেয়েদের দেখিয়া অনুভব করে যে, তাহার সবটাই ফাঁকা। সে অর্থ, বা সহায় সামর্থ্যহীন। মন ভাঙ্গিয়া পড়িলেও দেহ তাহার চলিতে থাকে কলের মত। চারুশীলা জানে, দুনিয়াকে ফাঁকী দিয়া চলা যায় না। যাহা করিবার তাহা করিতেই হইবে। সুখ দুঃখ অনুভূতির স্থান সেখানে নাই।

নূতন জুতার মস্‌মস্ শব্দ করিয়া দেড়মাস পরে সতীশ গৃহে প্রবেশ করিল। চারুশীলা হাতের ন্যাতা ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছিন্ন মলিন বস্ত্র যথাসাধ্য অঙ্গে গুছাইয়া লইয়া ইঙ্গিতে বিছানা দেখাইয়া দিয়া কহিল—"বসো।"

—"তুমি না কি কাল সরস্বতীর বাসায় গিয়েছিলে?"

ছেলেমেয়ে তিনটি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল পিতাকে দেখিতে। তাহাদের দেখাইয়া চারুশীলা কহিল—"ওদের মুখ চেয়ে না গিয়ে ত আর পারলুম না। তোমার উপায়ে এত লোকজন খাচ্ছে, আর ওরা কি শুকিয়ে মরবে?"

কনিষ্ঠ পুত্র সমীরের গালে টোকা মারিয়া সতীশ কহিল—"কি গো বাবু, মুড়ি খাওয়া হচ্ছে?" পরে পকেট হইতে ঠোঙ্গা বাহির করিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে কহিল—"এই 'বিস্কুটগুলো তোরা ভাগ করে খেগে যা'।" স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"দেখো, তোমার মতলব মন্দ নয়, কিন্তু শুধু কারিগরদের রান্না রাঁধলেই ত হবে না, সেই সঙ্গে আমার আর সরস্বতীরও রাঁধতে হবে। তা' হলে ওখানকার রাঁধুনীর খরচটাও বেঁচে যায়, তা'তে চাই কি ছেলেদের গরম জামাটা-চাদরটাও কিনে দিতে পারব।"

এই কথা শুনিয়া চারুশীলার অন্তরের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। এতটা শাস্তি সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সন্তানের দায়ীত্ব কি সবই তাহার! স্বামীর রক্ষিতার সেবা করিয়া সন্তানের মুখে অন্ন যোগাইতে হইবে! কিন্তু সে যে একান্ত উপায়হীন।

পলকের জন্য সে একবার নিজের বিগত-যৌবন হতশ্রী দেহের দিকে চাহিয়া লইল। তাহার মানস চক্ষে তখন সরস্বতীর অপরূপ মাধুরিমা ফুটিয়া উঠিল। বৃথা—স্বামীর উপর আর তাহার জোর খাটিবে না! সে স্পষ্ট অনুভব করিল—আজ সে নিরস্ত্র!

অতীতের কথা মনে পড়িল—যখন সে বিবাহের পর নষ্ট-চরিত্র স্বামীকে সৎপথে আনিয়া শ্বশুরের নিকট মঙ্গলময়ী বধূরূপে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছিল। হায়, সেদিন কি জীবনে আর আসিবে না!

সে সুখ সে কিন্তু বেশীদিন ভোগ করিতে পারে নাই। কন্যার জন্মের পরই সতীশের মন টলিল; সে পুনরায় কুস্থানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে যে বুকভরা প্রেম লইয়া চারুশীলা স্বামীর সেবা করিত বা তাহাকে সৎপথে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতে অভিমান আসিয়া দেখা দিল। স্বামীর এতদিনকার আদর-যত্ন তাহা হইলে সবই ভুয়া! কেবলমাত্র তাহার যৌবনে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল! নিদারুণ অভিমানে সে নির্ব্বাক হইয়া গেল। তারপর এই সুদীর্ঘ বার বৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও সে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলে নাই।

কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে সতীশ কখনও বাহিরে সমস্ত রাত্রি কাটায় নাই, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ বাড়ী ফিরিত। সরস্বতীকে লাভ করিয়া তাহার এই নিয়ম বদ্‌লাইল। দীর্ঘ দেড় মাস পরে আজ স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ।

সন্তানের মুখ চাহিয়া চারুশীলা মান-মর্য্যাদার গলা টিপিল। ধীরস্বরে কহিল—"আচ্ছা, তাই হবে।"

সতীশ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার ফিরিতে উদ্যত হইয়া কহিল—"আমি বাজার-টাজার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ তোমাদের মতই রাঁধ; কালকে থেকে সবাইকার রান্না করো।"

মিনতির সুরে চারুশীলা অনুরোধ করিল—"অমনি চলে যাবে? একটু চা খেয়ে যাও।"

অপরাধী সতীশ স্ত্রীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। দেওয়ালে বিলম্বিত ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া সে কহিল—"আচ্ছা, দাও।"

জননীর আদেশানুসারে শিশির পিতার নিকট হইতে দুইটি পয়সা চাহিয়া লইয়া চা ও চিনি কিনিয়া আনিল। পাতার আগুনে চা করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখা সুদৃশ্য কাচের পেয়ালায় ভরিয়া লইয়া চারুশীলা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

স্ত্রীর হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া কুণ্ঠিত-স্বরে সতীশ কহিল—"ঘরে কিচ্ছু নেই, তা' হ'লে। তোমার চা খাওয়া হয় না বলো?"

—"হ্যাঁ খাই ত, ঠাকুরঝি সকাল বেলায় চা দেয়।"

—"আর বিকেলে?"

—"বিকেলে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।" চারুশীলা রূঢ়ভাবে স্বামীর মুখের উপর বলিতে পারিল না—"ভাত জোটে না, তা' আবার চা।"

—"এতটা চা আমি খাব না, একটা জায়গা আনো, ঢেলে রাখি।"

চারুশীলা হাসিল। প্রেমভরা সলজ্জ হাসি নহে; উহা অবহেলার হাসি। চারুশীলা জানিত—সে বিগত-যৌবনা নারী; প্রেম তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। তাই সে এই সুযোগে মান-অভিমান করিয়া স্বামীর নিকট সোহাগ দেখাইল না। শুধু কহিল—"আমি কি তোমার এঁটো খাই না? কিন্তু তার দরকার নেই; আমার চা রান্নাঘরে চাপা দিয়ে রেখে এসেছি, গিয়ে খাব।"

আর কিছু না বলিয়া সতীশ নিঃশব্দে চা খাইয়া বলিল—"আচ্ছা, আসি তা' হ'লে।"

নিরুত্তরে চারুশীলা স্বামীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাঁচ

বেলা আটটা নাগাৎ মুটে করিয়া চাল-ডাল, ঘি-তেল-নুন এবং নিতায়ের মারফৎ এক পোঁটলা বাজার ও সেরটাক গলদা চিংড়ী সতীশ পাঠাইয়া দিয়াছিল।

ঝাঁটপাট্ সারিয়া স্নান করিয়া চারুশীলা রান্নার আয়োজনে লাগিয়া পড়িল। ইত্যবসরে রাধা দুইটা উনানে আঁচ দিয়া রাখিয়াছিল।

একবার দরজায় উঁকি মারিয়া নলিনী কহিল—"এই রকম রাজসূয় ব্যাপার বেশীদিন চালালে যে ক'খানা হাড় বাকী আছে, তাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

ভাতের ফেন উথ্‌লাইতেছিল। সরাটা খুলিয়া ফেলিয়া হাত ধুইতে ধুইতে মলিন হাসি হাসিয়া চারুশীলা কহিল—"ঠাকুরঝি, ভালবাস বলে এত আস্কারা দিও না—আটদশজনের রান্না যদি বারমাস রাঁধতে না পারি, বাঙালী হিন্দুর মেয়ে হয়ে, তা হ'লে আমার মরাই ভাল।"

—"করবে না কেন বৌদি', কিন্তু দেহের অবস্থা বুঝে কাজের কম-বেশী ওজন করতে হয়।"

বেলা বারটার সময় আজ যখন চারুশীলা বহুদিন পরে স্বামীকে নিজের হাতে যত্ন করিয়া আহার করাইতে পারিবে এই আশায় অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সতীশ তখন বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চারুশীলা তেলের বাটি ও গামছা লইয়া ঘরের বাহির হইতেই সতীশ কহিল—"আমি নেয়ে এসেছি, তুমি ভাত বাড়ো।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল—ঠিক, তিনি খাইতে আসিয়াছেনই বটে। সত্যই তবে স্নান সারিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র দেড়মাস

পুর্বে ছেলেমেয়েরা পনের মিনিট ধরিয়া পিঠে তেল মখাইয়া না দিলে তাঁহার স্নানে তৃপ্তি হইত না।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চারুশীলা সযত্নে ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িয়া কহিল —"খাবে এস।"

সতীশ আসনে বসিয়া কহিল—"এত বড় মাছ আমায় দিয়েছ কেন, তুলে নাও।"

গলদা চিংড়ীর কালিয়া করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় মাছটি চারুশীলা স্বামীর পাতে দিয়াছিল। মিনতির সুরে সে কহিল—"আবার তুল্‌ব কেন, তুমি খাও না।"

—"না, এটা বরং সরস্বতীকে দিও, আমায় একটা ছোট মাছ দাও।"

ঠিক! এখন আর স্বামীকে যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি তাহার সেবা চান্ না। সে যদি সরস্বতীকে তাঁহার এবং পুত্র-কন্যার উপরে বসাইয়া পূজা করিতে পারে, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

সতীশ খাইয়া দোকানে গেলে কারিগরেরা খাইতে আসিল। নিতাই উচ্ছ্বাসভরে কহিল—"মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! এমন সুতার রান্না অনেক দিন খাই নি, মুখ বদ্‌লে গেল।"

চারুশীলা নিতায়ের হাত দিয়া সরস্বতীর ভাত পাঠাইয়া দিল।

দিনকতক এইভাবে কাটিবার পর একদিন সতীশ দুপুরে বাড়ী আসিয়া কহিল—"ভাত আমি খাব না, শরীরটা আজ ভাল নেই।"

উদ্বিগ্না চারুশীলা নিকটে আসিয়া কহিল—"জ্বর হয় নি ত?"

—"কি জানি।" বলিয়া সতীশ স্ত্রীর সযত্নে রচিত পরিপাটি বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। চারুশীলা একটা থার্ম্মোমিটার আনিয়া ঝাড়িয়া স্বামীর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—"একবার এটা দিয়ে দেখো না।"

অনুযোগভরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সতীশ কহিল—"জামার বোতামটা খুলে তুমি দিয়ে দাও না।"

চারুশীলা প্রতিবাদ করিল না। জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কহিল—"এক শ' দুই দেখ্‌ছি, সর্দ্দিও ত রয়েছে, তা' হলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বোধ হয়।"

সতীশ স্ত্রীর ডান হাতটা কপালে চাপিয়া ধরিয়া কহিল —"ছুঁতেও ঘেন্না হয়, না?"

আবার মান-অভিমান! চারুশীলা এটাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এড়াইয়া চলে। সে তাহার বুকের ভিতরটাকে বহু যত্নে পাষাণে পরিণত করিয়াছে, কোনক্রমেই কোমল হইতে দিবে না। সংযত নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল—"তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি একটু আদা চা করে আনি।"

ছয়

গতকল্য বিকালের দিকে সতীশের জ্বর আরো বাড়িয়াছিল, কাজেই বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। আজ সকাল হইতেই জ্বর কম, মাত্র সাড়ে নিরানব্বুই। সে স্ত্রীকে কহিল—"আজ দেখ্‌ছি দোকানে যেতে পারব না, শুয়েই কাটাতে হবে। তবে যদি কাল একেবারে ঝরঝরে বোধ করি—"

বালিশ বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া চারুশীলা কহিল—"দোকানে দু'দিন না গেলেও চল্‌বে, এক গণ্ডা কারিগর আছে। কিন্তু বিরহিনীর জন্যে কা'কে বদ্‌লী পাঠাবে শুনি?"

শুইয়া শুইয়া হাত বাড়াইয়া তাহার বাহুটা ধরিয়া ফেলিয়া সতীশ কহিল—"আচ্ছা, তুমি কি একেবারে আমাকে মন থেকে মুছে ফেলেছ? এই সব কথা নিয়ে ঠাট্টা কর, একটু রাগও কি করতে পার না।"

ঠোঁট উল্টাইয়া চারুশীলা কহিল—"অরুচি! যেচে মান কেঁদে সোহাগ করবার আমার কিছু দরকার নেই। আমি বেশ আছি।"

—"কেন? চেষ্টা কর্‌লে আগের দিনগুলো কি আর ফিরে আসে না?"

দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া বিকৃত মুখে চারুশীলা কহিল—"রোগ হয়েছে বলে নিজেকে অত নরম ক'রে

ফেলো না। থিয়েটারী প্রেমটা আমার কাছে ব্যক্ত না ক'রে যার ভাল লাগ্‌বে তার জন্যে তুলে রাখো।"

এই যে বিকৃত মুখভঙ্গী ও হিংসাদ্বেষভরা বাক্যগুলি চারুশীলা ব্যবহার করিল, তাহা বড় কষ্ট পাইয়াই। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—যেখানে হৃদয় নাই, সেখানে কিছুতেই আপনাকে ধরা দিবে না। তাই সে সতত সযত্নে নিজেকে হীন ঘৃণিত মূর্ত্তিতে স্বামীর সম্মুখে তুলিয়া ধরে—যখনই সে আদর করিতে যায়। এইরূপে দিন দিন তাহাদের মধ্যে সুদৃঢ় ব্যবধান গঠিত হইতেছিল। সতীশ মাঝে মাঝে ব্যবধান সরাইতে চাহিত, কিন্তু এই একটি বিষয়ে বা নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয়ে চারুশীলার বিবেক-বুদ্ধি বা কর্ত্তব্যপরায়ণতা কিছুতেই সজাগ হইত না।

এখনও যদি সতীশ স্ত্রীর এই বিরক্তির কারণ বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিত, তাহা হইলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত এবং তাহার জীবনে সরস্বতীর কায়েমী ভিত্তি ঢিলা হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। স্ত্রীর বাহু ছাড়িয়া দিয়া বিতৃষ্ণভাবে সতীশ মুখ ফিরাইয়া শুইল। মনের কোমল পর্দ্দাগুলিকে আবার চড়াসুরে বাঁধিয়া লইল।

ঘরের কাজ সারিয়া চারুশীলা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। রাধা পূর্ব্বেই দুইটা উনানে আগুন দিয়া রাখিয়াছিল। একটা উনানে ডাল চাপাইয়া আর একটাতে চা ও হালুয়া করিয়া তাহা ডিসে ও পেয়ালায় ভরিয়া চারুশীলা কন্যাকে ডাকিয়া কহিল—"ওঁকে দিয়ে এস ত মা।"

রাধা ঘরে ঢুকিতেই সতীশ চীৎকার করিয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল—"তোকে এ সব কে আন্‌তে বলেছে? রোগ হলে বাড়ীতে একদিন শুয়ে থাক্‌বারও যো নেই! দূর হ' ঘর থেকে।"

পিতার সক্রুদ্ধ গর্জ্জনে রাধা এমন চমকাইয়া উঠিল যে, ঝন্‌ঝন্ শব্দে চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গরম চায়ে তাহার হাত পুড়িল ও ভাঙ্গা কাচে পা কাটিল।

চারুশীলা ছুটিয়া আসিল দুই চোখে টলটলে জল পূরিয়া। রাধা কহিল—"এই জন্যেই ত আমি বাবার সামনে আসি না। বাবা আমায় দু' চক্ষে দেখতে পারে না। তুমি কেন আমায় পাঠালে?"

রূঢ়স্বরে ধমক দিয়া চারুশীলা কহিল—"থাম্ তুই, ডেঁপোমী করতে হবে না। এক ফোঁটা মেয়ের কথা দেখো!"

নিজে সে যাহাই করুক, ছেলেমেয়েকে স্বামীর বিরুদ্ধে উদ্ধত হইতে দিত না। তখন সে কাচের টুকরোগুলা ফেলিয়া দিয়া ন্যাতা দিয়া মেঝে পরিষ্কার করিয়া কহিল—"যা' হাতে একটু নারকোল তেল দিগে, জ্বালা কমবে. অমনি ঠাকুরঝির কাছ থেকে পায়ে একটু টিনচার আইডিন দিয়ে আয়।"

জ্বর যদিও বেশী নয়, তথাপি বহুদিনের অত্যাচারের ফলে সতীশ দেহের মধ্যে এত বেশী ক্লান্তি অনুভব করিল যে, ইচ্ছাসত্বেও সে বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না। সারাদিন একটা বাজে উপন্যাস হাতে লইয়া সময় কাটাইল।

সন্ধ্যাবেলা উঠানে আসিয়া যে দাঁড়াইল, সে সরস্বতী। সদর দরজা খোলাই ছিল। চারুশীলা রোয়াকে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার শাঁক বাজাইতেছিল। আলো-আঁধারে ঠিক্ ঠাহর করিতে না পারিয়া সে কহিল—"কে গা?"

সরম-কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া সরস্বতী কহিল—"আমি দিদি।"

বিস্ময় দমন করিয়া স্বাভাবিক মধুর হাস্যে চারুশীলা কহিল—"ও, এস। ঐ যে ও ঘরে উনি শুয়ে রয়েছেন, যাও।"

মৃদু জড়িত কণ্ঠে সরস্বতী বলিল—"নিতায়ের মুখে শুনলুম, ওঁর অসুখ করেছে।"

—"হ্যাঁ। এসেছ, বেশ করেছ, তা'তে লজ্জার কি আছে? জ্বর আজ কম আছে। শ্যাম দু'দিন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরায় বিশ্রাম নিচ্ছেন।"

আর কোন কথা না বলিয়া সরস্বতী ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কথার আওয়াজ পাইয়া নলিনী এতক্ষণ রোয়াকে আসিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছিল। সরস্বতী

স্বর চুকিল নিম্নস্বরে বলিল—"কে বৌদি'? যে মাগীটা দাদার ঘাড়ে চেপেছে, সে?"

তরল হাস্যের সহিত চোখ ঘুরাইয়া চারুশীলা কহিল—"মাগী বলো না, খবরদার, খবরদার! ও তোমার ছোট বৌদি'। দেখ্‌লে না শাঁক বাজিয়ে বরণ কর্‌লুম।"

—"ঝাঁটা মার অমন বৌদি'র মুখে! তোমার যেমন সব তা'তে বাড়াবাড়ি! লক্ষ্মীরার মাসতুত বোন্ না সাজ্‌লেই কি চল্‌ত না? বাড়ীতে ঝাঁটাও কি একগাছা ছিল না?"

সাত

ঝাঁটার অভাব হউক আর নাই হউক, চারুশীলা রীতিমত বিরক্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহার বিবেক এই বলিয়া তাহাকে বাধা দিল—"তুমিই ত এই অনিষ্টের মূল। তুমি যদি অন্নের কাঙাল হয়ে সরস্বতীর দরজায় না যেতে, তা' হলে তার সাধ্য কি যে, ভদ্রপাড়ায় এসে তোমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে?"

দুপুরবেলা চারুশীলা যখন স্বামীকে মালিশ করিতে গিয়াছিল, তখনও সতীশের রাগ পড়ে নাই। সে রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।—"তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে, আমার কোন কাজ তোমায় কর্‌তে হবে না।"

সরস্বতী আসিয়া তাহার পাশে বসিলে বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই স্ত্রীকে শুনাইয়া সে কহিল—"ঐ তাকের ওপর মালিশের শিশিটা আছে, এনে বুকে একটু মালিশ করে দাও ত।"

তারপর তখন হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ঘরে হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব, সেবা-শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

ভাঁড়ার-ঘরে মাদুর পাতিয়া ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া চারুশীলা অন্ধকার উঠানে তুলসী-তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। রাধার পরে যে ছেলেটি চার মাসের হইয়া মারা গিয়াছে, সেই মৃত পুত্রের মুখ তাহার মনে পড়িল। তাহার বিষাদপূর্ণ অন্তরে সে যেন অমানুষিক বল পাইল। তুলসী-বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া সে অস্ফুট-কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

"অনিত্য বিষয়ে প্রমত্ত রহিয়ে
(মন) পরমার্থ কেন যাসরে ভুলিয়ে।"

নয়টার পর সরস্বতী বিদায় লইল। সেইদিন হইতে প্রায়ই সে আসিতে লাগিল। তাহার সরল মধুর ব্যবহারে নলিনীর বিরাগ অনেকটা কমিয়া আসিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা চলিতে লাগিল এবং আরও কিছুদিন গেলে তাসখেলা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়া গেল। কেবল নলিনীর মা মাঝে মাঝে বলিতেন—"ছুঁড়ীটা চলে গেলে তোরা কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলিস বাপু—ঘর-দোর সব ছুঁয়ে একসা করিস্ নি।"

সতীশ আর একটা দিন বা রাত্রি বাড়ীতে যাপন করে না। মাত্র আধঘণ্টার জন্য দুপুরে বাড়ী আসিয়া সে আহার করিয়া যায়।

চারুশীলার ভাত খাইয়া উঠিতে বেলা প্রায় আড়াইটা বাজিল। এমনি প্রত্যহই হয়। আজ কিন্তু তাহার বড় আলস্য ধরিল। আঁচল পাতিয়া রোয়াকের রোদে সে শুইয়া পড়িল। সবেমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় ভীষণ কোলাহল উঠিল। ধড়মড় করিয়া চারুশীলা আগাইয়া আসিয়া দেখিল—দরজায় অনেক লোকের ভীড়। তাহার মধ্য দিয়া বিন্দু পিসী ধীরে ধীরে আসিতেছেন। তাহার বুকে রাধা এলাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজা।

সকলের বক্তব্য হইতে চারুশীলা যাহা বুঝিল, তাহার সারমর্ম্ম এই—খাওয়া-দাওয়ার পর মাতার নিষেধ সত্ত্বেও রাধা একগোছা বাসন লইয়া রাস্তার ধারে পুকুরের বাঁধাঘাটে বসিয়া মাজিতেছিল। দত্তদের পাঁচ বছরের ছেলে পানু একটা পেকাটি লইয়া রানায় বসিয়া মিছামিছি মাছ ধরিতেছিল। হঠাৎ 'ঝুপ্' করিয়া আওয়াজ হওয়ায় রাধা চাহিয়া দেখে—ছেলেটি নাই। নিশ্চয়ই জলে পড়িয়াছে বুঝিয়া এবং রানার পাশে জল গভীর নয়, হাঁটিয়া গিয়া হাতড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে পারিবে এই আশায় সে পা বাড়াইয়া আগাইয়া চলে। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। একে রাধা সাঁতার জানে না, তাহাতে সেই পুকুরে ছিল ভীষণ পাক, যতই সে পা

তুলিতে যায়, ততই তাহার পা চাপিয়া বসে—ফলে সেও ডুবিয়া যায়। এতক্ষণ বোধ করি দু'জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত, যদি না কলিকাতার ভদ্রলোকটি সেই ভরা দ্বিপ্রহরে নিৰ্জ্জন রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে ইহা দেখিতে পাইতেন। তিনি দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়াই ছুটিতে থাকেন। ঘাটের মাথায় আসিয়া চাদর, জামা ও জুতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া জলে লাফাইয়া পড়েন এবং দৃঢ় হস্তে দুইজনকে টানিয়া তুলেন। ইত্যবসরে লোকজন আসিয়া পড়ে এবং পানুকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

ভীড় ঠেলিয়া যিনি চারুশীলার সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন, তিনি রাধার উদ্ধার-কর্ত্তা। কোমল মিষ্টস্বরে তিনি কহিলেন—"মা লক্ষ্মী, দাঁড়িয়ে থেকে দেরী করো না। খুকীর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে একটু গরম দুধ খাওয়াতে চেষ্টা কর। দেরী হলে জ্বর আস্তে পারে।"

রাধা একটু সাম্লাইলে চারুশীলা তাঁহার পরিচয় লইল। তাঁহার নাম বিপিনচন্দ্র মজুমদার। নিবাস কলিকাতা। ব্যবসা-উপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই চন্দননগরে আসিতে হয়। চারুশীলা গলায় আঁচল দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—"বাবা, আপনি যা' করেছেন, মুখের কথায় তা' বল্‌বার নয়। দয়া করে একটু মিষ্টি মুখ আপনাকে কর্‌তেই হবে।"

—"বেশ ত মা, তা'তে কিন্তু হচ্ছো কেন। আমি পেটুক মানুষ, খাওয়াতে না বলি না, আর কাপড়খানা না শুকুনো পর্য্যন্ত আমাকে ত বস্‌তেই হবে।"

নলিনী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র দিয়া তাঁহার ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী সরলা দেবী
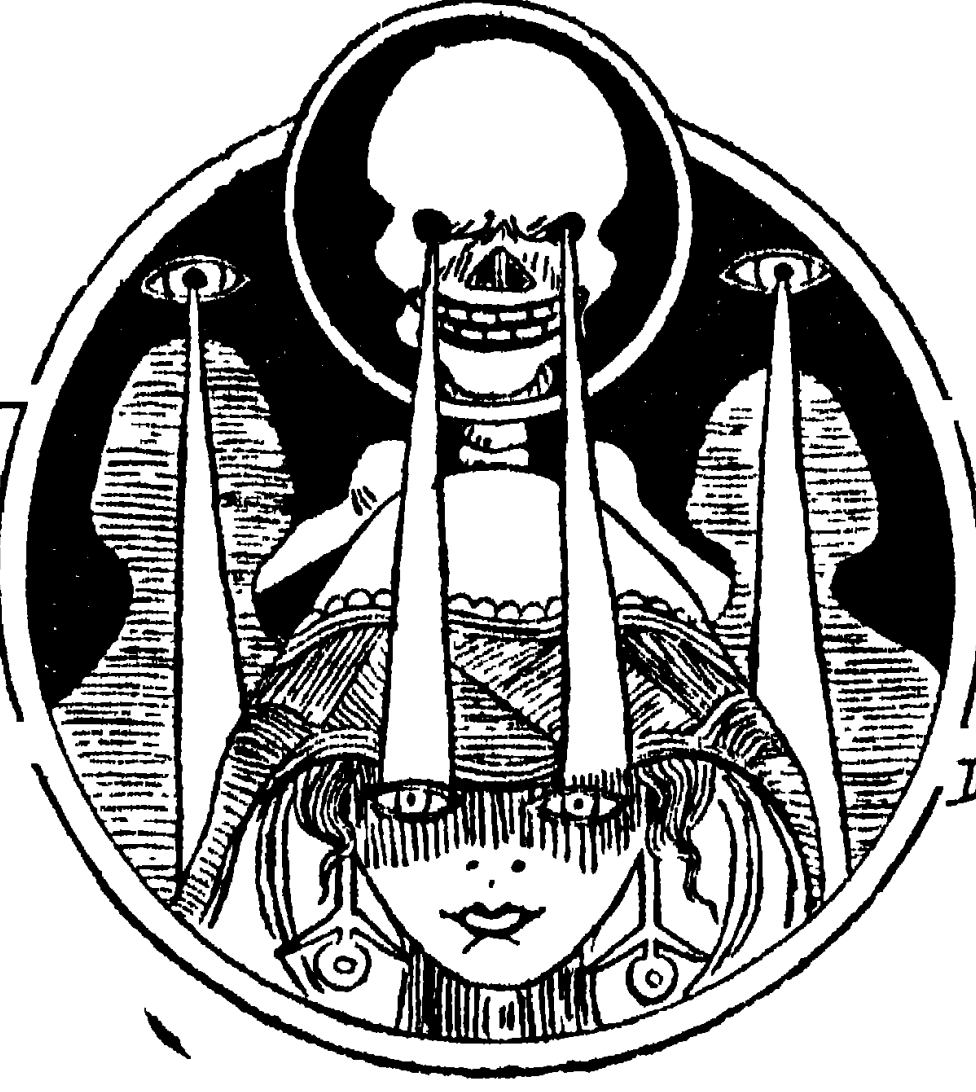
ভৌতিক গল্প

মায়ার টানে

কুমারী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়ার মেয়ে করুণা। সকল বাড়ীতেই তাহার অবাধ গতি।

ছোট যা' মন্দা, অফুরন্ত প্রেম-ভালবাসা, অগাধ স্নেহ-মমতা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া সে যখন জলে ডুবিয়া অকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথিতা হইল এই করুণা।

বাড়ীর সকলে তাহাকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া নাওয়াইয়া ধোওয়াইয়া চৌধুরী-বাড়ী রাখিয়া আসিল। ধীরা মেয়েটীর সঙ্গে তাহার বড় ভাব—যদি তাহাকে পাইয়া উপস্থিত শোকের উন্মাদনা হইতে সে কথঞ্চিৎ শান্ত হয়।

তা' শান্ত সে হইলও। দিনের অবশিষ্ট ভাগটা ধীরার ভাই কুসুমের নিজের হাতে টাঙ্গান দোলনায় পর্য্যায়ক্রমে দুলিয়া, কচি আমের শ্রাদ্ধ করিয়া চিত্ত-বিক্ষোভের কথা প্রায় একপ্রকার ভুলিয়াই গেল।

ধীরার মা কোন্ ফাঁকে আসিয়া ডাকিলেন,'ওলো করু, সেই কোন্ সকালে কি দুটো খেয়েছিস কি না খেয়েছিস, সেই হ'তে কিছু ত দাঁতে কাটিস নি, আয় মা, কিছু মুখে দিবি আয়।"

করুণা কাপড় পাতিয়া বলিল, "কি দেবে জেঠাইমা, জলপান? এই যে, দাও না।"

পিসীমার আর মালা জপ হইল না। উত্তেজনায় সেটীকে কপালে ঠেকাইতে ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "দূর ছুঁড়ী, আজ কি ভাজা-পোড়া খেতে আছে। নারকোলের রসকরা তুলে রেখেছি। বিনু, খানচার রুটি দিয়ে ওর হাতে দাও ত।"

বিন্দুবাসিনী ননদের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তা' ত নেই দিদি। আয়রে ধীরা, কুসু, পাতা নে, এই দিক্‌টায় বোস্। তুমি এইখানটিতে বসো মা করু। এঁটো যতটা পাড়তে পার না পার, গোবর জল ঢেলে দিলেও চলে যাবে।"

তিনজনে পাতা পাতিয়া বসিলে, বিন্দুবাসিনী দু'খানা করিয়া পরোটা ও কিছু তরকারী পাতে দিয়া বলিলেন, "বসে খা' বাছা, ভাজি। গরম গরম দেব, খান দুই বেশী খেলেও অসুখ করবে না।"

মা সরিয়া গেলে ধীরা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "দূর ছুঁড়ী, পরোটা বুঝি কেউ লোফে?"

করুণা ঝাঁজিয়া বলিল, "আসুন জেঠাইমা, দিচ্ছি বলে। এই বুঝি তোর বামুনাই? আমরা জাতে স্যাকরা, পাত থেকে তুলে নিচ্ছিস কি করে বল্ ত?"

ধীরা গালে আঙ্গুল চাপিয়া বলিল, "ও মা, বলিস কি লো, আমি নিলুম তোর পাত থেকে! অভাগ্যি! কেন, মা কি আমায় দেবে না?"

করুণা চঞ্চল হইয়া বলিল, "তবে, তবে নিচ্ছে কে, কুসু, তুই?"

কুসুম বলিল, "না করু দিদি, আমি ত নিজেরটাই খাচ্ছি, এই দেখো না—আর এখান থেকে তোমার পাতা কি নাগাল পাওয়া যায়?"

"তাও বটে—কিন্তু ওই দেখ্, ওই পরটা উঠে চল্লো।"

তিনজনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা মা, জেঠাইমা।"

তাহাদের চীৎকারের অর্থ বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বিন্দুবাসিনী রান্নাঘর হইতেই বলিলেন, "বসে খা' না, হ'ল এই।"

করুণা কাতর স্বরে হাঁকিল, "তা' নয় জেঠাইমা, আমার পরোটা কে তুলে নিচ্ছে, এসে দেখো না।"

খুন্তি হাতে বিন্দুবাসিনী বাহিরে আসিলেন। ততক্ষণে শূন্যের পরোটা কোন্ অজানা পথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। বলিলেন, "এতও পারিস তোরা! কে আবার নেবে? আহা, ক্ষিধে লাগ্‌বেই ত! এই নে বাছা, এনেছি, খা'।"

কিন্তু পাতে না পড়িয়া শূন্যেই যখন পরোটা ঝুলিতে লাগিল, তখন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বিন্দুবাসিনী ডাকিলেন, "দিদি, একবার এদিক্‌টায় এসে দাঁড়াও না ভাই।"

ডাকার পূর্ব্বেই ছেলেদের কথায় আকৃষ্ট হইয়া সুখদা-সুন্দরী সেখানে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, "তাই ত লো, ওগুলো চল্‌লো কোথায়?"

বিন্দুবাসিনী বিরক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "মরেও যার পেটের ক্ষিদে ঘোচে নি, তার কাছে। কতদিন বল্‌ত শোন নি, 'এমন মায়া পড়ে গেছে দিদি, এই গাঁটার ওপর, তোমাদের ওপর, যে, মলেও ছাড়তে পারব না, ভূত হয়ে ছুটে আস্‌ব।' তাই এসেছে। কিন্তু বলি, ছেলেমানুষের হাতেরটা কাড়া কেন? দেব 'খন—ওই পাঁদাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।"

গজগজ করিতে করিতে তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। অস্ফুট একটা ফিকে হাসির শব্দ শুনা গেল—বাড়ীর ঠিক্ পিছন দিকে বাঁশ ঝাড়ের পারে, শিউলি-তলার ওদিকের ফেলা হাঁড়ী-কলসীর দিক্ হইতে। না, ইহার পর ছেলেদের পাতের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য হইল না।

আঁচাইবার জন্য করুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরাও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। রান্নাঘরের উত্তর দিকের গলিটা পার হইয়া খিড়কীর পুকুর। সেই পুকুরে সকলে হাত-মুখ ধোয়।

পিসীমা হাঁকিলেন, "ওরে, দাঁড়া তোরা, আলোটা আনি।"

ছেলের জাত তাঁহার কথা কিন্তু কানেই তুলিল না, নাচিতে নাচিতে আগাইয়া চলিল। এ বয়সে বাধা হাত দিয়া জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলাই যে মস্ত বড় বাহাদুরী।

ধীরা চুপিচুপি বলিল, "পিসীমা, আলো নিয়ে বেরোবার আগেই আমরা ঘাটে নামব। করুণা, একটু পা চালিয়ে।"

কিন্তু অগ্রগমনে বাধা পড়িল। একখানা গয়নাপরা হাত এক মুঠো করবী বিজ ছুঁড়িয়া দিয়া খিল্‌খিল্ শব্দে যে হাসির তরঙ্গ তুলিল, তাহাতে শুধু বালক-বালিকা নয়, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও ভয়ার্ত্ত চীৎকারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা তখন উচ্ছিষ্ট বা জাত-অজাতের বিচার ভুলিয়া তিনটী শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

দুই

রাত্রি এগারটার পর তমাল আসিয়া হাঁকিল, "ক্ষিদেয় নাড়ী চুঁইয়ে গেল মা, তোমাদের আজ হলো কি?"

রান্নাঘরের কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "আজকের সব কিছু চুলোমুখী নিয়ে গেছে বাবা। খিচুড়ী চড়িয়েছি, হয়ে এল বলে।"

তমাল বিস্মিত হইয়া বলিল "তোমাদের গুষ্টিশুদ্ধর

খাবার খেয়ে গেল, এমন রাক্ষস কে এসেছিল মা—মানুষ ত ?"

বিন্দুবাসিনী গম্ভীর-মুখে বলিল, "ছিল ত এককালে, এখন কি হয়েছে সেই জানে! এসে বোস্ এই রান্নাঘরেই।"

তমাল চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, "কি বল্‌ছ মা, আজ তোমাদের মাথা খারাপ করে দেছে না কি কেউ ?"

উত্তেজিত-কণ্ঠে পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "আর কে! হতভাগী মরেও পেটের ক্ষিদে চেপে রাখ্‌তে পারে নি, ছোট ননদটার পাত থেকে কেড়ে কেড়ে খাচ্ছিল। সেই ত গুষ্টিশুদ্ধর তৈরী খাবার গিলে তবে ছাড়লে।"

তমাল প্রথমে কথার 'খেই' খুঁজিয়া পাইতেছিল না, পরে একটু ভাবিয়া হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কে মন্দা, তোমাদের শাঁক্‌চুন্নি, সেই বুঝি রান্নাঘরে ঢুকেছিল ? দেখো ত ভাল করে, কারুর হাতটাত মুচড়ে দিয়ে যায় নি ত।"

পিসীমা হাঁকিলেন, "কি, সেই ছোটলোকের মেয়ে ছোঁবে আমাদের! হোক্ না ভূত, বামুনকে ডিঙ্গুতে যাবে!"

তমাল বলিল, "তা' পারে না হয় ত, কিন্তু খাবার নিতে আটকায় না পিসীমা—ছোটলোকের মেয়ে ভূতটারও।"

পিসীমা মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "ইস্, তাই বই কি! দিয়ে এলো তোমার মা পাঁদাড়ে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ফেলে, কাজেই নিয়েছে—নইলে তার সাধ্য কি যে, বামুণের চৌকাঠ ডিঙ্গোয়!"

একটা হিহি খিল্‌খিল্ শব্দ আকাশ বাতাসে ভরিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া তমাল বলিল, "ধীরা, বাঁদরী, হাস্‌লি যে বড় ?"

মা অনুযোগ করিয়া কহিলেন,"তোর যেমন কথা বাছা, ও আবার হাস্‌লে কখন। যত নচ্ছারপনা সেই বৌ ছুঁড়ীর। সেই ত—"

তমাল বাধা দিয়া বলিল, "তৈরী খাবারের ওপর এত রাগ কেন হ'ল মা, দেখো ত, তোমার ছেলে যে ক্ষিদেয় মরে।"

মা বলিলেন, "একে ভূতুড়ে মাগী, তা'তে স্যাকরার ছোঁয়া, তুই খেতিস ?"

তমাল হাসিল। বলিল, "রেখেই কেন দেখ্‌লে না মা, কি কর্‌তুম।"

পিসীমা ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিলেন, "থাম্ থাম্, তুই সব পারলেও আমরা ত যা' তা' অনাচারে প্রশ্রয় দিতে পারি না। শোন্, কি হয়েছিল বলি।"

আগাগোড়া ঘটনাটা বুঝাইয়া দিতে দিতেই তপ্ত খিচুড়ী কোলের কাছে আসিয়া পড়িল। তমাল তামাসা করিয়া কহিল, "কিরে মন্দা, আর ক্ষিদে-টিধে আছে না কি ? সাম্‌নে তৈরী খিচুড়ী, দেখ্‌ছিস ত।"

কথা শেষ হইল না, কোলের থালা শূন্যে উঠিয়া চলিল। তমাল অবাক হইয়া থালা ধরিতে হাত বাড়াইল ; কিন্তু ক্রমশঃ উঠিয়া দাঁড়াইয়াও নাগাল পাইল না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার উচ্চহাস্যে সে দিক্ ভরাইয়া বলিয়া উঠিল, "মিসম্যাবিজম্, ভেল্কী!"

পিসীমা বলিলেন, "কি তুই বল্ ত আবাগী, বামুণের পাতা ছুঁলি ?"

থালা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া আবার তমালের কোলের কাছে বসিল। ছেলের উদ্যত হাত চাপিয়া ধরিয়া মা বলিলেন, "ও ভূতের ছোঁয়া খাস নি বাবা, সরে বোস্, আমি আবার এনে দিচ্ছি।"

তমাল বলিল, "বিশ্বাস তবেই করি, যদি এখনি সাম্‌নে তাজা ইলিশ মাছ এসে পড়ে। খিচুড়ী দিয়ে বেশ হয় কিন্তু, নয় ?"

বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই সম্মুখে সত্য-সত্য মাছ পড়িতে দেখিয়া তমাল লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "ওঃ, তাই ত!"

পিসীমা বলিলেন, "বিশ্বাস করছিলি না, তাই দেখিয়ে দিয়ে গেল। এ টাটকা গঙ্গার ইলিশ কি ক'রে এল তা' বল্? দেখ্ দেখ্, এখনও লাফাচ্ছে।"

তমাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হয়েছে। এ নকলোর কাজ। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি ছোঁড়াটাকে।"

তাহাকে ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া

মা তাহার পথ আগ্‌লাইয়া কহিলেন, "কোথায় চল্‌লিরে হতভাগা, ও কি মানুষ ?"

তমাল কিন্তু মানিল না। সারা ছাত ছুটাছুটি করিয়া শ্রান্ত দেহে যখন সে নামিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ বিশুষ্ক, দেহ ভয়-মিশ্রিত উত্তেজনায় ভরা।

নামিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আর একটা পরখ চাই মন্দা। যদি সত্যই তুই ভূত হ'য়ে থাকিস, খালের মাটি এক ঝুড়ি এনে ফেল্ দেখি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে খালের মাটির রাশি আসিয়া পড়িল। পিসীমা রাগিয়া বলিলেন—"নে স্বীকার করে। বুঝ্‌লি ত এখন ভোগ। কোথেকে এ পরের আপদ এল মা! জ্বালাতন!"

বাহির প্রাঙ্গন হইতে কে একজন হাঁকিল, "তিনকড়ি, ও তিনকড়ি, বাড়ী আছ না কি হে ?"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া তিনকড়ি বলিল, "সর্ব্বনাশ! ও গো, শুনছ, তোমার বড় দা' এলেন বুঝি। আজ ত বাজার হয় নি, ওঁকে কি খাওয়াই বলো ত ?"

অদৃশ্য ঝাঁজাল স্বরে কে বলিল, "যেমন মরদ, তেমনি মুরোদ! দেখো গে, ভাঁড়ারে সবই আছে—পাকা কলা, নীচু, আম। আমি যাচ্ছি মাছ, দই আর মিষ্টি আন্‌তে। ততক্ষণ হাত পা ধুইয়ে বসাও।"

অতিথি, পরিচর্য্যায় সেদিন পরম পরিতুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। বাড়ীর সকলে বলিল, "হ্যাঁ, গিন্নী বটে ছোট বৌ! ও আছে বলেই আজ মানটা বাঁচল।"

তিন

সব শুনিয়াও মন্দার স্বামী তিনকড়ি অশরীরির উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করিল না। বলিল, "হয়ে থাকে হয়েছে। আমার সেবা করবার জন্য ত একজন চাই, করুক ওই রকম হয়েই।"

ঘরের বাহিব একটা খিল্‌খিল্ শব্দে ভরিয়া উঠিল।

তমাল বলিল, "ভূতের হাতের সেবা সইতে পারবে ?"

তিনকড়ি স্বর টানিয়া বলিল, "খু-উ-ব! ভূত হলেও ত ঘরের লোক বটে। যথার্থ পাওনা যার কাছে যা', কেন সে তা' দেবে না।"

তমাল গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেল। বারবার অনুরোধ করিয়া বৃথা অপমানিত হইবার ইচ্ছা তাহার আর মোটেই ছিল না।

তিনকড়ি তখন শয্যাসীন হইয়া হাঁকিল, "কই গো, তুমি না কি নতুন মানুষ হয়ে এসেছ, দাও না পাটায় হাত বুলিয়ে। আজ বড় কষ্ট হয়েছে, পিরতম পুরের বাবুদের বাড়ীর পয়সা আন্‌তে গিয়ে। কাজটা তুলি। সোনা বাঁচিয়ে তোমায় যা' হোক্ কিছু করে দিচ্ছি আর কি।"

একটা অদৃশ্য ঝঙ্কার বহিয়া গেল, "থো কর, তোমার একখানা কে চায় ?"

চার

মাঠের মধ্যে ভীম 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আবার কে ডাকিল, "দাদা, আমার কথা কি একেবারেই শুনতে পাচ্ছ না, না গেরায্যি হচ্ছে না ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।"

ভীম একটা আতঙ্কপূর্ণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "তা' তা' আমায় কেন বোন্, তোমার শোন্‌বার লোক করে দিয়ে আমরা ত হাত পা ধুয়েছি।"

"ও সব বাজে আবদার চল্‌বে না। সে যদি নাই শোনে। তোমায় আমায় একপেটে জন্মেছি, দায় ত তোমার। না মানো, দেখ্‌ছ ওই এঁদো পুকুর।"

একটা অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে নিজেকে কোন প্রকারেই স্থির রাখিতে না পারিয়া ভীম হাঁকিল, "তা' তা' তুমি কি চাও মন্দা, বলো—আমায় জ্যান্ত মেরে ফেলে কি লাভ হবে তোমার ?"

"লাভ! তা' অনেক। একা একা ঘুরছি, তোমায় পেলে সঙ্গী একজন হবে ত। হাজার হোক্ মার পেটের ভাই বোন্, এমন তৃপ্তি, এমন শান্তি আর কারও সাথে বেড়িয়ে হবে না।"

যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে ভীমের উত্তর বাহির

হইয়া আসিল, "তোমার ভাইপো ভাইঝি, কে তাদের দেখবে দিদি ?"

"দেখবার ভাবনা। এই আমি কি না কচ্ছি ওদের, সব বয়ে এনে দিচ্ছি, ক্ষার কাচ্ছি, বাগান আগ্‌লাচ্ছি, তুমিও তেমনি করবে। মন্দ কি, দুই ভাই বোনে দেখ্‌বো শুন্‌বো, বেশ হবে।"

"না না বলিয়া ভীম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। মুখে, "ওরে, না না, মারিস নি, তুই যা' বল্‌বি আমি তাই, তাই শুন্‌ব।"

কিন্তু তাহার গতিবেগ শীঘ্রই থামিয়া গেল, যখন সেই এঁদো পুকুরের একটা ভাঙ্গা পাড়ের আঙ্গুল দুই ব্যবধানে সে আসিয়া বুঝিল—এবার মৃত্যু নিশ্চয়। ডাক ছাড়িয়া তখন সে কাঁদিয়া উঠিল।

"যাও, তুমি যাও দাদা। ছি, এমন কাপুরুষ—মরতে ভয় পাও! জলের ওপর যে হাঁড়িটা আছে, নিয়ে যাও। ছেলে-পুলেগুলোকে কিছু দিলুম। বলো, তোদের পিসী দিয়েছে।"

ভীম কিন্তু সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইল না, প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

পাঁচ

"কাপড় ক'খানা কেচে শুকুতে দে ছোট বৌ। ছেলেটা বড় কাঁদছে, ঠাণ্ডা করে আসি তাকে।"

বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব আসিল, "অনেক করেছি দিদি, আর না। এবার হয় তোমরা আমার হয়ে কিছু কর, নইলে—"

"নইলে কি লো?" ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে বড় যা' বলিল। তাহার চরণ গতি তখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অভ্যস্ত পরিহাসের উক্তিতে সে বলিল, "মরণ আর কি! ধন্যি লো ধন্যি! ঠাকুরপোর নতুন বিয়ের জন্যে বুঝি? হলেই বা সতীন, তুই ত আর বেঁচে নেই, ও বেচারীর প্রাণে কি একটু সখ্‌ জাগে না?"

"কে মানা কচ্ছে? আমার যা' হয় একটা ক'রে এলেই ত পারে। নইলে শুনে রাখো, আজ থেকে তিন্‌ দিনের মধ্যে আমি তিন পাঁচ সাতে চড়ব?"

"তার মানে?"

"মানে আবার কি, দেখ্‌তেই পাবে। তোমাদের পাঁচ সাতজন হ'লেই আমার এখানকার ঘরকন্না একেবারে গুছিয়ে নিতে পারব। তখন বেশ থাকা যাবে। কি বলো দিদি, নয় কি? এস না এগিয়ে এদিকে।"

"ওরে বাপরে, ছোট বৌ মেরে ফেল্‌লে গো!" বলিয়া গোঁ গোঁ করিতে করিতে বড় যা' মাঝ উঠানে আছাড় খাইল।

ভাশুর টাঙ্গি হাতে বাঁশ চেলা করিয়া মাচা বাঁধিতে-ছিল। হঠাৎ তাহার হাতের টাঙ্গি ঘুরিয়া দূরে গিয়া পড়িল—একেবারে ঠিক্ বড় বৌয়ের মাথার উপর। রক্তে নদী বহিয়া চলিল। শ্রীনিবাস ছুটিয়া গিয়া সেই টাঙ্গি তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় বসাইয়া দিল। দুই রক্তের ধারা একত্র মিশামিশি হইয়া স্থানটীকে ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিল।

বড় যা' টলিতে টলিতে উঠিয়া বলিল, "ছোট বৌ, ছোট বৌ, বাগ্যতা করি দিদি, থাম্, রক্ষে কর! আমি স্বীকার করছি, কেউ না করলেও আমি নিজের পয়সায় আপনি গিয়ে তোর উদ্ধার ক'রে আসব। বাঁচতে দে, ওকে নিস্ নি। ও যে তোর ভাশুর লো। ভাশুরকে কি ছুঁতে আছে আবাগী!"

একটা অস্ফুট কৌতুক-হাস্যে দিক্ ভরিয়া উঠিল। বড় যা' মাতঙ্গীর আর দেহের সামর্থ্যে কুলাইল না। স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

তিন দিনের দিন অমঙ্গলের চীৎকার করিতেও কেহ আর সে ভিটায় রহিল না। এখন ভুতুড়ে বাড়ীর নাম করিলে লোকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দূর হইতেই বাড়ীখানা দেখাইয়া দিয়া সভয়ে পলায়ন করে। তাহারা বেশ জানে, ছোট বৌয়ের গতি হয় নাই। তাহার অতৃপ্ত আত্মা ক্ষুধাতুর হইয়া আজও বাড়ীটার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্রোহ

শ্রীপ্রভাতলাল মুখোপাধ্যায়

আজকাল শোনা যাচ্ছে 'নারী জাগরণ' না কি সুরু হয়েছে—মেয়েরা সব স্বাধীন হচ্ছে। তারা আর আগের মত পুরুষের অধীনতা মান্‌তে চাচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা বাঙালী-পরিবারের ভেতরের খবর একটুও রাখেন, তাঁরা জানেন যে, এই আজকালকার স্বাধীনতা-প্রয়াসী নারীজাতি এক-দিকে কত নীচে পড়ে আছে।

এই ত সেদিন আমাদের সাম্‌নেই সুবোধের বউয়ের সঙ্গে সুনীলের স্ত্রীর খুব বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেল—যেটা আমরা কেউই আশা করি নি। অথচ, এমন এক সময় ছিল যে, তাদের দু'জনের মধ্যে মনে প্রাণে ছিল যথেষ্ট মিল, গভীর ভালবাসা। যাক্‌, এখন আগের কথা একটু বলা আবশ্যক মনে করি।

সুবোধ ও সুনীলের বয়স যখন মাত্র একুশ কি বাইশ হবে, তখন দু'জনেরই পিতা মাস তিনেকের আগু-পেছু তাঁদের পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করে সেই চির শান্তিময় স্বর্গে চলে গেলেন।

তারপর তাদের হ'ল জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে। সুবোধের স্নেহময় পিতা তাঁর পুত্রের জন্য কিছু না রেখে গেলেও একটী অবিবাহিত কন্যা রেখে গেছ্‌লেন। ওদিকে সুনীলের পিতাও পুত্রের ওপর অন্য একটা ভার চাপিয়ে গেলেন, যার জন্য সুনীলকে ভবিষ্যতে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল।

সেটা হচ্ছে—গাঁয়ে হাজার দুয়েক টাকা ঋণ। কাজেই তাদের দু'জনকেই বাঙালীর একমাত্র আকাঙ্খিত চাকরী, অর্থাৎ, দাস্যবৃত্তি যোগাড় করে নিতে হ'ল। তবে সুখের বিষয় এই যে, তখন দেশে মহাত্মা গান্ধীর 'নন্ কোয়াপরে-শন মুভমেণ্ট' সুরু হয় নি; কাজেই চাকরীর জন্য তাদের দু'-পাঁচ বছর কোলকাতা সহরে ঘুরে বেড়াতে হয় নি। তখন অল্প লেখাপড়া জানা থাকলেই লোকে চাকরী পেতো।

মাইনে এমন কিছু বেশী ছিল না, যার দ্বারা তারা তাদের পিতৃঋণ শোধ ও বোনের বিবাহ দিতে পারে। কাজে কাজেই তারা উভয়েই একটু অবস্থাপন্ন ঘর দেখে বিয়ে করে ফেল্‌তে সঙ্কল্প করলো। ইচ্ছে—শ্বশুর জামাই ও মেয়েকে যা' কিছু দেবেন, তা'তেই কোনরকমে তারা তাদের ঋণ শোধ এবং ভগ্নীর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করবে। করলোও তারা ঠিক্ তাই। সুবোধ ও সুনীলের মধ্যে ছিল অগাধ ভালবাসা আর অটুট বন্ধুত্ব, কাজেই তাদের সদ্য-বিবাহিত বধূদের মধ্যে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাতে আমরা একটুও আশ্চর্য্য হই নি।

তারপরের ঘটনা অতি সাধারণ। বিদেশবাসী বাঙালী-পরিবারের মধ্যে যা' হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে দুই বন্ধু পত্নীর মধ্যেও সেই চির প্রচলিত সনাতন নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হলো না।

সুবোধের স্ত্রী সুব্রতা যেদিন যা' ভালমন্দ রাঁধত, তার থেকে কিছু সুনীলের স্ত্রী প্রমীলাকে দিয়ে আস্‌ত। প্রমীলাও বান্ধবীর দানের প্রতিদান দিতে কোনদিনই ভুল্‌ত না। তারা দু'জন অবসর সময়, অর্থাৎ, তাদের স্বামী যখন অর্থান্বেষণে বেলা দশটার আগেই খেয়ে বেরিয়ে পড়্‌ত, তখন থেকে আবার তারা বাড়ী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত উভয়ে এক জায়গায় বসে বসে আবলতাবল কত কি বক্‌তে থাক্‌ত। সুব্রতা বল্‌ত—কিরূপে সে ছোটবেলায় তাদের খিড়কীর পুকুরে বিকেলে গা ধুতে গিয়ে সাঁতার শিখ্‌তো। প্রমীলা বল্‌ত—তার বিয়ের আগের দিনের ঘটনা। এইরূপে দু' বছর কেটে গেল, তবু কিন্তু তাদের জীবনের গতি বদ্‌লাল না। তাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হতে ক্রমশঃ

দৃঢ়তর হতে লাগ্‌ল। তারপর একদিন দু'জনেই দু'জনের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল—কেউ কখন কা'কেও প্রাণ থাক্‌তে ভুলবে না।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন তারা তাদের আগেকার প্রতিজ্ঞার কথা গেল ভুলে—বন্ধুত্বের সম্মান দিল নষ্ট করে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্থানে এল দারুণ বিদ্রোহের ভাব। মেয়েদের মধ্যে যখন কোন ঝগড়া হয়, তখন তারা পূর্ব্বাপর ভেবে দেখে না—কোথায় দাঁড়িয়ে তারা ঝগড়া করছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি থাকে না। এদের দু'জনের মধ্যে যখন ঝগড়া হচ্ছিল, তখন যে আশপাশের মেয়েরা এই লজ্জাকর কলহ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করছিল, সেটা আর তখন তারা দেখা প্রয়োজন মনে করে নি।

এতেই তাদের হলো যত গোল—তারা আর কেউ কা'কেও মুখ দেখাতে পার্‌ল না। তখন পাড়ার সব মেয়েদের মুখে কেবল সুব্রতা আর প্রমীলার কথা।

তাদের স্বামীরা এ ব্যাপার জান্‌তো না। কিন্তু তখন জান্‌লো, যখন তারা অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এসে ঠিক্ সময় তাদের কাপড় জামা, জলখাবার পেল না। এগুলো তাদের এ পর্য্যন্ত কোনদিনই চাইতে হয় নি এবং এদের জন্য কোনদিন তাদের এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে হয় নি।

বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে দুই বন্ধুতে যখন দেখা হলো, তখন তারা দু'জনই অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বোধ করি তাদের মনে তখন একমাত্র প্রশ্ন জেগে উঠলো—ব্যাপার কি? তারপর যখন তারা আন্দাজে বুঝলো যে, গৃহিণীদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়ে থাক্‌বে, যার জন্য তাদের এরূপ দুর্দ্দশা হয়েছে, তখন তারা তাচ্ছিল্যভরে খুব খানিকটা হেসে নিল। তারা বোধ হয় মনে করলো—ও কিছু নয়; মেয়েদের মধ্যে মাঝে মাঝে ও রকম হয়ে থাকে। শীঘ্রই আবার পূর্ব্বের অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু যখন এক মাসের স্থানে ছ' মাস এবং তারপর এক বছরও তাদের উভয়ের স্ত্রীর মধ্যে সেই একই বিদ্রোহের ভাব রয়ে গেল, তখন তারা আশ্চর্য্যও হলো যতটা, চিন্তান্বিতও হলো ঠিক্ ততটা। স্ত্রীদের মনের এই ভাব ত মিটলই না, বরং এরপর থেকে দেখা গেল যে, তাদের মধ্যে একজন যদি কোন প্রতিবেশী গৃহে যায়, তবে সেদিন হতে অপর জন সে বাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা, তার নামও একবার ভুলে মনে করে না। শেষ পর্য্যন্ত এমনও হলো যে, সুনীল ভুলেও যদি কোনদিন বন্ধু কিংবা বন্ধু-পত্নীর কথা তোলে, তবে সেদিন প্রমীলা আর স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না; অপর দিকে সুবোধ যদি কোনদিন সুনীলের বাড়ী যাচ্ছি বলে বেরুতে যায়, তবে সুব্রতা অমনি আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখায়।

সেদিনও যাদের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা, হঠাৎ কেন যে তাদের মনে এরূপ বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠলো, উভয় বন্ধুই সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লো না—কখনও যে তা' পার্‌বে সে আশাও তাদের মনে রইল না।

এতদিন পরে আজ তারা বুঝলো, তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, দু'জনের এখন এমন শক্তি নেই যার দ্বারা তাদের পত্নীদের মনের ওপর যে প্রকাণ্ড প্রাচীর পড়েছে, সেটা তারা সরিয়ে ফেলে আবার উভয়ের মধ্যে মিলন করিয়ে দিতে পারে।

শ্রীপ্রভাতলাল মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

গল্পের নামটা হচ্ছে বিদ্যাপতি। তাই বলে পাঠকেরা যেন কেউ ভাববেন না যে, চণ্ডীদাসের আমলের সেই বিদ্যাপতিকে নিয়ে আমি আজ গল্প লিখ্‌তে বসেছি। কারণ, সে রকম ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য বা দুর্ম্মতি আমার নেই। এই গল্পের নায়ক বিদ্যাপতিকে নিয়েই আমি ব্যস্ত এবং বাধ্য হয়েই বল্‌তে হচ্ছে যে, সে বিদ্যাপতির সঙ্গে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাপতির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমাদের বিদ্যাপতি গণপতি পণ্ডিতের পুত্র নয়, মৈথিলী-ভাষার কখনো চর্চ্চা করে নি বা দীনেশ সেন ওকে নিয়ে 'থিসিস্'ও লেখেন নি। তা' ছাড়া, এ বিদ্যা-পতি কার্ত্তিক সিংহের সভাপণ্ডিত কখনো ছিল না, বা লছিমা দেবী নামক কোনো স্ত্রীলোককেই আজ পর্য্যন্ত ভালোবাসে নি। এমন কি, 'এ সখি, আমারি দুখের ওর নাহি রে', বা 'যব গোধূলি সময় ভেলি', প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রেমের কাব্যও লেখে নি—যদিও ও একজন কবি।

ও একেবারে আজকালকার ধরণের; অর্থাৎ, এখনকার যুবকেরা যেমন হয় ও-ও ঠিক্ তেমনি। রাস্তায় হাঁট্‌তে গেলে ওর নজর থাকে বারান্দার দিকে। অঞ্চল দেখে অনেক সময় চঞ্চল হ'য়ে গোরুর গাড়ী চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে এবং ফাইন্ দিতে দিতে ও যায় বেঁচে। গঙ্গাস্নান কর্‌তে গেলে ওর পুণ্যির দিকে ততটা টান থাকে না, যতটা থাকে মেয়েদের প্রতি। এক কথায় ও সুন্দরী মেয়েদের খুব ভক্ত। তাদের জন্যে ও কম্বল সম্বল ক'রেও দেশ-বিদেশ এমন কি হিমালয় পর্য্যন্ত সুস্থ-চিত্তে ঘুরে আস্‌তে পারে। আর্ট ও সাইকোলজির বর্ম্ম প'রে বিরাট্ হর্ম্ম্যবাসিনী স্ত্রীলোকদের চর্ম্ম নিয়ে যে সমস্ত লেখকদের নর্ম্ম করাই একমাত্র ধর্ম্ম, তাদের লেখার মর্ম্মও ও বেশ উপলব্ধি ক'রে কপালের ঘর্ম্ম বার করে।

তা' ছাড়া, আরো ওর পরিচয় আছে। দেখ্‌তে ও প্রিয়দর্শন। সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে। সাধারণের মতো গরীব নয়। বেকার-সমস্যার সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই। বাপ কোথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্।—ভেট্ পান ঝুড়ি ঝুড়ি। এই থেকেই বোঝা যায় ওদের অবস্থা কেমন স্বচ্ছল।

ও কোলকাতায় থাকে। মেঘের ফাঁকে ওর স্বপ্ন।···

নির্ম্মল গয়লার ইটিলিতে যে পয়লা নম্বর দোতালা বাড়ীটা আছে, তা'তে উপস্থিত ও উঠে এসেছে। একলা একখানা বড় ঘর নিয়ে থাকে। বামুন-চাকরে রাঁধে, কাজ-কর্ম্ম করে। ও বেশ স্বচ্ছন্দেই আছে। হঠাৎ সেদিন বিদ্যাপতি আবিষ্কার ক'রে ফেল্লে, দূরের ছাদে একখানা নীল শাড়ী শুকুচ্ছে। নীল শাড়ী? হ্যাঁ, তাই তো! মনটায় ওর ভাব এসে গেল। নীল রঙে না কি অনেকেরি মনে ভাব আসে। বিরাট আকাশ—নীল; বিস্তৃত সমুদ্র—সেও নীল; গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, নীলকণ্ঠ সবই তো নীল। ভারতবর্ষেও নীল চায হতো। যাক্। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওর মনে পড়ল। কত যায়গায় না তিনি নীলের স্থান দিয়েছেন। নিজে-নিজেই ও আবৃত্তি ক'রে ফেল্লে—'নয়নে আমার স্নিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্চল লেগেছে', 'ও গো নবঘন নীলবাসখানি, বুকের উপরে কে লয়েছে টানি', 'যাব মোরা নীল নদীর তীরে···!" হঠাৎ ওর মনে এসে গেল চণ্ডীদাসের কথা—'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ স'হিত মোর!' আহা, কী চমৎকার কথা! কিন্তু কালিদাসকেও ভুলে গেল না।—'তমাল-তালী বনরাজি নীলা' ফট্ ক'রেও আবৃত্তি ক'রে ফেল্লে।

হঠাৎ ও দেখ্‌তে পেলে ঐ শাড়ীটা দিয়ে জল

ঝরছে। তাই তো, জলই তো! কিন্তু ঠিক্ জলই কি? না না, কান্না! কাঁদে না কে? মানুষ কাঁদে—পশুপক্ষী কাঁদে—গাছপালা কাঁদে। প্রাণ তো সকলকারই আছে। ওরই বা নাই কে বল্লে? জগদীশ বসু বলেছেন—গাছের প্রাণ আছে। কিন্তু তিনি কেন বলেন নি—কাপড়েরও প্রাণ আছে? জগদীশ বসুর ওপর ওর রাগ হলো। বোধ হয় তিনি বাড়ী-ভোলা হ'য়ে শাড়ীর কথা ভুলে গেছ্লেন—এইটাই উপস্থিত বিদ্যাপতি ঠিক ক'রে ফেল্লে। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল প্রাচীন বিদ্যাপতির কবিতা।—একটু-আধটু ও পড়েছিল বই কি। মনে পড়ল সেই স্থানটা, যেখানে রাধা স্নান করেছে এবং তার ভিজা শাড়ীটা তার দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিরহভরে কাঁদছে। তাই তো, কাঁদেই তো! ওই যে নীল শাড়ীটা শুকুচ্চে ছাতে, ও-ও বোধ হয় সেই জন্যে কাঁদ্ছে! নীল শাড়ীর অধিকারিনী ওকে ত্যাগ করেছে—ও ভুল্বে কি ক'রে? ওরও বিরহ জেগেছে—ও কাঁদ্ছে!

শাড়ীর অধিকারিনী নিশ্চয়ই সুন্দরী। বিদ্যাপতি ভাব্লে সুন্দরী না হয়েই ও যায় না। শুধু সুন্দরী নয়—তরুণী! ও পায়চারী করতে আরম্ভ করলে। মনে মনে বল্লে—নিশ্চয় ও তরুণী—অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশী—সে আর্টিমিস্। তরুণী ছাড়া নারীর কি রূপ আছে? মিরেণ্ডা তরুণী, শকুন্তলা তরুণী, কপালকুণ্ডলা তরুণী, সাবিত্রী তরুণী, ভেনাস তরুণী, রাধিকা তরুণী, মমতাজ তরুণী—সকলেই তো তরুণী। আর নভেল-নাটক তো তরুণীকেই নিয়ে আরম্ভ। বিশ্বজগৎ যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘুচ্ছে মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, যুগে যুগে, মানব জাতিও তেমনি তরুণীকে কেন্দ্র ক'রে ঘুচ্ছে আবহমান কাল থেকে। তার যুদ্ধ কিসের জন্যে—তার শিক্ষা কিসের জন্যে—তার সৌভাগ্য কিসের জন্যে—তার সৌন্দর্য্য কিসের জন্যে—তার সভ্যতা কিসের জন্যে—তার কৃষ্টি কিসের জন্যে—তার অভিমান কিসের জন্যে—তার অভিযান কিসের জন্যে?—সে তো শুধু এক তরুণীর জন্যেই। ট্রয়ের যুদ্ধ আজ হতো না—মহাকাব্য বন্ধ থাকৃত—পিরামিড আজ উঠ্ত না—তাজমহলের পরিকল্পনা হতো না—আর্থারের নাইটরা কেউ ছুট্ত না—বাইবেলের অর্দ্ধেক গল্প জন্ম' না—যদি আজ তরুণী না থাকৃত জগতে। কিন্তু বাস্তবিকই ঐ নীল শাড়ীটা কি তরুণীর? হঠাৎ ওর মনে প্রশ্ন জাগ্ল। কিন্তু কেনই বা হবে না ওটা তরুণীর? আশী বছরের বুড়ী কি ওটা পর্বে? আর যদি তাই পরে—আর যদি ওটা একটা কালো মেয়ের হয়? বিদ্যাপতি রেগে উঠ্ল। দেওয়ালে হাত ঠুকে বল্লে—তা' হলে ও আত্মহত্যা করবে—তা' হলে ও বিবাগী হয়ে যাবে—তা' হলে—

হঠাৎ নীল শাড়ীটার দিকে আবার ও চাইলে। ছাত থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ওটাকে ধর্ত্তে ইচ্ছা কর্লে। কী চমৎকার জীবন ওর! একটী সুন্দরী তরুণীর তনুলতার রহস্য ও কতদিন ধ'রেই না গোপন রেখেছে! তাকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে কত শোভাই না বাড়িয়ে তুলেছে! তার এলায়িত বেণীর কত সুরভিই না ও পরখ ক'চ্চে! তার কত জ্যোৎস্না-যামিনীর স্মৃতিই না ও বুকে এঁকে রেখেছে! তার অদৃশ্য দয়িতের উদ্দেশ্যে কত অশ্রুই না ওর নীলিমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে! ও সভ্যতার প্রতীক—ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—ও তরুণীর অস্তিত্ব! আর ওর নিজের জীবনটা কি? ওটা হচ্চে সাহারা—ওটা হচ্চে পাষাণ—ওটা হচ্চে ধোঁয়া—ওটা হচ্চে হাহাকার!

চাকর ডাকতে এল—বাবু ভাত দিয়েছে।

ও ঠাস্ করে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।—ভাত দিয়েছে তো তোর কি ব্যাটার ছেলে! যা'—খাবো না।

চাকর গালে হাত বুলুতে বুলুতে চলে গেল।

ও ফন্দী আঁটতে লাগ্ল, কি করে ঐ শাড়ীর অধিকারিণীর সঙ্গে দেখা হয়। ও যদি সারাদিন বসে থাকে—তা' হলে তা' হলে সে ছাতে একবারও উঠ্বে না কি? একবারটীও নয়?......ও মনে মনে ঠিক্ কর্লে, তাই বসে থাকবে। সারাদিন বসেও রইল। কিন্তু কই? সন্ধ্যা যে হয়ে এল, অন্ধকার ডানা মেলে নেমে আস্ছে, এখনো ও ওঠে না কেন? তবে কি সবুরে মেওয়া ফলে? তবে কি দুঃখের

দ্বারাই সুখকে পাওয়া যায়? তাই বুঝি হয়। ও ইজি-চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।...অনেক ভাব্‌লে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখে শাড়ীখানা দেখা যাচ্ছে না। তবে কি অন্ধকারের জন্যে দেখা যাচ্ছে না? বোধ হয় তাই। ও টপ্‌ করে নীচে নেমে এসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং সব চেয়ে বড় ও সব চেয়ে দামী একটা টর্চ্চ লাইট কিনে আবার যথাস্থানে ফিরে এসে ফোকাস্‌ ফেল্লে ওই ছাতে। কিন্তু কই? শাড়ী যে নেই! কে তুলে নে গেল? ও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌ল। যাঃ, যার জন্যে সারাটা দিন ও কাটালে, সে বুকে আঘাত দিলে এমন করে!...ওর ডাক ছেড়ে কান্না পেতে লাগ্‌ল।

পরদিন সকালবেলা।

ও একটু দেরীতে উঠ্‌ল। আবার দেখে শাড়ীটা ঠিক্‌ তেমনি শুকুচ্চে। ওর আনন্দ আর ধরে না! আজ ও বসে থাকবে—সন্ধ্যা হলেই টর্চ্চ ফেল্‌বে—তরুণী রূপ এমেরিকা আজ ও আবিষ্কার করবেই। উত্তেজনায় ও টেবিল চাপ্‌ড়ে ফেল্লে, একটুখানি নাচলে, গান গাইলে, চাকরকে বক্‌শিস্‌ দিলে। আবার চল্‌ল ওর পর্য্যবেক্ষণ।

দশটার পর এগারোটা বাজল, বারটা বাজল, বারটার পর একটা বাজ্‌ল। ও চুপ করে বসেই রইল। কিন্তু বসে থাক্‌লেও যে আবার ঘুম পায়। মানুষের ওপর সকলেরই শত্রুতা, সকলেরই ষড়যন্ত্র! ও রাস্তায় বেরিয়ে এক লাটাই সুতো কিনে ফেল্লে, বড় বড় দশটা ঘুড়িও কিন্‌লে। তারপর ঘরে এসে একটা ঘুড়িতে কত কি লিখে ওড়াতে ওড়াতে শাড়ীর ছাতেই গোঁত্তা দিয়ে ফেলে রেখে দিলে।

অনেকক্ষণ কাটল। কিন্তু কেউই যে নেয় না, পুরুষ মানুষও যে উঠ্‌ছে না। আঃ, আর পারা যায় না! ও লাটাইটা ধরে বসেই রইল।

হঠাৎ দেখে অন্য ছাতের একটা কালো ছেলে লগী বাড়াচ্ছে। বোধ হয় ওর সুতোটা সে ধরবে। ও রেগে উঠ্‌ল। এই হাড়্‌হাবাতে ছেলেগুলোকে দেখ্‌লে ওর পিত্তিশুদ্ধ জলে ওঠে। ওর ধারণা, ওরা সব করতে পারে। পরের কাছ থেকে নিয়ে গান্ধীর হাতে টাকা তুলে দিতে পারে, হুজুগে মাত্‌তে পারে, তকলী কাট্‌তে পারে, স্কুল পালাতে পারে, পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে—সব পারে। ও চীৎকার করে উঠ্‌ল—এইও খবরদার! সুতোয় হাত দিলে খুন করে ফেল্‌ব।

কিন্তু ছেলেটা ওর কথা গ্রাহ্যই করল না। দ্বিগুণ উৎসাহে লগীটা আরো তুলে ধর্‌ল। বিদ্যাপতি বাধ্য হয়েই ওর সুতোটা টেনে নিয়ে ছেলেটার প্রতি দুর্ব্বাসার মতো চেয়ে রইল।

সন্ধ্যা হলো।

ও টর্চ্চ জেলে বস্‌ল। হঠাৎ দেখে একটা কালো লোক সেই নীল শাড়ীটা তুল্‌ছে। সর্ব্বনাশ! তরুণী এল না কেন? তবে কি সে জেনে-শুনেই ব্যথা দিচ্ছে? ওঃ, কী নিষ্ঠুর! ওর মাথা ঘুরে উঠ্‌ল। কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলে—ও লোকটা নিশ্চয়ই বাড়ীর চাকর। তরুণী একদিন উঠ্‌বেই।.....

রাত্রিতে ও বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। কিন্তু ঘুম আসে কই? অত্যধিক গরম পড়েছে। তার ওপর ফাউ আছে ছারপোকা, মশা। এই ফাউদের জ্বালাতেই ও উত্যক্ত হয়ে উঠ্‌ল। বাইরে বেরিয়ে এসে ছাতটায় বসে পড়্‌ল। একবার ঐ শাড়ীর ছাতে টর্চ্চ ফেল্লে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। ভগবানের ওপর ওর রাগ হলো—সৃষ্টির ওপর রাগ হলো—প্রকৃতির নিয়মের ওপর ওর রাগ হলো। মনে মনে বল্লে—ঘোর অবিচার!

কেন, সেই তরুণীর বিছানায় কি ছারপোকা থাক্‌তে নেই? ওর কি অসহ্য গরম লাগে না? তা' হ'লে তো ও ছাতে এসে দাঁড়াত। তা' হ'লে তো চোখোচোখী হতো। তা' হ'লে তো বিদ্যাপতি বাঁচত।

দু'-তিনদিন কেটে গেল।

ও এখন অধৈর্য্য, মরিয়া। সারাদিন নীল শাড়ীখানা

দেখে, কিন্তু কোনো তরুণীকেই ছাতে উঠ্‌তে দেখে না। সন্ধ্যাবেলায় সেই কালো লোকটাই শাড়ীখানা তুলে নে যায় ও দেখতে পায়। ও বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল—বিল্বমঙ্গলের কথা। তাই তো ও যদি বিল্বমঙ্গলই হয়। ও যদি আস্তে আস্তে গিয়ে ও বাড়ীতেই আশ্রয় চায়। মন্দ হয় না তো! কিন্তু বাধা-বিপত্তিও আছে যে! তারাই বা আশ্রয় দেবে কেন? কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে হবে তো? নচেৎ চাঁটগাঁ ফেরৎ ব'লে সন্দেহ করে যদি? আর তা' ছাড়া, আসল কথা—ও বিলমঙ্গল হ'তে পারবে না। কারণ, এই ওর নবীন বয়স, নবীন যৌবন, আর ও কি না নিজের চোখ দুটো উপড়ে ফেল্‌বে? না না, তার চেয়ে ও অন্য কাজ করবে। যাবে চোর হ'য়ে। রাত্রে যখন সকলে ঘুমুবে, ও চুরি করতে যাবে। দোষ কি? ও তো আর সত্যি-কারের চোর নয়। যাবে প্রেমের জন্যে চুরি করতে, যাবে একটা ম কে চুরি করতে!…ক্ষতিই বা কি? না হয় ধরা পড়বে—জেলে যাবে! তা' গেলেই বা। জেলে যত লোক আছে, সকলেই কি সত্যিকারের চোর? এমনও লোক নেই কি, যে প্রেমের জন্যে চোর হয়েছে? হাঁ, তাই ঠিক্, ও চোরই হবে! কিন্তু বাড়ীটা আগে একবার ভাল করে দেখে নেওয়া উচিত। নচেৎ কার বাড়ী যেতে কার বাড়ী গিয়ে উঠ্‌বে। ও জামাটা পরে সোজা চল্‌ল। হঠাৎ কিছুদূর গিয়ে দেখ্‌তে পেলে ছাতে সেই শাড়ীটা। হ্যাঁ, এই বাড়ীই ঠিক্। কবাটটা খোলা। একটু উঁকি মেরে ও চ'লে এল। বিকালে উঠ্‌ল ঝড়। কাল-বৈশাখীর দারুণ ঝড়। পনের মিনিটের মধ্যেই আকাশ ঘোর অন্ধকার করে এল। ঝড়টা কমার সঙ্গে-সঙ্গেই বৃষ্টি নামল—ভীষণ বৃষ্টি। বিদ্যাপতি তখন আপন-মনে 'মেঘদূতে'র কথা ভাব্‌ছিল। হঠাৎ ওর আর একটা চিন্তা এসে গেল। নাঃ, ও চোর হবে না। তার চেয়ে এই দুর্য্যোগেই ও বেরুবে অভিসার করতে। তরুণীর বাড়ীর দরজার সাম্‌নে ও ভিজ্‌বে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দেখ্‌বে কেউ ডাকে কি না। আর যদি না ডাকে, তা'তেই বা ক্ষতি কি? ও সোজা কড়া নাড়্‌বে, কেউ এলে বল্‌বে—মশায়, আশ্রয় দিন, দেখ্‌ছেন তো কি রকম বৃষ্টি, বজ্রাঘাত! তা'তেও কি কেউ দেবে না? এত নিষ্ঠুর কেউ নয়।…

ও জামা-কাপড় পরে বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে এল। তারপর সোজা এসে সেই বাড়ীটার দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলে তখন ওর গা ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ একটী ভদ্রলোক ছাতি নিয়ে সাম্‌নে এসে ওকে বল্‌লেন—চিনতে পার্‌ছেন?

বিদ্যাপতি চোখ তুলেই লাফিয়ে উঠ্‌ল। আরে, এঁকে যে ও দেখেছে—ইনিই তো ছাতে সেই নীল শাড়ীটা তুল্‌তে আস্‌তেন। কিন্তু এঁকে যে ও চাকর ভেবেছিল—হঠাৎ বাবু বনে গেলেন কি করে?

বিদ্যাপতি বল্লে—হ্যাঁ, চিন্‌তে পাচ্ছি বই কি। আপনিই সন্ধ্যাবেলা ছাতে শাড়ী তুল্‌তে যান্ না?

ভদ্রলোক হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—হ্যাঁ, নইলে উপায় কি বলুন না। একলা থাকি। তা' দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছেন কেন? চলুন, চলুন, এ গরীবের ঘরে আপনার পায়ের ধুলো দেওয়া চাই। এঃ, ভিজে যে একেবারে নেয়ে গেছেন!

বিদ্যাপতি কোন কথাই শুন্‌তে পেলে না। খালি তারা একলা থাকে কথাটা তার বুকে মোচড় দিতে লাগ্‌ল। তা' হলে বাড়ীতে মেয়ে-টেয়ে কেউ নেই? কি আশ্চর্য্য, উনিই বা শাড়ী তুলতে যান্ কেন? ও শাড়ী তো মেয়েছেলের। ওঁর কি দরকারে লাগে? জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ওকে কোনো কথা না বল্‌তে দিয়েই ভদ্রলোক জোর করে ওপরে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে ওর হাতে একখানা গামছা দিলেন। বল্লেন—মুছে ফেলুন, আমি আস্‌ছি। আপনাকে চা না খাইয়ে ছাড়ছি না। আপনি প্রতিবেশী। এখানে, কোলকাতায় প্রতিবেশীর আদর নেই বটে, কিন্তু বিদেশে বা পাড়াগাঁয়ে যথেষ্ট আছে। একলা থাকি, মাঝে মাঝে কেউ এলে মন্দ হয় না। আচ্ছা, বসুন। এই অফিস থেকে আস্‌ছি কি না, পাটা ধুয়ে আসি। বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আবার একলা থাকি! বিদ্যাপতি চম্‌কে উঠ্‌ল। উনি বলেন কি? তবে শাড়ীখানা ঘোড়ার ডিম

কার ? এখানে এসে ওর লাভ হলো কি তবে ? ও ভাব্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ যেন কার চুড়ির আওয়াজ কানে এল। বিদ্যাপতি লাফিয়ে উঠ্‌ল।

সেই মুহূর্ত্তেই ভদ্রলোক মুখ হাত ধুয়ে ঘরে ঢুক্‌লেন। বিদ্যাপতির চাঞ্চল্য দেখে একটু অবাক হয়ে বল্লেন—কোন অসুবিধা বোধ কচ্ছেন না কি ?

হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে একটু অপ্রতিভ স্বরে বিদ্যাপতি বল্লে—না, বড় মশা কি না—

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—তা' একটু আছে। এখানে আপনার সঙ্কোচ করবার কোনো কারণ নেই—আমার বাড়ী ফাঁকা—আমিই একলা—কোনো মেয়েছেলে-টেয়ে-ছেলে নেই। বলে ভদ্রলোক ষ্টোভ জ্বালালেন।

তারপর উঠে একটু পরেই পাশের ঘর থেকে সেই নীল শাড়ীটা লুঙ্গির আকারে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন।

বিদ্যাপতির তখন চোখ কপালে উঠেছে। পৃথিবী ঘুচ্চে—সেও বুঝি ঘুচ্চে! তবে কি চুড়ির আওয়াজ মিথ্যে ? তবে কি শাড়ীটা ওই লোকটারই পরবার জন্যে? ওর বুকখানা ফেটে গেল। একবার জিগ্যেস কর্‌তে ইচ্ছে হলো—ওরে পাষাণ, ওরে নির্দ্দয়, ওরে রূপহীন পুরুষ, কেন তুই এতদিন ধ'রে শাড়ীটা শুকুতে দিয়ে আমায় প্রবঞ্চনা করেছিস ?

কিন্তু তা' জিগ্যেস করবার আগেই ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—আমায় শাড়ী পরতে দেখে অত আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে আছেন কেন ?

বিদ্যাপতির চোখ ফেটে জল আস্‌ছিল। অনেক কষ্টে বল্লে—আশ্চর্য্য হবো না, আশ্চর্য্য হবো না, কেন আপনি ওটা পরেছেন ? ও যে—ও যে—

ভদ্রলোক চা' কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন—কেন পরি তা' শুনুন। এবার যখন দেশ থেকে আসি, আমার স্ত্রী তখন কতকগুলো ডাব, লেবু ইত্যাদি একটা ঝাড়নের অভাবে এই শাড়ীটায় বেঁধে দিলে। আমিও আন্‌লাম। তারপর থেকে বাড়ীতে এটা প'রে শুয়ে থাকি রাত্রিতে, আবার সকাল হ'লেই কেচে ছাতে শুকুতে দিই। আর দেখুন না, কেরানী মানুষ—পাঁচখানা কাপড়ই বা পাই কোথা' ? পরিবার উপস্থিত দেশে বটে, তবে শীঘ্রই আস্‌বে।

তাঁর কথা শুনে বিদ্যাপতি 'টপ্‌' করে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। এ নিষ্ঠুর বাস্তবকে সহ্য কর্‌বার মত ক্ষমতা ওর ছিল না। মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে ও রাস্তায় নেমে এল। ভদ্রলোক ব্যাপারটা বুঝ্‌তে না পেরে হাঁ হাঁ ক'রে ওর পেছন পেছন এসে বল্লেন—ও কি, ও কি, যাচ্ছেন কোথা' ? চা খেয়ে যান।

বিদ্যাপতি কিন্তু তাঁর কথাটা শুন্‌তেই পেলে না।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অতিবুদ্ধি

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

রবিবার। রামধনুর সম্পাদক মশাই অফিসে বসে বসে অসমাপ্ত ভাদ্র মাসের রামধনুর জন্য চিন্তা করছেন। মধ্যে মাত্র আর পাঁচ দিন বাকি। টেবিলের সাম্‌নের ঘড়িতে নয়টা বাজ্‌ল। পিয়ন এসে চিঠিপত্র সব রেখে গেল। তিনি এক-একখানি ক'রে খাম খুল্‌ছেন, তারপর একটু চোখ বুলিয়েই বাঁ দিকের ঝুড়িটিতে তা ফেলে দিচ্ছেন। মুখ থেকে তাঁর মুহুর্ম্মুহু বার হচ্ছে 'যত সব বাজে, রাবিশ্'।

হঠাৎ সম্পাদক মশায়ের মুখে আশার আলো ফুটে উঠ্‌ল। বড় খামের ভেতরে ক'রে একটা গল্প এসেছে—তার নাম 'সিংহের কবলে', লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। লেখাটা তাঁর খুব পছন্দ হ'ল, অসমাপ্ত ভাদ্র সংখ্যার জন্য তিনি সেটাই মনোনীত কর্‌লেন।

যথাসময়ে ভাদ্র সংখ্যা কাগজ ছেপে বার হ'ল; সতীশবাবুর 'সিংহের কবলে' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের খুব ভাল লেগেছে। তাদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র রোজই এত বেশী করে আসছে যে 'চিঠিপত্র' বিভাগে সে সবগুলো কি করে ছাপ্‌বেন ভেবেই তিনি অস্থির।

সেদিন চিঠির সংখ্যা অন্যান্য দিনের চাইতে কিছু বেশী—হঠাৎ যে খামখানা প্রথম হাতে উঠ্‌ল, সেইটে ছিঁড়েই সম্পাদক পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে কৌতুকমিশ্রিত হাসি ফুটে উঠ্‌ল। চিঠিখানি এই রকম—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে আপনার পত্রিকায় অপরের চুরি করা লেখা এখনও বাহির হয়। শ্রীযুক্ত সতীশ রায়ের লেখা 'সিংহের কবলে' আপনার পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, কিন্তু উহা আগেই ১৩২০ সালের মাঘ মাসের 'ভাইবোন্' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। যদি সন্দেহ হয় ত' আপনি দেখিতে পারেন। সতীশবাবুর এরূপ কাজ আমি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি। এরূপ চুরি করিয়া নাম কিনিবার কি প্রয়োজন কিছুই বুঝি না।

ইতি—

শ্রীঅমলা চৌধুরী।

তৎক্ষণাৎ অমলা দেবীর পত্রসহ সতীশবাবুর কৈফিয়ৎ তলব করা হ'ল। তদুত্তরে সম্পাদক মশায়ের কাছে উত্তর এল—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

অমলা দেবীর পত্র পাইয়া সুখীই হইলাম। কারণ আমি পূর্ব্বে 'ভাইবোন্' পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। ভাই-বোনের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাল এবং মাসের নাম দেওয়া থাকে না। সেইজন্য পুরাতন পত্রিকাগুলি একত্রে বাঁধিতে দিবার সময় অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা পাইলাম না। হঠাৎ মাথায় চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি খুলিয়া গেল—অমলা দেবীর গল্পটা কপি করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আঃ জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম যে সেটা ১৩২০ সালের মাঘ মাসের 'ভাইবোন্'।

—ইতি শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।*

* 'রামধনু', অষ্টম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কৌতুক-কণা

রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

যোগেশের সাহেব সাজিবার বেজায় সখ। সম্প্রতি কয়েকটী বিলাত-ফেরৎ বন্ধুর দলে ভিড়িয়া অনেকগুলি বিলাতী আদব-কায়দা সে প্রায় দুরস্ত করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু পোষাকের দিক্ দিয়া টাই বাঁধাটা এখনও তেমন সরল হইয়া আসে নাই এবং বচনের দিক্ দিয়া ইংরাজী বুলিটাও। সে কথায় কথায় ইংরাজী বুকনি ছাড়িবার যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু আসলে তাহার বিদ্যা কম হওয়ায় সব দিক্ দিয়া গোলমাল হইয়া যায়।

অল্পদিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। বধূরূপে এক-জন খৃষ্টান মেম্-সাহেবকে বরণ করিবার আন্তরিক অভি-প্রায় সত্ত্বেও বুড়া-বুড়ী, অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহা না হইলেও তাহার মনে মনে ঠিক্ ছিল একজন শিক্ষিতা (অন্ততঃ ইংরাজী বুকনি জানা) বাঙালী মেয়েকে সে জীবন-সঙ্গিনীরূপে লাভ করিবেই। কিন্তু বিধাতা ইহাতেও বাদ সাধিলেন। তাহার বিবাহ হইল অতি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে অনুরাধার সহিত। অনুরাধা ইংরাজী ত দূরের কথা বাঙলা অক্ষর পর্য্যন্ত ভালরূপ চিনিত না।

যোগেশের তাহাতে দুঃখ নাই। সে তাহার বুক বাঁধিল। মুখে বলিল—"নেভার মাইণ্ড।"

বিবাহের পরদিন হইতে অনুরাধাকে পুরাদস্তুর মেম-সাহেব সাজাইতে সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। পিতা মাতা কত আপত্তি করিলেন। সে শুধু মুখ টিপিয়া হাসিল।

সেদিনকার কথা। যোগেশ তাহার কর্তৃক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং আলোক-প্রাপ্তা সহধর্ম্মিণী অনু-রাধাকে লইয়া গড়ের মাঠে টেনিস খেলিতে আসিয়াছে। পরনে তাহার শাদা প্যাণ্ট, গায়ে শাদা সার্ট, পায়ে শাদা টেনিস জুতা, হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মোট কথা, সমস্তই শাদা। আর অনুরাধার সমস্তই নীল। গাঢ় নীল শাড়ী, নীল ব্লাউস, পায়ে নীল হিল্ উঁচু জুতা।

অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ট্রাম হইতে নামিয়া কাদার হাত এড়াইবার জন্য তাহারা একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিল। কিন্তু মাঠ পার হইতেই মহা মুস্কিল! তাহার শাদা জুতা কাদায় ডুবিল—প্যাণ্টেও রীতিমত ছিটাছাটা লাগিল। সে কাদা বাঁচাইতে বিশৃঙ্খলভাবে যতই লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, ক্রেপ্ সোলে ততই উহা আট্‌কাইয়া যায়। অনুরাধা হাসিয়া আকুল হয়।

যখন তাহারা খেলার মাঠে উপস্থিত হইল, তখন তাহার শাদা জুতার অল্প পরিমিত স্থানই আসল রং বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যোগেশ ঘন ঘন র‍্যাকেট ঘুবায়, আর বারবার জুতার পানে চাহিয়া বলে—"উঃ, 'নুইসেন্স'।"

অল্প কিছুক্ষণ পরে সেখানে একজন কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধ মুচি আসিয়া উপস্থিত হইল। বোধ করি সেও খেলা দেখিতে আসিয়াছিল। স্বামীকে জুতার জন্য আপ্‌শোষ করিতে দেখিয়া অনুরাধা মুচিকে দেখাইয়া বলিল—"ওকে দিয়ে জুতোটা ঠিক্ করিয়ে নাও না।"

উৎফুল্ল হইয়া যোগেশ তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া সাহেবী-চালে বলিল—"এ মোচি, তোম্ এ সাফ্ কর্‌নে সেকোগে?"

মুচি তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"জী, হুজুর।"

মুচির থলির উপর দাঁড়াইয়া যোগেশ জুতা খুলিয়া দিল। মুচি একটা কালির কৌটা বাহির করিয়া তাহা পালিশ করিতে উদ্যত হইল।

যোগেশ ক্রোধে আগুন হইল। অনুরাধা হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিল।

মুচি হতভম্ব হইয়া বলিল—"তব কেয়া ক্রিম্ কিয়ে গা?"

বোমার মত ফাটিয়া যোগেশ বলিল—"তোমারা মুণ্ড।"

শান্ত অথচ টিপ্পনীর সুরে অনুরাধা বলিল—"অত গোলমালে দরকার কি বাপু। তার চেয়ে তোমার গালটা বাড়িয়ে দাও, ওতে কোব্রা মাখিয়ে আর একটু চক্‌চকে করে দিক্।"

ব্যঙ্গের সুরে যোগেশ বলিল—"তুমি ত আমার 'বেটার হাফ্'—তুমিই বা বাদ যাবে কেন? তা' হলে তোমাকেও শাদা ক্রীম মাখিয়ে আরও একটু শাদা করে দিক্। তারপর বাঁশীর বদলে আছে এই র‍্যাকেট। এসো দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে রাধাকৃষ্ণ সেজে এখানেই দাঁড়িয়ে যাই।"

মাঠশুদ্ধ লোক তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীকার্ত্তিক শীল

শ্রীমতী ছায়া দেবী

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা। | রূপ লেখার সৌজন্যে

দ্বাদশ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৩ | পঞ্চম সংখ্যা

হতভাগ্যের ডায়েরী

শ্রীশোভারাণী দেব

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আমি আমার দারিদ্র্যতার জন্য আজ এই বন্ধু-বান্ধবহীন জনাকীর্ণ নগরীর এক হাসপাতালে পড়ে আছি। এই অভাগার কেউ নেই! স্নেহ নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা বলে আমার কাছে আজ কিছুই নেই!

রিক্ত—হায়, আজ আমি রিক্ত! কিন্তু একদিন এই অভাগার সব ছিল। তখন ভাবতাম—পৃথিবী এত সুন্দর, এত মহান, তবু কেন লোক নিজেকে সুখী নয় বলে। আজ কিন্তু আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি—পৃথিবীতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা বলে কোন জিনিষ নেই, করুণা বলে কোন কিছু নেই, আছে শুধু দরিদ্রের হাহাকার, আর ধনীর গর্ব্বপূর্ণ বাক্য। তারা বোঝে না দরিদ্রের ব্যথা, জান্‌তে চায় না দরিদ্রের সুখ-দুঃখ। ভাবি আর বিস্মিত হয়ে যাই, তারাও ত মানুষ। একই দেশে জন্ম, একই আচার-ব্যবহার—তাদেরও ত ভাই-বোন্ আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে তবু কেন তারা দরিদ্রের ব্যথা বোঝে না। মন আমার ঘৃণায় ভরে আসে; দুঃখে-লজ্জায় আমার চোখে জল এসে যায়। পয়সাই কি সব? আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেম এ সব কি শুধু পয়সাতেই হয়? সবই পয়সা? হায়রে, ওদের পয়সার কথা ভাব্‌লেই সেই সঙ্গে আবার সুমিত্রার কথা মনে পড়ে যায়! ভেসে ওঠে তার সুন্দর স্বচ্ছ মুখ। সুমিত্রা, সুমিত্রা, তুমি যে এত বড় পাষাণী তা' আমি জান্‌তাম না—তোমার জন্য আমি পলে পলে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করে নিচ্ছি—না, তোমার দোষ নেই, দোষ আমার অদৃষ্টের! হায় ভগবান, কেন তুমি এই সুন্দর পৃথিবীতে দরিদ্রের সৃষ্টি করেছিলে!

লিখে যাচ্ছি—আমার বুকের রক্ত দিয়ে এই ডায়েরী লিখে যাচ্ছি। ভেতরে আগুন জ্বলছে—রাবণের চিতা বলে যদি কিছু থাকে ত সে আমার অন্তরের মধ্যে।

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমি আমার বিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী ভাবি। ভেবে হয়ত আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাথার কাছে যে নার্স বসে থাকে, সে বলে—"মিঃ মিটার, আজ বুঝি আপনার কেউ আসবার কথা আছে?"

হাসি। দুঃখের হাসিই মুখে ফুটে ওঠে। বলি—"না মিস্ রায়, আমার কে আছে যে আসবে।"

—"কেউ নেই?" নর্স বলে।

বলি—"কেউ নেই মিস্ রয়! আছে শুধু অভাগার রিক্ততার ব্যথাভরা হাহাকার!"

দেখি নর্সের চোখ ছলছল্ করে। ভারি ভাল লাগে তার এই ব্যথা-করুণ মূর্ত্তি দেখ্‌তে! বড় সুন্দর লাগে! নারী—এই সেবাপরায়না নারীর সঙ্গে আমি সুমিত্রাকে মিলিয়ে দেখি—আকাশ পাতাল প্রভেদ। চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে সুমিত্রার গর্ব্বপূর্ণ হাসি, পয়সার অহংকার, দরিদ্র দেখ্‌লে ঘৃণায় কুঞ্চিত করা মুখ, রোগ দেখ্‌লে বাড়ী ছেড়ে পালান। ভালভাবে মেলাতে যাই। কখন মনে হয়—না, সুমিত্রা সে রকম মেয়ে নয়—হয় ত উত্তেজনার জন্য আমি আমার সুমিত্রার বিকৃত মূর্ত্তি দেখি। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে দেখ্‌তে পাই মিস্ রয়ের সেবাপরায়না, মহিমময়ী মূর্ত্তি। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হ'য়ে আসে। নারী একই ধাতুতে গড়া জানতাম—কিন্তু সুমিত্রা আর মিস্ রয়তে অনেক প্রভেদ। একদিকে অহংকার, ঔদ্ধত্য, দারিদ্র্যের উপর তীব্র ব্যঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি সুমিত্রা, আর অন্যদিকে দরিদ্রের প্রতি অসীম মমতাময়ী, করুণারূপিনী, অহমিকাশূন্য, সেবাপরায়ণা মিস্ রয়। সুমিত্রার ব্যবহারে তার উপর কেন, সমস্ত নারীজাতির উপর আমার একটা ঘৃণা ভাব এসে গেছ্‌ল। কিন্তু মিস্ রয়কে দেখে আবার একটা শ্রদ্ধাভাব জেগে উঠেছে। রোজ ডায়েরী লিখি দেখে সে আমায় জিজ্ঞেস করে—"মিঃ মিটার, কি লেখেন এত বলুন ত?"

হাসি। হেসেই বলি—"আপনি বুঝবেন না মিস্ র' ব্যথিতের বেদনা ব্যথিত ছাড়া কেউ বুঝ্‌বে না।"

ম্লান হেসে মিস্ রয় বলে—"ভুল কর্‌ছেন প্রদীপবাবু, আমি আপনার মতই একজন ভুক্তভোগী। রো' দিন লেখা। আজ একটু ভাল আছেন, আবার কেন পরিশ্রম ক'রে রোগ বাড়াবেন।"

হোহো ক'রে হেসে উঠি। [illegible] নিজেই চম্‌কে যাই। আজ আমার স[illegible] অথচ, একদিন কোলকাতায় প্রদীপ মিত্র [illegible] প্রত্যেক খেলাধূলায় তাকে দেখা যেত। পরিশ্রম বলে কিছু সে জানত না। আজ সামান্য লেখা সত্যই প্রদীপ মিত্রের কাছে পরিশ্রম ঠেকে। জানি সুমিত্রা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে; তার কারণ, আমার এই দারিদ্র্যতা। মনে হয়—অভিশাপ দি' সুমিত্রাকে। কিন্তু, যাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতুম, তাকে অভিশাপ দেব কি করে? উমার কথায় আবার চম্‌কে উঠি—উমা হচ্ছে মিস্ রয়। বলে—"কি ভাব্‌ছেন প্রদীপবাবু?"

বলি—"কিছু নয় উমা।"

ওকে আমি নাম ধরে ডাকব বলে দিয়েছি। উমা আমায় শাসনের ভঙ্গীতে বলে—"শুয়ে থাকুন প্রদীপবাবু, আর লিখ্‌বেন না।"

সে চলে যায়।

তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা শেষ করতে চেষ্টা করি। জীবন-প্রদীপ নিবে আসছে আমি বেশ বুঝতে পারি—অতি দ্রুতই নিবে আসছে। আর ক'দিনই বা—বড় জোর মাস চারেক। হয় ত অত দিনও নয়। ভয়ে শিউরে উঠি—অকালে, অতি অকালে নিবে যাবে আমার জীবন-প্রদীপ! জগৎ-সংসার সব আমার কাছে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে! কেউ এই অভাগার জন্য এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুকণা ফেলবে না। সুমিত্রা—এই নিরানন্দ হাসপাতালেও সুমিত্রা! প্রলাপ বক্‌ছি না কি! কে সুমিত্রা! কোথায় সে! নেই, সুমিত্রা বলে কেউ নেই! এখনও মনে পড়ে, যখন আমি ধনীর সন্তান ছিলাম, তখন সুমিত্রা আমায় একদিন বলেছিল—"প্রদীপ, বিয়ে আমায় করতে হবে জানি

কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিবাহ করব না স্মরণ রেখো।"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমি তার মুখে আমার প্রণয়ের প্রথম চুম্বন এঁকে দিয়েছিলাম। সুমিত্রার সেই কোমল করপল্লব ধরে হৃদয়ের আবেগে বলেছিলাম—"সুমিত্রা, আমার এই প্রাণের সুখী কে!"

মায়ের কথায় আমার কাছে সব পরিহাস। তারপর "প্রদীপ, কি এত ভাবনে সব ভেঙে গেল—উঃ, সেদিনের কথা মনে হলে এখনও বুকের ভেতর কি রকম করে! বাবা যখন হার্টফেল করলেন, তখন আমি সুমিত্রাদের বাড়ীতে। রামা চাকর এসে খবর দিতেই আমার মাথাটা ঘুরে গেল। পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সাম্‌লে নিলাম। সুমিত্রা আমার হাতটা ধরে একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে—"অধীর হয়ো না, সিন্দুকের চাবীটাবীগুলো এই বেলা নিজের কাছে বুঝে নিও।"

বিস্ময়-বিহ্বল-মুখে তার পানে চেয়ে আমি "আচ্ছা" বলে ছুটে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রামা চাকর বল্‌লে—"দাদাবাবু, মোটর দাঁড়িয়ে আছে, উঠে পড়ুন।"

দ্রুতপদে গিয়ে মোটরে উঠে বস্‌লাম।

বাড়ী গিয়ে দেখি, মা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে আছেন—ওঃ, সে দৃশ্য আমি ভুলব না! অভাগিনী মা আমার! মায়ের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাক্‌লাম—"মা, মা গো!"

উত্তর নেই। কেঁদে ফেল্‌লাম। রামা কাছে এসে বল্‌লে—"ভয় নেই দাদাবাবু, মা মূর্চ্ছা গেছেন।"

মায়ের মূর্চ্ছা ভাঙাতে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। তাঁর চৈতন্য হবার পর লোক ডাক্‌তে বেরিয়ে গেলাম।

এসে দেখি সুমিত্রা আর তার মা মিসেস্ সেন এসেছেন। মিসেস্ সেন মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দেখ্‌লাম—মায়ের চোখে বিন্দুমাত্র জল নেই। উদাস দৃষ্টিতে শুধু বাবার পানে চেয়ে আছেন। আর সুমিত্রা বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন সব দেখে বেড়াচ্ছে। উঃ ভগবান! তারপর সব শেষ করে শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌তেই সুমিত্রা আমার কাছে এসে বল্‌লে—"তোমার বাবা উইল-টুইল কিছু করে গেছেন কি?"

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আমি তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। সুমিত্রা আবার ঐ প্রশ্নই করলে। রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লাম—"জানি না সুমিত্রা, এখন আমায় ঐ সব কথা জিজ্ঞেস করো না। তুমি মানুষ না কি!"

বিদ্রূপপূর্ণ-কণ্ঠে সে উত্তর দিলে—"না, জানোয়ার! ও সব ন্যাকামোর ধার আমি ধারি না—আমার কাছে সব স্পষ্ট কথা। দু'দিন বাদে যদি তোমার ঘর আমায় করতে হয়, তাই সব জেনে নেওয়া—তা' নইলে আমার মাথা ব্যথা কিসের! জিজ্ঞেস করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।"

উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে রইলাম। চোখ দিয়ে আমার বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরে পড়ল। সেই আমার প্রথম কান্না। ভাব্‌তাম, আমার মত কঠিন কেউ নেই—কিন্তু সেদিন আমি মেয়েছেলের মতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। কোথায় মায়ের কাছে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেব, তা' না করে আমি একজন সামান্য-নারীর মত অশ্রু বিসর্জ্জন করছি, আর অদূরে মা পাষাণ প্রতিমার মত বসে রয়েছেন! নীরবে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থেকে সুমিত্রা কোমলস্বরে আমায় বল্‌লে—"প্রদীপ, আমি যা' বল্‌ছি অন্যায় বলে মনে করো না। হাজার হোক্ উনি তোমার বিমাতা, তাই—"

বাধা দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লাম—"সুমিত্রা, তোমার হাত ধরে বলছি আমায় কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দাও।"

সুমিত্রা বোধ হয় বিরক্ত হয়ে চলে গেল, আর আমি দুঃখে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মায়ের পানে আর চাইতে পারলাম না—মিত্র-বংশের ভাবী বধূর স্বরূপ তাঁর সাম্‌নে প্রকাশ হ'য়ে পড়তে দেখে আমি ঘৃণায় লজ্জায় অধোমুখে বসে রইলাম।

হাত আর চলে না। ক্রমশঃ অবশ হয়ে আস্‌ছে। মনে হচ্ছে বুঝি সব অন্ধকার হয়ে এল। মিস্ রায় আমার নিকটে এসে দাঁড়ালেন। পেন্‌টা ফেলে রেখে আমি শয্যার উপর এলিয়ে পড়লাম। কিন্তু আবার

সেটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম উমাকে। আমি বুঝ্তে পারছি, আমার কণ্ঠস্বর স্বর অতি মৃদু, অতি অস্বাভাবিক।—"উমা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই বুঝি সব অন্ধকার দেখ্ছি? সন্ধ্যা আজ এরই মধ্যে হয়ে গেল যে?"

উমার গলা শুন্তে পেলাম—"কোথায় সন্ধ্যা মিঃ মিটার! এই ত মোটে বেলা তিনটে।"

অন্ধকার, অন্ধকার—মৃত্যু বুঝি ঘনিয়ে আসছে! ওঃ, সব অন্ধকার!

দুই

বড় দুর্ব্বল। উমার কাছে শুন্লাম আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলাম। কাল আমার মুখ দিয়ে 'ভল্ ভল্' করে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। হাত আর চলে না—কিন্তু ডায়েরীটা আমায় শেষ করতেই হবে।

উমা আমার জীবন-কাহিনী শুন্তে চায়। তাকে বলেছি—ডায়েরীতে আমার কথা সব লিখে যাব; আমি চলে গেলে সে যেন সেটা পড়ে দেখে।

মরতে আমার বড় ভয় হয়। এত ভয় হয় যে, আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করি—"এই অকালে আমায় এমন সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় দিও না ঠাকুর!"

জানি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে না। কাশি আসছে, নিশ্বাস ফেলতে পারছি না—পৃথিবীতে কি হাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল না কি? কি কাল রোগে আমায় ধরেছে সে আমি জানি। উমা আমায় সান্ত্বনা দেয়। বলে—"সেরে যাবেন প্রদীপবাবু, ভয় পাচ্ছেন কেন?"

মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে যে জোর পায় না সেটা বেশ বুঝ্তে পারি। কাল থেকে আমি ওর মুখটা অত্যন্ত শুক্নো দেখ্ছি। আমার যত হয়ে আসছে, আর ওর চোখ জলে ততই ভরে যাচ্ছে দেখে আমি হেসে বল্লুম—"উমা, তোমাকে এত ম্লান দেখ্ছি কেন? যেতে ত একদিন হবেই। তোমাদের এখানে বেশ ছিলাম। সত্যই বল্ছি—তোমার মত এত আদর-যত্ন আমি আমার মায়ের কাছ ছাড়া আর কোথাও পাই নি। তোমা[illegible] ঋণ—"

বাধা দিয়ে উমা আমায় বল্লে—"আপ[illegible] কি বল্ছেন প্রদীপবাবু!"

এই কথা বলে সে ঝড়ের মত ঘর [illegible] গেল।

স্পষ্ট দেখ্তে পেলাম তার [illegible] ফোঁটা চক্চক্ করছে। মনটা আমার [illegible] জীবনের এই সন্ধ্যায় কেন এমন একজন মমতাময়ী নারীর কাছে আমায় এনে দিলে ভগবান!

আমার মনের কোণে কেবলই একটা সন্দেহ উঁকি মারছে—উমা কি আমায় ভালবাসে? ভগবান, তা' যেন না হয়! কেন তুমি একজন মমতাময়ী সেবাপরায়ণা নারীকে ভালবাসার কুহকে ফেলে কষ্ট দেবে! উমার কথা ভেবে আমার মন কাতর হ'য়ে ওঠে।

উঃ, কত কষ্ট যে হয় আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখ্তে! কিন্তু যত কষ্টই হোক্, লিখ্তেই হবে। বাবা গত হবার পর জান্লাম বাড়ী দু'খানা একজনের কাছে বাঁধা আছে—চারিদিকে বিস্তর ঋণ। মাথায় আমার বজ্রাঘাত হ'ল। মাকে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বাড়ী দু'খানা বিক্রী এবং ঋণ কতকটা শোধ দিয়ে একখানা সস্তার ঘর ভাড়া করে মাকে নিয়ে সেখানে উঠে এলাম। একেই বলে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস—কাল রাজা, আজ ফকীর!

চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই—কিন্তু কোথায় চাকরী? অত যদি বাজার সস্তা হ'ত তা' হ'লে আজ আমার ভাবনা ছিল কি?

ইতিমধ্যে আমি সুমিত্রার অনেক কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি। সে রকম হাসি-খুসীভাব আর তার নেই। বুঝ্তে পারি না কেন সে আমার সঙ্গে আর পূর্ব্বের মত ব্যবহার করে না। বিস্মিত হ'য়ে দেখি আমার সঙ্গে না মিশে সে এখন প্রসাদ বোসের সঙ্গে বেশী মেশে। আমি তাদের বাড়ী গেলে সে বিরক্ত হয়। ভাবি, আমি আর আগেকার মত খরচ করতে পারি না [illegible]

[illegible]র এই ভাব? জানি না, ভগবান নারীর মন কি দিয়ে [illegible]ছেন!

সুমিত্রার ঐরকম ব্যবহার দেখে আমি মিঃ সেনের বাড়ী [illegible]ওয়া কমিয়ে দিলাম।

ওঃ, [illegible]গবানের কি দারুণ অভিসম্পাত হচ্ছে দারিদ্র্যতা! আমার এই প্র[illegible]তে পারি না! এ সব ঋণ যে কি ক'রে

মায়ের কথায় [illegible] মা শুষ্ক ম্লানমুখে আমার পানে "প্রদীপ, কি এত ভা[illegible] পারি তাঁর অন্তরে আমার জন্য কি [illegible] আমি অধীর হয়ে পড়ি, সে জন্য তিনি সেটা প্রকাশ করতে পারেন না।

একদিন আমি আর থাক্‌তে না পেরে বলে ফেল্‌লাম — "মা, আমাদের এত দেনা কি ক'রে হ'ল?"

মা মৃদুস্বরে যা' উত্তর দিলেন, তা'তে আমি বড়ই লজ্জিত হলাম। শুন্‌লাম, এত ঋণ হ'য়ে গেছল যে, সেটা ভোলবার জন্য বাবা না কি ইদানী খুব মদ খেতেন। মা অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বল্‌লেন—"প্রদীপ, উনি ব্যবসায় ফেল্ করলেন যখন, তখন আমায় বল্‌লেন —'তুমি যেন প্রদীপকে একথা বলো না। আমি আবার সব ঠিক্ দাঁড় করিয়ে নিচ্ছি।' জানি না তিনি কি ভাল বুঝ্‌লেন! তারপর তিনি মনের দুঃখে এই সর্ব্বনেশে মদ ধরলেন।"

মা আর বল্‌তে পার্‌লেন না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন। বাবা মারা যাবার পর এই তিনি প্রথম অশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। বাধা দিলাম না। ধীরে ধীরে সেখান থেকে আমি সরে এলাম।

দেনা, চারিদিকে দেনা! ঘরে চাল-ডাল নেই। বাড়ী ভাড়া বাকী। আমার যেন চারিদিক্ গোলমেলে [illegible]ঠেকুতে লাগ্‌[illegible] আর চাকরীর সন্ধানে বেরুই না। চাকরী খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। এম-এ ডিগ্রীটা কোন কাজেই লাগ্‌ল না। পাওনাদারেরা কড়া কড়া কথা বলে যায়; চুপ করে শুনে যাই। হঠাৎ আবার একদিন [illegible] ঝেঁড়ে উঠে পড়ি। ভাবি, বাবা একদিন যাদের এত উপকার করেছিলেন, এই দুঃসময়ে তাদের নিকট থেকে কোন প্রত্যুপকার কি আমি আজ পাব না?

বেরুতে যাচ্ছি, মা এসে বল্‌লেন—"প্রদীপ, বেরুচ্ছিস?"

বলল্‌াম—"হ্যাঁ মা।"

মা একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন—"যদি পারিস কিছু চাল আনিস। চাল বাড়ন্ত।"

"আচ্ছা" বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলাম। ভাবি, কৃতজ্ঞতা বলে মানুষের মনে একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। কখনই আমি শুধু হাতে ফিরব না—টাকা পেলে কাপড়-চোপড় কিন্‌তে হ'বে, জুতো একজোড়া। কিন্তু সব মিথ্যা! বাবা মদ খেতেন একথা যা' আমি এতদিন জান্‌তাম না, মাত্র সেদিন জেনেছি—বাড়ীর ছেলে হয়ে যা' জান্‌তাম না, বাইরের লোক সে সব ঠিক জানে দেখ্‌লাম। প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী থেকে শুন্‌লাম—"মদ খেয়ে বাপ সব উড়িয়ে দিয়ে ছেলেকে পথে বসিয়ে রেখে গেল, আর সেই মাতালের ছেলেটার এখানে ভিক্ষে কর্‌তে আস্‌তে লজ্জা কর্‌ল না!" ইত্যাদি।

আরও যা' নয় তাই বলে আমায় উপহাস আর অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলে। মায়ের কণ্ঠস্বর কানের কাছে ধ্বনিত হয়—"প্রদীপ, চাল বাড়ন্ত।"

হঠাৎ মনে পড়ে যায় মায়ের ত আজ একাদশী। আমিও না হয় মার সঙ্গে একাদশী করব—কিন্তু কাল কি হবে? হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল সুমিত্রার কথা। যাই, একবার তাদের বাড়ী যাই। চলি। কিন্তু মিঃ সেনের বাড়ীর কাছে এসে আর পা উঠ্‌তে চায় না। সুমিত্রাদের বাড়ীতে কিসের উৎসব। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। জীর্ণ মলিন বেশভূষা পরে ওদের বাড়ী যেতে লজ্জা করে। কিন্তু লজ্জা কেন? সুমিত্রা ত আমার অবস্থা সবই জানে—তবে লজ্জা কিসের? মনে ভাব্‌লেও ভিতরে 'ফস্' করে ঢুক্‌তে পারি না।

দারওয়ান আমায় চেনে। সে আমায় দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। বলে—"বাবুসাব, ই আপ্‌কো ক্যা হুই?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করি—"মিস্ সেন ভিতরমে হ্যায়?"

সে বলে—আছে। সঙ্কোচভরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকি।

বাইরে বিস্তর মোটর দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'ল একদিন ঐ রকম সারি সারি মোটরের মধ্যে আমার মোটরও দাঁড়িয়ে থাকত। হায়রে সেদিন! যাক্, অতিকষ্টে সুমিত্রাকে খুঁজে পেলুম। সে আমায় দেখে ঘৃনাপূর্ণস্বরে বল্‌লে—"প্রদীপ, আজ হঠাৎ এ বেশে আমাদের বাড়ীতে ?"

'দপ্' করে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে ভাব্‌লুম—আজ আমি ভিক্ষুক, আমার ঔদ্ধত্য দেখানো শোভা পায় না। মুখ তুলে চকিতে একবার সুমিত্রার পানে চাইলাম। দেখ্‌লাম, আমারি দেওয়া মূল্যবান অলঙ্কার সে আজ পরে আছে, আর সেগুলো যেন আমার পানে চেয়ে উপহাসের হাসি হাস্‌ছে।

মৃদুস্বরে বল্‌লাম—"আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি সুমিত্রা।"

তীক্ষ্ণ পরিহাসের স্বরে আমি সুমিত্রার নিকট হ'তে উত্তর পেলাম—"কি অধিকারে তুমি আমার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে এসেছ প্রদীপ ?"

লজ্জায় মাথাটা আমার নত হয়ে এল। তারপর জোর করে সেটা তুলে বল্‌লাম—"ভিক্ষুক ভিক্ষা সকলের কাছে করে—কোন্ অধিকার নিয়ে করে না। সুমিত্রা, আজ আমি সেই রকম তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—কোন অধিকার নিয়ে চাই নি। আর যদি অধিকারেরই কথা বলো, তবে—আমি এন্‌গেজ্‌ড্ রিংটা দেখিয়ে বল্‌লাম —"এই অধিকারে আমি চাইছি।"

হোহো করে সুমিত্রা হেসে উঠলো। দারুণ অপমানে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। সুমিত্রা আমার হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বল্‌লে—"আর আমাদের বাড়ী তুমি এসো না। আর যে অধিকার তুমি আমায় দেখালে, সে অধিকার আমি মানি না—এই দেখো তার প্রমাণ।" বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

দেখ্‌লাম আমার দেওয়া বাক্‌দত্ত আংটীটা সে খুলে ফেলেছে। সুমিত্রা আবার বল্‌লে—"তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে আজকাল আমার ঘৃণা হয়। মা গো মা, কি ময়লা কাপড়-চোপড় !"

সে যেন শিউরে উঠলো।

একবার মনে হ'ল নোটটা ফেলে দিয়ে চলে... কিন্তু মায়ের যে আজ একাদশীর উপবাস—কাল দ্বাদশী, খাবেন কি ? ফেল্‌তে পার্‌লাম না। সেই অপমান নীরবে মাথায় বয়ে নিয়ে আমি রাজপথে নেমে এলাম। ওঃ, ভগবানের কি দারুণ অভিসম্পাত ... মনে তাঁকে ডেকে বল্‌লাম—"... শেষ হয় নি ঠাকুর ? এখনো কি অভিসম্পাতের শাণিত খড়্গ ঝুল্‌ছে ?"

মন্দ কি ! নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে আমি পাগলের মত হাহা করে হেসে উঠলাম।

আর যেন লিখ্‌তে পার্‌ছি না—উঃ, কাশ্‌তে কাশ্‌তে রক্তে আমার রুমাল ভেসে গেল। মনে হচ্ছে যেন এখনই সব শেষ হয়ে যাবে। ভগবান, আর ক'টা দিন আমায় এই পৃথিবীতে রাখ! আমার ডায়েরীটা শেষ করে নিতে দাও! জ্ঞানে অজ্ঞানে কখন কাউকে মনঃপীড়া দিই নি; যে যা' চেয়েছে হাসিমুখে তাই দিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করেছি। যদি তা'তে আমার কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে দেবতা, তবে আমায় আর ক'টা দিন পৃথিবীতে ধরে রাখ! হাত কাঁপছে। আর যে পারি না! তবু আমায় আমার অতীত দিনের ব্যথায়-ভরা কাহিনী লিখে যেতে হবে। উমা পড়বে। হয় ত এই অভাগার জন্য তার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার উদ্দেশে ঝরে পড়বে। উমা কি আস্‌ছে ? প্রলাপ বক্‌ছি না কি ? যা' লিখ্‌ব না মনে কর্‌ছি, কে যেন আমায় জোর করে তা' লিখিয়ে দিচ্ছে। সুমিত্রা সুখী। সে জান্‌বে না যে, তার জন্য একটী যুবক অকালে, অতি অকালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। যদি সে আমার মৃত্যু-সংবাদ শোনে তা' হলে কি সে আমার জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে ? না, সে ফেলবে না—হয় ত তার দু' ফোঁটা অশ্রুর জন্যে আমার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

হাসপাতালটা সহর থেকে একটু দূরে।

করছে মাঠ। উদাস নেত্রে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমি সুমিত্রার কথা ভাবি।

রোজই দোশ আমার মত কত রোগী আসছে, তারপর সংসারের দেনা-পাওনা মিটিয়ে তারা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। আবার কেউ বা সেরে উঠে আমার এই প্রাঙ্গণ থেকে চলে যাচ্ছে। চোখের সাম্‌নে

মায়ের কথায় যা ভেসে ওঠে। এই ত সেদিন আমি "প্রদীপ, কি এত ভরেরই একটী শয্যা খালি করে একজন চিরজন্মের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে। তাদের মুখ মনে হলেই আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি।

বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। উমার বোধ হয় আজ থেকে 'নাইট ডিউটি।' উমার বদলে আজ মিস্ অরুণা সেন আমাদের ওষুধ খাইয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন আবার আমায় পূর্ব্ব-ঘটনা লিখ্‌তে হ'বে।

মিঃ সেনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমি আর কোথাও না গিয়ে একেবারে বাড়ী গিয়ে ঢুক্‌লাম। দেখি, বাড়ীওয়ালা বসে আছে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে দুটো দিনের সময় চেয়ে নিলাম। মায়ের হাতে নোটটা দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লাম—"মা, এই শেষ! এস আমরা মা বেটায় বিষ খেয়ে মরি! মরতে পারবে মা, ভয় করবে না ত তোমার?"

মা হাস্‌লেন। কি শান্ত স্নিগ্ধ উদাস হাসি! মায়ের পানে চেয়ে দেখি তাঁর চোখে জল। আমার মাথাটা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে তিনি বল্‌লেন—"প্রদীপ, মরবার ভয় তোর বাবার সঙ্গে চলেই গেছে। মৃত্যুকে ভয় আর আমি করি না। কিন্তু তুই পুরুষ মানুষ হয়ে সংসারের ঝড়-ঝাপ্‌টায় এত বিচলিত হলে চল্‌বে কেন? ভগবান না করুন, কিন্তু এখনও হয় ত তোর মাথার ওপর এর চেয়ে বেশী বিপদ ঝুল্‌ছে। এতে অধীর হতে নেই। ভয় কি বাবা?"

মায়ের বুকে মাথা রেখে আমি সেদিন নিতান্ত শিশুর মতই কেঁদেছিলাম। সমস্ত দিনের অপমান বিদ্রূপ আমি তাঁর বুকে মাথা রেখে ভুলে গেলাম। আর মায়ের চোখ দিয়ে পবিত্র অশ্রুবিন্দু আমার মাথায় আশীর্ব্বাদের মত ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।

তিন

তিন-চারদিন পরে আবার কলমটা হাতে তুলে নিলাম। এ ক'দিন আমি বড় দুর্ব্বল ছিলাম। সমানে একটানা ডায়েরী লেখার পরিশ্রমে আমায় বড় নিস্তেজ করে ফেলেছিল। আমার খুব সুবিধে হয়েছে উমার 'নাইট ডিউটি' হয়ে। তা' নইলে সে ডায়েরীটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিত। হাসপাতালে এমন আন্তরিক স্নেহ-মমতা আমার মত হতভাগ্য দরিদ্র যে কখন পাবে, এ আমি কল্পনাও করি নি।

মিস্ অরুণা সেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—উমা কোথায়, কি করছে? উত্তরে আমি শুধু তার মুখে এক আশ্চর্য্য রকমের হাসি দেখেছিলাম। মিস্ সেন যেন এক ধরণের মেয়ে! হাসপাতালটায় যেন সবই অদ্ভুত—এক-একটী নার্স এক-একরকমের।

মাস চারেক গত হয়ে গেছে। নির্ভাবনায় কাল কাটাচ্ছি; কারণ, আমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছি। বেকার। কাজের চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছি। সংসার চলে কি করে, যদি কেউ দয়া করে জিজ্ঞেস করেন, হেসে বলি—"আমার সোনার ঘড়ি বিক্রী করে আপাততঃ চালাচ্ছি।"

আবার যদি তিনি বলেন—"কতদিন এমন করে চল্‌বে?"

বলি—"যতদিন চলে চলুক ত।" বলে আমি নিতান্ত উপেক্ষাভরে তাঁর কাছ থেকে সরে আসি।

প্রদোষ মিত্রের ছেলে বলে এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে পারি নি। লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করে। রোজ রাত্রে মায়ের ঘুসঘুসে জ্বর হয়। ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য নেই। কোলকাতায় জোচ্চর বলে আমার দুর্নাম রটে গেছে। কেউ আর সহজে ঘর ভাড়া দিতে চায় না।

কোন কোনদিন হয় ত আমার ধনী আত্মীয়-স্বজন

মোটরে যেতে যেতে আমার পানে চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিদ্রূপ করে। সুমিত্রাও দু'-একদিন করেছিল। আমি কিন্তু নির্ব্বিকারভাবে চলে যাই। হাসি মনে মনে। সেটা সুখের কি দুঃখের বল্‌তে পারি না।

পাঁচ ছয়দিন পরে আমি মায়ের অসুখটা কি জান্‌তে পার্‌লাম। থাইসিস্‌। আমার মাথা ঘুরে গেল! মা যে আমার সব! চারিদিক থেকে আমার ঘাড়ে যখন অশান্তি চাপে, তখন তাঁর বুকে মাথা রেখে যে আমি শান্তি পাই। সে কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি!

মায়ের কথা ভেবে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি যখন কাশেন, তখন আমার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ী পেটে। মনে মনে বলি—"এমন অধম সন্তান হয়েছি মা, যে, তোমাকে একটা ডাক্তার দেখাতে বা একটুও ওযুধ খাওয়াতে পারি না!"

উঃ, এখনো মায়ের কথা মনে পড়লে বুকের ভেতর কি রকম করে ওঠে!

দিন চলে যায়। সেদিন আমি একজন ডাক্তারেব হাতে পায়ে ধরে মাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এলাম। তিনি এসে তাঁকে দেখে মুখ গম্ভীর করে 'প্রেস্‌ক্রপ্সন' লিখে দিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তার ত দেখালাম —কিন্তু ওযুধ-পথ্য পাই কোথা' থেকে?

ভাব্‌তে আর পারি না! মাকে বল্‌লাম—"মা, আমি এখুনি আসছি।" বলে বেরিয়ে গেলাম।

মা ইদানী শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছিলেন।

একটা ডিস্পেনসারীতে গিয়ে ওযুধটা ঠিক্‌ করে রাখ্‌তে বলে আমি সুমিত্রাদের বাড়ীর উদ্দেশে চল্‌তে লাগ্‌লাম।

বহুকষ্টে তার দেখা পেলাম। কিন্তু সে আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না—সেটা যে ইচ্ছা করে বেশ বুঝ্‌তে পারলাম। পরিচয় দিতে লজ্জা হতে লাগ্‌লো—কিন্তু বাধ্য হয়ে জানাতে এবং সব বল্‌তে হ'ল। আমার কথা শুনে সে নাক্‌ সিঁটকে বল্‌লে—"তোমার মা মর্‌ছে ত আমার কি? ও সব আমার কাছে হবে না। একবার পাঁচ টাকা নিয়ে গেছ্‌লে, আজ অবধি তা' শোধ দাও নি। আমি তোমায় বারবার টাকা দান করব ভেবেছ? সোহাগ যে উথ্‌লে উঠেছে দেখ্‌ছি!"

মিসেস্‌ সেন বেরিয়ে এসে সব কথা শুনে মেয়ের মতই উত্তর দিয়ে তিনি চলে গেলেন। এখন টাকা পাই কোথায়? আজ আমার অন্ততঃ আটটা টাকা চাই! মার ওযুধ আর কিছু পথ্য আজ হবে! কাতরভাবে আমি সুমিত্রা[illegible] ছি, ছি, লিখ্‌তে লজ্জা করে! সে [illegible] আমায় তার পায়ের জুতো খুলে মার্‌[illegible], এ [illegible] অপমান! ক্রোধে আমার অন্তরাত্মা জলে উঠলো। পায়ের জুতোটা খুলে হাতে উঠিয়ে নিলাম—পরক্ষণে গভীর লজ্জায় সেটা ফেলে দিলাম। বিপদ, ঘোর বিপদ আমার সাম্‌নে! সুমিত্রার হাত ছেড়ে দিয়ে আমি তাকে দারোয়ান ডাক্‌বার অবসর না দিয়ে ঝড়ের মত সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সুমিত্রার চেয়ে অপমান আর আমায় কে করতে পেরেছে! হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই এন্‌গেজ্‌ড্‌ রিংটার দিকে। এখনো আমার হাতে তার আংটীটা রয়েছে? হাহা করে হেসে উঠলাম। মনে মনে বল্‌লাম— "ভগবান, তুমি আছ! তোমাকে অবিশ্বাস আমি অনেক সময় করেছি—আজ কিন্তু বল্‌ছি তুমি আছ!"

আংটীটা দশ টাকায় বিক্রী করে মার ওযুধ আর পথ্য নিয়ে আমি যেন হাওয়ায় উড়ে চল্‌লাম। বাড়ী গিয়ে দেখি মা আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে শুয়ে আছেন। হেসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি রান্নার জন্য উনান ধরাতে বস্‌লাম। কিন্তু সেদিন কি হয়েছিল জানি না, আঁচটা মোটেই উঠ্‌ল না। এক পয়সা মুড়ি কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। মা শুধু অসহায়ভাবে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ একদিন বাক্স ঘাঁটুতে ঘাঁটুতে বাবার একটা আংটী দেখ্‌তে পেলাম। মা এতদিন সেটি অতি যত্নে তুলে রেখে ছিলেন। তাঁকে বল্‌লাম—"মা, আংটীটা বিক্রী করতে হবে।"

হায়রে, এত নিষ্ঠুর, এত পাষাণ আমি! মায়ের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও জোর করে আংটিটা বিক্রী করবার অনুমতি নিলাম। মাথায় আমার তখন রক্ত চড়ে [illegible]

—মাকে আমার চাই। মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকে বল্‌লাম—"ভগবান্‌, সর্ব্বস্ব গেছে, কোনদিন কিছু বলি নি। আজ তোমার কার্য্যের আমি সর্ব্ব প্রথম প্রতিবাদ করব—মাকে আমার চাই, তুমি নিতে পারবে না! সব দিয়েছি, কিন্তু মাকে আমি দিতে পারব না! দয়াময়, আজ তুমি আমার এই প্রার্থনা রাখ!"

মায়ের কথায় আমার চমক ভাঙ্‌ল। মা বল্‌লেন—"প্রদীপ, কি এত ভাব্‌ছিস?"

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বল্‌লাম—"মা, আমার মত কুপুত্র আর কারও নেই। এমনি অধম আমি যে, তোমার অসুখে ওষুধ খাওয়াতে বা একটা ডাক্তার দেখাতে পারছি না।"

মা হাস্‌লেন। কিন্তু তাঁর চোখে জল টল্‌টল্‌ করছিল। বল্‌লেন—"ওরে পাগলা, অনেক তপস্যা করে তোর মত ছেলে পেয়েছি। তোর মত যদি সকলকার কুপুত্র থাক্‌ত, তা' হ'লে আজ ঘর ঘর সুখের সংসার হ'ত। আমার অদৃষ্ট ভাল যে, ঐ ওষুধগুলো গিল্‌তে হয় না। সময় হয়ে এসেছে, ডাক পড়েছে, তাই যাচ্ছি, এতে দুঃখ কি—ও কি, তুই যে কেঁদে ফেল্‌লি!"

আমি চোখ মুছে মায়ের মাথার শিয়রে এসে বস্‌লাম।

আর লিখ্‌তে পার্‌ছি না। সন্ধ্যারাণী কখন যে ধরণীর বুকে আপনার কৃষ্ণবর্ণ চেলাঞ্চলখানি টেনে দিয়েছেন জান্‌তে পারি নি। উমার আস্‌তে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। হায়, এ সময় মাকে যদি কাছে পাই! মনে হচ্ছে এখনি বুঝি তাঁর সুশীতল কোমল হাতখানি আমার কপালের উপর এসে পড়বে—কিন্তু কোথায় মা! মা আজ ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে! আমার স্থান সেখানে কোথায়!

চার

উমার জ্বালায় অস্থির। সে আবার সকালের ডিউটি নিয়েছে। বুঝি আমায় আমার ডায়েরী লেখার হাত থেকে বিশ্রাম দেবে বলে।

কেবলই মনে হচ্ছে, ডায়েরীটা আমি আর শেষ করতে পারব না। কালকের লেখা পাতাটা আমি পড়ে দেখ্‌লাম। যেন আমি ঘুমের ঘোরে কেবলই মাকে ডেকে গিয়েছি। এ কি, আমার এ অদৃশ্য শক্তি এলো কোথা থেকে—যা' লিখ্‌তে চাই তার চেয়ে অনেক বেশী লিখে ফেল্‌ছি! মাকে আমি অহর্নিশি খুঁজ্‌ছি। উমা, অরুণার মুখে শুনেছি আমি না কি রাত্রিবেলা ঘুমের ঘোরে "মা, মা" করে ডাকি।

উমাকে দিয়ে ডায়েরীর বাকী পাতাগুলো লেখাতে হবে। আমার দ্বারা আর হয়ে উঠবে না দেখ্‌ছি। যতক্ষণ পারি প্রাণের সমস্ত শক্তি অর্পণ করে লিখে যাই। কাল পরশুর মধ্যে হয় ত উমা আর প্রদীপ মিত্রকে দেখ্‌তেই পাবে না।

আমার দেহটা হয় ত মাঠে ফেলে দেবে। আর শেয়াল-কুকুর, শকুনি-চিলের ভোজ লেগে যাবে। কেউ প্রদীপ মিত্রকে খুঁজতে কিংবা তার দেহটার সৎকার করতে আসবে না। এ মন্দ কি! প্রাণ দিয়ে সকলকার দুঃখ-কষ্ট যতটা পারি মোচন করে এসেছি, আর কাল-পরশুর মধ্যে নিজের দেহটা দিয়ে শেয়াল-কুকুরের ক্ষুধা কতকটা লাঘব করব। সময় আর আমার নেই, যতটা পারি এই বেলা লিখে ফেলি।

মায়ের অসুখ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বাবার আংটিটা বন্ধক রেখে দশ টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরছি। সন্ধ্যা হয় হয়। এক হাতে মায়ের জন্যে আঙুর আর এক হাতে ওষুধের শিশি। হঠাৎ আমার কানের কাছে একটি কোমল কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল—"বাবু, কিছু পয়সা দেবেন?"

হাসি পেয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লাম—ন' দশ বছরের একটি সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে। চোখ দু'টি তার বিষাদ-মাখা। কোঁকড়া কোঁকড়া সুন্দর চুল। এক কথায় চমৎকার মেয়েটি!

সে আমার কাছে আবার পয়সা চাইল। জিজ্ঞাসা করলাম—"এই সন্ধ্যাবেলায় ভিক্ষে করবার মানে কি?" আমার কথাটা বোধ হয় রূঢ় হয়ে গেছ্‌ল; কারণ, মেয়েটি আমার কথায় কেঁদে ফেলে বল্‌লে—"আমার

মায়ের বড় অসুখ—যায় যায়। তাই রাত্রিবেলা ওষুধের পয়সার জন্যে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি।"

তার কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা বিষাদে হাহাকার করে উঠলো। আর কোন কথা না বলে আমার হাতে যা' কিছু টাকা-পয়সা ছিল সব তার হাতে দিয়ে দিলাম। মনে মনে বল্‌লাম—"ভগবান, আমার ভুল হয়েছে। শুধু আমি নয়, এই ছোট মেয়েটিকেও তুমি আমার মত অবস্থায় ফেলেছ। সকলে তোমায় দয়াময় বলে—জানি না, তুমি এস্থলে কি দয়ার পরিচয় দিচ্ছ!"

আমি টাকা-পয়সা সব দিয়ে দিতে মেয়েটি অবাক্ হয়ে গেল। সে আমার মুখের পানে অনেকক্ষণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল। শেষে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—"বাবু, আপনি রাগ করে দিচ্ছেন কেন? আমি ত আপনার কাছ থেকে এত চাই নি। নিয়ে নিন্। আমি আপনার টাকা-পয়সা কিছু নেবো না।"

চোখে আমার জল এসে গেল। প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে বল্‌লাম—"না বোন্, আমি রাগ করে তোমায় দিই নি। তুমি সব নিয়ে নাও। চলো, তোমার সঙ্গে গিয়ে মাকে দেখে আসি। মা যে কি জিনিষ, সে আমি ভাল রকম জানি!"

গিয়ে দেখ্‌লাম তারা আমাদের চেয়েও দরিদ্র। আর আমার মায়ের যা' রোগ, মেয়েটির মায়েরও সেই এক রোগ, একই অবস্থা। সব টাকা-পয়সা দিয়ে আমি চলে এলাম। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বল্‌লাম—"আমার বিশ্বাস ছিল পৃথিবীতে আমার মত অবস্থা তুমি আর কারও কর নি—তাই বুঝি আজ আমার চোখে আঙুল দিয়ে এই দৃশ্য দেখিয়ে দিলে?"

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই মনে হ'ল মায়ের জন্য এখন কি নিয়ে যাব? চারিদিকে শূন্য দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট ভেবে নিজের কি করা কর্ত্তব্য বেছে নিলাম। এতদিন বৃথাই সকলকার খোসামোদ করে এসেছি। শরীরে জোর আছে—আজ সন্ধ্যার সময় কি কিছু পয়সা রোজগার করতে পারব না? রিক্ত হস্তেই কি ঘরে ফিরে যাব?

হঠাৎ দেখ্‌লাম আমার জমিদার কাকা ঠিক্ আমারই সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে পাঁচটা টাকা চাইলাম।

বিদ্রূপের হাসি হেসে তিনি উত্তর দিলেন—"আরে মলো যা', সন্ধ্যার সময় মদ গিলে টাকা চাইতে এসেছে! দূর দূর!"

মাথায় আমার খুন চেপে গেল। সজোরে তাঁর গলা টিপে ধরে আমার পকেট থেকে 'মাণি ব্যাগটা' ছিনিয়ে নিলাম। কাকা চীৎকার ক'রে উঠলেন। চারিদিক্ লোকে—লোকারণ্য হ'য়ে গেল।—"পুলিশ, পুলিশ!"

ধীরে ধীরে আমার মাথা যেন ঘুলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। বেশ মনে আছে আমার মুখ থেকে অস্ফুট-স্বরে বেরিয়ে এল—"পার্‌লাম না মা, তোমায় পথ্য দিতে! আর বোধ হয় দেখা হবে না! এই শেষ!"

তারপর ধীরে ধীরে আমি জ্ঞান হারালাম।

পাঁচ

তিনটি বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করে আমি বেরিয়ে এলাম। মা, মা কোথায়! নেই, মা নেই! তিনি সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বাইরে চলে গেছেন!

কোথাও এককণা অন্ন পাই না; কারণ, আমি চোর, ডাকাত। কলেজে পড়বার সময় কি একটা বইয়ে "মানুষই মানুষের উপর অত্যাচার করে" এইটা পড়ে হেসে ছিলাম। ভেবেছিলাম, মানুষ মানুষই—তারা শয়তান নয়! মানুষ কখনো শয়তান হতে পারে না! এখন দেখ্‌ছি মানুষ শয়তান—তাদের প্রাণে মায়া-দয়া বলে কিছু নেই—আছে শুধু কৃতঘ্নতা আর নিষ্ঠুরতা!

উঃ, দু' মুঠো অন্নের জন্য আমি কি না করেছি! প্রদোষ মিত্রের ছেলে হ'য়ে শেষে লোকের বাড়ী চাকর পর্য্যন্ত হয়েছি!

সেখানেও কিছুদিন পরে জেল-ফেরৎ জান্‌তে পেরে তারা আমায় তাড়িয়ে দিলে। ধিক্, শত ধিক্ আমাকে! মনে ঘৃণা এসে গেল। তারপর ভবঘুরের মত

ঘুরে ঘুরে এখন আমি এই হাসপাতালে—আমার জন্মভূমি হতে আজ কত দূরে!

জেল হ'তে বের হলাম 'থাইসিস্' নিয়ে। সকলে আমার বুক ভেঙে দিয়েছে—সুমিত্রাই তার মধ্যে প্রধান। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে বুক দেখাতে সেখানকার ডাক্তার বল্‌লেন—আমায় না কি অনেক দিন ধরেই 'থাইসিস' আক্রমণ করেছে। জেলে থাকতে ব্যায়রামটা আরও বেড়ে উঠেছে। আর পার্‌ছি না! এখনো অনেক লিখ্‌তে বাকী। ডায়েরীর পাতা সাত-আটখানা যে শাদা রয়েছে। ওগুলো আর ভর্ত্তি হবে? তা' মনে হয় না। এ কি, চোখে অন্ধকার দেখি কেন?

ও কি, কে গান গাইছে? উমা, উমা! চোখ তুলে চাইলাম। দেখি সে আমার পাশে বসে রয়েছে। তার একটা হাত ধরে আমি লিখে যাচ্ছি।

ঐ, আবার—বাঃ, কি মিষ্ট গান!

"দুঃখ মিছে কান্না মিছে
দু'দিন আগে দু'দিন পিছে।"

আর শুন্‌তে পাচ্ছি না যে! না, এই যে আবার শুন্‌তে পাচ্ছি—কি সুন্দর, কি মধুর!

"জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে।
অসীম ঘন নীরবতায়, উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি একই খেলা চলেছে নিয়ত—"

ছয়

উমার ডায়েরীর এক পাতা

প্রদীপের হঠাৎ কলম থেমে যেতে দেখে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। ডাক্‌লাম—"প্রদীপ, প্রদীপ!

দেখি, প্রদীপ নিবে গেছে! শাদা পাতাগুলোর একখানা আমার কথা দিয়ে ভর্ত্তি করেছি। চোখে আজ আর জল নেই। প্রদীপকে আমি সত্যই ভাল বাসতাম। তারই ডায়েরীর খাতার পাতায় এই কথাটা লিখে দিলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার গান! জীবনে বোধ হয় এত সুন্দর গান শুনি নি কখনো। প্রদীপের মুখ থেকে আমি শুন্‌তে পেলাম, সে বল্‌ছে—"অন্ধকার! মা, সুমিত্রা, আমার উমা!"

প্রাণ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যের বিষয় গানও থেমে গেল। প্রদীপ, প্রদীপ, জানি না কোন্ সুমিত্রা তোমার বুক ভেঙে দিয়েছে। যে সুমিত্রাই হোক্, ভগবানের অভিসম্পাত তার মাথায় যেন বজ্রের মতই ভেঙে পড়ে। একদিন যেন সে তোমার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়। তোমার যেমন সে বুক ভেঙে দিয়েছে, তার বুকও যেন তেমনি ভেঙে পড়ে। বহু কষ্টভোগের পর আজ তুমি মুক্তি পেলে। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—পৃথিবীতে তোমার মত হতভাগ্য হ'য়ে কেউ যেন কখনো না জন্ম গ্রহণ করে। পরপারে গিয়ে এবার যেন তুমি সুখী হও!

এ কি আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন—এ কি সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি কেন! প্রদীপ নেই বলে কি? ভগবান, এ কি খেলা তোমার! আলো দাও! ভগবান, আলো দাও গভীর অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলোক-রেখায় আমায় পথ দেখাও ঠাকুর!—প্রদীপের আলোয় আমায় পথ দেখাও!

শ্রীশোভারাণী দেব

উপন্যাস

বন্দিনী নারী

শ্রীমতী সরলা দেবী

[পূর্ব্বানুসরণ]

আট

আট-দশদিন বাদে বৈকালে রাস্তায় ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছিল। হরি বিনোদকে ডাকিয়া কাণে কাণে কহিল—"দেখ্ ভাই, একটা নতুন খেলা খেল্বি?"

—"কি?"

—"এই সুপুরি গাছের ছালটা যেন আমাদের মাছ ধরবার জাল হবে, আর এই যত্নে যেন হবে মাছ। চ', জাল দিয়ে ঘিরে মাছটাকে ডাঙায় তুলি গে।"

যতীন অন্যমনস্কভাবে ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল। তাহারা হঠাৎ সুপারী গাছের ছাল দ্বারা তাহাকে ঘিরিয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়া টানিতে সুরু করিল। সেই হেঁচ্কা যতীন সাম্লাইতে পারিবে কেন? টান সাম্লাইতে না পারিয়া সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। হরি ও বিনোদ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে, প্রকাণ্ড রুই মাছ জালে পড়েছেরে, তোরা সবাই দেখে যা'।"

যতীনের মুখ হাত পা ইটের ঘস্ড়ানিতে ছড়িয়া গিয়াছিল। সে একরোখা ছেলে। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কাজেই সে দুই হাতে ইট্ কুড়াইতে লাগিল। হরি ও বিনোদ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। রাধা এতক্ষণ দর্শক ছিল। সাম্নের বাড়ীর রোয়াকে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিশ্চিন্তভাবে খেলা করিতেছিল। রাধা পলকের জন্য সেইদিকে চাহিয়া দেখিল—যতীন যদি ইট ছোঁড়ে তাহা হইলে আগে সেই নিরাপরাধ শিশুদের লাগিবে। নিঃশব্দে পিছন হইতে রাধা যতীনের ঢিলশুদ্ধ হাত দু'টা চাপিয়া ধরিল।

তাহার পর যাহা আরম্ভ হইল, সে এক ভীষণ ব্যাপার! যতীন ক্ষমতাবান বলিষ্ঠ ছেলে। দুইজনে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইয়া গেল। হাত ধরিবামাত্র যতীন উহা ঘুরাইয়া ঢিল ছুঁড়িল। লক্ষ্য অব্যর্থ। রাধার কপাল ফুলিয়া উঠিল। ক্রমে যতীন তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া উল্টি পালটি খাওয়াইয়া দিল—প্রায় উলঙ্গ হইবার যোগাড়। ছেলের দল মজা দেখিতেছিল। ঘটনাক্রমে আবার সেদিন

বিপিনবাবু সেই পথের পথিক হইয়াছিলেন। তিনি দুই হাতে দুইজনকে ছাড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"ব্যাপার কি ?"

ছেলেরা শতমুখে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল। তিনি রাধার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"বাঃ, বেশ বেশ, আজকালকার দিনে এই ত চাই! চল মা, তোমাদের বাড়ী যাই।"

শিশির রাধার কাণে কাণে কহিল—"দিদি, এঁকে চিন্‌তে পেরেছিস ?"

রাধা কহিল—"না।"

—"উনিই ত তোকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছেন। তুই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি তা' জান্‌বি কি করে।"

বাড়ী আসিয়া দুইজনে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—"মা, পিসীমা, দেখ্‌বে এস, কে এসেছেন।"

নলিনী বাড়ী ছিল না। চারুশীলা যদিও বধূ, তথাপি বিপদের দিনে জ্ঞানশূন্যভাবে যাঁহার সম্মুখে বাহির হইয়াছে, আজ তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিতে পারিল না। একখানা আসন আনিয়া রোয়াকে পাতিয়া দিয়া কহিল—"বসুন। আপনি তা' হলে দয়া করে মনে রেখেছেন।"

—"মনে না করে উপায় নেই, আপনার মেয়েটি যে অসামান্য। আজ আবার এক কাণ্ড করে বসেছিল।"

মৃদু তিরস্কারের সুরে চারুশীলা কহিল—"কি করেছিলি পাজী মেয়ে ? তুই কি আমায় স্বস্তিতে থাকৃতে দিবি না ?"

আসনে বসিয়া রাধাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বিপিনবাবু কহিলেন—"থাক্, থাক্, বকৃবেন না। আজকালকার দিনে এমন একটু-আধটু সাহসী না হলে চলে না। এখন আসল কথা বলি, আপনার মেয়েটি সুলক্ষণা, গুণও নিজের চোখে দেখ্‌লুম, হৃদয়ও আছে। আমি এটিকে আমার ছোট ছেলের জন্যে ভিক্ষে চাই। আপনাদের মত হবে কি ?"

পুরুষের কণ্ঠস্বরের আওয়াজ পাইয়া নলিনীর মা বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কহিলেন—"উনি কি বল্‌ছেন বৌমা ?"

আনন্দাপ্লুতস্বরে চারুশীলা কহিল—"উনি দয়া করে রাধাকে নেবেন—ওঁর ছোট ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে।"

আগাইয়া আসিয়া নলিনীর মা বলিলেন—"সে আপনার দয়া, আর রাধার ভাগ্য। এ অঞ্চলে আপনার নাম জানে না এমন লোক খুব কম আছে। কিন্তু একটিমাত্র হর্ত্তুকি পণ যদি নেন, তবেই আমাদের ভাগ্যে এ আশা সফল হবে।"

—"তাই, তাই নেব। এতে আপনারা কিন্তু হচ্ছেন কেন ? ভগবানের দয়ায় আমার এমন কিছু অভাব নেই যে, ছেলের বিয়েতে দাঁও খুঁজব।"

অতঃপর বিবাহের বিষয় নানা কথাবার্ত্তা কহিয়া রাধার ঠিকুজি লইয়া তিনি বিদায় লইলেন। চারুশীলা সযত্নে তাঁহাকে জল খাওয়াইতে ভুলিল না।

রাত্রে অত্যধিক আনন্দে চারুশীলার রজনী প্রায় বিনিদ্রভাবেই কাটিল। ঘুমন্ত কন্যার মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিল—"ভগবান, যদি মুখ তুলে চেয়েছ ত আমার এই প্রার্থনা সফল কর—ও যেন স্বামীভাগ্যে সুখী হয়।"

নয়

বিবাহের কথা গতকল্যও স্বপ্নের অতীত ছিল। ইহার জন্য এক-একসময় চারুশীলা ভাবিয়া আকুল হইত—অর্থাভাবে না জানি কোন 'হা-ঘরে' গিয়া মেয়েটা সারাজীবন জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিবে! এতদিনে তাহার কন্যাদায় চিন্তার অবসান হইল। সৌভাগ্য আপনি আসিয়া দরজায় উপস্থিত!

কিন্তু খুড়ীমা বুড়ামানুষ, মুখের কথা বলিয়াই খালাস। তাই বলিয়া শুদ্ধমাত্র হর্ত্তুকি ভরসা করিয়া মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। বাহুল্য না থাকুক, প্রয়োজনীয় খরচ ত করিতেই হইবে।

সতীশ সাফ্ জবাব দিল—"আমার একটি পয়সাও নেই, আমি কি করে কি করব! তুমি বিপিনবাবুকে বল্‌লেই পারতে, তিনি ঘরের পয়সা খরচ করেই বৌ নিয়ে যেতেন।"

অভিমানে চারুশীলা আর কোনো কথা বলিল না।

কথাটা সরস্বতী শুনিতে পাইয়া কহিল—"সে কি !

কার মেয়ের বিয়ে—তোমার না অন্য কারও? এক ত তাঁরা কিছু নেবেন না। শুধু বিয়ের রাত্রের খরচ।—এ তোমায় করতেই হবে।"

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সতীশ কহিল—"মাছের মায়ের পুত্রশোক!"

"সত্যি ভুলে গেছ্‌লুম যে, আমার কিছু বল্‌বার অধিকার নেই।"

পরে না কি সতীশ তাহাকে বলিয়াছিল—"দেখ্‌লে ত সেই ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল, আর আগে যদি আমি ঘাড় পাততুম ত দেনায় মাথা বিকিয়ে যেত।"

দত্তদের বড়গিন্নী, অর্থাৎ মান্থর মা তাঁহার প্রকাণ্ড দেহখানি কস্তাপাড় শাড়ীতে ঘিরিয়া এবং এক শ' ভরি সোনায় মুড়িয়া পান দোক্তার ডিবে হাতে করিয়া দুপুরবেলা আসিয়া বলিলেন—"বৌমা, শুন্‌লুম রাধু দিদির বিয়ে, আর তুমি না কি মহা ভাবনায় পড়েছ? ভাবনা কি মা! তাঁর কাজ তিনি করবেন, তুমি আমি কি করতে পারি! এই যে পান্থ আমার সেদিন জলে ডুবে গিয়েছিল, ভাগ্যে আমার রাধু দিদি উপলক্ষ্য ছিল, তাই ত! তা' সেও তাঁর খেলা!" বলিয়া তিনখানা দশ টাকার নোট তিনি চারুশীলার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন—"আপত্তি করতে পারবে না মা, তা' হলে পান্থর আমার অকল্যাণ হবে। এইতে উপস্থিত আশীর্ব্বাদের খরচ চালাও, তারপর বিয়ের রাত্রের খরচও আমি দেব।"

প্রয়োজনটা কতবড় স্মরণ করিয়া চারুশীলা আপত্তি করিতে পারিল না। কন্যাকে কহিল—"প্রণাম কর।"

—"থাক্, থাক্, এস দিদি, রাজরাণী হও!" বলিয়া প্রণতা রাধাকে তুলিয়া পান্থর মা কহিলেন—"আজ উঠি মা, আবার আসব। সংসার ফেলে আমার এক মিনিট ত নড়বার যো নেই।"

পাত্র কন্যা আশীর্ব্বাদের পর যখন বিবাহের আর দুই দিন মাত্র দেরী আছে, তখন একদিন ঠিক্ দুপুরবেলা একখানা ঠিকা গাড়ী অনেক কিছু লগেজ-পত্র, একজন নেপালী মহারাজ ও তাহার দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠকায় বাঙ্গালী মনিবকে বহন করিয়া রাধাদের দরজায় আসিয়া হাজির হইল এবং অচিরে তাহার ফল হইল এই যে, বিবাহের রাত্রে পান্থর মায়ের দয়া বা অর্থ গ্রহণের আর কোনই প্রয়োজন হইল না।

যে আসিল সে জিতেন, নলিনীর স্বামী। সকলে মহা আনন্দে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। রমা জিতেনের সহোদরা। মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। দিবারাত্র নানাবিধ কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিল।

তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহাপ্লুতস্বরে জিতেন কহিল—"তুই যে আমার চাইতে বড় হতে চলেছিস্ রে, ঢ্যাঙাত কম হস নি!"

নলিনী কহিল—"তা' ঢ্যাঙা হবে না, বয়স হচ্ছে না।"

—"দাদা, তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ।"

—"এই সেরেছে! দাদার একটি ভুঁড়ি না দেখ্‌লে তোমার কি তৃপ্তি হয় না দিদি!" পরে পত্নীর দিকে চাহিয়া জিতেন কহিল—"রমা যা' চিঠি লিখ্‌ত তার পনের আনা কথা হ'ত আমাকে স্বাস্থ্য-বিষয়ে সাবধান থাক্‌বার উপদেশ। সেগুলো তুমি শিখিয়ে দিতে, না ওর ওই ছোট মাথা থেকে বেরুত বলো ত?"

—"একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!' তোমার বিদ্বান বোন্ দাদার ভাবনায় অস্থির হ'য়ে যে চিঠি লিখ্‌ত, তা'তে আমার মত মুখ্যু ভাজের কোন উপদেশ দেবার দরকার হ'ত না।"

চারুশীলা কারিগরদের খাওয়াইতে ব্যাপৃত ছিল। এতক্ষণে অবসর হওয়ায় অঞ্চলে হাত মুছিতে মুছিতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'বৌদি', ভেবেছিলেন বুঝি চুপিচুপি মেয়ের বিয়ে দেবেন, কিন্তু তা' পারলেন না ত! লুচির গন্ধে সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে ছুটে এলুম!"

—"সে আমাদের পরম সৌভাগ্য ভাই।"

দশ

পিসেমশায়ের দেওয়া গা সাজান গহনা পরিয়া ধুমধামের সহিত রাধার বিবাহ হইয়া গেল। তারপর যোড়ে

ঘুরিয়া রাধা শশুরবাড়ী গেলে বিপিনবাবু আর তাহাকে পাঠাইলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বধূ লইয়া বিদেশে থাকে। এক্ষণে ছোটবধূ ঘর আলো করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, এই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কাজেই তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া তিনি পুনরায় গৃহ অন্ধকার করিতে নারাজ।

হর্ষ বিষাদে চক্ষে অঞ্চল মুছিয়া চারুশীলা কহিল—"না পাঠায় জোর করবার দরকার নেই। সেখানে সে সুখেই থাকবে।"

গল্পে রাজার মেয়ে নিজের ভাগ্যে খাইয়াছিল। তাহার মত হতভাগিনী নারীর—যে বেশ্যার অনুগ্রহে উদর পূর্ত্তি করে, এ হেন দীনার কন্যা হইয়া সে যে ধনী ঘরের আদরিণী বধূ হইল একেই বলেভাগ্য! বারবার চারুশীলার এই কথাই মনে হইতে লাগিল।

সেদিন বিকালে চা পান করিতে-করিতে জিতেন কথাটার পুনরাবৃত্তি করিল—"আচ্ছা বৌদি', সত্যি করে বলুন ত আমাকে, বিন্দুমাত্র খবর দেন নি কেন?"

—"তুমি এত মহৎ ভাই যে, এখন বলতে আমার একটুও লজ্জা নেই। গরীবের অভিমানটা কিছু বেশী হয়। আমার কেবলই মনে হতো, তোমাকে জানালেই বুঝি ভাববে আমি ভিক্ষা চাইছি। কিন্তু সত্যি করে বলছি, তোমায় অত নীচু ভেবেছিলুম সে কথা মনে হলে এখন আমি লজ্জায় মরে যাই।"

—"কিন্তু স্বামীর ধনে স্ত্রীর ত পূর্ণ অধিকার?"

কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া চারুশীলা কহিল—"কেন ভাই?"

—"আপনি না জানান, আপনার ননদটি ত জানাতে পারত; কিন্তু সেও একবারে চুপচাপ। রমার পত্রে জানতে পেরে পাওনা ছুটি আর জমান টাকা নিয়ে জাহাজে উঠে পড়লুম। এসে দেখি যা' ভেবেছিলুম তাই—দাদা একেবারে সরে দাঁড়িয়েছেন! ভাগ্যে এলুম, তাই কুটুম-বাড়ী মান-মর্য্যাদা বজায় রইল। মেয়েটাকেও কখন খোঁটা খেতে হবে না 'হা ঘরের মেয়ে' বলে। তোমার কিন্তু একটু জানান উচিত ছিল।" বলিয়া জিতেন কর্ম্মনিরতা পত্নীর দিকে চাহিল।

—"আমি কেন জানাই নি সে কথা তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা করলে জবাবটা ভাল পেতে।" বলিয়া নলিনী মুখ টিপিয়া হাসিল।

—"রমাকে বলতে হবে কেন ভাই, চেষ্টা করলে বোধ হয় জবাবটা আমিও দিতে পারি। মেয়েদের বাপের বাড়ীর বিষয়ে মর্য্যাদা-জ্ঞান কিছু বেশী হয়, আর সেই জন্যেই ঠাকুরঝি তার দাদার অক্ষমতা তোমার কাছে ঢাকতে চেয়েছিল।"

—"গতস্য শোচনা নাস্তি।' ও কথার আর দরকার নেই। কিন্তু আপনি যে গরীব বলে বিনয় প্রকাশ করলেন, অতটা বিনয় না দেখালেই চলত।"

—"আমি বিনয় দেখিয়েছি?"

—"নিশ্চয়ই! আপনার মত সম্পদ আমাদের জাতে ক'জন মেয়ের আছে বলুন ত?"

মূঢ়ের মত চারুশীলা পুনরায় কহিল—"আমার সম্পদ আছে?"

—"আছে! আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি নিজের সম্পদের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে, আপনার মত নারী কি করে বেশ্যার দোরে হাত পাততে গিয়েছিল।"

—"এ খবরও শুনেছ দেখছি! কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল ভাই?"

—"উপায় ছিল অনেক। কিন্তু আপনি চেষ্টা করে দেখেন নি। শুনেছি আপনি ম্যাট্রিক অবধি পড়েছিলেন।"

—"ম্যাট্রিক নয়, সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলুম।"

—"বেশ, তাই। তারপর শিল্পকাজ জানেন, গান-বাজনা জানেন।"

—"না, শিল্পকাজ ভাল জানি না; তবে গান-বাজনা খুব ভাল রকমই জানতুম বটে—যা' আমাদের ঘরের মেয়ের পক্ষে একেবারে বৃথা—কারণ বিয়ের পরে সে বিদ্যা বাক্সর মধ্যেই তোলা থাকে।"

—"এ সব কি কোন কাজেই লাগ্‌ত না ?"

—"তোমার বক্তব্য আমি বুঝ্‌তে পেরেছি ঠাকুর-জামাই। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, এটা তোমার কোলকাতা বা রেঙ্গুন সহর নয়, এ হচ্ছে চন্দননগর। ও সব বিদ্যে প্রয়োজনে লাগান এখানে বড় সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়।"

—"কিন্তু আপনার আরও একটা ভগবান-দত্ত গুণ ছিল, যাকে অজ পাড়াগাঁয়ে বসেও ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌তেন।"

—"সে আবার কি ?"

—"এসে বল্‌ছি।" বলিয়া জিতেন উঠিয়া গেল।

এগার

পাশের ঘর হইতে একখানা পুরাতন বাঁধান খাতা হাতে করিয়া আনিয়া জিতেন কহিল—"তার সাক্ষী এই দেখুন।"

খাতাখানি চারুশীলার কিশোর বয়সের লেখা একখানা অর্দ্ধ-সমাপ্ত উপন্যাস।

চারুশীলার চোখে মুখে বেদনা ফুটিয়া উঠিল। কহিল—"এইবারে তুমি কথাটা ঠিক্ বলেছ বটে। কিন্তু ও গুণ ফোটাতে গেলে যে প্রাণ বস্তুর প্রয়োজন—সেই তাজা প্রাণ যে আমার শুকিয়ে গেছে ভাই! যাক্, ওটা যোগাড় করলে কোত্থেকে বলো ত ?"

—"ও ঘরে তাকের মাথায় কতকগুলো পুরোন পাঁজি আর ছেঁড়া খাতার সঙ্গে ছিল। না না, যা' হবার তা' হয়ে গেছে, আমার অনুরোধ আপনি রাখুন। নিজেকে আবার ফুটিয়ে তুলুন। সবাইকার বেলায় দেখি আপনার প্রাণ তাজা আছে, আর নিজের অস্তিত্ব ফোটাবার বেলায় অবহেলা করলে চল্‌বে কেন ?"

—"বাইরে আমার যে প্রকাশ দেখ্‌ছ, সেটা ঠিক্ তাজা প্রাণের পরিচয় নয়। চিরকালের অভ্যাসে কেবল মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাই। না হ'লে সত্যি বল্‌ছি তোমায়, সংসার আর আমার ভাল লাগে না। এক সময় সুখ, সম্মান, যশের কাঙাল ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আমার মনে সে সব অনুভূতি এখন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে!"

তাহার বিষাদময় কণ্ঠস্বরে জিতেন বেদনা অনুভব করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল—"একটা কথা আমি না ভেবে থাকৃতে পারি না।"

—"কি ?"

—"আপনি স্বামীকে মদ্যপ দুশ্চরিত্র জেনেও কি করে এত মেনে চলেন, আর দাদাই বা কি গেরোয় পড়ে আপনার মত রত্ন ফেলে এমন অধঃপাতে গেলেন ?"

—"তিনি যে কি অভাবে অধঃপাতে গেলেন, তার প্রকৃত কারণ আমার চাইতে তুমিই বেশী বুঝ্‌তে পারবে, কারণ, তুমিও পুরুষ মানুষ। আর আমি যে তাঁকে মেনে চলি, এটা যে আন্তরিক তা' নয়—এ হলো জন্মগত অভ্যাস। আমার বাবা প্রকৃত শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আমার মায়ের মৃত্যুর পর সেই তিনিও মদ ধরেছিলেন, আর সেই অত্যাচারের ফলেই আমার বিয়ের অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়—একথা সবাই জানে। কাজেই ওঁকে যখন প্রথম মদ্যপ বলে জান্‌লুম, তখন ভবিষ্যৎ ভেবে যতটা ভয়ে শিউরে উঠেছিলুম, ততটা ঘৃণা করবার অবসর পাই নি।"

—"কিন্তু যাই বলুন আপনি, আমার বলা যদিও উচিত নয়, তবুও আমি না বলে পারছি না—সন্ধেবেলা বেশ্যা-পাড়ায় যাওয়াটা কিন্তু আপনার উচিত হয় নি।"

—"তুমি ভুলে যাচ্ছ ঠাকুর-জামাই, সেটা বেশ্যাপাড়া হলেও সেখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস। আমি নিজেও অমন শ্বশুর স্বামীর অনুমতিতে সেই গলি দিয়েই কতবার না কাকার বাড়ী নেমতন্ন খেতে গেছি। আর এ পোড়া দেশের কথা বলো না। এখানে সমাজ জ্যান্ত আছে বলে কি মনে কর যে, এতেই আমি নিন্দেয় ঘরে বাস করতে পারব না ? আমি স্বামীর রক্ষিতার সঙ্গে মেলামেশা করি এত এ দেশে একটা তুচ্ছ ব্যাপার। নবীন গাঙ্গুলীকে জানো ত ? ঘোষেদের সেজ-কর্ত্তার খবরও তোমার অজানা নয়—অথচ, এঁরাই হলেন সমাজের মাথা।

—"কিন্তু এ সবগুলোই ত পুরুষদের কাহিনী।"

—"মেয়েদের কাহিনীও বিস্তর আছে, কিন্তু সে রামায়ণ-মহাভারতগুলো আমি বল্‌তে পারব না ভাই, সে বরং ঠাকুরঝির কাছ থেকে তুমি শুনো।"

—"রক্ষে করুন, রামায়ণ-মহাভারত আর আমার শুনে কাজ নেই!"

হাসিয়া চারুশীলা কহিল—"আমিও ঠিক্ তোমার মত ঐ রকম শিউরে উঠতুম এ দেশের কথাবার্ত্তা শুনে, যখন বিয়েব পর প্রথম ঘর করতে আসি। এখন কিন্তু নিজেকে এই দেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি।"

বার

তাহাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে নলিনী তাহার মায়ের প্রয়োজনীয় আহ্বানে উঠিয়া গিয়াছিল। এখন ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"তোমাদের মজ্‌লিস্ যে খুব জোর চলেছে দেখ্‌ছি।"

—"সত্যি ঠাকুর-জামাই, কতদিনের বিরহিনী বেচারী ননদিনী আমার, তাকে ফেলে কি না শালাজের সঙ্গে গল্প!"

ঢিল মারিলে পাটকেল খাইতে হয়। নলিনী তাহাকে মৃদু ধাক্কা মারিয়া কহিল—"বিরহ-বস্তুকে যদি এতই চেনো, তবে নিজেরটিকে কেন আঁচলে বেঁধে রাখ্‌তে পার না!"

ইহাদের হাস্য-পরিহাস অকস্মাৎ বন্ধ হইল। ধীরপদে যে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, সে রমা। তের বছরে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, চোদ্দ বছরে সে বিধবা হয়। কাজেই রমার সম্মুখে কেহ হাস্য-পরিহাস করিত না।

স্বহস্তে ছাড়ান ফলের রেকাব জিতেনের সম্মুখে রাখিয়া রমা কহিল—"দাদা, খাও।"

—"এই এত?"

—"হ্যাঁ, ও আবার এত কোথায়! তোমার ওই বড় দোষ, খাবার দেখ্‌লেই শিউরে ওঠো।"

—"আচ্ছা আচ্ছা, খাচ্ছি।" বলিয়া জিতেন আহারে প্রবৃত্ত হইল।

জননী যেমন সন্তানকে আহার করায়, সেইরূপ পরিতৃপ্তিব দৃষ্টিতে রমা জ্যেষ্ঠের খাওয়া দেখিতে লাগিল।

এক সময় মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া জিতেন কহিল—"এবারে তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছি কেন জানো? শুধু যে নিজের অসুবিধে তা' নয়, এর আরও একটা কারণ আছে যা' তোমাদের এখনও বলি নি।"

—"কি?"

স্নেহপূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার বোনের দিকে চাহিয়া জিতেন কহিল—"আমি ঠিক্ করেছি রমার আবার বিয়ে দেব। পাত্র সেখানেই থাকে। আমরা গেলেই হিন্দুমতে বিয়ে হয়ে যাবে।"

চারুশীলা ও নলিনী বহুদিন হইতেই জিতেনেব এই মনোভাব জানিত, এবং ইহাতে তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতিও ছিল। তাহারা দুইজনেই সমস্বরে কহিল—"সত্যি, এ ত আনন্দের বিষয়!"

কিন্তু তাহাদের কথা আর অগ্রসর হইতে পাইল না। রমা অকস্মাৎ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিস্মিতা নলিনী কহিল—"কি হলো বলো ত, ঠাকুরঝি অমন করে উঠে গেল কেন? দেখ্‌ব না কি?"

বাধা দিয়া জিতেন কহিল—"এখন ওকে কিছু আর বল্‌তে যেও না। ও যে রকম ভাবপ্রবণ, তা'তে নিজেকে সাম্‌লে নিতে সময় লাগ্‌বে। কথাটা আজ হঠাৎ শুন্‌লে কি না।"

কিন্তু রমার নিজেকে সাম্‌লাইতে অধিক সময় লাগিল না। তাহার পরদিন প্রাতঃকালেই সকল প্রশ্নেব মীমাংসা হইয়া গেল। যদিও রমা বিধবা, তথাপি এতদিন সে কুমারীর বেশেই ছিল। তাই সকালে তাহার নূতন সজ্জা যখন নলিনীর নজরে পড়িল, তখন সে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল।

রমা পরিধেয় বস্ত্রের দুই দিকের পাড় ছিঁড়িয়া থানের মত করিয়াছে। হাতের চুড়ি খুলিয়া ফেলিয়াছে। কাঁচি দিয়া মাথাব চুলগুলিও খুব ছোট করিয়া কাটিয়াছে।

নলিনী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"এ কি দিদি! কেন এমন করলি?"

—"এই ত ঠিক্ হলো বৌদি', আমার স্বরূপ এতদিনে প্রকাশ হলো। নইলে তোমরা যে আমায় ভুল বুঝ্ছিলে।"

—"কিন্তু তোর যে সুখের বয়স ভাই!"

—"বয়সে কি আসে যায় বৌদি', জ্ঞানই হলো আসল কথা। একদিন নয়, দু'দিন নয়, একটি বছর স্বামীকে পেয়ে ছিলুম। তাঁকে কি আর ভুল্তে পারা যায়! দাদা যে এতদিন বিদেশে ছিল, তুমি কি তাকে ভুলেছিলে? এও তেমনি। তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ক' একটা বছরের, আর আমাদের না হয় জন্মান্তরের ব্যবধান। কিন্তু তা'তে কি আসে যায়? আমরা হিন্দুর মেয়ে। একনিষ্ঠতা যে আমাদের জাতিগত সম্পদ।"

—"কিন্তু চুলগুলো শুদ্ধ কাট্লি কেন বোন্?"

রমা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীসমা বৌদি'র এই বেদনা রহস্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে চেষ্টা করিল। হাসিয়া কহিল—"কিন্তু এতে আমায় কেমন দেখ্তে হয়েছে দেখো, ঠিক্ দাদার মত মুখ হয়েছে, না? তোমারি সুবিধে। ডবল স্বামী লাভ হলো। দাদা যখন দূরে থাকবে, তখন তুমি আমায় দেখে সান্ত্বনা পাবে।"

তের

জিতেন দেখিল এবং যাহা দেখিবার নয়, রমার সেই মর্ম্মবাণীও স্ত্রীর নিকট শুনিল।

পিতৃমাতৃহীনা সযত্নে পালিতা কনিষ্ঠা ভগ্নীর মাথায় হাত রাখিয়া জিতেন কহিল—"তোমার কাজ তুমি ঠিক্ই করেছ দিদি! সত্যিই তোমায় চিনতে পারি নি, তাই অমন ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সারাজীবন কি নিয়ে কাটাবে তাই আমি ভাবছি।"

স্পষ্টভাষে রমা কহিল—"কেন দাদা, আমি ঠিক্ করেছি সেখানে গিয়ে তোমার কাছে আরও লেখাপড়া শিখ্ব।"

—"তাই ভাল, সেখানে গিয়ে তোমায় 'সারদা-সাধনে' ভর্ত্তি করে দেব। 'রামকৃষ্ণ-মিশন' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে নানারকম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রমা কহিল—"বেশ হবে। তারপর তুমি যখন 'রিটায়ার' হয়ে দেশে ফিরবে, তখন আমরা এখানে একটা বালিকা-বিদ্যালয় খুল্ব, আর আমি সেই স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী হবো।"

—"বাঃ, তোর আদর্শ ত নেহাৎ মন্দ নয়! যদি বজায় রাখতে পারিস ত একটা কাজের মত কাজ হবে।"

—"কিন্তু দাদা, আর একটা ভাব্বার কথা আছে। আমার ব্যবস্থা ত এক রকম বেশ হলো—বৌদি' সারা দিনরাত সেই বিদেশে একলাটি কাটাবে কি নিয়ে বলো দেখি? আমরা ত নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব।"

—"কি করা যাবে, এর ত কোন উপায় নেই।"

—"আছে একটা উপায়, যদি বড় বৌদি' দয়া করে।"

চারুশীলাকে রমা বড় বৌদি' বলিত। চারুশীলা জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া কহিল—"কি ভাই?"

—"বল্তে বড় লজ্জা করে, কিন্তু না বলেও পারছি না।" তারপর কুণ্ঠিতভাবে রমা কহিল—"তোমার শিশিরকে দেবে বড় বৌদি'?"

—"এই কথা বল্তে এত কিন্তু হচ্ছো কেন ভাই! শিশির ত আমার চাইতে তার পিসীমাকেই বেশী ভালবাসে। কিন্তু কথা হচ্ছে—ছেলে যাঁর, তাঁকে ত একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

সতীশকে যখন চারুশীলা একথা বলিল, তখন সে অত্যন্ত আনন্দের সহিত কহিল—"এ ত খুব ভাল কথা! শিশির ওদের কাছে খুব যত্নেই মানুষ হবে, আর ওর ওপর মায়াও পড়বে খুব। তা'তে ভবিষ্যতে সকলেরই ভাল হবে। জিতেন এর মধ্যেই বেশ টাকাকড়ি জমিয়েছে, একদিন তা' শিশিরেরই হবে।"

চারুশীলা নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। 'গোপাল ভাত খাবি আয়, না হাত ধোব কোথা'?' স্বামী ত প্রস্তুত—ঘাড় হইতে বোঝা নামাইতে পারিলেই বাঁচেন। ছেলেকে স্নেহ-মমতায় বঞ্চিত

করিতে তাঁহার এতটুকুও বাধিবে না বরং দূর ভবিষ্যতে পুত্রের দ্বারা অর্থলাভ করিবার সুখের কল্পনায় তিনি জ্ঞানশূন্য। হৃদয়হীন, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, স্বার্থপর পিতা! কিন্তু সেও ত আপত্তি করিতে পারিতেছে না। সেও কি দায় এড়াইতে চাহে? না, তাহা নহে। নলিনীকে সে বিশ্বাস করে, সহোদরার মতই ভালবাসে, সন্তান-হীনার নিঃসঙ্গ নিষ্কর্ম্ম জীবনের বেদনা মনে-প্রাণে অনুভব করে। সর্ব্বোপরি মনে মনে এই চিন্তা সে না করিয়া থাকিতে পারিল না যে, দুশ্চরিত্র লম্পট পিতার আদর্শ হইতে দূরে থাকিয়া পুত্র তাহার বিদ্বান, সৎচরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিসেমশায়ের শিক্ষায় ও সহবাসে মানুষের মতই মাথা উঁচু করিয়া দশের মধ্যে দাঁড়াইতে পারিবে। তবে তাহাই হউক! অন্ধ মাতৃ-স্নেহের বশে সে একটি সুকুমার জীবন, যাহা একদিন শতদল মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিবে, তাহাকে অন্ধকূপে ফেলিয়া রাখিয়া নষ্ট হইতে দিবে না।

জিতেন ও নলিনীকে চারুশীলা কহিল—"তোমরা শিশিরকে নিও ভাই, শুধু মানুষ করতে নয়, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ও তোমাদেরি হয়ে বেঁচে থাকুক।"

—"সে কি হয় বৌদি'! মায়ের ছেলে আবার মায়ের কাছে ফিরে আসবে; শুধু যে ক'টা দিন আমরা বিদেশে থাকব, ও আমাদের কাছে থাকবে।"

—'না না, তা' হয় না। আমি জানি কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে ছেলেদের মানুষ করতে হয়। তোমরা কত যত্নে ওকে মানুষ করে তুলবে, আর উপযুক্ত হলে আমি কেড়ে নেব, এমন অবিবেচক, এমন হীন আমি নই।"

শিশির মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"হ্যাঁ মা, সত্যি আমি পিসীমার সঙ্গে যাব?"

পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চারুশীলা কহিল—"হ্যাঁ বাবা। এইবার থেকে তুমি পিসীমাকে মা বলে ডেকো।"

চোদ্দ

জিতেন আসার পর হইতে সকলের দিনগুলি যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্য দিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। চারুশীলা জীবনে এত আনন্দ বহুদিন উপভোগ করে নাই। আজ কালীঘাট, কাল বালী ব্রিজ, পরশু মিনার্ভা থিয়েটার, তাহার পরদিন 'সিনেমা ডে ফ্রান্স।' এবং যেদিন কোথাও না যাওয়া হইত, সেদিন ষ্ট্র্যাণ্ডে বেঞ্চিতে বসিয়া গল্প চলিত বা ফুটপাতে বেড়াইতে বেড়াইতে নীরবে জ্যোৎস্না উপভোগ করিত।

জিতেন যেদিন আসিয়াছে, তাহার পরদিন সকালে চারুশীলা ঘুম হইতে উঠিয়া সবেমাত্র বাসিপাটে হাত দিয়াছে, এমনি সময় সে হাতযোড় ও মাথা নত করিয়া সবিনয়ে কহিল—"বৌদি', একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।"

—"সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই রাখব ভাই।'

—"আমার মাত্র একমাসের ছুটী, এই একটা মাস আপনি রান্নাঘরে ঢুকতে পাবেন না। আমার নেপালী মহারাজই দুটো সংসারের রান্না এক জায়গায় করবে। খাটুনী বারমাস ত আছেই। এই একটা মাস আমাদের অনুরোধই বলুন, আর জেদই বলুন, আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে।"

—"কিন্তু আমার অতিথি যে অনেক ভাই।"

—"আমি দাদাকে বলে আসছি, তিনি অতিথিদের সতন্ত্র ব্যবস্থা করবেন। আমরা চলে গেলে তখন আবার আপনার যা' খুসী করবেন।"

চারুশীলা মৌন হইয়া রহিল দেখিয়া জিতেন কহিল—"কি ভাবছেন বলুন দেখি? দাদা রাগ করবেন?"

—"ঠিক তা' নয়, রাজী তিনি হবেন। কিন্তু অনেক কষ্টে কাজটা যোগাড় করেছিলুম; হাত ছাড়া হলে আর যদি ফিরে না পাই।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিতেন কহিল—"আপনি তা' হলে চাকরী করেন বলুন। তবে আমি আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না।"

—"চাকরীই করি বটে! আচ্ছা, তোমার কথাতেই আমি রাজী। পরে যা' হবার হবে।"

সেই হইতে এই ব্যবস্থাই চলিতে লাগিল। মহারাজ

রান্না করে, আর সকলে একত্রে গল্প-গুজব করিয়া এবং ঘুরিয়া বেড়াইয়া দিন কাটায়। খালি বৃদ্ধা নলিনীর মা তাহাদের দলে যোগ দিতে পারেন না। বলেন—"তোদের আমোদ করবার বয়েস, তোরা যা' বাপু। আমি বুড়ো মানুষ, বাড়ী আগ্‌লাই।"

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর শিশির জিতেনের নিকট গিয়া বলিল—"পিসেমশায়, আজকের কি রুটিং ঠিক করছেন? কোথায় যাওয়া হবে?"

—"আজ নতুন রুটিং করিছি বাবা। আজ আর কোথাও বেড়ান নয়—খালি ভোজ। আমাকে এখুনি একবার কোলকাতা যেতে হবে; একটা বরাত আছে। তোমার মা আর পিসীমাদের বল গে নানারকম খাবার তৈরী করতে। রাত্রে বেশ জোর খাওয়া হবে।

শিশির নাচিতে নাচিতে গিয়া যথাস্থানে খবর দিল।

চারুশীলা কহিল—"আজকের ব্যবস্থাই সব চাইতে সুন্দর।"

অতঃপর তিনজনে পরামর্শ করিতে লাগিল—তাহারা কত রকম ঘিয়ে ভাজা খাবার ও মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিতে পারে।

পনের

ইদানী সরস্বতী আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঘুরিয়া চলিয়া যাইত। আজ তাহার যাত্রা সফল হইল, আর ফিরিয়া যাইতে হইল না।

—"দিদি, অনেক দিন পরে নন্দাই পেয়েছ বলে কি রোজই বেড়াতে যেতে হয়। বাবাঃ, যেদিনই আসি, সেদিনই বাড়ী নেই!"

চারুশীলার মনটা আজ অত্যন্ত লঘু ছিল, তাই 'ফস্' করিয়া বলিয়া বসিল—"দিদি, সম্বন্ধটা ত খুব পাতিয়েছিস্! তাই বল্‌ছি—আমি না হয় নন্দায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাই, তা' বলে ভগ্নীপতির সঙ্গে ত প্রেমে মজি নি।"

[illegible]লিয়া সে খাজার নেচি ভাঁজ করিতে করিতে কহিল—

"[illegible]লো ঠাকুরঝি?"

কথাটা সে পরিহাসরূপেই বলিয়াছিল, কিন্তু সকলে ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থগ্রহণ করিল। রমা নির্ব্বাক নতমুখে ছাঁচের চন্দ্রপুলি তুলিতে লাগিল। নলিনী বিরক্তির সুরে কহিল—"কে জানে বাপু, তোমার ঠাট্টা তুমিই বোঝ!"

সরস্বতী ইঙ্গিতটুকু বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল।

সে পতিতা। রসাল কথা বিস্তর জানে এবং বলিলে অনেক কথা বলিতেও পারিত। বলিতে পারিত—"তুমি রাশ আল্‌গা দিয়েছ, ছেড়ে দিয়েছ, তবে না আমি নিয়েছি। আমাদের কাজই ত এই। পুরুষকে ফাঁদে ফেল্‌তে পারাই যে আমাদের গৌরব। কিন্তু তুমি কেন যত্ন করে স্বামীটিকে আঁচলে বেঁধে রাখ নি, তা' হলে ত আজ এমন আফ্‌শোষ কর্‌তে হ'ত না।"

কিন্তু এত কথার একটিও সে মুখ হইতে উচ্চারণ করিল না। স্বভাবতঃ স্নেহের কাঙ্গালিনী সে। চারুশীলার নিকট হইতে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত স্নেহ মমতা পাইয়া তাহাকে সে বড় বোনের মতই শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত। তাই কথাটাকে সে পরিহাস বলিয়া লইতে পারিল না, অন্তর দিয়া অনুভব করিল। তাহার বিবেক তাহাকে বলিল—"ওরে রাক্ষসী, দিদি বলে যদি ভালই বেসেছিস, তবে তার স্বামীটিকে তোর কবল হ'তে মুক্তি দিস নি কেন? জগতে কি আর পুরুষ নাই?"

স্বেচ্ছায় কাহাকেও বেদনা দেওয়া চারুশীলার অভ্যাস নহে; বরং সে কাহাকেও অন্যায় করিতে দেখিলে প্রতিবাদ করিবার ভয়ে সেস্থান হইতে চোখ বুজিয়া পলায়ন করে। সরস্বতীর ব্যথিত লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত-কণ্ঠে সে কহিল—"ও মা, ও কি, তুই কি সত্যি মনে করলি না কি! আমি ঠাট্টা করে বলেছি, তোকে খোঁচা দেবার জন্য বলি নি। কিছু মনে করিস নি ভাই।"

এমন সময় জুতার আওয়াজ তুলিয়া যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সে জিতেন।

ঘরে একজন অপরিচিতা সুন্দরী নারীকে দেখিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহাকে হয় ত স্বামীর কোন প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া নলিনীও

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে জিতেন জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কে ?"

—"ওই ত দাদার ইয়ে।"

—"দাদার রক্ষিতা ?"

—"হ্যাঁ।"

বিস্ফারিত চক্ষে কিছুক্ষণ জিতেন স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। পরে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল—"কি আশ্চর্য্য, অনায়াসে তোমরা ওর সঙ্গে মিশ্‌ছ, গল্প করছ! তোমাদের কি একটু লজ্জাও করে না। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য, বৌদি' শিক্ষিতা হয়ে ওকে সমান আসনে বসিয়েছেন কি করে! তাঁর কি আত্ম-সম্মান জ্ঞানটুকুও চলে গেছে না কি ? ছি! ছি! রমা ওখানে কি করছে ? সে পবিত্র ফুল, খবরদার বল্‌ছি তাকে ঐ আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশ্‌তে দিয়ো না।"

জিতেনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে তিনজনেরই কানে বেশ স্পষ্ট প্রবেশ করিল। রমা নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। সরস্বতীও উঠিয়া দাঁড়াইতেই চারুশীলা কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল—"এরই মধ্যে যাচ্ছিস্ ?"

—"হ্যাঁ দিদি, যাই, আর আমায় থাকৃতে বলো না। তোমার ভালবাসা আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু এতদিন ওটা অপাত্রেই দান করেছ। এইবার চেষ্টা করব যাতে তোমার স্নেহের উপযুক্ত হতে পারি। তোমায় ভালবাস্‌লুম, কিন্তু দুঃখ দিলুম অনেক। স্বামীকে ত কেড়ে নিয়েইছি, আজ আবার কুটুমের কাছেও অপমানিত করলুম। তুমি ছিলে পূজোর আসনে, আর আমি তোমায় পথের ধূলোয় নামিয়ে আন্‌লুম। কিন্তু আর নয়, আমায় মাপ কর।"

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কথাগুলি শেষ করিয়া সরস্বতী নত মস্তকে চারুশীলার পদধূলি গ্রহণ করিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

—"একলা যাবি ?"

—"তা' হোক্, এখনো রাত বেশী হয় নি।"

ষোল

স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া চারুশীলা আকাশ পাতাল অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। মনে হইল, সে আজ কতখানি নামিয়া গিয়াছে! যে শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল, তাহাকে জলাঞ্জলি দিয়া সে এমন হীন জীবন কিরূপে বরণ করিয়া লইল ? ইহার জন্য দায়ী কে ? সে, না তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অথবা ভগবান!

দিল্লীতে শৈশব কৈশোরের অনেক কথা তাহার মনে পড়িল। সে হাঁটিয়া স্কুলে যাইত, আর হেনা, বেলা, সুষমারা সাইকেল চড়িয়া বিদ্যালয়ে আসিত। তাহারা একদিন তাহাকে বলিয়াছিল—"চারু, তুইও একখানা সাইকেল্ কেন্ না ভাই।"

গর্ব্বোজ্জ্বল মুখে সে উত্তর দিয়াছিল—"না, আমি তোদের মত রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়তে চাই না। আমি এই মাটির মানুষ—মাটিই আমার প্রিয়।"

আর একদিন একটি মেয়ে বলিয়াছিল—"তুই হলি নিরানব্বুইজন বাদ, বিশেষ চিহ্নিত একটি।"

—"কেন ?"

—"স্কুলে কেবল তোর পায়েই কখনো জুতো দেখ্‌লুম না।"

সঙ্গিনীর পায়ের সূক্ষ্ম জরীর কাজ করা নাগরার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া চারুশীলা কহিয়াছিল—"এই যে দশ-বারটাকা দিয়ে জুতো কিনেছিস, এই টাকাটা ইচ্ছে করলে অনেক রকমে গরীব-দুঃখীর সেবায় লাগাতে পারতিস্।"

সেই মেয়েটি চারুশীলার গাল টিপিয়া কহিয়াছিল—"তুই বিয়ে না করো নার্স হয়ে জগতের মঙ্গল করিস্, আর নয় সন্ন্যাসিনী হোস্।"

সেই হেনা আজ পসারওয়ালা ডাক্তারের স্ত্রী। বেলা উকীল-পত্নী। তারা সাইকেল ছাড়িয়া মোটারে বেড়ায়। আর সুষমা যাঁহার স্ত্রী, তিনি সুদূর সিংহলে প্রোফেসারী করেন। এই সিংহল-প্রবাসী বাঙ্গালী-দম্পতীর ছবি সেদিন মাসিকের পৃষ্ঠায় সে দেখিয়াছে।

সে কি তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিত না ? পারিত। জিতেনও তাহাকে সেই কথাই বলিয়াছে। নিজের জীবনের উপর সর্ব্বরকমে স্বামীর দাবী ও সম্মানকে শ্রেষ্ঠ

আসন দিতে গিয়াই আজ তাহার এই পরিণতি! কিন্তু যে ভুল সে করিয়াছে, তাহা আর করিবে না। আজ হইতে সংশোধন সুরু করিবে। নিজের নামে সে লোক-সমাজে পরিচিতা হইবে। স্বামীকে পুনরায় প্রাধান্য দিয়া নিজের স্বাস্থ্য হইতে, সম্মান হইতে, যশ হইতে আর সে তিলে তিলে মরিবে না। যদি বাঁচিতে হয় ত বাঁচার মতই বাঁচিবে। জীবনকে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে।

দিন পাঁচেক পরে নলিনী, রমা ও শিশিরকে লইয়া জিতেন কর্ম্মস্থলে রওনা হইল। তাহার ছুটীর মেয়াদ ফুরাইয়াছিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—"সত্যি বৌদি', আপনাকে বড় বোনের মত, দেবীর মত ভক্তি করি। এমন করে যদি নিজেকে নষ্ট করেন, মনে বড় কষ্ট পাব। কথা দিন, লেখায় মনোযোগ দেবেন। আমি নিশ্চয় বলছি—এই পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন!"

প্রকাশ্যে "আচ্ছা" বলিয়া চারুশীলা মনে মনে বলিল—"আমি চেষ্টা করবো প্রাণপণে, যাতে তোমার শ্রদ্ধা আবার ফিরে পাই! তুমি যে আমার জীবনের সকলের চেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী!"

দিন দুই বাদে যখন নিতাই পূর্ব্বের মত বাজার লইয়া আসিল, তখন চারুশীলা কহিল—"তোমার বাবুকে বলো নিতাই, আমার দেহ ভাল নয়, আমি আর রান্না করতে পারব না। তা'তে তিনি আমায় খেতে দেন, আর না দেন।"

কিন্তু সতীশ তাহাকে বসিয়া খাইতে দিত কি না দিত তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ আর চারুশীলার ঘটিয়া উঠিল না।

নলিনীর মা কহিলেন—"বৌমা, তোমার ভরসায় যখন আমি রইলুম, তখন আমাদের মা বেটীর জন্যে আর পৃথক হাঁড়ি কাড়তে পাবে না তা' বলে রাখ্‌ছি কিন্তু। মানুষ ত ভারী দু'জন। আর তোমার ছোট ছেলে সে ত কচি, বাচ্ছা।"

মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া তাহার শ্বাশুড়ীর
তে লাগিল।

সতের

সময় যেন আর কাটিতে চাহে না। এমন প্রচুর অবসর চারুশীলার ভাগ্যে বহুদিন ঘটে নাই। সে চিরকাল খাটিতেই ভালবাসে। কাজেই এতখানি সময় কি করিয়া কাটাইবে ভাবিয়া অস্থির হইল। সেই উপন্যাস—যাহা সে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে প্রচুর রসের উপকরণ দিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা শেষ করিতে বসিল। কিন্তু তাহা তেমন জমে কই? যাহার স্বামী বেশ্যাসক্ত, নিশাচর, বালক পুত্র পরাশ্রয়ে বিদেশে, মনের স্বাভাবিক আনন্দ সে পাইবে কোথায়?

মাস তিনেকের মধ্যে তাহার দুইটা ছোট গল্প বিভিন্ন মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। চারুশীলা একবিন্দু আশার আলো দেখিতে পাইল। এই আলোটাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিতে পারিলে হেনা, বেলা, সুষমার অপেক্ষা দেশের লোকের নিকট সে অধিক সম্মান পাইবে না কি? পাইবে। তাহাকে পাইতেই হইবে! কারণ, সে দুশ্চরিত্র স্বামীর পরিত্যক্তা লাঞ্ছিতা স্ত্রী বলিয়া সকলের সমক্ষে আর পরিচিত থাকিতে চাহে না। তাহার মধ্যে যে মহিয়সী নারী-প্রাণ আছে, তাহাকে সে প্রকাশ করিবেই! সে হইবে বিদুষী নারী, সম্মানিতা মহিলা।

গল্প লেখার ফাঁকে ফাঁকে চারুশীলা নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল। প্রাইভেটে তাহাকে ম্যাট্রিক দিতেই হইবে।

জিতেন নলিনীর পত্রের মধ্যে লিখিয়া জানাইল তাহার শ্রদ্ধা, যাহা চারুশীলাকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিল।—"বৌদি', জেনে আনন্দিত হলুম যে, আপনার প্রাণ সম্পূর্ণ মরে নি। গল্পগুলি কিন্তু বড়ই করুণ। আশা করি এবার যা' লিখ্‌বেন তা' আনন্দ রসে ভরপুর হয়ে উঠ্‌বে। আসল কথা, আপনার নিজের মনের আনন্দকে আবার বাঁচিয়ে তুল্‌তে হবে। পারবেন না? একটা কপাট বন্ধ হলে অপরটা দিয়ে মুক্ত হওয়া যায় না কি?"

উত্তরে চারুশীলা জানাইল—"ঠাকুর-জামাই, তোমার চিঠির মর্ম্ম আমি বুঝেছি। স্বামী আমায় করেছেন বন্দিনী, প্রতিভার দ্বারা আমি হবো মুক্ত।"

সতীশ পুনরায় বাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু এবার আর চারুশীলা তাহাতে কোন ক্ষতি মনে করিল না, বরং সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পূর্ব্বে এমন হইলে চারুশীলা কত বিনিদ্র রজনী চোখের জলে স্বামীর স্মৃতি-পূজায় কাটাইয়া দিত। কিন্তু আজকাল তাহার কান্নার অবসর কোথায়? এখন নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিশীথে সে পাতার পর পাতা আপন মনে লিখিয়া যায়।

সমীরের মধ্য রাত্রে যদি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে, কোমল-কণ্ঠে ডাকে—"মা, তুমি আমার কাছে শোবে এস।"

তখন শশব্যস্তে খাতা-পত্র তুলিতে তুলিতে সে উত্তর দেয়—"যাই বাবা।"

—"না, তুমি শীগ্‌গির এস, আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে।"

—"কার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে বাবা?"

"তা' জানি না। দাদা নেই, দিদি নেই, আমি কি একলা এত বড় বিছানায় শুতে পারি?"

—"কেন এই ত আমি তোমার কাছে শুলুম।"

—"ডাক্‌লুম তবে ত শুলে। আগেকার মত ত আমায় ভালবাস না, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াও না, খালি বই নিয়ে থাকো।" বলিয়া অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া পুত্র পাশ ফিরিয়া শোয়।

অতঃপর অজস্র আদরে মাতা তাহাকে প্লাবিত করিয়া দেয়। মনে মনে বিস্মিত হইয়া উঠে—অতটুকু শিশু, সেও তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে দুইখানি চিঠি চারুশীলা পাইল। প্রথমে যেখানি খুলিল, সেখানি রাধার। এই প্রথম রাধা তাহাকে পত্র দিল। অধীর আনন্দে সে তাহা পাঠ করিতে লাগিল—

"মা, মা গো, সেই কবে একখানি চিঠি দিয়েছিলে, তার জবাব দিই নি বলে কি আমার ওপর রাগ করেছ? কই, আর ত তুমি আমায় চিঠি দাও না? তোমার জন্য মন কেমন করে মা, কিন্তু এঁরা যে আমায় পাঠাবেন না। আমার যখন বিয়ে হয় নি, তখন এঁদের সংসার কি অচল ছিল? সবাই এখানে আমায় এত যত্ন করে যে, আমার তা'তে বড় লজ্জা হয়। সমীর আর ঠাকু'মাকে নিয়ে তুমি একলা কি করে অত বড় বাড়ীতে আছো! আমি যে দু'দিন তোমার কাছে যাবো, তারও উপায় নেই। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। তোমরা কেমন আছো লিখো। তুমি ও ঠাকু'মা আমার প্রণাম জেনো। সমীরকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি,

সেবিকা রাধা

পত্রের ছত্রে ছত্রে কন্যার শ্বশুর-গৃহের আনন্দোজ্জ্বল ছবি চারুশীলার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞ-চিত্তে যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীমতী সরলা দেবী

চন্দন

শ্রীঅমলা গঙ্গোপাধ্যায়

—"লালজী।"

চন্দনের আহ্বানে আমি তার দিকে চেয়ে বল্লাম—"কি বল্‌ছেন?"

চন্দন বেশ অম্লান-মুখে আমাকে জানাল আমার স্ত্রীটি চামার বংশোদ্ভবা এবং অদ্যই যেন আমি তাকে পিতৃগৃহে স্থানান্তরিত করি। আমি তাকে বল্লুম যে, এখনি বাড়ী ফিরেই তাঁকে অতি অবশ্য একথা জানাব। জানাব যে, তিনি চন্দনের মনোরঞ্জন করতে পারেন নি সেই অপরাধে তাঁর আমার গৃহে স্থান নাই।

পরক্ষণেই চন্দন তার স্বামী দেবীসহায়কে বল্লে—"এদিকে এসো।"

দেবীসহায় চেয়ার ছেড়ে স্ত্রীর শয্যায় খাটে এসে বস্‌ল। বল্লে—"কি বল্‌ছো?"

চন্দন আর কোন বাক্যব্যয় না করে দেবীসহায়ের হাতখানা টেনে নিয়ে কামড়ে ধর্‌ল।

দেবীসহায় 'চট' করে হাতখানা টেনে নিতেই চন্দন হেসে আমাকে বল্‌তে লাগ্‌ল—"দেখ লালজী, এই টুকুতেই ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নিচ্ছেন—আর তুমি যখন আমার 'কলেজা'কে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করেছিলে, তখন ত আমি পালাই নি।"

পরক্ষণেই দেবীসহায়ের জননী কক্ষে প্রবেশ করছেন দেখে চন্দন প্রতিহিংসাপূর্ণ হাসি হেসে বল্লে—"এই 'জমা-দারণী' আজ আমার ঘরে ঝাড়ু দিস নি কেন?"

দেবীসহায়ের মা বেরিয়ে গেলেন দেখে চন্দন আনন্দে হেসে বল্লে—"কেমন তাড়িয়ে দিলাম। যা' বুড়ী, পালা, তোর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।"

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। সঙ্গে স্ত্রী আছেন, কাজেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি চেয়ে বল্লাম—"এবার আমি যাই।"

চন্দন আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে বল্লে—"কাল নিশ্চয় এসো লালজী। সত্যি বল্‌ছি তোমাকে দেখ্‌লে আমার মন এত খুসী হয়ে ওঠে যে, সে আমি বল্‌তে পারি নে।"

—"হ্যাঁ, কাল আস্‌ব।"

—"কাল কিন্তু একলাই এসো, 'বহু চামারণী'কে নিয়ে এসো না। ও আমার কাছে একটুও বসে না, বুড়ী জমাদারণীর কাছেই বসে থাকে।"

—"না, কাল আর ওকে আন্‌ব না।"

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে মনে পড়ে গেল গতদিনের কথা। কি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া! সেই যে বালিকা বধূটি এ সংসারে এসে ঢুকেছিল, সেইদিন থেকে রোগে পড়বার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কখনো ওর কণ্ঠস্বর শুনি নি, অবগুণ্ঠন সরে যেতে দেখি নি।

কি নির্ম্মম পেষণই না ওর উপর দিয়ে গেছে! তখন আমরা একই বাড়ীতে থাক্‌তাম, আমার আজো যেন স্পষ্ট চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে সেই অবগুণ্ঠনবতী বধূটি, যে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের ইচ্ছায় স্থির হ'লে দেবীসহায়ের জননী তাড়না করে বল্‌তেন—"বৈঠ যা', কাম তো তেরে দেহেজ-ওয়ালীয়াঁ করলেগী।"

ওরা বহুকাল আমাদের গৃহে ভাড়াটে ছিল; কাজেই আমার সম্বন্ধে ওদের মনে কোন সঙ্কোচ ছিল না। দেবী-সহায়ের জননী আমাকে পুত্রের মতই স্নেহ দেখাতেন। বিশেষ করে হরিদ্বারে যখন যাই, ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই হ'তে আমি ওর ধরমকা বেটা হয়েছি।

দরিদ্রের কন্যা বলে শ্বশ্রূর একদিকে এই নির্ম্মম পেষণ,

অন্যদিকে দেবীসহায় যদিও স্ত্রীকে অবহেলা করত না, কিন্তু চরিত্রের দুর্ব্বলতার জন্য সে স্খলিত হয়ে পড়ল এবং এই স্খলনের জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অজস্র অত্যাচার ঘটতে লাগ্‌ল।

মনে পড়ে কত দিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে হয় ত বাইরে বেরিয়েছি, অমনি দেখেছি দেবীসহায়ের ঘরের জান্‌লার কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। এমনি করে দিনের পর দিন ও প্রতীক্ষা করে কাটিয়েছে। কচিৎ যখন ওর স্বামী ফিরে আস্‌ত, তখন কিন্তু সহজ অবস্থায় নয়।

এমনি করেই কিছুদিন কেটে গেল। তারপর অকস্মাৎ একটি মৃত পুত্র প্রসব করেই চন্দন রোগে পড়ল এবং ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘট্‌ল। এতদিন পরে দেবীসহায়ের অকস্মাৎ মনে হ'ল এ রোগের জন্য ওই দায়ী। তারপর থেকে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটল—এতদিনকার ঔদাসীন্য পূর্ণ সহানুভূতিরূপে ফিরে এল। ডাক্তারের পর ডাক্তার, ওষুধের পর ওষুধ আস্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তারেরা বল্লেন—"ওকে ক্ষয়রোগে ধরেছে।"

এতক্ষণ পরে স্ত্রী বল্লেন—"কি এত ভাব্‌ছ, তোমার মুখখানা এমন গম্ভীর যে, দেখে ভয় করে।"

সহাস্যে ফিরে চেয়ে বল্লাম—"ভাব্‌ছি চন্দনের কথা। কী ভীষণ প্রকৃতির প্রতিশোধ!"

—"আজ আমার ওপর ও বড্ড রেগে গেছে।"

—"হ্যাঁ। বল্‌ছিল আমাকে, আজ যেন বাড়ী ফিরেই তোমাকে আদেশ দিই যে, আমার বাড়ীতে তোমার আর স্থান নাই; কারণ, তুমি ওর অমনোমত কাজ করেছ।"

—"ও। সত্যি, শাশুড়ীর ওপর ওর ভয়ানক রাগ। দেবীসহায়ের ওপরও রাগ আছে, কিন্তু অত নয়। বুড়ী আজ আমার কাছে কত কথাই বল্লে। সেদিন বুঝি ছেলেকে কি একটা নালিশ জানাতে গিয়েছিল, তা'তে ও বলেছে—"ওকে আমরা যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি, এখন মরবার সময়টা একটু শান্তিতে মরতে দাও।"

হেসে বল্লাম—"উপযুক্ত শাশুড়ীর এই ত লক্ষণ, পাগল বলেও রেহাই নেই! কিন্তু দেবীসহায় সত্যি কি সহ্যই না করছে! সেদিন শুন্‌লাম চন্দন পাগ্‌লামীর ঝোঁকে উঠে সোজা ওর অফিসে গিয়ে দারোয়ানকে বলেছে—'দেবীসহায়কে ডেকে দাও।' ও তখুনি ছুটি করে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। চন্দন বুঝি ওকে বলেছে যে—'ওর মন কেমন কর্‌ছিল, তাই ও চলে গেছ্‌ল'।"

মনে হ'ল, প্রকৃতির দেনা-পাওনা সহজভাবে শোধ না করতে পারার এই ত প্রতিশোধ। কণ্ঠে ভাষা থাকা সত্ত্বেও স্বামী ও শ্বশুর অত্যাচারে চন্দন মূক অভিনয় করে চলেছিল। কিন্তু এ অভিনয়ের ছলনায় প্রকৃতিকে ফাঁকি দেওয়া চলে না—তাই আজ ও প্রলাপ বক্‌তে বাধ্য হ'ল।

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে এই যে অত্যাচার চলেছে, এর পরিণাম কি ভীষণ, তা' কি সমাজ বুঝ্‌বে না! হায় সমাজ, সহজ সুবিধার খাতিরে তুমি বিরাট্ কল্যাণকে অবহেলা করে চলেছ!

আমরা বলি মেয়েদের উপর মেয়েরাই অত্যাচার করে বেশী। একটু ভেবে দেখ্‌লেই বোঝা যায় সে অত্যাচারের প্রশ্রয়দাত্রী কারা? কিন্তু বংশ-পরম্পরায় দাসত্ব করতে করতে মেয়েদের আত্মসম্মান, বিচারবুদ্ধি, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি গেছে নষ্ট হয়ে। যদি তার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাক্‌ত, তবে ওরা এমনভাবে কখনই ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চল্‌ত না, নিশ্চয়ই প্রতীকারের চেষ্টা করত!

বাড়ী ঢুকেই স্ত্রী বল্লেন—"কাপড়-চোপড়গুলো কলতলায় ছেড়ে রেখে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে তবে ঘরে ঢুকো। যে রোগে ধরেছে, নইলে ত রোজই যাওয়া যায়।"

স্ত্রীর আদেশানুযায়ী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করবার জন্য কলতলার দিকে যাচ্ছিলাম, অকস্মাৎ "লালজী" আহ্বানে সচকিত হয়ে ফিরে দেখি মাঝ-উঠানে চন্দন দাঁড়িয়ে। আমাকে চাইতে দেখেই ও বল্লে—"লালজী, আমি এসেছি।"

মনে মনে বল্লাম—"তুমি যে এসেছ তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি; কিন্তু ক্ষয়রোগ বিস্তারের জন্য কেন আর এলে।"

কিন্তু পাগলকে ত আর এ কথা বা বলা যায় না। যা' হোক্, চাকরটাকে বারাণ্ডায় তিনখানা চেয়ার পেতে দিতে আদেশ করলাম।

তিনজনেই এসে বস্‌লাম। আমার স্ত্রীকে এখানে দেখেই চন্দন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"এখনও লালজী তোমাকে তাড়ায় নি। এখানেই আছ।"

আমি স্ত্রীকে চুপিচুপি বল্লাম—"ওকে আর ক্ষেপিয়ে কাজ নেই, , তুমি ওর সাম্‌নে থেকে উঠে যাও।"

স্ত্রী উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চন্দনের কি মনে হ'ল, ও বল্লে—"নহি, নহি, যাও মত, বৈঠো।" বলেই উঠে এসে আমার হাতখানা চেপে ধরে বল্লে—"লালজী, বহুকো ঐসা যব ময় কহ্‌তি হুঁ, তব আপ্‌কা জী দুখ্‌তা হ্যয় ?"

ভাল পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে! বল্লাম—"নহি, নহি, নহি দুঃখতা। উহ তো আপ্‌কি ছোটি বহন্ হ্যয়; আগর উস্‌কো আপ কুছ কহেঁ ত ম্যয় কেঁও নারাজ হোউঙ্গা ?"

চন্দন অবিশ্বাসপূর্ণ মাথা নেড়ে বল্লে—"জরুর হোতে হ্যয়। আপ্‌কা আঁখোসে মুঝে মালুম পড় যাতা হ্যয়।" পরক্ষণে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"এবার মরে হামি বাংলাদেশে জন্মাব। বাঙালীর 'বহু' হবো। বাঙালীরা স্ত্রীকে সত্যি সত্যি খুব যত্ন করে, ভালবাসে। কত কষ্ট যে পেয়েছি, তা' তোমার 'বহু' কি করে বুঝ্‌বে! তাই ও আমার কাছে না বসে 'মাজী'র কাছে কাছে ঘোরে। যখন আমরা এই বাড়ীতে ভাড়া ছিলাম, 'মাসীজী' (অর্থাৎ আমার মা) তখন বেঁচে ছিলেন। আমার সে সময় বড় ইচ্ছে করত যে তোমার সঙ্গে কথা বলি—কিন্তু আমার শাশুড়ী কি তা' হ'লে রক্ষে রাখ্‌ত! আমার অসুখ করে কিন্তু বেশ হয়েছে। শাশুড়ীকে 'জমাদারণী' বলে ডাকৃতে পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছি, আর উনিও আগের মত নেই। কেমন মজা!"

বলেই এমন হিহি করে হাস্‌তে লাগ্‌ল যে, সে হাসি অন্ধকার রাত্রে শুন্‌লে যে কোন সাহসী লোকও চমকে উঠবে।

দেবীসহায় চন্দনকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনেই চন্দন উঠে কক্ষের মধ্যে ঢুকৃতে ঢুকৃতে বলে গেল—"ওঁকে বলো না, আমি এখানে আছি। ওঃ, ভারী মজা হ'বে, আমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে!"

উঠে গিয়ে দেবীসহায়কে সব কথা বল্‌তেই সে ক্লান্ত ম্লানহাসি হেসে বল্লে—"পাগল!"

চন্দন জান্‌লার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্বামীর কথা কাণে যেতেই ছুটে এসে ওর হাতখানা চেপে ধরে বল্লে—তুমি কা'কে বল্লে পাগল? কেন বল্লে পাগল?"

চন্দন চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগিল।

দেবীসহায় বোঝাতে লাগ্‌ল যে, সে ওকে পাগল বলে নি। কিন্তু কার কথা কে শোনে! কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ কান্না থামিয়ে চন্দন স্বামীর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বল্লে—"আমি আর কাঁদব না, খুব শান্ত মেয়ে হবো। কিন্তু তুমি কথা দাও, ঐ যে তুমি লালজী ও 'বহু'কে নিয়ে প্রায়ই দেখ্‌তে যেতে, সেই 'বিলায়তী' নাটক আমায় দেখাবে? সে শুনেছি ভারী মজার—'তস্‌বীর' না কি কথা কয়!"

দেবীসহায় সব কথার মত এ কথাতেও স্বীকারোক্তি জানিয়ে ওকে শান্ত করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

চন্দন ফিরে যেতেই গৃহিণী বল্লেন—"এ এক ভালো জ্বালা হয়েছে! ওকে দিক্ না ধরমপুর কিংবা সোলোনে পাঠিয়ে। সারবে ত নাই, শুধু শুধু পাড়া-প্রতিবাসীদের পর্য্যন্ত মজাবে।"

—"ধরমপুরে ও রাখ্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে এমন পাগ্‌লামী আরম্ভ করলে যে, দেবীসহায় ওকে সরিয়ে আন্‌তে বাধ্য হ'ল।"

গৃহিণী আর কোন কথা না বলে 'লাইসোল', 'ফিনাইল', 'কার্ব্বলিক সোপ' খুঁজে খুঁজে বার করৃতে লাগ্‌লেন।

আজ সপ্তাহখানেক অত্যন্ত কাজের ভীড়ে চন্দনদের বাড়ী যাওয়া হয় নি। আজ সকাল থেকে কেবলি তার কথা ভেবে ভেবে মনটা উতলা হয়ে উঠ্‌ছিল। স্ত্রী চায়ের কাপ্ হাতে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। চায়ের কাপ্‌টা

সাম্‌নের টিপয়ের ওপর রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বল্লেন—"আজ চন্দনের কোন খবর পেয়েছ ?"

—"না, কই কিছুই খবর পাই নি।"

—"বাবাঃ, মেয়েমানুষের প্রাণ, সে কি সহজে বার হতে চায় ! পরশু আমি যখন গেলাম, তখন দেখে আমার মনে হ'ল—রাত্রটা বুঝি কাটবে না। কিন্তু ও আজো বেঁচে আছে।"

মনে হ'ল চলে ত যাবেই, কিন্তু যেটুকু সময় থাকে থাক্ না। এই সব স্নেহের পুতুলেরা যতক্ষণ আমাদের কাছে থাকে, ততক্ষণ মনেই থাকে না যে, এরা সবাই একদিন চলে যাবে। যদি সর্ব্বদা তা' মনে থাকৃত, তবে সংসার মৃত্যু প্রতীক্ষাভরা আতঙ্কে মূক শুষ্ক হয়ে উঠ্‌ত। হে অনন্ত শক্তিমান, কে তুমি ? এ কী খেলা খেল্‌ছ আপন মনে !

আজ মন কেবলি উদাস হয়ে উঠ্‌ছিল। ভাব্‌লাম, এখনি একবার গিয়ে চন্দনের সঙ্গে দেখা করে আসি।

এই মৃত্যু-অধিকৃত মরুভূমিতে উত্তাপের জ্বলন্ত পথে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তারি মধ্যে স্বার্থ-পরতার পথ অতিক্রম করে যে যেটুকু সহজভাবে দিল, সে যে কত অমূল্য, কত দুষ্প্রাপ্য, কর্ম্ম-কুজ্ঝটিকাবৃত মানুষ তা' বুঝ্‌বে কি করে।

—"লালজী।"

ফিরে চেয়ে দেখি দ্বারের সম্মুখে চন্দন দাঁড়িয়ে।

স্ত্রী অস্পষ্ট সুরে বল্লেন—"এ ধাক্কা খুব সাম্‌লে গেল দেখ্‌ছি।"

আমি চন্দনকে ডাক্‌লাম—"আসুন ভেতরে।"

চন্দন ভেতরে এল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে বল্লে—"না, আমি আর ভেতরে যাব না। তুমি এ ক'দিন কেন আমায় দেখ্‌তে যাও নি ? আমার যে বড় মন কেমন করৃত।"

বুঝ্‌তে পার্‌লাম তার মনে অভিমান হয়েছে। বল্লাম—"সত্যি বল্‌ছি, এত কাজের ভীড় হয়েছিল যে, নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় ছিল না, তাই যেতে পারি নি। আজ নিশ্চয় যেতাম।"

চন্দনের কাছে ক্রটী স্বীকার করে তাকে ভেতরে ডেকে আন্‌ব ভেবে উঠে দাঁড়াতেই সে বল্লে—"আমার বস্‌বার সময় নেই, আমি চল্লাম।"

চন্দন বেরিয়ে যেতে যেতে আর একবার আমার দিকে ফিরে চাইল। আজ আর ওর নয়নে সে উন্মাদ দৃষ্টি নাই, ওর মুখে সে পাগলের হাসি নাই, সমস্ত মুখ চোখে কেমন যেন অভিমানের বিষাদ-ঘন কাজল-মায়া ভরে উঠেছে।

আমি বল্লাম—"ও একলা বেরিয়ে গেল। পাগলামীর ঝোঁকে কোন্‌দিকে চলে যাবে তা' কে জানে! যাই, ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

গেট্ পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। চন্দনকে কিন্তু সেখানে দেখ্‌তে পেলাম না। কি করি, কোন্ পথে যাই ঠিক্ করৃতে না পেরে ওদের বাড়ীর রাস্তাই ধর্‌লাম। মন বিস্মিত হয়ে উঠ্‌ল—এই ত শুনেছিলাম চন্দন মৃত্যু-শয্যায়। এর মধ্যে এমন সবল ও কি করে হয়ে উঠ্‌ল ? অবশ্য পাগলের বিচিত্র কিছুই নাই—শক্তি তার না থাক্, খেয়াল ত আছে।

হঠাৎ দেখি চন্দনদের নাপিত বুদ্ধন দ্রুতপদে এগিয়ে আস্‌ছে। কাছাকাছি আস্‌তেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্লে—"বাবুজী, আজ সাড়ে তিনটার সময় আমাদের 'কওরাণীজী'র 'শও বরস' পূরো হয়ে গেছে, তাই আপনাকে 'দাগ্ কা নেওতা' দিতে আপনার বাড়ী যাচ্ছিলাম।"

এইটুকু বলে সে আবার হাতযোড় করে নমস্কার জানিয়ে অন্যস্থানে 'দাগ্ কা নেওতা', অর্থাৎ, শবদেহ সৎকার করৃবার নিমন্ত্রণ জানাতে চলে গেল। অতি নিকটে বজ্রপাত হ'লে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, আমি ঠিক্ তেমনি হয়ে পড়েছিলাম। সাড়ে তিনটের সময় যদি চন্দন মারা গিয়ে থাকে, তবে পাঁচটার সময় সে আমাদের বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে কথা কইল কি করে ? এ কি স্বপ্ন ? না, স্বপ্নও ত নয়। তবে কি ?

শ্রীঅমলা গঙ্গোপাধ্যায়

ফুল-বাগিচায় ভ্রমর

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীলেখা ও অঞ্জন সোজাসুজি গিয়ে মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেটের ভেতর প্রবেশ করলো। শাড়ীর এবং 'প্রেজেন্টে'র নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদির দোকানে ওরা ঘুরলো প্রায় ঘন্টাদেড়েক। কিন্তু ওখানে ভদ্রবেশধারী ব্যাপারীদের বিশ্রী নোংরা পরিচয় ভিন্ন শ্রীলেখা ও অঞ্জন অন্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারলো না। শ্রীলেখা বিরক্ত হয়ে বল্‌লো—"এখানে কি ভীষণ দর অঞ্জন দা', তার চেয়ে চলুন কলেজ ষ্ট্রীটে যাই।"

তারপর ওরা বাসে চড়লো। কোলকাতার উত্তর অঞ্চলে গেল। শ্রীলেখার পছন্দানুসারে 'খাদী-প্রতিষ্ঠান' হতে একখানা মুগাপাড়ের খদ্দরের ঢাকাই শাড়ী কিনে যখন ওরা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে এসে প্রবেশ করলো, তখনও গাড়ী ছাড়তে প্রায় মিনিট কুড়ি বিলম্ব ছিল। ওরা একখানা বেঞ্চে বসে পড়্‌লো। আইসক্রীম খেলো। অঞ্জন মোড়কটা খুলে শাড়ীটা আর একবার ভালো করে উল্টে-পাল্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

—"অত করে কি দেখ্‌ছেন অঞ্জন দা', আপনার বুঝি পছন্দ হয় নি?"

শ্রীলেখা অঞ্জনের দিকে তাকালো।

—"দূর পাগল!" হেসে উঠলো অঞ্জন। মুগ্ধকণ্ঠে বল্‌লো—"চমৎকার, বড় ভাল লাগ্‌ছে শ্রী, এ শাড়ীখানা আমার!" একটু থেমে সে পুনরায় বল্‌লো—"কিন্তু কাজল যে রকম সৌখীন, বিদেশী ভাবাপন্ন মেয়ে, এখন এ শাড়ীকে না চট্ বলে বসে।"

ভীষণ রেগে উঠ্‌লো শ্রীলেখা। বল্‌লো একটু জোর গলায়—"তা' নয় তিনি বল্‌বেন। তবে জানেন অঞ্জন দা', 'প্রেজেন্ট' কর্‌তে হয় নিজের পছন্দটাকে উঁচু করে।"

—"কিন্তু শ্রীলেখা দানের সার্থকতা ওখানে নয় তো।"

—"তার মানে?"

—"মানে" ওর দিকে মুগ্ধ অপলক চোখে তাকিয়ে অঞ্জন বললে—"ওকে যদি তৃপ্তই না কর্‌তে পার্‌লুম—"

—"তা' হলে অন্যায় প্রশ্রয়টাকে আমল দেওয়াটাই আপনার মত, কি বলুন?"

মৃদু হেসে অঞ্জন কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখ্‌লো সুমুখে তার দাঁড়িয়ে উৎপল। উৎপল বল্‌লে—"কি হে অঞ্জু, রেকর্ডে গান দিতে এসেছিলে না কি? হ্যাঁ, শুন্‌লুম এবার তোমাদের 'ডুয়েট' রেকর্ডখানা। সত্যি, ভারী চমৎকার হয়েছে! বাস্তবিক দু'জনেই তোমরা গাও বেশ। তবে শ্রীলেখা দেবীর গলাটা—"

গল্প কর্‌তে কর্‌তে উৎপল বন্ধুর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে ওধারটায় চলে গেল। চলে ত গেল, কিন্তু শ্রীলেখার চিত্তে যেন ও স্বপনের মায়া-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে গেল। "তোমরা দু'জনে" কতদিন, কতবার, কতলোক বলেছে, কই কখনো ত এমন করে মন দুলে ওঠে নি; ভরেও ওঠে নি এমন বিচিত্রভাবের অনুভূতিতে? আজ কেন এমন হ'ল? স্পন্দিত বুকখানা তার অজানা হর্ষে ঘন ঘন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। অত্যন্ত উন্মনা হয়ে গেল সে। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো। অঞ্জন এসে ডাক্‌লো—"এস শ্রীলেখা।"

কলের পুতুলের মতই ওকে অনুসরণ করলে শ্রীলেখা। কয়েক মিনিট পর গার্ড-সাহেব সবুজে নিশান উড়িয়ে তীব্রস্বরে হুইসল্ বাজিয়ে গাড়ী ছাড়বার ইঙ্গিত জানালে।

শ্রীলেখা বসেছিল খোলা জানালার ধারে। তখন মধুর অপরাহ্ণের মাঝামাঝি। সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে। তার এক ঝলক রঙীন আলো শ্রীলেখার চোখে

শ্রীমতী করুণা।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

[আদর্শের সৌজন্যে

মুখে পড়ে ওর ওই বিমনা ভাবটাকে বড়ই মধুর করে তুলেছে। চুরুট টানছিল অঞ্জন ওর সাম্‌নের আসনে বসে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি শ্রীলেখার দিকে পড়তে, ও যেন কেমন চম্‌কে উঠ্‌লো। শ্রীলেখার ওই গোলাপী-আলো-ঝল্‌মলে মুখখানা ওর চিত্তে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। ও আর একবার চোখ তুলে শ্রীলেখার পানে তাকালো। সত্যিই ও আর সেই আগের মত ছোট মেয়েটী নেই, ও যেন পূর্ণিমার ভরা নদীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

আজ কাজলের জন্মতিথি। উৎসব-আনন্দে সারা বাড়ীখানা মুখর হয়ে উঠেছে। নিমন্ত্রিতদের ভীড় নিবিড় হয়ে জমেছে। দেবদারু পাতা, ফুলের মালায় বাইরের তোরণ ঝলমল করছে। আতর-এসেন্সের গন্ধে বাড়ী ভরপুর। হলঘরখানি নূতন সাজ-সজ্জায় উজ্জল হয়ে উঠেছে। একটা ছোট টেবিলে উপহারের দামী দামী জিনিষগুলো স্তূপীকৃত হয়ে জমে একটা যেন ছোটখাটো পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে।

—"আসুন, ভিতরে আসুন অঞ্জন দা'।"

সন্ধ্যার সময়ে অঞ্জন এল উৎসব অঙ্গনে। কাজল ফুল্লমুখে ওর একখানা হাত ধরে হলে নিয়ে গিয়ে বসালো। অঞ্জন তাকিয়ে দেখ্‌লো কাজলের পানে। সাজের অপূর্ব্ব ছটায় ওকে আজ চমৎকার মানিয়েছে। পরণে ওর খুব পাত্‌লা জমীর 'পরে সোনালী জরীর কাজ করা ভেলভেট পাড়ের নীল জর্জ্জেট শাড়ী, গায়ে ওরই সঙ্গে 'ম্যাচ' করা টুক্‌টুকে নীল 'সট স্লিপে'র ব্লাউস। রুক্ষ চুলগুলো খুব আল্‌গাভাবে 'রিবন্‌' দিয়ে বাঁধা। তারই দু'-চারটে কপালে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। 'লিপষ্টিকে' ঠোঁট দু'টী সদ্যফোটা গোলাপের মতই টুক্‌টুক্‌ করছে লাল। অঞ্জন স্মিতহাস্যে ওর জন্মোৎসবের অভিনন্দন জানিয়ে হাতে তুলে দিল উপহারের শাড়ীখানা ও একখানা কি যেন পাত্‌লা মত বই। কাজল শাড়ীখানির পানে ক্ষণিক চোখ বুলিয়ে ওখানা রাখ্‌লো টেবিলে। তারপর বইখানা খুলে সে উল্টে-পাল্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ একখানা পাতায় চোখ পড়তে ও থম্‌কে গেল—"কাজল—কাজল বসু" না—হ্যাঁ, তাই ত। ওর অন্তর বিস্ময় ও আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠ্‌লো। এ বইটা একখানা মাসিক-পত্রিকা। কাজল বরাবর গান ও কবিতা লেখে অসংখ্য, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ওর কোনও রচনা সার্থক করে মাসিকের বুকে ফুটে ওঠে নি। অঞ্জন বরাবর গল্প গান ইত্যাদি অনেক মাসিকে লেখে। ওর কাছে কাজলের কয়েকটী কবিতা সংশোধনের জন্যে ছিল। অঞ্জন ওকে কিছু না জানিয়ে একটা কবিতায় সুর দিয়ে স্বরলিপি করে একখানা মাসিকে ছাপিয়ে রেখেছিল। আজকের এ মিষ্ট উৎসব-দিনে কাজলকে এতখানি ফুল্ল করার লোভ সে কিছুতেই সংবরণ করতে পারলো না। আনন্দ-উচ্ছ্বসিত মুখে যেন স্বপন-মাখা চোখে কাজল কিয়ৎক্ষণ ছাপার অক্ষরে লেখা আপন গানটীর পানে মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইল। তারপর চোখ তুলে অঞ্জনের পানে তাকালো। কি যেন ও বল্‌তে চাইছিল, কিন্তু কৃতজ্ঞের অশ্রুবন্ধ উৎসে কণ্ঠস্বর ওর রুদ্ধ হয়ে গেছলো।

—"নিশ্চয়ই কিছু বল্‌বে আমায়, কি বলো কাজল?" অঞ্জন ওর ভাবখানা লক্ষ্য করে স্নেহ-মধুর-কণ্ঠে বল্‌লো—"এবারে তোমাদের সেই ধন্যবাদের পর্ব্বটা—ঠিক নয়?"

—"শুধু ধন্যবাদ কেন অঞ্জন দা', তার চেয়েও অনেক বেশী।" বল্‌তে বল্‌তে কাজলের কণ্ঠ হাসির নির্ঝরে যেন উচ্ছল হয়ে উঠ্‌লো। পর মুহূর্ত্তেই নিজেকে দমন করে বেশ সংযতভাবে ও বল্‌লো—"আপনি আমার জন্যে কত কষ্ট করলেন—"

—"না, না।"

এমন সময় উৎপল কক্ষে প্রবেশ করলো, বল্‌লো অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে—"শ্রীলেখার বাবা লোক পাঠিয়েছে, শ্রীলেখার না কি ভয়ানক অসুখ করেছে।"

—"শ্রীলেখার অসুখ করেছে!" অত্যন্ত চঞ্চল পদক্ষেপে অঞ্জন ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

দিনগুলো চলে যায়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড়দিনের বন্ধ এসে পড়লো। 'কন্‌সেসনে' দেশ-বিদেশে যাওয়ার মহাধুম পড়ে গেল। স্বাস্থ্যকামীদের রোগপাণ্ডুর শীর্ণমুখে হাসির আভাষ জাগ্‌লো। ভ্রাম্যমানের দল আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ওদের সে আনন্দ একটা দেখ্‌বার জিনিষ। কে কোথায় যাবে—সে স্থান যেন আর কিছুতেই নির্দ্ধারিত হয় না। কাজলও সেই দলের। নেচে উঠ্‌লো ও হাজারীবাগ যাবে বলে। কিন্তু উৎপল পেলে না ছুটী। মনক্ষুণ্ণ হয়ে কথায় কথায় একদিন ও উৎপলকে বল্‌লে—"আচ্ছা দাদা, 'অঞ্জন দা' বল্‌ছিলো, বড়দিনের বন্ধে ও কোথাও না কোথাও বেড়াতে বেরোবে—তা' ওর সাথে আমি আর মা গেলে কি হয়?"

—"ওর সাথে!"

মুহূর্ত্তে উৎপলের মুখটা শুকিয়ে গেল। দাঁতের চাপে ওর ওষ্ঠ প্রান্ত লাল হয়ে উঠ্‌ল। ও কিছুক্ষণ নীরব দৃষ্টি বোনের উৎসুক মুখের পানে রেখে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তারপর নিজের চিত্তকে অনেক কষ্টে আয়ত্তে আন্‌লো। বেশ মরিয়া হয়ে উঠে ও বল্‌লো অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে—"না ভাই কাজল, তা' হয় না।"

—"কেন দাদা?"

—"জানিস ত তুই কাজল, অঞ্জুর ওপর আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্যরকম। ওকে পেতে চেয়েছিলুম আমাদের সংসারে একান্ত আপনার করে। কিন্তু বোন্‌, যদি সে পথই রইল রুদ্ধ, তবে আর কেন মিছে ঘনিষ্টতা—"

—"তার মানে?" উৎপলের কথার মানে অত্যন্ত উৎসুক-কণ্ঠে কাজল জিগ্‌গেস কর্‌লো।

"মানে—" গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে উৎপল বল্‌লে—"অঞ্জন বলে সে না কি শ্রীলেখাকে বিয়ে করবে।" ওর কণ্ঠ হতে আর বাক্য নিঃসরণ হ'ল না।

তখন কাজলের চক্ষু দু'টী সজল হয়ে উঠেছিল। এক ফোঁটা জল 'টপ্‌' করে ওর গালের ওপর ঝরে পড়্‌তে ও ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠলো, ত্রস্তে ভিজে চোখ দুটো মোছবার গোপন প্রয়াসে পিছন ফিরতেই মায়ের কাছে পড়লো ধরা। মা কখন যেন ঘরে ঢুকে নিঃসাড়ে ওখানে বসেছিলেন। ছেলেমেয়ের সব কথাগুলিও শুনেছিলেন। অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের অতলে চেপে রেখে, মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন।—"ছি, দুঃখ করিস নি মা!"

আশিস্‌বর্ষী হাতে মেয়ের চোখ দু'টী মুছিয়ে দিয়ে অনুতপ্ত-কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—"দোষ সম্পূর্ণ আমাদেরই। আমরা মা বাপ হয়ে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে শিশুর মতই ভুলে যাই একটা রঙীন ঠুন্‌কো খেল্‌না পেয়ে। এ যেন আমাদের সেই শৈশবের পুতুল খেলা। বাইরের ঝকমকে চেহারা, চকমকে আড়ম্বর দেখে আমরা দুনিয়া ভুলে যাই, হয়ে যাই আত্মবিস্মৃত। সুন্দর—ওঃ, অপরূপ সুন্দর ওই ছেলে! বিশ্বের সাথে যেন তুলনা চলে না ওর। ভুলে যাই সাম্‌নে পিছন, ভুলে যাই ও একজন যুবক, একান্তই অপরিচিত। দিয়ে ফেলি ওকে অবাধ প্রশ্রয়, অগাধ—"

হঠাৎ অপর্ণার কণ্ঠ নীরব হ'ল বাইরে যেন কার জুতোর শব্দ পেয়ে। তখনই অঞ্জন বল্‌লে স্ক্রীনের আড়াল থেকে—"ভেতরে আস্‌তে পারি?"

বেশ করে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে উৎপল বল্‌লে—"এস ভাই।"

ঘরে ঢুকেই অঞ্জনের ঠোঁট দুটো যেন পাহাড়ী ঝর্ণার মতই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। সে জানাল—"আজকের সন্ধ্যের গাড়ীতে শ্রীলেখা, সুজলা এবং ওদের মাকে নিয়ে পশ্চিম বেড়াতে যাচ্ছি। কারণ, সেই 'ফেন্টে'র পর থেকে শ্রীলেখার 'হার্টে'র 'উইকনেস্‌' আর কিছুতেই সারছে না। ডাক্তারের মত বায়ু পরিবর্ত্তন—অথচ, বাপের মর্‌বার পর্য্যন্ত ফুরসৎ নেই।" তারপর হাত ঘড়িটার পানে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ও বল্‌লে—কাজলের দিকে তাকিয়ে—"তুমি তা' হলে মুলতান ও কালাংড়া সুরটা ঠিক্‌ করে রেখো, আমি এসে শুন্‌বো।"

আর ওর দাঁড়াবার মুহূর্ত্ত অবসর ছিল না। হাওয়ার বেগেই ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

সেদিন বিকেলবেলা যখন অঞ্জন ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় 'স্যুটকেস', 'বেডিং' প্রভৃতি 'লগেজ'গুলো চড়িয়ে শ্রীলেখাদের বাড়ী অভিমুখে রওনা হ'ল, তখন সাম্‌নের বাড়ীর সেই তরুণ ডাক্তারের স্ত্রী শিশিরকণার বুক থেকে একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়লো। গাড়ীর চাকাগুলো যেন ওর বুকটাকে দলিত করে দিয়ে চলে গেল। ও জান্‌লা হতে সরে এল। ওর কণ্ঠ হতে অজান্তে নির্গত হ'ল—"তা' হলে সত্যিই কি অঞ্জন দা' শ্রীলেখাকে বিয়ে করবে—ওটা গুজব নয়।"

শিশিরকণার সাম্‌নে একটা ড্রেসিং টেবিল ছিল। তার ঝক্‌ঝকে বুকে ওর ঢলঢলে মুখটা ফুটে উঠতে ও নিজের ওই শুভ্র মুখের পানে দু' দণ্ড চেয়ে রইল। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুখটা মুছ্‌তে মুছ্‌তে ভাব্‌লো—উঃ, শ্রীলেখা কি মিশ্‌মিশে কয়লার মত কালো! অথচ, অঞ্জন দা' একদিন নিজ মুখেই বলেছিলেন—"কণা, তুমি কি সুন্দর! কি অপরূপ সুন্দর তোমার ওই ভাসা ভাসা চোখ দু'টী! প্রত্যেক পুরুষের কিন্তু তোমার মতই সুন্দরী স্ত্রী কামনা করা উচিত।"

এমনিতর কত অতীতের ছন্দে গাঁথা সুখ-দুঃখের গানে শিশিরকণার অন্তর ভরে উঠ্‌লো। অনুযোগ, শাসন, অনুরোধ, বারণ কিছুই মান্‌লো না ওর মন। আপন ধ্যানে ও আপনি তন্ময় হয়ে গেল।

সেদিন—প্রায় বছর দুয়েক আগে একদিন সকালবেলা নিজের ঘরে বসে 'মণীশে'র মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অনুরূপা দেবীর 'বাগ্‌দত্তাখানা' ও পড়ছিল। সহসা কাণে এল ভেসে ওর বাবার ও অঞ্জনের উচ্চকণ্ঠের কথাবার্ত্তা। কই, অঞ্জন দা' ত বাবার সঙ্গে এমন রুক্ষকণ্ঠে কথা বলেন না। তবে? ব্যাপার কি? তখনই বইখানি মুড়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে ওঁদের কথা শুন্‌তে ও উৎকর্ণ হয়ে রইল। আগে কি কথা হয়েছিল সেটা ও জান্‌তে পারে নি। তারপর অঞ্জন দা' ওর বাবাকে জিগ্‌গেস করলেন—"তা' হলে, আপনি আমার জন্যে সেই সঙ্গীত-সম্মিলনের 'পোষ্ট'টা ঠিক করে রেখেছেন? তা' না হলে আমার এদিকে আবার একটা ভালো 'অপারচুনিটি' মিস্ হয়ে যাচ্ছে।"

—"আহা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন অঞ্জন তুমি!" বাবা বল্‌লেন হাস্‌তে হাস্‌তে—"বিয়েটা তোমাদের হয়ে যাক্ আগে, চাকরীও তুমি পেয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।"

—না, না, সেজন্য ত বিশেষ কিছু নয়—সাম্‌নে ভাদ্র আশ্বিন কি না, তাই বল্‌ছিলুম।"

হাঃ—হাঃ—হাঃ আরও জোরে হেসে উঠলেন বাবা। বল্‌লেন—"বারে, আমি তোমাকে আগে চাকরী করে দিই, তারপর তুমি বলে বসো, আমি অমুক জজের মেয়েকে বিয়ে করবো। তখন—"

বাবা হয় ত কথাগুলো বলেছিলেন নিতান্তই পরিহাসচ্ছলে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য অঞ্জন দা' মেনে নিলেন সত্যি বলে। উঃ, কি ভীষণ রুক্ষ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তাঁর!—"তা' হলে আপনিও অনায়াসে মেয়েটিকে গছিয়ে আমাকে হতাশ করতে পারেন ত।"

আর শোন্‌বার মত ধৈর্য্য তখন ওর ছিল না, প্রবৃত্তিও হ'ল না। ছিঃ, প্রেমের ভিত্তি গড়বে কি না স্বার্থের জমীতে!

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি—
সহে না প্রেমের অপমান;
অমরাবতী ত্যজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তার চেয়ে সে যে মহীয়ান।"

অতীতের ছন্দভরা গন্ধে বিভোর স্মৃতি পুষ্পটীকে মুহূর্ত্তে ম্লান করে দিয়ে অদূরে নেটের ছাতা-মশারীর ভিতর শিশিরকণার খুকুমণি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লো।

মুঙ্গেরে এসে শ্রীলেখাদের দিনগুলি বেশ কাটছিল। পাহাড়ের দেশ—শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বড় বড় মাঠ, খোলা আকাশ, ছায়াঢাকা পথ। এরই মধ্যে শ্রীলেখার শরীরের দুর্ব্বলতা অনেকটা সেরে এসেছে। মনে হয় যেন এখন মুক্ত, অবাধ, স্বচ্ছন্দ মধুর মনের গতি ওর। নিয়মিত শ্রীলেখা সুজলা ও অঞ্জনের সাথে পাহাড়ে ওঠে, দেবদারু, শাল, মহুয়ার ছায়াঢাকা পথে অবারিত আনন্দে, উন্মত্ত উৎসাহে ছুটে চলে। আবার মাঝে মাঝে সুজলা

ও অঞ্জন হতে পিছিয়ে পড়ে অনেক দূরে। সুজলা পিছন ফিরে দেখে ও নীচু হয়ে বাবলা গাছের হল্‌দে ফুলে আঁচল ভরিয়ে তুলছে।—"এস শ্রী।" অঞ্জন ওকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে।

এমনিভাবে সমস্ত দিন হৈহৈ করে, পিক্‌নিকে যেতে, পাহাড়ে ঘুরে, শীকার খুঁজে, ছবি তুলে, গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, ওদের দিনগুলো দক্ষিণা হাওয়ার মতই মিষ্টি আবেশে যেন ফুরফুরিয়ে বেয়ে চল্‌ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুজলাদের স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে এল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীলেখা ফেরবার আয়োজনে জামা-কাপড়, জিনিস-পত্তর প্রভৃতি গুছিয়ে 'সুটকেসে' তুলছিল, আর সুজলা নূতন সই সংগ্রহ করা ওর ফটোগ্রাফ খাতাখানির পাতা গভীর মনোনিবেশে ওল্টাচ্ছিল। সেই সময় অঞ্জন ঘরে এসে ঢুক্‌লো। সুজলার হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে উল্টে-পাল্টে দেখে মুখখানা ও সাধ্যমত গম্ভীর করে কৃত্রিম অভিমানের সুরে অনুযোগ করলো—"বাঃ, বেশ মেয়ে তো তুমি সুজলা! সকলের সই নিয়েছ, আর আমার বেলাতেই বুঝি ফাঁকা!"

সুজলা মুখখানি নত করলো। শ্রীলেখা বলে উঠ্‌লো—"বারে, আপনার সই নেবে কেমন করে দিদি! জানেন না বুঝি—'ভালোবাসি যারে, জীবন মরণ পরিচয় থাক্‌বে বাঁধন ডোরে'।"

কথাগুলো শ্রীলেখা সাধ্যমত স্বাভাবিক কণ্ঠে বল্‌তে চাইলেও ওর গলার স্বর দস্তুরমত বিকৃত শোনাচ্ছিল। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছ্‌লো। চাপা হাসিতে চোখ নাচিয়ে অঞ্জন জিগ্‌গেস করলে—"তার মানে, এটা তোমাদের কল্পনা না কি শ্রী?"

—"কল্পনা কেন হতে যাবে অঞ্জন দা'—"মুখ লুকাবার ছলে একটা জামা উঁচু করে মুখের সাম্‌নে ভাঁজ করতে করতে শ্রীলেখা বল্‌লো—"সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্। এই সামনের মাসে আপনার সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে।" বলে ও অশ্রুরই রূপান্তর এক অদ্ভুত হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজলা স্মিত মধুর সলাজ দৃষ্টি মেলে মুহূর্ত্ত তাকালো অঞ্জনের চোখের দিকে। অঞ্জন জিগ্‌গেস কর্‌লো—"কথাটা সত্যি না কি সুজলা?"

—"শুন্‌ছি ত সেই রকমই অঞ্জন দা', কিন্তু আপনি যে শ্রীলেখাকে ভালবাসেন।"

ক্ষণকাল নীরব রইল অঞ্জন। তারপর বল্‌লো সুজলার পানে তাকিয়ে—"তুমি ভুল বুঝ্‌ছো সুজলা। আমি শ্রীলেখাকে ভালবাসি—হ্যাঁ, তাকে খুবই ভালবাসি। কিন্তু সুজলা সে ভালোবাসার রূপ যে অন্য। ওর সঙ্গীতকে, ভালবাসবার অপরিসীম শক্তিটাকে আমি ভালবাসি। ওকে আমি স্নেহ করি।"

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে পাশের ঘরে শ্রীলেখা নিজের চঞ্চল চিত্তটাকে কোনমতেই আয়ত্তে আন্‌তে না পেরে গরম কোটটা গায়ে দিয়ে ঘরের সংলগ্ন পিছনের ফুলবাগানে গিয়ে দাঁড়ালো। শীতের প্রাচুর্য্যে তখন ফুটন্ত ফুলগুলি কুঁচকে গেছ্‌লো। আকাশে জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কুয়াসার ক্ষীণ আবরণে ও আজ চাপা। দিগন্ত ওকে পেতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। "পূর্ণচাঁদ, পূর্ণচাঁদ! ত্রয়োদশীর পূর্ণচাঁদ পার্‌ছে না ফুট্‌তে—তবুও কত সুন্দর!" পাহাড়ের মাথার পাত্‌লা কুয়াসার পানে তাকিয়ে উন্মনা শ্রীলেখা বল্‌লে অনেকটা নিজের মনেই—"পারছে না ও বিশ্বকে ওর আলোয় ধুইয়ে দিতে। অস্পষ্ট, ম্লান, তবুও কত সুন্দর—ঠিক্ যেন অসময়ে মরে যাওয়া অস্ফুট প্রেমের মতই সুন্দর!"

কয়েকদিন পর ওরা বাড়ী ফিরলো। অঞ্জন নিজের ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে একখানা খামেভরা পত্র তুলে নিয়ে অসহ্য আনন্দে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সত্যি, সত্যিই কি তবে ওর অন্তরের একান্ত অভিলাষ পূর্ণ হবে—জীবনটা এবার সার্থকতার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে? পত্রখানি এসেছে কোনও ফিল্ম কোম্পানী হতে। একবার, দুইবার, তিনবার, বোধ হয় বার আষ্টেক ও চিঠিখানি পড়লো, তবুও পড়ার সাধ ওর যেন

কিছুতেই মেটে না। এই বন্দে মেলে ওকে রওনা হতেই হবে। সময় চলে যায়। ঘড়িতে তিনটের বার্তা ওকে সজাগ করে তুললো। চম্‌কে ও উঠে দাঁড়ালো। পরম যত্নে পত্রখানি 'সুটকেস' খুলে ডায়েরীর পকেটে রাখ্‌তে রাখ্‌তে চাকরকে ডেকে জামা-কাপড় গোছাতে বল্‌লো। তারপর টেবিলে গিয়ে বস্‌লো ওর ছাত্রীদের বিদায়-বার্তা জানিয়ে পত্র দিতে। তখন সমস্ত ঘরখানা কিসের একটা মিষ্ট গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

"প্রণাম নিও পথের প্রিয়, দিও আশীর্ব্বাদ,
ছিন্ন যদি রয় গো মম ক্ষম অপরাধ।"

সেদিন গভীর রাত্রে অঞ্জন যখন চলন্ত ট্রেণের কামরায় বসে জ্যোৎস্না-হসিত প্রান্তরের দিকে চেয়ে আনন্দে স্নাত হয়ে উঠেছিল, ঠিক্ তখন সুজলা ওর আপন কক্ষে অশ্রু-জমাট বুকে সেতারে করুণ গুঞ্জন তুলেছিল। ওর ওই সুরের মূর্চ্ছনা সুপ্ত পল্লীর বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে মর্‌ছিল—

"আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন,
সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে
করবো নিবেদন।"

হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে সুজলা চম্‌কে উঠলো। মুখ তুলে দেখ্‌লো শ্রীলেখা ওর সুমুখে দাঁড়িয়ে। সেতার তখনই থেমে গেল। ও বল্‌লে—"লেখা, তুই ঘুমোস্ নি এখনও?"

—"না দিদি।" ঘরের ভেতর প্রবেশ করে লেখা দিদির পাশে বস্‌লো। একটুখানি থেমে স্নেহের কণ্ঠে বল্‌লে—"কেন তুমি অকারণ দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে মনকে কষ্ট দিচ্ছ ভাই! ওটা নিছক মোহ। ওটাকে জোর করে অন্তর থেকে সরিয়ে দিয়ে, সার্থকতার আলোয় নারীর সত্যি-কারের আদর্শকে উজ্জ্বল করে তোল।"

ঘরের মোমবাতিটা যেন শ্রীলেখার কথায় সায় দিয়ে আনন্দে মৃদু মধুর হাসি হাস্‌ছিল। সুজলা শ্রীলেখার আলোক-দীপ্ত মুখের পানে চেয়ে রইল একদৃষ্টে, অশ্রু টলমলে চোখে।

শেষ

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

ভৌতিক গল্প
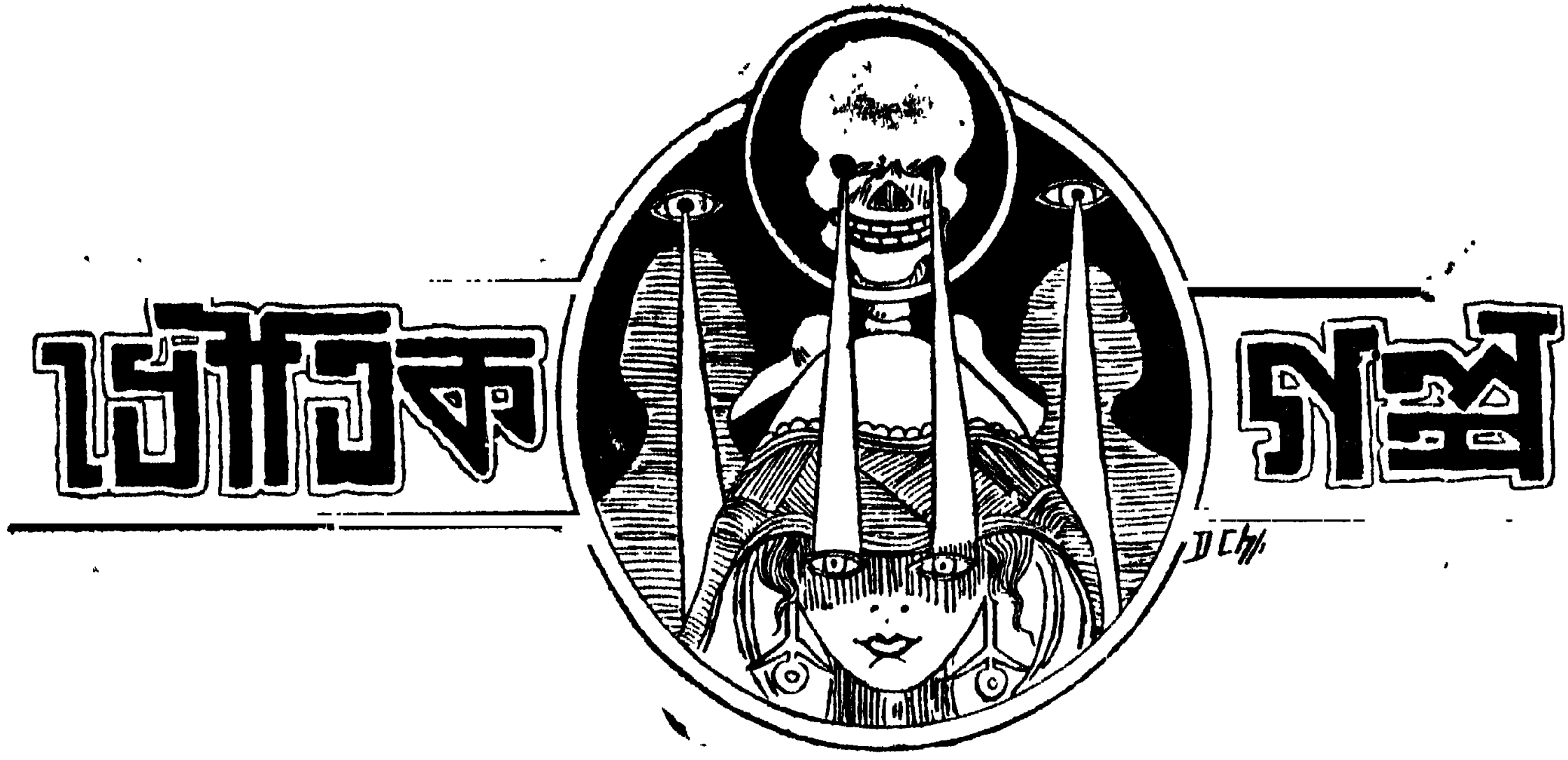
জীবনের অন্তরালে

শ্রীগৌরীরাণী বসু

জীবনী লেখ্‌বার ইচ্ছা আমার নেই। অত বড় সাহসও হয় না। সাধারণ লোকের জীবনে এমনি কিই বা ঘটে যে, সে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবে, আর সকলে আগ্রহভরে সেটা পড়্‌বে। অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যেই তো সব বাঁধা ধরা—সূর্য্যোদয়, আহার-বিহার, কাজ-কর্ম্ম, মায় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। একই ভাবে সকলের দিন কাটে। সেই একই মামুলী বাঁধা গৎ। পিছন ফিরে দেখ্‌লে সবই অন্ধকার, সবই ফাঁকা। তা'তে শোনাবার মতো কিছুই থাকে না। আবার যদি কেউ কিছু শোনায়—তা' অনেকে আজগুবি ব'লে উড়িয়েই দেয়। যা' আমরা জানি না বা বুঝি না, তা'কে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আমার এই কাহিনীটাও শুন্‌লে মনে হবে—অসম্ভব, অসত্য। কিন্তু এই ঘটনাটা নিছক সত্য ও সম্ভব হয়েছিল আমারই জীবনের কয়েকটা দিনে।

লোকের জীবনধারা সব সময়ে একই ভাবে কাটে না—তার ব্যতিক্রম হয়। আমারও তাই হয়েছিল। বাড়ী ছিল আমার রামদেবপুরে। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন—গিরীশ। ছেলেবেলায় দুরন্ত ছিলাম ব'লে লেখাপড়া আমার বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। বাবার কড়া শাসনে কোনরকমে কম্পাউণ্ডারীটা পাশ কর্‌লুম। কিন্তু চাকরী আমার জুট্‌লো না। তাই দুরন্তপনা আমার বেড়েই চল্‌লো—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহস ও শরীর দুই-ই। কিন্তু এ সুখ আমাকে বেশীদিন ভোগ কর্‌তে হলো না। বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থাও ভাল নয়। তায় আমি আবার এখন একা নই—স্ত্রী, একটী ছেলে ও বিধবা পিসীমা। চাকরী আমায় কর্‌তেই হবে। এখন আমার ওপরই সমস্ত নির্ভর করছে। না হ'লে সংসার অচল। এতদিন কিন্তু এটা বুঝ্‌তে পারি নি।

যাক্‌, অনেক সন্ধানে ত একটা চাকরী জুট্‌লো। আমাদের গ্রাম থেকে বার ক্রোশ দূরে গোপীগঞ্জে। সেখানে পাশ করা ঐ একমাত্র ডাক্তার, আর আমি তার

কম্পাউণ্ডার। সুতরাং যথেষ্ট প্রতিপত্তি। দিনের পর দিন ডাক্তারের খ্যাতি বেড়েই চল্‌লো। ঘরের অন্দর থেকে আরম্ভ ক'রে সভা-সমিতি সর্ব্বত্রই তাঁর অবারিত দ্বার। সর্ব্বত্রই ডাক্তারের প্রশংসা, অভ্যর্থনা—তিনি যেন গৃহস্থের মুক্তিকামী আরাধ্য দেবতা।

"যেখানে সঙ্কোচ আর সন্দেহ কম, ভয় আর বিপদের উৎস সেইখানেই থাকে লুকিয়ে"—একথা বুঝ্‌তে পার্‌লাম সেদিন, যেদিন ডাক্তার সেই গ্রাম থেকে রিক্তহস্তে বিতাড়িত হলো—অনেক কুলবধূ ও অনূঢ়া কন্যার সর্ব্বনাশ ক'রে।

তারপর আমার চারিদিকে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। কোথায় চাকরী পাই, কি ক'রে সংসার চালাই? —এই ভাবনাটাই আমার প্রবল হয়ে উঠ্‌লো।

রোগী এখনও অনেক আসে। কিন্তু ডাক্তারের অভাবে বিনা ওষুধেই তাদের ফির্‌তে হয়। তাই ঠিক্ কর্‌লাম যে, আমি নিজেই ডাক্তারের সমস্ত ওষুধ আর বইগুলো নিয়ে একটা ডাক্তারখানা খুলে বস্‌ব। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ঘরের ভাড়া দিয়ে আমার হাতে আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কাজেই স্থান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

কিছুদিন পরে বিনা ভাড়ায় মস্ত বড় একটা বাড়ী মিল্‌লো। তার একদিকে নিজের থাক্‌বার জায়গা, অন্য-দিকে ডাক্তারখানা হলো। এ বাড়ীর মালিক কিছুদূরে অন্য একটা বাড়ীতে থাকেন। এটাতে থাক্‌তে না কি তাঁর বড় ভয় করে। তাই এতদিন বাড়ীটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এর পিছন দিকে বন-জঙ্গলেরও সীমা ছিল না।

যাক্, আমার যখন একটা বাড়ীর দরকার, তখন ঐ সমস্ত আজগুবি উপদ্রবের কথায় না ভুলে বাড়ীটা নিয়ে ফেলাই সমীচীন মনে করলাম।

প্রথম দিন সেই নতুন বাড়ীতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বন্ধু বান্ধব নিয়ে গল্প গুজবে ও রান্না-খাওয়ায় আমার সময় মন্দ কাট্‌লো না। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হ'তে লাগ্‌লো, নিস্তব্ধতাও তত বেড়ে চল্‌লো। পাড়াগাঁয়ের রাত্রি। সব নিঝুম—আর চারিদিকে ঘন কালো অন্ধকার। ঘরের পাশ থেকে মাঝে মাঝে শেয়াল কুকুরের ঝগড়া ও পাখীর হিস্‌হিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে বড় বেল গাছের ডালটা ছাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ক'রে খটাখট শব্দ কর্‌ছে। মনে মনে ভাব্‌লাম, এর জন্যই হয়ত লোকে ভয় করে। তারপর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যখন আমি অগাধ নিদ্রায় অভিভূত, তখন 'খট্' ক'রে একটা শব্দ হলো। চেয়ে দেখি আমার মাথার দিকের জানলাটা খোলা। ভাব্‌লাম—ওটা নিশ্চই ঠিক্‌মত বন্ধ করা হয় নি—তখন উঠে জান্‌লাটা বন্ধ কর্‌তে দাঁড়ালাম। কিন্তু ও কি! জান্‌লার পাশে যেন কারা ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বল্‌ছে না? মনে ভয় হলো। কিন্তু সেটাকে বেশীক্ষণ স্থান দিলাম না। যে এতদিন লক্ষ্মীছাড়া, দুর্দ্দান্ত ব'লে আদৃত হ'য়ে এসেছে, তার আবার ভয় কিসের? মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে শক্ত ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে? কা'রা ওখানে?"

উত্তরে বাতাসে ভেসে এলো এক বিকট হাসি—হাঃ হাঃ, হা হা। সে হাসির আর বিরাম নাই। চলেছে প্রায় মিনিট দুই ধ'রে। বদ্ধ পাগলে যেমন ক'রে হাসে—এও ঠিক্ তেমনি। প্রাণটা এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো। এ কি আমাদের ডাক্তারের অনুসন্ধানকারী কোন গুপ্তদল না কি?

একে বাঙালী, তায় নিরস্ত্র। সম্বলের মধ্যে একগাছা বাঁশের লাঠি। তাই নিয়ে সেই অন্ধকার রাত্রে একা আর বনের মধ্যে যেতে ইচ্ছা হলো না। তাড়াতাড়ি ঘরের জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে লাঠি হাতে বাকী রাতটা জেগে কাটিয়ে দেবো ব'লে স্থির কর্‌লাম। তারপর আবার সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। ভয় ও ভাব্‌নায় রাতটা কেটে গেল।

পরদিন লোক ডেকে ঘরের পিছন দিক্‌কার সমস্ত বন

কাটিয়ে ফেললাম। অবশ্য বেলগাছটা বাদ দিয়ে; কারণ, ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি ওটা না কি কাট্‌তে নেই।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ শান্তিতেই ঘুমুচ্ছি, এমন সময় খট্‌খট্‌ খটাস্‌ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো, কে যেন আমার ঘরের বাইরে খড়ম পায়ে দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে। তাই তো! এত রাত্রে কি কারো কোন অসুখ বাড়লো? উঠে বস্‌লুম। না, এত নিজের ইচ্ছায়ই চলে বেড়াচ্ছে। কই, কাকেও ত ডাক্‌ছে না? তবে কি আমার শোন্‌বার ভুল? জেগে জেগে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না, এই তো আমি বেশ বসে আছি—শুন্‌তেও তো ভুল হয় নি। তবে?

বেশীক্ষণ আর ভাব্‌তে হলো না। দেখি, খট ক'রে ঘরের দরজা খুলে আমারই সাম্‌নে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত যজ্ঞ-উপবীতধারী সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লাম। কণ্ঠস্বর রহিত হলো। মুখ ফুটে একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না। চোখ চেয়ে আছি বটে, কিন্তু সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি। মাথা বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুর্‌ছে। এইরূপে কিছুক্ষণ কাট্‌ল। তখনো দেখি সেই মূর্ত্তি ঠিক্‌ আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর শুন্‌তে পেলাম কে যেন বল্‌ছে—"তুই বেলগাছটা না কেটে খুব ভাল করেছিস্‌। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ওই গাছের তলায় ধূপ-ধুনা গঙ্গাজল দেওয়ার ব্যবস্থা কর্‌বি—তা' হ'লে তোর ভাল হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এ সমস্ত কথা প্রকাশ হ'লে কিন্তু—"

তারপর আর কিছু শুন্‌তে পেলাম না। সেইখানেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হলো, চেয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ছে।

একে একে সব কথা মনে পড়ে গেল। স্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি না। চোখের সাম্‌নে এখনও ঘরের দরজা খোলা। কাউকে কোন কথা প্রকাশ কর্‌বারও ক্ষমতা নেই। তাই মনের কথা মনে চেপে রেখে দিনের কাজ আরম্ভ ক'রে দিলাম।

তারপর সেদিন সন্ধ্যা থেকে প্রত্যহ বেলতলায় ধুনা গঙ্গাজল দেবার ব্যবস্থা কর্‌লাম। এই ক'রে চারটী দিন বেশ কাট্‌ল। কোথাও কোন গোলযোগ নেই। সবই স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। এমন সময় একদিন শুয়ে শুয়ে সেই মূর্ত্তিটীর কথা ভাবছি—হঠাৎ দেখি তিনি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছেন। কি করবো কিছুই ঠিক্‌ কর্‌তে পার্‌লাম না। তাঁর আদেশে যন্ত্র-চালিতের মত বিছানা ছেড়ে উঠে বস্‌লুম। থর্‌থর্‌ করে কাঁপ্‌ছি—কথা বল্‌তে পার্‌ছি না—বুকে যেন কে হাতুড়ি দিয়ে ঘা মার্‌ছে।

নিজেরেই অজ্ঞাতসারে কখন 'কে' এই কথাটা বলে ফেলেছিলুম। তা'তে তিনি বল্‌লেন—"কে, এই কথাটার উত্তর দিতে গেলে তোরা হয় ত ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌বি। প্রথমেই বলে রাখা ভাল—আমাকে তোর কখন ভয় কর্‌তে হবে না। আমি আজ মানুষ নই বটে, কিন্তু একদিন আমি তোদের মতই মানুষ ছিলাম। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, ঘর-সংসার সবই একদিন তোদের মতো ভোগ করেছি। এখন তোদের চেয়ে আমার ক্ষমতা অনেক বেশী বটে, কিন্তু কষ্টও তোদের অপেক্ষা অধিক ভোগ কর্‌তে হয়। সেই কষ্ট থেকে মুক্ত হ'তে পারি—যদি কেউ গয়ায় আমার পিণ্ড দেয়।"

ভয় তখন আমার অনেক কমে গেছে। তাই সাহস করে তাঁকে বল্‌লাম—"দেখুন, আমি এখন যা' উপায় করি তা'তে আমার সংসার চলাই দায়। তবে যদি কোনদিন গয়া যাবার খরচ যোগাড় করতে পারি, তা' হলে নিশ্চয়ই আপনার কথামত কাজ করবো।"

তিনি তখন মহা সন্তুষ্ট হয়ে আমার হাতে একটা গাছের শেকড় দিয়ে বল্‌লেন—"যে কোন রোগাক্রান্ত রোগীকে, এমন কি মুমূর্ষু ব্যক্তিকেও এই শেকড় ভেজান জল খাওয়ালে, তৎক্ষণাৎ তার রোগের উপশম হবে—তখন আর তোকে পয়সার ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।

তারপরই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আর তাঁকে কোন কথা বল্‌বার সুযোগ পেলাম না।

এমনি করে কিছুদিন যায়। এখন আমার ওষুধের গুণে মরা লোকও না কি একটা কথা ব'লে তবে নিশ্চিন্ত হয়। তাই রোগীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমার অর্থ ও খ্যাতি দিন দিন বেশ বেড়েই চল্‌লো।. তারপর একদিন সেই ব্রাহ্মণের পিণ্ডদানের জন্য গয়া যাত্রা কর্‌লাম। কাজটা সেরে নিরাপদে ফিরে এসে আবার আমার ব্যবসায় সুরু করে দিলাম। পয়সার অভাব আমার ঘুচেছিল বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। তাই খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে শুধু রোগী দেখেই বেড়াতাম। এমন সময় একদিন দুপুরবেলায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক জেলের বাড়ীতে যাবার জন্য ডাক এলো।

পাড়াগাঁ। গাড়ী-ঘোড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। পদ-ব্রজেই সব কাজ সেরে নিতে হয়। এমন কি, সময় সময় ছোট ছোট খালবিল নদীও হেঁটে পার হ'তে হয়। সেদিন ওই জেলে-বাড়ী যেতে আমায় একটা ছোট নদী পার হ'তে হয়েছিল। • জলও তার বেশী ছিল না। এক হাঁটুর চেয়ে কম হবে ত বেশী নয়। নদী পার হ'য়ে রোগী দেখ্‌তে গেলাম।

বাড়ীতে কান্নারোল। রোগী স্থির, নিস্পন্দ। সব শেষ। কাজেই সেখান থেকে বিদায় নিতে দেরী হলো না।

পথে আবার সেই নদী। নদীর মাঝপথে এসেছি, এমন সময় মনে হলো কে যেন আমার পা টেনে বেঁধে রেখে দিয়েছে। পা তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম—পার্‌লাম না। ক্রমশঃ যেন নীচের দিকে নেমে যেতে লাগ্‌লাম। সেই হাঁটু অবধি জল অতলস্পর্শী হ'য়ে উঠ্‌লো। তার যেন আর শেষ নেই। তারপর এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লাম। তা'কে বাড়ী বলা চলে না—বৃহৎ অট্টালিকা বলাই ঠিক্। আশ্চর্য্য, অতবড় বাড়ীতে কেউ কোথাও ছিল না। সব ফাঁকা। চতুর্দ্দিকে আলো জ্বল্‌ছিলো—সে যেন আলোর ভোজবাজী। সেই বাড়ীরই দালানের একপাশে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন সাজান ছিল। ক্ষিদেও পেয়েছিল যথেষ্ট। কোথায় গিয়ে পড়েছি—সে কথা বেবাক্ ভুলে গিয়েছিলাম। তাই ফল ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার কর্‌বার জন্য প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় দেখ্‌লাম আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক কিম্ভূত কিমাকার জীব। মানুষের মতো তার হাত, পা, মাথা সবই ছিল। কিন্তু সবই অদ্ভুত ধরণের। গায়ের রং তার—কাক, কোকিল, আলকাতারা সবাইকে লজ্জা দেবার মতো কালো। মূর্ত্তিমান যেন ঘোর অমাবস্যার জমাট অন্ধকার। প্রকাণ্ড হাঁড়ির মতো মাথাটা দেখে মনে হলো যেন মস্ত বড় একখানা পিচের চাঁই। মার্ব্বেলের মতো চোখগুলো দিয়ে যেন আগুন ছিট্‌কে পড়্‌ছিলো। লম্বায় বোধ হয় সে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী ছিল না, কিন্তু প্রস্থে তাকে জল রাখ্‌বার জালার মতো বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ভয়ে তখন আমি মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলাম। সেই জানোয়ারটাকে মারবো ব'লে একটা পেতলের ডাণ্ডা (আলোর ষ্ট্যাণ্ড) তুলে ধরেছি, ঠিক্ সেই সময় সে আমার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লো। আমি তার মানুষের মতো গলার আওয়াজে বিস্মিত হ'লাম। বল্‌লাম—"তুমি কে?"

উত্তরে সে নিজেকে 'যক্ষ' ব'লে পরিচয় দিল। এক শ' বছর ধরে সে কোন লোকের টাকার ভাণ্ডার পাহারা দিচ্ছে বল্‌লে। যে তার সেই সমস্ত অর্থ সঞ্চিত রেখে গেছে—আমি তার বংশধর হ'লে সে আমাকে সেই সব দিয়ে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু যখন সে জান্‌তে পার্‌লো যে, আমি সে বংশের লোক নই, তখন সে বল্‌লে যে, আমাকে আর সেখান থেকে বেরুতে দেবে না। কিন্তু আমি যখন সেখানকার কথা প্রকাশ কর্‌বো না ব'লে খুব কঠিন শপথ কর্‌লাম, তখন সে আমাকে ওপরে তুলে দিয়ে চ'লে গেল।

এদিকে লোকজন তখন নদীর চতুর্দ্দিকে জাল ফেলে আমায় খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছে। তাদেরই জালে আট্‌কে পড়ে সে যাত্রা কোনরকমে প্রাণ বাঁচালুম।

ঘটনাটা সেদিন স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তার কাছে প্রকাশ করে ফেলায় কেবলই ভয় হচ্ছে—হয় ত আবার কোনদিন সেই কদাকার জীবটির কবলে পড়তে হবে।

শ্রীগৌরীরাণী বসু

উৎপলা

শ্রীরাণী দেবী

"উৎপল, মাসীমা কোথায় গেছেন, তাঁকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

উৎপলা হাতের বইখানা মুড়ে টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "মা আজকে পুণ্যি সঞ্চয় কর্ত্তে গিয়েছেন। আজকে আমার কলেজ বন্ধ; বাড়ীতে থাক্‌ব। মা এ সুযোগ কখন ছাড়তে পারেন?"

মণীশ উৎপলার পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসে পড়ে বল্লে, "তা' বয়েস ত হয়েছে, পুণ্যি সঞ্চয় কর্ব্বেন বই কি! হ্যাঁরে, তোর বন্ধু সেই মিঃ রায় আসে নি?...মাসীমা বাড়ীতে নেই...তুই একলা আছিস, এ রকম সুবিধে—"

উৎপলার মুখ লাল হয়ে উঠল, নতমুখে একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বল্লে, "দিন রাত বুঝি পরচর্চ্চা করেই কাটিয়ে দাও?...আমি মিঃ রায়কে বলে দেব, তুমি তাঁর সম্বন্ধে হীন ধারণা মনে পোষণ করে বেড়াও।"

মণীশ উদাসভাবে বল্লে, "তা' বলিস্ 'খন। মিঃ রায় আমায় ফাঁসী দেবে। তারপর তোর খবর কি!—অনেকদিন আসি নি—নতুন কিছু, অর্থাৎ তোর বিয়ের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। যদি সেই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণটা জুটে যায়। জানিস ত পেটুক মানুষ, খাবার কথা শুন্‌লে যে করে হোক্—"

উৎপলা বিরক্তভাবে বল্লে, "থাক্, ওঠো এখন; যত রাজ্যের বাজে কথা বল্‌বার জন্য আমার পড়া নষ্ট করো না।"

মণীশ আরো ভালো করে বসে বল্লে, "বাবা, তুই বড্ড রেগে যাস উৎপল, কী এমন পড়া হচ্ছিল যার জন্য চটে গেলি?...তোর মিঃ রায় দেখ্‌ছি—"

উৎপলা এক তাড়া লাগিয়ে বল্লে, "খবরদার! মিঃ রায় সম্বন্ধে কোন কথা তুমি বলো না বল্‌ছি। সে তোমাদের কোন ক্ষতি ক'রে নি, মিছিমিছি কেন তাকে জড়িয়ে ফেল্‌ছ?"

মণীশ একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বল্লে, "আচ্ছা, তোকে একটা কথা বল্‌ব উৎপল?"

"কী কথা বল্‌বে?—দেখ ওসব ইয়ার্কি করে কোন কিছু বল্লে আমি বড্ড চটে যাই। যা' বল্‌বে, বুঝে বল্‌বে।"

"মিঃ রায় তোকে খুব ভালোবাসেন, না?"

উৎপলা আরক্ত মুখে চুপ করে রইল।

মণীশ সোৎসাহে বল্লে, "দ্যাখ্, আমি ঠিক আন্দাজ করেছি। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই, মিঃ রায় এখন কা'কে বিয়ে কর্ব্বেন? তোকে, না নীহারকে?"—তার মুখে একটা করুণ হাসি দেখা দিল।

উৎপলা সভয়ে প্রশ্ন কর্ল, "নীহার কে মণীশ দা'?"

মণীশ বিস্মিত হয়ে বল্লে, "কেন, মিঃ রায় তোকে নীহারের কথা কিছু বলেন নি? নীহার মিঃ রায়ের বৌদি'র মাসতুত বোন্। নীহারের বাবা মারা গেছেন। নীহার এখন মিঃ রায়ের বৌদি'র বাড়ীতে আছে। তাঁদের সকলেরই ইচ্ছা আছে, মিঃ রায়ের সাথে নীহারের বিয়ে হয়। নীহার এ বিয়েতে পূর্ব্বে রাজী হয়েছিল, এখন সে বেঁকে বসেছে।"

উৎপলা রুদ্ধশ্বাসে বল্লে, "কেন—কেন?"

একটু ঢোক গিলে মণীশ বল্লে, "এই—তোমার খবরটা তার কানে গিয়েছে।"

উৎপলা একটু চুপ করে থেকে বল্লে, "তা' মিঃ রায়েরও কি ইচ্ছে, যে—" কথাটা সে শেষ কর্ত্তে পার্ল না। তার ঠোঁট দু'খানি অব্যক্ত বেদনায় কেঁপে উঠল।

মণীশ বিষণ্ণভাবে বল্লে, "মিঃ রায়ের আগ্রহ দেখেই ত নীহারের অভিভাবকেরা রাজী হয়েছেন, নইলে তাঁদের

হাতে ওরা ভালো ছেলে আছে। কিন্তু কী হবে!...
এ যে কোর্টশিপ করে বিয়ে।...

উৎপলা টেবিলটা ধরে নিজেকে সাম্‌লে নিল, ক্ষীণ হেসে বল্লে, "নীহার বুঝি খুবই সুন্দরী?"

"তা' যা' মনে করেছিস তা' মোটেই নয়; সুন্দরী বলা যায় না, তবে সুশ্রী বটে। আসল কারণ কি জানিস?... বাবা ব্যাঙ্কে বেশ দু' চার লাখ টাকা রেখে গিয়েছেন—এদিকে আবার মিঃ রায়ের চেহারাখানি, যাকে বলে একেবারে 'মন ভুলানো' গোছের। সুতরাং উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়ে গেছে। বিয়ে এদ্দিন হয়ে যেত—মাঝখান থেকে তুই যত গোল বাঁধিয়েছিস।"

উৎপল মুখে একটুখানি হাসি টেনে বল্লে, "তুমি যে এই সব কথা আমাকে বল্লে,—আমি যদি তা' বিশ্বাস না করি?"

মণীশ বল্লে, "বিশ্বাস আমি কর্ত্তে বল্‌ছি—তোমারই ভালোর জন্য। মিছিমিছি একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই। কেন না, মিঃ রায় অত কাঁচা ছেলে নয় যে, তোমাকে বিয়ে করে কুড়ি হাজার, কী বড় জোর পঁচিশ হাজার টাকাতে সন্তুষ্ট থাক্‌বে! তবে তুমি বল্‌তে পার, 'আমাকে তিনি ভালাবাসেন কী করে?' না উৎপল, মিঃ রায় কাউকে ভালোবাসতে পারে না। তুমি দৃঢ়ভাবে বল্‌তে পার, মিঃ রায় মুখে বলেছেন—'তোমাকে ভালোবাসেন'। বলো—বলো।"

পাংশুমুখে উৎপলা ধীরে ধীরে বল্লে, "মুখে না বল্লেও ভাবভঙ্গীতে মিঃ রায় আমার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন।" সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে, "যাও তুমি শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যাও। তোমার সব কথা মিথ্যে। আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাই নে।" বলেই উৎপলা মেঝেতে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল।

মণীশ উঠে এসে উৎপলার মাথায় একখানি হাত রেখে শান্তভাবে বল্লে, "আমি যাচ্ছি উৎপল, কিন্তু, আমার কথাটা বিশ্বাস করে তুই সাবধান হোস্ বোন্। মিঃ রায় তোকে ভালবাসে না, এ শুধু তার নিষ্ঠুর খেলা।"—মণীশ ঘর থেকে চলে গেল।

অব্যক্ত যন্ত্রনায় উৎপলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দুই

এক বছর পূর্ব্বে মিঃ রায় ওরফে মৃণালকান্তি সদ্য ব্যারিষ্টার হয়ে আসে। মৃণাল বাপের পয়সায় বিলাসিতার মাঝে সচ্ছন্দে দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। চেহারাখানি আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর, কাজেই ব্যাঙ্কের চেক্-এর জমার ঘর শূন্যের দিকে এগিয়ে এলেও সুন্দরী কুমারী কন্যার ঐশ্বর্য্যশালী মাতাপিতারা এই যুবকটির ওপর তাঁদের লুব্ধদৃষ্টি সঙ্গোপনে নিক্ষেপ করে আছেন। বড় বড় লোকের বাড়ীতে যখনই কোন সম্মিলন হয়, সেখানে মিঃ রায় সাদরে আমন্ত্রিত হয়ে গল্পে গানে সংখ্যাতীত কুমারীর অন্তরে অনুরাগের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করে।

এমনই এক সম্মিলনে উৎপলার সাথে মৃণালের সাক্ষাৎ হয়।—সমাগত তরুণীদের মাঝে যখন মৃণালের দৃষ্টি অনিন্দ্য-সুন্দরী উৎপলার উপর পতিত হলো, তখন এক লহমার জন্য মিঃ রায়ের সমস্ত প্রগলভতা চলে গিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দিল। অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিতা উৎপলার প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থেকে সোৎসাহে বলে উঠল, "চমৎকার! চমৎকার! আজকের উৎসব সার্থক!"

উৎপলা তার জনৈক বান্ধবী উমার সাথে অপেক্ষাকৃত দূরে দাঁড়িয়ে কী একটা কথা নিয়ে হাসি গল্প কর্ছিল, মৃণালের কথা কাণে যাওয়া মাত্র উভয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল। উমা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, "আমার ভাই ভুল হয়ে গেছে।—চল্ ঐ যে মিঃ রায় এসেছেন, আগে আলাপ করিয়ে দিই তোর সঙ্গে। দেখেছিস কী চমৎকার চেহারা! বিয়ে যদি কর্ত্তে হয় ত এমনি বর যেন হয়।"

উৎপলা তাকে ঠেলা দিয়ে হাস্যস্ফুরিত কণ্ঠে বল্লে, "বেশ ত মিঃ রায়কেই বিয়ে কর না? যে আদুরে মেয়ে তুই, তোর বাবা জান্‌লে এক্ষুনি বিয়ে দিয়ে দেবেন।"

উমা কপট দুঃখের সাথে বল্লে, "সে গুড়ে বালি। আমরা যে বদ্যি, আর ওঁরা যে বামুন। সে বরঞ্চ তোর সাথে হলে হতে পারে।—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল্, ও মা, ঐ দ্যাখ্ মিঃ রায় আমাদের দিকেই আসছেন যে বাব্বা, অমন সুন্দর বরটি বুঝি—। এই যে মিঃ রায়, ইনি আমার বান্ধবী—উৎপলা গাঙ্গুলী। আর ইনি আমাদের—"

মিঃ রায় করমর্দ্দনের আশায় হাত বাড়িয়ে ত্বরিতে বল্লে—"বন্ধু—মৃণালকান্তি রায়।"

উৎপলা নমস্কার করে আরক্তিম মুখে বল্লে, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হয়েছি।" বলে সে উমার একটু পশ্চাতে সরে গিয়ে তার গা টিপ্‌ল।—ভাবটা—আর কি—এখন এখান থেকে সরে পড়ি।

উমা নড়বার কোন লক্ষণ দেখালো না।

মিঃ রায় অগত্যা প্রতি নমস্কার করে বল্লে, "আমি আপনাকে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়েছি, কেন না বাঙ্গালীর মেয়ে যে এত সুন্দরী হতে পারে,—তা' আমি কোনদিন ধারণা কর্ত্তে পারি নি। আঃ, আপনি এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কী করে পেলেন?—আমি ভাব্‌তুম এদেশে শুধু কাচ ভর্ত্তি, এমন আশ্চর্য্য কাঞ্চন যে থাকতে পারে সে কল্পনা কোনদিনই ছিল না।"

উৎপলা অধিকতর লজ্জিত বুঝি বা সামান্য একটু বিরক্তও হলো; সামান্য পরিচয়ের পরে কোন তরুণ যে এভাবে কোন তরুণীর রূপের প্রশংসা প্রকাশ্যভাবে কর্ত্তে পারে এটা পূর্ব্বে উৎপলা জান্‌ত না।

উমা কিন্তু আশ্চর্য্য হলো না, সে মিঃ রায়ের স্বভাব কিছু কিছু জান্‌ত। সে মুখ টিপে হেসে বল্লে, "তা' যা' বলেছেন মিঃ রায়, এ রূপ ইহুদীদের ঘরেই জন্মায়।···আপনি সত্যের অপলাপ কচ্ছে'ন মিঃ রায়, সৌন্দর্য্যে বাংলাদেশে আপনিও শ্রেষ্ঠ।"

···বাড়ী ফিরে উৎপলার কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল, কী সুন্দর চেহারাখানি! আর কী চমৎকার কথাবার্ত্তা! ···কিন্তু···কিন্তু উনি অত আগ্রহ দেখিয়ে আমার সাথে আলাপ কর্লে'ন কেন?···কেন আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কর্লে'ন?···লোকটি একটু নির্ব্বোধ বলে মনে হচ্ছে—না, বিলেত থেকে সবেমাত্র এসেছেন, সে দেশের হালচাল ভুল্‌বেন কি করে সহজে। উমা মুখপুড়ী বলে কি না তুই মিঃ রায়কে বিয়ে কর। দূর! কী যে হয়েছে এই উমিটা!...কিন্তু তা' হলে নেহাৎ মন্দ হয় না—তা' মিঃ রায় কী আর আমার মতন একটা আই-এ পাশ মেয়েকে বিয়ে কর্বেন? কত বি-এ পাশ, এম-এ পাশ করা শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েরা ওঁর পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে।··· গভীর নিদ্রায় উৎপলার নয়ন দু'টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তিন

পরদিন সকালবেলা চা পানের সময় সুমিত্রা আড়-নয়নে মেয়ের প্রতি তাকিয়ে স্বামীকে উদ্দেশ করে বল্লেন, "কালকে মিঃ গুপ্তের বাড়ীতে একজন নতুন লোক দেখ্‌লুম। তুমি গেলে তাকে দেখে খুবই সুখী হতে।"

শিশিরবাবু চার পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে বল্লেন, "যাব কী করে? দু' দিন ধরে শরীরটা বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে। যাক্—কার কথা বল্‌ছিলে?"

সুমিত্রা পাঁউরুটির শ্লাইসে মাখন আর চিনি মাখিয়ে সকলের ডিসে পরিবেশন কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লেন, "বল্‌ছি—কিন্তু, তুমি আগেই চা খাও কেন? অত করে বল্লেও শুন্‌বে না। খাবার থাকে পড়ে, তাড়াতাড়ি চা খাওয়া চাই। চা ত পালিয়ে যাচ্ছিল না? নাও, নাবিয়ে রাখ বল্‌ছি। দু' শ্লাইস্ রুটি আগে খেয়ে নাও। উৎপলা, সমীর, তোদের রুটীতে কি দেব। চিনি না মরিচের গুঁড়ো? এই নে, রসগোল্লা দুটো সমীরই খা', উৎপল আবার মিষ্টি ভালবাসে না।—ও কি, আবার তুমি চা ঢেলে নিয়েছ?...শরীর খারাপ হবে তার আর আশ্চর্য্য কি! দিনে রাতে দশ বার পেয়ালা চা খেলে শরীর খারাপ হবে না?···আমারই অন্যায় হয়েছে; আমার উচিত ছিল ওদের আগেই চা-টা ভাগ করে দিই।—দ্যাখ দিকিনি এত চা খেলে—"

শিশিরবাবু অবশিষ্ট চাটুকু নিঃশেষ করে বল্লেন, "আহা, রাগ কচ্ছ' কেন তুমি বলো ত? চা-খোর মানুষ, একটু চা না খেলে বাঁচবো কি করে? কিন্তু তুমি যে তোমার বক্তব্য হারিয়ে ফেল্লে?"

"ওহো, শোন তবে, মিঃ রায় নামে একটি ভদ্রলোককে দেখ্‌লুম কালকে। কী চমৎকার চেহারাটি! কথা-বার্ত্তায়ও খুবই ভাল। অল্পদিন হলো ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছে। এই ত বুধবার দিন উৎপলের জন্মতিথি,

নিমন্ত্রণ কর না কেন তাকে। যদি ভাগ্যি ভাল থাকে, তবে উৎপলের সাথে—"

"আহা, আমাদের সাথে জানাশোনা নেই, গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ কর্লে মনে ভাব্বে কি?"

"কেন, কালকে উৎপলের সাথে যেচে আলাপ করেছে, উমাকে দিয়ে উৎপলই বরঞ্চ নিমন্ত্রণ করুক, কী বলো?"

"সে তুমি যা' ভাল বোঝ কর, আমি ওসব কিছু বুঝি নে।"

সুমিত্রা উৎপলার রক্ত গোলাপের মত টুকটুকে মুখখানির প্রতি চেয়ে বল্লে, "কী রে উৎপল, মিঃ রায় কেমন লোক বল্ ত?"

শিশিরবাবু স্ত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদু হাস্লেন।

সমীর রুমালে মুখ মুছে সহাস্যে বল্লে, "উৎপলের মনে যা' হচ্ছে সে আমি খুব বুঝতে পাচ্ছি। ও ভা'ব্ছে, বুধবারটা শীগ্গির এসে পড়ুক, আমি মিঃ রায়কে চোখের দেখাটা দেখি।"

উৎপলা ভ্রূকুটী করে সবেগে বলে উঠল, "যাও!" কিন্তু তার সুন্দর চোখ দু'টির আনন্দোজ্জ্বল বিভা দাদার কথাটি মেনে নিল।

বুধবার।

শিশিরবাবু অন্যান্যবার অপেক্ষা এবার কন্যার জন্মতিথিতে কিছু বেশী রকম আয়োজন করেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর শুধু উৎপলার বান্ধবীদেরই নিমন্ত্রণ হতো, কিন্তু এবার মিঃ রায়ের মত কয়েকটি সম্ভ্রান্ত তরুণও আমন্ত্রিত হয়েছে।

টেবিলের ওপর রক্ষিত অসংখ্য উপহাররাশি পৃথক পৃথক সজ্জিত ছিল।

একদল তরুণী উৎপলাকে টেনে এনে টেবিলটার কাছে দাঁড় করিয়ে বল্লে, "কে কি উপহার দিয়েছে বল্ ত উৎপল, তা' হলে কোন্ ভক্তের ভক্তির জোর বেশী তা' বেশ বুঝ্তে পাব।"

উৎপলা হেসে ফেল্লে। বল্লে, "বাবা, এই তোদের মত হিংসুটে দু'টি আর দেখি নি। তোদের জন্মদিনে ভক্তেরা যেন খালি হাতে দেবী-দর্শন করে! আমার বেলাতেই তোদের রাগ।"

রমলা মুখ বাঁকিয়ে বল্লে, "সোণার চাঁদ আর কি! আমাদের বেলায় বুঝি এই সব উপহার জোটে?...একটা কাস্কেট কি ব্রুচ, বড় জোর এক সেট্ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী। কিন্তু তোর জন্মদিনে কত কি! ও কি, ঐ ফুলের কাস্কেটটা কে দিয়েছে? বাঃ, ভারি চমৎকার ত! ওঃ, তাই ত বলি চাঁদবদনী, এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে তুলেছ দেখ্ছি। দ্যাখ্ যুথি, মিঃ রায় উপহারের গায়ে কী লিখেছেন!"

পরম উৎসুকে সব ক'টি তরুণী সেই প্রস্ফুটিত কাস্কেটটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ল, "যার সুন্দর হাত দু'খানি কুসুম অপেক্ষা কোমল, সেই 'কমল করে' এই উপহার প্রদত্ত হলো।"

লীলা চেঁচিয়ে বল্লে, "দেখ্ছিস উৎপল, ইনি তোর কী রকম শ্রেষ্ঠ ভক্ত?...না বাবু, ইনি একেবারেই মজেছেন।—আর মিছিমিছি বেচারীকে কষ্ট দিস্ নে।"

উমা বল্লে, "সে কথা সত্যি। নইলে একশো দেড়শো টাকা খরচ করে কেউ ফুলের কাস্কেট উপহার দ্যায় না। মূল্যবান উপহার অনেকেই দিয়েছে বটে, কিন্তু এমন 'কমল করে' কেউ দেয় নি।"

"এই যে মিস্ গাঙ্গুলী, আমি আপনাকেই খুঁজ্ছিলুম। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?"

উমা বিদ্রূপ করে বল্লে, "হ্যাঁরে উৎপল, তুই মিঃ রায়ের হৃদয়-গগন থেকে অদৃশ্য হোস্ কেন বল্ ত?"

লতিকা বল্লে, "এই উমা, তুই ছাই ব্যাকরণ পড়া ছেড়ে দে। 'হৃদয়-গগন' কিরে? বল্ 'সরোবর'; ও যে উৎপল—বুঝলি নে না কি...আমি প্রোফেসরকে বলে তোর আই-এ পাশের 'সার্টিফিকেট্'খানা কেড়ে নেওয়াব।"

"ঠিক্ ভাই, আমারই ভুল হয়েছে; তা' মিঃ রায়, আপনার 'হৃদয়-সরোবরে' উৎপল চিরদিন প্রস্ফুটিত থাকুক, আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি।"

হাসির তরঙ্গ তুলে উৎপলার বান্ধবীরা সে স্থান পরিত্যাগ করল।

মিঃ রায় মুগ্ধ-দৃষ্টিতে উৎপলার সুসজ্জিত মূর্ত্তিটির পানে

তাকিয়ে বললে, "আপনার বান্ধবীরা কী ব'লে গেল শুনলেন? আঃ, আজকে আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! ঠিক্ মনে হচ্ছে, রূপকথার সেই রাজকন্যা আপনি। নীল সিল্কের শাড়ী ব্লাউসে আপনাকে অতি সুন্দর মানিয়েছে!"

উৎপলার মুখ আনন্দে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল, সুমিষ্টকণ্ঠে সে বললে, "আপনি বড্ড লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে। ভারী ত আমার রূপ!—আপনাকেই দেখাচ্ছে যেন—সেই ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাওয়া রাজপুত্রের মত।" কথাটা ব'লে ফেলেই উৎপলা লজ্জায় মুখ নীচু করল।

—"ঠিক—ঠিক বলছেন মিস গাঙ্গুলী। আমি রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এসেছি—আমার মনে হচ্ছে। দেখুন, এই জিনিষটি আপনার জন্য আমি এনেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন।" ব'লে মিঃ রায় নিজের আঙুল থেকে খুলে একটি মূল্যবান আংটি উৎপলার হাতে দিতে গিয়ে পরক্ষণেই কি ভেবে অনুনয় করে বললে, "আমি নিজ হাতে আপনাকে পরিয়ে দিতে চাই মিস্ গাঙ্গুলী, যদি আপনার আপত্তি থাকে, তবে অবশ্য—"

"না—না, আপত্তি নেই।—কিন্তু এ আপনার ভয়ানক অন্যায় মিঃ রায়, কেন মিছে এতগুলি টাকা নষ্ট করলেন বলুন ত?"

মিঃ রায় আংটি পরান শেষ ক'রে, উৎপলার গৌরবর্ণ সুডোল হাতখানি নিরীক্ষণ করতে করতে হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বললে, "কী চমৎকার মানিয়েছে মিস্ গাঙ্গুলী! সোণার হাতে সোণার আংটি মিশে গেছে। শুধু হীরেখানি যা' জল্‌জল্ করছে!—অনেক আগেই আংটিটা দিতে পারতুম, শুধু আপনার বান্ধবীদের ভয়ে পেরে উঠি নি।"

উৎপলা লজ্জারক্ত-মুখে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় উমা এসে বললে, "কিরে উৎপল, তোদের প্রেমালাপ—"

"যাঃ, কী সব বকছিস্?—চল্, ওদিকে যাই।" ব'লে উৎপলা ত্বরিতে উমাকে হল্‌টার অপর দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাগ ক'রে বললে, "তুই বড় ফাজিল হয়েছিস। ছিঃ, মিঃ রায় কি মনে করলে বল্ দিকিনি?"

অকস্মাৎ উৎপলার করস্থ অঙ্গুরীয়কটা বিদ্যুদালোকে ঝক্‌মক্ ক'রে উঠল। উমা উল্লাসে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "বারে মেয়ে, এর মধ্যে আংটি পর্য্যন্ত 'প্রেজেণ্ট' হ'য়ে গিয়েছে। প্রাণটা বহু পূর্ব্বেই আদান-প্রদান হয়ে গিয়েছিল, বাকীটা—"

উৎপলা ত্রস্তভাবে সখীর মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু তর্জ্জনের সাথে বললে, "নাঃ, উমা, তুই বড় লজ্জা দিতে পারিস্। ঐ দ্যাখ্,—মা আসছেন, শুনলে লজ্জায় মরে যাব।"

—"আহা, কী আমার লজ্জাবতী লতাটী গো!"

পাঁচ

এমনি করেই মৃণাল উৎপলের আলাপ-পরিচয়ের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা উৎপলের পিতা লক্ষ্য না করলেও জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে নি। সুমিত্রার মনের গোপন বাসনা উৎপলা জান্‌ত বলেই সে মিঃ রায়ের সাথে অবাধ মেলামেশায় অন্তরে গভীর এক আনন্দ উপলব্ধি করত। মিঃ রায় কোর্ট থেকে বরাবর উৎপলাদের বাড়ী আস্‌ত। চা এবং তার আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জলযোগ সেরে কোনদিন মাতা পুত্রীকে নিয়ে অথবা অধিকাংশ দিনই একলা উৎপলার সাথে রাজধানীর যেখানে যত 'সিনেমা-হাউস' আছে সবগুলিতে একবার ক'রে যেতই। তা' ছাড়া, গড়ের মাঠ, জু-গার্ডেন এবং অন্যান্য জায়গা ত আছেই।

তারা বাড়ীর 'কারে' না গিয়ে যেত ভাড়া করা ট্যাক্সিতে। উমা একদিন এর কারণ জানতে চাইলে উৎপলা নীরবে একটু হাসল মাত্র। অপর একটি তরুণী বললে, "উমা, তুই বড় বোকা; এ আর বুঝলি নে, বাঙালী সোফার অপেক্ষা শিখগুলি সুবিধেজনক। তারা ত ওদের প্রেমালাপের বিন্দুবিসর্গ বুঝবে না।"

উৎপলা এবার প্রতিবাদ না ক'রে পারলে না। বললে,

"সত্যি বল্‌ছি, প্রেমালাপ আমাদের কোনদিনই হয় না, অতি সামান্য কথাবার্ত্তা ছাড়া সব সময়ই আমরা চুপ ক'রে থাকি।"

উমা এবার খুব একচোট হেসে বল্‌লে, "ঠিক্ উৎপল, আমার বোঝা উচিত ছিল, এখন যে মুখের ভাষা হারিয়ে চোখের ভাষায় আলাপ চল্‌ছে।"

উমা সত্যি কথাই বলেছে। এই দু'টি তরুণ তরুণীর অন্তরে একই ভাবের লীলা চল্‌ছে। দু'জনেই দু'জনকে বুঝেছে। দু'জনেই মুগ্ধ। তবে প্রকাশ্যভাবে কেউ অপরকে নিজের অন্তরের এ গুপ্ত তথ্য বুঝতে দেয় নি। উভয়ের সেই সরমজড়িত স্বর, পরস্পরের সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হ'তে না হ'তে দু'জনের অন্তরের ব্যাকুলতা তাদের চোখে মুখে ফুটত, তা'তে করেই তারা বুঝতে পেরেছে—পরস্পরকে।

এমনি করেই একটানা সুখের স্রোতে ছয়টি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল।

সুমিত্রা আর বিলম্ব না ক'রে স্বামীকে বল্‌লেন, "এইবার। জামাই এসে নিজে যখন ধরা দিয়েছে, তখন আর বিলম্ব করছ কেন?—বিয়ের যোগাড় কর।"

শিশির অবাক হয়ে বল্‌লেন, "কী বল্‌ছ তুমি? জামাই আবার কোত্থেকে এলো?"

স্বামীর কথা শুনে সুমিত্রা একটু রুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন, "তুমি কি কোনদিন সংসারের পানে চাইবে না?...মেয়ে যে এদিকে আঠারো পেরিয়ে উনিশে পা দিয়েছে, তার বিয়ের চেষ্টা কর্ব্বে, না, এমনি কোর্ট আর বাড়ী এই নিয়েই সারা জীবন কাটাবে?—ভাগ্যিস্ তোমার বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই কোনমতে মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চল্‌তে পার্‌ছি, নইলে তুমি যা' মানুষ, তা'তে তোমার রোজগারের পয়সায় খরচ চালাতে হ'লেই হাতে হাঁড়ী করতে হতো। নইলে এতবড় আইবুড়ো মেয়ে ঘাড়ের ওপর থাক্‌তে নিশ্চিন্তমনে নথি-পত্র নিয়ে দিন কাটাতে পারতে না।"

—শিশিরবাবু অগত্যা 'পাততাড়ি' গুটিয়ে পত্নীর রাগ-দীপ্ত মুখের প্রতি তাকিয়ে বল্‌লেন, "আহা, আমার ওপর দেখ্‌ছি তোমার রাগটা আজ বড্ডই বেড়ে গিয়েছে, কী হলো খুলেই বলো না।"

সুমিত্রা একটু নরম সুরে বল্‌লেন, "বল্‌ছি কি আজকে তুমি মৃণাল এলে বিয়ের সম্বন্ধে কথাটা তুলো; দেনা-পাওনা সম্বন্ধেও একটা কিছু পাকা কথা ঠিক্ করে নিয়ো।"

—"মৃণাল আবার কার নাম? ওঃ, মিঃ রায়ের নাম বুঝি? আচ্ছা, সে আমি বল্‌ব 'খন। তবে আমার মনে হয়, আগে তার বাবার সাথে বিয়ের কথা কইলে ভালো হয়। ছেলে যত বড় লায়েকই হোক্ না—মাথার ওপর মা বাপ থাক্‌তে—"

সুমিত্রা পুনর্ব্বার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, বল্‌লেন, "নাঃ, আমার গলায় দড়ি জোটে না তাই তোমার কাছে এসেছি এ সব কথা বল্‌তে।—যে লোকটা আজ ছ' সাত মাস ধরে তোমার বাড়ীতে রোজ যাওয়া-আসা করছে, তোমার অত বড় আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে এখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যায়, তার সম্বন্ধে ছাই কোন খোঁজই কি নাও না?...বল্‌ছি...মৃণালের মা বাবা কেউ নেই, কয়েক বছর পূর্ব্বে মারা গেছেন, সংসারে আছেন, এক দাদা আর বৌদি'। তা' তাঁরাও এদেশে থাকেন না। পশ্চিমে কোথায় বেশ মোটা মাইনেতে মৃণালের দাদা কাজ করেন। পাড়ার লোক সব 'ওৎ' পেতে বসে আছে, তোমার মেয়ের সাথে বিয়ে না হ'লে অমন ছেলে পড়ে থাক্‌বে না। এমনিতেই কত আলোচনা হচ্ছে, আমি যাই মানুষ, তাই আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করছি যে, বিয়ে ঠিক্ হয়ে গেছে, শুধু দিনটা দেখ্‌লেই হয়।"

শিশিরবাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা, আজকে আমি তাকে বল্‌ব। মৃণাল কী বলে জেনে নিয়ে তার দাদার কাছে চিঠি লিখ্‌ব।

ছয়

শিশিরবাবু চায়ের টেবিলে ব'সে অনেক পরে মনে মনে কথাটা বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে, একটু গলা ঝেড়ে

বল্লেন, "ভাখ মৃণাল, উৎপলার বিয়েটা এইবার দেওয়া দরকার, তা' তোমার এখন কী মত সেটা না জান্‌লে—"

এই আকস্মিক প্রশ্নে মিঃ রায় থতমত খেয়ে গেল। পার্শ্ববর্ত্তিনী সুন্দরী তরুণীর সরমজড়িত আননে যে পুলকোচ্ছ্বাস দেখা দিল, তার প্রতি ক্ষণেক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মিঃ রায় দৃষ্টি নত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "আমাকে কী করতে হবে—আদেশ করুন।"

শিশিরবাবু কী বল্‌বেন ভেবে না পেয়ে স্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সুমিত্রা মনে মনে স্বামীর ওপর ভয়ানক চটে গেলেন। নাঃ, এঁকে দিয়ে যদি একটা কাজও হয়! সুমিত্রা অগত্যা নিজেই স্বামীর হয়ে উত্তর দিলেন, "তোমার দাদার মতামত জানা দরকার, তুমি তাঁর ঠিকানাটা দাও, আমি তোমার বৌদি'কে সব খুলে লিখ্‌ব। তুমিও বেশ করে গুছিয়ে একখানি পত্র লিখে দাও। বিয়েটা যাতে শীঘ্র হয়ে যায় সেই ভালো।—দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তোমাকে বলে রাখ্‌ছি যে, উৎপল আমাদের একটিমাত্র মেয়ে, ছেলেও উপার্জ্জনক্ষম, সুতরাং সাধ্যমতন আমরা যৌতুক দেব। আমার শ্বশুর উৎপলের বিয়ের জন্য কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছেন, আমরাও আট দশ হাজার টাকা খরচ করতে পারব। আশা করি এ বিয়েতে তোমার দাদা অথবা বৌদি' অসন্তুষ্ট হবেন না। সুমিত্রা কথাগুলি বেশ দৃঢ়তার সাথে বল্‌লেন। এ কথার একটি বর্ণও যে ওলট-পালট হতে পার্ব্বে না, তা' মিঃ রায় খুব বুঝ্‌ল। সে নতমস্তকে কি চিন্তা করে বল্‌লে, "আচ্ছা, আমি তা' হলে আজ উঠি, দাদার কাছে চিঠিখানা লিখে দিই গে!—

মিঃ রায় আর একবার উৎপলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

সাত

কয়েকদিন পরে মিঃ রায়ের বৌদি' উত্তর দিল। অন্যান্য কথার পরে বৌদি' লিখেছেন, "তোমার বিয়ে হবে এ খুবই আনন্দের কথা, তবে পূর্ব্বে আমাদের জানানো উচিত ছিল। আমার এবং তোমার দাদার ইচ্ছা ছিল, নীহারের সাথে তোমার বিয়ে দিই, মেশোমশায় নীহারের জন্য তিন লক্ষ টাকার জমিদারী রেখে গিয়েছেন, তা' বোধ হয় জানো। নীহারকে বিয়ে কর্লে অর্থ চিন্তার জন্য মাথা ঘামাতে হতো না। আমার বেশ মনে আছে, বিলেত যাওয়ার পূর্ব্বে তোমার ও নীহারের মধ্যে একটা মধুর ভাব গড়ে উঠ্‌ছিল। যাক্, মোট কথা হচ্ছে বিয়েটা এখন মাস ছয়েকের জন্য বন্ধ কর। ছ' মাস পরে তোমার দাদা ছুটি পাবেন, তখন আমরা গিয়ে তোমার বিয়ে দেখে আস্‌ব।"

চিঠিখানা পড়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মিঃ রায় শয্যায় শুয়ে শুয়ে পূর্ব্ব কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল। বিলেত যাওয়ার পূর্ব্বে সত্যই নীহারের ওপর কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করে ছিল। সেই সুশ্রী কিশোরীটির প্রতি একদিন তার মনের মাঝে ছোট্ট একটু আশা অন্তরে এসে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু এখন? না—না উৎপলকে সে ছাড়বে কী করে? নীহার নক্ষত্র, আর উৎপলা শারদ চন্দ্রিমা। তবে হ্যাঁ, যত গোল বাঁধিয়েছে ঐ টাকা। তা' হোক্, জীবনে সে বহু অর্থ সঞ্চয় কর্ত্তে পার্ব্বে। উৎপলাকে হারালে সে বাঁচবে না।"

* * *

মিঃ রায় বৌদি'র চিঠির কথা অধিকাংশ গোপন করে শুধু বল্লে, "বৌদি' লিখেছেন, ছ'মাস পরে বিয়ে হবে, তখন দাদা ছুটি নিয়ে আসবেন।"

সুমিত্রা মনে মনে একটু অধৈর্য্য হলেন, আরো ছ'টা মাস, কিন্তু কী কর্ব্বেন? তিনি মুখে খুসীর ভাব দেখিয়ে বল্লেন, "বেশ, তবে এই ঠিক্ থাক্‌ল। সাম্‌নের বোশেখেই বিয়ে হবে।"

আট

উৎপলার মাসতুত ভাই মণীশ কিছুদিন হলো এখানে এসেছে। মিঃ রায় যে এ বাড়ীর ভাবী-জামাতা, এটা শুনে সে একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্লে, "মাথার ওপর মা বাপ নেই,

বিলেত ফেরৎ ছেলে, স্বভাব-চরিত্র কেমন সে সব খোঁজ নিয়েছ ত?"

সুমিত্রা বল্লেন, "না—না, তুই যা' ভাব্‌ছিস সে সব নয়। স্বভাব-চরিত্র বেশ ভাল বলেই মনে হলো। বেশ, তুই ত এখন কিছুদিন আছিস, নে না একটু খোঁজ-খবর। বিয়ে ত এক্ষুণি হচ্ছে না, এখনো মাস দুই বাকী আছে।"

মণীশ বল্লে, "তুমি রাগ করো না মাসীমা। আমি এই জন্য বল্‌ছি যে, এদেশ থেকে অনেক যুবকেরাই বিলেত গিয়ে সব বিশ্রী ব্যাপার গড়ে তোলে। এই ত মাস কয়েক পূর্ব্বেই আমার এক বন্ধুর নামে বিলেতে একটি কৃষক-কন্যা খোরপোষের মামলা তুলেছে। মনে কর ত এটা কতখানি লজ্জার বিষয়। এই মিঃ রায়ও যে সেই দলের হবে এমন কথা আমি বল্‌ছি নে, তবে জেনে-শুনে বিয়ে দিলে মন্দ কি?"

নয়

মণীশ অনেক চেষ্টা করে নীহারের সাথে যে মিঃ রায়ের একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল, এই তথ্যটুকু আবিষ্কার করে মাসীমাকে বল্‌তে এসে তাঁকে না পেয়ে একেবারে উৎপলার কাছেই বলে ফেল্লে। তার ধারণা ছিল, উৎপলা এ সব শুন্‌লে নিশ্চয় বীতরাগ হয়ে এ বিয়েতে আপত্তি উত্থাপন কর্বে। কিন্তু যখন উৎপলা দৃঢ়স্বরে বল্লে, এর একটি কথাও সত্য নয় এবং মণীশকে সে অবিশ্বাস করে, তখন সরল অন্তঃকরণ মণীশ মনে মনে যথেষ্ট লজ্জিত হলো। নাঃ, কী প্রয়োজন ছিল তার এই অহেতুক মুরুব্বিয়ানায়। ছিঃ, ছোট বোনের কাছে এভাবে খেলো হয়ে সে ভাব্‌ল, মিঃ রায়ের সাথে উৎপলার বিয়ে হলে উৎপলা যে অসুখী হবে এর কোন মানে নেই। নীহারের সাথে বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছে বলে সেটা এমনই বা কী অন্যায় হলো! হয় ত দু'জনের মধ্যে একটু ভালবাসার সঞ্চারও হয়েছিল, তাই বলেই যে মিঃ রায় দুশ্চরিত্র হবে এর কোনও মানে নেই। নাঃ, আমার একটুও বুদ্ধি বলে পদার্থ নেই। যাই, নিজের দোষ স্বীকার করে উৎপলের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি।

দশ

উৎপলা মুখে বলে ছিল বটে যে, সে মণীশের কথা অবিশ্বাস করেছে, কিন্তু সত্যিই কী তাই?...মিঃ রায় সম্বন্ধে তার মনে যেন একটা সংশয়ের রেখাপাত হলো। বিশেষতঃ, বিয়ের সম্বন্ধে যখন আলোচনা শেষ হলো, তখন থেকে মিঃ রায়ের গতায়াত কম্‌তে লাগ্‌ল। সুমিত্রা ভাবতেন, মৃণাল লজ্জায় যাওয়া-আসা কমিয়ে দিয়েছে। আর উৎপলা ভাব্‌ত হয় ত মণীশ দা'র কথাই সত্যি, মিঃ রায় একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে, এখন জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনায় পালাতে পার্লে যেন বেঁচে যায়। উৎপলা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে ভাবল, মিঃ রায় এলে এ বিষয়ে খোলা-খুলিভাবে জিগ্‌গাসা কর্বে, নীহারকে সে ভালোবাসে কি না! কিন্তু, লজ্জায় কুণ্ঠায় সে তা' পার্ত্ত না। তা' ছাড়া, মণীশ দা' যখন বলেছে যে, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, শুধু উৎপলার ভালবাসার গভীরতা পরীক্ষার জন্য সে একটা আজ্‌গুবী গল্পের সৃষ্টি করেছিল এবং উৎপলা যখন সে পরীক্ষায় পাশ করেছে, তখন মণীশ এই মিথ্যা বলার জন্য ক্ষমা চায়। উৎপলা তখন মুখে বলেছে, নাঃ, মনে কোন দাগ বসে নি। কিন্তু, মনের ওপর তার জোর খাটে কই? যেখানে যত ভালবাসা, সেখানেই তত ভয় ও সন্দেহ। উৎপলার একনিষ্ঠ ভালবাসা মর্ম্ম যাতনায় অন্তরে গুমরে ওঠে। একদিন মিঃ রায় এসে উৎপলার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে ব্যথিত কণ্ঠে বল্লে, "তোমার কী হয়েছে উৎপল? কেন তুমি এত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছ? শরীর কী তোমার অসুস্থ হয়েছে?"

উৎপলা ঘাড় নেড়ে মৃদুকণ্ঠে বল্লে, "না, কোথায় বিষণ্ণ হয়েছি।"

উৎপলার চোখ দু'টি অশ্রুতে টল্‌মল্ করে উঠ্‌ল।

মিঃ রায় উৎপলার সুন্দর মুখখানির প্রতি চেয়ে ক্ষুন্ন স্বরে বল্লে, "তুমি কী যেন একটা ব্যাপার আমার কাছে গোপন কর্চ্ছ উৎপল। আর ক'টা দিন পরেই আমরা পরস্পরের একান্ত আপনার হয়ে পড়ব, তখনো কি তুমি এম্‌নি করে আমাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌বে?"

উৎপলা তখন ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলে বল্লে, "আমাকে আপনি ক্ষমা কর্ব্বেন মিঃ রায়, আমি আজ ক'দিন ধরে ভাব্‌ছি, এ বিয়েতে আপনি কখনই সুখী হ'বেন না। তাই—"

মিঃ রায় এবার নিশ্চিন্ত মনে বল্লে "না উৎপল, তুমি এইবার থেকে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করে দাও। আমি যদি তোমাকে পেয়েও সুখী না হই, তবে ভগবান আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নি—বুঝ্‌তে হবে। ছি ছি, তুমি বড় ছেলেমানুষ, এই সব যা' তা' চিন্তা করে মনটাকে খারাপ করে তুল্‌ছ।"

তখন লজ্জায় উৎপলার মনে হলো, ছিঃ, এই মানুষের ওপর তা'র কী করে এমন ঘৃণ্য সন্দেহ মনে এলো?

এগার

উভয়েরই পরম প্রার্থিত দিনটী এসে পড়্‌ল।

বান্ধবীদের ঠাট্টার জ্বালায় উৎপলা এক সময় ব'লে উঠ্‌ল, "বাবা, কী হিংসুটে তোরা! চাই নে আমি মিঃ রায়কে বিয়ে কর্ত্তে, তোরাই গিয়ে তাকে বিয়ে কর্।"

উমার ওপর কনে সাজাবার ভার ছিল। সে উৎপলাকে একটি ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে, "আজকে তোকে এমনি করে সাজাব উৎপল, যে, তোর বর একেবারে মূর্চ্ছা যাবে।"

একদল তরুণী এসে উৎপলাকে আক্রমণ করে বল্লে, "তোর বর ভাই আমাদের পছন্দ হয় নি। ও মা, আমরা এতগুলি মেয়ে থাক্‌তে সে কি না বিয়ে কর্চ্ছে—মোটে তোকে? অন্ততঃ, এর মধ্যে পাঁচ ছ' জনকে ও অনায়াসেই বিয়ে কর্ত্তে পার্ত্ত।"

উৎপলা কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই দু'টি তরুণী এসে ঘরে ঢুক্‌ল। উৎপলা একজনকে চিন্‌ল, সে মিঃ রায়ের বৌদি' কণিকা; অপরটীকে সে চিন্‌তে পার্‌ল না। উৎপলা উভয়কে সাদরে দু'খানা চেয়ারে বসাল।

কণিকা উৎপলার মুখখানি দুই হাতে উঁচু করে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, বাবা মা কেউ তোমাকে দেখে যেতে পার্লেন না উৎপল! এমন ঘর আলো করা বউ দেখ্‌লে কত আনন্দই যে তাঁরা পেতেন!"

উপস্থিত সকলেরই চোখ দু'টা একটু চক্‌চক্ করে উঠ্‌ল।

কণিকা একটু পরে বল্লে, "একে তুমি চেন না উৎপল, এ আমার বোন্ নীহার।"

নীহার!—অকস্মাৎ উৎপলার বুকটা যেন কেমন করে উঠ্‌ল, বিবর্ণ মুখে অস্ফুট স্বরে সে কেবলই উচ্চারণ কর্ত্তে লাগ্‌ল, "নীহার...নীহার!—"

নীহার এসে উৎপলার একখানি হাত ধরে আদরপূর্ণ কণ্ঠে বল্লে, "আমি তোমার রূপের প্রশংসা এত শুনেছি যে, আজ্‌কে না এসে থাক্‌তে পার্‌লুম না।"

উৎপলা লজ্জায় মুখ লাল করে বল্লে, "ও কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি বড় বোনের মতন।

কণিকা হেসে বল্লে, "উৎপল, নীহারের বিয়ে হবে কার সাথে জান?—তোমার দাদার সাথে! সমীরকে আমাদের সবাইকার পছন্দ হয়েছে। আমার আদরের বোন্‌টীর উপযুক্ত বর বটে।"

উৎপলার মনের গুরু বোঝা মুহূর্ত্তে হাল্কা হ'য়ে গেল। গভীর পুলোকাচ্ছ্বাসে তা'র মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। নীহারের লজ্জারক্ত মুখের প্রতি সে চেয়ে রইল।

বার

বাসর-ঘর।

গম্ভীর রাত্রি। জ্যোৎস্না-পুলকিত এই মধুময় রাতটির প্রতীক্ষায় দু'টি তরুণ হৃদয় ব্যাকুল হয়েছিল, আজ তাদের প্রতীক্ষিত ক্ষণটি উপনীত হওয়ায় দু'জনেই মুগ্ধ। বাসর-সঙ্গিনীরা সকলেই কক্ষ ছেড়ে চলে গেছে। বাইরের নহবতের মিষ্টি সুর উভয়কেই বিহ্বল করে তুলেছে। মৃণাল দু' হাত দিয়ে উৎপলাকে বুকে টেনে নিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকল, "উৎপল, উৎপল, আমার উৎপল !—"

উৎপল স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে, "এই দিনটির জন্য আমি সারাজীবন ধরে আকাঙ্ক্ষা করেছিলুম, আজ আমার হৃদয় মন তৃপ্ত হয়েছে।"—একবার থেমে নিয়ে লজ্জা-জড়িত-কণ্ঠে সে বল্লে, "কিন্তু, আমি একটা অন্যায় করেছি, তোমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করে এই ক'টা দিন আমি মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছি।—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।—"বলে উৎপলা নীহার সম্বন্ধে যা' শুনেছিল—সব প্রকাশ কর্ল।

মৃণাল গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, "স্বামীর সম্বন্ধে এ রকম হীন ধারণা কর্লে মহাপাপ হয়। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।"

"কী প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে বলো তুমি?...তুমি যা' বল্বে, আমি তাই কর্ব।"

পূর্ব্বের মতনই কপট গাম্ভীর্য্যে আপনার সুন্দর মুখখানি মিঃ রায় উৎপলার মুখের সন্নিকটে নিয়ে গিয়ে বল্লে, "একটি চুম্বন।"

উৎপলা লজ্জায় বলে উঠ্‌ল, "ছিঃ!"

শ্রীরাণী দেবী
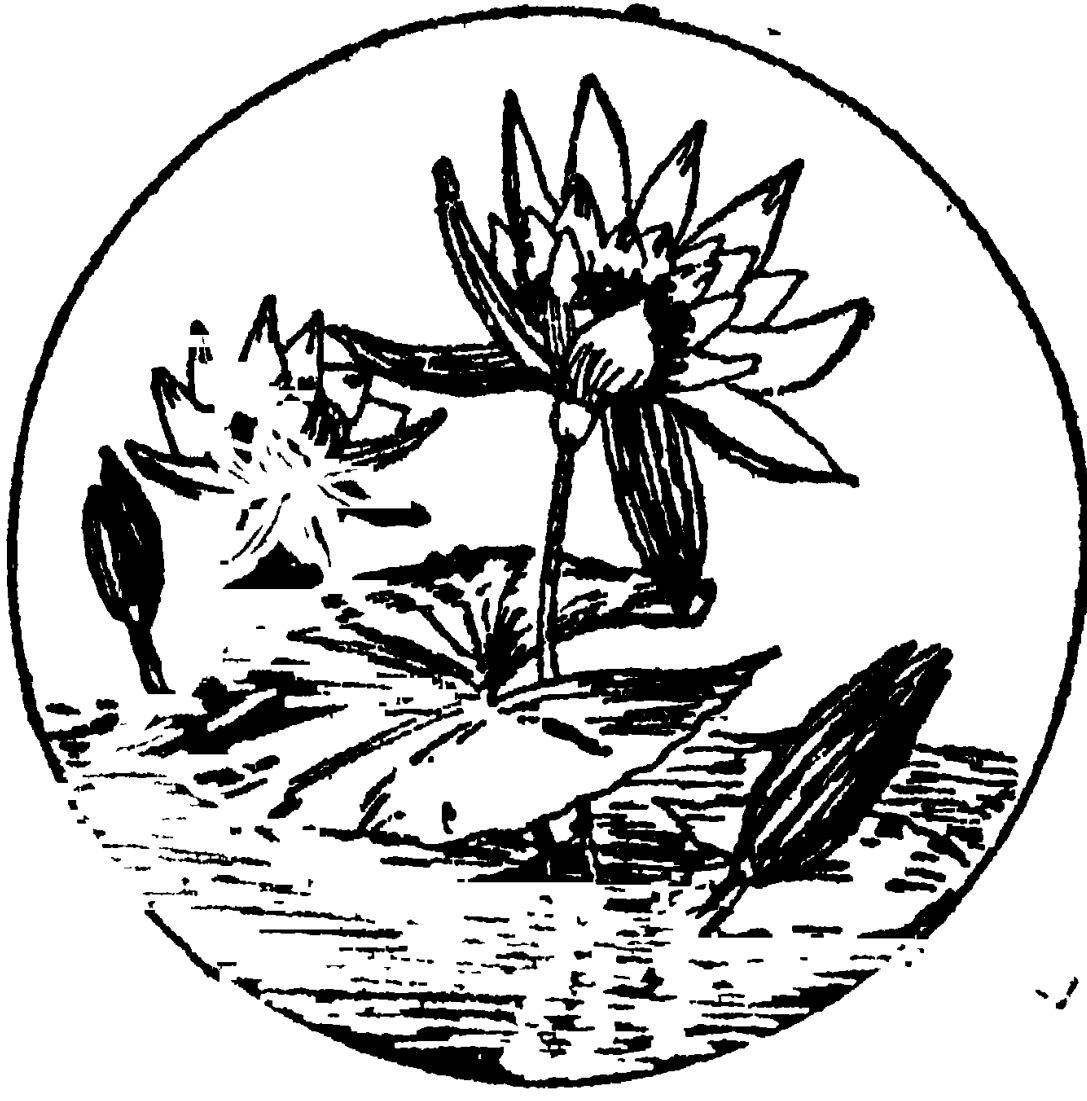
মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

যৌবন যখন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, তখনকার ক্ষণিক ভুলের একটা কাহিনী।

বড় রাস্তার ওপর পাশাপাশি দু'খানা বাড়ী। বাড়ী দু'খানাকে দু' পাশে সরিয়ে রেখে চলে গিয়েছে একটা গলি—তা' যাক্, তা'তে ক্ষতি হয় নি। সাম্‌নাসাম্‌নি দুটো জান্‌লা। তার ভিতর দিয়ে চলে যায় দৃষ্টি ঘরটার ভিতরে যেখানে তার খুসী। এ ঘরে থাকৃত কমলা—আর ও ঘরে থাকৃত এক যুবক। হঠাৎ হয়ে গেল দু'জনায় দেখা। তারপর আর হঠাৎ নয়, দু'জনেরই ইচ্ছাকৃত দর্শনলাভের পথ আবিষ্কার হয়ে গেল এই জান্‌লা দিয়ে। তারপর যেটুকু মনের ফাঁক ছিল, সেটুকু পূর্ণ করে দিল ছোট ছোট চিঠি। ক্রমে ছেলেটি চাইল মেয়েটির সম্পূর্ণ অধিকার। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়ল দু'জনাতে কোন্ অসীম পথের যাত্রী হয়ে। তারপর কত জায়গা ঘুরে আসাম অঞ্চলে ছেলেটির গেল চোখের নেশা কেটে একটা পাহাড়ী মেয়েকে দেখে। এ মেয়েটী কত কাঁদ্‌ল, কত মিনতি করূল, কিন্তু পাষাণ গল্‌ল না। অবশেষে মেয়েটীর নারী-জীবনের মূল্য ধার্য্য হল দু' শ' টাকা। সে তাই নিয়ে চলে এল কোলকাতায়। তারপর খুলে বস্‌ল তার রূপ-যৌবনের বেসাতি—হ'ল বেশ্যা। তারপর—

থাকে সে ময়না বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে তারি মত আরও অনেক হতভাগিনীর সঙ্গে।

সন্ধ্যা হতে-না-হতে, তাকে প্রসাধন শেষ করে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াতে হয় পথিকের পথ আর মন ভোলাতে। লজ্জায় সে আপনি রাঙা হয়ে ওঠে—তবু তাকে দাঁড়াতে হয়। রাস্তা দিয়ে লোক চলে যেতে যেতে একবার করে বারান্দার দিকে তাকিয়ে যায়। কেউ বা অল্প একটু হাসে। কেউ বা কুৎসিৎ ইঙ্গিতও করে যায়। সে কত কি ভাবে, তবু সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

"তুমি বুঝি ভাই নতুন এসেছ"—বলে পিছন দিক্ থেকে একটী মেয়ে তাকে ডাকৃল।

তার রূপ-যৌবনও কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠেছে। কমলা বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। নবাগত মেয়েটি বলে—"ভাই, এবার আমার অন্ন উঠ্‌ল কিন্তু।"

কমলা বিস্মিতভাবে বলে—"কেন!"

"কেন" মেয়েটি হাসে। "আমি হচ্ছি গিয়ে ওই 'চন্দ্র-কলা' থিয়েটারের সেরা অ্যাক্‌ট্রেস্। অনেক টাকা মাইনে পাই। তবু ঐ অটলবাবুর কাছে থাকি; তার বিস্তর অর্থ-সম্পত্তি আছে কি না। তা' কি বল্‌ব ভাই, লোকটা যেন আমার পোষাকুকুর। বাড়ীওয়ালীকে কিছু কিছু দিই বলে সেও খুব যত্ন করে। আজ শুন্‌লাম, কে একজন নতুন মেয়েমানুষ এসেছে। খুব না কি রূপসী, তায় ছেলেমানুষ। বাড়ীওয়ালী ঠিক করেছে যে, অটলবাবু যদি মাসে পাঁচ শ' টাকা করে দিতে রাজী থাকে ত মেয়েটী তাকেই দেবে। তাই দেখ্‌তে এলাম পাঁচ শ' টাকার যুগ্যি কি না। তা' তোমায় যা' দেখ্‌লাম, কত অটলবাবু তোমার ঐ পায়ে লুটোবে।" বলে সে একটা সিগারেট বার করে কমলাকে দিয়ে বলে—"নাও, ধরাও।"

কুণ্ঠিতভাবে কমলা বলে—"আমি ত খাই না।"

—"খাও না!"

সে বিস্মিতভাবে কমলার দিকে তাকায়। তারপর কি জানি কি ভেবে নিজেই সেটা ধরায়। একটু পরে আবার

বলে—"তুমি বুঝি নতুন এ পথে এসেছ? কি হয়েছিল—শাশুড়ী-ননদের অত্যাচার, না আর কিছু?"

কমলা এক এক করে সব কথা'ই তাকে খুঁটিয়ে বলে। চাঁপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুঃখের সহিত বলে—"পুরুষের প্রকৃতিই ভাই ওই রকম। ওরা যেন সব ব্যাধ—সামনে যাকে বেশী সুন্দরী দেখে, তাকেই শীকার করবার জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে। তারপর বাসনা মিটে গেলে তাকে ছেড়ে চলে যায়। মেয়েরা যেন ওদের কাছে খেলার পুতুল। কি ঘৃণ্য স্পৃহা ওদের! ফুটন্ত রূপ-যৌবন নিয়ে যতক্ষণ তুমি ওদের চোখের সাম্‌নে থাক্‌বে, ততক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন করে মাংসের দিকে তাকায়, তেমনি করেই তোমার দিয়ে চেয়ে থাক্‌বে। তারপর আর তোমার কেউ নয়। ওদের ভালবাসা ত ভালবাসা নয়—কুৎসিত লালসা।"

কথাগুলো কমলার মন্দ লাগে না। সে একমনে শুন্‌তে থাকে। চাঁপা সিগারেটটার শেষ আস্বাদ গ্রহণ করে সেটাকে ফেলে দিয়ে বলে—"এ ব্যবসা আর ভাল লাগে না! তাই মনে করেছি—এখন থেকে শুধু থিয়েটারই কর্ব, এ পথে আর নয়। মেয়েরা দুঃখে-বিপদে পড়ে বুদ্ধি হারায়, তাই ত এ পথে আসে—কিন্তু পরে এর দুর্গন্ধে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়! আচ্ছা ভাই, এখন আসি। আবার আসব।"

সে চলে গেল। কমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার কাণের কাছে লক্ষ করতালি দিয়ে একটি কথা বাজ্‌তে থাকে—এ ব্যবসা আর ভাল লাগে না!

সাঁঝের বাতি জ্বল্‌তে না জ্বল্‌তে, আশপাশের ঘর থেকে হাসির হররা, কাচের গেলাসের ঠুংঠাং শব্দ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে একবার একটা দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। দেখ্‌ল একজন মদ খেয়ে ওয়াক্‌ ওয়াক্‌ করে বমি কর্‌ছে। তার সঙ্গীরা কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। ঘৃণায় তার সর্ব্বাঙ্গ ভরে উঠ্‌ল। সে ঘরে গিয়ে একমনে নিজের অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় বাড়ীওয়ালীর গলা শোনা গেল—আসুন অটলবাবু, এই যে এদিকে।

একটু পরেই সে তার ঘরের সাম্‌নে এসে বলে—"কমলি ঘরে আছিস্‌ রে, অটলবাবুকে যত্ন করে বসা।" তারপর অটলের দিকে চেয়ে বলে—"দেখুন দেখি, এ যেন সগগের অপ্‌সিরে। এবার কিন্তু আমায় মোটা টাকা বক্‌শিস্‌ দিতে হবে বাবু।" তারপর কমলার দিকে চেয়ে বলে—"নে লো, তোর কপাল ভাল ছুঁড়ি, তাই বাবুর নজরে পড়েছিস। অনেক তপিস্যে করলে তবে এমন বাবু পাওয়া যায়। ভাল করে আদর-যত্ন করিস। তোরও সুনাম, আমারও সুনাম।"

বাবুটি খ্যাংখ্যাং করে ভাঙা গলায় বিশ্রী রকম সুরে হাস্‌তে থাকে। পরিষদবর্গ তার হাসির সুরের সঙ্গে সুর মিশিয়ে বলে—"সে কথায় আর কাজ কি মাসী। বাবুর নজরে যখন পড়েছেন, তখন ওঁয়ার এখন বেরস্পতির দশা চল্‌তে থাক্‌ল আর কি।"

তারপর বাবুর হুকুমে তার হাতে খানকতক নোট আর এক বোতল মদ দেয়। বাড়ীওয়ালী নমস্কার করে চলে যায়।

কমলা ভয়ে কাঁপতে থাকে। সাহস করে বাবুটির দিকে চাইতে পারে না। সবাই যেন ঘোর পাপের প্রতিমূর্ত্তি। বাবুটি পারিষদবর্গ নিয়ে মদ খেতে থাকে, আর ক্ষুধার্ত্ত বাঘ যেমন করে হরিণীর দিকে তাকায়, সেও তেমনি করে কমলার দিকে চেয়ে থাকে। কমলার চোখের সাম্‌নে তার ভবিষ্যৎ জীবনটা ফুটে ওঠে। সেই বীভৎস দৃশ্য আর সে দেখ্‌তে পারে না, জ্ঞান হারিয়ে চৌকীর ওপর লুটিয়ে পড়ে। বাবুটি ভাঙা গলায় মনের আনন্দে দেয় গান জুড়ে।

সোণার সূর্য্যের সোণালী আভার স্পর্শে কমলার ঘুম যায় ভেঙে। সে উঠে বসে। তারপর গত রাত্রের ঘটনার কথা একমনে ভাব্‌তে থাকে। কি করে কি হ'ল। সেই লোকটা তার ঘরে এসেছিল। সে জ্ঞান হারিয়ে ঢ'লে

পড়েছিল চৌকীটাব ওপর। তারপর—তখন নিজের কেশ বাস শয্যার দিকে তাকিয়ে সে সবই বুঝ্‌তে পারে। আপনাআপনি কি যেন সে ভাবে। বেশীক্ষণ কিন্তু আবার সে ভাব্‌তেও পারে না। সারা কোলকাতা সহর তার চোখে ধোঁয়ায় ভরে ওঠে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে। সে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

বাড়ীওয়ালী এসে বলে—"এই যে উঠেছিস্‌ দেখ্‌ছি। নে, মুখে চোখে জল দে। বাবু তোর ওপর কাল খুব খুসী হয়ে গেছে। আজ আবার আস্‌বে। দেখিস্‌ যেন চুপ করে বসে থাকিস নি। আব্‌দার ধরিস। পয়সাওয়ালা লোক—একেবারে সোণা দিয়ে মুড়ে রাখ্‌বে। যে ক'দিন রূপ-যৌবন আছে, বেশ করে দুয়ে নে। শেষ বয়সে গ্যাঁট হয়ে বসে থাক্‌বি। আজ কিন্তু তোর জড়োয়ার বালা নেওয়া চাই!"

কমলা কিছু বলে না। শুধু ভাবে, আবার আস্‌বে। আবার আজকে তাকে সেই কদাকার লোকটার কাছে রূপ-যৌবনের পসরা খুলে বস্‌তে হবে। নরকের গন্ধময় বুকে ঢলে পড়তে হবে। তীব্র কামোচ্ছ্বাস ধর্‌তে হবে তার এই ওষ্ঠের ওপর। ছিঃ!

সাম্‌নেই রাস্তার ওধারে একটা দোতলা বাড়ী। তার দৃষ্টি চলে যায় ওই বাড়ীটার অন্তরতম প্রদেশে। অন্যমনস্কে সে একবার সেই দিকে তাকায়। দেখে একজন যুবক, আর একজন যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। যুবক বোধ হয় যুবতীর স্বামী। যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে সে হাস্‌ছে। যুবতী রয়েছে দূরে দাঁড়িয়ে। মুখখানি তার সুন্দর, কিন্তু ভার ভার। চোখ দু'টি ছল্‌ছল্‌ করছে—যেন বিষাদে ঢাকা সোণার প্রতিমা।

অনেকক্ষণ দু'জনে কি কথা হয়—যুবতী দু'-একবার চোখও মোছে। হঠাৎ যুবক যুবতীর দিকে চেয়ে কি বলে। যুবতী যেন এইটুকুরই প্রতীক্ষা করছিল—ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে যুবকের বুকের ওপর। যুবক সাদরে তার মুখখানি তুলে ধরে অতৃপ্তনয়নে সেইদিকে চেয়ে থাকে; তারপর চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয়। কমলা সব ভুলে যায়। সময় স্থান সব বিস্মৃত হয়ে সে শুধু ভাব্‌তে থাকে অতীত জীবনের কথা। তারও তো স্বামী ছিল। সেও তাকে ভালবাসত। তবু সে প্রেম সে দু' পায়ে দলে চলে এসে বিশ্বের কাছে ভিখারিণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আর ফেরা চলে না। কলঙ্কের দাগ যেন গলিত কুষ্ঠের মত তার সারা গায়ে ফুটে বেরিয়েছে। এমনি ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার দিন কেটে যায়। আবার সময় আসে পথের ধারে সেজে দাঁড়াবার। চাঁপা সেই সময় এসে বলে—"কি গো, অটলবাবুর সঙ্গে ভাব হ'ল?"

কমলা উত্তর দেয় না। চাঁপা আবার বলে—"চলো থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে। খুব ভাল পালা। 'মায়ের প্রাণ' বইখানার নাম। আমি মায়ের পার্ট করি। দেখ্‌বে যদি ত চলো।"

—"কিন্তু ভাই, মাসী যে—"

বাধা দিয়ে চাঁপা বলে—"রেখে দাও তোমার মাসী। ওকে যা' হয় বুঝিয়ে দিয়ো। এখন উঠে পড়ো দেখি।"

থিয়েটার দেখে ত কমলা কেঁদেই অস্থির। আহা, ছোট ছেলেটির মায়ের জন্য কি দুঃখ! সে যেন মায়ের জন্য দিশেহারা! তার কষ্টে পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদে।

কি চমৎকার অভিনয়ই হ'ল! সে অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে। বাড়ীওয়ালী বলে—"তোর আক্কেল কি লা! ভদ্রলোক এসে বসে রইল—কোথায় তাকে আদর-যত্ন করবি—তা' নয় গেলি থিয়েটার দেখ্‌তে।"

কমলা হেসে বলে—"ভয় কি মাসী, মিন্সের মুণ্ডুটা যখন ঘুরিয়ে দিয়েছি, তখন সে যাবে কোথায়? এই পায়ে লুটুতেই হবে।"

বাড়ীওয়ালী তার কথায় খুব খুসীই হয়। তারপর সে আঁচল থেকে তামাক পোড়ার কৌটোটা বার করে দাঁতে খানিকটা লাগিয়ে বলে—নে, এখন হাসি রাখ; খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবি চল্‌। রাত হয়েছে; আরো রাত করলে শেষে অসুখ করবে। আয় আমার সঙ্গে।"

কমলা বলে—"তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি মাসী।"

পরদিন তাকে কিছুতেই দোর খোলানো যায় না। বাড়ীওয়ালী এসে বলে —"কম্‌লি দরজা খোল্।"

কমলা দরজা খোলে না।

শেষে হতাশ হয়ে অটলবাবু নিজেই ডাকে—"কমল, কমল, দরজাটা খোলো সোণামণি! দেখো, তোমার জন্যে কি এনেছি।"

কমলা এবার উত্তর দেয়—"আপনি বাড়ী যান।"

অটল বাইরে থেকে উত্তর দেয়—যেন সে কত ব্যথা পেয়েছে—"কোথায় যাব, আমার যে তুমি ছাড়া কেউ নেই মণি!"

কমলা এবার বিরক্ত হয়ে বলে—"যান্, চলে যান এখান থেকে! কি অধিকার আছে আপনার আমার এই দেহ-টাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌বার!"

পারিষদদল 'হুর্‌রে' বলে চীৎকার করে ওঠে। তারপর বাড়ীওয়ালীর দিকে চেয়ে বলে—"মাসী, তোমার এই বিদ্যেবতী বোন্‌ঝিকে থিয়েটারে পাঠিয়ে দাও বাবা! বল্‌বে ভাল!"

কমলা তবু অচল অটল। কেবলই তার কাণে একটি কথা লক্ষ করতালিতে বেজে উঠ্‌ছিল—এ ব্যবসা আর ভাল লাগে না!

শেষে বাড়ীওয়ালী মনে মনে খুব চটে গিয়ে বল্‌ল—"যাক্ গে বাবুরা। তোমরা সব মোক্ষদার ঘরে এস। আমারি ভুল হয়েছে। আমি যদি একটু নজর রাখ্‌তাম, তা' হ'লে আর—থাক্, আজকের মত ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে চালিয়ে নাও—একটা রাত বই ত নয়, আবার কাল তখন দেখা যাবে।"

পারিষদেরা হতাশ হয়ে বলে—শেষে কি না মুখীর ঘরে! তাই চলো বাবা মাসী। বলে—'ব্লাইণ্ড মামা, বেটার দ্যান নো মামা'।"

·

ভোরের হাওয়ার পরশ লেগে কমলা জেগে ওঠে। কোল্‌কাতা মহানগরীর ঘুম তখন সবেমাত্র ভাঙ্‌ছে। সে নিদ্রালস দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকায়। তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটে নি। আকাশের গায়ে দু'-একটা তারা জ্বল্‌ছে। বাইরে রাস্তায় ট্রাম বাসের ঘড়ঘড় শব্দ এবং রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দ এরি মধ্যে আরম্ভ হয়েছে।

কমলা ভাবে, তার যদি একটি ছেলে থাক্‌ত! সে যদি স্বামীকে ছেড়ে না চলে আস্‌ত, তা' হলে হয় ত এতদিনে তার ছেলে হ'ত। আর আজ! তার সারা মন মাতৃত্বের অধিকারের জন্য কেঁদে ওঠে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বাড়ীওয়ালী এসে তার ঘুম ভাঙায়। বলে—"কাল তোর হয়েছিল কি?"

—"শরীরটা ভাল ছিল না মাসী"—বলে সে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে।

মুখখানাকে যথাসম্ভব বিকৃত ক'রে বাড়ীওয়ালী বলে—"আ মরে যাই, কি ন্যাকামীর কথাই বল্লেন! কি আমার শরীর গো, অমন শরীরের বালাই নিয়ে মরি! যাও, এখন কাপড়-চোপড়গুলো কেচে নাও গে। না, তাও পারবে না? বেলা দশটার সময় কলে জল থাক্‌বে না তা' কিন্তু বলে দিচ্ছি।" ব'লে সে আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে চলে যায়।

কমলের বুক থেকে আবার একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে কিছুক্ষণ উদাস-দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে থাকে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে কল-ঘরে যায়। এই তার সকালের কাজ। এ না কর্‌লে কপালে অন্ন জুটবে না হয় ত। সে একবার কি ভেবে কাজে লেগে যায়।

খান তিনেক কাপড় কাচার পর তার মনে পড়ে—কাল্‌কের থিয়েটারে দেখা হিরণকুমারের কথা। কি সুন্দর ছেলেটি! 'মা মা' করেই আত্মহারা। হায়, তার যদি অমনি একটি ছেলে থাকতো!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে চলে যায় কোন্ স্বপ্নলোকে। কাপড় কাচা থাকে পড়ে। কোথা দিয়ে সময় চলে যায় তা' সে জান্‌তেও পারে না। বাড়ীওয়ালী ডাকে—"কম্‌লি, তোর হ'ল?"

সে চম্‌কে উঠে করুণ দৃষ্টিতে বাড়ীওয়ালীর দিকে চেয়ে

দেখে। অনেকগুলো কাপড় তখনও অকাচা পড়ে রয়েছে। বাড়ীওয়ালী তার রকম দেখে বেশ মোলায়েম সুরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—"এমন করলে ত চল্‌বে না বাছা। আমি তোমায় বসিয়ে ভাত দিতে পারব না। যে কুলে কালি দিয়ে সোয়ামী ত্যাগ করে পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, তার আবার এত ঢং কিসের—নাচতে নেমে ঘোমটা টান্‌লে চল্‌বে কেন? আজ তোমার দুপুরের ভাত বন্ধ। ওলো মালতি, তুই কাপড়গুলোকে কেচে ফেল্। উনি নবাবজাদী—ওঁকে বলেই ঝক্‌মারী করেছি।"

সে চলে যায়। কমলা কাপড়গুলো মালতীর হাতে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কাল সারাদিন তার খাওয়া হয় নি···আজও উপবাস। সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে।

সেখানে চারিদিকেই একটা বিশ্রী জঘন্য দৃশ্য। কেউ সারা গা খুলে স্নান করতে করতে কোন যুবকের সঙ্গে ইয়ারকী দিচ্ছে। কেউ বা হাস্‌তে হাস্‌তে অপর একজন পুরুষের গায়ে ঢলে পড়ছে। কোন ঘরে কেউ বা অতি কদর্য্যভাবে শুয়ে রয়েছে। উঠানের চতুর্দ্দিকে মাংসের হাড়, কাঁকড়া, ডিমের খোলা, খাবারের ঠোঙা, বেগুনি, ফুলুরি, মটর ভাজা ছড়ান। মদের বোতল ও গেলাস ভাঙা, তার ওপর মাছি ভন্‌ভন্ করছে। সে কোনদিকে না চেয়ে সোজা বাইরে চলে আসে।

সেখানে রাস্তায় তখন ছেলেরা খেলা করছে। তার মধ্যে একটী ছেলে অতি সুন্দর। সে কেবলই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রৌদ্রের তাপে তার আপেলের মত রাঙা গাল দুটো আরও রাঙিয়ে উঠেছে।

কমলার ইচ্ছা হ'ল সে একবার ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয়; একবার তার সুন্দর মুখখানা চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু পারে না। যে চুম্বন সে দানবের কাছে বিক্রয় করেছে, সেই চুম্বন সে ঐ ফুলের মত নির্ম্মল শিশুটিকে দিতে ভয় পায়।

হঠাৎ অন্য একটা ছেলে সেই ছেলেটিকে ধাক্কা মারে। ছেলেটি মাটিতে পড়ে 'মা গো' বলে কেঁদে ওঠে। কমলা আর থাকতে পারে না, ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। আঁচল দিয়ে গায়ের ধূলো ঝেড়ে দেয়। তার মুখে দুটো চুমোও খায়। আহা বাছারে! কমলার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল ঝরে পড়ে।

সন্ধ্যাবেলা আবার অটল আসে। সে তখন একটা ঘরে বসে আলো বাতি সাফ্ করছিল। বাড়ীওয়ালী সেখানে এসে তাকে ডেকে বলে—"চল্ কম্‌লি, অটলবাবু এসেছে।"

কমল উত্তর দেয়—"আমি যাব না মাসী।"

তার কথার দৃঢ়তায় মাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে—"নে নে, ন্যাকামী রাখ! চল্ দেখি এখন।"

—"আমায় কেটে ফেল্‌লেও আমি যাব না—জোর করে নিয়ে গেলে মাথা ঠুকে মরব।"

—"তবে তাই মর!" বলে মাসী রাগ করে একটা গেলাস তাকে ছুঁড়ে মারে।

গেলাসটা কমলার মাথায় লেগে চুরমার হয়ে যায়। কপাল বেয়ে রক্তধারা ঝরতে থাকে। দু' দিন উপবাসের পর এতবড় আঘাত পেয়ে সে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে। রক্তে মেঝেয় ঢেউ খেলতে থাকে।

তার অবস্থা দেখে মাসীর ভয় হয়। তাড়াতাড়ি জল দিয়ে রক্ত ধুয়ে ফেলে সে ন্যাকড়া দিয়ে কমলার মাথাটা বেঁধে দেয়। তারপর যায় অটলকে খবর দিতে।

ভোরের হাওয়ায় কমলের জ্ঞান হয়। মাসী ডাকে—"কম্‌লি, অ কম্‌লি।"

কমলা জবাফুলের মত লাল চোখ দুটো খুলেই আবার বন্ধ করে ফেলে। মাসী আবার ডাকে—"কমল, অ কমল, কথা বল্।"

কমলা তখন স্বপ্ন দেখছিল দিগ্বিজয় করে ফিরে এসেছে তার ছেলে। সে ডাকছে তাকে মা বলে। ছেলের নাম হিরণকুমার।

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

বিপ্রলব্ধ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কবিতা লিখে, ফাঁকি দিয়ে ফার্ষ্ট ইয়ার কেটে গেল। কিন্তু গোল লাগ্‌ল প্রমোশনের সময়। গ্রীষ্মের ছুটির পর যখন ক্লাসে গিয়ে বস্‌লাম, দেখ্‌লাম দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর খাতায় আমার নাম নেই। ব্যাপারটা বিস্ময়কর ঠেক্‌ল! টপ্‌ ক'রে নীচে এসে হেড্‌ ক্লার্কের কাছে চলে এলাম। তিনি তখন সবেমাত্র এক টিপ্‌ 'র' নস্য নাকে গুঁজেছেন। চোখ দু'টো তাঁর জবাফুলের মতো লাল—জলে টল্‌টল্‌ কর্‌ছে। অতি তুখোড় লোক—ছেলেদের বিপদে ফেল্‌তে তাঁর বড় আনন্দ। লোকটার প্রতি আমার এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। তবুও বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ব্যাপার কি স্যার? সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে আমার নাম নেই কেন?

হেড ক্লার্ক রামবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আপনার নাম কি?

আমি বল্লাম, ধীরাজ মুখার্জ্জী।

রামবাবুর ঠোঁটের আগায় একটু চাপা হাসি খেলে গেল। বল্‌লেন, আপনিই কবি, না?

আমি বল্লাম, জিজ্ঞাসা করবার কারণ?

রামবাবু বল্লেন, না এমনি; তবে 'ফার্ষ্ট ইয়ার নো ফিয়ার' কি না? বলে তিনি একটু চাপা বিদ্রূপ কর্‌লেন। আবার বল্লেন, প্রিন্সিপ্যাল একবার ডাক্‌ছিলেন আপনাকে, আপনার কবিতা তাঁর বড় ভাল লাগে!

আমি বল্লাম, ঠাট্টা রেখে দিন, ওটা বাড়ীতেও করবার যথেষ্ট সময় পাবেন, কাজের কথা বলুন।

রামবাবু পকেট থেকে একটা পচা নোংরা রুমাল বার করে নাকে দিয়ে ফোঁ ফোঁ শব্দ করে বল্লেন, ওঁর কাছেই সব জান্‌তে পার্‌বেন, তবে তিনি যে ডেকেছেন এটা নিশ্চয়।

আমি আর দাঁড়ালাম না। দাঁতে দাঁত চেপে সোজা প্রিন্সিপ্যালের ঘরের কাছে এসে হাজির হ'লাম। কিন্তু ঢুকতে যেতেই ইয়া ভুঁড়িওয়ালা ভোজপুরী দারোয়ান বাধা দিয়ে বল্লে, ঠারিয়ে বাবুজী, আভি জানেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

আমি তখন রাগে ও অপমানে ফুল্‌ছি। বল্লাম, হামারা বিশেষ প্রয়োজন হ্যায়, তোমারা কথা শোন্‌বার সময় নেহি হ্যায়। বলে নিজেই তাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে স্ক্রীন ঠেলে সোজা প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালাম।

অধ্যক্ষ-মশায় আমায় চিন্‌তেন; দেখেই বল্লেন, কি ধীরাজ, তোমার এই রকম ধারা কাজ? ছিঃ ছিঃ, কবিতা না হয় লেখো, কিন্তু তাই বলে লজিকের খাতায় বিদ্যে ফলালে? ফেল্‌ তো সবেতেই মেরেছ……

আমি খুব বিনীত এবং অনুতপ্ত স্বরে তাঁর পায়ের দিকে চেয়ে বল্লাম, কাজটা বিশেষ খারাপ করেছি, আমায় মাপ করুন…

অধ্যক্ষ-মশায়ের মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন, আমি পারি না তা', যিনি লজিকের খাতা দেখেছেন, তিনি যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তবে প্রমোশন দেওয়া যায়, নচেৎ তোমাকে ফাইন্‌ দিতে হবে পাঁচ টাকা। আর সবেতেই ফেল্‌ মেরেছ তো, প্রমোশন নিয়েই বা লাভ কি?

আমি বল্লাম, অর্দ্ধেক বই ছিল না, তা' ছাড়া...

অধ্যক্ষ-মশায় বল্লেন, বেশ বেশ, ও সব শুন্‌তে চাই না, এখন সুধীরবাবুর কাছে যাও, তিনি লজিকের খাতা দেখেছেন, যদি ক্ষমা করেন তো ভালো; আমার কোনো হাত নেই।

সুধীরবাবুর কাছে গেলাম। তিনি তখন 'প্রোফেসার রুমে' বসে বর্ম্মা চুরুট টান্‌ছেন। আমার প্রার্থনা শুনে প্রথমে তীব্র ভর্ৎসনা কর্‌লেন, তারপর বল্লেন, বেশ, আর

কখনো এ রকম লিখো না; আমি প্রিন্সিপ্যালকে ব'লে দিচ্চি, প্রমোশন পাবে, ভাল ক'রে পড়াশোনা করো।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রমোশন পেলাম।

প্রতিজ্ঞা করলাম, এবার ভালো ক'রেই পড়াশোনা করব। কিন্তু দু'মাস কাটতে না কাটতে আবার যে কে সেই।

ক্লাসে গেলেই আড্ডা চলতে থাকে। অবশ্য আড্ডাটা একটু স্বতন্ত্র গোছের। তিনজন ছেলেকে নিয়ে এই আড্ডাটা গড়ে ওঠে। আমি, নলিনাক্ষ আর জগদীশ। ক্লাসে যখন পড়াশোনা চলে, তখন তিনজনের মধ্যে আলোচনা হয়। তিনজনেই আমরা কবি। তিনজনেই আমরা সাহিত্যিক। নলিনাক্ষের কবিতা কলেজ-ম্যাগাজিনে ওঠে, জগদীশের শুধু কলেজ ম্যাগাজিনেই নয়, 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান' প্রভৃতি কাগজেও ওঠে, আর আমি একটু ভারিক্কে গোছের—কারণ, আমার লেখা অনেক কাগজে ওঠে। মাঝে মাঝে ক্লাসে বসেই আমাদের 'স্যাফো', 'অস্কার ওয়াল্ড', 'হুইটম্যান' প্রভৃতি কবিদের কবিতা থেকে তর্জ্জমা চলে। আবার পরস্পরের অভিনন্দনের জন্যে আমরা পরস্পরেই উঠে প'ড়ে লাগি।

সেদিন "সিভিক্স" পড়া হচ্ছে ক্লাসে। নলিনাক্ষ জগদীশের উদ্দেশে একটা পদ্য লিখে ফেললে। আমি সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম—

"অনুমানি তব দেশ হবে সখা, আন্দামান কি বর্ম্মা,
বিধাতা তোমায় গড়ে নাই কভু, গড়েছে বিশ্বকর্ম্মা!
মরি মরি কিবা দাড়ি খোঁচা খোঁচা, ভুরু কামায়েছ হর্ষে,
আই-এ ফেল মারা ছেড়ে দাও কবি, টাংরায় চষো সর্ষে!
কবিতা রচনা ছেড়ে দিয়ে সখা, সুরু করে দাও তর্জ্জা,
ছুতোরের মতো কিংবা কাঠেতে রচ গো জানলা দরজা!
জ্যোৎস্নাতে নয়, অমাবস্যাতে পড়েছি তোমার কাব্য,
তোমার গ্রন্থ 'রেলিঙ'এও কিনে পয়সা নষ্ট ভাববো।"

জগদীশও তার উত্তর লেখে। এইভাবে সারাদিনটা ত কেটে যায়।...

দেখতে দেখতে টেষ্ট পরীক্ষা এসে পড়ল। আমার মাথা ঘুরে গেল। এই বিরাট পাঠ-সাগর কি করে অতিক্রম করবো?...কিন্তু করলামও কোনোরকমে। আমি 'এলাউ' হয়ে গেলাম। কিন্তু 'এলাউ' হলেই হবে না তো... পাশ করতে হবে যে। মহা মুস্কিলে পড়লাম। হঠাৎ সেদিন আমাদের ইংরাজীর অন্যতম অধ্যাপক বিপিনবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হ'ল। তিনি খুব অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমায় দেখে বল্লেন, কি রকম পড়াশোনা হচ্ছে ধীরাজ?

আমি মাথা চুলকে বল্লাম, সুবিধে নয় স্যার।

তিনি খানিকক্ষণ কি ভেবে বল্লেন, এক কাজ করতে পারবে?

আমি বল্লাম, বলুন।

তিনি বল্লেন, আমি ত এইখানেই আছি, ঐ একটু দূরে, বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে পনের নম্বর। আমার কাছে না হয় আসবে তিনটে নাগাদ। আমি একটু-আধটু দেখবো-শুনবো 'খন।

প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। বল্লাম, বেশ ত, কাল থেকে না হয় যাবো।

অধ্যাপক বিপিনবাবু খুসী হয়ে বল্লেন, বেশ, বেশ, ঐ যে পথের ধারের বাড়ীটা—ওর সামনেই দেখবে সিঁড়ি। সোজা ওপরে উঠে গিয়ে ডাকবে। আমি ওপরের ফ্লাটেই থাকি।

আমি রাজী হয়ে নমস্কার করে বাড়ী চলে এলাম।

পরদিন কথামতো ঠিক তিনটার সময় তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। পথের ধারেই বাড়ী বটে। সোজা সিঁড়ি ধরে উঠে গিয়ে 'স্যার' বলে ডাকলাম। অধ্যাপকমশায় ভেতর থেকে বল্লেন, এসো।

আমি গিয়ে নমস্কার করতেই তিনি একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বল্লেন। বসলাম।

ঘরটা বেশ জমকালো। একধারে একটা মস্তবড় খাট—

দুগ্ধফেননিভ তার শয্যা। অন্যদিকে কতকগুলো আলমারী—ইংরাজী প্রবীণ এবং নবীন লেখকদের গ্রন্থরাজিতে ভর্ত্তি।

দেওয়ালে টাঙানো অনেক ছবি, বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের। ঘরে ঢোক্‌বার দরজার ধারেই কতকগুলো চেয়ার, একটা টেবিল। অধ্যাপক-মশায় তাঁর একটা চেয়ারে বসেছিলেন। টেবিলে তাঁর একখানা 'রাইডার হেগার্ডে'র উপন্যাস খোলা। বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে তিনি তা' পড়ছিলেন। আমায় বল্লেন, কোন্ বইটা তুমি পড়্‌বে উপস্থিত ?

আমি বল্লাম, 'ইনক্ আরডেন।'

অধ্যাপক বিপিনবাবু তার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটী আঠারো-উনিশ বছরের সুন্দরী তরুণী বই হাতে ক'রে ঘরে এসে দাঁড়াল। আমি তার দিকে চেয়েই মুখ নত করলাম। বিপিনবাবু একটু হেসে বল্লেন, এসো মণিকা, আজ যে দেরী হ'ল ?

মণিকা বোধ হয় তার একটা লম্বা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমাকে দেখে লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে আনতমুখে বল্লে, অঙ্ক কষ্‌ছিলাম বাড়ীতে, বাবা...

বিপিনবাবু বল্লেন, ও, বাবা বুঝি কষাচ্ছিলেন ?

মণিকা হাঁ ব'লে বিপিনবাবুর পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসে পড়্‌ল। অধ্যাপক-মশায় আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, এ আমার ছাত্রী, 'বেথুনে' আই-এস্-সি পড়ে, এবার পরীক্ষা দেবে। এর বাবা আমার বন্ধু, 'সেণ্ট পল্‌সে'র 'ম্যাথামেটিক্সে'র প্রোফেসার।

আমি মণিকার দিকে ক্ষণিক চেয়ে বল্লাম, ও।

অধ্যাপক এবার আমার পরিচয় দিলেন। বল্লেন, এটি হচ্ছে কবি, অল্প বয়সেই বেশ নাম করেছে।

সেই সময় হঠাৎ একটী লম্বা রোগা ছেলে ঘরে এল। আমার দিকে একটা সন্দেহপূর্ণ-দৃষ্টি হেনে বল্লে, বাবা, এটি কে ?

বিপিনবাবু বল্লেন, এ আমাদের কলেজেই পড়ে, এর কবিতা বোধ হয় কলেজ ম্যাগাজিনে দেখে থাক্‌বে...বেশ লেখা। দিনকতক আমি ওকে পড়াব ভাব্‌ছি।

অধ্যাপক-পুত্র বল্লেন, নাম কি ?

বিপিনবাবু বল্লেন, ধীরাজ মুখার্জ্জি। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, এ হচ্ছে আমার ছেলে, এবার বি-এ দেবে, নাম জহর।

জহর আমায় দেখে বিশেষ খুসী হ'তে পার্‌ল না। ঘৃণার সঙ্গে বল্লে, রাবিস কবিতা!

তারপর 'এডিসনে'র একটা বই নিয়ে সে বিছানার ওপর উঠে বস্‌ল। মণিকার দিকে চেয়ে বল্লে, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে মণিকা ?

মণিকা লজ্জার সঙ্গে উত্তর দিলে, ভাল।

জহর তখন আরম্ভ করলে। বল্লে, শুন্‌ছ বাবা, আজ একখানা বই পড়লাম—কি চমৎকার লেখা তার! কিন্তু 'ডেন্‌জারাস' একটা কবির চরিত্র। পড়ে কবিদের প্রতি ঘৃণা হ'য়ে গেল। ছি ছি, কি পাশবিক...

কথাটা যে আমাকেই উদ্দেশ্য ক'রে বলা হ'ল, আমি বুঝ্‌লাম, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ কর্‌লাম না। বিপিনবাবু বল্লেন, সে তোমার অন্যায়; একটা কবির চরিত্র দেখে শত শত কবির চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা, —লজিকও সমর্থন করে না।

জহর একটু চুপ কর্‌লে। তারপর আবার বল্লে, কো-এডুকেশন জিনিষটা তুলে দেওয়া উচিত।

বিপিনবাবু বল্লেন, থাক্, সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে। তুমি এখন চুপ কর।

বাধ্য হয়েই জহর চুপ কর্‌ল। বাপের আদুরে ছেলে!

অধ্যাপক-মশায় পড়া বোঝাতে সুরু কর্‌লেন। আমি শুন্‌তে লাগ্‌লাম। মাঝে মাঝে মণিকার সঙ্গে চোখো-চোখী হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল।...সব গুলিয়ে গেল। তার ডাগর ডাগর দু'টী চোখ, তার সোণার মতো রূপ, তার গণ্ডস্থলে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা লালিমা আমায় যেন আকুল ক'রে তুল্‌ল। ইচ্ছা হ'ল, এখনই ওর সঙ্গে কথা কই, একখানা নোট চাই, একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু সুযোগ্য অধ্যাপক-পুত্র জহরের পানে তাকিয়ে আমার সে সাহস হ'ল না। তার যেন চোখ দুটো আগুনের হল্‌কা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে বল্লাম, কেনরে বাপু, আমার ওপর তোর রাগ

কিসের ? কিন্তু পরক্ষণেই অনুমান ক'রে নিলাম, অধ্যাপক-পুত্র মেয়েটীকে হয় ত ভালবেসেছে। যেখানে একজনের ভালবাসা পড়েছে, অন্যে সেখানে হস্তক্ষেপ করলে প্রেমিক মাত্রেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, মণিকা কী সত্যই জহরকে ভালবাসে ? কই, সে রকম চিহ্ন তার চোখে তো দেখ্‌তে পেলাম না ! বরং ওর প্রতি একটা বিরক্তিই তো প্রকাশ পাচ্চে মণিকার চাহনি থেকে।...

সাড়ে চারটে বাজবামাত্রই বিপিনবাবু বললেন, থাক্ আজ এই পর্য্যন্ত, আবার কাল হবে। আমি বইটই নিয়ে উঠে পড়্‌লাম, এমন সময় দেখি জহরলাল ষ্টোভ জ্বেলেছে এবং মণিকাকে বল্‌ছে, দাঁড়াও, চা খেয়ে যাবে।

কথাটা বলা মানে আমাকে অপমান করা। আমি আর দাঁড়ালাম না। সোজা পথে নেমে এলাম।

বাড়ীতে এসে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, ওখানে আর যাব না। ...ওরা অতি ছোটলোক। মেয়েটার ওপর রাগ হ'ল—কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম ওরই বা দোষ কী ?

আবার তারপর দিন তিনটে বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই সোজা গিয়ে প্রোফেসারের দ্বারে আঘাত কর্‌লাম। কিন্তু প্রোফেসার না এসে বেরিয়ে এল তাঁর সুযোগ্য পুত্র জহর। আমার দিকে চেয়ে অতি রুক্ষস্বরে জিগ্যেস কর্‌লে, কা'কে চান্ ?

ন্যাকা যেন। আমি বল্‌লাম, বিপিনবাবুকে।

জহর বল্‌লে, বাবা ঘুমুচ্ছেন। আপনাদের কি পড়াশোনা নেই না কি ? যান্, এখন পড়ুন গে যান্। পরীক্ষায় যা' পাশ কর্‌বেন...

আমার রাগ হয়ে গেল। বল্‌লাম, পাশ করি না করি, আলাদা কথা,—আপনার বাবা বলেছিলেন বলেই এসেছি।

বসুন তা' হ'লে বলে অনিচ্ছার সঙ্গে জহর আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে। সামনে একখানা 'এড্‌ভান্স' পড়েছিল। ব'সে সেইটে নিয়ে পড়বার ভান কর্‌লাম।

দু' মিনিট পরেই মণিকা এসে গেল। জহর চল্‌লো—তার সম্বর্দ্ধনায়। হাসি মুখে বল্লে, এস, এস।

মণিকা আমারি নিকটস্থ চেয়ারে বস্‌বার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু জহর বল্লে, না, ওখানে 'রবীন্দ্রনাথ' আছেন, তুমি এই ঘরে এস, আমার বাবা এখন ঘুমুচ্ছে। বলে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে চাইলে।

মণিকা কিন্তু আপত্তি কর্‌ল। বল্লে, না, আমি এইখানেই বস্‌ছি। বলে আমারি হাত দুয়েক দূরে বসে পড়্‌ল।

জহরকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখা গেল।

মণিকার আজ একটু বেশের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্‌লাম। দামী একখানা শাড়ী তার পরণে রয়েছে, মাথার চুলগুলিও বেশ সুবিন্যস্ত, মুখে পাউডার, পায়ে একটা মখ্‌মলের শ্লিপার।

আজকে আমার লজ্জাটা একটু কেটে গেছ্‌ল। মণিকার দিকে তাকালাম। হঠাৎ দু' এক মিনিট পরে মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে গেল, আচ্ছা, আপনার 'ইলিয়াডে'র 'কোস্‌চেন'গুলো দিতে পারেন ?

মণিকাও যেন কথা কইবার জন্যে সুযোগ খুঁজ্‌ছিল। একটু লজ্জার সঙ্গে বল্লে, খাতায় আছে, যাবার সময় নিয়ে যাবেন।

আমি হাতে স্বর্গ পেলাম।...হঠাৎ দেখি জহর আমার দিকে চেয়ে বল্‌ছে, পরীক্ষা এসে গেল, এখনো নোট চাইবার প্রবৃত্তি গেল না ?

কথাটা আমার মর্ম্মে গিয়ে আঘাত কর্‌ল। আমি রাগে কোনো জবাব দিতে পার্‌লাম না। জবাব দিলে মণিকা। বল্লে, অপরে সে প্রবৃত্তিকে যদি প্রশ্রয় দিতে পারে, আপনার তা'তে 'ইন্‌টারফিয়ার' করবার যে অধিকার আছে, এ আমি মানতে প্রস্তুত নই।

জহর কথাটা শুনে কি একটা ভারিক্কে জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিপিনবাবু এসে পড়ায় পার্‌লে না।

বিপিনবাবু পড়াতে লাগ্‌লেন। হঠাৎ একজন সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোক এসে দরজা ঠেল্‌লেন। বিপিনবাবু বল্লেন, কে ?

ভদ্রলোক কোনো জবাব না দিয়েই ঘরে এসে পড়লেন। অধ্যাপক-মশায় লাফিয়ে উঠ্‌লেন।—হ্যালো মিঃ নাগ!

নাগ টুপিটা খোলামাত্রই বিপিনবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, আজ যাও, আজ আর হবে না।

আমি উঠে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে মণিকাও দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। জহর বল্লে, দাঁড়াও মণিকা, চা-টা খেয়ে যাবে।

মণিকা কি বল্লে বুঝ্‌লাম না। আমার হাতে সে খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বল্লে, এর মধ্যে 'কোস্‌চেন'গুলো পাবেন।

আমি বল্লাম, থাক্, আর দরকার নেই। বলে অপমান বোধ করে সোজা নীচে নেমে এলাম।

মণিকাকে বোধ হয় ছাড়লো না জহর। তাই তাকে পিছনে দেখ্‌তে পেলাম না।

বাড়ীতে এসে রাগে আমার সর্ব্ব শরীর ফুল্‌তে লাগ্‌ল। মাইনে দিই না বলেই কি আমায় এতদুর অপমান করবেন অধ্যাপক-মশায়? কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দেবেন? তার ছেলে পর্য্যন্ত একটা মেয়ের সাম্‌নে যা' তা' বল্‌বে? কেন, এক কাপ চায়ের কি আমি ভিক্ষুক না কি?...মন বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছা হ'ল এই মুহূর্ত্তেই যাই, প্রোফেসারকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। জহর ছোকরাকেও একবার দেখে আসি কেমন ছেলে। ভেবেছে কি? আমি মেয়েটাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য পাগল না কি? আমি তার হাত থেকে মণিকাকে টেনে নিয়ে পালাচ্ছি না কি? মণিকা যদি তাকে ভালবাসে তো বাসুক না। দু'জনের মধ্যে যদি বিয়ে হয় তো হোক্ না। আমার কি তা'তে?···

তিনদিন কেটে গেল। আমি আর প্রোফেসার-গৃহে গেলাম না। হঠাৎ সেদিন অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লাম। নাঃ, অপমান এ রকম করে হজম করা ঠিক্ নয়। ভাব্‌লাম, একবার যেতেই হবে—যেতেই হবে ওখানে। যাব ঝঞ্ঝা নিয়ে, যাব বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে, যাব প্রতিশোধ নিতে।··

অপমান সয়ে ভাল ছেলের সুনাম আমি চাই না। এমন মেরুদণ্ডও আমার নেই। এ শুধু আমারই অপমান নয়, এ আমার অন্তরের, আমার মনুষ্যত্বের, আমার আত্মার।...

তখনই দাঁড়িয়ে উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে অধ্যাপক-গৃহে হাজির হলাম। সিঁড়ি বেয়ে উপরে গিয়ে ডাকলাম, স্যার। কোনো উত্তর এল না। আমি দু' মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম জহরের গলা। জহর বল্‌ছে, মণিকা, আমার দিকে একবার চাও! শুধু একবার! এত করে বল্‌ছি, শুন্‌ছো না! তুমি কি পাষাণ!

বুকটা আমার কেঁপে উঠ্‌ল! জহর বলে কি? বাড়ীতে কেউ নেই না কি? আবার শুন্‌তে লাগ্‌লাম, মণিকা বল্‌ছে, জহরবাবু, আপনি এত বড় অভদ্র আমি তা' জান্‌তাম না। আপনি ছেড়ে দিন আমায়! ছি ছি, এ সব কথা বল্‌তে আপনার শিক্ষিত মনে একটুও বাধ্‌ল না! বিয়ে ত দূরের কথা, আপনি জানেন আমি কি কর্‌তে পারি আপনার?

হঠাৎ জহরের তীব্রকণ্ঠ শোনা গেল। জহর বল্‌ছে, বেশ, তুমি যা' ইচ্ছে করো, কিন্তু আমার ক্ষুধা মেটাবার জন্যে আমি উপস্থিত—

তারপর এক মিনিট আর কোনো কথা শোনা গেল না। হঠাৎ মণিকা আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল।...তীব্র আর্ত্তনাদ!···আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না। 'টপ্' করে লাফিয়ে উঠে ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়ে পড়লাম। কপাটটা ভেতর থেকে বন্ধ। মণিকার কাতর চীৎকার শুন্‌লাম, মা গো!

আমার বুকের রক্ত নেচে উঠ্‌লো। আমি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দরজায় আঘাত করে বল্‌লাম, কপাটটা খুল্‌বেন জহরবাবু!

জহর উত্তর দিলে না। মণিকা চীৎকার করে উঠ্‌ল, রক্ষে করুন ধীরাজবাবু, আমায় রক্ষে করুন!

মণিকা তবে আমায় চিনেছে। আমি শান্তকণ্ঠে বল্‌লাম, দরজাটা খুলুন তো মণিকা দেবী।

মণিকা কিন্তু দরজা খুল্‌ল না। খুল্‌ল জহর। আমার পানে হত্যাকারীর মত চেয়ে সে চীৎকার করে উঠল, আমার বাড়ীতে তোমায় আস্‌বার কে অধিকার দিয়েছে ষ্টুপিড ? বেরিয়ে যাও এখুনি, নইলে খুন করে ফেল্‌ব।

আমি বল্লাম, মাথা ঠাণ্ডা করে কথা কইবেন জহর-বাবু। অধিকার কেউ কখনো কা'কে দিতে পারে না—নিজের অধিকারেই অধিকারটাকে অধিকার করে নিতে হয়। আর এটাও স্থির জান্‌বেন, আমি কখনই একলা বেরিয়ে যাব না—মণিকা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে তবে যাব। আমি আজ এখানে এসেছিলাম কি জন্যে জানেন ?

জহর শুনে লাফিয়ে উঠে আমার গলা টিপে ধর্‌তে এল। মণিকা আগেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার বেশ আলুথালু। বুকের ব্লাউচ ছেঁড়া। সে খুব হাঁপাচ্ছিল। আমি জহরকে এক ঝাঁকানি দিয়ে দড়াম করে ঘরের মেজেয় ফেলে দিলাম। সে তবুও উঠ্‌তে যাচ্ছিল। আমি সজোরে তার পিঠে দু' তিনটে পদাঘাত কর্‌লাম। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে তার শেকল তুলে দিলাম। জহর চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, চোর, চোর !

আমি বল্লাম, হ্যাঁ আমি চোর ; শুধু চোর নয়, ডাকাত। তুমি খুব বেঁচে গেলে—তোমায় আজ খুন কর্‌তাম আমি। বলে মণিকাকে নিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে এলাম। বুঝ্‌তে পার্‌লাম, অধ্যাপক বাড়ী নেই।

মণিকা পথে এসে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বিপরীতং-ফলং

শ্রীমনোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিমা তিথি। সমস্ত জগৎ আজ যেন আনন্দে হাস্‌ছে। সুরেশ ও লীলা ছাতের ওপর বসে নিজেদের কথা-বার্ত্তায় মত্ত। বহুদিন পরে স্বামী সুরেশ স্ত্রী লীলাকে পাশে বসিয়ে সে কি ক'রে এই দীর্ঘ ন' মাস অতিবাহিত করেছে তাই শোনাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌ছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো লীলার মুখের ওপর পড়ে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। সুরেশ বলে যাচ্ছে—"যখন তোমার হাতের মেয়েলী আঁকা-বাঁকা অক্ষরের চিঠি পিয়ন আমার টেবিলের ওপর রেখে যেতো, তখন যে আমার কি আনন্দ হতো লীলা, তা' আর তোমাকে কি বল্‌বো! আমি তাড়াতাড়ি চিঠি খুলেই পড়্‌তে বস্‌তাম। চিঠি পড়ার আগে কি জানি কেন বুকটা আমার আনন্দে কাঁপ্‌তে থাকৃত; তারপর যখন দেখ্‌তাম তুমি লিখেছো—'একবার যত শীগ্‌গিব পার বাড়ী এসো', তখন যে আমার কি মনে হতো তা' আর তোমাকে কি বল্‌বো লীলা। ইচ্ছা হতো তখনই চাকৃরী ছেড়ে দিয়ে যে ট্রেণখানা আঁকাবাঁকা লাইনের ওপর দিয়ে বাসার নিকটেই ষ্টেশনের দিকে আস্‌ছে, ছুটে চলে গিয়ে সেই-খানাতে চড়ে বসি। কিন্তু আজকালকার দুর্লভ চাকরীর কথা মনে পড়্‌তেই চুপ করে যেতুম। অফিসে বেরুতুম বটে, কিন্তু সেদিন আর কোন কিছুই ভাল লাগ্‌তো না। ট্রেণ যখন বাঁশী বাজিয়ে তার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা কর্‌তো, তখন আমার মনে হতো সে যেন আমায় ডাকৃছে, আর যখন বিদায় বাঁশী বাজাতো, তখন মনে হতো ট্রেণ যেন বল্‌লো—"তুই তো আর গেলি নে, আমি চল্‌লাম'।"

—"আমি কিন্তু এবার তোমার সঙ্গে যাব।"

—"যাবে, সত্যি যাবে?"

—"নিয়ে গেলেই যাব। মা বল্‌ছিলেন—এবার আমাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন; নইলে তোমার বড় কষ্ট হয়।"

—"তা' হলে কিন্তু বড় আমোদেই আমাদের দিনগুলো কাট্‌বে লীলা! যাক্‌, ভালই হলো। আমি ভেবেছিলুম, এবার মাকে তোমার যাওয়ার কথা বল্‌বো। তবে বল্‌তে আমার ভারি লজ্জা কর্‌ত।"

—"বাবা চার পাঁচদিন আগে একখানা চিঠি লিখে-ছিলেন। তা'তে তিনি জানিয়েছিলেন—যদি তোর ওখানে ভাল না লাগে ত লিখিস। আমি গিয়ে তোকে নিয়ে আস্‌বো।

—"তুমি কি লিখ্‌লে?"

—"লিখ্‌লাম, আমার এখানে কোনও অসুবিধে নেই। আমি এখন যাব না।"

—"তা' হ'লে তোমার যাওয়া ঠিক্‌ তো?"

—"এখন যদি দয়া ক'রে নিয়ে যাও তবেই ঠিক্‌, নইলে সবই বেঠিক্‌।"

—"তুমি এত কথা কোথা থেকে শিখ্‌লে লীলু? তোমাকে দেখেছিলাম লজ্জাভারাক্রান্তা, কোমলা, অব-গুণ্ঠনবতী একটি বালিকা, আর এখন দেখ্‌ছি তুমি পাকা গিন্নী হ'য়ে পড়েছ!"

—"বাপরে, বিশেষণের আর কিছু বাকী থাকে ত ব'লে ফেলো। তুমিও ত দেখ্‌ছি এখন একজন শান্ত-সুশীল-বিনয়ী কর্ত্তা-মশায়।"

—"ও বৌদি" হঠাৎ নীচে থেকে ডাক্‌ এলো।

সুরেশ বল্লো—"নিভা বোধ হয় তোমায় ডাক্‌ছে।" বল্‌তেই সুরেশের বোন্‌ নিভা ওপরে উঠে এলো।

—"এই যে, দাদা, বৌদি' দু'জনেই এখানে, আর আমি বৌদি' বৌদি' করে সকল ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা লোক যা' হোক্‌।"

—"পূর্ণিমার আলোয় ছাতের ওপর বসে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছি। আয়, বোস্‌।"

—"বস্‌বো কি রকম? বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবে না?

আমি ত সেজে 'রেডি' হয়ে আছি, এখন তোমাদের যা' দেরী।"

—"মা বাবা যাবেন না?" সুরেশ জিজ্ঞাসা করলো।

—"না। আমি, তুমি আর বৌদি' এই তিনজনে যাবো। আর কেউ যাবেন না।"

সুরেশ বল্লো—"আমি না গেলে হয় না? তোরা দু'জনে যা' না।"

—"তুমি না গেলে বৌদি'ও যে যাবে না।" তারপর নিভা মুচকি হেসে বল্লো—"ওসব কোন আপত্তি চল্‌বে না দাদা। তোমাকে যেতেই হবে।"

"তবে চল্"—বলে সকলে ছাত থেকে নাম্‌লো।

দুই

গেটের সুমুখে মোটর দাঁড়িয়েছিল। সুরেশ, লীলা ও নিভা সেখানায় উঠে বস্‌তেই গাড়ীটা ছেড়ে দিলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মোটর 'টকি হাউসে'র সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তিনজনে গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌ল। পাশের মোটর থেকেও দু' জন নাম্‌লো। তাদের হঠাৎ দেখ্‌লে সাহেব, মেম বলে ভ্রম হয়। গাড়ী থেকে নেমে ভদ্রলোকটি সোজাসুজি এসে সুরেশের পিঠে এক চড় মেরে বল্লো—"হ্যালো মিষ্টার সুরেশ, আই য়্যাম ভেরি গ্লাড্ টু সি ইউ।"

সুরেশ কিছুক্ষণ ভদ্রলোকটির পানে চেয়ে সানন্দে বলে উঠ্‌লো—"ডিয়ার সুশীল, আর ইউ হিয়ার? আই নেভার এক্সপেক্‌টেড টু মিট উইথ ইউ হিয়ার। তারপর, কেমন আছিস? ভাল ত?"

—"হ্যাঁ, আছি একরকম"—ব'লে সুশীল সুরেশের সঙ্গে করমর্দ্দন করলো। ক্রমে লীলা, নিভা, সুশীলের স্ত্রী প্রীতি সকলে পরস্পরের প্রতি সাদর-সম্ভাষণ জানালো।

—"চল্, সিটে গিয়ে বসে কথাবার্ত্তা বলা যাক্।"

সুশীল সুরেশকে একরকম টেনে নিয়ে গিয়ে দু'খানি চেয়ারে দু'জনে বসে পড়লো। লীলা, নিভা ও প্রীতি সকলে নিজের নিজের আসন দখল ক'রে বস্‌লো। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চল্‌লো। ক্রমে 'শো' আরম্ভ হলো। সকলে একমনে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লো। প্লেটা খুব 'ইণ্টারেস্‌টিং' ছিল—

এক জেলে। ছোট্ট একটি গ্রামে সে বাস করে। তার একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে সে খুবই ভালবাসতো। বউকে দেখ্‌তে নেহাত খারাপ ছিল না। তাই সে তাকে 'সুন্দরী' ব'লে ডাকতো। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা জেলে বাড়ী আস্‌তো। সুন্দরী তার স্বামীর জন্যে আগে থেকেই ঠাণ্ডা জল, একটু গুড় আর হুঁকো-কল্‌কে সব ঠিক ক'রে রাখ্‌তো। জেলে বাড়ী এলে সে তাকে আঁচল দিয়ে বাতাস কর্‌তো; তারপর ঠাণ্ডা হ'লে তার মুখে একটু গুড় আর জল ধরতো। স্বামীকে তামাক সেজে দিয়ে সুন্দরী তার পায়ের গোড়ায় ব'সে আজ সে কি রকম পরিশ্রম করেছে, কত পয়সা ঘরে এনেছে তাই জিজ্ঞাসা করতো। জেলে সেই কথা শুনেই তাড়াতাড়ি আঁচল থেকে তার উপার্জ্জিত পয়সা খুলে স্ত্রীর হাতে দিতো। পয়সা হাতে পেয়ে সুন্দরীর লাল মুখ আনন্দে আরও লাল হ'য়ে উঠতো, আর জেলে তার স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো।

এই রকম করে সুখে তাদের দিন কাটতে থাকে। ক্রমে বর্ষা আসে। অবিরাম বৃষ্টি পড়ে। জেলে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানে আর ভাবে কখন জল ধরবে। অভাবের সংসার। জেলেনী, অর্থাৎ সুন্দরী কোন জিনিষ ঘরে নেই বল্লেই জেলে রেগে যায়। দুই এক কথায় বেশ ঝগড়া বেধে ওঠে। স্ত্রী স্বামীকে দুটো খাইয়ে নিজে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ে। এইরূপে কষ্টে দিন কাটে। হঠাৎ আকাশে সূর্য্য উঠ্‌তে দেখে জেলে নিজের কাজে যায়। সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ী এসে সে স্ত্রীর হাতে পয়সাগুলো দেয়। জেলেনী পয়সা গুন্‌তে থাকে আর জেলে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। স্ত্রী বলে—"আগেও ত পয়সা আন্‌তে, কিন্তু আজকের পয়সায় এত আনন্দ পাচ্ছি কেন?"

জেলে বলে—"এ যে দুঃখের পর সুখ। এ সুখে আনন্দ

বেশী। দুঃখের পর সুখ না হ'লে তা'তে কি আমোদ পাওয়া যায় রে!"

'শো' শেষ হয়। সুরেশ ও সুশীল পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের নিজের মোটরে এসে বসে। লীলা ও নিভা প্রীতির কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে এসে বস্‌তেই তাদের মোটর ছেড়ে দেয়।

তিন

সাত-আটদিন পরের কথা।

সকালবেলা সুরেশ চা খেয়ে বাইরে চেয়ারে বসে একখানা নভেল পড়ছিলো। তার পাশেই শুয়ে ছিল প্রিয় কুকুর 'টাইগার।' সুরেশ একমনে বই পড়ছিলো আর টাইগার শুয়ে নাক ডাকানি সুরু ক'রে দিয়েছিলো। এমন সময় পিয়ন এসে একখানা খামের চিঠি দিয়ে গেল। উপরে সুরেশের নাম লেখা। সে খামখানি খুলে দেখ্‌লো তার প্রিয় বন্ধু সুশীল তাকে লিখেছে—

ক্যাল্‌কাটা

"মাই ডিয়ার সুরেশ,

আজ তোমাকে চিঠি দিচ্ছি বলে বোধ হয় তুমি খুব আশ্চর্য্য হচ্ছো; কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'বার পর বাড়ী এসে আমি কিন্তু বড় বিপদে পড়ে গেছ্‌লুম ভাই। সেদিন বায়স্কোপে 'দুঃখের পর সুখ হলে সেটা বড় মধুর হয়' দেখে আমিও সেই সুখ উপভোগ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু ভাই ফল হয়েছিল বড় ভীষণ। কি হয়েছিল তাই জানাবার জন্যেই ত তোমাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি।

সেদিন বাড়ী এসেই প্রীতির সঙ্গে বেশ একটু 'খুন্‌সুড়ি' আরম্ভ করে দিলুম। ইচ্ছা ছিলো প্রীতি যেন আমার সুখ অনুভব করার ইচ্ছাটা বুঝ্‌তে না পারে। হলোও তাই। প্রীতি আমার সুখ অনুভব করার ইচ্ছাটা আদপেই বুঝ্‌তে পারলো না। ব্যাপারটা কিন্তু এতে গুরুতর হয়েই উঠ্‌ল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি প্রীতি আর আমার সঙ্গে কথা বলে না, মুখ ভার করে চলে যায়। ভাব্‌লাম, ভগবান বুঝি এইবার আমার ইচ্ছাটা পূর্ণ কর্‌লেন। কিন্তু কই, ফল দেখি ক্রমশঃ আরও উল্টো হ'তে আরম্ভ হলো। চার-পাঁচ-দিনের মধ্যেও প্রীতি আমার সঙ্গে কথা বল্লে না, আমার দিকে একবার ফিরেও চাইলেও না। আমি কিন্তু চেয়েছিলাম ভাই ক্ষণিকের বিরহ। এত অধিক বিরহ কি সহ্য করা যায়—না আগে জান্‌লে এমন কাজ কর্‌তুম! অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে, আমি ছবির সেই সুখ অনুভব করতে গিয়ে এই বিপরীত কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি। সে কিন্তু কিছুতেই সে কথা বুঝ্‌তে চায় না। অবশেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে বল্লো—'বলো, আর কোনদিন তুমি বায়স্কোপ বা থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে না।'

আমি তা'তেই স্বীকৃত হ'লুম। বল্লুম—'প্রকৃত সুখ অনুভব কর্‌তে গিয়ে শেষে এমন বিপরীত ফল হবে যদি জান্‌তুম, তা' হ'লে কি আর সেই ছায়ের ছবি দেখ্‌তে যেতুম।'—এই বলে আমরা আপোষে মিট্‌মাট্‌ ক'রে নিলুম।

সাবধান ভাই, তুমিও যেন আমার মত হিতে বিপরীত বা 'বিপরীতং-ফলং' করে বসো না। ইতি,

তোমার বন্ধু
সুশীল

লীলা যে কখন সুরেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে তা' জান্‌তেও পারে নি। চিঠিখানা পড়া শেষ হ'লে লীলা বল্লো—"দেখো, সাবধান, বন্ধুর উপদেশ মনে রেখো; তুমিও যেন তোমার বন্ধুর মত করে বসো না।"

এই কথা ব'লে সে হাস্‌তে লাগ্‌লো। সুরেশও সেই হাসিতে যোগ দিলো। দু'জনে মিলে তখন তারা খুবই হাস্‌তে লাগ্‌লো।

শ্রীমনোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

হলিউডের বিচিত্র-সংবাদ

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

চিত্রাভিনেতৃবর্গের মুদ্রাদোষের নমুনা—

কয়েক মাস পূর্ব্বে 'গল্পলহরী'র স্তম্ভে অভিনেতাদের 'খেলার খেয়াল' শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠক-পাঠিকার সমাদর লাভ করায় চিত্রাভিনেতৃদের মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে আজ একটু-আধটু আলোচনা করিব। মুদ্রাদোষ ব্যতীত মানুষ হয় না সত্য, কিন্তু যাঁহাদের নামের মোহ আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া তুলে—যাঁহাদিগকে ছবির পর্দ্দায় দেখিবার আশায় আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠি—তাঁহাদিগের মুদ্রাদোষের নমুনা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া বোধ হয় বিন্দুমাত্র বিচিত্র নহে।

বিখ্যাত অভিনেত্রী নর্ম্মা শিয়ারার কোনো দৃশ্যে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস লইয়া সমস্ত দেহটীকে সোজা করিয়া লন্। অভিনেতা রবার্ট মন্টগোমারী হাত দিয়া সাম্‌নের চুলগুলি পিছন দিকে সরাইয়া দেন। বেড়াইবার সময় গ্রেটা গার্ব্বো দুই পকেটে হাত পুরিয়া বেড়ান। ক্লার্ক গ্যেব্‌ল কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় যতটা সম্ভব চেয়ারের ভিতর একেবারে সমাধিস্থ হন্। জোয়ান ক্রফোর্ড ঠিক্ এই ব্যাপারে ঘন ঘন নীচের ঠোঁট কামড়াইতে থাকেন। লায়োনেল ব্যারিমুর ঘড়ির চেন পাকাইতে আরম্ভ করেন। ব্রায়েন আর্ণ কোনো দৃশ্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঘন ঘন এবং জোরে জোরে সিগারে ফুঁ দেন। অভিনেত্রী জীন্ হার্লো দুই স্কন্ধ ঘন ঘন কম্পিত করেন। সুশ্রী অভিনেত্রী ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস্ সন্দেহ হইলে দক্ষিণ হস্ত বারবার প্রসারিত করেন। চার্লস্ লটন মনযোগ-সহকারে কাহারও কথা শুনিবার সময় অঙ্গুরীয় খুলিয়া অপেক্ষাকৃত সরু আঙ্গুলে বারবার তাহা পরাইতে থাকেন। গায়ক অভিনেতা নেল্‌সন এডি আশ্চর্য্য হইলে টুপি খুলিয়া পিছন দিকে সরাইয়া লন্। কাহাকে কিছু বুঝাইয়া দিবার সময় অভিনেত্রী লুইস রেনার চুলের ভিতর অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলে ওয়ালেশ বেরী ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলান। ন্যাট্ পেণ্ডেলটন্ উরু চাপ্‌ড়ান। গুচো মার্ক্স নিজের পালার জন্য যখন অপেক্ষা করেন, তখন ছড়ি দিয়া পা খুঁটিতে থাকেন। বিরক্ত হইলে জেনেট ম্যাকডোনাল্ড ঘনঘন হাই তোলেন। চিন্তামগ্ন অবস্থায় রবার্ট টেলার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া থাকেন। রোসালিণ্ড রাসেল্ আশ্চর্য্য হইলে চোখ মিট্‌মিট্ করেন। মরিস্ ও' স্যুলিভান ক্রুদ্ধ হইলে বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়ান। কোনো কঠিন দৃশ্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে স্পেন্সার ট্রেসি এক পায়ে ভর দিয়া ঘন ঘন দোল খান্। জীন পার্কার হাততালি দিয়া উল্লাস প্রকাশ করেন। ফ্রাঞ্চট্ টোন্ অভিনয়ের অবসর সময় চেয়ারের হাতায় দুইটী আঙ্গুল দিয়া টোকা মারেন। জুন নাইট উত্তেজিত হইলে রুমালে ঘন ঘন গ্রন্থি দেন। হাত দুইখানি যোড়া করিয়া কোলের উপর রাখা মার্ণালয়ের গভীর চিন্তার

পরিচয় প্রদান করে। চেষ্টার মরিস্ যখন চক্রাকারে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন, তখন বোঝা যায় তিনি বেশ খোস মেজাজে আছেন।

রাম রাজত্ব—

গল্প শুনিয়াছি রাম রাজার রাজত্বকালে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। খাইত বলিয়াই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এ ঘটনা চাক্ষুস দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আজ হলিউডের দৌলতে তাহা বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জর্জ্জ এমারসন্ নামক এক ব্যক্তি এই কঠিন সংঘটন বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। ইনি প্রথমে সার্কাসে চাকুরী করিতেন। তখন হইতেই পশুদিগকে বিশেষ-ভাবে বশ করিবার শক্তি তিনি আয়ত্ত করেন। চলচ্চিত্রে তাঁর অদ্ভুত শিক্ষা কৌশলে 'সিকুয়িয়া' পুস্তকে একটি হরিণ এবং বাঘকে তিনি একত্র অভিনয় করাইয়াছেন এবং 'ও' সনেসিস্ বয়' পুস্তকে বাঘের সহিত একটী হাতীকে খেলাইয়াছেন। প্রচার আছে এবং শুনা যায় গণ্ডার না কি কাহারও পোষ মানে না, কিন্তু তিনি তাহাও সম্ভব করিয়াছেন। তিনি বলেন—এইরূপ পোষ মানান না কি মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কোন পশু পাইলে প্রথমে তাহাকে বশীভূত করিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী লইয়া বেড়াইতে হয়। সে পশুটী চলিতে রাজী হইলে আর একটীকে এইভাবে বশীভূত করিয়া পরে দুইটীকে একত্র লইয়া বেড়াইতে হয়। দুই পক্ষের মেলামেশার পর ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে তাহারা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। তখন তাহাদিগকে যে খেলা শিখাইবার প্রয়োজন তাহা অনায়াসেই শিখান যায়। মোটকথা, পরস্পরের মধ্যে ভয় ভাঙ্গিয়া দেওয়াই জন্তুদিগকে বশ করিবার একমাত্র কৌশল।

এমারসন্ প্রায় সকল রকম পশুই বশ করিয়াছেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী হইতে শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি বহুপ্রকার জীবই তাঁহার শিক্ষা কৌশলে সু অভিনেতা হইবার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

সু-অভিনেত্রী জীন্ হার্লোর চিত্র-জীবন—

শিকাগোর কন্সাস্ সিটিতে ৩-রা মার্চ্চ তারিখে হার্লো জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রে অভিনয় করিবার আশা তাঁহার মনে কোনদিনই উদিত হয় নাই; অথচ, ঘটনাচক্রে শেষ পর্য্যন্ত তিনি কি ভাবে চিত্র-জগতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সেই কথাই আজ আপনাদের শুনাইব। সে আজ প্রায় আট-নয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। হার্লো তাঁহার এক বালিকা-বন্ধুর সহিত একদিন একজন 'কাষ্টিং ডিরেক্টর'-এর অফিসে যান্। হঠাৎ তাঁহার কি খেয়াল হইল, বন্ধুকে বিদায় দিয়া তিনি ডিরেক্টরের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বাড়তি হিসাবে পরি-চালক-মশায় ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। পর কতকগুলি ছবিতে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করার পর 'হ্যাল রোচে'র একখানি দুই রীল ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। তাঁহার সু-অভিনয়ের গুণে পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে তিনি আবদ্ধ হন্। কিন্তু

Jean Harlow and Spencer Tracy in "Riffraff"

তাঁহার পিতামাতা এই ব্যাপারে আপত্তি করায় তিনি চুক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হন্।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে 'ক্রিষ্টি ষ্টুডিও'তে একদিন হঠাৎ বেন্ লায়ন্ এবং জেমস্ হল্-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা আবার তাঁহাকে হাওয়ার্ড হিউজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং তাহার ফলে 'হেল্‌স্ এঞ্জেল' পুস্তকে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি 'মেট্রো'র সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। 'সিক্রেট সিক্স', 'চায়না সীজ্', 'রীফ্ র‍্যাফ্' প্রভৃতি বহু পুস্তকে তাঁহার অভিনয় সত্যই অতুলনীয়।

পরিশেষে এই বিখ্যাত অভিনেত্রীটির দু'-একটি অদ্ভুত খেয়ালের কথা বলিয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিব। এঁর 'হবি' (বাতিক) হইতেছে সর্ব্বদা গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করা এবং বড় বড় লোমওয়ালা কুকুর পোষা। ইনি সাঁতার কাটিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, টাইপ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। ইনি বলেন —চিত্রাভিনেত্রী না হইলে তিনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজের অফিসে চাকুরী লইতেন।

'রোমিও-জুলিয়েট'—

সেক্সপীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েট' আজ প্রায় তিন শতাব্দী পরে ছবির পর্দ্দায় প্রতিফলিত হইবে। ইহার প্রধান উদ্যোগ-কর্ত্তা হইতেছেন মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার। 'জুলিয়েটে'র চরিত্রে অভিনয় করিবেন বিখ্যাত অভিনেত্রী নর্ম্মা শিয়ারার এবং 'রোমি'ও হইবেন লেস্‌লি হাওয়ার্ড।

'রোমিও-জুলিয়েট' লেখার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ষ্টেজে উক্ত দুইটী চরিত্রে অভিনয় করিয়া যাঁহারা নাম করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সেক্সপীয়রের প্রথম 'জুলিয়েট' ছিলেন কিন্তু একটি বালক; অর্থাৎ, এই ছেলেটিই সর্ব্বপ্রথম এই স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করেন। তারপর কত মাতা-কন্যায়, পিতা-কন্যায়, মাতা-পুত্রে, ভগ্নী-ভগ্নীতে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে এই দুইটি চরিত্র অভিনয় করেন তাহার ইয়ত্বা নাই। এই রকম সম্বন্ধ লইয়া অভিনয় করার কথায় আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহার কারণ হইতেছে—সে যুগে স্ত্রীলোক ত অভিনয় করিতেনই না, এমন কি পুরুষ অভিনেতাও সহজে পাওয়া যাইত না।

সর্ব্বপ্রথম 'জুলিয়েটে'র পার্ট যে স্ত্রীলোক অভিনয় করেন, তাঁহার নাম—মেরী সণ্ডারসন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ১-লা মার্চ্চ লিঙ্কন সহরে ইনি খুব গৌরবের সহিত এই চরিত্র অভিনয় করেন।

ইহার পর বইখানির দু'টি 'ভার্সন' বাজারে চলিতে থাকে। একখানি করেন কবি ড্রাইডেনের শ্যালক জেমস্ হাওয়ার্ড। এই নাটকখানিতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'রোমিও-জুলিয়েটে'র বিবাহ দিয়া পালা শেষ করেন। আর একখানি করেন মিঃ সিবার। ইনি ল্যাটিন ভাষায় নাটকখানি পরিবর্ত্তিত করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত 'রোমিও' বিষপান করিয়া 'জুলিয়েট'কে জাগ্রত করান এবং ফলে 'জুলিয়েট'ও আত্মহত্যা করে। এইভাবে বইখানির শেষ হয়।

শেষের অনুবাদটী এতবেশী হৃদয়গ্রাহী হয় যে, উপর্য্যুপরি একশত কুড়ি রাত্রি সমানভাবে পুস্তকখানি অভিনীত হয়। প্রথম আরম্ভ হয় ১১-ই সেপ্টেম্বর ১৭৪৪ সাল এবং শেষ হয় ১৯-এ ডিসেম্বর ১৭৪৮ সাল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস সারা সিডন্স নামে একটি মহিলা তাঁহার ভাই জন্ ফিলিপ কেম্বলকে 'রোমিও'-রূপে গ্রহণ করিয়া প্রশংসার সহিত 'জুলিয়েট' চরিত্র অভিনয় করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০-এ ডিসেম্বর তারিখে মিঃ ডুস্‌ম্যান্ 'হে মার্কেট থিয়েটারে' তাঁহার ভগ্নী সুসান্‌কে 'জুলিয়েট' সাজাইয়া তিনি 'রোমিও'র চরিত্র অভিনয় করেন।

'রোমিও-জুলিয়েট' পুস্তকখানি আমেরিকায় প্রথম দেখা যায় ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ জানুয়ারী তারিখে; অর্থাৎ, নাটক সৃষ্টির একশত ষাট বৎসর পরে। নিউইয়র্কে এই বইখানি প্রথম অভিনীত হয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ১১-ই জানুয়ারী তারিখে। ইহাতে লুইস হ্যালাম করেন 'রোমিও' এবং তাঁহার মাতা করেন 'জুলিয়েট।' এই সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছাইলে অনেকে বিদ্রূপ করায় অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। এইবার আমরা মিস্ শিয়ারারকে 'জুলিয়েট'-রূপে সবাক ছবির পর্দ্দায় শীঘ্রই দেখিতে পাইব। বইখানি পরিচালনা করিয়াছেন জর্জ্জ কুকার; অর্থাৎ, বিখ্যাত 'ডেভিড কপারফিল্ডে'র সেই পরিচালক-মহাশয়।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল
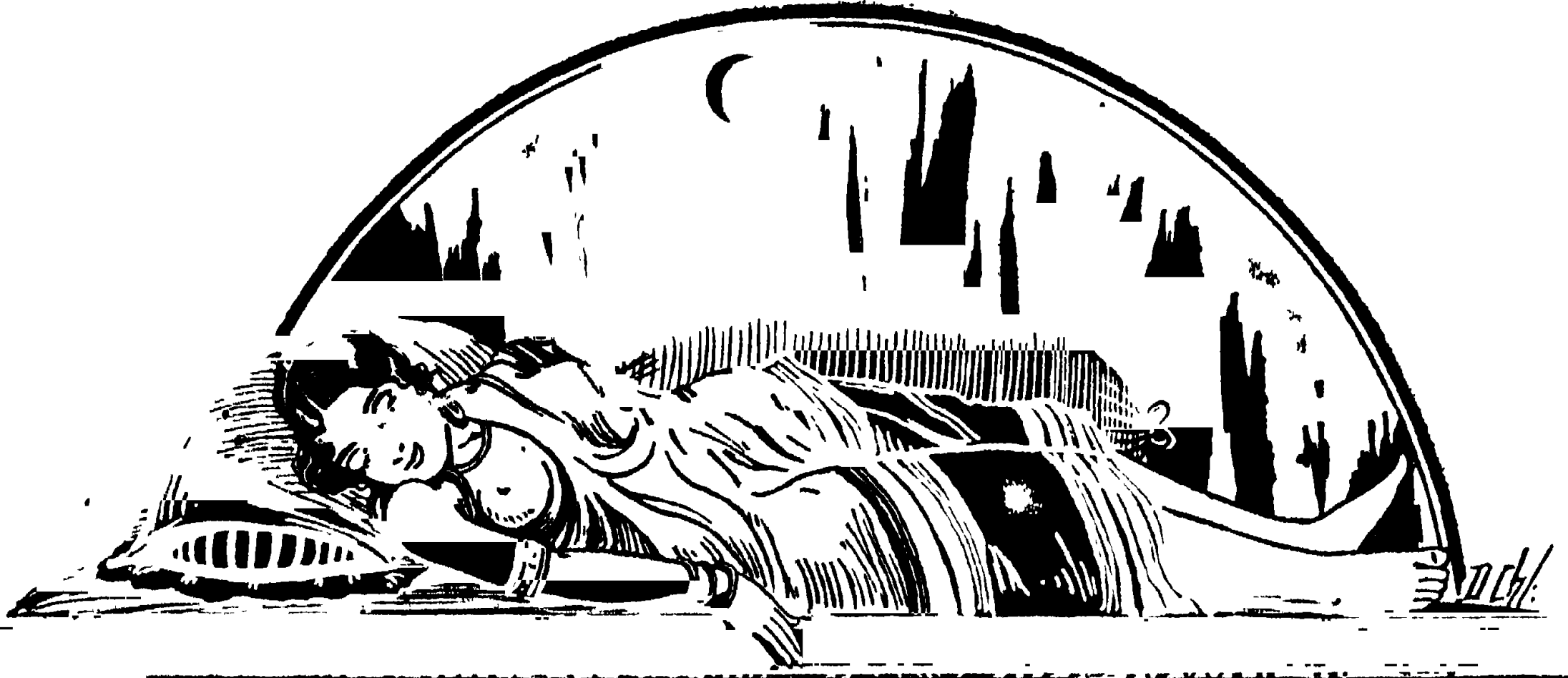
দ্বাদশ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

উৎপলবর্ণা

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম্-এ

[শ্রাবস্তীর রাজপ্রাসাদের একাংশ। কাল অপরাহ্ন। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া কুমারী উৎপলবর্ণা। সূর্য্যরশ্মি তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অদূরে অচিরবতীর দীর্ঘ জলরেখা দেখা যাইতেছে। কুমারী সেইদিকে বদ্ধদৃষ্টি। বায়ুভরে তাহার দুই-একগাছি চূর্ণকুন্তল দুলিতেছে। অস্তমান রবির রক্তোজ্জ্বল কিরণ প্রাসাদাংশটীকে অপূর্ব্ব বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে।

[ধীরে ধীরে পার্শ্ব প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া গেল। শান্ত পদক্ষেপে প্রবেশ করিল রাজকুমার নন্দ। তরুণ তাহার বয়স। বিচিত্র তাহার সজ্জা। বিলাস, ব্যসন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের চিহ্ন তাহার সারাদেহে বিদ্যমান। কুমার উৎপলবর্ণার দিকে ক্ষণকাল মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিল]—উৎপলবর্ণা!

[উৎপলবর্ণা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্বর বোধ হয় তাহার কর্ণে পৌছিল না। কুমার একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল]—উৎপলবর্ণা!

[উৎপলবর্ণা ত্রস্তে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। তারপর বসন সংযত করিয়া আবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল।]

নন্দ—কথা কচ্ছ না কেন উৎপলা? অত করে কি দেখ্ছ ওখানে? [এই বলিয়া নন্দ আরও একটু অগ্রসর হইয়া উৎপলবর্ণার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কিরণছটা নদীজলে পড়িয়া কালোজলকে সোণার রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই নন্দ সোল্লাসে বলিয়া উঠিল]—বাঃ, কি সুন্দর! সত্যই দেখ্বার মত দৃশ্য, না উৎপলা?

উৎপলা—হ্যাঁ।

নন্দ—তুমি এখানে এমন সময় প্রত্যহই কি দাঁড়িয়ে থাকো উৎপলা?

উৎপলা—হ্যাঁ থাকি। তুমি কি করে জান্‌লে?

নন্দ—আমি অপরাহ্নে অচিরবতীর তীর ধরে সান্ধ্য-ভ্রমণে যাই। প্রত্যহই দেখি এমনি করে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। আকাশে তোমার বদ্ধদৃষ্টি, বায়ুভরে উড়ছে তোমার অলকগুচ্ছ, সোণার সূর্য্য তোমার মুখে তার কিরণচ্ছটা মাখিয়ে দিয়ে তাকে সুন্দরতর করে তুলেছে। কিন্তু, তোমাকে তখন বড় বিষন্ন, বড় করুণ দেখায়। তোমার ও সুন্দর আননে বিষাদের কালিমা কেন উৎপলা?

উৎপলা—তুমি তা' বুঝ্‌বে না কুমার!

নন্দ—কেন বুঝ্‌বো না উৎপলা, খুব বুঝ্‌বো—আমাকে তোমার দুঃখের অংশ দাও!

উৎপলা—পিতৃহীনা পরান্নপ্রতিপালিতা বালিকার মর্ম্ম-ব্যথা তুমি কি বুঝ্‌বে রাজকুমার! তুমি পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াতলে প্রতিপালিত, ঐশ্বর্য্যের সহস্র আবেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ করছ, আমার কি দুঃখ, তুমি তার কি ধারণা করবে ভাই!

নন্দ—কেন উৎপলা, আমার পিতা মাতা ত তোমায় কম স্নেহ করেন না। আর আমি—তোমায় যে কত ভালবাসি তা' ভাষায় ব্যক্ত কর্‌তে পারি না—তুমি আমার বাক্‌দত্তা বধূ!

[উৎপলা নন্দের প্রতি চাহিয়া সহসা ক্রুদ্ধকণ্ঠে]—ভুলে যেয়ো না কুমার, আমি তোমার পিতৃস্বসা-ভগ্নী। ভগ্নীর অমর্য্যাদা করো না নন্দ!

[নন্দ আশ্চর্য্যে]—এ কথা বলছ কেন উৎপলা? তুমি পিতার মনোগতভাব ত জানো। মহারাজ যে তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করবার ইচ্ছা করেছেন।

উৎপলা—তোমার হাতে! একটা লম্পট, মদ্যপের হাতে! বেশ, তাই যদি মহারাজের ইচ্ছা হয়, আমি তা'তে বাধা দেব! নারী পণ্য-সামগ্রী নয় কুমার!

[অপমানে ক্রোধে নন্দের মুখ কালো হইয়া গেল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল]—আমার উপর তোমার এ ধারণা কবে হতে হলো উৎপলা?

উৎপলা—এ ধারণা শুধু আমার নয়, শ্রাবস্তীর জন-গণ—আবালবৃদ্ধবনিতা রাজকুমার নন্দের চরিত্র-মাহাত্ম্যের পরিচয় জানে।

নন্দ—শ্রাবস্তীর জনগণ! শ্রাবস্তীর আবালবৃদ্ধবনিতা! বেশ, তাদের ব্যবস্থা আমার হাতে! তারা যা' বলে বলুক। তুমি, তুমি ত জানো উৎপলা—আমি তোমায় কত ভালবাসি!

উৎপলা—হ্যাঁ জানি। কিন্তু এও জানি, আমি সে ভালবাসার প্রতিদান দিতে পার্‌ব না। তোমার মত চরিত্র-হীনের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে অচিরবতীর ওই অতল জলে ডুবে মরাও অনেক ভাল।

[নন্দ ক্রুদ্ধকণ্ঠে]—উৎপলা, তোমার স্পর্দ্ধা সীমা লঙ্ঘন কর্‌ছে। জানো, তুমি আমাদের অধীনা। ইচ্ছা করলে—

[উৎপলা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া]—কুমার নন্দ, ইচ্ছা কর্‌লে কি কর্‌তে পার? বলপ্রয়োগ, না? শ্রাবস্তীর রাজপুত্র, শতসহস্র প্রজার ভবিষ্যৎ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, আশ্রয়-হীনা উৎপলবর্ণা তোমার রক্ত চক্ষুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। [সে যেন ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে]—যাও, এই মুহূর্ত্তে এ স্থান পরিত্যাগ কর। ভাই বলে এতদিন যে স্নেহ করেছি, আজ থেকে তা' হতেও বঞ্চিত হলে। যাও, আমার সম্মুখ থেকে এখনি সরে যাও। তোমার ও লালসার কদর্য্যতা আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না। [এই বলিয়া গর্ব্বিতা ক্রুদ্ধা উৎপলা নন্দের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

[অপমানে পাংশুমুখে কুমার নন্দ ক্ষণকাল উৎপলবর্ণার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়া প্রাসাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।]

[রাজপ্রাসাদে শত শত আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদের একাংশে দীপাবলীশোভিত কুমার নন্দের বিলাস-কক্ষ। সে একাকী পদচারণা করিতেছে। পশ্চাতে হস্তবদ্ধমুষ্টি, মুখে পৈশাচিক দৃঢ় সঙ্কল্পের আভাস]

—উৎপলবর্ণা! উৎপলবর্ণা! বড় স্পর্দ্ধা তোমার! শ্রাবস্তীর রাজপুত্র আমি, আমার রক্তচক্ষুর তলে হাজার হাজার নরনারীর মাথা নত হয়—আর তুমি, ক্ষুদ্র তুমি, তোমাকে দলিতা করতে কতক্ষণ! [কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া]—আমি লম্পট, আমি মদ্যপ, তাই আমি ঘৃণিত? বেশ! গর্ব্বিতা নারী, এই ঘৃণিত নন্দের পায়ের তলায় বসে একদিন তোমায় প্রার্থনা করতেই হবে! তখন আমি —[কাল্পনিক উল্লাসে হাসিয়া উঠিয়া]—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি তোমার ওই গর্ব্বকে চূর্ণ করে, তোমার নারীত্বকে পদদলিত করে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাব। সেদিন তোমার অশ্রু-সমুদ্রেও এ পাষাণ প্রাণ বিগলিত হবে না। [পুনরায় ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া]—উঃ, কি অপমান! হাঁ, এ অপমানের প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ চাই-ই! [নন্দ ক্রুদ্ধভাবে কক্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পদচারণা করিতে লাগিল। দ্বারপ্রান্তে প্রতিহারী আসিয়া দেখা দিল। নন্দের দৃষ্টি সেইদিকে পড়িতে সে প্রশ্ন করিল] — কি সংবাদ?

প্রতিহারী—শ্রেষ্ঠীপুত্র সৌমিল্ল কুমারের দর্শন-প্রার্থী।

নন্দ—পাঠিয়ে দাও।

[প্রতিহারী প্রস্থান করিলে নন্দের আবাল্য-সুহৃদ, কু-কার্য্যের চিরসহচর, নগর শ্রেষ্ঠীপুত্র সৌমিল্ল সেখানে প্রবেশপূর্ব্বক কুমারকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। নন্দ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া]—এস বন্ধু, মনে মনে তোমারই কথা চিন্তা করছিলাম।

সৌমিল্ল—আমার কি সৌভাগ্য! রাজকুমারী উৎপল-বর্ণার কথা ভুলে কুমার আমার মত একটা নগণ্য লোকের কথা চিন্তা করছিলেন—এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার!

নন্দ—আশ্চর্য্য নয় সৌমিল্ল, আজ থেকে উৎপলবর্ণা আমার কেউ নয়।

সৌমিল্ল—সে কি কুমার,এমন অদ্ভুত কথা ত শুনি নি! ব্যাপারটা প্রকাশ করে বলুন। হেঁয়ালী বোঝবার মত আমার বুদ্ধি সূক্ষ্ম নয়।

নন্দ—হেঁয়ালী নয় সৌমিল্ল, এ অতি সত্য। উৎপলা আজ আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে—শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, অপমান করেছে!

সৌমিল্ল—প্রত্যাখ্যান! অপমান! বলেন কি কুমার! রাজকুমারীর এ দুর্ব্বুদ্ধি হলো কেন?

নন্দ—আমি মদ্যপ, আমি লম্পট, তার মত নারীর একান্ত অনুপযুক্ত! উঃ, কি স্পর্দ্ধা! না, এ অসহ্য! [ব্যগ্রভাবে সৌমিল্লের হাত ধরিয়া]—এর প্রতিকার করতে পার ভাই! ওই গর্ব্বিতা নারীর অহঙ্কার চূর্ণ করতে পার বন্ধু? এই লম্পট, মদ্যপের চরণতলে তাকে পাতিত করতে পার সৌমিল্ল?

[সৌমিল্ল হাত ছাড়াইয়া লইয়া]—উতলা হবেন না কুমার। রাজকুমারীকে আপনি বোধ হয় অত্যন্ত উত্যক্ত করেছিলেন, তাই তিনি বিরূপ হয়েছেন। এ আপনাদের প্রণয়-কলহ—এর উদ্ভবও যেমন দ্রুত, বিরামও তেমনিই সত্বর।

নন্দ—না না সৌমিল্ল, তুমি ভুল বুঝছ। এ প্রণয়-কলহ নয়—এ নিদারুণ ঘৃণা! উঃ, তুমি যদি তার সেই মূর্ত্তি দেখতে!

সৌমিল্ল—বেশ, ঘৃণাই যদি হয়, আপনি তার কি প্রতিকার করতে পারেন? আপনি তাঁকে নিয়ে কি করতে চান?

নন্দ—কি করতে চাই? তার উচ্চ মস্তক নত করতে চাই! আমি লম্পট, লাম্পট্যের চরম আদর্শ দেখাতে চাই!

সৌমিল্ল—ছি রাজকুমার! তিনি না আপনার আত্মীয়া!

নন্দ—না, সে আমার আত্মীয়া নয়, কেউ নয়! আমি চাই আমার অপমানের প্রতিশোধ! তুমি উপায় স্থির কর বন্ধু!

সৌমিল্ল—উপায়! উপায়ের ভাবনা কি? আপনার কোন্ আদেশ না প্রতিপালন করেছি কুমার? তবে ভয় মহারাজকে।

যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল]—কুমার, আমায় হত্যা কর ক্ষতি নাই। আমি যে রাজকুমারীকে রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার পরম আনন্দ। তবে শোন লম্পট, তোমারও কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে।

[দৃঢ় পাদবিক্ষেপে সে চলিয়া গেল। নন্দ ও সৌমিল্ল চিত্রার্পিতের মত সেইদিকে চাহিয়া রহিল।]

হয়ে আছে! না, এ আমি ভুলতে পারি না সৌমিল্ল! এর প্রতিশোধ—হ্যাঁ, এর প্রতিশোধ আমি চাই-ই!

[সৌমিল্ল উঠিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। নন্দ নীরবে সেইদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল]—বেশ, যাও। আমার কার্য্য আমি একাই সম্পন্ন করবো।

[নন্দের গুপ্ত মন্ত্রনা-গৃহ। জলদগম্ভীর তাহার মূর্ত্তি। অদূরে নতমস্তকে উপবিষ্ট সৌমিল্ল। প্রতিহারী আসিয়া কুমারকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।]

নন্দ—কি সংবাদ?

প্রতিহারী—দাসী আত্মহত্যা করেছে।

নন্দ—আত্মহত্যা করেছে! উত্তম! গোপনে তার দেহের সৎকার করো।

[প্রতিহারী প্রস্থান করিল]

নন্দ—সৌমিল্ল, উৎপলবর্ণা আমাদের পরাজিত করেছে। এখন সে আমাদের আয়ত্তের বাইরে—কি বলো বন্ধু?

সৌমিল্ল—যে আশ্রয়ে তিনি আছেন, আমাদের সাধ্য নাই যে, সেখানে প্রবেশ করি।

নন্দ—সাধ্য নাই? সাধ্য নাই? সত্যই কি তাই? আমি শ্রাবস্তীর রাজপুত্র, অখণ্ড আমার প্রতাপ, এক তুচ্ছ নারীর কাছে আমি পরাজয় স্বীকার করবো?

সৌমিল্ল—তুচ্ছ নারী নয় কুমার—তিনিও কাশীর রাজকন্যা—আপনারই পিতৃস্বসা-পুত্রী। পিতা মাতাকে হারিয়ে আপনাদের আশ্রয়ে এসেছিলেন, এই মাত্র।

নন্দ—তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, আমি তার উপর অযথা অত্যাচার করেছি?

[সৌমিল্ল নতমস্তকে নীরব রহিল]

নন্দ—না সৌমিল্ল, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ। আমি তাকে মহান গৌরবের আসনে বসাতে চেয়েছিলাম—সে ঘৃণায় তা' প্রত্যাখ্যান করেছে! আমাকে অপমানে জর্জ্জরিত করেছে! সে অপমানের শেল এখনও আমার বুকে বিদ্ধ

[মহাবন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম। সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ হইয়াছে। মুণ্ডিত শীর্ষ, কাষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া উদাত্ত-কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিল]—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

[বুদ্ধদেব তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শত শত মস্তক তাঁহার চরণে নমিত হইল। ভগবান হস্তোত্তলন করিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মুখে তাঁহার মধুর হাসি। চক্ষে অপূর্ব্ব করুণা। গাত্রোত্থান করিয়া সকলে নতমস্তকে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। উৎপলবর্ণা আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিল।]

বুদ্ধ—বৎসে, কুশল ত?

উৎপলা—প্রভুর চরণে যখন আশ্রয় নিয়েছি, তখন আর অকুশল কোথায়?

বুদ্ধ—তোমার কি কিছু প্রয়োজন আছে?

উৎপলবর্ণা—হে সুগত, আমায় ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে স্থানদান করুন।

বুদ্ধ—স্থান ত তুমি পেয়েছ উৎপলবর্ণা!

উৎপলবর্ণা—আমায় ভিক্ষুণী ধর্ম্মে দীক্ষা দিন।

বুদ্ধ—সে ভার আমি লগ্নাজিতার উপর দিয়েছি। যথাসময় তিনি তোমায় দীক্ষিতা করবেন।

উৎপলবর্ণা—এখন আমার কি কর্ত্তব্য?

বুদ্ধ—ধ্যানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর। এখনও অন্তরে তোমার বাসনা রয়েছে। এখনও তোমার কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হয় নি বৎসে! বাসনার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকতে

নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাও মা, নির্জ্জনে গিয়ে আত্মচিন্তা কর।

[উৎপলবর্ণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।]

[বনপথ। দুইপার্শ্বে সমান্তরাল বৃক্ষশ্রেণী। কাল গভীর রাত্রি। ম্লান জ্যোৎস্নায় দূরের সঙ্ঘারাম দেখা যাইতেছিল। পথ জনহীন, নিঃস্তব্ধ। নন্দ একাকী গুপ্তভাবে পথ চলিতেছিল। আকাশে মেঘের সমাবেশ হইতেছে। ক্রমে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কুমারকে আর দেখা গেল না।]

[সঙ্ঘারামের একাংশ। কুটীর মধ্যে মিট্‌মিট্‌ করিয়া দীপ জ্বলিতেছিল। উৎপলবর্ণা সেখানে একাকিনী ধ্যানমগ্না। ধীরে ধীরে কুটীরের দ্বার খুলিয়া গেল। নিঃশব্দ পদে কুমার সেখানে প্রবেশ করিল। উৎপলবর্ণার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল। বাহিরে মেঘ-গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ কাণে আসিয়া বাজিতেছে। দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে, নন্দ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তারপর অগ্রসর হইয়া সে উৎপলবর্ণার ঠিক্ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সংযত কণ্ঠে ডাকিল]—উৎপলা!

[কোন সাড়া মিলিল না। পুনরায় সে ডাকিল]—উৎপলবর্ণা!

[ধীরে ধীরে উৎপলবর্ণা চক্ষু মেলিল। তাহার একান্ত সন্নিকটে কুমারকে দেখিয়া ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সে কণ্ঠধ্বনি ডুবিয়া গেল। উৎপলবর্ণা ত্রস্তে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল]—এ কি, নন্দ! তুমি, তুমি এখানে! এই গভীর রজনীতে!

নন্দ—হ্যাঁ, আমি উৎপলা। বহুকষ্টে তোমার সন্ধান পেয়েছি। আজ আমার অপমানের প্রতিশোধ নেব।

[উৎপলা কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া]—কি, কি বলছ তুমি রাজকুমার? আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এই গভীর রাত্রে নির্জ্জন গৃহে তুমি কি আমার উপর অত্যাচার করতে এসেছ?

[নন্দ বিকট হাসি হাসিয়া]—হাঃ, হাঃ, হাঃ! অত্যাচার? না না, অত্যাচার নয়—প্রতিশোধ!

উৎপলা—প্রতিশোধ! কিসের প্রতিশোধ নন্দ?

নন্দ—আমার অপমানের। মনে পড়ে উৎপলা, সেই শ্রাবস্তীর রাজপ্রাসাদে, সেই সন্ধ্যাকালে, সেই অস্তগামী সূর্য্যের সম্মুখে, তোমার দুঃখের অংশভাগী হতে চেয়েছিলাম, তোমায় রাজবধূ করে অতুল গৌরবের অধিকারিণী করতে চেয়েছিলাম, প্রতিদানে তুমি কি দিয়েছিলে উৎপলবর্ণা? ঘৃণা, অপমান! আজ এই গভীর রাত্রে, এই নির্জ্জন কুটীরে, প্রকৃতির দুর্য্যোগের মধ্যে তোমায় যদি ধর্ষিতা করি, কে তোমায় বাঁচাবে গর্ব্বিতা নারী?

[উৎপলা ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। অসহায় কাতর-কণ্ঠে বলিল]—নন্দ, নন্দ, ক্ষমা কর, সেদিনের সে রূঢ় ব্যবহার ভুলে যাও ভাই! আমি যে তোমার ভগ্নী!

[নন্দ উত্তেজিতভাবে]—না, না, তুমি আমার কেউ নও! তুমি শুধু নারী—আমি পুরুষ। তুমি ভোগ্য—আমি ভোক্তা। তুমি দর্পিতা—আমি দর্পহারী। আমি মদ্যপ, আমি লম্পট, আমি বিচারশক্তিহীন। তোমার ওই ললিত যৌবন, ওই বরবপু, ওই রক্তাধর, অপূর্ব্ব সম্ভোগের সামগ্রী। না উৎপলা, আজ আর আমি অসিদ্ধ মনস্কামে ফিরে যাব না। [সে হস্ত প্রসারণ করিয়া উৎপলার দিকে অগ্রসর হইল।]

[উৎপলা চীৎকার করিয়া উঠিল]—রক্ষা কর, কে কোথায় আছ রক্ষা কর!

[সহসা বাহিরে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কড়কড় শব্দে দূরে বজ্র পতন হইল। দমকা বাতাসে কুটীর দ্বার খুলিয়া যাইতেই দীপ নিবিয়া গেল। গভীর অন্ধকারে ঘর ছাইয়া ফেলিল। অদূরে একটা আর্ত্ত চীৎকার উঠিয়া ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির শব্দে ডুবিয়া গেল।]

[সঙ্ঘারাম সন্নিহিত বনপথ। প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সারারাত্রিব্যাপী প্রলয়ের চিহ্ন বিদ্যমান। অদূরে পথিপার্শ্বে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। এক-জনের মাথার নিকট স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছে।

[বুদ্ধদেব নারীমূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া তাহার মস্তকে কর স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধ-মধুর-কণ্ঠে ডাকিলেন]—উৎপলবর্ণা, মা !

[সেই স্পর্শে উৎপলবর্ণা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। আলুলায়িত তাহার কুন্তল, বিস্রস্ত তাহার বসন, কপালে গভীর ক্ষত—তাহা দিয়া রক্তধারা ঝরিয়া কপোলের নিকট জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদেহে লাঞ্ছনার চিহ্ন বর্ত্তমান। উৎপলবর্ণা অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। অদূরে বজ্রাহত নন্দের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। তারপর নিজের দিকে চাহিয়া সে আকুল-কণ্ঠে কাঁদিয়া অমিতাভের চরণে পতিত হইল। তিনি স্বস্নেহে তাহার মস্তকে করার্পণ করিলেন। উৎপলা সরোদনে]—প্রভু, প্রভু, আমায় স্পর্শ করবেন না—আমি পতিতা। পাষণ্ড আমার অমূল্য সম্পদ হরণ করেছে। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

বুদ্ধ—ক্ষুব্ধা হয়ো না বৎসে, ধৈর্য্য ধর, মন সংযত কর। তুমি পতিতা নও—তুমি ধর্ম্মশীলা। দুর্বৃত্ত তার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে। তোমারও আজ কর্ম্ম ক্ষয় হয়েছে—নির্ব্বাণ তোমার করতলগত। [তারপর পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন]—লগ্নাজিতা, এইবার ভিক্ষুণীর চীর আনয়ন কর, ভিক্ষাপাত্র দাও উৎপলবর্ণার হস্তে, দীক্ষিত কর তাকে কামনা-বাসনা-হীন মোক্ষধর্ম্মে। আজ হতে উৎপলবর্ণা মহাভিক্ষুণী অগ্রশ্রাবিকা।

[উৎপলবর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। লগ্নাজিতা অগ্রসর হইয়া তাহার হস্তে ভিক্ষুণীর কাষায় বস্ত্র ও ভিক্ষা-পাত্র প্রদান করিল। শতশত কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হইতে লাগিল]—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

? ? ?
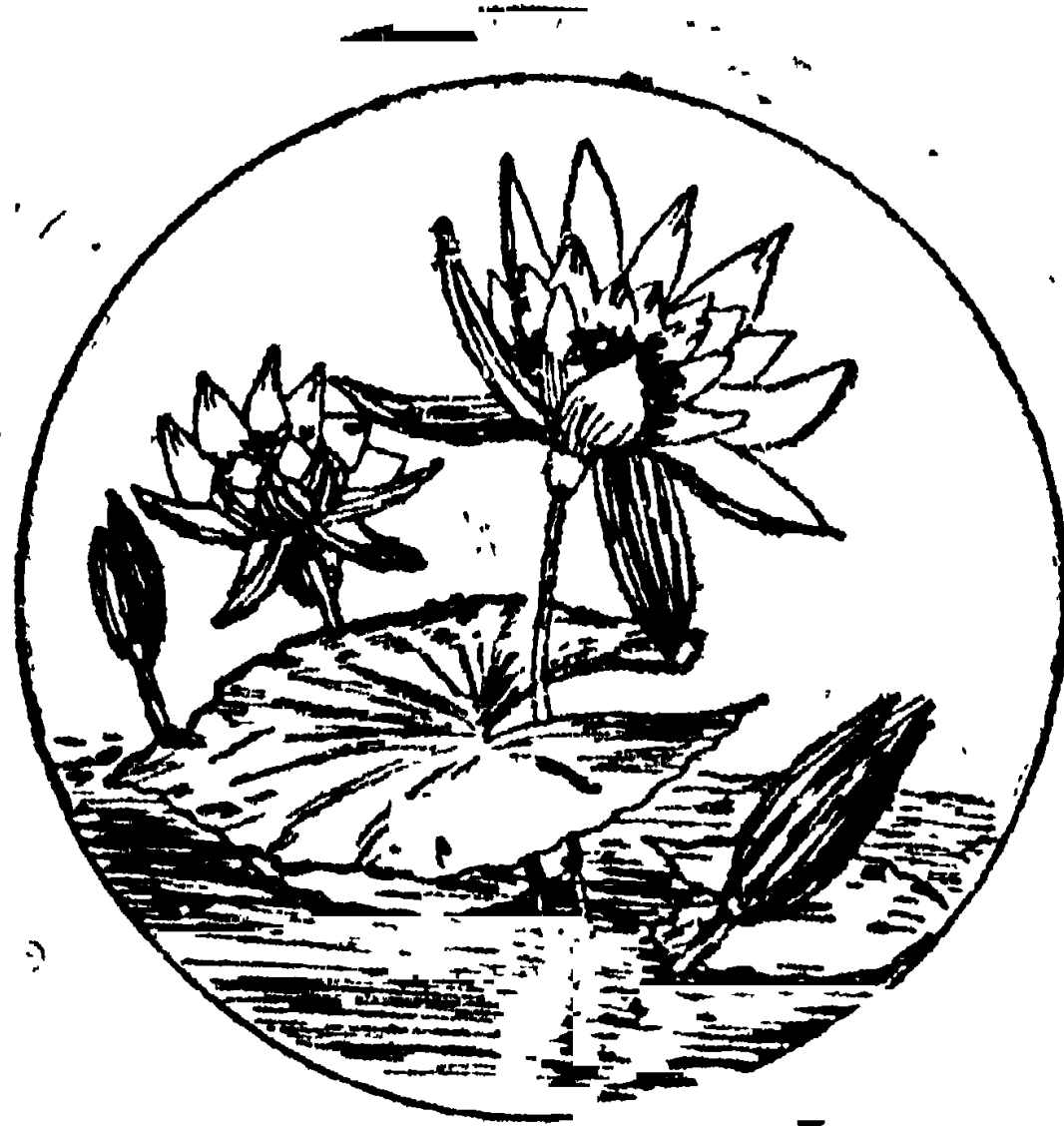
মূর্ত্ত-স্মৃতি

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌

এখানকার কোন লোকের সঙ্গেই আমার বনে না।

এ মানুষগুলো যেন কি একরকম! খনির কাজই এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—নেশা করাই কেবল এদের একমাত্র আনন্দ—সাঁওতালী ও বেহারী মেয়ে নিয়েই এদের যত কিছু উৎসাহ। জীবনটাকে এই তিনটে ভাগে ভাগ করে প্রাত্যহিক বাঁধা কাজ এবং বাঁধা রসিকতার মধ্য দিয়েই এরা বছরের সব ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়।

এখানকার চাটুয্যে একজন সেকালের আমলের মজ্‌লিসী লোক। প্রথম যখন এই খনিটার কাজ সুরু হয়, তখন সে এখানে চাকরী নিয়ে আসে তারপর এই খনির সাহেব মালিক মারা যাওয়ার পর খনিও যেমন হাত বদ্‌লেছে, চাটুয্যেও তেমনি নতুন নতুন মনিবের কাছে চাকরী করেছে। গোড়া থেকে কেবল সেই একমাত্র এই যায়গাটায় টিঁকে আছে।

আমি ক' মাস পূর্ব্বে যেদিন এই গিরিডির অভ্রের খনিতে ইন্‌স্পেক্টারী চাকরী নিয়ে আসি, সেদিন আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় এই চাটুয্যের। কোল্‌কাতার অনেক বড় বড় লোকের নাম সে জানে। সেখানে জন্মে এত বড়টা হওয়ার পরও আমি কোল্‌কাতায় কারও সঙ্গে কোন রকম আলাপ জমাতে পারি নি শুনে চাটুয্যে আমার সম্বন্ধে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল। শেষে শিশুজ্ঞানে হঠাৎ আমার সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা কইতে সুরু করে দিলে।

আমার অবশ্য এখানকার আবহাওয়া একেবারেই ভাল লাগে না। কিন্তু কোল্‌কাতায় ফিরে যেতেও আর ইচ্ছে করে না। সেখানে আমার দম্‌ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল বলেই ত আমি সেখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই খনিতে অজ্ঞাত-বাস কর্‌তে এসেছি।

দুই

গিরিডি থেকে যে রাস্তাটা বরাবর পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তার ধারে গোটাকয়েক অভ্রের খনি আছে। তারই একটাতে আমি চাকরী পেয়েছি। আমার কাজ খনিতে এবং বাইরেও কিছু কিছু আছে। কোম্পানী আমায় একটা ছোট মোটর গাড়ী দিয়েছে, আর একটা 'কোয়াটার্স' দেবার কথা আছে— কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তা' দিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। বিপত্নীক চাটুয্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তার 'কোয়াটার্সে'র একটা অংশেই আমি এখন বাস কর্‌ছি।

খনিতে যখন কাজ থাকে, তখন করি—তা' ছাড়া দিন আমার আর কাট্‌তে চায় না। কি যে করি, কিছুই ঠিক্‌ পাই না। আমার সঙ্গে একটা 'বাইনাকুলার' আছে। সেটাতে চোখ দিয়ে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকি। অসমতল বিরাট প্রান্তর আমার দৃষ্টির সাম্‌নে—মাঠের শেষে সব ছাই-রংয়ের ছোট ছোট পাহাড়। পৃথিবী যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে সেখানে আপনাকে এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। আমার মনে হয়—আমি এই পল্লী-প্রকৃতিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি—আবার কিন্তু সময় সময় দারুণ বিরক্তি এসে আমার এই জীবনটাকে হতাশায় ভরে তোলে।

তবে এখানে ওই ছোট গাড়ীটা আছে আমার সহায়।

একদিন গেলুম এখান থেকে উশ্রী দেখ্‌তে। সুন্দর ঝরণা। এর আগে আমি অনেক ঝরণাই দেখেছি, কিন্তু উশ্রীর প্রান্ত থেকে বিসর্পিত নদীর উপলময় শয্যার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করলুম, তখন মনে একটা প্রকৃত আনন্দ পেলুম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বল্‌তে হয়—কাননকুন্তলা কুমারী ধরণীর নির্ম্মল সিঁথির মত এই উশ্রী নদীর গতিপথ দিগন্ত-প্রসারি অরণ্যের মাঝখান দিয়ে সরল রেখায় নেমে এসেছে, হাস্যময়ী বালিকার ন্যায় মুখর ও উচ্ছল হয়ে।

সেখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের অনাবিল বায়ুস্রোত ও পতনশীল বারিরাশির একতান শব্দে জনসমাগমশূন্য উশ্রী আমার বড়ই ভাল লাগ্‌ল।

কিন্তু প্রথম দিন আমি যেমন আনন্দ পেলুম, দ্বিতীয় দিন আর সে রকম পাই নি, এবং তারপর দিন উশ্রী যাওয়ার কোন উৎসাহই আর রইল না। গিরিডি থেকে উশ্রী মাত্র ন' মাইল। মোটর বলে জিনিষ যদি আমার হাতের কাছে না থাকতো, যদি উশ্রী দেখার জন্য আঠার মাইল পথ আমায় পায়ে হেঁটে যেতে হতো, তা' হলে হয় ত তার প্রতি আকর্ষণ আমার আরও কিছুদিন স্থায়ী হতে পারতো—হয় ত তাকে আমি আরও কিছুদিন একাদিক্রমে ভালবাস্‌তে পার্‌তুম।

তিন

নতুন কিছু দেখ্‌তে যাবো, কিন্তু যাই কোথায় ?

চাটুয্যে বল্লে—'বিজয়, তুমি কি কখনও পরেশনাথ পাহাড় দেখেছো ?'

বল্লুম—'না, দেখি নি।'

বল্লে—'যাও না একদিন। আমাদের এই 'কোয়ার্টার্সে'র সাম্‌নে দিয়ে যে পথটা বরাবর ওইদিকে চলে গেছে, ওটা ধরে প্রায় বাইশ মাইল গেলে পরেশনাথ পাহাড়ের গোড়ায় পৌছবে—আর যদি হাজারীবাগ যেতে যাও, তা' হলে ওই রাস্তায় যেতে যেতে দেখ্‌বে ডান হাতে অন্য একটা পথ গেছে—সেইটে ধরে যেতে পারো। তবে হাজারীবাগ যাবার চেষ্টা করো না; কারণ, সেখান থেকে একদিনে ফেরা শক্ত হবে।'

বল্লুম—'আচ্ছা, অন্য সময় সুবিধে মত যাবো।'

...অভ্রের খনিগুলো পেছনে রেখে প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় মোটর ছুটিয়ে বাঁ হাতে থানা ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়লুম। খাড়াই রাস্তায় বরাবর গাড়ীখানা চালিয়ে আপন-মনে গান গাইতে গাইতে ডান হাতে হাজারীবাগ ছেড়ে একটা পাহাড়ের গা ঘেঁসে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। এম্‌নি করে দুটো পাহাড় পার হতেই প্রকাণ্ড পাঁচিলের মত গুল্মে ঢাকা পরেশনাথ আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো।

সেখানে গিয়ে গাড়ী থেকে নাম্‌লুম। সাম্‌নে পরেশনাথের গা বয়ে লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা সারিবন্ধ পিঁপড়ের মত সবুজ গুল্মের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বরাবর ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের মুখে জৈনদের দু'টি ধর্ম্মশালা—একটি শ্বেতাম্বরীর, অপরটি দিগম্বরীর। দু'টিই পাথরের তৈরী এবং উভয়ের মধ্যেই মন্দির আছে। ধর্ম্মশালার পেছনে পাহাড়ী খালের দিকে মুখ করে বেহারীদের খাবারের দোকান। বালি ও কাঁকরের ভেতর থেকে কৃশকায় গরুগুলো ঘাসের সন্ধানে ব্যস্ত। জৈনদের হাতী দুটো বড় গাছের ডাল ভেঙে আপন-মনে গলাধঃকরণ কর্‌ছিল।

খানিকটা ঘুরে-ফিরে আবার গাড়ীতে এসে বস্‌লুম।

পরেশনাথ পাহাড়ে উঠ্‌তে গেলে ভোরবেলা যাত্রা কর্‌তে হয়, এবং ওপরটা সব ঘুরে নাম্‌তে একটি দিন পুরো লাগে—তাই আর ওপরে আমার ওঠা হলো না। যেমন গিয়েছিলুম, তেমনিই চলে এলুম।

হাজারীবাগ রোড ছাড়িয়ে থানা পার হয়ে আস্‌বার সময় দূর থেকে একটা বাড়ী আমার চোখে পড়লো। রাস্তাটা যেখানে গোল হয়ে ঘুরে গেছে, সেইখানে পথের ধারে একটা উঁচু ঢিবির ওপর টালিখোলার একতোলা

একটি ছোট বাংলো। তার চতুর্দ্দিকে উদ্যান। তারের বেড়া দিয়ে বাগানটি ঘেরা। ছোট একটি কাঠের গেট আছে। সামনে তার গোটা কয়েক সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে ফটক পর্য্যন্ত উঠ্‌তে হয়।

আশপাশে কোথাও কোন লোকালয় নেই। গুরুভার নীরবতার মাঝখানে এই বাড়ীখানি বড়ই মনোরম—যেন দিগন্তের প্রহরায় মৌনমূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত কাল ধরে।

বাংলোখানি দেখ্‌লে মনে হয় এর মালিকের সৌন্দর্য্য-বোধ আছে। ঘরের প্রত্যেকটি জান্‌লায় ধপধপে সাদা সিল্কের পরদা ও সাম্‌নের দেওয়ালে লতানে ফুলগাছ লাগানো। বাড়ীটার সমস্ত দেওয়াল ভর্ত্তি শাদা ও লাল ফুলের সমাবেশ বড় মনোরম। ছোটবড় ফুল ও ফলের গাছে সেই পাহাড়ী বাগানখানি যেন একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আলো করে আছে।

জান্‌লার ধারে একখানা ইজিচেয়ারে একজন সাহেব বসে আছেন। বয়সে বুড়ো হলেও তাঁর মুখে চোখে কেমন একটা লালিত্য আছে। মাথার সম্মুখে অল্প একটু টাক। গায়ে একটা ধপধপে শাদা সিল্কের সার্ট।

তাঁর বাংলোর ফটকের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে যাবার সময় হঠাৎ মনে হলো কোন একটা লোহার জিনিষ মোটর থেকে 'ঠং' করে রাস্তায় পড়ে গেল।

গাড়ী থামিয়ে পথে নেমে পড়্‌লুম।

বেলা প্রায় চারটা। সূর্য্যের তেজ তখনও কমে নি। রাস্তায় নেমে যতটা দেখা যায় লক্ষ্য করে দেখ্‌লুম, খানিকটা দূরে আমার 'হুডে'র 'বাকল্‌'টা খুলে পড়ে আছে।

গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ফিরে আস্‌ছি, দেখি সেই সাহেব তাঁর প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে দেখে স্নেহভরে হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি সেই রোদ্দুরের ভেতরও গেট্ পার হয়ে এগিয়ে এলেন এবং কাছাকাছি এসেই পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন—আমায় তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কি না।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাহেবকে বল্লুম—'না, আমার এই 'বাকল্‌'টা পড়ে গিছ্‌ল, তুই কুড়িয়ে নেবার জন্যে মোটর থামিয়ে নেমেছিলুম।'

তিনি কিন্তু তবু আমার গাড়ীর নিকট দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাহেবকে দেখে অবধি প্রথম থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি কোথায় তাঁকে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে যেন আমার কতকালের ঘনিষ্টতা। কিন্তু মনে প্রাণে বেশ জানি—সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন—'আপনি কি টুরিষ্ট, না এখানে কোথাও থাকেন?'

পথিকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব এক পাড়াগাঁয়ের বুড়োরাই করে থাকে। ভাব্‌লুম তাদের মত আলাপ কর্‌বার কোন লোক না পেয়ে সাহেবের প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠছে—তাই বোধ হয় আমায় দেখে তিনি এগিয়ে এসেছেন। বল্লুম—'না, খনিতে চাকরী করি, সেই সূত্রেই এখানে থাকতে হয়।

প্রশ্ন কল্লেন—'কোন্ খনি?'

উত্তর দিলুম।

এম্‌নি ধারা দু'-একটা কথার পর সাহেব বল্লেন—'যদি তুমি কিছু মনে না কর, তা' হলে আমার ঘরে এসো। একসঙ্গে বসে একটু চা খাওয়া যাক্।'

গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌লুম।

সাহেবের সঙ্গে এদিক-ওদিক কথা কইতে কইতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌লুম, তারপর ফটক পার হয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে—

কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি—এ বাংলোটা ইতঃপূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নি,; কিন্তু তবুও যেন এ সব আমার অতি পরিচিত বলেই মনে হতে লাগ্‌লো। এধার ওধার চেয়ে দেখি, যেখানটি যেমন করে আমি সাজাতে পার্‌তুম, এ সাহেবও ঠিক্ তেমনি করেই সাজিয়ে রেখেছেন।

সাহেবের একটা বেহারী চাকর আছে। বারাণ্ডার ধারে এসে আমায় দেখেই সে একটা লম্বা সেলাম দিলে।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—'কিরে, কেমন আছিস্ ?'

কিন্তু অনেক চেষ্টায় নিজেকে সাম্‌লে নিলুম। কি মনে করবে লোক্‌টা, আগে ত ও আমায় কখনও দেখে নি।

সাহেব আমায় ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই ঘরখানি! আমি আমার ঘরকে এত করে ঝেড়ে-মুছেও ধুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই না—কিন্তু এই রাস্তার ধারে সাহেব তাঁর ঘর এবং গৃহ-সজ্জাকে কেমন করে যে এত সুন্দর রেখেছেন, ভেবে কিছুই ঠিক্ করতে পারলুম না। বাস্তবিক তাঁদের পরিচ্ছন্নতার একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে।

সাহেবের ঘরের টেবিল, চেয়ার, সোফা, এমন কি সিলিং থেকে ঝোলান ঝাড়ের আলোগুলো পর্য্যন্ত চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে এবং নতুন বলেই মনে হয়—যেন কাল এ সব জিনিষ কিনে এনে এখানে বসানো হয়েছে।

কথায় কথায় সাহেবকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বল্লেন—'আমার নাম রিকি স্কট্, আমাকে সবাই স্কট্ বলেই ডাকে।

বল্লুম—'কতদিন এখানে আছেন ?'

'অনেকদিন।'

তারপর তিনি নিজের জীবন-কাহিনী বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—এলাহাবাদে তাঁর বাপ ছিল মিলিটারী অফিসার। তিনিও প্রথমে সেখানে চাকরী নেন; কিন্তু তাঁর বাবার মৃত্যু হওয়ায় এবং আরও একটা দুর্ঘটনার পর—তারপর আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বল্লেন—'তোমায় আর বল্‌তে কি, আমি যে মেয়েটিকে ভালবাস্‌তুম, সে আমায় উপেক্ষা করত। মনের দুঃখে আমি তখন সেখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। প্রায় তিন বছর এম্‌নি করে ঘুরে আমার যা' কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। তারপর এই বেহারে এসে একটা অভ্র-খনিতে চাকরী নিতে বাধ্য হই। একদিন আমি ঘোড়ায় করে পরেশনাথ থেকে ফের্‌বার সময় এখন যেখানে তোমাদের খনি আছে, ওইখানে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একজন দেশীয় লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিই। তাদের বাড়ীতে অভ্রের থালায় করে সব জিনিষ-পত্র রাখা হতো। তাদের কাছে সব সন্ধান নিয়ে আমি ওইখানে অভ্র-খনির আবিষ্কার করি। তারপর জমীদারের কাছ থেকে জমী 'লিজ' নিয়ে আমিই প্রথম এখানে 'মাইকা মাইনে'র কাজ পূরোদস্তুর আরম্ভ করি। ওই খনি থেকে আমি অনেক টাকাই লাভ করেছি। তারপর বুড়ো বয়সে দায়িত্বশূন্য হয়ে বাকী জীবনটা কাটাবার জন্যে খনি-টনি সব বিক্রী করে দিয়ে এই বাড়ীখানি নিজের মনের মত করে তৈরী করিয়ে এখানেই বসবাস করছি। আজ তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করে বড় আনন্দ পেলুম।'

তারপর এদিক-ওদিক আরও কিছুক্ষণ কথার পর উঠে পড়লুম। বৃদ্ধ আমার হাতখানি স্নেহভরে চেপে ধর্‌লেন। তাঁর স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন হয়ে গেল। ভারী গলায় তিনি বল্লেন—'তোমাকে যে আমার কত ভাল লাগছে, তা' আর কি বল্‌বো। মনে হচ্ছে—তুমি আমার কল্পনা। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমি আজ প্রকৃত শান্তি পেলুম। তা' যাক্, তুমি যখনই অবসর পাবে, তখনি আমার কাছে আসবে, আর তোমার যখন যা' দরকার হবে, আমায় বল্‌তে দ্বিধা করো না। আমার এখানে যা' বই বা অন্য যে কোন জিনিষ আছে, তোমার আবশ্যক মত তুমি এ সকলেরই ব্যবহার—'

আমি তাঁর মুখের দিকে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম।

চার

চাটুয্যের দলে সেদিন তাসখেলার লোক অভাব পড়াতে সে আমায় জোর করে নিয়ে গিয়ে বসালে। তাকে কত বল্লুম—আমি তাস খেল্‌তে ভাল পারি না এবং সারাদিন ধরে মোটর হাঁকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চাটুয্যে কিন্তু আমার কোন কথাই শুন্‌লে না। তাদের সঙ্গে সেদিন খেল্‌তেই হলো।

খনির কেসিয়ার হরিদাসবাবু তাসটা ভাঁজ্‌তে

ভাঁজ্‌তে আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন—'আজ পরেশনাথ ঘুরে এলেন কেমন?'

উত্তর দিলুম—'ভাল।'

এদিক ওদিক কথার পর চাটুয্যেকে বল্লুম—চাটুয্যে-মশায়, আজ আপনাদের স্কট্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো।'

চাটুয্যে বল্লে—'কে, স্কট্?'

—'সে কি, স্কট্‌কে চেনেন না, আপনি ত গোড়া থেকেই এই খনিতে আছেন।'

—'হ্যাঁ, তা' ত আছি, কিন্তু স্কট্ বলে এ খনিতে এক ফাউণ্ডার রিকি স্কট্ ছাড়া আর কেউ ছিল বলে ত মনে পড়ে না।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ সেই।'

অপর খেলোয়াড় রায়-মশায় বল্লেন—সে কি মশায়, তিনি ত আজ বহুকাল হলো মারা গেছেন! আমরাই তাঁকে দেখি নি কখনও, তা' আপনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন কি রকম!'

চাটুয্যে বল্লে—'না না, তুমি থামো।' তারপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন—'স্কটের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো বিজয়?'

রায়ের কথায় কিন্তু আমার বড় মজা লাগ্‌লো। তাঁকে বল্লুম—'সে কি মশায়, মারা গেছেন কি! আমাকে নিয়ে একসঙ্গে নিজের বাংলোয় বসে চা খেলেন, কত রকম সব গল্প করলেন, আর আপনি বল্‌ছেন মারা গেছেন।'

তারপর সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথায়, কোন্ বাড়ীতে?'

তখন আমি ঘটনাটা সমস্তই খুলে বল্লুম।

রায়-মশায় চোখ কপালে তুলে বল্লেন—'সে কি মশায়, এ কি সব সত্যি কথা?"

চাটুয্যে বল্লে—'বিজয়, কেন ভাই ছলনা করছো আমাদের সঙ্গে। হয় ত ওই বাংলো সম্বন্ধে তুমি কোনো ভূতের গল্প শুনেছো, তাই থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে—'

আমি ত অবাক্! আমার কথা তাঁদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলুম না।

চাটুয্যে বল্লে—'বাপ্, ও বাড়ীতে কি ভয়ানক ভূতের উপদ্রব! স্কট্ মারা যাওয়ার পর তার এক আত্মীয় এসে ওই বাংলো অধিকার করেন; কিন্তু সে ওখানে কিছুতেই টিঁক্‌তে পারে না। তারপর ও বাড়ী ভাড়া দেওয়ার জন্যে রীতিমত চেষ্টা হয়। কোন ভাড়াটেই ওখানে একদিনও বাস করতে পারে নি—কি এ দেশী, কি সাহেব।'

রায় বল্লেন—'আরে, তুমি জানো না বুঝি। আমাদের উপস্থিত ম্যানেজার নিকল্‌স্ সাহেব অনেক লোকজন সঙ্গে করে ওই বাংলোয় গিয়ে আড্ডা নিয়েছিলেন, কিন্তু দু'দিন পরে পালিয়ে আস্‌তে পথ পান নি।'

চাটুয্যে বল্লে—'আরে রেখে দাও তোমার নিকল্‌স্। ওই বাড়ীটায় থানা হবার কথা হয়েছিল। বাড়ীওয়ালা বিনা ভাড়ায় পুলিশকে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু তবুও ওখানে থানা টিঁক্‌তে পারে নি—ও কি যে সে বাড়ী হ্যা!'

বল্লুম—'দেখুন, আপনারা বিশ্বাস না করলে আর আমি কি করতে পারি। আমি কিন্তু ওই বাংলোয় একজন বুড়ো সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে একসঙ্গে চা খেয়ে এসেছি।'

চাটুয্যে বল্লে—'ভায়া, বলি তোমার কি কিছু মাল টানার অভ্যাস আছে?'

রায়-মশায় বল্লেন—'আচ্ছা বিজয়বাবু, আপনি আমাদের কাল বাড়ীখানা দেখাতে পারবেন কি?'

নিঃসন্দেহে তখনি স্বীকার করে ফেল্লুম। বল্লুম—'নিশ্চয়ই পারবো।'

হরিদাসবাবু এ সব কথায় আর বড় আমোল দিলেন না। তাসগুলো হাতে সাজিয়ে ডাক্‌লেন—'পনেরো।'

পাঁচ

দুপুরবেলায় কাজ আমাদের কম থাকে। আমি চাটুয্যে ও রায়-মশায় তিনজনে অফিসের ছোট গাড়ীটা নিয়ে বেরোনো গেল।

মোটরে যেতে পনের মিনিটও লাগে না। পরিচিত পথের মোড়ে গাড়ীটা এনে দাঁড় করালুম।

কোথায় বা সাহেব, আর কোথায়ই বা তাঁর বাগান-বাড়ী! তারের বেড়ার ভেতর একটা উদ্যানের ভগ্নাবশেষ কোনরকম করে জীর্ণ খুঁটী ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দ্দিকে কাঁটাগাছ ও শুক্‌নো পাতার রাশি। দেখ্‌লে মনে হয় এক সময় যে আবাসে লোকের বসবাস ছিল—এখন কিন্তু সেই পরিত্যক্ত ভিটায় মনুষ্য-প্রবেশের পথমাত্র নাই। বড় একটা গাছের ডাল ভেঙে দরজাটার ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে। সাম্‌নের বারাণ্ডাটা স্থানে স্থানে ভাঙা। খুঁটীর গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড গহ্বর। বোধ হয় শৃগাল জাতীয় কোন জন্তু তার বসবাসের নিমিত্ত সেই প্রকাণ্ড গহ্বরটি খনন করেছে।

নিজের জ্ঞানকেও আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেখানে বসে পরমানন্দে আতিথ্য-গ্রহণ করে বাংলো ও বাগানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি—সেই বাড়ীই কি এই বাড়ী! অথচ, অবিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই। রাস্তার ধারে কাল আমি মাইল ষ্টোন্‌টা ঠিক্ ওইখানেই দেখেছি। ওই বাঁকের মাথায় আমার 'বাক্‌ল'টা খুলে পড়ে গিয়েছিল। ওইখানটায় আমি আমার গাড়ী থামিয়ে রেখেছিলুম। তবে—

চাটুর্য্যে বল্লে—'কি হে, এইখানেই ত?'

জবাব দিলুম—'হ্যাঁ, এইখানেই ত ছিল।'

—'ছিল ত, গেল কোথায়?'

রায় বল্লেন—'কি মশায়, আপনার বন্ধু কি রাতারাতি অদৃশ্য হলেন না কি?'

এ সব কথার কোন উত্তর আমার মুখে এলো না। শুধু অবাক্ হয়ে সেই ভাঙা বাংলোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। এ দৈবী মায়া, না ভৌতিক কাণ্ড? বিদেশে এসে আমার মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি হলো না কি? ভেবে কিছুই ঠিক্ করতে পারলুম না।

আমি চুপ করে রইলুম। তাঁদের সঙ্গে কোন কথাই আর কইলুম না। তাঁরাও প্রথম দিকে বেশ খানিকটা হাসাহাসি করলেও শেষকালে যেন কিছু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। আমি হলুম নতুন লোক; আমার সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ কিছুই জানেন না। এই অদ্ভুত গল্প শুনে তাঁরা আমায় কি ভাব্‌লেন কে জানে!

খনিতে ফিরে এসে যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করতে লাগলুম, তা' একমাত্র আমিই জানি। এই সমস্ত ঘটনা তবে কি? তখন হঠাৎ মনে পড়্‌লো—সাহেব আমায় তাঁর বই নেবার কথা কাল বলেছিলেন; কিন্তু বই ত আমি নিই নি। বই একখানা নিলে খুবই ভাল হতো; তবু একটা চিহ্ন থাক্‌তো।

আমি যেন কেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লুম। গাড়ী তখন 'গ্যারেজে' পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের এক বেহারী 'টেণ্ডেল'র কাছে থেকে তার সাইকেলখানা খানিক ক্ষণের জন্য চেয়ে নিয়ে স্কটের সেই ভাঙা বাংলোর উদ্দেশে পুনরায় রওনা হয়ে পড়্‌লুম।

সাইকেলে যেতে যেতে যতই বাড়ীটার কাছাকাছি আস্‌তে লাগ্‌লুম, ততই আমার বুকের ভেতর কেমন যেন দুরুদুরু করতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী ছিল না। জনশূন্য প্রকাণ্ড মাঠ তখন সূর্য্যের পড়ন্ত আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। মেঠো হাওয়ায় পথের ধূলো উড়ে এসে আমার কাপড় ও গাড়ীখানা লালে লাল করে দিলে।

পরিচিত মোড় পার হতেই আমার হাত পা সব কাঁপতে লাগ্‌লো। সেই বাংলোর সাম্‌নে গিয়ে আমি সাইকেল থেকে নেমে পড়্‌লুম।

তখনও পর্য্যন্ত সাহস করে রাস্তা থেকে চোখ তুলে বাড়ীখানা দেখ্‌তে ভরসা করি নি। তারপর ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম—পূর্ব্বদিনের মত বাগান তেম্‌নি সুন্দর-ভাবেই সাজানো। জান্‌লাতে সিল্কের পরদা ঠিক্ তেম্‌নি-ভাবেই অপরাহ্ণের হাওয়ায় দুল্‌ছিল। গাছে গাছে বাহারী পাতা এবং ফুলের গুচ্ছ যেন আর ধরে না।

চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে আর একবার চেয়ে দেখ্‌বো, এমন সময় ওপর থেকে স্কট্ আমার নাম ধরে

ডাক্ দিলেন। বল্লেন—'হ্যালো বিজয়, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? সাইকেল নিয়ে ভেতরে এস।'

পরনে তাঁর সাটিন জিনের শাদা ট্রাউজার, গায়ে একটা সিল্কের হাতকাটা সার্ট। বারাণ্ডার ওপর বেতের চেয়ারে বসে একটা 'বাইনাকুলারে'র পেছন দিয়ে একমনে দূরের 'ল্যাণ্ডস্কেপ্' দেখ্‌ছিলেন।

সাইকেলটা হাতে করে বাগানের মাঝখানের কাঁকর দেওয়া পথ দিয়ে ঢুকলুম। বেহারী চাকর তখন টিনের ঝারি নিয়ে গাছে গাছে জল দিচ্ছে। সারাদিনের উত্তাপের পর সন্ধ্যার জল এবং হাওয়ায় বাগানের উদ্ভিদ-মহলে তখন একটা প্রসাধনের উৎসব পড়ে গেছে।

স্কট্ আমায় পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বল্লেন—'বসো।'

বস্‌লুম। বল্লুম—'আপনাকে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে, তার উত্তর না পেলে আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না।

তিনি বল্লেন—'কি?'

আজ দুপুরের ঘটনাটা তাঁকে সব খুলে বল্লুম। শুনে তিনি একটু হাস্‌লেন। বল্লেন—'তাই না কি! কেন আমি ত এইখানেই বরাবর আছি।'

বুঝ্‌লুম যে, কোন কথা তিনি সহজে ভাঙ্‌বেন না। তখন চাটুয্যের কথাটাও তাঁকে বল্লুম। তবে যে লোক আমার সাম্‌নে বসে কথা কইছেন এবং যাঁকে দেখে তিলমাত্রও সন্দেহ বা ভয় করে না, তাঁকে আমি কিছুতেই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌লুম না—তিনি ভূত কি না?

কিন্তু স্কট্ আমার মনের কথা বুঝে নিয়ে বল্লেন—'কেন, চাটুয্যে কি আমাকে ভূত বলে না কি?'

বল্লুম—'এমনিই ত বলে।'

সাহেব যেন একবার কি ভাব্‌লেন। তারপর বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—'আচ্ছা, এই যে তোমরা ভূত ভূত কর, এর মানে কি? মনে কর, তুমি কোল্‌কাতায় ছিলে, এখন সেখান থেকে গিরিডিতে চলে এসেছো। আচ্ছা, উপস্থিত যদি কোন লোক তোমায় কোল্‌কাতায় খোঁজ করে' না পায় এবং না পেয়ে যদি বলে যে তুমি ভূত হয়ে গেছ, তা' হলে কি বল্‌বে?'

—'বা, কোল্‌কাতায় আমি না থাক্‌তে পারি, কিন্তু এখানে ত আছি। সে আমায় এখানকার ঠিকানায় খোঁজ কর্‌বে।'

—'হ্যাঁ তা' করবে, কিন্তু কোল্‌কাতা নামক দেশটায় তুমি এখন ভূত হয়ে গেছ; কারণ, আমি ভূত অর্থে অতীত ধর্‌ছি। কোল্‌কাতায় তুমি ভূত, গিরিডিতে তুমি বর্ত্তমান, তারপর ভবিষ্যতে কোথায় যাবে, তার ঠিক্ নেই। যাই হোক্, সত্যিকার ভূত বল্‌তে তোমরা যা' বোঝো, সেটা আমার মতে কিছুই নয়। আমার পরিবর্ত্তনে বস্তুর পরিবর্ত্তন, তোমার কোল্‌কাতা থেকে গিরিডি আসা হলো স্থানের পরিবর্ত্তন, দেহীদের দেহান্তর গ্রহণ করা রূপের পরিবর্ত্তন। মোটের ওপর বিষয় বস্তু কখনও বদ্‌লায় না, এই হলো আমার মত।'

কিন্তু আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর তিনি কিছুই দিলেন না। তখন আমায় নির্লজ্জের মত জিজ্ঞাসা কর্‌তে হলো—'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি কি—'

প্রশ্ন শুনে সাহেব একটু হাস্‌লেন। শেষে বল্লেন—'তোমার কি মনে হয় বলো ত বিজয়?'

—'মানুষ বলে।'

—'ঠিক্ তাই, মানুষ ছাড়া আমি আর কিছুই নই।'

—'তবে কেন বিকেলে এসে আপনাকে এখানে পেলুম না—আপনার বাড়ীখানা কেনই বা ওরকম অবস্থায় দেখ্‌লুম?'

—'বিজয়, এইখানেই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ। আমার আগে অনেকেই এই দেশে এসে ঘুরে গেছেন—বহুকাল ধরে বহু সহস্র লোক। তাঁরা সকলেই দেখেছেন এ দেশটা অনুর্ব্বর—মনুষ্যবাসের পক্ষে অযোগ্য বলে। কিন্তু আমার চোখে এদেশের মাটীতে প্রথম ধরা পড়ে এই অভ্রের সমৃদ্ধি। আমিও তাঁদের মতই মানুষ, শারীরিক কষ্ট ঠিক তাঁদের সমানই পেয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখ্‌তে পেয়েছি, এদেশের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য। এখন বুঝ্‌লে?'

—তা' যেন হলো, কিন্তু আমার সঙ্গীদের সঙ্গে যখন

এলুম, তখন কেন আমি এখানকার সেই পরিত্যক্ত অবস্থাই দেখ্‌তে পেলুম।'

—'সঙ্গদোষ বিজয়, সঙ্গদোষ! ওই জন্যই মানুষ উপযুক্ত সঙ্গীর অন্বেষণ করে। তুমি তোমাদের দেশীয় কাব্য নিশ্চয়ই পড়েছো। তোমাদের কাব্যে আছে—রাধা মেঘ দেখে কৃষ্ণ মনে করে মূর্চ্ছা যেতেন। সেটা হলো তাঁর নিজস্ব মানসিক চিন্তা—আবার যখন অন্য লোক এসে দেখিয়ে দিত ওটা নিছক মেঘ, তখন রাধার সেই ঐশ্বরিক দৃষ্টি সরে যেত। তুমি যখন নিজের মনে আসো, তখন আমার স্বরূপ তুমি দেখ্‌তে পাও, আর যখন ওই সব লোকের সঙ্গে আসো, তখন তাদের ভাবে ভাবান্বিত হয়ে—'

আকাশ থেকে অন্ধকার এসে নাম্‌লো আমাদের চতুর্দ্দিকে, পুঞ্জে পুঞ্জে স্তরে স্তরে। পথ, গাছ, বাগান-বাড়ী, এমন কি উন্মুক্ত প্রান্তর পর্য্যন্ত অন্ধকারে কালো হয়ে গেল। হাওয়ার তেজ ক্রমে বেড়ে উঠ্‌লো। আকাশে তখন মেঘের সমারোহ্ পড়ে গেছে।

বল্লুম—'আচ্ছা, আমি এখন উঠি, জল আস্‌ছে।'

বৃষ্টির মধ্যে সেখানে থাকৃতে আমার কেমন ভয় করতে লাগ্‌লো।

সাহেব বল্লেন—'আচ্ছা, কিন্তু কাল আবার এসো।'

—'মিঃ স্বট্, আমার বন্ধুদের আন্‌তে পারি কি?'

—'খুসী।'

তিনি সেই বেতের চেয়ারে চুপ করে বসে রইলেন। আমি আমার সাইকেল নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই পথে নেমে এলুম।

রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখ্‌লুম—অন্ধকারের মধ্যে সাহেবের মূর্ত্তি বেত্রাসনে গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট।

ছয়

ম্যানেজার নিকল্‌স্ আমায় দুপুরে চাপরাশী দিয়ে ডেকে পাঠালেন।

গেলুম। নিকল্‌সের ঘরে তখন রায়-মশায় বসে আছেন। নিকল্‌স্ আমায় স্কটের কথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি সেখানে কি দেখেছি?'

সমস্ত বিষয়টাই সংক্ষেপে তাঁকে জানালুম।

নিকল্‌স্ বল্লেন—'বেশ, আজ দুপুরে তুমি, আমি ও মিঃ চ্যাটার্য্যি তিনজনে যাবো। তৈরী থেকো।'

...মোটরটা সেদিন নিজেই চালাতে লাগ্‌লুম। স্বট্ সাহেব কাল সন্ধ্যায় বন্ধুদের আন্‌বার হুকুম দিয়েছেন বলেই আমি সাহস করে এঁদের নিয়ে চলেছি।

দূর থেকে বাংলোটার দিকে চেয়ে কিন্তু আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! দেখ্‌লুম—সেই ভাঙা বাড়ীখানা শুধু পরিত্যক্ত অবস্থায় পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দু'-একটা পাখী দুপুরের রৌদ্র থেকে আত্মগোপন করে গাছের ছায়ায় বসে অদ্ভুত রকম শব্দ করছে।

আশ্চর্য্য!

চাটুয্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে। নিকল্‌স্ একবার চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন—'কই বাবু, তোমার স্বট্ কোথায়?'

নিরুত্তর হয়ে রইলুম।

চাটুয্যে বল্লে—'চলো হে, ফিরে চলো।'

অগত্যা—

আরও একটুখানি এসে হঠাৎ আমার কি যেন মনে হলো। বল্লুম—'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তা' হলে এই গাড়ীর মধ্যে একটু বসুন, আমি একবার একা গিয়ে দেখে আসি।'

চাটুয্যে বল্লে—'আর কি হবে ভায়া, চলো ফিরেই যাওয়া যাক্।'

নিকল্‌স্ বল্লেন 'না না, তুমি যা' বল্‌ছো, কথাটা ঠিক্। তুমি এগিয়ে গিয়ে একলাটি একবার ব্যাপারটা দেখে এসো।'

মোটর থেকে নাব্‌বার উপক্রম কর্‌তেই নিকল্‌স্ বল্লেন—'না না, তোমায় নাব্‌তে হবে না, আমরা বরং নেবে যাচ্ছি। তুমি এই গাড়ীটা নিয়ে চলে যাও; 'চট্' করে ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে।'

নিকল্‌সের হুকুমে বুড়ো চাটুয্যেকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে মোটর থেকে নাব্‌তে হলো।

আমি সেই গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চল্‌লুম।

...দুপুর রোদ্দুরে স্কটের বাংলো যেন চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। গাছপালা সমস্তই যেন কেমন নেতিয়ে পড়েছে। ভেতর থেকে দোর বন্ধ—কিন্তু দেখ্‌লেই মনে হয় সে বাড়ীতে লোক আছে।

মোটর ছেড়ে আমি ওপরে এসে উঠ্‌লুম। মনে হলো বাড়ীটার ভেতর কে যেন পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে।

দরজায় হাত দিলুম। খুলে গেল। ড্রয়িংরুম পার হয়ে গানের শব্দ লক্ষ্য করে একটা ঘরের সাম্‌নে গিয়ে পরদা সরিয়ে ভেতর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, স্কট্ সাহেব পিয়ানোয় বসে আপন-মনে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইছেন। কক্ষ মধ্যে আর কেউ নেই। জানলায় কালো বনাতের পরদা থাকার দরুণ ঘরটা যেন কেমন আলো-আঁধারি হয়ে আছে। স্কটের সাম্‌নে, দেওয়ালে একটা বড় আরসী। মেঝেয় কার্পেট বিছানো। সমস্ত কক্ষটার মধ্যে যেন একটা পবিত্র গম্ভীরভাব ফুটে রয়েছে।

আমি কেমন আকৃষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লুম। স্কট্ ইঙ্গিতে আমায় বস্‌তে বল্লেন।

ধর্ম্ম-সঙ্গীত চল্‌তে লাগ্‌লো। আমি আমার অবস্থার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলুম। ভুলে গেলুম যে, আমার ম্যানজারকে আমি গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। একবারও মনে হলো না যে, এ অবস্থায় আমার এখানে বেশী দেরী করা উচিত নয়।

তন্ময় হয়ে স্কটের গান শুনছি। শুন্‌তে শুন্‌তে হঠাৎ আমার নজর পড়লো আরসীর দিকে।

স্কট্ বসে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছেন। আমি একটা কোচের ওপর বসে আছি। স্কট্ এবং আমার দু'জনের মূর্ত্তি দর্পনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। উভয়ের প্রতিচ্ছবির মধ্যে কতকটা যেন সাদৃশ্য আছে। কিন্তু স্কটের মুখভাবের পরিবর্ত্তন সুরু হলো। পিয়ানোর সঙ্গীতের মধ্যে কালের গতিস্রোত বেজে উঠলো। জনহীন প্রান্তর-বাটীকায় শুব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা ভেদ করে পিয়ানোর সঙ্গীতের মধ্যে শুনলুম যেন কার পদধ্বনি! মুকুর-গাত্রে সাহেবের ছবির মধ্যে পরিবর্ত্তন ফুটে উঠ্‌লো—রূপের পর রূপ পরিচ্ছদের পর পরিচ্ছদ বদ্‌লাতে লাগ্‌ল—শেষে সেই পরিবর্ত্তনের শেষ দিকে যার মূর্ত্তি সেই দর্পনে ফুটে উঠ্‌লো সে যে আমারই শৈশব মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিও ধীরে ধীরে বদ্‌লে গেল—শেষে ফুটলো আমারই বর্ত্তমান ছবি। পিয়ানোয় বসে গান গাইছি আমি, পাশের কোচে বসে শুন্‌ছিও আমি। শ্রোতারূপে নবীন আমি গায়করূপী পুরাতন আমির গান শুনে তন্ময় ও নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলুম।

গান শেষ করে আমার দিকে চেয়ে সাহেব বল্লেন—'বিজয় যে, এমন অসময়ে?'

তখন আমার জ্ঞান হলো। স্কটের হাতটা চেপে ধরে বল্লুম—'মিঃ স্কট, আপনি আমায় এই রহস্য থেকে মুক্তি দিন। আমি সকলের কাছে পদে পদে অপমানিত হচ্ছি, লোকে আমায় পাগল ভাব্‌ছে—অথচ, আমি এর কোন মীমাংসাই কর্‌তে পার্‌ছি না।

স্কট তাঁর স্বভাব-দত্ত হাসি হাস্‌লেন।—'তাই ত বিজয়, তুমি ত বড় বিপদে পড়েছো দেখ্‌ছি।'

একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বল্লেন—'এই আর-সীর ভেতরের ছবিটা দেখে তুমি কি বুঝ্‌লে বলো ত?'

বল্লুম—'কিছুই বুঝি নি, কোন কিছুর বোধ শক্তি আমার লোপ পেয়েছে।'

—'আচ্ছা, আর একখানি ছবি দেখো ত।' এই বলে সাহেব কার একখানা ফটো আমার হাতে তুলে দিলেন।

ফটোটা হাতে কর্‌তেই মনে হলো, সেটা উমার ছবি। কিন্তু সে হঠাৎ কেন যে গাউন পরে মেম সেজেছে, সেটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তারপর খুব ভাল করে দেখ্‌তেই মনে হলো—না, উমা ত নয়, তবে—হয় ত সেই—কি জানি!

মৃদু হেসে স্কট বল্লেন—'কে, তোমার উমা না কি?'

আশ্চর্য্যের সীমা আমার ছাড়িয়ে গেল—উমাকে তিনি জান্‌লেন কি করে?

স্কট্ বল্লেন—'দেখো, তোমায় যে প্রণয়িনীর গল্প করে-ছিলুম, ওই হলো আমার সেই প্রনয়িণীর ছবি। আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলুম—কিন্তু সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর সে এবার উমা হয়ে জন্মেছে। গত জন্মে আমার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ ছিল, এ জন্মেও সে তোমার সঙ্গে ঠিক্ সেই সম্বন্ধই স্থাপন করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছিল, তোমার সঙ্গেও ঠিক্ সেই রকম ব্যবহারই করেছে—কেমন তাই নয় কি?'

এই উমা মেয়েটি আমাদেরই প্রতিবেশী। আমার তাকে বড় ভাল লাগ্‌তো। প্রথম প্রথম সে আমায় ভালও

বাস্‌তো; কিন্তু শেষকালে আমায় প্রত্যাখ্যান করে। কোল্‌কাতার ছেড়ে দূরদেশে চাকরী নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে আসার মধ্যে উমার ওপর অভিমান ছিল অনেকখানি।

অবাক্ হয়ে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বল্লেন 'বিজয়, তুমি কি বুঝ্‌লে কিছু?'

বল্লুম— 'না, ঠিক্ বুঝ্‌ছি না।'

—'তবে শোনো। আমি হলুম পূর্ব্ব জন্মের স্কট্, আর তুমি হলে পরজন্মের বিজয়। আমার চিন্তা ও ভাবধারা এসে পরজন্মের বিজয়রূপে ফুটে উঠেছে—আর তোমার মনের মধ্যে যে রূপ অস্পষ্ট হয়ে ভাস্‌ছে, সেটা হলো স্কটের মূর্ত্তি। আমি হলুম তোমার স্মৃতি—আর তুমি হলে আমার কল্পনা—উভয়েই উভয়ের কাছে মূর্ত্তিমান।'

টেবিলের ওপর দু'খানা বই ছিল। সাহেব বল্লেন— 'বিজয়, দেখো ত ওই বই দু'খানা কি এবং কার নাম লেখা ওতে।'

একই বইয়ের দুটো সংস্করণ। একখানায় মুদ্রাঙ্কনের সাল আঠার শ' আটাশ, অপরটাতে উনিশ শ' সাত। প্রথম বইটার গোড়ার পাতায় কালি দিয়ে লেখা আছে—'রিকি স্কট্', আর দ্বিতীয় বইটায় কি আশ্চর্য্য—এ যে আমারই নাম!

স্কট্ বল্লেন—'আমার জন্ম বছর আঠার শ' আটাশ—তোমার?'

আমি বল্লুম—'উনিশ শ' সাত।'

..... চাটুয্যের গলা শুন্‌লুম। বাইরে থেকে বুড়ো আমার নাম ধরে ডাক্‌ছে।

স্কট্ বল্লেন—'বিজয়, ম্যানেজার এসেছে, যাও। আবার এসো।'

বাইরে বেরিয়ে এলুম।

চাটুয্যে বল্লে—'কি হে, তুমি এই ভাঙা ঢিবির মধ্যে এতক্ষণ ধরে কি কর্‌ছো?'

চেয়ে দেখি—বাস্তবিক, আমাদের সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ভাঙা ঢিবিই ত বটে!

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

ত্রিগুণবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রথম খণ্ড—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। ৩৮।৭৯, হাউস্ কাটরা বেনারস সিটি হইতে শ্রীসত্যহরি দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

অদ্যাবধি গীতার যতগুলি উৎকৃষ্ট সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইখানি যে অন্যতম, ইহা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ইহার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। পত্রিকায় স্থানাভাব, নতুবা পুস্তকের অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া লেখকের পাণ্ডিত্য-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতাম। বাঙ্গালীর সুমতির সঙ্গে গৃহে গৃহে এই গীতাখানি সযত্নে রক্ষিত ও পঠিত হইয়া গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক এবং ধর্ম্ম-পিপাসু জনগণের জ্ঞান, আনন্দ, শিক্ষালাভের সহায়তা করুক, সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা ইহাই কামনা করি।

জাগরণ—শ্রীসত্যহরি দাস সঙ্কলিত। ১৪, আহিরী-টোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা, কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা।

এই পুস্তকের ভূমিকায় পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছেন—'গাগরমে সাগর।' কথাটা অতি সত্য। লেখকের চিন্তাশক্তি, ভূয়োদর্শন এবং গুরুতর জটিল সমস্যা-সমূহের মীমাংসার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ইহাতে জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার অনেক কিছুই আছে। সুধী-সমাজ এই বইখানি একবার পাঠ করিয়া দেখুন. ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে যদি এমন গ্রন্থের সমাদর না হয়, তাহা হইলে আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এরূপ একখানি সারগর্ভ উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সত্যহরিবাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নেপালের পথে—শ্রীসুধীরকুমার আচার্য্য (এ্যাড্‌-ভোকেট্) এবং শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা, বি এ লিখিত। দক্ষিণা মাত্র তিন সিকা। পাব্লিসার—বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ভাল এ্যান্টিক পেপারে মুদ্রিত। স্থানের দূরত্ব ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য মধ্যে মানচিত্রের ব্যবহার করিয়াছেন। চিত্র-সম্ভারে-অলঙ্কৃত। স্থান-বিশেষে ইতিহাসের আভাষ দেওয়ায় ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই পাইয়াছে মনে হয়। ভাষা মিষ্ট। এক কথায় পুস্তকখানিতে আমার মনে হয় ক্রেতা ঠকিবেন না; অন্ততঃ, যাঁহারা তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মানুষ পথ-প্রদর্শক না হইলেও একেবারে অন্ধত্ব থাকিবে না।

গল্প না বাস্তব ?

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম্-আর্-এ-এস্

'গল্প-লহরী'র সম্পাদকের পুনরায় তাগিদ আসিয়াছে—কিন্তু 'ও রসে বঞ্চিত এ গোবিন্দ দাস', তাহা জানিতে বোধ হয় কাহারও বাকী নাই। গল্প লিখি বা না লিখি, সদা-সর্ব্বদা কিছু কিছু লিখিয়া থাকি। সেগুলি গল্প কি বাস্তব, তাহা 'গল্প-লহরী'র পাঠকগণ না জানিতেও পারেন ; কারণ, তাঁহাদের নিকট এ অধীনের মাত্র দ্বিতীয়-বার প্রকাশ। তাহার উপর আবার ফরমাস হইয়াছে, নাট্যালয়, নাট্যাভিনয় বা নাট্যরথী অভিনেতাগণ সম্বন্ধে গল্প বলিতে হইবে। নিম্নে কিছু কিছু লিখিলাম। সেগুলি গল্প কি বাস্তব আপনারাই বিচার করিবেন।

১৯১২ সালে মহাকবি গিরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরের তিন-চারিদিন পূর্ব্বে তাঁহার আলয়ে বাহির বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া ছাদের উপর দিয়া দক্ষিণ-দিকের যে ঘরটী ডিঙ্গাইয়া অন্দর-মহলে যাইতে হয়, সেই ঘরে নাট্যাচার্য্য রসরাজ অমৃতলাল সটকা টানিতে-ছেন। সেখানে পল্লীবাসী শ্রদ্ধেয় অসীমকৃষ্ণ বসু, গিরিশ-চন্দ্রের শেষ-সহচর, শিষ্য অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং অধীন (লেখক) সমাসীন। ন বাবু—গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়—মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতে-ছেন। শ্রাদ্ধ-বাসরের উদ্যোগ-আয়োজনের কথা ত হইতে ছেই, মাঝে মাঝে গিরিশ-প্রসঙ্গও চলিতেছে। কাজের কথা কিছু কিছু আলোচনা হইয়া গেলে, অমৃতলালকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করা গেল—একটা অবান্তর কথা—"বিশ্বকোষে' 'রঙ্গালয়' শব্দের বর্ণনায় কিছু কিছু ভ্রম থাকলেও একটা বিশেষ কথা আছে, সে সম্বন্ধে আপনার মতামত আমরা জানতে চাই ; কারণ, আপনি বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা, অভিনেতা ও আচার্য্য। জিজ্ঞাস্য এই—ঐ 'রঙ্গালয়' শব্দে লিখিত আছে যে, আপনাদের নাট্যশালায় নাট্য-শিক্ষকতার দু'টী বিভিন্ন প্রণালী বা শিক্ষা-পদ্ধতি চল্‌ছে ; অর্থাৎ, দু'টী 'ডিফারেণ্ট স্কুলে' দু' রকম শিক্ষা না কি দেওয়া হয়ে থাকে। একটী স্কুলের কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র ; অপরটীর কর্ত্তা বা শিক্ষক না কি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মশায় ? এবং অর্দ্ধেন্দুবাবুর 'স্কুল অফ্ এ্যাক্‌টিং' না কি 'ন্যাচারাল' ; অর্থাৎ, স্বাভাবিক বা স্বভাবের অনুকরণ এবং গিরিশচন্দ্রের না কি 'নেচার' হ'তে পৃথক ; অর্থাৎ, অস্বাভাবিক বা কাল্পনিক কলা-সাধন ?"

প্রশ্নটীর গুরুত্ব রসরাজ ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন এবং একটা যে কাল্পনিক দলাদলির দ্বেষ-বিদ্বেষ এই বিষয়টী লইয়া মাঝে মাঝে উঠে, তাহা তিনি জানিতেন। তাই গাম্ভীর্য্যের, অথচ হাস্যমুখে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"দেখো, 'বিশ্বকোষে'র 'রঙ্গালয়' শব্দে কি লেখা আছে না আছে আমি জানি না এবং জানতেও চাই না। অর্দ্ধেন্দুর ছেলে ব্যোমকেশ 'বিশ্বকোষে'র নগেন বোসের বন্ধু। এ শব্দটা বোধ হয় ব্যোমকেশেরই লেখা। ব্যোমকেশ পিতৃভক্ত—আমি সে জন্য তাকে বড় ভালবাসি ; কারণ, আজকালকার ছেলেদের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি নেই বল্‌লেই হয়। ব্যোমকেশ পিতৃগুণমুগ্ধ—সেটা খুব আনন্দের কথা। কিন্তু যখন সে আপনার বাপকে বড় করতে গিয়ে অন্যান্যের প্রতিভার বিরুদ্ধে কথা বলে বা তাঁদের শক্তিকে খাটো করে, তখন আমার হাসি পায় এবং পিতৃ-ভক্তিতে সে অন্ধ হয়েছে বলে ক্ষমা করি। আসল কথাটা হচ্ছে এই—তবে এটাও বলে রাখি যে, অর্দ্ধেন্দু আমার নাট্য-শিক্ষার প্রথম গুরু-মশায়—গিরিশবাবু—গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দু—অর্দ্ধেন্দু। গিরিশবাবুকে আমরা যে সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ বলেই সম্মান করে এসেছি তা' নয়—তাঁর

সাহচর্য্য, তাঁর সখ্য ও তাঁর শিক্ষকতা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে লেগে আছে। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা খুব উন্নত ও অসাধারণ হলেও ওটা একেবারে দুর্লভ নয়; কিন্তু আর একজন গিরিশবাবু বা তাঁর মত বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তি—বিশেষতঃ, নাটকের শিক্ষকতায়—যে যখন-তখন পাওয়া যায়, তা' ত একেবারেই নয়; বরং সেটা দুর্লভ এবং সে অভাব যুগ-যুগান্তেও পূর্ণ হবার নয়। প্রথম থিয়েটারের আখড়ায় সদা-সর্ব্বদা উপস্থিত থাক্‌বার এবং গাধা পিটে ঘোড়া করবার সময় ও সুযোগ অর্দ্ধেন্দুর ছিল এবং 'নিকামায়ে দর্জ্জি'দের নিয়ে অর্দ্ধেন্দু যথেষ্ট পরিশ্রম কর্‌ত ও তাদের রিহারস্যাল দিয়ে কোন না কোনরকমে খাড়া করত। তাদের ভেতর কেউ কেউ উতরে গিয়ে থাক্‌তে পারে এবং কেউ কেউ হয় ত মনে করে আমি অর্দ্ধেন্দু-প্রতিভার অধিকারী, এজন্য খুব বড় অভিনেতা। অর্দ্ধেন্দু নিজে নাট্যকলা বুঝ্‌ত, কিন্তু সব দিক্ দিয়ে নয়। তার নিজের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই বৈশিষ্ট্যের বলে সে লোকরঞ্জন কর্‌তে পার্‌ত, এবং তাই সে ষ্টেজে বেরুলে মুস্তফী-সাহেব-রূপে অভিনন্দিত হতো। কিন্তু ছাত্রগণকে সে বৈশিষ্ট্যটুকু দিয়ে সকল রকমের অভিনেতা গ'ড়ে তোলা যেতে পার্‌ত না এবং ছাত্রেরাও গুরুর বৈশিষ্ট্যটুকুও সকলে ধর্‌তে পার্‌ত তা' নয়। অর্দ্ধেন্দুর মত রঙ্গরসাবতার আর ক'জন পাওয়া যায়—তা' ত তোমরা দেখ্‌তেই পাচ্ছ। তবে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি, তা' পূর্ব্বেই বলেছি; কারণ, কোন কোন বুদ্ধিমান অভিনেতা তার শিক্ষার সাহায্য পেয়ে আপনাকে গ'ড়ে তুলেছে। আমার প্রথম গুরু হ'লেও আমি একথা বল্‌তে বাধ্য যে, অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষার চরম—বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত। গিরিশবাবুর শিক্ষা যদি ঠিক্ ঠিক্ কেউ বুঝ্‌তে পেরে থাকে, তা' হলে সে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তা' অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষার শেষ সীমার পর আরম্ভ; অর্থাৎ, 'এ্যাক্‌টিং'-এর কলেজ আরম্ভ হ'ল।" এই কথাগুলি বলে তিনি আবার আরম্ভ কর্‌লেন—"মাটিতে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে হাত তুল্লে যতদূর উঁচুতে ওঠে, অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সেই পর্য্যন্ত এবং তার ওপরে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার পাদপীঠ আরম্ভ—খালি গাধা পিঠে ঘোড়া করা নয়, সেই ঘোড়াকে 'ওয়েলার'-এ পরিণত করা। অমৃত মিত্র গিরিশচন্দ্রের শিষ্য, আবার মহেন্দ্রলালও গিরিশচন্দ্রের শিষ্য; দু'জনের শিক্ষা-দীক্ষার পরিমান বহু পৃথক হ'লেও দু'জনেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে যশস্বী অভিনেতা। যেখানে যেরূপ প্রতিভা বা যতটুকু শক্তির পরিচয় গিরিশবাবু পেতেন, সেখানে তার নিজের নিজস্বটাকে খুব বড় ক'রে দিয়ে তাকে গ'ড়ে তুল্‌তেন। কি ক'রে একজন অভিনেতা নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির জোরে এবং সেটাকে শানিয়ে নিয়ে বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, তাকে সেই পথটা দেখিয়ে দিতেন—গিরিশচন্দ্র নিজের বিরাট বৈশিষ্ট্যটা শিষ্যের ক্ষুদ্র আধারে ঢুকিয়ে তার সর্ব্বস্বটাকে নষ্ট করে দিতেন না। তাঁর শিক্ষার মাপকাঠি বহু রকমের ছিল। এক রকমের ছাঁচে তিনি সবাইকে ঢালাই কর্‌তেন না। তাঁর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল বা বহুমুখী প্রতিভার তিনি অধিকারী ছিলেন এবং সেই প্রতিভা কি নিজের অভিনয়ে, কি অভিনয়-শিক্ষায়, কি নাট্য-রচনায় নানা উদ্ভাবনী-শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছিল। তাঁর নিজের নাটক রচিত হ'ত তাঁর নিকট উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিয়ে—যখন যেরূপ কমবেশী প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁর দলে থাকৃত, তাদের নিয়ে তিনি এমন সব ভূমিকা দিয়ে নাটক রচনা করতেন এবং অভিনয় শেখাতেন যে, সর্ব্বত্র জয়-জয়কার ধ্বনি উঠত। পরের রচিত নাটকের অভিনয়ের সময়েও তিনি অভিনেতার শক্তি বুঝে ভূমিকা বিতরণ ক'রতেন এবং তিনি জান্‌তেন রামেরটা যদুকে দিলে হবে না এবং যদুরটা রামকে দিলেও চল্‌বে না। রাম, রাম হ'য়ে বেরুবে; যদু, যদু হ'য়ে বেরুবে। যাকে তাকে দিয়ে, যা' তার ধাতে সয় না, সেই রকম তাকে গ'ড়ে তুল্‌ব তা' তাঁর শিক্ষার পদ্ধতি ছিল না। এ থেকে তোমরা বুঝে নাও গিরিশচন্দ্রের 'স্কুল অফ্ এ্যাক্‌টিং' কি ছিল বা না ছিল।"

উপরোক্ত ঘটনাটি অমৃতবাবুর জীবনকালীন শ্রদ্ধেয় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নাট্য-মন্দির' নামক মাসিক-পত্রিকায় পাঠান হইয়াছিল এবং শুনিয়াছি যে, উহা

কম্পোজও হইয়াছিল, কিন্তু 'নাট্য-মন্দিরে'র ঐ সংখ্যা প্রকাশের সময় ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীর সহিত 'নাট্য-মন্দির' পরিচালকবর্গের বিবাদ হওয়ায় ঐ সংখ্যা আর প্রকাশিত হয় নাই এবং মণিবাবু তারপর কিছুদিনের জন্য বিদেশ যাওয়ার পরে ফিরিয়া আসিয়া যখন 'নাট্য-মন্দির' অন্য ছাপাখানা হইতে প্রকাশ করেন, তখন ঐ পাণ্ডুলিপি আর ফেরৎ পান নাই। আজ চব্বিশ বৎসর পরে উহা 'গল্প-লহরী'র লহরী হিসাবে যোগ করিয়া দেওয়া হইল।

'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত 'রঙ্গালয়' শব্দের লেখক ৺বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যে কিছু কিছু ভুল ও অতিরঞ্জিত বা বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, তাহা পরলোকগত নাট্যাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত 'রঙ্গালয়' শব্দ পাঠে গিরিশচন্দ্রের জীবনী-লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ করিয়া লিখিতে বলেন যে, 'ন্যাশানাল থিয়েটারে' (সান্যাল-বাড়ীতে) 'কৃষ্ণ-কুমারী' নাটকের অভিনয়-সংক্রান্ত, বিশেষতঃ, তাঁহার প্রধান ভূমিকা 'ভীমসিংহে'র অভিনয় উপলক্ষ্যে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানীর বংশধর রাজা চন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক গিরিশবাবুকে নিজের বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদে সাজাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিকৃত সংবাদটির প্রতিবাদ করা হউক। 'বিশ্বকোষে' লেখা আছে—"গিরিশবাবু প্রথম দিন 'ভীমসিংহ' অভিনয় করিয়াই বিনা কারণে দল ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই 'ভীমসিংহ' এবং তাঁহার নিজের অংশ 'ধনদাস' অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে এক ব্যক্তি দ্বারা যুগপৎ দুই বিরোধী রস—করুণ ও হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুকে উপহার দিয়াছিলেন।" এ সম্বন্ধে অমৃতবাবু বলেন—"রাজা চন্দ্রনাথ যদি অর্দ্ধেন্দুবাবুকে কিছু উপহার দিয়ে থাকেন, তা' লুকিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ, সে সময় সম্প্রদায় তা' জানতে পারলে সকলেই দল ছেড়ে দিতেন—তখন তাঁদের এতটা মনের তেজ ছিল। গিরিশবাবুকে নিজের গা থেকে পোষাক খুলে পরিয়ে দেওয়ায় সকলেই সম্মান বোধ ক'রেছিল মাত্র এবং সে পরিচ্ছদ থিয়েটারেরই হ'য়ে গিয়েছিল; গিরিশবাবু তা' নিজের বাটীতে নিয়ে যান নি। প্রথম রাত্রি মাত্র 'ভীমসিংহে'র ভূমিকা অভিনয় ক'রে গিরিশবাবুর চ'লে যাওয়ার সংবাদও অমূলক। মার্চ্চ মাসে থিয়েটার উঠে যায়, তিনি শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন।"

জানা গিয়াছে যে, সান্যাল-ভবনের 'ন্যাশান্যাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম অভিনয় ৮-ই মার্চ্চ, ১৮৭৩ সাল এবং ২২-এ মার্চ্চ শেষ অভিনয় করিয়া থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়—অর্থাৎ, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পর 'ন্যাশান্যাল থিয়েটারে'র অস্তিত্ব সান্যাল-ভবনে আর দুই সপ্তাহ মাত্র ছিল। 'বিশ্বকোষে' লেখা আছে—"বন্ধ হইবার কিছু পূর্ব্বে গিরিশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উপন্যাস হইতে নাট্য-গঠন এই প্রথম। ইহার অভিনয় হইয়াছিল।" ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাত্র চৌদ্দ দিনের মধ্যে গিরিশ-বাবু কবেই বা দলত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং কবেই বা পুনরায় দলে মিশিয়া নূতন নাটক অভিনয় বন্দোবস্ত করিলেন। এইরূপ গল্পের গল্প, অর্থাৎ বাজে গল্প 'বিশ্ব-কোষে'র 'রঙ্গালয়' শব্দে ইতিহাসের মত ঢুকিয়াছে। আমরা এখানে 'গল্প-লহরী'তে গাল-গল্পের প্রশ্রয় না দিয়া দু'-একটা বাস্তবের গল্প তাহার লহরীতে যোগ করিয়া দিলাম।

দুই

আর একটা বাস্তবের গল্প আরম্ভ করি—সেটিও গিরিশ-প্রসঙ্গ। সে আজ অনেকদিনের কথা—তখন 'ষ্টার থিয়েটারে' নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরলোক-গত প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'কামিনী ও কাঞ্চনে'র পূরাদমে মহলা দেওয়া হইতেছে। সেই বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তকুলাগ্রগণ্য স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠিত 'কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে' বাৎসরিক রামকৃষ্ণ-উৎসব মহা-সমারোহে চলিতেছে। বাগানের দক্ষিণ দিকে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর যে ছোট ঘরখানি আছে—যাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদরজঃ বিলেপনে এক সময়ে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল—তাহাতে নাট্যাচার্য্য অমৃত-

লাল তাম্রকূট সেবা এবং সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত কতকগুলি সমৎসুক ভক্তমণ্ডলীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র প্রসঙ্গে আলাপ করিতেছেন। সেই ঘরে রায়সাহেব হারাণচন্দ্রও উপস্থিত। কয়েকটা প্রসঙ্গের পর হারাণবাবু সসম্ভ্রমে অমৃতলালকে জানাইলেন যে, তাহার একটী অনুরোধ নাট্যাচার্য্যকে রাখিতে হইবে। অনুরোধটী এই—'ষ্টার থিয়েটারে' 'কামিনী ও কাঞ্চন' অভিনয়ের যে মহলা চলিতেছে, উহাতে 'রামপ্রসাদে'র ভূমিকা অমৃতলাল স্বয়ং গ্রহণ করুন। এই অনুরোধ শুনিবামাত্র, রসরাজ অমৃতলাল বীররসে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"হারাণবাবু, তুমি এরূপ অন্যায় অনুরোধ কিরূপে ক'র্‌লে? তুমি কি জান না যে, তোমার 'রামপ্রসাদে'র চরিত্র কোন্ পুরুষোত্তমের চরিত্রের ছায়া নিয়ে অঙ্কিত? যে লোকোত্তর মহাপুরুষের শ্রীচরণ-ছায়ার পবিত্র শীতলতায় ব'সে আমাদের ন্যায় তাপদগ্ধ বহু অপরাধী ব্যক্তি শান্তির পাবনী তৃপ্তির আস্বাদ পেয়ে নিজেদের জীবন শান্ত ও উন্নত ক'র্‌তে পেরেছ ব'লে গৌরবান্বিত বা ধন্য বিবেচনা করি, শ্রীদক্ষিণেশ্বরের সেই জীবন্ত ভগবৎ-বিগ্রহরূপী শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জগৎপাবন চরিত্র আমরা অভিনয় কর্‌ব? আমরা কি বালক যে, গোখ্‌রো সাপের সঙ্গে খেলা কর্‌ব? বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে আমরা সংসার করি; এরূপ অসম সাহস আমাদের কখনও কি হ'তে পারে? তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে মাত্র অসম্ভব নয়, অন্যায় বলে মনে করি।"

তখন হারাণবাবু বলিলেন—"মশায়, আপনি ত গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটকে 'নসীরামে'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন?"

তাহাতে বিস্মিত হইয়া অমৃতলাল বলিলেন—"বুঝেছি, তুমি কি সাহসে আমাকে ঐ অন্যায় অনুরোধ কর্‌ছিলে। কেন আমি 'নসীরামে'র ভূমিকা অভিনয় করেছিলাম তার বৃত্তান্তটা তোমায় বলি। 'নসীরামে'র লেখক গিরিশচন্দ্র। তোমরা সকলে তাঁকে জান তিনি মহাকবি, নাট্যকার এবং নটগুরু ও নাট্যাচার্য্য। কিন্তু আমরা তাঁকে এ ছাড়া আর একটা পরিচয়ে জানি এবং পরিচয়টা তোমাদের উক্ত পরিচয় সকলের অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নয় বরং তার চেয়ে অনেক বড়ও বলা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত ভক্ত-ভৈরব। জগতের আদি কবি—শ্রীভগবানের পার্ষদ, সহচর, শিষ্য ও প্রিয়তম সন্তান। গিরিশবাবু আমাদের নিকট মাত্র সহচর, সাথী, মিত্র ও নটগুরু নন্—আমরা ধর্ম্ম-জীবনে যদি কিছু-মাত্রও অগ্রসর হয়ে থাকি ত সেটা তাঁরই কৃপায়—সেখানেও তিনি আমাদের গুরু ও শান্তিদাতা। তাঁকে আমি বলি যে, 'মশায়, আমি 'নসীরামে'র ভূমিকা অভিনয় কর্‌তে পার্‌ব না, এরূপ সাহস আমার নাই।' তোমাকে আজ যেরূপ বল্‌ছি তাঁকেও সেইরূপ ব'লেছিলাম। কিন্তু তিনি দম্‌বার পাত্র নন্—শ্রীভগবান-পরিচালিত পুরুষ-সিংহ। তিনি বল্লেন—'অমৃত, তোমাকে 'নসীরাম' সাজ্‌তেই হবে, আমার আদেশ।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে টেনে পিঠে দুটো চড়রূপ সস্নেহ আশীর্ব্বাদ দিয়ে বল্লেন—'অমৃত, তুমি না ঠাকুরের আশ্রিত, তুমি না তাঁর পবিত্র সঙ্গে থাক্‌বার সুযোগ পেয়ে আপনার জীবনকে ধন্য করেছ? ভয় কি? আমি বল্‌ছি, তোমাকে 'নসীরামে'র ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করতেই হবে।' হারাণবাবু, তুমি কি আজ আমাকে সেরূপ সাহস দিতে পার্‌বে? তুমি কি গিরিশচন্দ্র যেমন ক'রেছিলেন, পবিত্র স্পর্শ দিয়ে আমার শিরায় শিরায় সে অদ্ভুত স্পন্দন, আধ্যাত্মিক স্পন্দন তুল্‌তে পার্‌বে—যে শক্তি পেয়ে আমি তোমার নাটকের 'রামপ্রসাদে'র ভূমিকা অভিনয় কর্‌তে ছুট্‌ব?" আর একটি কথাও তিনি ঐ সঙ্গেই ব'লেছিলেন—"এবং এটাও শুনে রাখ ও বিশ্বাস কর—আমি মাত্র একদিন 'নসীরামে'র ভূমিকা ঠিক্ ঠিক্ অভিনয় কর্‌তে পেরেছিলাম। সে-দিন তন্ময় হ'য়ে নিজেকে ভুলে গিয়ে যেন সত্যিকারের 'নসীরাম' হ'য়ে-ছিলাম—এবং আমার ডান হাতটা আপনা-আপনি ওপরে উঠে গিয়ে ঐশী সন্ধান দিয়েছিল।"

হারাণচন্দ্র আর বাক্যালাপ করিতে সাহসী হইলেন না। আমরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেখানে এই সকল অমৃতময় সংবাদ শুনিয়া ধন্য হইয়াছি। তাই গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের কি সম্পর্ক জানিতে হইলে পড়িতে হয়,—গিরিশচন্দ্রের তিরোভাবে অমৃতলালের স্মৃতি-তর্পণ—

"সাথী, মিত্র, গুরু তুমি,
প্রণমি লুটায়ে ভূমি,
চিরশিষ্য-তরে স্থান রাখিও চরণে;
(আছে) থাকিবে গিরিশ নাম জাতির স্মরণে।"

অন্যত্র (অমৃতলাল-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা' হইতে)—

"হে গিরিশ, ভক্তবীর, চরণে লুটায়ে শির
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্ঘ্য করিছে প্রদান।
নাট্য-রবি কবি-বিশ্বে, স্নেহের অনুজ শিষ্যে
রামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে দেওয়াইলে স্থান॥"

* * *

"স্মরি গুরু গিরিশের পদ-অরবিন্দ।
সভায় অমৃত গাঁথে এ গীত-গোবিন্দ॥"

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

পারাপার

শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবী

"তুমি কি শেফালি, মানুষের রক্ত কি একটুও তোমার গায়ে নেই ?"

শেফালী হাসিয়া বলিল, "কেন বলো ত, হয়েছে কি ?"

অনিমেষ রাগিল। বলিল, "আর হবে কি, লোকে এত বড় অপবাদ তোমায় দেবে, আর তুমি তাই হাসিমুখে সহ্য করে যাবে—কেন, কি জন্যে ?"

শেফালী বলিল, "ওটা কি জানো, গণ্ডারের গা কি না, সহ্য হয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে সৎমার সংসারে পড়ে হয়রান ত কম হই নি। তখন যেমন সহ্য করা ছাড়া গতি ছিল না, তার তুলনায় এ ত অতি তুচ্ছ।"

অনিমেষ কিন্তু অত সহজে তৃপ্ত হইতে পারিল না। বলিল, "সবাই তোমায় চোর বল্বে, তবু তুমি রাগ করবে না ? আশ্চর্য্য ধৈর্য্য বটে, মানতে হবে।"

শেফালী ধীরকণ্ঠে বলিল, "খায় সবাই ; কারণ, জীবন ধারণ করার জন্যে ওটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সে খাওয়াটা পরের হাত তোলার ওপর নির্ভর করতেই হবে, এর মানে আমি খুব বড় করে ধরি না—তা' ছাড়া, তোমার আনা জিনিষ ত ?"

অনিমেষ চুপ করিয়া খানিক শেফালীর দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ চঞ্চল হইয়া বলিল, "কিন্তু যা' তুমি কর নি, করতে পার না—লোকের সে কথার প্রতিবাদ তোমায় করতেই হবে। যদি না কর—"

শেফালী হাসিয়া বলিল, "বলো যদি না করি, তবে ?"

অনিমেষ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি করব ; কারণ, মিথ্যা যা' তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়।"

শেফালী ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু সে মিথ্যায় যদি অন্যে প্রতিষ্ঠা পায়, তা'তে আমার কি এমন এল গেল। না, ও সবে তুমি থেকো না। জানো, আমি বড় কষ্ট পাব।"

অনিমেষ অধীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমি যে জানি এ কাজ কে করেছে। জেনে-শুনে পরের পাঁক তোমার গায়ে জোর করে লেপে দেবে, আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ব—না, শেফালী, এত বড় পাগল আমি নই।"

শেফালী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমার অনুরোধ তুমি আমার মুখ চেয়ে চেপে যাও।"

"মানে এভাবে আত্ম-প্রবঞ্চনার মানে ত আমি বুঝ্‌তে পারলুম না।

শেফালী হাসিয়া বলিল, "কাজ কি ; কেবল ভাব—এটা তোমার শেফার অনুরোধ। হ্যাঁ গা, পার্‌বে না ?"

দুই

"হ্যাঁ গা, তোমার দাদার পায়ের ধূলো নিয়েছো ?"

অনিমেষ মাথা নাড়া দিয়া কেবল ছোট একটা উত্তর দিল, "না।"

শেফালী ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, "সে কি গো, আগে ঘর, তবে ত পর !"

অনিমেষ বলিল, "গিয়েছিলুম ত, জবাব এলো, আত্মীয়ের পায়ের ধূলোয় হয় না। তা' ছাড়া, তাদের হিংসের আগুন জ্বলে উঠেছে শেফা ! বংশের প্রথম সন্তান দাদার না হ'য়ে আমাদের হ'ল—এটা ওদের পক্ষ্যে নেহাৎ অসহ্য।"

শেফালী মুখে কিছু বলিতে পারিল না ; কেবল ব্যাকুল-চক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে সভয়ে পুত্রটীকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

অনিমেষ বলিতে লাগিল, "গেছ্‌লুম গোকুল দা'র বাড়ী—কি আনন্দ তাঁর তা' মুখে বল্‌তে পার্‌ব না শেফা ! এই বয়সে কোমরে হাত রেখে তিনি খেমটা নাচ নেচে নিলেন। শেষে বৌদি'কে ধরে টানাটানি। বল্লেন, 'তুমিও নাচবে এস গিন্নী ! অনির ছেলে হয়েছে, এ যে তোমার আমার কত বড় আনন্দের কথা, কথার চেয়ে কাজে তা' দেখিয়ে দাও !"

শেফালী বলিল, "ও মা, তাই না কি !"

অনিমেষ বলিল, "শুধু তাই না কি নয়, বৌদি পার-পেয়েছেন স্বীকার পেয়ে—খোকাকে কোলে নিয়ে একবার পেশোয়ারী নাচ নেচে নেবেন। তবে অব্যাহতি, নইলে—"

দ্বারে করাঘাত হইল। অনিমেষ কথা বন্ধ রাখিয়া বলিল, "কে ?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "খুলে দে ভাই। গিন্নীকে ধরে এনেছি—এ জিনিষ বাসি হ'লে মজা হবে না।"

শেফালী গায়ের কাপড় সাম্‌লাইয়া বসিল। গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে দয়াল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "এ কি আজকের দিনে ঘর ফাঁকা। তোর দাদা, বৌদি', নেত্য, কেউ আসে নি ?"

জবাব দিবার কিছুই ছিল না, কাজেই স্বামী স্ত্রী দু'জনে চুপ করিয়া রহিল।

বৌদি' লতিকা সে গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, "ও সব তুমি বুঝ্‌বে না, সবার সব জিনিষ সহ্য হয় না।"

শেফালী ধীরকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ দিদি, এতে খোকার কোনো অকল্যাণ—"

বৌদি' ঝাঁজিয়া বলিলেন, "কি কথা যে তুলিস

ধাপ নেবে আসতে হয়েছে তা' বোধ হয় তুমি বুঝতে পার নি। কিন্তু আমি বুঝলুম সেদিন, যেদিন জিতেন-বাবু আমাদের সাক্ষী রেখে তোমাকে তিরস্কার করে-ছিলেন, পতিতার সঙ্গে মিশে নিজের মর্য্যাদা হানি করেছ বলে। আমি জানি, তুমি আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান-সম্পন্না মেয়ে। মাথা উঁচু করে চলাই তোমার মজ্জাগত সংস্কার। সেই তোমাকে আমার জন্য নিকট আত্মীয়ের কাছে খেলো হতে হলো, অপমানিত হতে হলো। এই দুর্ঘটনা আমাকে অত্যন্ত আঘাত করেছে—কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। জানি না ভগবানের চরণে আমার মত পাপিষ্ঠার প্রার্থনা পৌঁছবে কি না, যদি পৌঁছয় ত এই প্রার্থনা তাঁকে জানাচ্ছি যে, আমার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমার সকল কালিমা দূর হয়ে যায়। স্বামী নিয়ে সম্মানে শান্তিতে গৌরবে যেন তোমার দিন কাটে। আমার মত আবার কোন রাক্ষসী যেন তোমার জীবন-আকাশে ধূমকেতুর মত উদয় না হয়। আবোল-তাবোল অনেক কথাই বলে গেলুম, নিজের গুণে ক্ষমা করো। ইতি,

সরস্বতী

পত্র পাঠান্তে চারুশীলা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। একটির পর একটি করিয়া অনেক কথাই মনে পড়িল। যখন চমক ভাঙ্গিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন অনুভব করিল অজানিতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে।

উনিশ

সেইদিন ভোর রাত্রে নলিনীর মাতার ভেদবমি আরম্ভ হইল। তখন চারিদিকে কলেরা দেখা দিয়াছে। ভীতা চারুশীলা যখন প্রতিবেশীর দ্বারা ডাক্তার ডাকিবার ব্যবস্থা করিল, তখন সমীরের ভেদবমি আরম্ভ হইয়াছে। চারু-শীলার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন—'মেরী' অফিসে খবর দাও। 'মেরী' হইতে সাহেব ডাক্তার আসিয়া সর্ব্বপ্রথম চারুশীলাকে কলেরার ইন্‌জেকসান দিয়া দিল। তাহাতে চারুশীলা রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ডাক্তারদিগের শত চেষ্টা বিফল করিয়া নলিনীর মাতা এবং সমীর দুই ঘণ্টার আড়াআড়ি মারা গেল। ভগবান চারুশীলার আকুল প্রার্থনা রাখিতে পারিলেন না।

চারুশীলা লুটাইয়া পড়িল। চেঁচাইল না, কোন-প্রকার মাতামাতি করিল না, কেবল এককোণে মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাপড়ে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে উঠিতে হয়, কাজে হাত দিতে হয়, খাইতেও হয়। দুনিয়ার ইহাই নিয়ম। শোক যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে সৃষ্টি মুছিয়া যাইত।

কিন্তু চারুশীলা দিবারাত্র নিজেকে ধিক্কার দিত। মৃত পুত্রের অভিমানভরা কথাগুলি সর্ব্বদা কানে বাজিত—"মা, তুমি আর আমায় ভালবাস না, খালি বই লেখো।"

তবে কি সত্যই তাহার অযত্ন দেখিয়া ভগবান তাহাকে কাড়িয়া লইলেন। সন্তানের উপর কি সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। কেন এমন করিল! সন্তান সেবার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া কি সে হেনা, বেলা, সুষমার মত যশ মান অর্থের কাঙ্গাল হইয়াছিল। কিন্তু অন্তর্যামী তুমি ত জান সে তাহা করে নাই। কেবলমাত্র এই নীরব ঘৃণ্য অবহেলিত জীবন হইতে উদ্ধার পাইতে চাহিয়াছিল।

চারুশীলা হাহাকার করিয়া উঠে। নিজেকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারে না।

পান্নুর মা রাধার শ্বশুরকে খবর দিয়া চারুশীলার নিকটে রহিলেন। তিনদিনের দিন রাধা স্বামীসহ আসিয়া পৌঁছাইল। এক মাস থাকিয়া মাকে কতকটা সুস্থ করিয়া রাধা পুনরায় যখন শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া গেল, তাহার দিন দশেক পূর্ব্ব হইতে সতীশ নিত্য রাত্রে বাড়ী আসিয়া শুইতেছিল। কাজেই রাধা এই ভাবিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল যে, এবার হয় ত পিতা গৃহবাসী হইলেন।

সতীশ রোজ রাত্রে আসে এবং সকালে উঠিয়াই দোকানে চলিয়া যায়। চারুশীলা দেখিল তাহার এই রাত্রে বাড়ী আসার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইতেছে না। গতকল্য

রাধা চলিয়া গিয়াছে। এতবড় বাড়ী ফাঁকা নিস্তব্ধ। রোয়াকে থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া চারুশীলা আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। ক্রমে তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সতীশ কিন্তু আজ বাহিরে যায় নাই। নিঃশব্দ পদে আসিয়া কহিল—"আর কত কাঁদবে শীলা? উপায় কি আছে কিছু?"

চারুশীলা চমকিয়া চোখ মেলিল এবং তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া ফেলিল। সতীশ তাহার পাশে বসিল। বসিয়া স্ত্রীর রুক্ষ চুলগুলি হাত বুলাইয়া গুছাইতে গুছাইতে কহিল—"কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে কি? কি চেহারা করেছ বল দেখি! আর এমন করো না, ওঠো, কাজ-কর্ম্মে মন দাও, মন ঠাণ্ডা হবে।"

বহুদিন পরে স্বামীর এই আদর। কিন্তু চারুশীলার বিরূপ চিত্ত ইহা ভোগ করিতে চাহিল না। তাহার শোকাহত কোমল মন মুহূর্ত্তে কঠোর হইয়া বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল—আমি কাঁদি নি, আমার জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।".

কুড়ি

চারুশীলা চোখমুখ ধুইতে কলতলায় গেল; সতীশ বাহিরে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারুশীলা ফিরিয়া আসিলে কহিল—"আজ থেকে আমি খাব, আমার জন্যে রান্না কর। এখন একটু চা করে দেবে?"

—"দিই" বলিয়া চারুশীলা রান্নাঘরে গিয়া ঘুঁটে ধরাইল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে এক পেয়ালা চা করিয়া স্বামীর দিকে আগাইয়া দিল।

—"তুমি খাবে না?"

—"না, আমার কাপড়চোপড় কাচা হয় নি, পরে খাব।"

সতীশ চা খাইয়া দোকানে গেল এবং এগারটা না বাজিতেই বাড়ী ফিরিল। দেখিল, তখনও রান্না শেষ হয় নাই। সে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল এবং যতটা পারে সাহায্য করিতে চাহিল। চারুশীলা ইহাতে সম্মতিও দিল না এবং অধিক বাক্যালাপের অনিচ্ছায় আপত্তিও করিল না।

আহারান্তে আঁচাইয়া আসিয়া সতীশ কহিল—"পান আছে?"

—"না। ও ঘরে সুপুরী মশলা দিয়ে এসেছি।"

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া সতীশের নজরে পড়িল চারুশীলা ভিন্ন থালায় ভাত বাড়িতেছে। কহিল—"আমার ওপর তোমার এত বিতৃষ্ণা যে, পাতেও আর খাও না?"

চারুশীলা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। জবাব দিল না।

রাত্রে যখন সতীশ বাড়ী ফিরিল, তখন রাত বারটা। সমস্ত পাড়াটাই তখন নিস্তব্ধ। এক ডাকেই চারুশীলা দরজা খুলিয়া দিল। সতীশ কহিল—"তুমি জেগে রয়েছ? কষ্ট দিলুম ত খুব। কি করব সমানে খদ্দের আসছিল বলে এতক্ষণ দোকান বন্ধ করতে পারি নি।"

শান্তস্বরে চারুশীলা কহিল—"ব্যস্ত হচ্ছ কেন, তোমার জন্যে ত জেগে থাকি নি, এমনিই আমার ঘুম আসে নি, তাই। ঘরের মেঝেয় খাবার ঢাকা আছে, খেতে বসো।"

সতীশ খাইতে বসিলে দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া চারুশীলা কহিল—"তুমি তা' হলে খাও, আমি শুই গে।"

—"তুমি খাবে না?"

—"আমি খেয়েছি।"

—"হ্যাঁ, মিছে কথা, কখ্খোন খাও নি।"

—"মিছে তামাসা করব কেন? আমি খেয়েছি।"

বিস্মিত সতীশ চুপ করিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। চারুশীলা তাহার আগে খাইয়াছে ইহা তাহার জীবনে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। অথচ সে এমন স্বরে কথা কহিয়াছে যে, অবিশ্বাস করিবার যো নাই। তবে কি ইহাও দিনের বেলা পাতে না খাওয়ার মত ঘৃণা ও অবহেলার আর একটি নিদর্শন। না জানি সে চিত্তকে কতখানি কঠোর করিয়া তাহার দীর্ঘদিনের অনাচারের প্রতিশোধ দিতে চাহে। মনে পড়িল বহুদিন পূর্ব্বে একবার চারুশীলার খুব অসুখ করে। অসুখ ভাল হইলে চারুশীলা যেদিন প্রথম পথ্য করে, সেদিন নিজেকেই রাঁধিতে হয়। সতীশ অনেক

করিয়া বলিয়া গিয়াছিল যেন সে রান্না শেষ হইলেই দু'টি খাইয়া লয়; কারণ, রোগা শরীর বেলায় খাইলে হজম হইবে না। কিন্তু বেলা একটার সময় বাড়ী আসিয়া সতীশ প্রশ্ন করিয়া জানিল চারুশীলা তখনও খায় নাই।

—"কেন খাও নি, কিসের জন্যে শুকিয়ে বসে আছো?"

—"বারে,নিজে রেঁধে-বেড়ে আগে খাওয়া যায় বুঝি?"

ফলে সতীশ এমন রাগ করিল যে, সমস্ত দিন দুইজনের খাওয়াই হইল না।

স্বামীর নির্নিমেষ চাহনিতে চারুশীলা অস্বস্তি বোধ করিল। চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া কহিল—"বসে আছ কেন, খাও।"

—"খাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

—"ও ঘরে শুতে।"

—"এতদিন রাধা ছিল, আজ একলা শুতে পারবে?"

—"খুব পারব।"

চারুশীলা চলিয়া গেল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে আহার্য্যের সম্মুখে বসিয়া সতীশ বারবার একই কথা চিন্তা করিতে লাগিল—কতদিনে, কেমন করিয়া এই বিমুখ চিত্তকে বশ করিতে পারিবে।

একুশ

দিনের পর দিন যায়, কতদিন আর এরূপে কাটিবে। সতীশের অপরাধী মন ক্ষমা পাইতে ব্যাকুল, আর ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারে না—কিন্তু ক্ষমা চাহিবে যাহার কাছে সে কবে যে এতখানি নাগালের বাইরে চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

চারুশীলা নিজের চারিদিকে একটি গাম্ভীর্য্যের দুর্গ রচনা করিয়া লইয়াছে। যতক্ষণ সতীশ বাহিরে থাকে, ততক্ষণ সে প্রতিবেশীর বাড়ী বেড়াইয়া কাটায়। একলা এতবড় বাড়ীতে টিঁকিতে পারে না। পাঁচজনের সহিত আজেবাজে কথা কহিয়া শোককে ভুলিতে চাহে, মনকে অন্যমনস্ক করিতে চাহে, আর স্বামী বাড়ী থাকিলে সে গৃহের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কাজে এত বেশী নিমগ্ন হইয়া পড়ে যে, সতীশ কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় না।

আশ্চর্য্য! স্বামী স্ত্রী, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক, তাহাতেই আজ আকাশ পাতাল ব্যবধান! যে মিলন যত মধুর, তাহার বিচ্ছেদে ততখানি বেদনা। সতীশ স্পষ্ট বুঝিল, সে শাদা চোখে সঙ্কোচ কাটাইতে পারিবে না, বেপরোয়া হইতে হইলে একটু নেশার প্রয়োজন।

সেদিন রাত বারটায় দরজা খুলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই সতীশ চারুশীলার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"যেয়ো না, কথা আছে।"

ফিরিয়া দাঁড়াইতেই চারুশীলা বুঝিল, সতীশ আজ আবার মদ খাইয়াছে।

দরজায় হুড়কা লাগাইয়া সতীশ স্ত্রীকে ধরিয়া আনিয়া যে ঘরে চারুশীলা শয়ন করিত সেই ঘরে তক্তাপোষের উপর বসাইল, নিজে পাশে বসিয়া কহিল—"তুমি আমাকে মাপ করবে কি না বলো, এমন করে আমি আর দিন কাটাতে পারছি না।"

চারুশীলা নিরুত্তরে জানালার বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

সতীশ অধীরভাবে তাহার হাত নাড়িয়া দিয়া কহিল—"বলো শিলু, বলো, যা' হয়ে গেছে তা' কি ভুলবে না? আগের দিন কি আর ফিরে পাব না?"

চারুশীলা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ঠোঁটের কোণ ঈষৎ বাঁকাইয়া বিদ্রূপের সুরে কহিল—"এবার নিয়ে ঠিক্ কবার হলো?"

—"হ্যাঁ, আমি জানি, ভাল হতে আমি অনেকবার চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি। কিন্তু এও ঠিক, তুমি যদি আমাকে আলগা না দিতে, অবহেলা না করতে, তা' হলে আমার সাধ্য হতো না বারবার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে। চুপ করে রইলে কেন? কথা কও। তোমার এই নীরব তাচ্ছিল্য আমি সইতে পারি না। তুমি ঝগড়াও করতে পার না কি? তা' হলেও বুঝি যে আশা আছে, আবার তোমায় আগের মত ফিরে পাব।" বলিতে বলিতে সতীশ হাঁটু গাড়িয়া চারুশীলার পায়ের কাছে বসিল। তাহার পায়ে হাত রাখিয়া কহিল—"মনকে নরম করতে কি পারবে না? ক্ষমা করে কাছে টেনে নেবে না? যতই

দোষ করি আমি, এতখানি পর তুমি কি করে করলে আমায়। আমি বেশ বুঝছি এ তোমার অভিমান নয়, তুমি মনকে পাষাণে পরিণত করেছ!"

দিনের গুমোট গরমে চুল খুলিতে না পারায় চুল ভিজা ছিল, রাত্রের হাওয়ায় তাহা শুকাইবে বলিয়া চারুশীলা আঁচড়াইয়া এলাইয়া দিয়াছিল। একগোছা চুল সামনে আসিয়া পড়ায় সতীশ চারুশীলার মুখ দেখিতে পাইতেছিল না, কিন্তু চারুশীলা স্পষ্ট অনুভব করিল স্বামীর কামনাভরা সপ্রেম তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ, এবং তাঁহার সঘন নিশ্বাসে তাহার চুল দুলিতেছে। চারুশীলার সর্ব্বাঙ্গ কঁপিয়া উঠিল। তার স্ত্রী-অন্তর পরাভব মানিল। মূঢ় সতীশ যদি সেই সময় স্ত্রীর চক্ষুতে চক্ষু মিলিত করিত! কিন্তু হায়, সে অত বুঝিল না, হেলায় সুযোগ হারাইল!

বাইশ

মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত মাত্র! নিমেষে চারুশীলা নিজের চিত্ত জয় করিল। দ্রুত উঠিয়া পড়িয়া কহিল—"তুমি ত বল্‌লে অনেক কথা, এর উত্তর দিতে গেলে হয় ঝগড়া—কিন্তু ঝগড়া করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই, আর শরীরও আমার ক্লান্ত, ঠাণ্ডা মেজাজে গুছিয়ে কথা বল্‌তে পারছি না। কাল রাত্রে এর জবাব দেব। ও ঘরে খাবার ঢাকা আছে, খাও গে।"

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আচ্ছা, যদি বিরক্ত হও, আজ আর জ্বালাতন করব না। কাল তোমার যা' বলবার বলো, তারপর বোঝাপড়া হবে।"

পরদিন রাত নয়টা।

সতীশ অনেকখানি আশা বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। চারুশীলা দরজা খুলিয়া দিয়া দুইখানি পত্র তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

—"এ কি, তুমি কপাট বন্ধ করে দিলে যে!"

রুদ্ধ দ্বারের ভিতর হইতে জবাব আসিল—"তোমার ঘরে খাবার ঢাকা আছে খাও গে, তারপর চিঠি দু'খানা পড়ে দেখো।"

কিন্তু সতীশের খাওয়া হইল না। শুধু সেই রাত্রি নহে, তাহার পর অনেকগুলা দিন-রাত্রিই তাহার আহার হইল না। অত্যন্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে আহারের সম্মুখের হ্যারিকেনের আলোয় পড়িতে আরম্ভ করিল—

"তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সব কথা গুছিয়ে বল্‌বার মত সাহস সঞ্চয় করতে কিছুতেই পারলুম না। দু'দিন আগে হলে পারতুম। কিন্তু দু' দিন যাবৎ তোমার যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি, তাতে মনে হচ্ছে আমার এই ইচ্ছাকে তুমি বাধা দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যে, আমি যা' স্থির করে ফেলেছি তাতে কোন বাধা-বিপত্তিই মানব না। আমি অনেক ভেবে দেখলুম—এই রাস্তা ছাড়া আমার শান্তি পাবার উপায় নেই। ধর্ম্ম সাক্ষী করে তুমি আমার যে ভার নিয়েছিলে, তাতে অনেক অবহেলা করেছ; সেই নির্ম্মম উপেক্ষা যদি আমি চিরকাল সহ্য করতে না পারি, তাতে আমার কোন অধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যহানিও হবে না। তাই এই সকল ভেবে আমি তোমাকে কিছু না জানিয়েই নিজের ব্যবস্থা ঠিক্ করে ফেলেছি। সেটা কি, তা' অপর পত্রে জানতে পারবে।"

সতীশ দ্বিতীয় পত্র খুলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতে লাগিল—

"স্নেহের চারু,

তোমার পত্র পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত, তেমনি মর্ম্মাহত হলাম। ভগবান তোমায় শান্তি দিন। বহুদিন পরে তুমি যে তোমার বিনয় দা'কে আপন বলে স্মরণ করেছ, তাতে অপার আনন্দ লাভ করলাম। যদিও আমি তোমার সহোদর নই, তথাপি আমি ও তোমার বৌদি' তোমাকে মায়ের পেটের বোনের মতই ভেবে থাকি। সেই তুমি আমাদের নিকট আস্‌তে চাও এতে আপত্তি কি থাক্‌তে পারে। তোমার পত্রের স্থূলমর্ম্ম—তুমি এখানে আমাদের নিকট থেকে এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে একটি চাকরী

পেতে চাও, জীবনটা শান্তিতে কাটাতে চাও। তোমার পত্র অতি সুসময়েই এসে পড়েছে। ঠিক্ এই সময় স্কুলটির জন্য দু'জন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক হয়েছে। আমার চেষ্টায় তোমাকে নেওয়া হবে ঠিক্ জেনো। কাকাবাবু চিরকাল বিদেশে কাটিয়ে শেষে কেন যে দেশে গিয়ে একটা অপদার্থের হাতে তোমায় তুলে দিয়ে গেলেন তা' বুঝি না। এতটা স্বদেশ-প্রীতি তাঁর না দেখালেই ভাল হতো। আমার মনে হয় বাঙ্গলার বাইরে শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙ্গালীর চিত্ত উদার এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি সদা জাগ্রত, নারীর সম্মান তারা খুব বেশী রকম রাখতে জানে। যাক, যা' হবার হয়ে গেছে। আশা করি আমাদের এখানে এসে তুমি ভগ্নমনে শান্তি পাবে এবং নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করবে। সামনের রবিবারে গিয়ে তোমায় নিয়ে আস্‌ব, প্রস্তুত থেকো। আমাদের আশীর্ব্বাদ জান্‌বে এবং ছেলে-মেয়েদের প্রণাম জান্‌বে।

আঃ—বিনয় দা'

তেইশ

সতীশ কিছুক্ষণ অসীম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সেই চারুশীলা! যে আজ কত বছর ধরিয়া শত লাঞ্ছনাতেও কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই! সেই আজ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে সিংহিনীর তেজে!

কিন্তু যতখানি তেজ দেখাইতে চাহিয়াছে, ঠিক্ ততখানি শক্তি খুঁজিয়া পায় নাই—হাঁ্যা, শীলা ততখানি শক্তি খুঁজিয়া পায় নাই। তাহার সাক্ষী তাহার চিঠি—"তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা গুছিয়ে বলবার মত সাহস সঞ্চয় করতে কিছুতেই পারলুম না।" শীলা বোঝে, অন্তরে নিশ্চয়ই অনুভব করে যে, তাহার সবল বাহু বেষ্টনে সে সকল কথার 'খেই' হারাইয়া ফেলিবে।

ভুল—মস্তবড় ভুল সে কল্য করিয়াছে। সামান্য আপত্তি মাত্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই সেই সময় সে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারিত—তাহা হইলে আজ তাহার হাতে এই চিঠি দুইখানি তুলিয়া দিবার মত শক্তি শীলা সমস্ত অন্তঃকরণেও খুঁজিয়া পাইত না। সে জয় করিবে। হাঁ্যা, দেখিবে পৌরুষের কাছে নারী-প্রাণ নত হয় কি না!

সতীশের আহার পড়িয়া রহিল। সে স্ত্রীর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কহিল—"শুন্‌ছ, কপাট খোল, আমায় বোঝাপড়া করতে দাও।"

চারুশীলা দরজা খুলিল না। ভিতর হইতে কহিল—"বোঝাপড়া করবার আর কিছু নেই, আমার যা' বলবার তা' চিঠিতে জানিয়েছি। সে মত আমার বদ্‌লাবে না।"

—"আচ্ছা তুমি দোর খোল ত, তারপর দেখি মত বদ্‌লায় কি না! তোমার অভিমানটাই যে বজায় রাখ্‌তে হবে তার কোন মানে নেই।"

—"অভিমান আমি করি নি, খুব মাথা ঠাণ্ডা করেই ব্যবস্থা করেছি।"

—"নিশ্চয়ই অভিমান করেছ—করেছ, করেছ, করেছ!"

—"অত অহঙ্কারকে মনে স্থান দিও না, তোমার ওপর আমি অভিমান করব এমন লোভনীয় বস্তু তুমি আমার কাছে নও।"

—"তোমারও অহঙ্কার ত কম নয়! আগে ত এত ঘেন্না করতে না। জিতেনের সঙ্গে বুঝি আমার তুলনা করে আফ্‌শোষ হচ্ছে। বেশ মাসের পর মাস মাসহারার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, স্বাধীনতার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, তাই আমি হয়ে গেছি তুচ্ছ, হীন, না? কিন্তু এত আশা তোমার ভাল নয়, এ আশায় ছাই পড়বে নিশ্চয়ই।"

—"ভুল করছ, জিতেন আমায় স্বাধীনতার রাস্তা দেখিয়ে দেয় নি, যদি কেউ আমার এ পথে পা বাড়াবার জন্যে দায়ী হয় সে তুমি, তোমার দুর্ব্যবহার। মিছিমিছি অপরের নাম জড়িয়ে কেলেঙ্কারী করো না।"

—"আচ্ছা, কেলেঙ্কারী কিছু করতে চাই না, তুমি দরজা খোলো। যদি না খোলো, সমস্ত রাত আমি এই চৌকাঠে মাথা দিয়ে পড়ে থাকব। ঝড় উঠেছে, বৃষ্টিও পড়তে আরম্ভ হয়েছে—এখনও খুলবে ত খোল, না হলে সমস্তক্ষণ আমি এই বৃষ্টিতে ভিজব জেনে রেখো।"

সতীশের ক্রোধ, দুর্ব্বাক্য, অনুনয়-বিনয় সমস্তই নিষ্ফল হইল, রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল না। চারুশীলা অবশেষে নিরুত্তর রহিল।

বৈশাখের শেষ। বৃষ্টিসহ কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব লীলা সুরু হইল। বহুক্ষণ বাহির হইতে আর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া চারুশীলা নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিল। ঘুম ভাঙ্গিলে অনুভবে বুঝিল প্রকৃতি শান্ত হইয়াছে। বাহিরের দিকের জানালা খুলিতেই পাখীর সুমিষ্ট গানের সহিত জলে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস তাহার দেহ মন স্নিগ্ধ করিয়া দিল। হ্যাঁ, ভোর হইয়াছে। অন্ততঃ আজিকার মত সে নিরাপদ।

দরজা খুলিয়া বাহিরে পা বাড়াইতেই চারুশীলা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

দ্বারের পাশে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সতীশ বসিয়া আছে নিস্পন্দভাবে, বোধ করি বা অচেতন। উপন্যাসের ঘটনা বুঝি বা কখনও কখনও বাস্তবরূপে দেখা দেয়।

চারুশীলা ভাবিয়া বিহ্বল হইল—তাহার মত অভাগীর জন্য এই ভালবাসা, এত প্রেম এতদিন কোথায় লুকান ছিল! যাহার জন্য এই দারুণ ঝড় জল উপেক্ষা করিয়া দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন!

চব্বিশ

চারুশীলা যে হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিয়াছিল, তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া গলিয়া পড়িল।

যে সস্নেহে দুই হাতে স্বামীর দুই বাহু ধরিয়া টানিয়া কহিল—"ওঠো, ওঠো! এ কি পাগলামী করেছ বলো দেখি! সমস্ত রাত এই ঝড় জলে ভিজে নেয়ে বসে আছ! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একবারে গেছে না কি!"

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতস্বরে সতীশ কহিল—"আমি ঘরে যাব কি করে শিল, আমার পা কাঁপ্‌ছে।"

—"পা কাঁপ্‌ছে! কেন? দেখি। হ্যাঁ, এই ত, যা' ভেবেছি, তাই! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে! কি গেরোয় আমায় ফেল্লে বলো দেখি! সাধ করে রোগ ডেকে আন্‌লে। চলো, আমার কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে কাপড়-জামা ছেড়ে শুয়ে পড়বে।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া গামছাদ্বারা উত্তমরূপে গা ও মাথা মুছাইয়া চারুশীলা স্বামীকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া সযত্নে একখানি চাদর ঢাকা দিয়া দিল।—"চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি আদা দিয়ে চা করে আনি।"

দু'-একটা অত্যাবশ্যকীয় কাজ সারিয়া কাপড় কাচিয়া আধঘণ্টা বাদে চারুশীলা যখন চা করিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন দেখিল জ্বরের প্রকোপ অধিক হওয়ায় সতীশ অঘোরে পড়িয়া রহিয়াছে।

অতিকষ্টে মাথা তুলিয়া ধরিয়া চারুশীলা কহিল—"চা-টা খাও, আস্তে আস্তে।"

দু'-চার চুমুক পান করিয়া সতীশ কহিল—"আর ভাল লাগ্‌ছে না।" পরে জবাসদৃশ দুই রক্ত-চক্ষু পত্নীর মুখের পানে নিবদ্ধ করিয়া কহিল—"সেই ত তোমার পাশে জায়গা দিলে—তবে পাঁচঘণ্টা আগে দিলে না কেন? তা' হলে ত আমায় এই কষ্ট পেতে হতো না।"

—"আমার কাঁধে দুর্ম্মতি ভর করেছিল। এখন্ কি কষ্ট হচ্ছে বলো, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাই।"

—"না, ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না, আমি মরলেই তুমি শান্তি পাবে!"

চারুশীলা আর কোনো বাদানুবাদ করিল না। পাছে রোগী অশান্ত হইয়া উঠে সেই ভয়ে সে ধীরে ধীরে স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটিয়াছে, সেই হেতু জ্বরের যন্ত্রণা সত্ত্বেও সতীশ অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল।

যথাকালে ডাক্তার আসিয়া যত্ন-সহকারে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"কি জ্বর ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তবে লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে মায়ের অনুগ্রহ হতে পারে; কারণ, আজকাল চারদিকে এই রোগটাই দেখা দিচ্ছে। গায়ে যখন এত ব্যথা, নরম করে বিছানা পেতে দাও।"

অবশেষে চিকিৎসকের বাক্য ভীষণ সত্যরূপে দেখা

দিল। সতীশের সারা অঙ্গে আসল বসন্ত বিভীষিকারূপে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয়বার চারুশীলার সমস্ত অন্তর তীব্র অনুশোচনায় হাহাকার করিয়া উঠিল।—"এ কি করলে ঠাকুর! নিজেকে প্রচার করতে গিয়ে অযত্ন করে ছেলে হারালাম, তবুও হতভাগী আমার চৈতন্য হলো না! অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে যাচ্ছিলাম, তাই কি আমার জন্যে এই নতুন শাস্তির সৃষ্টি করলে! আমার ভাগ্যে যত কষ্টই থাক্, শুধু দয়া করে ওঁর প্রাণটুকু নিও না! আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে অবসর দিও ভগবান!"

প্রাণপাত সেবায় মৃত্যু পরাস্ত মানিল। কিন্তু তাহার চরণ-চিহ্ন রাখিয়া গেল সতীশের দুইটি চক্ষে। শিশুর মত অসহায় ও একান্ত নির্ভরশীল অন্ধ স্বামীর সেবা করিতে করিতে এক-একবার চারুশীলার অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া গাহিতে চায়—

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চক্ষের জলে।"

—"ও গো দয়াল প্রভু, আমায় দয়া কর! জ্ঞানের আলো দিয়ে আমায় পথ দেখিয়ে দাও! আমার বাকী জীবনের চলার পথ সহজ সত্য দিয়ে সরল করে দাও! আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি প্রভু!"

—"নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।"

নীরব চোখের জলে চারুশীলার বুক ভাসিয়া যায়।

পঁচিশ

—"শিলু।"

চারুশীলা একটা সার্টে তালি বসাইতেছিল। কহিল—"কেন?"

—"দেখো, দর্পহারী মধুসূদন কারও দর্প রাখেন না।"

—"কেন? হঠাৎ ও কথা কেন?"

—"জিতেনের বিষয় নিয়ে তোমায় কত অকথা-কুকথা বলেছি, তার নাম নিয়ে কত হিংসা প্রকাশ করেছি, আর আজ তারি দেওয়া অন্নে আমায় বেঁচে থাক্‌তে হবে।"

স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে চারুশীলা কহিল—"আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমায় জিতেনের অন্ন খেয়ে মাথা হেঁট করতে দেবো না। তাতে তোমার চাইতে আমারই লজ্জা বেশী। অবশ্য এ কথা হয় ত তুমি বিশ্বাস কর্‌তেই চাইবে না যে, আমার কাছে তোমার আসন জিতেনের অনেক ওপরে। জিতেন তোমার আমার কাছে যেমন মানে ছোট, তেমনি ছোটই থাক্‌বে। বড় হয়ে ছোটর কাছে হাত পাততে নেই। সেজন্য আমাদেরও তার কাছে হাত পাতা যায় না। আমরা তার কাছে সাহায্য নিয়ে তাকে বড় হতে দেবো না।"

—"কিন্তু তার কাছে হাত পাতা ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে বলো?"

—"উপায় আছে এবং সেটা খুব সহজ। সে বিষয় অনেকটা এগিয়েও পড়েছি, আমাদের ভাবনার আর কোন কারণ নেই। তোমার দোকানের অবস্থা যে অমন দাঁড়িয়েছিল তা' ত আমায় একদিনও জানাও নি। অসুখে না পড়লে তুমি যে কি করতে তা' তুমিই জানো। দোকানে তালা বন্ধ দেখে নিতাইকে খোঁজ করে ডাকিয়ে পাঠালুম। সে এসে বল্‌লে—তিনজন কারিগর তিন-চার মাসের মাইনে না পেয়ে কাজে জবাব দিয়ে গেছে, খালি সেই যা' টিঁকে ছিল—তাও তোমার অসুখ হওয়ায় দিন পাঁচেক পরে উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে হরি ময়রার দোকানে চাকরী নিয়েছে। তারপর বাজারে তোমার চারিদিকে দেনা। এই সব শুনে আমার ত মাথায় বাজ পড়ল। তোমার জামার পকেট হাঁটকে দোকানের চাবি পেলুম। তখন নিতাইকে দিয়েই দোকানের আসবাব-পত্র সব বেচে ফেললুম। তাইতে দোকানের যে তিনমাস ভাড়া বাকী ছিল তা' মিটিয়ে দিয়ে দোকান ছেড়ে দিলুম। ধারও

কিছু শোধ করলুম। মনে করেছি কাল থেকে আমি রোজ সকালে মুড়ি, মটর আর বেগুনি ফুলুরি ভাজব, বিকেলে ঘিয়েভাজা খাবারও করব। পাড়ার অনেকেই—আমার খদ্দের হবে। তাতে আমাদের দুটো লোকের বেশ পেট চলে যাবে। আর বাকী যা' দেনা আছে আস্তে আস্তে শোধ করলেই চলবে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অন্ধ নয়ন স্ত্রীর মুখের দিকে ফিরাইয়া সতীশ কহিল—"কত লেখাপড়া শিখেছিলে, কত যত্নে মানুষ হয়েছিলে, আমার মত হতভাগার হাতে পড়ে শেষকালে তোমায় এমনি ভাবে জীবন কাটাতে হবে!"

—"তাতে কি হয়েছে, শিখলুমই বা লেখাপড়া, ময়রার ঘরের ঝি-বৌয়ের এতে লজ্জার কিছু নেই। তোমার আপনার পিসীমা এমনি করে দিন কাটিয়ে গেছেন। আর আমার দূর-সম্পর্কের মাসীমা, যিনি হালিসহরে থাকেন, তাঁর ত এই রকম মুড়ি আর তেলে ভাজা ভেজেই জীবন নির্ব্বাহ হচ্ছে। তবে আমারই বা এত মান কিসের! যখন যেমন, তখন তেমন, খালি পেটে মান-সম্ভ্রম আঁকড়ে থাকলে চলবে কেন!"

—"কিন্তু তোমার দেহ ত তত ভাল নয়, কাজের চাপ যে বড্ড বেশী পড়বে শিলু।"

চারুশীলার মনে পড়িল অতীতের একদিনের কথা, নলিনী দরদের সুরে ঠিক ঐ প্রকারের বাক্যই তাহাকে বলিয়াছিল—যেদিন সে প্রথম সরস্বতী ও কারিগরদিগের জন্য রাঁধিবার আয়োজন করে। হায়, সেদিন স্বামীর দরদ কোথায় ছিল!—"খাটলে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আরাম করে দিন কাটান কা'কে বলে জানি না ত। চিরদিন খেটেই আসছি।" বলিয়া চারুশীলা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

ছাব্বিশ

চারুশীলা ভাবিতে থাকে—আর একদিন নলিনী তাহাকে কষ্টের পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই গভীরতম দুঃখের ইঙ্গিত দিয়া কহিয়াছিল—"বৌদি', এত দুঃখ বরণ করে নিও না, যেমন আশার শেষ নেই, তেমনি দুঃখেরও শেষ নেই। যে যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে, ভগবান তাকে তত্ই দুর্গম পথে ঠেলে দেন তার শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে।"

—"কিন্তু ভগবান, এ ছাড়া ত আমার আর কোন পথ খোলা রাখো নি। তুমি জান আমার জ্ঞান, শক্তি, সহিষ্ণুতা কত ক্ষীণ, আমি দু' হাত দিয়ে এই বেড়াজাল ঠেলে ফেলতে চাই, কিন্তু এমন আমার আষ্টেপৃষ্টে বন্ধন দিয়েছ যে, একে বরণ করে নেওয়া ছাড়া উপায় দেখি না।"

—"স্বভাব না যায় মলে—"

আকস্মিক ভয়ানক রোগে আক্রমিত হইয়া অন্ধ হওয়ার বিহ্বলতায় এবং শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ সতীশের চিত্ত চারুশীলার উপর শিশুর মত পরম স্নেহে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফলে সে কিছুদিন বেশ ব্যথার ব্যথী মিষ্টভাষী হইয়া রহিল। কিন্তু যত দিন যায়, তত অবসাদ আসে। ধীরে ধীরে সতীশ পুনরায় রূঢ় ও কর্কশ হইয়া উঠিল। দিনরাত খিট্‌খিট্ করে, কোন জিনিষ হাতের কাছে পাইতে দেরী হইলে কল্পনা করিয়া লয় চারুশীলা ইচ্ছা করিয়া তাহাকে এইরূপ অসুবিধায় ফেলে। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিতে থাকে—"আমাকে ত অযত্ন করবেই, হতো যদি জিতেন, তা' হলে হাতের তেলোয় রেখে সেবা করতে। আমি একটা আপদ বই ত নই। অন্ধ হয়েছি, আরো সুবিধে হয়েছে, স্বাধীনা হয়ে মজা লুটছ।"

চারুশীলা প্রত্যুত্তর করে না, শুষ্ক চক্ষে নীরবে কাজ করিয়া যায়।

চারুশীলার খরিদ্দার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, ফলে লাভ হইতে লাগিল বেশ। ক্রমে সে দুপুরবেলা নিজের বাড়ীতে বসিয়া পড়াইবার জন্য ছয়-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যোগাড় করিয়া লইলে তাহাতেও আয় বাড়িল। প্রতি মাসে নিজেদের খরচ চালাইয়া দু'-পাঁচ টাকা হাতে জমিতে লাগিল।

একবছর পরের কথা।

চারুশীলা নিজের সঞ্চিত অর্থে সম্মুখে দাওয়া-সংলগ্ন একখানি মেটেঘর প্রস্তুত করাইল। সতীশ পূর্ব্বে দেনার জ্বালায় বাড়ীখানি জিতেনের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাড়ীর পিছনে যে জমিটুকু ছিল তাহা বিক্রয় করে নাই। এতদিন পরে তাহা চারুশীলার পরম উপকারে আসিল।

যেদিন তাহারা নূতন গৃহে প্রবেশ করিল, সেইদিন রাত্রে চারুশীলা স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করিতে করিতে কহিল—"এইবার কিন্তু আর তুমি গালাগাল দিতে পারবে না। এতদিন জিতেনের বাড়ী বাস করতে, তাই তার নাম নিয়ে ঝাঁজাল ঢেঁকুরগুলো না তুলে থাক্‌তে পারতে না; অন্ততঃ, আমি ত তাই মনে করি। আর সেই জন্য, তোমার গায়ের জ্বালা কোথায় অনুভব করতে পারি বলেই এতদিন সব সহ্য করেছি। কিন্তু এবার থেকে যদি গাল দাও আমি সইব না। নিজের কুঁড়েয় মাথা গুঁজে ক্ষুদ-কুঁড়ো যা' জোটে তাই খেয়ে শান্তিতে থাকো, আমাকেও শান্তি পেতে দাও।"

সতীশ কোন জবাব দিল না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

স্বামীর এই ব্যথিত হতাশ ভাবটুকু চারুশীলা সহিতে পারে না। তখনই শশব্যস্তে নিকটে সরিয়া গিয়া নিজের দিকে স্বামীর মুখ ফিরাইয়া লইয়া গালে, চোখে, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদরে সস্নেহকণ্ঠে সে কহিল—"রাগ করলে না কি—অতকথা বলেছি বলে? আচ্ছা, কখনও আর অমন বলবো না। তোমার যত ইচ্ছে গাল দিও।"

চারুশীলা সেইদিনই রাত জাগিয়া নলিনীকে পত্র লিখিল—

"ভাই ঠাকুরঝি,　　৩রা জ্যৈষ্ঠ

অনেকদিন তোমাদের কোন চিঠি পাই নি। আশা করি পত্রপাঠ তোমাদের কুশল-সংবাদ দানে ভাবনা দূর করবে। তোমার দাদার যে জমিটুকু ছিল, তা'তে আমি একখানি কুঁড়ে নির্ম্মাণ করেছি। আজ সেখানে নীড় বাঁধলুম। বলবে—বেশ ত সুখে ছিলে, হঠাৎ এ খেয়াল গেল কেন? সত্যিই ভাই এটা আমার খেয়াল। আর যাই কেন না তোমরা ভাব, শুধু এইটুক মনে করো না যে, আমি অহঙ্কার করে তোমাদের বাড়ী ছেড়ে এলুম। আমায় বিশ্বাস কর। অহঙ্কার করবার মত ভগবান আমার কিছুই রাখেন নি—তোমাদের অজস্র মমতা ছাড়া। বাড়ীখানি কেন মিথ্যে পড়ে থাক্‌বে, বলো ত ভাড়াটে বসাই—তা'তে করে যে টাকাটা জমবে, সেটা রমার কল্পিত ভবিষ্যৎ বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রয়োজনে লাগবে। অধিক কি লিখ্‌ব, আমাদের সংবাদ একই প্রকার। তোমরা আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। পত্রের আশায় রইলাম। ইতি,

তোমার
বৌদি'

জিতেনের ডায়েরী—

৮ই জ্যৈষ্ঠ

"দুঃখ যাকে মলিন করতে পারে নি, স্নেহে যে সুন্দর, সংযমে যে দৃঢ়, সত্যে যে অটল, ধর্ম্মে যে সুরক্ষিত, সেই মহৎ নারীকে আমার কোটী কোটী প্রণাম!"

শেষ

সরলা দেবী

চং যুগো

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, এল্‌-এম্‌-এফ্‌

"চায়না ষ্টোর্স।"

ষ্ট্রাণ্ড রোডে একখানি সুসজ্জিত মনোহারী দোকানের উপর উল্লিখিত সাইনবোর্ডখানি ঝুলিতেছিল। কয়েকজন চীনা কর্ম্মচারী নর ও নারী দোকানের কয়েকটি বিভাগে কাজ করিতেছিল।

বেলা দশটা। একখানি বৃহৎ মোটর আসিয়া দোকানের নিকট থামিয়া গেল। একটি জার্ম্মান মহিলা নামিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। একজন চীনা যুবতী মৃদুহাস্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আপনার?"

"আপনাদের 'চায়না সোপ' এক বাক্স দিতে পাবেন কি?"

"পারি। বিজ্ঞাপন এনেছেন?"

"বিজ্ঞাপন? কাগজে দেখেছি বটে, তবে সেটা আন্‌বার কথা ত লেখা নেই।"

"না তা' নেই, তবে যাঁরা আনেন, তাঁরা শতকরা চল্লিশ পার্সেণ্ট কমিশন পান। আমাদের পুরাতন গ্রাহকেরা এ কথা জানেন।"

"আমি নতুন। তা' বিজ্ঞাপন নিয়ে অন্য একদিন আসা যাবে। ভাল কথা, এক বাক্সে ক'খানি থাকে?"

"এক বাক্সে একখানিই থাকে—তিনটাকা বাক্স।"

"আচ্ছা, আর এক সময় আস্‌ব।"

জার্ম্মান মহিলা চলিয়া যাইবার অল্প পরেই একজন বিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিষ্টার মোটর হইতে নামিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। একটি চীনা যুবক আসিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই মশায়?"

"হংকো সেণ্ট' একশিশি" বলিয়া তিনি যুবকের হাতে একখানি সংবাদ-পত্র দিলেন। সেণ্ট সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন ঐ কাগজে বাহির হইয়াছিল।

সংবাদ-পত্রের উপর ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর?"

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "চং যুগো।"

কর্ম্মচারী তখন তাঁহাকে দোকানের অন্য একটি কক্ষে বসাইয়া ম্যানেজারকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

ম্যানেজার আসিলেন। আগন্তুককে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার 'হংকো সেণ্ট' চাই ?"

"হাঁ।"

"কত নম্বর—কোন্ মার্কা ?"

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "চং যুগো, নম্বর পঞ্চাশ।"

"আপনার নম্বর কত ?"

"সাত শ' আঠার।"

ম্যানেজার পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া দেওয়ালের এক অংশে প্রবেশ করাইয়া দিতে নিমেষে তাহা সরিয়া গেল এবং ভিতর হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির হইয়া আসিল। চাবি সরাইয়া লইতেই দেওয়ালের অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইয়া গেল—সেই স্থানেই যে গুপ্তকুটুরী আছে, তাহা বিশেষ পরীক্ষায়ও জানিবার সম্ভাবনা রহিল না।

নোটবই খুলিয়া কয়েকটি পাতার পর সাত শ' আঠার নম্বর বাহির করিয়া একটি ফটোর সহিত আগন্তুকের চেহারা মিলাইয়া লইলেন। সমস্ত মিলিয়া গেলে ম্যানেজার ও ব্যারিষ্টারের মধ্যে নিম্নস্বরে অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একটি সরু কাঁচের নল লইয়া ব্যারিষ্টার প্রফুল্ল-মনে দোকান হইতে চলিয়া গেলেন। ম্যানেজার সেণ্ট বিক্রয়ের নোট কয়েকখানি পকেটে তুলিয়া রাখিলেন।

দুই

রাত্রি এগারটা। একজন চীনা যুবতী সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া লাল গোলাপফুলের ছাপ দেওয়া একটি নীল ছাতা লইয়া ডাক্তার জি স্যাক্সেনার বৃহৎ অট্টালিকার নিকট আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বারোটা বাজিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ঘরের জানালা হঠাৎ খুলিয়া গেল। একটা টর্চের আলো ক্ষণিকের জন্য জানালার নিকট জ্বলিয়া উঠিল। চীনা রমণীর হাতের টর্চও সেই মুহূর্ত্তে জ্বলিতে দেখা গেল।

দ্বিতলের উন্মুক্ত জানালা দিয়া অবিলম্বে একটা দড়ি নামিয়া আসিল। চীনা যুবতী সেটাতে একটা ছোট শিশি বাঁধিয়া ঈষৎ টান দিল এবং উপর হইতে রুমালে বাঁধা কোন জিনিষ তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। রুমাল তুলিয়া লইয়া দড়ি ছাড়িয়া দিতেই ধীরে ধীরে সেটা উপরে উঠিয়া গেল। যুবতী রুমাল লইয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিল।

রাত্রি বারোটার সময় একাকিনী একজন স্ত্রীলোককে ঐরূপ সন্দেহজনক অবস্থায় দেখিয়া জনৈক কনষ্টেবল তাহার উপর গোপনে দৃষ্টি রাখিয়াছিল। অন্ধকারের মধ্যে তাহার কার্য্য-পদ্ধতি সে সঠিক্ দেখিতে পায় নাই। স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাইবার সময় পুলিশ তাহার পথরোধ করিয়া এত রাত্রে সেইস্থানে তাহার ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

চীনা রমণী ক্ষণিকের জন্য কনষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর জামার ভিতর হইতে একপ্রকার গুঁড়া বাহির করিয়া নিমেষে সে তাহার প্রশ্ন-কর্ত্তার মুখের উপর ফেলিয়া দিল। চূর্ণ পদার্থের উগ্র গন্ধে ও তেজে পুলিশ বেচারা হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। চোখ হইতে অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সেই অবসরে সুন্দরী চীনা রমণী ক্ষিপ্রপদে তাহার চক্ষুর অন্তরালে সরিয়া পড়িল।

"চায়না ষ্টোর্সে"র ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী হলো কেন ? তোমার কোন বিপদ হয় নি ত মিস্ রোজ ?"

অল্প হাসিয়া রুমালখানি ম্যানেজারের হাতে দিয়া চীনা রমণী বলিল, "সামান্য ঘটনা। একটা মূর্খ কনষ্টেবল সন্দেহ করেছিল, কিন্তু লঙ্কার গুঁড়োয় তার সন্দেহ ভঞ্জন করেছি, বেশী কিছু আর ব্যবহার করতে হয় নি।"

ম্যানেজার হাসিতে হাসিতে রুমাল খুলিয়া নোট গণিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মিস্ রোজ তাহার কাজের পুরস্কারস্বরূপ একখানি নোট লইয়া চলিয়া গেল।

তিন

গোয়েন্দা রঞ্জন রায় তাঁহার সহকারী মধুকে বলিলেন,

"কিছু বুঝ্‌লে এ বিজ্ঞাপন দেখে ? আজকাল এই 'চায়না ষ্টোর্স' বেশ নতুন নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে।"

মধু বলিল, "এরা জিনিষের য়া' দাম রেখেছে, তা'তে এ দোকান শীঘ্রই নিলামে উঠবে মনে হচ্ছে।"

"ও আলোচনায় আমাদের কাজ কি। তুমি বরং বিজ্ঞাপনটায় লাল দাগ দিয়ে রাখ, আর রেকর্ড-রুম থেকে গত তিনমাসের সংবাদ-পত্রে যেখানে এই 'চায়না ষ্টোর্সে'র বিজ্ঞাপন পাও তা' আমার কাছে নিয়ে এস - কাজ আছে।"

যে ঘরে সংবাদ-পত্রাদি রাখা হইত সেই রেকর্ড-রুম হইতে রঞ্জন রায়ের কথামত মধু কাগজ কয়েকখানি বাছিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কি কাজ আশা করেন ?"

"ও কথা থাক্।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "তিনমাস পূর্ব্বে 'চায়না ষ্টোর্স' কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল পড়ো।"

মধু পড়িল, "চায়না ষ্টোর্স—বৃহৎ মনোহারী দোকানে পৃথিবীর যাবতীয় প্রসাধন-দ্রব্য উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যের নাম ইত্যাদি দেওয়া হইল— 'চায়না সোপ।' 'হংকো সেন্ট।' ল্যাং য়ু ক্রীম।' 'বেরিনগো স্নো।' প্রত্যেকের মূল্য তিন টাকা। দাম দেখিয়া ভয় পাইবেন না—গুণের আদর করুন। ইতি, ম্যানেজার— 'চায়না ষ্টোর্স'—ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।"

রঞ্জন রায় বলিলেন, 'এই বিজ্ঞাপনখানা এরা তিনমাস ধারাবাহিক না হলেও মাঝে মাঝে দিয়ে আসছে। ভাল কথা, তুমি আঠার শ' ছিয়ানব্বুই সালের চাইনিস্ পুলিশ রিপোর্ট সাত নম্বর ফাইল, এইটথ্ ভলিউম 'হং' শব্দের নোটগুলি নিয়ে এস—কাজের জিনিষ পাবে বোধ হয়।"

চার

লালবাজারের মোড়ের নিকট নীল রঙের ছাতা মাথায় দিয়া একটি চীনা রমণী 'ফুংসিন্ কোম্পানী'র জুতার দোকান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। একখানি মোটর তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার নিকট থামিয়া গেল। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক ক্ষণিকের জন্য যুবতীর দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "চং য়ুগো মিস্ রোজ।"

মিস্ রোজ হাসিয়া মোটরের নিকট দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি খানকয়েক নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং একটি ছোট কাঁচের শিশি স্ত্রীলোকটির নিকট হইতে লইয়া নিমেষে মোটর চালাইয়া চলিয়া গেলেন।

'স্যাভয় হোটেলে' সাতাশ নম্বর ঘরে দুইজন আমেরিকান টুরিষ্ট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্র পড়িয়াছিল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল মিস্ রোজ নামে একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। টুরিষ্টদিগের আদেশে অবিলম্বে মিস্ রোজ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। পাঁচ মিনিট পরে কয়েক টাকা লইয়া চীনা রমণী চলিয়া গেল। আমেরিকানরা কয়েকটি ছোট কাচের শিশি আপনাপন ব্যাগের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিলেন।

"চায়না ষ্টোর্সে"র ম্যানেজার বলিলেন, "মিস্ রোজ নম্বর টু, আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তুমি বেশ লাভ দেখিয়েছ, তোমার মজুরী নিয়ে যাও।"

একখানি নোট মিস্ রোজের হাতে দিয়া ম্যানেজার চলিয়া গেলেন।

পাঁচ

"সাবানখানা কেমন হে মধু ?"

"একেবারে রাবিশ। কোলকাতার 'ন্যাশান্যাল সোপ ওয়ার্কসে'র তিনআনা দামের সাবানও এর চেয়ে অনেক ভাল"—বলিয়া মধু রঞ্জন রায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল।

রঞ্জন রায় বলিলেন, "ন্যাসকো'র সাবান ভাল তা' জানি—কিন্তু কথা হচ্ছে তিনটাকা দামের 'চায়না সোপে'র অন্য কোন অর্থ আছে কি না। পরীক্ষায় যতদূর জানা গেছে, তা'তে সোডার মাত্রা একটু বেশীই আছে। তা' ছাড়া, কেওলিন, চর্বি, রজন ইত্যাদি মেশান আছে।"

"বেটারা আবার বলে, বিজ্ঞাপন এনেছি কি না— চল্লিশ পার্সেন্ট কম দামে পাওয়া যেতো।"

"যাক্ ও কথা।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে'র না কি খুব নামজাদা একজন ডিটেক্‌টিভ এখানে এসেছেন শুন্‌লাম। বেড়াতে এসেছেন অবশ্য। তবে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে দিয়ে কিছু কাজ না করিয়ে ছাড়বেন না মনে হয়।"

"কি কাজ?" মধু খানিক চিন্তার পর বলিল, "বুঝেছি। সেই কোকেন-রহস্যের কথা ত?"

"হাঁ, বেআইনী কোকেন রাখার এবং বিক্রয় করার জন্য কয়েকজন ধরা পড়েছে—কিন্তু আসল সন্ধান কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—এত কড়া নজর সত্বেও 'কোকেন-স্মাগলিং' খুবই জমকালভাবে চলেছে।"

"গত বছরের মত এবারে ত আর ফাউণ্টেন পেনের মধ্যে কোকেন আসছে না, অন্য কত উপায়ে আসছে কে জানে!"

"আসবার উপায় অনেক আছে মধু—বালির সঙ্গেও সেবার এসেছিল। দেখা যাক্, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে'র মিঃ বোস্‌টন কি করেন। মোট কথা, তুমি কিন্তু এই চীনাদের দিকে নজর রাখ্‌তে ভুল্‌বে না।"

"ভাব্‌ছি এবার বিজ্ঞাপন নিয়েই যাব, আর একটা 'হংকো সেট' কিনে আন্‌বো।"

"আমিও তাই ভাবছি—ওদের জিনিসগুলা সব পরীক্ষা করা চাই। গতবার যারা ধরা পড়েছিল, তাদের অধিকাংশই চীনদেশের লোক ছিল—তাই এদের ওপর পুলিশের খরদৃষ্টি আছে।"

ছয়

রাত দুইটা দশ। "চায়না ষ্টোর্সে"র একটি নিভৃত কক্ষে ম্যানেজার ফুঃ চঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন।

ফুঃ চঙ্গ বলিলেন, "দেখুন, আপনারা সকলেই আমাদের এই কারবারের পরিচালক ও অংশীদার। আমি আমাদের গত তিনমাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পত্র আপনাদের নিকট দিয়েছি—মোট লাভ মাসিক খরচা বাদে এই তিন মাসে সত্তর হাজার টাকার কাছাকাছি। আপনারা খাতাপত্র দেখে আপনাপন অংশ বুঝে নিন্।"

"চায়না ষ্টোর্সে"র ডাইরেক্টার দশজন সকলেই সেই নৈশ-সভায় যোগ দিয়াছিলেন। দেশের মাননীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকেই বর্ত্তমানে ঐ কক্ষে দেখা যাইতেছিল। ম্যানেজারের কথার পর তাঁহারা হিসাব-পত্রাদি দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নীরবে কাটিয়া গেল। মাঝে মাঝে সোডা ও হুইস্কি ব্যতীত কয়েকটা চুরুটও পুড়িল। হিসাব দেখা শেষ হইলে ব্যারিষ্টার মিঃ স্যাকেলটন বলিলেন, "শুন্‌লাম আমাদের ফারমের মালিক এদেশে এসেছেন—কথাটা সত্য কি?"

ম্যানেজার বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি এসেছেন। আমাদের হিসাব-পত্রের পর তাঁকে ডেকে আন্‌ব। তিনি এখন বিশ্রাম কর্‌ছেন।"

এটর্ণি মিঃ র‍্যামিয়া বলিলেন, "চং যুগো আজই এসেছেন? হংকো থেকেই এলেন কি?"

"না, আমি সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, প্রোম, বেসিন হয়ে আস্‌ছি।" বলিতে বলিতে পাশের দরজা খুলিয়া মিঃ চং যুগো সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চং যুগো। এই চং যুগোই "চায়না ষ্টোর্সে"র ও অন্যান্য নানারূপ কারবারের একমাত্র সত্বাধিকারী। অগাধ সম্পত্তিশালী এই চং যুগোর নানাবিধ কারবারের শাখা অফিসগুলি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চং যুগো বৃদ্ধ, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মাথার চুল প্রায় নাই। শাদা গোঁফ জোড়াটীও বাঁকিয়া চিবুকের দুই ইঞ্চি বেশী নামিয়া গিয়াছে। গোল মুখ, ক্ষুদ্র চক্ষু, পীতাভ রং। মুখের সর্ব্বত্র চর্ম্মের শিথিলতা থাকিলেও তাহাকে দৃঢ়চেতা, পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল বলিয়াই বোধ হয়। ক্ষুদ্র চক্ষে একটা কঠোর ও উগ্র দীপ্তির প্রকাশ পাইতেছিল।

চং যুগোকে দেখিয়া ডাইরেক্টার সকলেই চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সকলের সহিত করমর্দ্দন শেষ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া বৃদ্ধ চং যুগো বলিতে লাগিলেন, "আমি ম্যানেজার ফুঃ চঙ্গের

মারফৎ জান্‌তে পার্‌লাম যে, আবার আমাদের কোলকাতা শাখার ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়েছে। গত বছরের সামান্য ঘটনা নয়—এবার 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে'র বিখ্যাত গোয়েন্দা দেশ-ভ্রমণের ছল করে আমাদেরই সন্ধান কর্‌তে কোলকাতায় এসে পুলিশের দলে যোগ দিয়েছেন। এর কোন প্রতিবিধান শীঘ্রই হওয়া দরকার।"

বিচারপতি জষ্টিস 'ক' বলিলেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন। পুলিশের কোন সাধ্য নেই যে, আমরা এতগুলো আইনজ্ঞ লোক থাক্‌তে আমাদের এ গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পায়—আর যদিও তাই হয়, আমরাও তার বিহিত জানি।"

ফুঃ চঙ্গ বলিলেন, "হ্যাঁ, মিঃ বোস্‌টনের এ খেয়াল ছাড়াবার অনেক উপায় আছে—একদিনেই তাঁকে নীরব করা যেতে পারে।"

সভাসদ প্রবীণ ব্যক্তিরা ঈষৎ হাসিয়া ম্যানেজারের এ কথায় সায় দিলেন।

চং যুগো বলিলেন, "যে কৌশলেই হোক্ কার্য্যোদ্ধার করা চাই—জানেন আপনারা এ কারবারের কি রকম মোটা অংশ আপনাদের হাতে আসে—কাজেই সামান্য একটু বিপদ না সবাতে পারলে কি করে চলে আমাদের।"

চং যুগোর গলার স্বরটা এবার খন্‌খন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে মনে হইল।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ভোরের আলো গবাক্ষ-পথে আসিতে দেখা গেল। যুক্তি পরামর্শ শেষ হইয়া "চায়না ষ্টোর্সে"র নৈশ-সভা ভাঙ্গিয়া গেল। সম্ভ্রান্ত পরিচালকেরা আপনাপন স্থানের গৌরবময় সীমার মধ্যে চলিয়া গেলেন।

সাত

পরদিন বেলা তিনটার সময় মধু 'হংকো সেণ্ট' কিনিবার জন্য "চায়না ষ্টোর্সে" উপস্থিত হইয়া দেখে একটি পার্শী ভদ্রলোক কয়েকটি জিনিষ কিনিতে তাহার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ক্রেতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মধু ব্যাপার বুঝিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মধুর চিন্তা বাড়িল—এই ভদ্রলোকটি কে? রঞ্জন রায়—না বোস্‌টন? আহারাদির পর রঞ্জন রায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। মিঃ বোস্‌টনও গৃহে ছিলেন না এ সংবাদও মধু সংগ্রহ করিয়াছে। পার্শী ভদ্রলোকটি তবে কে? চিন্তিত মনে মধু গৃহে ফিরিল।

পার্শী ভদ্রলোক কয়েকটি জিনিস কিনিতে "চায়না ষ্টোর্সে" প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটি চীনা যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া মৃদুহাস্যে তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন, 'ল্যাংযু ক্রীম' ও 'বেরিনগো স্নো' চাই মিস্ রোজ।"

চক্ষুর ঈষৎ সঙ্কেতে বাধা দিয়া নিম্নস্বরে মিস্ রোজ বলিল, "আমরা যে পরিচিত এ কথা এখানে জান্‌তে দেবেন না—কাজ সব পণ্ড হয়ে যাবে।" তারপর স্বাভাবিক স্বরে প্রশ্ন করিল, "বিজ্ঞাপন এনেছেন কি মশায়?"

আগন্তুক একখানা সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "এই কাগজেই আপনাদের বিজ্ঞাপন আছে।"

কাগজ দেখিয়া মিস্ রোজ বলিল, "তারপর?"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "চং যুগো।"

মিস্ রোজ তখন তাঁহাকে লইয়া দোকানের একটি পৃথক কক্ষে বসাইয়া ম্যানেজারের নিকট সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

ম্যানেজার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার 'ল্যাংযু ক্রীম' ও 'বেরিনগো স্নো' চাই?"

"হুঁ।"

"কত নম্বর—কোন্ মার্কা?"

"নম্বর পঞ্চাশ—চং যুগো মার্কা।"

"উত্তম কথা। আপনার নম্বর কত?"

আগন্তুক নিশ্চিন্ত মনে বলিলেন, "পাঁচ শ' পাঁচ।"

ম্যানেজার লাফাইয়া উঠিলেন। তীব্রস্বরে বলিলেন, "অসম্ভব—দু'দিকেই পাঁচ! এ রকম নম্বর আমার গ্রাহকদের হতেই পারে না। চিন্তা করে বলুন, নতুবা বিপদে

পড়বেন। আমরা সরল লোক, সোজা প্রথায় কাজ করি।"

ক্ষণিক চিন্তা করিয়া আগন্তুক বলিলেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে—সাত শ' নয়।"

"মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!" ম্যানেজার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মাঝখানে শূন্য দেওয়া নম্বর বল্‌তে আপনাকে কে শিখিয়েছে? মাঝখানে শূন্য! অমন নম্বর আমরা রাখি না। সাতের সঙ্গে শূন্য যোগ করে নয় হয় না, সাত শ' উনত্রিশ বলা বরং ভাল ছিল। আমাদের নম্বরের নিয়ম না জেনে প্রতারণা করতে আসা হয়েছে এখানে—গোয়েন্দাগিরির অন্যত্র সুবিধা করতে পারো নি?" এই বলিয়া তিনি সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখা 'কলিং বেলে'র বোতাম টিপিয়া দিলেন।

নিমেষে মিস্ রোজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ম্যানেজার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ রোজ নম্বর টেন্, তুমিই এই লোকটাকে এ ঘরে এনেছিলে না?"

"আজ্ঞে হাঁ। উনি আমাকে বিজ্ঞাপন দেখিয়েছিলেন এবং আমাদের 'পাশ ওয়ার্ড' শব্দও ঠিক্ বলেছিলেন।"

"কে একে বিজ্ঞাপনের কথা বলেছিল—নম্বর, মার্কা এসব তথ্য এ হতভাগা কোন্ সূত্রে আবিষ্কার কর্‌লে বলো?"

"আমিই এঁকে বলেছিলাম"—বলিয়া মিস্ রোজ মৃদু-হাস্যে বলিল, "ইনি গোয়েন্দা। কয়েকদিন আমাদের দোকানের কাছে এঁকে ঘুরতে দেখেই আমি এঁর সন্ধান নিয়েছিলাম। তারপর ভেতরের সংবাদ যৎসামান্য বলে এঁকে এখানে নিয়ে এসেছি। ভদ্রলোককে গোয়েন্দাগিরির পুরস্কার দেওয়া উচিত।"

ম্যানেজার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসির শব্দে আগন্তুক শিহরিয়া উঠিলেন। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত মনে করিয়া পার্শী ভদ্রলোক সেঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যান্ কোথায় গোয়েন্দা-মশায়?" কঠোরস্বরে ম্যানেজার বলিলেন, "এত সহজে কি যাওয়া হয়। বিশ্রাম করুন—এমন জায়গায় আপনাকে বিশ্রাম করতে পাঠাব যে, দশ বিশ বছরেও আপনার সন্ধান আর পাওয়া যাবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেওয়ালের একস্থানে একটি ছোট হাতল ঘুরাইয়া দিলেন।

পার্শী ভদ্রলোক যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিমেষে সে স্থানের খানিকটা অংশ সরিয়া গেল। একটা পতনের শব্দ হইল এবং সরিয়া যাওয়া অংশটা পুনরায় ঘুরিয়া পূর্ব্ব-স্থানে সংলগ্ন হইয়া গেল। ঘরের নিম্নে গভীর গহ্বরে চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্ব্বেই পার্শী ভদ্রলোকটির জীবন্ত সমাধি হইয়া গেল। উপরে দাঁড়াইয়া শ্লেষহাস্যে ম্যানেজার বলিতে লাগিলেন, "গোয়েন্দাপ্রবর, যতদিন ইচ্ছা ততদিন আপনি নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করুন। ঘরে আলো নেই বলে আমরা দুঃখিত—খাদ্য ও জলের অভাবে যদি মারা পড়েন আমরা নিরুপায়।"

"নিরুপায়—কিন্তু কেন নিরুপায় মিঃ ম্যানেজার? অবিলম্বে ভদ্রলোককে মুক্ত করুন—নতুবা আপনি এবং মিস্ রোজ আমার পিস্তলের এক এক গুলিতে জগৎ হতে লুপ্ত হয়ে যাবেন"—বলিয়া দুই হাতে দুইটি পিস্তল লইয়া দুইজনের উপর লক্ষ্য করিয়া এক অসমসাহসী ভদ্রলোক তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেশভূষায় তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়াই মনে হয়।

উন্মুক্ত দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই মিস্ রোজ নিজের অসাবধানতা লক্ষ্য করিল। ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিবার অল্পমাত্র ভুলে এই নবীন ক্রেতাটি হঠাৎ তাহার অনুসরণ করিয়া এ কক্ষের সন্ধান পাইয়াছে। 'কলিং বেলে'র আহ্বানের পূর্ব্বেই এই লোকটি তাহারই নিকট 'হংকো সেন্ট' কিনিতে আসিয়াছিল।

আকস্মিক বিপদে পড়িয়াও ম্যানেজার পূর্ব্বের মত নির্ভীক হৃদয়ে প্রশ্ন করিলেন, "কে হে তুমি মৃত্যুকামী গোয়েন্দা, জানো না এ কোথায় এসেছ—কোন্ রাক্ষসের মুখগহ্বরে স্বইচ্ছায় প্রবেশ করেছ?" বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওয়াং হো, ওয়াং হো!"

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। নিমেষে পদতলের খানিকটা সরিয়া গেল এবং ম্যানেজার ভূগর্ভের এক নূতন গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মিস্

রোজও যাইতেছিল, কিন্তু নবীন আগন্তুক ক্ষিপ্রহস্তে তাহার দীর্ঘ বেণী ধরিয়া সজোরে টান মারিলেন। ম্যানেজারের পদতলে যে নূতন গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল, নিমেষে তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল। টেবিলের উপর হইতে টেলিফোন্ উঠাইয়া লইয়া কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দে কোন লোককে কিছু সংবাদ পাঠাইয়া এবং মিস্ রোজের হাতে সুদৃঢ় হাতকড়ি পরাইয়া তাহাকে সেই ঘরেই রাখিয়া ভদ্রলোক দোকান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আট

মধু ফিরিয়া রঞ্জন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিল—তিনি মাঝে একবার গৃহে ফিরিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কেবল একখানি পত্র তাহার নামে লিখিয়া রাখিয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ভৃত্য এই বলিয়া চিঠিখানি তাহাকে দিল। মধু পত্র পাঠ করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়িল—টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। 'রিসিভার' লইয়া কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিয়া মধু তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ও একখানা চলন্ত খালি ট্যাক্সি থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইল।

রঞ্জন রায় ও মধুর সহিত মিঃ ব্রাউন বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মধুর কথামত একখানা মোটরে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ লইয়া তাঁহারা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে "চায়না ষ্টোর" অভিমুখে ছুটিলেন। ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইতে-না-হইতে ইংরাজবেশী জনৈক ভদ্রলোককে দেখিয়া মধুর ইঙ্গিতে মোটর থামিয়া গেল। মিঃ ব্রাউন গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যালো মিঃ রায়, গোয়েন্দা মিঃ বোস্টন কোথায়?"

রঞ্জন রায় সংক্ষেপে বলিলেন, "ভূগর্ভে!"

"বাঁচিয়া আছে? রক্ষা হইবে?"

"হাঁ, সম্ভব।"

"চলুন, পথ দেখান।" বলিয়া মিঃ ব্রাউন সদলবলে রঞ্জন রায় প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলেন। দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইয়া সকলে দেখিলেন—সেখানে জনপ্রাণী নাই। সমস্তই শূন্য। যে ঘরে মিস্ রোজকে বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার অবস্থাও অন্য ঘরেরই মত—মিস্ রোজকে লইয়া সকলে পলাইয়া গিয়াছে।

"পালিয়েছে দেখ্‌ছি।"

রঞ্জন রায় বলিলেন, "পালান অসম্ভব। বাড়ীটার ওপর আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি। বাইরের পথে কেউই পালায় নি। বাড়ীর নক্সা যা' আমি সংগ্রহ করেছি, তা'তে ভেতর বা ছাদ দিয়ে পালাবারও কোন পথ নেই। পালাতে পারে নি, লুকিয়েছে। অনুসন্ধান করা দরকার। কিন্তু তার আগে মিঃ বোস্টনকে উদ্ধার করা চাই।"

ম্যানেজার ও মিস্ রোজের সহিত মিঃ বোস্টনের কথা-বার্ত্তার সময় রঞ্জন রায় মিস্ রোজের অনুসরণ করিয়া ঘরের বাহিরে একটা জলের কলের পাশে ক্ষণিক অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং মিঃ বোস্টনের হঠাৎ ভূগর্ভে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই ঘরেই এখন সকলে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

দেওয়ালের উপর একটি হাতল দেখিয়া রঞ্জন রায় তাহা ঘুরাইতেই চেয়ারের নিকটস্থ মেঝের এক অংশ নিমেষে সরিয়া গেল। সেই অংশের তলায় একটি গহ্বর দেখা গেল। গর্ত্তের ভিতর আলোক যাইতেই মিঃ বোস্টন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একগাছা শক্ত দড়ি অবিলম্বে গর্ত্তে নামাইয়া দেওয়া হইল। রাস্তায় বাহির হইয়া রঞ্জন রায় দড়িটা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

দড়ি ধরিয়া মিঃ বোস্টন উপরে উঠিয়া আসিলেন। তখন সকলে মিলিয়া নানাস্থানে অপরাধীদিগের সন্ধান চলিতে লাগিল। ম্যানেজার যে স্থানে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, রঞ্জন রায় সেইস্থানের অংশ সরাইয়া ফেলিতে নানাবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া অগত্যা জায়গাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। যন্ত্রাদি শীঘ্রই সংগ্রহ

করা হইল। তাবপর স্থানটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নিম্নে একটি গহ্বর দেখা গেল। টর্চের আলোকে একজন কনষ্টেবল গর্ত্তের ভিতরের অবস্থা দেখিতে গিয়া হঠাৎ সরিয়া আসিল এবং সেই মুহূর্ত্তে পিস্তলের শব্দে কক্ষটি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

গহ্বরের ভিতর হইতে বারংবার পিস্তলের শব্দ হইতে লাগিল। নিকটে যায় কাহার সাধ্য? রঞ্জন রায় মধুকে কি আদেশ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল এবং শীঘ্রই একটা লম্বা ও মোটা রবারের নল বাজার হইতে কিনিয়া আনিল। ঘরের বাহিরে যে জলের কল ছিল, নলটা সেই কলে যোগ করিয়া অপর মুখটা গহ্বরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া মধু কল খুলিয়া দিল। গর্ত্তের মধ্যে অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল। গর্ত্তের ভিতর হইতে এবার ঘন ঘন পিস্তলের শব্দ হইতে লাগিল। নলের খানিকটা অংশ কাটিয়া উড়িয়া গেল, কিন্তু জল পড়া বন্ধ হইল না।

আত্মসমর্পণ করিতে তথাপি কেহই স্বীকৃত নহে। উপর হইতে সকলেই নানারূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কোনো ফলই হইল না।

গহ্বর ক্রমে জলে ভরিয়া আসিল। পিস্তলের শব্দও তখন কমিয়া আসিয়াছিল। জলের ভিতর সন্তরণ দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টাই তখন চলিতেছিল। প্রশস্ত গহ্বর হইলেও অনেকগুলি লোকের পক্ষে একযোগে সন্তরণের মত বিস্তৃত স্থান তাহাতে ছিল না। রঞ্জন রায় অবস্থা অনুমান করিয়া দড়ি নামাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তে দড়িতে টান পড়িল। পুলিশের লোকেরা দড়ি টানিয়া তুলিতেই একজন স্ত্রীলোক উপরে উঠিয়া আসিল। রঞ্জন রায় তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "মিস্ রোজ নম্বর টেন্ হাতকড়ি কোথায় গেল তোমার?"

সিক্ত বসন সংযত করিয়া মিস্ রোজ বলিল, "আপনি গোয়েন্দা রঞ্জন রায়! আমরা আপনাকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেই ভাল হ'ত। মিঃ বোস্টনকে ধর্‌তে গিয়েই মহা ভুল করেছি।"

"তা' বেশ করেছ—কিন্তু তোমার হাতকড়ি খুল্‌লে কি করে?"

"যাদুকরেরা যে কৌশলে হাতকড়ি খুলে ফেলে, আমিও সেই কৌশলে"—বলিয়া মিস্ রোজ হাসিতে লাগিল।

কনষ্টেবলরা একে একে দড়ির সাহায্যে গর্ত্তের ভিতর হইতে মজ্জমান লোকদিগকে টানিয়া তুলিল। উপরে উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রত্যেকের হাতে হাতকড়ি পড়িল। একে একে সকলেই আসিল, কিন্তু ম্যানেজার ফুং চঙ্গকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল না। অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, অথবা সঙ্গীদের কাহারও গুলিতে হত হইয়াছিলেন বলা কঠিন; কিন্তু তিনি যে অল্প পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। পুলিশের লোকেরা গর্ত্তে নামিয়া জলের ভিতর হইতে তাঁহাকে টানিয়া তুলিল।

দোকানের নানাস্থানে পরীক্ষার পর কয়েক পাউণ্ড কোকেন পাওয়া গেল। তাহা ছাড়া, সরু কাচের শিশিতে বিস্তর কোকেন দেওয়ালের মধ্যে কোন গুপ্ত আলমারী হইতে বাহির করা হইল। কয়েকখানি খাতা ও ফটো এলবাম পাওয়া গেল। ফটোর নীচে গ্রাহকদের নাম এবং নম্বর লেখা ছিল।

মিঃ বোস্টন, মিঃ ব্রাউন ও রঞ্জন রায় সেই ফটোগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ক্ষণিকের জন্য পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এলবামগুলি সযত্নে আপনার কোটের ভিতর পকেটে রাখিয়া মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "কঠিন সমস্যা! দেশের যত বড় লোকই এদের গ্রাহক—এবার পুলিশের কঠিন কর্ত্তব্যের মহা পরীক্ষা দিতে হবে।"

কাজ শেষ হইলে দুইজন কনেষ্টবলকে সেইস্থানে রাখিয়া বন্দীদিগকে লইয়া সকলে থানায় চলিলেন। পথে মিঃ বোস্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সন্ধান কর্‌লেন কিরূপে মিঃ রায়?"

"বিজ্ঞাপনের একটি গুপ্ত নিদর্শন আবিষ্কার করে।" রঞ্জন রায় বলিতে লাগিলেন, "যতবারই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, ততবারই ওদের বিজ্ঞাপনের একটি বিশেষ কৌশল আমি দেখ্‌তে পেয়েছি। 'চায়না সোপে'র প্রথম অক্ষর

ইংরাজী বর্ণমালার 'সি,' হংকো সেণ্টের প্রথম অক্ষর 'হং'; অর্থাৎ, ঐ দুইটি প্রথম অক্ষর লইয়া 'সি' ও 'হং' বা 'চং' শব্দ পাওয়া গেল। তারপর ক্রীম ও স্নোর শেষের অক্ষর ল্যাংযুর 'যু' আর বেরিনগোর 'গো' বা 'যুগো' হয়। মোট কথা, এই উপায়ে 'চং যুগো' শব্দটি স্থির হলো।"

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "চীন ভাষা ছেড়ে ওরা ইংরিজী সাঙ্কেতিক রাখ্‌ল কেন মিঃ রায়?"

"ওদের কর্ম্মস্থল বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে, কাজেই চীন ভাষা সকলে না বুঝ্‌লেও ইংরিজীতে কিছু না কিছু বুঝ্‌বে বলেই ইংরিজীর সাহায্য নিয়েছে—প্রত্যেক কর্ম্মচারী কেমন ইংরাজী বল্‌তে পাবে তা' দেখেছেন ত?" এই কথা বলিয়া রঞ্জন রায় মিঃ বোস্‌টনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সন্ধান রাখ্‌লে আপনি জান্‌তে পারবেন যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে চীন গভর্ণমেণ্ট চং যুগো নামে একজন জুয়াচোরকে অপরিমিত কোকেন রাখার অপরাধে দ্বীপান্তরিত করে—কিন্তু লোকটা কৌশলে দণ্ডের হাত থেকে পালিয়ে বহুকাল নিরুদ্দেশ হয়। পুনরায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তার ওপব শ্যাম রাজ্যের দৃষ্টি পড়ে এবং আবার সে বন্দী হয়—কিন্তু অর্থবলে বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়ে চং যুগো গোপনে নিজ কারবার চালায়। তারপর সেই অপরাধী এবার এদেশে এসে নতুনভাবে কাজ চালাবার চেষ্টা করে।"

"এ সব তথ্য আপনি জান্‌লেন কি করে?" জিজ্ঞাসা করিয়া মিঃ বোস্‌টন বিস্মিত হইয়া রঞ্জন রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঞ্জন রায় বলিলেন, "চীনের সংবাদ-পত্রে এ সব খবর বেরিয়েছিল—আমি সে সব কাগজ-পত্র আমার রেকর্ড-রুমে জমা করে রেখেছি।"

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বছরের কোকেন ব্যাপারের সঙ্গে এদের কোন বিশেষ সংশ্রব আছে কি?"

"অল্প। তারা এদেরই খুচরা খরিদ্দার মাত্র।"

মিঃ বোস্‌টন বলিলেন, "আমি এ দোকানে এসেছিলাম তা' আপনি জান্‌লেন কেমন করে মিঃ রায়?"

"গোয়েন্দা মিঃ বোস্‌টনের ওপরেও আমার নজর রাখ্‌তে হয়েছিল।" রঞ্জন রায় হাসিয়া বলিলেন, "মিস্ রোজ নম্বর টেন ও আপনি যেদিন 'গ্লোব থিয়েটারে' গেছ্‌লেন, সেদিন একজন মাড়োয়ারীকে কি ঠিক্ আপনাদের পাশে বসে থাক্‌তে দেখেছিলেন?"

"হাঁ—মহা আনাড়ী লোক। ইংরিজী কিছুই জানে না, তবুও ইংরাজী প্লে দেখ্‌তে যায় কেন বলুন ত? যা' বিরক্ত করেছে আমাদের—বলিয়া সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

"লোকটি আনাড়ী হলেও কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, আপনি ধীরে ধীরে মিস্ রোজ দ্বারা প্রতারিত হচ্ছিলেন। এই সব নীল ছাতা, লাল গোলাপফুল মার্কা যে কোন স্ত্রীলোককেই আপনি মিস্ রোজ বলে ডাক্‌তে পার্‌তেন। অনেক মিস্ রোজ আছে এই দলে"—বলিয়া রঞ্জন রায় নীরব হইলেন।

অবিলম্বে সকলে থানায় উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্রাউন প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া রঞ্জন রায় মধুর সহিত গৃহাভিমুখে চলিয়া আসিলেন।

বাড়ীর দরজাতেই ভৃত্যের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলেন। চিঠিখানা খুলিতেই দেখিলেন বড় অক্ষরে নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে, "চং যুগো।"

চমকিত হইয়া নিমেষে তিন লাইনে লেখা পত্রখানা তিনি পড়িয়া গেলেন। লেখক লিখিয়াছে—

"গোয়েন্দা রঞ্জন রায়,

বিরুদ্ধাচরণ করে আমার ক্ষতি করেছ। আমাকেও বাধ্য হয়ে তোমার অনিষ্ট কর্‌তে হবে। শয়তান আমি—শয়তানকে নিমন্ত্রণ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেছ। ইতি,

চং যুগো।"

চিঠি দেখিয়া মধু শিহরিয়া উঠিল। রঞ্জন রায় অল্প হাসিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কে দিয়েছে?"

"একজন বুড়ো চীনেম্যান ট্যাক্সি থামিয়ে আমাকে এই চিঠিখানা দিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা আগে চলে গেছে।"

"ভাল, সময়ে আবার দেখা হতে পারে"—বলিয়া রঞ্জন রায় মধুকে বিদায় দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

বিচার

কমলা মৈত্র

আদালত লোকে লোকারণ্য। বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা নেই। চারিদিকে আলোচনা এবং প্রতিবাদের স্রোত বইছিল। সহানুভূতির ক্ষীণ ভাষাকে ছাপিয়ে মধ্যে মধ্যে কানে বাজছিল অনাকাঙ্ক্ষিত কত রূঢ় উক্তি।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল একটী কুড়ি বাইশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক। সাধারণ অপরাধীদের মত তার মুখ শুষ্ক ও মলিন। বিশেষত্ব বর্জ্জিত তার মূর্ত্তি।

ইন্দ্রনীল যে তার মামার ঘরে আগুন লাগাতে পারে তা' লোকের ধারণার অতীত ছিল। তাই বন্ধু-বান্ধব যে কেউ তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে জানত, সবাই একদিন ইন্দ্রনীলের জামিনের জন্য ছুটে এসেছিল। কিন্তু সেদিন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁদের কড়া মেজাজে বলেছিলেন—এ অপরাধে জামিন চলে না মশায়।

সকলে এ কথায় নিরাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু এই ভরসাটা তাদের হৃদয়ের এককোণে রয়ে গেছ্‌ল যে—বিচার হ'লে নিশ্চয়ই সে বেকসুর খালাস পাবে।

ইন্দ্র ছিল গরীবের ঘরের ছেলে। সে যখন সবেমাত্র চার বছরের, তখন হঠাৎ একদিন তার পিতা আপনার অজ্ঞাতসারে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। ইন্দ্রের মা জীবন-নদীর মাঝপথে নাবিক হারালেন। দিন কিন্তু বসে থাকে না। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, যেমন তেমন করে তাঁদের দুটো পেট চলে যেতে লাগ্‌ল। কতদিন আর এমন করে চলে? তাঁরা তখন আশ্রয় খুঁজ্‌তে বেরুলেন। আশ্রয়ও মিল্‌ল। আশ্রয়-দাতা হচ্ছেন ইন্দ্রের খুব দূর-সম্পর্কের এক মাতুল যোগেশবাবু। তিনি না কি অতি মহাশয় লোক।

এমন আশ্রয় পেয়ে মাতা ও পুত্র খুব খুসীই হলেন। যোগেশবাবু ছিলেন গ্রামের একজন ছোটখাট জমীদার। ইন্দ্র খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগ্‌ল। ক্রমে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলে। পাশের সঙ্গে দশ টাকা বৃত্তিও পেলে। মা ভাব্‌লেন, এতদিনে বিধাতা বুঝি তাঁদের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন।

তারপর যোগেশবাবু একদিন ইন্দ্রের মাকে বল্‌লেন—দিদি, ইন্দ্রকে আর পড়িয়ে কাজ নেই—তার চেয়ে ও আমাদের গ্রামের স্কুলের মাষ্টারী করুক।

ইন্দ্রের মা বল্‌লেন, তুমি যা' ভাল বোঝ তাই কর ভাই।

বেশীর ভাগ স্থলে এমন ঘটে যে, যাঁর সত্যিকার কোন কর্ত্তৃত্ব নেই, তিনি যদি নিজেকে কর্ত্তা মনে করে সকলের ওপর হুকুম জাহির করেন, তা' হ'লে তাঁকে এবং তাঁর আশ্রিতকে লোক বড় সুনজরে দেখে না। কিন্তু এ স্থলে আশ্রয়-দাতা লোকের বিরাগ ভাজন হলেও ইন্দ্র কারও অপ্রিয় হয় নি। কথায় এবং কাজে সে ছিল ভদ্র, মিশুক এবং সত্যনিষ্ঠ—কাজেই তাকে অপছন্দ করা লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তার ওপর তার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল বড় সুন্দর। এ কথা ছেলেদের এবং তাদের বাপ-মায়ের বুঝ্‌তে একটুও দেরী হয় নি।

ইন্দ্রকে যোগেশবাবুর অনুরোধে তাঁর মেয়ে বালুকণাকেও পড়াতে হতো। বালুকণা ছিল কিশোরী, সুন্দরী এবং তার স্বভাবটী ছিল বড়ই মধুর। যদিও সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিন্তু তার মধ্যে এমন সব গুণ ছিল যা' সহরের অনেক মেয়ের মধ্যে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। ইন্দ্র তাকে বেশ যত্নের সহিত পড়াতে আরম্ভকরলে।

ঘটনাবহুল পৃথিবীতে ইন্দ্র ও তার মায়ের জীবনের ক'টা বছর বৈচিত্র্যহীনভাবে কেটে গেল। ইন্দ্র এখন একুশ-বাইশ বছরের সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক, আর বালুকণা পনের বছরের অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী। কিন্তু তার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। সে বুকের অসুখে প্রায়ই ভুগ্‌ত। মেয়ের জন্য যোগেশবাবু বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। যথেষ্ট পয়সা-কড়িও খরচ করেছেন, ফল কিন্তু কিছুই হয় নি।

কেন জানি না, হঠাৎ একদিন যোগেশবাবুর মনের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি ইন্দ্রকে ডেকে বল্‌লেন—তুমি এখন দু'পয়সা রোজগার করছো, এবার তুমি তোমার মায়ের ভার নাও। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

ইন্দ্র তার মাকে গিয়া বল্‌লে—মা, অনেকদিন ত তুমি দেশছাড়া হয়েছ, এবার বাড়ী যাও। আমি তোমায় মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেব।

ইন্দ্র মাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে গ্রামের লোকজন ভেবে পেলে না—যোগেশবাবু যে ইন্দ্রকে স্নেহের কোলে স্থান দিয়েছিলেন, যার অমায়িক ব্যবহার ও নির্ম্মল চরিত্রে মুগ্ধ হ'য়ে সকলেই যাকে ভালবাসে, তার ওপর যোগেশ-বাবুর এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?

এদিকে ইন্দ্র ও তার মা চলে যাওয়ার পর থেকে বালুকণার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। সে আর কারও সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা বলে না; নিজের ঘরটীতে কেবল চুপ করে বসে থাকে। যোগেশবাবুর স্ত্রী মেয়ের রোগ একদিন ধরে ফেল্‌লেন। তিনি স্বামীকে ডেকে বল্‌লেন—ও গো, কণার হালটা একবার চেয়ে দেখো—ও যেন দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে। এক কাজ কর, ইন্দ্রকে আবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আন—তা' না হলে তোমার মেয়ে কখনই বাঁচবে না।

যোগেশবাবু বল্‌লেন—ক্ষেপেছ, সে আর কখনো আসে! তার চেয়ে বরং আমি অন্য পাত্র দেখি। এমন পাত্র আনব যে, তাকে দেখে কণার আমার খুবই পছন্দ হবে। তখন আর ইন্দ্রের কথা মনেও থাক্‌বে না।

তারপর সত্য-সত্যই সাত-আটদিনের মধ্যে যোগেশবাবু পাত্র ঠিক করে ফেল্‌লেন। পাত্রটী হচ্ছে পাশের গাঁয়ের তরুণ জমীদার।

এই ব্যাপারের প্রায় সপ্তাহ দুই পরে একদিন রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যোগেশবাবুর খড়ের ঘরে আগুন ধরে গেল। গ্রামের লোক ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌ল। চারদিক থেকে কেবল 'জল আন' 'জল আন', শব্দ। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আগুন যখন নিবল, তখন যোগেশবাবু ঘরের মধ্যে চারিদিক সন্ধান কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—হুঁ, এ যে দেখ্‌ছি আমার গুণধর ভাগ্নের কাজ!

পুলিশ তখন ইন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে তাকে আগুন লাগাবার অপরাধে থানায় চালান দিলে।

আজ তার বিচারের দিন। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকের আশা ছিল যে, ইন্দ্র নিশ্চয়ই বেকসুর খালাস পাবে—কিন্তু বিচার আরম্ভ হবার কিছু পরেই লোকের সে আশার সমাধি হয়ে গেল।

যোগেশবাবু আদালতে যে সব প্রমাণ দিতে লাগ্‌লেন, তা'তে ইন্দ্রের খালাস পাওয়া ত দূরের কথা, তার শাস্তি যে কিরূপ হবে তাই জান্‌তেই তখন লোকের কৌতূহল বেশী হয়ে উঠ্‌ল।

যোগেশবাবুর একজন চাকর প্রায় রাত দশটার সময় গরুকে খড় দিতে গিয়ে ইন্দ্রকে সেখানে সন্দেহজনকভাবে ঘুর্‌তে দেখেছিল। যোগেশবাবুও নিজে একটা আংটী হাকিমের সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—এইটা আমি ইন্দ্রকে দিয়েছিলুম। আগুন নেব্‌বার পর খড়ের ঘরের ভেতর থেকে আমি এই আংটীটা পেয়েছি।

বিচারক ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

—না, আমি আগুন লাগাই নি এই কথাটাই শুধু বল্‌তে পারি।" ধীরকণ্ঠে ইন্দ্র উত্তর দিলে।

তারপর অনেকে তাকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বিচারক শাস্তির হুকুম দেবেন, এমন সময় কামরার বাইরে একটা মর্ম্মন্তুদ কান্নার শব্দে সকলে চেয়ে দেখ্‌লেন যে, একটী তরুণী আলুথালু বেশে সেখানে দাঁড়িয়ে। সে ছুটে এসে যোগেশবাবুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্‌লে—বাবা, আগুন আমিই লাগিয়েছি—ইন্দ্র দা' সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ওকে শাস্তি দিলে নরহত্যা পাপের—এই পর্য্যন্ত বলে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। একচাপ রক্ত তার মুখের বাইরে বেরিয়ে এল।

যোগেশবাবু তখন নিজেই পাগলের মত ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আন্‌লেন। অনেক কষ্টে বালুকণার জ্ঞান ফিরে এল। চিকিৎসককে উদ্দেশ করে সে বল্‌লে—আপনি এখন যেতে পারেন ডাক্তারবাবু।

তারপর ধীরে ধীরে সে বলে যেতে লাগ্‌ল—বাবা, আজ আমার মহা আনন্দের দিন। যাবার সময় তোমার কাছে কিছু লুকিয়ে যাব না। তুমি চেয়েছিলে পাশের গাঁয়ের ছোকরা জমীদারের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে। কিন্তু একজনকে শ্রদ্ধার সহিত যখন আমি হৃদয়-আসনে বসিয়ে পূজা করেছি, তখন সেই মন নিয়ে কি করে আবার অপরকে স্বামীত্বে বরণ করব! তাই ভেবেছিলাম—আমি আত্মহত্যা করবো। কিন্তু ইন্দ্র দা' আমাকে বারণ করে। তারপর থেকে আমরা দু'জন দু'জনকে লুকিয়ে চিঠি দিতাম। আমাদের পত্র রাখার গুপ্তস্থান ছিল—ওই খড়ের ঘর। তুমি যে ইন্দ্র দা'কে আংটীটা দিয়েছিলে, সেটা সে একদিন আমাকে ফিরিয়ে দেয়।

সেদিন রাত্রে যখন চিঠি আন্‌তে যাই, তোমার গলার স্বর শুনে আমি পালিয়ে আসি। ভুলবশতঃ জ্বলন্ত কুপিটা ওখানে ফেলে আসি এবং আংটীটাও হাত থেকে পড়ে যায়। পরে ওই কুপিটার দ্বারাই হঠাৎ কি করে যে আগুন লাগে—তা' আমি বল্‌তে পারি না। তারপরই জ্বরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তুমি ত সে কথা—এই পর্য্যন্ত বলে সে খুব হাঁপাতে লাগ্‌ল।

যোগেশবাবু বল্‌লেন—চুপ কর মা, চুপ কর!

একটু দম নিয়ে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—না বাবা। আজ যখন শুন্‌লাম আমার দোষের জন্য ইন্দ্র দা'র শাস্তি হচ্ছে, তখন এই শরীর নিয়ে ছুটে না এসে কিছুতেই আর থাক্‌তে পার্‌লুম না। বিচার! বিচার! আমি শুধু সত্যকার বিচার চাই!

আবার এক চাপ রক্ত তার মুখ থেকে বাইরে গড়িয়ে পড়্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দনও থেমে গেল।

যোগেশবাবু চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লেন—কণা! কণা! মা আমার!

বিচার! বিচার! এই শব্দটাই তখন তাঁর কাণের কাছে বারবার ধ্বনিত হতে লাগ্‌ল।

কমলা মৈত্র

আলো-আঁধারি

শ্রীসত্যহরি মুখোপাধ্যায়

মন্দের সহিত ভাল মিশিয়া ভাল খারাপ হইয়া যাইতেছে দেখিলে যীশুখৃষ্টপ্রমুখ মহাত্মা ব্যক্তিরা যে ভাবের বশে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, প্রভাস ও কল্পনা-ঘটিত ব্যাপারটা একেবারেই সে ধাঁচের নয়। তাহাদের ঘটনাটা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের, কাচের মত স্বচ্ছ, অতি সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত ব্যাপার, পৃথিবীতে যাহা অহরহ ঘটিয়া চলিয়াছে।

ব্যাপারটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি। অতুল ছিল প্রভাসের ক্লাস-ফেলো এবং ছাত্র-নিবাসের রুম-মেট। সেই হেতু প্রভাস অতুলকে ভালই চেনে। অতুল ছিল ঠিক্ সেই টাইপের ছেলে, যাহারা বন্ধু-মহলে বাজী ধরিয়া অক্লেশে গিয়া মেয়েদের অসম্মান করিয়া আসিতে পারে। প্রভাস সেটা পছন্দ করিত না। কল্পনা প্রভাসের প্রেমের পাত্রী। তাই, আজ কিছুদিন হইতে কল্পনাকে অতুলের সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরাবরই সে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছে।

সেদিন যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহা এই আশঙ্কার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করিয়াই।

ঘটনার পূর্ব্বদিন কল্পনা প্রভাসকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও অতুলের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। তাই সে পরের দিনটাতে আরো বেশী আগ্রহের সহিত প্রভাসের আশায় ফটকের কাছটাতে অপেক্ষা করিতেছিল। প্রভাস আসিলে একসঙ্গেই বাহির হইয়া যাইবে। প্রভাস আসা মাত্র তাহার একখানি হাত মুঠার মধ্যে লইয়া কল্পনা বলিল—আজ কিন্তু নদীর ধারটা দিয়ে বেড়াতে যাব।

প্রভাস বিরক্ত হইয়া বলিল—আর ফ্লার্টিং-এর বিশেষ দরকার নেই, হাত ছাড়।

অতঃপর হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া সে সোজা চলিতে লাগিল।

হাতের আঙ্গুলের একটা নখ দাঁতে দিয়া কল্পনা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। যতদূর দেখা যায় তাহার দৃষ্টি প্রভাসকে অনুসরণ করিয়া চলিল। প্রভাস একটী বারও ফিরিয়া তাকাইল না। কল্পনার আকর্ণ সমগ্র মুখটা রক্তিম হইয়া উঠিল। মনের সমস্ত ঘৃণা যেন এক সঙ্গে লুটোপুটি খাইয়া মুখের উপর আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে।

আচমকা চোখের উপর কোনও অচিন্তপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিতে দেখিলে দর্শকের মনে যেমন বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না, নিজের উপর প্রভাসের ব্যবহারের প্রথম ধাক্কাটা কল্পনা ঠিক্ সেইভাবেই গ্রহণ করিল। অনন্তর পরিতাপ ও অপমানে তাহার যেন সমস্ত মাথাটা কাটা যাইতে থাকিল। মুখখানা বিকৃত করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। স্থানটীতে কেহ ছিল না। খানিকটা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে অনেক রকম দুর্ভাবনা বহন করিয়া সে আবাসের দিকে যাত্রা করিল।

কল্পনা কতক্ষণ যে শয্যার উপর পড়িয়াছিল, সে নিজেই বোধ করি ঠিক্ তাহা বলিতে পারিত না। সে ঘুমায় নাই। তবে, বাইরের জগৎটা সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর রাখিবে, এমনও বোধ করি তাহার অবসর ছিল না। তাহার চিন্তাস্থল ছিল মাত্র তাহার অন্তর ও চিন্তার বিষয় ছিল, প্রভাসের সেই অদ্ভুত আচরণ। পরিষ্কার নিথর তাহার হৃদয়-সরোবরের প্রত্যেকটী স্থান সে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিল। তলের যাবতীয় জিনিষ অক্লেশে দেখা যায়, কিন্তু প্রভাসের সেই আচরণের সামান্ত সূত্রটুকুও তাহার নজরে পড়ে না। বাহিরে চাহিয়া দেখিল সন্ধ্যা কখন উৎরাইয়া গিয়াছে। ছাত্রীরা নিজের নিজের আবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে। কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। এখনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আসিয়া পড়িবেন।

কল্পনা তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া দিল। ঘরটী আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেই ক্ষিপ্র হাতে বিছানাটা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া নূতন করিয়া পাতিয়া লইয়া একখানা বই হাতে সে চেয়ারে বসিল। বইটার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ কল্পনা তাহার উপর একবারেই মন বসাইতে পারিল না। কল্পনার মন লাগাম-ছাড়া হইয়া বিবাগী ঘোড়ার মত উর্দ্ধশ্বাসে যেদিকে সেদিকে ছুটিয়া চলে, বই-এর পাতায় নিবিষ্ট থাকিতে চাহে না। একবার ছুটিয়া যায়, ধরিয়া আনিয়া জোর করিয়া পুনরায় তাহাকে পুস্তকের পাতায় সংলগ্ন করিতে হয়। সন্ধ্যা হইতে আহারের ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টুকু কল্পনা এই রকম ভাবে দুইটী বিরুদ্ধ চিন্তা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কাটাইল। আহারের পর শয্যায় শুইতে গিয়া দেখিল তাহার ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত কোমল নারী-হৃদয়খানি দুঃখে ক্ষোভে একবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে। পরিশ্রান্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—অপ-রাধটা কী এমন ভয়ঙ্কর করে ফেলেছি? কিন্তু গলা হইতে কোন স্বর নির্গত হইল না, তাহার বদলে কেবল একটী প্রচণ্ড তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

প্রেমাতুরের মনে বিচ্ছেদের বেদনাটা না দিতে পারিলে বোধ করি প্রেমের যথার্থ স্বরূপটা ধরা পড়ে না, আবার সেই বিচ্ছেদের অবকাশে প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-টুকু মনের ভিতর বসাইয়া রাখিয়া-চাখিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলে সহজে কেহ তাহা ছাড়িয়া দিতেও চাহে না। প্রভাসও তাই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। যতই দিন যাইতে লাগিল, তাহার সেই রস আস্বাদনের পালাও ক্রমশঃ জেদে আসিয়া পরিণত হইল। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থাটা এমন স্থানে আসিয়া পৌছিল, যেখানে গিয়া মাত্র কল্পনার সংবাদটা লইয়া আসে প্রভাসের আর এমন মুখও থাকিল না। এইভাবে দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইয়াছে—ঝোঁকের মাথায় অতবড় একটা ব্যথার আঘাত দিয়া আসার পর কল্পনার মনে সেটা কেমন ভাবে লাগিয়াছে, একবার তাহাকে চোখের দেখা দেখিয়া আসিতে পারিলেও যেন সে বাঁচিয়া যায়। নানা ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে এই রকম একটা উদ্বিগ্নতা লইয়া দোটানার ভিতর দিয়া প্রভাসের দিনগুলি হ-য-ব-র-ল-ভাবে কাটিয়া যাইতে থাকিল।

এদিকে কল্পনা আঘাতের প্রথম ঝোঁকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া মনকে দৃঢ় করিল। উপর্য্যুপরি দিন দুই গত হওয়ার পর যখন অশেষ গবেষণা করিয়াও প্রভাসের ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট কোনো হেতু খুঁজিয়া পাইল না, তখন মনে করিল —একবার না হয় তাহার নিকট গিয়া জানিয়া আসে অপ-রাধটা এমন কী, যাহার জন্য তাহাকে এত শাস্তিভোগ করিতে হইতেছে? পরক্ষণেই অপমানের সেই তীব্র বেদ-নাটা বুকের কোথায় যেন লুকান ছিল, সহসা বাহির হইয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নিজেকে হীন করিয়া উপযাচকের ন্যায় প্রভাসের নিকট উপস্থিত হওয়াটাকে তাহার যেন নিতান্ত বেহায়ার মত দেখাইল। ভাবিল—অপমানিত হওয়ার পরও আবার তাহার দ্বারস্থ হইয়া মহত্ত্ব দেখানর মত অনুগ্রহের পাত্র অন্য কেহ হইতে পারে, কিন্তু প্রভাস নয়। এই ভাবিয়া কল্পনা মনটাকে শক্ত করিয়া বাঁধিল। এখন তাহার পক্ষ হইতেও সেই জেদের পালাটাই চলিতে লাগিল।

* * *

তখন কলেজের সময়। সংস্কৃতের ক্লাসে শেষের দিকে একটা বেঞ্চে বসিয়া কল্পনা শুনিতেছিল বলিলে ভুল হইবে, শূন্য দৃষ্টিতে লেক্‌চার শোনার ভান করিয়া চলিয়াছিল। তাহার বান্ধবী শোভনা দূরে ছিল, উঠিয়া আসিয়া এমন সময় তাহার ঠিক্ পাশটীতে বসিল। বৃদ্ধ অধ্যাপক-মহাশয় অতটা লক্ষ্য রাখেন না। শোভনা কল্পনাকে শুনাইয়া বলিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দিবি?

শোভনাকে এরূপ অদ্ভুতভাবে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া কল্পনা তাহার দিকে একটু উদ্‌গ্রীবের মত তাকাইল, বলিল—কেন ভাই, উত্তর দেবো না?

শোভনা জিজ্ঞাসা করিল—আজ ক'দিন থেকে এমন মনমরা দেখ্‌ছি কেন রে?

কল্পনা তাড়াতাড়ি বলিল—কই না, কিছু ত এমন হয় নি।

শোভনা হাসিল, বলিল—আর্শিটা এনে একবার মুখের সাম্‌নে ধর্‌বো ?

কল্পনা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল—ও, না, অমনি-শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে ক'দিন ধ'রে।

কল্পনার হাত হইতে বইখানা ছিনাইয়া লইয়া কৃত্রিম কোপের সহিত শোভনা বলিল—নে, রাখ্, আর বেশী ন্যাকামীতে কাজ নেই। কি হয়েছে বল্। প্রভাস-বাবুর সঙ্গে কিছু একটা 'খুন্‌সুটী' করেছিস্ বুঝি ?

কল্পনা ইহার কোনো প্রত্যুত্তর করিল না। শুধু ম্লান মুখে নীচের দিকে চাহিয়া থাকিল।

ঘণ্টা শেষ হওয়া মাত্র তাহারা ক্লাসের বাহিরে চলিয়া গেল। পরে আর কোনো ক্লাস না থাকায় উভয়ে ছাত্রী-নিবাসের অভিমুখে যাত্রা করিল। রাস্তায় শোভনা কল্পনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, বলিল—নে, ওসব সৃষ্টিছাড়া ছাইপাঁশ আর মনে করে রাখিস্ নে। মনটাকে একটু হাল্‌কা কর্। অমন মাঝে মধ্যে এক-আধটু হয়েই থাকে।

বেলা অপরাহ্ণের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়া আসিয়া শোভনা ও অতুল কল্পনাকে ধরিয়া লইয়া গেল। অতুল প্রভাসের ক্লাশ-ফেলো এবং রুম-মেট হওয়া সত্ত্বেও প্রভাস কল্পনার মন কসাকসি ঘটিত ব্যাপারটার কিছুই জানিত না। শোভনাও তাহাকে ইহা জানান আবশ্যকতা বোধ করে নাই। অতুল অতি সহজ সরল মনে কল্পনার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে কল্পনা তাহাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই বলিতেছিল না। ছাত্রী ও ছাত্রাবাসকে পৃথক করিয়া দিয়া মধ্যে এক বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান। তাহাতে ছোট বড় নানা আকারের গাছপালা, মাঝে মাঝে খোয়াতোলা রাস্তা। তাহারই মধ্য দিয়া তিনজনে চলিয়াছিল। রাস্তার একটা মোড় ঘুরিতেই সম্মুখে পড়িল একেবারে স্বয়ং প্রভাস। সে কতকগুলি খাতাপত্র লইয়া হন্তদন্তভাবে সেইদিকেই আসিতেছিল। শোভনা এবং অতুল তাহাকে কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—এই যে প্রভাসবাবু, বড় ব্যস্ত যে।

প্রভাস প্রত্যুত্তরে মাত্র বলিল—হ্যাঁ, একটু বিশেষ কাজে—আপনারা বেড়াতে চল্লেন বুঝি ?

কল্পনা এতক্ষণ অতুল ও শোভনার ঠিক্ পিছনটিতে অতি সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভাস আপনার গন্তব্য-পথের দিকে চলিতে গিয়া সহসা কল্পনার দিকে তাকাইল। পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই প্রভাস চোখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা চলিয়া গেল। কল্পনা প্রভাসের দৃষ্টিতে কি যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করিল। সে ইহার মধ্যে কতই না জানি পর হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবী সকলেই আছে, কিন্তু, তথাপি কল্পনার চোখে জগৎটা যেন নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। একটা খুব প্রয়োজনীয় এবং বড় অভাব যেন বারেবারে তাহার বুকে আঘাত দিয়া চিরিতে লাগিল। চাপা কান্নার একটা স্বর তাহার গলা দিয়া ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চায়। অদম্য চেষ্টায় কল্পনা সেটাকে চাপিয়া রাখিল। প্রভাস চকিতে যে চাউনিটা দিয়া গেল তাহা অক্লেশে পড়া যায়—সে যেন কতই বিষাদময়ী, ব্যথাতুর, উদাস এবং অভিমানী। সমস্ত জন-মানুষের স্পর্শ বাঁচা-ইয়া তাহা সন্তর্পণে দূরে দূরে ফিরিতেছে। প্রভাসের আজিকার অবস্থাটা সেই পূর্ব্বদিনের আচরণের সঙ্গে মনে মনে মিলাইয়া দেখিতে গিয়া কল্পনার মনের পটে হঠাৎ যাহা ভাসিয়া উঠিল তাহাতেই তাহার এতদিনের সমস্ত সংশয় বাতাসের মত হাল্কা হইয়া গেল। সেদিন যে সে প্রভাসকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও অতুলের সহিত বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহার ত সঙ্গত একটা কৈফিয়ৎ প্রভাসকে দেওয়া হয় নাই ? তবে কি সেইটাই প্রভাসের রাগের কারণ ? ইহার পর তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। কল্পনা মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে সঙ্গীদের সম্বোধন করিয়া বলিল—শোভনা, আর ভাই আমি বেড়াতে যাব না।

শোভনা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। কিছুক্ষণের জন্য কি একটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা, তবে যা'।

নিজের আবাস-কক্ষে ফিরিয়া গিয়া কল্পনা ভাবিতে লাগিল—এখন কি করা যায়? প্রাণান্তকর কোনো জটিল বিষয়ের কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে সহসা যখন মীমাংসার একটা শেষ সীমান্তে আসিয়া উপনীত হওয়া যায়, সে সময়টার মনের অবস্থা বর্ণনা করা একবারেই অসম্ভব। অন্তর ইহাতে তখন দোয়েল শ্যামা প্রভৃতি যেমন অসীম আনন্দে শিস্ দিয়া উঠে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা মনখানা কোথায় যে উড়িয়া যাইবে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারে না। মীমাংসার আনন্দ ত প্রচুর পাওয়া গেল, এখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কেমন করিয়া বাঁধিতে যাইবে? কেমন করিয়া গিয়া কল্পনা প্রভাসের নিকট তাহার ত্রুটির কথা জানাইয়া আসিবে? এই দুরূহ চিন্তাটা পুনরায় তাহাকে 'কাবু' করিয়া ফেলিল। লোহার ডাঙসের ঘায়ে তাহার বুকটা যেন প্রবলভাবে টিপ্ টিপ্ করিতে থাকিল। অথচ, কথাটা যেন না বলিলেও নয়। সাম্‌নে গিয়া একবার বলিয়া ফেলিতে পারিলে প্রভাস তাহার প্রতি যে ব্যবহারই করুক না কেন, স্বচ্ছন্দে সে তাহা হজম করিতে পারিবে। প্রাণটাকে ইস্পাতের মত শক্ত করিয়া লইয়া কল্পনা আস্তে আস্তে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সোজা ছাত্রাবাসের যে ঘরটিতে প্রভাসের সিট্, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরটী নির্জ্জন। প্রভাসের দেখা না পাওয়ায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় তাহার দৃষ্টি পড়িল প্রভাসের বিছানার উপর। ধোপা কাপড় দিয়া গিয়াছে, তথাপি বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর বদলান হয় নাই। ময়লা বিছানার উপর বই, দোয়াত, কলম ইত্যাদি করিয়া প্রভাসের যাবতীয় সংসার আসিয়া ভিড় করিয়াছে! কল্পনা সযত্নে বিছানার শ্রী ফিরাইয়া যে স্থানের যে বস্তুটি পরিপাটীরূপে সাজাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

দোতালা ছাত্রাবাসের দুই বারান্দার সঙ্গম-স্থলে লোহার গোল সিঁড়ি দিয়া সে নীচে নামিয়া যাইতেছিল। কিছু-দূর গিয়া সহসা দেখিতে পাইল প্রভাস পূর্ব্ব অবস্থাতেই সিঁড়ি বাহিয়া উপরের দিকে আসিতেছে। কল্পনার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। প্রভাস তাহার পাশ কাটাইয়া দুই-তিন ধাপ উঠিয়া যাইতেই কল্পনা স্বস্থানে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—আমার একটা কথা শুন্‌বে?

ভদ্রতার খাতিরে প্রভাস দাঁড়াইল। বলিল—কি বল্‌বে বলো।

গ্রীবা হেঁট করিয়া কল্পনা গাছের একটা পাতা কুচি-কুচি করিতেছিল। মুখ তুলিয়া প্রভাসের দিকে চাহিয়া বলিল—আমাকে এত দুখ্ খু দিচ্ছ কেন? আমি কি এমন অপরাধ ক'—

তাহার কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রভাস দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—সে সব কিছু জানি নে, যাও।

অনন্তর আর অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত-পদে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, মেয়েগুলো কি একেবারে নির্লজ্জভাবেই স্বার্থপর? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সে কল্পনাকে অতুল ও শোভনার সঙ্গে নির্ব্বিকারভাবে বেড়াইতে দেখিয়া আসিয়াছে। আবার দেখিল অক্লেশে আসিয়া 'কর্কেট্রি' করিতেও সে দ্বিধাবোধ করিল না। ভাবিল—ন্যাকামী করিবার এত সাহস তাহারা কোথা হইতে পায়? কল্পনার উপর ঘৃণায় এবং ক্রোধে তাহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।

এদিকে কল্পনা পুনর্ব্বার প্রভাসের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া অভিমানে এবং রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। ঘৃণায় তাহার মনে হইল—মা বসুমতী, তুমি দ্বিধা হও না কেন? অস্পষ্ট-ভাবে মুখে কি যেন বলিতে লাগিল—আমি এলাম কত আশা করে, অহঙ্কারের মুখে ছাই দিয়ে, মনে কর্‌লাম—অপরাধের বোঝাটা ওর পায়ের ওপর রেখে নিশ্চিন্ত হ'ব; কিন্তু হলো কই? ওর যে মন গলে না। দুই পায়ে দিলেন ঠেলে ফেলে। যেন আমি অপবিত্র! আচ্ছা এর প্রতিফল তুমি পাবেই!

সহসা প্রভাসের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কল্পনা সচেতন

হইল। ফিরিয়া মনে মনে আপনাকেই ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কেন ছাই আবার ওর কাছে গিয়ে অপমানের বোঝাটা শুধু-শুধুই ভারী করে এলাম? না গেলেই ত ছিল ভাল?

ইহার উত্তর দিবে কে? কল্পনার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতেছিল। জোর করিয়া প্রতিরোধ করিল।

প্রভাস আপনার ঘরে গেল। খাতাপত্র বিছানার উপর রাখিতে গিয়া দেখিল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল স্থানটী প্রসন্নতার হাসিতে বেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভ্রূ কুঁচকাইল। সক্রোধে বিছানা-পত্র উল্টাইয়া ফেলিতে গিয়া দেখিল, কোথা হইতে এক দোয়াত কালি উপুড় হইয়া পড়িয়া চাদরের প্রায় অর্দ্ধেকটা বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর কোনোদিকে না চাহিয়া বিছানা-পত্র যথাযথ রাখিয়া দিয়া সদম্ভে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

* * *

ছাত্রী-আবাসে আজ পুরুষ ছাত্রদেদের নিমন্ত্রণ। ছাত্রাবাসের সকলকেই রাত্রে ওখানে খাইতে যাইবে। এ প্রথাটা চিরকালই এখানে আছে। ছাত্রীরা মাসের মধ্যে দু'দিন স্বহস্তে রাঁধিয়া পুরুষদের খাওয়ায় এবং এ খাওয়ানর সমস্ত ব্যয়ই ছাত্র-ছাত্রীরাই বহন করে।

সন্ধ্যার পর হইতে ছাত্রী-নিবাসে হাঁকাহাঁকির আর বিরাম নাই—সমস্ত স্থানটা সাড়া-শব্দে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নির্দ্দেশে ছাত্রীরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া এক একটি কর্ত্তব্যের ভার লইয়াছে। একদল রান্নার ব্যবস্থায়, একদল তদারকে, একদল পরিবেশনে, এইরকম করিয়া নানাভাগে বিভক্ত হইয়া কাজ পরিচালনা করিতেছে। কোথাও স্ত্রী-কণ্ঠে শোনা যায়—ওরে শ্রীধর, এদিকে ভাঁড় নিয়ে আয়। কোথাও—ব্রজ, এদিকের বারান্দাটা পরিষ্কার করে দে। কোথাও—রামভজন, কোথায় গেলি, পাতাটা করে দে না? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আলোর ছটায় নানারকমের পোষাক-পরিচ্ছদপরা ছাত্রছাত্রীরা হাসি ও আলাপে উপরের তলা সচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। নীচে স্তূপীকৃত উচ্ছিষ্টের উপর কুকুরের দল কোলাহল তুলিয়া দিয়াছে। ছাত্রেরা একদলের পর আর একদল বসে, খাইয়া পাণ লইয়া চলিয়া যায়, আবার আর একদল বসে।

এইভাবে শেষের দলকে খাওয়াইয়া দিয়া ছাত্রীরা যখন আপনাদের খাবার ব্যবস্থা লইয়া পড়িল, শোভনা তখন নীচে। সকলকে পাণ দেওয়া শেষ করিয়া সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিতেছিল। কোঁচার খুঁটে হাত মুছিতে মুছিতে প্রভাস আসিয়া তাহাকে বলিল—শোভনা দেবী, আমাকে একটা পাণ দিন ত?

—এই যে দি' বলিয়া শোভনা প্রভাসের হাতে একটা পাণ দিল। জিজ্ঞাসা করিল—রান্নাবান্না সব কেমন লাগ্‌ল? পোলাওটা কেমন হয়েছে?

প্রভাস উত্তরে বলিল—বেশ হয়েছে। পোলাওটা অতি চমৎকার!

শোভনা কৌতুক করিয়া বলিল—পোলাওটা কার রান্না জানেন? বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

প্রভাস তাহার দিকে জিজ্ঞাসু হইয়া তাকাইল, পরে রহস্যটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল—তা' আর কি, মিথ্যে বলি নি—বলিয়া দ্রুতপদে নীচের দিকে নামিয়া গেল।

রান্নাঘরে আসিয়া শোভনা চুপিচুপি সমস্ত কথা-গুলিই কল্পনাকে শুনাইল। প্রকারান্তে প্রভাসের মুখে নিজের কৃতিত্বের কথা শুনিয়া কল্পনার মুখখানা আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শোভনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল—সে তোকে আগাগোড়াই ঠাট্টা করেছে জানিস?

প্রত্যুত্তরে শোভনা তাহার গালে কেবল একটা ঠোনা মারিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

* * *

এখন বসন্ত কাল। সকল বস্তুকে ছাপাইয়া বসন্তের ভুবন-ভোলান চেহারাটা একচ্ছত্র অধিকার করিয়া বসিয়া আছে কেবল সেই বিচিত্র বাগানখানায়। বাগানখানা দেখিলেই বেশ বোঝা যায় তাহাতে প্রচুর পয়সা খরচ হয়; তাহার প্রতি মানুষের হাতের যত্ন আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে

পাওয়া যায় কর্ত্তৃপক্ষের রুচির ও মমতার পরিচয়। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়িয়া বাগান। কয়েকটা প্রশস্ত রাস্তা কাননের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। লাল কাঁকরের রাস্তা। তাহার দুইদিকে উঁচু উঁচু শাল-পিয়াল গাছের বীথিকা। সেই বড় রাস্তাগুলিকে ধরিয়া অনেক ছোট ছোট রাস্তাও ইতস্ততঃ বাহির হইয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া, সমস্ত জায়গাটা বিভিন্ন জাতের দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছে পরিপূর্ণ। বড় কৃষ্ণচুড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য রজনীগন্ধা পর্য্যন্ত কোনটাই বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেকটা গাছের গোড়া সুন্দরভাবে খোঁড়া। নীচের দিক্ সতেজ সবুজ ঘাসে ভরপুর। একটাও পাতা পড়িয়া নাই।

একদিন সকালবেলা প্রভাস সেই বাগানের ভিতর দিয়া কি একটা কাজে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়াছিল। বসন্তের সকালবেলা শরৎকালের প্রভাতের মত সঙ্কুচিত, শিশির-সিক্ত, লজ্জা-জড়িত নয়। বেশ ঝরঝরে, কোকিলের সাধা গলার মত মিষ্ট। সবেমাত্র সূর্য্য উঠিয়াছে। চারিদিকের গাছ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। মাথার উপর পাখী ডাকিতেছে। প্রভাস একমনে রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন কাহাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুদূরে একটী মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েটির পরণে একখানা বাসন্তী রঙের সাড়ী, গায়ে বাদামী ব্লাউজ, পায়ে জরির চটি। মুক্তবেণী পিঠের দিকে ঝোলান। আড়ভাবে দাঁড়াইয়া সে একটা তোড়ায় ফুল গুঁজিতেছিল। মুখের একপাশে কোঁকড়া চুলের গোছা পর্য্যন্ত সূর্য্যের ছটা ছড়াইয়া পড়িয়া যেন রামধনুর মত করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাস মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া একটা গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় দেখা গেল, কল্পনা প্রভাসকে ওইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ যেন চম্‌কাইয়া উঠিল। দেখিয়া পরক্ষণে সেইদিকেই আসিতে লাগিল। প্রভাসের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে ডাক্‌ছিলে?

প্রভাস তাহাকে ডাকে নাই। অথচ, জোর করিয়া 'না' বলিতেও পারিল না। মৌনমুখেই দাঁড়াইয়া থাকিল।

কল্পনা পুনরায় বলিল—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। সেদিন অতুলবাবুর সঙ্গে বেড়িয়ে এসে তোমাকে কিছু বলি নি। আমাকে মাপ কর।

প্রভাসের স্বপ্ন ভাঙ্গিলে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কুণ্ঠার সহিত দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কল্পনার কোলের কাছটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। একটি হাত দিয়া কল্পনার মুখ হইতে অলকের গোছা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল—আমি তোমাকে মাপ করবার যোগ্য নই কল্পনা, তুমিই বরং আমাকে মাপ কর।

প্রত্যুত্তরে কল্পনা কোনো কথাই বলিল না। মাত্র তাহার দেহলতাখানি প্রভাসের বুকের উপর এলাইয়া দিল। প্রভাস নিবিড় করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া গালের উপর একটি চুমু খাইতে যাইবে, দেখিল—কল্পনার কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্রীসত্যহরি মুখোপাধ্যায়
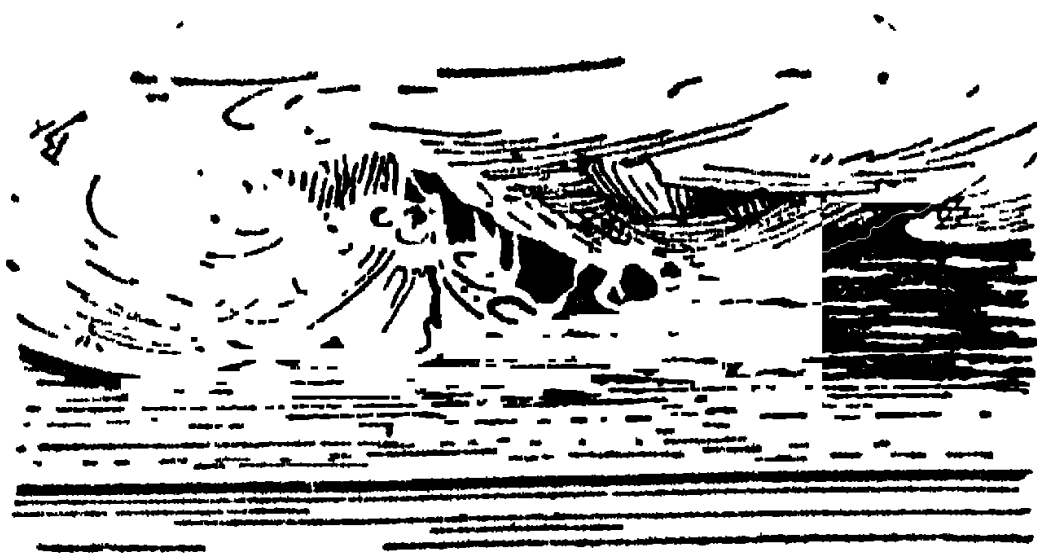
উইল

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

রবিকরদীপ্ত শুভ্র প্রভাত। বেলা তখন প্রায় সাতটা হইবে। মিহির আপন-মনে টেবিলের কাছে বসিয়া কতকগুলা কাগজ-পত্র লইয়া খুব নিবিষ্ট চিত্তে কি পরীক্ষা করিতেছিল। তাহার সম্মুখে রহিয়াছে কতগুলা নানা আকার ও নানা প্রকারের যন্ত্র। কয়দিন হইতেই দেখিতেছি অবসর পাইলেই সে এই সব লইয়া বসিয়া যায়—কি যে করে তা' সেই জানে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তারী পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি। পিতা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাই নির্ভাবনায় দিন কাটাই। চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিবার দিকে আমার একটুও লক্ষ্য নাই। দ্বার সম্মুখে অবশ্য নামের সঙ্গে সদ্য-প্রাপ্ত উপাধিটা জুড়িয়া একটা 'ট্যাবলেট' বসাইয়া দিয়াছি। মধ্যে মধ্যে কলও আসিয়া থাকে। সেটার সঙ্গে অর্থের যে কোন সংশ্রব থাকে নাই, সেটা বলাই বাহুল্য। থাকি মিহিরের বাড়ীতেই। তাহার সঙ্গে ঘুরিয়াই দিন কাটে। মিহির এক-একবার হাসিয়া বলে—কিছু যদি কর্‌বিই না, তবে এত কষ্ট করে ক'টা বছর ডাক্তারী পড়তে গেলি কেন? সময় কাটানর উদ্দেশ্যে?

হাসিয়া উত্তর দিতাম—ঠিক্ তাই।

সত্যই এ ছাড়া আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

সেদিন সকালবেলা এই পল্লীরই একটা বাড়ীতে রোগী দেখিবার জন্য আহ্বান আসিয়াছিল। কাজটা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে জানালার ধারে একটা হাল্‌কা কাঠের চেয়ার পাতিয়া বসিলাম। ইচ্ছা, হাতের বইখানা লইয়া এইভাবে সময় কাটাইব, স্নানাহারের জন্য যতক্ষণ না তাগিদ আসে।

কিন্তু জানালার কাছে গিয়া বইটাতে মন দিবার পরিবর্ত্তে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ ছোট ফুল-বাগানটী পার হইয়াই বিস্তৃত রাজপথ। কর্ম্মব্যস্ত নরনারী ও গাড়ী-মোটরে পথ আচ্ছন্ন। সকলেরই চোখে মুখে একটা চাঞ্চল্য। দেখিতে বেশ লাগিতে ছিল; তাই বহুক্ষণ ধরিয়া একমনে সেই সব দৃশ্য দেখিতে ছিলাম।

একজন ভদ্র যুবক খুব ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে আসিতে ছিলেন। আমাদেরই বাড়ীতে তিনি প্রবেশ করিলেন। মিহিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলাম—অপরিচিত আগন্তুক, সম্ভবতঃ মক্কেল।

কাগজের উপর হইতে চোখ না তুলিয়াই মিহির বলিল—ভাল খবর, আস্‌তে দাও।

একটু পরেই আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া ভৃত্য মন্মথ ঘরে প্রবেশ করিল। মিহির তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বসুন। দেখে মনে হচ্ছে, আপনার বিশেষ কিছু বল্‌বার আছে। বল্‌তে পারেন।

মাথা নাড়িয়া লোকটী বলিলেন—হ্যাঁ, বিশেষ কিছু বল্‌তেই আমি এসেছি—আরও আগে আস্‌তে পার্‌লে খুবই ভাল হতো; কিন্তু কালকের ওই কাণ্ডের পর বাড়ী এসে এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম যে, আজ সকালে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল। সেজন্য ইচ্ছা থাক্‌লেও তাড়াতাড়ি আসতে পারলুম না।

লোকটীর দিকে একবার পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মিহির বলিল—কালকার সেই কাণ্ডটা কি তাই এখন বলুন। দেরী যা' হবার তা' ত হয়েছে, আর বেশী দেরী কর্ব্বেন না।

—না, আর দেরী করব না। আপনি প্রথমে শুনুন; তারপর ভেবে দেখুন—এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এই অবধি বলিয়া লোকটী পকেট হইতে একটা কার্ড বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া বলিল—আমার নাম।

কার্ডটা তুলিয়া লইয়া মিহির পড়িল—শশাঙ্ক রক্ষিত, এম্-এ, বি-এল্, উকীল, হাইকোর্ট।

আপনি ওকালতী করেন?

শশাঙ্ক হাসিয়া উত্তর দিল—করি এ কথা আর বলি কি করে। এ যাবৎ 'কেস' দু'টী বই আর পাই নি। তাও পূরো টাকা না দিয়েই একজন মক্কেল গা ঢাকা দিলে। তারপর আর কেউ মামলা নিয়ে আমার কাছে আসে নি। মক্কেলের জন্যে ব্যর্থ প্রত্যাশায়ই দিন কাটে। এই ত আমার অবস্থা। ভাগ্যে দু'-চারটা টিউসনী আছে—তাই দু'বেলা রান্নাঘরে উনুন জলে; নইলে কি হতো বলা দুরূহ। কিন্তু থাক্ এ অবান্তর কথা। যা' জানাতে এসেছি, তাই বলি। কাল রাত্রি যখন আটটা, সেই সময় একটা কাল রংয়ের মোটর আমার বাড়ীর সাম্‌নে এসে থাম্‌ল। আমি তখন ছেলে পড়ান সেরে সবেমাত্র বাড়ী ফিরেছি। স্ত্রীর রান্না তখনও হয় নি দেখে এক পয়সা দিয়ে কেনা একটা বাংলা খবরের কাগজ নিয়ে বাইরের দিক্‌কার ঘরে বসেছিলুম। আমার ব্যবসায়ের অবস্থা আপনাকে ত আগেই বলেছি। মক্কেল আসবে এ আশা মোটেই ছিল না, আর মোটরে করে আসবার মত ধনী আত্মীয়ের সংখ্যাও খুব কম—কাজেই ওদিকে কোন মনোযোগ দিই নি। ভাব্‌লুম, আর কারও বাড়ীতে হয় ত এসেছে। কিন্তু দরজার কড়া নড়ে উঠল আমারই বাড়ীর। মক্কেল হয় ত হতে পারে ভেবে খুব খুসী হয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই অল্প বয়সী একটী লোক ঘরে এল। চেহারা ও বেশ দেখে তাকে ভদ্রঘরের ছেলে মনে হলেও তার মুখে এমন একটা ভাব ছিল যা' দেখ্‌লেই বোধ হয় লোকটা বড় ভাল নয়। মনটা একটু বিরসই হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা কল্লু'ম—কা'কে চান আপনি?

—ছোট ছোট চোখের অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার মুখের ওপর রেখে সে বল্লে—শশাঙ্কবাবু উকীল বাড়ী আছেন?

—বল্লুম—আমিই। কি দরকার?

—লোকটা যেন খুব খুসী হয়ে উঠেছে এই ভাবে বল্লে—আপনিই, নমস্কার। আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে। আমার কাকা মরণাপন্ন—তিনি উইল কর্ব্বেন; এখনই যেতে হবে। রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি সে জন্যে ফি আপাততঃ এই দিলুম, পরে আরও কিছু দেব। তারপর পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করে সে পাঁচখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিলে।

সামান্য কাজে এত ফি! ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌লেও এর মধ্যে যে অন্য কিছু আছে, সেটা ভাব্‌তে পারি নি অবশ্য। যা' অবস্থা আমার—তা'তে টাকা পেলে যমের বাড়ীও হয় ত যেতে পারি; তা' একটু রাত্রে বেরোন, এ ত তুচ্ছ কথা। স্ত্রীকে বলে টাকা ক'টা তাকে দিয়ে তখনই লোকটার সঙ্গে মোটরে উঠলুম। সে নিজেই গাড়ী চালাতে লাগ্‌ল। ড্রাইভার কেউ ছিল না। কোলকাতা ছাড়িয়ে দমদমের ওদিকে একটা বাগান-বাড়ীতে এসে সে গাড়ী থামালে। তারপর আমাকে খুবই সমাদরের সঙ্গে একটা ঘরে এনে বসালে। সে ঘরে ছিল আর একটী লোক। প্রায় চল্লিশ বছর তার বয়স। একটু রোগাটে চেহারা হলেও দেহে শক্তি আছে মনে হয়। এরও মুখের ভাব যেন কি রকম! চোখের দৃষ্টি যেন আগুনের ফুলকির মত গায়ে বেঁধে। আপনা হতেই যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগ্‌ল।

—আমায় যে এনেছিল, সে একে বল্লে—সব ঠিক্ ত, এঁকে নিয়ে যেতে পারি?

—অন্য লোকটী বল্লে—হ্যাঁ।

—তখন তারা দু'জনে আমায় সঙ্গে নিয়ে দোতলায় চল্‌ল।

এতক্ষণ মিহির নীরবে শুনিতেছিল, এবার প্রশ্ন করিল—সেখানে আর কাকেও দেখেছিলেন?

দু'-একজন লোক—মনে হলো তারা চাকর বা বাগানের মালী। তারপর আমায় নিয়ে তারা ওপরের একটা ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। যে লোকটী আমায় আন্‌তে গেছ্‌ল, সে ভেতরে চলে গেল। আমি ও অন্য লোকটী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু শুন্‌তে পেলুম কে যেন কা'কে বলছে—কই সে উকীল, তাকে ডেকে আনো।

—আমি, আমার কাছে যে ছিল তার সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেলুম। একধারে একটা চেয়ারে বসেছিল একজন

লোক। অদ্ভুত তার চেহারা। অতি রোগা, কঙ্কালসার মূর্ত্তি। চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো; অথচ, তাকে দেখে মুমূর্ষু রোগী বলেও মনে হয় না। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। একজন লোক কতকগুলো কাগজ এনে একটা ছোট টিপয়ের ওপর রেখে আমার কাছে সেটা সরিয়ে আন্‌লে। তারপর সেই অদ্ভুত লোকটার দিকে চেয়ে বল্লে—এইবার লিখ্‌তে হবে।

—সে লোকটা এতক্ষণ কেমন একরকমভাবে আমার দিকে চেয়েছিল, এইবার হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমি উইল করব না—ওভাবে কিছুতেই লিখ্‌ব না!

—লিখ্‌বে না, চালাকী পেয়েছ!

—দুটো লোক বাঘের মত গর্জ্জে উঠ্‌ল। আমি আরও আশ্চর্য্য হয়ে তাদের দিকে চাইলুম। হিংস্র জন্তু শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বার আগে তার দিকে কি ভাবে চেয়ে থাকে সেটা কখনও দেখি নি—কিন্তু ইঁদুর ধরবার আগে বেড়ালের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেটা অনেক বার দেখেছি। এদের দু'জনের চোখেও দেখ্‌লুম সেইরূপ দৃষ্টি। একজন বল্লে— ই মাত্র স্বীকার কর্লে না, উইল কর্বে বলে?

—রুগ্ন লোকটা সে কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—মশায়, আমি আপনাকে আমার এই অবস্থার কথা জানাতে পার্ব বলে এদের কথামত উইল কর্ত্তে রাজী হয়েছিলুম। আপনি আমায় এদের হাত থেকে উদ্ধার করুন। এরা—

—চুপ চুপ, আর একটাও কথা নয়!

—লোক দুটোর চীৎকারে চম্‌কে উঠে দেখ্‌লুম—একজন রিভলভার ঠিক্ তার কপালের ওপর তুলেছে। ভয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বল্লুম—এ কি ব্যাপার! কি মতলব তোমাদের?

—সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লুম আমারও চোখের সাম্‌নে আর একটা রিভলভার। যার হাতে সেটা ছিল, সে বল্লে—চুপ, স্থির হয়ে বসে থাকো! দেখ্‌ছ ত, বাঁচতে যদি ইচ্ছে থাকে, তা' হলে কথা বলো না। তারপর আমার কপালের ওপর পিস্তলটা ধরে রেখেই রুগ্ন লোকটাকে লক্ষ্য করে বল্লে—অন্য কথা একটাও বলো না, শুধু জবাব দাও—উইল কর্বে কি না? একটা কথা—হ্যাঁ, কি না?

—সে লোকটির মাথার ওপর যদিও রিভলভার উদ্যত হয়েছিল, তবুও দৃঢ়স্বরে সে বল্লে—না, সে কথা ত আগেই বলেছি।

—শয়তান, ইচ্ছে করে আমাদের হায়রান কর্‌লে। ভেবেছ—এমনি করে তুমি আমাদের হাত থেকে সরে যাবে—সে আশা করো না। এখনও বলো—উইল কর্বে কি না?

—না না না! কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়! লোকটা খুব জোরে বলেই অবসন্নভাবে চেয়ারে হেলে পড়ল।

—লোকগুলো আমার দিকে চেয়ে কি বল্‌তে গেল, ঠিক্ সেই সময় পাশের একটা দরজা খুলে বছর কুড়ি বয়সের একটা মেয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। সে অবাক হয়ে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, তারপর রোগা লোকটির দিকে নজর পড়তে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—এ কি, কাকা, তুমি!

—সে লোকটা একবার মাথা তুলে চেয়ে বল্লে—সুধা!

—মেয়েটা ছুটে এগিয়ে এল তার দিকে। কিন্তু যে লোকটা আমার সাম্‌নে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে ছুটে এসে তাকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য লোকটা আমার হাত ধরে বাইরে আন্‌লে। কোনো কথা না বলে সে আমায় মোটরে তুল্‌লে। তারপর বল্লে—যদি বাঁচতে চাও, তা' হলে এখানে যা' দেখ্‌লে এর একটি কথাও কাউকে বল্‌বে না—তোমার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত নয়। একথা প্রকাশ কর্লে আমরা জান্‌তে পার্‌ব, তখন যেখানে যেভাবে হোক্ তোমার মরণ নিশ্চিত।

—তার কথা শেষ হবার পর যে আমায় বাড়ী থেকে সঙ্গে করে এনেছিল, যে একটু আগে সেই মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গেছ্‌ল, সেই ছোকরা বাইরে এসে দাঁড়াল। অতি কর্কশভাবে সেও বল্লে—দেখো উকীল, ইচ্ছে কর্লে এখনি তোমায় শেষ করে দিতে পারি, কিন্তু দয়া করে দিচ্ছি না। তবে মনে রেখো, এর একটা কথা যদি কেউ জান্‌তে পারে, তা' হলে তোমার রেহাই নেই—বুঝে কাজ করো।

—আমি তখন ভয়ে ভয়ে বল্লুম—না, আমি কাউকে বল্‌ব না।

—মনে থাকে যেন। চলো, তোমায় রেখে আসি—বলে সে এসে আমার পাশে বস্‌ল।

—তারপর বাড়ীর সাম্‌নে পথে আমায় নামিয়ে এবং আরও একবার সাবধান করে দিয়ে সে চলে গেল। তারপর রাতটা কোনমতে কাটিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। তারা বারণ কর্লে'ও এ আমি না জানিয়ে পারছি না। সেই রুগ্ন লোকটির কাতর ম্লান মুখ কেবলই আমার মনে পড়ছে। সে যে খুব বিপদের মধ্যেই আছে, তা'তে আর সন্দেহ নেই।

শশাঙ্কের কথার উত্তরে মিহির বলিল—আপনার অনুমান ঠিক্। সে ওদের বাদী। বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ওরা তাকে দিয়ে উইল করিয়ে নিতে চায়। উদ্ধার পাবার জন্যেই সে উইল কর্ত্তে সম্মত হয়েছিল—কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয় নি—কোন কথাই সে আপনাকে জানাতে পারে নি। যাই হোক্, যা' জানা গেছে, এই যথেষ্ট। এখন আপনি কি সে বাড়ীটা চিনে বার কর্ত্তে পারবেন ?

মিহিরের প্রশ্নে সোৎসাহে শশাঙ্ক বলিল—পার্‌ব। যদিও রাতের অন্ধকারে নানা পথ দিয়ে ঘুরিয়ে আমায় নিয়ে গেছ্‌ল, তবু সে বাড়ী আমি চিন্‌তে পার্‌ব।

—বেশ, এখনি আমাদের সেখানে যেতে হবে—তবে পুলিশের সাহায্য চাই। আমি পুলিশ-ষ্টেশনে যাচ্ছি।

বিনীতভাবে শশাঙ্ক বলিল—তা'তে আপনার কিছু দেরী হবে ত, আমি তার মধ্যে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আমার স্ত্রীকে সব বলে আসি। কালকের এই ব্যাপার শুনে সে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। আজ যদি আমার ফিরতে দেরী হয়, সে ভেবে অস্থির হবে। আধঘণ্টার মধ্যেই আমি আস্‌ব।

মিহির আসন ছাড়িয়া উঠিয়াছিল। বলিল—যেতে পারেন—কিন্তু আধঘণ্টার বেশী দেরী কর্বেন না; এমনই যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। তাদের পাব কি জানি না—তবে আমাদের যেন দেরী না হয়। আপনি এইখানেই আসবেন। এখানে আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। চলুন তবে, আমিও যাই।

সে অগ্রসর হইল। আমি প্রশ্ন করিলাম—আর আমি, আমি কি করব ?

—মোটরটা গ্যারেজ থেকে বাইরে আন। যা' দরকার হতে পারে সঙ্গে নাও। দুটো রিভলব্যর যেন নিতে ভুলো না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই মিহির ফিরিল—সঙ্গে ইনস্পেক্টর নৃপেনবাবু ও আরও কয়জন পুলিশ কর্ম্মচারী।

মিহিরের 'কার'খানিকে বাহির করিয়া অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। মিহির সমস্ত দেখিয়া বলিল—সব ঠিক্, এবার শশাঙ্কবাবু এলে হয়।

আমরা তখন কয়জনে ঘরে আসিয়া বসিলাম। নৃপেনবাবু বলিলেন—একটা উড়ো খবরের ওপর নির্ভর করে ত চল্লেন, শেষে ঝঞ্চাট না হয় কিছু। যদি তারা নির্দ্দোষই হয়।

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাসিয়া মিহির বলিল—কথায় কথায় যারা রিভলবার বার করে, সংবাদ যারা গোপন করবার জন্যে নিরীহ বেচারীকে প্রাণের ভয় দেখাতে দ্বিধাবোধ করে না, তারা যে সাধু নয় এ বুঝ্‌তে কা'রও বিলম্ব হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এদের বাড়ী 'সার্চ্চ' করার অপরাধে কোন ঝঞ্চাটেই আপনাকে পড়তে হবে না। কিন্তু আধঘণ্টা ত হয়ে গেল, এখনও শশাঙ্কবাবু এলেন না কেন ? বৃথা ব্যয় করবার মত সময় ত আমাদের নেই।

আরও কয় মিনিট ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটাইয়া যখন শশাঙ্কবাবু আসিলেন না দেখিল, তখন অধীরভাবে মিহির বলিল—আর দেরী নয়, এবার যাওয়া যাক্। উঠুন নৃপেনবাবু।

আমি ও মিহির উঠিলাম আমাদের 'কারে'। সদলে নৃপেনবাবুও নিজের গাড়ীতে উঠিলেন। মিহিরকে খুবই চিন্তিত দেখিলাম। বলিলাম—কি ভাব্‌ছ মিহির ?

—ভাব্‌ছি লোকটার কথা—কেন তিনি এলেন না। যতটা দেখ্‌লুম তাঁকে, কাণ্ডাকাণ্ড বোধহীন অর্ব্বাচীন ত তিনি নন্। শিক্ষিত ভদ্রলোক। জীবনের আশঙ্কা সত্ত্বেও

এ ব্যাপার যখন গোপন করেন নি, তখন বোঝা যাচ্ছে তাঁর যথেষ্ট দায়ীত্ববোধ আছে। তবে কেন এত দেরী কর্‌ছেন ?

আরও একটু দেখিয়া মোটরে 'ষ্টার্ট' দেওয়া হইল। তারপর একটা ছোট দোতলা বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া মিহির গাড়ী থামাইল। দ্বার বন্ধ। 'ট্যাবলেটে' নামটা দেখিয়া লইয়া সে পথে নামিয়া দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। সাত-আট বছরের একটী সুশ্রী ছেলে দ্বার খুলিয়া দিয়া বিস্মিতভাবে মিহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মিহির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—শশাঙ্কবাবু বাড়ী আছেন খোকা ?

অদূরস্থ কারখানার দিকে চাহিয়া ছেলেটী উত্তর দিল—না, বাবা ত বাড়ী ফেরেন নি এখনও।

—বাড়ী ফেরেন নি ? কখন বেরিয়েছেন ?

—অনেকক্ষণ, সেই সকালবেলা।

—তুমি ঠিক্ জান খোকা, তিনি বাড়ী আসেন নি ? কিম্বা এসে আবার বেরিয়েছেন ? তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস দেখি।

ছেলেটী বেশ শিষ্ট। তখনই ভিতরে গিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—না, বাবা সকালে সেই যে বেরিয়েছেন, আর বাড়ী ফেরেন নি। মা সেই জন্যে ভাব্‌ছেন।

—তাঁকে ভাব্‌তে বারণ কর। তোমার বাবার ফির্‌তে হয় ত একটু দেরী হবে, কোনো ভয় নেই।

তখন কিছু ব্যস্ততার সঙ্গেই 'কারে' উঠিয়া মিহির বেগে মোটর চালাইয়া দিল। বলিল—যা ভেবেছি, ঠিক্ তাই। শশাঙ্কবাবুর ওপর তারা দৃষ্টি রেখেছিল। পথে যেভাবেই হোক্ তিনি আবার ওদের হাতে পড়েছেন। বেচারীর ভাগ্যে এতক্ষণ কি ঘটল তাই বা কে জানে! এখন সময় মত পৌঁছতে পার্‌লে হয়।

সবিস্ময়ে বলিলাম—এ কি বলছ! দিনের বেলা পথের ওপর থেকে একটা লোককে ধরে নিয়ে যাবে—এও কি সম্ভব!

—জোর করে ধরে নেওয়া অসম্ভব হলেও কোনরকমে ভুলিয়ে নেওয়া বিশেষ আশ্চর্য্য নয়। কে জানে, কি তাঁদের মৎলব! দেখা যাক্ গিয়ে।

গাড়ীর গতি সে আরও বাড়াইয়া দিল। সাধারণ মোটর হইতে মিহিরের এ 'কার'খানির পার্থক্য কিছু বেশীই ছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে নিজের মনোমত করিয়া সে এ খানিকে প্রস্তুত করাইয়াছে। কয় মিনিটের মধ্যে আমরা কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—ভাব্‌ছি, শশাঙ্কবাবু সঙ্গে নেই, সে বাড়ী তুমি চিন্‌বে কেমন করে ?

—পুলিশ-ষ্টেশনে যখন গেছ্‌লুম, তখন খানিকটা পর্য্যন্ত শশাঙ্কবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কাছে কথায় কথায় বাড়ীর বিবরণ যতটা জেনেছি, চেন্‌বার পক্ষে সেই যথেষ্ট। ও অঞ্চলে বড় বাড়ী ত তেমন নেই। যে ক'খানা আছে, তার মধ্যে থেকে আমরা যেটা খুঁজছি সেটাকে পেতে বড় বেশী দেরী হবে না। কিন্তু নৃপেনবাবুর 'কার' রইল অনেক দূরে—তাঁদের জন্যে অপেক্ষায় অনেকটা সময় বৃথাই যাবে।

তখন গাড়ীর গতি কিছু কমাইয়া দিয়া মিহির তীক্ষ্ণ-নেত্রে পথপার্শ্বস্থ বাড়ীগুলা দেখিতে দেখিতে আপন-মনেই বলিতেছিল—পথের বাঁ ধারে সাম্‌নে খোলা জমি.. লোহার গেট, চারধারে উঁচু পাঁচীল—এ নয়, এও নয়, ওটা ত হতেই পারে না, এটা নিশ্চয়ই নয়—

একটা বাড়ী দেখাইয়া আমি বলিলাম—ওই বাড়ীটা হওয়া সম্ভব। ওই দেখো, বারাণ্ডায় একটী অল্প বয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ওকেই বোধ হয় শশাঙ্কবাবু দেখে-ছিলেন। নিশ্চয় এই বাড়ী।

—নিশ্চয়ই এ বাড়ী নয়! শশাঙ্ক-দৃষ্টা তরুণীকে ওভাবে এলোচুলে উদাস-দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে তার অভিভাবকেরা আজ অন্ততঃ দেবে না, এ নিশ্চিত! আমাদের আর বেশী দূর যেতে হবে না, ওদিকের ওই বাড়ীটা নিশ্চয়ই সেই বাড়ী।

সেখানে মোটর রাখিয়া মিহির নামিয়া পড়িল। আমিও তাহার সঙ্গে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যতদূর দেখা যায়, চাহিয়া দেখিলাম—নৃপেনবাবুদের চিহ্নও নাই।

ব্যস্তভাবে মিহির বলিল—ওঁদের অপেক্ষায় থাক্‌লে চল্‌বে না, এস তুমি।

সাহস আমার কিছু কম নয়। তাহাতে বহুদিন ধরিয়া এ সব কাজে মিহিরের সঙ্গী আমি। বিঘ্ন-বিপদ, ঝড়-ঝাপ্‌টা অনেক কিছুই আমার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। তবুও কহিলাম—শুধু আমরা দু'জন ওর মধ্যে যাব, এ কি ঠিক্ হবে? শশাঙ্কবাবু যদি সত্যিই তাদের হাতে পড়ে থাকেন, তা' হলে আমরাও যে এখানে আসব, এও তারা বুঝেছে—আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে তারা যে তৈরী হয়ে নেই, এই বা কে বল্‌তে পারে?

—তবুও আমাদের যেতে হবে অশোক। সামান্য দেরীতে হয় ত খুব বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে।

আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার অনুগামী হইলাম। নিকটে ফটক খোলাই ছিল। হতাশভাবে মিহির কহিল—সব বৃথা হলো, পাখী পালিয়েছে!

—পালিয়েছে কি করে জান্‌লে?

মিহির পথের উপর মোটর 'টায়ারে'র দাগ দেখাইয়া কহিল—ওই দাগ দেখো। পথের ওদিক থেকে এ দাগ আসে নি, এই ঘাস হতেই আরম্ভ। তারা পালিয়েছে—আর খুব অল্পক্ষণই গেছে। দাগটা একেবারে টাট্‌কা।

সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। তারপর পথের দিকে চাহিয়া উৎসাহে বলিয়া উঠিল—ওই নেপেনবাবুরা আস্‌ছেন, চলো ভেতরে যাই।

মিহিরের গাড়ীর কাছেই গাড়ী রাখিয়া নৃপেনবাবু সদলে নামিয়া পড়িলেন। আমরা তখন উদ্যান-পথ পার হইয়া বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দ্বারে বদ্ধ প্রকাণ্ড তালাটার দিকে চাহিয়া হতাশভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নৃপেনবাবু কহিলেন—এ ত একটা খালি বাড়ী দেখ্‌ছি। আসামী কই?

ম্লান হাসির সঙ্গে মিহির বলিল—পালিয়েছে। তবুও আমাদের বাড়ীর ভেতর যেতে হবে।

তালাটার দিকে দেখাইয়া নৃপেনবাবু কহিলেন—কি করে যাবেন? দেখ্‌ছেন না, শেষে কি—

—শেষে যদি কিছু হয়, তার কৈফিয়ৎ আমি দেবো নেপেনবাবু। এখন আসুন, ভেতরে যাবার উপায় কি আছে দেখি।

বারাণ্ডার উপর হইতে নামিয়া মিহির বাড়ীর অন্য ধারে একটা জানালার কাছে আসিল। তারপর দু'টা লোহার শিক্ দু'হাতে ধরিয়া দু'দিকে একটু টান দিল। তাহার দৈহিক শক্তি যে কত বেশী এ আমার ভালরূপ জানা থাকিলেও উপস্থিত অন্য কয়জনের দৃষ্টিতে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা অবর্ণনীয়। লোহার শিক্ দু'টা তখন দু'পাশে বাঁকিয়া পড়িয়া মধ্যে অনেকটা স্থান করিয়া দিয়াছে। নৃপেনবাবুর দিকে চাহিয়া মিহির বলিল—একজন লোক এর মধ্যে দিয়ে অনায়াসে যেতে পার্বে।

—তা' ত পার্বে। কিন্তু কি অদ্ভুত ক্ষমতা মশায় আপনার! ভগবানকে বহু ধন্যবাদ যে, আপনি আমাদের সপক্ষেই আছেন। এই শক্তি যদি আমাদের বিপক্ষে হতো, তা' হলে আর আমাদের—

—দেরী করবেন না নেপেনবাবু, চলে আসুন।

প্রথম মিহির তাহার রচিত পথ দিয়া ওই বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করিল, তারপর আমি, তারপর নৃপেনবাবু এবং অন্য সকলেই ভিতরে আসিলাম। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মিহির তখন প্রত্যেকটী কক্ষ তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। সব কয়টার দ্বারই রুদ্ধ; তবে তালা বন্ধ নয়—শিকল তুলিয়া দেওয়া আছে মাত্র। ছয় সাতটা ঘর দেখার পর একটা কক্ষে পা দিয়াই ত্রস্তে মিহির বাহির হইয়া আসিল। একসঙ্গে সকলে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কি হয়েছে, কি হয়েছে মিহিরবাবু?

—সাবধান, এধারে আসবেন না! ওখানেই থাকুন।

পকেট হইতে তখন একটা মোটা কাপড়ের রুমাল বাহির করিয়া মিহির তাহার নাকের উপর চাপিয়া ধরিল। আমিও তাহার অনুকরণ করিতেছি দেখিয়া হাত নাড়িয়া সে আমাকে নিষেধ করিল। তারপর সেইখানেই থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বারণ না শুনিয়া আমি নীরবে তাহার অনুগমন করিলাম। গাঢ় একটা ধূমে ঘরখানা আচ্ছন্ন। স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। মিহির পকেট হইতে 'টর্চ্চ' বাহির করিল। তাহার আলোতে

দেখিলাম—ঘরের ঠিক্ মাঝখানে হাত-পা বাঁধা দু'টী লোক পড়িয়া আছে। তাহাদের মাথার কাছে একটা বড় পাত্রে আগুন জলিতেছে এবং তাহার মধ্য হইতে অনবরত ধোঁয়া উঠিতেছে। পা দিয়া আগুনের পাত্রটা উল্টাইয়া দিয়া মিহির একজনকে ধরিয়া তুলিল। আমিও অপর ব্যক্তিকে তুলিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে কক্ষের বাহিরে আসিয়া ভূমি-তলে লোকটীকে শোয়াইয়া দিলাম। নৃপেনবাবু সভয়ে বলিলেন—এ কি কাণ্ড! খুন না কি? কি ভয়ানক!

মুখের উপর হইতে আবরণ খুলিয়া মিহির কহিল—তারই আয়োজন। কিরে অশোক, বেঁচে আছে ত?

আমি তখন এক্ষেত্রে চিকিৎসকের যাহা করণীয়, তাহাই করিতেছিলাম। একজনকে পরীক্ষা করিয়া অপরের কাছে গিয়াই সচকিতে কহিলাম—মিহির, এই ত শশাঙ্কবাবু।

সহজভাবেই মিহির বলিল—হ্যাঁ, তিনিই। অন্যটী বোধ হয় সেই লোক—কাল যাঁর উইল কর্‌বার জন্যে শশাঙ্কবাবুকে আনা হয়েছিল। কি রকম দেখ্‌ছিস—বাঁচবে ত?

—শশাঙ্কবাবুর অবস্থা শঙ্কাজনক নয়, কিন্তু এ লোকটীর কথা বলা যায় না। বড় দুর্ব্বল—বোধ হয় অনেক দিন এঁকে না খাইয়ে রাখা হয়েছে। তারপর এতক্ষণ এই বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে থাকায়—

সত্রাসে নৃপেনবাবু বলিয়া উঠিলেন—বিষাক্ত গ্যাস! এঁদের কি গ্যাস দিয়ে—

—হ্যাঁ, এঁদের গ্যাস দিয়ে মারা হচ্ছিল—কিন্তু ঠিক্ সময় মত আমরা এসে পড়ায় তাদের সে সু-উদ্দেশ্য হয় ত সফল হলো না। যাক্ নেপেনবাবু, এ লোক দু'টীকে হস্‌পিটালে নিয়ে গিয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবার ভার আপনার। তারপর একটু থামিয়া মিহির পুনরায় কহিল—একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, যদি তাদের—

হাসিয়া নৃপেনবাবু বলিলেন—এখনও তাদের ধর্‌বার আশা করেন মিহিরবাবু। কখন তারা পালিয়েছে, এতক্ষণে কত দূরে—

—বেশীদূর যায় নি নেপেনবাবু, এদের যখন এখানে ফেলে রেখে গেছে, তখন মনে হয় তারা ট্রেণ পথেই যাবে—কিন্তু দমদম, শেয়ালদা বা হাওড়া দিয়ে তারা যাবে না। মানে, ওই ষ্টেশনগুলোই যে আমরা খুঁজব, তারা তা' বেশ জানে। তারা যাবে বারাকপুর দিয়ে—এইটাই তাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব। এঁদের দেখ্‌বেন, আমি চল্লুম। অশোক, আয়, আর দেরী করিস নে।

মিহিরের এ অভিযান সফল হওয়া সম্ভব নয় এ ধারণা মনে সুদৃঢ় হইয়া থাকিলেও নীরবে তাহার সঙ্গী হইলাম। 'কারে' উঠিতে উঠিতে মিহির বলিল—ওদের অবস্থা দেখে মনে হয়, মিনিট পনেরর বেশী ওরা গ্যাসের মধ্যে ছিল না, নয়?

সপ্রশ্ন নয়নে সে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—তাই মনে হয়। ও গ্যাসের মধ্যে পঁচিশ ত্রিশ মিনিট থাক্‌লে মরণ নিশ্চিত।

—তা' হলে আমরা আসবার মাত্র দু'তিন মিনিট আগে তারা গেছে নিশ্চয়ই। তাদের আমি পাবই অশোক।

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত আমাদের মোটর ছুটিল। যে গতিতে গাড়ী চলিয়াছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে আমার ভয় হইতেছিল, বুঝি পথে কোন বিপদ হয়। কিন্তু মিহিরের নিপুণ হাতের কৌশলে তেমন কিছুই ঘটিল না। নির্ব্বিঘ্নেই আমরা বারাকপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। একখানা ট্রেণ তখন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল। ছাড়িবার বেশী বিলম্ব নাই। লাফাইয়া উভয়ে মোটর হইতে নামিলাম। ষ্টেশন-মাষ্টারকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মিহির নিজের নামের কার্ড তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া সংক্ষেপে কয়টা কথা বলিল। ষ্টেশন-মাষ্টার তখন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিলেন। সবুজ নিশান হাতে গার্ড যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে তাঁহাদের কথা চলিতে লাগিল। আমি ও মিহির ব্যস্তভাবে ট্রেণের প্রতি কামরা দেখিতে লাগিলাম। প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীই দেখা হইতেছিল। বলিলাম—থার্ড ক্লাসটা বাদ দিচ্ছিস কেন মিহির?

—মোটর থেকে নেমে তারা থার্ড ক্লাসে ওঠে নি এটা নিশ্চয়। এ দিক্‌টা হলো, চল্, ও ক'টা গাড়ী দেখে নিই একবার।

একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে দুইজন ইংরাজ যাত্রীর মধ্যে অল্পবয়সী সাহেবী পরিচ্ছদধারী এক যুবক

বসিয়া খুব তন্ময় চিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। তাহাদের হইতে কিছু দূরে বসিয়া দুইটী বৃদ্ধ মাড়োয়ারী পাটের দর অকস্মাৎ কমিয়া গেল কেন সেই সম্বন্ধে জোর আলোচনা চালাইয়াছেন। মিহির সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার খবরের কাগজে নিবিষ্ট চিত্ত ছেলেটীর দিকে চাহিল। তাহার চেহারা কটা হইলেও সে যে বিলাতী সাহেব নয়, এটা নিশ্চয়। কয় সেকেণ্ড ছেলেটীকে দেখিয়া সে আমার দিকে চোখ ফিরাইল। তারপর একেবারে ট্রেণের মধ্যে উঠিয়া পড়িল। আমিও তাহার সঙ্গে গেলাম। আমাদিগকে সহযাত্রী ভিন্ন অন্যরূপে কেহই ভাবে নাই। মাড়োয়ারী দুইজন একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ঠিক্ সেই সময়ই মিহির আর একবার আমার দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ সে ও আমি সেই মাড়োয়ারী দুইটীর হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগাইয়া দিলাম।

বিস্ময়ে সকলে চম্‌কাইয়া উঠিলেও সব চেয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিল খবরের কাগজ-ধারী সেই তরুণের। একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াই সে আবার বসিয়া পড়িল। তাহার সারাদেহ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। মাড়োয়ারীরা এ অভাবনীয় আক্রমণে ক্ষণেক স্তব্ধ ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেও তখনই নিজেদের সংযত করিয়া লইয়া এই মারাত্মক ভুলের জন্য আমাদের দুইজনকে সুমধুর ভাষায় শ্রুতি সুখকর সম্বোধনে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। ট্রেণের দ্বারে তখন রেলওয়ে পুলিশের লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন ইংরাজ মিহিরকে প্রশ্ন করিয়া কি ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। সংক্ষেপে অপরাধের বিবরণ জানাইয়া সে অপরাধী দুইজনের চুল ধরিয়া টান দিল। একজনের শুভ্র কেশরাজি, অপরজনের শাদা কালো মিশান অলকগুচ্ছ এক টানেই তাহার হাতে চলিয়া আসিল। যাত্রী কয়জন অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পুলিশের একজন কর্ম্মচারী তখন ট্রেণের মধ্যে উঠিয়া আসিলেন। ছেলেটীর দিকে চাহিয়া মিহির বলিল—দেখুন সুধাদেবী—

ছেলেটী অত্যন্ত চমকিয়া মিহিরের দিকে চাহিল। গভীর ভয়ে তাহার সারা মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মিহির বলিল—সুধা দেবী, এইবার আপনাকে দয়া করে একবার পুলিশ-ষ্টেশনে যেতে হবে। অবশ্য আপনার সঙ্গী দু'জন সঙ্গেই থাক্‌বেন। আপনি অনুগ্রহ করে উঠে পড়ুন।

ছেলেটী তেমনই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। তখন অপেক্ষাকৃত কঠোর-কণ্ঠে মিহির বলিল—ও ভাবে আর বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। ট্রেণ ছাড়তে এমনই অনেক দেরী হয়েছে—আর নয়।

এবার ছেলেটী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—হ্যাঁ, এই ত বেশ লক্ষ্মী মেয়ের কাজ! আসুন, নেমে আসুন। ইনস্‌পেক্টর-সাহেব, এবার আপনি আপনার আসামীদের বুঝে নিন্।

তিন

স্নান আহার সারিয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া আমরা যখন 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে' আসিলাম, তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। শশাঙ্কবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতেছিলেন। অন্য লোকটী তখনও শয্যাশায়ী। শুনিলাম, অবস্থা তাঁহার আশাজনক হইলেও ভাল হইয়া উঠিতে কিছু বিলম্ব হইবে। বহুদিন অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকায় দেহ তাঁহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি ও মিহির তাঁহার নিকট আসিলাম। ভদ্রলোকের তখন চেতনা ফিরিয়াছে, মৃদুস্বরে কথাও বলিতেছেন। নাম শুনিলাম, জলদনাথ। মিহিরের পরিচয় পাইয়া সজল চক্ষে বহু ধন্যবাদ দিয়া তাহাকে তিনি নিজের কাছে বসিতে বলিলেন। আমরা বসিলাম। লোকটীর চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। কোমল কণ্ঠে মিহির বলিল—আপনার ওপর এ উৎপীড়নের কারণ কি জান্‌তে বড় আগ্রহ হচ্ছে জলদবাবু, যদি কষ্ট না হয়—

ক্ষীণকণ্ঠে জলদবাবু বলিলেন—কষ্ট হবে না, বল্‌ছি সব কথা। এ আমাদের কলঙ্কের কাহিনী—কিন্তু প্রকাশ না করেও ত উপায় নেই। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—সুধা আমার দাদার একমাত্র কন্যা। অল্প বয়সেই সে তার মা-বাপকে হারায়। আমি নিঃসন্তান। মেয়ের মত স্নেহ-যত্নেই আমি তাকে পালন করি। লেখাপড়া শেখাই, ওস্তাদ রেখে গান-বাজনাও

শিক্ষা দিই। আমার স্ত্রীও তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কিন্তু তার খুব প্রতিদানই সে আমাদের দিয়েছে! যাক! তারপর সুধার বয়স যখন ষোল, তখন তার বিয়ের চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লুম। হঠাৎ মেয়ে বলে বস্‌ল—সে একজনকে ভালবাসে; তার সঙ্গে বে না দিলে বিষ খেয়ে মরবে। আমি তো অবাক্! আমরা সেকেলে মানুষ—বিয়ে সম্বন্ধে মেয়েদের যে আবার নিজস্ব মতামত থাকে, এ আমার ধারণা ছিল না। স্ত্রী বল্লেন—বড় মেয়ে, লেখাপড়া শিখ্‌ছে, তার ইচ্ছে মতই বিয়ে হোক্—কি কর্ব্বে আর। সুধাকে জিজ্ঞেস কর্লুম—কে সে? মেয়ে বল্লে—কোলকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে যখন সে পড়ত, তখন ছেলেটীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। সেখানেই তাদের বাস। তখনই কোলকাতা এলুম—

মিহির প্রশ্ন করিল—আপনি থাকেন কোথায়?

—আমি থাকি আসানসোলে। সেখানেই রেলে চাকরী কর্ত্তুম। তারপর কয়লার কাজ আরম্ভ করি। ভগবানের দয়ায় তা'তে যথেষ্টই লাভ হয়েছিল। যা' হোক্ কিছু সঞ্চয়ও করেছি। সেই জন্যই ত এত কাণ্ড।

—বুঝেছি। বলুন তারপর।

—তারপর সুধা যে ঠিকানা বল্লে, সেখানে এসে খবর নিয়ে ছেলেটীর প্রকৃতির যা' পরিচয় পেলুম, তা'তে মনে হলো এর চেয়ে মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়াও তার পক্ষে মঙ্গলের হবে। বাড়ী এসে সুধাকে সেই কথা বলে অন্য জায়গায় তখন তার বিয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে লাগ্‌লুম। হঠাৎ একদিন সকালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কি যে হয়েছে সব বুঝ্‌লুম। স্বামী স্ত্রী তখন গোপনে চোখের জল মুছে প্রচার করলুম—মেয়ে আবার পড়তে কোলকাতা চলে গেছে। তারপর ছ' মাস পরে পেলুম এক চিঠি। সুধা লিখেছে—অন্য উপায় না দেখে তার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে সে বাড়ী ছেড়ে চলে আসে। ছেলেটী তা'কে বিয়ে করেছে। তারা খুব সুখেই আছে। তার কষ্ট কেবল আমাদের স্নেহে বঞ্চিত হওয়ায়। আমি যদি একবার তাকে গিয়ে আশীর্ব্বাদ করি, তা' হলে আর তার কোন দুঃখই থাক্‌বে না। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতে করে মানুষ করেছি ত। স্ত্রীও বল্লেন—ছেলেমানুষ যা' করে ফেলেছে তার ত আর চারা নেই। যাও তুমি, একবার তাকে দেখে এস। সেইদিনই আমি কোল্‌কাতায় চলে এলুম। চিঠিতে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেই বাড়ীতে আসতেই দেখা হলো ওই দু'জন লোকের সঙ্গে। অল্পবয়স্ক যে, তাকেই সুধার স্বামী বলে মনে হলো। ছেলেটী আমায় খুব আদর করে ঘরে বসালো। একথা সেকথার পর যখন সুধাকে দেখ্‌তে চাইলুম, তখন হঠাৎ দু'জনে দু'দিক থেকে দুটো রিভলবার বার করে বল্লে—আমার সমস্ত সম্পত্তি এখনই সুধাকে দানপত্র করে দিতে হবে। না হলে সেখান থেকে আর আমি বাইরে যেতে পাব না। মেয়েটা যে কি রকম লোকের হাতে পড়েছে সবই বুঝ্‌লুম। যদিও তখন তাদের কবলে, তবুও আমার অত কষ্টের উপার্জ্জিত সম্পত্তি ঐ দুটো পাষণ্ডের হাতে পড়বে এ প্রস্তাবে আমি কিছুতেই সম্মত হতে পারলুম না। ওরা সেইদিনই সেই বাড়ী থেকে আমায় সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আমার ওপর অত্যাচার সুরু হলো। পাঁচ ছ'দিন অন্তর সামান্য কিছু খেতে দিত। তারপর সময় নেই, অসময় নেই আমার পিঠে চাবুক পড়ত। তবুও আমি রাজী হই নি।

প্রশংস-নয়নে মিহির তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—খুব সহ্যগুণ ত আপনার! বুদ্ধিও ধন্যবাদের যোগ্য! আপনি সেদিন উইল করতে রাজী হওয়ায় শশাঙ্কবাবুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেই ত এত সহজে রেহাই পেলেন।

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া জলদবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্ষীণকণ্ঠে তিনি কহিলেন—হঠাৎ কেমন মনে হলো, এইভাবে যদি মুক্তির কোনো উপায় হয়। অবশ্য এর জন্যে শশাঙ্কবাবুকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছে—

হাসিয়া মিহির বলিল—তা' হোক্! আপনাকে যে উদ্ধার করতে পারা গেছে এই আমাদের পরম লাভ। ও কষ্ট শশাঙ্কবাবু মনেই রাখ্‌বেন না। আচ্ছা শশাঙ্কবাবু, বলুন ত, আবার আপনি ওদের হাতে গিয়ে পড়লেন কি করে?

—আপনারই নাম করে তারা আমায় নিয়ে গেছ্‌ল। যেই বাড়ীর কাছে এসে পৌচেছি, সেই সময় একটা লোক মোটরে করে এসে বল্লে—মিহিরবাবু আপনাকে এখনই যেতে বল্লেন—ভারী দরকার।

—আমিও তাই মনে করেছিলুম—বলিয়া মিহির একবার নীরবে হাসিল। আর কোনো কথা বলিল না।*

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

* ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

হলিউডের বিচিত্র-সংবাদ

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসিক অভিনেতা কে ?

বিদেশী 'কমিক' অভিনেতাদের মধ্যে চার্লিচ্যাপ্‌লিনের নাম বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ এবং ঘরে ঘরে বিরাজমান। নির্ব্বাক ছবির যুগে এমন চিত্রামোদী খুব অল্পই ছিলেন, যাঁহার নিকট চার্লি ছিলেন অপরিচিত। চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় ব্যাপারেও চার্লির সমকক্ষ অভিনেতা আজও খুব কমই আছেন।

চার্লির পরে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন হারল্ড-লয়েড। অভিনয়ের দিক্ দিয়া তুলনা করিলে লয়েড অবশ্য চার্লির সহিত কোন অংশেই সমকক্ষ নহেন। তাহা হইলেও লয়েড-এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং চাহনির ভঙ্গী তাঁহাকে দিনকয়েক খুবই জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর আসিল সবাক্ ছবির যুগ। চার্লির অভিমত, ছবিতে কথা বলিলে কৌতুকের রসভঙ্গ হয়। এই বলিয়া তিনি পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সবাক্ ছবিতে লয়েডও বিশেষ বৈচিত্র্য দেখাইতে পারিলেন না। এদিকে ধীরে ধীরে 'মেট্রো গোল্ডউইনে'র লরেল-হার্ডি এবং 'রেডিও পিকচার্সে'র হুইলার-উলসি কৌতুক-চরিত্রে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতে লাগিলেন। লরেল-হার্ডির কৌতুক-চিত্র হুইলার-উল্‌সি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও, শেষোক্ত দুইজনের কৌতুক-চিত্রে কতকগুলি অবদান একেবারে অবজ্ঞা করিবার নহে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। অবশ্য একথা সত্য, বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতা চার্লি যদি আজ পথ ছাড়িয়া না দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে শেষোক্ত কয়জনের বিশেষ কিছু সুবিধা হইত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ—চার্লি-অভিনীত যে কোন ছবির সহিত শেষোক্ত অভিনেতাদের একখানি ছবির তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে।
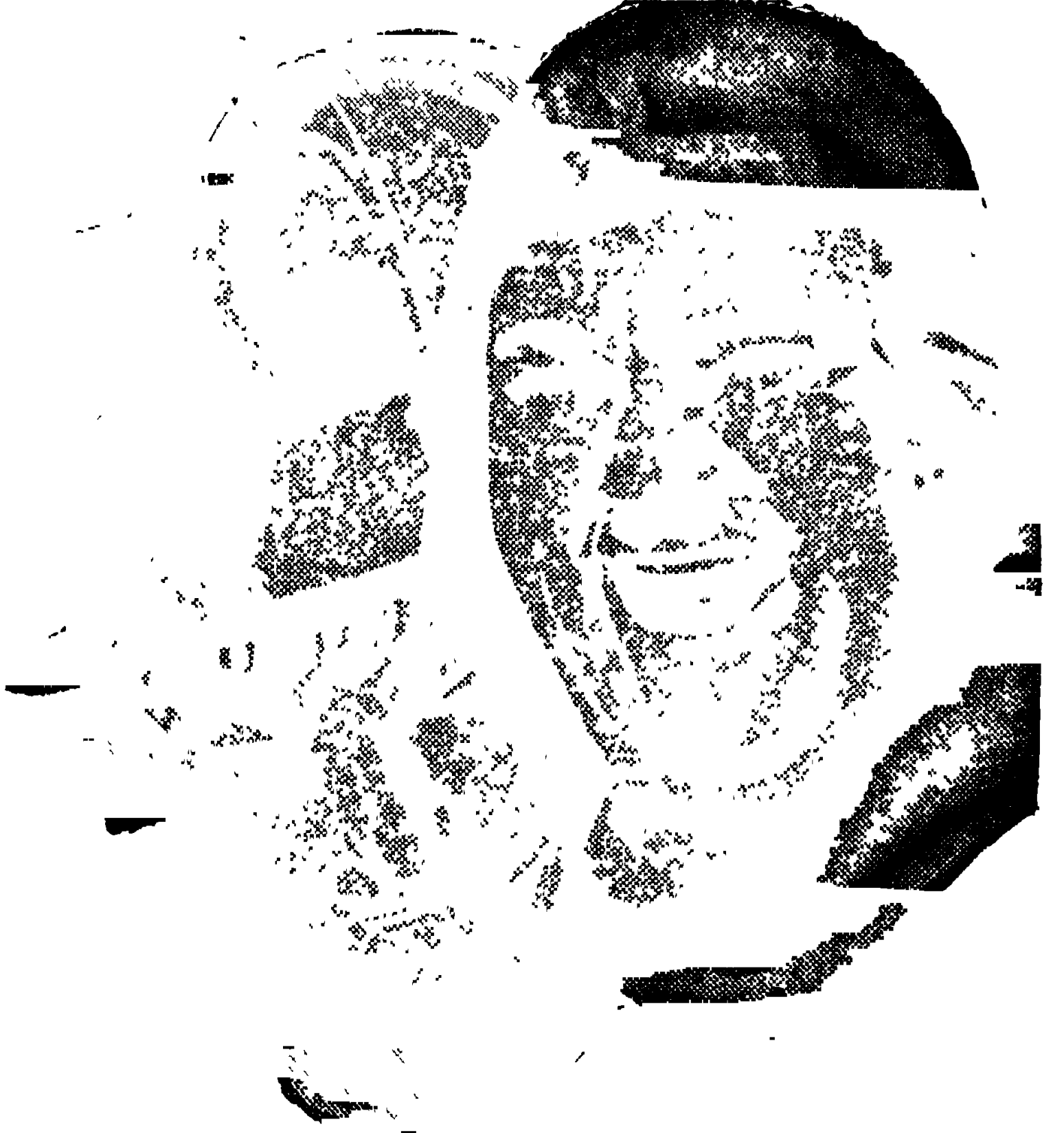
'মেট্রো'র হাস্য-রসিক অভিনেতা ষ্ট্যান্ লরেল এবং অলিভার হার্ডি ইঁহাদিগকে 'থিকার দ্যান্ ওয়াটার' পুস্তকে সম্প্রতি দেখা গিয়াছে।
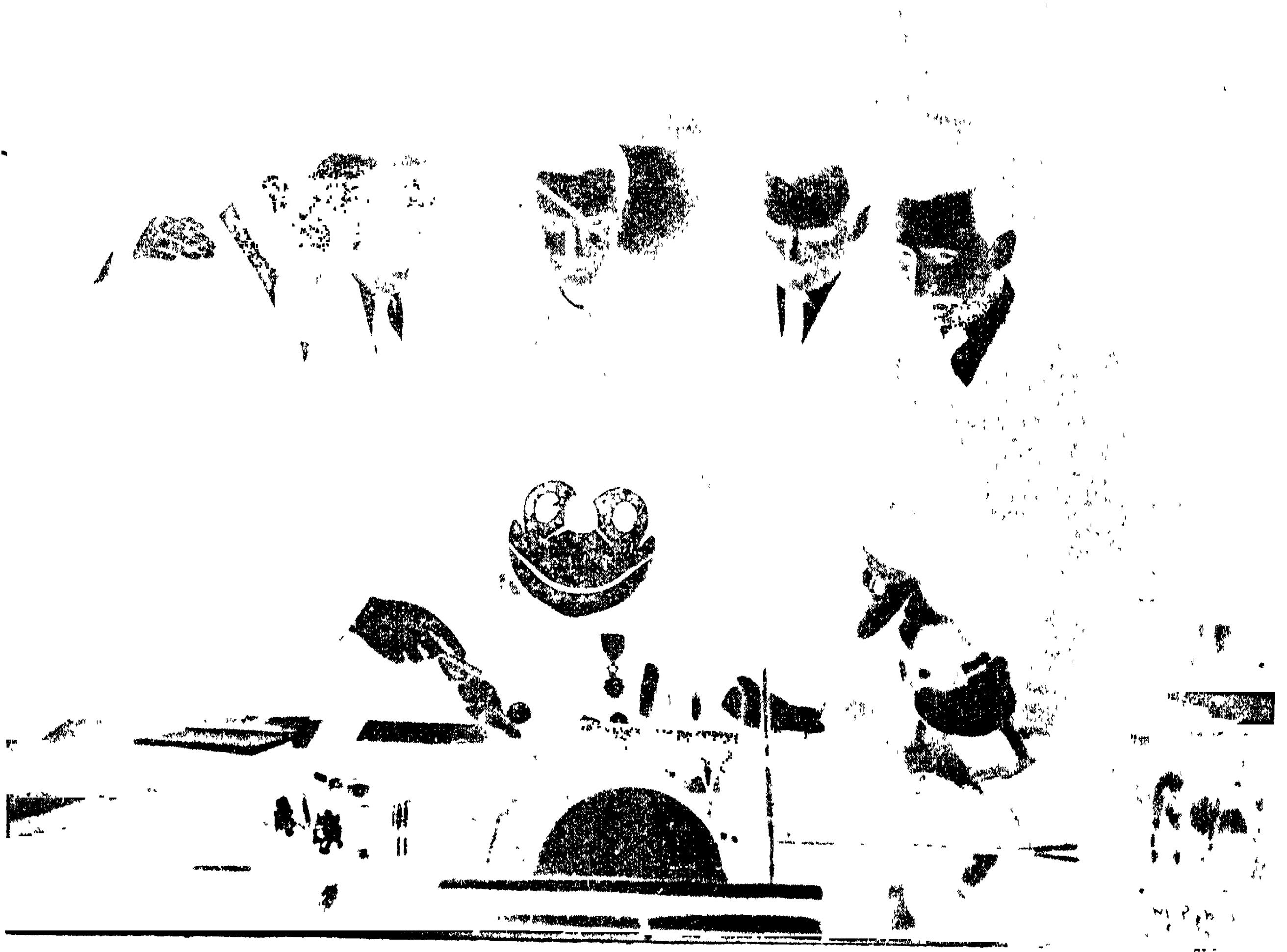
মিকি মাউস কণ্ট্রাক্ট সহি করিতেছে। এই দিক্ দিয়া কথা-চিত্র কতদূর উন্নতি করিয়াছে, এই ছবিখানি দেখিলে কতক বোঝা যাইবে।

সবাক্ চিত্রে অভিনয় করিলে কৌতুকের রসভঙ্গ হয় বলিয়া চার্লি যে সবাক্ চিত্রে অভিনয় করিতে পারেন না, এ কথা যেন কেহ না মনে করেন। তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ চার্লি অভিনীত 'দি কীড' ছবিখানি। এই ছবিখানি যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাকে চার্লির সবাক্ চিত্রে অভিনয়ের শক্তি সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অল্পদিন হইল হারল্ড-লয়েডও 'দি মিল্কি ওয়ে' (The Milky Way) পুস্তকে অভিনয় করিয়া নিজের পুরাতন শক্তির কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। ইহারই পূর্ব্ববর্ত্তী ছবি 'ক্যাট্স্ প' (Cat's paw) আমাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ দিতে সমর্থ হয় নাই।

অতি আধুনিক কৌতুক-চিত্র 'থিকার দ্যান্ ওয়াটার' (Thicker than water) পুস্তকে 'মেট্রো'র তরফ হইতে লরেল-হার্ডি সম্প্রতি তাঁহাদের কৌতুক অভিনয়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 'রেডিও পিকচার্সে'র 'রিও রিটা' (Rio Rita) পুস্তকে হুইলার-উলসির অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাহা হউক, কমিক অভিনেতা চার্লি, লয়েড, লরেল এবং হার্ডির জীবনী একাধিকবার বহু পত্রিকায় আলোচিত হইয়া গিয়াছে। আজ 'রেডিও'র কমিক অভিনেতা হুইলার এবং উল্সির জীবনী-সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিব।

হুইলারের পুরা নাম বার্ট হুইলার—জন্মভূমি প্যাটারসন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার রঙ্গমঞ্চ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিছুদিন ছোটখাট কয়েকটা কোম্পানীতে অভিনয় করিবার পর, হঠাৎ কমিক অভিনয়ের দিকে ইনি ঝোঁক দেন এবং কিসে

এই দিক্ দিয়া উন্নতি করা যায়, সেইদিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। প্রথমে অবশ্য অগ্রসরের গতি খুবই ধীর হইতে লাগিল। পরে একদিন হঠাৎ বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতা হ্যারি গিবন্স (Harry Gibbons) কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় হুইলার তাঁহার চরিত্রে অভিনয় করিবার সুযোগ পান এবং সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। বিখ্যাত জিগ্‌ফেল্ড তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং 'রিও রিটা' পুস্তকে অভিনয় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই ছবিখানি বাজারে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এ ছাড়া, তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।

সাধারণ মানুষ হিসাবে হুইলার বেশ অমায়িক এবং হাস্য-রসিক। ছেলেবেলায় একবার তাঁহার গলার স্বর খারাপ হওয়ায় ডাক্তার অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহা আরোগ্য করেন। সেইদিন হইতে হুইলার ডাক্তারদিগের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ এবং তাঁহাদের অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখেন।

পার্টনার-অভিনেতা রবার্ট-উল্‌সির সহিত ইঁহার অত্যন্ত ভাব এবং উলসি-পরিবারের সহিত তিনি অনেক দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খেলা গল্‌ফ্ এবং বক্সিং। তাহা ভিন্ন একাদিক্রমে ছয়দিন সাইকেল চাপার বাতিক ইঁহার খুব আছে। ইঁহার অভিনীত কয়েকখানি বিখ্যাত ছবির নাম: 'রিও রিটা', 'ডিক্সিয়ানা', 'হুক্, লাইন এণ্ড সিঙ্কার', 'ক্রাক্ট নাট্‌স্', 'সো দিস্ ইজ্ য্যাফ্রিকা' ইত্যাদি।

উল্‌সির পুরা নাম রবার্ট-উলসি—জন্মভূমি সিন্‌সিনাটি। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন একজন জকি—বেশ নামও করিতেছিলেন—হঠাৎ একদিন ঘোড়া হইতে ভীষণভাবে পড়িয়া গিয়া তাঁহার জীবনধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। চাকরী লইলেন ষ্টেজ-ম্যানেজারের। হঠাৎ একদিন একটী তৃষ্ণার্ত্ত অভিনেতাকে জল খাওয়াইবার পর, তাঁহার যুক্তিমত উলসি থিয়েটারে যোগ দেন। কিন্তু অভিনয়ের দিক্ দিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য না হওয়ায় থিয়েটারের শিক্ষকের পরামর্শ মত কমিক চরিত্র অভিনয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। এইদিকে তিনি প্রথম হইতেই বেশ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। মুখে লম্বা সিগার এবং চোখে মোটা কালো শেলের চশমা তাঁহার কমিক মেক্-আপের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। মিঃ জিগ্‌ফেল্ড কর্ত্তৃক 'রিও রিটা' পুস্তকে নিযুক্ত হইবার পর হইতে তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ইঁহার ডাক নাম কার্ডিনাল।—প্রিয় খেলা মাছধরা, গল্‌ফ্, ব্রীজ্। তবে অবসর পাইলেই তাঁহাকে ছিপের সদ্ব্যবহার করিতে দেখা যায়। প্রত্যেক কমিক পুস্তকে হুইলার ইঁহার পার্টনার; কাজেই দুইজনের বিখ্যাত ছবি এক।

দেশী-বিদেশী ছবির কথা—

সম্প্রতি এক ভদ্রলোক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—বিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশী চলচ্চিত্রের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজও ঠিক্ সেইরূপই আছে—ইহার বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নাই। শুধু যেটুকু হইয়াছে, তাহা ভাষা বৈচিত্র্যের। কথাটা একটু অপ্রিয় হইলেও বাস্তবিকই সত্য। চলচ্চিত্র জগতে য়্যামেরিকা প্রত্যহ যেরূপ উন্নতি করিতেছে, সে তুলনায় আমাদের দেশী ছবিগুলির নাম পর্য্যন্ত করা যায় না—নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। দেশী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'নিউ থিয়েটার্স' কোম্পানী তবু কতকাংশে দেশের মুখ রক্ষা করিয়াছেন—সেই হিসাবে তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বাকী দেশী কোনো কোম্পানীই নিখুঁত ছবি তুলিতে আজ পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই—ইহা অতীব দুঃখের কথা। 'দেবদাস', 'ভাগ্যচক্রে'র পরে কোনো ভাল বাঙ্‌লা বই দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সম্প্রতি 'দেবদত্ত ফিল্মসে'র 'রজনী' বা 'চন্দ্র ফিল্মসে'র 'পরপারে' বা 'ভারতলক্ষ্মী'র 'বাঙ্গালী' কোনটাই আমাদের আনন্দ দিতে পারে নাই। আমাদের মনে হয়, উপযুক্ত পরিচালকের অভাবেই দেশী ছবি উন্নতি করিতে পারিতেছে না। সেদিন 'ফক্স ফিল্ম কোম্পানী'র 'কান্ট্রি ডক্টর' নামক একখানি ছবি দেখিয়া আসিয়া এই কথাই আরো আমাদের মনে দৃঢ়মূল হইয়াছে। 'কান্ট্রি ডক্টর' পুস্তকের গল্পটী নিতান্তই মামুলী ধরণের; অথচ, ভাল পরিচালনার গুণে ছবিখানি এমনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে যে, অভিনয়ের পরেও মনে বেশ একটা দাগ রাখিয়া যায়। অথচ, আমাদের দেশী পরিচালকবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি হাতে লইয়াও তাঁহাদের গলা টিপিয়া মারিয়াছেন। ইহাতে আমাদের শক্তিহীনতার কথাই প্রকাশ করে। সম্প্রতি 'গ্রেট্ জিগ্‌ফেল্ড' পুস্তকে 'মেট্রো'র জনৈক বিখ্যাত পরিচালক-মহাশয় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সত্যই তাহা অতুলনীয়—আমাদের দেশী ছবিতে এসব জিনিষ স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। কাজেই আমাদের মনে হয়, দেশী ছবি উৎকৃষ্ট করিতে হইলে জনকয়েক ভাল পরিচালক তৈয়ারী করা বিশেষ প্রয়োজন—নতুবা আজও আমরা যে তিমিরে, আগামী পঞ্চাশ বৎসর পরেও ঠিক্ সেই তিমিরেই থাকিব।

শ্রীকার্ত্তিক শীল

শ্রীমতী যমুনা

পঞ্চপুষ্প

দ্বাদশ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৩ | সপ্তম সংখ্যা

সাগরিকা

পূর্ণশশী দেবী

এ যেন এক নেশা ধরে গেছে—সাগরের নেশা!

সাগর যেন ডাকে—ওরে, আয়! আয়! আয়!

সকালে, দুপুরে, বৈকালে, রাত্রে, জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে সকল সময় তার নতুন নতুন রূপ আমায় মুগ্ধ করে। যত দেখি, ততই দেখার আগ্রহ যেন বেড়ে যায় আরো।

কী মহান্, সুন্দর, বিরাট, বিচিত্র এই জলধি! কী অসীম রহস্য গোপন রয়েছে ওর বিশাল বুকে! সুদূর প্রসারিত শুভ্র সৈকতে বসে' দেখ্‌ছিলাম রক্ত তপন সাগরের ঘন নীল জলে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার তরল ছায়া ঘনিয়ে এসে জলধির বিরাট প্রশান্ত রূপকে গম্ভীরতর করে তুল্‌ছে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী। আজ চাঁদ উঠতে দেরী আছে। সাগরতট নির্জ্জন হয়ে আসে ক্রমশঃ। তবু উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিলাম না। সাগরের নীলজল কালো হয়ে গেছে—তবু কী সুন্দর!

—কে তুমি? তুমি কে গো?

কে যেন বলে সেতারের মৃদু ঝঙ্কারের মত মধুর গুঞ্জন সুরে—কে ও?

চকিত হয়ে চারিদিকে দেখি—কই, কেউ তো নেই!

আবার কানে এল সেই সুর। এবার স্পষ্ট—কথা কও না কেন?

আমি চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সবিস্ময়ে বল্‌লাম—কে তুমি? কি বল্‌ছ?

—আমি? আমি সাগরিকা, জলনারী।

—জলনারী! কই, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখ্‌ছি না তো?

—কেমন করে দেখ্‌বে? দেখ্‌বার মত যখন ছিলাম—সুন্দরী সাগরিকা, কবির মূর্ত্ত কল্পনা, তখন যদি দেখ্‌তে! এখন আর কি আছে! শুধু একখানি ব্যথাহত

অদেহী আত্মা বাতাসে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছি সাগরে বুকে! আমার ব্যথার কাহিনী শোনাবার লোকও পাই না খুঁজে। তুমি যদি শোনো—তুমি তো মানুষ, না? আহা, মানুষ বড় ভাল, কিন্তু বড় নির্দ্দয়!

একটা গভীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

অতিমাত্র বিস্ময়ে, আগ্রহে, অধীরভাবে বল্‌লাম—কেন? মানুষ তোমার কি করেছে বলো তো?

—মানুষের জন্যেই তো আজ আমার এই দশা! রাজকুমারী সাগরিকা—

—তুমি রাজকুমারী?

—হ্যাঁ গো! একদিন—সে যে কতদিনের কথা তা' বল্‌তে পারি না, তখন আমি এই সমুদ্রের রাজকন্যা ছিলাম। মাকে আমার মনে পড়ে না। আমি যখন ছোট্ট, তখন তিনি মারা যান। কিন্তু মায়ের অভাব আমি বুঝ্‌তে পারি নি বাবার অপরিমেয় স্নেহ-যত্নে। বড় আদরিণী অভিমানী মেয়ে ছিলাম আমি।

হ্যাঁ, তারপর? বলো, তোমার জীবনের কথা শুন্‌তে বড় আগ্রহ হচ্ছে আমার। আশ্চর্য্য! জলনারী আছে শুনেছি, বইয়েতেও পড়েছি, কিন্তু এমনভাবে...বলো, চুপ করলে কেন?

—বল্‌ছি। সমুদ্রে আমার সঙ্গী-সাথীর অভাব ছিল না; কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকেই একলাটী বসে ভাবতে, গান করতে ভালবাস্‌তাম। বাবার কাছে আমি গান শিখেছিলাম। তাঁর কাছে কত দেশদেশান্তরের বিচিত্র-কাহিনী শুন্‌তাম। হাসি, খেলা, গান, কল্পনা আমার জীবনকে স্বপ্নের মত মধুর করে তুলেছিল। সব চেয়ে আমার প্রিয় ছিল শুভ্র মর্ম্মর-গঠিত একটী সুন্দর প্রতি-মূর্ত্তি—হয় তো কোন সময় কোথায় একখানা জাহাজ ডুবি হয়ে ওই রাজপুত্রের অপরূপ পাষাণ মূর্ত্তিটী পিতার রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল। সেটী চেয়ে নিয়ে আমি আমার ফুলবাগানে রেখেছিলাম যত্ন করে উঁচু একটা শ্বেতপাথরের বেদীর ওপর। তার চারিদিক্ ঘিরে গোলাপ গাছ—পান্নার ঘন-সবুজ পাতার মধ্যে থরে থরে ফুটে থাকৃত টুক্‌টুকে লাল চুনীর গোলাপগুলি। তার রক্ত-আভায় পাষাণ মূর্ত্তির অমল-ধবল-কান্তি রঙীন্ হয়ে যেন সজীব দেখাত। আমি তাকে মনের মত করে স'জিয়ে দিতাম।

মাথায় ফুলের মুকুট, কাণে ফুলের স্তবক, গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে অনিমেষে চেয়ে থাক্‌তাম তার দিকে। তার শীতল শুভ্র নিস্পন্দ পাষাণ দেহ আবেগময় বাহুপাশে ঘিরে আমার প্রাণের গান গাইতাম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। আদরে সোহাগে তার সুন্দর মুখখানি ঢলঢল করত যেন। কিন্তু তা'তে প্রাণের সাড়া ছিল না তো!

তা' না-ই থাক্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই পাষাণ-প্রীতি বেড়ে চলেছিল দিনে দিনে।

আজন্ম জলে বাস, তোমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। বাবার মুখে পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের কথা শুনে এক-একবার জলের বাইরে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখ্‌বার জন্য বড় আগ্রহ ও কৌতূহল হ'তো মনে। বাবা আমাকে যেতে দিতেন না—কি জানি ছেলেমানুষ, যদি বিপদ ঘটে কোনো। কিন্তু এখন তো বড় হয়েছি, বাবাকে বলে-কয়ে, কাকুতি-মিনতি করে মাত্র একটীবার সমুদ্রের ওপরে যাবার অনুমতি চেয়ে নিলাম।

* * *

আঃ, কী স্ফূর্ত্তি! কী আনন্দ!

অনন্ত, অথই জলে, সাগর স্রোতের তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমি বহির্জগতের অপরূপ অভিনব দৃশ্যগুলি দেখ্‌ছিলাম বিস্মিত মুগ্ধ নয়নে। শুভ্র বালুকাময় সৈকত-ভূমি—দূরে দেখা যায় লোকালয়। কেমন সুন্দর সবুজ গাছপালা! মাথার ওপর অপরিসীম গাঢ় নীলিমায় আমাদের কোষাগারের মাণিকের মত কি সব জ্বল্‌জ্বল্ করছে—ওগুলি তারা বুঝি? চমৎকার! বাতাস কী স্নিগ্ধ মধুর!

কিন্তু সেই মাণিকগুলি একে একে নিবে গেল যে! আকাশ নিকষ-কালো—মেঘ উঠেছে, না?

তাই তো! বাতাসের বেগ বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ—এলোমেলো হয়ে। এ কি ঝড়! প্রবল ঝড়! উত্তাল

সমুদ্র! ঢেউয়ের ওপর ঢেউ! আর কোনো দিকে কিছু দেখা যায় না। আমি ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরছিলাম, কিন্তু দেখি একখানা বজরা উন্মত্ত ঢেউয়ের তালে তালে উঠে-পড়ে ছুটে আস্ছে তীরের মত। তার মধ্যে কি সুন্দর উজ্জ্বল আলো—কত লোকজন! আমি সাগ্রহে সকৌতুকে দৌড়ে চল্লাম বজরার সঙ্গে সঙ্গে। আরোহীরা সকলেই প্রাণভয়ে ব্যাকুল শশব্যস্ত। স্ফটিকের আবরণে ঢাকা জান্‌লা দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। তার মধ্যে একজনকে দেখে আমি চম্‌কে উঠলাম—এ যে আমার পরিচিত! ও গো, এ সেই—যে আমার চির-প্রিয়, চির-চেনা!

আস্তেব্যস্তে আরো কাছে সরে গিয়ে ভাল করে দেখ্‌লাম—হ্যাঁ, সেই তো! সেই আমার প্রিয় পাষাণ রাজপুত্রের জীবন্ত রূপ! এ মানুষ—আহা, মানুষ কি এত সুন্দর হয়! মরি! মরি!

কে তিনি জানি না—কিন্তু অপরূপ রূপ, উজ্জ্বল মহার্ঘ বেশভূষায় তাঁকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল!

ঝড়-তুফান বেড়েই চলেছে, কী বিকট তার গর্জ্জন! বৃষ্টিও পড়ছিল। কী অন্ধকার! সেই ঝড়-বৃষ্টি-তুফানের মধ্যে বজরাখানি ডুবে গেল বুঝি? হায়, হায়, আমার সেই রাজপুত্র!—

অতিমাত্র ব্যাকুল হয়ে আমি পাগলের মত সেই ফেনিল সংক্ষুব্ধ সাগর জলে তন্নতন্ন করে তাঁকে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম কতক্ষণ। বহুকষ্টে পেলাম তাঁর অচৈতন্য দেহ-খানি। তিনি মানব, জলে রাখ্‌লে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই? কেমন করে তাঁকে বাঁচাই?

নিরুপায় হয়ে সংজ্ঞাহারা রাজকুমারকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সেই উত্তাল দুস্তর পারাবারে, উদ্দাম উন্মত্ত তরঙ্গের সাথে আমি ভেসে চল্‌লাম একদিকে। কতক্ষণ পরে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত একটা ঢেউ ঠিক্ এইখানে—যেখানে তুমি বসে আছ, আমাদের ফেলে দিয়ে ফিরে গেল ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে।

* * *

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত। নির্জ্জন সাগর-সৈকত। রাজকুমারকে কোলে নিয়ে আমি সেখানে বসে রইলাম একলাটী। কতক্ষণ কে জানে!

ক্রমে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। সমুদ্রের সে উন্মাদ রূপ আর নেই। অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। ভোর হলো বুঝি?

আলো পেয়ে ভাল করে দেখ্‌লাম এবার আমার মানস-মোহনকে—কিন্তু দেখার সাধ মেটে না যে!

চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আঃ! আনন্দে আত্ম-হারা হ'য়ে আমি তখন ভাবছিলাম—রাজকুমার চোখ মেলে যখন আমাকে দেখ্‌তে পাবেন, তখন জলনারী বলে আমায় উপেক্ষা করবেন না তো?

কিন্তু আমার অভিলাষ পূর্ণ হবার আগেই সেখানে লোক সমাগম দেখে আমায় সরে যেতে হলো বাধ্য হয়ে। লুকিয়ে থেকে আমি তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—অতি আগ্রহে, অতি সন্তর্পণে। ধীরে ধীরে কে একজন রূপসী তরুণী রাজকুমারের কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। তার সারা অঙ্গে লীলায়িত রূপ-যৌবন, হীরা-মতির উজ্জ্বল আভরণ ঝল্‌মল্ করছে যেন! এ কি রাজকন্যা? সঙ্গের লোকজনের সাহায্যে সে রাজকুমারের শুশ্রূষা করতে লাগ্‌ল।

আমি ক্ষুব্ধ হতাশ হয়ে দেখ্‌ছিলাম—সেই ভাগ্যবতী রূপসী রাজকুমারের ভূলুণ্ঠিত শির কোলে তুলে নিয়ে নীলাম্বরীর সোণালী আঁচলখানি দুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে।

চেতনা লাভ করে রাজকুমার চোখে মেলে যেই চেয়েছেন, অমনি তার বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি মিলিত হলো সেই সুন্দরীর নীলোৎপল নয়ন দু'টীর হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টিতে। হায়, আমি যে ঠিক্ এই ভয়ই করেছিলাম!

ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে রাজকুমার উঠে বস্‌লেন। দু'জনে তখন কথা হলো। হায়, মানব ভাষায় অনভিজ্ঞা আমি, তার একবর্ণও বুঝ্‌তে পারলাম না—তবে রাজকুমার যে তার জীবন-দাত্রীর কাছে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, তা' বেশ বোঝা গেল।

একটা অব্যক্ত, সুগভীর বেদনায় আমার বুকের ভেতর টন্‌টন্ করে উঠল, দুঃখে-বেদনায় চোখে জল এসে পড়ল। একবার মুখ ফুটে চীৎকার করে বল্‌তে ইচ্ছা হলো—

ও গো সুন্দর, ও গো আমার সাগর-সেঁচা মাণিক, তুমি একবার জান্‌তেও পারলে না—অন্ধকার দুর্যোগ নিশীথে, উন্মত্ত জলধি গর্ভ থেকে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, তোমাকে বুকে করে কে উঠিয়েছে!

আমার ব্যথা-ব্যাকুলতা কেউ জান্‌তে পার্‌লে না। রাজকুমারকে নিয়ে তারা চলে গেল। কোথায় গেল—কে জানে!

* * *

গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে শুন্‌ছিলাম সেই অজ্ঞাত, অদৃশ্যমানা সাগরিকার বিচিত্র করুণ-কাহিনী। তাকে থাম্‌তে দেখে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—হ্যাঁ, তারপর?

ব্যথাভরা, অশ্রুভেজা-সুরে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—তারপর? হতাশ হয়ে বুকভরা ব্যথা নিয়ে আমি ঘরে ফিরে এলাম—কিন্তু শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই কিছুতেই।

সেই সুখময় গৃহ, স্নেহময় পিতা, অনুরক্ত প্রিয় সঙ্গী-সাথী কেউ-ই আর এতটুকু আনন্দ দিতে পারে না আমার নিরানন্দ প্রাণে। আমার চিরদিনের সাথী সেই পাষাণ মূর্ত্তি—এখন তাকে দেখে প্রাণের ব্যথা-ব্যাকুলতা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে যেন! তারই সজীব প্রতিমূর্ত্তি সেই রাজকুমার—সে আজ কোথায়! কোথায় গেলে তাকে পাব?

আমার উদাসীনতা ও বিষণ্ণভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় বাবা আমার জন্যে 'বর' খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি রাজকন্যা, তায় সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল সমাজে—আমার বরের অভাব কি?

নিরুপায় হয়ে অবশেষে বাবাকে জানাতে হলো আমার মনের গোপন কথা। জলনারী হয়ে মানবের প্রেমার্থিনী আমি, এ কথা শুনে পিতার ক্রোধের পরিসীমা রইল না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অধীর হয়ে তিনি আমাকে তিরস্কার করতে লাগ্‌লেন নিষ্ঠুরভাবে।

আমি লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সব ত্যাগ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লাম। সেই রাজকুমারকে আমি চাই-ই! সে ছাড়া আর কাউকে—

আদরিণী দুহিতার এই দুঃখ-বেদনা বাবার মমতাময় চিত্তে আঘাত করল বুঝি। তিনি স্নেহভরে আমাকে বুকে তুলে নিলেন। তারপর ম্রিয়মান গম্ভীর-মুখে বল্‌লেন—মানবের সাথে জল-নারীর মিলন যে অসম্ভব। তবে তুমি যদি মানবী হতে চাও—কিন্তু তা' হলে আমাদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হবে তোমায়। তা' পারবে? বেশ ভাল করে ভেবে দেখো।

হায়, ভেবে দেখবার শক্তি কি ছিল তখন আমার!

আমার নীরবতায় মৌন সম্মতি জেনে পিতা ভ্রূকুটি করে বিরক্তিভরে বল্‌লেন—বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! তুমি তাকে পাবে—কিন্তু মানবী রূপে। জল-নারীর গৌরব—তোমার এই সুন্দর সুলোভন পুচ্ছ এ আর থাকবে না, সেতারের সুরের মত মধুর কণ্ঠ তোমার নীরব হয়ে যাবে তখন। শুধু তাই নয়—সেই অজ্ঞাত মানব, যার জন্য তুমি সমস্তই ছাড়তে প্রস্তুত, সে যদি কোনোদিন অন্য মানবীর উপাসনা করে, তবে সেইদিনই তোমার জীবনের শেষ।...

পিতা আর বল্‌তে পার্‌লেন না, রোষদীপ্ত চোখ দু'টী তাঁর ভিজে উঠল ব্যথার অশ্রুজলে। অভাগিনী আমি, পিতার স্নেহ-কোমল প্রাণে কি নির্ম্মল আঘাত দিয়েছি তা' বুঝেও বুঝ্‌লাম না। এই সুন্দর সুস্থ দেহ, জল-নারীর স্বচ্ছন্দ স্বাধীন সুখের জীবন, পিতার নিরাপদ স্নেহের আশ্রয় সব ছেড়ে হয় তো অকাল মৃত্যুই আমার ললাট-লিখন! তা' হোক্! তাঁকে যদি পাই, তবে পৃথিবীতে আর কিছুই চাই না আমি।...

তবে যা' হতভাগী, মানবী হয়ে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ গিয়ে—দূর হ'!

বজ্রনাদের মত গভীর কঠোর সে আদেশ! উঃ, আমার কানে যেন তালা লেগে গেল! সমস্ত শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল! যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলাম সেইখানে।

* * *

জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমি সাগর-তটে এই থানটীতেই পড়ে আছি একলা। সেদিন ঝড়-বাতাস কিছুই ছিল না। চাঁদের আলোয় জল-জঙ্গল সব হাসছে যেন!

আমি আমার দেহাবয়বের রূপান্তর দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলাম! এখন আমাকে দেখ্‌লে কে বল্‌বে—আমি 'সেই' সাগরিকা! সুমুখে কার দীর্ঘছায়া পড়তে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লাম—এ যে সেই—আমার আরাধনার বস্তু সম্মুখে! অপ্রত্যাশিত গভীর পুলকে সারা অঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল আমার। তিনি আমার মুখপানে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি? এত রাত্রে এখানে একলাটী?

কি মিষ্ট সে কথা! এবার আমি তাঁর কথা বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌লাম—কারণ, আমি তখন মানবী। সে কথার উত্তরে কত চেষ্টা করেও একটি কথা বল্‌তে পারলাম না। আমার বাক্‌রোধ হয়েছে—এটা বুঝি পিতার ভবিষ্যদ্বাণী—হায়রে অদৃষ্ট!

আমার নীরবতায় ব্যগ্র হয়ে তিনি আবার বল্‌লেন—কে তুমি? কি চাও বলো না?

সে প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত চিত্ত আমার অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে বল্‌তে চাইল—তোমাকে চাই—আমি তোমাকেই চাই—ও গো প্রিয়, বাঞ্ছিত আমার! তোমার জন্যই আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে এসেছি!...

কিন্তু পোড়ামুখে একটী কথাও ফুট্‌ল না—উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল অক্ষমতার ব্যথায়!

আমার অসহায় অবস্থা দেখে রাজকুমারের মনে দয়া হ'ল বুঝি। আমার হাতখানি সযত্নে ধরে করুণ-কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—কাঁদছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—না।

—তবে তুমি আমার সঙ্গে এস—আমি যত্নে রাখ্‌ব তোমাকে।—বলে তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরলেন।

তাঁর সেই মোহময় সুখ স্পর্শে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার। চোখের জল মুছে ফেলে আমিও তাঁর সুকোমল হাতখানি পরম আগ্রহে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু এ কি, পায়ের তলায় হাজার হাজার কাঁটা ফুটছে কেন? উঃ, কি যন্ত্রণা! তা' হোক্, কোন কষ্টই আমাকে কাতর করতে পার্‌বে না আর। আমার বুকে তখন যে তুফান উঠেছিল, তার কাছে এ কিছুই নয়।

সেদিন—শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে বল্‌তে পারি না, আমি রাজকুমারের আশ্রয়ে স্থান পেলাম। রাজকুমারই বটে। আমার প্রিয়তমের রাজৈশ্বর্য্য, গৌরব, সম্মান আমাকে বিস্মিত, পুলকিত করে তুল্‌ল।

আমি মূক, দীন হীন হলেও তিনি এই অযোগ্যাকে তাঁর চরণে স্থান দিলেন। আমার সুখের সীমা নেই! বাক্‌-শক্তি ছিল না—আমার প্রেমোচ্ছ্বসিত প্রাণের নীরব ভাষা তিনি বুঝ্‌তেন কি না জানি না—কিন্তু আমাকে আদর-যত্ন করতেন যথেষ্ট। বালক যেমন তার খেলার পুতুলকে ভালবাসে—

সেই যথেষ্ট, সেইটুকু পেয়েই জীবন আমার পরম তৃপ্ত ও চরিতার্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেল একদিন অতর্কিতে।

দেখ্‌লাম রাজকুমার যেন কোথায় যাবার আয়োজন করছেন। কোথায় যাবেন তিনি? কেন যাবেন আমাকে ছেড়ে? ধরে বস্‌লাম—আমি তাঁর সঙ্গে যাব। তিনি রাজী হলেন না কিছুতেই। আবার শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বেন বলে মিষ্ট স্তোকবাক্যে আমায় ভুলিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন কোথায়—কি জানি! জীবন-সর্ব্বস্বকে বিদায় দিয়ে দুঃসহ ব্যথা, দারুণ দুঃশ্চিন্তায় কাতর অবসন্ন হয়ে আমি কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে লাগ্‌লাম।

বাস্তবিক রাজকুমার শীগ্‌গিরই ফিরে এলেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলাম, ডাকার অপেক্ষা না রেখে—কিন্তু তাঁর সঙ্গে এ আবার কে!...

—এ কে গো? ওঃ, আমার মাথা ঘুরে গেল! এ যে সেই—সেই সৌভাগ্যবতী রূপসী—যে সেদিন সাগর-সৈকতে আমার সাগর-ছেঁচা-মাণিককে বুক থেকে কেড়ে নিয়েছিল! সর্ব্বনাশী—আবার—আবার এসেছে!...হায়, এইবার আমার শেষ—সব শেষ!

অসহনীয় তীব্র মর্ম্ম-বেদনায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল—তবু মুখ ফুট্‌ল না!

রাজকুমারের হর্ষোৎফুল্ল মুখে ক্ষোভের ম্লান হাসি, চোখ দু'টীতে অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাব। মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে তিনি বল্‌লেন—কি করব বলো?

উঃ, মানুষ এত সুন্দর—কিন্তু এমন নিষ্ঠুর প্রতারক !

নীরবে চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেই হৃদয়-হীনের চরণ তলে লুটিয়ে পড়তে গেলাম—কিন্তু পারলাম না। কোথাকার একটা দুর্নিবার শক্তি আমাকে সজোরে আকর্ষণ করছিল। এ কি, আমি যে আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না ! এ আমি কোথায় চলেছি !···

ধীরে, ধীরে, ধীরে !

জলের কাছে এসে আবার আমার মনে পড়ে গেল সেই বিস্মৃত স্মৃতি ! সেই সুখময় সাগর-বাস, স্নেহময় পিতা, ভালবাসার সঙ্গী-সাথী সব !...

স্বেচ্ছায় সব হারিয়ে অভাগিনী আমি মরতে বসেছি এখন ! সেখানে আর তো যেতে পারি না ! যে জলে আমার জন্ম—চিরদিনের বাসস্থান—সেখানেই যে ডুবে মরছি এবার ! বাঁচবার উপায় নেই—নেই !···

জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত বাক্‌শক্তি আমার ফিরে এল আবার ক্ষণেকের জন্য। আমি উদ্বেলিত বেদনায়, মর্ম্মভেদী কাতর স্বরে যেন আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বল্‌লাম—কোথায় তুমি, ও গো, নিষ্ঠুর দয়িত আমার ! একবার শেষ দেখা দিয়ে আমার প্রাণের কথা শুনে যাও ! ওঃ, আর না, গেলাম—আমি গেলাম !···বিদায়, চির-বিদায় ! ··

ধীরে, ধীরে, ধীরে !

আমার সেই মানবী-দেহ ধ্বংস হ'য়ে সাগর জলের শুভ্র ফেন-রাশিতে পর্য্যবসিত হ'ল।

ধীরে ধীরে সেই ফেন-পুঞ্জ সূর্য্যের তাপে গলে' গলে' শেষে বাষ্প হ'য়ে বাতাসে মিশে গেল।

সাগরিকার ক্ষুদ্র জীবনের এই শেষ পরিণতি !—ঘুমুচ্ছ না কি ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লাম—না, ভারি দুঃখ হচ্ছে শুনে ! তারপর ?

—তারপর, তারপর আর কি—তখন থেকে বাতাসে মিশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এইখানে। কত দিন, কত যুগ চলে গিয়েছে তারপর। যার জন্যে আমার এই দশা—তার অস্তিত্বটুকুও এ ধ্বংসশীল জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন মুছে গিয়েছে কবে—কিন্তু আমার তো ধ্বংস নেই !...অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে এই অকূল সমুদ্রের বাতাসে রাতদিন কেবল হায় হায় করে বেড়াচ্ছি !...এ হাহাকারের কি বিরাম নেই ? শেষ নেই ? বলো না, ও গো মানব, এমন করে আর কত দিন—

কি একটা শব্দে চম্‌কে উঠে দেখি—মাথার ওপর চাঁদ হাস্‌ছে। সাগরের কালো বুক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায়। চারিদিকে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই। সাগরিকা—আশ্চর্য্য কিন্তু !...

কত রাত কি জানি ! এমন বেহুঁস হয়ে এতক্ষণ—এ এক আচ্ছা নেশা ধরেছে আমার !···

পূর্ণশশী দেবী

সতী

অমলা গঙ্গোপাধ্যায়

—"অমানুষ, রাস্কেল, মনুষ্যত্বহীন, মুখ দেখাতে লজ্জা করে না! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!"

রাগে বিদ্যুৎ চীৎকার করে উঠ্‌ল।

ওর এ উত্তেজনার কারণ ছিল যথেষ্ট। স্বামী চন্দ্রনাথ পাশের বাড়ীর নরেনের সঙ্গে গত রাত্রে শনিবার কর্‌তে বেরিয়েছিল। প্রভাতে স্বামীকে শুষ্কমুখে ক্লান্তভাবে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখেই বিদ্যুৎ রাগে দুঃখে যেন উন্মাদ হয়ে উঠল।

এ ব্যাপার ওদের নতুন নয়—কাজেই চন্দ্রনাথ আরো কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই নির্ব্বাক মুখে শয্যা গ্রহণ করল।

বিদ্যুৎ ছুটে এসে লেপখানা টান দিয়ে খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্লে—"আর কোন সাড়া নেই, মুখ যেন পুড়ে গেছে! ছিঃ, ছিঃ, লজ্জা-ঘেন্না কিছু নেই!"

চন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বল্লে—"যা' বল্‌বে একটু আস্তে বলো না। দিদি শুন্‌তে পাবেন যে।"

—"দিদির শোন্‌বার কিছু বাকী আছে কি না। ওঃ, সিল্কের পাঞ্জাবী না হ'লে বাবুর আবার বাহার হয় না!"

এই বলে চন্দ্রনাথের গায়ের পাঞ্জাবীটা ধরে একটা টান দিতেই সেটা ছিঁড়ে গেল।

চন্দ্রনাথের বাড়ীতে এত কোলাহল, কিন্তু নরেন্দ্রের বাড়ীতে তার এতটুকু চিহ্নও নাই।

লাবণ্য স্বামীকে কোন প্রশ্ন কিংবা রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করে বিব্রত করল না—প্রতিদিনকার মতই নীরবে সংসারের কাজ করতে লাগ্‌ল।

প্রতিবেশিনীদের মুখে ওর প্রশংসা আর ধরে না! সবাই বলে—"বউ যদি বল্‌তে হয় ত নরেনের, কখন দু'টী ঠোঁট এক করে না। আর চন্দ্রনাথের বউ, বাবাঃ! পুরুষ মানুষ অমন একটু হয়েই থাকে, তাই বলে তুই মেয়ে মানুষ হয়ে অমন কেলেঙ্কারী করবি?"

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হলো—চন্দ্রনাথের অকারণ অহেতুক এই ক্ষুদ্র হীন দৌর্ব্বল্যের মূল উৎস তার স্ত্রীর এই অসহিষ্ণুতা। আর—"নরেনের বউ, আহা, কপালের ফের! কিন্তু অত যখন লক্ষ্মী, তখন ওর ভাল হবেই—অমন লক্ষ্মীর মূল্য একদিন নরেন বুঝ্‌বেই!"

লাবণ্য সবিস্ময়ে ভাবে—কেন বিদ্যুৎ অমন করে। কই, ওর ত অমন প্রচণ্ড জ্বালা জাগে না। কেন?

ওর বিবাহ হয় দশবৎসর বয়সে। তারপর এই আটটী বৎসর ওর জীবনে কত অত্যাচার, কত গ্লানির স্রোত বয়ে গেছে। কতদিন স্বামী উন্মত্ত অবস্থায় ওর ওপর শারীরিক পীড়ন করেছে। সে সব নির্ম্মম অমানুষিক অত্যাচারের চিহ্ন আজো ওর দেহে আঁকা আছে—কিন্তু ও কখন তার ক্ষীণতম প্রতিবাদও করে নি।

ও যে নারী, সে কথা ও সর্ব্বান্তঃকরণে জানে। সে কথা যে ওদের অস্থি-মজ্জায়, রক্তের প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে মিলে আছে—সে কি ও সহজে ভুল্‌তে পারে।

ওর স্বামী ওকে কতদিন রাত্রে সপ্রেম বাহু-বন্ধনে বদ্ধ করে নিজের দুর্নীতির ইতিহাস ব্যক্ত করেছে। ও কিন্তু তার এতটুকুও প্রতিবাদ করে নি। ও পুরুষের স্বরূপ যে জানে—কাজেই কখন তার প্রতিবাদের প্রয়োজন অনুভব করে নি। বিদ্যুৎ সে অবস্থায় হয় ত একটা বিশ্রী ব্যাপার করে বস্‌ত! মূর্খ নারী, জানে না—পুরুষের কামনার জন্যই নারীর মূল্য। সহধর্ম্মিনী, শক্তিরূপিনী, পথের সঙ্গিনী, এ সব ত কাব্যের রঙে রাঙান কথা। নারীর একমাত্র মূল্য—পুরুষের কামনা।

সেই কামনার স্রোত যদি রুদ্ধ হলো, তবে নারীর আশ্রয়

কোথায়? এই ত পাশের বাড়ীর নন্দরাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ট-তার কথা নরেন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছে। কত রাত্রে ও নন্দরাণীর জন্য শয্যা ছেড়ে উঠে গেছে—তার ইতিহাস ওর অজানা নয়। কিন্তু তা' নিয়ে মিথ্যা কোলাহল করে কি হবে? ও যে সতীলক্ষ্মী—সে কথা নিজেই নয়, সমস্ত পাড়া-প্রতিবেশী, এ পরিবারের প্রত্যেকে, এমন কি নরেন্দ্র পর্য্যন্ত স্বীকার করে।

এই ত নারী-জীবনের চরম সার্থকতা, পরম গৌরব।

নরেন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে—তার মত স্ত্রী-ভাগ্যে সৌভাগ্যবান বাংলাদেশে বেশী নেই।

পৌরাণিক সতীদের জ্যোতি, লাবণ্যের সতীত্বের কাছে মনে হয় যেন ম্লান প্রভাতের চন্দ্র। সীতা সতী, কিন্তু তাঁর মধ্যেও ক্রটী ছিল। শেষ যখন রামচন্দ্র পরীক্ষা চাইলেন, তখন তিনি পরীক্ষা না দিয়ে করলেন পাতাল-প্রবেশ। অবাধ্য স্ত্রী।

সতী শিবের যশ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রাণ দিলেন—কিন্তু তাঁরও সতীত্বের ক্রটী ছিল। শিবের নিষেধ লঙ্ঘন করে তিনি পিত্রালয় চলে গেলেন। কিন্তু লাবণ্য হলে কখন যেত না। ও সৌভাগ্যবান শিবের চাইতে, রাম-চন্দ্রের চাইতে।

এই ভাবেই লাবণ্যের জীবনের দীর্ঘ আটটা বৎসর কেটে গেছে। কোন বৈচিত্র্য ছিল না—বৈচিত্র্য ওর কাম্যও ছিল না—ও যে সতী। ও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর ইচ্ছার কল টেপা পুতুল হয়ে দিনের পর দিন সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু জীবনের চক্রটা এবার হঠাৎ অচল হয়ে উঠল।

কারণটা খুবই স্পষ্ট। একদিন দেখা গেল পাশের বাড়ীর বিধবা নন্দরাণী এবং নরেন্দ্র দু'জনেই অদৃশ্য।

লাবণ্যের এতদিনকার সযত্নে রক্ষিত সতীত্ব ওকে সান্ত্বনা দিল না, আশ্রয় দিল না—এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থাটা চিন্তা করবে ওর মেরুদণ্ডে সে শক্তিটুকুও সতীত্ব দিল না।

ওর চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রইল কলিকাতা মহানগরীর ফুটপাতের অধিবাসী এবং অধিবাসিনীদের এবং বিশেষ পল্লীর রমণীদের চিত্র।

চোখের জলে লাবণ্য কেবলি বলে—"আমার কি হবে!"

কাণ্ডারীহীন নৌকা অগাধ সমুদ্রের মধ্যে দিশা পায় না—ওরা যে চিরদিন চালিত হয়, চলে না।

কিন্তু লাবণ্যের সমস্ত দুর্ভাবনার মীমাংসা হলো। বড় ননদ রাধারাণী ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।

মহানগরীর মধ্যস্থল। ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড় শব্দে চারিদিক সচকিত। রিক্‌সার শব্দ আসে ঠুন্‌ঠুন্। একটী লোক মত্ত অবস্থায় গলির মধ্যে ইংরাজী বাংলা হিন্দীর অপূর্ব্ব মিশ্রনে কোলাহল করছে। চানাচুরওয়ালা এক অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে, পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে গাইতে গাইতে চলেছে—"চাই হরিদাসের বুলবুল ভাজা, না চিবুলে যায় না বোঝা।"

এনামেলের বাসনওয়ালা চীৎকার করে হেঁকে যাচ্ছে—"এনামেলের থালা চাই, বাটী চাই, গ্লাস চাই।"

সমস্ত কোলাহল মিলিয়ে মনে হয় কেবলি চাই, চাই। আয়োজনের পর আয়োজন, প্রয়োজনের পর প্রয়োজন। মনে হয় এই কোলাহলের মধ্যে শুধু একটী কথা দিগ্‌দিগন্তে প্রকাশিত হচ্ছে—সে শুধু 'হরণ।' শক্তি, প্রাণ, প্রেম, মনুষ্যত্ব, এমন কি আত্মাকেও বুঝি হরণ করবে।

রাধারাণী বেশ আধুনিক মেয়ে। স্বামী চন্দ্রনাথ খুব উদার-পন্থী। লাবণ্য সম্বন্ধে ওঁদের মনে করুণার অন্ত নাই।

কিন্তু লাবণ্যের কিছু ভাল লাগে না। ওর মনে হয় সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন শুধুই কোলাহল। শান্ত শান্তির মৌনতা অন্তরে ত নাই—বাহিরেও বুঝি কোথাও তার লেশমাত্র নাই।

রাধারাণী ওকে অন্যমনস্ক করবার এবং ভোলাবার জন্য বিকালের দিকে দেবর শিবনাথকে বল্লেন—"চল ঠাকুরপো, একটু বেড়িয়ে আসি।"

শিবনাথ বয়সে তরুণ। কলেজে পড়ে। নারী-সম্বন্ধে ওর মন করুণায় পরিপূর্ণ। ও 'লেডিস্ ফার্ষ্ট' কথাটী সর্ব্বদা

মনে রাখে। বাসে অত্যন্ত ভীড় হ'লেও মেয়েদের উঠ্‌তে দেখ্‌লেই ও সকলের আগে স্থান ছেড়ে দেয়।

বাসে মেয়েরা নাম্‌বার সময় কণ্ডাক্‌টারের "একদম বাঁধকে, জেনানা উতরে গা" বলা সত্ত্বেও যদি বাস থামাতে দেরী হয়, তবে ও মনে মনে অত্যন্ত চটে যায়।

ওরা তিনজনে বেড়াতে বেরুল।

বৈশাখের বৈকাল। আকাশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কালো একটুখানি মেঘ দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে রাধারাণী বল্লে—হয় ত ঝড় উঠবে। শেষে পথের মধ্যে ঝড়—যাব না।

শিবনাথ হেসে উঠল—"'বৌদি', তোমার যে বার্দ্ধক্য সন্নিকট, সেটা আজ তোমার কথায় পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

"'বৌদি' যে বৃদ্ধা, সেটা এতদিন বুঝ্‌তে পার নি বলে দুঃখিত। আজ যে তোমার সে জ্ঞানোদয় হয়েছে, সে জন্য আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

লাবণ্য কথা বলে না, শুধু চেয়ে থাকে। এ যেন কোন আশ্চর্য্য জগতে ও এসে পড়েছে। এরা পুরুষের কথার প্রতিবাদ করে, স্ত্রী-স্বাধীনতার তর্ক করে, প্রগতির গতিতে ট্রামে-বাসে ঘোরে—একি সবই সত্য, না মায়ার ছলনা!

নারী সত্যই পুরুষের সঙ্গে প্রতিপদে প্রতিযোগিতা করতে কি পারে? হয় ত পারে—নইলে এরা প্রতি কথার উত্তর দেয় কি করে? ট্রামে-বাসে ঘোরে কি করে?

ওরা এতক্ষণ বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, এইবার বাস্‌ আসতেই উঠে পড়ল। সেই চিরন্তনী সুরে বাস্‌ কণ্ডাক্‌টার প্রচ্ছন্ন পৌরুষের গর্ব্বে ডেকে বলে—"বাবু, সিট ছোড় দিজিয়ে, জেনানা হ্যায়।"

লাবণ্য পরম বিস্ময়ে চেয়ে দেখে—নারীকে সিট্‌ ছেড়ে পুরুষেরা দাঁড়িয়ে ওঠে! তবে সত্যই নারীর মূল্য আছে।

বাস্‌ভরা অজস্র পুরুষের ভীড়। তারই মধ্যে বসে লাবণ্যের সমস্ত অন্তর কম্পিত কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এমন করে অজস্র লোক-চক্ষুর সম্মুখে ওকে দাঁড়াতে হবে, এ কল্পনা ওর স্বপ্নেও কখন ছিল না। ওর কুণ্ঠিত অন্তরে একটা আনন্দ জাগে—ও চলেছে প্রগতির গতি-পথে।

দক্ষিণ কলিকাতার রাজপথ দিয়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ওরা একটা পার্কে এসে বস্‌ল।

এদিকটা লাবণ্যর ভালই লাগে। যদিও পল্লীগ্রামের মত শান্ত স্নিগ্ধ মৌন শ্যামল নয়, তবু ভাল; মধ্য কলিকাতার মত মুখর কোলাহলে পাষাণ বধির করে না!

"'বৌদি' যে।"

শব্দে সচকিত লাবণ্য ফিরে চাইল। দেখ্‌ল, একটী যুবক এসে রাধারাণীর পাশে বসে পড়ল।

রাধারাণী আনন্দিত কণ্ঠে বল্লে—"আরে ধীরেন যে! ছিলে কোথায় এত দিন?"

—"আমাদের আর থাকা যাওয়া। বিয়ে-টিয়ে ত দিলেন না, কাজেই মন উড়ু উড়ু! এই সোমবার ফিরেছি।"

—"সত্যি ভাই, এবার বিয়ে কর, খুড়ীমা কত দুঃখ করছিলেন। তুমি এক ছেলে, আরো পাঁচটী থাক্‌লে না হয় তোমার এ ত্রুটি ঢাকা পড়ত।

—"থাক্‌ থাক্‌ 'বৌদি', ও কথা দিনের মধ্যে দু'লক্ষ ছিয়াশী হাজার বার শুন্‌ছি। আমি বিয়ে নিশ্চয় করবো মায়ের সুসন্তান হয়ে—শুধু অপেক্ষা করছি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনটা পাশ হবার জন্যে।"

বীরেন্দ্র হেসে উঠল।

রাধারাণী কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে বল্লে—"কথায় তোমার সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হার মানে, আর আমি ত মানুষ!"

—"কথার জোরেই বেঁচে আছি, নইলে তোমাদের হাতে রক্ষা ছিল না।"

এতক্ষণ পরে বীরেন্দ্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লাবণ্যের দিকে চেয়ে রাধারাণীর মুখের দিকে তাকাল।

রাধারাণী বল্লে—"এটী আমার ছোট ভাই নরেনের স্ত্রী, নাম লাবণ্য।" পরে লাবণ্যের দিকে চেয়ে বল্লে—"লাবণ্য, ইনি আমার ভাতৃস্থানীয়, নাম বীরেন্দ্রনাথ বসু।"

বীরেন্দ্র হাত তুলে লাবণ্যকে নমস্কার করলে।

লাবণ্য এতক্ষণ পরে কম্পিত জড়িত হস্ত দু'টী যোড় করে কোনরকমে কপালে ঠেকিয়ে একবার লজ্জিত

শঙ্কিত নয়ন তুলে ওর দিকে চাইল। বীরেন্দ্র অপূর্ব্ব সুন্দর নয়; কিন্তু ওর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, ওর দাম্ভিকতাহীন পৌরুষপূর্ণ মুখভাব দেখে লাবণ্যের মনে হ'ল, যদি ওর শির মুকুট শোভিত করে সিংহাসনে বসান যায়, সেও ওর পক্ষে অশোভন হয় না। এমন করে লাবণ্য কখন সমস্ত অন্তর দিয়ে কোন পুরুষকে মনে মনে সুন্দর বলতে পারে নি, কখন বলে নি। ও সতীনারী, ও জানে পৃথিবীর মধ্যে যা' কিছু পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সৌন্দর্য্য কৃতিত্ব আছে তা' থাক, একমাত্র স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সৌন্দর্য্য কৃতিত্ব স্বীকার করা অসতী নারীর কাজ। কিন্তু আজ বীরেন্দ্র এ কী পরিবর্ত্তন ঘটাল দস্যুর মত। আজ ওর এতদিন কার সযত্নে রক্ষিত বন্ধন জাল ছিন্নভিন্ন করে এ কে, কে এলো গো!

মন তখনি বিদ্রোহী কণ্ঠে বলে—"আজ এ কী করছ?"

লাবণ্য সচকিত হয়ে জেগে উঠে গভীর ঔদাসীন্য মনে জাগাতে চেষ্টা করে; মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে—"হোক্ অসচ্চরিত্র হোক্ নিষ্ঠুর, সেই ওর চক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ, আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। গভীর তাচ্ছিল্যভরে বাড়ী এসে বলে—"ঠাকুরঝি তোমাদের ঐ বীরেন না, কি নাম? লোকটা যেন কী রকম!"

—"কী রকম মানে? আরো দেখ্‌লে বুঝতে পারবি—সত্যি ও কি চমৎকার!"

—"আমার কিন্তু ভাল ল'গ্‌ল না।"

—"এই একঘণ্টাতে আর কি বুঝ্‌বি।"

—"তা' বটে।"

বলে লাবণ্য কাজে মন দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আজ সমস্ত ছাপিয়ে কেবলি মনে হয় বীরেনের মুখ! রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে বারবার স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলে—"তুমি আমার দেবতা ইহকাল পরকালের।"

রাত্রে ঘুমিয়ে কিন্তু স্বপ্ন দেখে একটি নির্জ্জন শান্ত বনভূমির পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে কোন অজানা সাগর উদ্দেশে। তারই কূলে ও বসে আছে, ওর ক্রোড়ে মাথা রেখে বীরেন শুয়ে। ওর সমস্ত অন্তরের চঞ্চল আকুলতার বার্ত্তা ও অঙ্গুলির মধ্য দিয়ে বীরেনের ললাটে কেশের ফাঁকে ধীর ধৈর্য্যে এঁকে চলেছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, ও সঙ্কুচিত অন্তরে বলে "ছিঃ ছিঃ!"

ও সতী, ও শৃঙ্খল জালে বন্দিনী সতী, ও নরেনের কামনার বন্দিনী সতী! ও জানে না নিজেকে, চেনে না আত্মাকে। ওর সতীত্বের মূল্য আত্মার আনন্দ নয়, মুক্তি নয়, শুধু নরকের কামনা!

বীরেনকে এখন ভালই লাগে; ওর যেদিন আসবার কথা থাকে, সেদিন উন্মনা অন্তর কেবলি পথের দিকে কান পেতে পদধ্বনি শোনে! সমস্ত দিনের প্রখর গ্রীষ্মের পর শীতল বাতাসে অন্তর প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বীরেনকে নিয়ে ওরা ছাতে এসে বসে।

ঝুনু কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে রাধারাণীর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে বলে—"মা, রাণু আমাকে মেরেছে।"

—"রাণু মেরেছে? এত কাল আমরাই মার খেয়েছি, এখন আমাদের হাতে জোর হয়েছে, এখন আমাদের মারবার পালা—কেঁদে আর কি করবে বলো?"

মৃদু হাস্যে বীরেন প্রশ্ন করল—"হাতে জোর হয়েছে কি?"

—"হয়েছেই ত।"

—"আপনাদের মুখে এ ধরণের কথা শুনতে আমার ভালই লাগে, যেমন দিদির দু'তিন বছরের ছোট ছেলেটাকে রাগিয়ে দিলেই সে চটে বল্‌ত—'মারব কিন্তু', ঠিক তেমনি।"

—"বড় বেশী বল্‌ছেন।" এতক্ষণ পরে লাবণ্য মৃদুস্বরে বল্লে।

বীরেন লাবণ্যের দিকে ফিরে চেয়ে বল্লে—"বেশী একটুও বলি নি। মেয়েরা শক্তির দম্ভ প্রকাশ করলে আমার হাসি পায়। শক্তিহীন আপনারা নন্, কিন্তু আপনাদের শক্তি আমাদেরই কাজে লেগেছে এবং লাগ্‌বে, আপনারা নিজের জন্য সে শক্তি লাগাতে পারেন্ নি, পারবেন না। সুভদ্রা যে সু-সারথী ছিলেন, সে প্রমাণ

পেলাম অর্জ্জুনের রথে, সতী যে যশের জন্য প্রাণ দিতে পারতেন, সে প্রমাণ পেলাম শিব নিন্দা থেকে! আপনারা আমাদের বাদ দিয়ে কি করলেন, কোন কাজটা? মহিয়সী নারী বলেছেন—'অমৃত বোল পিগই অব তুম জান রঘুনাথ।' অব্যক্তকে অন্তরের পথ দিয়ে সমস্ত নির্ভরতা দিয়ে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু মহাপুরুষ তাকে ধরতে চেয়েছেন জ্ঞানের পথ দিয়ে, মহাপুরুষের কণ্ঠে বেজেছে—'সোহং।' আমাদের বাদ দিয়ে না কি আপনারা পথ চল্‌বেন, তার চেয়ে বলুন না—পা দু'খানা বাদ দিয়ে পথ চলবেন; এর চাইতে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য!"

রাধারাণী সহাস্যে বল্লে—"জগতে অনেক বিশ্বাস-যোগ্য কথাও সত্য নয়।"

—"অন্ততঃ আমার কথা সে শ্রেণীর নয়।"

—"সে শ্রেণীর হ'লেও বাঁচতাম; তোমার কথায় শুধু মিথ্যাই নেই, তার সঙ্গে মিথ্যা দম্ভ আছে, তোমাদের শরীরের প্রতিটী রক্তের বিন্দু আমাদের দেওয়া; যে ভাষায় আমাদের বিদ্রূপ করছ, সে ভাষা আমাদের মুখের থেকে তোমরা শিখেছ, তোমাদের সবই ত আমাদের দান, আর তোমরাই কর বিদ্রূপ!"

—"এখানেও তোমরা ব্যর্থ! মাতৃত্বও তোমরা স্বীকার করেছ আমাদের জন্য, সন্তানের জন্য নয়। যদি সন্তানের জন্য মাতৃত্ব স্বীকার করতে, তবে তোমাদের দেহ, মন, স্বাস্থ্য, শক্তি, আয়ু দিয়ে যাকে সৃজন করলে, পালন করলে, সে সন্তানকেও নিজের বলে দাবী করতে পারলে না কেন, কেন তার পরিচয়ের জন্য আমাদের প্রয়োজন হয়। কোথায় থাকে তোমাদের মাতৃত্বের শক্তি যখন তোমাদের কোল থেকে সন্তানকে আমরা আমার বলে দাবী করে ছিনিয়ে নিয়ে যাই?"

—"দেখো, ক্রমে যত আমরা বুঝ্‌ব, ততই এসব ভুল সংশোধন করবো।"

—"পারবে না! যুগে যুগে মেয়েরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে চোখের জলই ফেলেছে; শক্তি দেখায় নি, দেখাতে পারে না! যা' হয় নি কখন, তা' আজ হঠাৎ হতে পারে না!"

—"যা' হয় নি তা' যে কখন হ'বে না, তার মানে?"

—"তার মানে এই যে, সমস্ত সৌরজগৎ সূর্য্যকে কেন্দ্র করেই ঘুরেছে, আজ হঠাৎ চাঁদকে কেন্দ্র করে ঘুরবে না।"

লাবণ্যের ইচ্ছা করে ওর কথার প্রতিবাদ করতে, মনে হয় ঈশ্বর কেন ওকে অসামান্য যুক্তির অস্ত্র সমর্পণ করলেন না! কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই নারী অন্তর মাথা নত করে বলে—হে বীর, হে শক্তিমান, যুগে যুগে নারী অন্তর তোমারি পায়ে মাথা নত করেছে; তোমারি বিজয়ী রথ-চক্রের তলে পড়ে সে পিষ্ট হয়েছে; তোমারি অন্তর-দেউল-দ্বারে সে মাথা খুঁড়েছে।

বীরেন্দ্র আজকাল লাবণ্যের শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেছে, ও শুধু পুথিগত বিদ্যাই দেয় না, নিজের বিদ্যার ভাণ্ডার ওর সম্মুখে খুলে ধরে।

বীরেন্দ্রর মনে মস্ত আশা, চোখে ওর ভবিষ্য জনগণের জন্য আলোক সঞ্চিত। ও আশা রাখে ও যে দেশে জন্মেছে, সে কথা সমস্ত দেশ একদিন জানবে। ও অন্যায়কে দলিত করবে, অবিচারের গতি প্রতিহত করবে। ও এক অপূর্ব্ব আদর্শে নিজের জীবন-বীণার তন্ত্রী বেঁধে বাজিয়ে যাবে—সেই সুরে সুরে একদিন সমস্ত নিদ্রিত দেশ জাগ্‌বে। ও প্রতি সময় আবৃত্তি করে—

আমার জীবনে জীবন লভিয়া
জাগরে আমার দেশ।

লাবণ্যের জন্য ওর অফুরন্ত সহানুভূতি। ও মেয়েদের কথা ভাবে। স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের অত্যাচার সমাজের অবিচার দেখে ওর অন্তর হাহাকার করে। ও প্রতিবাদ করবে, তীব্র প্রতিবাদ। ওর জীবন্ত প্রতিবাদ মূর্ত্তিমতী লাবণ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করবে! ও প্রদীপ্ত কণ্ঠে লাবণ্যর কাছে বক্তৃতা করে, তীক্ষ্ণ সূচাগ্র বিদ্রূপে ওকে বিদ্ধ করে, হাস্য-পরিহাসের তরল মধুর রসে ওকে সিঞ্চন করে। কেবলি বলে—"জাগো!"

বিস্মিত লাবণ্য চেয়ে থাকে। বোঝে না কিছুই, শোনে সব। এতদিন এই যুগ-যুগান্তর ধরে যে সতীত্ব শিক্ষায় ওরা শিক্ষিত হয়েছে, সে ওর ব্যর্থ হয় নি—ওর দেহের প্রতি অণুতে অণুতে সেই সতীত্বের স্রোত বয়ে চলেছে।

ওর হৃৎপিণ্ড প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে বল্‌ছে—"নারীর শৈশব কখন শেষ হয় না।"

লাবণ্য আজকাল নারী-প্রগতি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ, নারীর উত্তরাধিকার, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তর্ক করে। পুরুষের যে অধিকার আছে, সে অধিকার কেন নারী পাবে না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শিখেছে।

ওরা চিরদিন কণ্ঠস্থ করে মুখস্থ করে, ওরা যুগ-যুগান্তর ধরে পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলে—ওরা সতী!

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার তার ছায়া ফেলেছে।

নন্দরাণী কি একটা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কোন বান্ধবীর বাড়ী গেছেন। বাড়ী জনশূন্য। নীচে কড়া-খুন্তির এবং হরির সঙ্গে ঠাকুরের গল্পের শব্দ শোনা যাচ্ছে। লাবণ্যের মন যেন কি রকম উতলা হয়ে ওঠে—ও কোন পথে চলেছে! মনে হয় সমস্ত সহজ সরল স্পষ্ট আলোকের ধীরে ধীরে অবসান হ'য়ে এল, তারপর এক নিবিড় ঘন আঁধারে মহাসাগর যেন তার শত সহস্র উত্তাল তরঙ্গ জাল বিস্তার করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, সমস্ত অন্তর আকুল হয়ে আর্ত্তনাদ করে ওঠে, ভয়ে সমস্ত শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ওকে মোহমুগ্ধ সম্মোহিত করেছে, পরিত্রাণ নাই, মুক্তি নাই, এগিয়ে ওকে যেতেই হ'বে কাছে আরো কাছে, অজ্ঞাত অন্ধকার ঐ মহাসাগরের বুকের মধ্যে। কিন্তু তারপর? এই অন্ধকার মহাসাগর পার হয়ে আবার কি আলোকের সন্ধান জাগ্‌বে? এই শত আশঙ্কা ভয়ার্ত্ত প্রাণের জন্য এরপর কোথাও কি আশ্বাসের বিশ্বাসের স্নেহের কূল আছে?

দ্বারের কাছে পদশব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে বীরেন্দ্র, ওকে ফিরে চাইতে দেখে সে এগিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল—"অন্ধকারে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছ! আজকাল কবিতা লিখছ না কি?"

এতক্ষণকার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জটিলতা যেন ওর পদ-শব্দে দূরে সরে গেল—মনে হলো তার চিহ্নও বুঝি কোথাও নেই!

উচ্ছ্বসিত আনন্দ ওর চোখে মুখে ফুটে উঠল, হেসে বল্লে—"লিখছি, কিন্তু পাঠক জোটে না।"

—"তাই না কি?"

অকস্মাৎ কোথা হ'তে উন্মত্ত ঝঞ্ঝা বয়ে গেল। একটী মুহূর্ত্তে প্রলয়ের নিশান উড়িয়ে সব এলোমেলো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গেল। সমস্ত কথা, সকল হাস্য-পরিহাস সব স্তব্ধ হয়ে গেল—শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও স্পষ্ট শোনা যায় যেন। কিছুক্ষণ পরে বীরেন্দ্র আলো জেলে আবার এসে চেয়ারটাতে বসে একটা চুরুট ধরাল। লাবণ্য সেইভাবে স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

যেন একটা বিরাট প্রলয় হয়ে যাবার পর সমস্ত প্রকৃতির স্তব্ধ বিহ্বল ভাব। কিছু সময় চুপ করে থাকার পর বীরেন্দ্র উঠে লাইট্‌টা জেলে আবার একটা চুরুট ধরাল।

—"লাবণ্য!"

বীরেন্দ্রর আহ্বানে লাবণ্য ফিরে চেয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

—"লাবণ্য, আমি চলে যাব!"

লাবণ্য কোন উত্তর দিল না। বীরেন্দ্র কি একটা গানের পদ গুণগুণ করতে করতে ঘরময় পদচারণ করতে লাগ্‌ল।

নীচে ছেলেমেয়েদের আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে চন্দ্র-নাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"রঘু।"

ওরা উভয়েই সহজ ভাবের অবগুণ্ঠন টেনে বস্‌ল। বীরেন্দ্র একখানা বই টেনে নিয়ে খুলে সেইদিকে চেয়ে রইল।

চন্দ্রনাথ রাধারাণী এসে বস্‌লেন। এতক্ষণ পরে ঘরের বাতাস লঘু চঞ্চলভাবে বয়ে গেল। লাবণ্য কি একটা কাজের ভানে উঠে বেরিয়ে গেল।

রাধারাণীর নারী চক্ষে কোথায় একটা 'কিন্তু' জাগে, কিন্তু তখনি সচকিত হয়ে ওঠেন, উনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী।

চন্দ্রনাথ একখানা মাসিক-পত্র টেনে নিয়ে এলো-মেলো পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হেসে বলেন—"উঃ, কি আক্রমণ সাহিত্যিকদের!"

স্মিতহাস্যে রাধারাণী বলে—"আক্রমণ মানে? ওঁরা

কি কোন কারণ ঘটান নি, যাতে আক্রমিত হ'তে পারেন ?"

—"হয় ত ঘটিয়েছেন, কিন্তু সে বিশেষ দায়ে।"

—"বিশেষ দায়ে মানে? কোলকাতার ফুটপাতে বসে থাক্‌লেই ত পারেন।"

—"হ্যাঁ তা' হলে অবশ্য লাভই হয়—বিশেষ যদি সুপুরুষ হন্, তবে তোমরা সব কোন্ না দু'-চারানা দাতব্য করে আস।"

বীরেন্দ্র হেসে বল্লে—"আর যাঁরা সুপুরুষ নন তাঁদের দশা কি হবে?"

—"কেন তাঁরা দায়ে পড়ে যা' ইচ্ছে তাই লিখ্‌বেন।"

—"ব্যবস্থা মন্দ নয়! একটা কাজ করা যাক— আমাদের মধ্যে এ বিষয় একটা ব্যবস্থা করে সাহিত্যিকদের কাছে চিঠি পাঠান যাক্।"

চন্দ্রনাথ হেসে বল্লেন—"এতদিন আমরা যা' করেছি এবং করছি মেয়েরা যদি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করেন—তবে কিসের প্রগতি? বিশেষ এই বেকার-সমস্যার দিনে যদি আমাদের একটা 'হিল্লে' হয়, তাই বা মন্দ কি?"

—"থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে! মুখ নয় ত কল, খুলে দিলেই হ'ল!"

—"বকে বকে গলা যে শুকিয়ে গেল, যদি একাদশীর ভয় থাকে, তবে এককাপ চা এনে দাও।"

—"কি কথার শ্রী!" বলে রাধারাণী উঠে গেলেন।

অন্ধকার রাত্রি। লাবণ্য বিনিদ্র নয়নে ভাবে—ওদের মুক্ত প্রেম, ওরা মানবে না সমাজ। সমাজ ওকে কোন্ সুখ, কোন্ শান্তি দিয়েছে? কিসের জন্য ও সামাজিক স্বামীর ধ্যান করে ওর অন্তরের প্রেমকে বঞ্চিত করবে? ওর প্রেম, ওর অন্তর ত তাকে স্বীকার করে না। সে যে বলে—ওর স্বামী বীরেন্দ্র। তবে কেন ও কেন একথা স্বীকার করবে না? তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' জাগে! কে যেন ক্ষীণ, অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে— 'তারপর?'

লাবণ্য মনে মনে প্রতিবাদ করে—"না না, তারপর আর কিছু নেই। এত বড় উদার যার অন্তঃকরণ, বিরাট যার প্রেমের স্বর, সে প্রেমে কখন ভাঁটা পড়ে না, সে অন্তর কখন সঙ্কুচিত হয় না।"

ও সমস্ত অন্তর নত করে মনে মনে বীরেন্দ্রকে প্রণাম জানায়।

ও আর কিছু ভাববে না, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে মনের কোণে স্থান দেবে না, ও সমস্ত আদেশ মাথা নত করে পালন করবে। ওর সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সমস্ত সঁপে দেবে বীরেন্দ্রের পায়ে।

মীরার মতই ত সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেমে নির্ভরশীলা হয়ে সমস্ত হলাহল কণ্ঠস্থ করে বলবে—"অমৃত বোল পিগই অব তুম জানো রঘুনাথ।

হায়রে নারী! হায়রে পদাঙ্ক অনুসরণকারিণী সতী! প্রিয়া চিরদিন কলঙ্কিনী হয়েছে—ঘরে-বাইরে অপমান, অসম্মান, লাঞ্ছনা মাথার মুকুট করেও প্রিয়কে সম্পূর্ণ পাই নি। তবুও প্রিয় তাকে ভুলে কুব্জাকে রাণী করেছে, চন্দ্রাবলীকে আহ্বান করেছে। যে সীতা সর্ব্বান্তঃকরণে পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিলেন, এমন সতীকেও রামচন্দ্র অসতী বলে লাঞ্ছনা করেছিলেন।

পুরুষের কাছে প্রিয়তমার স্থান—মানুষের কাছে পাদুকার স্থান! সে বহুমূল্য হীরক-খচিত হোক্, তবু তার স্থান থাকে পদতলে।

প্রিয়ার স্থান পৃথিবীতে কোথাও নাই—একমাত্র পুরুষের পদতলে পিষ্ট হওয়া ভিন্ন।

কিন্তু তবু নারী বলেছে—"সীতার মত সতী হবো।"

বলে নি—"উমার মত নারী হবো।"

বলে নি—"সাথী হবো, বলেছে দাসী হবো।"

চা ছাঁক্‌তে ছাঁক্‌তে রাধারাণী ডাক্‌ল—"বৌ, নন্তুকে খাবার দিয়ে এদিকে আয়, শোন।"

লাবণ্য এসে দাঁড়াল—"নন্তু ত খাবার খেয়ে গেছে।"

—"খেয়ে গেছে? ও মা, কি বাঁদর ছেলে, আবার বলে কি না খিদে পেয়েছে!"

স্মিতমুখে চন্দ্রনাথ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন—"খিদে পাওয়াটাই ওদের স্বধর্ম্ম।"

—"এবং বঞ্চিত করাটাই মায়েদের স্বধর্ম্ম।"

হাস্‌তে হাস্‌তে বীরেন্দ্র ঘরে ঢুকল।

রাধারাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"তবে রে ছেলে, কি তোমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে ?"

—"হয়েছে বই কি, না জন্মান থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।"

লাবণ্য বল্লে—"মুখ ছিল বলে, নইলে—

—"নইলে সত্যপীর হতাম; জান না, যত বাধা এই মুখ।"

—"হ্যাঁ, মুখখানাই বটে!"

লাবণ্য অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বীরেন্দ্রের দিকে চাইল। বীরেন্দ্র মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বীরেন্দ্রের দিকে চেয়ে বল্লেন—"তোমার মাথায় খদ্দরের টুপি উঠ্‌ল কবে থেকে ?"

—"টুপি আমি পরিত মাঝে মাঝে; আর তা' ছাড়া, আজ—দত্ত বক্তৃতা করবেন, যাবেন বৌদি' ?"

—"না ভাই, অত ভীড়ে আমি হাঁপিয়ে যাই।"

—"লাবণ্য যাবে ?"

—"লাবণ্য বরং যাক, ও ছেলেমানুষ আছে।" চন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন—"গিন্নী যা' বলেছেন, ছেলেমানুষরাই হিষ্টিরিয়ার হিষ্ট্রি লিখতে পারবে, ওরাই যাক্, আমরা বুড়োমানুষ, কাজ কি ও সবে।"

—"অর্থাৎ ?"

বীরেন্দ্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের দিকে চাইল।

—"অর্থটা খুবই স্পষ্ট; বাঙ্গালীরা যা' করে, সবই ত হিষ্টিরিয়ার ঝোঁকে।"

—"মানে, আপনি কি বল্‌তে চান দেশের কাজ" বাঙালীরা যা' করছে সব হিষ্টিরিয়ার ঝোঁকে।"

—"ঠিক্ তাই। তারা দেশের সেবা করছে নিজেদের সেবা করছে না। তারা জানেই না দেশের কি অভাব, কিসের গ্লানি কতখানি অপমানের বোঝা আছে। সুলভে নাম করবার জন্ম ধনীর পুত্র সব দেশের নেতা হয়ে সসম্মানে জেলে বন্দী রইল, নাম হ'ল দেশ ছেয়ে।"

—একটা স্বাধীন মনোবৃত্তির লোক বন্দী হয়ে রইল, সে কি কম কষ্ট, কি বল্‌ছেন আপনি!"

—"আমি ঠিক্ বল্‌ছি। স্বাধীন মনোবৃত্তি কার ? যাঁরা বিদেশী সাজে সজ্জিত হয়ে জি-ও-সি সেজে নাটক করলেন, তাঁদের ? স্বাধীন মন তাঁর তার পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করেছিল জান না। হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কি বলবো তোমাদের ঐ স্বনাম খ্যাত নেতার কাণ্ডে অত্যন্ত পরাধীন মনোবৃত্তির লোকও হেসেছিল। অবশ্য হ'তে পারে তরুণ লোকের পক্ষে হিষ্টিরিয়াই স্বাভাবিক।"

—"যাকে সমস্ত দেশ সম্মান করে, তার নিশ্চয় গুণও কিছু আছে—কই, সেটা ত বল্‌ছেন না।"

—"আচ্ছা গুণটা তুমিই দেখাও না।"

—"এই যে স্ত্রীস্বাধীনতার আবহাওয়া, তিনিই এনেছেন।"

—"হোয়াট্ ইজ দি মিনিং অফ্ স্বাধীনতা ? স্বেচ্ছাচারিতা ? কই দেশনেতার আত্মীয়ারা ত সে স্বাধীনতা উপভোগ করছেন না ? দেশের অর্দ্ধশিক্ষিতা, অশিক্ষিতা মেয়েদের টেনে এনে জেল খাটিয়ে হৈহৈ করিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। তার মধ্যে কতকগুলি করছে বিয়ে, তারা বিয়ে করে খাসা রামী শামীর মত ঘর-সংসার করছে, রাজনীতির-ও তারা উচ্চারণ করে না, দৈনিক পত্রিকা-খানাও খুলে দেখে না দেশের কি অবস্থা, আর বাকীগুলি 'দি ফ্রিডাম' উপন্যাসের নাটক করে বেড়াচ্ছেন। এ সব হিষ্টিরিয়া রোগী না হ'লে দেখে-শুনে ভয় পেতেন নিজের অপরিণামদর্শিতায়।

—"সবটা ভাল হ'ল না বলেই মন্দ বল্‌ছেন কেন, এর পরিণাম কি হয় দেখুন।"

—"ঢের দেখেছি, ঢের দেখেছি, স্বাধীন করছেন! স্বাধীনতামানে কি জেলখাটা ? বাঙালীর মেয়ে যারা সব জেলে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে পনের আনা রাজনীতির 'র' জানত না। বেচারা অশিক্ষিতা অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়ে ও রকম স্বাধীন না করে, সত্যকার শিক্ষিতা করে স্বাধীন মনোভাব-সম্পন্না করে গড়ে দেশে শিক্ষা-প্রচার,শিল্প-প্রচার পল্লী-গঠন ইত্যাদি কাজে দিলে দেশেরও উপকার হ'ত,

আর তাদের নিজেদেরও শুভ হ'ত। তারপর তারা যদি স্বাধীনতার জন্য জেলে যেত তাতে আমরা সুখী হ'তাম। সরোজিনী নাইডুর জেলকে আমরা সম্মান দেব, কারণ, তিনি সত্যই স্বাধীন মেয়ে কিন্তু যারা শ্বশুর-শাশুড়ী, যা'-ননদ, স্বামী, বাপ-মা-ভাই, পাড়া-প্রতিবেশী সমাজ-সংসার প্রহরী বেষ্টিত জেল থেকে বেরিয়ে সরকারী জেলে গেল, তাদের জেলকে কোন্ সম্মান দেব ?"

—"তবে আপনার বক্তব্য কি, সবাই শুয়ে থাক্‌বে ?

—"শুয়ে থাকবে কেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কি শুয়ে আছেন ? তাঁর দান কি দেশের জেল ফেরত নেতাদের কোন অংশে কম ? দেশে এত সমস্যা আছে যার সমাধান করবার প্রয়োজন আছে। সমস্ত শক্তি অকারণ জেল খেটে, আর বিপ্লব করে ফাঁসী দীপান্তর অর্ডিনান্সে শেষ করবার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা দেশে শোনা যায় মেয়েরাও বিপ্লবে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্য করো তাদের মধ্যে সধবা, বিধবা কুমারী যতই থাক্ স-সন্তান কোন মা যোগ দিয়েছেন কি ? তার কারণ, সন্তান জন্মালেই মেয়েদের হিষ্টীরিয়ার প্রাদুর্ভাব কমে যায় এবং মেয়েরা দায়ীত্বশীল বিচক্ষণ হয়।"

—"যাক গে ওসব কথা। অর্থাৎ লাবণ্যর যাওয়া হ'বে না ?"

—"হবে না কেন ? যদি লাবণ্যর ইচ্ছা হয় ও যাবে। আমি ত আর প্রথম শ্রেণীর জেলখাটা দেশনেতা নই, যে যে কথা অন্য লোককে উপদেশ দেব। ঠিক সেই বিষয় নিজে সতর্ক হয়ে থাক্‌ব, যাতে সে ঘটনা, আমার বাড়ীতে না ঘটে।"

—"কি যে তর্ক করা স্বভাব, আজ কি তোমার কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই !"

রাধারাণীর প্রশ্নে চন্দ্রনাথ সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন —"কাজ আছে বই কি, কিন্তু অকাজের সময়টা ত তর্কে কাটল নইলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে কাটত !"

বীরেন্দ্র ও উঠে দাঁড়াল—"আমার ও কাজআছে, এখন যাই। লাবণ্য, তুমি যদি যাও ত প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমি ঠিক্ পাঁচটায় আসব।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই লাবণ্য প্রস্তুত হয়ে প্রসাধন শেষ করবার জন্য আয়নার সম্মুখে দাঁড়াল। চুলগুলো স্বাভাবিকভাবে আঁচড়ে হঠাৎ আবার তুলে ফেল্লে। "না, এরকম নয় ও আজ প্রতিটী সাজাব মধ্যে দিয়ে বীরেন্দ্রের কল্পনাকে সার্থক করবে। ও আজ যে পথ দিয়ে চলে যাবে, সে পথের সকল পথিক যেন সবিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ও আজ সকল নারীর মধ্যে অপূর্ব্ব হয়ে উঠতে চায়। বহুক্ষণ ধরে প্রসাধন শেষ করে বেরিয়ে আসতেই বীরেন্দ্র সহাস্যে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—"বাপ। চুল আঁচড়াতে এত সময় লাগে ! আমাদের দেখো দিকি ?"

—"তোমরা ত জন্ম শ্রমিক, তোমাদের আবার সাজ কি ?"

বীরেন্দ্রের কথায় লাবণ্য অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল। এবার রাধারাণীর পক্ষ সমর্থনে ও হেসে উঠল—"আর আমরা জন্ম-সম্রাজ্ঞী, কাজেই আমাদের ও সময়টুকু লাগাই উচিত, না লাগা অস্বাভাবিক।"

—"তোমার কথাগুলি কিন্তু ঠিক্ সম্রাজ্ঞীর মত হ'ল না।"

—"তবে কিসের মত হ'ল ?"

বীরেন্দ্র রাধারাণীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্লে—"না, থাক্, শত্রু বৃদ্ধি না করাই ভাল।"

—"বলে ফেলো, কথা শেষ করাই উচিত, আধখানা কথা বল্লে আধ কপালে ধরে।"

—"আচ্ছা বল্‌ছি, এখন চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

বীরেন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে লাবণ্য বেরিয়ে এল। বীরেন্দ্র থমকে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে লাবণ্যর দিকে চেয়ে বল্লে—"আজ সত্যি তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, সম্রাজ্ঞীর মত নয়, ঠিক পুজারিণীর মত !"

লাবণ্য কিছুক্ষণের জন্য অপ্রস্তুতভাবে চোখটা নত

করে রইল, পরে বল্লে—"ওটা কি নিজের জন্য স্তোক বাক্য দেওয়া।"

—"না না, স্তোক না, সত্যি। তোমার কোনখানটা সম্রাজ্ঞীর মত নয়।"

—"আচ্ছা থাক্, এর মীমাংসা করে শুধু শুধু দেরী করবার প্রয়োজন নেই।"

—"তা বটে, চলো।"

ওরা বেরিয়ে পড়ল।

সভা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বেই ওরা উপস্থিত হ'ল।

চারিদিকের চেয়ার বেঞ্চি প্রায় ভরে উঠছে। মধ্যস্থলে জাতীয় পতাকা উড়ছে, ফুল পাতা দিয়ে বড় বড় করে লেখা—"বন্দে মাতরম!"

সভারম্ভের কিছু বিলম্ব আছে। বিরেন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই বেশ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সে নিকটে এসে দাঁড়াতেই শ্রীযুক্ত দত্ত বল্লেন—"এই যে এসেছেন, আপনাকে না দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে উঠেছিলাম।"

—"আমি সকাল থেকেই উপস্থিত ছিলাম ত, শুধু খানিকটা ছিলাম না, এঁকে আনতে গিয়েছিলাম।" বলে পরে উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি লাবণ্যলতা রায়, ইনি শ্রীযুক্ত দত্ত, যাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছ।"

ওঁরা উভয়ে নমস্কার বিনিময় করার পরে শ্রীযুক্ত দত্ত আরম্ভ করলেন—"আপনি এসেছেন দেখে বড় আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের সাড়া না পেলে আমাদের সার্থকতা কোথায়? আপনারা শক্তি, আপনারাই ত শ্রী, আপনারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, অভয় দেবেন, তবে ত আমরা শক্তিমন্ত শ্রীমান হবো। আমি আপনার মত মেয়েদের চাই, যাঁদের প্রাণ আছে, শক্তি আছে, যাঁরা সমস্ত পুরুষদের দেবে শ্রী, শক্তি, আর মেয়েদের মধ্যে আন্‌বে জাগরণী সুর।"

আরো কিছু হয় ত বল্‌তেন, কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের আগমনে তিনি সেইদিকে চলে গেলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল। লাবণ্য একদিকে বসেছিল। মনে হ'ল, আজ যেন ওর জন্ম হ'ল নূতন প্রভাতের উজ্জ্বল আলোতে! নারী শক্তি ও শ্রী। ওর শক্তি ও ব্যর্থ হ'তে দেবে না। মনে মনে বীরেন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—"তোমার প্রেম আমাকে সুন্দর করেছে, শক্তি দিয়েছে, সেই প্রেমের আলোতে আমি দীপ্ত হয়ে সমগ্র দেশকে আলোকিত করব, সমগ্র নারী জাতিকে মুক্ত করবো, সকল বন্ধন হ'তে তারা মুক্ত হয়ে বিচরণ করবে দেশের বুকে। মান্‌ব না আমরা কোনো বন্ধন—আমরা মুক্ত হবো, মুক্ত হবো!"

হঠাৎ চারিদিক 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে সভাগৃহ কম্পিত হয়ে উঠল্। লাবণ্য সচকিত হয়ে চেয়ে দেখেন বীরেন তারই মুখের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলছে—"বন্দে মাতরম!'

লাবণ্য বধূ, লাবণ্য স্বামীর অত্যাচার প্রশ্রয়কারিণী সতী লাবণ্য আজ বীরেন্দ্রের মুখের পানে চেয়ে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বল্লে—"বন্দেমাতরম!"

লাবণ্যের মনে হ'ল ওর লাল চওড়া পাড় খদ্দরের শাড়ীখানা প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সভাপতি-মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীযুক্ত দত্ত বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। সুন্দর। সুপুরুষ। ওঁর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে মনে হ'ল প্রতিটি কথা প্রত্যেকের অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে আঘাত করছে। মনে হ'ল, ওঁর আন্তরিক আহ্বানে আজই বুঝি সমগ্র দেশ সাড়া দেবে।

শ্রীযুক্ত দত্তের প্রত্যেকটী কথা লাবণ্যের কর্ণে যেন দৈববাণীর মত বাজতে লাগ্‌ল।

বীরেন্দ্র এসে মৃদুস্বরে বল্লে—"শ্রীযুক্ত দত্ত বল্লেন তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে।"

—"আমি? পারব না।"

—"পার্‌বে, খুব পারবে। যে আমাকে জয় করল, সে কি না সামান্ত সভায় দাঁড়িয়ে দুটো কথা বল্‌তে পার্‌বে না—সে কি সম্ভব? আমি ওঁকে বলছি তুমি সম্মত আছ।"

আর কোন সম্মতির অপেক্ষা না রেখে বীরেন্দ্র চলে গেল। বহুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতা শেষ হ'ল।

সভাপতি মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে লাবণ্যলতা রায়কে আহ্বান জানালেন।

লাবণ্যের অন্তর কম্পিত হয়ে উঠল। মনে হ'ল—'কি বল্‌বো?" আস্তে আস্তে উঠে এসে মণ্ডপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। বাণী চৌধুরী এসে ওর কণ্ঠে প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালা দিয়ে গেলেন। সমগ্র জনতার দিকে চাইতে নয়নের দৃষ্টি এসে থাম্‌ল বীরেন্দ্রের মুখের দিকে। দেখ্‌ল বীরেন আশ্বাসভরা নয়ন ছু'টি তার দিকে মেলে উজ্জ্বল মুখে চেয়ে আছে। ও বীরেনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্‌তে আরম্ভ করল।

ক্রমে কণ্ঠ ওর উচ্চস্তরে উঠতে লাগ্‌ল—

—"হে আমার দেশের নারীশক্তি তুমি জাগো, জাগাও এ দাস জাতিকে। তুমি মহাভয়ঙ্করী কালী মুর্ত্তিতে এসে দাঁড়াও দেশের জাতির এ ছুর্দ্দিনে।...

"ভেঙ্গে দাও দাসত্ব শৃঙ্খল মহা কারাগার।

ধ্বংস কর দুই হাতে মানুষের শির।"...

লাবণ্য দেখল বীরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত-মুখে তারই দিকে চেয়ে আছে। মনে হ'ল আশ্বাস ভরা ঐ দুটী চোখ যেন ওকে দ্বিগুণ বলে বলীয়ান করে দিচ্ছে।

ও দীপ্ত ভঙ্গিতে উদার গম্ভীর স্বরে আবার বলতে আরম্ভ করল—বল একবার একটী মুহুর্ত্তের জন্য সমস্ত দাসত্ব শৃঙ্খল ভুলে বল "বন্দেমাতরম।"

সমস্ত জনতা মন্ত্র মুগ্ধের মত সভা প্রাঙ্গণ কম্পিত করে বলে উঠল 'বন্দেমাতরম।'

বক্তৃতা শেষে শ্রীযুক্ত দত্ত ওদের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিশেষ করে বল্লেন—চলুন আমার গাড়ীতে আপনাদের বাড়ী পৌছে দিই।'

গাড়ীতে ওরা তিনজনে এসে বসলে শ্রীযুক্ত দত্ত বলতে লাগলেন—আপনি কি রকম লোক বীরেন বাবু এমন রত্নই ঘরের কোণে লুকিয়েছিল আর আপনি জেনে শুনে চুপ করে বসেছিলেন? এঁকে আমাদের কমিটীতে যোগ দিতেই হ'বে ওঃ আজ আমার লজ্জা করছে. ওঁর বক্তৃতা এত সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে। লাবণ্য দেবী আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, বল্লুম, কথা দিন আপনি আমাদের বিশেষ কমিটীতে যোগ দেবেন।

লাবণ্য বীরেন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বীরেন্দ্র বুঝতে পারল বল্লে—দেখুন ওর আপত্তি ত নেই কিন্তু আত্মীয় সজনের মতামত না জেনে চট করে কথা দেওয়া চলে না।'

—না না সেকি একটা কথা হল। সামান্য বাধার জন্য এতবড় একটা শক্তি চাপা পড়ে থাকবে মনে করলেও যে মন পীড়িত হয়ে ওঠে।

লাবণ্য অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—না না সে দিক দিয়েও না তবে আমার নিজের শক্তি যে কতখানি সেওত ভাববার কথা।

—'আপনার শক্তি যে কতখানি সে আজ প্রথম দিনেই দেখলেন না? এখনও সংশয় আছে নাকি?

—"তা আছে বই কি।'

—"সে যদি থাকেত থাক। আমাদের নেই অতএব আপনি অনুগ্রহ করে যোগ দিন।'

বাড়ী এসে পড়ল। লাবণ্য সম্মতি দিয়ে নমস্কার করে নেমে পড়ল।

—দেখ লাবণ্য আজকাল সমস্তদিন হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে আমার ভাল লাগে না।'

"রাধারাণী স্বামীর উদ্দেশ্যে বল্লেন।

—'কেন ভাল লাগে না? ছেলে মানুষ কিছু একটা নিয়ে সময় কাটাবে ত।'

—"সময় কাটাবার অনেক জিনিস আছে পৃথিবীতে একমাত্র দেশ উদ্ধার করা ভিন্ন।'

—"তা আছে কিন্তু রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন।"

—"তুমি কেবল তর্ক করে কথা কেটে দাও। ও যদি ছেলে হ'ত তবে ভাববার কিছুই ছিল না কিন্তু মেয়ে মানুষ।"

—"মেয়ে মানুষ বলেই ত ওর প্রয়োজন বেশী! যে কোন আন্দোলনে মেয়েদের আনলে সে আন্দোলনে বহু পুরুষ এসে যোগ দেবেই। এটাও একটা রাজনৈতিকদের রাজনীতি! ধর যদি আজ জেলে মেয়ে পুরুষদের

একসঙ্গে রাখা হত তা'হলে দেশ শুদ্ধ পুরুষ জেলেই বসবাস করত, ভয় করত না।—

—"আবার ঐ বাজে কথা। সত্যি আমার কি রকম মনে হ'চ্ছে।'

—"কিন্তু এই সঙ্গে এটাও তোমার ভাবা উচিত যে ছেলেমানুষ বেশী লেখাপড়া জানে না যে তাই নিয়ে থাকবে, ছেলেমেয়ে নেই, ওর একটা অবলম্বন চাইত।

—"কি জানি আমার কিন্তু কেমন মনে হ'চ্ছে। সারাদিন টং টং করে ঘোরা। রাধারাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাবণ্যর বেশ লাগে, এ যেন নবজীবন! কোন কথা ভাববার সময় নাই। দাঁড়াবার সময় নাই মনে হয় এমনি করে ছুটেও যেন জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াবে তার আগে নয়।

আলোকের সন্ধান ও পেয়েছে, ও মৃত্যু হ'তে অমৃতের পথে চলেছে, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ দিগদিগন্তরে।

মনেই পড়ে না নরেন্দ্রের কথা, কবে কোথায় ওর জীবনে একটা দুঃস্বপ্নের মত ক্ষণিক ছায়া পাত করেছিল তার কথা মনে রাখবে এত সময় ওর নাই। ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত ও বীরেন্দ্রের প্রেমে দীপ্ত। কী জীবন! এমন জীবন ও যে কখন পাবে সে কথাও স্বপ্নেও ভাবেনি! ও যদি জাতীয় পতাকা তলে এসে না দাঁড়াত তবে এত স্বাধীনতা ও কখন কি পেত? বীরেন্দ্রকে এত নিবিড় বন্ধনে কি ও পেত! সমস্ত অন্তরে বীরেন্দ্রের কথা মনে হ'তেই বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়।

হঠাৎ মনে পড়ল আজ সভায় একটা বক্তৃতা দিতে হ'বে আজও খুব ভাল করে বলবে দাসত্ব সম্বন্ধে। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে—

আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল-পারা!

আবৃত্তি করতে করতে ও বেরিয়ে এল!

রাধারাণী রান্নাঘরে থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লেন,

—"আর কাজ নেই অত জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবার ঢের হয়েছে এবার একটু ঘরের কোনে চুপ করে বোস দিকি!"

সহাস্যে লাবণ্য বল্লে "চুপ করে বসে ত দেশ শুদ্ধ মেয়ে বসে আছে. চলন্ত মেয়েরই অভাব।"

—"আর চলে কাজ নেই। যদি জেলে যেতে হয়?"

—"তাও যাব। আমাদের ঘরে কারাগার বাইরে কারাগার কোথায় কারাগার নেই আমরাও জন্ম বন্দী, তবে আর জেলকে ভয় কি?"

—"কি জানি বাপু! কি করছো, কোথায় যাচ্ছ কখন বাড়ী আস কখন আস না, লোকে যদি কিছু চট কর বলে তখন!

—লোকে বলেই থাকে তাই বলে কি চুপ করে পঙ্গু হয়ে বসে থাকতে হ'বে?

—"জানিনে বাপু।"

রাগ করে রাধারাণী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

লাবণ্য এসে রান্নাঘরে ঢুকল—"রাগ করলে? কিন্তু তোমার মতামত ত এ রকম ছিল না, হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন?

"—তুমি লেখাপড়া ভাল করে শেখ তারপর দেশের যাতে ভাল হয় সেই রকম কিছু একটা কাজ কর আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ শুধু হৈ হৈ আমার যেন ভাল লাগে না। আর তা ছাড়া ঠাকুরপো বলছিলেন হয়ত তোমাকে ও ধরবে।"

—"আসল কথা এইটেই? তাই বল?

—"এইটে ত নিশ্চয়।"

"—সামান্য এইটুকু ভয়ে সত্য পথ ত্যাগ করব?"

"—সে তুমি যা ভাল বুঝবে করবে।"

লাবণ্য চট করে এগিয়ে এসে রাধারাণীকে জড়িয়ে ধরল

"—অমন করে বোল না দিদি। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।"

—"ছাড় ছাড়! দুলালী!"

—"দুলালীই ত। তোমার মত দিদি যেন জন্ম জন্ম পাই।"

রাধারাণীর মাতৃহৃদয় ব্যথিত লজ্জিত হয়ে উঠল ভ্রাতাকে স্মরণ করে, বল্লেন—"কাজ নেই আর জন্ম জন্ম পেয়ে। দিদি ত তোমায় রাজা করে দিয়েছে।"

—"দিয়েছেই ত কার ভাগ্যে এমন দিদি জোটে।"

—"দিদি জোটার কপাল খানা।"

বলে রাধারাণী সস্নেহে হেসে কাজে মন দিলেন।

লাবণ্য কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ। আবছায়া অন্ধকারে রাধারাণী এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। ছেলেমেয়েরা বেড়াতে গেছে। চন্দ্রনাথ ক্লাবে, শিবনাথও সান্ধ্য ভ্রমণে গেছেন।

লাবণ্য গেছে ওদের আজ কিসের একটা সভা আছে। মনটা আজকাল লাবণ্যর জন্য কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। আহা ছেলেমানুষ। উনি বোঝেন সবই কিন্তু পরিণাম যে কি অন্ধকার সে কথা ভেবে উনি যেন কূল পান না। ভ্রাতার উপর রাগে ঘৃণায় অশ্রদ্ধায় মন যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রের যদি মৃত্যু হ'ত সে ওর গৌরবের ছিল।

হঠাৎ ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল, রাধারাণী এসে ফোন ধরলেন।

"—হ্যাঁলো।"

"চন্দ্রনাথ বাবু আছেন?"

"না তিনি উপস্থিত নেই।"

—"উপস্থিত নেই। আচ্ছা তিনি এলে তাঁকে বলবেন শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা রায় এরেষ্ট হয়েছেন।"

ঠিক এই ভয়ই রাধারাণীর মনে কিছুদিন থেকে অনবরত উদয় হয়েছে। উনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন—'রঘু যা শিগগির ওঁকে ডেকে নিয়ে আয় বল আমি তাড়াতাড়ি ডাকছি!"

তারপর যথানিয়মে আত্মীয় স্বজনের উৎকণ্ঠা ছুটোছুটি অনুনয় বিনয় সব ব্যর্থ করে আত্মপক্ষ সমর্থন না করেই কারাবরণ করল। সংবাদ পত্রে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশিত হ'ল, সমগ্র পাঠক সমাজ সে সব কাহিনী পাঠ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, অন্তরে নব প্রেরণা পায়।

নারী মঙ্গল আশ্রম। এখানে যে সব নারী সমাজ হতে স্খলিত হয় তারা এসে আশ্রয় নেয়, সেই সঙ্গে পতিতার কন্যারাও আশ্রয় পায়।

স্খলন, পতনেও পুরুষের প্রয়োজন, আবার মঙ্গল, কল্যান, সেবা, আশ্রম ও পুরুষের আয়োজন।

নারীর দল সশ্রদ্ধ মান বলে কি উদার নইলে এসব মেয়ের কি গতি হত?' পুরুষের দল সগৌরবে বলে—আমরা শক্তি মান প্রাণবান জাতি তাই আমরা স্খলিত পতিত করি আবার তাদের উদ্ধার করি।

নির্ব্বোধ দুর্ব্বল বিবেচনাহীন নারীজাতি অবনত মস্তকে স্বীকার করে, উপায় নাই তারা যে শক্তিহীন।

গামা ভীমভবানীর ইচ্ছা হলে ও তারা যে কোন পুরুষের উপর শারিরীক অত্যাচার করতে পারে, কারণ তারা শ্রেষ্ঠ শক্তিমান। লাবণ্য কারাগার থেকে বের হয়ে কিছুদিন দেশসেবার পর ভাগ্যের বিপর্যয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে অত্যন্ত গোপনে প্রায় অজ্ঞাত বাস।

সমস্ত রাত্রি লাবণ্যের শিশু পুত্রের ক্রন্দনে নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় সুষমা তিক্তস্বরে বল্লে থামাওনা লাবণ্যদি সমস্ত রাত্রির একটু চোখে পাতার এক করবার জো নেই।

লাবণ্য অকস্মাৎ পুত্রের পৃষ্ঠে সজোরে চড় মেরে বল্লে—"মরে না আপদ, মর, মর, মরনা যমের অরুচি।"

—"বল্লাম অমনি রাগ! বাবাঃ বাবা আমার বলাই ঝকমারী কাল থেকে বড়দি মনীকে বলবো আমি এঘরে থাকবো না। বলি ছেলে হয়েছিল কেন এতই যখন অরুচি!"

লাবণ্য ক্ষতস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত হয়ে উঠল।

হ্যাঁগো হ্যা কে যে কত সতী সব জানি।"

নন্দরাণী এতক্ষণ ওদের কলহ শুনছিল এবার উঠে বসল।

—"তবে লা—"

একটা অশ্রাব্য গ্রাম্য উক্তি করে বল্লে—"কি জানিস তুই?"

লাবণ্য ধপ করে ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে—"তোকে কি বলেছি যে মাঝখানে তুই যা তা বলছিস?

বল্লিইত সবাইকে জড়িয়ে বল্লিনে?"

রাগে অপমানে লাবণ্য জ্ঞান শূন্যের মত ছুটে এসে ছেলেটার গায়ে এলো মেলো কীল চড় মারতে মারতে চীৎকার করতে লাগল—হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া তোকে নিয়েই যত জ্বালা তুই মর না, মর না, মর না।"

সমবেত মেয়েদের চিৎকারে লেডী সুপারিনটেনডেন্ট রুদ্রবালা সেন ছুটে এলেন

—"একী হ'চ্ছে?"

বলেই তিনি একটা সজোরে ধাক্কা দিলেন, লাবণ্য ছিটকে পড়ে গেল।

রুদ্রবালা লাবণ্যর পুত্রের ভার সুষমার উপর দিয়ে, লাবণ্যর গায়ে হাল্কা চপ্পলের ঠেলা দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে সেকলটা তুলে দিতে দিতে বলেন—"অভদ্র ইতর স্ত্রীলোক। নিজেই না হয় চরিত্র হীন হয়েছ কিন্তু ভদ্র পল্লীতে আছ সে কথা মনে থাকে না, রাত দুপুরে হৈ চৈ যেন পতিতার আড্ডা।"

প্রচণ্ড রাগে ভিতর থেকে লাবণ্য এলোমেলো অর্থহীন চিৎকার করে সেই সঙ্গে নিজের কাপড় চুল ছিঁড়ে নিজেকে ঘামাক্ত মেঝেতে মাথা ঠুকে আরো যে কি করবে ভেবে পায় না। সবাই আপন শয্যায় শুয়ে পড়ে।

শুধু লাবণ্য বহুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে অন্ধকারে মাটিতে এলিয়ে পড়ে চেয়ে থাকে অন্ধকারের অকূল পাথারে।

অমলা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-এ-এস্,

এক

সত্য সত্যই এটা মীনার ভারী অন্যায়। সুরেশ এমন কি করিয়াছে যাহাতে তাহার সহিত বাস করা একান্ত অসহ্য হইয়াছে? তাই ত সে বলিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। কলিকাতার শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ না করিয়া যদি সে তাহাদের পল্লীগ্রামের কোনও বালিকাকে বিবাহ করিত তাহা হইলে সে কি বিনাদোষে এই ভাবে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত?

জমিদারের ছেলে সুরেশ। এম্-এ, বি-এল, সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে উকীল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। সিনিয়র উকীলের বাড়ীতে তাঁহার অনুরোধে কয়দিন উপর্য্যুপরি বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতে হইয়াছে। আর দিন দুই কলেজের পুরাতন বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া তাহার সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখিয়া রাত্রিতে বাটী ফিরিয়াছে। স্বীকার করি, বালীগঞ্জের নবক্রীত বাটীটিতে মীণাকে সমস্ত দিন একাকী থাকিতে হয়, কিন্তু সুরেশ কি বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত কোর্ট হইতে ঠিক তিনটার সময় স্কুল পালানো ছেলের মত পলাইয়া আসে নাই? কয়দিন বাটী আসিতে রাত্রি হইয়াছে, তাহার কৈফিয়ত ও ত সে দিয়াছে। কিন্তু মীণা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গেল যে তাহার কোন কথা বিশ্বাস করে না এবং পুরুষ মানুষদের স্বভাবই এইরূপ। পল্লীগ্রামের কোন হিন্দু স্ত্রী কি স্বামীর কথায় এরূপ অবিশ্বাস করিতে পারিত, কিম্বা স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত? মীণা ত স্পষ্টই বলিয়া গেল যে তাহার সহিত বাস করা অসহ্য। এই মীণারই রূপে গুণে সুরেশ মোহিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল তাহার জীবনে আর যাহাই হউক কখনই দাম্পত্য সুখের অভাব ঘটিবে না। আশ্চর্য্য! এই সংসার! এমন সংসারে থাকিবার প্রয়োজন কি সে আজই সংসার ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হইবে। মীণার মনে যদি এতটুকুও অনুতাপ জাগিত তাহা হইলে এই যে তিন দিন সে পিত্রালয়ে গিয়াছে ইহার মধ্যে অন্ততঃ একখানি পত্র লিখিয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিত।

সুরেশ তাহার প্রিয়ভৃত্য রাজুকে ডাকিল। রাজু দ্বারদেশেই ছিল। সুরেশকে তাহার কিছু বলিবার ছিল কিন্তু সুরেশের চিত্তচাঞ্চল্যের পরিচয় পাইয়া সে কিছু বলিতে পারে নাই। হয়ত সুযোগ ঘটিতে পারে এই মনে করিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল।

রাজু আসিলে সুরেশ তাহার সাহায্যে সুটকেশ ও বিছানা গুছাইয়া লইল এবং একটি ট্যাক্সি ডাকিতে বলিল।

রাজু সঙ্কোচের সহিত বলিল, "বাবু, কোথায় যাবেন?"

সুরেশ সংক্ষেপে বলিল, "বম্বে। মাস খানেক সেখানে আপাততঃ থাকব। তুই সাবধানে বাড়ী চৌকী দিবি, অন্য লোকজন নতুন।"

"বাবু সকালে ত কিছু খাওয়া হয় নি। কদিনই ত নাম মাত্র খেতে বসেছেন। এবেলা ঠাকুরকে কিছু—"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিল, "না, না, কিছু দরকার নাই। আমার বিনোদের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে সেখানে খেয়ে ট্রেণে উঠব। তুই সাবধানে থাকবি।"

খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়া সুরেশ ট্যাক্সিযোগে গৃহত্যাগ করিল।

রাজুর ভারী বিপদ। তাহার দেশ হইতে পত্র আসিয়াছে যে মহাজনকে অন্ততঃ একশত টাকা অবিলম্বে না পাঠাইলে তাঁহার ঘর রাড়ী জমি জমা নীলাম হইবে।

সুরেশের অনেকদিনের বিশ্বাসী চাকর সে। পূর্ব্বে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে সুরেশকে বলিবামাত্র সে বিনা

বাক্যব্যয়ে অগ্রিম টাকা দিয়াছে। সে টাকা অনেক সময়েই সম্পূর্ণভাবে বেতন হইতে শোধকরিবার আবশ্যক হয় নাই কারণ তাহার বহু সংকার্য্য ও সেবা শুশ্রূষার জন্য পুরস্কার স্বরূপ সে দেনা পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া সুরেশ ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই মানসিক চাঞ্চল্যের সময় সে কি করিয়া নিজের বিপদের কথা উত্থাপন করিবে?

মা ঠাকুরাণী ত লক্ষ্মীস্বরূপিনী। স্বামী অন্ত প্রাণ তার সত্য সত্যই কি তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন? রাগের মাথায় কথাকাটাকাটিতে যাহাই তিনি বলুন না কেন, এখন একবার বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া বুঝাইয়া বলিলে সব মিটিয়া যাইত। সে বাবুকে দুএকবার এ পরামর্শ দিতেও গিয়াছিল কিন্তু ধমক খাইয়া নিরস্ত হইয়াছে।

বাবু না জানিতে পারেন, সে ত মাঠাকুরাণীকে এই একবৎসর যে বিবাহ হইয়াছে বিলক্ষণ দেখিয়াছে ও চিনিয়াছে। বাপের বাড়ী যাইবার সময়ে গোপনে রাজুকে তিনি কি একশবার বলিয়া যান নাই যে বাবুকে সে ভাল করিয়া দেখে শুনে, ঠিক সময়ে যেন তাঁহার খাওয়া দাওয়া হয়, অসুখ করিলে যেন তাঁহাকে খবর দেয়! মাথার দিব্যি দিয়া বাবুকে এসকল কথা বলিতে বারণ করিয়া গিয়াছে। বলিয়াইত রাজু তাঁহাকে কিছু জানায় নাই।

সন্ধ্যার সময় রাজু গেটের ধারে বসিয়া ভাবিতেছিল কি উপায়ে সে মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক শুভযোগ উপস্থিত হইল।

রাজু দেখিল তাহাদের নিকটেই যে বাড়ীটিতে আলিপুরের হাকিম বাবুটি থাকিতেন এবং দিন পনরো তিনি বদলী হওয়ায় যে বাড়ীটী একটি মাদ্রাজী সাহেব ভাড়া লইয়াছিলেন তাহার সম্মুখে একজন সাহেব বেশী বাঙ্গালী যুবক দরয়ানকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি ট্যাক্সীতে একজন সুন্দরী যুবতী (অনুমানে বোধ হয় তাঁহার স্ত্রী) এবং তাঁহার সুটকেশ বিছানা প্রভৃতি। দ্বারবানের সঙ্গে কথা কহিয়া যুবক যেন নিরাশ হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিলেন। এবং ড্রাইভারকে কি উপদেশ দিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজুকে দেখিয়া যুবকটি জিজ্ঞাসা করিলেন নিকটে কোন সুসজ্জিত বাড়ী ভাড় পাওয়া যায় কি না—সে সস্ত্রীক পনেরো দিনের জন্য কলিকাতায় দর্শনীয় বস্তু সকল দেখিতে আসিয়াছে।

রাজু এই অনুযোগের মধ্যে পরমেশ্বরের দয়ায় নিদর্শন দেখিতে পাইল! সে বলিল পনেরো দিনের জন্য এই বাড়ীটিই ভাড়া দেওয়া যাইবে কিন্তু ভাড়া এক সময়েই লাগিবে এক শত টাকা অগ্রিম দেয়।

যুবকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাহার বাড়ী বাবু কোথায় থাকেন?"

রাজু বলিল, "এখন বাড়ী আমারি জিম্মায়, আমাকে টাকা দিলেই আমি ঘর খুলিয়া দিব! যুবক গাড়ী হইতে স্ত্রীকে নামাইল! স্ত্রীকে বলিল, "নির্ম্মল যে এর মধ্যে আলিপুর থেকে বদলি হয়ে যাবে এ আমি মনেও করি নি। কোথায় মনে করলাম তাকে সারপ্রাইজ করব, কিন্তু তাকে আগে না জানিয়ে এসে ভাবি অন্যায় করিছি। যাই হোক্, ভগবানের ইচ্ছায় বেশ সুন্দর বাড়ীটা পাওয়া গেছে। ছুটীটা এখানেই উপভোগ করা যাবে।"

রাজু লেখাপড়া জানে। সে তাহার বাঙ্গলায় বাড়ী ভাড়ার রসিদ দিয়া রায় দম্পতীকে বাড়ীতে বসাইয়া বাড়ীর চাকরদের চুপি চুপি বলিল, "সাহেব বাবুর পুরাণো বন্ধু, তোরা সব এঁকে বাবুর মত যত্ন করবি, নইলে বাবু এসে ভারী রাগ করবে। তাহার পর সে তাহার এক গ্রামবাসীর নিকট মহাজনের টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

মিষ্টার বিমল রায় আই সি এস পাশ করিয়া বম্বেতে চাকুরী পাইয়াছেন। তাঁহাকে ও মিসেস রায়কে বাল্যবন্ধু নির্ম্মল সেন অনেকবার কলিকাতায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, অবশেষে অভিমান করিয়া লিখিয়াছিলেন, আর লিখিব না।' বিমল বাবুকে চমৎকৃত করিবার জন্য এবার বিনা নিমন্ত্রণে ত বটেই, বিনা সংবাদে তাহার বাড়ীতে বেড়ানও হইবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু দৈবযোগে নির্ম্মল ইতোমধ্যে বদলী হইয়া গিয়াছে! সেবা বলিল "যখন এত খরচ করিয়া কলিকাতায় আসাই গিয়াছে, তখন ছুটির কটা দিন কলিকাতার দৃশ্যাদি দেখিয়াই কাটান যাউক। বাড়ীটিও পাওয়া গিয়াছে ভাল।

ছোট হইলেও, নূতন ও পরিষ্কার, আসবাবপত্রও গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীর পরিচয় দেয়।

দুই দিন ট্রেণে আসিয়া রেবা ক্লান্ত হইয়াছিল। সে স্নান করিয়া শয়ন গৃহে একটি কৌচে শুইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বিমল পাঠগৃহে গিয়া কয়েকটি পত্র লিখিতে বসিল এবং তাহার পর সেও ইজি চেয়ারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এ দিকে সুরেশ তাহার বন্ধুর বাড়ীতে আহারাদি করিয়া হাবড়ায় গিয়া দেখিল তাহার বন্ধুর আতিথেয়তার আতিশয্য বশতঃ বম্বে মেলটি ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে। মীনা সম্বন্ধে বন্ধুর সহিত তর্কবিতর্ক করিবার সময় ঘড়ির কাঁটাগুলি যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। সে ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার শয়ন গৃহে আলোক জলিতেছে। তবে কি মীনা তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে বহু তাপে দগ্ধ হইয়া যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। বন্ধুর সহিত তর্কের পর সুরেশ নিজের ভ্রম অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে, এক্ষণে মীনা অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনের গ্লানি দূর হইয়া গেল।

গোপনে দেখিতে হইবে মীনা কি করিতেছে। লোক জনেরা না হৈ চৈ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেয়। খুব সৌভাগ্য রাজুকে দেখিতে পাইতেছে না। সে নূতন একটি চাকরকে জিনিষ পত্র ট্যাক্সি হইতে নামাইতে বলিয়া এবং তাহার আগমন বার্ত্তা এখন কাহাকেও প্রকাশ করিতে না বলিয়া পা টিপিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

দেখিল, যুবতী—(মীনা ব্যতীত যায় কে) ? কৌচে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। আহা কয়দিনে রোগা হইয়া গিয়াছে সুরেশের মায়া হইল।

সে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া প্রিয়তমা আর কে আছে ? যা বলেছি ভুলে যাও।"

রেবা অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি কে ? বেরোও ঘর থেকে !"

সুরেশ রেবাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল ! সে বলিল, "আপনি কে ?"

রেবা বলিল "সে কথায় তোমার দরকার কি ? একজন ভদ্রমহিলার নিদ্রিতাবস্থায় তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করে যে, সে বর্ব্বর -"

সুরেশ নতজানু হইয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু আমি যথার্থই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আপনি কিরূপে আমার শয়নগৃহে এসে উপস্থিত হলেন।"

রেবা বলিল, "তোমার শয়নগৃহ ? এ বাড়ী এখন আমাদের, তুমি এ ঘর থেকে যাবে কিনা ?"

একজন যুবতী এই সময়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বেশ, বেশ। আমি দু'দিন বাড়ী ছেড়ে গিয়েছি আর অমনি আর একটি সুন্দরীকে এনে তার সামনে—ছি ছি।"

সুরেশ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল মীনা।

এই গোলযোগে বিমলেরও তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। সে রেবার শয়নগৃহে আসিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর সুরেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সুরেশ না ?"

সুরেশ বলিল, "বিমল ?"

"তবু ভাল, চিন্‌তে পার্‌লে।"

"সেই কলেজের পর ত আর দেখা নেই। তুমি বিলেত গেলে, আই-সি-এস হলে, বম্বেতে চাক্‌রি পেলে সবই জানি, কিন্তু আমাদের এখন চিন্‌তে পারবে কিনা সেই সন্দেহ ছিল। সেই সন্দেহ মিটাবার জন্য আমি বম্বে যাচ্ছিলাম, এই দেখ বম্বের টিকিট। নেহাত ট্রেণটা ফেল হওয়ায় বাড়ী ফিরলাম।"

রেবা বলিল, "ওঃ আপনিই সুরেশ সেন। আমায় ক্ষমা করবেন, আমার মাথার ঠিক ছিল না। কি বলেছি আপনাকে।"

মীনা বলিল "ক্ষমা যদি কাহাকেও চাইতে হয় ত সে আমাকে। আমি তোমাদের দুজনের কাছেই অপরাধিনী।"

পরে সমস্ত ঘটনা একে একে প্রকাশ পাইল। সুরেশ রাজুকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া মিঃ রায়কে টাকা ফেরত দিতে বলিল কিন্তু রায় কিছুতেই টাকা লইলেন না, বলিলেন, "তোমার কাছে ত বাড়ী ভাড়া নিই নি সুরেশ, রাজু বাবুর কাছে নিয়েছি। তুমি এখন সস্ত্রীক আমাদের অতিথি।"

সুরেশ তাহা স্বীকার করিল না। সে পনেরো দিন পরে সস্ত্রীক বম্বেতে মিষ্টার ও মিসেস রায়ের আত্মীয়তার পরিচয় লইতে গেল।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

আভিজাত্যের মূল্য

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

পূজা আগত প্রায়! হরিপাল নাট্য সমিতির সভ্যেরা সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বরাবরের মত এ বৎসরও মহাষ্টমীর দিন স্থানীয় নাট্যমন্দিরে নাটকাভিনয় হইবে। ক্লাবঘরে কয়দিন হইতে "জনা" ও "আলিবাবার" জোর মহলা চলিতেছে। রায় পাড়ার পরশ্রীকাতর অকাল পক্ক কতকগুলো ছেলে নাকি এবার কলিকাতার ভাড়াটে অভিনেতা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে নাটকাভিনয়ের বন্দোবস্ত করিতেছে! তা হউক, কলিকাতার পাবলিক ষ্টেজের ভূতপূর্ব্ব প্লেয়ার ভোলাদার মত অভিজ্ঞও পারদর্শী মোশন মাষ্টার" উহারা পাইবে কোথায়?

সেদিন সন্ধ্যায় সভ্যেরা সকলেই ক্লাবঘরে মহলার জন্য সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু কাহারও যেন তেমন উৎসাহ নাই। মূল অভিনেতা তারক, যে জনার প্রবীরের ভূমিকা ও আলিবাবার নাম-ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহারই দেখা নাই। অথচ বলিতে লেলে অভিনয়ের সাফল্য চৌদ্দ আনা নির্ভর করিতেছে তাহারই উপর। সে না হইলে মহলাই বা জমিবে কেমন করিয়া? এ যেন সেই ডেনমার্কের যুবরাজের ভূমিকা নাই অথচ হ্যামলেটের অভিনয় হইতেছে সেইরূপই অসম্ভাব্য, যেইরূপই হাস্যকর।

আকাশ মেঘাচ্ছন্নই ছিল, কিছুক্ষণ হইতে বেশ বৃষ্টিও স্বরু হইয়াছে। যে ছেলেটিকে তারকের খবর আনিতে পাঠান হইয়াছিল, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পড়িল; ছাতা না থাকায় ছেলেটি ভিজিয়াছেও বেশ! ললিত, করুণা, নন্দ প্রভৃতি সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, —'কি হ'লরে ভজা, তারকের খবর কি? ভজা জানাইল, তারককে নাকি কোন অনিবার্য্য কারণে ডানকুণিতে তাহার দিদির বাড়ী যাইতে হইয়াছে; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহার আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তা হখন সে আসে নাই, সম্ভবতঃ দিদির নিকট আটক পড়িয়াছে।

দুঃসংবাদ শুনিয়া হতাশায় সকলের মুখ বাহিরের আকাশের মতই অন্ধকার হইয়া উঠিল। লালু ওরফে ললিত বলিল,—জানি আমি ওই ইল্‌রেস্‌পন্‌সিবল তারকাটাই শেষ পর্য্যন্ত সব পণ্ড করবে;···যত সব ইয়ে নিয়ে হয়েছে কারবার...বলিয়া বিরক্তিতে সে মুখ বিকৃতি করিল। 'আলিবাবার' মর্জ্জিনার পাট করুণার। সে ততক্ষণে হারমোনিয়মটা বাগাইয়া বসিয়া ধীর মেঘলি কণ্ঠে সুর ভাজিতে সুরু করিয়াছে—

ছি ছি এত্তা বড়া বাড়ীমে এত্তা জঞ্জাল,
হর্‌দম্ লাগাত ঝাড়ু তববি এ্যায়সা হাল।
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল...

ভোলাদা লোকটা স্বভাবতই যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির। এতক্ষণ তিনি চুপ করিয়াছিলেন; এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন,—জানলে হে করুণা, এই রকম বাদলার দিনে তোমার ওই গানটা শুনে, কি জানি কেন আজ হঠাৎ বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল। পারুলবালার মর্জ্জিনা তুমি নিশ্চয়ই দেখ নি···যে দেখেছে সে আর ভুলতে পারবে না।...বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। বোধ হইল কোন অতীত ঘটনার অস্পষ্ট স্মৃতিকে তিনি মনের মধ্যে একটু ঝালাইয়া লইতেছেন।

ঘোনা ওরফে ঘনশ্যাম চিরকালই গল্পপ্রিয়; বিশেষতঃ ভোলা দা' স্বয়ং যেখানে বক্তা। আর শুধু ঘোনাই বা কেন, ভোলাদার মুখ হইতে পারুলবালার তথা কলিকাতার নাট্যজগতের গুহ্যতম ইতিবৃত্ত শুনিবার অদম্য কৌতূহলে দেখিতে দেখিতে ঘোনা, মোনা, লালু, করুণা প্রভৃতি সকলেই একে একে তাঁহার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। ভোলা দা তাঁহার বর্ম্মা চুরুটে একটা মস্ত টান দিয়া আরম্ভ করিলেন,— পারুলবালাকে তোমরা হয়ত অনেকেই খুব নাম-করা আর সুন্দরী এ্যাক্‌ট্রেস বলেই শুধু জানো;—আর শুধু তোমরাই

বা কেন, আমরা—যারা তার সঙ্গে কতদিন একসঙ্গে প্লে করেছি,—জানতাম না যে তার জীবনটা একটা কত বড় ট্রাজেডি। সেই কথাই আজ বল'ব তোমাদের। তোমরা অনেকেই নিশ্চয় জানো না, পারুলবালা তা'র আসল নাম নয়, ছদ্ম নাম। তা'র আসল নাম ছিল, লীলা দেবী··· ভদ্রঘরের মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে। সে তা'র কীর্ত্তির দ্বারা থিয়েটার ফ্যানদের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনের প্রতিষ্ঠা করেছিল বটে, কিন্তু তা'র বংশের মুখে দিয়েছিল চুণকালি। সুতরাং আজ আমি আর তোমাদের কাছে তার সুবিস্তৃত বংশ পরিচয় দিয়ে অপরাধী হতে চাই না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, সে ছিল পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রসিদ্ধ অভিজাত বংশের আর ধনীর সন্তান। বাপ বাংলা গভর্ণমেণ্টের একজন খুব বড় অফিসর ছিলেন, আর তা' ছাড়া দেশেও ছিল তাঁর বিস্তর জমিদারী। ভদ্রলোককে চাকরীর খাতিরে কলকাতাতেই থাকতে হ'ত বছরের অধিকাংশ সময়। স্ত্রীকে তিনি হারিয়েছিলেন বহুকাল পূর্ব্বেই ;—সে জন্য মাতৃহীন সন্তান দুটিকে—অর্থাৎ লীলা আর তার দাদা অমলকে—নিজের কাছেই রাখতেন। জীবনে দুঃখ কিম্বা অশান্তি কাকে বলে তা' লীলা বা অমল তা'দের বাপ বর্ত্তমানে কখনও জানতে পারে নি। এমন কি বাপের অপর্য্যাপ্ত স্নেহলাভে তা'রা মায়ের অভাব পর্য্যন্ত ভুলেছিল। মাতৃহীন সন্তানের সুখ সুবিধার দিকেই যে শুধু বাপের লক্ষ্য ছিল তা' নয়, তা'দের লেখাপড়া, গান বাজনা, ক্রীড়া, কৌতুক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই পারদর্শী করে তোলার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তা'দের দু'জনেরই ছিল অনেকগুলি মাষ্টার,—কেউ শেখাত গান, কেউ শেখাত লেখাপড়া, এই রকম। কিন্তু লীলার বাবা সকল বিষয়েই মধ্যপন্থী ছিলেন। প্রাচীন আর আধুনিক দুই মতবাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গ'ড়ে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি স্ত্রী শিক্ষারবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু প্রাপ্ত যৌবনা মেয়েদের সঙ্গে পরপুরুষের অবাধ মেলামেশা তিনি মোটেইপছন্দ করতেন না। সেইজন্য লীলা একটু বড় হতেই তিনি পুরুষ শিক্ষক ছাড়িয়া তার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করলেন।...দুটি ছেলেমেয়ে, যেন দুটি রত্ন। পরস্পরের মধ্যে ভাবও তেমনি যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।···সন্তান-গর্ব্বে বাপের বুক দশ হাত হ'য়ে ওঠে, তা'দের সুখ্যাতিতে তিনি পঞ্চমুখ হন।···এইভাবে তিনটি প্রাণীর নিরুদ্বেগ দিনগুলি কেটে যায়।

তারপর ভাগ্যচক্র গেল ঘুরে। নির্ম্মেঘ আকাশ থেকে যেন হ'ল আকস্মিক বজ্রপাত। অমল সেবার বি এ তে স্কলারশিপ পেয়েছে, লীলা পরের বছর প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবে, এমন সময়ে সহসা একদিন এ্যাপোপ্লেক্সির অতর্কিত আক্রমণে সন্তানদের রেখে পিতা করলেন মহপ্রস্থান, শেষ আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করবারও অবসর পেলেন না।...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভোলা দা নীরব হইলেন। চুরুটের আগুণ নিভিয়া গিয়াছিল, আবার অগ্নি সংযোগ করিয়া খুব জোরে গোটাকতক টান দিয়া, একমুখ ধূম উদ্গীরণ করিয়া আরম্ভ করিলেন,—লীলা যথাসময়ে ম্যাট্রিক পাশ করল, রীতিমত স্কলারশিপ পেয়ে। অমল তখন এম, এ পড়ছে। অমলের ইচ্ছা আরও একটু অভিজাত পল্লীতে বাস করবে। দাদার কোন কথায় লীলা কখনও অমত করে নি, এবারও করলে না। আর পয়সারও তাদের অভাব নেই, বাপের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন তারাই। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বাসা ছেড়ে থিয়েটার রোডের ওপর একটি বাসায় তারা উঠে গেল।...অমলের দ্বিতীয় ইচ্ছা হ'ল, লীলাকে মেয়েকলেজে না পড়িয়ে স্কটিশে পড়াবার। লীলা অনেক আপত্তি ক'রল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা'র আপত্তি কিছুতেই টি'কল না। সে স্কটিশেই আই, এ পড়তে লা'গল। পুরুষ ছাত্রদের দৃষ্টি সম্মুখে বসতে প্রথম প্রথম তা'র খুব আশোয়াস্তি বোধ হ'ত, কিন্তু অতি অল্পদিনের চেষ্টাতেই সে সেই অকারণ সঙ্কোচ জয় করলে।...এরপর অমল একদিন প্রস্তাব করলে তা'র এক ক্লাস-ফ্রেণ্ড লীলাকে পড়াতে রাজী আছে...খুব ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে সে লীলার যদি কোন অমত না থাকে ত' তা'কে এ্যাপয়েণ্ট করা যেত পারে। লীলা এবার আর আপত্তি করলে না, ববং বেশ একটু খুসীই হ'ল যেন। কিন্তু সে তা'র দাদার কথার প্রথম প্রতিবাদ ক'রল সেইদিন যেদিন অমল বললে যে সে তা'র জনকতক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে...তা'দের রিসিভ করা ও

গান শুনিয়ে এন্‌টারটেন করার ভার নিতে হবে লীলাকে। লীলার আপত্তি দেখে অমল বেশ একটু বিরক্ত হ'য়েই বলে উঠল,—''ডোণ্ট বি সিলি লিলি...টোয়েন্টিয়েথ্‌ সেঞ্চুরির এডুকেটেড্‌ গার্ল হ'য়েও তুমি এত আন্‌সোসিয়াল হ'লে, লোকে যে গায়ে থু থু দেবে,...ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলে তা'রা বাঘও নয় ভল্লুকও নয়,...এতে তোমার নার্ভাস্‌ হবার কি আছে?...দাদার বিরক্তির ভয়ে লীলাকে নিমরাজী হ'তে হ'ল। এইভাবে দাদার শিক্ষায় বছরখানেকের মধ্যেই লীলা দস্তুরমত এক "আল্‌টামডার্ণ সোসাইটী গার্লে" রূপান্তরিত হ'ল। নিজে মটর ড্রাইভ করে সে শপিংএ বার হয়, ডান্সে গিয়ে রাত করে' বাড়ী ফেরে, দাদার অনুপস্থিতিতে ভ্রাতৃবন্ধুদের শুভাগমন হ'লে, নিঃসঙ্কোচে হাসিমুখে সে তাঁদের অভ্যর্থনা করে, পিয়ানোয় বসে গান গেয়ে তাঁদের পরিতৃপ্ত করে। এমন কি অমলেরই উদ্যোগে এম্পায়ারে একবার ভদ্রমহিলাদের দ্বারা অভিনীত এক চ্যারিটী পারফরমেন্স হয়, তাইতে নায়িকার পার্টে প্লে করে সে এক রাত্রেই এমন নাম করে ফেললে, যে কলকাতার অভিজাত মহলে রীতিমত একটা সাড়া প'ড়ে গেল। ভগ্নীর এই গৌরবে অমল নিজেকে ধন্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করলে।... তার বহুদিনের স্বপ্ন হ'ল সফল, কামনা হ'ল পূর্ণ। কাগজে কাগজে লীলার ছবি ছাপা হ'য়ে অসংখ্য পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করছে,...ট্রামে, বাসে, সর্ব্বত্র লীলারই জয়গান,... এসবেরই মূলে যে সেই, সমস্ত কৃতিত্ব যে আজ তা'রই এই কথা ভেবে অমল পরম আত্মতৃপ্তি বোধ করলে কিন্তু তা'র কৃতিত্ব যে আরও কত বেশী যে বিষবৃক্ষ সে নিজের হাতে সযত্নে রোপণ করেছে, তা'র ফল যে কত কটুতিক্ত, কত বিষাক্ত হ'তে পাবে, সে জ্ঞান তা'র হ'ল সেইদিন, যেদিন সিনেমা থেকে ফিরে দেখে সে অবাক হ'য়ে গেল, ...লীলা সহসা উধাও হ'য়ে গেছে, কোথায় কে জানে। শুধু এক টুকরা কাগজে সে লিখে রেখে গেছে,—দাদা, আমি আজ নিরুদ্দেশের পথে পা' বাড়ালাম,...আমার বৃথা খোঁজ আর না করলেই আমি সুখী হ'ব। এই প্রিসিয়াস লাইফটাকে আমি সমস্ত কায়মন দিয়ে এনজয় করতে চাই ক্ষমা কোরো।...

অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত অমল কখনও ভেবেও দেখেনি, চিরাচরিত বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙে দুর্ব্বার গতিতে অনির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হওয়ার বিপদ কতখানি কি তা'র সম্ভাব্য ও স্বাভাবিক পরিণতি। সেই দিন প্রথম সে নিজের কাছে অনুতপ্ত চিত্তে স্বীকার করলে, লীলার এই পদস্খলনের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে ত' সেই।...এখন ভগ্নীর এই কলঙ্ক সে গোপন রাখিবে কেমন করে? কেমন করে সে জন সমাজে মুখ দেখাবে? কোথায় সে সন্ধান করবে লীলার?...লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে অমল পাগলের মত হ'য়ে গেল। তারপর সেও দেরী করলে না,...ঝড়ের মুখে নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতই ছিটকে পড়ল যেন,... লোকলজ্জা এড়াবার জন্য সেও দিলে লম্বা পাড়ি, একেবারে সাগরপারে। কিন্তু সেখানে গিয়েও যখন শান্তি পেলেনা, তখন সে সর্ব্বদুঃখহরণ সুরার আশ্রয় নিলে,...ইউরোপের ভোগ সুখলালসাময় পঙ্কিল জীবনের মধ্যে পড়ল ঝাঁপিয়ে এই রকম করে দেখতে দেখতে অধঃপতনের গভীর অতলে অতি দ্রুত সে গেল নেমে। শরীরে আগুন লাগলে লোকে যেমন ছুটোছুটি করে, সেও তেমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত কখনও ছোটে ফ্রান্সে, কখনও ইটালীতে, কখনও যায় জার্ম্মাণীতে।...এদিকে লীলাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন, তিনি ইতিমধ্যে মই কেড়ে নিয়ে সরে পড়েছেন, তাঁর মোহ গেছে কেটে। লীলা মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু খেতে খেতে, স্রোতে ভেসে নানা আঘাটায় লেগে, বিবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষে পারুলবালায় হয়েছেন রূপান্তরিত।...বলরুমে, বারে, জুয়ার আড্ডায়, সাঁলোয় অজস্র অর্থব্যয় করে দু'তিন বছর পরে অমল যখন কলকাতায় ফিরল, মনে হ'ল এ যেন তা'র প্রেতমূর্ত্তি।...ভাই তখন এক পুরোদস্তুর চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল মাতাল, ভগ্নী নাট্যমহলের নাম করা এ্যাক্‌ট্রেস্‌।

তারপর এল সেইদিন, যেদিনের কথা তোমাদের বলতে বসেছি। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হ্যাণ্ডবিলের ছড়াছড়ি, দেয়ালে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে ঘোষণা করা হয়েছে "জনপ্রিয়া, সুদর্শনা, নৃত্যগীতপটীয়সী অভিনেত্রী শ্রীমতী পারুলবালার সম্মানরজনী উপলক্ষে" জলসা, নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত, চন্দ্রশেখর

আর আলিবাবার অভিনয় হবে। অভিনয়ের দিন আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়লো, কিন্তু তবু পারুলবালার নামের এমনি গুণ, অডিটরিয়মে তিলধারণের স্থান রইল না। প্লে আরম্ভ হ'লে ভক্তবৃন্দের ঘন ঘন "এনকোর" আর করতালি ধ্বনিতে পারুলবালা অভিনন্দিত হ'তে লাগল। তারপর সর্ব্বশেষে আরম্ভ হ'ল আলিবাবার প্লে;...বিচিত্র বেশভূষায় সেজে মোহিনীমূর্ত্তিতে নামল পারুলবালা মর্জ্জিনার ভূমিকায়। আনন্দধ্বনিতে চারিদিক মুখর হয়ে' উঠল, চঞ্চল হয়ে উঠল, দর্শকের দল, ...নৃত্যশালা। মর্জ্জিনা যখন, "ছি ছি; এত্তা জঞ্জাল" ব'লে গানটা গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ চমৎকৃত করে' তুলেছে, ঠিক সেই সময়ে অর্কেষ্টার মধ্যে হঠাৎ একটা হট্টগোল উঠল,—কি যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। দর্শকরা চেঁচাতে লাগল—"মাথায় জল দাও", "বাতাস করো।" কত বোতল মদ গিলেছেরে বাবা,—কে একজন মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট বুঝি ছিল, সে দেখে বললে,—"কেস্ অফ পয়জনিং" বলে যেন মনে হচ্ছে···পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।... লোকটা চেয়ারের ওপরেই এলিয়ে পড়েছিল, তা'র পায়ের কাছ থেকে একখানা ছোট নোটবুক কুড়িয়ে পাওয়া গেল, বোধ হয় বুক পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। তাতে এক জায়গায় নাম লেখা আছে,—"অমল রায়।"···ষ্টেজের ওপর ইতিমধ্যে ড্রপসিন্ পড়ে গিয়েছিল,...অভিনেতা অভিনেত্রীরা তখন গ্রীণরুমে। এমন সময়ে লোকের মুখে মুখে অমল রায়ের নাম আর তা'র আকৃতির বর্ণনা পারুলের কাণে পৌছুতেই, সে তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন চম্‌কে উঠল।·· স্থানকাল ভুলে আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই মর্জ্জিনার বেশেই সেই মুহূর্ত্তে সে উন্মাদিনীর মত ছুটে গেল, একেবারে সেই অডিটরিয়মের মধ্যে। সচকিত দর্শকেরা তাড়াতাড়ি তা'কে পথ ছেড়েদিলে কিন্তু অমলের শবদেহ তখন পুলিশ গ্রহণ করেছে। পারুলের অচেতন দেহটাকেও ধরাধরি করে তখনই মোটরে তুলে হাসপাতা"ল নিয়ে যাওয়া হ'ল।

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সব দুর্ঘটনার জন্য দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন; তারপর অপর একজন অভিনেত্রীকে মর্জ্জিনার পার্টে দিয়ে কোন রকমে নমঃ নমঃ করে সেদিনকার অভিনয় সাঙ্গ হ'ল। সেই দিনটি হ'ল নাট্য জগৎ থেকে পারুলবালার তিরোধানের দিন। আর কখনও নাট্য রসিকেরা তা'কে কোনও রঙ্গমঞ্চে দেখতে পান নি। পারুলবালার "সম্মান রজনীই হ'ল তা'র অভিনেত্রী জীবনের শেষ রজনী।...

এই ঘটনার পর থেকে সে বিলাস, ব্যসন শরীরের যত্ন প্রসাধন সব ছেড়ে দিয়ে সুরু করলে কেবল দান, ধ্যান কর্ম্ম। অগাধ ধন সম্পত্তি তা'র দিল দীন দুঃখীকে দু'হাতে বিলিয়ে। তারপর কলকাতার বাস উঠিয়ে চ'লে গেল।... কাশীতে।...কিন্তু অকস্মাৎ এতটা পরিবর্ত্তন, শরীরের ওপর এত অযত্ন তা'র সহ্য হ'ল না; বছর খানেক বছর দেড়েকের মধ্যেই সেই বারাণসীতেই মরণের কোলে চিরশান্তি লাভ করল।...

গল্প শেষ হইলে ভোলা দা' দগ্ধাবশেষ চুরুটটা জানালা দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন,—এই ত' গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারক এসে গেছে দেখছি।

তারক প্রবেশ করিতেই ঘোনা নাটকীয় ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিল,—রোহিণী, আজ তোমার এত দেরী কেন?

সকলে, মায় ভোলা দা' পর্য্যন্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

মা ও ছেলে

শ্রীহরিপদ গুহ

সুরেনবাবু তামাক খাইতে খাইতে চাকরকে দিয়া কুম্‌ড়া গাছের জন্য মাচা বাঁধাইতেছিলেন। তাঁহার নিজের হাতে লাগানো গাছে নূতন লক্‌লকে ডগা বাহির হইয়াছে।

ঠিক এমন সময়ে পিওন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। রঙিন খামে 'শুভ বিবাহ' লেখা পত্র দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন! তাঁহার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি দ্রুত বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী দাওয়ায় বসিয়া কচুর শাক কুটিতে ছিলেন। ছোট বধূ কমলা শাশুড়ীর নিকট বসিয়া দুধ জ্বাল দিতে-ছিল।

সুরেনবাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া একগাল হাঁসিয়া বলিলেন, ওগো এবার সব তৈরী হয়ে নাও, বেয়াইয়ের চিঠি এসেছে, পনেরই আষাঢ় বৌমার ছোট বোন্ অমলার বিয়ে। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—নাও, আর হেসো না! 'তু' বলে ডাক্ দেবে, আর অমনি ছুটতে হবে লুচি-সন্দেশ খেতে। বেয়ায়ের উচিৎ ছিল না, নিজে এখানে আসা! তুমি ছেলের বাপ, তোমার কি মান-অপমান কিছু জ্ঞান নেই? আহ্লাদে একেবারে ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছ যে!

সুরেনবাবু কেমন একটু দমিয়া গেলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—এখনো ত অনেক দেরী, একবার কি আর আসবেন না!

অমলার বিবাহ সংবাদে কমলার মুখখানি বেশ হাসি হাসি হইয়া উঠিয়াছিল, শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কিন্তু তাহা নিমেষে একেবারে কালিমাখা হইয়া গেল।

দুধের কড়াইখানা নামাইতে নামাইতে কমলা শাশুড়ীকে বলিল—বাবা একা মানুষ, তাই বোধ হয় আসতে পারেন নি। গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—তবে তুমি কার সঙ্গে যাবে বাছা? আমরা ত কেউ এখান থেকে যাবো না।

কমলার দুই চোখ ফাটিয়া কান্না আসিল, সে কোন জবাব দিতে পারিল না। কোলের মেয়েটা কঁদিয়া খুন হইতেছিল, বাটীতে দুধ লইয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিল।

সেই দিনের মত আলোচনাটা সেইখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

সেইদিন কমলার খুড়তুতো ভাই কনক আসিয়াছিল তাহাদের লইয়া যাইবার জন্য।

কনককে দেখিয়া কমলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া গিয়া শশ্রূকে সংবাদটা বেশ একটু গর্ব্বের সহিত দিয়া আসিল।

গৃহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন—আমি কি আর সত্যিই বল্‌ছিলুম। বেয়াই যে একা মানুষ, সে কি আর আমি জানি না? তারপরই কুটুম-বাড়ীতে যাইবার জন্য সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। জিনিষ-পত্র বাঁধাছাদা ও গোছাইবার ধুম পড়িয়া গেল। সে এক বিরাট কাণ্ড!

পরদিন বিকাল পাঁচটার পূর্ব্বে আর কোন ট্রেণ নাই। সেই টেণখানিতে যাওয়াই স্থির হইল। বাড়ীতে থাকিবে সুরেনবাবুর এক বৃদ্ধা পিসী ও চাকর জগু।

পাঁচটায় ট্রেণ। সুরেনবাবু মালপত্র, গৃহিণী পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি, নাত্‌নী, ভাগনে ও দাসী চারুরমাকে লইয়া বেলা তিনটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মোটে মিনিট :দুই তিন ট্রেণ দাঁড়ায় এখানে।

তাহার মধ্যে মাল পত্র ও এতগুলি লোক লইয়া গাড়ীতে উঠিতে পারিবেন কি না, ইহাই হইল সুরেনবাবুর মহা ভাবনা।

সুরেনবাবু নগদ পয়সা খরচ করিয়া একদোনা পান ও একটা সিগারেট কিনিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের হাতে দিলেন। তিনি হাসিয়া তাহাকে একখানি টুলে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

সুরেনবাবু তাহাতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—আজ আমার ফ্যামেলি নিয়ে কল্‌কাতা যাচ্ছি, আপনাকে একটু সাহায্য কর্‌তে হবে ; যাতে ভাল মত ট্রেণে উঠ্‌তে পারি।

মাষ্টারবাবু ঠোঁট দিয়া সিগারেটটা টিপিয়া ধরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—ও ইয়েস্‌, নিশ্চয়! আপনি নির্ভয়ে থাকুন। প্রয়োজন হলে গাড়ী দু'মিনিট বেশী ডিটেন্‌ করাব।

খুসীতে সুরেনবাবুর মুখখানি বেশ উজ্জল হইয়া উঠিল।

গৃহিণীর একটু দিবা নিদ্রার অভ্যাস ছিল, সুরেনবাবু চীৎকারও তাড়াতাড়িতে আজ আর তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। এই দুই ঘণ্টাকাল তিনি বসিয়া বসিয়া অনবরত পান দোক্তা চিবাইয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে সুরেনবাবুর মস্তকটাও।

সুরেনবাবুকে দেখিয়াই তিনি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন! বলিলেন—কখন গাড়ী আসবে তার নেই ঠিক, তিনদিন আগে থাকৃতে এনে ইষ্টিশানে বসিয়ে রেখেছেন! ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বৌমা পোয়াতী মানুষ, তার কি কষ্টটাই না হচ্ছে।'

সুরেনবাবু অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—তোমাদের ভালর জন্যই একটু সকাল সকাল এসেছিলুম। এই ট্রেণখানা ধরতে না পার্‌লে সেখানে পৌঁছুতে কত রাত হবে তার হুঁস আছে? বলিয়া সুরেনবাবু চুপ করিলেন।

আছে বলিয়া গৃহিণী আপন-মনেই বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

যথাসময়ে সিগন্যাল পড়িল। সুরেনবাবু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার তখন টিকিট দিতেছেন, শীঘ্র তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ ট্রেণ আসিবারও আর বিশেষ দেরী নাই। সুরেনবাবু কেমন একটা অশ্বস্তি বোধ করিয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছিলেন। টিকিট তিনি বহু পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বার দুই ষ্টেশন মাষ্টারকে তাগাদা দিয়া আসিয়াছেন। মাষ্টারবাবু বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই? ঢের দেরী এখনো, গাড়ী এলে ঠিক্‌ আমি তুলে দেব'খন, কিছু ভাব্‌বেন না। সুরেনবাবু একটু নিশ্চিন্ত হইলেও মনে মনে তাঁহার উপরে খুবই চটিয়া গেলেন কিন্তু। তাঁহার মুহুর্মুহু মনে মনে হইতেছিল যে, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া বৃথাই তাহাকে পাণ সিগারেট খাওয়ান হইয়াছে।

একটু পরেই বিরাট বাষ্পীয় যান হুস্‌ হুস্‌ শব্দ করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল।

সুরেনবাবুর সঙ্গের লোকজন সব ছত্রাকার হইয়া পড়িয়াছিল, শুধু গৃহিণী, ঝি এবং শিশু কন্যাকে কোলে করিয়া কমলা একস্থানে বসিয়া ছিল। কমলার বড় ছেলে শরদিন্দু ওরফে খোকা ছিল তাহার ছোট কাকার কাছে। কখন যে সে বাঁধা বেডিংটার উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে দিকে কাহারো হুঁস্‌ ছিল না।

ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া তাড়াতাড়ি একটা কামরা খুলিয়া মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনারা উঠে পড়ুন। মেয়েরা উঠিবার পূর্ব্বেই কিন্তু উঠিয়া পড়িলেন সুরেনবাবু। মাষ্টারবাবু ঘন ঘন হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া তাড়া দিতে লাগিলেন! সুরেনবাবুর দিকে তিনি বিরক্ত ভাবে চাহিয়া বলিলেন—আপনি বেশ লোক তো মশায়! মেয়েদের ফেলেই নিজে আগে-ভাগে উঠে পড়লেন।

সুরেনবাবু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কি যে বলিলেন ভাল করিয়া বোঝা গেল না।

গৃহিণী এবং স-কন্যা কমলা উঠিতেই ষ্টেশন-মাষ্টার গার্ডকে কি ঈঙ্গিৎ করিলেন ; গার্ড বংশীধ্বনি করিলেন।

দাসী চারুর মা পাদানীর উপরে ছিল, ট্রেণ তখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভিতর হইতে সুরেনবাবু তাহার হাত ধরিল, আর নীচ হইতে মাষ্টারবাবু তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন!

চাকর এবং ছেলেরা যে যেখানে পারিল উঠিয়া পড়িল।

ট্রেণ তখন পূর্ণবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুরেনবাবু চারুরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মালপত্র সব উঠছে তো।

চারুর মা বলিল : তা আমি কি জানি? নিজেই উঠতে পারছিলুম না তা' মাল পত্র! ভাগ্যিস্ মাষ্টারবাবু ঠেলে তুলে দিলে, নইলে যেতুম চাকার তলায়! কোথায় কি আছে গুণে দেখো না।

সুরেনবাবু তাহার দিকে অনলবর্ষি দৃষ্টিতে চাহিয়া এক দুই করিয়া তাহার জিনিষ গুণিতে লাগিলেন। গোনা শেষ হইলে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—তিন্‌টে মাল কম হচ্ছে কেন? তোরা আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি দেখ্‌ছি!

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কি কম হলো?

সুরেনবাবু বলিলেন—বেডিংটা, একটা বড় ট্রাঙ্ক ও ছোট ক্যাস বাক্সটা।

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ওগো সেকি কথা, ক্যাস্‌বাক্‌সের মধ্যে যে ছেলেদের গয়না রয়েছে। তারপর তিনি চারুর মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—সেটা তো তোমার হাতেই দিয়েছিলুম, কি করলে?

চারুর মা বলিল—আমি কি কর্‌ব বল মা, যেই তোমারা উঠ্‌লে, আর সেই ঐ পোড়ার মুখো মিন্‌সেটা আমাকেঠেলে তুলে দিলে, নইলে সে দুপুর থেকে তো ওটাকে হাতে হাতেই রেখেছি, গরীবের উপরে অতবড় বোঝা কেন মা!

সুরেনবাবু তাহাকে একটা ধমক দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—যত সব আহাম্মক নিয়ে হচ্ছে আমার কারবার। তারপর গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—সাধে কি আর পণ্ডিতরা বলে গেছেন—'পথিনারী বিবর্জ্জিতা।' তোমাদের মত কাপড়ের গাঁট রীদের নিয়ে কোথাও বেরুনোই উচিত নয়!

কমলা তখন কাঁদিতেছিল। গৃহিণী কোমল স্বরে বলিলেন—তুমি কেঁদো না বাছা! যদি হারিয়েই থাকে, তোমার খোকা-খুকীর গয়না আমি আবার নতুন করে গড়িয়ে দেব। তারপর তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তুমি আগেই অত উতলা হচ্ছ কেন? মাল গুলো তো ছেলেদের গাড়ীতেও নিয়ে থাকতে পারে! আগে সেই খোঁজ নাও।

যুক্তিটা সুরেনবাবুর মনে লাগিল, তথাপি একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—সেইরকম ছেলেই গর্ভে ধরেছ কি না? তাহলে আর আমার ভাবনা ছিল কি!

কমলার কান্না কিন্তু ক্রমেই বাড়িতেছিল। চারুর মা বলিল—বৌদি' তার খোকার জন্য কাঁদ্‌ছে!

সকলেরই নজর পড়িল সেইদিকে। সত্যই তো খোকা গাড়ীতে নাই। গৃহিণী অমনি বধূর প্রতি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—এতবড় ধিঙ্গী মাগী তোমার একটুও আক্কেল নেই! ছেলেটাকে ফেলেরেখেই নিজে লাফিয়ে উঠ্‌লে গাড়ীতে!

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—সে তো ঠাকুরপোর কাছে ছিল, খুকী ছিল আমার কোলে। আমি কি কর্‌ব বলুন।

গৃহিণী তিক্ত স্বরে বলিলেন—তবে আর ন্যাকামী করে কান্না কেন? ঠাকুরপোর কাছে ছিল তো, তার কাছেই আছে।

সুরেনবাবু খ্যাঁক করিয়া উঠিলেন,—বলিলেন : ও বাঁদরের কাছে আবার ওকে দিতে গেলে কেন? ওর যা

বুদ্ধি বলিয়া তিনি ট্রেণের শিকল ধরিয়া টানিতে উদ্যত হইলেন।

পাশের এক ভদ্রলোক তাঁহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন—অমন কাজটী করবেন না মশাই। এক্ষণি পঞ্চাশ টাকা ফাইন্ হয়ে যাবে, তা জানেন! সাম্‌নেই ষ্টেশন, সেখানে গাড়ী থাম্‌লে খোঁজ নেবেন।

সুরেনবাবু বসিয়া পড়িয়া আপন মনেই গজ গজ করিতে লাগিলেন।

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সুরেনবাবু নামিয়া পড়িয়া প্রত্যেক কামরার কাছে চাকর ও ছেলেদের খোঁজ করিতে লাগিলেন। অনেক ছুটাছুটী করিয়া অবশেষে তাহাদের পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মালপত্র বা খোকার কোন খবরই পাওয়া গেল না। তাহারা স্পষ্ট জবাব দিল আমরা কি জানি, আপনি নিজেই ত সব তুলেছিলেন, আমাদের ত কোন ভার দেওয়া হয়নি।

সুরেনবাবু রাগে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিলেন। রক্তচক্ষে তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া ছুটিয়া চলিলেন গার্ড সাহেবের নিকট। সাহেবকে একটা সেলাম ঠুকিয়া তিনি বলিলেন—মশাই, আমার নাতি খোকা ও মালপত্র পিছনে ফেলে এসেছি। তাড়াতাড়িতে তাদের আন্‌তে পারিনি। এখন আমায় উপদেশ দিন, কি করা কর্ত্তব্য?

সাহেবটি ছিল খুব ভালমানুষ, কিছুক্ষণ হো হো শব্দে হাসিয়া লইয়া বলিলেন—দেখা যাক্ আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।

তারপর তিনি ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া পূর্ব্ব-ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন—মালপত্র সহ একটী ছোট ছেলে রহিয়া গিয়াছে, তাকে যেন সাবধানে রাখা হয়। গাড়ীতো আর বেশীক্ষণ ডিটেন করা চলে না, গার্ড-সাহেব সুরেনবাবুকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া ট্রেণ ছাড়িবার জন্য হুইসিল দিলেন।

হুস হুস্ শব্দে ট্রেণ আবার সম্মুখ দিকে ছুটিয়া চলিল।

কমলার মনে এতক্ষণ আশা ছিল, ছেলে হয় ত দেওরের কাছেই আছে। কিন্তু যখন শ্বশুরের মুখে শুনিল, ছেলে সেখানে নাই তাহার মাতৃ-হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহার কান্না আর থামিতে চায় না। সমস্ত পথটা সে আকুল স্বরে কাঁদিয়াই কাটাইল।

সকালবেলা শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই পূর্ব্ব টেলিগ্রামের জবাব পাওয়া গেল। ষ্টেশনমাষ্টার লিখিয়াছেন,—মালপত্র সবই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ছেলেকে সেখানে দেখিতে পান নাই। সুরেনবাবু মনে করিয়াছিলেন খোকাকে ষ্টেশনে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। সে সেখানেই রহিয়াছে।

এই টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহার মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কি যে করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অথচ এই দুঃসংবাদ চট্ করিয়া মেয়েদের কাছে বলিতেও সাহস করিলেন না। কমলা তো একেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারারাত্রি কাটাইয়াছে, এখন যদি শোনে যে, খোকা সেখানে নাই, তবে না জানি সে কি এক বিভ্রাট বাঁধাইয়া বসিবে।

সুরেনবাবু একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলকে লইয়া বৈবাহিকের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর বৈবাহিকের সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াদিলেন। বেশ মোটা রকম একটা পুরস্কার ঘোষণা করিতেও ভুলিলেন না।

কমলা মনে মনে কত আশা করিয়াছিল—ছোটবোন্ অমলার বিবাহে সে কত আনন্দ করিবে। কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতার কৃপায় তাহা মুহূর্ত্তে কোথায় চলিয়া গেল। বিবাহের কয়টা দিন সে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাটাইল।

কমলার ছেলে খোকা তাহার কাকার কাছে ছিল, এক সময়ে ঢুলিতে ঢুলিতে সে ঐ বেডিংটার উপরেই শুইয়া গভীর নিদ্রায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তারপর ট্রেণ আসিল, যে যেখানে পারিল উঠিয়া পড়িল। খোকা কিম্বা মাল পত্রের কথা কাহারো মনেই পড়িল না। কমলা যখন খোকার খোঁজ করিল, পরের ঘটনা পূর্ব্বেই বলিয়াছি!

খোকার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। অদূরে একটা কেরাসিন-আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। খোকার বড় ভয় করিতেছিল। সে ছোট দুইখানি হাত দিয়া বিছানাটাকে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ষ্টেশন তখন একেবারে জন-মানব শূন্য; শুধু মাষ্টারবাবু ঘরে বসিয়া তাহার হিসাব মিলাইতেছিলেন। আপট্রেণের তখনও অনেক দেরী, কুলিটা কি আনিতে গ্রামের দিকে গিয়াছে।

খোকা আড়ষ্ট ভাবে চক্ষু বুজিয়া আকুল ধারে কাঁদিতেছিল। অদূরে বড় বড় তালগাছ গুলির দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতর কাঁপন উঠিয়াছিল, সে ভয়ে ভাল করিয়া সেইদিকে চাহিতেও পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—যেন দুইটা বিরাট দৈত্য তাহাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে।

এইভাবে যে কতক্ষণ কাটিয়াছে, তাহার হুঁস ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—দৈত্যটাই বোধ হয় তাহার মা, দাদু ও ঠাকুরমাকে খাইয়া শেষ করিয়াছে। এমনই কত কি সে আপন মনে ভাবিয়া যাইতেছিল।

তখন আপ্ ট্রেণ আসিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। দুই একজন যাত্রী আসিয়া টিকিট ঘরের কাছে ভীড় করিতেছিল।

মার উপর দারুণ অভিমান করিয়া খোকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

একটু পরেই 'হুস্ হুস্ শব্দে ষ্টেশন কাঁপাইয়া আপ ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকজন যাত্রী নামিয়া গেল, কয়েকজন উঠিল।

একটা কামরার দরজা খোলা দেখিয়া খোকা চারিদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে উঠিয়া পড়িল। একটু পরেই ট্রেন আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

সেখানা ছিল মেয়েদের গাড়ী। সকলেই তখন শুইয়া পড়িয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিতেছিল। খোকা চারিদিকে চাহিয়া তাহার মাকে খুঁজিতে লাগিল।

ওধারের পাশের বেঞ্চিতে অবগুণ্ঠিতা এক যুবতী শুইয়াছিল খোকা তাহার কাছে গিয়া পিঠের উপর কচি গালখানি কাত করিয়া রাখিয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুইখানি ছোট কোমল হাতে তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিতেছিল—মা, ওমা।

যুবতী অঘোরে ঘুমাইতেছিল, সহসা শিশুর কোমল স্পর্শে তাহার মাতৃ হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। নিকটেই ফুট ফুটে একটী সুন্দর শিশু দেখিয়া অবাক্ বিস্ময়ে সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাহার ছেলে, কোথা হইতে এখানে আসিল? তাহার বেশ মনে আছে, এর আগের ষ্টেশনেও এই গাড়ীতে কোন ছেলে ছিল না। সে ভাল করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন নূতন আরোহীকে দেখিতে পাইল না। সে সস্নেহে খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিল। বেঞ্চির নীচে হাঁড়িতে খাবার ছিল, বাহির করিয়া খোকাকে খাইতে দিল। খাওয়া হইয়া গেলে একটু পরেই সে যুবতীর কোলে পরম তৃপ্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে যুবতীর স্বামী তাহার খোঁজ করিতে আসিল। যুবতী খোকাকে বেঞ্চিতে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে খোকার কথা সব বলিল। স্বামী অবনীকুমার বলিল—তুমি পরের ছেলেকে এভাবে রেখে দিয়ে ভাল করো নি? শেষকালে ছেলে চুরির দায়ে না পড়তে হয়।

যুবতীর নাম রেবতী, অবনী তাহাকে আদর করিয়া রেবা বলিয়া ডাকে। হাসিয়া বলিল—না, গো না, তুমি দেখো, কোন বিপদ হবে না। আমি তো আর একেবারে ওকে নিচ্ছি না, যাদের ছেলে, চাইলেই তাদের ফিরিয়ে দেব। একা ওকে কোথায় ফেলে যাবো বল তো? তোমার একটু মায়া দয়াও নেই গা?

অবনী আর কোন কথা বলিল না। সে স্ত্রীর মর্ম্মবেদনা বেশ ভাল করিয়াই জানে। আজ প্রায় ছয় সাত বৎসর হইল তাহাদের বিয়ে হইয়াছে, কিন্তু ভগবান তাহাদের সন্তান সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। একটি সন্তান লাভের জন্য রেবতী কিই না করিয়াছে। মাদুলীতে মাদুলীতে তাহার অঙ্গ ঢাকিয়া গিয়াছে। যে যাহা বলিয়াছে, সে তাহাই করিয়াছে। কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। আজ খোকাকে পাইয়া তাহার বুভুক্ষিত মাতৃ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। অবনী তাই স্ত্রীর মনে আর ব্যথা দিতে চাহিল না। সে ধীরে ধীরে নিজের কামরায় চলিয়া গেল।

অবনী পোষ্টমাষ্টার। পলাশপুরে বদলী হইয়া চলিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতেই সে মালপত্র সহ রেবতীকে নামাইয়া লইল। রেবতী ঘুমন্ত খোকাকে কোলে করিয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর অনুসরণ করিল

নূতন স্থানে আসিয়া অবনী কাজ কর্ম্ম লইয়া খুবই ব্যস্ত ছিল, নিয়মিত পত্রিকা পড়িবার অবসর পায় নাই। কাজেই সুরেনবাবু কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অবনী প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিল যে, সে পত্রিকায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া দিবে যে ট্রেণে একটি ছেলে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, যাহার শিশু সে যেন তাহার কাছ হইতে লইয়া যায়।

কাজের ভীড়ে সে কিন্তু তাহাও দিতে পারে নাই।

ইদানীং খোকার জন্য তাহার বিশেষ চিন্তা ছিল না। রেবতী তাহাকে নিবিড় ভাবে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দিন সে তাহাকে লইয়াই থাকিত। অবনী মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ঠাট্টা করিত,—খোকাকে পেয়ে যে, আমাকে একেবারে ভুলে গেলে।

রেবতী হাসিয়া জবাব দিত—কি যে বলো, তুমি ভারী ইয়ে!

অবনী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে থাকিত।

রেবতী তিন চার বৎসর পিত্রালয়ে যাইতে পারে নাই। বিদেশে স্বামীর কষ্ট হইবে বলিয়া সে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে।

এবার তাহার মা বিশেষ অনুরোধ করিয়া পূজার সময় তাহাদেব যাইতে লিখিয়াছেন।

রেবতী স্বামীকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিল—পূজোর সময়ে যেতেই হবে কিন্তু। কতদিন মা বাবাকে দেখি নি।

অবনী একমাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিল। যথা সময়ে ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল।

আকস্মিক খোকাকে ওই ভাবে হারাইয়া অবধি কমলা তাহার জন্য ভাবিতে ভাবিতে কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। তাহার সেরূপ আর নাই, সারা অঙ্গে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। দিনের ভিতর দুইবার তিনবার করিয়া ফিট্ হয়। চিকিৎসা করিয়া ও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ডাক্তারে বলিয়াছে—মানসিক দুর্ব্বলতা হইতেই তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে। সর্ব্বদা খুব আমোদে থাকিতে হইবে; এ ভাবে থাকিলে হয় তো এক সময়ে হার্টফেল করিতেও পারে!

পূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে কমলা একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। সকলে তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল।

কমলার অবস্থা যখন খুবই বাড়াবাড়ি, ঠিক্ সেই সময়ে স্বামী সহ রেবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। রেবতী সুরেনবাবুর মধ্যমা কন্যা। রেবতীর সহিত খোকাকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

রেবতী খোকাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই, কাজেই তাহাকে দেখিয়া চিনিবার যুক্তি-যুক্ত কোন কারণ ও থাকিতে পারে না।

খোকাকে কিভাবে কোথায় পাইয়াছে, রেবতী আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। সব শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল: ভগবানই রক্ষা করেছেন! কলিকাল লোকে ঈশ্বর মানতে চায় না।...

রেবতী আর কালবিলম্ব না করিয়া খোকাকে কোলে করিয়া কমলারাণীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে খোকাকে কমলার শয্যা পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল: 'বৌদি', তোমার খোকাকে নাও ভাই।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের ন্যায় সচকিত হইয়া কমল চোখ দুটী বড় বড় করিয়া রেবতীর মুখেব দিকে চাহিল।

রেবতী আগাইয়া গিয়া খোকাকে তাহার আরও নিকটে সরাইয়া দিয়া বলিল: তোমার ছেলে নাও বৌদি'।

কমল তাহার শীর্ণ দুর্ব্বল দুইখানি হস্তে খোকাকে তাহার দীর্ণ বুকে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

একটু পরেই তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল। নাড়ীর গতি অতি-স্বাভাবিক হইয়া গেল। যে ডাক্তার তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন,—তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন—আর কোন আশঙ্কা নাই।...

হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া দুইদিনেই কমলা রোগ মুক্ত হইয়া সারিয়া উঠিল!

সেইদিন দুপুর বেলা রেবতী খোকাকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। কমলা একদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া ছিল। একটু পরে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—'ভগবান তোমাকে দিয়েছেন, ওকে তুমিই নাও ভাই ঠাকুর ঝি!"

রেবতী হাসিয়া বলিল—কাজ নেই আর অত আদরের। শেষকালে আবার চোখ্ উল্টোও তুমি!"

লজ্জায় কমলের মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

শ্রীহরিপদ গুহ

! ! !

রাত্রির বিভীষিকা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বাড়ীতে বসে থাকতে থাকতে কোমরটা যখন প্রায় ধরে এসেছে, এমন সময় সামান্ত চল্লিশ টাকা মাইনের একটা চাকরী জুটে গেল। যখন মেডিকেল কলেজে পড়তাম, তখন কত সুখের স্বপ্নই না দেখ্তাম—কিন্তু পাশ করে বেরুবার পর দেখা গেল, সেটা সত্যিকারের স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে!...

যা' হোক্ 'স্বর্ণময়ী হাসপাতালে'র ডাক্তারের পদটা শেষ পর্য্যন্ত মিলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখ্লাম—সহরের এক টেরে হাসপাতাল। হাসপাতালের সংলগ্ন প্রকাণ্ড একটা বাগান; সেই বাগানের ভেতর ডাক্তারের কোয়ার্টার। মস্তবড় দোতালা বাড়ী। ওপরে নীচে প্রায় বার-তেরখানা ঘর। যিনি হাস্পাতাল প্রতিষ্ঠা করে যান্, এই বাড়ীতে আগে তিনিই বাস করতেন।

ভদ্রলোকের ব্যাঙ্কে যথেষ্টই টাকা ছিল। তিনি সেই টাকায় বাড়ীর সাম্নে আর একটা বড় বাড়ী তৈরী করিয়ে সেটায় তাঁর স্ত্রীর নামে ডিস্পেনসারী ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা রাখেন—যাতে সেই টাকার সুদ হতে ঔষধ-পত্র, ডাক্তারের, কম্পাউণ্ডারের ও চাকর-বাকরের মাহিনা এবং অন্যান্য খরচ চলে—এই ভাবে একটা বন্দোবস্ত করে সকল কিছু ভার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে তুলে দিয়ে তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। হাসপাতালে যে দু'-চারজন রোগী আসত, তাদের বাইরের বাড়ীতেই কুলিয়ে যেত, ভেতরের বাড়ীর আর প্রয়োজন হতো না; সেই জন্যই ভেতরের বাড়ীটা ডাক্তারের কোয়ার্টার হিসাবেই ব্যবহৃত হতো।

এখানে এসে দেখ্লাম লোকজনের মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী কম্পাউণ্ডার নাম পান্নালাল, একজন বামুন নাম শুক্‌দেও, আর হাসপাতালের কয়েকজন ভৃত্য। ডাক্তারের বামুন, ও চাকরের সব কিছু কাজ ঐ শুক্‌দেওই করত। তাকে হাসপাতাল হতেই মাহিনা দেওয়া হতো।

গাড়ী এসে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে লাগ্‌তেই একটা লোক এসে আমায় সেলাম করে দাঁড়াল। লোকটা যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি কদাকার। লোকটার একটা চোখ কাণা। মুখে বিশ্রী বসন্তের দাগ। তার একটীমাত্র চোখের কুৎসিত চাউনি প্রথমটাই আমার যেন কেমন কেমন লাগ্‌ল। গাড়ীর মধ্য থেকে আমার বুল টেরিয়ার জিম্ হঠাৎ সেই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে গোঁগোঁ করে উঠল। লোকটা তার একটীমাত্র চোখের একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে যেন জিম্‌কে ঝল্‌সে দিতে চাইলে। সে বল্‌লে, 'আমার নাম শুক্‌দেও। আমি এখানকার বামুন।'

ইতিমধ্যে কম্পাউণ্ডার পান্নালালও সেখানে এসে হাজির হলো। সুন্দর সুদর্শন চেহারা, পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশই হবে। শুক্‌দেও ততক্ষণে গাড়োয়ানের সঙ্গে ধরাধরি করে গাড়ীর মাথা হতে জিনিষ-পত্রগুলি নামাচ্ছিল, আর জিম্ সেইদিকে তাকিয়ে গোঁগোঁ করছিল।

দুপুরের দিকে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব এসে হাজির হলেন। তিনি পান্নালালকে সঙ্গে করে ঘুরে-ফিরে আমায় সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগেই সহরে চলে গেলেন। দোতালায় একপাশের একটা বড় ঘর ভাল করে ধুয়ে-মুছে

আমার থাকা ও শোবার জন্য ঠিক্ করে নিয়েছিলাম। ঘরের সাম্‌নেই প্রকাণ্ড একটা ঢালা বারান্দা--একবারে এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত। ঘরগুলি সব পর পর—কিন্তু কোন ঘর হতে কোন ঘরেই আসা-যাওয়া করা যায় না। প্রত্যেক ঘরেই যাওয়া-আসার জন্য পৃথক পৃথক দরজা।

অল্পক্ষণ হলো সন্ধ্যার তরল আঁধারটা ধরণীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরের বারান্দায় একটা ডেক্ চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে আছি। পায়ের কাছে শুয়ে জিম্। বাতাসে মাঝে মাঝে পত্রমর্ম্মর শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে যেন একটা ভারি যন্ত্রণাদায়ক স্তব্ধতা বিরাজ করছে। হঠাৎ কোনদিকে একটু-আদটু শব্দ হলে জিম্ গোঁগোঁ করে ছুটে যায়, আবার ফিরে আসে। অন্ধকারে তার চোখের মণি দুটো যেন দু'খণ্ড জলন্ত কয়লার মতই জলজল করছে। সহসা একটা ভারী পায়ের শব্দ কাণে আস্‌তেই সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা কি ছায়ার মত দুল্‌তে দুল্‌তে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ধ্বক্ করে উঠ্‌লো!...জিম্ চীৎকার করতে করতে সেইদিকে ছুটে গেল। এমন সময় মানুষের একটা চীৎকার কাণে এসে বাজল, 'বাবু!'

একদৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি, ছায়ার মত যেটা মনে হয়েছিল—সে শুক্‌দেও। জিম্ তার দিকে এক-একবার তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে, আর প্রাণপণে চীৎকার করছে। সে আমায় দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, 'বাবু, আপনার ওই কুকুরটাকে ডাকুন।'

আমি 'জিম্' বলে ডাক্‌তেই কুকুরটা ফিরে এল। তা' সত্বেও সে আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে শুক্‌দেওর দিকে তাকিয়ে গোঁগোঁ শব্দ করতে লাগ্‌ল। শুক্‌দেও বল্‌লে, সে আমায় জিজ্ঞাসা করতে আসছিল, রাত্রে আমি কি খাব?

আমার রাত্রের আহার সম্বন্ধে সব শুনে নিয়ে সে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এসে আলো জ্বালালাম।

দুই

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যাবো, হঠাৎ শুক্‌দেও আমায় শুধালে, 'জিম্ কি ওপরেই থাক্‌বে, না নীচের ঘরে গিয়ে বেঁধে রেখে আসবেন?'

আমি বল্‌লাম, 'না, জিম আমার ঘরেই থাক্‌বে।'

নতুন জায়গা। যদিও ছোটবেলা হতে কোনদিন ভয় বলে কিছুই আমার ছিল না, তথাপি সাবধানের মার নেই—তাই ভাল করে দরজা এঁটে মাথার কাছে রিভলভার আর টর্চ্চটা ঠিক্ করে রেখে শুয়ে পড়া গেল। জিম্ আমার ঘরে খাটের পায়ার কাছেই শুয়ে রইল।

আগের রাত্রে ট্রেণ 'জার্ণি' ও নানা হাঙ্গামে তেমন ভাল করে ঘুম হয় নি, তাই বিছানায় শোবার অল্প পরেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ জিমের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন তার দীর্ণ চীৎকারে কেটে ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছে!... প্রথমটায় অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। আলো জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়েছিলাম, সেটা নিবে গেল কি করে? আর ঘরের দরজা ত ভাল করে এঁটেই শুয়েছিলাম; অথচ, জিমের চীৎকার বাইরে থেকেই আসছে—সে বাইরে গেল কেমন করে?...তাড়াতাড়ি বিছানা হতে তড়াক্ করে লাফ্ দিয়ে উঠে টর্চ্চটা জ্বাল্‌তেই দেখ্‌লাম—ঘরের দরজাটা 'হাঁ হাঁ' করছে খোলা।...বাইরে ছুটে এসে ডাকলাম, 'জিম্! জিম্!'

সে তখনও ডাকছিল, 'ঘেউ! ঘেউ!'

তার চীৎকার অনুসরণ করে এসে দেখি সিঁড়ির নীচের দরজাটা বাইরে হতে বন্ধ। সেই বন্ধ কপাটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিম্ নিষ্ফল আক্রোশে চীৎকার করছে, আর মাঝে মাঝে অন্ধের মত সেই কপাটের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে নখ দিয়ে কপাটটাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করছে। দরজাটাকে ভেতর হতে অনেক টানাটানি করলাম, কিন্তু কিছুতেই খোলা গেল না। তখন চীৎকার করে বামুনটার নাম ধরে ডাকতে লাগ্‌লাম, শুক্‌দেও! শুক্‌দেও!

তার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বেটা কি মরেছে না কি! বাবা কি ঘুমই ঘুমোয়! নিতান্ত বিরক্ত চিত্তেই তখন ওপরে উঠে এলাম। অন্ধকার রজনীর বুকে ঝিঁঝিঁ পোকার করুণ ক্রন্দন যেন ভূতের কান্নার মতই মনে হচ্ছিল!...মাঝে মাঝে দু'-একটা নিশাচর জীব বোধ হয় বাগানের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তাদের পায়ের শব্দে যেন রাত্রির জমাট আঁধারও শিউরে শিউরে উঠছিল!...টর্চ্চটা জেলে সব দিক্ ভাল করে দেখ্তে লাগ্লাম—যে এসেছিল তার কোনো চিহ্ন যদি পাওয়া যায়। হঠাৎ টর্চ্চের আলো বারান্দার মেঝের ওপর পড়তেই আমি চম্‌কে উঠ্লাম—খানিকটা তাজা লাল টক্‌টকে রক্ত সেখানে পড়ে আছে! রক্ত! রক্ত কোথা হতে এল? তারপর দেখা গেল সেই রক্ত শুধু সেখানে নয়, সমস্ত বারান্দা ও আমার ঘর পর্য্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়ে আছে—যেন কে এইমাত্র রক্তের ছড়া দিয়ে গেছে!...নানা কথা ভাব্তে ভাব্তে ঘরে এসে ঢুক্‌লাম। বাকী রাতটুকু আমার বিনিদ্র অবস্থাতেই প্রভাতের অপেক্ষায় কেটে গেল।

পরদিন ভোর হতেই আমি দ্রুতপদে নীচে নেমে এলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাল রাত্রে যে দরজাটাকে হাজার টানাটানি করেও খুলতে পারি নি, সেটা সামান্য এক টান দিতেই দু' ফাঁক হয়ে আমার যাবার রাস্তা করে দিলে।...

রান্নাঘরে কাঠের উনুন জেলে শুক্‌দেও তখন বোধ হয় আমার চায়ের যোগাড় করছিল। আমি ডাক্‌লাম, 'শুক্‌দেও!'

'বাবু'—বলে সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে। আমি তাকে শুধালাম, 'কাল রাত্রে কোথায় ছিলে? ষাঁড়ের মত চেঁচিয়েও তোমার সাড়া পাই নি কেন?'

'কেন বাবু, আমি ত' এই দিক্‌কার ঘরেই রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'কি জানি বাবু তোমরা কেমন ঘুম ঘুমোও। তা' নীচের কপাটটা বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?'

সে আমার কথায় বিস্মিত হয়ে বললে, 'সে কি বাবু, দরজা বন্ধ করব কেন, সে ত খোলাই ছিল। তবে ঐ দরজাটা মাঝে মাঝে এমন এঁটে যায় যে, বাইরে হতে ধাক্কা না দিলে আর খোলে না।'

আমি আর বেশী কিছু না বলে ওপরে চলে এলাম। কিন্তু রাত্রের ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না—একটা দুঃস্বপ্নের মতই সেটা যেন আমার সমস্ত মনটা জুড়ে কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করতে লাগ্ল। হাসপাতালে এসে দেখি দু'-চারজন রোগী বসে আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের দেখা-শোনা এবং ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে পান্নালালকে ডেকে পাঠালাম। আগের দিন তাকে দেখা অবধিই ভেবেছিলাম, লোকটা বোধ হয় ভালই। পান্না-লাল এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা পান্নালাল, আমার আগে এখানে আর ক'জন ডাক্তার এসেছেন?'

সে বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'কেন স্যার, ও কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

আমি বল্লাম, 'এমনি।'

সে বল্লে, 'আপনার আগে মাত্র একজন ডাক্তারবাবু এসেছিলেন।'

'তিনি কতদিন ছিলেন?'

'দু' মাস।'

'তা' হঠাৎ তিনি চলে গেলেন কেন?'

'চলে ত যান নি, হঠাৎ মারা যান।'

'মারা যান কেন—কিছু অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?'

স্পষ্টই বুঝ্তে পারলাম যে, সে আমার কথায় যেন বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে। আমি বল্লাম, 'পান্নালাল, অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে, তা' হলে আমি তোমাকে—'

সে বল্লে, 'না, আপত্তি আর কি। তবে তিনি কি করে যে মারা যান তা' আজও আমরা ঠিক্ বুঝ্তে পারি নি।...একদিন ভোরে উঠে দেখা গেল—তিনি তার শোবার ঘরে মরে পড়ে আছেন। সহর হতে ডাক্তার-

সাহেব এলেন, কিন্তু তিনিও কিছু ধরতে পারলেন না।... বললেন, 'যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তা'তে বোধ হয় হঠাৎ ভয় পেয়েই উনি মারা গেছেন।'

'আচ্ছা, ওই বাড়ীটায় কি কোন ভূতের উপদ্রব টুপদ্রব আছে বলে তোমার মনে হয়?'

সে বল্লে, 'সে রকম কিছু ত কোনদিন শুনি নি—তবে এই হাসপাতাল যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তার উপযুক্ত তিন পুত্রও হঠাৎ একরাত্রে ভয় পেয়ে মারা যান।'

আমি আশ্চর্য্য হয়ে শুধালাম, 'সে কি!'

সে বল্লে, 'হ্যাঁ, তাই। তারপরই ভদ্রলোক এই বাড়ীটায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। শোনা যায় তার সংসারে ঐ তিন ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

আমি আর তাকে কোন কথা না বলে বাড়ী চলে এলাম। গত রাত্রির ঘটনাটা ইচ্ছা করেই তার কাছে গোপন করে গেলাম।

দ্বিপ্রহরে খেতে বসে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম—শুকদেওর বাঁ পায়ে একটা ন্যাকড়া জড়ান, আর সে যেন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'পায়ে কি হয়েছে শুকদেও?'

সে বল্লে, 'কাঠ কাটতে গিয়ে হঠাৎ কুড়ুল পায়ের ওপর পড়ে কেটে গেছে।'

'কেটে গেছে ত ঔষধ লাগিয়ে দাও নি কেন? এখুনি পান্নালালবাবুর কাছে গিয়ে ঔষধ দিয়ে পা বেঁধে এস।'

সে বল্লে, 'যাবো 'খন।

তিন

দ্বিতীয় রাত্রি। কালকের রাত্রির চেয়েও আজ অনেক বেশী সতর্ক হয়েছিলাম। জিম্ আমার ঘরেই শুয়েছিল। তখন বোধ হয় রাত্রি অনেক। সহসা ধড়াস্ করে আমার ঘরের বাগানের ধারের জানলাটা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে প্রশ্ন করলে, 'কে? কে? কে?'

একটা দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় ঘরের টেবিল-ল্যাম্পটা দপ্ করে নিবে গেল, আর সহসা যেন সেই খোলা জানলাটা দিয়ে হুড়্‌হুড় করে অন্ধকারে কারা আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল। তারপর আমার শয্যার চারপাশে, ঘরের ছাতে, দেয়ালে, প্রত্যেক স্থান হতে একটা চাপা প্রশ্ন জেগে উঠ্‌ল, 'কে? কে? কে?'

আমিও ভয়-মিশ্রিত-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠ্‌লাম, 'কে? কে?'

হঠাৎ ঘরের দরজাটা দড়াম্ করে খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ভারি জিনিষ যেন ঝুপ্ করে আমার খাটের কাছে এসে পড়ল। সেই সঙ্গে মনে হলো একটা ভারী দ্রুত পায়ের শব্দ যেন দুপ্‌দাপ্ করে আমার ঘরের দরজার গোড়া হতে সিঁড়ির দিকে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ মড়ার মত নিস্তব্ধ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলাম। তারপর এক সময় সাহসে ভর করে টর্চ্চটা নিয়ে ধীরে ধীরে শয্যার ওপর উঠে বস্‌লাম।

মেঝের ওপর আলো ফেল্‌তেই বিস্ময়ে আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর 'কাঠ' হয়ে গেল। জিম্। হ্যাঁ, জিম্‌ই মেঝের ওপর পড়ে। তার মুখ চোখ দিয়ে তখনও 'ভল্‌ভল্' করে রক্ত পড়ে সমস্ত মেঝেটা ভেসে যাচ্ছে। উঃ, কি করুণ ও বীভৎস তার চেহারা! বুঝ্‌লুম খুব: নিষ্ঠুর নিপীড়ন তার ওপর হয়েছে। চোখ দুটো যন্ত্রণায় কোটর হতে যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে এসেছে। নেড়েচেড়ে দেখ্‌লাম—সে মরে গেছে। বুকের মাঝে এতটুকুও প্রাণের স্পন্দন নেই। সহসা সেইদিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার দু' চোখ জলে ভরে উঠল। হায়, আমার বিদেশের একমাত্র বন্ধু জিম্ আজ আমারই জন্য এমনি করে শেষ হয়ে গেল!

পর দিন সারাটাক্ষণই আমি গম্ভীর হয়ে রইলাম। সন্ধ্যার দিকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পান্নালাল প্রশ্ন করলে, 'কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

শ্রীমতী জারিনা খাতুন

আমি ব্যথিতকণ্ঠে বল্‌লাম, 'কালকে আমার জিম্ মারা গেছে পান্নালাল! কি অদ্ভুত তার মৃত্যু!'

তখন একে একে পর পর দুই রাত্রের ঘটনা সব তাকে খুলে বল্‌লাম। সে আমার সব কথা শুনে বল্‌লে, 'তাই ত বাবু, কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছি না!'

আমি পান্নালালকে শুধালাম, 'আচ্ছা পান্নালাল, শুক্‌দেও লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়?'

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, 'কেন স্যার, ও কথা বল্‌ছেন কেন?'

'আমার কিন্তু ওকে তেমন সুবিধা বলে মনে হয় না।'

'আপনার আগে যিনি এসেছিলেন, তিনিও এমনি একটা সন্দেহ করে ওকে এখান হতে তাড়াবার জন্য মনস্থ করেন এবং একদিন শুক্‌দেওকে ডেকে সে কথা বলেও দেন,—সে যেন অন্য কোথাও কাজের বন্দোবস্ত করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই রাত্রেই তিনি ভয় পেয়ে মারা যান।'

'ওই লোকটা কতদিন এখানে কাজ করছে?'

'তা' ঠিক জানি না। তবে ওর মুখেই শুনেছি, বাবু—অর্থাৎ, এই হাসপাতালের মালিক এখানে আসার-সঙ্গে-সঙ্গেই ও নাকি এসে কাজে ভর্ত্তি হয়। সেই হতেই ও এখানে রয়ে গেছে।'

আমি শুধু 'হুঁ' বলে চুপ করে গেলাম। এমন সময় ঘরের দরজার আড়াল হতে কে যেন মৃদুকণ্ঠে ডাকলে, 'বাবু।'

আমরা উভয়েই এক সঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌লাম—এ যে শুক্‌দেওর গলা। সে বল্‌লে, সে একটা ওষুধের জন্য পান্নালালের কাছে এসেছে। পান্নালাল ওষুধ দিতে চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার অল্প পরেই ডিস্‌পেন্সারী ঘর হতে একটা চাপা গোলমাল শুনে দ্রুতপদে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

দরজার কাছে পৌঁছতেই দেখি একান্ত নির্ব্বিকারভাবে শুক্‌দেও বেরিয়ে চলে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখ্‌লাম, ঔষুধের টেবিলটা ধরে পান্নালাল থর্‌থর্ করে কাঁপছে। ভয়ঙ্কর ভয় পেলে লোকের চোখ-মুখের যেমন চেহারা হয়, তারও চোখ-মুখ দিয়ে সেই রকমই একটা ভয় ও আতঙ্ক যেন ফুটে বেরুচ্ছিল। আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লাম, 'কি, কি হয়েছে পান্নালাল?'

সে শুধু অস্ফুট-কণ্ঠে বল্‌লে, 'ভূত! ভূত ডাক্তার-বাবু!

সে তখনও কাঁপ্‌ছিল। আমি তার গায়ে হাত দিয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বললাম, 'ভূত! কি বল্‌ছ তুমি? কোথায় ভূত?'

সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ভূত! আমি এখানে আর এক মিনিটও থাক্‌ব না, আমায় বিদায় দিন! আমায় মেরে ফেল্‌বে!'

আমি বিস্মিত হয়ে বল্‌লাম, 'কে তোমায় মেরে ফেল্‌বে?'

কিন্তু সে আর কোন কথাই বল্‌লে না, শুধু নীরবে বসে বসে কাঁদতে লাগ্‌ল। অনেক্ষণ কাঁদার পর সে যখন কতকটা সুস্থ হলো, আমি তখন তাকে বল্‌লাম, 'কোন ভয় নেই পান্নালাল, তোমার আর হাসপাতালে শুয়ে কাজ নেই। চলো তুমি আজ আমার পাশের ঘরে শোবে।'

আমার যথেষ্ট অভয়বাণী সত্ত্বেও সে যেন কিছুতেই তেমন সুস্থ হতে পারলে না। তাকে সঙ্গে করে উপর্য্যুপরি কয়দিনকার অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে হাসপাতাল হতে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। সে রাতে পান্নালাল আর কিছুই খেলে না। অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার ত পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দিলাম। সে ঘরের খিল এঁটে শুয়ে পড়্‌ল। আমি তাকে বল্‌লাম, 'আমি পাশের ঘরেই রইলাম, যদি সে তেমন কিছু বোঝে তবে যেন আমায় তখনই ডাকে, আমি সজাগই থাক্‌বো।'

আমি আজ মনে মনে একপ্রকার ঠিক্‌ই করে ফেলেছিলাম যে, আজ রাত জেগে দেখ্‌বো—রোজ কে এসে আমার দরজা রোজ খুলে দিয়ে যায়, আর কেমন করেই বা খোলে। শুক্‌দেও আমার ঘরে ভাত দিতে এলে তাকে যেন কেমন আচ্ছন্নের মত বলে মনে হলো—

খুব অতিরিক্ত নেশা করলে লোকের যে রকম ভাব হয়, শুকদেওকে দেখে ঠিক্ সেই রকমই মনে হচ্ছিল। ভাত খাওয়া হলে আমি নিজে গিয়ে সিঁড়ির নীচের ও ওপরকার দুটো দরজাই বেশ ভাল করে এঁটে দিয়ে এলাম।

ক্রমে যত রাত বাড়তে লাগ্‌ল, সমস্ত বাড়ীটার ওপরও যেন ধীরে ধীরে একটা মৃত্যু-বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে বন্ধ জানলা দুয়ারগুলোর ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ে যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠ্‌ছিল।...টেবিল-ল্যাম্পটা ভাল করে উস্কে দিয়ে একখানা ডাক্তারী বই খুলে আনমনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার পাতাগুলো একটার পর একটা উল্টে চলেছি, সহসা বাইরে একটা কুকুরের কান্না শোনা গেল। সে কি নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক কান্না! যেন ব্যথায় বেদনায় তার বুকের প্রত্যেক পাঁজ্‌রা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে বোধ হয় শ্রান্ত হয়ে কুকুরটা থাম্‌ল। কখন না জানি এর মধ্যে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে টেবিলের টাইমপিস্‌টার দিকে তাকিয়ে দেখি—রাত প্রায় তিনটা। হঠাৎ সেই সময় 'খট্‌' করে একটা আওয়াজ হতেই চোখ দুটো বন্ধ দরজার ওপর গিয়ে পড়তেই বিস্ময়ে আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। দেখ্‌লাম, কপাটেব ছোট এক পিস্ তক্তা কেমন করে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর তার ভেতর দিয়ে একটা কালো মোটা লোমশ হাত ধীরে ধীরে দরজার খিল্‌টা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সেই হাতের আঙুলে আবার কুকুরের নখের মত বড় বড় তীক্ষ্ণ নখ। অমন কুৎসিত ভীষণ দর্শন হাত ইতঃপূর্ব্বে আর কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না।..আমি মাত্র অল্পক্ষণের জন্য অত্যন্ত বিহ্বল' হয়ে পড়েছিলাম, তারপরই বিদ্যুৎ গতিতে টেবিলের ওপর হতে আমার লোডেড রিভলভারটা তুলে নিয়ে সেইদিকে 'তাক্' করে ঘোড়া টিপ্‌লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তার ভেতর হতে একটুও ধোঁয়া পর্য্যন্ত বেরুল না—গুলি ত দূরের কথা! অথচ, নিজের হাতে কাজে লাগাব বলে আজ দুপুরে এতে গুলি ভরে রেখেছিলাম। কিন্তু তখন আর ভাববার সময় নেই। টেবিল হতে জলশুদ্ধ কাচের গেলাসটা তুলে নিয়ে সেই দিকে ছুঁড়ে মারলাম। ঝন্‌ঝন্ করে টুকরো টুকরো হয়ে গ্লাসটা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল, আর হাতটা 'চট্' করে অদৃশ্য হয়ে গেল।...তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ হতে একটা লাঠি তুলে নিয়ে এক লাফে দরজটা খুলে বাইরে এসে-পড়লাম। কি একটা দ্রুতপদে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে দোতলার রেলিং টপ্‌কে নীচের বাগানে লাফিয়ে পড়ল। টর্চ্চটা এনে বাগানের চার পাশে আলো ফেলে দেখ্‌লাম—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। সে এসেছিল এবং প্রতি দিনকার মত আমার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েও গেল।...

তাড়াতাড়ি কি ভেবে পান্নালালের ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কপাটে হাত দিতেই সেটা 'হাঁ' হয়ে খুলে গেল। তারপর ভেতরের দৃশ্য যা' দেখ্‌লাম, তা'তে আমি নিশ্চল ও অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেঝেয় যেন রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, আর পান্নালাল মড়াব মত পড়ে রয়েছে। মনে হলো তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা কে তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে তার জীবনের শেষ করে দিয়েছে।...হতভাগ্য পান্নালাল, শেষ পর্য্যন্ত জিমের মতই বেঘোরে প্রাণটা দিলে!...

চার

সে রাত্রিরও অবসান হলো। হাসপাতালের একটা লোককে দিয়ে সবিশেষ জানিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কাছে একটা পত্র পাঠিয়ে দিলাম। শুকদেওর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি—লোকটা কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রবল জ্বরে হু হু করে কাঁপ্‌ছে। অতি কষ্টে গুঁইয়ে গুঁইয়ে সে বল্‌লে, কাল রাত্রে শোবার পর হতেই তার ভীষণ জ্বর আসে। সমস্ত রাতটা সে আচ্ছন্নের মতই পড়েছিল। আমি তাকে ব্যস্ত হতে না বলে ওপরে চলে এলাম। 'দাঁড়াও বেটা পাজী শয়তান, তোমার শেষ আজই যদি আমি না করি ত আমার নাম যতীন বাঁড়ুয্যেই নয়!'

আজ বেশ ভাল করে পরীক্ষা কর্‌তেই জান্‌তে পার্‌লুম—একটা কাঠের 'পিস্‌' বাইরে হতে বসিয়ে এমনভাবে দরজার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কে বল্‌বে ওটা যোড়া কপাট। আততায়ী ওই 'পিস্‌'টা সরিয়েই যে রোজ রাত্রে ঘরে এসে ঢোকে, তা'তে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না।

বেলা দশটার মধ্যেই ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেব মোটরে করে এসে হাজির হলেন। আমার মুখে ব্যাপারটা আগাগোড়া সব শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, 'তাই ত মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, এ ত ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!···কিন্তু আমার মনে হয়—এর ভেতর ভূত-টুতের নাম-গন্ধও নেই; এ সবই মানুষের খেলা। তবে আপনার মত আমার ওই শুক্‌দেওকেই বেশী সন্দেহ হয়। সে যা' হোক্‌, ও রাস্কেলটা ত এখন জ্বরে অজ্ঞান—ও না ভাল হলে এর কোন কিনারাই হবে না। আসুন, আজকের রাত্রে আমি ও আপনি দু'জনে মিলেই পাহারা দিই। যদি সত্যিই এ ব্যাপার শুক্‌দেওই করে থাকে, তবে আজ ত ঐ জ্বরের মধ্যে আর সে উঠতে পারবে না; আর যদি সে দোষী না হয় এবং অন্য কিছু হয়, তবে সেটাও মীমাংসা হয়ে যাবে—কি বলেন?

আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বল্‌লাম, 'বেশ।'

তখন ক'জন লোক দিয়ে পান্নালালের দেহ সৎকারের জন্য শ্মশান-ঘাটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এদিকে হাসপাতাল ও খাওয়া-দাওয়ার একা বিলি-ব্যবস্থা করতে-করতেই বেলা প্রায় বিকেল গড়িয়ে এল। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বলে গেছেন, ঠিক্‌ রাত আটটার সময় তিনি এখানে এসে পৌঁছবেন। শুক্‌দেওর কাছে হাসপাতালের একটা ভৃত্যকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। বেলা যখন প্রায় ছ'টা, সে দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিলে, শুক্‌দেও ভুল বক্‌তে আরম্ভ করেছে। আমি ব্যস্ত হয়ে তার পিছু পিছু নীচে নেমে এলাম।

জ্বরের ঘোরে সে তখন অজ্ঞান হয়ে কি সব বল্‌ছিল, 'এই নান্নু, সরে যা', সরে যা', এদিকে আসিস নি, ভাগ। তোর কাকাকে আমি—হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি। কিন্তু কেন, কেন সে আমার সাথে এমনি করে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? কি, কি করেছিলাম আমি তার? ধরবি, আমায় ধরবি—ওঃ, ধরলেই হলো কি না! দেখ্‌বি এমনি যায়গায় পালিয়ে যাবো যে, আমার পাত্তাও তোরা আর পাবি না।'

আমি অবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে লাগ্‌লাম। সে তখনও বক্‌ছিল, 'কেন, আমি তোর কি করেছি যে, তুই আমায় চাকরী হতে ছাড়িয়ে দিবি।'

'পান্নালাল!'

হঠাৎ পান্নালালের নাম শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম!

'পান্নালাল, সাবধান, এ সবের ভেতর মাথা গলাস নি!'

তারপর শুক্‌দেও ধীরে ধীরে যেন শ্রান্ত হয়েই এক সময় চুপ করে গেল। আমি আপাততঃ তাকে একটা ওষুধ দিয়ে চিন্তিত মনে ওপরে চলে এলাম।

যথাসময় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেব 'রেডি' হয়ে এখানে এলেন। তাড়াতাড়ি করে খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা রাত্রের সেই বিভীষিকার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি বেড়ে চল্‌ল। আজ উপর উপরি ক' রাত্রি নানা উদ্বেগে কাটানয় চোখে ঘুম যেন জড়িয়ে আসছিল। এক সময় চেয়ে দেখি, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেব ইজিচেয়ারটার ওপর শুয়ে গভীর ঘুমে নেতিয়ে পড়েছেন। উঃ, চোখ যে আর কোন মতেই খুলে রাখা যায় না! এ কি ভীষণ ঘুম ধর্‌ল আমার! কিন্তু ঘুমলে ত চল্‌বে না। তারপর ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ 'খট্‌' করে একটা শব্দ হতেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি—ঘরের দরজাটা 'হাঁ হাঁ' করছে খোলা। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ইজিচেয়ারে নেই। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা কালো কুকুরের মত জন্তু হামা দিয়ে দিয়ে আমার ঘরে এসে

ঢুক্‌ল। জন্তুটার একটা চোখ নেই। কিন্তু যে চোখটা আছে, তা' দিয়ে যেন আগুনের আভা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। ভয়ে আতঙ্কে একটা ভীষণ চীৎকার করে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হলো চেয়ে দেখি, ঘরের বাতিটা তখনও টিম্‌টিম্ করে জল্‌ছে, আর ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেব আমার পাশে মেঝের ওপর পড়ে আছেন। ধীরে ধীরে উঠে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। নাকে হাত দিয়ে দেখি—না, তিনি মরেন নি, বেঁচেই আছেন। কোনমতে অতিকষ্টে তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলাম। হঠাৎ একটা বীভৎস কুকুরের ডাকে চম্‌কে উঠ্‌লাম। সেদিনকার সেই রাত্রের মতই করুণ ও যন্ত্রণা-কাতর বুক-ভাঙা কাতরানী। নীচে নেমে এলাম। দেখি শুক্‌দেওর বিছানাটা খালি।...আর যে লোকটা তার পাহারায় ছিল, সেও সেখানে নেই।

বিকেলের দিকে ক'জন সেই লোকটাকে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে এল—কিন্তু শুক্‌দেওকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকটার দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লাম—বেচারা পাগল হয়ে গেছে! কি এক অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে সে চাইছিল, মাঝে মাঝে চোখ রাঙিয়ে কা'কে যেন শাসাচ্ছিল, আবার হঠাৎ ভয় পেয়ে কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছিল।

বুঝ্‌লাম হঠাৎ কোন কারণে দারুণ 'সক্' লেগে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যারা তাকে খুঁজতে গেছ্‌ল, তারা বল্‌লে, একটা মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ে সে না কি বিড়বিড় করে কা'কে গালাগাল দিচ্ছিল—এই অবস্থায় তাকে ধরে আনা হয়েছে।

যাত্রার সময় গাড়ীতে উঠ্‌তে যাবো, সহসা রাত্রির অন্ধকারকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে কোথা থেকে মরণাধিক যন্ত্রণায় সেই বীভৎস কুকুরটার কান্নার শব্দ জেগে উঠ্‌ল। উঃ, সে কি করুণ ও বেদনাময়!

অনেক বেলায় সাহেবের জ্ঞান হলো। তখন চারিদিকে শুক্‌দেও আর সেই লোকটার খোঁজে জনকয়েককে পাঠান হলো। আমিও সেইদিনই চাক্‌রীতে 'রিজাইন্' দিয়ে রাত এগারটার গাড়ীতে বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। যাক্ বাবা, চাকরী ঢের হয়েছে!—শেষ পর্য্যন্ত বিদেশে বেঘোরে ভূতের হাতে পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াব না কি?

আজও মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে সহসা সেই কান্না শুনে জেগে উঠি।

যেন ব্যথায় জর্জ্জরিত হয়ে একটা কুকুর কেবলই কাঁদ্‌ছে—কাঁদ্‌ছে, আর কাঁদ্‌ছে!

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অপূর্ণ

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

সন্ধ্যা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গড়িয়াহাট রোডের যে অংশটা লেকের দিকে গিয়াছে উহার সবগুলি আলো তখনও জ্বালা হয় নাই। বাতিওয়ালা মই ঘাড়ে করিয়া ব্যস্তভাবে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছে।

সেই আলো-আঁধারের আব্‌ছায়ায় ঢাকা পথ দিয়া প্রদোষ ধীরে ধীরে বালীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে পথ চলিতেছিল। লেকের তীরবর্ত্তী বৌদ্ধ-মন্দিরের সন্ধ্যারতি তখনও শেষ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি আসিয়া তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা জন্মাইতেছিল।

আজ তাহাদের অফিসের ছুটি হইয়াছে। রাত্রিব গাড়ীতে গেলে সে খুব ভোরেই বাড়ী পৌছিতে পারে; কিন্তু ষ্টেশনের ভিড়ের কথা মনে হইতেই তাহার উৎসাহ কমিয়া আসিল। অতিরিক্ত গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াও রেল-কোম্পানী পূজার ভিড় সামলাইতে পারিতেছে না।

রাত্রি প্রভাত হইলেই মহাষষ্ঠী। আপন জনের সমাগম সম্ভাবনায় বাঙালী নরনারীব চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, প্রবাসী বাঙালী ছুটিয়া চলিয়াছে পল্লী-ভবনের অভিমুখে। বোধনের বাঁশী বাজিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙ্‌লার চিত্ত মিলনের অমৃত রসে অভিসিক্ত হইয়া উঠিবে।

প্রদোষ ভাবিল সারারাত জাগিয়া কষ্ট করিয়া যাওয়া অপেক্ষা কাল সকালের গাড়ীতে যাওয়াই ভাল। সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই যখন সে বাড়ীতে পৌছিতে পারিবে, তখন আর অত কষ্ট ভোগ করার আবশ্যক কি?

মাঠের মধ্য দিয়া যে নূতন রাস্তাটা নির্ম্মিত হইতেছে উহা দিয়া গেলে অনেকটা পথ কম হয়, একেবারে হিন্দুস্থান পার্কের পাশ দিয়া আসিয়া রাসবিহারী এভিনিউ-এ পড়া যায়। মোড় ঘুরিয়া প্রদোষ সেই পথই ধরিল। দুই চারি পা চলিবার পর সে দেখিতে পাইল সম্মুখে কিছু দূরে একটী তরুণী দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়াছে, আর তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে রঙিন্ লুঙ্গি পরা একটা লোক। প্রদোষের সন্দেহ হইল তরুণী হয় ত এই লোকটাকে এড়াইবার জন্যই এত দ্রুতবেগে চলিয়াছে। রাস্তার উপর একটা বড় গাছের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, মেয়েটী সেইখানে পৌছিতেই লুঙ্গিপরা লোকটা একেবারে তাহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। সঙ্কুচিতভাবে মেয়েটী একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং একটা বিরক্তিসূচক অস্ফুট শব্দ কবিল। লোকটা কিন্তু বেশীদুব অগ্রসর না হইয়া মেয়েটির দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ও একটা অশ্লীল ভঙ্গী করিল। রুখিয়া উঠিয়া মেয়েটী বলিল, "খবরদার!"

লোকটা কিন্তু তাহা গ্রাহ্যমাত্র না করিয়া কুৎসিৎভাবে হাসিতে হাসিতে আরও তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রদোষের শিরায় শিরায় উষ্ণরক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। এক ছুটে লোকটার দিকে আসিয়া কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া সে হঠাৎ তাহার পিঠে জুতা সমেত এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। টাল সামলাইতে না পারিয়া লোকটা তরুণীর প্রায় পায়ের কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। প্রদোষ মরিয়া হইয়া তাহার পিঠে লাথি চালাইতে লাগিল। লোকটার গায়ের ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী ছিঁড়িয়া গেল, রাস্তার ঝামায় থেতলাইয়া গিয়া তাহার হাত, পা, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে মেয়েটী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কণ্ঠ হইতে আবার ভীতিসূচক শব্দ বাহির হওয়ায় প্রদোষের হুঁস হইল। মেয়েটীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিল অপর এক দুর্ব্বৃত্ত একখানা চক্‌চকে ছোরা হাতে লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

রাস্তার পাশে কতকগুলা থান ইট পড়িয়াছিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে একখানা ইট হাতে লইয়া দুর্ব্বৃত্তকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "খবরদার, এক পা এগুলে এই থান ছুঁড়ে মাথা ভেঙে দোব।"

লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রথম লোকটা ততক্ষণে কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ প্রদোষের হাতটা প্রাণপণে কামড়াইয়া ধরিল। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রদোষ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হাতের ইট দিয়া সে সজোরে তাহার মাথায় আঘাত করিতেই লোকটা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়নের পথ ধরিল। গোলমাল শুনিয়া নিকটবর্ত্তী বস্তির কতকগুলি লোক সেইদিকে ছুটিয়া আসিতেই দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল।

হাতের রক্ত মুছিতে মুছিতে প্রদোষ বলিল, "চলুন, কোথায় আপনাদের বাড়ী, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে মেয়েটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মেয়েটীর মুখখানি অতি সুন্দর, গায়ের রঙও বেশ ফরসা। অঙ্গের সুগঠন ও পরিচ্ছদের শালীনতা তাহার স্বাস্থ্য ও সুরুচির পরিচয় প্রদান করিতেছিল। প্রদোষ মনে মনে অনুমান করিল মেয়েটীর বয়স আঠারোর বেশী হইবে না। এই সুন্দরী তরুণীকে অবধারিত বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার সুযোগ যে সে পাইয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাহার চোখে মুখে পুলকের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া সে আবার বলিল, "এখানে বেশীক্ষণ থাকা বোধ করি নিরাপদের নয়। চলুন, আপনাদের বাড়ীতে যাওয়া যাক্। আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি, ভয়ের কোন কারণ নেই।"

তরুণী চোখ তুলিয়া প্রদোষের মুখের দিকে চাহিল। তাহার এই উক্তি যে অসার বাক্যচ্ছটা মাত্র নহে, তাহার পরিচয় ত সে এই মাত্রই পাইয়াছে। সে কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রদোষ তাহার পাশে পাশে চলিল।

বড় রাস্তার উপর বৈদ্যুতিক আলোকের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। সেখানে পৌঁছিতেই তরুণীর বিহ্বলতা যেন অনেকটা কাটিয়া গেল। অতি স্নিগ্ধ ও মধুর কণ্ঠে সে বলিল, "ভাগ্যে আপনি ঠিক্ সময়টিতে এসে পড়েছিলেন—নইলে আজ যে কি ঘটতো!"

মেয়েটীর চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার যে সুকোমলভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রদোষের সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ যদি দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে তাহার প্রাণ যাইত, তবে তাহার সে মরণ কোনরকমেই অসার্থক হইত না।

হঠাৎ প্রদোষের হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তরুণী বলিল, "ইস! আপনার হাত দিয়ে যে এখনও রক্ত পড়ছে। চলুন, একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে এখুনি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নেওয়া যাক্।"

রুমাল দিয়া ক্ষতস্থানটী বাঁধিতে বাঁধিতে প্রদোষ উত্তর দিল, "না, তেমন বেশী কিছু হয় নি, ও রক্ত এখনি বন্ধ হয়ে যাবে। ডাক্তারখানায় এখন যাওয়ার কোন দরকার নেই। চলুন, আগে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

প্রদোষ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল—বাড়ী যাওয়ার জন্য মেয়েটীর যেন তত বেশী তাড়া নাই। সে অতি মন্থর পদে চলিয়াছে, আর যেন কি একটা গুরুতর বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। প্রদোষ মনে করিল—মেয়েটী নিশ্চয়ই তাহার জীবনের মধ্যে এরূপ ঘটনার সম্মুখে এই প্রথম পড়িয়াছে; সুতরাং তাহার বিহ্বলতা যে অতিমাত্রায় অধিক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

মেয়েটীর কেশ ও বেশ হইতে একটী স্নিগ্ধ সৌরভ আসিয়া প্রদোষের চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। মনে মনে কল্পনার রঙিন জাল বুনিতে বুনিতে সে মেয়েটীর পাশে পাশে চলিল। সে ভুলিয়া গেল যে, এ বালীগঞ্জের পথ। দূরে একটী মন্দিরের চূড়ার পাশ দিয়া এক ফালি চাঁদ দেখা যাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—এই সুন্দরী মেয়েটী যেন উপকথার রাজকন্যা। নির্দ্দয় দানবের পাষাণ-পুরী হইতে সে অতি কঠোর আয়াসে তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই

বরবর্ণিনীর কম্প্রকরধৃত বরমাল্য একান্তভাবে শুধু তাহারই প্রাপ্য।

রিচি রোডের মোড়ে পৌঁছিতে মেয়েটীর কথায় তাহার চমক ভাঙিল। মেয়েটী বলিল, "ওই যে ফটক-ওয়ালা বাংলোখানা দেখা যাচ্ছে, ওইটে আমাদের বাড়ী। আমার জন্যে যে ক্ষতি আজ আপনি স্বীকার কর্‌লেন, তা' আমার চির-জীবন মনে থাক্‌বে।"

প্রদোষের পক্ষে নিজেকে সাম্‌লানো শক্ত হইয়া উঠিল। এই সুন্দরী তরুণীর মনে তাহার কথা চিরদিনই বাঁচিয়া থাকিবে, ইহার চেয়ে কাম্য তাহার আর কি থাকিতে পারে? ভাষায় তাহার মনোভাব সে ব্যক্ত করিতে পারিল না। মেয়েটীর মুখের উপর সে শুধু তাহার কোমলতা মাখানো দৃষ্টির পরশ বুলাইয়া লইল। মেয়েটী ধীরে ধীরে মুখখানি আনত করিল।

চাঁপার কলির মত আঙুলে শাড়ীর আঁচলখানা জড়াইতে জড়াইতে মেয়েটী বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা আপনাকে বলি—"

প্রদোষের বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতে লাগিল। কি জানি মেয়েটী কি কথা বলিতে চাহে। আশা ও আশঙ্কায় তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোনও রকমে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "বলুন, যা' আপনি বল্‌তে চান। আমার কাছে সঙ্কোচ করবার আপনার কোনই আবশ্যক নেই।"

শেষের কথাটায় সে নিজেই মনে মনে একটু লজ্জা অনুভব করিল। ঘটনা-চক্রে এই তরুণীকে দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া কেবলমাত্র সেই দাবীতে এতটা ঘনিষ্ঠতা বোধ করি না দেখানোই ভাল ছিল। মেয়েটী কি বলে তাহা শুনিবার জন্য তাহার সমগ্র দেহের চেতনা যেন কাণের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া তরুণী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আজকের এই ঘটনাটা আমার বাড়ীর কারও কাণে না যায় এইটি আমার একান্ত ইচ্ছা। আশা করি অবস্থা বুঝে আপনি আমার অশিষ্টতা মাপ করবেন।"

মেয়েটী যে কি চাহে, তাহা বুঝিতে প্রদোষের আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। জামার হাতার যে দিক্‌টায় রক্ত লাগিয়াছিল, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। এই রাত্রিকালে একজন রক্তাক্ত-কলেবর অপরিচিত যুবকের সঙ্গে ঘরে ফিরিলে গৃহবাসী সকলের দৃষ্টিই যে মেয়েটীর উপর পড়িবে এবং প্রশ্নবাণে সকলেই যে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে প্রদোষ তাহা বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারিল। মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বেও যে মধুর সম্ভাবনার কল্পনায় তাহার মনে রঙের নেশা ধরিয়াছিল, এক নিমেষেই তাহা টুটিয়া গেল। শরতের মেঘহীন নক্ষত্রখচিত আকাশ হইতে তাহার দৃষ্টি স্খলিত হইয়া পদতলের কঠিন মৃত্তিকার বুকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল।

তাহার অর্দ্ধ-মলিন পরিচ্ছদ ও ধূলা-কাদামাখা তালি দেওয়া জুতা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে একজন সামান্য বেতনের কেরানী মাত্র। সমস্ত দিন দারুণ পরিশ্রম করিয়া যাহাকে নিছক অন্নবস্ত্রের যোগাড় করিতে হয়, তাহার পক্ষে এই সুবেশা সুন্দরী তরুণীর প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা আকাশ-কুসুম ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

তরুণীর ব্যাকুল দৃষ্টি প্রদোষের মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। প্রদোষ দেখিল সে দৃষ্টির মধ্যে আশঙ্কা ও সঙ্কোচের কালো ছায়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে বিপদ হইতে তরুণীকে সে এইমাত্র উদ্ধার করিয়া আনিল, তাহার আসন্ন বিপদ যেন তাহা অপেক্ষা কোনমতেই কম নহে।

কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিবার অভিনয় করিয়া প্রদোষ মৃদু হাসির সহিত বলিল, "অর্থাৎ, আমি এখান থেকেই বিদাই হই, এই ত আপনি চান?"

মাথা হেঁট করিয়া তরুণী আবার শাড়ীর আঁচল খুঁটিতে লাগিল। প্রদোষের জিজ্ঞাসু-দৃষ্টির সম্মুখে সে কিছুতেই আর মুখ তুলিতে পারিল না।

প্রদোষই আবার প্রথম কথা বলিল, "বেশ, তাই হবে। যান, ওই ত ফটকের দোর খোলা রয়েছে, আপনি ভেতরে যান, আমি এখান থেকেই চলে যাচ্ছি।"

তাহার দীর্ঘনিশ্বাস তরুণীর লক্ষ্য এড়াইল না। হাত দুইটী তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া সে প্রদোষকে একটী

ছোট নমস্কার জানাইল। তারপর ধীর পদক্ষেপে ফটকের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

একটা অজানা ব্যথায় প্রদোষের বুক টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। গাড়ী বারান্দার নীচে তরুণীর মৃদু পদধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পর সে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গতিতে বড় রাস্তার উপর আসিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে লাফ্ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য আরোহীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে দুই-চারিটী কথা বলিলেন। কাহারও কোন কথার উত্তর না দিয়া সে এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

* * *

মেসে আসিয়া প্রদোষ দেখিল ঘর প্রায় সবই খালি হইয়া গিয়াছে। দুই-চারজন যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ভোরের গাড়ীতে যাইবেন বলিয়া তল্পিতল্পা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। কলঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে হাতের ক্ষত স্থানটায় খানিকটা টিন্‌চার আইডিন্ লাগাইয়া দিল এবং সটান্ গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মেসের চাকর খাইতে যাইবার জন্য তাহাকে দুই-তিনবার ডাকিতে আসিল, কিন্তু তাহার কোন সাড়া মিলিল না।

প্রদোষের ঘুমন্ত মন ততক্ষণে কল্পনার সোনালী রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মঞ্জরীদের বাড়ী ঢুকিতেই তাহার পিতা মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছেলেটী কে রে মঞ্জু, এর জামা কাপড়েই বা এত রক্ত কেন ?"

মঞ্জরী সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল। মিঃ সেনের মেজাজ গরম হইয়া উঠিল: "বটে, এত বড় স্পর্দ্ধা, মেয়েছেলের 'পরে অত্যাচার! কালই পুলিশ কমিশনারকে এনে গুণ্ডাগুলোকে যদি সায়েস্তা না করি ত আমার নাম টি সেনই নয়।"

চেঁচামেচি শুনিয়া মঞ্জুর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি ত একেবারে কাঁদিয়াই আকুল। মঞ্জরীর মাথা বুকে লইয়া তিনি তাহার কপালে চুমা খাইলেন। তারপর প্রদোষের দিকে চাহিয়া স্নেহ-সিক্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "ওঃ! তুমি না থাকৃলে আজ আমার মঞ্জুর যে কী হতো তা' আমি ভাব্‌তেও পারছি না বাবা! আর মেয়েও হয়েছেন তেমনি ধিঙ্গী, রোজই লেকে না গেলে পেটের ভাত আর হজম হয় না! তা' যাবি, না হয় 'টু সিটার'খানা নিয়ে যা', কি নেপালী চাকরটা সঙ্গে যাক্— তা' নয়; একা একা হেঁটে গিয়ে আদিখ্যেতা দেখানো চাই! হয়েছে ত এবার তেমনি শিক্ষা? বাপু, হাজার হোক্ মেয়েছেলে—মেয়েছেলের মত থাক্—তা' নয়, কলেজে পড়্‌ছেন বলে একেবারে মাথা কিনে নিয়েছেন! সব বিষয়েই বেটা ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে টক্কর দিতে যান্!"

প্রদোষ আড়নয়নে চাহিয়া চাহিয়া মঞ্জরীর দুরবস্থা দেখিতেছিল, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ তাহার জামার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সেন-গিন্নী সচকিত হইয়া উঠিলেন ও স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কী কর্‌ছো তুমি? ফোন্ কর এক্ষুনি ডাঃ দত্তকে—শীগ্‌গির এসে তিনি যেন ওঁর হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে যান।"

আধঘণ্টার মধ্যেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়া গেল। ট্রেতে চা, চপ, ও মিষ্ট লইয়া মঞ্জরী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সে কাপড় ছাড়িয়া ও হাতমুখ ধুইয়া আসিয়াছে। কচি দুর্ব্বাঘাসের রঙের শাড়ীতে তাহার সমস্ত শরীর ঝল্‌মল্ করিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া প্রদোষের আর আশা মিটিতেছিল না।

চা খাইতে খাইতে মিঃ সেন প্রদোষের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। এত ভালভাবে বি-এ পাশ করিয়াও প্রদোষ যে সামান্য মহিনার কেরানীগিরি করিতেছে, সে শুধু তাহার তেমন অভিভাবক কেহ নাই বলিয়া। মুরুব্বির জোর থাকিলে সে আর কোন্ চার-পাঁচ শ' টাকার একটা পদ না পাইত? কথাপ্রসঙ্গে মিঃ সেন ইহাও জানিয়া লই-লেন যে, সুযোগ পাইলে বিলাত যাইতে তাহার কোন আপত্তি আছে কি না? আপত্তি? প্রদোষ মূর্খ নহে। এ বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব যে কি জন্য তাহা সে বুঝে। মিঃ সেনের মত একজন পদস্থ ব্যক্তির জামাতা ত আর যা' তা' লোকে হইতে পারে না। তাহার পক্ষে অন্ততঃ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসাটা একবার চাই-ই। মঞ্জরীর

যে স্বামী হইবে, সে বিলাত-ফেরৎ না হইলে মঞ্জরীর সহিত তাহাকে মানাইবে কেন? না, প্রদোষ আর অত ভাবিতে পারে না, মঞ্জরীর কথা ভাবিতে গেলে তাহার শরীর ও মন যেন কি এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া আসে। মঞ্জরী, মঞ্জু, মঞ্জুলা! কী সুন্দর নাম! সমগ্র জগতের মধ্যে ওই একমাত্র নাম যাহা তাহাকে যথার্থ মানায়।

* * *

পরদিন সকালে মেসের চাকর হরিয়ার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে প্রদোষ অনুভব করিল—তাহার হাতে অসহ্য বেদনা হইয়াছে এবং সর্ব্বশরীরও হইয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত উত্তপ্ত। চাকরকে দিয়া সে নিকটবর্ত্তী একজন পরিচিত ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, জ্বর খুব বেশী হইয়াছে, হাতখানাও যেরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 'সেপ্‌টিক' না হয়।

প্রদোষের আর দেশে যাওয়া হইল না। মা হয় ত আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। ছোট ভাই বোন্ দুইটী নূতন কাপড় পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বারে বারে হয় ত রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

প্রদোষের চোখে অশ্রুবিন্দু টল্‌টল্ করিতে লাগিল।

দুপুরের পর তাহার জ্বর আরও বাড়িল। ডাক্তার আবার দেখিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া গেলেন। জ্বরের ঘোরে প্রদোষ সমস্ত দিন প্রায় অচেতনের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার পর যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন চারিদিকে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। গত সন্ধ্যার স্মৃতি তাহার মনকে উচাটন করিয়া তুলিল। সেই মেয়েটি এখন কি করিতেছে? সমস্ত দিনের মধ্যে সে কি একবারও তাহার রক্ষা-কর্ত্তার কথা ভাবিয়াছে? যদি পদ্মপুকুর রোড ও রিচি রোডের মধ্যকার সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া প্রদোষের দৃষ্টি সেই বাংলো-বাটীর লতাকুঞ্জ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত,—কল্যকার সেই সুবেশা তরুণীটি আবো মনোহর সাজে সুসজ্জিতা হইয়া তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামী তরুণ ব্যারিষ্টার পেলব রায়ের বাহু-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
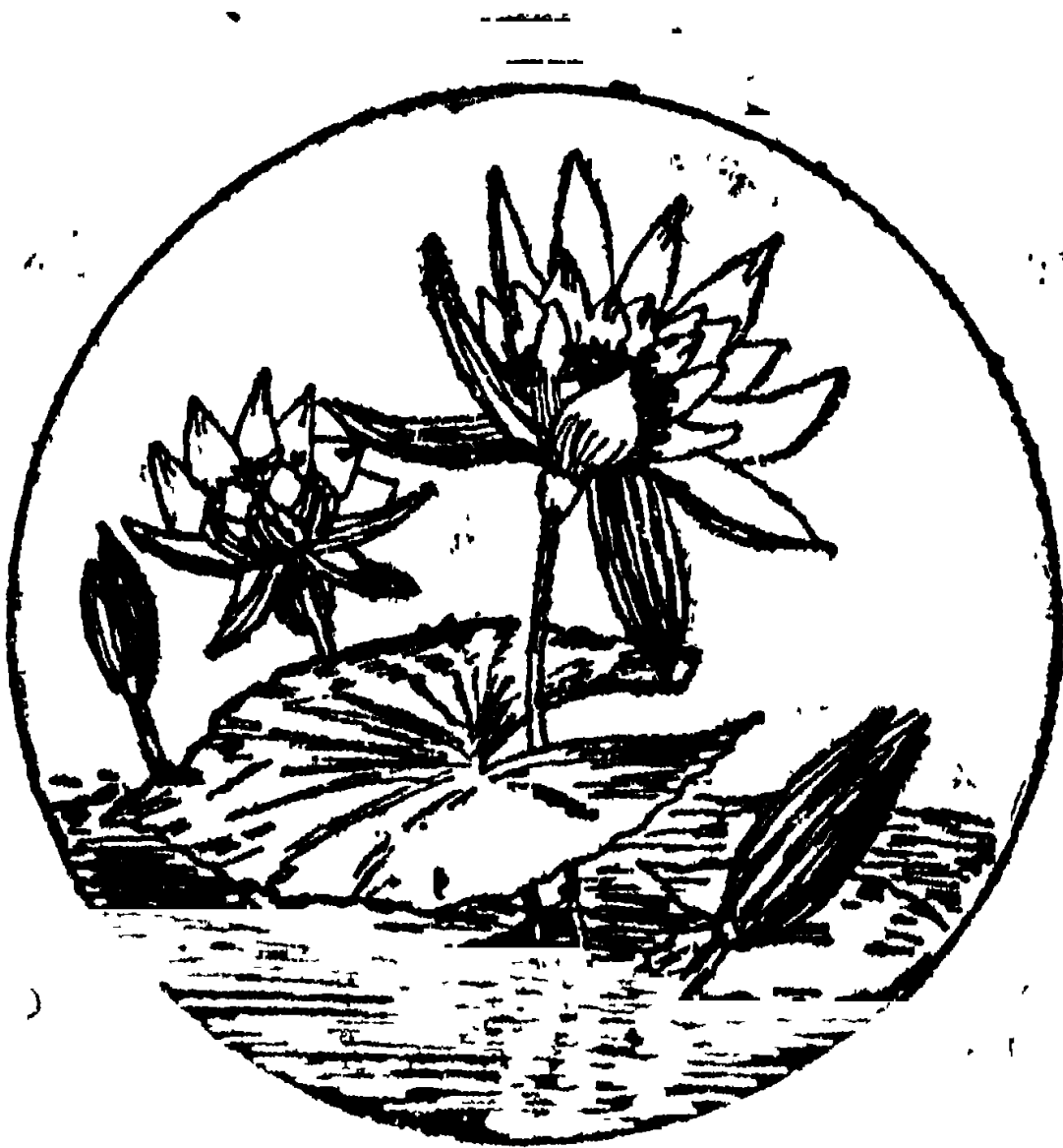
'ওয়ান্, টু, থ্রি'

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, এল্-এম্-এফ্

"তুই ঠিক্ শুনেছিস ?"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"খুন করব বলেছে ?"

"বলেছে। আজ খুন করবে নিশ্চয়।"

"হুঁ, সমস্যার কথা" বলিয়া প্রণব রায় একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। বিনয় মজুমদার তাহার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিবার পর টেবিলের উপরিস্থিত একখানা ইংরাজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

সার্পেনটাইন লেনের একটা মেসে একই ঘরে এই দুই বন্ধু বহুদিন বাস করিতেছে। দুইজনেই বি-এস্-সি পড়ে এবং গভীর রাত্রে এডগার ওয়ালেশ, ওপেনহীম, কনান ডয়েল প্রভৃতি বড় বড় লেখকের গোয়েন্দা উপন্যাসের পাঠ, আলোচনা, এমন কি সমালোচনা পর্য্যন্ত তাহারা বাদ দেয় না।

সিগারেট টানিতে টানিতে প্রণব রায় টেবিলের উপর পা দুইটি তুলিয়া মাথাটা পশ্চাৎ দিকে হেলাইয়া চিন্তা করিতেছিল। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উপরে উঠিতেছিল।

হঠাৎ টেবিল চাপড়াইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রণব রায় বলিয়া উঠিল, "দ্যাটস্ ইট্। তাই ঠিক্।"

ভাবী গোয়েন্দার মুখের দিকে বিনয় বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিল।

প্রণব বলিল, "এ হত্যা আমি হতে দেব না বিনয়। তুই দেখিস, কি কৌশলে আমি খুনে লোকটাকে জব্দ করি। শুধু দুঃখ এই যে, আমরা ইংরেজ গোয়েন্দাদের মত পিস্তল রাখ্‌তে পারি না। তা' যাক! আমি খুব ভাল যুযুৎসু জানি।"

"যুযুৎসু জানিস ? কোথায় শিখ্‌লি, কে শেখালে— এ সব ত আমায় কিছুই বলিস নি কখনও ?"

স্মিতহাস্যে প্রণব বলিল, "গোয়েন্দাগিরি করতে হলে অনেক কিছু শিখ্‌তে হয় রে বোকা। ভাল, এখন ত আটটা বাজে, চল্ আজ ন'টার সময় বায়স্কোপ যাবার নাম করে মেস থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্। হ্যাঁ, তোর কাছে কিছু 'এমোনিয়া' আছে না ? আর রাস্তা থেকে কিছু পটকাও কিনে নিতে হবে।"

"এই বেশেই যাবি ?"

"পাগল! ছদ্মবেশ ছাড়া কি গোয়েন্দাগিরি চলে ? রাস্তায় ওসব কিনে নেওয়া চল্‌বে। পয়সা-কড়ি সঙ্গে নিলেই হবে।"

দুই

রাত্রি সাড়ে এগারটা। তালতলা পার্কের একখানা বেঞ্চে দুইটি যুবক বসিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল। দুইজনেই লুঙ্গি পরিয়াছিল। হঠাৎ দেখিলে মুসলমান বলিয়াই মনে হয়। মাথায় টুপিও ছিল।

একজন প্রশ্ন করিল, "যে বাড়ীটা আমায় দেখালি, ঠিক্ ঐ বাড়ীটাই ত ? তা' হোক্, আমি ওসব ভয় করি না।"

"হ্যাঁ, ঐ বাড়ী। আমার নোট বইয়ে লিখে রেখেছি।"

"কত নম্বর বল্‌লি ?"

"১—নং নেউগীপুকুর লেন।"

"হুঁ। আচ্ছা, তুই প্রথমে এ সংবাদ জান্‌লি কি করে ? সত্য বল্‌বি ? তোকে অবশ্য সন্দেহ করছি না— তবে কি না আমাদের সব দিকেই শ্যেনদৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। ঠিক্, ঠিক্ বলে যা' বিনয়, অর্থাৎ কি না এজাদ। আজকের মত তোর এ নামই থাকুক।"

বিনয় মজুমদারকে 'এজাদ খাঁ' না হইলে চলিবে কেন ?

এজাদ বলিল, "মাসীমার বাড়ী থেকে কাল খাওয়া-দাওয়া সেরে আস্তে বেশ রাত হয়েছিল—বিয়ে-বাড়ী, অমন হয়েই থাকে। তারপর আমি ওই নেউগীপুকুর দিয়েই আসছিলাম—"

"দাঁড়া" কথায় বাধা দিয়া ওসমান আলি জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মাসীমার বাড়ীটা কোথায় বল্লি ?"

"ডাক্তার লেন।"

"তারপর ?"

"হ্যাঁ, রাত তখন একটা হবে, ওই বাড়ীটার কাছে আসতেই সব জান্তে পার্লাম। মেয়েটার কি করুণ চীৎকার! তারপর জান্লার ফাঁক দিয়ে যা' দেখ্লাম —ভীষণ! ভীষণ!"

ওসমান বলিল, "সেই গুণ্ডাটা মেয়েটাকে খুন কর্তে এল—বাঁচাবার কেউ ছিল না জেনেও কাপুরুষের মত তুই বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্ছিলি! লজ্জার কথা! ভাল কথা, মেয়েটার বয়স কত ? দেখ্তে কেমন ?"

আবেগে এজাদ বলিল, "পরী, পরী—আঠারো বছরের আধ ফুটন্ত ফুল—বসরাই গোলাপ!"

"অসম্ভব" বেঞ্চ হইতে উঠিয়া মহা আবেগে ওসমান বলিয়া উঠিল, "এ খুন হতে দেব না! ঐ ললিত লবঙ্গলতা শতদলবাসিনী, কঞ্জুমঞ্জু কম, মানস মনোরম, তাকে কি আমরা আজ উদ্ধারিতে আসি নি ?"

এজাদ বলিল, "ছিলি গোয়েন্দা, হলি কবি। কাব্য রেখে এখন কাজে যাবি কি ?"

"তুই বলে যা' রে, বলে যা' বিনয়, আই মিন্ এজাদ।"

এজাদ বলিল, "হ্যাঁ, জান্লার ফাঁক দিয়ে আমি দেখ্লাম—ঘরে একটা ভুষোপড়া হ্যারিকেন ছিল—কি দেখ্লাম তা' ত বলেছি। গুণ্ডাটা অনেক জোর-জবরদস্তি করেও মেয়েটার মত পেলে না—কিন্তু তার কাকুতি-মিনতিতে বোধ হয় একটু নরম হ'ল ; তাই বল্লে, 'আচ্ছা, আজ তোকে কিছু বল্লাম না—যদি আমার কথায় রাজী না হোস্ ত' কাল তোর শেষ—মনে রাখ্বি কাল ঠিক্ এই সময়ই হয় তোর মুক্তি, আর নয় এই ছোরার এক আঘাতে—' বলে গুণ্ডাটা হাহা করে হাস্তে লাগ্ল।"

ওসমান গম্ভীরভাবে বিড়ি ধরাইল এবং রিষ্টওয়াচ দেখিয়া বলিল, "সওয়া বারটা। আচ্ছা, তুই আগে যা'— যা' বলেছি মনে আছে ত ? লাইব্রেরীর কাছেই থাক্বি।"

তিন

রাত্রি পৌনে একটার সময় তালতলা পাবলিক লাই-ব্রেরীর সম্মুখে ওসমান আসিয়া এজাদের গায়ে হাত রাখিল। লাইব্রেরীর সিঁড়ির উপর বসিয়া এজাদ নিবিষ্ট-মনে কি চিন্তা করিতেছিল, বন্ধুর আগমন লক্ষ্য করে নাই।

ওসমান বলিল, "চম্কে উঠ্লি যে ?"

"তুই যে কখন এলি তা' জান্তেও পারি নি, রবার সোল জুতো কি না।"

"তোকে ত বল্লাম আজকেই একযোড়া কিনে ফেল্, এসব কাজে খুবই দরকার হয় আমাদের। তোর জুতোটা যে আওয়াজ করে!"

"লুঙ্গী কিন্লাম আবার জুতো কে কেনে—খালি পায়েই যাব। জুতোটা খুলে এই সিঁড়ির পাশেই রাখ্ব, যাবার সময় নেওয়া যাবে।"

"আর যদি না পাওয়া যায় ত কাল লাইব্রেরীয়ানের কাছ থেকে নিয়ে যাবি—তা' চল্, চট্ করে যা' করবার করে নে।"

চার

"ও গো কে কোথায় আছ আমায় বাঁচাও, মলাম, খুন করলে!"

"চীৎকারে কোন লাভ হবে না তোমার, এ গভীর অরণ্য প্রদেশে, দুর্গম গিরিগুহায় কোন রক্ষাকর্ত্তা আস্বে না—"

রাস্তায় দাঁড়াইয়া এজাদ বলিল, "ওরে, অরণ্য প্রদেশ, গিরিগুহা বল্‌ছে যে!"

গম্ভীরমুখে ওসমান বলিল, "চুপ্‌, লোকটা মাতাল তা' বুঝ্‌ছিস না।"

রাস্তার উপর জানালার ছিদ্রপথে এজাদ ও ওসমান ভিতরের ঘটনা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

দস্যুর মত একটা লোক একটি সুন্দরী যুবতীকে সবলে টানিয়া তাহার বক্ষদেশে হঠাৎ বৃহৎ একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমূল প্রোথিত করিয়া দিল—রমণী দু'-একবার কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর টলিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। রক্তে তাহার বক্ষ বসন লাল হইয়া উঠিল।

"কি সর্ব্বনাশ!" ওসমান ক্ষিপ্তের মত বলিয়া উঠিল, "কি হলো এজাদ, কি হলো! পারলাম না, পারলাম না!"

এজাদ বলিল, "চল্‌ লোকটাকে গ্রেপ্তার করি—বাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারবি?"

নিমেষের মধ্যে এজাদের কাঁধে চাপিয়া ওসমান বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাচীরের উপর উঠিয়া সঙ্গীকেও সেখানে তুলিয়া লইল।

এজাদ বলিল, "যদি আরও লোক থাকে?"

"কুছ পরওয়া নেহি, যুযুৎসুর প্যাঁচ আছে। 'ভারতবর্ষ' পড়ি এমনি না কি?" বলিয়া সে সঙ্গীকে সাহস দিল।

রাত্রি একটা। বেশ অন্ধকার। ঝুপঝুপ করিয়া তখন দুই বন্ধু বাড়ীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। রাস্তার মোড় হইতে দুইজন কনষ্টেবল হঠাৎ বাহির হইয়া বাড়ীর নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রাচীর হইতে ভিতরের উঠানে লাফাইয়া পড়িতেই অপরিচিত লোক দেখিয়া একটা কুকুর ভীষণ রবে চীৎকার করিয়া উঠিল।

—এজাদ বলিল "ওরে, কুকুর যে, কোন প্যাঁচ-ট্যাঁচ আছে?"

"তাই ত দেখ্‌ছি—কিন্তু এরকম ত কথা ছিল না। বেটাকে ধরে আচ্ছা করে 'এমোনিয়া' শোঁকাতে পারিস?"

তা' ত পারি, কিন্তু শিশিটা ঐ লাইব্রেরীর কাছে জুতো খুল্‌তে গিয়েই রেখেছি, ভুলে আর আনা হয় নি। বরাবর ত হাতেই ছিল।"

"গভীর সমস্যা!"

কুকুরের চীৎকার শব্দে হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া সেই দস্যু তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন হাতে বাহির হইয়া আসিল —তাহার দক্ষিণ হস্তে একটা একনলা বন্দুক। আলোটা উঠানে রাখিয়া কঠোরস্বরে বন্দুকধারী বলিল, "শীগ্‌গির হাত ওঠাও, নইলে গুলি করব—চুরী করতে আসা আমার বাড়ী!"

এজাদ শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "ওরে বন্দুক যে!"

"তাই ত দেখ্‌ছি! কিন্তু এ রকম ত কথা ছিল না।"

"দেখ্‌ না, যদি কোনো প্যাঁচ-ট্যাঁচ লাগাতে পারিস।"

"উঁ হুঁ, 'ভারতবর্ষে' এ রকম কথা ত লেখে নি কিছু।"

"হাত ওঠাও" বলিয়া বন্দুকধারী পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বলিয়া দুই বন্ধু হাত উঠাইল।

বন্দুকধারী ডাকিল, "সেলিমা, বাইরে এসে দরজাটা খুলে পুলিশ ডাকো ত।"

পাঁচ

নারী-চরিত্র কে বুঝিবে? বুঝিতে পারা যায় না, যাইবেও না। কিন্তু সত্যই কি ইহা দুর্জ্ঞেয়? নানা জ্ঞানীর নানা মত—বিনয় ও প্রণবের মতও অবিশ্বাস্য নহে।

সেলিমা—সেই সেলিমা যে ক্ষণ পূর্ব্বে বদ্ধ কক্ষে 'রক্ষা কর, মলাম, গেলাম' বলিয়া কাতর চীৎকারে নির্ম্মম দস্যুর প্রাণে করুণার উদ্রেক করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল—দস্যুর রক্ত-পিপাসু ছুরিকা যাহার বক্ষ রক্তপান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল—সেই সেলিমা, সেই বন্দিনী অবলীলাক্রমে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সেই খুনী দস্যুকেই জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছোঁড়া দুটো আবার কে গো? চোর না কি?"

রহস্যময়ীর এ কি রহস্য! নিমেষে তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! সেই ললিত লবঙ্গলতা শতদলবাসিনী অপ্সরী কোথায় গেল? এ ত রীতিমত একটা গদ্য—ত্রিশ বছর ধরিয়া কালো কালীর একখানা কালো বই।

সেলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকধারী বলিল, "দরজা খুলে তুমি পুলিশ ডাকো, হতভাগাদের চুরি করবার সখ মিটিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া হ্যারিকেন তুলিয়া বন্দুক হস্তে লোকটা যুবকদের নিকট অগ্রসর হইল।

এজাদ মৃদুস্বরে বলিল, "ওরে, ওটা ত একটা 'ডেজি এয়ার গান'—আলোয় দেখ্‌তে পাচ্ছিস না। আমি পটকা ছুঁড়ি, তুই প্যাঁচ-ট্যাঁচ লাগা।"

নিমেষে দুই-তিনটা পটকা সেই দস্যুর গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়াই এজাদ দেখিল—খোলা দরজা-পথে দুইজন লাল পাগড়ীধারী দাঁড়াইয়া। পটকা ছোঁড়া আর হইল না। কাতর স্বরে এজাদ বন্ধুকে বলিল, "পুলিশ যে রে, প্যাঁচ-ট্যাঁচ লাগানা।"

গম্ভীর স্বরে ওসমান বলিল, "এ রকম ত কথা ছিল না। তুই পটকা ছোঁড়।"

"বাজীওয়ালা বেটা ঠকিয়েছে, ও গুলোর একটাও ত ফুটলো না।"

"সমস্যা, ঘোর সমস্যা!"

'প্যাঁচ লাগাও, প্যাঁচ লাগাও।"

"তাই লাগা—ওয়ান, টু, থি—"

ছয়

সেলিমা দরজা খুলিয়া দিতেই কনষ্টেবলরা ভিতরে আসিয়া বন্ধুদের গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বেই 'ওয়ান্, টু, থ্রি'র প্যাঁচ অতি সুন্দরভাবেই লাগান হইয়াছিল।

"শালা চোর ভাগা—পাক্‌ড়ো—ও—ও" রবে দুই বীর প্যাঁচওয়ালাদের পশ্চাতে ছুটিল—কিন্তু এ কেতাবী প্যাঁচ নয় যে, পুলিশে তাহাদের হারাইয়া দিবে।

সেলিমা বলিল, "বেটাদের সাহসেও বলিহারী যাই! আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ঘরের মধ্যে জেগে এত রাত অবধি রিহার্সাল দিই যে, পাড়ার লোক পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারে না—তার মধ্যে এলি কি না তোরা চুরি করতে!"

"দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে—যাক্, এবার পেণ্টিং-গুলো ধুয়ে শুয়ে পড়া যাক্। পরশু প্লেটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়।" এই কথা বলিয়া হোসেন শাহ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত
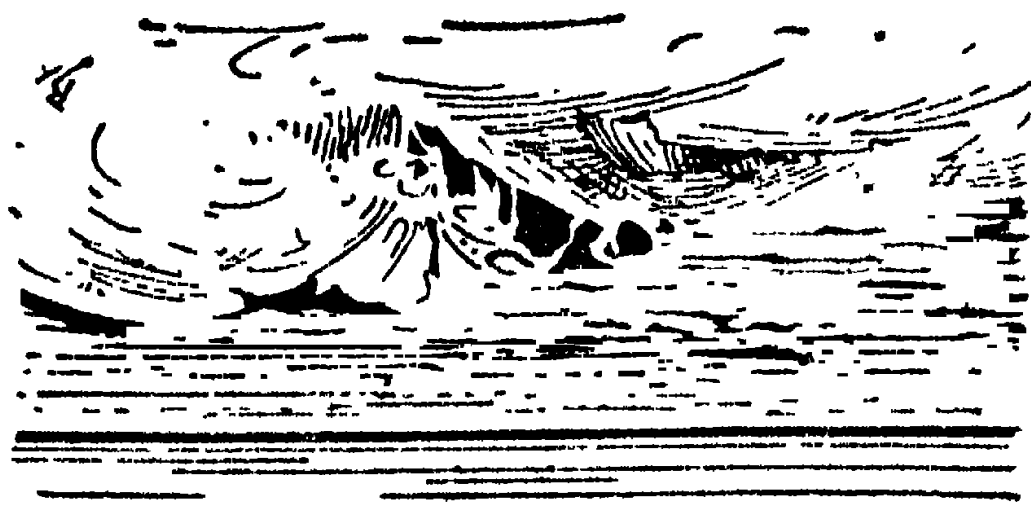
অপ্রস্তুত

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সহসা গৃহিণী নয়নতারা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—ও গো, শুনছ ?

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া যামিনীবাবু চশমার ভিতর হইতে চোখ দুইটি সাধ্যমত উপর দিকে তুলিয়া বলিলেন,—এঁ্যা !

খবরের কাগজখানা তখনও তাঁহার হাতে ধরা ছিল।

নয়নতারা তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়েছে !

যামিনীবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়নতারাকে কোনদিন তিনি সদরের উঠান পার হইতে দেখেন নাই ; অথচ, আজ তাঁহাকে অসঙ্কোচে বাহিরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন অবশ্যই, কিন্তু ততোধিক বিস্মিত করিয়াছিল নয়নতারার বাক্যটি। যামিনীবাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন,—কি ব্যাপার ?

নয়নতারা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—আর ব্যাপার ! ব্যাপার আমার পোড়া কপাল ! তখন অত করে বলেছি কাণ দাও নি, এখন তার ফল ভোগো !

যামিনীবাবু হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কি যে ঘটিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন,—আগে খুলেই বল না,—তারপর না হয় যত পার দুষো।

নয়নতারা কহিলেন,—বল্‌ব আমার মাথা আর মুণ্ডু ! বড় ছেলে এধারে উড়তে শিখেছেন।

বিস্মিত হইয়া যামিনীবাবু বলিলেন,—কে পেসাদ ? সে কি !

নয়নতারা তখন একখানি চিঠি তাঁহাকে দিয়া কহিলেন,—নাও, পড়ে দেখো।

যামিনীবাবু দেখিলেন ডাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে যে রঙিন খামখানি আসিয়াছিল,—ইহা সেইখানি। বলিলেন,—পেসাদের নামের চিঠি ; তুমি খুল্‌লে কেন ?

ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া নয়নতারা কহিলেন,—না, তা' আর খুল্‌ব কেন ? গোল্লায় যাবার পথ বেশ পরিষ্কার করে দিতে হবে কি না !

চিঠিখানি খোলায় যামিনীবাবু প্রথমটায় বেশ একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হয় ত পুত্রের কোন বন্ধু-বান্ধব লিখিয়া থাকিবে। কিন্তু চিঠিখানির আদ্যন্ত পড়িতেই তাঁহার মুখটি কালো হইয়া উঠিল। দারুণ ক্রোধ মনের মাঝে বাসা বাঁধিল।

চিঠিখানি এই—

মুক্তারামবাবুর রো
কলিকাতা, শুক্রবার

প্রিয়,—

প্রসাদ দা', তুমি বেশ লোক যা' হোক্ ! আজ তিন দিন তোমার পদধূলি এ বাড়ীতে পড়ে নি। তুমি কি নিষ্ঠুর প্রসাদ দা' ! আমি তোমা ছাড়া আর জানি না,—আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে এমনি করে পায়ে ঠেলে আমায় ব্যথা দিচ্ছ ! তোমার কি একটু কষ্ট হয় না, একটু দয়ামায়াও নেই ! আমি তোমার আশায় রোজ বিকেলে বৈঠকখানায় বসে থাকি ; তারপর নিরাশ হয়ে ওপরে উঠে আসি রাত্তিরে—তোমার দেখা পাই না ! এ চিঠি পাবার পরও যদি তুমি না আসো, তা' হলে বুঝ্‌বো, আমার সঙ্গ আর তোমার ভাল লাগে না।

আসছে বুধবার 'চিত্রা'তে 'ভাগ্যচক্র' দেখ্‌তে যাবে ? আমি তা' হলে তোমার সঙ্গে যাব। তুমি আর আমি, আর কেউ নয়। আমি কালই দু'খানা সিট রিজার্ভ করে রাখ্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ব। দেখো, যেন নিরাশ করো না। অফিস থেকে সটান এখানে চলে এসো। তুমি আমার প্রাণভরা ভালবাসা জেনো। ইতি,

তোমার জোটের পায়রা—
পরি

যামিনীবাবু তিন-চারবার চিঠিখানি পড়িলেন ; যতই পড়িতেছিলেন, তাঁহার ক্রোধ ততই বাড়িতেছিল। প্রকৃতিতে তিনি যেমন ছিলেন শান্ত,—ঠিক্ সেই পরিমানেই ছিলেন কান পাতলা। কেহ কোন কথা একবার কোনরূপে তাঁহার মাথায় প্রবেশ করাইয়া দিলেই তিনি অবিসংবাদিভাবে তাহা বিশ্বাস করিয়া বসিতেন। বিষয়টির সম্ভাবতা, অসম্ভবতার দিকে তখন আর আদৌ তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। এইটুকু ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান দুর্ব্বলতা!

আর একবার চিঠিখানি পড়িয়া তিনি বলিলেন,—জানোয়ার কোথাকার! লেখাপড়া শিখে এক-একটি বাঁদর তৈরী হয়েছেন!

নয়নতারা সখেদে বলিলেন,—যা' তৈরী হয়েছেন তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি! পর মুহূর্ত্তেই উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—আসল দোষ জেনো ঐ হতচ্ছাড়া ছুঁড়িটার। আজকাল মেয়েগুলো নেকাপড়া শিখ্‌ছেন, আর তৈরী হচ্ছেন—বাচাল আর বেলেল্লার শিরোমণি!

গম্ভীর মুখে যামিনীবাবু বলিলেন,—শুধু মেয়েদের দোষ দিলেই হবে না,— ছেলেরাও যোল আনা দোষী।

হাত নাড়িয়া নয়নতারা কহিলেন,—তা' জানি, কিন্তু মেয়েগুলোই ত আসকারা দেয়।

যামিনীবাবু বলিলেন,—থাক্, সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ত কোন লাভ নেই। চিঠিখানায় ঠিকানা দেখ্‌ছি মুক্তারামবাবুর রো। মেজকর্ত্তার বাড়ীও ত ঐখানে।

মেজ কর্ত্তা, অর্থাৎ নয়নতারা দেবীর মধ্যম ভ্রাতা।

যামিনীবাবু কি যেন ভাবিতেছিলেন। নয়নতারা স্বামীর কথায় যেন একটু আলো দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন,—ঐ জন্যই পেসাদ অত ঘন ঘন খোকাদের বাড়ী যায়। খোকা মেজ কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রসাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু—যদিও বয়সে প্রসাদ অপেক্ষা সে বছর তিনেকের ছোট। তিনি কহিলেন,—আচ্ছা, ও বাড়ীর খোকাকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? সে হয় ত সব খবর দিতে পারবে।

যামিনীবাবু মুখটা একটু বিকৃত করিয়া বলিলেন,—তাকে জিজ্ঞেস করলেই অমনি সে সব বল্‌ছে। আর কি বলেই বা জিজ্ঞেস কর্‌ব যে,—পেসাদ মুক্তারামবাবুর রো'র কোন বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেয় জানো? বলিয়া তিনি চিঠিখানি ছুঁড়িয়া নয়নতারার দিকে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—চুলোয় যাক্ সব! নিজেরা উচ্ছন্ন যাবেন, আমার আর কি! দু' চার লাখ রেখেও যাব না যে, কাপ্তেনী করে দু' হাতে ওড়াবেন—

যামিনীবাবুর পেশা ছিল,—ই-বি-আর-এর গুড্‌স ইনস্‌পেক্‌টরগিরি। মাসের মধ্যে বিশ দিন তাঁহাকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হয়। তাই তিনি দিন কয়েকের ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন বিশ্রাম উপভোগের জন্য। তাহাও শেষ হইয়া আসিয়াছে—কার্য্যে যোগদানের তারিখ নিকটবর্ত্তী। সংসারে তাঁহার স্ত্রী নয়নতারা এবং তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্যা। দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, আর দুইটি এখনও ছোট। সন্তানদের মধ্যে প্রসাদদাসই জ্যেষ্ঠ, অপর দুইটী পুত্রের এখনও পাঠ্যাবস্থা। প্রসাদদাস বছর দুই হইল ম্যাকিনান ম্যাকেঞ্জীর অফিসে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং মাহিনাও সৌভাগ্যক্রমে সত্তরের কোঠায় পৌঁছিয়াছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান ছেলে। বয়স বছর সাতাশ। বিবাহ তাহার আজও দেওয়া হইয়া উঠে নাই। যদিও এ বিষয়ে পুত্রের গর্ভধারিণীর তাগিদ যথেষ্টই ছিল।

* * *

পরদিন রাত্রে অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া প্রসাদ মেজবোন্ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁরে, আমার কোন চিঠি এসেছিল?

সেখানে নয়নতারাও ছিলেন। তিনি অনাগত দৌহিত্রের জন্য কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। কমলা একবার মায়ের দিকে চাহিল। নয়নতারা গম্ভীরভাবে কহিলেন,—কই, না। একটু থামিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর ফির্‌তে এত দেরী হলো যে?

প্রসাদ বলিল,—খোকাদের বাড়ী গিয়েছিলুম। বলিয়া সে ঘরে ঢুকিল—জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য।

কমলা মায়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তিনি 'গুম্' খাইয়া বসিয়া রহিলেন।

বুধবার দিন অফিসে বাহির হইবার সময় নয়নতারা প্রসাদকে বলিলেন,—আজ একটু সকাল সকাল ফিরিস, গোটা কতক জিনিষ মুদীর দোকান থেকে এনে দিতে হবে।

প্রসাদ কহিল,—আজ আমি পারবো না। কাল তখন এনে দেব।

মা বলিলেন,—কেন, আজকে কি হলো?

প্রসাদ বলিল,—আজ আমার একটু কাজ আছে।

নয়নতারা এবার জেদের সহিতই বলিলেন,—না, আমাকে জিনিষগুলো আজই এনে দিতে হবে। কাল এনে দিলে চল্‌বে না।

—আজ আমার দ্বারা হবে না—বলিয়া প্রসাদ একটু রাগতভাবেই বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সবই বুঝিলেন। জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার অন্তস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল। এই সেই ছেলে, যে তাঁহার আদেশ কোনদিন অবহেলা করিবার সাহস পায় নাই। আর আজ? একটা নগণ্য মেয়ের মোহে তাঁহাকে অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। ইহা অপমান ছাড়া আর কি?

নয়নতারা তখন ঠাকুর-ঘরে গিয়া বিগ্রহের সাম্‌নে উপুড় হইয়া পড়িলেন। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—দোহাই ঠাকুর, ডাইনির হাত থেকে ছেলেকে আমার ফিরিয়ে দাও! সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের জলে ঘরের মেঝে ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া যামিনীবাবু গৃহিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পেসাদ ফিরেছে।

নয়নতারা কহিলেন,—হ্যাঁ, ফিরেছে। এখন শম্ভুদের বাড়ী গিয়েছে।

শম্ভু প্রসাদের বন্ধু এবং তাহাদের প্রতিবেশী।

কনিষ্ঠ পুত্র হাবুল পিতার জন্য তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া যামিনীবাবু ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

খানিকটা পরে তিনি কহিলেন,—বুঝ্‌লে, আজ 'চিত্রা'য় গিয়েছিলুম।

নয়নতারা কহিলেন,—সে আবার কোথায়?

যামিনীবাবু বলিলেন,—ঐ যে গো বায়স্কোপ। শ্যাম-বাজারের পাত্রীটিকে দেখেই যাচ্ছিলুম মেজ কর্ত্তার বাড়ী। বায়স্কোপটার সাম্‌নে আস্‌তেই মনে হলো যাই একবার গুণধরের ব্যাপারটা দেখে। তখনও ছবি আরম্ভ হয় নি। আট আনার টিকিট একখানাও পেলুম না। শেষকালে এক টাকা দু'আনা আক্কেল সেলামী দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম।

নয়নতারার এবার মনে পড়িল—সেই চিঠিখানির কথা।

আগ্রহের সহিত তিনি বলিলেন,—ওদের দেখ্‌তে পেলে?

যামিনীবাবু মুখের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—পেলুম বই কি। ঢুকেই দেখি সব অন্ধকার। সবে ছবি আরম্ভ হয়েছে। খানিকটা দেখ্‌তেই গাটা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠল। আরে রাম রাম, সে যাচ্ছেতাই ব্যাপার! কি আর করি। চুপচাপ বসে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সেই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করার পর আলো জ্বলে উঠল। আমি ত হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলুম। তারপর এধার-ওধার চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি—তোমার গুণধর বসে রয়েছেন, সঙ্গে ও বাড়ীর খোকা।

নয়নতারা কহিলেন,—খোকাও ছিল? তবে যে লিখেছিল—আর কাউকে সঙ্গে নেবে না। সেই ডাইনী ছুঁড়ী ছিল ত?

যামিনীবাবু বলিলেন,—ছিল নিশ্চয়ই! খোকাকে বোধ হয় যুড়িদার বলেই সঙ্গে নিতে হয়েছিল। ভেতরকার ব্যাপার তিনিও সব জানেন বোধ হয়। বলিয়া গড়গড়ায় আবার দু'-চারটী টান দিলেন।

নয়নতারা বলিলেন—সে ছুঁড়িকে দেখ্‌তে কি রকম—ফরসা না কালো?

যামিনীবাবু বলিলেন,—কেমন দেখ্‌তে সে কি আর ভাল করে দেখছি? তারা ছিল আমার চার-পাঁচটা সারের আগের সারে; আমার দিকে পেছন করে। তবে দু'-

পাশেই মেয়ে ছিল বলে ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলুম না—কোন্‌টি আসল।

সবিস্ময়ে নয়নতারা বলিলেন,—দু'পাশে মেয়ে সে আবার কি?

যামিনীবাবু কহিলেন,—আহা, বুঝ্‌তে পারলে না। মাঝখানে বসেছে পেসাদ আর খোকা; আর তাদের দু'-পাশে দু'-তিনটী বিদ্যোধরী রয়েছেন। কী হাসি ঠাট্টার ঘটা তাঁদের! উচ্ছন্নয় গেছে সব! বলিয়া পুনরায় গড়গড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

নয়নতারা গালে হাত দিয়া বলিলেন,—ও মা, কি হবে! এঁ্যা! অত লোকের মাঝখানে ইযারকি দিতে একটু লজ্জা-সরম হলো না। ছিঃ ছিঃ! আবার খোকাও ঐ দলে, ওরও পাখা তা' হলে গজিয়েছে?

যামিনীবাবু বলিলেন—তা' আর গজায় নি। দু'টিতে একবাবে হলায় গলায়! তারপর শোন,—আমি আর দেখ্‌লুম না, উঠে পড়ে গেলুম মেজ কর্ত্তার বাড়ী। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে দুই মূর্ত্তি ফিরলেন। আমায় দেখে একটু চম্‌কেও গেলেন ধরতে পারলুম। পেসাদ একটু পরে রওনা হলো। আমায় আবার জিজ্ঞেস করা হলো—এখুনি আমি বাড়ী আসব কি না? বল্‌লুম,—আমার দেরী আছে। ফেরবার মুখে খোকাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম যে,—ঐ মেয়ে দু'টী কারা?

আগ্রহান্বিত হইয়া নয়নতারা বলিলেন,—তারপর, খোকা কি বল্‌লে?

যামিনীবাবু বলিলেন,—যা' বলে থাকে। একেবারে ঝাড়া অস্বীকার,—চিনি না। আমাদের সঙ্গে আসে নি ত। ব্যস, চুকে গেল!

—বল্‌লে চিনি না। অবাক হইয়া নয়নতারা কহিলন,—তা' হলে নিশ্চয় উনিও ঐ দলেই আছেন।

যামিনীবাবু কহিলেন,—তা' আর নেই। আমি কিন্তু মেজ কর্ত্তাকে আভাষে সব জানিয়ে এসেছি।

নয়নতারা বলিলেন—বেশ করেছ। দাদা কি বল্‌লে?

যামিনীবাবু বলিলেন—আরে, ওরা হচ্ছে আজ কালকার ফ্যাসানের মানুষ! সহজে কি কোন কথা বিশ্বাস করে! সব শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলে। বল্‌লে—আমার ধারণা না কি ভুল। পেসাদ সে প্রকৃতির ছেলেই নয়!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নয়নতারা বলিলেন,—যাক্! এখন মেয়ে কেমন দেখ্‌লে বলো।

তাহার পর পাত্রীটির রূপ, রং, দোষ-গুণের নানাবিধ আলোচনা চলিল; শেষ পর্য্যন্ত বোঝা গেল যে,—মেয়ে পছন্দ হয় নাই।

* * *

মধ্যে একদিন প্রসাদ তাহার রিং সমেত চাবিটা ফেলিয়া অফিসে চলিয়া গিয়াছিল। কমলা সযত্নে উহা সংগ্রহ করিয়া লইল এবং প্রসাদের অনুপস্থিতিতে তাহার যাবতীয় বাক্স সুটকেশ ইত্যাদি হাতড়াইয়া দেখিতে বসিল,—যদি পোড়ারমুখী পরীর হাতের লেখা আর কোনও চিঠি সে বাহির করিতে পারে। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নিরাশ হইতে হইল। কমলা বুঝিল—দাদা বড় চালাক। সে কি আর চিঠি রাখিয়া দিয়াছে—পড়িয়াই বোধ হয় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের কথা মনে পড়িল। দুই বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে,—এ পর্য্যন্ত স্বামীর লিখিত সব চিঠিই সে সযত্নে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। একখানিও সে নষ্ট করে নাই,—এমন কি খামগুলি পর্য্যন্ত নয়। এখানে আসিবার সময় সে সন্তর্পণে সেগুলি লইয়া আসিয়াছে। শ্বশুর-বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই—যদি কেহ লইয়া পড়ে, অথবা নষ্ট করে। পড়ে তাহাতে খুব বেশী লজ্জা নাই; কেন না, তাহার এখানকার ও সেখানকার দুই-চারিটি বান্ধবী অনেকগুলি চিঠিই দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার ভয়,—পাছে কেহ নষ্ট করিয়া ফেলে। সে যক্ষের ধনের ন্যায় উহা আগলাইয়া রাখিয়াছে। সেগুলি তাহার অলঙ্কার অপেক্ষাও প্রিয় সামগ্রী।

নিজের তুলনায় দাদার চিত্ত-বৃত্তির কথা ভাবিয়া সে হাসিল। বেটাছেলে মাত্রেই বোধ হয় ঐরূপ। মেয়েদের কাছে যে ক্ষুদ্র জিনিষটি অতি প্রিয়,—পুরুষদের নিকট তাহা নিরর্থক মাত্র। হয় ত তাহার স্বামীও ঐ দলে। তাহার লেখা চিঠিগুলি বোধ হয় সে অবহেলা করিয়া

ফেলিয়া দিয়াছে—নাঃ, এবার সেখানে গিয়া খবর লইয়া দেখিতে হইবে। যদি সত্যই ফেলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সে ক্ষমা করিবে না। ভবিষ্যতে কোনদিন তাহাকে আর চিঠি লিখিবে না,—ইহা সুনিশ্চিত!

এইরূপ অনেক কিছুই ভাবিতে ভাবিতে কমলার অনেক সময় কাটিয়া গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিতেই তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি বাক্সগুলি গোছাইয়া ফেলিল। তারপর চাবি বন্ধ করিয়া মায়ের কাছে রিপোর্ট দাখিল করিল,—বামাল কিছুই পাওয়া গেল না।

* * *

যামিনীবাবুর ছুটি বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ছিল। প্রসাদ সে কথা জানিত। কিন্তু তিনি যখন শুক্রবারেও রওনা হইলেন না, তখন সে উৎসুকবশতঃ প্রশ্ন করিল,—আপনার জয়েনিং ডেট্ আজ ছিল না?

যামিনীবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন,—হ্যাঁ।

প্রসাদ বলিল,—কই, আজ গেলেন না?

যামিনীবাবু বলিলেন,—না, আমি আরো দিন পনেরোর ছুটি নিয়েছি। একটা কাজ আছে, সেরে তারপর যাব।

প্রসাদ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। সে তাঁহার সাম্‌নে বড় একটা বেশী কথাবার্ত্তা বলিত না। তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় এবং শ্রদ্ধা করিয়া চলিত।

প্রসাদ চলিয়া গেলে যামিনীবাবু মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন—আজকালকার ছেলেরা মনে করে তাহারা ভারী ধড়ীবাজ; আর বুড়োগুলো বড় বোকা। তাহাদের চাল আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি চলিয়া গেলে বাবুর ভারী সুবিধা হয়। গিন্নী হাজার হইলেও মেয়ে মানুষ—বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্তই তাঁহার দৌড়। বাহিরের খবর এ শর্ম্মা না থাকিলে কিছুতেই বাহির হইত না। যামিনীবাবু আবার একটু হাসিলেন।

দিন দশেক পরের কথা। সকালবেলা যামিনীবাবু গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তা' হলে কি বলো, কালীঘাটের ওঁদের সঙ্গেই কথা পাকা করি?

নয়নতারা কহিলেন,—তাই কর। যখন এ মাসে ওই ছাব্বিশ-এ ছাড়া আর দিন নেই—তা' হ্যাঁ গা, ওঁরা দেড় হাজারের বেশী একেবারেই আর উঠবেন না?

যামিনীবাবু বলিলেন,—না, মোটেই পারবেন না। হাতযোড় করে ভদ্রলোক বলেছেন,—তার ওপর আর কি বলি বলো। তবে মেয়েটি খাসা—সাক্ষাৎ প্রতিমা—নামেও, দেখ্‌তেও।

নয়নতারার মনটা একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। প্রথম ছেলের বিবাহ। একটা ভাল রকম খরচ-পত্র করিবেন, ভালমত পাওনা-থোওনা হইবে,—এইরূপ আশা ছিল। কিন্তু বিধাতা সেদিকে বাদ সাধিলেন। সকলই তাঁহার কপালের দোষ! নতুবা অমন ভাল ছেলে সহসা বিগড়াইয়াই বা যাইবে কেন? তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কর্ত্তার ইচ্ছা ছিল ফাল্গুন মাসে বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁহার আগ্রহে মাঘ মাসে দেওয়াই স্থির হইয়াছে। তিনি কর্ত্তাকে বলিয়াছিলেন,—রক্ষে কর। অমন ব্যাপার জান্‌বার পর আবার ইচ্ছে করে দেরী করে।

সেদিন শুক্রবার। সকালবেলা প্রসাদকে ডাকিয়া যামিনীবাবু কহিলেন,—কাল তুমি অফিসের ছুটি নেবে।

প্রসাদ বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন?

যামিনীবাবু বলিলেন,—কাল তোমার আশীর্ব্বাদ। ছাব্বিশ-এ মাঘ বিয়ের দিন স্থির করেছি।

প্রসাদ চমকাইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! তাহার বিবাহের সকলই স্থির, অথচ সে ঘুণাক্ষরেও ইহার কিছুই জানে না!—কাল তাহার আশীর্ব্বাদ! সে একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিল,—কিন্তু এত শীগ্‌গির কি দরকার? আরও কিছুদিন পরে—

বাধা দিয়া যামিনীবাবু বলিলেন,—শীগ্‌গির দেরীতে তোমার আর এমন কি এসে যাবে। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, তার আব নড়চড় হবার উপায় নেই।

প্রসাদ আর কিছু বলিল না। আর সে বলিবেই বা কি ?

*　　*　　*

ছাব্বিশ-এ যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। প্রসাদ লক্ষী ছেলের মত বর সাজিয়া গিয়াছিল এবং হাসিমুখেই পরদিন কনেকে লইয়া ফিরিল।

রাত্রে কর্ত্তা গৃহিণীতে কথা হইতেছিল।

নয়নতারা কহিলেন,—এত দিনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম, যতক্ষণ না চার হাত এক হয়েছে—ততক্ষণ আমি কেবল ঠাকুরদের ডেকেছি—দোহাই হরি, আমার মুখ রেখো দয়াময়! আর দেখো, পেসাদ বেশ হাসিমুখেই ফিরেছে, বউও চমৎকার হয়েছে!

কর্ত্তা পাত্রী মনোনয়ন করিয়া সকলের কাছে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং উৎফুল্লভাবে তিনি বলিলেন,—দেখো, কেমন বউ করে দিয়েছি। কেবল আমায় বলো,—কোন কাজের নই। কেমন, এখন দেখ্‌লে ত?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—তা' দেখেছি। না জানি কি রকম করে 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে।'

কর্ত্তা কহিলেন—বটে!

নয়নতারা কহিলেন—নয় ত কি! ভাগ্যে আমি চেপে ধরলুম,—তবে না তোমার টনক নড়ল,—এত শীগ্‌গির বিয়ে হলো। তখন ত ছেলের নামের চিঠি খুলেছিলুম বলে কর্ত্তার কি রাগ! কিন্তু এখন বুঝ্‌ছ ত, সে চিঠি তখন না খুললে আজ কি সর্ব্বনাশ না হতে পারত?

কর্ত্তা গড়গড়ায় মুখ টান দিয়া একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন—তা' ঠিক্। দেখো, এই অফিস-সেরেস্তার কাজ বলো, আর সাহেবদের সঙ্গে বোঝপড়া করা বলো,—আমরা বেশ পারি। সংসারের এই খুঁটিনাটি, হেপাজাত বওয়া বা সেদিকে বুদ্ধি খেলান আমাদের দিয়ে কস্মিন কালেও হবে না। এদিকে তোমার মাথা অদ্ভুত রকম খেলে,—একথা স্বীকার করতেই হবে।

নয়নতারা দেবী আত্মপ্রশংসায় বিলক্ষণ গর্ব্বিতা ও পুলকিতা হইলেন।

ফুলশয্যার দিন সকালবেলা। প্রসাদ কি একটা কাজে তাহার ঘরের ভিতর আসিয়াছে। নববধূ তখন অন্যত্র ছিল। এমন সময় ছোট ভাই হাবুল আসিয়া একখানা রঙিন খাম তাহার হাতে দিয়া বলিল,—পিওন দিয়ে গেল।

দামী টয়লেট পেপারের খাম, ভুরভুরে গন্ধ বাহির হইতেছে। ঠিকানায় হাতের লেখা দেখিয়া প্রসাদ বুঝিতে পারিল না যে,—প্রেরকটী কে? খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানা পড়িয়া সে হাসিতে লাগিল। এমন সময় যামিনীবাবু তাহাকে বাহিরের ঘরে ডাকিলেন।

—আসছি বলিয়া প্রসাদ সাড়া দিল। তাড়াতাড়িতে খামের ভিতর পত্রখানা ভরিবার অবসর না পাইয়া সে খাম ও চিঠিখানা একত্রে বিছানার মাথায় বালিশের তলায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরেই নববধূ প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া কমলা সেই ঘরে আসিল এবং বধূকে খাটের উপর বসাইয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রতিমার কাছে রহিল প্রসাদের ছোট বোন্ বেণু। বয়স তাহার বছর দশ। বেণু মাথার বালিশটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই সে পত্র এবং খাম দেখিতে পাইল। নাকের কাছে চিঠিখানা ধরিতেই সে দিব্য 'সেণ্টে'র গন্ধ পাইয়া বলিল,—বারে, কেমন সুন্দর গন্ধ দেখুন বৌদি'—বলিয়া পত্রখানা সে বৌদি'র দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

প্রতিমাও বালিকার অনুরোধে পড়িয়া চিঠিখানা নাসিকার সন্নিকটস্থ করিতেই বেশ একটা মিষ্ট গন্ধ পাইল এবং কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে খোলা পত্রের দিকে নয়ন দুইটি ক্ষণেকের জন্য নিবদ্ধ করিল। কিন্তু চিঠিখানার কিয়দংশ পাঠ করিতেই তাহার মাথাটা যেন ঘুরিয়া উঠিল। একরকম মোহাক্রান্তের ন্যায় অনিচ্ছাসত্বেও সে পত্রটার শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সুরু হইল। চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে সজোরে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া প্রতিমা পাশ বালিশটার উপর

মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠের স্বরও বুঝি তখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বৌদি'র এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বেণু হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ঐভাবে বৌদি'কে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ডাকিল,—বৌদি', ও বৌদি'!

বৌদি'র নিকট হইতে কিন্তু সে কোন জবাবই পাইল না। তবে কি বৌদি'র ফিট্ হইল? কেন না, তাহার মায়ের ফিট্ সে অনেকবার দেখিয়াছে। তাহার আরম্ভ কতকটা এইভাবেই হইয়া থাকে। সে দৌড়াইয়া রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল,—মা, বৌদি' কি রকম করছে! বোধ হয় ফিট্ হয়েছে।

সকলে চমকিয়া উঠিল—সে কি! কমলাও সেখানে ছিল। এইমাত্র যে সে ভাল অবস্থাতেই বধূকে দাদার ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে। সকলে একপ্রকার পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিয়া প্রসাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রতিমা ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলে সমস্বরে তাহার উপর প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন,—হঠাৎ এমন হলো কেন? তোমার কি ফিটের রোগ আছে?

কেহ আবার মাথায় বাতাস করিতে সুরু করিয়া দিলেন।

প্রতিমা লজ্জিতা হইয়া উঠিয়া বসিল। নম্রকণ্ঠে সে কহিল,—না, বাতাস করতে হবে না। মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে গিয়েছিল। এখন ভাল হয়ে গেছে।

বেণু সবিস্তারে ঘটনাটার বর্ণনা করিতেছিল। গন্ধওয়ালা চিঠির কথা শুনিয়া নয়নতারা চমকাইয়া উঠিলেন। কমলাও অর্থপূর্ণ-দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল।

নয়নতারা দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—কই সে চিঠি, দেখি।

চিঠিখানি তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলা অনুচ্চস্বরে পড়িতেছিল। সে মুখখানা কালো করিয়া চিঠিটা মায়ের হাতে দিল।

নয়নতারা ও কমলা দুইজনে যুগপৎ অনুচ্চস্বরে পড়িতে লাগিলেন। তাহা এই—

মুক্তারামবাবুর রো
বুধবার

প্রিয়,—

প্রসাদ দা', আর কি, এবার ত বিয়ে করলে। কিন্তু বিয়ে করলে বলেই কি এ রাস্তা আর মাড়াতে নেই। এখন ত পরম সুখেই বৌদি'কে নিয়ে দিন ঘর-কন্না করবে—আর ভুলেও কি মনে করবে আমার কথা? তোমার ভালবাসার যে শেষ পরিণতি এই হবে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। জান্‌লে বোধ হয় অমনভাবে নিজেকে তোমার কাছে বিলিয়ে দিতুম না। আজ আমার কি রইল প্রসাদ দা'! মনে পড়ে কি,—পূর্ণিমার রাতে লেকের ধারে বেঞ্চিতে বসে গল্প করার কথা? সেদিন বোধ হয় ইহজীবনে আর কোনদিন আসবে না। এখন ত তুমি বৌদি'র অধিকার-ভুক্ত,—আমি কে? তবুও তোমাকে পূর্ব্বের সম্বন্ধেই আমার প্রাণভরা ভালবাসা জানাচ্ছি। ফুলশয্যার দিন তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে দেখা করব। বেশ জানি যে, এখন পাহাড় মহম্মদের কাছে আসবে না কোন দিন, মহম্মদকেই যেতে হবে পাহাড়ের কাছে এবং যেচে। ইতি,

তোমার জোটভাঙা পায়রা
পরি

কি আশ্চর্য্য, সেই হাতের লেখা, সেই কাগজ, তেমনি গন্ধ!

নয়নতারা অস্ফুটস্বরে কহিলেন—আসুক না একবার, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো 'খন।

এমন সময় প্রসাদ ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বাহিরে সে শুনিয়াছে কাহার বুঝি ফিট্ হইয়াছে। তাহার মায়ের ফিট্ হইয়াছে মনে করিয়া সে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল।

বিমলা বলিল—বৌদি'র মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল; এখন ভাল আছে।

প্রসাদ কমলার হস্তধৃত চিঠিখানা দেখিয়া সহাস্যে কহিল,—ও চিঠিখানা তুই পেলি কোথায়?

কমলা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। দাদা দেখ্‌ছি নেহাৎ

নির্লজ্জ। নতুবা নিজের কলঙ্কের কথা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিতেছে। ছিঃ!

নয়নতারা দেবীও ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। কমলা কোনও জবাব দিল না। প্রসাদ হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল ইহাদের ব্যাপার দেখিয়া।

বিমলা একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ দাদা, পরিটা কে?

এতক্ষণে প্রসাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল—এই আকস্মিক বিবাদের মূল সূত্র কোথায়। এই চিঠিখানাই যে একটা বিপ্লব পাকাইয়া তুলিয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই।

এমন সময় বাহিরে খোকার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তাহার গলার শব্দ পাইতেই প্রসাদ বলিল—চিঠিখানা যার লেখা, তাকেই নিয়ে আস্‌ছি—সেই সব জবাব দেবে।

কমলা যেন আঁতকাইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! দাদার কি একটু কাণ্ডজ্ঞানও নাই! সেই মেয়েটাকে, এই ঘরের ভিতর মা, বৌদি'র সম্মুখে লইয়া আসিবে,—যাহার সহিত সে এতদিন অবাধে প্রেমলীলা চালাইয়াছে!

কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া প্রসাদ যাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল,—সে কোন ষোড়শ বা সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী নহে—তাহারই মাতাতো ভাই, ও বাড়ীর খোকা।

সকলে সত্যই অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। এই চিঠির লেখক যে খোকা হইতে পারে, সে কথা তাঁহারা তখনও সম্যক বুঝিতে পারেন নাই।

প্রসাদ বলিল,—বুঝ্‌তে পার্‌লে না? চিঠির তলায় লেখা আছে 'পরি', না? ওর সঙ্গে 'ম' আর 'ল' যোগ কর, তা' হলেই বুঝ্‌বে।

যোগ করিতে দাঁড়াইল 'পরিমল।' ঠিক্ ত। খোকার ভাল নাম ত পরিমল। একথা এতদিন কাহারও মাথায় আসে নাই। ও, তাই ঠিকানায় লেখা থাকিত মুক্তারাম-বাবুর রো এবং সেই জন্য বায়স্কোপে প্রসাদের সঙ্গে খোকাকে দেখা গিয়াছিল।

এতক্ষণে সব জলের মত পরিষ্কার হইল। সকলের বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল।

বিমলা হাসিয়া বলিল—ওঃ, কি দুষ্টুমী বুদ্ধি তোমার খোকা দা'! আমাদের একেবারে 'থ' বানিয়ে দিয়েছিলে!

পরিমল হেঁট মুণ্ডে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতেছিল। অন্য সময় হইলে কথার জবাবে তাহার মুখ দিয়া যেন তুবড়ী ছুটিত। কিন্তু পিসীমার সম্মুখে সে আজ চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন নয়নতারা। তিনি বিস্মিত-দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিলেন। কমলাও মায়ের দিকে চাহিল।

এধারে প্রতিমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া যাইতেছিল। ছি ছি, সে কি কেলেঙ্কারী না করিয়া বসিল! সকলে কি মনে করিবেন? বিশেষ করিয়া তাহার স্বামী? হয় ত তিনি মনে করিয়াছেন—মেয়েটার মন কী নীচ!

সে ঘোমটার ফাঁক দিয়া আড়চোখে তাহার এই কীর্ত্তিমান দেবরটিকে দেখিতে লাগিল। না জানি ভবিষ্যতে তাহাকে লইয়া আবার সে কি কৌতুক করিয়া বসিবে।

ভাল করিয়াই সে পরিমলকে চিনিয়া রাখিল।

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈরাগ্য-সাধন

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী-মহাশয় তো হাসিয়া একেবারে লুটো-পুটি! বলিলেন, "রাগ কোরো না ভায়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বলি, নাত-বৌয়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে না কি? একটু—ওর নাম কি—মন কসাকসি?"

কিন্তু নির্ম্মল মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "এ সব 'সিরিয়াস' ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবেন না চক্কোত্তি-মশায়। আমি একে নিজের অশান্তিতে জ্বলে পুড়ে মরছি, তার ওপর আপনি কচ্ছেন ঠাট্টা।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় সদানন্দ মানুষ। কিন্তু নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়া আর বেশী কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদেরও এক সময়ে দিন কাল ছিল রে ভায়া"—বলিয়া 'লেজারে'র বৃহৎ পাতাটা উল্টাইয়া ফেলিলেন।

ব্যাঙ্কের কেরানী। দশ বৎসর পূর্ব্বে পঁয়ত্রিশ টাকায় ঢুকিয়াছিল, আজ সেই বেতন বৃদ্ধি হইয়া পঞ্চান্নয় দাঁড়াইয়াছে। জীবন-পথের 'স্লো' প্যাসেঞ্জার—কবে যে শেষ সীমায় পৌঁছিবে আশা করাও যেন দুরাশা! সংসারে স্ত্রী এবং পাঁচটি ছেলেমেয়ে। একটা বাড়ীর দুইখানা ঘর এবং তাহারই বারান্দায় দরমা দিয়া ঘেরা একটুখানি রান্নার জায়গা, ইহারই জন্য ভাড়া দিতে হয় প্রতি মাসে কুড়িটি টাকা। বাকী পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে অতবড় সংসারটার সমস্ত খরচ চালানো!

সংসারে বিতৃষ্ণা কি আর মানুষের সাধ করিয়া আসে!

পাঁচটা বাজিয়া গেল। যাঁহারা ডেলী প্যাসেঞ্জারী করেন, সকলেই নিজ নিজ চ্যাটাইয়ের ব্যাগ ও ঝাড়ন লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশনের মোড়ে বাজার করিয়া পাঁচটা সাঁইত্রিশের ট্রেণ ধরিতে হইবে।

নির্ম্মলও উঠিল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় তখনও মোটা খাতাখানা লইয়া কতকগুলি সারিবন্দী অঙ্কের 'টোটাল' দিতেছেন। নির্ম্মল বলিল, "যাবেন না ঠাকুর দা'?"

তিনি বলিলেন, "না ভায়া, এই 'টোটাল'গুলো শেষ না করে আজ আর ওঠবার উপায় নেই। এগোও তুমি।"

নির্ম্মল অগ্রসর হইল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীতেই ফিরবে তো ভায়া, না কোনো পাহাড়ের গুহায়, কিম্বা দণ্ডকারণ্যে—"

নির্ম্মল সে কথার উত্তর না দিয়া বাহিরে আসিল। রাস্তা তখন জনকোলাহলে মুখরিত। মোটর, ট্রাম, বাস বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়াছে।

পাহাড়ের গুহায় কিম্বা দণ্ডকারণ্যে সে কি সাধ করিয়া যাইতে চায়? এই দরিদ্র, ব্যর্থ জীবনের গুরুভার, বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন আর সে বহন করিতে পারে না। দীর্ঘ দশটি বৎসর চাকরী-জীবন কাটিয়া গেল, নিত্যই দায়িত্বের গুরুভার—ইহার আর সমাপ্তি নাই! সংসার-জীবনে সে ইহারই মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করিতেছে। চায় সে মুক্তি, বিশ্রাম!

মাসের হিসাবটা সে মুখে-মুখেই একবার আবৃত্তি করিয়া ফেলিল। বাড়ীভাড়ার কুড়িটি টাকা বাদে যাহা ছিল, মুদির দোকানে দিতে হইয়াছে, কয়লার দাম মিটাইতে হইয়াছে, দুধওয়ালার সব টাকা দেওয়া হয় নাই, খেঁদার কাপড়, নেপুর জামা, বুঁচুরাণীর জুতা, তা' ছাড়া, সংসারের দৈনন্দিন খরচের দীর্ঘ তালিকা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। নিজের জুতা যোড়াটা সে গত বৎসর কিনিয়াছিল, তালি এবং হাফ্ সুলে ভারি হইয়া উঠিয়াছে, এই মাসে কিনিলেই ভাল হইত, আগামী

মাসের 'বজেট' হইতেও কেনা সম্ভব হইবে না। স্ত্রীর কাপড় প্রায় সবগুলিই ছিঁড়িয়াছে, কোলের খোকা 'হর্লিক' ছাড়া হজম করিতে পারে না, সুতরাং এ দুইটি জিনিষ কিনিতেই হইবে। নেপু গত মাসে জ্বর হইয়া প্রায় পনের দিন ভুগিয়াছে, ডাক্তারখানার বিল আসিয়াছে সাত টাকা ছয় আনা। এতদিন দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সাত টাকা ছয় আনা সেদিকে দিলে সংসার খরচে টান পড়ে। বুঁচুরাণীর দুধে জল ঢালিয়া মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য সাবু মিশাইতে হয়, দর্জ্জিহাটার কোন একটা দোকানে সাবু একটু সস্তা দামে পাওয়া যায়, সেখানেও দু'-তিনদিন পূর্ব্বে যাওয়া উচিত ছিল, আজও যাওয়া হইল না।

নাঃ—বানপ্রস্থই ঠিক্। সংসার তাহার ভরা বোঝাই লইয়া অতলে ডুবুক, সে আর পারিবে না। দূরে—বহুদূরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে। শেষে হয় তো হিমালয়ের কোন দুর্গম গিরিগহ্বরে পাইবে কোন এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ, তারপর তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের পরমার্থিক জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

কল্পনা সেখানেই আসিয়া থামে না। ঐহিক জীবনেরও ভবিষ্যতে সোনার রং ধরাইয়া দেয়। হয় তো কোনও মহারাজার জীবন রক্ষা করিবে কোন এক অলৌকিক উপায়ে—তিনি হয় তো বক্‌শিস্ দিবেন তাঁর রাজ্যের মহামাত্যের পদ। জীবনের অন্ধকারের পরিবর্ত্তে তখন আসিবে আলোকের তীব্র দীপ্তি!

পাশ দিয়া একখানা প্রকাণ্ড মোটর চলিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে তাহার কাদা ছিট্‌কাইয়া লাগিল। জামাটা কাদার দাগে বিশ্রী করিয়া দিল। অন্যদিন হইলে নির্ম্মল বিরক্ত হইত, আজ তাহার হাসি পাইল। ভবিষ্যৎ জীবনে সেও ঐ রকম মোটরেই যখন বেড়াইবে, তখনও অনেক অভাগার সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিট্‌কাইয়া লাগিবে। সে দিন আর কতদূরে?

দীর্ঘ পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঐ মোড়টা পার হইয়া বাঁদিকের গলিটার খানিকটা গেলেই তাহার দৌলতখানা।

দুঃখ হয় সুরমার জন্য। বেচারী দিনরাত্রির মধ্যে বিশ্রাম কাহাকে বলে জানে না। বিরক্তি বা বিতৃষ্ণার স্বরূপ সে কখনও দেখে নাই। সমস্ত ছেলেমেয়েগুলির দৌরাত্ম্য, আবদার সাম্‌লানো, সংসারের কাজকর্ম্ম, বাসন মাজা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা, সব তাহাকেই করিতে হয়, সেজন্য সে কোনোদিন কোনো অনুযোগ করে নাই, বিরক্তিও প্রকাশ করে নাই।

বাড়ী পৌছিবার পরের ঘটনাগুলিও সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল। সুরমা হয় তো সবেমাত্র বালিশের ওয়াড়গুলিতে সাবান দিয়া উঠিয়াছে। কাদামাখা জামাটা এখনই তাকে দিতে হইবে। সাবান না দিলে কাল এটা গায়ে দেওয়া চলিবে না। খেঁদা এবং নেপা হয় তো মারামারি বাধাইয়া দিয়াছে, বুঁচুরাণীর পালাজ্বরটা আজ আসিবার দিন, সে বেচারী হয় তো মুড়িসুড়ি দিয়া জ্বরে কাঁপিতেছে, কোলের খোকা হয় তো কান্না জুড়িয়া দিয়াছে!—নাঃ, শান্তি আর নাই! মহাপুরুষেরা যে বলিয়াছেন সংসারের মধ্যেই নরক আছে—মিথ্যা কথা নয়। সাক্ষাৎ ঋষিবাক্য!

সুরমা হয় তো বলিবে তৈল ফুরাইয়া গিয়াছে—হয় তো এখনই আবার তেলের ভাঁড় হাতে করিয়া দোকানে ছুটিতে হইবে। নয় তো বলিবে, ডাক্তারখানা হইতে বিলের তাগাদায় লোক আসিয়াছিল। দুইটাই সমান বিপজ্জনক।

বাড়ীর দুয়ার বন্ধ। একতলার একপাশে থাকে তাহারা, অন্যপাশে থাকেন মুখুয্যে-মশায়। তিনি লোহার দালালী করেন; রোজগার মন্দ নয়। বেশ মজলিসী লোক। তাঁহার স্ত্রীকে সুরমা মাসীমা সম্বোধন করে, সেই সুবাদে নির্ম্মলও তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকে।

কড়া ধরিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিতেই দ্বার খুলিয়া দিলেন মুখুয্যে-মাসীমা। রোয়াকের উপর উঠিতেই নির্ম্মল দেখিল—তাহার দুইটা ঘরের দুয়ারেই মস্ত তালা ঝুলিতেছে। বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না।

মুখুয্যে-মাসীমা একখানা খাম আনিয়া দিলেন। তাহার মধ্যে রহিয়াছে দুয়ারের চাবি এবং একখানি চিঠি।

সুরমা লিখিয়াছে—

"দুপুরবেলা হঠাৎ দাদা আসিয়াছেন। মায়ের মাথার অসুখটা আবার বাড়িয়াছে। আজ সকালে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে দেখিতে চান। সেজন্য ছেলে-মেয়েদের লইয়া দাদার সঙ্গে আমি দু'টার গাড়ীতে শ্রীরপুর যাইতেছি। লক্ষ্মীটি, রাগ করিও না। এই বিপদ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তুমি ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে রাত্রের গাড়ীতে যাইতে হয়। তাহাতে অনেক রাত্রে সেখানে পৌঁছিতে হয়। আমি তিন-চারদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

রান্নাঘরের 'সিকা'র উপর তোমার জলখাবারের পরোটা রহিল। কাগজে জড়ানো সন্দেশও চার পয়সার কিনিয়া রাখিয়া গেলাম। কুঁজায় জল ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছি। আজ রাত্রে দোকান হইতে খাবার আনিয়া লইও। কাল সকাল হইতে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা মাসীমার কাছে করিয়া গেলাম। গয়লা দুধ দিয়া গেলে বেশী দুধ লইবার দরকার নাই, কেবল তোমার চায়ের জন্য অল্প একটু দুধ লইও। ইতি,

সুরমা"

আবার পুনশ্চ দিয়া লিখিয়াছে—

"বুঁচুরাণীর আজ আর জ্বর আসে নাই। মুখুয্যে-কর্ত্তার হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ফল হইয়াছে।"

বেশ চিঠিখানি। ঠিক সাহিত্য বলা চলে না, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিতেই ত্রুটি হয় নাই। সুরমা তাহার পীড়িতা মাতাকে দেখিতে গেল বটে, কিন্তু দুধেরও যাহাতে অপচয় না ঘটে, সে সম্বন্ধেও সাবধান করিয়া দিয়াছে। জলখাবারের পরোটা এবং চার পয়সার সন্দেশ—সে ব্যবস্থাও দু'টার গাড়ী ধরিবার পূর্ব্বেই করা হইয়া গিয়াছে।

যাক্, সংসারের কোলাহল এবং দুশ্চিন্তা হইতে তবু তিনটা দিনের জন্যও মুক্তি!

কাঁদামাখা জামাটায় সাবান আজ নিজেই দিতে হইবে। কাল দশটার পূর্ব্বে না শুকাইলে অসুবিধার একশেষ। কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেওয়া এবং যথাসময়ে তোলা এ কার্য্যও এ কয়দিন আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাক্, অসুবিধা হইবে বটে, কিন্তু তবুও স্বস্তি!

পরোটা অনেকগুলি রহিয়াছে। কি দরকার আর রাত্রে দোকান হইতে খাবার কিনিবার? এখন খাওয়ারই বা কি প্রয়োজন? রাত্রের জন্য এগুলি রাখিয়া দিলেই তো যথেষ্ট।

চা প্রস্তুত করাটা একটু অসুবিধা বটে। ষ্টোভটা নাড়িয়া দেখা গেল—তৈল নাই। এটা বোধ হয় সুরমার নজর এড়াইয়াছে। এখন তেলের বোতল হাতে করিয়া এই কাদামাখা জামা গায়ে দিয়া সারাদিন অফিসের খাটুনির পর আবার দোকানে যাওয়া ঝকমারিই বটে। মনীষিরা সতই বলিয়াছেন, 'চা-ই দেশের সর্ব্বনাশ করিল।' চা খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না? আজ হইতেই তাহার পরীক্ষা করিলে ক্ষতি কি?

জামাটা ছাড়িয়া, হাতমুখ ধুইয়া নির্ম্মল অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল—

নির্জ্জন ঘর। চেঁচামেচি নাই, ছেলেমেয়েদের কোনো গণ্ডগোল, কোনো কোলাহল নাই—একেবারে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান! খেঁদা অঙ্ক বুঝাইয়া লইতে আসিবে না, নেপার ইংরাজী বানান সংশোধন করিবার প্রয়োজন আজ আর নাই, তাহার ক্রমাগত ভুলের শাস্তিস্বরূপ চড় মারিবার আবশ্যকতা হইতেও সে আজ মুক্ত! পথে আসিবার সময় সে প্রার্থনা করিয়াছিল শান্তি।—সেই শান্তি আজ তাহার গৃহে বিরাজমান!

কিন্তু চিন্তা তো যায় না। একটু ঠাণ্ডা পড়িতে সুরু করিয়াছে, ঋতু পরিবর্ত্তনের এই সময়টা বড়ই বিশ্রী। খেঁদাটা হয় তো সেই পল্লীগ্রামে যাইয়া খালি গায়ে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। তারপর পাড়াগাঁয়ের মশা—এনোফিলিস—জ্বর—তারপর ফিরিয়া আসিলে আবার তাহাকেই ছুটিতে হইবে ডাক্তার এবং ডাক্তারখানার সন্ধানে। নেপা তো গাছে উঠিতে পাইলে আর কিছুই চাহে না। গাছের অভাব কোন পল্লীগ্রামেই নাই; সুতরাং

সে যে অক্ষতদেহে ফিরিবে না, এটা বেশ বোঝা যাইতেছে। বুঁচুর পালা জ্বর সবেমাত্র আজ বন্ধ হইয়াছে, সেই পল্লীগ্রামের হাওয়া খানিকটা সঞ্চয় করিয়া আসিলেই হয় তো পালাজ্বরের পরিবর্ত্তে কালাজ্বর দাঁড়াইবে।

আচ্ছা, কি দরকার ছিল সুরমার তাড়াতাড়ি সেখানে যাওয়ার? তাহার মায়ের মাথার অসুখ তো অনেক দিন হইতেই আছে, অজ্ঞান হইয়া পড়াও আজ নূতন নয়, তবে আজ হঠাৎ এতখানি দুশ্চিন্তার মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া সেখানে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

কেবল কি দুশ্চিন্তাতেই শেষ? অসুবিধা কি কম? কাদামাখা জামাটা নিজে কাচিতে হইবে, ঘর পরিষ্কারও নিজেরই করিতে হইবে, চা খাওয়া হইল না—হাই উঠিতেছে। দুধ কতখানি লইতে হইবে, সেও এক সমস্যা, কেরাসিন তৈল আনাও এক বিরক্তিকর ব্যাপার। কি দরকার ছিল সেখানে যাওয়ার?

এক স্বামীজি 'বৈরাগ-সাধন' সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। বহুবাজারের এক রোয়াকে সাজাইয়া এক ব্যক্তি বিক্রয় করিতেছিল, ছয় আনা দিয়া নির্ম্মল সেখানি কিনিয়াছে। বইখানি খুলিয়া বসিল। নাঃ, ভাল লাগে না! হিমালয়ের অরণ্যে নিভৃত সাধন, তিব্বতের বৌদ্ধমঠে যোগের বিশেষ প্রক্রিয়ার অভ্যাস, গঙ্গোত্তরীর এক গুহায় হঠযোগ সাধন—ভাল ভাল কথা। কিন্তু অক্ষরগুলা চোখের সামনে কিল্‌বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। অত ভাল ভাল কথাতেও মন বসিতে চায় না। মনের মধ্যে কেবলই উদয় হয়—এ কি অসুবিধায় পড়া গেল!

খাওয়া-দাওয়ারও অসুবিধার একশেষ! মুখুয্যে-মাসীমা কি তাহার খাওয়া-দাওয়ার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু জানেন?

সুরমা হয় তো এতক্ষণে তাহার মায়ের কাছে বসিয়া মাথাঘোরার ব্যবস্থা করিতেছে। বুঁচু হয় তো জ্বর গায়ে একা গিয়াছে পুকুর পাড়ে। পিছল ঘাট—পা হড়কাইয়া যদি জলে পড়িয়া যায়, কেহ জানিতেও পারিবে না। কি দরকার ছিল সুরমার তাড়াতাড়ি সেখানে যাওয়ার? এখানকার সহস্র অসুবিধা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে তাহাকে রাখিয়া সেখানে গিয়া সে উপস্থিত হইলেই তাহার মায়ের মাথাঘোরার কি উপশম হইবে? নাঃ, আর পারা যায় না!

মুখুয্যে-গিন্নী ডাকিলেন, "বাবা, নির্ম্মল!"

"কি মাসীমা?"

"তোমার চা করে এনেছি বাবা।"

আঃ, কি তৃপ্তির সংবাদ! মুখুয্যে-গিন্নী সুরমার হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

চা প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিস্বাদ, তেতো, মিষ্টি এবং দুধের অসামঞ্জস্য! সুরমা যে রকম চা প্রস্তুত করে—আবার মনে হইল যে, সুরমা হঠাৎ চলিয়া গিয়া যেন সারা বাড়ীটাকেই ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে।

স্তব্ধ নির্জ্জনতা। ভাল লাগে না। ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কোলাহল, তার মধ্যে অসুবিধা ও বিরক্তি কিছু থাকিলেও এ বদ্ধ নির্জ্জনতা যেন একটা মস্ত শাস্তি।

মুখুয্যে-গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরোটা করে তোলা ছিল 'সিকে'য়, খেয়েছো তো?"

মিথ্যা কথাটা বলা যায় না। সত্য কারণটাও বলিতে বাধে। বিরক্তি! বিরক্তি! 'বৈরাগ্য-সাধন' বইখানা আবার খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সংসারকে লোষ্ট্র খণ্ডের মত বর্জ্জন করিবার প্রায় আ'ড়াই পাতা ব্যবস্থা। হাসি পায়। সুরমা এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র গিয়াছে, ইহারই মধ্যে বৈরাগ্যের আস্বাদন সে পাইয়াছে। মাথায় থাকুন হিমালয়, গঙ্গোত্তরীর গুহা, বরং রেলের 'কন্‌সেসন্' পাইলে পরে একবার ঘুরিয়া আসা যাইবে, কিন্তু আপাততঃ কাল অফিস কামাই করিয়া পীরপুরে যাইয়া সুরমাকে লইয়া না আসিলে তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে।

পরোটা এবং সন্দেশ—তরকারীও ছিল অনেক। রাত্রের আহারের জন্য দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইল না। কিন্তু ঘুম আর আসে না। 'বৈরাগ্য-সাধন' বইখানার অক্ষর-গুলা যেন পিঁপড়ার সার চলিয়াছে, এক লাইনও পড়িতে গেলে যেন মাথা ধরিয়া যায়। মনের সম্মুখে কেবলই নানা দুশ্চিন্তার ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠে। বুঁচু যদি

পুকুরে পড়িয়া যায়, নেপা যদি গাছ হইতে পড়িয়া হাত ভাঙ্গে?—না! রাত্রি আর কত?

ঘড়িটা খুলিয়া দেখিল, রাত্রি মাত্র সাড়ে দশটা। ভোর হইতে এখনও সাত আট ঘণ্টা দেরী।

বাহিরের দরজায় আবার কড়া নাড়ে কে? বিরক্ত করিয়া মারিল!

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কলরব। মস্ত একটা ঝুড়ি মাটিতে রাখিবার শব্দ। দেখা গেল, কতকগুলি তরিতরকারীর অগ্রভাগ ছেঁড়া চটের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। খেঁদা, নেপা, বুঁচু, খুকু সব হৈহৈ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। পিছনে সুরমা ও তাহার দাদা। মৃত বাড়ীখানা যেন মুহূর্ত্তে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নির্ম্মলের সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ দেখা দিল। আনন্দ শিহরণ! তৃপ্তির শিহরণ!

সুরমা বলিল, "রাত ন'টার গাড়ীতেই চলে এলাম। মা এখন বেশ সাম্‌লে উঠেছেন। যেমন মাঝে মাঝে হয়, তেমনি আর কি। দাদার যেমন কাণ্ড! সাত তাড়াতাড়ি আমাকে নিতে ছুটে এলেন। বাবাঃ, আমি তো আর ভেবে বাঁচি নে!"

"নেপা হাত পা ভাঙ্গেনি তো! বুঁচু পুকুরে—"

"কেন হাত পা ভাঙ্গতে যাবে কেন? নেশা করেছো না কি? তুমি ঘুমোও নি যে এত রাত্তির পর্য্যন্ত? বই পড়া হচ্ছিল বুঝি? কি বই?"

বইখানা বিছানার তলায় সরাইয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা নির্ম্মল করিতেছিল, সুরমা বইখানা লইয়া পাতা উল্‌টাইয়া বলিল, "বৈরাগ্য-সাধন?—বই আর খুঁজে পেলে না সংসারে?"

নির্ম্মল মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিল।

মায়ের মাথার রোগ বোধ হয় সুরমাকেও পাইয়াছে। হাসিবার কি আছে ইহাতে? সুরমা হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কেবল তাহাই নয়, ছয় আনা দিয়া সেইদিনই কেনা হইয়াছে বইখানা, তাহার আনকোরা নূতন মলাটখানা সে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

পাগল সুরমা!

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

কল্পনা নয় সত্য

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম্-আর-এ-এস্

'গল্প-লহরী'র সম্পাদক-মহাশয়ের আহ্বানে সে-দিন নাট্যশালা-সম্বন্ধীয় দু'-একটা ঘটনা-চিত্রে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃত-প্রসঙ্গ আলাপ করিয়াছি, তাহা আশ্বিন (১৩৪৩) সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। এবার মহাপূজা কার্ত্তিক মাসে—তাই পূজার সংখ্যায় ছোটখাট একটা কিছু দেওয়া উচিৎ মনে করিয়া সামান্য কিছু পরিবেশন করিলাম।

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা, যখন মহাকবি গিরিশচন্দ্র সবেমাত্র রামকৃষ্ণ-লোকে আশ্রয় লইয়াছেন। এবারকার 'ভারতবর্ষে'র, আশ্বিন, ১৩৪৩ সালের প্রচ্ছদ-পটে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, গ্রন্থকার ও সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সৌম্য মূর্ত্তিখানি আঁকা রহিয়াছে দেখিলাম—তাই তাঁহার কথা স্মরণ-পথে আসিয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্রের তিরোভাবের পর দেশবাসী যখন নানা প্রকারে তাঁহার কীর্ত্তিরাশি স্মরণপূর্ব্বক তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের স্তুতিগানে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, নানা স্থানে সভা-সমিতিতে, পত্র-পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের যশোগান সসম্ভ্রমে গীত হইতেছে, শ্রদ্ধাবনত শিরে দেশবাসী তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অমর অবদানের বিষয় আলোচনা করিতেছে, তখন শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত 'নব্য-ভারত' নামক বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রে মহাকবির উদ্দেশে সম্পাদকীয় মন্তব্যে যথোপযুক্তভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হইল—মনীষীর লেখা, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার চির-অনুরাগী আমরা, আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত উহা পাঠ করিলাম। কিন্তু একটা স্থানে, কি জানি কোন্ অসতর্কতায়, বিস্মৃতি-বশে বা অজ্ঞানতায় একটা অসংলগ্ন অসত্য সেই স্মৃতি-তর্পণের অঞ্জলিতে দেখিতে পাইলাম। সেটী এই—"গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্য!" শরীর মন শিহরিত হইয়া উঠিল। মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—এটা কি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবী-কুল-ধুরন্ধর সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ দেবাপ্রসন্নের রচনা! চুপ করিয়া থাকিলে ঐরূপ একটা নির্জ্জলা মিথ্যা বা সত্যের অপলাপ অতবড় লোকের, অর্থাৎ বরেণ্য সাহিত্যিকের সম্পাদিত সুবিখ্যাত প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠ পত্রিকায় থাকিয়া যায়—এবং ফলে পরবর্ত্তী কালের সংবাদ বা মাসিক-পত্র হইতে মাল-মসলা সংগ্রহকারী, তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা প্রবলভাবে ঐ সত্য-প্রচার করিয়া প্রকৃত সত্যের শ্রাদ্ধ করিবে—এই ভয়ে উহা পাঠ মাত্রই আমরা শ্রদ্ধেয় 'নব্য-ভারত' সম্পাদক-মহাশয়কে ঐ অসতর্কিত আলোচনার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে কিছু খাঁটী ঐতিহাসিক বিবরণ-সহ এক সুমিষ্ট পত্রাঘাত করিলাম। সে পত্রখানির উত্তরে শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্নবাবু ১৯-এ চৈত্র, ১৩১৮ (গিরিশচন্দ্রের তিরোভাবের বৎসর) নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠান :—

Babu Kiran Chandra Dutt.
1, Ramkanto Bose's Ist Lane, (Bagbazar.)

২১০।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
১৯ চৈত্র ১৩১৮। কলিকাতা

সসম্মান নিবেদন,

আপনার অনুগ্রহপূর্ণ পত্র পাইলাম। আপনার মন্তব্যে বড়ই লজ্জিত হইলাম। আমি সামান্য ব্যক্তি, এ মন্তব্যের অযোগ্য।

আমি গিরিশচন্দ্রের অনুগত ব্যক্তি। তাঁহার প্রতিভার একান্ত পক্ষপাতী, তাহাই লিখিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুবাবু হইতে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করি নাই। পরবর্ত্তী বলিয়া শিষ্য বলিয়াছি, অন্য অর্থে নহে। যেমন আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য। অনেক পূর্ব্বে (১৮৭২ খৃঃ) যখন জোড়াসাঁকো ন্যাসন্যাল থিয়েটার হয়, তখন নীলদর্পণের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা

আজও ভুলি নাই। চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে। তখন গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয় হয় নাই। আমাকে আমি অভ্রান্ত মনে করি না। আপনিও অর্দ্ধেন্দুকে Senior বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। তবে আর গোল কোথায়? ইহা ছাড়া অন্য কিছুই বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে জন্য যদি কষ্ট পাইয়া থাকেন, ক্ষমা চাই। নচেৎ যদি প্রতিবাদ করেন, ছাপাইব। কিন্তু তাহার উত্তরও দিতে হইবে। তাহা এই সময়ে প্রার্থনীয় কি না বিবেচনা করিবেন।

আপনাদের অনুগত
শ্রীদেবীপ্রসন্ন

কিন্তু ঐ পত্রের মধ্যে যে দুইটী স্থলে কয়েকটি শব্দের নীচে কসি টানিয়া দিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ দেখিবেন যে, প্রথম স্থলে যুক্তির পরিপাট্য ত নাই-ই এবং সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কোন ব্যাপারের প্রথম প্রবর্ত্তক বা পথ-প্রদর্শককে 'পাইয়োনিয়র' ও তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণকারীদের 'ফলোয়ার' বলা যাইতে পারে, কিন্তু অমুক এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর পূর্ব্বে একটা কোন কর্ম্মে হাত দিয়াছিল বলিয়া ও পরে অপর ব্যক্তি সেই কার্য্যে ঢুকিলেই তাহার শিষ্য হইয়া যাইবে এবং প্রথম ব্যক্তি গুরু হইয়া যাইবে—কথাটা কি যুক্তিযুক্ত?

দেবীপ্রসন্নবাবুর উপরোক্ত প্রথম পত্রখানি পাইয়াও আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না—কেন না, উহাতে ভীতি-প্রদর্শন করা হইয়াছে। সত্য-প্রচারে ভয় পাওয়া উচিত নহে, তাই সেইদিনই, তৎক্ষণাৎ গিরিশচন্দ্রের সহিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের সম্বন্ধ, আলাপ,—প্রথম দেখা হইতে পরে বাগবাজারের 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ে মিলন—এবং তৎপূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর কর্ত্তৃক পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাটীতে অভিনীত 'বুঝ্‌লে কি না' নামক প্রহসনের 'উতোর' গাওয়া হিসাবে কয়লাঘাটার (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অভিনীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনের একটী ভূমিকা লইয়া অভিনয় করার কথা (১৮৬৭ খৃ) এবং সেই সময় বাগবাজারের 'শর্ম্মিষ্ঠা' গীতাভিনয়-দলের প্রতিষ্ঠা ও গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাহার পরিচালনের বিবরণ এবং উক্ত নাটকের গীত-রচনাদির বিষয় বিশেষভাবে লিখিয়া এক উত্তর-পত্র পাঠাইতে বাধ্য হই। কিন্তু সুধিবর দেবীপ্রসন্নবাবুও সৌজন্যের আধার ছিলেন বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আমাদের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠাইয়া দেন।

Babu Kiran Chandra Dutt
1, Ram Kanta Bos 1st. Lane.
(Bagbazar.)

নব্যভারত কার্য্যালয়,
২১০।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
২০শে চৈত্র ১৩১৮।

সসম্মান নিবেদন,

আপনার কৃপাপূর্ণ পত্র পাইলাম। "শিষ্য" শব্দ আপনারা অন্য অর্থে গ্রহণ করিবেন না। আপনি অর্দ্ধেন্দু-বাবুকে Senior স্বীকার করিতেছেন, তাহাই আমি আগামী বারের সম্পাদকের মন্তব্য লিখিয়া "শিষ্য" শব্দ প্রত্যাহার করিব। শোকের দিনে অপ্রিয় সমালোচনা ভাল নয়। তাঁহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, তাঁহার জন্য আপনি এত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনি দয়া করিয়া যে পুস্তক পাঠাইয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম। বিধাতা আপনার শুভ ইচ্ছার জন্য পুরস্কার বিধান করুন।

অনুগত
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

কিন্তু এই পত্রের কসিটানা পংক্তি কয়টির দিকে লক্ষ্য রাখিলেই বুঝিবেন যে, প্রথমবারের 'অগ্রবর্ত্তী' এবং 'পরবর্ত্তী' এবার 'সিনিয়ার' ও 'জুনিয়ার'-এ পরিণত হইয়াছে —'পাইয়োনিয়র' ও 'ফলোয়ার' হয় নাই, বা ইহার কোনটীতেই 'গুরু' ও 'শিষ্য' এইরূপ পদ ব্যবহার করা যায় না। যাহা হউক, সম্পাদকের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বসিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ 'শিষ্য' শব্দটী প্রত্যাহারের বিষয় পরবর্ত্তীতে ত নয়ই, পর-পর দুই-চারিখানি সংখ্যার 'নব্য-ভারতে'ও খুঁজিয়া পাই নাই—বোধ হয় কোন প্রবন্ধ মধ্যে উহা এমন অবস্থায় নিহিত ছিল যে, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সে জন্য আমরা আর মাথা ঘামাই নাই—কারণ, শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্বহস্তের লেখা এই পত্র দুইখানি আমার নিকট বরাবরই সমাদরে রক্ষিত ছিল—এতকাল পরে উহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

দ্বাদশ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ { অষ্টম সংখ্যা

বন-হরিণী

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

কমলা বহুকাল পরে শ্বশুর-বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল। তাহার বিবাহ হইয়াছে হরিপালের ভট্টাচার্য্যি-দের বাড়ী। ও অঞ্চলে হরিপালের বাবুদের বাড়ী বলিলেই সবাই বুঝিতে পারে, আর অধিক ব্যাখ্যার আবশ্যক হয় না। তাহারাই ওখানকার সাবেক কালের জমিদার, মস্ত বনেদী বংশ। এখনও পর্য্যন্ত সব একঅন্নেই আছে। দোল-দুর্গোৎসব, বারমাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই থাকে। একে বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে, তাহার উপর জমিদার-বাড়ীর বউ, বাপের বাড়ী তাহার একটু বেশী আদর-যত্ন হইতেই পারে। মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিলেন দেখিয়া সে কলতলায় যে ছোট বালতিটা বসান ছিল, জলশুদ্ধ সেই বালতিটা আনিতেছিল। মা হঠাৎ দেখিতে পাইয়া 'হাঁ হাঁ' করিতে করিতে ছুটিয়া যান,—না বাবু, এ মেয়েকে বুঝিয়ে আর পারলাম না; হ্যাঁ লা কমলি, তোকে যে ক'দিন ধরে পইপই করে বল্‌ছি যে, পেটে একটা রয়েছে, একটু সাবধান হয়ে চ', তা' সে কথা কি কিছুতেই কাণে উঠ্‌ছে না; তোকে ও মদ্দানি করতে কে বল্‌লে বল্‌ ত'?

তিনি তাহার হাত হইতে বালতি কাড়িয়া লন; তাহার পর অনুচ্চস্বরে নিজের মনে-মনেই বলেন,—সুভালাভালি একখানকার জিনিষ দু'খান হ'লেই সত্য-নারা'ণের সিন্নী দেব।

কমলা মুখ টিপিয়া টিপিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া হাসে; বলে,—এর মধ্যেই মায়ের যেন সব বাড়াবাড়ি।

সেদিন সকালে সরোজ নিজের ঘরটিতে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া অলসভাবে গুণ্‌গুণ্ করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছিল। কমলা একটা

কাঁথা সেলাই করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। সরোজ কমলা অপেক্ষা মাত্র বছর দুয়েকের বড় হইবে বোধ হয়।

—কিরে কম্‌লি, কি মনে করে? বোস্। শুন্‌ছি না কি, তুই মঙ্গলবার দিন চলে যাচ্ছিস্?

—হ্যাঁ দাদা; ও ছাড়া ত' এর মধ্যে ভাল দিন নেই; তারপর আবার চোত মাস পড়বে যে।

সরোজ শুধু 'ও' বলিয়া জানালা দিয়া তাহার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করিয়া দিয়া বসিয়া থাকে।

কমলা বলে,—আচ্ছা দাদা, আমার জন্ত কি তোমার একটুও মন কেমন করে না?

—করে বই কিরে।

—হ্যাঁ, ছাই করে! করে যদি ত' একবারও গরিব বোনের ওখানে পায়ের ধুলো ত' দাও না।

সরোজ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠে; বলে,—তুই যে খুব পাকা পাকা কথা শিখেছিস রে কম্‌লি! আচ্ছা, আচ্ছা, তোর ছেলেটেলে হ'লে তারপর একদিন দেখ্‌তে যাওয়া যাবে—কি বলিস্?

কমলা মুখ রাঙা করিয়া বলে,—ধ্যেৎ, তাই যেন বল্‌ছি!

সরোজ অভিমানের অভিনয় করিয়া বলে,—ও তা' হলে তুই বারণ কর্‌ছিস? তা' বেশ। দরকারই বা কি বাবা; একে জমিদার-বাড়ী; আমরা হলাম গরিব-সরিব মানুষ।

—বারে, আমি যেন তাই বল্‌লাম।

—তবে তুই কি বল্‌লি?

—আমি বরং বল্‌ছি যে, প্রত্যেক বছর পুজোর সময় আর সকলে তবু যায়, তুমি ত' একবারও যাও না। এবার কিন্তু দাদা, তোমার যাওয়া চাই-ই; না বল্‌লে আমি শুনবো না।

কমলা দাদার মুখের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া আবদারের সুরে বলে,—বলো, এবার যাবে?

সরোজ নিজের দর বাড়াইবার ভঙ্গীতে বলে,—আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।

—না, না, দেখা যাবে নয়; যেতেই হবে। আচ্ছা, কেন, ওখানে যেতে তোমার কি হয় দাদা? সত্যি তোমরা পুরুষ মানুষেরা কি করে এত সহজে যে সব ভুলে যাও, তাই ভাবি; আমরা ত' পারি না।

—নাঃ, তা' কি আর পারিস?

—সত্যি দাদা, বল্‌লে বিশ্বাস করবে না; বিয়ের পর প্রথম প্রথম তোমাদের কথা কেবল রাতদিন মনে পড়ত, আর চোখের জল যেন আর বাগ মান্‌ত না।

শৈশবের বহু পুরাতন বিস্মৃত সুখের দিনগুলি মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে; কমলার চোখ দুইটি সত্যই যেন ছল্‌ছল্ করিতে থাকে।

ছোট বোন্‌টির সঙ্গে 'খুন্‌সুটি' করা সরোজের চিরকালের স্বভাব; সে একটু খোঁচা দিয়া বলে,—ও, বিয়ের পর নতুন নতুন আমাদের কথা মনে পড়ত? তবু আমাদের ভাগ্যি; তা' এখন বোধ হয় আর পড়ে না, নারে?

—না, পড়ে না বই কি। আচ্ছা দাদা, ছোটবেলাকার কথা তোমার সব মনে পড়ে? আমরা দু'জনেই বেশীর ভাগ একসঙ্গে খেলতাম—না? আমাদের আর কোন সঙ্গী বড় কেউ ছিল না। আর তখন ত' আমাদের এখনকার মত কোলকাতার বাসা হয় নি; খড়দাতেই থাক্‌তাম। তুমি সেই তেলাকুচোর ফল, আশশেওড়ার ফল, পটপটির ফুল, আরও কত কি সব নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দোকান খুলে বস্‌তে, আর আমি খোলাম কুচির পয়সা দিয়ে সেই সব কিনে এনে ছোট্ট বঁটিতে কুট্‌নো কুটে ধুলো-বালির মশলা দিয়ে রান্না করতাম; সে সব মনে পড়ে?

শৈশবের স্মৃতির সত্যই একটা মোহ আছে। এমন কি, বৃদ্ধ বয়সেও সেই বহু পুরাতন অথচ চির নূতন স্মৃতির কথা মনে করিলে, ক্ষণকালের জন্ত যেন সেই হারানো দিনগুলি ফিরিয়া পাওয়া যায়।

কমলার বাল্যস্মৃতি সরোজের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল; সে হাসিয়া বলিল,—মনে পড়ে বই কি; মনে হয়, এই ত' সেদিনকার কথা! তোর মনে পড়ে, ছাদ থেকে আচার চুরি করে খাওয়া? সেই শেষকালে ধরা পড়ে গিয়ে মায়ের কাছে আমি খেলাম বেদম প্রহার, আর তুই গেলি পালিয়ে—মনে পড়ে?

পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া দু'জনেই শিশুর মত সরলভাবে হাসিতে থাকে।

কমলা বলে,—তার পরের কথা বোধ হয় তোমার মনে নেই? মা তোমাকে ছোট্ট 'গজের ঘরে' বন্ধ করে দোরে শেকুল দিয়ে চলে গেলেন; তারপর খানিক বাদে আমি এসে দোরের ফাঁক দিয়ে তোমাকে ডাক্‌লাম; তুমি তখন মুখখানা খুব ভার করে বসে আছ; বোধ হয় আমার ওপর খুব রাগ হয়েছিল। আমি বল্‌লাম,—ভাই, কথা কইবে না? তুমি বল্‌লে,—কইব, তুই দোরটা খুলে দে। আমি বল্‌লাম,—বারে, আমি খুলে দেব, আমি কি শেকলে হাত পাই? তুমিও দোরের ফাঁকে মুখ দিয়ে চুপি-চুপি বল্‌লে,—আচ্ছা, একটা কাজ যদি করিস ত' হয়; ওদিকে যে ভাঙা চেয়ারটা আছে, সেইটে আস্তে আস্তে টেনে এনে তার ওপর উঠে—আমি বললাম,—মা যদি টের পায় ভাই? তুমি বল্‌লে,—দূর, টের পাবে কেন পোড়ারমুখী; আস্তে আস্তে দেখ্‌ না, মা বোধ হয় ঘাটে গেছে। লক্ষ্মীটি! আচ্ছা, যদি খুলে দিতে পারিস ত' তোকে চৌধুরী-পাড়ায় 'ধুমো কার্ত্তিক' দেখ্‌তে নিয়ে যাব—এক্ষুণি। তারপর যে কথা, সেই কাজ। ছোট-বেলায় আমিও ত' গাছমদ্দা কম ছিলাম না। দোর খুলে দু'জনেই হাওয়া।

খুসীর আনন্দে তখন ভাই-বোন্‌ উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিতে থাকে।

—আচ্ছা, হ্যাঁরে কম্‌লি, একটা সত্যি কথা বল্‌বি? তখনকার সেই সব দিনগুলো ভাল ছিল, না এখনকার—

—সে আবার জিগ্যেস করছো? সে দিনগুলো যদি আবার ফিরে পেতাম! আবার যদি তোমার সঙ্গে সেই রকম করে একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গঙ্গা-যমুনা খেল্‌তে পারতাম! সত্যি দাদা, মেয়েগুলো সব খেলে দেখে আমার যেন হিংসে হয়।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

—আচ্ছা দাদা, সেই তুমি কি করে এমন হয়ে গেলে? চিঠির ওপর চিঠি দিলেও, একবারটি ওখানে গিয়ে দেখাটা দিয়ে আসতে পার না? এবার কিন্তু তোমায় পুজোর সময় না নিয়ে গিয়ে ছাড়বো না, তা' বলে দিচ্ছি।

নীচে হইতে মায়ের গলা শোনা যায়,—কমলি, ও কম্‌লি, আয় মা, আয়; বেলা যে পড়ে গেল; চুলটা বেঁধে দি', আয়।

—যাই মা বলিয়া কমলা চলিয়া গেল।

সরোজ বাল্য-স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, উন্মনা হইয়া। তখন অস্তমান সূর্য্যও পশ্চিমের ত্রিতল বাড়ীটার ছাদের আড়ালে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

মাস পাঁচ ছয় পরের কথা।

ভাদ্রমাস। দুপুর হইতে সেই যে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, আর এখন বেলা ছয়টা বাজে, একই ভাবে বর্ষণ চলিয়াছে। ঠনঠনিয়ার কালীতলার রাস্তায় এতক্ষণ বোধ হয় নৌকা চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। সরোজ অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে—রবিবারের ছুটিটা তাহার একেবারেই মাটি হইয়া গেল। বৃষ্টি আরম্ভ হইবার একটু আগে বাহির হইয়া পড়িতে পারিলে, অন্ততঃ ক্লাবে গিয়া বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়া এমন বর্ষণ-মুখর অপরাহ্ণটা মন্দ কাটিত না। কে জানিত যে, এমনভাবে আকাশ আজ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সকালটায় ত' বড়বাজারের পোস্তায় পোস্তায় ঘুরিয়া তত্ত্বের জিনিষ-পত্র সওদা করিতেই কাটিয়া গিয়াছে। নাঃ, এইজন্যই লোকে এটাকে পচা ভাদ্দর বলে।

সে ঘরের কোণ হইতে হারমোনিয়ামটা টানিয়া বাহির করিয়া নেহাৎ যেন সময় কাটাইবার জন্যই গান ধরিল,—

"বর্ষা রাতের শেষে,
সজল মেঘের কোমল কালো অরুণ আলোয় মেশে।"

আজ সে যেন সত্যই নিজের গানে নিজেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেই একই গান একবার, দুইবার, তিনবার গাহিল, তবুও যেন আবার গাহিতে ইচ্ছা করে। বাহিরে বৃষ্টি কখন থামিয়া গিয়াছে, সে

জানিতেও পারে নাই। হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা কলরব শুনিয়া সে উঠিয়া পড়িল। কমলাদের বাড়ী যাহারা সাধের তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল, সব ফিরিয়া আসিয়াছে। এই দুর্য্যোগে তাহাদের কাহার কত কষ্ট হইয়াছে, কে কতটা ভিজিয়া গিয়াছে, রাস্তায় কতটা জল জমিয়াছিল, সেই কথা বলিতেই তাহারা ব্যস্ত। এই গোলমালের মধ্যে মা শুধু বাড়ীর বুড়ী ঝিকে আড়ালে ডাকিয়া বোধ হয় কমলার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সরোজের কাণে কেবল গুটিকতক কথার টুক্‌রা আসিয়া পৌঁছিল মাত্র।

—মা গো মা, দিদিমণির কি চেহারা হয়েছে গো! গায়ে কে যেন হলুদ মেড়ে দিয়েছে; খালি পেট সর্ব্বস্ব চেহারা; পাঁজরগুলো জিরজির করছে! আমি শুধোলাম, কেমন আছ গো দিদিমণি? শুধু একটু মুচকে হেসে সে বল্‌লে,—ভাল আছি; খালি যা' খাই, কিছু পেটে থাকে না। মাকে ভাবতে বারণ করিস।

মা জিজ্ঞাসা করে,—আমার চিঠিটা দিয়েছিলি?

ঝি কাপড়ের খুঁট হইতে দু'খানি চিঠি বাহির করিয়া একখানি দিল মাকে, আর একখানি সরোজের কাছে আনিয়া বলিল, —দাদাবাবু, দিদিমণি তোমাকে এই চিঠিখানা দিয়েছে, আর অনেক করে তোমাকে একবারটি সেখানে যেতে বলেছে।

বৈঠকখানায় গিয়া সরোজ চিঠিখানি পড়ে। গোটা গোটা অক্ষরে বাঁকাচোরা লেখা—

শ্রীচরণকমলেষু,

ভাই, দাদা, কিছুদিন হইল তোমাদের কোন খবর পাই নাই বলিয়া চিন্তিত ছিলাম, ঝিয়ের মুখে সব শুনিয়া নিশ্চিন্দ হইলাম। আমি একরকম ভাল আছি এখন; আমার জন্য মাকে ভাবিতে বারণ কোরো। শুধু একটু ঘন ঘন বমি হয়; কিছু খাইলে পেটে তাহা থ'কে না। আমি তোমাকে যে এত করিয়া এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম, কই আসিলে না ত'? একবারটি দেখা দিলে কি হয়? তোমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, বেশ ভুলে থাকো; কিন্তু বলিলে বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, আমার কিন্তু এখানে এক্কোবারে মোটেই ভাল লাগে না। কেন লাগে না, তাও জানি না। এ কথা আজ এই প্রথম শুধু তোমাকেই বলিলাম; না বলিয়া যেন থাকিতে পারিলাম না। আমার শুধু ছোটবেলাকার সেই সব পুরাণো কথা মনে পড়ে, আর তার সঙ্গে তোমার কথা। মন রাত-দিন বড় খারাপ হ'য়ে থাকে। অথচ, তোমার এই ছোট বোন্‌টির কথা সেই তুমি একবারও ভাব না—বোধ হয় বিদায় করিয়া দিয়া বাঁচিয়াছ। আবার লিখিতেছি, তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে; একটু কষ্ট কোরে একবারটি এসো। তুমি আমার নমস্কার জেনো। মাকে আলাদা চিঠি দিলাম।

ইতি,—তোমার সেই ছোটবেলাকার ছোট বোন্‌টি।

চিঠি পড়িয়া সরোজের ভারাক্রান্ত মন উদাস হইয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য তাহার মন খড়দহের সেই পুরাতন বৈঁচিবনে, ঝড়ের রাতে আম গাছতলায়, চৌধুরী-পাড়ার মাঠে, সিক্‌দারদের জামরুল গাছতলায় ছোট বোন্‌টির সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিতে থাকে। সে যেন আবার সেই মুক্ত আকাশ তলে স্নিগ্ধ সমীরণের পরশ পায়; পল্লী-বনানীর আনন্দ গুঞ্জন বুঝি কাণে ভাসিয়া আসে।

—সরোজ, সরোজ, বাড়ী আছিস না কি? আরে এই যে, বাইরের ঘরে একলাটি বসে কি হচ্ছে বাবা?

পাঁচ-ছয়জন বন্ধু আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কমলার চিঠিখানা টেবিলের উপর পড়িয়াই রহিল, পরে বাতাসে উড়িয়া নীচে পড়িল ও পরদিন ভৃত্য ঘর ঝাঁট দিবার সময় সেটাকে লইয়া আবর্জ্জনার সঙ্গে বাহিরে পথে নিক্ষেপ করিল।

সেদিন সকালে সরোজ কলেজের পড়া করিতেছিল। মা ঘরে আসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে সরোজ, তোকে এত করে বল্‌লাম, কম্‌লিকে একবারটি দেখ্‌তে গেলি না বাবা। ক'দিন তার কোনো চিঠি-পত্তর পাই নি; তার ওপর কাল রাত্তিরে এমন একটা বিচ্ছিরি কুস্বপ্ন দেখেছি যে, মনটা সারাদিন বড্ড খারাপ হয়ে আছে, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। কে জানে মেয়েটা কেমন আছে? এর

মধ্যে ছেলেপিলে হওয়ার কিই বা দরকার ছিল! ভেবে ভেবে আর পারি না!

সরোজ বলিল,—হ্যাঁ, এবার একদিন যেতেই হবে। কম্‌লি অনেক করে আমাকেও সেদিন লিখেছিল। তা' মনে করলাম,—ভাদ্দর ত' শেষ হয়েই এল, আর এবার আশ্বিনের গোড়াতেই পূজো; ক'দিন বাদে পুজোর সময় একেবারে গেলেই হবে। তাই—

মা বাধা দিয়া বলেন,—দেখ্‌ ত বাবা, বাইরে কে যেন কড়া নাড়ছে।

সরোজ 'কে' বলিয়া জোরে একটা হাঁক্ দিয়া নীচে নামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে বিমর্ষ-মুখে আসিয়া বলে,—মা, কম্‌লির দেওর সতু এসেছে। কাল শেষ রাত্তিরের দিকে কম্‌লির এক মরা ছেলে হয়েছে; কষ্টও খুব পেয়েছে। সে না কি এখন তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; তারা তাদের মোটর পাঠিয়ে দিয়েছে, তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। তুমি তাড়াতাড়ি করে একখানা ফরসা কাপড় পরে নাও। চলো, আমিও যাচ্ছি।

মা চিন্তিত হইয়া বলেন,—তা' সে এখন কেমন্—

সরোজ বাধা দিয়া বলে,—সে সব গাড়ীতে বসে শুনো অখন মা, ঢের সময় পাবে। এখন ঝাঁ করে নাও।

গাড়ী তখন সহরের রাস্তা ছাড়াইয়া নানা গ্রামের মধ্য দিয়া তীরবেগে ছুটিয়াছে।

সতু ইতিমধ্যেই সরোজকে চুপিচুপি সব কথা বলিয়াছে। সারারাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করার পর দুই-তিনজন ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টা করায় তবে কমলা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। দুই-তিনবার সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। যতবার জ্ঞান হইয়াছে, তাহার মুখে শুধু 'মা গো', আর 'দাদা গো' লাগিয়াই ছিল। সকালের দিকে সে একটু ভাল ছিল; অতি ক্ষীণ একটু হাসিয়া সে সতুকে বলিয়াছিল,—ঠাকুরপো, ভাই, একবারটি তুমি যদি আমার দাদাকে নিয়ে আস্‌তে পার,—আর মাকেও। ডাক্তারেরাও বলিয়াছেন যে, এখনও জীবনের সম্পূর্ণ ভয় রয়েছে, আত্মীয়-কুটুম্বদের খবর দেওয়া উচিত।

সরোজ সতুর পাশটিতে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া উদাস মনে কমলার কথাই ভাবিতেছিল। মা পিছনের 'সিটে' যেন এলাইয়া পড়িয়াছেন।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা হইবে, উহারা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল। কাহারা যেন সদরে ভীড় করিয়া আছে। সরোজ উৎসুকভাবে চাহিয়া দেখে। বহু শোকার্ত্ত নরনারীর মিলিত করুণ আর্ত্তনাদে তখন গগন বিদীর্ণ হইতেছে। মা পিছনের 'সিটে' একবার মা গো বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সেবার জন্য অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। সরোজ পাগলের মত ছুটিয়া কমলার ঘরে গিয়ে দেখে,—তাহার সেই বাল্য-সঙ্গিনী, ভ্রাতৃগতপ্রাণা অভিমানিনী ভগ্নী, পল্লী-মাতার স্নেহের মানস কন্যা কমলা শুইয়া আছে, জীবন-হীন, নিষ্প্রভ, যেন ঝড়ের রাতে বৃন্তচ্যুত একরাশ যুঁই ফুল। সে শুধু একবার বুকভাঙা 'উঃ' বলিয়াই কমলার দেহের উপর আছড়াইয়া পড়িল। সেইভাবে যে সে কত-ক্ষণ ছিল জানে না। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন কমলা আর ইহলোকে নাই। সে উদাস চক্ষে বাতায়ন-পথে চাহিয়া থাকে। তখন হইতে বনের মধ্যে একটা ঘুঘুপাখী একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে। সরোজের মনে শৈশব-জীবনের শত বিস্মৃত কথা জাগিতে থাকে। কমলা যেন বালিকার মূর্ত্তিতে তাহার মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহার ইচ্ছা করে ছোট বোন্‌টিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চুমায় চুমায় গালটি ভরিয়া দেয়। তাহার আকুল আন্তরিক আহ্বান বারবার প্রত্যাখ্যান করায় অভিমান-ভরে সে চলিয়া গেল। মনে পড়ে সে বলিয়া-ছিল,—তোমায় এবার পূজোর সময় ওখানে না নিয়ে গিয়ে ছাড়ব না। হ্যাঁ, সে প্রতিজ্ঞা রাখিয়াছে বটে—কিন্তু পূজার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল যে! সে ছিল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম—কৃত্রিম সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে সে বাঁচিবে কেন? খড়দহের আম বন, কাঁটাল বন, মনসা-দিঘীর আঁকাবাঁকা ঘাটের পথ তাহাদের চির-পরিচিতা সেই ক্ষুদ্র চঞ্চলা বালিকাটির কোমলপদস্পর্শের জন্য তৃষিত, লালায়িত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

গোপন অভিনয়

শ্রীরণেন্দ্র মৌলিক

তার সঙ্গে আমার আলাপ কতদিনেরই বা! চার-পাঁচ-দিনের বেশী নয়—তবু মনে হয়, আমার জীবনে তাকে কখনো ভুলতে পার্ব্বো না।…

কথাগুলি অমিতাভ বল্লে স্বপ্নাবিষ্টের মতো।

চাইলুম তার মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে।

সে বলে চল্লো—

দিনক্ষণ আমার ঠিক্ মনে নেই, তবে এইটুকু আমার স্মরণ আছে যে, সেদিন বিরহী বর্ষার নয়নাশ্রু সমস্ত আকাশ-খানায় টলটল কর্ছে। সেই বিরহের দীর্ঘশ্বাস বহন করে চলেছে পূবালী বায়ু। আর সেই মেঘ মেদুর আকাশের দিকে চেয়ে…ভবঘুরে জীবনের নেশা আমায় কর্লে মাতাল। বেরিয়ে পড়লাম ছেঁড়া সুটকেশটা হাতে করে। তখন সবেমাত্র দিনের ক্ষীণ আলো আঁধারের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

একখানা যাত্রী গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লাটফর্ম্মে। টিকিট না কেটেই উঠে পড়লাম তার একটা কামরায়। সেটা ছোট হলেও প্রায় ফাঁকা। কয়েকটী যাত্রী বিছানা পেতে প্রস্তুত হয়েই আছে; ছাড়া মাত্র লম্বা হবে।

রাত্রি তখন কত জানি না, ধাক্কা খেয়ে ঘুমটা গেল ভেঙ্গে। চেয়ে দেখি হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেকার। যদিও জানি টিকিট নেই, তবু পকেটে একবার হাত দিয়ে বল্লাম—টিকিট তো পাচ্ছি নে।

পদের গৌরবটা বজায় রেখে চেকার বল্লে—কোথায় যাবেন?

উদাস কণ্ঠে বল্লাম্—তা' কোনো ঠিক্ নেই।

—তবে এইখানেই নেবে যান।

—যে আজ্ঞে।

আমাকে নাবিয়ে দিয়ে গাড়ী চলে গেল অন্ধকারের বুক চিরে।

ছোট্ট ষ্টেশন। এতক্ষণ আলো জ্বল্ছিল। গাড়ীখানা ছাড়ামাত্র আবার সেই অন্ধকার।

একটা কুলি এধার-ওধার খানিক ঘুরে তার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করে এককোণে ছেঁড়া চটের ওপর শুয়ে পড়লো। আমিও আস্তে আস্তে হলের মধ্যে ঢুক্‌লাম।…

একখানা ভাঙা চেয়ার হলের শোভা বর্দ্ধন করে এক-কোণে পড়ে রয়েছে। তাতেই ক্লান্ত দেহখানাকে এলিয়ে দিলাম।

সীমাহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনে হলো—কেন এ অভিমান? কিসের আশায় বেরিয়ে পড়েছি? পদে পদে লাঞ্ছনা সহে, জীবনটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ানোর কি সার্থকতা?

ছারপোকার কামড়ে চিন্তার 'খেই' গেল হারিয়ে; কালটা যদিও উপযুক্ত, স্থানটা মোটেই নয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাটাও অনুভব করলাম।

একটা নিশ্বাস ফেলে অন্ধকারেই পা চালিয়ে দিলাম অজানা পথে। অন্ধকার হাতড়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে খালি মনে হতে লাগ্‌লো রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতার লাইন 'নগরের নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা।'

যদিও আমি নটী নই। যৌবন এই অন্ধকারের মতোই মনে গোপনে নিশ্চল হয়ে আছে। তবুও অন্ধকার, তারাহীন আকাশের দিকে চেয়ে মাথার ওপর তরু-বীথি-কার ছায়া পথ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে আমার মনে হলো— 'আজ এসেছে বুঝি মোর অভিসার রাত্রি।'

টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। পূবের আকাশে তখনো লাল্‌চে ভাব আসে নি। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে গতি গেল থেমে। দশ ইন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝ্‌লাম—রেলিং-ঘেরা বারান্দার সঙ্গে হয়েছে সম্ভাষণ। দুঃখের সঙ্গে আনন্দ একটু হলো আশ্রয় পাবো ভেবে।

আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়তে লাগ্‌লাম। কিছু-ক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল। তাকিয়ে দেখি আলো হাতে দাঁড়িয়ে একটী ক্ষীণ ঋজু তরুণী।

জিজ্ঞাসা করলে—কি চান্?

করুণ কণ্ঠে বল্‌লাম—আজ রাত্রের মতো একটু আশ্রয়—সকাল হলেই চলে যাবো।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সে বল্‌লে—আচ্ছা, আসুন।

আস্তে আস্তে তার সঙ্গে একটি ঘরে প্রবেশ কর্‌লাম। ওয়াল-ল্যাম্পটা জেলে দিয়ে সে বল্‌লে—আপনি একটু বসুন, আমি আস্‌ছি।

ঘরটী বেশ সুসজ্জিত ও আধুনিক রুচির পরিচায়ক। 'আপ্-টু-ডেট্' শিল্পীর অঙ্কিত কয়েকখানি রঙ্গিন ছবি দেওয়ালের গায়ে টাঙানো। ওরি একটার দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সুযোগ বুঝে আবোলতাবোল ভাবনাও আমার মগজের ভিতর প্রবেশ কর্‌লে।

জামা-কাপড় তো ভিজে গেছে, ওগুলো ছাড়বেন আসুন।

তাকিয়ে দেখি তোয়ালে, সাবান, কাপড় ইত্যাদি হাতে ক'রে মেয়েটী দাঁড়িয়ে।

চল্‌লাম তার পিছনে পিছনে। 'বাথরুম'টা দেখিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে—'কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আস্‌ছি।'

স্নান সেরে নিয়ে কাপড়টা কাচছি, এমন সময় তরুণী এসে বল্‌লে—রেখে দিন কাপড়, ঝি এসে কেচে দেবে। আপনি আসুন।

মৃদু হেসে বল্‌লাম—আমার এ সব অভ্যাস আছে। তা' ছাড়া, আবার আপনাকে বিব্রত করা তো?

—কিছু না, কিছু না, আপনি আসুন?

অগত্যা কাপড়খানা রেখে দিয়ে তার সঙ্গে যেতে হলো।

ঘরে ঢুকেই দেখি চা, খাবার ইত্যাদি।

যদিও ক্ষুধায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে, তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এ কি, এ সব কি! কেন এত কষ্ট কর্‌লেন?

—কষ্ট আর কি, ওই তো সামান্য জিনিষ; তা' ছাড়া, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। ওই যা' তা' খাবারগুলো দিতে ভারি লজ্জা কর্‌ছে। যা' হোক্—

—অনর্থক আপনাদের কষ্ট দিলাম।

—কষ্ট আর কি, বরং আপনিই কষ্ট পেলেন। বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই তো, কথাবার্ত্তা কওয়ার—

—কেন, আপনি কি একলা থাকেন?

—না, আমি বেথুন হোষ্টেলে থাকি। সম্প্রতি মায়ের অসুখ সংবাদে আজ চার-পাঁচদিন হলো বাড়ী এসেছি।

—ও, তবে কি কষ্টটাই না আপনাকে দিলাম ক্ষমা কর্‌বেন। কিন্তু আপনার মা সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যাচ্ছি না; কেন না, মানুষ মানুষের অসময়েই করে।

—না না, আপনার বড় কষ্ট হবে।

—কষ্ট আর কি। আপনি এতে আপত্তি কর্‌বেন না।

পাঁচদিন পরে।

রোগীর জ্বর সেদিন 'রেমিশন' হয়েছে। ডাক্তারের মতে ভয়ের কোন কারণ নেই। খাওয়ার পরে বসে আছি রোগীর ঘরে। ঘরের মধ্যে কোন স্পন্দন নেই—সমস্ত নিস্তব্ধ। আর সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে একটা ক্লক আপন-মনে বকে যাচ্ছে—টক্, টক্, টক্। এককোণে হ্যারিকেনটা 'ডিম্' করা ছিল। রোগী অঘোরে ঘুমাচ্ছে—অনেক যন্ত্রনার পর খানিক সুস্থতা বোধ করে।

আমি তাঁর শিয়রে বসে কত কি স্বপ্নের জাল বুনে চলেছি। কতক্ষণ যে এমনিভাবে বসে আছি তার ঠিক নেই। হঠাৎ আমার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল অরুণিমার কথায়।

—কি ভাব্‌ছেন আপন-মনে উদাসভাবে?

মুখপানে তাকাবামাত্র দেখি—তার পাতলা টুকটুকে অধরে যেন বিজলী খেলে গেল।

বল্‌লাম—যাবার কথা।

আস্তে আস্তে দীর্ঘনিশ্বাসটা বেরিয়ে এলো। তার প্রফুল্ল মুখটা মলিন করে সে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—ও।

আবার নিস্তব্ধতা। অনেকক্ষণ পরে মনে হলো, হৃদয়ের

সমস্ত অনুভূতিগুলিকে সবলে চেপে সে বল্‌লে—"আচ্ছা, বল্‌তে পারেন এই জীবনের কি সার্থকতা আছে! কি পেয়েছেন আপনি দীর্ঘকাল ঘুরে ঘুরে!

—ঠিক বল্‌তে পারি নে, তবে পেতে চাই মুক্তি—সমাজ ও সংস্কারের বন্ধন থেকে—

চাইলাম তার মুখের দিকে। যে বিজলী অধর সীমায় নিয়ে সে প্রবেশ করেছিলো, তা' অন্তর্হিত হয়েছে। মনে হলো চোখ দুটোও যেন কেমন কেমন হয়েছে।

আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে সে উঠে গেলো। নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী বিদ্রোহীর দিকে চোখ তুলে দিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

না, আর না—এইখানেই যবনিকা না টান্‌লে চাওয়া-পাওয়া সব ঘুলিয়ে যাবে।

পাঁচ বৎসর পরে।

পাহাড়ী পশ্চিমের ছোট একটী ষ্টেশন। ষ্টেশনটী ছোট হলেও বেশ দেখ্‌তে। সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ছি একটা ট্রেণের—তা' যে কোনো গাড়ীই হোক্—হয় আপ্, না হয় ডাউন। না, আবার মনে জোর করে ভেবে নিলাম ডাউনেই যাবো।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। অমনি কোথা থেকে ষ্টেশনের লাল কাঁকর বিছানো মেঝের ওপর ছুটোছুটি, চেঁচামেচি, বড় বড় মাল ফেলার ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ—যেন ষ্টেশনটা এইমাত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জেগে উঠ্‌লো একটা আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায়।

ফিরে আসছি আপন-মনে। হঠাৎ নিজের নাম শুনে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি—একটি যুবতী 'ফিমেল ইন্টারে' দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ডাক্‌ছে।

প্রথমে মনে হলো—আমাকে নয়, অপর কাকেও।

বোকার মত ইতস্ততঃ তাকাতে সুরু কর্‌লাম।

মেয়েটী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বল্‌লে—আপনাকে, আপনাকে, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌ছেন না অমিতাভ দা'?

ঘাড় তো নেড়ে ফেল্‌লাম—যা' থাকে কুল কপালে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। মৃদু হেসে বল্‌লাম—তোমাকে কি ভুল্‌তে পারি!

তার মুখের কোনো রেখার বিবর্ত্তন ঘটলো না। তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তে সে বল্‌লে—ছেঁড়া সুটকেশটার মায়া এখনও কাটাতে পারেন নি দেখ্‌ছি। তারপর কোথায় চলেছেন?—একে চিন্‌তে পারেন?

একটী ছোট শিশুকে সে কোলে টেনে নিয়ে বল্‌লে।

প্রায় না তাকিয়ে বল্‌লাম—না।

—সে কি! সকলেই যে বলে মায়ের মত দেখ্‌তে হয়েছে।

বিস্মিত হয়ে চাইলাম তার মুখের দিকে। অধরে তার মৃদু হাসি।

—ছেলেটা খুব সুন্দর হয়েছে, না অমিতাভ দা'?

উত্তর দেবার আগেই বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস! আর সেই দীর্ঘশ্বাসকে ব্যঙ্গ করে ইঞ্জিনখানা ফোঁসফোঁস করে নড়ে উঠ্‌লো।

শ্রীরণেন্দ্র মৌলিক
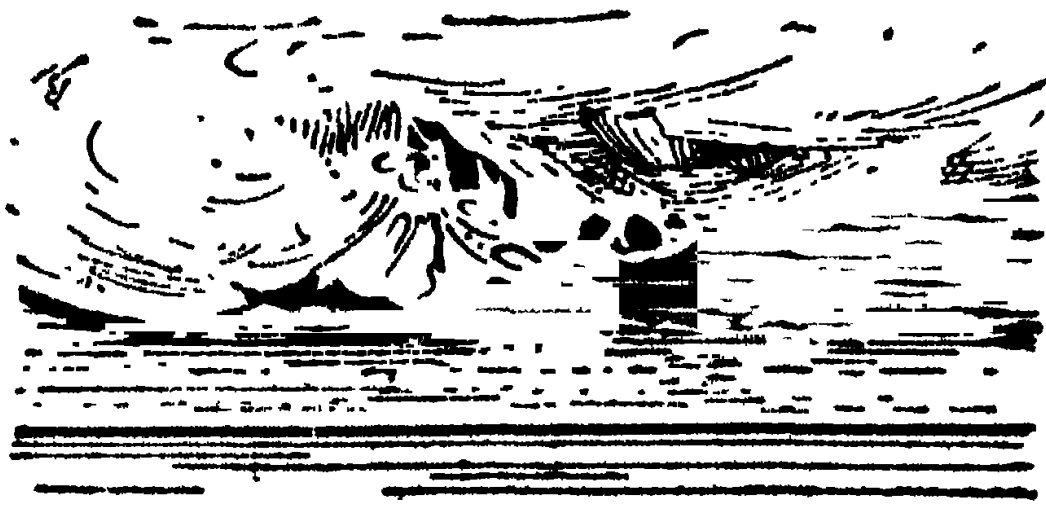
ভৌতিক গল্প
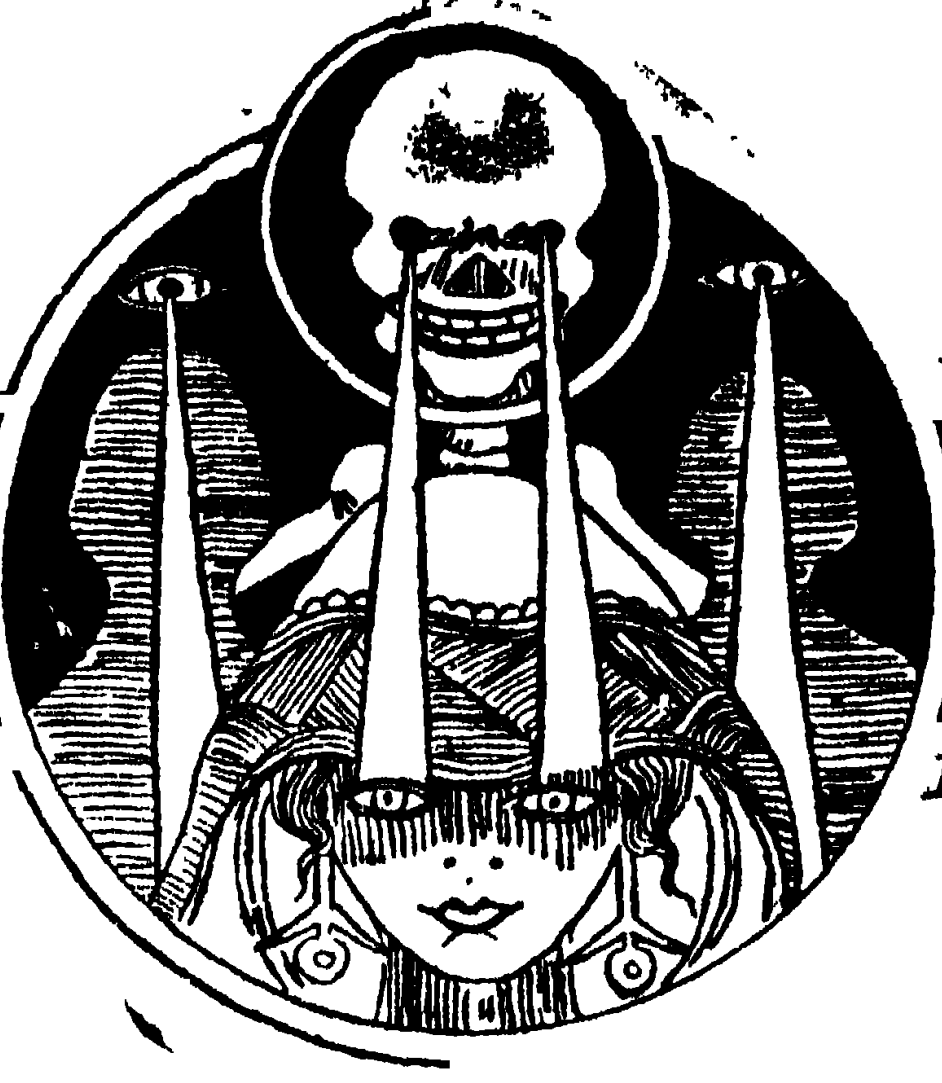
মুক্তির তৃষ্ণা

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা, বি-এস্-সি

সুশীলের আবেশ-মুগ্ধ চক্ষু দুইটী একসময় বুজিয়া আসিল।

দাদাবাবু—দাদাবাবু—ও দাদাবাবু!...

সুশীল সচকিত হইয়া চোখ মেলিয়া বিস্মিত হইল! সবিস্ময়ে কহিল, আরে হ্যাব্‌লা যে! তুই তুই কখন এলি-রে?

হ্যাব্‌লা একগাল হাসিয়া কহিল, এই ত আসছি দাদা-বাবু। বাপরে কি বৃষ্টি! আসার কি যো আছে দাদাবাবু!

সুশীল বাহিরের প্রবল বারিপাতের দিকে কিয়ৎকাল তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, মামার ওখান থেকে আস্‌ছিস্ তো—কেমন আছেন তাঁরা?

হ্যাব্‌লার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। দুইটী চক্ষুর কানায় কানায় বিষাদের কালো ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিল। ম্লানকণ্ঠে হ্যাবলা কহিল, আর কেমন আছেন! ওলাদেবী কি আর প্রাণ রেখেছেন—সব ওজাড় করে দিয়েছেন! পরশু রাতে মায়ের হয়েছিল—কাল দুপুর থেকে বাবার যা' অবস্থা, হয় ত এতক্ষণ—

সুশীল চমকিয়া উঠিল। সমস্ত অন্তর তাহার বেদনায় বিষাইয়া উঠিল। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন সুশীল জীবনে পিতামাতার স্নেহ আস্বাদন করে নাই। এই মামা আর মামীই তাহার সে অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। নিঃসন্তান মামা-মামী তাঁহাদের অন্তরের সমস্ত স্নেহটুকু নিংড়াইয়া সুশীলকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। আজ সেই মামা-মামী মরণ-পথের যাত্রী!...সুশীলের চোখ দুইটী অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

বেদনার্দ্র-কণ্ঠে সুশীল কহিল, বেঁচে আছেন ত?

হ্যাব্‌লা মুখ ফিরাইয়া কহিল, তখন ত ছিল।...

সুশীল আনমনা হইল। তাহার বুকের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত কান্নায় ভরিয়া উঠিল। সুশীলের মনে হইল, এতক্ষণ হয় ত মামা-মামী তাহার স্নেহজাল ছিন্ন করিয়া আর এক লোকে চলিয়া গিয়াছেন! সুশীল কাঁপিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মামা-মামীর মমতাভরা মুখ সে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু সে মুখ মনে পড়িল না। পরিবর্ত্তে তাহার দুইটী চোখের দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রক্তহীন বিবর্ণ অস্পষ্ট দুইটী মুখ নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভাল করিয়া চেনা যায় না। সুশীল

শিহরিয়া উঠিল! ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিল, তুই লুকোচ্ছিস না ত রে হ্যাব্‌লা?

চঞ্চল কণ্ঠে হ্যাব্‌লা কহিল, না না, তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন দাদাবাবু! হয় ত ভালই আছেন—কিন্তু আর দেরী কর্‌লে যে গাড়ী ধরতে পারবে না।

সুশীল ঘড়ির দিকে তাকাইল—সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট। হতাশ কণ্ঠে সে কহিল, এখন গেলেও যে পাওয়া যাবে না হ্যাবল—তিন মাইল পথ, পনের মিনিটে কি ক'রে যাব!...

খুব যেতে পারব, তুমি ওঠো ত দাদাবাবু। গাড়ীটা পেয়েছি ভাল—এমন গাড়ী যে, ঠিক্ সময় তোমাকে পৌছে দেবে।

সুশীল বিস্ময়ভরা কণ্ঠে কহিল, গাড়ী! গাড়ী তুই পেলি কোথা'!

ষ্টেশন থেকেই নিয়ে এসেছি গো।

সুশীলের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। খানিক ভাবিয়া সে কহিল, তুই এলি ক'টার গাড়ীতে রে হ্যাবল, যে, এরি মধ্যে গরুর গাড়ী তোকে পৌছে দিল! স' ছ'টার গাড়ীতে এসেছিস্ ত?

হ্যাবল বিরক্ত হইয়া উঠিল, নাঃ, এ তোমার যাওয়া নয়, খালি তর্ক! মা বাপ্ ত আর নয়—মামা মামী!...

আঃ! ম্লান চক্ষু দুইটী হ্যাব্‌লার মুখের উপর রাখিয়া ভারীগলায় সুশীল কহিল, মামা মামী ছাড়া বাপ্ মাকে কোনদিন জানি না কিরে হ্যাব্‌লা!...

হ্যাবল মুখ ফিরাইয়া বাঁকাসুরে কহিল, কেমন ক'রে জান্‌ব বলো, গরীব আমরা, বড় লোকের পেটের কথা বুঝ্‌ব কি করে!...তা' না যাও, পষ্ট বলো না—একা বাড়ীতে রোগী রেখে ভোর পর্য্যন্ত তোমার এখানে থাকৃতে পারব না। আমাকে যেতেই হবে।

সুশীল রাগ করিয়া কহিল, আমিই কি যাব না বল্‌ছি না কি!

সুশীল উঠিয়া পড়িল।

তাহার বিস্ময় কাটিল না। গাড়ীর উপর 'চিৎ' হইয়া পড়িয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল—শোকে দুঃখে বোধ করি হ্যাব্‌লাটার মাথা খারাপ হইয়া থাকিবে—নহিলে মানুষের সাধ্য নাই যে, তিন মাইল পথ পনের মিনিটে লইয়া আসে। গরুর গাড়ী আসিল কি করিয়া, আর পৌছাইবেই বা কি করিয়া! তাহার ঠোঁটের কোলে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পাশ ফিরিয়া শুইয়া সহসা গাড়ীর ছইয়ের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেই সে বিপুল বিস্ময়ে উঠিয়া বসিল—গরুর গাড়ী চলিয়াছে ঠিক মোটরের বেগে! সাঁ সাঁ করিয়া দুই পাশের গাছপালাগুলি ছুটিয়া নিকটে আসিয়া ক্রমে দূরে, তারপর চোখের নিমেষে মিশাইয়া যাইতেছে। পথভরা কাদা—কিন্তু গাড়ী যেন চলিয়াছে রবার ঢালা বাঁধা পথের উপর দিয়া! আঁধার তখনও ভাল করিয়া ঘনায় নাই। বৃষ্টি তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া পড়িতে থাকিলেও মেঘের আশপাশে দু'-একটা তারা জলে ভিজিয়াও পৃথিবীর রূপ দেখিবার লোভে একেবারে আকাশের কোণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের আশপাশের সুদূর বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রগুলির কোমল শ্যামলিমা অস্পষ্ট অন্ধকারে একখানা কালো যবনিকার মত পৃথিবীর মুখ ঢাকিয়া দিয়াছে। পাশের নদীর জলধারা একটা আঁধারের স্রোত—নিকটে ও দূরের বৃদ্ধ বনস্পতি-গুলি ইহারই মধ্যে অশরীরীর মত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গাড়ীর গতিবেগ এ সব যেন উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সুশীল ডাকিল, হ্যাবল!

হ্যাবল উত্তর করিল, কি দাদাবাবু?

মোটরের মত গাড়ী চলে কি করে রে!

হ্যাবল হাসিয়া উঠিল। এমন হাসি সুশীল জীবনে কোনদিন শোনে নাই। শীতের দিনের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শের মত এই হাসির শব্দ বুকের ভিতর কাটিয়া বসে। সুশীল চকিত হইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইল।

হ্যাবল হাসিয়া কহিল, ক্ষেপেছো দাদাবাবু, গরুর গাড়ী কখনও মটোরের বেগে যায়! এই যেমন চলে, তেমনি চল্‌ছে।

সুশীল স্থির হইয়া দেখিল, সত্যই গাড়ী ও সাধারণ গাড়ীর মতই 'কোঁচর ক্যাঁক্ কোঁচর ক্যাঁক্' করিতে করিতে কাদা জল ভাঙ্গিয়া ধীরে মন্থর গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

সুশীল আবার শুইয়া পড়িল।

ট্রেণ ধরিয়া তাহারা যখন ঈপ্সিত ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি দশটা। এখান হইতে পাহাড়পুর—তাহার মামা-মামীর গাঁ এগার ক্রোশ; অর্থাৎ, বাইশ মাইল। হ্যাবল নিমেষ মধ্যে খুঁজিয়া কোথা হইতে আবার একখানা গরুর গাড়ী আনিয়া হাজির করিল।

সুশীল নিম্নকণ্ঠে কহিল, আজকের রাতটা কাটিয়ে নিয়ে ভোরের দিকে গেলে হয় না রে হ্যাবল? যে রাস্তা—তার ওপর অন্ধকার রাত্রি।...

হ্যাব্‌লা কহিল, ভয় কর্‌ছে? কিন্তু না গেলে যে তাদের আর দেখ্‌তে পাবে না! তাদের প্রাণটুকু শুধু তোমার পথ চেয়ে এখনও ধুক্‌ধুক্ করছে! তুমি ঘুমিয়ে পড়ো না দাদাবাবু—আমি এমনভাবে নিয়ে যাব যে, তুমি কিছু টেরই পাবে না।

সুশীল নিশ্চপে শুইয়া পড়িল।

গাড়ী চলিতে লাগিল তাহার বিচিত্র শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া।

রজনী বাড়িয়া চলিল। চতুর্দ্দিকে রাত্রির গভীরতা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আরো গভীর হইয়া উঠিল। বাতাস থামিয়া গিয়াছে—বৃষ্টির অবিরাম পতন তখন আর শোনা যাইতেছে না। স্তব্ধ রজনীর অন্ধকার আকাশ তলে শুধু নিষ্কম্প তরুলতাগুলি কি একটা আশঙ্কায় মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভয়ার্ত্ত পল্লী-শিশুগুলির চাপা কর্কশ আর্ত্তনাদ একটা দুঃস্বপ্নের মত চতুর্দ্দিক ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

সুশীল তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ীর একটা বড় ঝাঁকানীতে সহসা জাগিয়া উঠিয়া চোখ মেলিতেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গাড়ী আবার চলিয়াছে ঠিক্ মোটরের মত! দুই-ধারের গাছপালাগুলি সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া চক্ষুর নিমেষে মিশাইয়া যাইতেছে! সকলের উপর সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এই দেখিয়া যে, গরুর পায়ের শব্দ, কাদা-জলের 'ছলাৎ ছলাৎ' আওয়াজ এসব কিছুই নাই। গাড়ী চলিয়াছে বিদ্যুৎবেগে—কিন্তু গতি অতি নিঃশব্দ—ছায়াপটে যেমন গাড়ীগুলি শব্দ না করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যায়, ঠিক্ তেমনি!

সাঁ করিয়া একটা ছবির মত রাজাপুরের হাট পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

সুশীলের হাত-ঘড়িতে রেডিয়ামের কাঁটা ও দাগগুলি আগুনের মত জ্বলিতেছে। সে দেখিল, ঘড়িতে দশটা বাজিয়া সবেমাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট! সুশীলের চক্ষু দুইটাতে কৌতূহল উপচিয়া উঠিল। এখান হইতে ষ্টেশন বিশ মাইল—পাহাড়পুর মাত্র আর দু'মাইল দূরে অবস্থিত। বিশ মাইল পথ পঁয়ত্রিশ মিনিটে আসিল—তাও দুইটা ক্ষীণদেহ বলদ-বাহিত গো গাড়ী! সে স্বপ্ন দেখিতেছে না ত!

সুশীল জোরে জোরে চোখ দুইটা মুছিল। অন্ধকারে সারা দেহের নানাস্থানে চার-পাঁচ বার চিম্‌টি কাটিল—না, জাগিয়াই আছে ত! তবে—

সুশীল মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিল। এবার আর এবার আর হ্যাব্‌লাকে ডাকিবে না,—কি করিয়া এমন হয় একবার সে দেখিবে!

সুশীল কৌতূহল বিস্ফারিত চক্ষে সম্মুখের প্রসারিত প্রায় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টি চলে না। কিছুই বোঝা যায় না। সামনের আসনে হ্যাব্‌লা একাই আছে, না আর কেহ আছে তাহাও আন্দাজ করা কঠিন। এম্‌নি নিঃসীম নিশ্ছিদ্র, গাঢ় অন্ধকার!

সহসা ভয়ে সুশীলের চোখ বুজিয়া আসিল—মুখের রক্ত কে যেন নিমিষে চুষিয়া লইল—একটা ভয়ার্ত্ত কম্পন তাহার বুকের হাড় ক'খানাকে পর্য্যন্ত সবেগে নাড়িয়া দিয়া গেল।

সুশীল দেখিল—স্পষ্ট দেখিল—সেই অন্ধকারের বুক

চিরিয়া জল-কাদাভরা দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পথের উপর দিয়া তাহার গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে—গরু নয়, মহিষ নয়—অগণিত নরকঙ্কাল!···মাংস-চর্ম্মহীন সেই অস্থিময় উলঙ্গ দেহগুলির কি বিদ্যুৎ গতি!···তাহাদের সম্মুখভাগ কিছুই দেখা যাইতেছিল না—পিছন ফিরিয়া তাহারা গাড়ী টানিতেছিল। কিন্তু শুধু ঐটুকু চোখে পড়িতেই ভয়ে সুশীলের রক্ত জমিয়া ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গেল। এমনভাবে ভয় পাওয়ার পরিণাম যে কি, সে তাহা ভালভাবেই জানিত বলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে তাহার জ্ঞানটুকুকে অটুট রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা কতক্ষণ?

ক্রমে সুশীলের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া ভয়ে সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সম্মুখের আসনে এতক্ষণ হ্যাব্‌লাকে কল্পনা করিয়া মনে মনে সে সাহস সঞ্চয় করিতেছিল; কিন্তু এইবার দেখিল—আর একটা নর-কঙ্কাল হয় ত বা হ্যাব্‌লারই হইবে, সেই ভূতগুলোকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে!···ভয়-জড়িত-কণ্ঠে সুশীল ডাকিল, হ্যাবল!

হ্যাবলা মুখ না ফিরাইয়া কহিল, স্বপ্ন দেখ্‌লে না কি দাদাবাবু? আচ্ছা ভয় বাপু তোমাদের! এত বড় একটা জোয়ান মরদ—

সুশীলের কাণে সেই কথার আওয়াজগুলি ঝুরো বরফের ন্যায় হিমস্পর্শে ঝরিয়া পড়িল—রসহীন দূরাগত কোনো কর্কশ প্রতিধ্বনির মত সে স্বর সকম্প ভীতিতে তাহার অন্তর মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সুশীল কহিল, আমায় ভয় দেখাচ্ছিস হ্যাব্‌লা?

ভয় দেখাচ্ছি! হ্যাব্‌লা উচ্চ হাসিয়া উঠিল।

সে হাসির প্রলম্বিত শব্দে সুশীল আরও কেমন উচ্চকিত হইয়া উঠিল। মানুষ কখনো কি এমন প্রাণহীন হাসি হাসিতে পারে! ভয়ে তাহার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করিতে লাগিল। তথাপি অতিকষ্টে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সহজ করিয়া সে কহিল, কি জানি! কিন্তু পঁয়ত্রিশ মিনিটে তোর গাড়ী আসে রাজপুরে—আরে হ্যাব্‌লা, এও কি মানুষে পারে।

তবে কি ভূতে পারে? হ্যাব্‌লা আবার হাসিয়া উঠিল।

সেই হাসি। বরফের টুকরার মত সে হাসি পাঁজরার গিয়া সূচের মত বিঁধিতে লাগিল। সুশীল তবুও বলিল, তুই ভূত-সিদ্ধ হ্যাবল!...

শুয়ে শুয়ে স্বপন দেখছো না কি দাদাবাবু? ভাল করে চোখ মেলে দেখো গরুতেই গাড়ী টান্‌ছে—ভূতে নয়।

সুশীল চোখ মেলিয়া দেখিল, সত্যই যেমন গাড়ী গড়াইয়া গড়াইয়া যায়, তেমনি ধীর মন্থর গতিতে বলদ দুইটার কাঁধে ভর করিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু ধোঁকা তাহার কিছুতেই গেল না।

বাড়ীতে পৌছিয়া সব দেখিয়া-শুনিয়া সুশীলের চোখে জল আসিল। মামীমা মারা গিয়াছেন। মামাকেও চেনা যায় না—তবে অবস্থা এখন ভাল।

সুশীলের সাড়া পাইয়া তাহার মামা হরগোবিন্দ ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন, এসেছিস্‌ বাবা?

সুশীল উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, দুটো দিন আগে কি খবর দিতে পারেন নি—মামীমার সাথে চোখের দেখা হলো না!·····

হরগোবিন্দ কহিলেন, সবই অদৃষ্ট বাবা, যার ভাগ্যে যা' লেখা আছে, হবেই! কিন্তু খবরটা দি' কা'কে দিয়ে বল্‌। গ্রামে যে মহামারী লেগেছে—একটাও লোক পাবার উপায় নাই। পরশু তোমার মামীমা মারা যান্‌, হ্যাব্‌লার তার আগেই হয়েছিল, তোমার মামীমাকে দাহ করে এসে দেখি তারও শেষ হয়েছে।

সুশীল সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, হ্যাব্‌লা নেই, মারা গিয়েছে! তবে সে আমাকে নিয়ে এল কি করে?

হরগোবিন্দ এসব কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন,

হ্যাঁ, বড়ই বিশ্বাসী ছিল! বাবার আমলের চাকর—ছোট ভাইটীর মত—

তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অঝোরে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সুশীলের কিন্তু তখন আর কথা বলিবার মত শক্তি ছিল না। সমস্ত বিশ্ব পৃথিবী তাহার দুই চক্ষের নিকট টলিয়া টলিয়া উঠিতেছিল। আকণ্ঠ ভয়ে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

তাহা হইলে সে ভুল করে নাই—মিথ্যা দেখে নাই! এতদিন যাহা লোকের মুখে শুনিয়াছে, আজ নিজেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মরিয়া ভূত হইয়াও হ্যাব্‌লা মামার চাকুরী ছাড়িতে পারে নাই—তাহাকে খবর দিয়া ভূতের গাড়ী করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সুশীলের সমস্ত গা কাঁটা দিয়া উঠিল।

অনেকটা পরে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া কহিল, এখন কেমন আছেন? বলিয়া আগাইয়া গিয়া হরগোবিন্দের দেহ পরীক্ষা করিতে গেল।

হরগোবিন্দ ইহা দেখিয়া ভয়ানক চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সরে থাক্, সরে থাক্ সুশীল! খবরদার ছুঁস নে! ছুঁলেই মর্‌বি—তুই ত জানিস নে বাবা, ত্রিপুষ্কর কি ভয়ানক! এ গাঁয়ে তাই পেয়েছে। আমরা কেউ বাঁচব না রে—গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে! কিন্তু তুই ছাড়া যে আমাদের গতি নেই রে সুশীল!

হরগোবিন্দ হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুশীল হতভম্ব হইয়া গেল। সব দেখিয়া-শুনিয়া সে যেন ক্রমেই কেমন হইয়া পড়িতে লাগিল। জীবনে এমন বিচিত্র ঘটনা কখনও সে দেখে নাই—এমন বিপদাপন্নও হয় নাই কখনও। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

হরগোবিন্দ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, আমার জন্যে ভাবিস নে সুশীল। বুড়ো হয়েছি, একদিন মরতেই হতো, আজই না হয় গেলেম। কিন্তু তুই বাবা আগে একটু জিরিয়ে নে। ও ঘরে বিছানা আছে; একটু শুয়ে পড় গিয়ে।

সুশীল আপত্তি তুলিয়া কহিল, না মামা, এইখানেই থাকি; আপনার কখন কি দরকার—

হরগোবিন্দ কহিলেন, আমার কিছুই দরকার হবে না সুশীল। তুই এখানে থাক্‌লে আমি স্বস্তি পাব না, কিছুতেই। অনেক রাস্তা এসেছিস। কষ্ট যা' হয়েছে—

সুশীলের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এই মামা, এত স্নেহময়। অথচ মৃত্যুকালে সে তাঁহার কোন কাজেই আসিল না। সুশীল মিনতিভরা-কণ্ঠে কহিল, আমার কোন কষ্ট হয় নি মামা—ও ঘরে কিছুতেই ঘুমোতে পার্‌ব না।...

হরগোবিন্দ অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, এখানে থাক্‌লেই রাখ্‌তে পারবে—যে কালে ধরেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরি এলেও রাখতে পার্‌বে না, তা' তুমি ত ছেলেমানুষ! শিখেছো কেবল তর্ক—শরীর বোঝো না। যাও ঘুমোও গে—দরকার হলে আমি নিজে ডেকে পাঠাব।

নিরুপায় সুশীল মামার দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

ছোট কক্ষটীতে আসিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এখানে আসিয়া এই ঘরটিতেই সে বরাবর শোয়। ছোট ঘরটী অপুত্রক মামা-মামী আদর-যত্ন দিয়া অপরূপ করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। আজ সে ঘরে পা দিয়াই দেখিল—শুভ্র বিছানাটি ঠিক্ তেমনি করিয়াই পাতা আছে, যেমন মামীমা পাতিয়া দিতেন। কোথাও কোনো ত্রুটী নাই। বরাবর সে ফুল ভালবাসে। মামীমা ইহা জানিতেন বলিয়া টেবিলের উপর ছোট ফুলদানিটায় যুঁই, বেলফুল ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিতেন। সুশীল চাহিয়া দেখিল—ফুলদানিটি ঠিক্ আগের দিনের মতই আজও নানাপ্রকার টাট্‌কা ফুলে ভরা।

সুশীলের দুই চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া গেল।

মামীমা নাই—হ্যাব্‌লা মারা গিয়াছে—মামাও সেই পথের যাত্রী—অথচ, ঘরের ল্যাম্পটা পর্য্যন্ত ঠিক্ জ্বালা রহিয়াছে।

সুশীল বিছানায় 'চিৎ' হইয়া পড়িয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ত্রিপুষ্কর! মনে পড়িল, কোথায় কবে কোন্ পঞ্জিকায় জ্যোতিষ-বচনার্থে সে পড়িয়াছিল,

"বারে শস্যং সুতং হস্তি তিথৌ গোধনমেব চ।
নক্ষত্রে গোত্রহানিঃ স্যাৎ বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি!"

বারদোষে শস্যহানি ও পুত্রহানি হয়, তিথিদোষে গোধন নাশ, নক্ষত্রে গোত্র নাশ হয়, আর ত্রিপুষ্কর দোষ যোগ হইলে বাস্তু বৃক্ষও জীবিত থাকে না।

সুশীল মনে মনে শিহরিয়া উঠিল—এতবড় একখানা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে! ইহার কোনো প্রতীকারই কি নাই?

ভাবিতে ভাবিতে সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে সুশীলের নিদ্রাভঙ্গ হইতে অনেকটা বেলা হইয়া গেল। ঘুম হইতে জাগিতেই গত রাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এলোমেলোভাবে তাহার মনে পড়িল। কতকটা সময় সে এমনি বসিয়াই রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাশের ঘরেই হরগোবিন্দ থাকেন। সুশীল উঁকি মারিয়া দেখিল—জাগিয়া আছেন কি না ঠিক্ বোঝা গেল না। বোধ করি তিনি ঘুমাইতেছিলেন।

সুশীল বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। জনমানবহীন পুরীতে তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি থরে থরে সজ্জিত—মুখ ধোয়ার জল, টুথ পাউডার, সাবান, তোয়ালে—এমন কি, আয়না চিরুণীও বাদ পড়ে নাই। সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। লোকে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে—সে জাগিয়াই দেখিতেছে না ত?

ঘরের মধ্য হইতে হরগোবিন্দ হাঁকিয়া বলিলেন, ওখানে বসে বসে ভাবছিস্ কি সুশীল। হাতমুখ ধুয়ে ফেলে চা-টা খেয়ে নে। ও ঘরে তোর চা দেওয়া হয়েছে; এরপর ঠাণ্ডা হ'লে যে, আর খেতেই পার্‌বি নে।

সুশীল সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—দেখিল, মামার ঘর হইতে এদিক্‌টা চোখে পড়িবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। তবে মামা দেখিলেন কি করিয়া—এবং সে যে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, তাহাই বা জানিলেন কিরূপে? তবে ও ঘরে কি মামার মৃতদেহ পড়িয়া আছে—এবং তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া এতক্ষণ যে তাহার সহিত কথা বলিল, গত রাত্রির মত সেও কি একজন অশরীরী?

কথাটা মনে পড়িতেই বিদ্যুৎ ক্রিয়ার মত সকম্প ভীতি হিমস্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দিল। তাহার অসহায় বিবর্ণ চোখের সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা অকস্মাৎ বিকট রবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সুশীল সভয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পাশের খুঁটিটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ক্ষীণ চেতনাটুকুকে সজাগ রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে হরদয়াল আবার ডাকিয়া বলিলেন, কিরে, কেবল বসে বসেই থাক্‌বি, না হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খাবি। তোর হলো কিরে সুশীল? কোথায় এসে আমাকে একটু দেখ্‌বি, আমার সঙ্গে দুটো কথা বল্‌বি, বিষয়-সম্পত্তিগুলো বুঝে-সুঝে নিবি, তা' নয়, কেবলি ভাবনা! কি যে ছেলেমানুষ তুই সুশীল!

সুশীলের আবার সহজ জ্ঞানটুকু ফিরিয়া আসিল। মরা মানুষ কি এমন দরদভরা গলায় কথা বলিতে পারে! কিন্তু এ সব যোগাইতেছে কে? পড়িয়া থাকিয়া মামাই বা সব জানিলেন কেমন করিয়া?

সংশয় ও ভয় ছাপাইয়া তখন তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা কৌতূহল জাগিল। মৃত্যু, সে ত আছেই—জন্মিলেই মরিতে হইবে—তবে হা-হুতাশ করিয়া কি হইবে? আর যদি ইহারা সত্য ভূতই হয়—খপ্পরে ইহাদের পড়িয়াছেই ত সে—তখন আর বৃথা ভয় করিয়া লাভ কি? এখন পর্য্যন্ত ত কেহ তাহার কোনো অনিষ্ট করে নাই—বরং তাহাকে যত্নই করিতেছে। তবে—

সুশীল হাত-মুখ ধুইল। ধুইয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া দেখিল—সত্যই চা ও জলখাবার কে রাখিয়া গিয়াছে! আস্বাদন লইয়া দেখিল—অমৃতোপম—জীবনে এমন স্বাদ সে কখনও উপভোগ করে নাই।

সুশীল মামার ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, যে অবস্থায় গত রাত্রিতে তাঁহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, আজও তিনি ঠিক্ তেমনিভাবেই শুইয়া আছেন। সুশীল অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—না, কোথাও প্রাণের স্পন্দন আছে বলিয়া মনে হয় না—সর্ব্বাঙ্গ স্থির—চক্ষু নিস্পলক—মুখের উপর মৃত্যুর রূঢ় কালো ছায়া সুস্পষ্ট বিদ্যমান! সুশীল তখন বুঝিল, মামার মৃত্যু আজ হয় নাই, হয় ত বা দুইদিন আগেই হইবে—কাল আসিয়া যাঁহার সাথে সে কথা কহিয়াছে, সে তাহার মামার এই কবন্ধ!…

কাঁপিতে কাঁপিতে সে সেইখানে মূর্চ্ছিতের মত 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল। আর তাহার লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, কে তাহাকে তাহাদের গ্রাম হইতে এতদূর এখানে এইভাবে টানিয়া আনিয়াছে। হ্যাব্‌লা—হ্যাব্‌লা উপলক্ষ্য। যে আনিয়াছে, সে—

সুশীল চিন্তিত মনে আবার বাহিরে আসিয়া বসিল।

কতকটা সময় কাটিয়া গেল, তাহা সে মনেও করিতে পারিল না। এমন সময় সহসা সে শুনিল, ঘরের ভিতর হইতে তাহার মামা তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, বাবা সুশীল, আমাদের সদ্গতিটা কর্! তোর কাছে লুকিয়ে কি হবে—বেঁচে আমরা কেউ নেই—দেহটা পর্য্যন্ত দাহ করার লোক পাওয়া যায় নি! পেটের ছেলের মত তুই এই কাজটা কর্ বাবা! দেহটা দাহ ক'রে একবার গয়ায় গিয়ে আমাদের পিণ্ডিটা দিয়ে আয়, নইলে কারও গতি হবে না।

সুশীল শিহরিয়া উঠিল। তারপর মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্ মামা, আমার সাধ্য মত সব করবো।

হরগোবিন্দ ভিতর হইতে আবার কহিলেন, সুখী হলেম বাবা। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবি হও! গ্রামে আজ আর কেউ বেঁচে নেই বটে, তবে কোনো ভয়ও নেই। শুধু আমার নয়—সকলের বিষয়-সম্পত্তিই তুমি ভোগ করো সুশীল। আবার বল্‌ছি, কোনো ভয় নেই—তোমার কোনো অমঙ্গল হবে না—আমরা সুখীই হবো। শুধু তুমি পিণ্ডিটা দিয়ে এসো—আমরা উদ্ধার হই।

সুশীলের চোখ দুইট ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। আর্দ্র-কণ্ঠে সে কহিল, জানি না আপনি মামা কি না! কিন্তু যেই হোন্, দুঃখ দূর করুন। আপনার শবদাহ ক'রে আমি গয়ায় গিয়ে গ্রামের সকলের উদ্দেশেই পিণ্ডি দেবো।

ভিতরে মিলিত কণ্ঠের হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে সুশীল শবদাহ করিয়া ফিরিল। কষ্ট তাহার একটুও হয় নাই। শশ্মান-ঘাটে সহস্র অদৃশ্য হস্ত তাহার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য যোগাইয়াছে। মামার দেহটা পর্য্যন্ত তুলিতে গিয়া সে কম আশ্চর্য্য হয় নাই—নরম, ঠিক্ যেন তুলার মত। শবদাহান্তে সে আর বাসায় ফিরিল না। ধীরে ধীরে ষ্টেশনাভিমুখে চলিল। তাহার তখন জ্ঞান ছিল না। শোকে-দুঃখে, অশরীরিদিগের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপে সে কেমন আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘপথ সে যেন নিজের অজানিত-ভাবেই অতিক্রম করিতেছিল। অন্ধকারের বোধ ছিল না—পথের ভয় ছিল না—দেহের শ্রান্তির কথাও মনে আসিতেছিল না—শুধু মনে হইতেছিল—কি করিয়া এতগুলি জীবকে সে মুক্তি দিবে!

ষ্টেশনের অনতিদূরেই একটা তেঁতুল গাছ। অন্ধকারে তখন চতুর্দ্দিক ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। এইখানে আসিতেই তাহার গাটা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পিছন হইতে কে ডাকিয়া বলিল, ভয় নেই সুশীল! তুমি নির্ভয়ে যাও—গিয়ে আমাদের উদ্ধার কর। গয়া থেকে ফের্‌বার সময় এই গাছটার দিকে লক্ষ্য করো—এর মাথাটা ভাঙ্গা দেখ্‌লে জেনো, সত্যই আমরা উদ্ধার হয়ে গেছি।

সুশীল চকিত হইয়া পিছনে চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তারপর সে ধীরে ধীরে ষ্টেশনে গিয়া পৌছিল। রাত্রিতে কোনো ট্রেণ ছিল না। সমস্ত রাত্রি

একরকম অনিদ্রায় কাটাইয়া সকালে কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই সে তেঁতুল গাছটার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—গাছটা অক্ষত।

তাহার পর সুশীল গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিল এবং ফিরিবার সময় মামাদের বাড়ীর ষ্টেশনে নামিয়া তেঁতুল গাছটার নিকট গেল। কতকটা ভয়ে, কতকটা চাহিয়া বিস্ময়ে দেখিল—সত্যই তেঁতুল গাছটার মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে—অথচ খোঁজ লইয়া জানিল আজ কয়দিনের মধ্যে এধারে ঝড় ইত্যাদি কিছুই হয় নাই। সকলেই ইহাকে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়াই মনে করিতেছে। সুশীল তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর ~~সেই~~ সব অদৃশ্য আত্মাদের উদ্দেশে মনে মনে সহস্র নমস্কার জানাইয়া সে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সংবাদ-পত্র সম্পাদকের তিরোধান

মঙ্গলবার, ৩রা কার্ত্তিক, দেবী-পক্ষের পঞ্চমী-তিথিতে স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ও সু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-কুমার বসু-মহাশয় বৃন্দাবন-যাত্রার পথে চলন্ত ট্রেণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। সহযাত্রী-হিসাবে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দে-মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। মহা-ষষ্ঠীর দিন বুধবার প্রাতে 'শোন্-অন্-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক' ষ্টেশন হইতে তারযোগে এই দুঃসংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছায়।

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রকুমার বসিরহাট মহকুমার দণ্ডীরহাট গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দর্পনারায়ণ বসু-মহাশয়ের বংশধর। কলিকাতার সুবিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক-প্রবর ৺জগবন্ধু বসুর মধ্যম ভ্রাতা ৺কুঞ্জবিহারী বসুর কনিষ্ঠ পুত্র। সুশিক্ষিত হইয়া সত্যেন্দ্রকুমার সাংবাদিকের ব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমে 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'টেলিগ্রাফ্' নামক ইংরাজী পত্রের সম্পাদক-হিসাবে গত সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া 'বঙ্গবাসী'র সহযোগী সম্পাদকরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। পরে ১৯১৮ সাল হইতে 'বসুমতী' সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিয়া দীর্ঘ আঠার বৎসরকাল বহুভাবে যোগ্যতার সহিত ইহার সেবা করেন। এবং শেষের দশ বৎসর 'মাসিক বসুমতী'র যুগ্ম-সম্পাদকরূপে ইহার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সু-সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথের লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া সংবাদ-পত্র সেবা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; সঙ্গে সঙ্গে বহু পুস্তক, উপন্যাস, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ সু-সাহিত্য প্রসব করিয়াছে। অবসরবিনোদনে যাত্রা করিয়া তিনি ভারতের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ ও ঐতিহাসিক নগর-নগরী ভ্রমণ করেন এবং উহার বিবরণ সংবাদ-পত্র মারফতে প্রকাশ করিয়া শেষে উহা 'ভারত-ভ্রমণ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় মহাসমরের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' নামে তিনি একখানি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বৈষ্ণবী,' 'বংশের কলঙ্ক', 'প্রতারক', 'বাদসা পিরু', 'অন্তঃস্রোতা', 'আগুনের ঝলকে' 'প্রজাপতি', 'তরুণ-তরুণী,' 'পরাজয়,' 'কাল বৌ', 'রাঙা বৌ' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠকগণকে তৃপ্তি দিয়াছে।

'গল্প-লহরী'কে তিনি বহুবার তাঁহার অমূল্য রচনা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য পত্রিকা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার সৌজন্য, শিষ্টাচার ও অমায়িক ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নহে।

রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি কয়েকমাস অসুস্থ ছিলেন বলিয়া গত শ্রাবণ মাসের শেষে তিনি 'বসুমতী'র কর্ম্ম ত্যাগ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য হারাইয়াও সারস্বত-সেবক সত্যেন্দ্রকুমার বাণী আরাধনায় বিরত থাকিতে পারেন নাই। মাত্র দুই মাসের চেষ্টায় 'তপোবন' নামে একখানি নূতন মাসিক-পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করিবার আয়োজন করিয়া মহাপূজা-সংখ্যা-হিসাবে প্রথম সংখ্যাখানি শ্রীবিবেকানন্দের বাণীতে উজ্জ্বল করিয়া লোকোত্তর পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া পূজাবকাশে তীর্থযাত্রা করেন। 'তপোবনে'র প্রথম সংখ্যা তাঁহার শেষ দান এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রাই তাঁহার শেষ তীর্থযাত্রা। এই অনন্যসাধারণ বাণী-সেবকের আত্মা শ্রীশ্রীভারতীর চরণ প্রান্তে বসিয়া শত-সুরভি-পীযূষ পানে মত্ত থাকুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

উপন্যাস

ধ্রুবজ্যোতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়ার হাতের মিঠা কিলগুলির অপেক্ষা মিষ্টান্ন জিনিষটা যে এমন বিশেষ কিছু উপাদেয় হইতে পারে নিশীথনাথ তাহা মানিত না—তাই খাবাবের রেকাব হস্তে যখনই মাধবী গৃহে আসিয়া ঢুকিত, তখনই কারণে অকারণে সে তাহাকে না রাগাইয়া ছাড়িত না। আবার মাধবী ইহার শোধ সুদে-আসলে পোষাইয়া লইত—তাহার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্য দিয়া। নিশীথনাথ সর্ব্বদাই পত্নীকে একটু ফিট্‌ফাট্‌ একটু পরিষ্কার পরিপাটিরূপে সজ্জিত দেখিতে চাহিত—তাই ইচ্ছা করিয়াই মাধবী তাহার নিজের বেশ-ভূষার দিকে একটু বেশী অমনোযোগীই হইত—সদ্য পাট্‌ভাঙ্গা কাপড়খানিকেও সে ধূলাকাদা না মাখাইয়া পরিত না। এমনি বাদ-বিসংবাদের মধ্য দিয়া তাহাদের দুইটী প্রাণীর দিন বেশ সুখেই চলিতেছিল।

বাড়ীতে গৃহিণী ছিলেন বুড়া পিসীমা। কাল তাঁহার আয়ুর্জ্যোতি এক ফুঁয়ে মলিন করিয়া দিলে, নিশীথ পত্নীর সহায়তার জন্য একজন পাচক, একটী দাসী নিযুক্ত করিয়া দিল। মাধবী একই দিনে সে দুইটীকেই তাড়াইল। তারপর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চুলগুলি মাথার উপর উঁচু করিয়া বাঁধিয়া ভাতের থালা হাতে সে যখন স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নিশীথ তখন রীতিমত একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কি তুমি! তুমি কেন? ঠাকুর গেল কোথায়?"

মাধবী তখন বেশ একটু দুষ্টামীমাখা স্বরে বলিল, "কেন গা, আমার বুঝি জাত গিয়েছে?"

কৌতুকভরে তাহার গালে একটী 'ঠোনা' বসাইয়া দিয়া স্বামী ফুল্লকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ—নইলে ও ভাড়া করা রসুয়ে বামুন আস্‌বে কেন?"

বেশ একটু নেকা সাজিয়া পত্নী উত্তর দিল, "ও মা, তা' ত জানি না! তা' আর কর্‌বে কি বলো, কোনো রকমে ওষুধ গেলা করে আজকের মত ত খাও, কাল সওয়া শ' টাকা দণ্ড দিয়ে তখন জাতে উঠো।"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "তাই বলো, তুমি তাকে তাড়িয়েছ। কিন্তু এতটা পরিশ্রম সইবে কি? বিশেষ ও ধোঁয়া-কালীর মধ্যে তোমার যাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

"ও হো, রঙটা ময়লা হয়ে যাবে, নয়?"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "হ্যা গো, তাই। তুমি শুধু চুপটী করে আমার পাশটীতে বসে হাওয়া করবে।"

মাধবী ত্বরিত কণ্ঠে বলিল, "তা' দেখো গা, তুমি এক

কাজ কর, একটা চাকর রেখে দাও, সেই অফিসে যাওয়া-আসা করবে।"

"তারপর?"

"তুমি চুপটী করে আমার পাশটীতে বসে গল্প করতে পারবে—সারাদিনের রোদ-জলে শরীর মাটি হবে না।"

"দূর ক্ষেপী, আমি যে পুরুষ।"

"মনে রাখ্‌বেন মশায়, আমিও নারী। যার যা' অধিকার তা'তে হাত দিতে যাওয়া শুধুই যে অন্যায় তা' নয়, একটা মস্ত বড় পাপ।"

"আমার ঘাট হয়েছে বিচারক-ঠাক্‌রুণ! তোমার যত খুসী কালী-ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে রোগ জুটিও, এই নাকে-কাণে খৎ, আর যদি ও কথা তুলি।"

আহারের পর পত্নীকেই হাতে জল ঢালিয়া দিতে দেখিয়া নিশীথ হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি! ঝি মাগীকেও বিদেয় দিয়েছ না কি?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "না, সে যে কুড়ে, খাটুনীর ভয়ে পালিয়েছে।"

গামছায় হাত মুখ মুছিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে নিশীথ বিছানায় বসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আসল ব্যাপার কি তাই বলো ত, এ সব ত বাজে।"

"দাঁড়াও খেয়ে আসি" বলিয়া মাধবী স্বামীর আপাতঃ প্রশ্নের হাত এড়াইতেই যেন ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই কলিকার আগুনে সারা মুখটী রাঙা করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নিশীথের মুখের উপর দিয়া একটা গাম্ভীর্য্যের ঘন মেঘ বহিয়া গেল। সে বলিল, "স্ত্রীকে এমন দাসীভাবে দেখ্‌তে পারব না মাধবী, ক্ষমা কোরো।"

মুখ মচ্‌কাইয়া মাধবী ধীরপদে স্থান ত্যাগ করিল। ঘণ্টাখানেক পর সে যখন আবার ফিরিয়া আসিল, নিশীথ তখন চঞ্চল পদে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রী নিকটে আসিতেই সে অধীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না মাধবী, তোমাকে এত ছোটর চক্ষে আমি দেখ্‌তে পারব না।"

মুখ ঘুরাইয়া মাধবী বলিল, "ভাল মাথা গরম লোক যা' হোক্!"

নিশীথ চঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "তুমি বোঝো না মাধবী, এতে আমার—"

বাধা দিয়া মাধবী বলিল, "তা' হলে, আমিও আমার মনের কথা বলি শোনো—তোমার আমার সংসারের মধ্যে কেউ যে এসে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তা' আমি সহ্য করতে পারব না, একটা ঝিও না, একটা চাকরও না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করেই রাখ্‌তে চাই।"

স্বামী অবাক্ দৃষ্টিতে খানিক স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "এটা কিন্তু তোমার নেহাৎ বাড়াবাড়ি মাধবী। নীচ দাসী-চাকর আমাদের পাওনা-দেনার মধ্যে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে?"

দৃঢ়তায় কণ্ঠ ভরাইয়া তুলিয়া মাধবী বলিল, "পারে! তোমার খুঁটিনাটি কাজে ভাগ বসিয়ে তারা যে আমার সাম্‌নে এসে সতীনপনা করবে, অন্য মেয়েরা কি করে এটা সহ্য করে জানি না, আমি কিন্তু তা' পারব না।"

নিশীথ এবার হাসিল। বলিল, "সকল কাজ নিজের হাতে কর্‌বার চেষ্টা পেতে গেলে মানুষের প্রাণ ত আর বাঁচে না।"

ঠোক্কর দিয়া মাধবী বলিল, "পুরুষগুলো এমনি অপদার্থই বটে!"

দুই

"আচ্ছা, বল্‌তে পার, ক্লাব ছেড়ে আজকাল এমন কুণো হয়ে যে ঘরে সেঁধুলে, তার মানে কি?"

"ছেলেবেলার একটা সখ, বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত যে এতটুকু তেতো না হয়ে ভাল লাগ্‌বেই, তারই বা মানে কি মাধুরী?"

মুখভার করিয়া মাধবী বলিল, "যাও, কি যে বলো! তুমি বুঝি বুড়ো?"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "স্বামীটীকে তোমার বুড়োর পদবীতে উঠ্‌তে দেবার সাধ এতটুকু না থাকুলেও,

মাধবী, বয়স ত মানবে না, গোণা বছরগুলো যে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে।"

মুখ ঘুরাইয়া মাধবী বলিল, "এ্যা, কি কথাই হচ্ছে! এই বয়সে মানুষ বুঝি বুড়ো হয়?"

"তা' হয় মাধবী। সংসার সময় সময় আমাদের জীবনের সামনে এমন এক-একটা মুহূর্ত্ত এগিয়ে দেয়, যার চঞ্চল পদের গতির শেষে মানুষ নিজেকে আর কিছুতেই যুবা বলে মনে করতে পারে না।"

মাধবী এ অপ্রিয় কথাটাকে ঢাকা দিয়া ফেলিবার জন্যই বলিল, "ও বাড়ীর মণীশ ঠাকুরপোর টিট্‌কিরীর জ্বালায় আমি ত অস্থির! সে বলে ফাঁকা ঘরের গিন্নী হয়ে আমিই না কি তোমায় আটকে রেখে দিয়েছি। ঘরের লোকের যখন এই কথা, তখন তোমার বন্ধু-মহল কি যে না বলেন তা' ত জানি না।"

নিশীথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি প্রতিবাদ তুলে তাদের জানাব, কথাটায় সত্য বস্তুর অভাব বড় বেশী।"

মাধবী উত্তর দিল, "সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সত্য যে এতে একটা কিছু আছে, এটা সবাই মানতে বাধ্য। দেখ্‌ছি, পিসীমা যাওয়া অবধি তুমি আমাকে নিয়ে মেতে উঠেছ। নিজের হাতে গড়া সঙ্ঘ কোথায় যে তলিয়ে যেতে বসেছে, তার তল্লাস নেওয়ার দরকারও ভাব্‌ছ না।"

নিশীথ প্রফুল্ল হাস্যে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া বলিল, "কাজেই, তোমার দারোয়ানী কাজে যখন বাহাল করেছ!"

অন্তরের সঠিক সংবাদ বাহ্যিক ধরা পড়িল না। মুখে চোখে কোপের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল বটে, কিন্তু আসল নকলের চাপে কতখানি আত্মগোপন করা সম্ভব বুঝা গেল না।

মাধবী বলিল, "বন্ধু-মহলে এ সব কথা তুলে তুমি যত বেশী আনন্দ পাও না কেন, জেনো, আমার দিক্ থেকে তত বেশী ব্যথার রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ে।"

কথাটা এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়াই সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। খানিক অবাক্ বিস্ময়ে তাহার চলিয়া যাওয়ার শূন্য পথটির দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকিয়া নিশীথ ধীরে ধীরে বহির্বাটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। দলের গুটিকয়েক সহকর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া মণীশ ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই দ্বারের পার্শ্ব হইতে ডাকিতেছিল, "নিশীথ দা', বাড়ী আছ?"

ধীরে ধীরে অর্গল উন্মোচন করিয়া নিশীথ অনুযোগ-মাখান সুরে বলিল, "তোদের মতলব কি বল্ ত মণীশ, শেষে কি আমায় পাড়া ছাড়া করে তবে ছাড়বি!"

"সেটা নিজে হতেই হয়ে আছ দাদা, আমাদের সাহায্য নেবার বিশেষ দরকার হবে না। যে কোণ নিয়েছ, কুণো ব্যাঙও তোমার কাছে হার মেনে যায়। বলি, এতই যদি মনে ছিল, এতগুলো নিরপরাধ বেচারীর মাথা খেলে কোন্ লজ্জায়?"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "তুই জ্বালালি মণীশ! ঘরে বাইরে এমন করে অনুযোগের বোঝা ওজোড় করে যদি চাল্‌তে চাস্ তোরা, মাথাটা বাঁচান আমার দায় হয়ে পড়বে।"

মণীশ উত্তরে দু'-একবার কাশিয়া লইয়া বলিল, "বেশ, তাই যদি বোঝো, লক্ষ্মী ছেলেটীর মত যা' বলি দাঁড়িয়ে শোনো। এবারের গঙ্গা-সাগরের মেলার ভার তুমি কাঁধে নেবে কি না?"

নিশীথ বিরক্তি-চাঞ্চল্য-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও সব ছেলেমানুষী আর ভাল লাগে না মণীশ, যেতে দে।"

মণীশ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "তা' এখন বল্‌বেই ত তুমি, ছেলেমানুষী আসরে যখন টেনে নামিয়েছো—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিজে ডেকে যে এ চিঠিখানা দিয়েছেন, তার উপায় কি?"

পত্রে লেখা ছিল, "এ কর্ম্মী-সঙ্ঘটীর উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান হইয়াই আমি অনুরোধ করিতেছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও এ সঙ্ঘ আমাদের সহায় হউন। যে অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া ইহারা এতদিন কার্য্য শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে প্রতি রাজপুরুষই ইহাদের গুণমুগ্ধ। আশা করি, ভগবৎ কৃপায় ইহাদের প্রতিষ্ঠান অচিরে আরও সফলতার পথে

অগ্রসর হইয়া দশের দেশের লক্ষ্যরূপে প্রতীয়মান ও প্রতিভাত হইতে থাকিবে।"

পাঠশেষে ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া নিশীথ বলিল, "তা' সার্টিফিকেটখানা মন্দ যোগাড় হয় নি মানতে হবে।"

মণীশ মাথা নীচু করিয়া কহিল, "জানি দাদা, সুখ্যেতের ঢাকের চেয়ে তুমি কাজকেই বড়র আসন দিতে চাও। কিন্তু পরে না চাইতে যদি কিছু দেয়, অন্ততঃ সেটুকু সহ্য করার ক্ষমতাও আমাদের থাকা দরকার।"

নিশীথ ধীরকণ্ঠে বলিল, "বেশ ত, তোরা ত রয়েছিস্, যা' না।"

"বেশ, এদের যদি রাজী করে দিতে পার দাদা, আমার আপত্তি নেই। দলের সবাই বেঁকে বসেছে—তোমায় না নিয়ে এখন থেকে কোন কাজেই ওরা নামবে না।"

মাথা চুলকাইয়া নিশীথ বলিল, "তা' কি করে হয়—"

সে না হইবার কারণ মুখে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও সবার অন্তরের ভাষা বহি মুখমণ্ডলে যে একটা ব্যঙ্গভরা কৌতুকের ছাপ্ বড় সুস্পষ্ট দাগ রাখিয়া ফুটিয়া উঠিবে, নিশীথ অন্তরে অন্তরে তাহা অনুভব করিল, আর করিল বলিয়াই আপন কথায় আপনি লজ্জিত হইয়া সেই প্রাণের দুর্ব্বলতা লুকাইতেই যেন যত্নে-আনা ঔদাসীন্যের উপর জোর দিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

মণীশ পরিহাস-পূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "সাধে কি আর বলি, বৌদি' কতটা জলপড়া খাইয়েছে তার খোঁজটাই আগে নেওয়া দরকার।"

অপ্রতিভ হওয়ার মাত্রাটা কোনরূপে কমাইয়া দিতে চাহিয়াই যেন নিশীথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা' নয় রে! বাড়ীতে ত একা মানুষ, আমি গেলে থাক্‌বে কার কাছে, সে ভাবনাটাও ত ভাবা দরকার।"

সহসা দ্বারের পার্শ্ব হইতে মাধবী ডাকিল, "ঠাকুরপো!"

নিশীথ উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাঁচা গেল! যাওয়া-না-যাওয়ার কৈফিয়ৎটা ওর কাছ থেকেই শুনে আয়।"

দ্বারের নিকটে আসিয়া মণীশ মিনিট দুই কাণ পাতিয়াই বেশ একটু উৎসুকভরে বলিয়া উঠিল, "তোমার 'না'টার প্রাধান্য আর মোটেই জোর করতে পারছে না নিশীথ দা', বড় আদালতের রায় বেরিয়ে গেছে নিয়ে যাবার, এবার আর যাও কোথায়!"

আকুল বিস্ময়ে নিশীথ বক্তার মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। মণীশের সতেজ কণ্ঠ হর্ষভরে আবার দুলিয়া উঠিল, "আর শেষের আপত্তিটাও তোমার টিঁকছে না দাদা। আপাততঃ দশ দিনের জন্যে উনি ফারখৎনামায় সই দিয়ে বাপের বাড়ী চলেছেন।"

তিন

মুক্ত মন আর নদীর স্রোত উভয়ে প্রায় একই প্রকার। কর্ম্মের প্রেরণায় উন্মত্ত হইয়া মুক্ত মন যখন কর্ত্তব্যের পথে ছুটিয়া যায়, তখন ঠিক্ নদীর একটানা স্রোতেরই মত সে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। পথ-অপথ মানে না, আত্মপর বাছে না। সম্মুখে একমাত্র বরণীয় কর্ম্ম এক অভিনব মূর্ত্তিতে নামিয়া আসিয়া মানুষকে আত্মভোলা করিয়া তুলে।

স্বার্থ ততক্ষণ, মন গণ্ডী-বেড়ার মোহজাল যতক্ষণ না কাটাইয়া উঠিতে পারে। পারিলে শুধু স্বার্থ কেন, পরার্থও তাহার নিকট হীনপ্রভ হইয়া যায়। তখন বিশ্ব-প্রেমের মধুর ডাক্ কাণে পশিয়া তাহাকে আর কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের পশ্চাতে টানাটানি করিতে পারে না। কাজেই সবার দুঃখ-ক্লেশ মাথায় বহিয়া ধরার সন্তান তখন জগতে কল্যাণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আমাদের নিশীথনাথ আজ সেই মহাপ্রেম-প্রবণতায় গা ভাসাইয়া সাগর-কূলে আসিয়া পৌছিয়াছে।

দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোবৃত্তির সংযোজক মধ্য মণি-রূপে সাগর-দ্বীপ আজ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একত্র ত্যাগ ও লালসার বিকিকিনিতে স্থানটী মুখরিত। দাতার শুভ্র নিষ্ঠা-ভরা অন্তরের দান গ্রহীতার কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ির মাঝে পুণ্যের শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তিটীকে যেন পরিম্লান করিয়া আনিতে-ছিল। জনৈকা প্রৌঢ়া মহিলা তিনটী সুন্দরী কন্যা ও বেশ চালাক চতুর এক যুবক পুত্রের সহিত ধর্ম্মের দোকান-

দারীতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। দোকান সাজাই-বার মত পণ্যের তাহার সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও, খরিদ-দারের ভীড় সেই স্থানেই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দাতার তরল মস্তিষ্ককে বাক্যের দেওয়া পুণ্য ছটায় মোহিত করিয়া ইহারা কারবার চালাইতে ছিলেন বড় মন্দ নয়।

যুবক সাজিয়াছিলেন পুরোহিত, মেয়ে তিনটীর দুইটী সধবা, অপরা অনূঢ়া। এত বয়স পর্য্যন্ত তাহার এ অবিবাহিত জীবন অতিবাহিতের কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বড় একটা কাহারও দেখা যাইতেছিল না; বরং হাতের নিকট এত সহজে এ তিনের সম্মেলন সবার প্রাণেই তৃপ্তির সু-বাতাস বহাইয়া দিতেছিল। প্রৌঢ়া সকল দিকে নজর রাখিয়া দর কষাকষির মাঝখানে যথাসাধ্য আয়ের পথ কিছু সুগম করিয়া লইতেছিলেন।

পুরোহিত অজ্ঞ যজমানদিগকে মন্ত্রোচ্চারণ করাইতে-ছিলেন, "নমঃ। 'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব।' নাও নাও, চট্‌পট্‌ ডুব দিয়ে নাও, কার কি মানসিক আছে বলো।"

একজন বয়োবৃদ্ধ থাকিয়া থাকিয়া প্রশ্ন তুলিয়া বসিল, "এজ্ঞে পুরুত-মশায়, এটা যেন ছেরাদ্দর মন্তর বলে মনে লাগছে।"

পুরোহিত যুবক সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ছেরাদ্দই ত, এ সব তীর্থস্থানে এসে বাপ চোদ্দ পুরুষকেই পিণ্ডি দিতে হয়, নিজের কিছু রাখ্‌তে নেই।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলিল, "তাই ত, করা আছে কি না, তা' বেশ পড়ান।"

একজন স্ত্রী যাত্রী কিন্তু অবুঝের মত বলিয়া উঠিল, "মাইতি ঠাকুরকে পুছ কর ঠাকরুন, সব যদি তেনাগোর জন্যেই গেল ত আমাগোর তা' অলে অইলো কি?"

গালভরা হাসি হাসিয়া পুরোহিত তাহার সেই উচ্চ নিভৃত কথা কয়টীর জবাব নিজেই দিলেন, "ও গো, তাই, তাই। বোঝো না সোঝো না, ঐ যে বোঝে, তাকেই জিজ্ঞেস্‌ কর। কি বল মাইতির পো।"

এত বড় বিজ্ঞতার পদ সহজে ছাড়া বৃদ্ধের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; কাজেই মাথা নাড়া দিয়া সে বলিল, "ওদের কথা ধরতব্বির মধ্যে আনুবে না ঠাকুর। দশহাত কাপড়খানা পরে, না আছে কাছা, না আছে কোঁচা, বুদ্ধি হবে কোত্থেকে?"

মেয়েটী তাহার গোলমেলে মাথা ঠিক্‌ করিয়া লইবার পূর্ব্বেই প্রৌঢ়া উচ্চ নিনাদে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরকে এত খাটাতে চাচ্ছ, দক্ষিণে দেবে ক' টাকা শুনি। কই, বের কর না গো, কার কি মানসিক আছে? বামুনের গলা ফেটে রক্ত বেরুলে কি তোমাদের ভাল হবে?"

জাতের শিরোমণির এ আকস্মিক বিপদ আশঙ্কায় সকলকেই কম বিস্তর চঞ্চল করিয়া তুলিল। ফলে থলি ঝাড়িয়া যে যাহার মানসিকের দণ্ড, সেই দণ্ডমুণ্ডের ভুঁই-ফোড় পাওনাদার ব্রাহ্মণ দেবতাটীর হাতে সমর্পণ করিয়া দেবতার ঋণ পরিশোধ কল্পনায় জীবনের একটা মস্ত বড় ভার হাল্কা করিয়া ফেলিল। একটী স্ত্রীলোক তাহা পারিল না। বলিল, "কিনে কেটে কিছু আন্‌তে পারি নি ত মা, কি হবে?"

প্রৌঢ়া বেশ একটু সহানুভূতির স্বরে তাহার এই না আনার দায়ীত্বটাকে যথাসম্ভব ছোট করিয়া দিয়া বলিল, "না পেরেছো, তা'তে আর হয়েছে কি? দাম দাও, আম-রাই যোগাড়-যন্তর করে দিচ্ছি।"

মেয়েটী একটু শঙ্কিতভাবে বলিল, "ও উচ্ছুরুগু জিনিষগুলোয় হবে ত মা?"

প্রৌঢ়া তাহার সকল দন্ত বাহির করিয়া একবার হাসিল—বুঝি বক্তার এই অনভিজ্ঞতাটাকে বেশ একটু শাসন করিয়া লইবার অছিলায়। তারপর ধীরকণ্ঠে বুঝাইয়া বলিল, "উরুছুরুগু কেন গো, আমরাও বামুনের মেয়ে, এ বিদেশ বিভুঁয়ে যাত্রীরা কোথায় কি পাবে, তার জন্যেই খুঁটিনাটি সব গুছিয়ে আনা। পাপ করলে তার অংশ ত আমাদেরই নিতে হবে।"

পুরোহিত বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া, "তা' 'মূল্যানাং দ্রব্যং শুদ্ধং।' বামুনের ঘরের জিনিষ, দাম দিলেই শুদ্ধ, ওতে কিছু দোষ হয় না। কি কি চাও, টাকা ফেলো, কিনে নাও। জেনো, স্বর্গের সিঁড়ির চাবি এই বামুনের ট্যাঁকে। আমরা যা' ব্যবস্থা দেবো, তার নড়চড় করে কে?"

যজমানকে রাজী করিয়া প্রৌঢ়া তাহার সাতবারের উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসম্ভার বাহির করিয়া যাত্রীর পারের দেনা-পাওনা পরিশোধের উপায় করিয়া দিল। সঙ্গিনীরা নিজেদের আনীত পনের টাকা দ্রব্যের স্থলে মাত্র পাঁচ সিকায় এমন কার্য্য উদ্ধারের সদুপায় জানা না থাকার নিমিত্ত নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সধবার অলক্ত রঞ্জিত পা দু'খানিতে আবার নূতন করিয়া রক্তাক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেবা-ব্রতচারী প্রহরীর উপর প্রহরীগিরি করিতে আসিয়া নিশীথ ব্যাপারটা সচক্ষে দেখিল। ধর্ম্মের নামে এত বড় ভণ্ডামীতে প্রাণ জ্বলিয়া উঠিলেও, মুখে একটী প্রতিবাদের ভাষা সে বাহির করিতে পারিল না; কারণ, শান্তি-রক্ষকের দায়ীত্ব মাথায় লইয়া নিজেই অশান্তির একটা ঝড় বহাইতে প্রাণ নমিত হইয়া পড়িল। বিশেষ, মানুষ যে স্থলে জানিয়া-শুনিয়া ঠকিতেছে, সে স্থলে তাহা-

দের সেই ঠকার আনন্দে বাধা দিয়া ঠকুকে শাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করার নাম যে ইহাদের চক্ষে অধর্ম্ম সে তাহা বুঝিত, আর বুঝিত বলিয়াই লজ্জায় ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া সে দ্রুত-পদে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

কিন্তু কর্ত্তব্য মুহূর্ত্ত পরেই আবার তাহাকে সেই পথে টানিয়া আনিল। এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিল—চক্কুকে পুরোহিত-দলের কার্য্য ও আচরণের প্রতিভূ হইতে কোনমতেই সে দিবে না; যত্নে অন্যদিকে সরাইয়া রাখিবে। নিকটে আসিতেই কিন্তু তাহার সে বাঁধনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। পুরোহিত উচ্চ চীৎকারে বলিতেছিল, "খাটলুম আমি, টাকা দেব ওঁকে—আরে কি আমার এরে!"

প্রৌঢ়া মেঘ গর্জ্জনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "যা' ফুরোন আছে তোর সঙ্গে, তাই ত নিবি। কাঁচা পয়সা হাতে পড়েছে বলে মাথা গরম করলে চলবে কেন?"

যুবক দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "রেখে দে তোর ফুরোন! আমার দক্ষিণের টাকা ওঁকে দিই—কি আমার আবদার রে! বেশী চেঁচামেচি করবি ত তোর সব ভুর ভেঙ্গে দেব এখুনি।"

প্রৌঢ়া আগুন-মাখা কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দেখ্ কেলো, লাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব হতভাগা!"

যুবতীদ্বয়ের একজন তাড়াতাড়ি বাধা দিতে চাহিয়া বলিল, "ছি মা, হাজার হোক্ বামুন ত! ও কথা বলতে আছে?"

প্রৌঢ়া হাত মুখ নাড়িয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ লো, হ্যাঁ, তুই যত বড় সধবা, ও-ও তত বড় বামুন। এত বুক উৎলে থাকে, বেরিয়ে যা' ওর সঙ্গে, তোদের না হলেও আমার চলবে।"

আর দাঁড়াইবার প্রবৃত্ত হইল না। নিশীথ দ্রুতপদসঞ্চারে স্থানত্যাগ করিল।

আধ ঘণ্টাটাক্ পরে নিশীথ আবার যখন ফিরিয়া সেই পথে আসিল, তখন রীতিমত একটা হৈচৈ স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই সে দেখিল—একটী মেয়ে সজ্ঞাহারা হইয়া ভূতলে পতিত। ঠিক তাহারই পার্শ্বে প্রৌঢ়া ও যুবকের মধ্যে মল্ল-যুদ্ধের কসরৎ চলিতেছে।

চার

হাসপাতালের ক্যাম্পের মধ্যে প্রথম চক্ষু উন্মীলন করিয়া রোগিনী দেখিল নিশীথকে। ডান হাতে এক টুকরা বরফ লইয়া তাহারই চোখে মুখে বুলাইতে বুলাইতে বাম হাতে ধীরে ধীরে সে বাতাস করিতেছিল। দারুণ ক্লান্তিতে প্রাণের বোঝা নিশ্বাসে নামাইয়া দিয়া সে আবার চক্ষু নিমীলিত করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশীথ ডাকিল, "এঁর বোধ হয় জ্ঞান ফিরে এসেছে মণীশ তুই এঁর কাছে খানিক বোস। আমি আর একটা পাণ্টা চক্কোর দিয়ে আসি।"

রোগিনী আবার চক্ষু উন্মীলন করিল। দেখিল, আপাতকরণীয় কার্য্য সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি দু'-একটী উপদেশ দিয়া নিশীথ বাহিরে যাইতেছে। তৃপ্তি-কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। মণীশ নিকটে আসিয়া নিশীথের পরিত্যক্ত টুলটীতে বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন?"

"ভাল।"

কিন্তু সেই 'ভাল' কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে তাহার বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। ক্ষিপ্রহস্তে একটা 'টাম্বলার গ্লাসে' গরম দুধের সহিত কি একটা মিশাইতে মিশাইতে মণীশ নিকটে আসিয়া বলিল, "এইটুকু খেয়ে নিন্ ত? কষ্টটা অনেক কমে যাবে।"

দু'-চার ঢোক খাইয়া রোগিনী কিছু সুস্থ হইল। নীরবে অল্প কিছুকাল কাটাইয়া সে আর্ত্ত করুণ কণ্ঠ কাঁপাইয়া উচ্চারণ করিল, "আপনারা আমায় বাঁচিয়েছেন।"

মণীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠিক্ আমরা বাঁচিয়েছি স্বীকার করে নিলে নিশীথ দা'র ওপর অত্যাচার করা হবে। এই কতক্ষণ যিনি বেরিয়ে গেলেন, বাঁচিয়েছেন তিনিই—এমন কি, সেবার ফাঁকে এতটুকু অন্যে যে বাহাদুরী নেবে, সেটুকুও তিনি করতে দেন নি।"

যুবতীর কাতর কণ্ঠ দুলিয়া উঠিল, "কোথায় গেলেন উনি?"

"রোদে। আমাদের কর্ম্মী-সঙ্ঘের ছেলেরা কে কিভাবে কাজ করছে না করছে তারই ওপর নজর রাখতে।"

"কতদূর যাবেন উনি?"

"তা' প্রায় সারা দ্বীপটায়। যেখানে যেখানে মানুষের গতিবিধি আছে, সেই সব জায়গাতেই আমাদের লোক ছড়িয়ে আছে। তাদের অভাব-অভিযোগের আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট কথার উৎসাহ দেবার জন্যে উনি প্রায় সবার কাছেই যাবেন।"

নিরুত্তরা রমণী খানিক স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল। একা স্ত্রীলোকের পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা মণীশ কেমন বিপদের মধ্যেই ধরিয়া লইয়া যাহা হউক একটা কিছু বলিবার জন্যই যেন বলিল, "বড় কষ্ট হচ্ছে কি?"

রমণী মুখের ফিকে হাসিটুকু হাত দিয়া চোখ রগড়াই-বার অছিলায় ঢাকিয়া রাখিয়া বলিল, "না। ভাবছি,

পরের জন্যে এত কষ্ট মাথায় তুলে নেয় মানুষ কোন্ আশায়! মাপ করবেন, স্বার্থপর লোক আমরা, স্বার্থের দিক্‌টাই বেশী বুঝি।

উত্তরে মণীশ বেশ একটু উৎসাহিতভাবেই বলিল, "কেন, আপনার মত বোন্ কুড়িয়ে পাওয়াটা কি স্বার্থের হিসেবে আমাদের একেবারেই লোকসান বল্‌তে চান্।"

"তা' বই কি।"

"কিন্তু ভুল ওইখানেই। সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য-পথটা যতটা সহজ সরল হ'য়ে আসে, এতটা আর কিছুতে আসে না, আস্‌তে পারে না।"

কথাটা এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়াই সে দৃষ্টান্তস্বরূপ পুরাণের অনেক চরিত্রের অবতারণা করিয়া আপন মতের সার্থকতা সমর্থন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঠিক্ সেই সময় তাহার সহকর্ম্মী মনসিজ নিকটে আসিয়া বলিল, "কি হে, বড় লম্বা বক্তৃতা আওড়াচ্ছ যে, কিন্তু শুন্‌ছে কে, শ্রোতা যে ঘুমুচ্ছে।"

মণীশ তাহার এত বড় একটা ভুলের উত্তরে চাপা হাসির নর্ত্তনশীল তরঙ্গ ছুটাইয়া দিয়া বলিল, "এ মেয়ে জাতটাকে আমি কিছুতে চিনে উঠ্‌তে পারলুম না মনসিজ! তোলবার মুখে বেশ বড় বড় কথাই এরা তোলে, কিন্তু জবাব কিছু শোন্‌বার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে—ঘরেও তাই, বাইরেও তাই।"

"কিন্তু এর পাল্‌টা জবাব দেবার ওর পক্ষে কিছু আছে। বেচারী সাধ করে অজ্ঞান হওয়ার অভিনয়টা করে নি। পুরুত-ঠাকুর রীতিমত গলা টিপে ওকে সাহায্য করেছে।"

লাফাইয়া উঠিয়া মণীশ বলিল, "তাই না কি! শালা ক্রুট্, পেজমো করবার আর জায়গা পায় নি।"

"এখুনি লাফিও না দাদা, আরও কিছু শোনো জাতে তিনি বামুন ত নন্‌ই, কায়েতও নন্, শুঁড়ী। চোদ্দ পুরুষে কেউ তার পুরুতগিরি করে নি।"

একটা উচ্চ ক্ষোভের হাসি হাসিয়া উঠিয়া মণীশ বলিল, "আমাদের হিন্দু জাতটাকে সবাই মিলে তা' হ'লে আচ্ছা করেই তু'সাধোনা করছে, কি বলো? যাক্, এতেও যদি চৈতন্য হয়।"

মনসিজ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, "ছাই হবে! ব্যাপার শুনে আমি যাত্রীদের হাতে ধ'রে মানা করেছি। উত্তর কি পেয়েছি জানো, 'ওঁর ফল উনি ভুগ্‌বেন, তা'তে আমাদের কি মশায়, এ বিদেশে নেবার লোক একজন চাই ত।' এর-পরও তুমি কি করতে চাও?"

"করবো যাত্রীগুলোর শ্রাদ্ধ, আর সেই সঙ্গে এ দলটার গয়ায় পিণ্ডের ব্যবস্থা। আর কি?"

উত্তেজিতভাবে তাহারা উভয়েই বাহির হইয়া গেল।

রমণী ঘুমায় নাই। নিস্তেজভাবে পড়িয়া তাহাদের সকল কথাই শুনিতেছিল। এখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় হাতের কনুই দিয়া শয্যার উপর বল প্রয়োগে নিজের হারাণ শক্তির পুনরোদ্ধারে ব্যস্ত হইল, কিন্তু পারিল না। দারুণ অবসন্নতা ছুটিয়া আসিয়া তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। নির্জ্জীবের মত আবার সে শয্যার উপর পড়িয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টাটাক্ পরে মণীশ নিরীহ ভাল মানুষটীর মত ফিরিয়া আসিয়া রোগিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নিশীথ দা' কি মানুষ?"

হাসিবার চেষ্টা পাইয়া রমণী বলিল, "কেন বলুন ত, আমারও সন্দেহ হয় বটে।"

"নইলে নিজে বসে গিয়েছেন মন্ত্র পড়াতে, পয়সা-কড়ি যা' কিছু ওই নচ্ছার বেটার হাতে তুলে দিচ্ছেন—এমন লোক আর দেখেছেন?"

রমণী চঞ্চল চক্ষু তুলিয়া বক্তার দিকে একবার চাহিল মাত্র, মুখে কিছুই বলিল না।

মণীশ বলিয়া চলিল, "সাধারণভাবে দেখ্‌তে গেলে আপনার হয় ত মনে উঠবে, নিজে খেটে পরকে দেওয়া কেন? কিন্তু 'কেন'র উত্তর দেয় কে? ওইটুকুই যে তার বিশেষত্ব—যেখানে সবাই কারণ হাতড়ে অকারণ মাথা ঠুকে মরবে, সেইখানেই ওর মাথা খেল্‌বে সবার চেয়ে বেশী। এতদিন একসঙ্গে আছি, ও দাদাটীকে চিনে নেওয়া দেখ্‌ছি আমার কর্ম্মে হলো না।"

"জিজ্ঞেস করলেই পারতেন?"

"করব না কেন, জবাব পেয়েছি শুধু হাসি, মানুষের মধ্যে জলজ্যান্ত প্রহেলিকা যদি কেউ থাকে, তবে সে আমাদের ওই দাদাটী।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া মণীশ প্রাণটাকে যেন কিছু হাল্‌কা অনুভব করিল। তারপর ধীর-মার্জ্জনা-চাওয়া-কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে একা ফেলে যাওয়াটা যে আমার কত বড় অন্যায় হয়েছে, দু'-এক কথায় কেবল সেইটেই বুঝিয়ে দিয়ে তিনি আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তেমন বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি বোধ হয় আপনাকে?"

মেয়েটী ধীর-মধুর-কণ্ঠে বেশ একটু দোল দিয়া বলিল, "নেবার যতটুকু অধিকার, তার অনেক বেশীই আপনাদের কাছ থেকে আমি নিয়ে ফেলেছি। আপনাদের ও খেয়ালী দাদাটীর কথা শুনে অনর্থক আর কতগুলো বোঝা ঘাড়ে চাপাবেন না, বইতে পার্‌ব না।"

মণীশ কথাটা সম্পূর্ণ কাণে না তুলিয়াই জবাব দিল, "তা' যা' ব'লেছেন, খেয়ালীই বটে! এম্‌নে বৌদি'র আঁচল

ছেড়ে কিছুতেই ত বেরুবেন না; এলেন যদি, এমন ক্ষেপা যে, নিজের খিদে-তেষ্টা বলে একটা কিছু যে থাকতে পারে তার খোঁজই নেই—ও কি, উঠছেন কেন?"

"স্নান করবো।"

"সে কি! এই সন্ধ্যেবেলা?"

রমণী হাসিয়া বলিল, "এত লোকে স্নান করছে, দেখি, তাদের ফাঁকে পুণ্যিটা যদি কিছু আসে। আর না এলেও তেমন ক্ষতি হবে না; শরীরটা ত ঠাণ্ডা হবে।"

মণীশ বলিল, "বা, আপনিও যে দেখ্‌ছি আমাদের দাদাটীরই এক জুড়িদার!"

রমণী কথা কহিল না। একটা হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ মণীশের মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া পটাবাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজয়ার সাদর-সম্ভাষণ

গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপন-দাতা, শত্রু-মিত্র সকলের নিকটেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আমরা আমাদের বিজয়ার প্রীতি-অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি—দারিদ্র্য-জরা-প্রপীড়িত ভারতবাসীর মুখে অন্ন, বুকে শান্তি ফিরিয়া আসুক, উৎসবের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ হউক, বিজয়া-সম্মেলন সার্থক হউক!

পুস্তক-পরিচয়

গুপ্তিপাড়া মঠ বিবরণ—প্রথম খণ্ড—৫, সরকার-বাড়ী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে লেখক শ্রীবারিদ-বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দক্ষিণা, চার আনা।

গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত বাঙ্‌লা দেশে এইরূপ পুস্তক প্রচার করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার সৎ-সাহসেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসা প্রশংসার যোগ্য। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেনবাবু এই পুস্তকের অভিমতে ঠিক্‌ই লিখিয়াছেন—"* * * ভবিষ্যতে এরূপ বিবরণ বঙ্গের ভাবী ইতিহাসের অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রীতি—লেখক, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক - ডাক্তার বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ, ১৫৩, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

বসন্তবাবু পুস্তকখানিতে জগৎপূজ্য স্বামীজির অমূল্য উপদেশগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া দেশবাসীর প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার চয়ন উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি। অধুনা দেশে এইরূপ সৎ-গ্রন্থের প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বার্ষিক শিশুসাথী—একাদশ বর্ষ, ১৩৪৩—প্রকাশক, বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য, দেড় টাকা।

এই বার্ষিক সংগ্রহ-পুস্তকখানি বর্ষে বর্ষে শিশুদিগকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। এ বৎসরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষেও বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট রচনাসম্ভারে 'শিশুসাথী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বালক-বালিকাদিগের মনের খোরাক ইহাতে প্রচুর পরিমাণেই আছে। বইখানি এতই সুন্দর যে, শুধু শিশুরা কেন, তাহাদের পিতা-মাতাও ইহা একবার পড়িয়া দেখিবার জন্য সন্তানদিগের নিকট হাত পাতিবেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীফণী গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র-সম্পদে ইহা অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'শিশুসাথী'র উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কাফ্রি মুল্লুকে—লেখক শ্রীবরদাকুমার পাল—প্রকাশক, বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য, দশ আনা।

এই পুস্তকখানিতে জানিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। কাফ্রিদেশের দৃশ্যাবলী যেন পাঠকের চক্ষের সম্মুখে জল্‌জল্ করিতে থাকে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল। তাঁহার নিরীক্ষণ শক্তিও প্রশংসনীয়। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ এক্ষণে ছেলেদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের দৃষ্টি যে এদিকে গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ত্রয়ী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল

পাশের বাড়ীর ছোট মেয়ে পুষির সঙ্গে প্রকাশের ভাবী ভাব। পুষিও প্রকাশ দা' বল্‌তে অজ্ঞান।

প্রকাশ হলো এ বাড়ীর ঘরের ছেলে। সিনেমায় যাবার সময় প্রকাশ হয় এদের নিত্যসঙ্গী, পুষির রুগ্ন বোন্‌টার জন্যে হঠাৎ যদি কবিরাজ কোনদিন ডাকপাখীর ঝোল খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন, তা' হ'লে সেই পক্ষী হত্যার জন্য ডাক পড়ে প্রকাশকে, প্রকাশের কোনদিন মাথা ধরলে পুষির সেদিন আদৌ খিদে থাকে না; কারণ, হাজার ছট্‌ফট্‌ করলেও প্রকাশ দা'র বাড়ীতে সে কোনমতেই যেতে পারে না,—প্রকাশের বাবা এসব মোটেই পছন্দ করেন না।

প্রকাশের বৃদ্ধ পিতা লক্ষণবাবু ভীষণ কড়া প্রকৃতির লোক। যদিও তিনি তাঁর বড় দুই ছেলেকে সাগর পারে পাঠিয়েছেন শিক্ষার জন্যে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি খুব সাত্ত্বিক। তিনি হচ্ছেন সেই শ্রেণীর বুড়ো, যারা নিজেরা নামাবলী ফেলে ওভার কোট পরে এবং গৃহিণীদের কাছে সাবেকী চালের কথাবার্ত্তা বলে' বাড়ীর বউ-ঝিকে ঠাকুরমা সাজিয়ে রাখতেই ভালবাসে।

কিন্তু প্রকাশের খবর তার বাবা খুব কমই রাখেন।

পুষি বল্লে—'প্রকাশ দা', আমি কি পরীক্ষায় ফেল হবো?'

প্রকাশ বল্লে—'আলবৎ! কারণ, আজকাল যখন ফেলের চাইতে পাশের সংখ্যাই বেশী, তখন বোঝা যাচ্ছে ফেল করার মধ্যে এমন একটা কৃতিত্ব আছে, যা' অধিকাংশের নেই।'

চোখ মুখ ফুলিয়ে পুষি বল্লে—'হ্যাঁ, নিজে সব পাশ-টাশ শেষ করে বসে আছে কি না, তাই; কেন, নিজে ফেল করতে পারো নি কেন?'

প্রকাশ বল্লে—'ঐটুকুই ত ভুল হয়েছে পুষি, ঐ পাশ করেই বড় ঠকে গেছি, তা' নইলে যদি ফেল করতুম, তা' হলে এতদিনে—'

পুষির মা তখন ছোটদের ছেঁড়া জামা ইত্যাদি নিয়ে সেলাই করছিলেন। বল্লেন—'কথা শোন ছেলের—ঠাকুরের ইচ্ছেয় পাশ করে ওরকম কথা বলতে নেই রে প্রকাশ।'

পুষি বল্লে—'সে হবে না প্রকাশ দা', আমায় এই একটা মাস একটু পড়িয়ে দিতে হবে।'

প্রকাশ বল্লে—'বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু কখন পড়বি?'

—'যখন তোমার সুবিধা।'

প্রকাশ বল্লে—'দেখ্‌, আমি কিন্তু সন্ধ্যের পরে পারবো না, বিকেলে পড়াতে পারি।'

পুষির মা বল্লে—'কেন, সন্ধ্যের পর কিছু কাজকর্ম্ম করছিস্‌ না কি রে।'

পুষি বল্লে—'না মা, প্রকাশ দা' থিয়েটারের আখড়া দিচ্ছে। ক্লাবের 'সাজাহান' অভিনয়ে সে যে 'দিলদারে'র পার্ট নিচ্ছে তা' বুঝি জানো না।'

কলে জল আসতে পুষির মা একতোলায় নেমে এলেন।

ইতিহাসের পাতাটা খুলে পুষি বলে—'প্রকাশ দা', আমার এই ইতিহাসে বোধ হয় ভুল আছে।'

প্রকাশ বল্লে—'কেন?'

—'দেখো না এখানে লিখ্‌ছে যে, সাজাহান তাজমহল তৈরী করেছিলেন তাঁর স্ত্রী মমতাজের জন্য, কিন্তু আমি বাবার কাছ থেকে শুনেছি সাজাহান তাঁর স্ত্রী নূরজাহানের জন্য তাজ তৈরী করেছিলেন।'

এম্‌নি ধারা কথাবার্ত্তার মাঝখানে প্রকাশ হঠাৎ বল্লে—'আচ্ছা পুষি, সাজাহান কেন তার বেগমের জন্যে এমন একটা তাজ তৈরী কর্লে বলো ত।'

পুষি বল্লে—'তা' করবে না কেন, ও যে ওর বউ।'

প্রকাশ বল্লে—'তা'তে কি? বউ হলেই কি তাজমহল তৈরী কর্ত্তে হবে।'

পুষি এর উত্তরে একটু ভেবে নিয়ে প্রকাশের দিকে চেয়ে বল্লে—'হাঁ, করতে পারে, যদি কি না বউকে তেম্‌নি ধারা ভালবাসে।'

প্রকাশ বল্লে—'তাই না কি, কেন আমি ত এই তোমায় এত ভালবাসি, কিন্তু—'

পুষি প্রকাশের মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্লে—'ছি!'

প্রকাশ তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে পুষির পিঠটা জড়িয়ে ধরে আরও কাছে টেনে আনে, তারপর আর এক হাত দিয়ে পুষির হাতটা সরিয়ে নিয়ে—

—'পুষি—'

তেতালার ঘরে যে মানুষ কোনও দিন আসে না,—সেই পুষির মা এই তেতালায় এসে গম্ভীর কণ্ঠে মেয়েকে ডেকে বল্‌লেন—'পুষি, উঠে আয়।'

পুষির বাবা তার পরের রবিবারে আর একবার লক্ষ্মণ-বাবুর কাছে হানা দিলেন, কিন্তু কড়াপ্রকৃতির বুড়ো লক্ষ্মণ সোজাসুজি হাঁকিয়ে দিলেন। বল্লেন—বড় ছেলেদের বিয়ে না দিয়ে ও বিয়ে হতেই পাবে না। কথাবার্ত্তা পাকা করে রাখতেও তাঁর আপত্তি। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর দশ হাজার টাকা পণ চেয়ে বল্লেন—'পাবেন ত এধারে আসবেন, নইলে মিথ্যে বিরক্ত করবেন না।'

প্রকাশ তার মেজদি'র মারফৎ আর একবার চেষ্টা করলে, কিন্তু, অবস্থা পূর্ব্ববৎ—বুড়োর সেই একই কথা।

পরের ঘটনা প্রকাশের বন্ধুরা সবাই জানে। প্রকাশকে কেউ ডাক দিলে তার চাকর বল্‌ত—'বাবু বাড়ী নেই।'

বন্ধুরা তার সংবাদ খুব কমই পেত, শেষে তাকে এমন সব আপত্তিকর স্থানে কেউ কেউ দেখ্‌তে আরম্ভ করলে যে, তা'তে করে তার পুরাতন বন্ধুরা সকলেই বিরক্ত হয়ে তার সঙ্গ ছাড়লে; সেই সঙ্গে পুষির বাবাও তার বিয়ে দেওয়ার জন্যে যে-পাড়ায় মেয়ের এমনি সব কাহিনী রটেছে, সেই পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে পাত্রের সন্ধান সুরু কল্লেন। কিন্তু সন্ধান আর শেষ হলো না। রবিবার, রবিবার পাত্র দেখা ছেড়ে তাকে অবশেষে ডাক্তার ডাকতে হলো।

ডাক্তার এসে প্রথমেই বল্লেন—'মেয়েকে চেঞ্জে পাঠান।' শেষে বল্লেন—'ফুসফুসের অসুখ।'

কথাটা সবাই বুঝে নিয়ে আঁৎকে উঠলো। পুষির মা একবার অলক্ষ্যে চোখ মুছলেন।

দুই

বুড়ো লক্ষ্মণ যখন হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে ছেলেকে এমনি করে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বুঝিয়ে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময় প্রকাশের মেজ ভাই প্রতাপ থাকতো এসেক্সের এক সাহেব বাড়ীতে 'পেয়িং গেষ্ট' হয়ে। 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে প্রতাপকে এই বাড়ীই প্রথমে ঠিক্ করে দিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতাপের কেমন এই বাড়ীটাই ভাল লাগে। এদের ব্যবহার বড় সুন্দর, বিশেষ করে গৃহকর্ত্রীর।

প্রতাপ এখানে এসেছিল একাউণ্টেন্সী পড়তে। রোজ সকালে সে ব্রেকফাষ্টের পর বেরোয় তার স্কুলে, আবার সন্ধের সময় ফিরে আসে ডিনারের আধঘণ্টা আগে। স্নানাদি সেরে নিয়ে ডিনারে বসে।

মিঃ জোন্স সেই বাড়ীর মালিক। চিরকাল 'নেভি'তে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে দেশে এসে বাস করছেন। লোকটি বড় ভদ্র। 'নেভি'র গল্প বলতে বড়ই ভালবাসেন, আর সেই সঙ্গে নিজের গর্ব্বও সামান্য পরিমাণে করে থাকেন।

সেদিন ছিল রবিবার। প্রতাপ সারাদিন বাড়ীতেই ছিল, বিকেলের দিকে জোন্সের ছোট মেয়ে জিকি জোন্সের সঙ্গে একসঙ্গেই বেড়াতে বেরুল।

দু'জনে ওরা বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর এগোল। ওকরাইড পার হয়ে ঈগল ফল্‌সের ধার দিয়ে বেলে কাঁকর দেওয়া পথের ওপর দু'জনে পাশাপাশি কতই না গল্প

করতে করতে এগিয়ে যায়। জেসপের ডেয়ারী ফার্ম ছাড়িয়ে সেণ্ট সিসিলের অর্কিড্‌কে ডাইন রেখে ছ'জনে পাহাড়ের ওপর উঠতে উঠতে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে আসে। মার্চ্চের দিকে নূতন বসন্ত বায়ু এখন পাইনের কচি পাতার মধ্যে কি যে একটা সম্মোহন স্বরের মূর্চ্ছনা দিয়ে নবীনের প্রাণে সব নীতিবিহীন উন্মাদনার সঞ্চার করে, তা'ঐ সমাজের নীতিকারক বৃদ্ধের দল সব উপলব্ধি করবে কি করে? বেড়াতে বেড়াতে এল ওরা অপার এসেক্সের ফুলবাগানে। সেখান থেকে ছ'জনে হাত ধরাধরি করে ছড়ানো পাথরের ঢিবি পার হয়ে পাতলা মেঘের ম্লান আলোয় এসে দাঁড়ালো উন্মুক্ত আকাশের একেবারে নীচে। সান-ফল্‌সের ঝিরঝির শব্দে এই পাহাড়ের চূড়াটি যেন সর্ব্বদা মুখর হয়ে আছে। কলমাস পর্ব্বতের বড় একটা পাথরের ওপর ছ'জনে ওরা পাশাপাশি বস্‌লো—প্রকৃতির অবাধ মুক্তি ওদের প্রাণময় আবরণে সমাজের স্পর্শ থেকে অনেক দূরে যেন সরিয়ে নিয়ে এসেছিল—সেখানে ওদের মন হ'লো বিরাট—অনন্ত নীল আকাশ ঐ বিরাট দিগন্তকে যেমন করে আলিঙ্গনে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে তার জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে দিক্‌চক্রবালের একদিনের জন্য অবকাশ-প্রাপ্ত অসংখ্য ধূমবাহী চিম্‌নির স্তম্ভে, তেম্‌নি করে প্রতাপ যেন চাইলে তার কঠিন মুষ্টির মধ্যে জিকির পেলব দেহকে আলিঙ্গন করে একেবারে গ্রাস করতে, আর জিকিও নারী-ধরণীর মত নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই লুপ্তির মধ্যে নিজের সংজ্ঞাকে ভোগ করে ধন্য হলো। মেঘময় ধূসর আকাশের কোলে তখন পক্ষ বিস্তার করে দু'-একটা নভচর এদের মিলনের সাক্ষী হয়ে রইলো। পাহাড়ের নিম্নবর্ত্তী কোটরে রঙিন সোয়ালো এবং চামচিকার দল তখন আপন আপন বাসস্থান ও রাত্রির বিশ্রাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বহুদূরে কোন অজ্ঞাত সাহেব মেম তাদের বড় একটা লোমওয়ালা কুকুরকে সঙ্গে করে দিগন্তের গায়ে গায়ে চলন্ত ছবির মতন চল্‌তে থাকে—মিস জোন্স ও প্রতাপ তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে কত কি সব বাজে গল্প করতে বিভোর হয়ে ওঠে।

আকাশের আলো তখন ধীরে ধীরে কম্‌তে থাকে, পটের ওপর আঁকা ঐ দূরের দেশগুলিতে বিজলীর বাতি সব জ্বলে ওঠে। পাহাড়ের চূড়া থেকে এসেক্সের গ্রাম তখন আলোক মালায় দীপালী রজনীর ন্যায় দুল্‌তে থাকে। জিকি তখন উঠতে চায়। সে বলে—'ডিনারের সময় হলো।'

কিন্তু খাওয়াটা যে নিয়মমত করা উচিত, প্রতাপ ঠিক্ এ কথা বিশ্বাস করে না। সে একটু পেটুকের মত মিষ্টিকে বেশী করেই গ্রাস করতে চায়। বলে—'ডিনার টাইম উতরে যায় ত ক্ষতি কি—অসময়ে খাওয়ারও ত একটা আনন্দ আছে।'

কিন্তু তারা উঠ্‌লো।

পথে চল্‌তে চল্‌তে জিকি বল্লে—'মাকে বল্‌তে হবে।'

কথা শুনে প্রতাপ আঁৎকে উঠ্‌লো। বল্লে—'সে কি!'

জিকি বল্লে—'ইংলিশ মেয়ে যখন যা' করে সবই সে মা বাপকে বলে,—বিশেষ করে সেটা যদি ঠিক সাধারণ কাজ না হয়।'

প্রতাপের একটু ভয়ও হলো। কি জানি হয় ত বা তাকে জোর করে বিয়ে করার মৎলব।

...জিকি বল্লে—'বাস্তবিক, তোমাকে ভালবাসা আমার দারুণ অন্যায়; কারণ, আমি ত আর তোমায় বিয়ে করতে পার্বো না।'

প্রতাপ বল্লে—'কেন?'

জিকি বল্লে—'না, আমি তোমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে পারবো না—তার চেয়ে আমি এখানে 'ক্রকারি' ও 'কাট্‌লারী'র দোকান করে হ্যারি ও ডিককে 'ফ্লার্ট' করেই আনন্দে কাটিয়ে দেবো।'

আহারাদি শেষ করে ওঠবার পূর্ব্বে জিকি একটু ঘাড় হেঁট করে সাম্‌নের চেয়ারে পিতামাতাকে লক্ষ্য করে অপরাহ্নের সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে সঠিক্ বলে গেল।

সবটুকু শুনে মা একটু গম্ভীর হয়ে মেয়েকে বল্লেন—'এটা তুমি ভারী অন্যায় করেছো, তুমি হয় বিয়ে করো, না হয়—'

মেয়ে বল্লে—'সে হয় না।'

টেবিল থেকে ওঠার সময় জোন্স বল্লে—'প্রতাপ, এটা কিন্তু উচিত নয়, বিয়ে যখন করতেও রাজী নয়, তখন তুমি ওভাবে ওর সঙ্গে মিশো না।'

নিরুত্তরে প্রতাপ তার বিয়ারের গ্লাসে অল্প অল্প চুমুক দিতে লাগ্‌লো।

আহারাদির পরে ওরা নিয়মিতভাবে ড্রয়িং-রুমে সবাই মিলে তাস খেল্‌তে বস্‌ল বটে, তবে সকলেই যেন কেমন একটু গম্ভীর ছিল।

তিন

ওদের বড় ভাই প্রমথ ঠিক্ সেই সময় ক্যানাডায় মিঃ রবার্টের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে বসেছে। লক্ষ্মণের বড় ছেলে প্রমথ আজ বছর ছয়েক হলো ক্যানাডায় ফোর্ড মোটর্সে চাকরী করে। চাকরী বড় মজার। ফোর্ডের আট মাইল ব্যাপী লম্বা কারখানার এসেম্‌ব্লি-প্ল্যাণ্টে ফ্লাই হুইলের জাম নাট্‌ পরিয়ে সে তার প্রথম চার বছর কাটিয়েছে, তারপর সে দু'বছর যাবৎ পেটি-প্রডাকসান্‌ প্ল্যাণ্টে অটোম্যাটিক লেদের সাহায্যে একটা বেঁকাচোরা গোছের কি যে জিনিষ তৈরী করছে, তা' সে নিজেই ঠিক্ জানে না। সেটা যে মোটরের ঠিক কোনখানে লাগে সে চার বছর এসেম্‌ব্লিতে থেকেও তার কিছুমাত্র হদিস পায় নি। তা যাক্, এতে তার কোনো রকম দুর্ভাবনাও নেই। তার কাজ হচ্ছে ঐ রকম বেঁকাচোরা লোহার একটা জিনিষ দৈনিক হাজার হাজার তৈরী করা।

তবে এবার সে বড় বিরক্ত হয়েছিল তার ঐ ফ্যাক্টরীর কাজে। ফোরম্যান্‌কে বলে সে ছুটী চাইলে। বল্লে—এবার একটু বেড়াতে যাবে। ফোরম্যান তার ছুটী কিন্তু মঞ্জুর কল্লে না। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক্ হলো প্রমথকে দেড়-মাসের জন্য পানামায় মোটর-প্রদর্শনীর জন্য যে একদল কর্ম্মচারী যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে ওকে যেতে হবে। ফ্যাক্টরীর বাঁধা নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়ে ও যেন কথঞ্চিৎ সুস্থ হলো।

এমনি করে পানামায় যাবার ঠিক্। প্রমথ যখন তার বন্ধু মিস্ রবার্টস্‌কে সেই সংবাদটি দিলে, তখন সেও লাফিয়ে উঠ্‌লো। বল্লে—'আমিও যে যাব।'

সে হলো ফোর্ডের 'সো-রুমে'র একজন 'সেল্‌স্ গার্ল'।'

দেড় মাস পরে ওরা পানামা থেকে ফিরে এল, এবং তারপর রবার্টসের এই ডিনার পার্টি।

বরফ জমা রাস্তার ওপর দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা একটি কুপে-গাড়ী চালিয়ে প্রমথ গিয়ে দাঁড়ালো ঐ রবার্টসের পল্লী-ভবনের দরজায়। ফোর্ড ফ্যাক্টরীর অতি সামান্য মিস্ত্রী এই প্রমথ; দৈনিক সাত ডলার মজুরীতে ও কাজ করে। থাকে একটা কম দামী হোটেলে; অর্থাৎ, সেখানে ওর খরচ পড়ে হপ্তায় বিশ ডলার—তারপর পোষাক-পরিচ্ছদ ত আছেই। এ ছাড়া, ফোর্ডের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকেই মোটর রাখতে হয়—প্রমথর বিয়ে করতে এক-একবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু ঠিক মত সাহস সে পায় না।

—গাড়ীখানা 'পার্কিং-এ' রেখে দারুণ শীতের মধ্যে ওভার কোট জড়িয়ে ও 'ষ্টীয়ারিং' থেকে নাম্‌লো। তারপর 'লিফ্‌টে' করে সোজা উঠে গেল এগার তলায়, সেইখানে একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে রবার্টসরা থাকে।

মিস্ রবার্ট এসে প্রমথর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। মিঃ রবার্ট ওর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে মেয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন ডিনারের জোগাড় করতে। গরীবের ছোট ছোট ফ্ল্যাটও বাইরের তুষারপাতকে উপেক্ষা করে দিব্য গরম,—বিজলীর সাহায্যে ওরা দারুণ শীতের মধ্যেও 'ট্রপিকে'র উত্তাপকে ভোগ করে।

ওভারকোট ও কোট খুলে মোটা কোচের মধ্যে ডুবে বস্‌লো আমাদের লক্ষ্মণের বড় ছেলে প্রমথ।

তারপর সুরু হলো ডিনার।

টেবিলে বসে এদিক-ওদিক নানারূপ কথাবার্ত্তার পর

'সোনার সংসার' চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী।

মিসেস্ রবার্ট প্রমথকে লক্ষ্য করে বল্লেন—'মিঃ চ্যাটো, আমি কিন্তু একটা প্রোপোজাল দেব ; তোমরা এক কাজ কর, তুমি আর আমার মেয়ে তোমরা দু'জনে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হও।'

উত্তরে প্রমথ কিছু বলার আগেই মিস্ রবার্টস্ তার মাকে বল্লে—'কেন বলো ত। মিঃ চ্যাটোকে তুমি ও রকম করে বিরক্ত কর।'

প্রমথ বল্লে—'না, বিরক্ত কি, এ ত আমার আশীর্ব্বাদ।'

প্রমথর হাতের ওপর চামচের ঘা দিয়ে মিস্ বল্লে—'নটি বয়!' তারপর মায়ের দিকে চেয়ে বল্লে—'ছিঃ, ও সব বিয়ে-থা করা হচ্ছে অসভ্যতা।' রবার্টস্‌কে লক্ষ্য করে সে বল্লে—'না বাবা, ওরকম এইট্টিন্থ্ সেঞ্চুরির বিয়ে আমি করবো না।'

পিতা বল্লেন—'কেন রে, মিঃ চ্যাটোকে তুই ও রকম করে হতাশ করবি কেন?'

মাথার চুলগুলো নাচিয়ে নিয়ে চপটায় মাষ্টার্ড মাখাতে মাখাতে মিস্ বল্লে—'হতাশ? একটুও না, মিঃ চ্যাটো, আমি কি তোমায় কম ভালবাসি।'

বিবাহে প্রমথর যে কি মত, ঠিক্ বোঝা গেল না। কিন্তু সে মিসের দিকে চেয়ে বল্লে—'তবে তুমি পিতামাতার অবাধ্য হও কেন?'

মিস্ বল্লে 'না, বিয়ে আমি এখন কিছুতেই করবো না।' পিতাকে বল্লে—'বুঝ্‌লে বাবা, পানামায় গিয়ে আমরা স্ত্রী-পুরুষের মত ছিলুম, কিন্তু তা'তে আমার এমন মুস্কিল হলো—পুরুষ বন্ধুরা কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে আর কথাই কইলে না। আমার পানামা যাওয়াটাই যেন কেমন বিরক্তিকর হয়ে উঠ্‌লো। কেমন তাই নয় কি?'

প্রতাপ বল্লে—'হ্যাঁ, সেটা ঠিক্ বটে।'

মিস্ বল্লে—'না মা, এখন আমরা বিয়ে করবো না, বেশ বন্ধুর মতন থাক্‌বো, তারপর যখন খুব বুড়ো হবো, তখন—কি বলো কম্‌রেড্?'

প্রতাপ তখন স্যুপ থেকে একটা বাঁধাকপির পাতা নিয়ে মুখে দিচ্ছে।

মা তাঁর স্বামীর দিকে চেয়ে বল্লেন—'মেয়ে আমার পাগ্‌লী!'

রবার্টস বল্লেন—'হ্যাঁ, কিন্তু কথাটা ও নেহাৎ মিথ্যে বলে নি।'

...পৃথিবীর তিনটি অংশ—ভারত, ইংলণ্ড, এমেরিকা, —আশেপাশে আরও যে কত দেশই আছে!

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরের অন্তরালে

ভুবনমোহন মিত্র

বর্ষাধোয়া শরতের এক সুনির্মল রাত্রি।

বনলতা অতি সন্তর্পণে ঘরের ভেতর ঢুকে তার স্বামীর জ্যোৎস্না-স্নাত ঘুমন্ত মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে যেন কি ভেবে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে—ও গো, শুনছো?

দারুণ বিরক্তিতে পলাশ 'আঃ' বলে পাশ ফিরে আবার পূর্ব্বের মত ঘুমোতে লাগলো।

কিসের একটা বেদনা বনলতার বুকখানাকে উদ্বেলিত করে তুললে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যে মিশিয়ে গেল। এবার সে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বললে—ওঠো না, কেমন করে দিনরাত ঘুমোও, দেখো না বাইরে কেমন—

তাকে আর বলতে না দিয়ে পলাশ বললে—চাঁদের আলো এই তো? এত রাত্তিরে 'কাব্যি' করার ইচ্ছে আমার নেই, বরং তুমি দয়া করে' একটু ঘুমুতে দেবে কি?

বনলতা যেমন এসেছিল, তেমনি করে' ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। আজ তার মনের আগলে কত কথাই না ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, সে যেন আজ মূক হয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে সে শুধু ঐ সুদূর নীলিমার দিকে চেয়ে যেন কি ভাবে।

কতক্ষণ যে এমনি করে সে দাঁড়িয়েছিল জানে না। পলাশের ডাকে সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চমকে উঠে সাড়া দিলে—কি-ই।

পলাশ বললে—কাব্য-জগতে এর যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে জানি, কিন্তু বাস্তব জগতে বাঁচতে হ'লে হয় তো ওর মূল্য এক কাণা কড়িও নয়। আজ কি ঘুমোবে না পণ করেছ?

পলাশের দিকে বনলতা দৃষ্টি মেলে ধরে' জবাব দিলে—বাঁচতে হলে ঘুমোতেও হবে, খেতেও হবে, সব কিছুই করতে হবে জানি, কিন্তু প্রাণ ধারণের জন্যে বাইরের খোরাককে আর যে বড় করে' দেখে দেখুক, ভেতরের খোরাকেরও যে একটা দাম আছে এ কথাও আমি অস্বীকার করি না, সেই জন্যে তাকে আজও অবহেলা করতে শিখলাম না, তাই না নিজেকে দিনের পর দিন কেবল ঠকিয়েই চলেছি। আর—

—আজ আর থাক্, কাল এর সমাধান করলে কি চলবে না?

বহুদিনকার বাণী যেন আজ মুখর হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, আজ আর বনলতা নিজেকে সংযত করে' রাখতে পারলে না, বললে—না, কাল না, আজই আমি এর উত্তর চাই। ভেবো না নারী শুধু তোমাদের খেয়ালের একটা আধার, একটা খেলার জিনিষ...অমন করে' আমার দিকে চেয়ে কি দেখছো?...প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন সারা জগৎকে দেখেছিলাম একটা রঙিন খেলাঘর! শুনলাম এক শিল্পীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তখন আমি একবার কল্পনার রঙিন চোখ মেলে নিজের অন্তর দেখে নিলাম, দেখে নিলাম আমার এই দেহ, আমার কামনা। তুমি শিল্পী, আমি হবো তোমার কল্পনার রঙিন রেখা। কিন্তু ভুল—মুহূর্ত্তে আমার সব কামনা হয়ে গেল ম্লান। শুধু ভাবি—শিল্পী না হয়ে তুমি লোহার দোকান খুললে না কেন?

সহসা যেন বনলতা চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ কারও মুখে আর ভাষা রইল না। বনলতার কাজল চোখে বাদল নেমে যেন উতল করে' তুলেছে, সে শুধু চেয়ে রইল ওই অসীমের মাঝে। হয়তো সে ভাবছিল, এমনি করে তার অন্তরটা যদি মেলে ধরতে পারতো। কোথা থেকে উড়ো মেঘ এসে যেন চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে আলো ছায়ার সৃষ্টি করছিল।

ধীরে ধীরে পলাশ বল্‌লে—বলো লক্ষ্মীটি, অমন করে কি দেখ্‌ছো?

—কি দেখ্‌ছি?—সে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—দেখ্‌ছিলাম এতক্ষণ চাঁদের আলো ছিল, কিন্তু কোথা মেঘ এসে তার সমস্ত আলোটাকে ঢেকে দিয়েছে।

একটু থেমে সে আবার বল্‌লে—আচ্ছা, তোমার কি জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, তোমার মন কি পঙ্গু? বলে সে পলাশের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে উঠলো।

পলাশ তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌তে লাগ্‌লো—পাগল, পাগল, ছিঃ, চলো!

বিদ্যুৎগতিতে সে পলাশের বুক থেকে ছিটকে গিয়ে বল্‌লে—যাও, যাও—তুমি যাও! বলে সেখান থেকে সে এক রকম পালিয়েই গেল। পলাশ তখন হয়তো মনে করছিল—নারী কি সত্যই রহস্যময়ী!

পলাশ যেন কি একটা ছবি আঁকছিল, এমন সময় কে তাকে ডাক্‌লে—পলাশ আছ না কি,—প লা-শ।

পলাশ বেরিয়ে এসে দেখ্‌লে তার বন্ধু দীপক হাতে সুটকেশ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। অপ্রত্যাশিত বন্ধুর আগমনে সে আনন্দোদ্ভাসিত মুখে বাণী ফুটিয়ে বল্‌লে—আরে দীপক যে, তারপর কি মনে করে, এসো এসো ভেতরে এসো। তোমার দেশনেতা হওয়ার স্বপ্ন এতদিনে ঘুচলো না কি, এঁ্যা, কি বলো?

বলে সে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলো।

পলাশের পেছনে যেতে যেতে দীপক উত্তর দিলে—দেশনেতা হওয়ায় দুরাশা আমার কোনকালে ছিল না, কোনদিন হয়ও নি ভাই, তবে স্বপ্ন নয় বলেই আজও আমি দেশেরই সেবা করি—এই পর্য্যন্ত।

পলাশ তাকে তার ছবি আঁকার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। হেসে দীপক বল্‌লে—ছবি আঁক্‌ছিলে, না? 'ডিস্টারভ' করলাম কি?

—এই রকম 'ডিষ্টারভেন্সি' আমি তো 'ফিল' করতে চাই। যাক্, আঁকা কেমন হচ্ছে?

—আমার ভাল লাগা না লাগায় তোমার কি এসে যাবে পলাশ, নেহাৎ বেরসিক আমি—

বাধা দিয়ে পলাশ বল্‌লে—যাও, সব তাতেই ইয়ার্কি, বলোই না ছাই।

—বল্‌তে যখন হবে, তখন বলেই ফেলি। সত্যি কথা বল্‌তে কি জান পলাশ, প্রেমের গল্প, কবিতা, আর ওই তোমার মেয়েদের ছবি, এ আমার একেবারেই ভাল লাগে না। ও সব নেকামী আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। এমন ছবি আঁক যা' আসবে দশের উপকারে, দেশের উপকারে, ও রঙে নয়, বুকের রঙ দিয়ে তুলিতে ফুটিয়ে তোল, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, তোল বিদ্রোহের স্বর। আমি সব গুছিয়ে বল্‌তেও পার্‌ছি না ভাই, বোঝাতেও পার্‌ছি না। শিল্পে আন 'রেভলিউসন্।' বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা তরুলতা আজ শুকিয়ে গেছে পলাশ, পারতো আবার তাকে জিইয়ে তোল! থাক্ এসব কথা, তারপর তোমার ঘর-সংসার কেমন চল্‌ছে বন্ধু?

এতক্ষণ পলাশ বিস্মৃত দৃষ্টিতে দীপকের দিকে তাকিয়ে ছিল। বনলতা চা, জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকেই হয়তো এই অপরিচিতকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল। তারা কথায় এত মেতে উঠেছিল যে, বনলতার আগমন জান্‌তেও পারে নি। তার চোখে চোখ পড়তে পলাশ বলে উঠল—এস, এস, ও আর কেউ নয়, আমার বন্ধু। হঁ্যা, ওরই কথা তোমায় বলি—দীপক, ও যে দীপক।

অপ্রস্তুত হয়ে দীপক হেসে বল্‌লে—আমার কথা তোমার মনে আছে জানি পলাশ, থাক্, আর জানাতে হবে না। নমস্কার বৌদি', কিন্তু আর একটা জলখাবারের থালা যে আনতে হচ্ছে। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই সে হেসে অস্থির।

বনলতা 'টিপয়ে'র ওপর হাতের রেকাবীখানা রেখে হাসিমুখে বল্‌লে—বেশ তো ঠাকুরপো, আমরা দ্রৌপদীর জাত, এটা ভুলে গেলে তো চল্‌বে না, একটা কেন, অমন দশজনের খাবার এখন-ই হাজির করতে পারি। বলে সে বোধ করি দীপকের জন্য খাবার আনতেই চলে গেল।

দীপক বল্‌লে—বাঃ, চমৎকার সংসার তোমার পলাশ!

পলাশ জবাব দিলে—বাইরেটা দেখেই একটা ধারণা করে নেওয়া সহজ, কিন্তু—

বাধা দিয়ে দীপক উত্তর দিলে—কেন, তুমি কি সুখী হও নি ?

দৃঢ়ভাবে পলাশ বল্‌লে—না !

—না ? আশ্চর্য্য ! কিন্তু—

বাধা দিয়ে পলাশ বল্‌লে—এখন 'কিন্তু' থাক্ ভাই। হয়তো বনলতা এখনই জলখাবার নিয়ে এসে পড়বে। তবে এইটুকু শুধু জেনে রেখো দীপক, যে স্ত্রী অল্পতে না সন্তুষ্ট হয়, তার সঙ্গে ঘর ঘর করা তো দূরের কথা, বাস করাও চলে না। তুমি তো জান ভাই, আমি কখনও কোনদিন বিলাসিতার ধার দিয়েও যাই নি, আজও না। আর আমার স্ত্রী ঠিক্ তার উল্টো। একদিন কি হয়ে ছিল জান। পরের বউ চুরির অপরাধে জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছি। পুলিশ বিশ্বাসই করতে চায় নি যে, অমন 'এরিস্‌ট্রোক্রেট' স্ত্রীর এমন স্বামী হওয়া সম্ভব। শেষে কি না শ্বশুর-বাড়ীর ঠিকানায় খবর নিয়ে এসে, তবে হলো নিস্তার। ও আমার অবস্থার ধাপে ধাপে পা ফেলে চল্‌তে পারে না, নিজের ক্ষমতাকেও চায় ডিঙুতে, তাই না কেবল দুঃখ পায়, কেবল ঠকে।

জলখাবার নিয়ে বনলতা ঘরে ঢুকতেই পলাশ চুপ করে গেল। সেই নীরবতা ঘরের মধ্যে যেন অন্য একটা আব-হাওয়ার সৃষ্টি করছিল।

দীপক বলে উঠ্‌ল—করেছেন কি বৌদি', এত খাবার কে খাবে ?

পলাশ বললে—'আপনি' 'আজ্ঞে' রেখে এখন খেয়ে নাও দেখি।

—'আপনি'টা প্রথম জানা-শোনার যে গোড়ার ধাপ পলাশ, না হয় 'তুমি'ই বল্‌বো। কিন্তু বৌদি'কে তো আমি 'আপনি' বল্‌তে দিতে পারবো না।

দীপক খেয়ে চলেছে, বনলতা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতেই দীপক বলে উঠলো—চা তো আমি খাই না বৌদি'।

—খান্ না ?

—না, কিন্তু আবার 'খান' ? বলে দীপক হেসে উঠ্‌লো। তারপর বল্‌লে—প্রথম প্রথম ও রকম বেরিয়ে যাবেই।

বনলতা চায়ের কাপটা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—আমিও চা পছন্দ করি না, যা' নিজে পছন্দ করি না, তা' অপরকে খাওয়ার জন্য জোর করতেও ভালবাসি না। উনি কিন্তু চা খান খুব। বিশেষ করে যখন ছবি আঁকতে বসেন, তখন চা আর সিগারেট না হলে ওঁর চলেই না।

মুচ্‌কি হেসে দীপক বল্‌লে—শুধু চা সিগারেট, না আর কিছু ? বলে সে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠ্‌লো।

পলাশও সে হাসিতে বাদ যায় নি।

বনলতার বুকখানা যেন দুলে উঠ্‌ছিল। তারা যদি তার দিকে তাকাত, দেখ্‌তে পেত, বনলতার সারা মুখখানা যেন কিসের বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পলাশ এবং বনলতার জীবনে যেন আর এক অধ্যায় আরম্ভ হলো। বনলতার সঙ্গে একটি পুরুষের চেনা ছিল বিশেষ করে। সে শান্ত, গম্ভীর, স্বল্পভাষী শিল্পী। তার শিল্প-চর্চ্চার কাছে আর সব কিছুই যেন তুচ্ছ, বাজে জিনিস। আজ সে দেখ্‌লে অন্য একজনকে। সে উৎসাহ-দীপ্ত, সে কর্ম্ম-চঞ্চল, সে প্রাণবন্ত। সব কিছুতে যেন সে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। বনলতা ভাবে—মানুষের সঙ্গে মানুষের এত তফাতও হয় ! সংসারের ভেতর এতদিন ছিল নীরবতা, নিঃসঙ্গতা, কেমন করে ওই লোকটা এখানে এনে দিলে আনন্দের প্রবাহ। যে স্বামীর মুখে হাসি দেখাটা তার কল্পনার মধ্যে ছিল, কেমন করে এল তার মুখে হাসি। বনলতার যেন সব কিছুতেই আশ্চর্য্য লাগে। আজ এ কি পরিবর্ত্তন !

দীপক খবরের কাগজ পড়ছিল, এমন সময় বনলতা ডাকলে—ঠাকুরপো।

হেসে দীপক উত্তর দিলে—কি বৌদি' ?

—উনি কোথায় গেছেন বল্‌তে পার ?

বিস্মিত হয়ে দীপক প্রশ্ন করলে—তুমি জানো না কি বৌদি'? পলাশ বলে যায় নি?

বনলতা কিছু বললে না। দীপকের কাছে সে যেন কত ছোট হয়ে গেছে। স্বামীর বিষয়ে ঐ লোকটার যা' অধিকার আছে, বোধ করি তারও তা' নেই।

দীপক আবার বললে—তিনটে দিন তো সে আসবে না বৌদি', কোথায় যেন একটা আঁকবার অর্ডার পেয়েছে—আশ্চর্য্য, তোমায় বলে নি এ কথা?

ঘরের ভেতর যেন একটা কিসের বীভৎস নীরবতার সৃষ্টি করে তুললে।

হঠাৎ বনলতা ডাকলে—ঠাকুরপো!

পলাশ তার দিকে তাকাতেই, সে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

দীপক প্রশ্ন করলে—কি বৌদি'?

—না, থাক্। বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় দীপক আবার ডাকলে—বলেই যাও না বৌদি'।

—নাই বা শুনলে ঠাকুরপো, তবে এইটুকু জেনে রেখো, তৃতীয় প্রাণীর যা' অধিকার এখানে আছে, আমার তাও নেই।

—তৃতীয় প্রাণী যে কা'কে লক্ষ্য করে বললে তা' আমি বুঝতে পেরেছি বৌদি'। সত্যিই এ তার বড় অন্যায়।

—ন্যায়-অন্যায় অনেক দেখেছি, অনেক বুঝেছি, হয়তো বা বিচারও করেছি, কিন্তু আজ আর বোঝবার, জানবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, দেখে দেখে আজ আমি ক্লান্ত, আর পারছি না। যার মরম নেই, তাকে আর কোথায় আঘাত করবো বলতে পার ঠাকুরপো? পাষাণ দেবতারও না কি আসন টলে—এ কি-ই! বলতে পার তুমি?

বিস্মিত হয়ে দীপক বনলতার দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলে, কিসের একটা অপূর্ব্ব তেজে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত।

দীপক যেন কি বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বনলতা বলে চলল—আজ আর আমার কোন সঙ্কোচ নেই, হয়তো বা সব কিছুই আজ বলতে পারি। হ্যাঁ, কি বলছিলাম,—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ হয়েই যে জন্মেছি ঠাকুরপো, পাষাণ হলে হয়তো বা এতদিন এ প্রাণ ফেটেই যেতো। আমার এই 'আমিত্ব'কে বাদ দিতে পারি নি বলেই না জীবনে এত দ্বন্দ্ব, এত কোলাহল।

একটু থামতেই দীপক বললে—আর নয় বৌদি', আর একদিন বোলো 'খন, আজ বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছ।

কে তার কথা শোনে! বনলতা বকেই চলল, আর দীপক নির্ব্বাক শ্রোতার মত চুপ করে বসে রইলো।

তিন দিন পরে পলাশ এলে বনলতা আর কোন অনুযোগের বাণী শোনালে না। এ যেন তার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পলাশ যে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয় নি তা' নয়, কিন্তু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলো। বনলতা যেন দেখাতে লাগলো, পলাশ যেখানে খুসী যাক্ আর থাক্, তা'তে তার কিছুমাত্র যায় আসে না।

এমনি করে দিন যায়। সেদিন পলাশ দীপকের মধ্যে কি যেন একটা কথা হচ্ছিল। এমন সময় বনলতা এসে বললে—ও গো, আজ বায়স্কোপ দেখতে যাবো, কিছু টাকা দাও তো।

পলাশ জবাব দিলে—আজ কি না গেলে নয়? একটু কাজ ছিল কি না—

—কাজ তো জীবনভোর থাকবেই, কিন্তু আজ না গেলে এ বইটা আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু আমি তো—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বনলতা বললে—পারবে না, এই তো?

বনলতার চোখটা যেন জলে উঠলো। বললে—শুধু আজ কেন, কোনদিনই তোমার নিয়ে যাওয়ার সময় হবে না, জানি আমি। টাকা দাও দেখি, সঙ্গী জুটে যাবেই। বলে দীপকের দিকে ফিরে বললে—ঠাকুরপো, সময় করে নিতে পারবে না?

বনলতার মুখে যেন বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। পলাশ দীপকের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলে সে যেন

অকারণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বল্‌লে—দীপকের শরীর কি অসুস্থ না কি হে?

বনলতা বল্‌লে—না যাওয়ার মত অসুস্থ নিশ্চয় হয়ে পড়ো নি ঠাকুরপো। নাও, ওঠ দেখি। দেরী হয়ে গেলে আবার—

পলাশ কিছু বল্‌লে না, ধীরে ধীরে একটা নোট বনলতার হাতে দিলে। তার কাছে এটা নতুন নতুন ঠেক্‌তে লাগ্‌লো।

যখন তারা ফিরে এল, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বনলতার আওয়াজ পেয়ে পলাশ যেন কেমন চম্‌কে উঠলো। বনলতা ঘরে ঢুকে বল্‌লে—এখনও বসে আছ, ঘুমোও নি?—হ্যাঁ, ন'টার সময় ভেঙেছিল, আমি-ই ঠাকুরপোকে জোর করে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে' নিয়ে গেছলাম। বলে সে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পলাশের চোখের সাম্‌নে তখন নীল, লাল, হলদে, সমস্ত রং সাপের মত হিজিবিজি হয়ে খেলা করছে। একবারও বনলতা জিজ্ঞেস করলে না তার খাওয়া হয়েছে কি না। সে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। দেখ্‌লে দীপক খেয়ে চলেছে, আর বনলতা যত্নসহকারে তাকে পরিবেশন করছে। তার কোথায় যেন কি কর্‌কর্‌ করে উঠলো। সে আর দাঁড়ালো না। বনলতা তাকে বসতে বল্‌লে, কিন্তু পলাশ যেতে যেতে অস্ফুট কণ্ঠে কি যে বল্‌লে, বোঝা গেল না।

শীতের রাত্রি গভীর হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ পলাশের ঘুম ভেঙে গেল। ঘন কুহেলীর ওড়না ঢাকা দিয়ে ধরিত্রী যেন অভিসারে চলেছে। চাঁদের আলো সেই কুহেলিকা-চ্ছন্ন ঘন আস্তরণের ওপর পড়ে যেন কিসের একটা আব্‌ছা ইঙ্গিৎ জানাচ্ছে। পলাশ তার পার্শ্ববর্ত্তী শয্যায় তাকালে। বনলতার নিদ্রা-নিমীলিত নিলাজ নয়নে হয়তো বা কত রাজ্যের স্বপ্নই না খেলা করে বেড়াচ্ছে। পলাশ তার মুখটা এগিয়ে নিয়ে এল বনলতার মুখের কাছে। দেখ্‌লে—সে মুখে একটুও পাপের ছায়া স্পর্শ করে নি। কখনও বা বনলতার মুখখানা কিসের বেদনায় করুণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, আবার পরক্ষণে কিসের আলোয় যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—ওই মুখে যেন আলো-ছায়ার খেলা চলেছে। হয়তো বা পলাশের মনের কোণে একটুখানি দোলাও লেগেছিল।

কখন যে পলাশ আবার ঘুমিয়ে পড়লো, জানে না। সকালে বনলতার ঘুম ভাঙতেই দেখ্‌লে সে স্বামীর সবল বাহুর মধ্যে আশ্রয় ক'রে শুয়ে আছে। অতি সন্তর্পণে সে নিজেকে বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে উঠে বস্‌লো। দেখ্‌লে—স্বামীর সারা মুখে যেন কিসের চিন্তার রেখা। খুব সাবধানে পলাশের কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে যেতেই দেখ্‌লে দীপক যেন চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সমস্ত বারান্দাটায় পায়চারী করে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্ন করলে—এত সকালে যে ঠাকুরপো?

—কেন? এমনি সময়েই তো রোজ উঠি বৌদি'।

—ওঃ। বলে বনলতা চলে গেল।

দীপক যে আর কতক্ষণ এই রকম পায়চারী করে বেড়িয়েছে জানে না। হঠাৎ বনলতা ডেকে উঠ্‌লো—ঘরে এস ঠাকুরপো, দুধ, জলখাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কখন যে পলাশ এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে বনলতা জান্‌তেও পারে নি। দীপক জোরে বলে উঠলো—এস পলাশ, এই তোমার কথাই হচ্ছিল।

বনলতা চম্‌কে উঠে দীপকের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। পলাশ যেন অনধিকারে এ ঘরে প্রবেশ করেছে, সে টেনে টেনে জোর করে হাস্‌তে লাগ্‌ল। সে হাসি তার মুখখানাকে যেন ব্যঙ্গ করে উঠ্‌লো।

দীপক বল্‌লে—আমি যেদিন এখানে আসি, সেদিনের কথা মনে পড়ে পলাশ? সেদিন বলেছিলে—সীমা অতিক্রম করলেই মানুষ ঠকে? মনে পড়ে? আজ তুমি সেই সীমা—

বাধা দিয়ে পলাশ জবাব দিলে—আর তোমার অন্য কোনও কথা নেই কি দীপক?

দীপক মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

দীর্ঘদিনের সুপ্ত মনে তার কোন্ গুপ্ত স্থানে আজ কিসের সাড়া জাগ্‌লো কে জানে! পলাশ শূন্য দৃষ্টিতে তারই আঁকা একখানা ছবির দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইলো। জান্‌তেও পারলে না বনলতা কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে বিচলিত হয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু কোন প্রশ্নই কর্‌লে না। বনলতাই প্রথম কথা পাড়ল—কিছু টাকা দাও দেখি, ঠাকুরপোকে নিয়ে একটা কাপড় কিনে আনি।

নির্ব্বিকারভাবে সে জবাব দিলে—কত চাই ?

বনলতা বল্‌লে—পঞ্চাশ, আচ্ছা ষাটই দিও, যদি বেশী লাগে। এর কমে কি মুর্শিদাবাদী সিল্কের কাপড় হবে ?

—অত টাকাতো এখন নেই লতা।

—তা' আমি জানি গো, জানি! সেদিন যে আমায় এক শ' টাকা রাখ্‌তে দিলে, তাই থেকে না হয়—

—না, সে আমার টাকা নয়।

—তবে কার শুনি ?

—দীপকের। ও রাখ্‌তে দিয়েছিল।

—ও। খানিক পরে আবার বল্‌লে—বলো তো ঠাকুরপোর কাছে ধার বলেই না হয় নিই ?

দৃঢ়কণ্ঠে পলাশ জবাব দিল—না, সে হয় না !

—কেন শুনি ?

—একটা সাময়িক খেয়ালের জন্যে এ অপমান আমায় নাই বা করলে লতা।

উত্তেজিত হয়ে বনলতা জবাব দিলে—যে খেয়ালী নিজের খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্যে সব কিছুই করতে পারে, তার এ কথা বলা চলে না।

—ছি, ভুল বুঝো না লতা !

—ভুল! হয়তো তাই, হয়তো বা তাও নয়, কিন্তু প্রশ্ন করি, যে স্বামী অন্যের কাছে তার স্ত্রীকে ছোট করে' দেখায়, পরপুরুষের সামনে যে নিজের স্ত্রীকে—তার নারীত্বকে যার অপমান করতে বাধে না, সে—সে—

দারুণ উত্তেজনায় তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। পলাশ শুধু হতবাক্ হয়ে চুপ করে' বসে' রইলো।

বনলতার কাছে এটা অভিনয় হ'লেও, দীপকের পক্ষে এটা হয়ে উঠেছিল যেন একটা কিসের দাবদাহ। সে ভাবতে লাগ্‌লো হয়তো বনলতা তাকে ভালবাসে। ক্রমে সে যেন মাকড়সার জালে আট্‌কে যেতে লাগ্‌লো। যত সে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, ততই যেন আরও জড়িয়ে পড়ে। এ কি সেই দীপক—বিপ্লববাদী, বিদ্রোহী দীপক,—এ কি সেই !...

সে ভেবে পায় না কেমন করে বনলতাকে পলাশ অবহেলা করে। মনে পড়ে তার সেই বায়স্কোপ যাওয়ার কথা, যাওয়ার জন্যে তার কি উৎসাহ, কিন্তু বায়স্কোপ না দেখে আবার বেড়াতে যাওয়ারই বা সে আগ্রহ দেখালে কেন! বনলতা যেন তার কাছে এক রহস্যময়ী! ট্যাক্সিতে সেই গায়ে গা লাগা...নারীর স্পর্শ...মনে হলে তার সমস্ত স্নায়ু ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে, যেন বিহ্বল করে তোলে।

হঠাৎ বনলতা বলে উঠলো—কি ভাবছিলে ঠাকুরপো, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছ জানতেও পারি নি।

—অন্তরের অন্তরালে অনেক কিছুই এমনি ঘটে যায় বৌদি'—যাক্, পলাশ কি করছে ?

বনলতা তাচ্ছিলভরে জবাব দিল—কে জানে! বেরুতে তো দেখলাম। তোমার ভাত দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরপো, এস।

—পলাশ কি খেয়েই বেরিয়েছে বৌদি' ?

—হ্যাঁ। বলে বনলতা বেরিয়ে গেল।

দীপক যেন কি ভেবে একবার উঠে দাঁড়াল, আবার পরক্ষণে বসে পড়লো।

খানিক পরে বনলতা আবার এসে বল্‌লে—খাওয়ার কথা কি আজ ভুলেই গেছো না কি ঠাকুরপো ?

—না ভুলি নি। ভাবছিলাম, আর কতদিন এমনি করে' আটকে রাখ্‌বে ?

—আমি আটকাতে যাব কেন। নাও, ওঠো, ভাত যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

—আমার শরীরটা আজ ভাল নেই বৌদি', হয়তো জ্বর এসেছে।

বনলতা দীপকের দেহের উত্তাপ গ্রহণ করে দেখ্‌লে যেন গাটা পুড়ে যাচ্ছে। দীপকের রক্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

—বৌদি'।—তার গলাটা যেন কেঁপে উঠলো। বনলতা এ ডাকে যেন চম্‌কে উঠলো। ভুল করেছে সে, তার জীবনের মাঝে দীপককে কেন সে জড়াল। তার পক্ষে যেটা শুধু একটা খেলা, অপরের জীবনে যে সেটা দাবদাহের সৃষ্টি করবে, তা' একবারও সে ভেবে দেখে নি কেন? দীপক যদি আজ তার কাছে ভালবাসা জানায়, সে কী বল্‌বে—কী উত্তর দেবে সে? দীপক যদি বলে—ভালই যদি না বাস, তবে আলেয়া হয়ে কেন ও ভুলের আলো আমায় দেখালে, তবে—

এই সবের উত্তর আজ তাকে কে দেবে।...

দীপক বল্‌লে—পলাশ আচ্ছা লোক তো, একটা কাণ্ডজ্ঞানও কি তার নেই। আমি হলে—

বনলতা নিরুত্তর। তোমার মত যদি স্ত্রী পেতাম, তা' হলে 'বুক্‌কেসে' সাজিয়ে রেখে দিতাম।

বনলতা শুষ্ককণ্ঠে বল্‌লে—এখন তো তা' হওয়ার উপায় নেই ঠাকুরপো।

—কেন, কেন নেই শুনি?

বনলতার মুখটা যেন মড়ার মত শাদা হয়ে গেল। যে বিষ সে পান করেছে, তার ক্রিয়া যদি কাজ করে, তাকে তো তা' সহ্য করতেই হবে।

দীপক বলে চলেছে—তোমার মত নারীই এতদিন আমি কল্পনা করেছিলাম। এমনি সে হবে নিজের মহিমায় মহিমান্বিত, এমনি সে হবে বিজয়িনী রহস্যময়ী—হ্যাঁ, এমনি নারীই আমি জীবন ভোর চেয়ে এসেছি, যে আমার পাশে থেকে সকল কাজে সাহায্য করবে, সহধর্ম্মিণী হবে।

—আর তো তা' হওয়ার উপায় নেই।

—উপায় নেই? আশ্চর্য্য করলে আমায়! কেন শুনি? বিয়ের মন্ত্রটাই কি বড় হলো, আর অন্তরের—

বাধা দিয়ে বনলতা বল্‌লে—থাক্ ঠাকুরপো। এ বলতেই ভালো শোনায়, নভেলে পড়তেও মন্দ লাগে না, তুমি হয়তো বল্‌বে সংস্কার, কিন্তু এমনি মুস্কিল ঠাকুরপো, এ সংস্কার আমাদের যেন রক্ত-মাংসে মিশিয়ে আছে, একে এড়ানর কথা ভাবতেই সহজ, আসলে যে কি তা' আমরা জানি—তোমরা পুরুষ কি করে জান্‌বে। জানো ঠাকুরপো, আজও আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি। সবাই যেমন করে বাসে, তেমনি করেই।

—ভালবাস!

—হ্যাঁ। এতে আশ্চর্য্যের কিছু তো নেই ঠাকুরপো, না বাসাটাই আশ্চর্য্যের। তার মনে আঘাত দেওয়ার জন্যে, তাকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এটা যে শুধু আমার অভিনয়, তা' তোমায় কেমন করে বোঝাব। তোমার কথাও যে না ভেবেছি, তা' নয়। আমি তখন অতটা বুঝি নি, তখন যদি বুঝ্‌তাম হয়তো তোমার এমন ক্ষতি হতো না। একটু থেমে আবার বল্‌লে জানি, ক্ষমা চাওয়া বিড়ম্বনা। তবু—তবু—

আর সে বল্‌তে পার্‌লে না। দুই চোখ দিয়ে তার অশ্রু-ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে।

নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে আবার সে বল্‌লে—আমার ভাই নেই, আজ থেকে তুমি আমার ভাই, দাদা।...

পাশের ঘরে এদের মধ্যে যে কেউ একজন গেলে দেখ্‌তে পেত, পলাশ যেন বনলতার সমস্ত কথা গিল্‌ছে। তার সমস্ত মুখটা কিসের একটা আনন্দে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর সেখানে দাঁড়াতে না পেরে, পলাশ ঘরে ঢুকেই হাতের বাণ্ডিলটা সশব্দে টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

বনলতা দীপক যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। পলাশ বলে চলেছে—ঃ, বাপ, এই কাপড়ের জন্যে কি কম ঘুরেছি! দেখো, পছন্দ হয় কি না।

বনলতা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে পলাশের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। পলাশ বল্‌লে—এতদিন তোমায় ভুল বুঝে এসেছি লতা।

বনলতা তখন দীপকের পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালে। হঠাৎ একটা চাকর এসে খবর দিলে—বাবু, পুলিশ।

পলাশ সবিস্ময়ে জবাব দিলে—পুলিশ!

—হ্যাঁ বাবু, বাড়ী ঘেরাও করেছে।

পলাশ এক রকম দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীপক বল্লে—পুলিশ তোমাদের দরজায় কেন হানা দিয়েছে জান বৌদি'! কি, অমন করে' আমার দিকে চেয়ে কি দেখ্ছো। জর:হলেও তারা ছাড়বেনা, বুঝ্লে বৌদি'। বলে সে হেসে উঠ্লো। সে হাসিতে যেন সমস্ত ঘরখানা থরথর করে কাঁপতে লাগ্লো।

পলাশ বেরিয়ে আসতেই ইন্‌স্‌পেক্টার প্রশ্ন করলে—দীপক বলে কোন লোক থাকে মশায় এখানে।

পলাশ মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘাড় নেড়ে জানালে—থাকে।

—ওঃ, প্রায় দু' বছর ওর জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি! দিন, বার করে দিন।

ততক্ষণ দীপক পলাশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বল্লে—এতদিনে হয়তো আপনার ঘোরা সার্থক হয়েছে ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু। নিন, আপনার মূল্যবান সময় আর নষ্ট করবেন না। আসি আমি পলাশ। যদি বেঁচে ফিরে আসি, আবার একদিন হয়তো দেখা হবে।

ক্রমশঃ ভিড় কমে গেল। পথ আগের মতই সরল হয়ে উঠ্ল। পলাশ স্থির হয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বনলতা দীপকের দুপুরের বাড়া ভাতের দিকে চুপ করে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে বসে রইলো। দীপকের জর হয়েছে বলে আজ খায় নি, সে অভুক্ত।

তার না খাওয়া বাড়া ভাতই রইলো শুধু পড়ে, কিন্তু যার জন্যে এ ভাত বাড়া হয়েছিল, সে লোকটি তখন কোথায়! সমস্ত বুকখানা তার টন্‌টন্ করে উঠ্লো।

বাইরে তখন বাদল নেমেছে। সমস্ত আকাশটা তখন নিকষ ঘন কালো, ঘোর অন্ধকার। এই দুর্য্যোগ যে ক্রমে বেড়েই চলেছে, তা' তারা বোধ করি জান্‌তেও পার্লে না,—এর শেষ কোথায়!

ভুবনমোহন মিত্র

দেবী

কুমারী লাবণ্য মজুমদার

অদূরে উপবিষ্ট ক্রীড়ারত পুত্রের দিকে চাহিয়া সত্যব্রত কহিল—"কিন্তু অমুকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারবো না দেবী।"

দেবী বিস্ফারিত দুই চক্ষুর দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিল—"বারে! ওইটুকু ছেলে রেখে আমি কি ক'রে বাপের বাড়ী যাব?"

ঈষৎ হাসিয়া সত্যব্রত কহিল—"নাই বা গেলে বাপের বাড়ী?"

—"না, তা' যাব কেন? বিয়ের পর সেই তিন বছর আগে অমু হবার সময়ে গেছি, আর এই যাচ্ছি।—তাও দায় পড়ে—"বলিয়া অভিমানভরে দেবী অপব দিকে মুখ ফিরাইল।

—"আহা, চটো কেন, আমি কি সত্যিই বারণ করছি বাপের বাড়ী যেতে! ঠাট্টা বোঝো না দেবী।

—"তবে অমুকে রেখে যেতে বল্‌ছ কেন?"

—"তুমিও যাবে, অমুও যাবে, তা' হলে আমার অবস্থাটা কি রকম হবে বলো দেখি? তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ, আমার কথা তো একবারও ভাবছ না। তুমি বুঝ্‌তে পারছ না দেবী, অমুকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে কি অসম্ভব ব্যাপার!

—হায়! জান না প্রিয়তমে,
পুত্র হেন রত্নে ছাড়িতে
কি ব্যথা বাজে পিতৃ-হৃদয়ে!"

অমল অকস্মাৎ পিতাকে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে, হাত মুখ নাড়িয়া কথা কহিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া পিতার ঘূর্ণায়মান হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"কি হয়েছে বাবা? হাতে পোকা কামলেতে—দেখি, দেখি, অতুদ লাগিয়ে দি'।"

হাসিয়া ফেলিয়া সত্যব্রত কহিল—"দেখ্‌ছ দেবী, দেখ্‌ছ? এ রকম ছেলে ছেড়ে কি থাকা যায়? সেখানে যাবার কিছুদিন পরেই তো অমুর একটি ভাই কিংবা বোন্‌ হ'বে, তখন আর অমুর জন্যে তোমার মন তত খারাপ হবে না। দোহাই দেবী, ভাল মনে অমুকে রেখে যাও।"

—"আচ্ছা, তর্কাতর্কি না করে অমুকেই জিজ্ঞাসা করা হোক্‌, ও এখানে থাক্‌বে, না আমার সঙ্গে যাবে? ও যা' বল্‌বে তাই হবে।"

—"আচ্ছা, বেশ। অমু, মাণিক আমার, এই রিষ্ট-ওয়াচটা তোকে দেবো—বল্‌ তো বাবা, তুই আমার কাছে থাক্‌বি, না তোর মার সঙ্গে যাবি?"

—"বা বা, ও কি হচ্ছে, লোভ দেখিয়ে ওকে নিজের দলে টানা হচ্ছে?"

—"বেশ তো,—তুমিও লোভ দেখাও না। যে লোভ দেখিয়ে নিজের দলে টান্‌তে পারবে, তার কাছেই ও থাক্‌বে।"

—"আচ্ছা অমু, আমার হাতে এই সোনার চুড়ি দেখ্‌ছিস, সব তোকে খেল্‌তে দেব, বলতো বাবা, কার কাছে থাক্‌বি?"

পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট অমল একবার পিতার ও একবার মাতার হস্তের দিকে চাহিল। বহুক্ষণ ভাবিয়া সে মত প্রকাশ করিল—"বাবাল কাছেও থাক্‌বো, মাল কাছেও থাক্‌বো।"

পিতা মাতা উভয়ে হাসিয়া উঠিল।

সত্যব্রত কহিল—"ও সব চালাকী চল্‌বে না মাণিক! একজনের কাছে থাক্‌তে হ'বে। কার কাছে থাক্‌বি—আমার কাছে, না ওর কাছে?"

অমুবাবু মহাবিভ্রাটে পড়িল! পুনরায় দুইজনের হস্তের দিকে চাহিয়া কহিল—"চুলি ভাল না, ঘলি ভাল—কাঁত আতে। আমি বাবাল কাছে থাক্‌বো।"

সত্যব্রত উচ্চ হাসিয়া উঠিল। কৃত্রিম রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া দেবী কহিল—"অকৃতজ্ঞ ছেলে।"

সস্নেহে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সত্য কহিল—"চিরদিন এইরকম অকৃতজ্ঞ থাকিস বাবা।"

দেবী দু'-একটি কথার পর কহিল—"তা' হ'লে অমুকে মাঝে মাঝে সেখানে নিয়ে যেও।"

বিপন্নস্বরে সত্যব্রত কহিল,—"তা' কি ক'রে হবে দেবী? আমি এই সবে মাত্র প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করেছি—আমার সব রোগী হাতছাড়া হয়ে যাবে যে।"

বাধা দিয়া দেবী কহিল—"ও সব বিনা পয়সার রোগী হাতছাড়া হয়ে গেলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।"

—"আমার কোনো ক্ষতি হবে না বটে, কিন্তু রোগীদের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তা' ছাড়া, রোজ রোজ শ্বশুর-বাড়ী গেলে বাবা—"

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, তুমি জমীদারের ছেলে—আমার গরীব মায়ের বাড়ী যাবে কেন? তা' হলে যে তোমার মান-সম্ভ্রম যাবে! নাই বা গেলে—" বলিয়া অভিমানভরে দেবী মুখ ফিরাইল।

এমন সময় কমলপুরের জমীদার, সত্যব্রতের পিতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে করিতে হাঁকিলেন—"কই গো মা লক্ষ্মী, আমার অমু দাদু কই?"

দেবী শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল! পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িয়া—"দাদু দাক্‌তে দাই—" বলিয়া অমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সত্যব্রত হাসিয়া কহিল—"অমু বাবাকেই বেশী ভালবাসে দেবী।"

উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া দেবী পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

দুই

দেবীর পিত্রালয়ে গমনের পর চারিমাস অতীত হইয়াছে।

শয়ন-কক্ষে বসিয়া সত্যব্রত দেবীর একখানি সদ্য-প্রেরিত পত্র পড়িতেছিল—

দেবগ্রাম

"শ্রীচরণেষু,

তোমার পত্র পেয়েছি। অমু কেমন আছে? সে তার মাকে ভুলে গেছে না কি? নতুন খোকা কার মত হয়েছে বলো দেখি? তোমার মতও নয়—অমুর মতও নয়—তবে বলো দেখি কার মত হয়েছে? সবাই বলে আমার মত না কি হয়েছে। তার এখনও কিছুই নাম রাখা হয় নি। মা বলেন—'তোমাদের ছেলে, তোমরাই নাম রাখ্‌বে'—তাই হবে। এতদিনের মধ্যে একবারও এলে না, এইবার নিশ্চয়ই আস্‌বে—নিয়ে যাবার সময় হয়েছে কি না? অমু বোধ হয় আমার নাম করে না—কেমন আছে সে? বাবাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও এবং তুমিও জেনো। অমুকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। কেমন আছ লিখো। ইতি,

প্রণতা
দেবী

—"বাপ্‌! চিঠি তো নয়, যেন—"

—"সত্য।"

তাড়াতাড়ি সত্যব্রত পত্রখানি পকেটে পূরিয়া ফেলিল।

—"সত্য, ঘরে আছ?"

—"আজ্ঞে আছি।" বলিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া সত্য কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান পিতার দিকে চাহিয়া কহিল—"আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন বাবা। আপনি কেন কষ্ট করে—"

—"সত্য, আমার মা লক্ষ্মীকে বুঝি আর আনা হলো না!" ভগ্নস্বরে এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ জমীদার কুমুদ চৌধুরী সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সত্য কহিল—"কি হলো বাবা, এ রকম করে এখানে বসে পড়লেন কেন? ঘরের মধ্যে আসুন।"

—"সত্য!"

—"বলুন?"

—"বৌমাকে আর আনতে যেতে হবে না। তাঁকে তো আর আমি চৌধুরী-বংশের ভিটেতে ঢুক্‌তে দিতে

"পারি না সত্য!" বলিয়া অসহ্য যন্ত্রণা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সত্যব্রত চমৎকৃত হইল। এই চারি মাসের মধ্যে এমন কি ঘটিল, যাহার জন্য দেবীসদৃশা দেবীকে আর গৃহে লওয়া যাইতে পারে না! ব্যাকুল হৃদয়ে সত্যব্রত কহিল—"বাবা, কি হয়েছে খুলে বলুন, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।"

কুমুদ চৌধুরী মৃদুস্বরে তাহাকে দু'-একটি কথা বলিতেই সত্যব্রত চীৎকার করিয়া কহিল—"মিথ্যা কথা!"

—"মিথ্যা কথা নয়, সত্য।"

—"কিন্তু এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান না ক'রে—"

—"বিনা বিচারে কিংবা বিনা অনুসন্ধানে কুমুদ চৌধুরী আজ পর্য্যন্ত কোনো কাজ করে নি সত্যব্রত।"

পিতার গম্ভীর স্বরে চকিত হইয়া সত্য কহিল—"কিন্তু মায়ের দোষে কি কন্যারও শাস্তি হবে?"

—"কলঙ্কিনীর কন্যার সঙ্গে চৌধুরী-বংশের ছেলের বিয়ে হয়ে নিষ্কলঙ্ক চৌধুরী-বংশে যে কলঙ্ক পড়েছে, তাকে গৃহে স্থান দিয়ে আমি আর সে কলঙ্কের বোঝা বাড়াতে চাই না। আজ হতে আর সে চৌধুরী-বংশের বধূ নয়, এটা জেনে রাখো সত্যব্রত।"

চকিতে সত্যের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—শুভ্র-বসনা শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর সেই পরম স্নেহশীলা দেবীসমা মাতৃ-মূর্ত্তি! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, বিদায়ের পূর্ব্বদিন দেবীর সেই অভিমানপূর্ণ বাণী—"কেন যাবে? আমার গরীব মায়ের বাড়ী গেলে, তুমি জমীদারের ছেলে, তোমার যে তা' হলে মান যাবে!"

দেবীর মুখ চাহিয়া ঈষৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া সত্যব্রত এই সর্ব্ব প্রথম পিতার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল।

সত্য কহিল—"কিন্তু বাবা এতে তো আমার শাশুড়ীর কোনো দোষ আমি দেখ্‌তে পাই না। তাঁকে অসহায়া পেয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওই পর্য্যন্ত—"

—"সত্যব্রত নারীর চরিত্র শুভ্র বস্ত্রের ন্যায়—সামান্য ধুলো লাগ্‌লেই মলিন হয়। কিন্তু যাক্, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না—আমার আদেশ তোমাকে পূর্ব্বেই জানিয়েছি।"

আসিবার সময় তিনি টলিতে টলিতে আসিয়াছিলেন, যাইবার সময় তিনি দৃঢ়পদে প্রস্থান করিলেন। স্নেহ হইতে তিনি কর্ত্তব্যকে—তাঁহার বংশের সম্ভ্রমকে উচ্চে স্থান দিয়াছিলেন। তাই তিনি পরম স্নেহ সত্ত্বেও দেবীকে এমনই করিয়া নির্ব্বাসিতা করিতে পারিলেন। দেবীর পরম সুখময় জীবনের যবনিকা এইভাবেই পতিত হইল।

তিন

রোগ শয্যায় শুইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কুমুদ চৌধুরী কহিলেন—"ওঃ, আমি কি করেছি—আমি কি করেছি—আমি মিথ্যা সংবাদ পেয়ে আমার ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়িয়েছি!

ছেলেবেলার সেই সামান্য শত্রুতা মনে রেখে, আমার এত উপকার বিস্মৃত হয়ে, মোহিত আমাকে এই মিথ্যা সংবাদ দিয়ে আমার সংসার লক্ষ্মীহীনা করে দিলে! ওঃ! পাছে আমি অবিশ্বাস করি—পাছে আমি অবিশ্বাস করি—সেই জন্যে সে আগে থেকেই কতকগুলো লোককে মিথ্যে শিখিয়ে-পড়িয়ে এনে প্রমাণ করে দিলে! আমি তার জুয়াচুরি বুঝ্‌তে পারলাম না, ভুল করলাম! কুমুদ চৌধুরী ভুল করলে—জীবনে সেই প্রথম ও শেষ ভুল করলে—ওঃ! কুমুদ চৌধুরীর ভুল হোলো—

বৃদ্ধ জমীদার উন্মাদের ন্যায় ঝাঁকানি দিয়া, শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। সত্যব্রত অসহ্য ব্যথায় দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া পিতাকে ধরিয়া জোর করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল।

—"ওঃ, আমার অমু দাদুকে মা থাকা সত্ত্বেও মা-হারা করলাম! আমি কি করলাম—কি কর্‌লাম—"

—"বাবা, অসুস্থ শরীরে আপনি বেশী কথা বলবেন না, চুপ করুন।"

—"হ্যাঁ, চুপ করবো, একেবারেই চুপ করবো! এত বড় অন্যায়—এর থেকে অন্যায় বুঝি আর কিছু নেই—"

—"বাবা—" চমক ভাঙ্গার ন্যায় তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কে, সত্য ?"

—"আজ্ঞে হাঁ।"

—"অমু কোথায় ?"

—"এই যে, আপনার কাছে—"

—"অমু, দাদু আমার!"

তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমল কহিল—"এই দে আমি দাদু—"

—"আমি যাচ্ছি দাদু—"

—"কোতায় দাদু—মায়েল কাতে ?"

—"না দাদু, অন্য জায়গায়। সে—"

—"আমি দাব দাদু। তোমাল অসুখ করেছে, আমি ধলে ধলে নিয়ে দাব।"

—"না দাদু। ছেলেমানুষের সেখানে যেতে নেই। তুমি যে ছেলেমানুষ ভাই।"

"কেন, ছেলেমানুষে দেতে নেই দাদু ?"

অধৈর্য্য হইয়া সত্যব্রত কহিল—"বাবা, কেন ওসব কথা বলছেন ? মা কি রকম, কখনও জানি না—একমাত্র যে আপনাকেই জানি বাবা—" তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বৃদ্ধের নয়ন কোণে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। স্নেহরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি কহিলেন—"সত্য, আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে—যার কাছে আমার এত বড় অপরাধের পর যে আর আমার বেঁচে থাক্‌বার ক্ষমতা নেই বাবা!"

—"সে তো আপনার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয় বাবা, তবে কেন আপনি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করছেন ? —কেন তিলে তিলে নিজেকে এমন ক'রে হত্যা করছেন ?"

বিস্ফারিত নয়নে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—"অপরাধ নয় ? এর চেয়ে বড় অপরাধ কি আর আছে সত্য! উঃ, বুকের ভেতর কেমন করছে! বুঝি সময় হয়ে এল—"

যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ব্যস্ত হইয়া অমলকে শয্যা হইতে নামাইয়া দিয়া সত্য কহিল—"অমু, রমানাথকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় তো—তা'কে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠাবো—"

অমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সত্য কহিল—"বাবা, বড় কি কষ্ট হচ্ছে ?"

—"কেন ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছ সত্য ? আর আমার বেশী দেরী নেই—আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—আমি মরে গেলে যত শীগ্‌গির পার, আমার মা লক্ষ্মীকে এখানে ফিরিয়ে এনো। ওঃ, এই দীর্ঘ এক বৎসর মাকে আমার কি মনোবেদনাই না দিয়েছি—আর তার প্রায়শ্চিত্তও আমি প্রতিদিনই ক'রে আসছি! আর এ বৃদ্ধ বয়সে সহ্য করতে পারলাম না সত্য, যেদিন খবর পেলাম যে, মাকে আমার বিনা অপরাধে শাস্তি দিয়েছি—ওঃ!"

দেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই সত্যব্রতের মুখের উপর নীরব বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

চার

গ্রীষ্মের খরতপ্ত মধ্যাহ্নে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এক যুবক দেবগ্রামস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে কয়েক মিনিট উৎসুক দৃষ্টিতে বাড়ীটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পরে ধীরপদে বারান্দার উপর উঠিয়া দ্বারেমৃদু আঘাত করিল। ভিতর হইতে কোনো উত্তর আসিল না। যুবক কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"দেবী!"

কোনো উত্তর নাই।

সত্যব্রত সজোরে দোরে ধাক্কা দিল। এইবার উত্তর আসিল। সশব্দে দ্বার খুলিয়া এক বৃদ্ধা গৃহের বাহির হইয়া আসিলেন। অপরিচিতা রমণী দেখিয়া সত্যব্রত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। বৃদ্ধা তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তুমি কে গা বাছা ?"

—"আমি—আমি—নাম বল্‌লে তো আপনি আমাকে চিন্‌বেন না।"

ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণস্বরে বৃদ্ধা কহিল—"চিন্‌বো না যদি, তা' হলে আমার কাছে কেন এসেছ বাছা?"

—"আমি—আমি তো আপনার কাছে আসি নি।"

—"আমার বাড়ীতে এসেছ—আর বলছো কি না, আপনার কাছে আসি নি। তুমি কি রকম লোক গা বাছা?"

আশ্চর্য্য হইয়া সত্যব্রত কহিল—"সে কি, আপনার বাড়ী! এ বাড়ীতে কি তবে আর কেউ থাকে না?"

—"আবার কে থাক্‌বে!"

—"থাকে না? একজন বিধবা—কুড়ি-একুশ বছরের একটি মেয়ে—আর তার একটি ছোট ছেলে?"

—"না বাছা। তবে আগে থাক্‌তো কি না জানি না। আমি তো এখানকার দুর্ভিক্ষ শেষ হবার পর বাড়ীটা সস্তায় পেয়ে নন্দাইকে দিয়ে সেদিন কেনালাম।"

চমকিত হইয়া সত্যব্রত কহিল—"সে কি, এখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল না কি! কি সর্ব্বনাশ!"

—"হ্যাঁ। দুর্ভিক্ষে কত লোক পালিয়ে গেল—কত লোক মরে গেল, তার কি ঠিকানা আছে। দেখ্‌ছ না, গ্রামটা একেবারে খাঁখাঁ করছে।"

—"আপনি কি জানেন,—আপনি এ বাড়ী কেনবার আগে যারা এ বাড়ীতে থাক্‌তো, তারা কোথা' গেল?"

—"ঠিক জানি না, তবে মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর-জামাই তখন বলেছিল—এ বাড়ী যাদের ছিল, তারা না কি সব মরে গেছে দুর্ভিক্ষে। তাদের—"

সত্য আর দাঁড়াইতে পারিল না, সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল একটি মাত্র কথা —"দেবী!"

বিশ্বের যত আর্ত্তনাদ যেন একত্রিত হইয়া সত্যব্রতের মুখের ঐ দু'টি অক্ষরের মধ্য দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তারপর ভগ্ন-হৃদয়ে দেবগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া চির-বিশ্বাসী বৃদ্ধ দেওয়ানের হস্তে জমিদারীর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সে শিশুপুত্রসহ কলিকাতাবাসী হইল।

পাঁচ

তাহার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অমল এখন ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক। সে কলিকাতাস্থিত কোনো স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সেদিন প্রাতে স্কুলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমল তাহার অপেক্ষা অল্প বয়সের একটি বালকের সহিত কথা কহিতেছিল। বালকটি অমলকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"তুমি বুঝি ভাই এই স্কুলে নতুন ভর্ত্তি হয়েছ?"

—"আমি তো দু' মাস হলো ভর্ত্তি হয়েছি। তুমি কি আমাদের এই স্কুলে পড়ো?"

বালকটি মাথা নাড়িয়া কহিল—"হ্যাঁ।"

বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া অমল কহিল— "কিন্তু এর আগে একদিনও তো তোমাকে স্কুলে দেখি নি।"

—"আমার মায়ের বড় অসুখ করেছিল কি না, তাই দু' মাস ছুটি নিয়েছিলাম।"

—"তুমি এইটুকু ছেলে মায়ের অসুখের জন্যে ছুটি নিলে!"

—"কি করবো, আমাদের তো আর কেউ নেই, খালি হরি দা' আছে—তা' সে তো একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছে—কিছুই করতে পারে না।"

—"কেন, তোমার বাবা?"

ম্লানমুখে বালক কহিল—"আমার তো বাবা নেই।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অমল কহিল—"বাবা নেই!"

এই দুইটি কথা সে এমন ভাবে উচ্চারণ করিল, যেন কাহারও 'বাবা' না থাকা তাহার নিকট পরম বিস্ময়জনক ব্যাপার।

অমলের কথার উত্তরে বালক নীরবে মস্তক নাড়িল।

—"আমার বাবা আছে।" বলিয়া অমল গর্ব্বিত-ভাবে তাহার দিকে চাহিতেই দেখিল—বালক করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অমল কহিল—"তুমি কোন্‌ ক্লাসে পড়ো ভাই?"

—"তোমার চেয়ে দু' ক্লাস নীচে পড়ি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বালকটি কহিল—"আচ্ছা ভাই, তোমরা বড়লোক—মোটরে ক'রে এলে, না ?"

অমল মস্তক নাড়িল।

—"তোমাদের বাড়ীতে কুকুর আছে—কুকুর আমি বড় ভালবাসি।"

সোৎসাহে অমল কহিল—"হ্যাঁ, আমার দুটো কুকুর আছে—একটা শাদা, একটা কালো।"

আগ্রহভরে বালক কহিল—"আমাকে দেখাবে ভাই ?"

—"হাঁ, দেখাবো। যাবে আমাদের বাড়ী ?"

—"হ্যাঁ, যাব।"

সাগ্রহে তাহার হস্ত ধরিয়া অমল কহিল—"আজই স্কুলের ছুটির পর চলো না ভাই। যার সঙ্গে আমার ভাব হয়, তাকেই একদিন-না-একদিন আমাদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাই। তোমার সঙ্গেও তো আজ ভাব হয়ে গেল—চলো না ভাই, আমাদের বাড়ী আজকে।"

—"না ভাই, আজ বাড়ী গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস ক'রে কাল যাব, কেমন ?"

—"আচ্ছা, কাল কিন্তু ঠিক্ যেতে হবে।"

ছয়

বাহিরে গমনের উপযোগী বেশ ধারণ করিয়া সত্যব্রত ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। এই দশ বৎসরের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার তপ্তকাঞ্চন বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ নয়ন কোণে কালি পড়িয়াছে। তাহার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের মধ্যে খুঁজিলে দু'-একগাছি শাদা চুলও পাওয়া যাইতে পারে। সত্যব্রত অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। এমন সময় অমল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"বাবা, আমার আর একজন নতুন বন্ধু হয়েছে।"

সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া ঈষৎ হাসিয়া সত্যব্রত কহিল—"বেশ।"

—"তা'কে এনেছি বাবা, দেখ্‌বে এস। সে কুকুর বড় ভালবাসে—আমার কুকুর দেখ্‌বে বলে এসেছে। এস না বাবা।"

—"আমি এখন একটু দরকারে যাচ্ছি অমু, এসে তোমার বন্ধুকে দেখ্‌বো।"

—"না বাবা, ও যে এখুনি বাড়ী চলে যাবে। তুমি একটু পরে দরকারে যেও।"

"—ওকে তা' হলে আর একদিন এনো।"

—"না বাবা, ও রোজ রোজ আমাদের বাড়ী আসবে না। ও বলে—আমরা বড়লোক, আমাদের বাড়ী প্রত্যহ ওর আসতে নেই।"

সত্যব্রত হাসিয়া ফেলিয়া পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া গেল। আপন-মনে কহিল—"সত্যি কথা।"

—"ও বল্‌ছিল, ওর মা আসতে দিচ্ছিল না। অনেক কেঁদে একদিন খালি কুকুর দেখ্‌বে বলে এসেছে। মা ভাল না, বাবাই ভাল—নয় বাবা ?"

সত্যব্রত তাহার দীর্ঘ নয়ন তুলিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিল। 'কি বলিতে চাহিল, বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহার বক্ষ কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল।

—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা ? এস না—" বলিয়া অমল পিতার হস্ত ধরিয়া টানিল। সত্যব্রত পুত্রের অনুসরণ করিল।

পুত্রের কোনো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। পুত্রের ছোট ছোট খেয়ালগুলি মিটাইতে তাহাকে সদা-সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা যতদূর অসম্ভব অশোভনীয় হোক্ না কেন, তাহা না মিটাইয়া সত্যব্রত হৃদয়ে শান্তি পাইত না। পুত্রের এক খেয়াল ছিল নিত্য নূতন বন্ধু সংগ্রহ করা এবং তাহাদের গৃহে আনিয়া পিতার নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া।

অমল পিতার হস্ত ধরিয়া তাহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিল।

সত্যব্রত বিস্মিত নেত্রে দেখিল, এক অনিন্দ্যসুন্দর বালক অমলের কালো রংয়ের কুকুরটার গলা জড়াইয়া

ধরিয়া আদর করিতেছে। পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই, তাহার মুখের উপর সত্যব্রতের দৃষ্টি পড়িল। বিহ্বল নেত্রে সত্যব্রত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! অমল কহিল—"ও ভাই, আমার বাবা তোমাকে দেখ্‌তে এসেছে।"

বালক মুখ ফিরাইয়া সত্যব্রতের দিকে চাহিল। সত্যব্রত চমকিত হইল।—এ কি—এ কি—এ কার নয়নের দৃষ্টি! কিন্তু হায়, সে তো বহুদিনই কাল কবলিত হইয়াছে! সত্যব্রত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পুনঃ পুনঃ সত্যব্রতকে তাহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া বালক বড়ই বিব্রত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল—কতক্ষণে এই লোকটা এখান হইতে চলিয়া যাইবে।

সত্যব্রত মৃদুকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"খোকা, তোমার নাম কি?"

আড়ষ্ট কণ্ঠে সে কহিল—"স্মৃতি।"

—"স্মৃতি!"

স্মৃতি মস্তক নাড়িল।

—"স্মৃতি, তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

—"স্কুলের কাছে।"

—"না না, সে বাড়ী নয়, আমি সে বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের দেশ কোথায়?"

—"আমাদের তো দেশ নেই, আমরা এখানেই থাকি।"

—"চিরকালই এখানে থাকো?"

—"হ্যাঁ।" হতাশভাবে সত্যব্রত চেয়ারে গা এলাইয়া দিল।

অমল কহিল—"দাঁড়া স্মৃতি, আমার শাদা কুকুরটা নিয়ে আসি।" বলিয়া ছুটিয়া সে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

স্মৃতি বিপন্নভাবে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যব্রত আবার সোজা হইয়া বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"স্মৃতি, তোমার দিদিমা আছেন?"

—"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সত্যব্রত আপন-মনে কহিল—"হায়! জানি অসম্ভব, তবু যে কেন"—বলিয়া একটা উদ্যত নিশ্বাস সে অতিকষ্টে রোধ করিল। অমল তাহার কুকুরের গলার চেন ধরিয়া টানিতে টানিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—"বাবা, এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

সত্যব্রত কক্ষ ত্যাগ করিল। স্মৃতিও হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অমল কহিল—"দেখো স্মৃতি, আমার কালো কুকুরের চেয়ে এই শাদা কুকুরটাই ভালো, নয় ভাই?"

—"হ্যাঁ ভাই, খুব সুন্দর! আমার একটা কুকুর পুষতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু মা বারণ করে।"

বিরক্তভাবে মাথা নাড়িয়া অমল কহিল—"মায়ের চেয়ে বাবাই ভালো।"

সবেগে মস্তক চালনা করিয়া স্মৃতি কহিল—"কখনোই নয়, মা ভালো!"

সাত

একমাস পরে একদিন অপরাহ্নে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া সত্যব্রত একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল। দ্রুতপদে অমল সেখানে আসিয়া কহিল—"বাবা, স্মৃতি আজ দু' দিন স্কুলে আসে নি বলে আজ আমি ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

সত্যব্রত অন্যমনস্কভাবে কহিল—"হুঁ।"

—"ওর মায়ের খুব অসুখ করেছে বাবা। খালি খালি অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি যখন ওদের বাড়ী গেলাম, তখন স্মৃতির মা বিছানার ওপর অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে, আর স্মৃতি পায়ের কাছে বসে বসে কাঁদছে। ওর বুড়ো হরি দা' দরজার কাছে চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমি ডাক্তার ডাকতে বল্লাম বাবা। স্মৃতি বল্লে—"আমরা যে ভাই গরীব, আমাদের তো পয়সা নেই। পয়সা না দিলে ডাক্তারবাবু আসেন না।"

—"আহা!"

—"তুমি দেখ্‌বে চলো না বাবা, তা' হলে তো ওদের পয়সা দিতে হবে না।"

—"দূর পাগল! তারা না ডাকলে আমি কখনও কি যেতে পারি?"

—"বারে! আমি স্মৃতিকে বলে এসেছি যে, আমার বাবাকে আন্‌ছি, আমার বাবা ডাক্তার—তুই কাঁদিস নি ভাই, চুপ কর্।"

—"অমু, তুমি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌বে না যে, এভাবে একজনদের বাড়ী যাওয়া আমার পক্ষে কতদূর অসম্ভব।"

—"না বাবা, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি—তুমি চলো। স্মৃতি বড় কাঁদছে—ওদের যে আর কেউ নেই বাবা! ওঠো না বাবা!"

আট

তাড়াতাড়ি মোটার হইতে নামিয়া অমল তাহার পিতার হস্ত ধরিয়া নামাইল।

—"এই দিক্ দিয়ে এস বাবা—"বলিয়া সে অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়া পিতাকে লইয়া একটা জীর্ণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারই এক কক্ষের সম্মুখে আসিয়া কহিল—"এই ঘরে বাবা।"

সত্যব্রত থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। কক্ষমধ্য হইতে স্মৃতির অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। অমল ডাকিল—"স্মৃতি।"

স্মৃতি ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

—"ও ভাই, শীগ্‌গির এস—আমার মা কিছুতেই কথা বল্‌ছে না!"

সত্যব্রত তাহাকে ক্রোড়ের নিকট আনিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"ভয় কি? আমি ওষুধ দিচ্ছি, তোমার মা এখুনিই কথা বল্‌বেন।" বলিয়া স্মৃতিকে লইয়া পুত্রসহ সত্যব্রত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষের চতুর্দ্দিকে নির্ম্মম দারিদ্র্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একপ্রান্তে একটি জীর্ণ শয্যার উপর রোগিনী শায়িতা। সত্যব্রত 'ষ্টেথিস্কোপ্' হস্তে তাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল! ছিন্নতরুর ন্যায় ডাক্তারের মস্তক রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল। আর্ত্তস্বরে সে কহিল—"দেবী!"

* * *

তারপর সত্যব্রতের অক্লান্ত চেষ্টায় দেবী চক্ষু মেলিল। ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল—"স্মৃতি!"

স্মৃতি ছুটিয়া আসিয়া মাতৃবক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা!"

দেবী জীর্ণ হস্তে তাহার মস্তক বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

—"দেবী!"

এ কি, এ কার কণ্ঠস্বর! ও গো, এ কার কণ্ঠস্বর! দীর্ঘ দশ বৎসর পরে দেবীর ছিন্ন হৃদয়-তন্ত্রীতে কে আজ এ অপূর্ব্ব মধুর ঝঙ্কার তুলিল! আত্মবিস্মৃতভাবে সে উঠিয়া বসিতে গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া সত্যব্রত কহিল—"উঠো না দেবী, পড়ে যাবে যে।"

এ কি অচিন্তনীয় দৃশ্য! দেবী যে কোনোমতেই তাহার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারে না! বিহ্বল-দৃষ্টিতে সত্যব্রতের মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে সে কহিল—"তুমি—তুমি—সত্যি তুমি!"

ম্লান হাসি হাসিয়া সত্যব্রত কহিল—"হ্যাঁ, আমি। শুধু আমি নয়, তোমার অমুও এসেছে। সেবারে তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে রেখে দিয়েছিলাম, এবারে অমু চিরদিনের জন্যে তোমার—"

উৎসুক নয়নে সত্যব্রতের দিকে চাহিয়া দেবী কহিল—"অমু এসেছে? কই—কই—কোথায় আমার অমু?"

শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অমল অবাক্ হইয়া চাহিয়াছিল! কিছুই তাহার বোধগম্য হইতেছিল না। দেবী অনুসন্ধিৎসু নয়নে চারিদিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি অমলের দিকে পড়িল। সে ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিয়া পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইল। তাহার নয়নের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সত্যব্রত পত্নীর মাথার নিকট দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সেই অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

লাবণ্য মজুমদার

চং যুগো

[দ্বিতীয় লীলা]

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত এম্-এম্-এথ্

গোয়েন্দা রায় জগন্নাথ দাস বাহাদুর রঞ্জন রায়ের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া একখানি সংবাদ-পত্র পড়িতেছিলেন। সন্ধ্যা সাতটা। রঞ্জন রায় ভিতরে ছিলেন বলিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই রঞ্জন রায় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "নমস্কার, জগন্নাথবাবু যে—কি আদেশ বলুন ?"

কাগজখানি টেবিলে রাখিয়া স্থূলবপু জগন্নাথ দাস বলিলেন, "একটু কাজ আছে, বসো, বল্‌ছি।" "পরে অল্প কাশিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন, "শুনেছ হে, এ দিকের ব্যাপার যে গুরুতর হয়ে উঠছে; কোকেনের রাজা চং যুগো আবার এসেছে। আমাকে সে চিঠি দিয়েছে যে, শীগ্‌গিরই একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।"

"ভালই করেছে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে রঞ্জন রায় বলিলেন; "দেখি চিঠিখানা, চং যুগো কি লিখেছে।"

ঢিলা পাঞ্জাবীর বোতাম খুলিয়া ভিতরের পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া রঞ্জন রায়ের হস্তে দিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "গতবারে সে তোমাকে যে চিঠি দিয়েছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো একই লেখা কি না। সেবারে খুব পালিয়েছে লোকটা।"

সতর্ক গোয়েন্দার পাঞ্জাবীর ভিতরের দিকেও পকেট ছিল।

টেবিলের উপরিস্থিত 'কলিং বেল' বাজাইয়া রঞ্জন রায় মধুকে ডাকিলেন এবং পূর্ব্বের চিঠিখানা 'রেকর্ড রুম' হইতে আনিতে বলিলেন।

কোকেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে গতবার চং যুগোর দল ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নেতা চং যুগো পলাইয়াছিল। পলায়ন কালে রঞ্জন রায়কে ভয় দেখাইয়া একখানা চিঠিতে পুনরাগমনের কথা লিখিয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বের পত্র আনীত হইলে রঞ্জন রায় নিবিষ্ট মনে দুইখানি পত্র মিলাইয়া দেখিলেন—লেখা এক হাতের বলিয়া

মনে হইল না। বিশেষ পরীক্ষার পর তিনি বলিলেন, "না, এ দুটো লেখা এক হাতের নয়; অন্ততঃ, এক রকম নয় এ কথাই বলা ঠিক্।"

"তবে?" রায়বাহাদুর বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম এবার আর তাকে পালাতে দেব না; একবার চাক্ষুষ দেখা হলে হয়। পুলিশের সঙ্গে চালাকী!"

রায়বাহাদুরের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা মোটর আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিয়া গেল এবং অল্প পরেই ইংরাজী পোষাকপরা এক বৃদ্ধ একগাছা মোটা লাঠির উপর ভর দিয়া রঞ্জন রায়ের ভৃত্যের সহিত তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

রঞ্জন রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বুঝি মিঃ রায়? আর ইনি? হ্যাঁ, গোয়েন্দা রায়বাহাদুর জগন্নাথ দাস বোধ হয়?"

বৃদ্ধের বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা শুনিলে তাহাকে ইংরাজ বলিয়া ভ্রম হয়—কিন্তু রং অল্প ময়লা, মুখমণ্ডল কিছু গোলাকৃতি এবং তাহাতে বয়সের ছাপ থাকিলেও স্থবিরতার রেখা নাই, বরং তাহা দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চক্ষু ও নাসিকায় তাহার জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল।

"হাঁ, ইনি গোয়েন্দা রঞ্জন রায়" বলিয়া জগন্নাথবাবু বলিলেন, "আমার বিষয় আপনি সত্যই অনুমান করেছেন।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লাঠিটা টেবিলের নিকট দাঁড় করাইয়া বসিতে বসিতে মৃদুহাস্যে বৃদ্ধ বলিল, "অনুমান নয়, অনুমান নয়। অনুমানের উপর নির্ভর করে চং যুগো কোনো কাজ করে না। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম; কোন বিশেষ কাজ ছিল। তা' শুন্‌লাম, আপনি এখানে এসেছেন, কাজেই এলাম।"

নাম শুনিয়া রায়বাহাদুর লাফাইয়া উঠিলেন—যে দুর্বৃত্তকে ধরিবার জন্য দেশের পুলিশ প্রাণপাত করিতেছিল, যাহার কৌশল ও কার্য্যদক্ষতায় বারবার তাহারা পরাজিত হইতেছিল, সেই, সেই বৃদ্ধ চং যুগো আজ দুইজন গোয়েন্দার সম্মুখে বসিয়া অবলীলাক্রমে নিশ্চিন্ত মনে আত্ম-পরিচয় দিতে আসিয়াছে।

রায়বাহাদুর লাফাইয়া মধুকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে পুলিশ ডাকিতে, অথবা লোকজন লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিল, "মিঃ দাস, ব্যস্ত হবেন না। আমি জানি আমার নামের একজন লোকের বিরুদ্ধে পুলিশ গত বৎসর থেকেই কড়া নজর রেখেছে। আমি যদি সত্যই সেই চং যুগো হতাম ত এতটা মূর্খতা করে আপনাদের বাড়ীতেই সাক্ষাৎ করতে আসতাম না। ভাল, মনে করুন, আমার নাম চং যুগো নয় আমি ওয়াঃ সেম্—আপনারা কি করতে পারেন? আমাকে আপনারা জানেন না, চাক্ষুষ দেখেন নাই, যদি বলি আমিই সেই জাপানের মিকাডো, আপনারা তা' বিশ্বাস করবেন কি? কাজেই দেখুন, শুধু নামটা এক বলেই অমন করে লাফিয়ে ওঠা ঠিক্ হয় না।"

রায়বাহাদুর কঠিন স্বরে বলিলেন, "তোমার হাতের লেখায় তা' এখনই প্রমাণ হবে—তোমার দু'খানা চিঠি আমার কাছে আছে।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "উত্তম কথা মিঃ দাস। সোনাগাছির লছমী বাঈয়ের কাছে আপনি হ্যাণ্ডনোটে যে পাঁচ শ' টাকা নিয়েছিলেন, সেটা কবে দেবেন তাই বলুন—আপনাদের গোয়েন্দাগিরিটা একটু পরেই না হয় করবেন। টাকার জন্য আমি এসেছি, সেই কথা বলুন।"

সক্রোধে জগন্নাথ দাস বলিলেন, "মিথ্যা কথা! হ্যাণ্ডনোটে আমি একটা বেশ্যার কাছে টাকা ধার করব? জাল, ষড়যন্ত্র!"

হাস্যমুখে বৃদ্ধ বলিল, "কিন্তু হাতের লেখাটা ত আপনার, কাজেই আপনার এ সব উচ্ছ্বাস আদালতে টিঁকবে কি মনে করেন?"

টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা শাদা কাগজ টানিয়া বৃদ্ধ বলিল, "আমার হাতের লেখার সঙ্গে আপনাদের চিঠির লেখা মিলবে কি" বলিয়া দোয়াত কলম লইয়া বৃদ্ধ চিঠির ভাষানুযায়ী সমস্ত লিখিয়া গেল। টেবিলের উপর রঞ্জন রায় চিঠি দুইখানি বৃদ্ধের নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন।

একবার লেখা শেষ হইলে পুনরায় সে বাম হস্তে কলম লইয়া স্বচ্ছন্দে ঐরূপ লিখিয়া বলিল, "মিল পাচ্ছেন কোথাও? মুখে কলম ধরেও আমি লিখ্তে পারি। পায়ের সাহায্যেও পারি। কি ছাই গোয়েন্দাগিরি করেন আপনারা যে, এক কথায় আমাকে ধরবার জন্য পুলিশ ডাক্‌তে পাঠান। লছমীয়ার টাকাটা যদি না দেন ত আপনার নামে শীগ্‌গিরই 'কেস' করা হবে তা' জানিয়ে রাখ্‌ছি কিন্তু। আদালত আপনার হস্তাক্ষর মেনে নেয় কি না তা' আপনি দেখ্‌তেই পাবেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি হ্যাণ্ডনোট বাহির করিয়া দুইজনকেই দেখাইয়া পকেটে রাখিয়া দিল।

"তুমি মনে করো না যে, তোমার ঐ জাল দলিল দেখে আমি ভয় পাব চং যুগো—তুমি স্বইচ্ছায় বাঘের গুহায় এসে মনে করো না যে, পালাবার পথ পাবে আজ—আমার সঙ্গে তোমায় এখন থানায় যেতে হবে" বলিয়া রায়বাহাদুর দরজার নিকট কনষ্টেবলদের দেখিয়া তাহাদের ভিতরে ডাকিলেন।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "চমৎকার মিঃ দাস! আপনি বল্‌তে পারেন কোন্ অভিযোগে, কোন্ যুক্তিতে আমায় বন্দী করবেন? আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আছে কি আপনার? চং যুগো কোকেন দলের নেতা—কাজেই যেখানে যত চং যুগো আছে, সবাই অপরাধী মনে করেন বোধ হয়। আমি যে সত্যই সেই নেতা তার প্রমাণ যোগাড় করুন। এ পুলিশ অভিনয়ে লোকে আপনার বুদ্ধির তারিফ করবে না। প্রমাণ চাই, বুঝ্‌লেন—মুখের কথায় হবে না—কাগজে-কলমে কঠোর প্রমাণ দরকার। যেমন আপনার ঐ হ্যাণ্ডনোটখানা। পারবেন এ রকম যোগাড় করতে? যদি না পারেন, জানবেন—বাঘের গুহায় সিংহ আসতে ভয় পায় না।"

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রঞ্জন রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনার কি মত, বন্দী করছেন না কি?"

হাসিতে হাসিতে রঞ্জন রায় উঠিয়া বৃদ্ধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "কিছু মনে করা কোন পক্ষেরই উচিত নয় এখন, এক নাম অনেক লোকেরই থাকে।" তৎপরে মধুকে ডাকিয়া তিনি বৃদ্ধকে লইয়া বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

চং যুগো চলিয়া যাইবার পর প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। রঞ্জন রায় চুরুট টানিতে টানিতে রাস্তার দিকের জানালার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন, রায়বাহাদুর জগন্নাথ দাস উপরের ঠোঁট নীচে এবং নীচের ঠোঁট উপরে করিয়া দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া ছিলেন।

কনষ্টেবল ও বৃদ্ধকে বিদায় করিয়া মধু ঘরে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "বুড়োর লাঠিটা পড়ে রয়েছে।"

সত্যই লাঠিটা লইতে বোধ হয় সে ভুলিয়া গিয়াছিল। রায়বাহাদুরের দৃষ্টি সেইদিকে পড়ায় তিনি লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "ভারী ঠেকছে, নিশ্চয় এটা গুপ্তি।"

লাঠিটা উপরের দিকে তুলিয়া হাতলটি খুলিতেই জগন্নাথ দাস ভয়ে চীৎকার করিয়া সেটা ফেলিয়া জামা-কাপড় ঝাড়িতে লাগিলেন।

"সাপ। সাপ!" বলিয়া মধু জগন্নাথ দাসের পাঞ্জাবীটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। লাঠির খোলের মধ্যে একটা সাপ ছিল। মুখ খোলা পাইয়া সেটা কিরূপে জগন্নাথবাবুর পাঞ্জাবীর উপর পড়িয়া গিয়াছিল।

একটা সাপ বোতাম খোলা ঢিলা পাঞ্জাবীর উপর দিয়া গিয়া গেঞ্জির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে—যাহার দংশনে মানুষ মৃত্যু কল্পনা করিয়া থাকে, সেই সাপ গেঞ্জির মধ্যে চলিয়া গেল। মধু তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার পূর্ব্বেই সাপটা রায়বাহাদুরের বক্ষে দংশন করিল। নিমেষে এ সব ঘটিয়া গেল। রঞ্জন রায় তাঁহাদের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মধু সাপটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

সাপটা মরিল সত্য, কিন্তু যাঁহার বক্ষে দংশন করিল, তাঁহার কি হইল? জগন্নাথবাবুর চোখের সম্মুখে বিরাট অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, শরীর অবসন্ন হইয়া গেল। রঞ্জন রায় তাঁহাকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া স্পিরিটের বোতলে মৃত সাপটাকে

রাখিয়া বলিলেন, "বিষহীন সাপ—ফাঁপা লাঠি—কিন্তু লাঠিতে দেখ্‌ছি রায়বাহাদুরেরই নাম লেখা রয়েছে। চতুর এই চং যুগোর দূরদৃষ্টিহীন মূর্খতা! সন্দেহ সত্য হলো।"

দুই

কয়েকদিন পরের ঘটনা। ক্যানিং ষ্ট্রীটের একখানা দ্বিতলে বাড়ীর একটা নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া কয়েকজন চীন দেশীয় লোক নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। চীন ভাষায় লিখিত একখানা পত্র লইয়াই আলোচনা চলিতে ছিল।

বৃদ্ধবেশে চং যুগো তখন পাশের ঘর হইতে ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। হস্ত সঙ্কেতে তাহাদের বসিতে বলিয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, "দিন দিন বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে, কিছু কমিয়ে নিলেই ভাল হয়—রঞ্জন রায় বোধ হয় আমাকে সত্তর-আশী বছরের বুড়োই মনে করেছে।"

চিঃ ফোঃ বলিল, "কিছু কমিয়ে ফেলুন।"

"তাই ভাল" বলিয়া ঘরের একপাশে রাখা একটা ড্রেসিং টেবিলের নিকট গিয়া ড্রয়ার খুলিয়া সাবান ও এক বোতল কি একটা লোশন বাহির করিয়া মুখ প্রভৃতি খানিকটা জলে ধুইয়া পরে সাবান ও লোশন দ্বারা উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া আর্শীতে মুখ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ বলিল, "এবার আমি আসল চং যুগো—ত্রিশ বছর ধুয়ে ফেল্‌লাম এক কথায়।"

সান ইয়ুম জিজ্ঞাসা করিল, "এ চিঠিখানার বিষয় কি আদেশ দেন আমাদের?"

"এবার আমাদের বিশেষ সাবধানে কাজ করতে হবে। ক্যাণ্টন থেকে যে আফিম আসছে, সেটা যাতে পুলিশের হাতে না পড়ে" বলিয়া চং যুগো বলিতে লাগিল, "এ চিঠির জবাব আমিই লিখে দিয়েছি, তবে তার প্রতি উত্তরটা কেন ক্যাণ্টন থেকে এতদিনেও এল না তাই ভাবছি।"

চগ্‌ টোয়াঙ বলিল, "মারা পড়েনি ত?"

"না তা' নয়" চং যুগো বলিল, তোমরা দু' জনে লাসায় যাও। ক্যাণ্টন থেকে একদল লামা লাসায় রওনা হয়েছে। তাদের হাতেই আমাদের মাল চালান করে দিতে বলেছি। যে সব লামাদের জামায় গোলাপের লাল ছাপ দেওয়া দেখ্‌বে, তারাই আমাদের মাল আন্‌ছে জান্‌বে।"

টেবিলের উপর চীনা মাটির বড় একটা বাটিতে খানিকটা গরম 'সবুজ চা' তৈয়ারী ছিল। একটা বড় কাঠি দ্বারা চা-টাকে ভাল করিয়া নাড়িয়া চং যুগো তাহার খানিকটা পান করিয়া বলিল, "এস সান্‌ ইয়ুম, চা নাও। তোমাকে লাসায় যেতে হবে।"

পাত্রটি লইয়া সান্‌ ইয়ুম কপালে ঠেকাইয়া তাহার এক চুমুক পান করিয়া চিঃ ফোঃর দিকে চাহিল। চিঃ ফোঃ বাটিটা কপালে ঠেকাইয়া এক চুমুক পান করিয়া আনন্দে বলিল, "কবে যেতে হবে বলুন?"

"বেশ।" চং যুগো বলিল, "তোমরা দু'জন ছাড়া আর বাকী সঙ্গীদের আমার এখন দরকার হবে না। তোমরা থাকো, অন্যেরা যাক্‌।"

এক এক করিয়া ঘর খালি হইয়া গেলে চং যুগো বলিল, "এক হাজার পাউণ্ড আসবার কথা আছে।"

"হাজার পাউণ্ড!"

"হ্যাঁ, তিব্বতের পথে আসবে এবার। লাসা থেকে গ্যাংটক্‌ বা গ্যাঁচী পর্য্যন্ত আনা শক্ত হবে না। কিন্তু কালিম্পং থেকে বৃটিশ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। পুলিশের লোক আছে; তাদের টাকার জোরে হাতে আন্‌তে না পার, ছোরা ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হবে না। কালিম্পং পার হয়ে যে সব চা বাগানের মালিকদের নামে চিঠি দেব, তাদের সঙ্গে দেখা করবে। তারাই বড় বড় বাক্সের মধ্যে চায়ের সঙ্গে কয়েক পাউণ্ড করে আফিম আমার এখানে পাঠিয়ে দেবে। চায়ের এজেন্সী তবে আমি নিয়েছি কেন?"

সান্‌ ইয়ুম বলিল, "সমস্তই এক উপায়ে আসবে?"

"পাগল!" চং যুগো বলিল, শোনো, "কিছু যাবে জয়ন্তী পাহাড়ের দিকে—বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদী পার হয়ে হাঁটা পথে জয়ন্তীর বনে আমাদের যে কাঠের কারখানা আছে সেইখানে—বড় বড় গাছের গুঁড়ির মধ্যে মিস্ত্রীরা গর্ত্ত

করে দু' দশ পাউণ্ড মাল ভরে মুখ বন্ধ করে দেবে, আর লোকজন নিয়ে তোমরা সেই সব গুঁড়ি তিস্তা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসবে, তারপর যা' করবার, আমার এখানকার দলের লোক করবে।"

"পুলিশের চোখ পড়বে না ?"

"না। চিঃ ফোঃ, তারা এ রহস্য জান্‌লে ত তবে চোখ ফেল্‌বে। কাঁচা কাঠের গন্ধে আফিমের গন্ধই থাক্‌বে না। তার ওপর জলে ভিজে গর্ত্তের মুখ আরো এঁটে যায়, গন্ধ বার হবার উপায় থাকে না।"

"চং যুগো বলিল, "তবে পুলিশেরা কতকটা অনুমান করেছে যে, বিস্তর আফিম আসছে। কি করে জান্‌ল জানি না। তাদের এই অনুমানটাকেই কেন্দ্র করে তাদের অন্য পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি রকম ?"

"তারা জানে যে, আফিম আস্‌ছে 'ওটাগা' জাহাজে, জলপথে। কাজেই তারা এখন থেকেই রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি জায়গায় বেশ লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছে। মোটা গোয়েন্দাটা এবার শীগ্‌গিরই একটা বড় কিছু উপাধি পাবে। রায়বাহাদুরে আর চল্‌বে না।"

"আস্‌ছে হাঁটা পথে, আর আপনি সংবাদ দিলেন জল-পথের।" সান্ ইয়ুম বলিল, "কিন্তু 'ওটাগা' ত তিন মাস পরে নানকিং থেকে ছাড়বে।"

"নানকিং নয়, স্যাংহাই থেকে" বলিয়া চং যুগো কহিল, "কাজেই তিন মাস পর্য্যন্ত তারা নিশ্চিন্ত। আমরাও নিশ্চিন্তে কাজ করে যাব।" অল্প পরে চং যুগো পুনরায় বলিতে লাগিল, "কিন্তু যেন মনে হয়, সেই গোয়েন্দাটা আমার ছদ্মবেশ জান্‌তে পেরেছে—তাকে মাঝে মাঝে আমাদের পাড়ার পোষ্ট অফিসে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

"কে ? গোয়েন্দা রায় ?" চিঃ ফোঃ বলিল, "বলেন ত কালই তার মাথাটা গলা থেকে নাবিয়ে দিয়ে আমরা তিব্বতে রওনা হই। সামান্য একটা লোকের জন্য এত ক্ষতি হ'তে দেওয়া উচিত নয়।"

"না, তার দরকার হবে না। যখন যে রকম অবস্থা দেখ্‌ব, তখন সে রকমই করব আমি—দরকার মনে হয়, সমস্ত কথাই উড়িয়ে দেব। পুলিশের সঙ্গে কোথায় কি রকম ব্যবহার করতে হয় তা' আমি জানি।"

"কিন্তু তারা ত আপনাকে চেনে ?"

"ও চেনাচিনির কোনো দাম নেই—আবার সব উল্টো প্রমাণ দেখিয়ে তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেব।"

নানারূপ কথায় রাত্রি অধিক হইয়া গেল। অনুচরদিগকে তিব্বতে পাঠাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সঙ্গীদের লইয়া চং যুগো ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

তিন

"অদ্ভুত ঘটনা! অদ্ভুত ঘটনা!" বলিতে বলিতে রায়বাহাদুর রঞ্জন রায়ের সহিত দেখা করিয়া কহিলেন, "কি হে, ভাব্‌ছ কি ? এবার চং যুগো ত মুঠোর মধ্যে।"

সন্ধ্যার সময় রঞ্জন রায় বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। জগন্নাথ দাসের কথা শুনিয়া বলিলেন, "সত্যই অদ্ভুত! ভাব্‌ছি এই চং যুগোর বয়স ঠিক্ কত। চল্লিশ, না সত্তর-আশী ?"

"চুলোয় যাক্ তার বয়স! ভাল, চল্লিশ কিসে মনে হলো ?"

"যখন সে এসেছিল লাঠিতে ভর দিয়ে, আর যখন সে চলে গেল তখন বিনা লাঠিতে—তার আসা ও যাওয়ার ভঙ্গীতে তার বয়স পাওয়া গেল।"

"তা'তে লাভ ?"

"জানা গেল অনেক। মোট কথা, সে ছদ্মবেশে সিদ্ধহস্ত।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "কোন চতুর লোককে ধরতে গেলে তার প্রধান প্রধান গুণগুলি আমাদের নিখুঁত-ভাবে জানা দরকার। এই লোকটার অনেকগুলি গুণ আছে। যার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে—তার সেই গুণগুলি অতিক্রম করে তার কাছে পৌঁছতে হলে একটা কোন ছিদ্র আবিষ্কার করা দরকার—না হলে ব্যূহ-প্রবেশ সম্ভব নয়। অনেক সময় এই গুণেরই কোন একটা অতিমাত্রায় হয়ে দোষের কাজ করে। চং যুগোর অতিমাত্রায় আত্ম-বিশ্বাসই তার ব্যূহ-প্রবেশের

পথ মনে হয়। যাক্, এখন আছেন কেমন? সাপের বিষ আর টের পান না ত? মাসাবধি আর এদিকে আসেন নি যে—কাজ ছিল?"

"কাজ?" চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জগন্নাথ দাস বলিলেন, "কাজ কি হে, কাজ বলে কাজ! চং যুগোর পেছনে মাসাবধি যে খাটুনিটা খাট্‌ছি, তুমি ঘরে বসে জল্পনা-কল্পনায় তার কি জান্‌বে হে। তার দলের একটা স্ত্রীলোককে আবিষ্কার করেছি, জানো? অনেক রহস্য জানা গেছে। আমরা যে বুড়োকে দেখেছিলাম, সেই প্রকৃত চং যুগো—কিন্তু সে আজকাল এখানে নাই, ভয়ে রেঙ্গুনে পালিয়েছে। রেঙ্গুন পুলিশ তাকে দেখ্‌লে গ্রেপ্তার করবে।"

একটা চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া স্মিতহাস্যে রঞ্জন রায় বলিলেন, "এত কাজ করেছেন আপনি, তা' আমি মিঃ ব্রাউনের মুখে শুনেছি। তিনিও আপনার সুখ্যাতি করছিলেন। কিন্তু জগন্নাথবাবু, এতটা পরিশ্রম না করলেও পারতেন, এ সমস্তই পণ্ডশ্রম হয়েছে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জগন্নাথ দাস ক্ষণিকের জন্য রঞ্জন রায়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "যাক্, তোমার মতামত নিতে আসি নি, সময়ও নেই। ভাল কথা, তুমি যাবে না শুন্‌লাম, মধু বল্‌ছিল।"

"কোথায়?"

"লালবাজার থানায় আজ রাত ন'টার সময় সর্ব্বজাতীয় গোয়েন্দা-সম্মেলনী আছে। কয়েকজন দেশী-বিদেশী বিখ্যাত গোয়েন্দা কোলকাতায় এসেছিলেন। মিঃ ব্রাউন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের যোগাড় করেছেন, তোমাকে বলেন নি বোধ হয়?"

"মিঃ ব্রাউনের নিমন্ত্রণ আমিও পেয়েছি, আর আজকের যা' যা' অভিনয় হবে, তাও জানি; কাজেই আমি সেখানে যাব না—কেন না, এই জিনিষটাকে আমি অন্যদিক্ দিয়ে অন্যরূপে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, আমি যুক্তি ও বিচার সাহায্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, চং যুগো রেঙ্গুনে যায় নি, চং যুগো বৃদ্ধ নয়, জলপথে সে আফিম আনাচ্ছে না—কোলকাতায় বসে আপনাদের নিয়ে সে অভিনয় করছে।"

"বটে! যে স্ত্রীলোকটা তার দলের—বিশেষতঃ চং যুগো-সংক্রান্ত অনেক কথাই বলেছে—যে আজ সে সমস্ত প্রমাণ করবার জন্য এতগুলি গোয়েন্দার মধ্যে কাগজ-পত্র নিয়ে আসতে স্বীকৃত হয়েছে, সে অভিনয় করছে বল্‌তে চাও? এ অভিনয়ে, এ প্রতারণায় তার কি শাস্তি হতে পারে তা' কি সে জানে না?"

"জানে—বড় জোর ছ' মাস কি এক বছরের জেল। সময়টা না হয় আরও বাড়াতে পারেন, কিন্তু তাকে ফাঁসি দিতে ত পারেন না।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "তারপর স্ত্রীলোকটার আদ্যন্ত সব জানেন ত?"

"ভাল করেই তা' জানা হয়েছে। আমরা এতগুলো লোক কিছু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি না। দশ দিন থেকে পুলিশ সেই মেয়েটার পেছনে ছায়ার মত ঘুরছে। প্রতারণার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। স্ত্রীলোকটা বেন্টিক ষ্ট্রীটে—কোং-এর জুতোর দোকানে কাজ করে।"

"চমৎকার কথা!" রঞ্জন রায় বলিলেন, "রাত এখন সাড়ে সাতটা বাজে। আপনাদের মিটিং আছে, আর দেরী করবেন না। বড়ই দুঃখিত হলাম যে, মিঃ ব্রাউনের নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতে পারলাম না।" বলিয়া রঞ্জন রায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন।

চার

জগন্নাথ দাস চলিয়া গেলে রঞ্জন রায়ের শিষ্য মধুসূদন ওরফে মধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই যাবেন না আপনি?"

"মিটিং-এ না থাক্‌বার কিছু কারণ আছে। যাব এবং যাব না দুটো কাজই করতে হবে আমাকে। মিটিং-এ আমি যাব কি না তা' জান্‌বার জন্য চং যুগোর লোক এ পাড়ায় সংবাদ নিতে এসেছিল। আমার ওপর তাদের খুবই সুনজর আছে তা' আমি জানি, কাজেই যাওয়া উচিত নয় ভাবছি।"

"ঠিক্ বুঝ্‌লাম না। চং যুগো-সংক্রান্ত অনেক কথাই আপনি আমায় বলেন নি, কাজেই আমি আপনার ধারণা বা যুক্তির সঙ্গে চল্‌তে পার্‌ছি না।"

"না মধু, তা' বলি নি ; কেন না দেখ্‌লাম, ঐ লোকটা এত চতুর যে, তোমার কাছ থেকে কথা বার করে নেওয়া তার পক্ষে কিছুই নয়। মিটিং-এ যাব না তুমি জান্‌তে ; অথচ দেখো, একঘণ্টা আগেও চং যুগোর লোক তোমার কাছ থেকে সে কথা আদায় করে চলে গেছে।"

"কে, ঐ চীনে কাপড়ওয়ালা? সে ত এ পাড়ায় অনেক দিন থেকেই আসে—কাপড়, সিল্ক বিক্রী করে।"

"যেহেতু সে অনেক দিন থেকে এ পাড়ায় যাতায়াত করছে, সেই হেতু সে চং যুগোর লোক কখনই নয় এই তোমার যুক্তি।" বলিয়া হাসিয়া রঞ্জন রায় বলিলেন, "যাক্, এতে বড় ভাল ফলের আশা করা যায়। আমার গাড়ী শীগ্ গির আন্‌তে বলে দাও, এখনই মিটিং-এ যাব।"

"মিটিং-এ যাবেন!" বলিয়া মধু বিস্মিত হইয়া রঞ্জন রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই খামখেয়ালী লোকটার যুক্তি-বিচারের মধ্যে মধু কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না।

একটা 'এটাচি কেসে' কয়েকখানা কাগজ-পত্র লইয়া রঞ্জন রায় হাসিয়া বলিলেন, "কি হে, অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে যে! গাড়ী এল?"

রাত্রি সাড়ে আটটার অল্প পূর্ব্বে রঞ্জন রায় মিটিং-রুমে প্রবেশ করিয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। গোয়েন্দা জগন্নাথ দাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আরে, এই বল্‌লে আস্‌বে না—নেহাৎ ছেলেমানুষ!"

ডিটেক্‌টিভ চিফ্ মিষ্টার রদারফোর্ড বলিলেন, "আপনি আসবেন না শুনে আমরা বড় দুঃখিত হয়েছিলাম ; বিশেষতঃ, আজ মিসেস্ ওয়াং আসবে, তার কাছ থেকে অনেক রহস্য জানা যাবে।"

"মিসেস্ ওয়াং শুনছি চং যুগোর দলেরই লোক—সে কেন বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌ছে বল্‌তে পারেন? এটা ছলনা নয় ত?"

"না মিঃ রায়।" মিঃ রদারফোর্ড বলিলেন, "বড় বড় দলের মধ্যে ঢুক্‌তে হলে এ রকম বিশ্বাসঘাতক লোক দ্বারা খুব কাজ হয়। এটুকু জান্‌বেন, দল যত বড় হয়, বিশ্বাস-ঘাতকের সংখ্যাও তা'তে তত বেশী পাওয়ার আশা করা যায়। সকলেই কিছু বিশ্বাসী হতে পারে না।"

"তা' ঠিক্। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটা অবিশ্বাসী কিসে বুঝ্‌লেন?" রঞ্জন রায় বলিলেন, "ওয়াং বলে কোন অবিশ্বাসী স্ত্রীলোকের কল্পনায় সময় নষ্ট করবেন না। চং যুগোর ছদ্মবেশ ধারণের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। কাজেই আমি মনে করি—স্ত্রীলোকটা ছদ্মবেশী চং যুগো, অথবা তারই দলের শিক্ষিত কোনো লোক বিশ্বাসঘাতকের অভিনয় কর্‌ছে।"

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ দিতে পার?"

"দাঁড়ান, কথাটা আর একটু ভাল করে বলি।" রঞ্জন রায় কহিল, "তিব্বতের দালাই লামা এ বৎসর মারা গেছেন ; অর্থাৎ, লোকচক্ষুর অন্তরালে গেছেন, তা' সংবাদ-পত্রের যে কোনো পাঠক ভাল করেই জানেন।"

"হাঁ তা' জানি।" মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন, "চীনদেশ থেকে একদল লামা হাঁটা পথে তিব্বতে আসছে এবং ঐ মৃত দালাই লামার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তারা দেশের ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌বে, বা ঐ রকম কি একটা কাজেই তারা আসছে।"

"ঠিক্ কথা।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "এই পর্য্যন্তই আমরা জানি—কিন্তু 'চাইনীজ হেরাল্ড' লিখ্‌ছে, প্রায় দুই শত লামা ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থান থেকে আবার রওনা হয়েছে—এরা পূর্ব্বের দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।"

'না, সে সব কাগজ আমরা দেখি নি।" জগন্নাথ দাস বলিলেন, "তা' থেকে তুমি কি মীমাংসায় আসতে চাও?"

"যদি জলপথে আফিম না পাঠিয়ে স্থলপথে ঐ লামাদের মারফৎ মাল পাঠান হয় ত আপনারা কি কর্‌ছেন? যত দিনে জাহাজ এখানে আসবার কথা, তার আগেই মাল এসে যাবে।"

হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ায় "ন'টা বাজে, আমি এখনই চল্‌লাম মিঃ ব্রাউন" বলিয়া রঞ্জন রায় তাঁহার সহিত

কয়েকটি কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, উচ্চকণ্ঠে মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "বলেন কি ! মিসেস্ ওয়াং আস্‌বে না ?"

"না" বলিয়া রঞ্জন রায় চলিয়া যাইবার অল্প পরেই একজন কনষ্টেবল একখানা কার্ড লইয়া মিঃ ব্রাউনের হাতে দিয়া বলিল, "এক বৃদ্ধ একজন স্ত্রীলোকের সহিত বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছে, ভেতরে আন্‌ব কি ?"

সাতজন বিখ্যাত দেশী ও বিদেশী গোয়েন্দা কার্ড দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চং য়ুগো !"

"মিঃ রায়ের সমস্ত যুক্তিতর্ক এক মুহূর্ত্তেই আকাশে মিলিয়ে গেল" বলিয়া মিঃ রদারফোর্ড একটু শ্লেষ হাসি হাসিলেন।

টেবিলের উপর সাতজন বিখ্যাত গোয়েন্দা চৌদ্দটা পিস্তল বাহির করিয়া রাখিলেন। মিঃ ব্রাউনের আদেশে কনষ্টেবল আগন্তুকদের আনিতে চলিয়া গেল।

পাঁচ

"আমি কি ভ্রমক্রমে কোন পিস্তল-বিক্রেতার দোকানে এলাম।" বলিয়া বৃদ্ধ চং য়ুগো একটা চীনা রমণীর সহিত সেই ঘরে আসিয়া গোয়েন্দাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

দুইজনে আসন গ্রহণ করিলে পর রায়বাহাদুর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ য়ুগো, এটা হাস্য-পরিহাসের স্থান নয়। তুমি ঠিক্ স্থানেই এসেছ এবং আরও ভাল জায়গায় তোমায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হবে।"

"ধন্যবাদ !" বৃদ্ধ ক্ষণিকের জন্য রায়বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথায় বড়ই বাধিত হলাম।"

"শোনো য়ুগো—"রায়বাহাদুর বলিলেন, "গতবার কোকেন ও এবার বেআইনী আফিম বিক্রয় করার জন্য তুমি স্বইচ্ছায় আমাদের কাছে মূর্খের মত কাজ করেছ, যে কোনো সময় মুহূর্ত্ত মাত্রে তোমায় বন্দী করা যেতে পারে।"

প্রশান্তস্বরে চং য়ুগো বলিল, "আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। আমার চারিদিকে যে অনাবশ্যক রহস্য-জাল সৃষ্টি করে আপনারা আমার স্বাধীনতার ব্যাঘাত কর্‌ছেন, তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে। বিনা কারণে, বিনা প্রমাণে এদেশের পুলিশের এ অভদ্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য খণ্ডন করতে। ভবিষ্যতে যদি আপনারা আপনাদের কল্পিত চং য়ুগো ও আমাকে পৃথকভাবে না দেখ্‌তে শেখেন ত আমি আইনতঃ আপনাদের বাধ্য করাব তা' মনে রাখ্‌বেন—এবং মনে রাখবেন মিঃ দাস, এটা সত্যই হাস্য-পরিহাসের স্থান নয়।"

জগন্নাথ দাস বলিলেন, "তুমি কি কোকেন-সংক্রান্ত চং য়ুগো নাও বল্‌তে চাও ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন হলো না—কোনো অপরাধী কি এত সহজে স্বীকার কর্‌বে আপনার কথা ? প্রমাণ দিন।"

"তোমার সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি এসেছে, প্রমাণ তার কাছেই পাবে। আমাদের আর দিতে হবে না।"

"আপনাদের প্রমাণ নাই। ভাল, এই স্ত্রীলোকটিকে কি করে সন্ধান কর্‌লেন ? কি গো মিসেস্ ওয়াং, কি বলেছ তুমি আমার বিরুদ্ধে, কি সব প্রমাণ দেবে দাও" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ পুনরায় বলিল, "এর সঙ্গে আমার একটু আলাদা সম্বন্ধ আছে, তাই বুঝি এ বিশ্বাস-ঘাতকের অভিনয় করতে এসেছে। দেখা যাক্, কি প্রমাণ এ দেয়।"

মিঃ রদারফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ আমাদের যে সব প্রমাণ, কাগজ, চিঠিপত্র দেবেন বলে ছিলেন, সে সব এনেছেন মিসেস্ ওয়াং ?"

অম্লান বদনে মিসেস্ ওয়াং বলিল, "এমন কোনো কথা বলেছি বলে আমার স্মরণ হয় না। তবে চং-এর সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া হয়েছিল, আর আমি যখন ওকে জব্দ করব বলে চীৎকার করছিলাম, আপনাদের গোয়েন্দাদের কাণে সে কথা যাওয়ায় আমাকে আপনারা সেদিন এখানে আসতে বাধ্য করেছিলেন—কাজেই আমাকে ভয়ে ভয়ে অনেক কথাই বল্‌তে হয়েছিল, যার মূলে সত্য কিছুই নাই। না বল্‌লে আপনারা আমায় ছাড়্‌তেনও না।"

দিল্লীর প্রধান গোয়েন্দা মিঃ ব্র্যাডলীমুর জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আমাদের কাছে সেদিন তুমি মিথ্যা বলেছিলে কেন ?"

মিসেস্ ওয়াং বলিল, "এই চং যুগোর সঙ্গে আমার গুরুতর ঝগড়া হওয়ায় আমি জ্ঞানহারা হয়েছিলাম। ভীষণ রেগে সত্যই একে জব্দ করবার কৌশল চিন্তা কর্‌ছিলাম, ঠিক্ সেই সময় আপনাদের একজন সাব ইন্সপেক্টার আমার সহিত সাক্ষাৎ করে চং যুগোর বৃত্তান্ত জানতে চায়। সেই লোকটা গোপনে আমাদের ঝগড়া শুনে আমার সঙ্গীর নাম জানতে পেরেছে বলে—কাজেই তার আগমনে ও কথাবার্ত্তায় আমি তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করলাম যে, নামজাদা কোকেন ব্যবসায়ী সেই চং যুগোর সন্ধানে পুলিশ আমার চং যুগোর পিছু নিয়েছে। বুড়োকে জব্দ করবার সুযোগ পেলুম; সুতরাং, অনেক আজগুবি কথা মানানসই করে বলেছি। এতে দোষ হয়েছে কি—ঘরোয়া ঝগড়ায় পুলিশের এত মাথা ব্যথা দেখে তাদের নিয়ে একটু রঙ্গ করাটা অন্যায় কি ?"

আমেরিকান গোয়েন্দা মিঃ ষ্টিফেন্স বলিলেন, "তুমি কি বল্‌তে চাও যে, সেই কোকেন দলের নেতা ও এই চং যুগো এক লোক নয় ?"

"একেবারেই নয়।" রমণী বলিল, "আপনি কি বল্‌তে চান যে,আমেরিকায় কাল যে একজন মিঃ ষ্টিফেন্সকে খুনীর আসামী বলে চালান দেওয়া হয়েছে, সে ও আপনি এক ব্যক্তি ?"

মিঃ লা প্র্যাজ্ ফ্রান্সের বিখ্যাত গোয়েন্দা বলিলেন, "মিসেস্ ওয়াং, তুমি আমাদের সকলের সাম্‌নে সেদিন বলেছ যে, চং যুগো বিস্তর আফিম জলপথে আনাচ্ছে। আফিম-সংক্রান্ত এ সংবাদ আমরা জানতাম, কিন্তু তুমি ঠিক্ ঐ কথার প্রতিধ্বনি করলে কিরূপে ?"

"বড়ই কুটিল প্রশ্ন!" হাসিয়া ওয়াং বলিল, "আপনাদের এ দেশের সংবাদ-পত্রগুলি বড়ই শীগ্‌গির আপনাদের মনের কথা প্রকাশ করে দেয়। যে সংবাদ আপনারা অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতের লোকের কাছে দু'দিন বাদে তার দাম হয়েছিল মাত্র দুটো বা চারটে পয়সা। আপনার প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন বোধ হয় ?"

বৃদ্ধ বলিল, "যাক্, যাক্, ভদ্রলোকদের সঙ্গে আবার ঝগড়া করবে না কি ? এখন চলো, আমার ওপর আর এঁদের কোন সন্দেহ নাই, তা' বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে।" তৎপরে সকলকে সম্বোধন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ওপর আপনাদের আর কোনো সন্দেহ আছে কি ? চং যুগোর দল বেআইনী কোকেন, আফিম চালাচ্ছে, কাজেই এখানকার সুবিবেচক পুলিশ প্রভুরা রাজ্যের যত চং যুগোকে গ্রেপ্তার করছে। তার চেয়ে চলুন চীনদেশে, গাড়ী গাড়ী চং যুগো ধরতে পারবেন। গোয়েন্দাগিরি বটে!"

"কিন্তু এত সহজে তুমি নিস্তার পাবে না।" রায়-বাহাদুর বলিলেন, "একমাস পূর্ব্বে তুমি একবার রঞ্জন রায় ও আমার সঙ্গে দেখা করেছিলে মনে আছে ?"

"মনে আছে—হ্যাণ্ডনোটের তাগাদায় আপনার সন্ধানে গিয়েছিলাম।"

"তুমি ছদ্মবেশে ছিলে—এই বৃদ্ধের মতই গিয়েছিলে।"

"যদি বৃদ্ধের মতই দেখেছিলেন, যা' এখন দেখ্‌ছেন—তবে ছদ্মবেশ বল্‌লেন কেন ?"

"তুমি বৃদ্ধ নও, অথচ ছদ্মবেশে বৃদ্ধ সেজেছ।"

"যেমন আপনি গোয়েন্দাগিরির 'অ, আ' জানেন না, অথচ গোয়েন্দা সেজেছেন।"

রায়বাহাদুরের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

মিঃ রদারফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ছদ্মবেশে এসেছ কি না সত্য বলো—অন্যথা আমরা সত্য জানবার চেষ্টা করব।"

হাসিয়া চং যুগো বলিল, "ছদ্মবেশ বল্‌লে আপনারা আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারেন কি ? পুলিশ আইনে ছদ্মবেশ ধরাটা কোনো অপরাধ হয় কি ? এসব যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন গোয়েন্দাগিরির কিছুতেই প্রশংসা করা যায় না।"

"ছদ্মবেশ অপরাধের নয়—" মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "যতক্ষণ না সেই বেশের সাহায্যে অপরকে প্রতারণা করা হয়।"

"আমার ছদ্মবেশে প্রতারণা বা অন্য কিছু পেয়ে ছিলেন কি ?"

"তুমি লাঠির মধ্যে ভয়ঙ্কর সাপ নিয়ে গিয়েছিলে—দু'জনের একজনকে আহত করতে।"

"ভয়ঙ্কর সাপ!" বৃদ্ধ বলিল, "আপনাদের সেই মিঃ রায়কে দেখ্ছি না যে, তাঁকে এখানে আনেন নি কেন? তিনি থাক্‌লে বল্‌তেন, সাপটা কত ভয়ানক—ভাগ্যে সাপটা আমায় কিছু না বলে জগন্নাথবাবুর ওপর পড়ে ছিল। যাঁর জিনিস তাঁর কাছেই গিয়েছিল। পোষা জলঢোড়া সাপ—জগন্নাথবাবু যে সাপ পোষেন, তা' জান্‌তাম না।"

মাদ্রাজী গোয়েন্দা রামাস্বামী মুদেলিয়ার বলিলেন, "কিন্তু শুন্‌লাম লাঠি তুমিই এনেছিলে—লাঠির খোলেই সাপ ছিল।"

"এখন শুনে নিশ্চিন্ত হোন্ যে, যাঁর লাঠি তিনি তা' এনেছিলেন—লাঠিটা দেখাতে পারেন কি ?"

মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "প্রয়োজন নাই। কৌশলে তুমি তা'তে আগে থেকেই রায়বাহাদুরের নাম লিখিয়ে ছিলে।"

"একেই বলে গোয়েন্দা বুদ্ধি!" হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল, "পুলিশ আদালতে এই রকম যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই আপনারা কাজ চালান কি? যার নাম লেখা আছে, জিনিষটা তার নয়—সেটা হলো চং যুগোর—আর এই চং যুগো হলো একেবারে সেই আফিম-কোকেনের রাজা। আপনাদের দেখ্ছি চং যুগো ভুতে পেয়েছে।"

মিঃ ষ্টিফেন্স বলিলেন, "রায়বাহাদুরের সঙ্গে তোমার শত্রুতা নাই। পরিচয়ও ছিল না। তিনি তোমার গায়ে সাপ ফেল্‌বার চেষ্টায় সাপ নিয়ে যাবেন কেন?"

"ঠিক্ এটা আমিও প্রথমে মনে করেছিলুম—কোনই শত্রুতা নাই, কেন তিনি আমার অপকার করবেন।" বৃদ্ধ বলিল, "কিন্তু পরে বুঝ্‌লাম ঐ হ্যাণ্ডনোটখানার জন্যই এ উৎপাত হয়েছিল—তিনি সম্ভবতঃ ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ঐখানা কেড়ে নেবার চেষ্টায় ছিলেন।"

"কোন্ হ্যাণ্ডনোট?" মিঃ ষ্টিফেন্স বলিলেন, "কিসের হ্যাণ্ডনোট?"

"না, ও সব বাজে কথা" বলিয়া জগন্নাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, "হ্যাঁ, সামান্য কথা।" জগন্নাথবাবু একটি বেশ্যার কাছ থেকে কিছু টাকা হ্যাণ্ডনোটে নিয়েছিলেন, এখন বলেন নিই নি—তা' ছোট আদালতে শীগ্‌গিরই এর মীমংসা হবে।"

লা প্ল্যাজ বলিলেন, "সম্ভবতঃ, সে হ্যাণ্ডনোট জাল, তুমি জালিয়াৎ। রকম রকম হাতের লেখা লিখ্‌তে পার—এই অপরাধেই যদি তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "তার চেয়ে পরিষ্কার বলুন না কেন যে, 'হে চং যুগো, যেহেতু আমরা তোমার নামের একজন লোকের কোনোই সন্ধান করে উঠ্‌তে পারছি না—অথচ, সরকারের কাছে প্রতিনিয়ত অপদস্থ হচ্ছি—তুমি আমাদের মান বাঁচাও।' তা' হলে আমি হাসিমুখে আপনাদের কথায় রাজী হতে পারি—কিন্তু যদি কেবল বৃথা গোয়েন্দাগিরির অভিনয়ে আমাকে জ্বালাতন করতে আসেন ত আসুন আপনাদের যুক্তি-তর্ক নিয়ে। দেখুন, আমি তা' ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে পারি কি না।"

লা প্ল্যাজ বলিলেন, "আমার কথার উত্তর দাও তুমি—রকম রকম লেখা লিখ্‌তে পার কি না? রঞ্জন রায়ের বাড়ীতে দু'হাতে লিখেছিলে কি না?"

"পারি। একজন লোক দু' হাতে যদি দু' রকম লেখে, সেটা দোষের হয় না। দু' হাতের লেখা, দু' রকমই হয়ে থাকে।"

"তুমি বলেছিলে, পায়ের সাহায্যে লিখ্‌তে পার, মুখেও পার।"

"এতদিন জান্‌তাম চীনেরাই অফিম খায়, কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী গোয়েন্দা বিনা আফিমে যে এরকম কল্পনা করতে পারেন তা' আমার জানা ছিল না। ফরাসীরা কি সত্যই এই রকম কল্পনা-প্রিয় মশায়?"

মিঃ লা প্ল্যাজ আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না, মাথা নত করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

চং যুগো উঠিয়া দাঁড়াইল। চৌকটা পিস্তলের উপর

হাত রাখিয়া গোয়েন্দারা তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ বলিল, "আর বৃথা আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না; কেন না, আমার আর এখানে থাক্‌বার দরকার দেখ্‌ছি না। আপনারা বৃথা সন্দেহে আমার ওপর লক্ষ্য করে অনেক কাজ নষ্ট করেছেন। আশা করি, এবার সে ভুলটা কেটে যাবে। এখন থেকে আমাকে যখনই দরকার হবে, এই মিসেস্ ওয়াংকে খবর দিলেই চল্‌বে—প্রকৃত চং যুগোকে ধরবার জন্য আমার যতটুকু সাধ্য আছে, তা' আমি কর্‌ব। আচ্ছা, তা' হলে এখন যেতে পারি, কি বলেন? আর মিসেস্ ওয়াংকে নিয়ে কি কর্‌বেন—ওকে যেতে দেবেন, না রাখ্‌বেন?"

"ঠিক্ বুঝ্‌তে পারা গেল না।" মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "যাও, তোমরা দু'জনেই যাও—ভবিষ্যতে দরকার হয়, তোমাদের যোগাড় করতে দেরী হবে না। আপনারা সকলে কি বলেন?" বলিয়া তিনি সমবেত গোয়েন্দা-মণ্ডলীর মতামত জানিতে চাহিলেন।

'উপস্থিত ছেড়ে দেওয়া চলে, এই আমাদের সকলের মত" বলিয়া মিঃ রদারফোর্ড বলিলেন, "স্ত্রীলোকটার কিছু দোষ থাক্‌লেও ওদের ওসব ঘরোয়া ব্যাপারের জন্য ওকে আটকান ঠিক্ হবে না; প্রয়োজন হলে পরেও পাওয়া যাবে।"

ধীরে ধীরে মিটিং-রুমের দরজা খুলিয়া গেল। গোয়েন্দা রঞ্জন রায় সিল্কের পাঞ্জাবী ও চাদর গায়ে একটা 'এটাচি কেস' হাতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বেশে প্রশান্ত মুখে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ছেড়ে দেওয়ার কিছু দেরী আছে মিঃ ব্রাউন। এই বৃদ্ধকে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বড়ই ভুল করে এসেছ চং যুগো—অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসই আজ তোমার পতনের কারণ হলো।"

ছয়

রঞ্জন রায়কে হঠাৎ পুনঃ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেলেন। চং যুগো একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ কথা। আপনার যা' প্রশ্ন আছে, তারও উত্তর দেওয়া যাবে" বলিয়া দুইজনে পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করিল।

রঞ্জন রায় 'এটাচি কেসটা' টেবিলে রাখিয়া একখানা চেয়ারে বসিলেন এবং ক্ষণকাল মিসেস্ ওয়াং ও চং যুগোর প্রতি চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, "ক্যানিং ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডো চায়না টি এসোসিয়েশন' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, সেটার স্বত্বাধিকারী তুমি কি না বলো?"

রঞ্জন রায়ের এরূপ বিসদৃশ প্রশ্নে সকলেই বিস্মিত হইলেন। চং যুগো ক্ষণিকের জন্য প্রশ্ন-কর্ত্তার দিকে চাহিয়া ধীরস্বরে বলিল, "যদি বলি সেটার স্বত্বাধিকারী আমি নই?"

"তা' হলে সেটা মিথ্যা বলা হবে" বলিয়া রঞ্জন রায় কহিলেন, "তুমি চং যুগো উনিশ শ'—সালের জুলাই মাসের আঠারো তারিখে একজন সান ইয়ুমের কাছ থেকে তিন হাজার দু' শ' টাকায় দোকানের সর্ত্ত কিনেছিলে। রেজিষ্ট্রারী অফিসে তার নকল আছে, তার কপি আমার 'এটাচি'তেও পাওয়া যাবে।"

"অন্য কোন চং যুগো কিনে থাক্‌বে।"

"কিন্তু রেজিষ্ট্রারী অফিসের খাতায় যে আঙুলের ছাপ আছে, সেটা বোধ হয় অন্য লোকের নয়? সে ছাপের ফটো দেখ্‌তে চাও?" বলিয়া রঞ্জন রায় 'এটাচি কেস' হইতে দলিলের কপি ও ফটো বাহির করিয়া মিঃ ব্রাউনের হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনারা মিলিয়ে দেখুন।"

মিঃ ব্রাউনের আদেশে তৎক্ষণাৎ আঙুলের ছাপ লইবার কালি, প্যাড প্রভৃতি আসিল এবং বৃদ্ধের আঙুলের ছাপ উঠাইয়া লওয়া হইল। ছাপ দুইটার পরীক্ষায় কোনো প্রভেদ পাওয়া গেল না।

চং যুগো হাসিয়া বলিল, "কোনো দোকান কেনা কি একটা মস্ত অপরাধ মিঃ রায়? মনে করুন, ঐ দোকানের আমিই মালিক—কিন্তু তা'তে কি সুবিধে হলো আপনাদের?"

"যেটা অস্বীকার করেছিলে, সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হলে।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "ত্রিশদিন পূর্ব্বে ক্যাণ্টনের

হেড অফিস থেকে তোমার নামে কোনো চিঠি এসেছিল কি ?"

"আমার নামে ? একমাস পূর্ব্বে ?"

"না, ঠিক্ তোমার নামে নয়, আর একমাসও নয় ; কেন না, এটা আগষ্ট মাস, তাই ঠিক্ ত্রিশদিন বল্‌লাম। চিঠি এসেছিলো তোমার ফার্ম্মের নামে—প্রোপ্রাইটার, 'ইণ্ডো চায়না টি এসোসিয়েশন'-এর নামে। তুমিই যখন মালিক, তখন তোমার নামেই বল্‌লাম।"

"অনেক দিনের কথা, ঠিক্ মনে হয় না।"

"তারও নকল আমার কাছে আছে। ক্যাণ্টন হেড অফিস একহাজার পাউণ্ড আফিম কি উপায়ে তোমার কাছে পাঠাবে, তা' জান্‌তে চেয়েছিল, এই নাও সেই চিঠির একখানা নকল।" বলিয়া রঞ্জন রায় 'এটাচি কেস' হইতে তাহা বাহির করিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রাউনের হাতে দিলেন।

প্রকৃত চিঠিখানা চীনভাষায় লেখা ছিল ; নকলটাও ঐ ভাষায় ছিল—কিন্তু তাহার নীচে রঞ্জন রায় তাহার যথাযথ তর্জ্জমা ইংরাজীতে করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পড়িবার পক্ষে সকলের সুবিধা হইল।

চং যুগো রাগে গর্জ্জিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব জান্‌লেন কিরূপে ?"

রঞ্জন রায় বলিলেন, "চং যুগোকে প্রথমাবধি আমি বিশেষ করে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছি। ছদ্মবেশে সে অতি চতুর হলেও সৌভাগ্যক্রমে তার কয়েকটা এমন লক্ষণ আছে, যা' লুকান যায় না। লোকটার চোখ দুটোর দিকে লক্ষ্য করুন। দেখ্‌বেন, দুটো ত্রিকোণের মত পাতলা মাংসের রেখা চোখের ভেতরের দিকের দুই কোণ থেকে প্রায় চক্ষু তারকার কাছ পর্য্যন্ত গেছে। এ একটা রোগ—'টেরিজিয়ম' বলে। চোখের মধ্যে ছদ্মবেশ চালান চং যুগোর সম্ভব হয় নি।"

বৃদ্ধ বলিল, "কিন্তু এ রোগটা বোধ হয় কেবল আমারই জন্য সৃষ্ট হয় নি—জগতে আরও অনেকের এ রকম আছে।"

"অতি সত্য।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "তোমার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর নখে একটা শাদা ছোট তিলের মত গোল দাগ আছে জানো বোধ হয় ? আমার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে আমি সেকহ্যাণ্ড করেছিলাম, তার অর্থ ও উদ্দেশ্য এখন বুঝ্‌ছ কি ?"

"তারপর ?"

"তোমার দক্ষিণ হস্তের আয়ুরেখার মাঝখানে একটা যবচিহ্ন আছে এবং ঠিক্ তারই নীচে একটা কালো তিল আছে কি না সকলকে দেখিয়ে দেবে কি ? বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকের আয়ুরেখার কথাই আমি বল্‌ছি।"

রঞ্জন রায়ের কথায় সকলেই ব্যস্ততার সহিত চং যুগোর হাতের সমস্ত লক্ষণই মিলাইয়া লইলেন।

রঞ্জন রায় বলিলেন, "আঙুলের ছাপ থেকে নিয়ে এ সমস্ত লক্ষণ কিছু এক হাত ছাড়া দশ হাতে পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু এ সব অভিনয়ে কি প্রমাণ হলো ?" চং যুগো বলিল, "যে কথা আমি স্বীকার করেছি, তা' ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল কি ?"

"তুমি স্বীকার করেছ যে, তুমি ঐ 'ইণ্ডো চায়না'র মালিক ; তুমি স্বীকার করেছ যে, ক্যাণ্টন থেকে আফিম-সংক্রান্ত পত্র তোমার কাছে এসেছিল—ঠিক্ ত ?"

"দ্বিতীয় অংশ মিথ্যা, জাল—ওটা অস্বীকার করছি।"

"চমৎকার !" রঞ্জন রায় বলিলেন, "যদি ঐ পত্র তোমার কাছে না এসে থাকে ত তার উত্তরে তুমি হাঁটা পথে তিব্বতের রাস্তায় লামাদের মারফৎ মাল পাঠাতে কিরূপে লিখেছিলে ? কেন না, ক্যাণ্টন থেকে তোমার নামে দ্বিতীয় চিঠি, অর্থাৎ, তোমার উত্তরের প্রতি উত্তর ও প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে একখানা চিঠি তারা তোমায় লিখেছিল। সে কথা তারা লিখ্‌ল কি করে ? অবশ্য এই দ্বিতীয় চিঠিখানা তুমি পাও নি—আমার কাছেই আছে।"

চিঠিখানা বাহির করিয়া মিঃ ব্রাউনের হাতে দিতে

দিতে রঞ্জন রায় বলিলেন, "এখানাও চীন ভাষায়—ইংরাজীতে এর তর্জ্জমাটা চিঠির খামেই অন্য কাগজে আছে।"

মিঃ রদারফোর্ড বলিয়া উঠিলেন—"ওয়াণ্ডারফুল!"

মিঃ ষ্টিফেন্স ও ল্যা প্ল্যাজ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এত সংগ্রহ করলেন কি করে মিঃ রায়?"

"চং যুগোকে প্রথমে আমি বৃদ্ধবেশেই দেখেছিলাম; কিন্তু জান্‌লাম, সেটা তার ছদ্মবেশ—কাজেই এই বেশ অতিক্রম করে কয়েকটা এমন লক্ষণ সন্ধান করেছিলাম, যা' কোনোরকম বেশভূষায় লুকান যায় না। চং যুগোর হাতে দস্তানা ছিল না; কাজেই করমর্দ্দন করবার সময় হাতের লক্ষণও দেখে নিয়েছিলাম। তবে চোখের লক্ষণই আমায় খুব বিশেষ সাহায্য করেছিল; কেন না, ঐ থেকেই তাকে ক্যানিং ষ্ট্রীটের দোকানে দেখ্‌তে পাওয়া গেল। পরে ছদ্মবেশে একদিন ঐ দোকান থেকেই কিছু চা কিনে তার হাতে টাকা দেবার সময় আমি তার হাতের সমস্ত লক্ষণগুলি মিলিয়ে পাই—তবে দোকানে সে কিছু বৃদ্ধবেশে থাকৃত না; চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় চং যুগোই দোকানে বস্‌ত। বাকী কাজ রেজিষ্টারী অফিস ও স্থানীয় পোষ্ট অফিসে সমাধা করা হয়েছে। খুব সোজা, সহজ কাজ নয় কি?" বলিয়া রঞ্জন রায় একটা চুরুট বাহির করিলেন।

মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "যা' প্রমাণ পাওয়া গেল, তা' থেকে তোমাকে বেআইনী আফিম সরবরাহ করবার জন্য অনায়াসে বন্দী করা চলে। তোমার কিছু বল্‌বার আছে চং যুগো?"

"যা' বল্‌বার আদালতে বল্‌ব।" বলিয়া চং যুগো একবার কঠোর দৃষ্টিতে রঞ্জন রায়ের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্রাউনের আদেশে কনষ্টেবল আসিয়া চং যুগোর দুই হাতে হাতকড়ি পরাইল।

সভাভঙ্গ হইয়া গেল। রঞ্জন রায় বলিলেন, "হাটাপথে এর দলের লোকের ওপর এবার আপনারা একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বেন—তা' হলে সকল বিষয়েই পরিষ্কার প্রমাণ যোগাড় হয়।"

*　　*　　*

পরদিন বেলা দশটার সময় মিঃ ব্রাউন ও জগন্নাথ দাস আসিয়া রঞ্জন রায়কে বিস্মিত করিয়া দিলেন। রায়-বাহাদুর বলিলেন, "হাজতের মধ্যে বিষ খেয়ে চং যুগো আত্মহত্যা করেছে মনে করে মূর্খ কনষ্টেবলরা তার লাস বার করে ডাক্তারের সন্ধানে গিয়েছিল—কিন্তু ফিরে এসে কেউই আর চং যুগোকে দেখ্‌তে পায় নি—কি করে পালিয়েছে, কোথায় গিয়েছে, কিছুই জান্‌তে পারা যায় নি।"

"আর মিসেস্ ওয়াং?"

রঞ্জন রায়ের প্রশ্নে মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "প্রমাণ পাওয়া গেল মিসেস্ ওয়াং আদৌ স্ত্রীলোক নয়; অর্থের লোভে ছদ্মবেশে স্ত্রীলোক সেজে এসেছিল—তার নাম আঃ সেম্; বেণ্টিক ষ্ট্রীটের একটা জুতার দোকানের কর্ম্মচারী মাত্র। তাকে হাজতেই রেখেছি; কিন্তু কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে রঞ্জন রায় বলিলেন, "আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ শিক্ষা ও দ্রব্যগুণ জ্ঞান এই চং যুগোর; দ্রব্যগুণেই সে নিজেকে মৃতবৎ রেখেছিল বোধ হয়। হঠযোগ-প্রক্রিয়ার 'সাসপেণ্ডেড এনিমেশন'ও হতে পারে।"

রায়বাহাদুর জগন্নাথ দাস উপরের ঠোঁট নীচে ও নীচের ঠোঁট উপরে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

বিদায়

শ্রীবরদাকুমার পাল

—"সরোজিনী, ও সরোজিনী !"

শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আকাশ মেঘমুক্ত—পরিষ্কার। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশতলে চন্দ্রমা ও নক্ষত্ররাজি শোভা পাইতেছে। এই সময় পল্লীপথ শেফালীর মধুর গন্ধে আমোদিত। কিন্তু সহরে বনকুসুমের গন্ধ না থাকিলেও ফুটপাত দিয়া যাতায়াতকারী বিলাসী বাবুদের রুমালের বিলাতী এসেন্সের তীব্র গন্ধ শেফালীর স্থান দখল করিয়াছে। রাত্রি অধিক হয় নাই। গীর্জ্জার ঘড়িতে তখনও দশটা বাজে নাই। রাজপথ জনকোলাহল মুখর। ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ, মোটর কারের 'হর্ণ', রিক্সাওয়ালার ঘুঙুরের টুং টাং আওয়াজে প্রধান প্রধান রাজপথগুলি তখনও শব্দায়মান রহিয়াছে। ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর যাতায়াতও থামে নাই। এমন সময় কলিকাতার এক অপ্রশস্ত গলির মধ্যে একখানা ঘোড়ার গাড়ী প্রবেশ করিল। গাড়ী গলির মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাহা হইতে একজন আরোহী অবতরণ করিল। সে যুবক—তাহার বয়স বোধ হয় পঁচিশ বৎসরের বেশী নয়। গাড়ী হইতে নামিয়া একখানা দোতলা বাড়ীর নিকট আসিয়া সে দরজায় ধাক্কা দিল। তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া যুবক ডাকিল,—"সরোজিনী, ও সরোজিনী !"

পরিধেয় বস্ত্রের এবং অন্যান্য পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও চলনভঙ্গী দেখিয়া যুবককে ধনাঢ্যের সন্তান বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক যুবক ধনাঢ্যের সন্তানই বটে। তাহাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। পিতার একমাত্র পুত্র সে। কলিকাতার কলেজে পড়ে। নাম নির্ম্মল। ধনবান পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া নির্ম্মলের বিলাসিতার জন্য টাকার অভাব হয় না। যে গলিতে সে প্রবেশ করিল, তাহা নিতান্ত অপরিষ্কার ও পুতিগন্ধময়—সব সময় কর্পোরেশনের কৃপাদৃষ্টি ওই দিকে পড়ে বলিয়া মনে হয় না।

নির্ম্মল ডাকিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। যে কপাট খুলিয়া দিল—সে তরুণী, সুন্দরী। বয়স বেশী নহে—সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবন-হিল্লোলে তাহার সৌন্দর্য্যরাশি উছলিয়া উঠিয়াছে। তাম্বুল-রাগে অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ। পরিধানে তাহার বেনারসী শাড়ী—হাতে ও শরীরের অন্যান্য অবয়বে বহুমূল্য মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কারসমূহ শোভা পাইতেছে। একবার শুষ্ক হাসি হাসিয়া গদগদকণ্ঠে তরুণী বলিল,—"নির্ম্মলবাবু যে, এই বুঝি আপনার ভালবাসা? কত রাত্তির পর্য্যন্ত আপনার আসার আশায় ব'সে আছি, আর আপনি এমনই পাষাণ যে, হতভাগীকে একবারে ভুলে গেছেন।"

আবেগ-জড়িত-কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল,—"আমি পাষাণ সরোজিনী? তোমার জন্যই না আমি—"

আর বলা হইল না। তরুণী নির্ম্মলের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল এবং সোহাগভরে তাহাকে সোফার উপর বসাইল। তারপর পুনরায় দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, এই সুন্দরীর নামই সরোজিনী। সে যে কি প্রকৃতির রমণী, তাহাও বোধ হয় পাঠক-পাঠিকা কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। সরোজিনী কুল কামিনী নহে। অনেকদিন হইল কুলে কালি দিয়ে সে অকূলে ভাসিয়াছে। বন্ধন-মুক্তা বিহঙ্গিনী যৌবনোন্মেষে ইন্দ্রিয় তাড়না দমন করিতে না পারিয়া রূপের পসরা লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার রূপানলে অনেক পুরুষ পতঙ্গবৎ ঝাঁপ দিয়াছে—অনেকেই দগ্ধ হইয়াছে। নির্ম্মলও এই কুহকিনীর রূপানলে আকৃষ্ট হইয়াছে; তবে, এখনও দগ্ধ হয় নাই—হইবে কি না কে জানে!

* * *

সেবার আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজা। পূজায় নির্ম্মল দেশে যায় নাই। তাহার পিতা তাহাকে গৃহে যাইতে

পত্র লিখিলেন; পাথেয় পাঠাইলেন—কিন্তু নানা ওজর-আপত্তি দেখাইয়া সে বাড়ী গেল না। পূজার ছুটিতে মেসের সকলেই দেশে চলিয়া গেল—মেস্ বন্ধ। কাজেই সেখানে অবস্থানের কোন সুবিধা না থাকায়, নির্ম্মল সরোজিনীর বাসায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিল। পাপিয়সীর আনন্দের সীমা নাই। হরিণ এবার স্বেচ্ছায় জালে আসিয়া পড়িয়াছে—আর যায় কোথায়?

পূজার ছুটি শেষ হইয়া আসিল, তবু নির্ম্মল বাড়ী গেল না। লক্ষ্মী-পূজার কয়েকদিন পরে সে বাড়ী হইতে একখানা পত্র পাইল। চিঠিখানা মেসের ঠিকানায় আসিয়াছিল; মেসের দারোয়ান সেখানা দিয়া গেল। সরোজিনী তখন ওই কক্ষে ছিল না। খানিক পরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সে নির্ম্মলকে একটু ভাবিত দেখিয়া বলিল,—"কি গো, একা ব'সে ব'সে অমন ক'রে কি ভাবছো?"

এখানে পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া রাখা ভাল যে, তখন উভয়ের প্রণয় এতটা পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে যে, সরোজিনী সোহাগ করিয়াই নির্ম্মলকে 'তুমি' সম্বোধন করে। নির্ম্মলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সরোজিনী পুনরায় কহিল,—"কি গো, কথা কইছ না যে—বলি অত ভাবনা কিসের?"

তারপরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নির্ম্মল বলিল,—"আমাকে বাড়ী যেতে হবে।"

—"কেন?"

—"বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে;—বাবা অসুস্থ।"

—"চিঠি কে লিখেছে?"

—"স্নেহলতা।"

—"স্নেহলতা কে, তোমার বোন্?"

—"না, আমার কোন বোন্ নেই। স্নেহলতা আমার স্ত্রী।"

নির্ম্মলের শেষোক্ত কথা দুইটি সরোজিনীর কাণে ভাল লাগিল না। তথাপি সে ভাবটা সন্তর্পণে গোপন করিয়া নির্ম্মলকে কতকটা অন্যমনস্ক করিবার মানসে টেবিলের উপর হইতে হারমোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া 'বেলো' করিল। তারপর যন্ত্রের সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিল—

"এসো এসো কাছে, দূরে কি গো সাজে,
বিছায়ে রেখেছি হৃদয়-আসন।
চরণের ধূলি, দেহ মাথে তুলি,
আজি এ অভাগীর সফল জীবন।" ইত্যাদি।

এভাবে বারবার বিভিন্ন সুরে গাহিয়া সরোজিনী শ্রান্ত হইল। তাহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। মনে হইল, নির্ম্মলের হৃদয়াকাশও নির্ম্মল হইয়াছে—ভাবনা-মেঘ বুঝি বা সঙ্গীত-প্রবাহে উড়িয়া গিয়াছে।

যথানিয়মে নৈশ-আহার শেষ হইলে নির্ম্মলকে উদ্দেশ করিয়া সরোজিনী বলিল,—"তবে কি তুমি বাড়ী যাচ্ছ? তা' যাওয়া ত উচিতই। না গেলে, ওঁরা কি মনে করবেন? তা' ছাড়া, আমাদের খরচের টাকারও ত অভাব। তুমি না গেলে ওঁরা টাকাও পাঠাবেন না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো—তোমার স্ত্রীর না একটা দামী চন্দ্রহার আছে বলেছিলে, সেরকম একটা আমার কিন্তু চাই-ই চাই! বলো, বাড়ী থেকে এসে দেবে তো?"

শেষোক্ত কথাগুলা সরোজিনী এমন সুরে বলিল যে, তাহাতে মনে হইল সে নির্ম্মলকে কতই না ভালবাসে! কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা কি, তাহা কি সে জানে? প্রকৃত ভালবাসা কামনাশূন্য, তাহাতে স্বার্থের গন্ধমাত্র নাই—আছে কেবল স্বর্গীয় সুষমা। কুহকিনীর কুহকে নির্ম্মল আত্মপর জ্ঞানশূন্য। সে একটু চিন্তা করিল না যে, সরোজিনী তাহার কে, আর সেই বা সরোজিনীর কে? মন্ত্রচালিতবৎ সে বলিয়া উঠিল,—"সে কি কথা প্রাণের সরো, তোমাকে অদেয় বস্তু পৃথিবীতে আর আমার কি আছে! জেনো, এবার বাড়ী থেকে ফির্‌লেই তোমার গলায় চন্দ্রহার শোভা পাবে।"

আরও কতক্ষণ কথোপকথনের পর সে রাত্রে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন নির্ম্মল দেশে রওনা হইল।

* * *

নির্ম্মলের পিতা হরিশবাবুর বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কিছু বেশী। তিনি সদাশয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বিচক্ষণ ব্যক্তি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য জ্বর হইয়াছিল; এখন তিনি সম্পূর্ণ নীরোগ। পুত্রের চেহারা ও হাব-ভাবের

পরিবর্ত্তন দেখিয়া বহুদর্শী হরিশবাবু বুঝিলেন যে, পুত্রের নাম নির্ম্মল হইলেও, চরিত্র নির্ম্মল রহে নাই। তথাপি একমাত্র সন্তান, বংশের দুলালকে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। নির্ম্মল শৈশবে মাতৃহীন। মৃত্যুশয্যায় সজল চোখে শিশুপুত্রটিকে হরিশবাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার গৃহিণী সংসারের মায়া কাটাইয়া গিয়াছেন। সে কথা ভাবিয়া তিনি নির্ম্মলের উপর একটীও শাসনের ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কথায় আছে—'কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।' অপত্যস্নেহের আধিক্যও অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন বিঘ্ন-সঙ্কুল করে। স্নেহের প্রাবল্যে সুবিশাল বঙ্গ-সমাজের অনেক সমৃদ্ধ পরিবারই রসাতলগামী হইয়াছে। হরিশবাবুর সংসারও সেই পথে চলিল। স্নেহ পবিত্র—কিন্তু হায়, ব্যবহারের দোষে অমৃতও গরল হইয়া উঠে!

অন্যান্য বার বাড়ী আসিলে নির্ম্মল পিতার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিত। নিজের পাঠোন্নতির কথা—তাহার বাল্য-জীবনের সুখ-স্বপ্নের কথা—মাতৃ-বিয়োগ-জনিত দুঃখের কথা—সম্পত্তির আয় ব্যয়ের কথা—এইরূপ কত কথাই না পিতা-পুত্রের মধ্যে হইত। এইরূপ কথা-বার্ত্তায় নির্ম্মল কতই না শান্তি পাইত! কিন্তু এবার সে সবে রুচি নাই—বালসুলভ সরল প্রাণে যেন কুটিলতার ছাপ পড়িয়াছে।

এবার স্নেহলতার সহিতও নির্ম্মলের ব্যবহারের বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে বাড়ী আসিলে সে স্নেহলতাকে গ্রীক পুরাণের বা ইংরাজী উপন্যাসের গল্প পাঠ করিয়া শুনাইত—নানা রকম কৌতুক করিয়া কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিত। কোন কোনদিন গল্প শুনিতে শুনিতে স্নেহলতা ঘুমাইয়া পড়িত—আর নির্ম্মল তাহার সহিত নানাপ্রকার 'খুনসুটি' আরম্ভ করিয়া দিত। স্নেহলতা চক্ষু খুলিয়া শুধু একটু হাসিত মাত্র। এখন সে কাছে আসিলে নির্ম্মলের মুখে হাসি থাকে না—অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে তাহার মুখ নত হইয়া পড়ে। স্নেহলতা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে উত্তর দেয়। খাওয়া-দাওয়ায়ও এবার তাহার প্রবৃত্তি নাই। নানা রকমের ব্যঞ্জন বাটিতে পড়িয়াই থাকে। আহার বিহার, কথোপকথন সকল বিষয়েই নির্ম্মল এবার বড়ই উদাসীন।

এইভাবে সপ্তাহকাল কাটিয়া গেলে, নির্ম্মল কলিকাতা যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হরিশবাবু তাহাকে আরও কয়েকদিন বাড়ী থাকিতে অনুরোধ করিলেন। নির্ম্মল পিতাকে বুঝাইল যে, গৃহে থাকিলে রীতিমত পড়া-শুনা হয় না। কাজেই পুত্রের প্রবাস গমনোপযোগী ব্যবস্থা করিতে পিতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না—বধূকে পুত্রের জিনিষ-পত্র গুছাইতে আদেশ দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্ম্মল কলিকাতা রওনা হইল। অবশ্য সরোজিনীর প্রার্থিত বস্তুটি সে সঙ্গে লইতে মোটেই বিস্মৃত হয় নাই। প্রথমতঃ হারছড়া দিতে স্নেহলতা আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু 'কালেজী নলেজে' সুপক্ক কৃতবিদ্য স্বামীর যুক্তির বহরে সে আপত্তি খণ্ডন হইতে বেশী দেরী হয় নাই। সময়োপযোগী দুই-চারিটি মধুর বাক্যে স্ত্রীকে মুগ্ধ করিয়া নির্ম্মল হারগাছি আদায় করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ, স্নেহলতা মনে করিয়াছিল,—স্বামী দেবতা, সামান্য স্বার্থত্যাগে যদি দেবতা তুষ্ট হন্‌, তবে ত তাহার নারীজন্ম সার্থক। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা—স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন করা—স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়াই হিন্দুনারী তাহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে।

নির্ম্মল চলিয়া গেল। স্নেহলতার বুকে আজ যে কি দুঃখানল জ্বলিতেছে, তাহা অপরে কি বুঝিবে! বুদ্ধিহীনারা মনে করিবে, বুঝি হারের জন্যই স্নেহলতার দুঃখ, কিন্তু তাহা নহে। স্নেহলতার দুঃখ স্বামী-বিরহে—বিশেষতঃ, স্বামীর আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে।

নির্ম্মল কলিকাতায় পৌছিল। তখনও কলেজ খোলে নাই—মেস্‌ও বন্ধ। কাজেই সে পূর্ব্ববৎ সরোজিনীর আবাসে আশ্রয় লইল।

* * *

কার্ত্তিক মাস আরম্ভ হইয়াছে। স্কুল-কলেজ, আফিস-আদালত সর্ব্বত্রই নূতন উদ্যমে তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ী হইতে যাওয়ার পর নির্ম্মল পিতাকে বা স্ত্রীকে একখানিও চিঠি দেয় নাই। হরিশবাবু এজন্য বড়ই

উদ্বিগ্ন আছেন। কিন্তু কি যে করিবেন, ভাবিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন পুত্রকে দুই-তিনখানা পত্র লিখিলেন—কিন্তু একখানারও উত্তর পাইলেন না।

একদিন বিকালবেলা হরিশবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি বাহিরের দিকেও তাকাইতেছিলেন। কিন্তু সব সময়েই নির্ব্বাক, নীরব। ঘরে তখন অন্য কেহ ছিল না; কেবল টেবিলের উপরকার ছোট ঘড়িটা 'টিক্‌টিক্' শব্দে আপন-মনে চলিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের চালে বসিয়া দুইটা কাক কর্কশ স্বরে 'কা কা' করিয়া অপরাহ্ণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। কাকের সেই নীরস কণ্ঠস্বরে হরিশবাবু যেন বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 'ইচ্ছাময়ীর কি ইচ্ছা জানি না' উদাসীনভাবে এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি বৈঠকখানার বাহিরে যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাক-পিওন আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল।

পত্রখানা কোনো অপরিচিত হাতের লেখা বলিয়া বোধ হইল। চিঠি খুলিয়াই হরিশবাবু লেখকের নাম দেখিলেন—কিন্তু নামটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনও মেয়েমানুষের। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ধীরে ধীরে পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন। খানিকটা পড়িয়াই তিনি আর পড়িতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। চিঠিখানা অবিকল এইরূপ লেখা ছিল—

"কলিকাতা
৪ঠা কার্ত্তিক

মাননীয় মহাশয়, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আপনার পুত্র নির্ম্মলবাবু একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় বিষম জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে সজ্ঞাহীন হইয়া পথিপার্শ্বে পড়িয়া যায়। আমি তাঁহাকে আমার বাসায় স্থান দিয়াছি এবং সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছি। সে সব সত্ত্বেও তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং, আপনি পত্র পাঠ মাত্র এখানে আসিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবেন। আমার ভয় হইতেছে, পাছে বা আমাকেও কালজ্বরে ধরে, কারণ, আজকাল ও জ্বরটা সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে। ইতি।

নিবেদিকা—
সরোজিনী দাসী।"

চিঠি পড়িয়া হরিশবাবু পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। পত্রখানা তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিতা কোনও মহিলার লেখা। তা' ছাড়া, তাহাতে লেখিকার ঠিকানাটিও পূরাপূরি নাই। পত্রে লিখিত বিবরণ ভয়াবহ। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বিষয়টি স্নেহলতারও কর্ণগোচর হইল। এই নিদারুণ দুঃসংবাদে স্নেহলতার মুখখানা মসী-মলিন হইয়া পড়িল—হৃদাকাশে বিষম দুঃখাবর্ত্তের তোলপাড় সুরু হইল।

হরিশবাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া বধূ স্নেহলতা ও পুরাতন ভৃত্য কানাইলালকে সঙ্গে করিয়া সেই রাত্রিতেই কলিকাতা রওনা হইলেন।

* * *

যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। হরিশবাবু একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া নির্ম্মলের মেসে রওনা হইলেন। মেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-মহাশয়ের নিকট নির্ম্মলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। নির্ম্মল মেসে নাই দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, সে বুঝি বাড়ী হইতে ফিরে নাই। এখন হরিশবাবুর মুখে তাহার কলিকাতা আগমন ও অসুস্থ হওয়ার কথা জানিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন।

মেসের দারোয়ানটি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে নির্ম্মলের পিতা জানিতে পারিয়া সে তাঁহার নিকটে আসিল এবং জানাইল যে, নির্ম্মল যে বাসায় আছে, তাহা সে চিনে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত দারোয়ান তাঁহাদিগকে সে বাসার দিকে লইয়া চলিল। এই দারোয়ানই সরোজিনীর বাসায় নির্ম্মলকে স্নেহলতার পত্রখানা দিয়া আসিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে অসুখের সময় মাঝে মাঝে তাহার তত্ত্বাবধানও লইতেছে, কিন্তু নির্ম্মলের কোন ক্ষতি

হইবে বিবেচনা করিয়া তাহার আবাস-স্থল বা সঙ্গিনীটির কথা মেসে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে সে সাহসী হয় নাই—কারণ, ছুটীর পূর্ব্বে নির্ম্মলের মত মুক্তহস্তে পার্ব্বণী আর কোন্ বাবুই বা দেন? হিন্দুস্থানী দারোয়ান বা উড়ে চাকরেরা পার্ব্বণীতে পরম বাধ্য।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ী আসিয়া সরোজিনীর বাসার সম্মুখে থামিল। নোংরা গলি ও তাহার উভয় পার্শ্বের অধিবাসী ও অধিবাসিনীদের চাল-চলন দেখিয়া এবং গলির উপযুক্ত ভাষায় কথোপকথন ও রকমারি সঙ্গীত-লহরী শ্রবণে বিচক্ষণ হরিশবাবু বুঝিতে পারিলেন কোনও কুহকিনী কুলটার কুহক পাশে তাঁহার প্রাণের নির্ম্মল আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সরোজিনীর কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল। দুঃখে জর্জ্জরিত হরিশবাবু নাগরিক আদব-কায়দার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীকে ডাক্-হাঁক্ না দিয়া সাশ্রুনেত্রে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কানাইলাল ও স্নেহলতা গাড়ীতেই বসিয়া রহিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া পুত্রের অবস্থা দেখিয়া হরিশবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, তাহার প্রাণের পুত্তলী একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, আর, তাহারই পার্শ্বে একখানা সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি বহুমূল্য বসন-ভূষণ-পরিহিতা এক রমণী মূর্ত্তি স্বীয় আগুল্‌ফ-লম্বিত কৃষ্ণ কেশদাম বিন্যাসে নিবিষ্টচিত্তা। হরিশবাবু বুঝিলেন, এই পাপিয়সীই পত্রে লিখিত সরোজিনী দাসী। একজন বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত অপরিচিত লোককে গৃহপ্রবিষ্ট দেখিয়া, একটু ঝাঁজাল স্বরে সরোজিনী বলিল, "আপনি কে মশায়? এখানে আপনার আবশ্যকই বা কি শুনি?"

হরিশবাবু দুঃখে ও ক্রোধে জর্জ্জরিত। তথাপি সে ভাব প্রকাশ হইতে না দিয়া তিনি তাহার স্বভাবসুলভ বিনয়-নম্রস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন,—"আমার নাম হরিশ্চন্দ্র সেন, আমি নির্ম্মলের পিতা, তাকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে এসেছি।"

শিকার কবলচ্যুত হইতেছে দেখিয়া সরোজিনী বলিল—"তাকে নিয়ে যাবেন? তা' নিন্। কিন্তু আমি যে ওঁর ঔষধ-পথ্যে ও সেবা-শুশ্রূষায় প্রায় শ'খানেক টাকা খরচ করলুম, তারও ত একটা ব্যবস্থা করা চাই।"

হরিশবাবু বাক্যব্যয় না করিয়া মণি ব্যাগ হইতে এক শ' টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া সরোজিনীর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। তারপর নির্ম্মলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার নাড়ী ধরিয়া বুঝিলেন, জ্বরের উত্তাপ খুবই বেশী। 'নির্ম্মল, নির্ম্মল' করিয়া আবেগ-জড়িত মধুর কণ্ঠে দুই-তিনবার তিনি ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস একরূপ বন্ধ। তিনি বুঝিলেন, জ্বরের প্রাবল্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখ করিবার তাঁহার অবসর নাই; তেমন বিপদেও তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন না। ধীরকণ্ঠে কানাইলালকে ডাকিলেন। কানাইলাল ঘরে প্রবেশ করিলে প্রভু ভৃত্য দুইজনে ধরাধরি করিয়া নির্ম্মলকে গাড়ীতে উঠাইলেন।

উভয়ের কেহই সরোজিনীর দিকে তাকাইলেন না। তাহার দিকে দেখিলে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাইত যে, নির্ম্মল চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সরোজিনী একটুও দুঃখিতা হয় নাই; বরং সে একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া স্বীয় কণ্ঠ-লগ্ন চন্দ্রহারের বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত 'লকেট'টা বারংবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। দর্শক যদি মানস-নেত্রে একবার নিরীক্ষণ করিতেন, তবে দেখিতেন এবং বুঝিতেন যে, সরোজিনী তাহার ভাবভঙ্গী দ্বারা যেন ইহাও বলিতে চাহিতেছে—"দেখো পুরুষ, তোমরা তো পতঙ্গ। আমাদের রূপানলে আকৃষ্ট ও মোহিত হয়ে সকলই করতে পার, কিন্তু আমাদের নিকট হ'তে লাভ করতে পার না কিছুই—কেবল জ্বলেই মর। আর আমরা কি করি? আমরা তোমাদের অর্থে পুষ্ট হয়ে তোমাদের পুতুল-খেলার পুতুল নাচিয়ে থাকি। আবার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তোমাদের উৎসবান্তে ফুলের মালার মত পদদলিত করতেও কুণ্ঠিত হই না।"

অদূরে বড় রাস্তার ধারে হরিশবাবুর পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ী। গাড়োয়ানকে সেইদিকে গাড়ী চালাইতে বলিয়া কানাইলাল গাড়ীর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। স্নেহলতা মর্ম্মান্তিক কষ্টে জড়সড় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্ম্মলের পদতলে বসিয়া পড়িল। আর হরিশবাবু চেতনা রহিত পুত্রের মস্তক স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়া এতক্ষণে যেন শোক করিবার অবসর পাইলেন। তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। হায়রে অপত্যস্নেহ!

* * * *

হরিশবাবুর পরিচিত নরেশবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকীল। তাঁহার প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিতেই হরিশবাবু নামিয়া পড়িলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি কপাটে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে শব্দ হইল,—"কে?"

আবেগ-জড়িত-কণ্ঠে হরিশবাবু বলিলেন,—"হতভাগ্য হরিশ সেন!"

নাম উচ্চারিত হইতে-না-হইতেই ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল।

তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশে

সূর্য্যদেব অনেকটা নীচে নামিয়া পড়িয়াছেন। তাহাতে কার্ত্তিকের অনতিদীর্ঘ দিবাভাগের আশু অবসান সূচিত হইতেছিল। এ হেন সময় হরিশবাবুকে গলদশ্রুলোচনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেশবাবু প্রথমতঃ একটু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু হরিশবাবু সংক্ষেপে তাঁহার বিপদের কাহিনী বিবৃত করিলে নরেশবাবুর বিস্ময় দূরীভূত হইল।

নরেশবাবু বিচক্ষণ লোক। দুই-চারি কথাতেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়টা তাঁহার নিকট জাজ্বল্যমান হইয়া দেখা দিল। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া হরিশবাবুকে সময়োচিত কয়েকটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া নির্ম্মলকে ধরাধরি করিয়া দোতালায় লইয়া গেলেন। কানাইলাল এবং স্নেহলতা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় হরিশবাবুর অনুসরণ করিল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় নির্ম্মল চৈতন্যলাভ করিল। নরেশবাবু যত্নের ত্রুটী করিতেছিলেন না। বড় বড় ডাক্তার ডাকা হইল। তাঁহারা বিশেষভাবে রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "এ রোগীর কিছুতেই মৃত্যু হতে পারে না—যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ দিচ্ছি, তার ঔষধেই অনেকটা সেরে উঠবে 'খন। চিন্তা করবেন না মোটেই। অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে 'ফোন্' করবেন।"

এইভাবে আশ্বাস দিয়া ষোল টাকা এবং বত্রিশ টাকা 'ফি' পকেটস্থ করিয়া ডাক্তারেরা মোটরে চাপিলেন। কিন্তু হায়, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে জগতের প্রাণীমাত্রেরই মুহূর্ত্তকালও বাঁচিবার সাধ্য নাই—তাঁহার ইচ্ছা না হইলে পৃথিবীর কোনো ঔষধই জীবের জীবন দান করিতে পারে না।

চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই নির্ম্মলের দুষ্কার্য্যের স্মৃতি তাহাকে ম্রিয়মান করিয়া ফেলিল। 'বাবা নির্ম্মল' বলিয়া হরিশবাবু পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন—কিন্তু নির্ম্মল কিছুই বলিতে পারিল না। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত জমাট পাপ ও দুঃখরাশি অনুতাপের আগুনে দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুরূপে তাহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিতেছিল।

নির্ম্মল পুনরায় সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল—তাহার মুখমণ্ডলও দেহাবয়বে যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সঙ্গে হরিশবাবুর মুখও তাহাতে মসী-মলিন হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল গৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল—তাহার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু যেন ব্যাকুলভাবে কাহাকে খুঁজিতেছিল। বহুদর্শী বিচক্ষণ নরেশবাবু বুঝিতে পারিলেন—নির্ম্মলের প্রাণবায়ু বাহির হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। কাজেই তিনি ইসারায় নিজ গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিলেন যে,—এই সময় নির্ম্মল ও স্নেহলতার শেষ মিলন একান্ত প্রয়োজন।

স্নেহলতা সাশ্রুনেত্রে স্বামীর পদতলে আশ্রয় লইল। নির্ম্মলের চক্ষুর্দ্বয় এতক্ষণ শুষ্ক থাকিলেও স্নেহলতাকে দেখিয়া যেন তাহার শোক সাগর উথলিয়া উঠিল। আবেগ-জড়িত ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল,—স্নেহ!

কিন্তু আর বলা হইল না। স্নেহলতা তখন তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কি যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু বাষ্পজড়িত কণ্ঠে তাহা প্রকাশ পাইল না। আবার একটু শক্তি সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় নির্ম্মল ডাকিল,—"স্নেহ আমার!"

স্নেহলতা নির্ম্মলের মুখের কাছে মুখ রাখিল। চারি চক্ষুর মিলিত অশ্রুরাশি নির্ম্মলের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। তাহার পাপ হৃদয় বুঝি বা সেই অশ্রুতে সুস্নাত হইয়া পবিত্র হইল। শেষ চেষ্টা করিয়া নির্ম্মল বলিল,—"ক্ষমা করো স্নেহ—বিদায়—বি-দা-য়!"

আর কিছু বলা হইল না। নির্ম্মলের মুখ নিঃসৃত শেষ কথা দুইটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণ পাখীও দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল—চোখ দুইটী যেন তন্দ্রার আবেশে আপনি মুদ্রিত হইয়া পড়িল। নির্ম্মলের প্রাণহীন অসাড় দেহ কোলে করিয়া স্নেহলতা ও হরিশবাবু হাহাকার করিতে লাগিলেন। নরেশবাবুর পরিবারের মধ্যেও বিলাপের রোল উঠিল।

ঠিক্ সেই সময় অদূরস্থ গলির মধ্যে একটা দোতালা বাড়ীর ছাদে বসিয়া কোনও রূপসী হারমোনিয়মে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছিল—

"বিদায় বলিতে দুঃখ পাই চিতে,
(মোর) পিয়াসা রহিল—সাধ না মিটিল!..."

শ্রীবরদাকুমার পাল

গল্প-লহরী

দ্বাদশ বর্ষ | ১৩৪৩, পৌষ | নবম সংখ্যা

দোটানা

অমলা গঙ্গোপাধ্যায়

—মেয়েদের প্রয়োজন আমাদের জীবনে ষোল আনার মধ্যে একআনা। বুঝলে ?"

সুরেশ বন্ধু প্রমথর দিকে চেয়ে বল্‌লে।

প্রমীলা ফিরে স্বামীর মুখের দিকে চাইল—"আর তোমাদের প্রয়োজন আমাদের জীবনে দু' পয়সাও নয়।"

সুরেশ এতক্ষণ পরে প্রমীলার দিকে ফিরে চাইল।

—"মিথ্যে কথা, তোমাদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত বলছে, আমাদের না হলে তোমরা অচল টাকা।"

সুরেশের মুখের উৎস প্রমীলার কথার আঘাতে উন্মুক্ত হয়ে গেল—"মেয়েদের পুরুষেরা বহু স্তব-স্তুতি করেছে বলে তোমরা মনে করেছ তোমরা পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিম্বা তাদের সমকক্ষ! একটা জুতোর মূল্য লক্ষ টাকা দিলেও সেটা হীরে নয়, মুকুটে উঠবে না! সেটা শুধু আমাদের ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ দেয়।"

প্রমীলা আর কোন সাড়া দিল না, বাইরের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল।

সুরেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল হয়ত উত্তরের আশায়, তারপরেই উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুরেশের স্ত্রীভাগ্য ওর বন্ধু-মহলে ক্ষোভের সঞ্চার যথেষ্টই করেছিল। বিবাহের পূর্ব্বে যখন ওদের প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়, তখন অপূর্ব্ব ধীরেন দু'জনেই পরম বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে উঠেছিল যে, ওরা প্রমীলার জন্য এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও যে লোকটা জীবনে কখন নারীর মূল্য দিলে না, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্য কি না তারই গলায় পড়ল!

কালটা কলি এবং ওরা কেউ রাজা বা রাজপুত্র নয়,

কাজেই অপূর্ব্ব খুব করুণ মুখে প্রমীলার কাছে বল্লে—"আপনাদের জীবনের এ নব পরিবর্ত্তনে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এতে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হই নি; কারণ, বিধাতা সুরেশের ললাটে বিজয়-টিকা দিয়ে পাঠিয়েছেন।" বলে সে সুদীর্ঘ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গেল। এবং ধীরেন কেমন যেন একটা অন্যমনস্কভাবেই বন্ধুর বহু দুর্ব্বলতার ইতিহাস বিশেষ করেই প্রমীলার কাছেই ব্যক্ত করে পরে পরম অনুনয়ের সঙ্গে প্রমীলাকে বিস্মৃত হবার অনুরোধ জানাতে লাগ্‌ল। কথাগুলো ক্রমে সুরেশের কানে আসতে লাগ্‌ল, কিন্তু সে যেন এর জন্যে প্রস্তুতই ছিল তেমনিভাবে নিতে লাগ্‌ল। এবং এরপর একদিন বন্ধুদের সহিত উপস্থিতি সময় প্রমীলার সঙ্গে তর্ক করতে করতে বললে—মেয়েদের এত করে নানা দিক দিয়ে বেঁধে না রেখে উপায় নেই; কারণ, স্বাভাবিক অসচ্চরিত্রতা ওদের মজ্জাগত। একটা জিনিষ আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখি—একটা অসচ্চরিত্র পুরুষের জন্য বহু মেয়ে তার অন্তরের ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দেয়, কিন্তু একটা সচ্চরিত্র পুরুষ তার অর্দ্ধেকও পায় না।"

তারপর আর প্রমীলা তর্ক করে নি; কারণ, কথার অস্ত্রে লোকজয় করার শক্তি ওর কখন ছিল না।

যাক্, এসব পৌরাণিক কাহিনী। বর্ত্তমানে সুরেশ ঘর ছেড়ে চলে যেতেই প্রমীলা প্রমথর দিকে চেয়ে বল্‌লে—"অমন গম্ভীর হয়ে কি ভাবছেন?"

প্রমথ আজ সুরেশের ব্যবহারে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল; কাজেই আপনাকে সম্বরণ করতে পারলে না। বল্লে—ভাবছি, পৃথিবীতে কোথাও যথার্থ মানুষ পাওয়া যায় না।"

—"তার মানে? কখন এক টাকা ভাঙ্গাতে গিয়ে বারো আনা ফিরে পেয়েছেন?"

প্রমীলা তার অভ্যাস মত প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। প্রমথ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল; মৃদুহাস্য মুখের উপর টেনে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে সুরেশ আরও কয়েকটি বন্ধু নিয়ে ফিরে এল এবং পরম উৎসাহে ওরা তাস খেলতে বসল। প্রমীলা উঠে নিজের সংসারের কাজে চলে গেল।

এ সংসারে অভাব কিছুরই নাই, না অর্থ, না অন্তর। এ যেন সেই শ্মশানবাসিনী উমার সংসার—অভাব যেন কিছুরই নাই, তেমনি প্রভাবও কিছুরই নেই। স্বামী আর স্ত্রী সংসারে দু'টী প্রাণী। স্বামী আছেন বন্ধু-বান্ধব সভা সমিতি খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা নিয়ে, আর প্রমীলা থাকে সংসারে স্নেহ তরুচ্ছায়ার মত আপনাকে দিক্ হতে দিকে বিস্তার করে!

রান্নাঘরে ঢুকেই প্রমীলার মনে হলো আজ সতীশের আসবার কথা আছে। সেদিন সতীশ বলছিল—মেসের রান্না খেয়ে খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হবার যোগাড় হয়েছে। আচ্ছা, ও কেন এ বাড়ীতে এসে থাকে না। এবার সতীশকে তাই বলবে। এইত বিপুল আছে, অনিল আছে, আর ও থাকতে পারে না। এই সন্তানহীনা নারীটির সমস্ত মাধুর্য্য আনন্দ এই কয়েকটিকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

ও সতীশের জন্য জলখাবার তৈরী করতে বসল।

বিপুল কোথা থেকে ছুটে এসে ছোট ছেলের মত রান্নাঘরে প্রমীলার পাশে বসে পড়ে বল্লে—কি করছ খুড়ীমা? চলো, ঘরে একখানা বই এনেছি তোমার জন্যে, খুব ভাল বই চলো না।"

—"দাঁড়া একটু পরে যাচ্ছি।"

—"না, একটু পরে নয়, এখনি যেতে হবে। ও কি করছো?"

—"আজ সতীশ আসবে কি না, তাই তার জন্যে খাবার কর্‌ছি।"

—"সতীশ তোমার ভাই কি না, তাই তার জন্যে খাবার হচ্ছে? কখনো তাকে খেতে দেব না, আমি সব খাব। দাও আমাকে।"

প্রমীলা হেসে উঠল—"খা' না, তুই কত খাবি।"

—আমি সব খাব, দাও।"

প্রমীলা একখানা রেকাবে খাবার সাজিয়ে ওর সামনে এগিয়ে দিল।

বিপুল খাবারটা হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—নিজের ভায়ের জন্যে নিজে করছো, আর আমাদের জন্যে ঠাকুর

খাবার করে। ভাই-ই তোমার সব, আর আমরা ত্যজ্য পুত্তুর।"

প্রমীলা সস্নেহ হাস্যে বল্লে—"আর সে ধর্ম্মপুত্তুর গেলেন কোথায়? এসেই বলবে—মাসীমা, আমি আজ তিন দিন খাই নি।

—"সে কোথায় বেরিয়েছে।"

—"বেরুল আবার কোথায়? আজ যে কাপড়গুলো বদলে দেব বলেছিলাম। এমন ছেলে যদি আর একটি থাকে। নিজের কাপড়খানা পরিষ্কার আছে কি না সে দিকেও হুঁস নেই। ঠাকুর, দাদাবাবুকে একগ্লাস জল দিয়ে যাও।"

প্রমীলার জলখাবার তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোকে জাল আলমারীতে তুলে রাখতে রাখতে ঠাকুরকে বল্লে—"ঠাকুর, এবার চায়ের জল বসিয়ে দাও, এখনি বাবু চা চাইবেন।"

বিপুল খেয়ে উঠে দাঁড়াল—"খুড়ীমা, আজ খুব ভাল 'ফিল্‌ম' আছে, যাবে দেখতে?"

—"গেলে ত হয়, কিন্তু আজ যে সতীশ আসবে বলেছিল।"

—"তবে তুমি যাবে না ত? বেশ, আমি একলাই দেখে আসি।"

—"মন কেমন করবে না?"

—"মন কেমন সতীশের করবে, আমার নয়।"

—"ছেলেদের যদি না করে ত ভায়ের কি করা সম্ভব যে করবে?" বলে প্রমীলা আবার এসে স্বামীর কক্ষে ঢুক্‌ল।

—"চা আনতে বলি?"

সুরেশ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে—"কটা বেজেছে? আমার আবার সাড়ে ছ'য়টায় এক জায়গায় যাবার কথা আছে।"

বিপিন সুরেশের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বল্লে—"এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়নু। দেখো, যেন এক মিনিটও দেরী না হয়, ট্রেণ ফেল হয়ে যাবে।"

সুরেশও হাসল—"সত্যি, মিস্ রায়কে আমার এত ভাল লাগে, এত মিষ্টি—কি সুন্দর স্বভাব!"

প্রমীলার মুখখানা একটি মুহূর্ত্তের জন্য কেমন এক অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল—কিন্তু সে একটি মুহূর্ত্ত। পরক্ষণেই হেসে বল্লে—"সাড়ে ছ'টা বাজতে আর দেরী নাই, চা খাবে কি না বল্লে না।"

—"হ্যাঁ, নিয়ে এসো, দেরী করো না।"

তাস ফেলে সুরেশ বেশ পরিবর্ত্তন করতে গেল।

প্রমীলা ঠাকুরকে চা করতে বলে দোতালায় নিজের শয়ন-কক্ষে এসে ঢুক্‌ল।

মনের নিভৃততম স্থানে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা অনুভূত হয়; অথচ, সেটাকে প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করতেও আত্মাভিমান আঘাত পায়। কিন্তু ভোলাও যায় না। প্রমীলা চুপ করে জান্‌লা থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের কোলে জল কেবলি উপচে আসে। সুরেশ কেন ওকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখায় না; সেও যে শত-গুণ ভাল ছিল। হৃদয়হীনকে অবজ্ঞা করে সরে যাওয়া যায় কিন্তু উদাসীনকে ভোলা যায় না।

সন্ধ্যার অন্ধকার কক্ষের মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে। ঝি ভাঁড়ার বার করে দেওয়ার জন্য ডাকতে এল—"মা, ঠাকুরকে ভাঁড়ার বার করে দাও, উনুন ধরে গেছে।"

প্রমীলা আঁচল থেকে চাবিটা ঝিয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—"ঠাকুরকে বের করে নিতে বলো।"

আজ আর যেন কোন কাজ তার ভাল লাগে না।

প্রমীলা চুপ করে বসে রইল। সন্ধ্যার পর নীচের সিঁড়ির কাছ থেকে সুরেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কে এসেছে দেখবে এসো।"

প্রমীলা উঠে দাঁড়াল। ঘরের আলোটা জেলে বাইরে আসতেই দেখ্‌ল—সুরেশ ওপরে উঠে আসছে এবং তার পশ্চাতে একটা কিশোরী। প্রমীলা স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চাইতেই, সুরেশ বল্লে—"এ আমাদের তটিনী, যাকে তুমি মিস্ রায় বলে জান।" বলে সুরেশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

তটিনী কিন্তু বেশ চির-পরিচিতের মত এগিয়ে এসে প্রমিলাকে জড়িয়ে ধরল—"আপনিই প্রমীলা দি', না?

প্রমীলা হেসে ওকে এনে নিজের কক্ষে বসাল। তটিন

আপন-মনে বকে চল্ল—"সুরেশবাবু কি মিথ্যে কথাই বলতে পারেন! কতদিন ধরে বলছি যে, আপনার স্ত্রীকে দেখব; তা উনি বল্লেন কি না—আপনি না কি ভীষণ বদ-রাগী; বাইরের কোনো লোক এলেই তাকে দূর করে দেন। শেষে আমি আজ বল্লাম যে, যদি তাড়িয়ে দেন সেও ভাল তবু আমি যাব। তখন বল্লেন—'আমার কাজ আছে।' বলে উঠে বেরিয়ে গেলেন। ও মা! আমি যখন বাস থেকে নামছি, তখন দেখি বাস 'ষ্টপে'র কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। এত মিথ্যে কথা বলেন! সত্যি, আপনি কি চমৎকার! ইচ্ছে করে না আপনাকে ছেড়ে যেতে।"

প্রমীলা হেসে ওকে কাছে টেনে নিল—"থাকো না আমার কাছে।"

সুরেশ হেসে প্রমীলার দিকে চেয়ে বল্লে—"হ্যাঁ, একেই যে মনোযোগী ছাত্রী! তবু ওদের কাছে রয়েছে, একটু পড়া-শুনোয় মন দিচ্ছে; এখানে থাকলে সারাদিন তোমার গলা জড়িয়ে আবদার করবে।"

প্রমীলার মনের কালো মেঘ সম্পূর্ণ যেন সরে গেল। ও মনে মনে চরম লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। এই শিশুর মত সরল, নিষ্পাপ কিশোরীকে নিয়ে ও উন্মাদের মত দগ্ধ হয়েছে! স্বামীর প্রতিবাদে ওর মনে হ'ল সুরেশ ওর বেদনার দিকে চেয়ে এ কথা বল্‌ছে। নিজের এ হীনতায় এবং স্বামী গৌরবে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ও ঠিক শিশুর মত তটিনীকে কোলের কাছে টেনে বল্লে—"না, ও আমার কাছে থাকলে আরো মন দিয়ে পড়াশুনো করবে।"

সুরেশ মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করেই বল্লে—"নাও, আলাপ ত হলো, এখন চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আবার একটু কাজ আছে, নীলাম্বরের ওখানে যেতে হবে।"

—"না, আমি যাব না এখন। আপনার কাজ থাকে ত যান।"

—"আমি কি তোমাকে চিনি নে। আমি কাজে বের হব, আর তুমি এখানেই রয়ে যাবে।"

প্রমীলা ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"তাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি অমন করছো কেন?"

—"ক্ষতি কি মানে? ওর বীণা দি' কি ভাববেন বলো ত?"

তটিনী চটে উঠল—"ভাববেন ছাই, তিনি আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন!"

—"সে তোমার ব্যবহারে, তাঁর দোষ নয়।"

প্রমীলা বল্লে—"আচ্ছা, তুমি নীচে চলো, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুরেশ নীচে নেমে গেল। যাবার সময় সিঁড়ি থেকে চেঁচিয়ে বল্লে—"দেরী করো না। শীগ্‌গির এসো।"

সুরেশ চলে যেতেই প্রমীলা ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—"লক্ষ্মী ভাই, আজ তুমি যাও, কাল তোমাকে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব। কি বলো?"

তটিনী প্রতিবাদের সুরে বল্লে—"আপনাকে সুরেশ-বাবু যেতে বারণ করবেন, আমি কি আর জানি না! আপনার কাছে আসতেই উনি এতদিন ধরে বাধা দিয়েছেন।"

—"না না, উনি বারণ করবেন না, আমি জানি। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। আজ সত্যি হঠাৎ থেকে গেলে ওঁরা কি ভাববেন।"

—"এমনিতেই ওরা ভাবতে বাকী রেখেছেন কি না! ওদের ভাবাতে আমার ভারী বয়ে গেল!"

—"তা' হোক্, লক্ষ্মী মেয়ে! আজ আমার কথা শোনো।" বলে প্রমীলা ওর হাত ধরে নীচে নেমে এল।

রাত্রি বেশ গভীর। আকাশে মেঘ করেছে। তারি ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রমীলার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাড়ীর সামনের বড় রাস্তার উপর দিয়ে কারা শ্মশানে চলেছে—"বল হরি হরি বোল।"

তটিনী হঠাৎ চমকে উঠে ডাকল—"প্রমীলা দি'।"

—"কি ভাই?" এই যে আমি।"

তটিনী প্রমীলার কণ্ঠ বেষ্টন করে বুকের কাছে মাথাটা গুঁজে দিয়ে বল্লে—"আমার ভয় করছে।"

—"পাগল!"

প্রমীলা সস্নেহে নিজের মুখটা ওর কপালে ঠেকিয়ে। সস্নেহ স্পর্শে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

প্রমীলার স্নেহময়ী অন্তরবাসিনী তটিনীর দিকে চেয়ে আজ যেন অপূর্ব্ব জীবনে জেগে উঠেছে।

তটিনী শিশুর মত ওর বাহুবন্ধনে শান্ত হয়ে বলে—"সত্যি, তুমি কি ভাল প্রমীলা দি'! বীণা দি' আমাকে আর ঝুম্‌কিকে একঘরে শুইয়ে নিজে আর জামাইবাবু আর একঘরে শুয়ে থাকৃত। এক-একদিন রাত্রে ভয়ে আমরা দু'জনে সমস্ত রাত জেগে বসে থাকৃতাম শুনে বীণা দি' রেগে উঠত। বল্‌ত—"সব তাতে ন্যাকামো!"

ওর শিশুর মত সরল কথায় প্রমীলা মৃদু হেসে ওকে আরো নিবিড় করে কাছে টেনে নেয়।

একটু পরেই তটিনী অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রমীলার চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। তটিনী আসার পর হ'তেই সুরেশের ব্যবহার যেন কেমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে! সব সময় মনে হয়, ও যেন এদের এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচে।

প্রমীলার মন একান্ত বেদনায় এবং নব আনন্দের রসে কেমন যেন অদ্ভুত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ও শয্যা ছেড়ে উঠে এসে ঘরের মধ্যেকার পরদাটা সরিয়ে সুরেশের ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ওর শয্যার দিকে চাইল। শয্যার উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে সুরেশ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পাশ ফিরে শুয়ে আছে সম্পূর্ণ মুখখানা দেখা যায় না। অস্পষ্ট আলো-ছায়াতে যেটুকু দেখা যায়, তা'তে মনের আকুলতা আরো বেড়ে ওঠে। মনে হয়, সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ, ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি-ক্ষয় নিয়ে প্রকৃতির এই শিশুটি আনমনে খেলা করে চলেছে কোন বিরাট্ জীবনের পথে। এই বন্ধুটিকে প্রমীলা তার খেলার জীবনে কেমন করে চিরন্তনী করে রাখ্‌বে? মনে হয়, আকাশের চাঁদ যেমন ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর বক্ষের উপর নিজের প্রতিবিম্ব ফেলে তাকে আকুল করে চলে যায়, সুরেশও যেন তেমনি করে প্রতি পাদক্ষেপে প্রমীলাকে চঞ্চল আকুল করে চলেছে।

তটিনীর পাশফেরার শব্দে প্রমীলা ফিরে এসে নিজ শয্যায় বস্‌ল।

মন উদাস হয়ে যায়। মনে হয়, এ সংসারের খেলায় এবার যেন ওর ছুটী হয়ে গেছে। এবার শুধু সরে যাওয়ার পালা। আকাশের এলোমেলো আলো-ছায়া প্রমীলার মনে বিস্তার করে, আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে, রাত কেটে যায়।

প্রভাতের স্পষ্ট অরুণালোকে রাত্রের আলো-ছায়া মিলিয়ে যায়, তটিনী বিপুল, অনিল চেঁচামেচি করে—ঠাকুর, এখনো চা দিলে না। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। এই রঘুটা গেল কোথায়? আমি স্নান করতে যাব এখনো সব গোছ করে দিয়ে গেল না।"

প্রমীলা স্মিতমুখে রাত্রের কথা ভাবে। কী পাগল! সংসারে ওর প্রয়োজন কে বল্লে শেষ হয়েছে? এই যে স্নেহের ধন, এদের প্রতিপদে ওকে চাই।

স্বামীর যদি কোন স্থান দুর্ব্বল থাকে ত থাক! সেদিকে ওর দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। কেন ও অত দুর্ব্বল? কেন সামান্য আঘাতে এমন বিচলিত হয়ে ওঠে?

কোথায় কতটুকু ফাঁকী আছে সেই দুঃখই এতবড় হয়ে উঠল, আর এই যে এদের সম্পূর্ণ আনন্দময় দান তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল না।

চা খাওয়ার পর তটিনী কাপড় ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, সুরেশ ওদিক্‌কার বারান্দায় চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ওকে এ বেশে নীচে নামতে দেখে বল্লে—"তুমি কি সকালবেলায় হাওয়া খেতে যাচ্ছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কোথায়?"

—"যেখানেই যাই না, সব কথার জবাবদিহি করতে হ'বে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা আছে?"

—"হ্যাঁ আছে। তুমি মনে করেছ আমি জানি না, তুমি কোথায়, কার কাছে যাবে।"

—"যেখানেই যাই না, তোমার তা'তে কি? আমি কি তোমার রক্ষিতা যে ভয় পাব।"

প্রমীলা ওদের উচ্চকণ্ঠস্বরে ছুটে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তটিনীর কথাটা শুনে ওর অবস্থাটা অন্ধকার রাত্রে চলন্ত পথিক হোঁচট খেয়ে গর্ত্তে পড়ার মতই হয়ে উঠল। পরক্ষণেই সুরেশ গর্জ্জন করে উঠল—"ভদ্রভাবে কথা বলো। ইতর, অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক, কথা কইতে পর্য্যন্ত জানো না! তুমি যাও দেখি, কেমন যাবে।"

প্রমীলা এবার সচেতন হয়ে ত্বরিত পদে ফিরে আসছিল, হঠাৎ তটিনী পাগলের মত ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠ্‌ল—"প্রমীলা দি', তুমি যেও না।

প্রমীলা ফিরে দাঁড়িয়ে ওকে কোলের কাছে টেনে নিল। নিজের ব্যবহারে লজ্জিত সুরেশ খবরের কাগজখানা ফেলে নেমে গেল।

সুরেশ চলে যেতেই রুদ্ধ আক্রোশে তটিনী বকে যেতে লাগল—"আমি যেখানে ইচ্ছে যাব, যা' ইচ্ছে কোরবো, কার তা'তে কি! ও যে কি তা' ত তুমি জানো না! আমাকে বলে অসচ্চরিত্র! ওঃ, নিজের কি মহান চরিত্র! তোমার মত স্ত্রী বলে সহ্য করে, আমি হ'লে অমন স্বামীর নামে কুকুর পুষতাম!"

সুরেশ আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে প্রমীলাকে বল্লে—"এখনো ঠাণ্ডা হয় নি। হিষ্টিরিয়া রোগী সব! যাও, তুমি নীচে যাও, আমি ওকে ঠাণ্ডা করছি।"

—"না না, তুমি যেও না প্রমীলা দি'!"

ক্রন্দন-জড়িত-কণ্ঠে কথাগুলো বলে তটিনী প্রমীলার আঁচলখানা চেপে ধরল। কিন্তু সুরেশ আবার বল্লে—"তুমি নীচে যাও।"

প্রমীলা ওর হাত থেকে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে ত্বরিত পদে নীচে নেমে গেল।

বিষাক্ত, সমস্ত সংসার আজ ওর বিষাক্ত হয়ে উঠেছে! ওর ঐশ্বর্য্যশালী মন যে অভিজাত্যের গৌরবে কখনো স্বামীর উপর স্পষ্ট অভিমান জানাতে পারে নি, যে কখনো ভয়ে স্বামীর গমন-পথের দিকে ফিরে চায় নি, পাছে কোন হীনতা চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার কি পরিণাম!

কিছুক্ষণ পরেই সুরেশের সঙ্গে তটিনী বেড়াতে বার হয়ে গেল। এখন ওর মুখে হাসিও ফুটেছে। লজ্জায় ঘৃণায় প্রমীলা আর সেদিকে চাইতে পারল না, চট করে সরে দাঁড়াল। মনের আভিজাত্য যে নারী রেখেছে, তার চেয়ে দুর্ভাগিনী বুঝি আর নাই!

বিরহ নয়, বিচ্ছেদ নয়, মান-অভিমানের পালা নয়, শান্ত স্তব্ধ সানন্দে আবার প্রমীলা সংসার করে, যেমন আগে করত। তটিনী ধূমকেতুর মত ওর ধরা প্রাঙ্গণে অমঙ্গলের ছায়াপাত করে সরে গেছে।

অনিল বিপুল তেমনি পূর্ব্বের মত খেতে বসে কোলাহল করে—"এটাতে ঠাকুর কি ঝালই দিয়েছ!"

প্রমীলা তেমনি সহাস্য-মুখে বলে—"লোকে কথায় বলে এক ব্যঞ্জন নুনে বিষ। তাড়াতাড়িতে ডাল আর একটা তরকারী হয়ে উঠল, তাও লঙ্কাগোলা। দাদাবাবুরা খাবে কি দিয়ে ঠাকুর? তুমি একটু হুঁস রাখো না। যাও, চট করে খানকতক আলু ভেজে দাও।"

বিপুল ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আর করতে হবে না, আমার কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

—"লক্ষ্মী বাবা, একটু দাঁড়া, এখনি আন্‌ছি।"

প্রমীলা দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। আলু ভাজা, আচার-মোরোব্বা, দই-মিষ্টি। আহা, রান্না হয়ে ওঠে নি, কাজেই ভাঁড়ার খুঁজে খুঁজে ভেবে ভেবে একে একে ছেলেদের পাতের কাছে এসে জমা হয়। বিপুল হেসে বলে—"আ, আজ কিছু রান্না হয়ে ওঠে নি বলে আমার খাওয়া ভাল হলো না। নয় খুড়িমা?"

প্রমীলা হেসে বিপুলের দিকে চাইল—"বাঁদর ছেলে! একে কি খাওয়া বলে?"

—"তবে কি বলে?"

প্রশ্ন করে দুষ্ট কৌতুকপূর্ণ মুখে বিপুল প্রমীলার দিকে চাইল।

প্রমীলা উত্তর দিল—"একে বলে 'উচ্ছের ঝাড়' যেমন খুড়ো, তেমনি ভাইপো!"

—"আমরা কথা কইতে জানি, তাই উচ্ছের ঝাড়। আর তোমরা, অর্থাৎ, যারা বোবা, তারা কিসের ঝাড়?"

—"তারা যারই ঝাড় হোক্, সেটা ত তোদের পরীক্ষা-পত্রে প্রশ্ন জাগ্‌বে না, অনুপস্থিতিটা পরীক্ষার ক্ষতি করতে পারে।"

—"তা' বটে! ওদিকে দশটা বেজে গেছে।"

বিপুল, অনিল তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে উঠে পড়ল।

সবই তেমনি আছে, সেই বন্ধু-বান্ধব, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মতই উভয়ে স্ত্রী-পুরুষের পক্ষ সমর্থন করে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব। আজও সুরেশ স্থানান্তরে গেলে বিরহ-ব্যথিত অন্তর তার পথ চায়। ওর অসুস্থ শয্যাপার্শ্বে গত দিনের মতই উদ্বিগ্ন মুখে এসে বসে। কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয় নি।

বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, কিন্তু মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সংসারের কাজকর্ম্ম বহুক্ষণ সারা হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। শুধু সুরেশের অফিস্-কক্ষে এখন প্রতিদিনকার মত আলো জ্বল্‌ছে। অন্যদিন এ সময় প্রমীলা ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আজ এই বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে উতলা শ্রাবণ এসে ওর নিদ্রাকে হরণ করে নিয়েছে। বর্ষার অন্ধকার রাত্রে পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায় অদ্ভুত নির্ঝরশীলা সরল বন্য প্রকৃতির সেই মেয়েটির কথা।—"প্রমীলা দি,' তুমি ও পাশ ফিরো না, আমার ভয় করছে!" অন্তর যেন আকুল হয়ে ওঠে তাকে আপন বক্ষের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য! ও তাকে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে বুঝেছিল—আর কেউ কি ওর মত করে তাকে বুঝ্‌তে চেষ্টা করবে! কোথায় দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিনের মধ্যে সে হয়ত আর্ত্তনাদ করছে, কাল সকালে ও নিশ্চয় তার ঠিকানা সংগ্রহ করে তাকে ফিরে আসবার জন্য লিখ্‌বে।

মিথ্যা, মিথ্যা, সমস্ত মিথ্যা ধারণা! অসম্পূর্ণ বিকশিত অন্তরে যৌবন তাকে উন্মাদ করেছিল, সেকি তার অপরাধ! সুধাপাত্র তার ওষ্ঠের নিকট ধরে রেখে ক্রমাগত প্রলুব্ধ করলে সে কেন পান করবার জন্য বাহু প্রসারিত করবে না! নারী বলেই কি আজ সমস্ত অপরাধের বোঝা তারই স্কন্ধে পড়বে! পুরুষের কণ্ঠে শক্তি আছে, সুরে যুক্তি আছে, তাই তারা সত্যকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল নারীজাতি সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সুরেশ সত্যকে অস্বীকারের ভান করেছিল, কিন্তু তটিনী পারে নি। সে ত তার অপরাধ নয়।

তন্দ্রার সামান্য লেশটুকুও সরে যায়। প্রমীলা শয্যা ছেড়ে উঠে জানলার ওপর বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। মেঘের কোলে কোলে কেবলি ভেসে ওঠে সেই সরল নির্ঝরশীলা অদ্ভুত মেয়েটির মুখ। বিদ্যুতের চকিত চমকিত ভাষায় সে যেন কেবলি বল্‌তে থাকে—"প্রমীলা দি', তুমি ও পাশ ফিরো না, আমার ভয় করছে।"

ঢং ঢং বারান্দার বড় ঘড়িটাতে বারোটা বেজে যায়। অফিস-ঘরের আলো নিবিয়ে সুরেশ দোতলায় উঠে আসে।

প্রমীলার শয়ন-কক্ষে ঢুকেই বিস্মিতভাবে সুরেশ এগিয়ে এল—"এ কি, আজ এখনও জেগে!"

—"ঘুম আসছে না।"

—"একে বসন্তকাল, তায় আবার আকাশ মেঘে ভরা ঘুম না আসাই উচিত।"

'খট্' করে সুইচটা টিপে আলো জ্বেলে সুরেশ একবার প্রমীলার মুখখানা দেখে নিল। গভীর বেদনাভরা চোখ নত করে আত্মগোপন করবার প্রয়াসে প্রমীলা বলে—"আলো কেন জ্বাল্‌লে? ভাল লাগ্‌ছে না।"

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সুরেশ প্রমীলাকে দুই বাহুর মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে বেষ্টন করে ধরে নত আননে ঝুঁকে পড়ে বলে—"তোমাকে বড় কষ্ট দিই, নয়?

দুর্ব্বল নারীর আত্ম-বিস্মৃতির চরম মুহূর্ত্ত।

মান-অপমান-অভিমান, ব্যথা-বেদনা-ক্ষয় একাকার

হয়ে যায়। ব্যাকুল বাহুবেষ্টনে প্রমীলা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বক্ষের মধ্যে নিবিড়ভাবে মুখ লুকিয়ে স্পন্দনহীন স্তব্ধ হয়ে থাকে। রজনীর শ্যামাঞ্চলের তলে ধরণী অচেতন। কেহ সাক্ষী নাই। রজনীর মন্ত্রমুগ্ধা অচৈতন্য ধরা নিজেও জানে না তার বসন্ত-বনে রজনী কি ফুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল।

বহুক্ষণ পরে সুরেশ উঠে পরদাটা সরিয়ে ও পাশের ঘরে আপন শয্যায় চলে গেল। শূন্য কক্ষে বিনিদ্র নয়নে প্রমীলা চুপ করে চেয়ে থাকে। আজ ওর কি যে হয়েছে কে জানে! নিদ্রা কিছুতেই আসে না। আবার মনে পড়ে যায় তটিনীর কথা। মন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। আশ্চর্য্য অভিনেতা! সমস্ত দেহ-মন যেন অশুচি হয়ে ওঠে। দুর্ব্বল অজ্ঞান অবস্থার অবসরে প্রতারকের মত প্রতারণার সুলভ মূল্যে বহুমূল্য মণি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। সমস্ত অন্তর জুড়ে দাবানল জ্বলে ওঠে। ইচ্ছা হয় আপনার সর্ব্বাঙ্গ তীব্র কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে।

ফুটপাতে একটা গেরুয়া-পরা ভিখারী ছোট একটা কল্কে হাতে করে বসেছিল। বৃষ্টির প্রবল ধারায় তার আগুন নিবে গেল, কিন্তু জলভরা মেঘের বুকে বিদ্যুদগ্নি ঘন ঘন চমকে আকাশের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটো-ছুটি করতে লাগ্‌ল।

পাশের ঘরে সুরেশ তখন গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য।

অমলা গঙ্গোপাধ্যায়
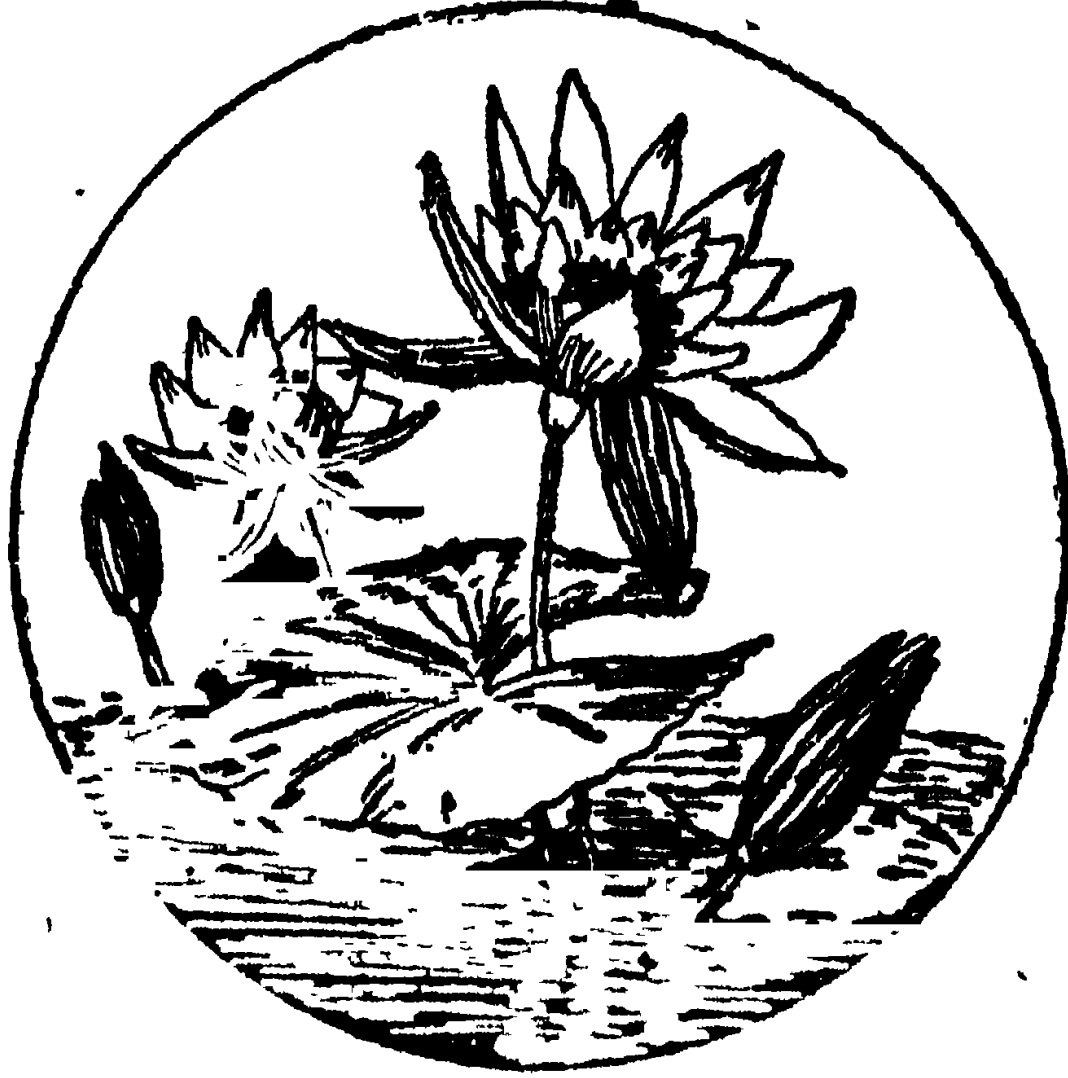
মালার ব্যথা

ননী মুখোপাধ্যায়

মজুমদারদের বাড়ীতে আজ যাত্রা। মজুমদারেরা গ্রামের জমীদার। জমীদারী যদিও এখন আর তেমন নেই, তবে নাম-ডাক আছে যথেষ্টই। তাই বিকালবেলা হতেই চল্‌ছিল সেই যাত্রার আয়োজন। বুনো, বাগ্‌দী চাকরেরা ছিল তারি কাজে ব্যস্ত। সামিয়ানা টাঙানো, 'পাক্ লাইট ফিট্' করা, ফরাস ও সতরঞ্চি পাতা হচ্ছিল হরদম। কর্ম্মীদের মিশ্রিত কোলাহলে মজুমদার-বাবুদের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ ছিল সরগরম।

সুরেন দাসের যাত্রাপার্টি আজ দেখাবে অভিনয়। সুরেন দাসের যাত্রাপার্টির নাম-ডাক এদিকের লোক না শুনেছে কে! এতকাল যার শুধু নাম শুনে তারিফ করে এসেছে, আজ দেখ্‌বে তার দলের অভিনয়। তাই চারিদিক্‌কার গ্রামে পড়ে গিয়েছিল সাড়া। লোকেরা উঠেছিল মেতে।

সন্ধ্যা না হ'তেই চারিদিক থেকে পঙ্গপালের মত লোক মজুমদার-বাবুদের বহির্বাটীতে এসে ভীড় জমাতে লাগ্‌লো। অধিকাংশই চাষীর দল; গাম্‌ছা কাঁধে দিয়েই চলে এসেছে অনেকে। বুড়োরা বেশীর ভাগই নগ্নপদ—গায়ে কারোও কারোও বা একটা আধময়লা ছেঁড়াখোড়া জামা আছে। আবার কারোও গায়ে শুধু একখানা উড়ুনী। তবে ছোক্‌রাগোছের, আর তরুণ যুবক যারা—তাদের গায়ে রঙিন ছিটের সার্ট—চুল ওল্‌টানো—আর পায়ে রবারের জুতো—প্রায় ষোলো আনার বেশভূষাই এক রকম—নেহাৎ যারা জুটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি, তারাই পড়েছে বাদ—এদের কারোও কারোও হাতে আবার 'টর্চ্চ লাইট' আছে। অবসর বুঝে অভিনেতাদের মুখে 'ফোকাস' দেবে—এই হলো তাদের এখানে 'টর্চ্চ লাইট' আনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মজুমদার-বাবুদের বহির্বাটী দর্শকে প্রায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। পাণ-বিড়ীওয়ালারা এসে একপাশে তাদের দোকান জাঁকিয়ে তুলেছে—বিক্রীও তাদের আরম্ভ হ'য়ে গেছে। দর্শকেরা উৎসুক হ'য়ে গোলমাল সুরু করেছে—এবার শুধু যাত্রার দল আসরে নামলেই হয়।

জমীদার-বাবুদের পুরানো একতালা দালান। বহির্বাটীর সম্মুখ দিকের উন্মুক্ত দরদালানে বাবুদের নিজেদের বস্‌বার সতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাবুরা তিন সরিক। প্রত্যেকেরি আলাদা আলাদা বাড়ী। শ্যামবাবুদের প্রাঙ্গণেই আজ হয়েছিল যাত্রার আয়োজন। তিন ভায়ের মধ্যে শ্যামবাবুই বড়—শ্যামবাবু অপুত্রক—একটীমাত্র মেয়ে আছে তাঁর। বড় সাধের মেয়ে তার এই নীলা। নীলা টুক্‌টুকে সুন্দরী—কোমল সদ্যফোটা ফুলের মত তরুণী—দেখ্‌লে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা যায় না। এমনিই তার রূপের চটক। তাই সাধ করে শ্যামবাবু ছোট বেলাতেই অনেক টাকা খরচ করে নীলার দিয়েছিলেন বিবাহ। সুন্দর সুকোমল একটী বালক জামাতা তিনি এনেছিলেন ঘরে। কিন্তু বিধাতা বিমুখ—দু' বছর যেতে-না-যেতেই মেয়ে হলো বিধবা। সেই নীলা আজ সপ্তদশী—রূপ-যৌবন যেন তার উছ্‌লে উছ্‌লে পড়্‌ছে—দেহের বিকাশ মান্‌ছে না কোনও বাধা। বিবাহের কথা, স্বামীর কথা নীলার মনেই পড়ে না—তবে বিধবা হওয়ার কথা ক্ষীণ আলোক রশ্মির মত আজও তার মনের কোণে উঁকি দেয়। এই নীলাই আজ শ্যামবাবুর সকল দুঃখের কারণ—তিনি মেয়ের মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারেন না—চাইলেই বুকখানা তার ব্যথায় ভরে ওঠে। ভদ্রতার খাতিরে যদিও তিনি আসরে এসে বসেছিলেন—কিন্তু মনে তাঁর শান্তি ছিল না।

ওদিকের দালানে মেয়েদের বস্‌বার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে—সেখানেও ভীড় জমে উঠেছে। দু'-একটী

কচি ছেলেমেয়ে কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। জমীদার গিন্নীরা সব নিজেদের আসন দখল করেছেন—নীলাও এক-কোণে চুপ করে বসে আছে—চাউনি তার কিছু উদাস।

যাত্রার দল অনেকক্ষণ এসে হাজির হয়েছে। বাবুদের কাছারী ঘরটাই তাদের বসবার ও সাজবার ঘর বলে সাব্যস্ত হয়েছে। তারা সব সাজগোজ আরম্ভ করে দিয়েছে। আসর জঁাকিয়ে যাত্রার দলের মিশ্রিত সুরের বাজনা সুরু হয়েছে—এখুনি পালা আরম্ভ হবে।

'কুসুমকুমারী' পালা হবে অভিনয়। সুরেন দাসের পার্টির 'কুসুমকুমারী' পালার অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত। ও পালাটা ও দলের মত আর কেউ না কি জমাতে পারে না। 'কুসুমকুমারী' পালা দেখ্‌লে পাষাণের চোখ দিয়েও না কি জল বেরোয়।

'কুসুমকুমারী' একখানা বিয়োগান্ত নাটক। অলকাপুর সমৃদ্ধশালী ধনজনপূর্ণ একটী রাজত্ব। সে রাজ্যে প্রজারা সব সুখী। অভাব-অভিযোগ নেই কারো। এই শান্তিময় সম্পদশালী রাজত্বের ওপর আশপাশের সকল রাজারই লোলুপদৃষ্টি ছিল। বাজের মত শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে এই রাজ্যটাকে গ্রাস করবার জন্ত সকল রাজাই একান্ত অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে থাক্‌তো। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুশৃঙ্খলা-পূর্ণ, যুদ্ধনিপুণ বীর সৈন্যবাহিনীর ভয়ে কোন রাজাই এই ছোট রাজ্যটাকে আক্রমণ করতে সাহসী হতো না।

এই বাঞ্ছনীয় রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন কুসুম-কুমারী। কুসুমকুমারীর পিতা রাজা সুশান্ত দেব এই কুসুমকুমারীকে রেখেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ষোড়শী কুমারী রাজকন্যা কুসুমকুমারীই সিংহাসনের অধিকারিণী হন্‌। রাজকুমারীর গুণে প্রজা-পুঞ্জের সুখ-সাচ্ছন্দ্য দিন দিন বাড়তে থাকে।

শান্তিময় অলকাপুর। অবিবাহিতা রাজকুমারী তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রূপে-গুণে অতুলনীয়া কুসুমকুমারী—এঁকে নিয়েই এই নাটকের সৃষ্টি। অলকাপুরের ঠিক্‌ পার্শ্ববর্ত্তী রাজত্ব হচ্ছে বীরনগর। এই বীরনগরের রাজা বিজয় মল্লের সহিত অলকাপুরের রাজা সুশান্ত দেবের ছিল ছুরি-কাটারী সম্বন্ধ। সুশান্ত দেব জীবিত থাক্‌তে বিজয় মল্ল কোনও সুবিধা করে উঠ্‌তে পারেন নি। এইবার অভিভাবকহীনা কুসুমকুমারীকে সিংহাসনের অধিকারিণী পেয়ে তাঁর হলো সুবর্ণ সুযোগ। তিনি তাঁর দ্বাবিংশ-বর্ষীয় পুত্র স্বপনকুমারকে পাঠালেন অলকাপুর জয় করতে। বিরাট এক বাহিনী নিয়ে স্বপনকুমার অলকা-পুরের উদ্দেশে সুরু করলেন তাঁর অভিযানের জয়যাত্রা।

স্বপনকুমার সুঠাম সুন্দর বীর পুরুষ। অশেষ গুণে ভূষিত রাজার তনয়। অলকাপুর পৌছে রাজকুমার দূত পাঠালেন কুসুমকুমারীর কাছে। দূত গেল। 'যুদ্ধং দেহী'—অথবা বশ্যতা স্বীকার। কুসুমকুমারী কোনোটাই করলেন না। তিনি বীরনগরের রাজকুমার স্বপনকুমারের বিষয় অনেক কথাই শুনেছিলেন এবং কুমারীসুলভ দুর্ব্বল অন্তরে মনে মনে তাকেই পতিত্বে করেছিলেন বরণ। সুতরাং দূতকে তিনি বলে পাঠালেন—"তোমাদের রাজকুমারকে গিয়ে বলো—যে রাজ্য তিনি দখল করতে এসেছেন, সেখানকার রাণী তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেছেন—রাজায় রাজায় বিবাদ—সুতরাং বোঝাপড়া হবে তাদের মাঝে। অনর্থক কতকগুলো বাজে লোকের প্রাণ যাবে কেন।"

দূত গিয়ে সংবাদ দিল। রাজকুমার পড়্‌লেন মুস্কিলে—স্ত্রীলোকের সাথে তিনি পুরুষ হয়ে যুদ্ধ করবেন কি প্রকারে? তবুও নাচার। কাপুরুষতা প্রকাশ পায়—যদি আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কাজেই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিতে হলো। স্থান এবং সময় নির্দ্দিষ্ট হলো। দু' দলের প্রতিনিধির মাঝে যার ঘটবে পরাজয়, সেই দলকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হবে বিনা প্রতিবাদে।

কুসুমকুমারী এবং স্বপনকুমার সাম্‌নাসাম্‌নি। উভয়ের হস্তেই উন্মুক্ত অসি। স্বপনকুমার কুসুমকুমারীর রূপে মোহিত। কুসুমকুমারী স্বপনকুমারকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন। মহা সমস্যা।

স্বপনকুমার ভাব্‌লে, কেমন করে ওই কোমল তনুতে অস্ত্রাঘাত করবেন। কুসুমকুমারীও ভাব্‌ছেন, প্রাণ দেব—তাঁর হাতে যদি প্রাণ যায়, তা'তেও শান্তি।

স্বপনকুমার ভাবছেন—না, রাজকুমারীর অস্ত্র কৌশলে

হস্তচ্যুত করে তাকে বন্দিনী করি, তারপর তার চরণের নিকট প্রেমের ডালি সাজিয়ে নতমস্তকে দাঁড়াব। কুসুমকুমারীর মনের ভাব বদ্‌লে গেছে। তিনি ভাব্‌ছেন, না, কিছুতেই নয়, রাজকুমারকে বন্দী করতেই হবে।

সঙ্কেতধ্বনি হ'লো। উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কুসুমকুমারী প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগ্‌লেন। স্বপনকুমারের অসি আর ঘুর্‌ছে না। তিনি শুধু অনিচ্ছাসত্বে প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন। কুসুমকুমারীর গোলাপী গণ্ড বেয়ে মুক্তার ন্যায় শুভ্র স্বেদধারা বেয়ে পড়ছে। বুকের বসন হ'য়ে পড়েছে অবিন্যস্ত। স্বপনকুমার মোহিত, তন্ময়। এই সুযোগে কুসুমকুমারীর অসির আঘাতে স্বপনকুমারের অসি হস্তচ্যুত হলো। কুসুমকুমারী সদর্পে স্বপনকুমারের সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন—"কি রাজকুমার! এবার তুমি আমার বন্দী।"

অলকাপুরের পক্ষ হ'তে বিজয় ভেরী বেজে উঠলো। কুসুমকুমারী ফুলের শিকল দিয়ে স্বপনকুমারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাজপ্রাসাদে এসে উঠলেন। সেখানে বাহুর মালা জড়িয়ে স্বপনকুমারকে টেনে নিলেন নিজের মাঝে।

এদিকে বীরনগরের সৈন্য-সামন্ত সব ফিরে এলো রাজকুমার কিন্তু ফিরলেন না। তিনি কুসুমকুমারীর প্রেমে রইলেন বিভোর।

রাজা বিজয় মল্ল রেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! কর্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন কামুক পুত্রের শাস্তি বিধানের জন্য তিনি তখনি 'সাজ সাজ' আজ্ঞা দিলেন। বিজয় মল্ল সসৈন্যে অলকাপুর আক্রমণ করলেন। সে আক্রমণে সাড়া না দিয়ে স্বপনকুমার ও কুসুমকুমারী বর-বধূবেশে এসে রাজার পায়ে লুণ্ঠিত হলেন—কিন্তু তা'তেও রাজার ক্রোধের উপশম হলো না। তিনি কুসুমকুমারীকে মুঠার মাঝে পেয়ে বন্দিনী করলেন। অলকাপুর দখল করলেন। তারপর কুসুমকুমারীকে দিলেন নির্ব্বাসন, আর নিজের পুত্রকে করলেন কারারুদ্ধ—এমনিই তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি। সেই কারাগারেই কুসুমকুমারী কুসুমকুমারী করতে করতে রাজকুমার গেলেন পাগল হ'য়ে। এই হলো নাটকের আখ্যানবস্তু।

কাছারী ঘরে সাজগোজ চলেছে গোপালপুরের জীবন ঠাকুর করবে স্বপনকুমারের পার্ট। তার মত আর কাউকেই না কি এ মহকুমার মাঝে রাজকুমারে 'পার্টে' মানায় না। এমনিই চেহারা। এই জন্যেই ত সুরেন দাস ওকে এত ভালবাসে, এত সাধ্য-সাধনা করে, পাছে ও দল ছেড়ে অন্যদলে না চলে যায়। প্রত্যেক দলই ত ওকে টান্‌ছে। দু' টাকা বেশী দিতে হয় তাও স্বীকার, তবুও সুরেন দাস ওকে অন্য দলে যেতে দেবে না। যত জায়গায় সুরেন দাস বাহবা পেয়েছে, সে ত ওর জোরেই।

জীবন ঠাকুরের বয়স বাইশ-তেইশ বছর। উজ্জল গৌরবর্ণ গায়ের রঙ তার, মাংসাল নিটোল বাহু। স্ফীত বক্ষ। উচ্চতা মানানসই। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত বাবরী ছাঁটের চুল। বাঁশীর মত নাসিকা। সব থেকে সুন্দর তার চোখ দু'টী, নীলাভ তার তারা। তার চাউনিতে মোহ আছে, সে চোখের দৃষ্টিতে আছে মাদকতা। তার মত ও দলের মাঝে অমন পার্টও কেউ বল্‌তে পারে না।

জীবন ঠাকুরের পোষাক পরা শেষ হ'য়ে গেছে। সে আর্শী সাম্‌নে ধরে একদৃষ্টে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন পাঁচ শ' বছর আগেকার মগধ দেশের কোনও রাজকুমার—পথ ভুলে মজুমদারদের কাছারীতে এসে ঝড়ের রাতে আশ্রয় নিয়েছে।

অতর্কিতে পৃষ্ঠদেশে মৃদু চপেটাঘাত খেয়ে জীবন ঠাকুর মুখ তুলে চাইলো। তাদের দলের কর্ত্তাই এই মৃদু আঘাত-কারী। সুরেন দাস স্মিতমুখে বল্লে—"দেখবো ভায়া, আজ বাহাদুরী দেখ্‌বো, জমীদার-বাড়ী বাজীমাৎ করতে পারলে বুঝবো ক্ষমতা!"

প্রত্যুত্তরে জীবন ঠাকুর শুধু একটু সম্মতির হাসি হাসলো।

এদিকে গোঁফ আঁট্‌তে আঁট্‌তে নীলকণ্ঠ বল্‌লে—"কি গো সুন্দরি, দেখো ত বরটীকে পছন্দ হচ্ছে কি না?"

কথাটা বলা হলো যে কুসুমকুমারীর অভিনয় করবে তাকে উদ্দেশ্য ক'রে। সে তখন তার শাড়ীতে সেফ্‌টী পিন আঁটছিল। নীলকণ্ঠের কথায় তার হলো রাগ। সে

নীলকণ্ঠের আর্শীখানা কেড়ে নিয়ে জীবন ঠাকুরের কোলের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। নীলকণ্ঠ তা'তে না রেগে ঠাট্টার সুরে বল্লে—"ও রে বাবা! এরি মধ্যে এত—পরের জিনিষ কেড়ে নিয়ে আবার নিজের লোকের কাছে দেওয়া হচ্ছে!"

এমনি ছোট আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-তামাসা নিয়েই কাটে এদের দিন। এরা যেন যাযাবর! আজ এখানে, কাল সেখানে। ঘর নেই, বাড়ী নেই অনেকের, তবু এরা বেশ আমোদেই থাকে।

যাত্রা অনেক্ষণ হলো আরম্ভ হয়েছে। আসরের চারিদিকে বিরাজ করছে অসীম নিস্তব্ধতা। রাত প্রায় দুটো। রাজা বিজয় মল্লের আদেশে স্বপনকুমার আর কুসুমকুমারীকে আলাদা আলাদা কারাগারে প্রেরণ করা হচ্ছে। এই দৃশ্য অতি করুণ। সারা নাটকের মাঝে এমন করুণ দৃশ্য আর নেই। জীবন ঠাকুরের অভিনয় হচ্ছে প্রাণস্পর্শী। এ যেন বাস্তব। দর্শকের সাম্‌নে যেন বাস্তবতা বিরাজ কচ্ছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের সত্বা। নীলার অশ্রুর বাঁধ গেছে ভেঙে। সে এককোণে বসে নীরবে শুধু কাঁদছে। তার সেই নয়নের অশ্রু গড়িয়ে গণ্ড বেয়ে এসে বক্ষকে অনেকক্ষণ সিক্ত করে ফেলেছে।

তারপর চোখের সাম্‌নে দিয়ে কত দৃশ্য গেল। নীলার কান্না আর কিছুতেই থাম্‌লো না। বালবিধবার ব্যথিত অন্তর কান্নার প্লাবনে একেবারে তলিয়ে গেল। কুসুমকুমারীর হলো নির্ব্বাসন, আর স্বপনকুমার কুসুমকুমারী, কুসুমকুমারী করে গেল পাগল হয়ে। এইখানে এসে নীলা আর থাক্‌তে পার্‌লো না—কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

যাত্রা ভেঙে গেছে। উদাস মন নিয়ে সকলে বাড়ী ফিরে চলেছে—সঙ্গে নিয়ে নানারকম ব্যথাভরা আলোচনা। রাজকুমার আর কুসুমকুমারীর প্রতি সহানুভূতিতে সকলেরি মন আর্দ্র।

নীলার সে রাতে ঘুম হয় না। সে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ছাদে উঠে যায়। তার গণ্ডে তখনও শুক্‌নো জলের দাগ লেগে থাকে। বসন ও নয়নের কোণ থাকে আর্দ্র হয়ে। দক্ষিণের শীতল বাতাস নীলার ফুর্‌ফুরে কেশগুচ্ছকে দোলা দিয়ে যায়। নীলার মন তখন চলে গেছে সেই কারাগারে। সে নিজের উপস্থিতি, নিজের সত্বা বিস্মিত হয়েছিল। কোঠার দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে বলে, স্বপনকুমার না জানি এতক্ষণে কি কর্‌ছে!.. অশিক্ষিত পল্লীগ্রামের বালবিধবার মাথায় আসে না যে, এটা শুধু নিছক লেখকের কল্পনা।

নীলার ক্ষুধিত অন্তরে কে যেন প্রেমের উৎস জাগিয়ে দেয়। সেই উৎস নীলার অভুক্ত হৃদয়কে কেন্দ্র করে প্রেমের প্লাবনে শুধু উচ্ছ্বসিত হ'তে থাকে।.. সে হৃদয়ে অনুভব করে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ।...তার দেহে জাগে পুলক শিহরণ।...সে জীবনে প্রথম আবিষ্কার করে প্রেম।...অনুভব করে প্রেম কত মধুর, কত সান্ত্বনার।...

স্বপনকুমারের প্রতি তার বেদনাসিক্ত মন আরও সজল হ'য়ে ওঠে। কি যেন এক অজ্ঞাত সহানুভূতিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

রাজা বিজয় মল্লের প্রতি এক জঘন্য বিতৃষ্ণায় নীলার মন বিকৃত হয়ে ওঠে। সে ভাবে—মানুষ এত হীন, এত কঠোর হয় কেন? দু'টী প্রাণের মিলনে বাধা দেওয়ার জন্য মানুষের এত অপরিসীম আগ্রহ, এত উগ্র আনন্দ আসে কোথা হ'তে?

নীলার মনে পড়ে যায়—বিজয় মল্লের সেই অট্টহাসি। সেই তীক্ষ্ণ ছুরীর ফলার মত হাসি—যে হাসি তিনি হেসেছিলেন ওদের দু'জনকে কারাগারে ও নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে। না না—সেই কঠোর বিজয় মল্লের কথা নীলা মনে কর্‌বে না।

সদ্য-বিধবার মুখের মত ফ্যাকাশে পাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিমের কোলে ঢলে পড়ে। নিষ্প্রভ তারাগুলো যেন কোন ব্যথিতের উদাস আঁখি। ধরণীর বুক ফিকে আলো-আঁধারে মেশামিশি হ'য়ে কি যেন এক উদাস বিদায়ের বাঁশী বেজে ওঠে। সেই সুর যেন ঘোষণা করে—ঘনিয়ে এসেছে বিদায়ের লগন।

নীলায় মনের মাঝেও বিদায়ের বাঁশী বেজে ওঠে। কে যেন তার কাণে কাণে বলে—"ও রে,আর ত দেরী নাই!"

নীলা চঞ্চল হয়ে পড়ে। মনে হয়, তার প্রাণের কথা ত এখনও জানান হয় নি—সে যে স্বপনকুমারের দুঃখকে ভালবেসে ফেলেছে গোপনে গোপনে। তার অন্তরে জেগে ওঠে এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—এক দুর্নিবার লোভ।

বালবিধবা সপ্তদশীর মন রঙ্গমঞ্চের নায়কের বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তার অতৃপ্ত কামনার সরোবরে ফুটে ওঠে এক আকাঙ্ক্ষার কমল। একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষা—অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ—যার কথা জগতের কেউ কোনও দিন জান্‌বে না।

নীলা মোহাবিষ্টের মত ছাদ থেকে নেমে আসে। রজনী জাগরণের ক্লান্তি নিয়ে বাড়ীর সকলেই ঘুমে অচেতন। নীলা সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে আসে। খিড়কীর দরজা খুলে আস্তে আস্তে ফুলের বাগানে প্রবেশ করে। ফুলের কুঁড়িগুলো দখিণ সমীরণের পরশ পেয়ে সবেমাত্র চোখ মেলে চাইছে, তাদের আঁখিতে তখনও লেগে আছে ঘুমের আবেশ, অন্তরে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে জন্মগ্রহণ করার আনন্দ। নীলা স্নেহের অর্ঘ্য সাজাবার জন্য ঘটায় তাদের অপমৃত্যু। দেবতার পায়ে ডালি দেবার জন্য অকালে দেয় তাদের বলি। সে একটী একটী করে সদ্যফোটা ফুলগুলিকে চয়ন করতে থাকে। তারপর তার শুভ্র বসনাঞ্চলে সেগুলিকে নিয়ে চাঁপা গাছটীর তলায় এসে বসে। মিশ্রিত ফুলের ভরা বাতাস কিসের যেন নেশা বয়ে আনে। সুরভিতে অন্তর কি যেন এক অপূর্ব্ব নেশায় আবিষ্ট করে তোলে। তার মোহাবিষ্ট দু'টী কোমল হাতের পরশে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একগাছি মালা গড়ে ওঠে। তারপর সেই মালাটিকে বসনাবাসে লুক্কায়িত করে। অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে কপোতের ন্যায় ভীরু হিয়া নিয়ে সে এগিয়ে চলে বহির্বাটীর পানে যেন কোন এক দেবতার অন্বেষণে।

অভিনয় শেষে জীবন ঠাকুর মিলিত কণ্ঠের বাহবা নিয়ে সুরেন দাসের মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত হয়ে কখন যে কাছারীতে ফিরে আসে, তা' সে টের পায় না। তার ব্যথিত অন্তর শুধু কেঁদে কেঁদে ওঠে রাজকুমারীর ব্যথায়। আঁখিতে অশ্রু আসে জমাট বেঁধে। তন্দ্রা আসে সারা দেহ ঘিরে। সে আর থাক্‌তে পারে না। গায়ের পোষাক গায়েই থাকে, তা' আর উন্মোচন করা হয় না। মুখের রঙ মুখেই লেগে থাকে, তা' আর পরিষ্কার করা হয় না। সে 'ড্রেসে'র বড় কাঠের বাক্সটাতে হেলান দিয়ে তেমনি করেই লুটিয়ে পড়ে। সারাদেহ ক্লান্তি আর তন্দ্রাতে আসে এলিয়ে। তার ঘুমন্ত মনের পরদায় কত রঙ্গিন দৃশ্য যাওয়া-আসা করতে থাকে।

ভোরের যাদুকাঠীর স্পর্শে জীবন ঠাকুর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে—সে যেন চলেছে কুসুমকুমারীর দেশ জয় করতে। তারপর? তারপর কত নদ নদী, কত মাঠ পার হ'য়ে, শেষে ক্লান্ত চরণে একদিন এসে পৌছাল কুসুমকুমারীর দেশে। রাজকুমার ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় শুষ্ক; অথচ আর চলবার উপায় নেই। সৈন্য-সামন্তেরা সব পেছিয়ে পড়েছে। রাজকুমার একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়লো।

নীলা কাছারী ঘরের মাঝে এসে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লো। সবাই নিদ্রিত। সবাই এলোমেলোভাবে শুয়ে রয়েছে। সে সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চাইতে লাগ্‌লো। আবছা আঁধারে ঘরখানি ভরা। নীলা ঈষৎ বক্রভাবে কা'কে যেন খুঁজ্‌ছে। তারপর দু'-তিনজনের পাশ কাটিয়ে নীলকণ্ঠকে ডিঙিয়ে তার ঈপ্সিতের কাছে সে এসে দাঁড়াল। সেই ঘুমন্ত মুখখানির উপর আধ-অন্ধকারে নজর পড়্‌তেই নীলার মনে জেগে উঠ্‌লো অপরিসীম মমতা, নিষ্কলুষ—নীতি। সে মৌন, স্তব্ধ।

রাজকুমার তখন গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল, তা' সে জানে না। হঠাৎ কার শীতল স্পর্শে রাজকুমারের ঘুম ভেঙে গেল—রাজকুমার চোখ মেলে চাইলো। পরমাসুন্দরী—বাঃ, অমন সুন্দরী কি পৃথিবীতে হয়! চেয়ে দেখ্‌লো পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যা তার গলায় মাল্যদান করছে অতি সন্তর্পণে। রাজকুমারের সাথে দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই, ব্রীড়াবনতা রাজকুমারী সলজ্জ আঁখি দু'টীকে নত করলো। রাজকুমার মোহিত। সে শুধু কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—"কে তুমি কুমারী, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে মাল্যদান করলে?"

রাজকুমারী স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—"আমি কুসুমকুমারী। শুন্‌লাম তুমি না কি রাজকুমার, আমাকে জয় করতে এসেছো?"

রাজকুমার শুধু একটু হেসে বল্লে—"আমি ত তোমাকে জয় করেছি রাজকুমারী।"

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে কার যেন শীতল করস্পর্শে জীবন ঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। বিস্মিত জীবন ঠাকুর ঘুম-বিজড়িত চোখে নীলার দিকে অবাক্ হ'য়ে চাইলো। আর আপনা হতেই সেই সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—"কে তুমি?"

ভীতা নীলা লজ্জায় একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌লো। তার রসনা তখন রুদ্ধ। তার মোহ, তার নেশা তখন ছুটে গেছে—সে ফিরে এসেছে বাস্তবে। লোকনিন্দার ভয় তখন তার মনকে জয় করে ফেলেছে। সে চকিতে একটীও কথা না বলে নীলকণ্ঠকে মাড়িয়ে দ্রুতপদে বাড়ীর মাঝে এসে হাঁপাতে লাগ্‌লো।

জীবন ঠাকুর ভাবলে স্বপ্ন। তারপর নিজের বুকের দিকে নজর পড়তেই সে আরও বিস্মিত। না, এত স্বপ্ন নয়। এই ত একছড়া তাজা সদ্য গাঁথা মালা দুল্‌ছে তার বুকের ওপর! তা' হ'লে? তা' হ'লে—সত্যই কি কুসুমকুমারী এতদিনে তার ব্যথা বুঝেছে? সত্যই কি কুসুমকুমারী এসেছিলো?

জীবন ঠাকুর কি কুসুমকুমারীকে পেয়ে হারাবে? না, কিছুতেই নয়। জীবন ঠাকুর তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল। কাছারী-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। মন তার কেঁদে বলে উঠ্‌লো—"কোথায় গেল আমার কুসুমকুমারী!"

জীবন ঠাকুর উন্মাদের ন্যায় ছুটে চলেছে কুসুমকুমারীর অন্বেষণে। বক্ষে তার তখনও দুল্‌ছে সেই সদ্যফোটা ফুলের মালা।

বাইরে তখন বিদায়ের লগন। রজনী ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। চারিদিকে শুধু বিদায়, বিদায়। সারা পৃথিবীতে তখন চলেছে একটা বিরাট বিদায়ের পালা। জীবন ঠাকুরের বক্ষে তখন চলেছে একটা বিদায়মাখা হারাণো হাহাকার। সে শুধু ছুটে চলেছে—দূর হ'তে দূরে কোন এক হারাণো রাজকুমারীর অন্বেষণে।

সকালবেলা সুরেন দাসের পার্টি জীবন ঠাকুরকে না পেয়ে প্রথমে ভাব্‌লে হয় ত কোথায় গেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়তে লাগ্‌লো, কিন্তু জীবন ঠাকুর আর ফিরলো না। তারপর কত বেলা, কত দিন, কত মাস কেটে গেছে, জীবন ঠাকুরের খোঁজ কেউ পায় নি।

প্রায় তিন চার বছর পরে ধূসর গোধূলী তখন ছড়িয়ে পড়েছিল নীলিমার বুকে বুকে। পথিক চলেছে—দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারিত তার পথ রেখা। পরণে তার চুম্‌কী দেওয়া ভেল্‌ভেটের যাত্রাদলের রাজকুমারের পোষাক। ধূলি-মলিন হয়ে এসেছে সেই চক্‌চকে ভেল্‌ভেট। অনেক জায়গায় সেলাই গিয়েছে খুলে। বেশীর ভাগ চুম্‌কীই খসে পড়েছে। কণ্ঠে রয়েছে তার একগাছি শুক্‌না মালা। পথিক চলে—প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে মাঠের আল বেয়ে বেয়ে।

ওদিকে চিলে কোঠার পাশে বসে বালবিধবা যুবতী অসীমের পানে উদাস দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে। সীমাহীন দেশের পরপারে তার ব্যথা-বিজড়িত অন্তর কা'কে যেন খুঁজে ফেরে। তার চোখের কোণে কালিমা। কেশপাশ অবহেলিত, অবিন্যস্ত। সমুদ্রের মত গভীর ভাবনা তার মনের গায়ে আছ্‌ড়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। নয়নে জমে ওঠে দু' ফোঁটা ব্যথার অশ্রু।

পথিক চলে—ধূসর গোধূলী লগনের বুক চিরে। গৃহ পানে গম্যমান দু'-একটী গ্রাম্য চাষীকে দেখে সে থম্‌কে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ গো, তোমরা আমার কুসুমকুমারীকে দেখেছো এই পথে যেতে?"

তারা 'হাঁ', করে এই পাগ্‌লা পথিকের দিকে চেয়ে থাকে। উত্তর না পেয়ে পথিক আবার চল্‌তে থাকে—সাম্‌নে তার অনেক পথ। চক্ষে তার খোঁজার নেশা, বক্ষে জলে মালার ব্যথা।

নবী মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

ধ্রুবজ্যোতি

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘণ্টা দুই পরে নিশীথ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রমণী ষ্টোভ জ্বালিয়া খাবার প্রস্তুত করিতেছে, আর মণীশ তাহার পার্শ্বে বসিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছে—অধিকাংশই নিশীথের পূর্ব্ব ইতিহাস। ভিতরে ঢুকিয়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়াই নিশীথ বিরক্তিমাখা-কণ্ঠে বলিল, "খুব লোক যা' হোক্ তুই মণীশ! রোগীর সেবা বুঝি এমনি করেই করতে হয়?"

মণীশের প্রাণে তখন ভরা গাঙের ঢেউ টলটল করিতেছে। সে কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া বলিল, "অমলা দি'র সাধ গিয়েছে, আমাদের মত গুটিকতক ব্রাহ্মণকে নিজে হাতে পরিতুষ্ট করতে; বাধা দিয়ে পাপ সঞ্চয় কি করে করি দাদা, তুমিই বলো?"

"কিন্তু মানুষটা যে এখন জোর পায় নি, এ কথাও ত ভাবা উচিত?"

"তার চেয়ে ওঁর ভাবনা কিসে জান দাদা, আমরা ওঁর হাতে খেয়ে ওঁকে ধন্য করতে পারব কি না তাই জানতে। আমি ত নির্ব্বিকারে হুকুম দিয়ে দিয়েছি। এখন তোমারটা তুমিই বলো।"

উদাস-কণ্ঠে নিশীথনাথ উত্তর দিল, "না, এ অবেলায় ও সব আমি আর কিছু খাব না।"

কাতর-কণ্ঠে অমলা বলিয়া উঠিল, "কিছু ফলটল ছাড়িয়ে দিলেও কি—"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "না, তার জন্যে নয়। আপনাকে এখুনি রওনা হ'তে হবে, ওরা সব যাওয়ার যোগাড় করছে।"

"আমি ত ওদের সঙ্গে যাব না।"

"তা' হ'তে পারে না। এসেছেন যখন ওদের সঙ্গে, যাওয়াটা ওদেরই সঙ্গে উচিত।"

মণীশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর আধেক পথে জোর গলা টিপুনি খেয়ে প্রাণটা সাগর-পথেই রেখে যাওয়া উচিত, সেটাও বলো দাদা।"

"সে ভয় নেই, জাহাজ পুলিশের হেপাজতে থাক্‌বে, তবে নেহাত যদি উনি—"

"না, আমি যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, আমার আজকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি বল্‌তে পারেন?"

"পাপ ব'লে কি মনে হয়?"

"হয়।"

"তা' হ'লে আমায় জিজ্ঞাসা না ক'রে নিজের মনের কাছে করুন; জবাব সেইখান থেকেই বেরিয়ে আস্‌বে "

পাঁচ

"বৌদি', বৌদি'!"

"কি বল্‌ছ ঠাকুরপো?"

"দাদা কোথায়?"

"আস্‌ছেন, একবার দোকানে গেছেন।"

"না, নিশীথ দা'কে একটা রীতিমত চাকর তৈরী না ক'রে তুমি ছাড়লে না বৌদি'!"

মাধবী সহজ পরিহাস উক্তির সহিত বলিল, "ঠেকে শিখে নাও ঠাকুরপো, নিজেরটির রাশ এমনি কড়া হাতে টেনে ধরবে, যা'তে মাথা তোলাটাই তার দায় হ'য়ে পড়বে।"

"সে যাক্। কিন্তু সত্যি করে বলো ত, দাদাকে এমনি সব ছোট কাজে আট্‌কে রেখে তোমার কি সুখ হয়?"

"হয়। সাক্ষী তার, নিজেকেও আমি বাদ দিই নি; বাঁদীকে বাঁদী, রাঁধুনীকে রাঁধুনী।"

"আচ্ছা অনর্থক এ হীনতায় লাভ?"

"লাভ আছে বই কি ঠাকুরপো। বিয়ে যখন করবে, তখন বুঝ্‌বে। নিজেদের গড়ে তোলা সংসারের চারটী হাত দিয়ে যতটুকু সুখ, যত তৃপ্তি তোমরা পেতে পার, পরের ধার করা সেবা-যত্নের মধ্যে দিয়ে তার শতাংশের এক অংশও পাবে কি না সন্দেহ।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু লোকে কি বল্‌বে তা' জান, ও সব বাজে ভুয়ো, কৃপণতার দোকানদারীতে তুমি নিজেকে বিকিয়ে বসেছ।"

মাধবী ফুল্লমুখে জবাব দিল, "বলে যদি ভাই, তাতেই বা কি করছি বলো; কিন্তু তারও ত একটা সার্থকতা আছে। হাত-পায় যে কাজ করে তোলা যায়, আলস্যের খাতিরে সেইটে পরের হাতে ছেড়ে দেওয়াকে তোমরা কি বল্‌বে জানি না, আমি কিন্তু তার নাম দি' অপব্যবহার। যাক্। দাদার খোঁজ এ অসময়ে কেন বলো ত—সম্বন্ধ কোথাও জুটেছে না কি?"

"কি যে বলো বৌদি'! হ্যাঁ, এসেছি দাদার ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছে নালিশ পেশ করতে।"

"কি নালিশ?"

"এবার সাগরে গিয়ে সাগর-ছ্যাঁচা এক ধনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বৌদি'।"

সোৎসুকে মাধবী বলিল, "তাড়াতাড়ি গলায় ঝুলিয়ে ফেলো ঠকুরপো—দেরীতে খোয়া যেতে পারে।"

"জিবটাকে কিছু ঢেকে ঢুকে কথা কয়ো বৌদি', সে আমার দিদি হয়।"

"তার আগে আর কোন কথা যোগ করনি ত ভাই?"

"কি রকম?"

"এই যেমন বৌদি'-টৌদি'।"

ঠিক্ সেই সময়ে নিশীথ বাজার হাতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে মণীশ?"

"একটা শিকার জুটেছে দাদা—যক্ষারোগী বুড়ো হেম ঠাকুর আজ সকালে মরেছে। প্রায়শ্চিত্ত না হওয়ার অজুহাতে তার যত আত্মীয়-বন্ধু পেছিয়ে দাঁড়িয়েছে। লাশের গতি এখন আমাদেরই করতে হবে।"

কৌতুকভরা হাসির ছটায় স্থানটীকে ভরাইয়া তুলিয়া মাধবী বলিল, "কাজেই এমন নিকড়ের মুর্দ্দোফরাস আর কোথায়ই বা আছে!"

দৃঢ়তাভরা-কণ্ঠে নিশীথ কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মাধবী স্বামীর এ ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হেম ঠাকুরের ছেলে, সেও কি সরে দাঁড়িয়েছে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে মণীশ বলিল, "তার কথা আর মুখে এনো না বৌদি'! বাপের শেষ অবস্থাটা ক্রমশঃই এগিয়ে

আসছে দেখে, কোমর থেকে চাবীর গোছা খুলে নিয়ে সেই যে সরেছে, এখন পর্য্যন্ত তার কোন খোঁজই নেই।"

মাধবী উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি হ'লে জবাব কি দিতুম জান ঠাকুরপো, যেখানকার লাশ সেইখানেই থাক্, দলের কেউ যেতে পারবে না।"

"কিন্তু বৌদি—"

"এর ভেতর ত একটুও কিন্তু নেই ভাই। তারা তোমাদের নরম দয়াল প্রাণগুলিকে যেন পেয়ে বসেছে। এতে শুধুই যে তোমরা দয়ার অপব্যবহার ক'রছ, তা' নয়, লোকগুলোকে কর্ত্তব্যের পথভ্রষ্ট হবার সাহায্য করছ।"

মণীশ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তা' যা' বলেছ বৌদি'। সেদিন ঘোষেদের তিনকড়ে মলো। অত বড় লোক ত, বাড়ীর কেউ কিন্তু সে রাত্রে বেরুল না। আমাদের লেলিয়ে দিয়ে খালাস। বাড়ীর সরকার, গতিক দেখে সেও ভাগ্‌তে চায়। আমায় এসে বল্লে, 'তা' বাবু, আপনারা যখন আছেন, তখন আমি আর গিয়ে কি করব?' এতেই বুঝ্‌ছ, পাড়ায় যে মড়িপোড়া নাম রটেছে, তারও একটা কারণ আছে। বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলবার মত কোন কিছুই নেই।"

মাধবী বলিল, "তা' তিনকড়ের সঙ্গে ওদের রক্তের সম্পর্ক তেমন কিছুত ছিল না, কাজেই না যাওয়ার জন্যে তত বেশী দোষী করতে পারি না।"

মণীশ স্বরটা কিছু রুক্ষতায় ভরাইয়া তুলিয়া বলিল, "যত সম্পর্ক কি আমাদের সঙ্গেই ছিল বৌদিদি! আরও শোনো, ও পাড়ার মাণিকচাটুর্য্যের গতি করতে যখন যাই, তার নিজের মায়ের পেটের ভাই বল্‌লে কি জানো, কি করব ভাই, আমার যে ছোঁবার উপায় নেই; নইলে দাদার গতি করতে কি বাইরের লোক ডাকি?' দেখ্‌ছ আস্পর্দ্ধা! নিজে ত করবেই না, এদিকে কেঁড়েলীটুকুও ছাড়বে না।"

নিশীথ এতক্ষণ সহিষ্ণুভাবে উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার কিছু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "কাজ করতে গেলে কেবল বিচার নিয়েই যদি থাকিস্ মণীশ, ফলে বিচারই পাবি, কাজ এতটুকুও এগুবে না। নদীতে বান যখন ডাকে, তখন দুকূল ছাপিয়ে সে ছুটে যায়—এটা কাঁটাবন, এটা চন্দনবন এ বিচার কোনোদিনও সে করে না। পরের উপকার করবি ভেবে যদি নেমে থাকিস্, নির্ব্বিকারে এগিয়ে যেতে হবে। পরের সঙ্গে তুলনা করেই যদি চলবি, এ ত্যাগের খাতার নাম তা'হলে কাটিয়ে দে।"

মুখখানা ভ্যাবাচ্যাকা করিয়া মণীশ বলিল, "তা' নয় দাদা, পরের ব্যাপার দেখে প্রাণে কেমন লাগে।"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তবু বোকামীর চরম দৃষ্টান্তে তোমাকে পৌঁছাতেই হবে—এই হচ্ছে তোমার দাদার মত।"

নিশীথ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "মরণ যাকে আদর করে কোলে নিয়েছে মাধবী, সবার সঙ্গে আমরাও যদি তাকে ফেলি, সে ফেলা তা'কে হবে কি মনে কর? না, তা নয়, জীবিতের সঙ্গে আড়াআড়ি করতে গিয়ে নিজেরাই আমরা ছোট হ'য়ে যাব।"

মাধবীর চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। মণীশ উদ্‌ভ্রান্তের মত নিশীথের পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "ক্ষমা কর দাদা, ক্ষমা কর! আমার এ ক্ষণিক ভ্রমটা যে কত বড়, এবার তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।'

নিশীথ তাড়াতাড়ি তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "পাগল কোথাকার! এ মোহ কার না আসে—সত্যিই ত, পরকে তাদের নিজের কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেল্‌তে দেখ্‌লে মনটা কার না জলে ওঠে।"

মনীষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলিল, "ও কথা আর তুলো না দাদা, এখুনি আবার হয় ত সব গুলিয়ে ফেলব। তা হ'লে হেম ঠাকুরের জন্যে জনাচারেককে পাঠিয়ে দিই গে?"

"দাঁড়া, আমিও যাব। আজ রবিবার ছুটী আছে।"

মাধবী রাগিয়া বলিল, "উনুনে কি তা' হ'লে জল ঢেলে দেবো?"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "তার দরকার হবে না—এ ঘণ্টা তিনেকের মকর্দ্দমা বই ত নয়। বাড়ীতে দুটো বন্ধু-বান্ধব জুটলেও এ রকম পেকেট পাওয়া যেত না। তুমি যত্ন

ক'রে রাঁধ। দেখো, গরম থাকতে থাকতেই আমি এসে খেয়ে নেব।"

উভয়ে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলে মণীশ বলিল, "কাল অমলা দি' তোমার খোঁজ নিচ্ছিলো নিশীথ দা?"

হঠাৎ সর্পাহতের ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিশীথ বলিয়া উঠিল, "আমাদের কোনো ভাই বাইরের কোনো স্ত্রীলোকের মায়ায় এমন করে জড়িয়ে যায়, এটা আমার মোটেই প্রার্থনীয় নয় মণীশ, অনেক আগেই তোমার এটা বোঝা উচিত ছিল।"

মণীশ মুখখানা কাচুমাচু করিয়া বলিল, "আমার এতে মোটেই হাত ছিল না নিশীথ দা। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না—পথ দিয়ে আসতে আসতে আমায় দেখতে পেয়ে তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না—কেলেঙ্কারীর ভয়ে আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল।"

"আর সেটা এবার থেকে বরাবর সেই বাধ্য হয়েই বোধ হয় হবে?"

"না দাদা, তোমার খোঁজ পাওয়া তার একপ্রকার জপমালা হ'য়ে উঠেছে; তাই মাথার দিব্য দিয়ে তিনি এই একবারের জন্যে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার গা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—"

"তা' করো না; কারণ, আমি জানি তুমি তা' রাখতে পারবে না।"

ছয়

ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া এবং তাহার উপর চাবিবাঁধা আঁচলটা স্বামীর সম্মুখে শ্লীলতার পরিচায়করূপে আবরণস্বরূপ রাখিয়া মাধবী পাণ সাজিতে বসিয়াছিল। আহারান্তে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত নিশীথ সেই ফাঁকে মোজাটা পায়ে দিবার চেষ্টায় রত ছিল। ঠিক সেই সময় মণীশ ভিতরে আসিয়া বলিল, "আমি আসতে পারি বৌদিদি, দাদা আছেন?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "খুব, খুব, তোমাদের এ তৈরী সভ্যতার জ্বালায় গেলুম ভাই।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ উত্তর দিল, "কেনরে মণীশ?"

অনেক সময়ে এমন হয় যাহার সহিত দেখা করিতে চলিয়াছি, অন্তর তাহারই ঠিক সম্মুখ হইতে পলাইয়া থাকিতে চায়। কাজেই কর্ত্তব্যের খাতিরে অগ্রসর হইলেও মনে মনে সে কল্পনা করে, এতক্ষণে নিশ্চয় সে বাহির হইয়া গিয়াছে, দেখা হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ প্রায় একত্র আসিয়া তাহার অন্তরটাকে ছাইয়া ফেলে। কিন্তু তাহাতে দুঃখের অপেক্ষা তৃপ্তির নিশ্বাসই বোধ হয় অধিক করিয়া ঝরিয়া পড়ে।

মণীশ ঠিক সেই দোটানার মাঝে পা বাড়াইয়াই আজ আসিয়াছিল। আশা কাণের কাণে কেবলই শুনাইতেছিল, এতক্ষণে নিশীথ দা' নিশ্চয়ই কাজের পথে পা বাড়াইয়াছে, তুই চল্। কার্য্যতঃ, কিন্তু ফল উল্টা ফলায় প্রাণের ভিতরটা তাহার কেমন দুরদুর করিয়া উঠিল। তাই অসীম সাহসে নিজের গোপন ব্যথা লুকাইতে সে একেবারে আরম্ভ করিয়া দিল, "কাল আবার ওখানে যেতে হয়েছিল নিশীথ দা', আসতে অনেকটা রাত হয়ে গেল—"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশীথ বলিল, "তুইও ত বেরুচ্ছিস, চল্ না একসঙ্গেই যাই। দাও ত গা, চট করে গোটা কতক পাণ।"

না-ফেলার মত করিয়া পা ফেলিয়া মণীশ তাহার সঙ্গে চলিল। দু'-চার পা অগ্রসর হইয়া নিজেকে কথঞ্চিৎ সম্বিত করিয়া লইয়া সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এই চিঠিখানা সে তোমায় দিয়েছে নিশীথ দা', নাও। আমি আবার একটু ঘুরে যাব।"

"আচ্ছা দে" বলিয়া নিশীথ হাত বাড়াইয়া সেখানা পকেটে পুরিল। আরও দু'-চার কদম চলিয়া তাহারা যখন প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া পড়িল, অতুল সাহসে বুক বাঁধিয়া মণীশ তখন মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল, "না, চলো, তোমার সঙ্গেই যাই।"

"কাজ কি। যদি তোর কোন কাজ থাকে, সেরেই আয়।"

স্বর বড় বেশী মাত্রায় স্নেহার্দ্র, যেন প্রাণের নিরসতা গোপন করিবার ইচ্ছাতেই তাহা সিক্ত করিয়া তোলা

হইয়াছে। স্বরে বড় আঘাত প্রাণে বাজিল; কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করিবার মত কোনো কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া মণীশ জোরকরা হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি ভেবে ছিলুম নিশীথ দা', তুমি কত না জানি বক্‌বে।"

বাধা দিয়া নিশীথ বলিল, "ও কথা আর তুলে কাজ নেই ভাই।"

"কেন দাদা?"

"পিছল্ পথে ছেলেরা যখন পা দেয়, তখন ঠিক্ তারা এমনি করেই নেমে যায়; বাধা দিয়ে জেদ বাড়ান ছাড়া আর কিছুই ফল পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু দাদা, অন্তরে আমার এতটুকু কালির আঁচড়ও নেই।"

"ভাল। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস্, যেখানে লজ্জা, যেখানে সঙ্কোচ, পাপ সেইখানেই মাথা তুলেছে।"

বাধা দিতে চাহিয়া মণীশ বলিল, "তুমি জানো না দাদা, কেবল একটু উপকার করার লোভেই—"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "কলুষ যখন এগিয়ে আসে ভাই, তখন অনেকেই অমন সৎ-প্রবৃত্তির মুখোস পরেই সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। কেউ বা চায় পরের দায় উদ্ধার করতে, কেউ বা চায় বিপন্নকে রক্ষা করতে—সে সবগুলোই কিন্তু মৌখিক; সত্যের ভিত্তিতে গোড়াপত্তন হয় না বলে সে ভাব দু'দিনেই লুকিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছেই সে ধরা পড়ে; কারণ, ভেতরকার মানুষটি তখন লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে।"

একখানা বাস নিকটে আসিয়া পড়ায় নিশীথ কথা ছাড়িয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িল। ইহার পরও নিশীথ দা'র অনুগমন করিয়া নিজের দোষ কি কথায় স্খালন করিয়া লইতে পারা যায় ঠিক্ ঠিক্ ধরিয়া উঠিতে না পারিয়া মণীশ 'হাঁ' করিয়া শুধু চাহিয়াই রহিল।

বৈকালে হাতমুখ ধুইয়া নিশীথ জল খাইতে বসিয়াছে। মণীশ নিকটে আসিয়া বলিল, "আমি দিনকতক পশ্চিমে যাচ্ছি দাদা।"

মাধবী চঞ্চল হইয়া বলিল, "সে কি! এমন অসময়ে?"

মণীশের মুখটা কেমন শাদা হইয়া গেল। নিশীথের দিকে বিকল-বিপন্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া সে প্রায় হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। নিশীথ গম্ভীর-মুখে উত্তর দিল, "না যাক্। এত খাটাখাটুনীর পর একটু বিশ্রাম ওর দরকার হয়ে পড়েছে।"

মাধবী রাগতস্বরে বলিল, "বিদেশ-বিভুঁয়ে বিশ্রাম কখন হয় বুঝি। সেবার তীর্থে গিয়ে কি নাকালটা হ'য়ে এসেছ, মনে নেই? তোমরা যতই বলো, বাড়ীতে আমাদের হাতের সেবার মধ্যে দিয়ে যেটুকু শান্তি তোমরা পেতে পার, ইন্দ্রের অমরাবতী হাতে এলেও তার শতাংশের এক অংশও পাবে কি না সন্দেহ।"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "কি জানো, ভাল জিনিষও কিছু রয়ে-বসে খাওয়া ভাল। উপরিপাওনার দিক্‌টাও ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছে; তাতে একটু নড়ে-চড়ে যদি না বসে, বেচারীর চাই কি গর-হজম ঘট্‌তে পারে।"

মাধবী আরও অধিক ক্রুদ্ধা হইয়া মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিল, "জানি না, তাই বটে! দেখে-শুনে কোথায় একটী বিবাহ দিয়ে গুছিয়ে সংসারী করে দেবে, তা' না দিন-রাত যেন ভূতের মত টো টো আর টো টো! না ঠাকুরপো, ওর কথা তুমি শুনো না। যাচ্ছি বড় ঠাকুরঝির কাছে—আসছে মাসে তোমার বিয়ে দেওয়াবই দেওয়াব।"

নিশীথ পরিহাস মাখা কণ্ঠে মুখ মুচকাইয়া বলিল, "তবে আর কি, হাইকোর্টের রায় বেরিয়ে গিয়েছে—অতএব মাভৈঃ। কোথায় যাবি ঠিক্ করলি মণীশ?"

"আপাততঃ গিরিডি, তারপর দেখে-শুনে একটা 'স্যানিটোরিয়াম' ঠিক্ করে নেওয়া যাবে।"

"সঙ্গে কে যাবেন?"

'বড় দি'। অসময়ে ছেলেটা যাওয়ার শোক ওঁকে বড় কাতর করে তুলেছে।"

মাধবী এবার সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "আহা তা' নয়! ঠাকুরঝিকে যদি নিয়ে যাও ঠাকুরপো, একটা কাজের মত কাজ করবে, এর ওপর আর মানা চলে না। আহা, কি ছেলেই গেল! তাঁর কাশী-টাশী ঘুরে এলেই হতো; ঘোরার ফল ত পেতেই, মাঝে হতে দেবতা-দর্শনটাই লাভ।"

"তা' হয় না বৌদি,' তীর্থে গিয়ে হৈচৈ খুব খানিকটা হ'তে পারে, লাভ কিছুই থাকে না।"

সমর্থন করিয়া নিশীথ বলিল, "তা' ঠিক! তা' ছাড়া, হিন্দুর মেয়ে দেবতার কাছে গিয়ে পুরোনো শোক ভোলার চেয়ে ঝালিয়ে তোলার দিক্‌টাতেই বড় বেশী ঝুঁকে পড়ে। স্বভাবের মুক্ত-সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে যে দেবতার সন্ধান দিদি পাবেন, মানুষের হাতের গড়া মূর্ত্তির চেয়ে তা' ঢের বড়। শোক ওখানে শুকিয়ে যাবে না বটে, কিন্তু খসে পড়বে। হয় ত দেখো, চির জীবনের জন্যেই অলস নিদ্রায় অভিভূত থাকবে, জানাবার অবকাশ পাবে না।"

মণীশ চঞ্চল-কণ্ঠে বলিল, "চিঠিখানা দেখেছিলে দাদা?"

তাচ্ছিল্যভাবে নিশীথ উত্তর দিল, "না, পকেটেই আছে, দেখব অখন। চল্, ক্লাবে ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি গে।"

দু'-দু'বার চিঠির কথা কাণে যাওয়ায় মাধবীর মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সাতকুলে কে এমন আছে, যাহার মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা স্বামী তাহার নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। একবার ভাবিল, দূর কর ছাই, ওদের পুরুষের কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল, কই, এর আগে ত স্বামী কোনদিন কোন কথা তাহার নিকটে চাপিয়া রাখে নাই—তবে এ আবার কি নূতন ভাব! কত অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের অতি বড় গুপ্ত কথাটিও যখন ব্যক্ত করার মধ্য দিয়া তাহার মনের পাত্রটিকে ভরাইয়া দিতে সে ইতস্ততঃ করে নাই, তখন আজ দেওয়া-নেওয়ার হিসাবে এ লুকোচুরী কেন? কিন্তু এ কথার উত্তর সে ইচ্ছা করিয়াই ভাবিতে পারিল না। ভাবিলে তাহার নির্ম্মল পবিত্র স্বামীর চরিত্রে ক্ষণিক সন্দেহরূপ কালির আঁচড় টানিয়া দেওয়া হয় যে।

কেরোসিন তেলওয়ালা আসিয়া পয়সা চাহিল। অন্য দিন বিনা বিচারেই বাক্স খুলিয়া সে দাম ফেলিয়া দিত। আজ কিন্তু তাহা করিল না; ধীরে ধীরে স্বামীর জামাটী নামাইয়া মনিব্যাগ হইতে একটি সিকি ফেলিয়া দিল। তারপর জামাটী যথাস্থানে রাখিতে গিয়া সে দেখিল, খামের মধ্যে কি যেন একটা রহিয়াছে। একটা দুর্দ্দমনীয় লালসা তাহার অন্তর কাঁপাইয়া বহিয়া গেল। বুঝি এই-খানেই প্রথম মানবের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

একটু বেশী রাত্রে নিশীথ ঘরে ফিরিল। আহারা-দির পর শয্যায় পড়িয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে তাহার মনে পড়িল, মণীশের দেওয়া পত্রখানির কথা। যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মণীশ মাথার দিব্যি দিয়া চলিয়া গিয়াছে, "একবার দেখো দাদা, দেখো, অভাগিনী কি চায় সেটুকু পড়ে দেখ্‌লে এত বেশী তোমার ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। তা' ছাড়া, পরের সেবাব্রত যে ইচ্ছে করে ঘাড়ে নিয়েছে, এত বাঁধনের গণ্ডী দিয়ে নিজেকে ঘেরে রাখা অন্ততঃ তার যে উচিত নয়, একথা আমি খুব বড় গলা করেই বল্‌তে পারি।"

নিশীথ উঠিয়া জামা হাতড়াইল। কিন্তু পত্রখানি যে কোন কারণেই হউক স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল; খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ঠিক্ সেই সময় বাড়া ভাত ফেলিয়া রাখিয়া মাধবী আপন-মনে কি কতকগুলা গজগজ করিয়া বকিল। তারপর আঁচাইবার ভঙ্গীতে দু'-একবার জল লইয়া নাড়া-চাড়া করিল। পরিশেষে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। নিশীথ গায় হাত রাখিয়া প্রশ্ন তুলিলে, দেহের আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনে হাতটিকে সরাইয়া দিয়া ধরা গলায় বলিল, "একটু স্থির হয়ে ঘুমুতে দাও, বড় পেট ব্যথা করছে।"

জীবনে এই প্রথম মিথ্যার আশ্রয়ে উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল—কিন্তু নিজের খেয়াল কেহই ধরিয়া উঠিতে পারিল না।

বুকযোড়া কান্নার বেগ দাঁতে চাপিয়া মাধবী স্বামীর ঠিক্ পাশটীতে পড়িয়াছিল। আকুল মর্ম্ম-যন্ত্রণা তাহার সারা বুকখানিকে দোলাইয়া দোলাইয়া অন্তর বেদনা ছড়াইয়া ফেলিবার অজুহাতে সমস্ত বিশ্বটাকে তাপদগ্ধ করিতে চাহিলেও সে প্রাণপাত সাধনার বলে সংযমকেই বলীয়ান করিয়া তুলিল।

পাশের এই লোকটীকে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব বিলাইয়া সে যে আজ ফকির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে কিসের জন্য? সেই যে প্রাণঢালা ভালবাসা দানে সে এ সংসারটাকে আপন

করিয়া লইতে চাহিয়াছিল, সেটা কি শুধু ওই মধুমাখা মুখখানির বাহিক সৌন্দর্য্যের ফেরে, না আর কিছু। বিকিকিনির মধ্য দিয়া সে কেবল হারাইবেই, আর অন্যে দু'হাতে কুড়াইয়া তুলিয়াও সন্তুষ্ট হইবে না, এই কি বিধি? যদি তাহাই হয়, তবে এ নীতির নিয়ন্তাকে পুরুষ ত? জিজ্ঞাসা করি, নারীকে নারীত্ব দিয়া পুরুষের মানস-যন্ত্রের অধীন করিয়া দিবার মতিভ্রম পোড়া বিধিকে কে দিয়াছিল?

তাহার বুকের সারা নিশ্বাস বেগ সে রোধ করিতে পারিল না। দুর্দ্দমনীয় আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে নিশীথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে?"

"বাইরে।"

কণ্ঠটা কতটা জড়াইয়া গেল, তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নিশীথের তখন ছিল না। কাজেই ইহার পর আর কোন প্রশ্ন তোলা সে আবশ্যক বোধ করিল না। মাধবী ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

একবুক কান্না মুক্ত বাতাসে ছড়াইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিলেও কার্য্যতঃ সে তাহা পারিল না। আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্তূপ বুকে চাপিয়া নীরবে বসিয়া রহিল মাত্র। ঠাণ্ডা বাতাস বুকের সকল শীতলতা দিয়া তাপিতার সেবায় রত হইল।

পরের দিন প্রত্যূষে নিশীথ যখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, মাধবী তখনও ঘুমাইতেছে! একখানি শুভ্র শান্তি মাখা আস্তরণ তাহার সারা দেহে বিস্তারিত। এ সময়ে পত্নীকে সুষুপ্তির কোল হইতে টানিয়া তুলিতে কি জানি কেন তাহার প্রাণ চাহিল না। ধীরে ধীরে সে প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া গেল!

বড় বড় দু'টা ফুলকপি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে নিশীথ বলিল, "ও গো, আজ বাগানের ফুল পাওয়া গেছে। দেখো না কত বড়। নাও, ভাল করে ফুলুরি ভাজ। তোমার জন্যে একটাও ফেলে রাখ্‌ব না, ভয় নেই।"

মাধবীর সারা অঙ্গে একটা অজ্ঞাত শিহরণ বহিয়া গেল। ফুলকপির ফুলুরি সে নিজে ভালবাসে; তবে বাগানের ফসল না হইলে খাইতে চাহে না। স্বামীর তাহা জানা আছে। কিন্তু ঠিক্ সে বুঝিল না নিশীথের আনীত এ উপহার ভালবাসার প্রতিদান, না কৃতকর্ম্মের কথঞ্চিৎ সংশোধন অভিপ্রায়ে উৎকোচ দান। অন্তরের ঝড় আরও অন্তরমুখী করিয়া দিয়া সে সেগুলি হাত পাতিয়া লইল।

দুপুরবেলার প্রচুর অবকাশের মধ্যে সে যখন আর একবার ঘটনাটা আগাগোড়া তলাইয়া বুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে, ঠিক্ সেই সময় বাহির দ্বারের কড়া কে নাড়িল। খড়খড়ীর পাকি তুলিয়া সে প্রথমতঃ লুকাইয়া দেখিয়া লইতে চাহিল, লোকটা কে? তারপর ধীরে ধীরে সার্সীর খিল খুলিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতা নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি চান আপনি?"

দরজা ছাড়িয়া মেয়েটা আধভেজান খড়খড়ির নিকটে আসিয়া বলিল,"এইটে কি নিশীথবাবুর বাড়ী?"

"হ্যাঁ, কোত্থেকে আস্‌ছেন আপনি?"

"বেশী দূর থেকে নয়,—নিশীথবাবু বুঝি বাড়ী নেই?"

"না। কি দরকার আপনার?"

"বল্‌ছি, খিল্‌টাই একবার খুলুন, দেখ্‌ছেন ত আমিও মেয়েমানুষ।"

গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল, "মাপ্ করবেন, দরকার যখন আমার সঙ্গে নয়—"

বাধা দিয়া নারী চঞ্চল-হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ, অতিথ-ভিখিরী এলে এমনি করেই কি দরজায় খিল এঁটে রাখেন? গৃহস্থালীর পক্ষে হয় ত এটা সুন্দর, শোভন, কিন্তু যারা আসে তাদের পক্ষে—"

মাধবী রাগিয়া বলিল, "আপনি আসুন, এ বাড়ীতে ঢোক্‌বার অধিকার আপনি পাবেন না।"

"গৃহস্বামী থাকলে কিন্তু পেতুম।"

"বেশ, তিনি থাক্‌লেই আসবেন।"

"আর রঙ্গরসে কাজ নেই দিদি, দোর খোলো।"

মাধবীর অন্তরটা একবার মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার অপরিচিতা স্বামীর কোনো আত্মীয়া কি

থাকিতে পারেন না? যদি তাহাই হয়। পরক্ষণেই কালিকার পত্রখানা উজ্জ্বল অক্ষরে তাহার মানস নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। দোটানার মাঝে পড়িয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম?"

"বল্‌ছি দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, একবার দোর খোলো। এ পুরুষগুলোর চোখ থেকে একবার লুকিয়ে বাঁচি।"

মাধবী আর পারিল না। সকল সঙ্কোচ দূরে রাখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। রমণী সব পারে, কিন্তু নারী হইয়া নারীর শ্লীলতায় আঘাত সে সহ্য করিতে পারে না। আগন্তুক ভিতরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "ফাঁকী দিয়ে কেমন ভেতরে সেঁধিয়ে নিলুম তা' বলো দিদি। এবার তোমার সঙ্গে গৃহস্থালীর ভাগাভাগি করে নিয়ে তবে অপর কথা।"

এ সরল পরিহাসের উত্তর ঠিক্ সরলভাবেই মাধবী দিতে চাহিল—কিন্তু পারিল না। খানিকটা জোরকরা হাসি মুখে মাখিয়া সে বলিল, "বল্‌ছি না দিদি, তার কারণ নামের ভেতর দিয়ে একচুলও তোমার ধোঁকাটা কাটিয়ে তুল্‌তে পারব না বলে তাই। তোমার সঙ্গে আমার যতটা অচেনা, কর্ত্তাটির সঙ্গে আবার ঠিক্ ততটাই চেনা। এমন কি, একদিন ফাঁকী দিয়ে তাঁর বিছানাটা পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলুম। তিনি আসবেন কখন ভাই—রাত্রে? ততক্ষণ তোমায় জ্বালাতন করব? না থাক্, আবার আসব 'খন। কি মানুষ! তাঁর সঙ্গে কিন্তু আমার দেখা করা চাই-ই! বলো না যেন আমি এসেছিলুম; তা' হ'লে হয় ত লজ্জায় আবার গা ঢাকা দিয়ে বসবেন। বড় গুমোর ছিল মনে—পুরুষজাতটাকে চিনে ফেলেছি; ইনি কিন্তু সে গুমোর ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

মাধবী নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির-দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নবাগতা নবীনা যাইবার জন্য উঠিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া 'থপ্' করিয়া আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, "একটু জল দেবে দিদি?"

গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল, "হ্যাঁ। নিজে হাতে খিল খুলে যখন তোমার গৃহ-প্রবেশ ঘটিয়েছি, তখন শুধু জল কেন, আরও কত কি দিতে হবে?"

বিস্ময় আকুলিত নয়ন তুলিয়া অমলা বলিল, "হ্যাঁ, কি বল্‌ছ দিদি?"

মাধবী তাড়াতাড়ি কথাটা বদলাইয়া লইয়া বলিল, "না কিছু না। ঘরে চাকর নেই ভাই, মিষ্টি খাওয়াতে পারলুম না। ওঁর জন্যে হালুয়া-লুচি তৈরী করে রেখেছি, তাই খানকতক খেয়ে যাও।'

"তা' কি হয় দিদি, পুরুষের—"

"ভয় নেই, আমার একটা অংশ আছে, তা' হাত পেতে নিলে নেহাত আইনে বাধবে না।"

অমলা চলিয়া গেল। মাধবী শূন্য প্রাণে আকাশ-পাতাল চিন্তার শেষ রেখাটিকে হাওয়ার তালে মিশাইয়া দিতে চাহিল—কিন্তু পারিল কি?

নিয়মিত সময়ে নিশীথ ফিরিয়া আসিলে মাধবী তাহার সম্মুখে জলখাবারের থালাটি ধরিয়া বলিল, "আজ একজন খুঁজতে এসেছিল?"

উৎকণ্ঠিত আগ্রহে নিশীথ বলিল, "কে?"

"একটী স্ত্রীলোক। শুনলুম, তার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে। নাম শুন্‌লুম অমলা।"

বিস্ময়-চকিতভাবে নিশীথ হাতের খাবার পাতে ফেলিয়া বলিল, "কে, কে?"

"অমলা—এই কাছেই না কি কোথায় থাকে।"

কণ্ঠটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া গেল। ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশীথ বলিল, "কি বেহায়া? রসো, একবার শাসন দরকার, আমি এখুনি—"

বাধা দিয়া মাধবী বলিল, "তার আগে একখানা গাড়ী নিয়ে এস; শুন্‌লুম, মণ্টুর ব্যামো, আমি দেখ্‌তে যাব।"

"বেশ, আমার ত ওই পথ; চলো না, তোমায় রেখেই যাই। আসবার সময় তখন একসঙ্গেই আসা যাবে।"

সাত

দিদির সহিত তর্কে হারিয়া মণীষ মধুপুরে আসিয়া নামিয়াছে। এখানে আসিবার যথাযথ কারণ চিন্ময়ী

প্রকাশ করিয়া বলেন নাই; অনাবশ্যক বোধে মণীশ জিজ্ঞাসাও করে নাই। সে বুঝিয়াছে, শত উদ্ভট খেয়ালের মধ্যে এটাও একটা তাঁর পাগ্‌লামী।

সুদৃশ্য বাঙলোর সম্মুখে খোলা ময়দানটার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মণীশ নিঃসঙ্গ জীবন পুস্তকের পাতায় পাতায় ঢালিয়া দিয়া তৃপ্তি সুখ অন্বেষণ ও সময় সংক্ষেপ করিতে ব্যস্ত। ঠিক্ সেই সময় একটা প্রকাণ্ড কুকুর লাফে লাফে নিকটে আসিয়া তাহার হাতের বই একপ্রকার জোর করিয়াই কাড়িয়া লইয়া দূরে পলাইল। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে একটা খলখল হাসির রোলে চমকিয়া উঠিয়া সে দেখিল, একটী সাত-আট বৎসরের বালক মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতেছে।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে মণীশ ডাকিল, "এ কুকুরটা তোমার বুঝি খোকা?"

"না, দিদির। 'সুলতান' বড় দুষ্টু, না? কিন্তু আপনি ভুল বুঝেছেন ওকে; ও মোটেই দুষ্টু নয়। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ইচ্ছে হয়েছে কি না, তাই বই কেড়ে নিয়ে আলাপ করছে। ঠিক মানুষের মত স্বভাব ওর। এই দেখুন না, বকে দিচ্ছি। সুলতান, সুলতান, পাজী, ফিরিয়ে দে ওঁর বই।"

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সুলতান ব্যগ্র-কৌতুকে মণীশের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। ইচ্ছাটা, যেন ধরিতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া পলাইবে। বালক প্রভুর ডাকে নিজের ছেলেখেলায় নিরাশ হইয়া সে সুলতানেরই মত গম্ভীর চালে পা ফেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আগাইয়া আসিল। মাঝে মাঝে বালকের দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া যেন বলিতে চাহিল, "এমন করে আমার খেলার আমোদে বাধা দেওয়া তোমার ভাল হলো না কিন্তু বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ!"

হারান বই হাতে পাইয়া মণীশ ধীর ধীরে আমোদ করিয়া দু'একটী মৃদু চপেটাঘাত কুকুরটার পিঠটাতে লাগাইয়া দিল। আনন্দে মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া সম্মুখের দুইটী পায়ের সাহায্যে তাহার ডান পা'খানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সুলতানও ইহার প্রত্যুত্তর দান করিল বুট জুতাটার উপর মৃদু কামড়ে।

বালকটী তাড়াতাড়ি বলিল, "ভয় পাবেন না যেন—ও মোটেই কামড়ায় না। কেবল ও খেলা খেলতে এত ভালবাসে কি আর বল্‌ব।"

বালক সঙ্গীব এ স্বচ্ছন্দ মধুর কেকারবে মুগ্ধ মণীশ অবাক্-দৃষ্টিতে কিয়ৎকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা?"

বালকের চঞ্চল চক্ষু নাচিয়া উঠিল। উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "ও, আপনি জানেন না বুঝি? তা' কি করে জানবেন; আপনারা যে নতুন এসেছেন। আমরা কিন্তু যেদিন এসেছেন, সেইদিনই দেখেছি, না রে সুলতান?"

সুলতান তাহার লাঙ্গুল ও জিহ্বা দু'একবার সঞ্চালন করিয়া কথাটার যথার্থতা মানিয়া লইল। মণীশ উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসুক হইয়া বলিল, "তা' আমরা যেদিন এসেছিলুম তুমি দেখেছিলে বুঝি?"

"বাঃ! শুধু আমি কেন, দিদি, আমি, সুলতান, ভগলু চাকর সবাই দেখেছি। ভগলুটা এমনি বোকা, আপনাকে বলে সাহেব। মা বুঝিয়ে দিলেন বাঙালী, কিছুতে মানবে না। আজ সকালে আপনাকে কাপড় পরে বেরুতে দেখে তার যে ছুটোছুটি! দেখ্‌লে হেসে লুটিয়ে পড়তেন। একলা আর কত হাসব, দিদির আঁচল ধরে টেনে নিয়ে এলুম; সে কিন্তু হাসলে না উল্‌টে ধমক দিলে। আচ্ছা, বলুন ত, এমন বোকামী দেখে না হেসে থাকা যায়?"

কৌতুকভরে মণীশ বলিল, "তা' ত বটেই! এবার থেকে ভগলুর কাণ্ড দেখে তোমার সঙ্গে আমি হাসব'খন—কি বলো?"

বালক সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিটা তাহার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, "যাবেন, বেশী দূর নয়, ওই যে বাড়ী। এই মোড়টা ঘুরলেই ওই যে লাল রঙের বড় বাড়ীটা, যার গায়ে 'নিকুঞ্জ ভিল্লা' লেখা আছে, সেইটে। বেশ হবে—বাড়ীর সবাইকে আশ্চর্য্য

করে দেওয়া যাবে। দিদি বলে আমার কোনো ক্ষমতা নেই; কেবল লোককে বকিয়ে বকিয়ে বিরক্ত করে তুলি। আচ্ছা, বলুন ত, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি নি? এবার তাক্ লাগিয়ে দেব সবাইকে। নন্টু কেবল বকে না, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে জানে।"

কথাটা শেষ করিয়া নিজের গর্ব্বে নন্টু নিজেই মাতিয়া উঠিল। ঠিক্ সেই সময় ভিতর হইতে চিন্ময়ী ডাকিয়া বলিলেন, "খাবার দিয়েছি মণীশ খেয়ে যা'।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "আমার আরও একটী বন্ধু আছে দিদি, তাকেও দাও।"

চঞ্চল পদে বাহিরে আসিতে আসিতে চিন্ময়ী বলিল, "কে কে, দেশের কেউ এসেছে না কি? ও মা কোথা পেলি একে, বেশ ছেলেটি ত! এস খোকা, আমাদের বাড়ী এস।"

নন্টু মণীশের প্রায় গা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ছি, আপনি কি, দেখুন দেখি কি লজ্জায় ফেললেন! এখন ওঁকে কি বলি বলুন ত? উনি কে আপনার?"

"আমার দিদি।"

"দিদি! না না, দিদি নয়। আমার দিদি মোটে এই এত বড়টা হবে, তার বিয়েও হয় নি। তা' হলে উনি আপনার দিদি হবেন কি করে?"

"কিন্তু আমি যে তোমার চেয়ে ঢের বড় নন্টু।"

"ও, তা' বটে! আমি কেমন ভোলা, বন্ধুও পাতিয়েছি কি না, তাই বয়সের কথাটা আর মনেই উঠে নি। আচ্ছা, উনি আপনাকে ধমকান, পড়া না হলে বকেন?"

মণীশ স্বীকার করিলে বালক অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মানিয়া লইল, "তা' হলে দিদিই বটে! তা' হলে আপনি শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নিন; আমাদের বাড়ী যেতে হবে ত?"

মণীশ কৌতূহল-ছলে বলিল, "কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি না খেলে ত আমি যেতে পারব না।"

"কিন্তু তা' ত হয় না; দেখ্‌ছেন, সুলতান সঙ্গে রয়েছে। আমি যেখানে যাব ও হতভাগা ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে যাবে। আপনি ভয় করেন না। কিন্তু যদিও ও কামড়ায় না, উনি কি তা' বুঝ্‌বেন—হয় ত হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবেন—সে বড় বিশ্রী হবে। থাক্। জান্‌লেন, আপনিই খান।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন—খাবারটা বাইবে আনি, সব গোল তা' হলে চুকে যাবে।"

নন্টু চিন্তিত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু কিছু দিলুম না থুলুম না, এমনি খেয়ে ঋণী হয়ে যাব, সেটাও যে একটা কেলেঙ্কারী হবে।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিও, তা' হলেই শোধ-বোধ হয়ে যাবে।"

"তা' বেশ, আসুন তবে। যেতে হবে কিন্তু—ফাঁকী দিয়ে কেবল আমাকে ঠকিয়ে দেবেন, তা' হবে না।"

চিন্ময়ী তন্ময়ভাবে ছেলেটির কথা শুনিতে ছিলেন। এবার পায়ে পায়ে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে একটু আলাপ করবে না খোকা?"

মাথা নাড়া দিয়া নন্টু বলিল, "না, আপনি যে দিদি। দিদিরা কেবল মারে, আর কি করে?"

উৎসুকভরা-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চিন্ময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি কিন্তু মারি না খোকা, ধমকাইও না।"

নন্টু চঞ্চল হইয়া বলিল, "আর এগুবেন না, এগুবেন না সুলতানটা বড় বদ, যদিও অনিষ্ট কিছু করে না, কিন্তু গায়ে লাফিয়ে উঠে আদর বাড়াতে চায়, মা ত' চক্ষে ওকে দেখ্‌তে পারেন না! বাইরেই বেচারী বাধ্য পড়ে থাকে। আমি আর দিদি এই দুজন হলুম ওর সঙ্গী, কি করি বলুন না, হাজার হ'ক্ ওয়ো একটা জীব বটে।"

চিন্ময়ী মানিয়া লইলেন এবং কলে কৌশলে বালককে স্বীকার করাইয়া লইলেন, এবার যে দিন আসিবে সুলতানকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিবে, তা হইলে দু চার দণ্ড এই নূতন পাওয়া দিদিটীর সহিত সে আলাপ করিয়া যাইতে পারিবে। সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতার কারণ হইয়াছিল, এ দিদি মারেনও না ধমকানও না। সবার উপর ঘণ্টা খানেক ধরিয়া বকিয়া গেলেও বিরক্ত না হইয়া বরং তৃপ্তি অনুভব করেন।

জলখাবার ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া তিনজনে মাঠের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চং যুগো
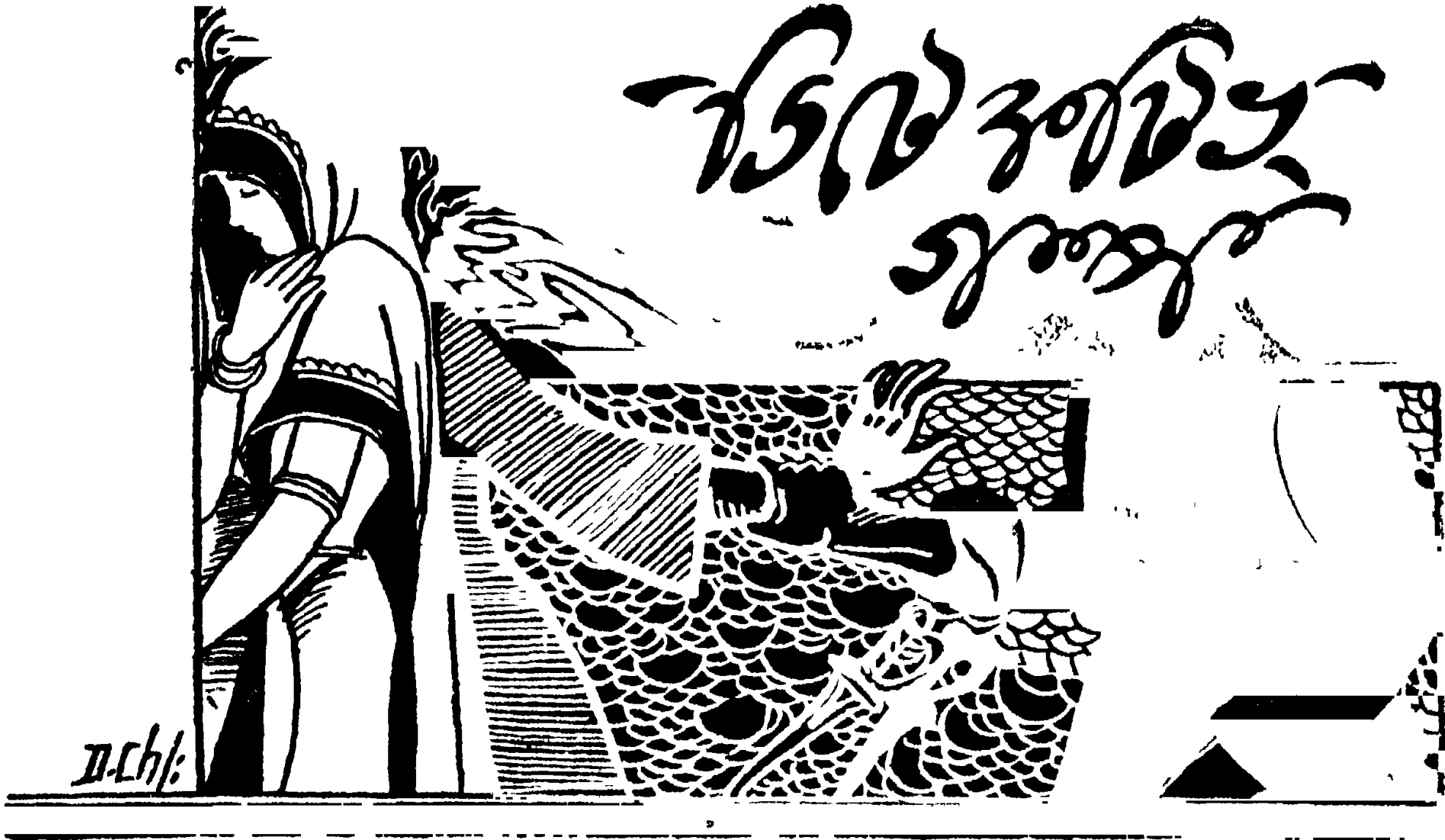
ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, এল্‌-এম্‌-এফ্‌

[তৃতীয় অভিযান]

"গোয়েন্দা জগন্নাথ দাসের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বলেন কি নির্ম্মলবাবু, কখন থেকে নিরুদ্দেশ তিনি?"

লালবাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টার নির্ম্মল সেন বলিলেন, "শুনুন রঞ্জনবাবু, আপনার সাহায্য নেবার জন্যই আপনার বাড়ীতে আমি এসেছি। মিঃ ব্রাউন আপনার মতামত জান্‌তে চান।"

"বেশ, ঘটনাটা বলে যান। আমার শক্তিমত আমি নিশ্চয় সাহায্য করব" বলিয়া রঞ্জন রায় একটা মোটা চুরুট ধরাইলেন।

"কাল একুশ-এ জুন সোমবার ভোর সাড়ে চারটের সময় জগন্নাথবাবু হঠাৎ থানায় এসে আমাকে ও অন্য দু'জন কনেষ্টবলকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন—বুন্দেলখণ্ডের রাজা জগৎ সিংহের বাড়ীতে চুরী হয়েছে, এই সংবাদ তিনি 'টেলিফোনে' জান্‌তে পারেন।"

"কে 'টেলিফোন্‌' করেছিল জানেন কিছু?"

"হ্যাঁ। জগন্নাথবাবু বলোছলেন, জগৎ সিংহের কোনো কর্ম্মচারী, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মোটরও পাঠিয়েছিলেন।"

"আপনারা সেই মোটরেই গিয়েছিলেন? নম্বর ইত্যাদি জানেন?"

"নম্বর চার শ' সাতষট্টি। 'সিঙ্গার কার, সেলুন বডি'।"

"সোফার' ছাড়া গাড়ীতে আর অন্য লোক ছিল?"

"না।"

"কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন?"

"টালিগঞ্জের দিকে একটা বড় বাগান-বাড়ীর কাছে গাড়ী থেমে যায়—ওই বাড়ীর কাছে জনকতক কনষ্টেবল জমা হয়েছিল। আমরা না আসা পর্য্যন্ত ম্যানেজার কাউকে ভেতরে যেতে দেন নি; ফটক বন্ধ ছিল। জগন্নাথবাবুর সংবাদ পাওয়া মাত্র ফটকের ভেতর দিয়ে একজন লোক এসে তাঁকে নিয়ে যায়। আমরা বাইরেই অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম 'সোফারে'র মুখে শুন্‌লাম,

ম্যানেজারবাবু বড় গোয়ান্দাকেই প্রথমে সমস্ত জানাবেন এবং দরকার হলে আমাদের সাহায্য নিতে পারেন।"

"তখন বেলা কত? জল-বৃষ্টি ও অঞ্চলে হয়েছিল কি? রাস্তায় লোকজন ছিল?"

"ভোর তখন সাড়ে পাঁচটা। লোকজন বা জল-বৃষ্টি কিছুই ছিল না; তবে আকাশ মেঘলা থাকায় অন্ধকার ছিল বেশ।"

"বলে যান।"

নির্ম্মলবাবু বলিতে লাগিলেন, "সোফার' বল্লে, 'আপনারা যদি একটু এখানে দাঁড়ান ত আমি গাড়ীতে 'পেট্রোল' ভরে আন্‌তে পারি। তাড়াতাড়ি তখন অতটা দেখি নি; মাত্র এক 'গ্যালন' আছে।' তার কথায় আমরা গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ফটকের কাছে রইলাম।"

"আর সব কনেষ্টবলেরা কোথায় ছিল?"

"আমার সঙ্গে যে দু'জন ছিল, তারা ছাড়া স্থানীয় পুলিশেরা আর দাঁড়াতে চাইলে না। হেড অফিসের লোক আসায় তারা আর সেখানে থাকা দরকার মনে করে নি; কাজেই তাদের দারোগার আদেশ মত তারা কাজ করেছিল।"

"স্থানীয় পুলিশেরা চলে যাবার পর আপনারা কতক্ষণ ছিলেন?"

"ঘণ্টাখানেক আন্দাজ। মিঃ ডিক্রুজ সেখানে এসে পড়ায় আমাদের দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা এখানে যে'?"

"আমি ঘটনাটা মোটামুটি তাঁকে বল্লাম।"

"তিনি হেসে বল্লেন, 'মিঃ সেন, এত বড় একটা ঘটনা আমার এলাকায় হয়ে গেল, আর আমরা কিছু জান্‌লাম না। এ বাড়ীতে কোনকালে কোন রাজা-উজীরকে থাকতে দেখি নি—হয় ভুল করেছেন, না হয় বিপদে পড়েছেন'।"

"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কিন্তু আপনার কনেষ্টবলেরা ত একটু আগেও এখানে ছিল'?"

"বুঝেছি—পোষাক দেখে আপনার ভ্রম হয়েছে। আমার থানায় কোন রিপোর্টই হয় নি—আমি কনেষ্টবল পাঠাব কেন? আমার কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে জগন্নাথবাবু দৌড়ে এলেন কেন জানি না—তবে তিনি নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন। সকালে রোজ একটু বেড়ান অভ্যাস আছে বলে আজ এদিকে এসে আপনাদের অবস্থা জান্‌তে পারলাম। এ বাড়ীটা খালি বাড়ী, বন-জঙ্গলে ভরা, সাম্‌নের দিক্‌টায় একটু বাগান মত আছে মাত্র।"

"বাড়ীটা অনুসন্ধান করে কি দেখ্‌লেন?"

"দেখেছি সব—সাব-ইন্সপেক্টার মিঃ ডিক্রুজ যা' বলেছিলেন, তাই ঠিক্। বাড়ীতে লোকজন ছিল না। পশ্চিম দিক্‌টায় বন-জঙ্গল, গাছ-পালায় ভরা। আর একটা ভাঙা দরজা আছে; সেই দরজার বাইরে ধূলোর ওপর মোটরের দাগ দেখে মনে হলো—আমাদের পূব দরজায় নামিয়ে দিয়ে 'সোফার' অন্যপথে পশ্চিম দরজা দিয়ে জগন্নাথবাবুকে নিয়ে গেছে।"

"আর এ সব জান্‌তে পারলেন প্রায় একঘণ্টা পরে? তারপর আজ বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাঁর কোনো সংবাদ পান নি?"

"না। মিঃ ব্রাউনও বড় চিন্তিত আছেন; তিনিও আপনার কাছে সন্ধ্যার সময় আসবেন আজ।"

'ক্রিং ক্রিং' শব্দে 'টেলিফোন্' বাজিয়া উঠিল। রঞ্জন রায় 'টেলিফোন্' ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আপনি কে, রঞ্জন রায় কি?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি বুন্দেলখণ্ডের রাজা জগৎ সিংহ।"

"রাজা জগৎ সিংহ!"

"হ্যাঁ, তাই; অথবা, মিঃ চং যুগোও বল্‌তে পারেন খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে জান্‌তে পেরেছেন কি?"

বিস্ময়ে রঞ্জন রায় বলিলেন—"চং যুগো—আবার চং যুগো!"

দুই

চীন জাহাজ 'সুয়ান্‌টুঙ্' কয়েক দিন হইতে খিদিরপুর ডকে অপেক্ষা করিতেছিল। মাঞ্চুবংশের শেষ নরপতি বালক সুয়ান্‌টুঙের নামেই ইহার নাম।

রাত্রি দশটা। জাহাজের কাপ্তেন চীয়েন চীয়েন এবং অপর দুইজন চীনযাত্রী একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

কাপ্তেন বলিতেছিল, "আর মাত্র তিনটে দিন অপেক্ষা কর চং। আজ শনিবার ছাব্বিশ-এ জুন, আমরা ত্রিশ-এ জুন বুধবার ভোরে রওনা হবো। তার আগে তোমার মাল আমরা জাহাজে তুলতে সাহস করি না।"

চীনা মাটির বোতল হইতে খানিকটা 'সাম্‌সু' মদ গ্লাসে ঢালিয়া বোতলটা নিকটের টেবিলে রাখিয়া চং যুগো বলিল, "পুলিশের নজর যে এদিকে পড়বে, তা' আমার জানা আছে চীয়েন—কিন্তু আমি তোমাকে চিনি—পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়া তোমার এই প্রথম নয়।"

গ্লাসটা হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে চীয়েন বলিল, "তা' বটে। কিন্তু ভাই, এ ত আর তোমার আফিম্-কোকেন নয়—এ মাল যে কথা বলতে পারে, চীৎকার করতে পারে।"

"আমি সে চীৎকার বন্ধ করেও দিতে পারি—দু'-এক-দিন তাদের কথা বলা-না-বলা ত আমার ইচ্ছাধীন। যে সব জিনিষ আছে আমার কাছে, তা'তে এ সব ত অসম্ভব নয়—'জিন্‌সেঙে'র নাম শুনেছ?"

"জিন্‌সেঙ্?" কাপ্তেন বলিল, "হ্যাঁ, শুনেছি মাত্র।"

হাসিয়া চং যুগো বলিল, "আবার যেমন-তেমন নয়, আসল শেকড়, উরগাদেশের মানবাকৃতি জিন্‌সেঙ্।"

"অদ্ভুত তুমি, আর অদ্ভুত তোমার সংগ্রহ!" কাপ্তেন বলিল, "বেশ কাল রাত দুটোর পর তোমার সজীব মাল নির্জীব করে নিয়ে এস—আমরা জাহাজে এমনভাবে রেখে দেব, পুলিশের বাবাও জানবে না। ভাল কথা, ক'জন লোক বললে?"

"মাত্র তিনজন। দু'জন যোগাড় হয়েছে; বাকীটাও কাল হবে।"

"তিনজনকেই সমুদ্রে ফেলে দিতে বলেছ ত? এটা খুব শক্ত কাজ নয়, আর আমার পক্ষে কিছু প্রথমও নয়—সেবার এগারজনকে দিলাম। কিন্তু ভায়া, আসল কথার কি হচ্ছে, কত দিচ্ছ তা' বলো?"

"তিন হাজার।"

'সাম্‌সু'র গ্লাসটা এক মুহূর্ত্তে খালি করিয়া চং যুগোর পিঠের উপর একটা থাপড় মারিয়া উচ্চহাস্যে চীয়েন বলিল, "মজার লোক তুমি—তিন-তিনটা জাঁদরেল লোকের দাম দিচ্ছ ত খুব দেখ্‌ছি! ওতে হবে না চং—দশটি হাজার চাই আমার—বুঝেছ?"

"দশ হাজার!"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—চীয়েন বন্ধুলোকের সঙ্গে দরকষাকসি করে না।"

"বেশ কথা। এই নাও, এখন তোমায় মাত্র এক হাজার বায়না দিচ্ছি; বাকী টাকা জাহাজ ছাড়বার সময় পাবে" বলিয়া চং যুগো কতগুলা নোট বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল।

টাকা গণিয়া লইয়া কাপ্তেন বলিল, "উত্তম কথা! তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজও দেখে নিও।"

রাত্রি এগারটার পর চং যুগো জাহাজ হইতে নামিয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, খিদিরপুর বায়স্কোপ তখন সেইমাত্র শেষ হইয়াছে। লোকজন রাস্তার চারিদিকে হট্টগোল করিয়া চলিয়াছে। চং যুগো সেই দল ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহার জামার পকেটে একটু টান মারিল। 'পকেট মার' মনে করিয়া অল্প হাসিয়া সে পকেটে হাত দিয়া দেখিতেই একখানা ছোট কার্ড তাহার হাতে ঠেকিল। কার্ডখানা বাহির করিয়া রাস্তার আলোয় ধরিতেই সে চমকিত হইয়া দেখিল, ছাপার অক্ষরে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

রঞ্জন রায়

লেখা দেখিয়া, নাম দেখিয়া নির্ভীক চং যুগোর শরীরও ক্ষণিকের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। নিকটে সন্দেহজনক কোনো লোককে না দেখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কার্ডখানা ছিঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া চং যুগো একখানা ট্যাক্সিতে উঠিল। তাহার ট্যাক্সি ছুটিবার সঙ্গে-সঙ্গেই অপর একজন লোক ক্ষিপ্রতার সহিত ট্যাক্সির সন্ধানে 'ষ্ট্র্যাণ্ডে' আসিয়া দাঁড়াইল।

তিন

"আপনি চিন্তিত হবেন না মিসেস্ ব্রাউন।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "প্রাণপণ শক্তিতে আমি মিঃ ব্রাউনের সন্ধান কর্‌ছি—জগন্নাথ দাস ও ইনি একই লোকের হাতে পড়েছেন।"

"যে সাংঘাতিক লোক, যদি বিশেষ কিছু গুরুতর হয়?"

"না, সে রকম আশঙ্কা আমি করি না। চং যুগো, শঠ, জুয়াচোর, জালিয়াত—কিন্তু ঠিক্ খুনী নয়।"

"হতেও ত পারে?"

"অসম্ভব নয়—তবে এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সে এতটা করবে না। খুন করে যদি সে তার অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারত, তা' হলে না হয় খুন করা তার পক্ষে সম্ভব হতো—কিন্তু তার পূর্ব্বের অপরাধ এত আছে, যাতে শুধু সেই সব কারণেই তাকে জেল দেওয়া চলে—কাজেই খুন করে সে নিজের জীবনকে আরও বিপন্ন করবে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু আপনাদের সঙ্গে তার শত্রুতা আছে—আপনাদের হত্যা করে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে ত?"

"না, আমাদের হত্যা করলেও পুলিশ তাকে ছাড়বে না; বরং আরো ভীষণভাবে তার সন্ধান করবে—তার ফলে তার ব্যবসার ক্ষতি হবে—হয় ত তাকে এদেশ ছাড়তেও হতে পারে—তিনটে লোকের জন্য এত লাভের জায়গা সে ছাড়বে না।"

"তবে এদের নিয়ে কি করবে এই লোকটা?"

"ভয় দেখাবে—বন্দী করে রাখ্‌বে। পুলিশের নজর এইদিকেই থাক্‌বে—আর অন্য দিকে সে তার কারবার নির্ব্বিঘ্নে চালাবে।"

"যাক্, আপনার কথায় একটু সাহস হলো মিঃ রায়। কিন্তু যখন চিন্তা করি, অত বড় একজন কৌশলী সুপারিন্টেডেণ্ট, সশস্ত্র সাহসী পুরুষকেও কৌশলে বন্দী করে নিয়ে যেতে পেরেছে এরা, তখন, তখন আর কিছুতেই স্থির হওয়া যায় না। মঙ্গলবারে রাত ন'টার সময় তিনি 'পিকচার হাউসে' এক খুনীর সন্ধানে গেলেন—আজও এলেন না! বুধবারে চং যুগোর চিঠি পেলাম। কে জানে, এখন তিনি কি অবস্থায় আছেন!"

"বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন। আমরা প্রাণপণে তাঁদের বিপন্মুক্ত করবার চেষ্টায় আছি—আপনি অধীর হবেন না মিসেস্ ব্রাউন।"

চার

"চং যুগোকে এবার ধরা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।"

"কিসে বুঝ্‌লেন নির্ম্মলবাবু?"

"জগন্নাথবাবুকে যে কৌশলে সে নিয়ে গেছে, মিঃ ব্রাউনের কথা ঠিক্ জানা গেল না, তবে তাঁকেও সরান হয়েছে; আর আপনাকে 'ফোন্' করে, মিসেস্ ব্রাউনকে চিঠি দিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে সে যে দম্ভের পরিচয় দিয়েছে, তা'তে বেশ মনে হয়—এবার তার আয়োজন কিছু অন্য রকমের।"

রঞ্জন রায় বলিলেন, "আমরাও অন্য রকম আয়োজন করছি না কি? আমি জানি চং যুগোর প্রধান শত্রুতা আমারই সঙ্গে—কিন্তু এখনও সে আমাকে তার কৌশল-জালে ফেল্‌তে পারে নি কেন তা' বল্‌তে পারেন কি?"

"কেন বলুন?"

"সে জানে যে, কোন রকম ছদ্মবেশেই আর আমার কাছে সে আস্‌তে পারবে না—তার চোখের রোগের কথা ছাড়া হাতের যে সব লক্ষণ আছে, তা'তে আর ছদ্মবেশ চলে না; কাজেই সে এবার তার লোকজন দ্বারা কাজ চালাচ্ছে—কিন্তু তার লোকেরা তার মত কৌশলী না হওয়ায় আমাকে নিয়ে একটু বিব্রত হয়েছে—চং যুগো এখনও ঠিক্ করতে পারে নি, আমাকে সে কি কৌশলে আক্রমণ করবে।"

"কিন্তু একটা বিষয় আমি সমস্যায় পড়েছি—চং যুগো আপনাকে 'টেলিফোন্' করলে কেন, মিসেস্ ব্রাউনকে চিঠি দিলে কেন? সে ত সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করে এ কাজ করে যেতে পারত—তা'তে আমাদেরও বিশেষ চিন্তার

পড়তে হতো—চং যুগোর নামও আমরা জান্‌তে পারতাম না—বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌তাম।"

"কেন আমরা জান্‌তে পারতাম না? আঠারই জুনের 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কাগজে চীন জাহাজ 'সুয়ানটুঙে'র খিদিরপুর ডকে পৌঁছাবার কথা ছিল তা' জানেন ত?"

"জানি। তার বিষয় আবগারী বিভাগের গোয়েন্দা যা' রিপোর্ট দিয়েছেন, তা'তে দেখা যায় যে, আফিম, কোকেন প্রভৃতি কিছুই ছিল না।"

"ও সব তা'তে না থাকতে পারে—কিন্তু চং যুগোর দল যে ওই জাহাজে আসে নি, তা' জান্‌লেন কিসে?"

"এসেছে এমন প্রমাণ আপনিই বা পেয়েছেন কোথা?"

রঞ্জন রায় হাসিয়া বলিলেন "এর উত্তর মধুই ভাল দিতে পার্‌বে—কেন না, জাহাজ আসবার আগেই তাকে খিদিরপুরে পাঠান হয়েছিল—যাত্রীদের ওপর সে নজর রেখেছিল।"

"কিন্তু সে যদি চং যুগোকে দেখেছিল ত তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয় নি কেন?"

সে দায়িত্ব মধুর। সেই এবার আমার হাত থেকে কাজের ভার নিয়েছে—সংবাদ দেওয়া হয় ত সে উচিত মনে করে নি। আমাদের বারবার হার হতে দেখে এবার মধু নিজেই গোয়েন্দা সেজেছে। আমিও তার কাজে হাত দিতে চাই না—দেখা যাক্‌, সে কতটা কি করে।"

"যদি চং যুগোর দল আপনাকেও নিয়ে যায়?"

"মধু রক্ষা করবে—তা' নইলে মধুসূদন নাম কেন? আমি গ্রেপ্তার হতেও রাজী আছি নির্ম্মলবাবু—হয় ত দরকার হবে।"

"সেই জন্যই এ কয়দিন মধুকে এখানে দেখ্‌ছি না—কতটা সে এগিয়েছে?"

"সে কথা বলা এখন উচিত হয় কি? মধু অবশ্য প্রায়ই এখানে আসে; আমার মতামত নিয়ে যায়—তবে সব কথা ভেঙে বলে না।" রঞ্জন রায় হাসিয়া বলিলেন, "দেখা যাক্‌, সে এতদিনে কতটা শিখেছে, কি বলেন আপনি?"

"কিন্তু চং যুগো বড় ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী! মধুর হাতে এত বড় কাজটা দেওয়া—"

"অন্যায় হবে বলেন, আমাকেও বিপদে জড়াতে বলেন? তা' রাজী আছি আমি। অনেক সময় বড় ডাক্তারেরা যা' পারেন না, সামান্য একটু টোটকায় তা' হয় জানেন?"

পাঁচ

মল্লিক-বাজারে মুসলমান হোটেলের এক নিভৃত কক্ষে দেবদারু কাঠের টেবিলের উপর একটা মোটা মোমবাতি জ্বলিতেছিল। রাত প্রায় তিনটা। তিনটা টুলের উপর তিনজন মুসলমান বেশধারী পীতবর্ণ লোক চিন্তিত মনে বসিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

একজন বলিল, "আমি চিন্তিত হয়েছি চিঃ ফোঃ, আমাদের জাহাজের সন্ধান রঞ্জন রায় পেলে কোথায়?"

"আমি তখনই আপনাকে নিষেধ করেছিলাম যে, ও লোকটা বড় চালাক—'টেলিফোন্' করবেন না, চিঠি দেবেন না—কিন্তু আপনি তা' শুন্‌লেন না।"

"তা' নয় চিঃ ফোঃ, আমার প্রধান শত্রুকে এমন অসাবধানে আক্রমণ করায় আনন্দ পাওয়া যায় না, সেটা কাপুরুষতা। আমার সমকক্ষ বলে তার সর্ব্বনাশ করবার আগে তাকে আমি সাবধান করা দরকার মনে করি। হঠাৎ আক্রমণে অতি মূর্খ আনাড়ীও কোন চতুর কৌশলীকে হত্যা করতে পারে; ঘুমন্ত অবস্থায় দুর্ব্বল ভীরু ও যে কোন সাহসী বীরকে খুন করতে পারে—এ রকম ছোট কাজ চং যুগো করে না, আনন্দও পায় না।"

সান্ ইয়ুম বলিল, "কিন্তু জগন্নাথ দাস ও ব্রাউনকে ত কোনরকম সতর্ক করা হয় নি—সেখানে কাপুরুষতা হলো না কেন?"

"সেটার উদ্দেশ্য খেলা। ওদের হত্যা করতে চাই না—একটু খেলতে চাই; কাজেই জানান দরকার হয় নি।"

"কিন্তু ওদের ত সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়া হবে।"

"তা' হবে। যেখানে ফেলা হবে, সেখানে যে জল

থাকবে এমন কথা ত বলি নি। কাপ্তেন জানে, কোন দ্বীপে তাদের নির্ব্বাসিত করতে হবে। কিন্তু রঞ্জন রায়কে ত মুক্তি দেওয়া হবে না—হত্যা করা হবে। কোথায় তা' জানতেই পারবে।"

"রঞ্জন রায় বা তার লোক যখন আপনার পকেটে কার্ড দিয়েছে, তখন সে যে আমাদের এ আড্ডা জানতে পারে নি এমন মনে হয় না—শীগ্‌গিরই জায়গা বদলান দরকার।"

"বড়ই আশ্চর্য্য কথা, ভীড়ের মধ্যে কি করে আমায় দেখলে সে! জাহাজেও সে দেখেছে কি না কে জানে" বলিয়া চং যুগো বলিল, "যাক্‌, মহাপুরুষ দু'জনকে আজ কিছু খাইয়েছ ত? কতটা 'জিন্‌সেঙ্‌' দিলে?"

"তারা সন্ধ্যা থেকেই ঘুমিয়ে আছে—প্রত্যেকের নাকের ভিতর নল দিয়ে খাওয়াতে হচ্ছে। আজ এক ছটাক আরক দেওয়া হয়েছে।"

"বেশ কথা। কাল রাত দুটোর পর জাহাজে ও দু'জনকে তুলতে হবে মনে থাকে যেন—এ কাজের ভার তোমাদের ওপর। আমাকে আসল দিকে নজর দিতে হবে। যদি তাকে আনতে না পারা যায় ত অগত্যা শেষ পথই নিতে হবে।"

ছয়

"তোমার কাজের একটু ভুল হয়েছে মধু।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "ছাব্বিশ-এ জুনের যে সব ঘটনার কথা শুনলাম, তা'তে কাল চং যুগোর পকেটে আমার কার্ড দেওয়াটা ঠিক্ হয় নি—তার চেয়ে নীরবে তাকে অনুসরণ করে তার আড্ডাটা বার করাই উচিত ছিল।"

"কিন্তু সে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল; অন্য গাড়ী না পাওয়ায় আমি পিছু নিতে পারলাম না।"

"কার্ডখানা না দিলে বোধ হয় সে হেঁটেই যেত; বিশেষতঃ, জাহাজ থেকে অতটা পথ যখন হেঁটেই এসেছিল। এখন সে জানতে পারল যে, আমরা তার অনেকটা কাছাকাছি এসেছি—হঠাৎ যদি সে সমস্ত পথ বদল করে ফেলে ত আমাদের কাজ অনেকটা পেছিয়ে যাবে।"

মধুবলিল,"আজ সাতাশ-এ জুন—বোধ হয় দু'-একদিন আমাকে আর এদিকে দেখবেন না—জগন্নাথবাবুদের সন্ধানে আজ সন্ধ্যার পর আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে। জাহাজে বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না—তবে একটা চীনা মজুরের কাছে সন্ধানে জানলাম,'তাঁদের বরানগরে রাখা হয়েছে—একবার সেই দিকেও দেখা উচিত।"

"লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ত?"

"না। তা' ছাড়া, আমি সতর্ক আছি; আপনিও থাকবেন।"

"আমি ঠিক্ আছি মধু।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "মেয়েদের অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। বাড়ী খালি; কেবল হাণ্টারটা ছাড়া আর কোনো প্রাণী নেই। চং যুগোর অভ্যর্থনার জন্য আমি তৈরীই আছি।"

অন্য কয়েকটা বিষয় আলোচনার পর মধু চলিয়া গেলে রঞ্জন রায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'টেলিফোন্' করা, চিঠি দেওয়ার কি কারণ ছিল চং যুগোর? চিঠিতে বিডন ষ্ট্রীটের 'পোষ্টমার্ক' ছিল বলিয়াই যে সে ওই অঞ্চলের অধিবাসী তাহার নিশ্চয়তা নাই। নির্ম্মলবাবু টালিগঞ্জের যে বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহাও রাজার বাড়ী নয়—বুন্দেলখণ্ডের রাজা জগৎ সিংহ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। চং যুগো উপস্থিত কোথায় আছে, তাহাও বিশেষ করিয়া জানা যায় নাই—মধুর উত্তেজনায় সমস্ত পণ্ড হইয়াছে।

টালিগঞ্জ থানার মিঃ ডিক্রুজের নিকট হইতে রঞ্জন রায় জানিয়াছিলেন যে, রাজা জগৎ সিংহের সেই 'সিংগার' মোটরখানা আসলে স্থানীয় উকিল চারু বসুর। তাঁহার 'গ্যারেজ' হইতে রাত্রে চুরী করা হইয়াছিল—পরদিন কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে উহা পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনো সংবাদ তিনি দিতে পারেন নাই।

'য়ুয়ান্‌টুঙ্‌' জাহাজের উপর নজর রাখিয়াও কয়দিনে কোনই নূতন পথ বা সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গোয়েন্দা, ইঞ্জিনীয়ার অনেকেই অনেক রকম খোঁজ করিয়া বিফল হইয়াছেন। জগন্নাথ দাস বা মিঃ ব্রাউনের কোনো তথ্যই এ কয়দিনে আবিষ্কার হয় নাই।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ-পত্রে, লোকের

মুখে, হাট-বাজারে পুলিশের যে সব সুনাম ও কীর্ত্তি-কলাপ প্রকাশ হইতেছিল, তাহাতে অনেক কথাই এমন ছিল, যাহাতে পুলিশের সুনামের কোনো আভাষ পাওয়া যাইত না।

সাত

চং যুগোকে অনুসরণ না করিয়া ক্ষণিকের উৎসাহে মধু যে ভুল করিয়াছিল, তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল। ট্যাক্সি লইয়া চং যুগো চলিয়া যাইবার পর অন্য ট্যাক্সির সন্ধানে যাওয়ার পূর্ব্বের গাড়ীর নম্বর পর্য্যন্ত সে দেখিয়া লইতে পারে নাই; মোটর না পাওয়ায় অনুসরণ করাও সম্ভব হয় নাই।

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় মধু নিজেই লজ্জিত হইয়াছিল এবং সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য জাহাজের একজন চীনা মজুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া ভিতরের সন্ধান লইবার চেষ্টায় ছিল—এই চীনাই তাহাকে বরাহনগরের আভাষ দিয়াছিল।

দুইদিন বরাহনগরে ঘুরিয়া মধু বুঝিয়াছিল যে, সেই চীনা মজুর তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। কৌশলক্রমে তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়ার কারণ কি জানিবার জন্য মধু এবার সম্পূর্ণ নূতন বেশে কার্য্যক্ষেত্রে নামিল।

উনত্রিশ-এ জুন রেঙ্গুণের টিকিট কিনিয়া মিঃ টি, পি, আয়ার নামক জনৈক মাদ্রাজবাসী 'সোয়ান্‌টুঙ্‌' জাহাজের একটা 'কেবিনে' আপনার মাল উঠাইল। জাহাজের জনৈক চীনা মজুর এই নবাগত মাদ্রাজীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া একটু হাসিয়া ইঞ্জিন-রুমে চলিয়া গেল। মিঃ আয়ার তাহাকে গ্রাহ্য করিল না।

সমস্ত দিন নানা কৌশলে মিঃ আয়ার জাহাজের সর্ব্বত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও কোন মীমাংসায় আসিতে পারিল না। কাপ্তেনের ঘর, বেতার-কক্ষ, ইঞ্জিন-রুম প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাহার দৃষ্টি পড়িতেছিল।

'স্ক্রু' ও 'প্যাডেল প্রোপেলর' জাতীয় প্রায় একশত পঁয়তাল্লিশ ফিট্ লম্বা সাত হাজার ছয়শত ষাট্ গ্রোস্ টনের যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ এই 'সোয়ান্‌টুঙ্‌'—ইহার তলদেশ ডবল তক্তা দ্বারা মজবুত করা এবং ওই স্থানে মাল প্রভৃতি রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিফল মনোরথে চিন্তিত হইয়া মিঃ আয়ার আপনার কামরার সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িবার ছলে চিন্তা করিতেছিল। কাপ্তেন চীয়েন চীয়েন সেই সময় তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যালো মিঃ আয়ার, বায়োস্কোপে যাবেন?"

আয়ার বলিল, "না, ভাল 'ফিল্ম্' নেই আজ।"

"দেখি কাগজখানা৷" বলিয়া কাপ্তেন কাগজের পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "কেন মন্দ কি? খিদিরপুরে ত ভাল 'ফিল্ম্'ই দেখ্‌ছি।"

"ও আমার দেখা, আপনারা যান।"

কাপ্তেন চলিয়া গেল। কাগজ হাতে মাদ্রাজীর চিন্তা বাড়িল।

রাত্রি দশটা বাজিল। আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করিয়া নির্ভয়ে আয়ার বা আমাদের ছদ্মবেশী মধু বাক্স হইতে কয়েকটা চাবি ও অন্যান্য জিনিষ বাহির করিল। রবার সোল জুতা পরিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া কাপ্তেনের ঘরের দিকে চলিল। জাহাজের অনেকেই বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। কাল ভোরে জাহাজ ছাড়িবে; কাজেই আজ অনেকে অনেকরূপে ব্যস্ত।

অন্ধকারের মধ্যে মধু কাপ্তেনের ঘরের নিকট আসিয়া একবার চারিদিকে দেখিল—সর্ব্বত্রই অন্ধকার। লোক-জনের কাহাকেও না দেখিয়া নকল চাবি লাগাইয়া শীঘ্রই মধু কাপ্তেনের ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা ভিতর হইতে চাপিয়া দিয়া একটা ছোট 'টর্চ্চে'র সাহায্যে সে ঘরের জিনিষ-পত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। কাপ্তেনের ঘরেও নানারূপ যন্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া গেল—'টেলিফোন্', 'স্পীডোমিটার', 'কম্পাস', 'সার্চ্চ লাইট', ঘুরাইবার 'হ্যাণ্ডেল', 'ম্যাপ্', 'লাইফ্ বেল্ট্' কত কি ছিল মধুর দেখিবার সময় ছিল না। দেওয়ালের একদিকে কয়েকটা 'কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড', 'গ্যাস্ সিলিণ্ডার' আগুন নিবাইবার জন্য রাখা ছিল—

তাহারই মধ্যে দুইটা। 'অক্সিজেন গ্যাস্ সিলিণ্ডার' দেখিয়া মধু একটু বিশেষভাবেই তাহার দিকে লক্ষ্য করিল।

'অক্সিজেন গ্যাস্ সিলিণ্ডারে'র সহিত দুইটি রবারের নল যোগ করা ছিল এবং দেওয়ালের দুইটি ছিদ্র দিয়া নল দুইটাকে অন্য জায়গায় পাঠান হইয়াছিল। 'সিলিণ্ডারে'র কলও খোলা দেখা গেল। 'সিলিণ্ডার' হইতে রবারের নল দ্বারা 'অক্সিজেন' সরবরাহ হইতেছে কোথায়? 'অক্সিজেন' ব্যতীত প্রাণ ধারণ অসম্ভব মধুর ইহা অজানা ছিল না—কিন্তু এই নল এখন যাইতেছে কোথায়?

যে পথে নল দুইটি অন্যত্র গিয়াছিল, মধু সেই স্থানে ধীরে ধীরে শব্দ করিয়া জানিতে পারিল—ভিতরটা সম্পূর্ণ ফাঁপা। কাপ্তেনের ঘর ও বেড়ার কক্ষের কাঠের দেওয়ালের মধ্যে এই ফাঁপা স্থানটায় কি আছে জানিবার জন্য মধু ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ছিদ্রপথে মুখ রাখিয়া মধু সাহস করিয়া মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে ডাকিল, "মিঃ ব্রাউন।"

কোনো উত্তর আসিল না। অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া দ্বিতীয় গর্ত্তের নিকট মধু চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মিঃ দাস, মিঃ ব্রাউন।"

উত্তর নাই, উত্তর নাই। মধুর কপালে ঘাম ঝরিতে লাগিল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ঘরের 'সুইচ্' টিপিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোকে মধুর সাহস বাড়িল। ফাঁপা স্থান দুইটা খুলিবার কোনো পথ আছে কি না, তাহাই সে দেখিতে লাগিল।

কাঠের দেওয়ালে 'সিলিণ্ডার' দুইটার পিছনে দুইটা গর্ত্ত আবিষ্কার করিয়া মধু ক্ষিপ্রহস্তে নকল চাবি দিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ কাঠের একটা অংশ দরজার মত সরিয়া গেল।

বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে মধু দেখিল—হাত, পা ও মুখ সম্পূর্ণরূপে বদ্ধাবস্থায় অর্দ্ধমৃত, শীর্ণ, ভয়ার্ত্ত মিঃ ব্রাউন সেই চার হাত উচ্চ ও দেড়হাত প্রস্থ অল্প পরিসর স্থানে শক্ত দড়ি দ্বারা নির্ম্মমভাবে বন্দী হইয়াছেন। বসিবার স্থানও ছিল না; কাজেই তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতেই হইয়াছিল। নিমেষে অপর গর্ত্তে চাবি ঘুরাইতেই একই চাবি দ্বারা তাহা খুলিয়া গেল এবং একই অবস্থায় জগন্নাথ দাসকে সেই স্থানে পাওয়া গেল।

দড়ি কাটিয়া মধু শীঘ্রই দুইজনকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিল। উভয়েই সংজ্ঞাহীন। কাপ্তেনের বিছানায় দুইজনকে শয়ন করাইয়া মধু আলো নিবাইয়া একটা 'অক্সিজেন সিলিণ্ডার' নামাইয়া আনিয়া তাঁহাদের গ্যাস দিতে লাগিল।

এতগুলি কাজ করিতে কত সময় কাটিল, মধু তাহা খেয়াল করে নাই। কিছু পরে মিঃ ব্রাউন উঠিয়া বসিয়া হঠাৎ মধুকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আমরা রক্ষা পেলাম!"

জগন্নাথ দাসও অনেকটা সুস্থ হইলেন। মধু তখন টেবিল হইতে খানিকটা ব্রাণ্ডি লইয়া দুইজনের মুখে কিছু ঢালিয়া দিলেন। টেবিলের উপর প্রায় আধ বোতল মদ রাখা ছিল। মধু তাহা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল; এখন তাহার সদ্ব্যবহার করিল।

জগন্নাথ দাস এবার মধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঞ্জন এসেছে?"

মধুর ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ইঁহারা অনায়াসে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সে বিস্মিত হইল!

কথা বলিতে নিষেধ করিয়া মধু শীঘ্রই ঘরের অবস্থা পূর্ব্বের মত করিয়া রাখিল—সময়ের দিকে তাহার এখনও লক্ষ্য ছিল না।

কাপ্তেনের ঘরের দরজায় হঠাৎ ধাক্কা পড়িল। দরজা খুলিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে চীয়েন চীয়েন এক-জন চীনা মজুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার হাতের লোহার সাবল কাড়িয়া লইয়া ইহাদের সবলে আক্রমণ করিল। মধুর হাতে 'টর্চ্চ' ছিল। সে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত চীনা মজুরকে দেখিয়াই 'টর্চ্চ' নিবাইয়া নিমেষে সরিয়া দাঁড়াইল। মজুরটা আন্দাজে একটা টুল তুলিয়া তাহাদের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

অন্ধকারে কাতর আর্ত্তনাদ ও পতনের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কাপ্তেন ও মজুর দুইজনে বিকট চীৎকার করিয়া পুনরায় তিনজনকে আক্রমণ করিল। সাবল লইয়া

ভীষণবেগে চীয়েন একজনের মাথায় আঘাত করিল—কাতর আর্ত্তনাদ ও পতন শব্দে জাহাজ কাঁপিয়া উঠিল। সেই কোলাহল ও আলোকমালা ভেদ করিয়া একটি 'হুইসেল'র শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

আট

"আজই চং যুগো আপনার বাড়ীতে আস্‌বে এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ?"

"হ্যাঁ নির্ম্মলবাবু। আজ উনত্রিশ-এ জুন। রাত এখন একটা দশ—তার আসবাব আর বেশী দেরী নেই জান্‌বেন।"

"কি করে আপনি জান্‌লেন যে, আজই আসবে সে—আপনার বাড়ীতেই আপনাকে হত্যা করবার সাহস করবে সে—অন্য দিন অন্য স্থানে কর্‌লে না কেন?"

"কাল ত্রিশ-এ জুন ভোর ছ'টার সময় জাহাজ ছেড়ে যাবে—চং যুগোর দল সেই সময় পালাবার চেষ্টা করবে। এবার তারা কারবার করতে আসে নি—এসেছে শত্রুদের নিপাত করতে—দু'জনকে সরিয়েছে, বাকী আমি।"

"আপনি কি বল্‌তে চান ওঁদের দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে?"

"না, তা' নয়। আগে জান্‌তাম হত্যা করা হবে না; কিন্তু মধুর একটু ভুলে হয় ত তাদের মতের সম্পূর্ণ অদল-বদল হয়ে গেছে। এখন চং যুগো 'মরিয়া' হয়ে উঠেছে। ভালভাবে যে কাজ সে করতে চেয়েছিল, তা'তে বাধা পড়ায় অন্যপথ নিতে সে দ্বিধা করবে বলে মনে হয় না।"

"জাহাজটাকে আমাদের গোয়েন্দারা দিনরাত লক্ষ্য করছে—আজ রাত দশটা পর্য্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নি। হয় ত তাঁদের অন্য কোথাও রাখা হয়েছে—আমরা জাহাজ নিয়েই ব্যস্ত আছি।"

"অন্য কোথাও রাখা হলে মধুকে বরানগরের ঠিকানা দিয়ে চীনা মজুর ভুল রাস্তায় তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ত না। আমার বিশ্বাস জাহাজেই আছেন তাঁরা।"

দুটো লোককে জাহাজে ওঠান হলো, অথচ সেখানকার গোয়েন্দারা কিছু জান্‌তে পারল না। কমিশনারের যে রকম কড়া নিয়ম হয়েছে, তা'তে কোন বড় বাক্স, ট্রাঙ্ক বা ঐ রকম কিছু পুলিশকে না দেখিয়ে কেউই জাহাজে তুল্‌তে পারবে না—তবে কি করে মিঃ ব্রাউন ও জগন্নাথ-বাবুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো তা' হলে?"

"নিজের গলদ দেখ্‌বেন?" রঞ্জন রায় হাসিয়া বলিলেন, "বলুন ত নির্ম্মলবাবু, এ রকম কড়া নিয়ম কমিশনার-সাহেব কবে থেকে প্রকাশ করেছেন?"

আটাশ-এ জুন, সোমবার সকাল ছ'টা থেকে এ নিয়ম তিনি জারী করেছেন—আজও কোন কিছুই পাওয়া যায় নি?

"যদি আটাশ-এ জুনের আগেই তাঁদের ওঠান হয়ে থাকে?"

"আর দু'দিনের বিশেষ অনুসন্ধানেও তাঁদের কা'কেও পাওয়া যাবে না জাহাজে, এটাই বা কি করে বিশ্বাস হয় বলুন? আমার বিশ্বাস, তাঁদের হয় অন্য কোথাও রাখা হয়েছে, আর না হয় হত্যা করেছে।"

"বেশ, আপনি এবার নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই অনেকেটা দিয়েছেন।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "আপনি বল-ছেন, 'হয় অন্য কোথাও রাখা হয়েছে, না হয় তাঁদের হত্যা করা হয়েছে।' চং যুগো যদি তাঁদের হত্যা করে থাকে ত আমাকেও সে নিশ্চয় হত্যা করবে; কারণ, আমিই তার বিশেষ শত্রু—অর্থাৎ, আপনার কথায় চং যুগোকে উপস্থিত হত্যাভিলাষী পাচ্ছি। তারপর অন্য কোথাও রাখার কথা—বেশ, আমি তার জাহাজে নেই, অন্য কোথাও, অর্থাৎ, বাড়ীতেই আছি এবং সে হত্যাভিলাষী, কাজেই আমার বাড়ীতেই সে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করবে।"

হাসিয়া নির্ম্মলবাবু বলিলেন, "কিন্তু আপনার কথামত দেখ্‌লে—যদি ওই দু'জনকে জাহাজেই সে কোথাও আবদ্ধ করে রাখে, হত্যা না করা হয়ে থাকে ত আপনার বাড়ীতে এসে সে আপনাকে হত্যা করবে এটা কি করে মনে করেন?"

"আমাকে সে কোনো কৌশলে নিয়ে যেতে পারলে না; অথচ, আমি তার প্রধান শত্রু—আমাকে হত্যা করতে তার

আপত্তি নেই—এই কথাটা মনে রাখ্‌লেই সব কথা সহজ হয়ে যাবে। আমাকে অন্যত্র যখন সে পেলো না, তখন মহম্মদকে পাহাড়ের কাছেই যেতে হবে।"

"বেশ, কিন্তু আজই আস্‌বে কেন ?"

"কাল সকালে জাহাজ ছেড়ে যাবে—সেই সুযোগে সে ত পালাবে—তার আগেই আজ রাত্রে তার এ কাজটুকু করে যাবার চেষ্টা করবে—কেন না, এই উদ্দেশ্যেই তারা এসেছে।"

"জাহাজে সে কি করে যাবে ? পুলিশ তাকে চেনে—জাহাজ ছাড়বার আগেও পুলিশ যাত্রীদের বিশেষ করে না দেখে ছাড়বে না।"

"কি আশ্চর্য্য! জাহাজে সে যাবে এমন কথা ত বলছি না—আপনারা জাহাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বেন, আর সে ট্রেণে পালাবে। অন্যদিন পুলিশেরা জাহাজের দিকে অতটা ব্যস্ত থাকবে না, কাজেই কালই সব চেয়ে সুবিধের দিন।"

"আপনি যদি সত্যই তা' বিশ্বাস করেন, তবে পুলিশকে সংবাদ দেন নি কেন ?"

"দেখুন নির্ম্মলবাবু, মানুষের, বিশেষতঃ চং যুগোর মত লোকের মনস্তত্ব নিয়ে একটা পথ বেচে নেওয়া এক কথা, আর নিশ্চিত হয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে হট্টগোল করা আলাদা কথা। খুনী, বদমায়েস, গুণ্ডা প্রভৃতির মানসিক গতিবিধির ওপর নির্ভর করে ঘরে বসেই তাকে ধরবার আয়োজন করেছি আমি—কিন্তু জানবেন, মানুষের ভুলও আছে। হঠাৎ ঘটনার পরিবর্ত্তনে আমার সমস্ত কল্পনারও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব—চং যুগো যদি হঠাৎ কোন কারণে পালাতে না পারে, হঠাৎ যদি কোন শারীরিক রোগ বা ব্যাঘাৎ হয়, ত৷' হলে খুবই সম্ভব সে কাল যাবে না এবং কাল যাওয়া তার বন্ধ হলে আজ সে আসবে কি না সন্দেহ। মানুষের কাজ যন্ত্রের মত হয় না, ব্যতিক্রম আছেই; কিন্তু সেই ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেও সম্ভাবনাটার কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না। বিশেষ ব্যতিক্রম কিছু না হলে আজ সে আস্‌বেই। পুলিশের কাজ আমি নিজেই করব বলে বেচারাদের আর কষ্ট দিই নি।"

দুইজনে রঞ্জন রায়ের 'ল্যাবরেটরী-রুমে' বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। নির্ম্মলবাবু পুনরায় কি বলিতেছিলেন, কিন্তু রঞ্জন রায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আর নয় নির্ম্মলবাবু, ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিন—ওই দেওয়ালের 'সুইচ বোর্ডে'র দিকে দেখুন।"

দেওয়ালের উপর একটি নূতন ধরণের 'সুইচ বোর্ডে' ছোট ছোট কয়েকটি নানারঙের 'ইলেকট্রিক বাল্‌ব' লাগান ছিল এবং তাহার নীচে কয়েকটি সাঙ্কেতিক অক্ষর দেখা যাইতেছিল। ঘর অন্ধকার করিয়া দুইজনে প্রায় পঁচিশ মিনিট পর্য্যন্ত সেই বোর্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৈঠকখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিতে শুনা গেল।

নয়

'সুইচ বোর্ডে' একটি ছোট লাল আলো হঠাৎ জ্বলিয়া নিমিষ মধ্যে নিবিয়া গেল। আলো দেখিয়া রঞ্জন রায় বলিল, "বাড়ীর সদর বা পেছনের দরজা বন্ধ কি না দেখ্‌বার জন্য কপাটে সামান্য ধাক্কা লাগ্‌লেই ওই আলো জ্বল্‌বে।"

অল্প পরে নীল আলো জ্বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল। রঞ্জন রায় বলিলেন, "পেছনের পাঁচিল দিয়ে একটা লোক ভেতরে লাফিয়ে পড়েছে—তাই নীল আলো দেখা গেল।"

তাঁহার কথার সঙ্গে-সঙ্গেই সবুজ আলো জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতে দেখিয়া হাসিয়া রঞ্জন রায় বলিলেন, "এ লোকটা কোনো ভাড়াটে গুণ্ডা—শরীরের ওজনটাও তিন মণের ওপর দেখ্‌ছি।"

"কিসে জান্‌লেন ?"

"বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির ওপরে একটা 'স্প্রীংয়ে'র পাপোষ আছে। তিন মণের বেশী ওজন না হলে সেটা তার নীচের সুইচে যোগাযোগ করবে না। চং যুগোকে ত দেখেছেন ? তার ওজন তিন মণের কম।"

একটা বেগুনী আলো পর পর দুইবার জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। রঞ্জন রায় নিমেষে উঠিয়া জানালার নিকট

দাঁড়াইলেন। কুকুর হাণ্টারকে টেবিলের নীচ হইতে বাঁধন খুলিয়া পাশে রাখিলেন। নির্ম্মলবাবুকে বিপরীত দিকের জানালায় দাঁড়াইতে বলিয়া দুইজনে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 'সুইচে'র আরও দু'-একটা আলো জ্বলিয়া পুনরায় নিবিয়া যাওয়ায় রঞ্জন রায় বলিলেন, "দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছে। শোবার ঘরের দিকেই গেল দেখ্‌ছি।"

অল্প পরেই 'ল্যাবরেটরী'র দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। দুইজন লোক আপাদমস্তক কালো পোষাকে ঢাকিয়া হাতে এক-একটা পিস্তল লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

নিমেষের মধ্যে বিকট চীৎকার করিয়া আগন্তুকেরা সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল—পিস্তল দুইটা হস্তচ্যুত হইয়া দূরে পড়িল। ঘরে বড় বড় দুইটা আলো সেই মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল।

কুকুরের শিকলে হাত রাখিয়া রঞ্জন রায় হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ যুগো, হত্যাকার্য্যটাও হয়ে যাক্ এবার।"

চং যুগো ও তাহার সঙ্গী বিপুলকায় চীনা গুণ্ডা তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

নির্ম্মলবাবু চং যুগোকে ধরিতে যাইতেছিলেন, রঞ্জন রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "না, না, ওদিকে যাবেন না, আপনিও তা' হলে 'ইলেকট্রিক সক্' পাবেন। টেবিলের তলায় আমার রবারের জুতযোড়া আছে, পায়ে দিয়ে নিন্ আগে।"

'ল্যাবরেটরী'র দরজার নিকট একখানা বড় দস্তার চাদর ঘরের ভিতরেই রাখা ছিল, আক্রমণকারীরা তাহারই উপর পড়িয়াছিল।

নির্ম্মলবাবু এবার পিস্তল দুইটা উঠাইয়া লইয়া একে একে দুইজনের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিলেন। রঞ্জন রায় একটা 'সুইচ' টিপিয়া দিলেন—কুকুরটা মনের দুঃখে গজরাইতে লাগিল।

দুইজনকে সুরক্ষিত করিয়া একটি বেঞ্চে বসাইয়া তাঁহারা চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ 'সুইচ বোর্ডে' পুনরায় লাল আলো কয়েকবার জ্বলিয়া উঠিল, বাহিরে লোকজনের কোলাহল ও মোটরের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

রঞ্জন রায় বিস্মিত হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেই মুহূর্ত্তমাত্রেই সেই চীনা গুণ্ডাটা কট্‌কট্ শব্দে হাতকড়ি ভাঙিয়া বাম হস্তে রঞ্জন রায়ের গলা ভীষণ জোরে টিপিয়া দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড ছোরা উঠাইল, কিন্তু আঘাত করিবার সুযোগ আর তাহার মিলিল না, হাণ্টার বিরাট গর্জ্জনে লাফাইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিতে এমন জোরে কামড় দিল যে, তাহার কব্জির হাড় চূর্ণ হইয়া হাত অক্ষম হইয়া ছোরা পড়িয়া গেল, নির্ম্মল সেন তৎক্ষণাৎ অপর একযোড়া হাতকড়ি লইয়া তাহার হাতে পরাইয়া দিল।

কিন্তু চং যুগো কোথা'?

হাণ্টার ও নির্ম্মলবাবুর দৃষ্টি রঞ্জন রায়ের দিকে পড়িবার সময় কৌশলে হাতকড়ি খুলিয়া সে পলাইয়াছে। ঘরের মধ্যে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া হাণ্টার দৌড়িয়াই নীচে নামিয়া গেল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার গলার শিকলটা সিঁড়ির রেলিংয়ের সঙ্গে আটকাইয়া যাওয়ায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না, নির্ম্মলবাবুও নীচে নামিয়া আসিয়া চং যুগোকে পাইলেন না।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইতেছিল, অগত্যা নির্ম্মলবাবু দরজা খুলিয়া দিলেন। মিঃ ব্রাউন ও জগন্নাথ দাসকে মধুর সহিত সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা!"

পথের আলো জ্বালিয়া মধু ভিতরে আসিয়া সকলকে লইয়া উপরে উঠিতে গেল—সিঁড়িতে হাণ্টারের অবস্থা দেখিয়া শীঘ্র সে তাহার গলা হইতে শিকল খুলিয়া দিল। শিকল রেলিংয়ে লাগিয়াই রহিল, কিন্তু বিরাট উচ্ছ্বাসে হাণ্টার চং যুগোর পথে ছুটিয়া গেল—যাইবার সময়ও আর তাহার কোন চীৎকার শুনা গেল না।

রঞ্জন রায় ততক্ষণে সুস্থ হইয়া ছিলেন—সকলকে অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দে মধুর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "ভুল শোধ করেছ দেখ্‌ছি—জাহাজেই এঁরা ছিলেন কি?"

বন্দী চীনা গুণ্ডার দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্রাউন সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন, 'পিকচার হাউসে' যাইবার সময় কিরূপে চং যুগোর লোকেরা তাঁহার মোটর আক্রমণ করে—কিরূপে ঔষধ দ্বারা তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া জাহাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। নিকটেই যে জগন্নাথবাবু ছিলেন সে বিষয়েও তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না।

মধু বলিল, "অনেক সন্ধানে আমি এঁদের খুঁজে পেয়েছিলাম। যেদিন আমি বরানগরে যাই, সেদিন, অর্থাৎ সাতাশ-এ জুন রাত্রেই এঁদের জাহাজে তোলা হয়েছিল—চীনা মজুরটা এখন এ কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।"

নির্ম্মলবাবু বলিলেন, "কাপ্তেন ও সেই মজুরটা তা' হলে নিজেদের মধ্যেই মারামারি করেছিল?"

"হাঁ।" মধু বলিল, "তারা দুজনেই মাতাল হয়ে নিজেরাই মারামারি করে আমি সেই সুযোগে 'হুইসিল' দিয়ে জেটির ওপর থেকে পুলিশকে সঙ্কেত করে ডাকলাম, পুলিশের সঙ্গে আগেই এ বন্দোবস্ত ছিল।

হঠাৎ কুকুরের বিকট চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল—এ চীৎকারের অর্থ রঞ্জন রায় বুঝিতেন। বড় একটা টর্চ্চ লইয়া নিমেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন,—জগন্নাথ দাস ব্যতীত অপর সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

শব্দের পর শব্দের ঝঙ্কারে দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল—'টর্চ্চ' হাতে সকলেই শব্দের লক্ষ্যে ছুটিলেন।

অন্ধকারের গাঢ়ত্ব কমিয়া আসিয়াছিল—'টর্চ্চে'র আলোয় সকলে দেখিলেন—একটা কালো পোষাক পরা লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে; আর ব্যাঘ্রের মত বিশালকায় ভীষণ মূর্ত্তি হাণ্টার তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

নিকটে আসিতেই দেখিলেন কুকুরে ও মানুষে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লোকটার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তস্রাব হইতেছে—তাহার কালো পোষাক ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। মিঃ ব্রাউন কাছে আসিয়া বলিলেন—"চং যুগো!"

ক্ষণিকের জন্য উপরের দিকে চাহিয়া বামহস্তে নিজ রক্তাক্ত গলদেশ দেখাইয়া, মৃদু হাসির আভায় মুখে ফুটাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার মাথাটা টলিয়া পড়িল। নির্ম্মলবাবু হাতকড়ি পরাইতে গেলেন, কিন্তু রঞ্জন রায় বিষাদ মাখা-কণ্ঠে বলিলেন, "আর দরকার হবে না রঞ্জনবাবু, চং যুগোর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে গেছে—এতবড় একটা প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে আমি দুঃখী কি সুখী তা' বল্‌তে পারি না—মনে হয় যদি এ পালাতে পারত—"

বিস্মিত হইয়া সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

কাজ-বাগিয়ে—'বউ-এর ভাই'

শ্রীসত্যহরি মুখোপাধ্যায়

মনে করিয়াছিলাম, ঘটনাটা আর ভদ্র-সমাজে জানাইব না। পরে বিচার করিয়া দেখিলাম, না বলিলেও থাকিয়া যাইবে। তাই, এই গল্পের অবতারণা।

ব্যাপারটা আমাদের উপেন ডাক্তারের ছোট মেয়ে শ্রীমতী কমলবাসিনীর বিবাহের ঘটনাটাকে অবলম্বন করিয়া।

গল্প সুরু করিতে গেলে উপেন ডাক্তারের খানিকটা অতীত জীবনের ইতিহাস আসিয়া পড়ে। আমাকে তাহাও বলিতে হইবে।

শোনা যায়, উপেন ডাক্তার না কি তাঁহার প্রথম জীবনে উপার্জ্জন করিবার সময়টায় ই-আই-রেল-কোম্পানীর কোনো এক লাইনে একটা অজ্ঞাতনামা কাজে বাহাল হইয়া ছিলেন। কি কাজ জানিতে গেলে অতটা ঠিক্ ধরা যায় না। তবে, 'ধাদসে'র উপর মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়, কাজটী খোদ গার্ড-মাষ্টারী হইতে আরম্ভ করিয়া মায় শেষ কর্ম্মচারী পানি-পাঁড়েটীর মধ্যে যে কোনও একটি হইতে পারে। পরে কোম্পানীর টাকা ভাঙ্গিতে দেরী লাগে নাই। অতঃপর তথা হইতে দে-চম্পট! অন্তর্ধানের পর আসিয়া তাঁহার উদয় আমাদের এই বাজিতপুরে। সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাঁহার গরুড় পক্ষী আন্দাজ এই এক হাত লম্বা গোল নাক, আর তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের লাবণ্যময়ী একটি তন্বঙ্গী সহধর্ম্মিণী। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিবার অতি অল্প-কাল পর হইতে যে সময়টার ভিতর তাঁহার স্ত্রী একটি দুইটী করিয়া ক্রমান্বয়ে পর পর তিনটী মেয়ে ও তিনটী ছেলে প্রসব করিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে উপেন ডাক্তার যে কীর্ত্তি কয়টী ফাঁদিয়া বসিলেন, একে একে তাহার হিসাব দিতেছি।

প্রথমে আসিয়া তিনি একটি সন্দেশের দোকান খুলিয়া দিলেন, ঠাকুর ও চাকর রাখিয়া। বৈঠকী-সমাজে উপেন ডাক্তারের দোকানের সম্পর্কে আলোচনা আসিয়া পড়িলে, তিনি অন্তরে ব্যথা ভরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের বুঝাইতেন—বাজিতপুরে বিধবাদের খাবার ইত্যাদি কেনা সম্বন্ধে অনেক অসুবিধা, তাই এই দোকানটা খোলা। দোকান চলার সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি পড়াশুনাও চলিতে লাগিল। এদিকে যেমনই দোকানটী বাজিতপুরের বাজার হইতে বেমালুম সরিয়া পড়িল, ওদিকে তেম্নি এম-বি উপাধি বিশিষ্ট ডাক্তারের গোটা নামটী লেখা এক সাইনবোর্ড আসিয়া দুয়ারে লটকাইয়া গেল। কয়েক বৎসর গত হওয়ার পর শোনা গেল, ডাক্তারী চিকিৎসা না কি বেশ ভালই করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রমাণও পাওয়া গেল—ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী বাড়ী হইতে উঠিয়া আসিয়া বাজারের মধ্যে একটি নূতন ঘরে বিশিষ্টতা লইয়া আশ্রয় করিয়াছে, আর আসিয়া পড়িল লালে শাদায় দোহারা শরীরের একটি অশ্বতর। ডাক্তারের কথায় ঘোড়াটীর বিশেষত্ব—এঁই যেঁ দেঁখ্‌চো ঘোঁড়া, এঁটা এঁখান থেঁকে বঁহ্‌রমপুর উঁনিশ মাঁইল রাঁস্তা মাঁত্র দুঁ ঘঁণ্টায় যাঁতায়াত কঁরে।

আরো কয়েক বৎসর গত হওয়ার পর শোনা গেল, ডাক্তারবাবু না কি আর আট টাকা ভিজিট না হইলে 'পাদমেকং ন গচ্ছতি।'

জানি না কোন্ কারণটায়—লোকে তাঁহাকে বুঝিল না এই দোষে, না, লোকের 'ভিজিটে'র টাকা যোগান দায় হওয়ার দোষে উপেন ডাক্তারের ব্যবসায় যেন ভাঙ্গন ধরিল। তাঁহার ডিস্পেন্সারী উঠিয়া আসিয়া পুনরায় বাড়ীর ভিতর আশ্রয় লইল। কয় বৎসর পরে দেখা গেল, 'ডাক্তার- ফ্যামেলি' বসত-বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া একটা পুরাণ জীর্ণ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে এবং ডাক্তারের

সময়, প্রতিবেশী নিখিল বনোয়ারীর দোকানের একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া দিব্য আরামে কাটিয়া যাইতেছে। পরস্পর কথা উঠে—ডাক্তারবাবুর অন্তঃপুরই এখন না কি গোটা পরিবারের কর্ণধার। পাড়া-প্রতিবেশীরা দেখিয়া আসিয়াছে, ডাক্তার-গৃহিণী শরীরখানিকে ডাঁটা সার করিয়া তুলিয়াছেন যাঁতায় ডাল, গম ইত্যাদি পিষিয়া।

উপেন ডাক্তারের শোচনীয় অবস্থাটা ধরা পড়িত না, যদি না লোকের কাছে প্রকাশ পাইত তিনি গেলাস-বাটি ওফে নারিকেলের মালা ব্যবহার করিয়া প্রয়োজন সমাধা করিতেছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবে সেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া অনুযোগ করিলে, উপেন ডাক্তার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বক্তৃতা দিয়া তাঁহাদিগকে যাহা বুঝাইতেন, তাহার সারমর্ম্ম —শরীর পুষ্ট রাখ্‌বার পক্ষে নারকেলের মালার অবদান না কি একেবারেই উপেক্ষা করবার মত নয়।

যাহাই হউক, অবশেষে উপেন ডাক্তারের এই সর্ব্বনাশা ভাঙ্গনের মুখে আসিয়া ঠেকা দিল তাঁহার বড় ছেলে সুবোধ। উপেন ডাক্তারের ভাঙ্গন-লীলাটা বরণ করিয়া লইবার সৌখীন ভঙ্গীতে সুবোধের মাথাটা প্রবলভাবে চাড়া দিয়া উঠিল। নিজের চেষ্টায় মোটর ড্রাইভারীর কাজ শিখিয়া অতঃপর তথাকার এক 'মোটর এসোসিয়েসান'-এ পঁয়ত্রিশ টাকার একটা চাকরী যোগাড় করিয়া লইল।

উপেন ডাক্তারের মুখে বড় ছেলের প্রশংসা আরম্ভ হইল; আর এদিকে লোক-সমাজের কাণের পর্দ্দাও ক্রমে আপনিই ভারী হইয়া আসিতে লাগিল। প্রশংসা চলে না কেবল মেজ ছেলের। সৌভাগ্যের বাজারে পড়িয়া ছোট ছেলেটাও বাদ যায় না। সে না কি সিংহ-রাশিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে—অতএব সে একটা কিছু না হইয়া যায় না। ডাক্তারবাবু বলেন,—ভবিষ্যতে যদি উন্নতি করতে হয়, তবে সেটা এই ছোট ছেলের দ্বারাই।

কন্যাদিগের মধ্যে বড় মেয়ে শৈলবাসিনী তাহার বাপের জীবনের সৌভাগ্য-আকাশেই জন্মিয়াছিল। সে সময়, ডাক্তারবাবুর মেয়ে হইয়া দু' আঁচড় বাংলা ইংরাজী পেটে পুরিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া সে একদিন কোনো এক উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়িল। দ্বিতীয় মেয়ে জলদবাসিনী বাপের জীবনে হাসির আসরে নামিয়া আসিলেও ভাঙ্গনের গাদে পড়িয়া শেষটা আর মাথাঝাড়া দিতে পারে নাই। অবশেষে বাপের ঠুন্‌কা সামর্থ্যের উপর ভর করিয়া সে কোন্ এক অখ্যাতনামা গোমস্তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। তাহার ক্ষেত্রে বোধ করি কোনো পক্ষই বিশেষ লাভবান হইল না—শ্বশুরকুলও না, পিতৃকুলও না।

এইবার কমলবাসিনীর পালা। এ সময়টায় ভাই-এর চাক্‌রীটা বজায় থাকিলেও বা এক রকম ছিল। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার চাকরীটি খোয়া গিয়াছে। পরিবারের সকলেই মনে করিয়াছিল, সুবোধের চাকরীর চোরাবালিতে মন বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে এ যাত্রা উৎরাইয়া যাইবে—কিন্তু ভগবান সে আশায় বাদ সাধিলেন। সহসা আজ তাহারা দেখিল, সবই ভুল। ছিট্‌কাইয়া আসিয়া কখন অতল সমুদ্রে পড়িয়াছে। হাবু-ডুবু খাইয়া প্রাণ বাঁচানই দায়, সামান্য পদার্পণের আশা করা ত একেবারেই ভুল। এই বিপদের দিনে কমলবাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া যে কেহ তাহার সৎকামনা করিবে এমন ভরসাও থাকিল না।

ব্যাপারটা গড়াইল এমনি।

আজ কয়েক দিন হইতে কথক-ঠাকুরের মত একটা নাদুস্‌নুদুস্ আকারের বছর পঞ্চাশের লোক উপেন ডাক্তারের বাড়ী যাতায়াত করিতেছে। হাতে এক গাছা ছড়ি ও মণিবন্ধে সোণার রিষ্ট ওয়াচ।

গুজব রটিল, ভদ্রলোকটি আমাদের উপেন ডাক্তারের হবু জামাই ও কমলের ভাবী বর। লোকটা না কি কোথাকার পোষ্টমাষ্টার। টাকাকড়ি, জমিজমা, বাগান ইত্যাদি করিয়া তাহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি আছে। আরো শোনা গেল, সে সমস্তই না কি কমলবাসিনীর হইবে।

কমলবাসিনীর কিন্তু কান্না আর থামে না। প্রতিবেশীরা সে কান্না শোনে। আবার, যে কান্না বাড়ীর আগল টুটিয়া কেবল প্রতিবেশীদের কাণে ঢুকিয়াছিল, তাহা আর সেইখানেই আটকাইয়া থাকিল না—ক্রমশঃ বাতাসের মত চলিতে চলিতে তাহা সকলের কাণে গিয়া পৌছিল। ব্যথিতের প্রাণ করুণায় কানায় কানায় ভরিয়া গেল

কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া দলে দলে গিয়া তাহারা পল্লী-সঙ্ঘের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের ধরিয়া পড়িল—এ বিয়ে ভাঙ্গিয়া কচি মেয়েটার একটা সদ্গতি করিয়া দিতেই হইবে। কর্ম্মীরা এ বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সভাপতি-মহাশয়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সভাপতি-মহাশয় বলিলেন—দেখো হে বাপু, আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ধর্ম্ম হচ্ছে পল্লী-সংস্কার। এ পর্য্যন্ত সে তাই নিয়েই আছে। কিন্তু যদি এটাকে একটা জন-প্রতিষ্ঠান বলি, তা' হ'লে সমাজ-সংস্কারের দিক্ দিয়েও লোকের তার ওপর দাবী আছে। তবু সে দাবী যেন গৌণ আকারে প্রকাশ পায়। আমরা এ পর্য্যন্ত জন-সমাজকে সন্তুষ্ট করেই এসেছি এবং এখনো যে কোনো বিষয়েই হোক্ না কেন, আমাদের লোককে খুসী করেই চল্‌তে হবে। কাজে-কাজেই এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়ীত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও, এটা আশা করা যায়, একদল নিঃস্বার্থ কর্ম্মী দিয়ে যখন এই প্রতিষ্ঠানটা চল্‌ছে, তখন হয় ত এ বিয়ের ব্যাপারেও তাদের সে ত্যাগ-অনুশীলন বঞ্চিত হয়ে থাক্‌বে না। দেখো, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সে রকম ত্যাগী পুরুষ থাকো, তবে বিয়ে কর।

দলের একজন কে বলিল—আমাদের ভেতর তেমন আর কে আছে? ওদের আবার ভারী ফ্যাঁসাদ! জাত বামুন, ঠিকুজী মেল না হলে ত আর বিয়ে হচ্ছে না।

একজন তৃতীয় ব্যক্তির গলা শোনা গেল—আছে, তোমাদের ভেতর আছে একজন।

একযোগে সকলের মুখ হইতে বাহির হইল—কে?

উত্তর হইল—সুনীল মুখুয্যে।

কে বলিয়া উঠিল—ধ্যাৎ, সে বিয়ে করবে না!

অনন্তর সেখান হইতে বাহির হইয়া কর্ম্মীদল উপেন ডাক্তারের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। রাস্তায় এক বুড়ীর সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ। সে নাক সিঁটকাইয়া বলিতেছে—এ যেন গাজন-তলা।

বাস্তবিকই কথাটা ঠিক। গন্তব্য স্থানে আসিয়া দেখা গেল, উপেন ডাক্তারের বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের রাস্তা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটা একেবারে লোকে লোকারণ্য! বাধা নাই, মানা নাই। ঠাকুরের প্রেমের আকর্ষণে ভক্তের দল যেমন আত্মহারা হইয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে মন্দির ঢুকিবার অবাধ অধিকার লাভ করে, কোনো সঙ্কোচ মানে না, উপেন ডাক্তারের হবু জামায়ের আকর্ষণেও সেই রকম দর্শকের ভীড় লাগিয়া গেল। তাহার প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি গৃহ-কর্ত্তারও থাকিল না। লোকের জামাই দেখিবার প্রবল আগ্রহের স্রোতে তাঁহার ন্যায্য অধিকারটুকুও যেন ভাসিয়া গিয়াছে।

উপেন ডাক্তারের বাড়ী লোকে লোকারণ্য—জামাই দেখিবে। লোকের সহিত মিশিয়া কর্ম্মীরাও ডাক্তারের অতিথি হইল। ত্যাগী কর্ম্মীদলের প্রত্যেক কাজের উপর সাধারণের একটা সহজ সহানুভূতি ও আন্তরিক আস্থা ছিল। সকলেই তাহাদিগকে সেইজন্য যথেষ্ট সমিহ করিয়া চলিত ছেলেরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই সকলের দৃষ্টি একটা অজানা আকুলতা লইয়া তাহাদের উপর পড়িল, সকলে চাহিয়া থাকিল। ভাবটা এই—দেখি, এদের বিচার ব্যাপারটা কি—কতদূর দাঁড়ায়।

জামাতা-বাবাজীকে ইতিমধ্যে নানাজনে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মনটাকে নিতান্ত কটু করিয়া তুলিয়াছে। বেচারী শেষ পর্য্যন্ত মৌন থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। কর্ম্মীদিগের ভিতর হইতেও কে আবার একজন যেন 'ফস্' করিয়া বলিয়া ফেলিল— বলি, তামাকটা তা' হলে এবার এক হুঁকোতেই চল্‌বে ত? পরে স্বগত হইয়া—যাক্, এবার ডাক্তারবাবুর রাজ্যপাটের খবর শোন্‌বার একজন ধৈর্য্যবান শ্রোতা তবু মিল্‌লো।

জামাতা-বাবাজীবন ছোকরাটীর দিকে মিঠে কড়া রকমের একটা চাহনি না দিয়া পারিল না। পরক্ষণেই অপর একজন বলিল—হাঁারে সুরেশ, একটা ঘাটের মড়া এসে কি না মেয়েটার সর্ব্বনাশ করে যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? কী লজ্জার কথা!

ভদ্রলোক আর মুখের বাঁধন রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন—আজ্ঞে, সর্ব্বনাশ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বড়

একটা আসি নি, বরং উদ্ধার করবো এই মনে করেই এখানে এসেছি।

কে একজন বলিল—হ্যাঁ মশায়, এটা আপনার কোন্ পক্ষ পর্য্যন্ত এসে দাঁড়াচ্ছে?

জামাই উত্তর দিলেন না, মুখ হাড়ি করিয়া রহিলেন। ছেলেটি পুনরায় বলিল—আপনার অপর পক্ষের দু'-চারটে ছেলে-মেয়ে আছে মনে করলে ভুল হবে না বোধ হয়? আপনার ছোট মেয়েটির মুখখানা একবার ভেবে দেখুন দিকি। এও যে আপনার ছোট মেয়ের সামিল। সত্যিই একে বিয়ে করবেন না কি?

ভাবী জামাই অপমানের অসহ্য ব্যথায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—কী সব নোংরা কথাবার্ত্তা বলেন মশায়! দয়া করে ভদ্রভাবে কথাগুলো বলবেন।

ইহার পর কেহ আর বাদ-প্রতিবাদ করিল না। মাঝখানে উপেন ডাক্তার আসিয়া কখন ঘরে ঢুকিলেন। একটা ছেলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার মতিচ্ছন্ন ধরলো কেন? আপনার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? একটা বাহত্তরের হাতে দিয়ে মেয়েটাকে বিসর্জ্জন দেবেন?

ডাক্তারবাবু সামান্য আহত হইয়া বলিলেন—কেঁন তোঁমরা কিঁ আঁমার পাত্র খুঁজে দেঁবে নাঁ কিঁ?

বালক কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই পাশের দাওয়া হইতে শ্যামবর্ণ অপরিচিত মুখের একটী ভদ্রছেলে লাফাইয়া উঠানে পড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি দিতে রাজী আছি; আপনি আমার সঙ্গেই আপনার মেয়ের বিয়ে দিন।

—তোমার নাম কি?

—আমার নাম নির্ম্মলেন্দু ঘটক।

—আমরা ঘটকের সঙ্গে বিয়ে দিই না।

কোথা হইতে একটা লোক বলিয়া ফেলিল—ডাক্তার, অমন পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।

একটা ঠোঁটকাটা লোক বলিয়া উঠিল—ওরে ভাই, বিয়ে দেবে কোত্থেকে? জামায়ের কাছ থেকে আগেই যে টাকা খেয়ে বসে আছে।

উপেন ডাক্তারের মাথা বিগড়াইয়া গেল। চরম রাগের মাথায় হাত-পা ছড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—বেঁরোও সঁব আঁমার বাঁড়ী থেঁকে বেঁরোও! কোঁন সাঁহসে এঁখানে এঁসে জুঁটেছ, বেঁরোও!

কর্ম্মী একটি ছেলে বলিল—আজ্ঞে যাব ত নিশ্চয় জানি, কিন্তু তার আগে জেনে যেতে চাই—এ বিয়ে আপনি ভাঙবেন কি না? তা' না হলে আমাদেরই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

উপেন ডাক্তার আর কোনো উত্তর করিলেন না। যেমন ধূলা পায়ে আসিয়াছিলেন, তেমনই আবার দ্রুতপদে সদর্পে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। লোকে বলিল—ডাক্তার থানায় ডায়েরী করতে গেলেন।

যে ছেলেটী বিবাহ করিবে বলিয়া অসঙ্কোচে নিজেকে আগাইয়া দিয়াছিল, পরে শোনা গেল, ছেলেটী সেখানকার সাব-রেজিষ্ট্রারবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে। সম্প্রতি কয়েক দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

এখন ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে, স্থানীয় দোকানদার, মহাজন, বড়লোক, ছোটলোক ইত্যাদি করিয়া যে কাহারো দুয়ারে গেলেই দেখা যাইবে তাহাদের আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। দুর্ভাবনার বিষয় কেবল উপেন ডাক্তারের ছোট মেয়েটার এই বিবাহ সঙ্কট লইয়া। বাজারে দোকানদারেরা যে নিজেদের একেবারে তুলিয়া গিয়া খরিদদার পটাইবার ভঙ্গীটি তাহাদের হাতেই তুলিয়া দিয়া নিজেরা আজ তাহার ফলাফলটা বুঝিয়া লইতেছে, তাহার ষোলআনা প্রশংসাই উপেন ডাক্তারের। এই যেমন রামচন্দ্র কি একটা দরকারী কাজে রাস্তা দিয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ শ্যামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। 'ফট্' করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া সে বলিল—কেমন হে, একেই না বলে বিবাহ-বিভ্রাট!

তারপর দুইজনেই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা লইয়া যেন রাজার ঘুম নাই, পাওনাদারের তাগাদা নাই, মহাজনের কিস্তি নাই—এমন কি, সুবিধা

বুঝিয়া বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য পর্দ্দা ঠেলিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িতেছে।

* *

বেলা তখন প্রায় বিকালের দিকে হইবে। স্থানীয় পুলিশ্-ষ্টেশনের একজন দারোগা ও জনকয়েক পুলিশ পিতলের ঝিলিক দেওয়া তাহাদের সাঙ্কেতিক নামের অপূর্ব্ব সাজ-সজ্জা, লাঠি-সোটা, লাল পাগড়ী ইত্যাদি পরিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন শ্রদ্ধায় নত করিয়া উপেন ডাক্তারের বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া হাজিরা দিল। কথা, দারোগাবাবু 'এন্‌কোয়ারী' করিতে আসিয়াছেন।

ডাক্তারের বাড়ীতে লোকের ত কোনো অভাব ছিলই না, উপরন্তু দারোগাবাবুর পিছন পিছনেও আবার আর একদল লোক আসিয়া প্রবেশ করিতে কসুর করিল না। উপেন ডাক্তার স-সম্মানে দারোগাবাবুকে একটা টুলের উপর বসাইলেন। দারোগাবাবু বলিলেন—কই, আপনার মেয়েকে একবার এদিকে আনুন দেখি, তাঁকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

এই কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুর মুখ অলক্ষ্যে শুকাইয়া উঠিল। তিনি বোধ করি এতটা আশা করেন নাই যে, দারোগাবাবু স্বয়ং মেয়ের জবানি লইয়া কাজে হাত দিবেন। যন্ত্রচালিতের মত মেয়েকে বাহিরে আসিবার ইঙ্গিত করিলেন। কমলবাসিনী আসিয়া দারোগাবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে দারোগাবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ মা, তোমার এ বিয়েতে কি মত আছে?

প্রশ্নটা যে ওই অতটুকু মেয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ গুরুভার, এ কথা আশা করি সকলেই বিশ্বাস করিবেন। মেয়েটি উত্তর দিবার পূর্ব্বে একেবারে গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল। জানি না, সে নিজের বাপ মাকে দাঁড়ির একদিকে বসাইয়া দিয়া অপর দিকে নিজের ভবিষ্যৎ ভাগ্যফলটাকে বসাইয়া ওজন করিয়া দেখিতে লাগিল কি না। তাহার কচি বুকের মধ্য দিয়া এ সমস্যাটা একবার সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া গেল কি না বলিতে পারি না। একদিকে দারিদ্র্য-জীর্ণ নিরুপায় পিতৃ-পরিবারের ক্ষুধিত জঠরের অন্ন-সংস্থান ও অপরদিকে এক মরণ-পথের যাত্রী বৃদ্ধের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়া দু'-দিন পরে মরু-জীবনের অভিশাপ বহিয়া চলার ভিতর কোন্‌টা বাছিয়া লওয়া সমীচীন হইবে।

পিতা ত কন্যার মুণ্ডুটি হাড়িকাঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছেন, ঘাতককেও আজ কয়েক দিন ধরিয়া নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন, আজ আবার দারোগাবাবুর এই প্রশ্নের টানে মেয়েটার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। কমল অনেক দিন আগে হইতেই নিজের বলিদান অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, এখন যদি বা প্রশ্নের উত্তরটা নিজের অনুকূলে আনিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাকে যে আবার পিতার ভিটায় পুনর্ব্বার দুরবস্থায় কাল কাটাইতে হইবে না, এই বা কে বলিতে পারে?

প্রশ্নটা তাহার হাত পা ধরিয়া যেন অসম্ভব প্রবলভাবে টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করিয়া দিল। মুখ দিয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিতে চায়।

এ যেন সন্ধিক্ষণ! পরিচিত, অপরিচিত সকলেই চারিপাশে মায়ের রূপা ভিক্ষা করিয়া নির্ব্বাক আশঙ্কায় দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটা দেখিতে পাইল, বাহিরে তাহার পিতার ভীতি-শুষ্ক বদন এবং ঘরের ভিতর তাহার ভ্রাতা, ভগ্নী ও মাতার সন্ত্রস্ত এবং পাণ্ডুর চাহনি তাহার চিন্তা-ব্যাকুল মুখের উপর নিবদ্ধ আছে। সে আর সাম্‌লাইতে পারিল না। নিজেকে হারাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মত আছে।

বাঙ্গালী মেয়ের আত্মবলি দিবার প্রকৃতিই এই!

দারোগাবাবু বলিলেন—তবে আসি ডাক্তারবাবু, আমাদের আর কিছু জ্ঞাতব্য নেই।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

দারোগাবাবু চলিয়া যাইতে, জন-সমুদ্রও তাহাদের নিস্ফল আক্রোশ লইয়া 'হ্যাংলা' কুকুরের মত নিজের নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

* *

তখন প্রাতঃকাল। নির্ম্মুক্ত আকাশের পথ-ঘাটের স্থানে স্থানে সঞ্চিত জল ও গাছের ভিজা লতা পাতা ফুল ইত্যাদির উপর বালারুণ তাহার লাল রঙের কিরণ ছিটাইয়া দিয়াছে। গত রাত্রিতে মেঘ নামিয়াছিল। রাত্রির নিভৃত বুকের অন্তঃস্থলে নিজের পরিচিত লোকজন লইয়া ও বাহিরের সমস্তই দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া বাদলধারার সঙ্গে কমলবাসিনীর বিবাহ-ব্যাপারটা সমাধা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে।

আমাদের পরিচিত কর্ম্মীদল রাস্তায় 'টহল' দিয়া ফিরিতেছিল। একজন সভ্য আসিয়া দলে যোগ দিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—জামাইটা কি বলেছে জানিস? বলেছে —সে শালারা কই এখন? এইবার পেলে দেখিয়ে দিতাম মজাটা!

শ্রীসত্যহরি মুখোপাধ্যায়

'ডেড্ মার্ক'

কমলা মৈত্র

পাগলা মেহের আলিকে হুগলী শহরে কে না চেনে। মাসখানেক হলো সে এখানে এসেছে। এদিক-ওদিক ছুটোছুটী করছে। মুখে কেবল তার এক কথা—'ডেড্ মার্ক, ডেড্ মার্ক!'

সকলেই তাকে বদ্ধ পাগল বলে জানে এবং তার কাছে যেতে দ্বিধা বোধ করে।

সেদিন বড় গরম বোধ হচ্ছিল। আকাশ যেন তার রুদ্ধ নিশ্বাস চেপে রেখেছে। ঘুম কিছুতেই আসছিল না। ভাব্লাম, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। জামাটা গায়ে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

গঙ্গার ধারে একটা বহু পুরাতন অশ্বত্থ গাছ অতীত স্মৃতি নিয়ে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় বেদীর ওপর একটা লোক যেন বসে রয়েছে মনে হলো। নিকটস্থ হয়ে দেখ্লাম, আর কেউ নয়—আমাদের সেই পরিচিত মেহের আলি।

আমি নিকটে যেতেই সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বস্তে বল্ল। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, উন্নত ললাট, গম্ভীর প্রকৃতি। তার গৌরবর্ণ দেহের ওপর চাঁদের কিরণ এসে পড়েছিল। পার্শ্বে গঙ্গা যেন জ্যোৎস্নার ওড়না গায়ে দিয়ে কুলুকুলু শব্দে চারিদিক মুখরিত করে আপন-মনে লাস্য-ভঙ্গীতে ছুটে চলেছে।

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেহের আলি প্রশ্ন করলো—জানো, আমি কে?

মনে মনে হাস্লাম। ভাব্লাম, এবার পাগলামী আরম্ভ করেছে। প্রকাশ্যে উত্তর দিলাম—তুমি পাগলা মেহের আলি।

—হ্যাঁ, আজ আমি পাগলা মেহের আলিই বটে! তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে বল্লে—না, আমি চিরকাল পাগলা ছিলাম না, আমি ছিলাম মেহেরপুরের মেহের আলি।

এই কথাগুলা বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ সেইভাবে থাকার পর আবার হঠাৎ বলে উঠল—শুন্বে, শুন্বে ভাই আমার জীবন-কাহিনী?

কৌতূহল হলো। ভাব্লাম, বসেই ত থাক্বো, শোনাই যাক্ না কি বলে। ধীরকণ্ঠে বল্লাম—বলো তোমার জীবন-কাহিনী।

আমার কথায় তার মনে কি ভাবের উদ্রেক হলো জানি না। কিছুক্ষণ বিরক্তিকর উদ্ভট অঙ্গভঙ্গী করে খানিকটা জল পানের পর সে বল্তে আরম্ভ করল—

মেহেপুরের কলে আমি সামান্য বেতনের চাকরী করতাম। অল্প মাইনে পেলেও সে গ্রামে আমার মত সুখী কেউ ছিল না। আমি দরিদ্র ছিলাম, কিন্তু পেয়েছিলাম গুণবতী স্ত্রী। আমার কিসের অভাব ছিল! তার সুন্দর চোখ দু'টী, ফুল্ল শান্ত মুখখানি দেখে সমস্ত দারিদ্র্য-দুঃখ ভুলে যেতাম। তার অফুরন্ত ভালবাসা আমার ঘরে 'বেহেস্ত' এনেছিল। আমার যদি কল থেকে আস্তে কোনোদিন বিলম্ব হতো, সে তখন কি ভাব্নাই না ভাব্ত! পাড়ার কোনো ছেলেকে পাঠাত আমার খোঁজ করতে। আমি যখন কল হ'তে ফিরে আস্তাম, সে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বল্ত—তুমি কি বলো ত, কেবল দেরী করবে, আর আমি ভেবে মরব!

এরূপ অনুযোগ-অভিযোগের ভেতর দিয়ে আমাদের সেই দরিদ্র সংসারের দিনগুলি বড়মধুরভাবেই কাট্ছিল।

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলে মেহের আলি একটু শ্রান্ত হলো। নদীর দিকে খানিকক্ষণ অচপল দৃষ্টিতে চেয়ে

রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বেশ একটু উত্তেজিতভাবে আবার বল্‌তে সুরু করল—

এমন সময় কোথা থেকে এক খবর এল—যুদ্ধ বেঁধেছে। সঙ্গে সঙ্গে হুজুগে বাতাস আমাদের গ্রামের মধ্যেও বইতে আরম্ভ করল। গ্রামের যুবকদের প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে ঘনঘন যুদ্ধে যাবার জন্য ডাক্ আস্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামের দু'-চারজন বন্ধু এসে বল্‌ল—কি, যাবে না কি ভাই?

আমি উত্তর করলাম—তোমরা গেলে আমার বিশেষ আপত্তি নাই।

হাওড়া ময়দানে 'রিক্রুটিং'-এর বিরাট সভা হলো। আমরা পঁয়ত্রিশ জন নাম দিলাম। তারপর যুদ্ধে যাবার দিন। উঃ, সে কি দিন—জীবনে কখনো ভুলব না!... সেদিন সকাল থেকে স্ত্রী জোহেনা কাঁদতে আরম্ভ করল। তাকে সান্ত্বনা দিলাম, নানা রকমে বোঝালাম, সে একটু শান্ত হলো। স্বামীর বীরত্বের গৌরব ম্লান হওয়ার ভয়ে সে একটী বারও আমায় যুদ্ধে যেতে বারণ করে নি। ধীরে ধীরে তার কাছে বিদায় নিতে গেলাম। বল্‌লাম—জোহেনা, লক্ষ্মীটি, কেঁদো না, আমি নিশ্চয় আবার ফিরে আসব। তোমার ভাই রইল, কোনো কষ্ট হবে না।

ঠিক্ যাত্রার পূর্ব্বে আমি তাকে বল্‌লাম—জোহেনা, আমি মরব না, তোমার বুকের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাকব! ...তোমার ও প্রাণঢালা ভালবাসার কাছে কোন দুষমনই এগুতে পারবে না—কোনো মৃত্যুই আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না!...

জোহেনা একটী কথাও বল্‌তে পারল না, শুধু ঝর্‌ঝর্ ক'রে তার চোখ ফেটে জল বেরুতে লাগ্‌ল। তার বুকের মধ্যে যে ঝড় বইতে লাগ্‌ল, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পারলাম—কিন্তু তখন আমি নিরুপায়। সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে ফেলেছি—যেতেই হবে আমাকে।

আল্লাকে স্মরণ ক'রে যুদ্ধ যাত্রা করলাম। যতদূর দেখা যায়, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জোহেনা এক-দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।...

করাচীতে কয়েকদিন অবস্থানের পর আমাদের দল মেসোপটেমিয়ার উদ্দেশে রওনা হলো। অনন্ত অপার সমুদ্রের বুকে আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজ ভাস্‌ল। ধীরে ধীরে ভারতের বেলাভূমি আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে লাগ্‌ল। তখন কেবলি আমার জোহেনার সেই অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। আমি আর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলাম না; অশ্রু সংবরণ করবার জন্য অন্যত্র নির্জনে চলে গেলাম।

প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রে প্রকৃতির হুঙ্কার লোকের মনে যেমন ভয়ের সঞ্চার করে, তেমনি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ সমুদ্র এই নূতন যাত্রীদলের মনে ভীতির উদ্রেক করছিল। কিন্তু আমাদের এই জাহাজ ওই বিশাল সমুদ্রকে অবহেলায় মথিত ক'রে নিজের গন্তব্য-পথে অগ্রসর হচ্ছিল। কয়েক দিনের সুখ-দুঃখ, গান-গল্প, হাসি-ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আমাদের জাহাজ মেসোপটেমিয়ায় এসে পৌঁছল।

দূরে কামানের শব্দ কানে এসে বাজতে লাগ্‌ল। সেই গগনভেদী শব্দে আমরা সব ভুলে গিয়ে যুদ্ধের উন্মাদনায় উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লাম। কবে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধ করতে পারব, সেই কথাই বারবার মনে হতে লাগ্‌ল।

তখন স্বদেশ, প্রিয়-পরিজন সব ভুলে গেলাম।

একদিন আমাদের কয়েকজনের প্রতি হুকুম হলো যে, দূরে কোনো একটা মাঠ পাহারা দিতে হবে। সজ্জিত হ'য়ে সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

গুড়ুম্! গুড়ুম্! কোথা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে কামানের গোলা আমাদের ওপর বর্ষিত হতে লাগ্‌ল। চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। তারপর কি যে হয়েছিল, তা' আমি বল্‌তে পারি না। কতক্ষণ যে অজ্ঞান অবস্থায় সেই মাঠের মাঝে পড়েছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—আমি মৃতের মধ্যে পড়ে রয়েছি। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট 'ডেড্ মার্কা' কাল নিশান প্রোথিত রয়েছে।

এই সময় একদল লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি বল্‌লাম—জল, জল, বড় তেষ্টা!

ধরাধরি ক'রে তারা আমায় মাটি থেকে তুল্‌ল। ক্লান্ত

দেহটা তাদের সাহায্যে খাড়া করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যেতে হবে ?

তাদের মধ্যে একজন লোক কাল নিশানটা দেখিয়ে কর্কশ-কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—আপ্‌ ত 'ডেড্‌ মার্কা' হ্যায়, মর গিয়া ! মাটী দেনে হোগা।

আমি তাদের কাতর-কণ্ঠে বল্‌লাম—লেকিন্‌ দেখিয়ে, হ্যাম্‌ ত মরা নেহি হ্যায়।

তারা নাছোড়বান্দা। বল্লে—ডাক্তার-সাব্‌ 'ডেড্‌ মার্ক' দিয়া হ্যায়, জরুর মর্‌ গিয়া।

এই পর্য্যন্ত বলে পাগলা মেহের আলি চুপ করলো। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ল। একদল পেচক কর্কশ শব্দে চারিদিক্‌ কম্পিত ক'রে গঙ্গার অপর পারে উড়ে গেল। আমি ভীত ও কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর ?

জলপান করে সে নব উদ্যমে আবার বল্‌তে সুরু করল—

হ্যাঁ, তারপর তাদের অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেলাম। ক্যাম্পের দিকে না গিয়ে সোজা চল্‌লাম গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক সহৃদয় ব্যক্তির আশ্রয় পেলাম। অনেকদিন তাঁর বাড়ীতে থেকে তাঁরই সাহায্যে দেশে ফিরে এলাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছর পরে। কোলকাতায় এসে নিজের বাড়ীর দিকে চল্‌লাম। বাড়ীর দরজায় আমার শ্যালক দাঁড়িয়েছিল। তার নিকটে যেতেই সে আমাকে দেখে একেবারে হতভম্ব—ভূত দেখ্‌লে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হ'য়ে যায়, ঠিক্‌ তেমনি। তার মুখ ত ভয়ে একেবারে শাদা—সে নিস্তব্ধ হ'য়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার কাছে গেলাম এবং বেশ একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লাম—আমি মরি নি, আমি বেঁচে আছি, বিশ্বাস কর আমাকে।

সে খানিকক্ষণ পরে প্রকৃতস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি বেঁচে আছ ? তবে যে সরকারের—

হ্যাঁ, সরকারের দপ্তরে আমি মৃত বটে, কিন্তু আল্লার দপ্তরে আমি জীবিত। তারপর তাকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞেস করলাম—কই, জোহেনা কই ? তাকে দেখ্‌ছি না যে ?

এ প্রশ্নের উত্তর সে হঠাৎ দিতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে বল্‌ল—সরকারের নিকট হ'তে যেদিন তোমার মৃত্যু-সংবাদ ও তার সাথে মাসিক আঠার টাকা মাসহারা পাবার হুকুম এল, সেদিন বোনের আমার কি কান্না !...

এই মাস কয়েক হলো অনেক বুঝিয়ে কলের বড় সাহেবের খানসামার সঙ্গে তার—

এঁ্যা, জোহেনা নেই !......আমার জোহেনা এখন অপরের !...রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে আর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। মনে হলো, পায়ের তলা থেকে যেনা পৃথিবী সরে যাচ্ছে, মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল, আর দাঁড়াতে না পেরে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

একটু প্রকৃতস্থ হ'য়ে দেখ্‌লাম—শ্যালক নেই ; পালিয়ে গেছে। ক্ষোভে, রোষে আমার মন তখন জর্জ্জরিত। দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মাদের মত ছুট্‌লাম এক উকিলের নিকট জোহেনাকে ফিরে পাবার জন্য। সেইদিনই মোকর্দ্দমা রুজু করে দিলাম। মোকর্দ্দমার দিন এল। আদালত লোকে লোকারণ্য ! সকলের সমক্ষে প্রমাণিত হলাম যে, আমি মেহেরপুরের আলি। জোহেনাও আমায় সনাক্ত করল। আমি প্রাণে আবার নূতন বল পেলাম। ভাব্‌লাম—আর ভয় কি ? আবার আমি সব ফিরে পাব—জোহেনাকে ফিরে পাব ! কিন্তু হায় ! বিচারক রায় দিলেন—যে ব্যক্তি সরকার কর্ত্তৃক মৃত বলে সাব্যস্ত হয়েছে, জীবিত থাকুলেও সে মৃতের সামিল। ফরিয়াদী স্ত্রী বা সম্পত্তির কোনো দাবী করুতে পারে না।

এ রায় নয়—বজ্রপাত !

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে একটা বিকট হাসি হেসে 'ডেড্‌ মার্ক, ডেড্‌ মার্ক !' বল্‌তে বল্‌তে ছুট্‌ দিলে। অন্ধকারে তার সেই বিকট শব্দ কানে এসে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। আমি বাড়ী ফিরে এলাম। সে রাত্রে আর ঘুম হলো না।

কমলা মৈত্র

লক্ষপতি

শ্রীপ্রবোধকুমার অধিকারী

পুত্রের ভাগ্য-গণনায় যখন বরাহের ভুল হইয়াছিল, তখন প্রতিবেশী পুত্রের ভাগ্য-গণনায় যে হরিনাথ দৈবজ্ঞের ভুল হইবে, তাহা আর এমন আশ্চর্য্য কি। কিন্তু তিনি যখন অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া শীর্ণ অঙ্গুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"রাখু, তোমার এ ছেলে একদিন লক্ষপতি হবে—বড় শুভলগ্নে জন্মেছে!"

রাখাল মুখুয্যে তখন একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না; কিন্তু আঁতুড়-ঘরে সদ্য-প্রসূত সন্তানকে বুকে করিয়া জননী লতিকার বেদনা-জর্জ্জরিত শীর্ণ বুকখানা যে মুহূর্ত্তের জন্য অতিমাত্রায় ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিছক সত্য।

কিন্তু ভাগ্যের নিতান্ত বিড়ম্বনা—এই লক্ষপতি হইবার আশা দূরে থাকুক, পুত্র জন্মিবার মাস কয়েক পরেই লতিকাকে সিথির সিন্দূর, হাতের খাড়ু জন্মের মত ঘুচাইয়া অজ পাড়াগাঁয়ে নিঃসন্তান ভ্রাতা অমরনাথের আশ্রয় লইতে হইল এবং সেইখানেই বালক নরেন্দ্র লক্ষপতির ভাগ্য লইয়া দুলে, বাগ্‌দী বালকদিগের সহিত মিশিয়া দিবারাত্র হৈহৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু তাহা হইলেও বালকের আদর-যত্নের ত্রুটী একটুও হইল না। 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত সে কোলে কোলে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ বালক যখন সাত বৎসরের হইয়া উঠিল, তখন অমরনাথ একদিন তাহাকে পাঠশালায় লইয়া গিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। বালকের লেখাপড়ায় আদৌ মন বসিল না। হয় ত বয়স হইলে জ্ঞান হইবে, এই ভাবিয়া অমরনাথ নরেন্দ্রকে কিছু বলিতেও সাহস করিতেন না। কিন্তু এম্‌নি করিয়া বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করিয়াও যখন বালকের লেখাপড়ায় একেবারেই মন বসিল না, তখন অমরনাথ সহসা একদিন হাল ছাড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তথাপি ইহার প্রতিবিধানের কোনো উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু যে লেখাপড়ায় নরেন্দ্রের বিরক্তি ছিল, তাহা নহে। তাহার বাল্য-সুলভ প্রকৃতির ভিতর এমন একটা উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা জন্মিয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য শুধু মাতাকে নয়, সময়-অসময়ে মাতুলকে পর্য্যন্তও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত।

ক্রমে নরেনের বয়স আঠারো ছাড়াইয়া চলিল, তবু গ্রামের পাঠশালার সামান্য পাঠটুকুও সে শেষ করিতে পারিল না। স্বেচ্ছাচারিতাও তাহার কমিল না। তারপর আবার ভবঘুরে ছেলেদের দলে মিশিয়া সে এমন সব কাণ্ড করিয়া বেড়াইতে লাগিল, যাহার জন্য অমরনাথ ও লতিকার পাড়ায় মুখ দেখানোই ভার হইয়া উঠিল।

সংসারে একটী মাত্র ভগ্নী, তাহাতে অকালে তাহার স্বামী-বিয়োগ। তাই পাছে সে মনে দুঃখ পায় এই ভাবিয়া অমরনাথ অবশেষে এক অষ্টম বৎসরের বালিকার সহিত ভাগিনার বিবাহ দিয়া দিলেন। কিন্তু ভিতরের আগুনে উপর হইতে জল ঢালিলে কি হইবে? যে উচ্ছৃঙ্খল হয়, সে বুঝি এমনি করিয়াই হয়। বিবাহের একমাস পরেই নরেন যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা ভ্রাতা ও ভগ্নী কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহারা তাহার খোঁজ-খবর পাইলেন না।

দুই

বাপ-মা বড় সাধ করিয়া নাম রাখিয়াছিল মনোরমা। দরিদ্র পিতা-মাতার সংসারে সত্যই সে অসামান্য রূপ লইয়া জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পর তাহার যে কি হইল, সে তাহা কিছুই বুঝিল না; বিবাহ যে কি পদার্থ, তাহার মর্ম্মও সে জানিল না। দীর্ঘকাল পরে, অকস্মাৎ যেদিন বুঝিল, তখন দেখিল—সে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়া

ফেলিয়াছে। লতিকা বধূর মুখের দিকে চাহিতে পারেন না; অমরনাথ মনে মনে শিহরিয়া উঠেন। শুধু বয়ঃ-সন্ধিগতা, বিরহ-ভারাবনতা মূর্ত্তিমতি, বিশ্ব-দেবতার অসীম সৃষ্টির পানে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, আর নিথর নিঝুম রাতে বেদনা-ব্যথিত অন্তরে আকুল হইয়া 'মা গো' বলিয়া শাশুড়ীর বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে। আকাশ ফাটাইয়া সৃষ্টির বুকের উপর প্রকৃতির উদ্দাম তাণ্ডব-লীলা চলিতে থাকে। শুধু দীন পল্লীর নিভৃত কুটীরের ভিতর কয়টী প্রাণী বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দেয়। ঝড়ে কুটীরের ঘরগুলি মড়মড় শব্দে হেলিয়া-দুলিয়া উঠে; অমনি লতিকা বধূকে জাগাইয়া বলেন—"বউ-মা, দেখো ত, বুঝি নরেনের গলা!"

বধূ তড়িৎ-গতিতে দীপ জ্বালে, দুয়ার খোলে—কিন্তু কেহ কোথাও নাই! শুধু সম্মুখে দিগন্তব্যাপী নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া রুদ্ধ বাতাস গোঁগোঁ শব্দে আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে থাকে, বিদ্যুৎ হানাহানি করে, আর জলের ঝাপটে বধূর ঘনকৃষ্ণ চুলের রাশি ভিজিয়া উঠে।

ক্রমে বর্ষা যায়, বসন্ত আসে। কালো কোকিল আর পাপিয়া বিশ্বের নব নব বার্ত্তা বহিয়া আনে। কৃষ্ণচূড়ার বনে বনে রঙের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আকাশের কোলে কোলে শ্রান্ত বলাকার দল ফিরিয়া চলে।

এমনি দিনে কি এক অজানা পুলকে মনোরমার তরুণী হৃদয় নাচিয়া উঠে। কিন্তু, ইহাও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লতিকার দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বধূকে কাছে কাছে রাখেন, আর সকাল-সন্ধ্যায় তাহাকে সতী সাবিত্রীর কথা শুনান। মনোরমা অবাক্ হইয়া শুনিতে শুনিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—"হ্যাঁ মা, সাবিত্রীর স্বামী কতদিন বেঁচেছিল, মন্দোদরী কি করে চির-এয়োস্ত্রী হলো?"

লতিকার বুক কাঁপিয়া উঠে। তাই কতদিন, কতবার তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি বলেন—"মা গো, নরেন ফিরুক না ফিরুক, সে তোর ইচ্ছে! কিন্তু আমার বউ-মাকে সুমতি দে মা!"

তিন

বয়সের চাঞ্চল্যে মানুষের স্বভাবের ব্যতিক্রম কিছু না কিছু ঘটিয়াই থাকে। তাই লতিকা বধূকে যতই পক্ষী শাবকের মত পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পাড়া-প্রতিবেশীদিগের দুর্জ্জয় সন্দেহ বধূর উপর ততই ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সে না কি পাশের বাড়ীর যুবক নিশীথের সঙ্গে আড়ে-আব্‌ডালে কথা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে। শুধু এই পর্য্যন্তই নয়, দুপুরবেলায় জল আনিবার ছল করিয়া মনোরমা খিড়কীর দ্বার দিয়া চুপিচুপি নিশীথের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া আরো কত কি করে। মোট কথা, শেষ ব্যাপারটা যখন এমনি গুরুতর হইয়া উঠিল, তখন অমরনাথ ও লতিকার প্রাণে দুঃখ রাখিবার আর ঠাঁই রহিল না। কিন্তু লতিকা মেয়ে-মানুষ, তাহাকে স্থানান্তরেও যাইতে হয় না এবং সমাজে উঠা-বসা করিতেও হয় না; সুতরাং, বধূর কুৎসাটা যেখানে, সেখানে গিয়া অমরনাথকেই শুনিতে হইত।

এমনি করিয়াও কিছুদিন চলিল। কিন্তু ক্রমশঃ অমরনাথের পাড়ায় যাতায়াত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বধূর নিন্দায় তাঁহার কাণ পাতা দায় হইয়া পড়িল।

কথাটা নানাভাবে লতিকার কাণে আসিয়াও পৌঁছিল। কিন্তু পুত্রের অদর্শন ব্যথা তিনি এই বধূটীকে পাইয়া ভুলিয়াছিলেন বলিয়া মনোরমাকে নিজের প্রাণের অপেক্ষাও বোধ করি বেশী ভালবাসিতেন। তাই সহসা বধূকে কিছু বলিতেও সাহস করিতেন না। কিন্তু সেদিন পাড়ার ভিতর ঢুকিতেই যখন বৃদ্ধের দল অমরনাথকে ধরিয়া যাহা খুশী তাহা বলিয়া ফেলিলেন, তখন ক্ষোভে দুঃখে যতখানি না তিনি মুসড়িয়া পড়িলেন, ততখানি ইহার বিহিতের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাই ঝড়ের বেগে বাড়ী ফিরিয়া লতিকাকে সম্মুখে পাইয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আজ থেকে তোদের মত তোরা পথ দেখ্ লতি। এ বাড়ীতে আর তোরা কোনমতে থাক্‌তে পারবি না!"

কথাটা বুঝিতে লতিকার বিলম্ব হইল না। তিনি অধোবদনে মাটীর দিকে চাহিয়া, তারপর একটা দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সবই বুঝি দাদা, কিন্তু এতখানি যে ঘটে উঠবে, তা' স্বপ্নেও ভাবি নি।" বলিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া পুনরায় কহিলেন—"জানি না, ভগবানের মনে কি আছে! পোড়াকপালীকে দেখ্‌লে যে চোখে জল রাখতে পারি না! আজ যদি আমার কপালে—"

অমরনাথ সত্যই ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন। তাই লতিকার কথা শেষ না হইতেই তিনি অধীর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তোর ওই এক কথা বোন্! যে বিধবা হলো, তাকে তুই আদর করে মাছ-মাংস খাওয়াবি, সিঁথেয় সিঁদুর দিবি। কিন্তু হিঁদুর মেয়ের এতটুকু শাসন-ধর্ম্ম মেনে চলাও কি উচিত নয়?"

লতিকার চোখে সহসা জল আসিয়া পড়িল। তিনি গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না দাদা, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি! যে যাই বলুক, বউ-মাকে আমি জানি। তার চরিত্রে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। বয়সের চাঞ্চল্যে এমন একটু-আধটু হয়। দু'দিন বাদে আবার দেখ্‌বে, ওই নিশীথের কাছে দাঁড়াতে গিয়ে লজ্জায় তার মাথা কাটা যাবে। দেখো, আমার নরেন একদিন ফিরবেই ফিরবে—তখন আমি তার কাছে মুখ দেখাব কি করে?"

অমরনাথ এবার একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন—"সবই বুঝি, সবই জানি। কিন্তু, সমাজ ত তা' মান্‌তে চায় না। আর মানবেই বা কেন? একদিন নয় দু'দিন নয়, পুরো বার বৎসর কেটে গেল—আরো কি তার আশা করিস বোন্? সে যদি তোর ফিরবেই, তা' হলে এ সব কথার জ্বালা সইবে কে—আর এত বড় অকলঙ্ক কুলে কালিই বা দেবে কে?" বলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—"তার চেয়ে আমি বলি কি, এবার হতভাগীকে নিয়ে প্রয়াগে চল্—সেখানে গিয়ে কুশমূর্ত্তি দাহ এবং প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধ-শান্তিতে ওর পরকালের কাজ করে ধর্ম্মের কাছে, সমাজের কাছে খালাস হই।"

লতিকার চোখের জল এবার আরো হুহু শব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাই তিনি আর সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। শুধু নিশ্চল পাথরের মত ভাইয়ের মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন—"জানি না, ভগবানের মনে কি আছে! কিন্তু সমাজের অন্যায় শাসন মেনে চলাই যদি তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হয়, হোক্! এর বেশী আমিও আর কিছু তোমাকে বল্‌তে চাই নি দাদা।"

অমরনাথ মুখ ভার করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তারপর আর সারাদিনের মধ্যে ভাই-বোনের দেখা সাক্ষাৎ মিলিল না। রাত্রে লতিকা বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। পুত্রের আশায় আশায় থাকিয়া তিনি যেন এতদিন পাগলের মত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ যখন ধার্ম্মিক ভ্রাতার কঠোর অনুশাসনে আশার শেষ রশ্মিটুকু তাঁহাকে নিবাইয়া দিতে হইল, তখন নূতন করিয়া পুত্রশোক জাগিয়া উঠিলেও, একটা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার বোঝা যেন এতদিন পরে তাঁহার মন হইতে নাবিয়া গেল। পবিত্রচেতা নারী কতদিন মনে মনে ভাবিয়াছেন, বধূর এই উচ্ছৃঙ্খলতা কি করিয়া কমাইবেন, কি করিয়া তিনি তাহার পবিত্র শ্বশুরকুলকে এ মহাকলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করিবেন? তাই মনোরমার দীর্ঘ কেশগুলির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে পরম আবেগে তিনি তাহার মুখে একটী চুম্বন দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমার ভেতরের অবস্থা কাউকে জানাবার নয় মা, একমাত্র অন্তর্য্যামীই তা' জানেন! কিন্তু, এই আশীর্ব্বাদ করি—যেন তোর শ্বশুর-বাড়ীর মানটা বজায় রাখ্‌তে পারিস্!"

চার

ইহাদের প্রয়াগ হইতে ফিরিবার পর একদিন ভোরে অমরনাথ শঙ্কা-ব্যাকুলিত-চিত্তে লতিকাকে বলিলেন—"শুনছি, চণ্ডীতলার মাঠে ক'দিন থেকে যে বড় লোকটী তাঁবু ফেলে বাস কচ্ছে, সে না কি আমাদের নরেন। কাল সন্ধ্যায় আমার কাছে চিঠি দিয়ে এক ভোজপুরী পাঠিয়েছিল। আজ বিকেলে সে তোদের নিতে আসবে।"

লতিকা কথাটা শুনিয়া অবশ নির্জ্জীবের মত একবার

ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর বধূর কথা ভাবিয়া তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মনোরমা ঘর হইতে দ্রুত ছুটিয়া আসিল। মুণ্ডিত-কেশা, নিরাভরণা, শুক্লাম্বরা। সদ্য বিধবার একটা শুদ্ধ পবিত্রতা তাহার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। কান্না থামিলে লতিকা বধূকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"এ মুখ তাকে কেমন করে দেখাবে মা?"

মনোরমা চিরদিনই চঞ্চলা। কিন্তু প্রয়াগের জাহ্নবী-তটে সে যেন অকস্মাৎ জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনা, চপলতা তাহার দীর্ঘ ঘন কেশরাশির সহিত বিসর্জ্জন দিয়া পাষাণীর মত নির্ম্মম নিষ্ঠুরা হইয়া আসিয়াছিল। তাই নিজ অঞ্চলে শাশুড়ীর অশ্রুধারা সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"ঘরের ছেলে ঘরে এসেছেন, তাকে আদর করে বুকে নিন্ মা! দুঃখ কি?"

লতিকা অশ্রু-জড়িত-কণ্ঠে কহিলেন—"আর তুই, পাগ্‌লী?"

মনোরমা কথা বলিল না। তেম্‌নি অধোবদনে মাটীর দিকে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া, তারপর অন্তস্থলভেদী একটা উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

* * *

কি করিয়া যে দীর্ঘকালের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উচ্ছৃঙ্খল নরেন অগাধ ধনরাশি লইয়া দেশের মাটীতে ফিরিয়া আসিল, তাহা ঠিক্ জানা গেল না। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে একটী ক্ষুদ্র বালিকার সরম-ভরা মুখ, যাহা সে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পূর্ব্বের এক সজল সন্ধ্যায় দূর হইতে নীরবে আঁকিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার এ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের দিনেও ভুলিতে পারে নাই। বরং সে তাহার মনোমন্দিরে ওই বালিকা মূর্ত্তিটীকে আরো সুদৃঢ়-রূপেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ যুবা, জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ জয়ী! ধীর-স্থির, সৌম্য-শান্ত-গম্ভীর! মাতার শুষ্ক মরু-হৃদয়ে আবার স্নেহের বন্যা জাগিয়া উঠিল। মাতুলের জীর্ণ-শীর্ণ বুকখানা গর্ব্বের আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু এই অপার আনন্দের মাঝখানে আর একজন যে লজ্জাবতী লতার মত মুষ্‌ড়াইয়া পড়িল, সে মনোরমা। শুধু যে আজ লজ্জাই তাহার একমাত্র সম্বল, তাহা নহে; দুঃখ-ভয়, নিরাশা-বেদনা, ঘৃণা-অভিমান সবগুলি উপসর্গই যেন সহসা তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাই সে পাগলিনীর মত আলুথালুবেশে ঘরের মেঝেয় পড়িয়া শুধু দাপাদাপি করিতে লাগিল। প্রয়াগ-যাত্রার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে যে অনবদ্য যৌবন-প্রবাহ লীলা-চঞ্চল গতি লইয়া বিদ্যমান ছিল, গঙ্গাতীরে পলাতক স্বামীর উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দানের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহা যেন মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিন সেই তরুণ সুদর্শন যুবক নিশীথের ক্ষণিক দর্শনলাভের জন্য যাহার তৃষিত চক্ষু দুইটী মরুর ক্ষুধা বহিয়া বেড়াইত, পুরুষের অনাবিল স্পর্শ-ভালবাসা পাইবার জন্য সমস্ত শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করিত, আজ এই সুকুমার তনু গৌরবর্ণ পুরুষটিকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে তাহারই অন্তর দারুণ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, তাহার মুখের সঞ্চিত পবিত্রতা যেন সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—"আমি বিধবা! চিরদিনের মত জাহ্নবী-তীরে মাথার চুল, নোয়া, সিঁদুর সব বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি!"

তাই সেদিন অপরাহ্ণে যখন মনোরমা নরেনের চরণ যুগলে ভক্তিভরে প্রণাম করিল, তখন মুগ্ধ যুবক উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই সদ্য বিধবার মূর্ত্তি দেখিয়া আবেগে বলিয়া উঠিল—"এ কি করেছ মনু, আর একটা দিনও কি তোমার সবুর সইল না!" বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ তাহার থামিতে-না-থামিতেই সে সাদরে মনোরমাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইতে গেল।

কিন্তু হঠাৎ পদতলে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তেম্‌নি একটা দারুণ শঙ্কা ও উত্তেজনায় দূরে সরিয়া গিয়া মিনতির সুরে মনোরমা কহিল—"ও গো, আমি যে বিধবা, পুরুষের স্পর্শে যে অশুচি হবো! তার চেয়ে তোমরা আমায় নির্জ্জন কোনো বনবাসে পাঠিয়ে দাও!"

নরেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মর্ম্মভেদী কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু মনু, আমি যে—ওঃ, হতভাগিনী, এ কি কর্‌লি!"

শ্রীপ্রবোধকুমার অধিকারী
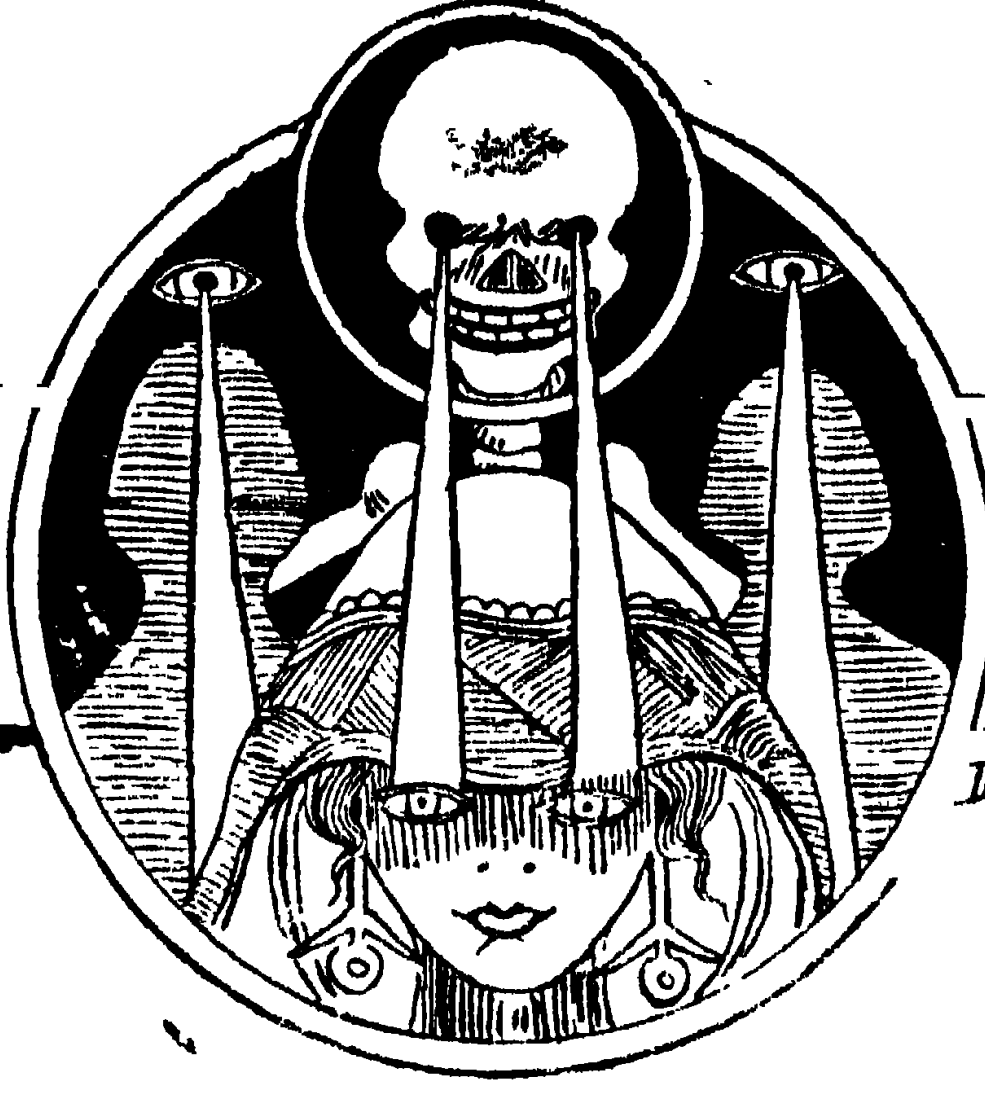
ভৌতিক গল্প

ভূতুড়ে দেশ

শ্রীকড়িলাল গোস্বামী

সেদিন সকালে মুখ ধুয়ে যেমন চায়ের কাপে হাতটা দিয়েছি, তেম্‌নি হঠাৎ বন্ধু রমেশ এসে ঘরে ঢুক্‌লো। তাকে বস্‌তে বলে চাকরকে আর এক কাপ্ চা দিয়ে যাবার জন্যে আদেশ দিলাম।

রমেশকে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে দেখে বল্‌লাম—কি হে, যদি বা বহুদিন পরে দর্শন দিলে, তা' অমন মৌনব্রত অবলম্বন করলে কেন?

সে বল্‌লে—ভাই, আমি এখানে ছিলাম না; কাল রাত্রে দেশ থেকে ফিরেছি।

বল্‌লাম—তাই ভাল। যাক্, বাড়ীর সব ভাল ত'?

সে বল্‌লে—ভাল আর কই? বাবার অসুখ দেখে এসেছি। বেশীদিন এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না; বোধ হয় দু'-একদিনের মধ্যেই চলে যাবো। একা আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না। আচ্ছা ভাই, তোর কলেজ খুল্‌তে এখনও ত' দেড়মাস বাকী। চল্ না, আমাদের ওখানে দিনকতক বেড়িয়ে আস্‌বি।

বল্‌লাম—বেশ ত', আমি রাজি আছি। আমারও ভাই এখানে ব'সে ব'সে একঘেয়ে জীবনটা আর ভাল লাগ্‌ছে না। ভাব্‌ছিলাম, কোথাও গিয়ে ঘুরে আসি কিছুদিন। তা' তুই যখন বল্‌লি, তখন ভালই হলো।

সে বল্‌লে—তবে কিন্তু একটা কথা আছে—

এমন সময় ভৃত্য চা দিয়ে গেল। বল্‌লাম—চা খেয়ে তোর কথাটা বলিস্।

চা খাওয়া হলে পর সে বল্‌লে—দেখ্ ভাই, তুই যাবি বটে, কিন্তু সে অজ পাড়াগাঁ। সেখানে না আছে নদী, না আছে কিছু। তবে বড় বড় পুকুর আছে। তাতেই স্নান করা এবং তার জলই খাওয়া হয়। আর তোর থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখার যে নেশা, সেখানে ও সবের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। তোর কিন্তু ভারি অসুবিধে হবে।

বল্‌লাম—ও সব দু'দিন না হয় নাই দেখ্‌লাম।

পরদিন আমি যাত্রা কর্‌লাম নূতন দেশের উদ্দেশে। আমার মন যে কিরূপ উৎসুক হয়ে উঠেছিল, তা' বর্ণনাতীত। যথাসময়ে আমরা চুঁচুড়া ষ্টেশনে পৌছে

টিকিট করলাম ও ট্রেণ এলে পর আনন্দিত চিত্তে তা'তে উঠে বসলাম্। দুই তিন জায়গায় গাড়ী বদ্‌লী করে আমরা 'পাগ্‌ড়া' নামক ছোট ষ্টেশনে এসে পৌছলাম।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। রমেশ বল্‌লে—কড়ি, এখানে মোটর বা ঘোড়ার গাড়ী কিছুই নেই। একমাত্র গরুর গাড়ীই সম্বল। তোরা শহুরে ছেলে—তোদের কি গরুর গাড়ী চাপা পোষাবে? তা' না হলে কিন্তু হেঁটে যেতেই হবে। এখান হতে প্রায় তিন মাইল। এখন কি কর্‌বি বল্।

বল্‌লাম—কুছ্ পরোয়া নেই! হেঁটেই চল্।

অবশেষে তাই স্থির হলো। মেটে রাস্তা। তা'তে গরুর গাড়ী চলাফেরা করায় মাঝে মাঝে বড বড় গর্ত্ত হ'য়ে গেছে। দু'-ধারে নিবিড় বন-জঙ্গল। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস কর্‌ল। তার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম আমরা এই দু'টী প্রাণী। আমি একটা 'টর্চ্চ' সঙ্গে করে নিয়ে গিছ্‌লাম। তারই আলোতে আমরা পথ দেখে চল্‌তে লাগ্‌লাম। ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধেকের বেশী পথ আমরা পার হলুম।

খট্-খট্-খট্। সহসা সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের বক্ষ ভেদ ক'রে শব্দ হলো—খট্-খট্-খট্। আমরা চম্‌কে উঠ্‌লাম। 'টর্চ্চে'র আলোতে চারিদিকে চাইলাম। কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, আবার সেই শব্দ—খট্-খট্-খট্। এবার যেন খুব কাছে মনে হলো—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। আবার দু'চার পা যেতে-না-যেতেই কি যেন একটা শাদা জিনিষ আমাদের কাছ দিয়ে চলে গেল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পচা গন্ধ পেলাম। তাড়াতাড়ি আলোটা ফিরিয়ে দেখি—যেন একটা লোক সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত করে চলে যাচ্ছে। বন্ধুর দিকে ফিরেই থম্‌কে দাঁড়ালাম। দেখ্‌লাম, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর সে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে। বল্‌লাম—ব্যাপার কি?

সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ অস্ফুট-স্বরে বল্‌লে—শ্ম-শা-ন!

ব্যাপার বুঝ্‌তে আমার বাকী রইল না। এই সময় সামান্য ঝড় দেখা দিলে; সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়তে লাগ্‌ল। রমেশ বল্‌লে—একটু জোরে হাঁট্। আর প্রায় মাইলখানেক পথ আছে।

রিষ্টওয়াচে দেখ্‌লাম, তখন মাত্র সাড়ে ছ'টা; কিন্তু শীতকাল বলে মনে হচ্ছিল, যেন অনেক রাত হয়েছে। অল্প পরেই ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। তখন আমরা শ্মশান ছেড়ে অনেকটা পথ এসে পড়েছি। এতক্ষণ রমেশ কোনো কথাই বলে নি। এখন সে বল্‌লে—কড়ি, এ পথে না এসে যদি—

তার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই একটা বিকট হাসির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌লাম। এখনও সেই হাসি মনে হ'লে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। যাক্, হাসি লক্ষ্য ক'রে 'টর্চ্চ'টা ঘুরিয়ে দেখি—এক ভীষণ দৃশ্য! জীবনে সে দৃশ্য ভুল্‌তে পারব না। দেখি একটা প্রকাণ্ড শীর্ণকায় স্ত্রীলোক। তার পেটটা কাটা। মুখটা যে কি ভীষণ তা' বর্ণনাতীত। সে বিকট শব্দে খল্‌খল্ ক'রে হাস্‌ছে।

সেই দৃশ্য দেখে আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌ল, হাত থেকে 'টর্চ্চ'টা পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়লাম। রমেশের যে কি হলো তা' আর জান্‌তে পার্‌লুম না।

যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখ্‌লাম, একটা কক্ষে খাটের ওপর শুয়ে আছি। কাছে রমেশ ব'সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আর একটি বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঠবার চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু পার্‌লাম না। রমেশ বল্‌লে—উঠিস্ নি, শুয়ে থাক্।

বৃদ্ধটি বল্‌লেন—উঠতে চেষ্টা করো না বাবা, বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ। একটু দুধ খাও—বলে এক বাটী দুধ আমার মুখের কাছে ধর্‌লেন।

এক নিশ্বাসে দুধটা খেয়ে নিজেকে একটু সুস্থ মনে করলাম। জিজ্ঞাসু-নেত্রে রমেশের দিকে চাহিতে, সে

বল্‌লে—এটা আমাদের বাড়ী। সে অনেক কথা, পরে বল্‌ব 'খন। এখন একটু ঘুমো।

ঘুম ভাঙ্‌লে দেখি সকাল হ'য়ে গেছে। রমেশ কাছে বসেছিল। তাড়াতাড়ি সে খানিকটা গরম জল আন্‌লে। আমি হাত-মুখ ধুলাম। তারপর একবাটী গরম দুধ এনে বল্‌লে—এখানে চা পাওয়া যায় না ভাই, এই দুধটা খেয়ে নে।

জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছিস রমেশ?

সে বল্‌লে—ভালই আছি। আমার বিশেষ কিছু হয় নি। ওসব আমাদের একরকম গা-সওয়া হয়ে গেছে। তোকে কিন্তু 'সকটা' বড্ডই লেগেছিল। তারপর খানিকটা থেমে আবার বল্‌লে—শব্দটা শুনে প্রথমে আমি হতভম্ব হয়ে গিছ্‌লাম। যখন আমার চেতনা ফিরে এলো, তখন তোকে কাছে না দেখ্‌তে পেয়ে আমার বড ভয় হলো। তাড়াতাড়ি তোর খোঁজ করবার জন্য এগিয়ে যাবার সময় কি একটা জিনিষে পা ঠেকে গেল। তখন ভাল করে চেয়ে দেখি—তোর জ্ঞানশূন্য দেহটা পড়ে আছে। উপায়ান্তর না দেখে তোকে কাঁধে করে নিয়ে বাড়ী আসি এবং বাবাকে সমস্ত ঘটনা বলি। তিনি তখন তাড়াতাড়ি একজন রোজা ডেকে আনেন। সে দেখে বল্‌লে—ভয়ের কোনো কারণ নাই। তারপর, কিছু পরেই তোর চেতনা হয়।

আমি কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম।

তারপর সেখানে দিন পনের বেশ আমোদেই কাট্‌ল। গ্রামের অনেক লোকজনের সঙ্গে আমার বেশ আলাপও হয়ে গেল। হারাণ পালিত গ্রামের মোড়ল। লোকটা বেশ সাদাসিদে ও আমুদে। প্রায়ই আমি তার কাছে যেতাম। সে কতরকম গল্প করত। গ্রামটা ছোট হলেও লোকের বসতি বিরল নয়।

কিন্তু আমার ভাগ্যে এ আনন্দ বেশী দিন সইল না। সহসা এমন একটা ঘটনা ঘট্‌লো, যাতে বাধ্য হয়ে আমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে আস্‌তে হলো।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি সবেমাত্র শোবার জন্য ঘরে ঢুক্‌ছি, এমন সময় হারাণ এসে বলে গেল—আমি আর রমেশ যেন সন্ধ্যার সময় তাদের বাড়ী বেড়াতে যাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি হারাণ?

সে বল্‌লে—গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা উৎসুক-চিত্তে মোড়লের বাড়ী গিয়ে দেখি যে, তার দাওয়ায় কতকগুলি লোক বসে বসে তামাক ধ্বংস কর্‌ছে। আমাদের দেখে মোড়ল উঠে দাওয়ার একপাশে একটা চাটাই বিছিয়ে দিলে। আমরা বসে বল্‌লাম—ব্যাপার কি মোড়ল, ডেকেছিলে কেন?

সে বল্‌লে—মাঠের দিকে চেয়ে থাকুন, কিছু পরেই ব্যাপারটা দেখ্‌তে পাবেন।

সাম্‌নে একটা বহুদিনের পোড়ো জমি। তার চারিদিকে গভীর বন। মাঝে খানিকটা ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি ইট স্তূপাকার হয়ে পড়েছিল।

ঘণ্টাখানেক নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। আমরা অধীর হয়ে উঠ্‌লাম। হারাণ বল্‌লে—আর একটু অপেক্ষা করুন। মিনিট কয়েক পরে হঠাৎ সে বলে উঠ্‌ল—ওই যে, ওই যে!...

দেখ্‌লাম মাঠের চার কোণে চারটে আলো। ক্রমে ক্রমে আলোগুলো অগ্রসর হতে লাগ্‌লো। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লাম—অগ্রসর হতে হতে আলোগুলো আয়তনে বাড়ছে। ক্রমে সেগুলো ইটের গাদার কাছে এসে এক জায়গায় মিলিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট অগ্নির সৃষ্টি করল।...সে আলোতে মাঠটা আলোকিত হয়ে উঠ্‌লো। ইতিমধ্যে আমি বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখি, সে নিবিষ্ট চিত্তে ও পলকহীন নেত্রে সেইদিকে চেয়ে আছে। তখন আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখি—আলোর জায়গায় চারজন লোক দাঁড়িয়ে। একজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক। তাদের গা থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।...কিছুক্ষণ পরে দেখি, একজন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মালা-বদল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। মিনিটখানেক পরে লোকগুলো সব মিলিয়ে গেল। আবার

সেইস্থানে বিরাট অগ্নি জ্বলে উঠ্‌ল। ক্রমে অগ্নি চার ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে চার কোণের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল এবং আয়তনে হ্রাস হ'তে হ'তে যখন চার কোণে গিয়ে দাঁড়াল, তখন পূর্ব্বে যেমন মিট্‌মিটে আলো দেখে-ছিলাম, ঠিক্ সেই রকম হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ কোনো কথা কইলে না। আমি হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ করে বল্‌লাম—ব্যাপার কি?

সকলেই উৎসুক-নেত্রে মোড়লের দিকে চাইল। তখন মোড়ল বল্‌লে—আজ নিয়ে ঠিক্ তিন দিন হলো এই ব্যাপারটা দেখ্‌ছি। সকলকে দেখাবার জন্য আজ এখানে ডেকে এনেছি। একটু থেমে সে আবার বল্‌লে—আমার ইচ্ছা নিকটে গিয়ে ব্যাপারটা কি একবার দেখে আসি। কিন্তু ফিরবো কি না সন্দেহ। কেবল ভাবনা হচ্ছে—যদি না ফিরি, তা' হ'লে ছেলেপুলের কি দশা হবে।

সকলেই বল্‌লাম—সে জন্য তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না। সে সব আমরা ঠিক্ ক'রে দেবো। তবে এ সামান্য বিষয়ের জন্য জীবনটা খোয়াবে না কি?

সে কারও কথা শুন্‌ল না, কেবল বল্‌লে—যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন যেমন ক'রে হোক্ যাবই যাব।

পরদিন একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে মোড়ল বাড়ী থেকে বেরুল। সেদিন আমরা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সকলে মাঠের দিকে চেয়ে ব'সে রইলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার সেই সব আরম্ভ হলো। আজ কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। আলোগুলো ইটের গাদার কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ ওলোট্-পালট্ হ'য়ে সব নিবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ শব্দ হলো। ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। হাত পা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেল। ভয়ে আমরা উঠতে পারলাম না। চুপ ক'রে ব'সে সেই অন্ধকারা-চ্ছন্ন মাঠের দিকে চেয়ে রইলাম। আবার হঠাৎ সেই আঁধারের বুক চিরে এক ভীষণ হুঙ্কার শব্দ হলো—আবার আবার—শব্দ ভীষণ হ'তে ভীষণতর হ'তে লাগ্‌ল। মহাভারতে পড়েছিলাম, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় না কি শত বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ পুনঃপুনঃ উত্থিত হয়েছিল। এখন এই মাঠটা দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র হ'য়ে উঠলো না কি! প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হ'তে লাগ্‌ল—এই বুঝি মাঠটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তারপর কি হয়েছিল আমি আর জানি না।

যখন চেতনা হলো, তখন চেয়ে দেখি, প্রাতঃ সূর্য্যরশ্মি আমার মুখের ওপর এসে পড়েছে। উঠে দেখি সকলে মরার মত প'ড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সকলকে উঠিয়ে ছুট্‌লাম। গিয়ে দেখি—হারাণের দেহটা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মাঠের দিকে পড়ে আছে। হিংস্র জন্তুতেও বোধ হয় এমনভাবে কাউকে হত্যা করতে পারে না।

সেইদিনই আমি বন্ধুকে ব'লে সে ভূতুড়ে গ্রাম পরি-ত্যাগ করলাম।

শ্রীকড়িলাল গোস্বামী
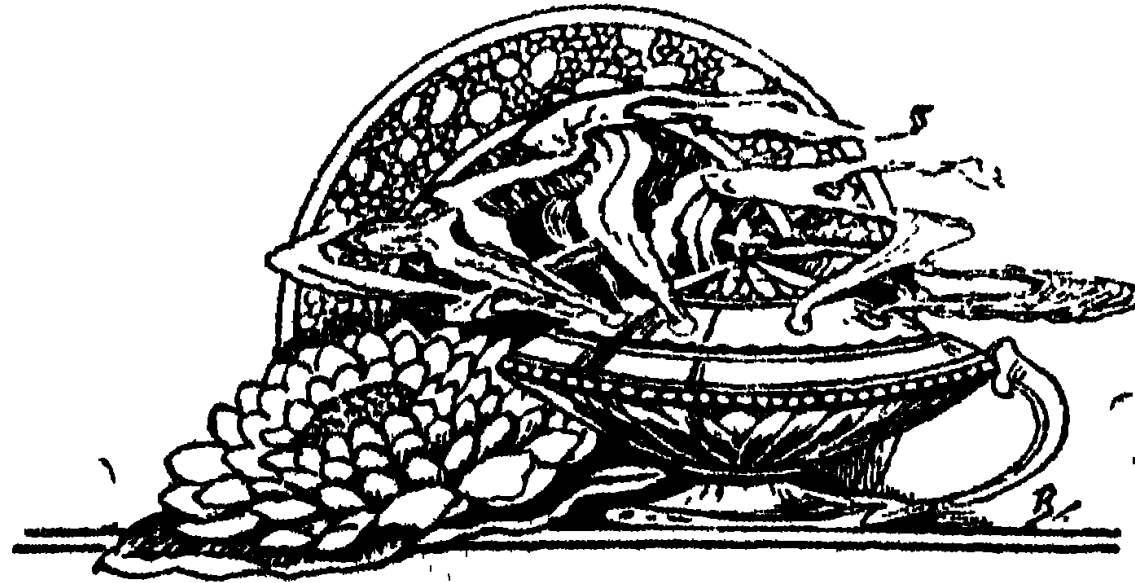
রোগমুক্তি

শ্রীবীণা দত্ত

শান্ত রজনী।

দূরে শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট আম গাছটার ফাঁক হতে আধখানা চাঁদ উকি মারে,—চাঁদটা মুমূর্ষুর মত ম্লান। মেসের সকল ছাত্রই নিদ্রিত, কেবল শঙ্করের চোখ দু'টী নিদ্রাহীন। আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা চাঁদটার সাথে সেও জেগে ওঠে। সাম্নে বই খোলা—মনটা কিন্তু তার যে কোথায় তা' কে জানে! তার পুস্তকে যে নয় তা' সহজেই বুঝা যায়।

শঙ্কর আজ সন্ধ্যায় চিঠি পায় সুধীরের, "মায়ের কঠিন পীড়া, শীঘ্র বাড়ী এস।"

সুধীর তার বাল্যবন্ধু, মাতৃহীন প্রতিবেশী, তাই একই মাতার কোলে লালিত। শঙ্কর বড় উন্মনা। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান, বাপ-মা উভয়কেই সে দেখে এক মায়ের মাঝে। নির্ম্মম সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিতভাবে সন্তানকে পালন করেছেন যে মা, সেই মা পীড়িতা। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরে সুখে-দুখে যে মা তাকে সমভাবে যত্ন করেছেন, সেই মা আজ না জানি যন্ত্রণায় কতই কাতর! শঙ্কর আর ভাব্‌তে পারে না—পড়া ভুলে যায়। স্থির করে কাল ন'টার ট্রেণেই সে হুগলী রওনা হবে।

শঙ্কর রায় দু' বৎসর পশ্চিমে কাজ কর্‌বার পর কোলকাতায় আসে এম-এ পড়তে। আগে সে কোলকাতারই কলেজে পড়ত—এখান হতে সে বি-এ পাশ করে। প্রথম যখন সে কলেজে পড়তে কোলকাতায় আসে, তখন সে হোষ্টেলে থাকৃত—সকলেই তার অতিরিক্ত ছেলেমানুষী নিয়ে ঠাট্টা করত। মাকে ছেড়ে এসে তার মন খারাপ হতো খুবই—তাই 'নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে' এই আখ্যা সে লাভ করেছিল। শঙ্কর বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। সর্ব্বদাই সে বৃত্তি নিয়ে পড়ে আসছে; দীন মাতাকে তাই অর্থাভাবে তার পড়া বন্ধ করাতে হয় নি। হোষ্টেল সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট বিশ্বনাথবাবু শঙ্করকে বেশ স্নেহের চোখেই দেখ্‌তেন। তাঁর বাটীতে শঙ্করের অবাধ গতি ছিল। কলেজে পাঠকালীন শঙ্কর বিশ্বনাথবাবুর পুত্র সুশান্ত ও কন্যা লীলার সাথে কত খেলা, কত গল্প করত। লীলা তখন সাত বৎসরের, আর সুশান্ত নয়। মেয়েটীর বুদ্ধি ছিল সাধারণের চেয়ে কিছু তীক্ষ্ণ। শঙ্করকে নানা প্রশ্নে সে উদ্‌ব্যস্ত করত। তারপর শঙ্কর বি-এ পরীক্ষা দিয়ে হঠাৎ উধাও হয় কোথায়, তা' কেউ জানে না। মা তার পাগলিনীর ন্যায় ছুটে আসেন বিশ্বনাথবাবুর কাছে। অথচ, তিনিও কোনো খোঁজ-খবর দিতে পারেন না।

প্রায় বছরখানেক পরে একদিন হঠাৎ দু'খানি পত্র আসে সুদূর এলাহাবাদ হতে শঙ্করের মায়ের ও বিশ্বনাথবাবুর নামে। তার দ্বারা জানা যায়, শঙ্কর এলাহাবাদ স্কুলে মাষ্টারী করে। শঙ্করের মাতা নাছোড়বান্দা হয়ে প্রতি হপ্তায় পুত্রকে দেশে ফিরতে কাকুতি-মিনতি করতে লাগ্‌লেন। অবশেষে শরতের মাঝামাঝি সে বাড়ী ফেরে—খোট্টার দেশ ছেড়ে সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার স্নেহের কোলে। কিছুদিন মায়ের অঞ্চলনিধির ন্যায় হুগলীতে থাকে; কিন্তু পল্লীর একটানা জীবন-যাত্রা অসহ্য হওয়ায় আবার কোলকাতায় এসে এম-এ পড়তে সুরু করে। বিশ্বনাথবাবু একদিন পথ হতে শঙ্করকে আনেন নিজ গৃহে। শঙ্কর দেখে সবই চলে একভাবে—বিশ্বনাথ বাবু বই লেখেন, সুশান্ত ও লীলা যাদের সে বি-এ পরীক্ষার পর তের বছর ও এগার বছরের দেখেছিল, তারা এখন পনের বছর ও তের বছরের, সেই রকমই ছেলেমানুষী চলে তাদের। আত্মভোলা শঙ্কর ক্ষণেকের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে—তাদের হাস্য-কৌতুকে যোগ দিতে ভুলে যায়। বিশ্বনাথবাবু যখন শুন্‌লেন, শঙ্কর ছেলে পড়ায়, আর তাতেই তার খরচ চলে, তখন তিনি পনের

টাকায় সুশান্ত ও লীলাকে পড়াবার ভার তার ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হন্।

শঙ্কর পড়ায়—লীলারা পড়ে। মাত্র পনের দিন পরে সুধীরের নিদারুণ চিঠি তার সব কল্পনা-কুসুম ছিন্ন-ভিন্ন করে তাকে টেনে আনে এক দুঃখের রাজ্যে। পরের দিন ভোরে শঙ্কর যায় মাকে দেখ্‌তে। লীলাদের জানানর সুবিধাও তার হয় না। হুগলী এসে সে দেখে মা সত্যই পীড়িতা; তবে পীড়া কঠিন নয়—অতি সামান্য। এদিকে সারা বাড়ীতে যেন একটা উৎসবের ধূম। শঙ্কর স্তম্ভিত! সুধীর চুপিচুপি বলে, "তোর কাল বিয়ে, অমত করিস নি ভাই। মায়ের একান্ত ইচ্ছা, তুই রাধারাণীকে তাঁর জীবিত অবস্থায় বিয়ে করিস।"

শঙ্কর রেগে বলে, "সে যে হবার নয় ভাই—লীলা ছাড়া জগতে কাউকে বিয়ে করতে পারব না! মাকে বুঝিয়ে বল্, তুই তো সবই জানিস।"

সুধীর ধমক দেয়। বলে, "সেকি খৃশ্চানীকে বিয়ে করবি, ছিঃ! আর সে যে তোর চেয়ে অনেক ছোট। লক্ষ্মীটি ভাই, শেষ জীবনে আর মাকে মনোদুঃখ দিস নে।"

শঙ্কর বলে, "কেন, তুইও তো মায়ের ছেলে—ছেলেবেলা থেকে একই মায়ের কোলে লালিত। আমার হ'য়ে তুই-ই বিয়ে কর্ না ভাই। আমাকে বাঁচা।"

সুধীর বলে, "দূর পাগল! আমি রাধারাণীকে বিয়ে করব কি করে—সে যে সম্পর্কে আমার বোন্! আমি করব অন্য একজনকে।"

শঙ্কর চটে যায়, পালাবার পথ খোঁজে; কিন্তু রোগক্লিষ্টা মাতার অনুরোধ শেষ পর্য্যন্ত ঠেল্‌তে পারে না—'কুইনাইন' গেলার ন্যায় বিবাহ করে রাধারাণীকেই—শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে তা' বিধাতাই জানেন। বাসরে নতমুখে কাটিয়ে পরদিন বউ নিয়ে বাড়ী আসে। মাতা বধূকে আশীষ দেন, "স্বামী-সোহাগিনী হও মা!"

শঙ্কর হাসে। তারপর সন্ধ্যার ট্রেণে পালায় সকলের অজ্ঞাতসারে।

দুই

সেদিন সোমবার। সন্ধ্যাবেলা সুশান্ত ও লীলা বাপের কাছে অনুযোগ করে, "শঙ্কর দা' আজ তিনদিন এলেন না কেন বাবা?"

বিশ্বনাথবাবু খবরের কাগজ হতে মুখ তুলে বলেন, "তাই তো, খোঁজ নেব, বোধ হয় বাড়ী গেছে 'উইক্-এণ্ড-এ'।"

এমন সময় শঙ্কর আসে। চুলগুলো তার এলোমেলো, পরণে অর্দ্ধমলিন খদ্দরের একটা ধুতি ও পাঞ্জাবী। লীলা ও সুশান্ত একসাথে চেঁচায়, "বাবা, বাবা, শঙ্কর দা' এসেছেন। যা' হোক্, অনেকদিন বাঁচবেন কিন্তু। আমরা এখুনি আপনার নাম করছিলুম।"

লীলা জিজ্ঞেস করে, "বাড়ী গেছলেন বুঝি?"

শঙ্কর করুণ দৃষ্টিতে লীলার পানে চেয়ে বলে, "থামো, সব বল্‌ছি এক এক করে; আগে তোমার বাবার সাথে দেখা করে আসি।"

বিশ্বনাথবাবু পাশের ঘরেই ছিলেন; মাঝে একটা পার্টিসানের ব্যবধান মাত্র। তিনি সাগ্রহে ডাকেন, "এস হে, এস, ব্যাপার কি?"

শঙ্কর আসে অপরাধীর মত নতমুখে। বিশ্বনাথবাবু তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে হাতের উদ্বাহ-বন্ধনীটার 'পরে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেন, "ও কি হে, ফাঁকী দিয়ে বিয়ে করে এলে না কি—ভোজটা যে মাঠে মারা গেল—তা' এতে এত লজ্জা কেন? এ তো জগতের চিরন্তন প্রথা।"

শঙ্কর শিউরে ওঠে। ভাবে, কেমন করে সে ব্যাপারটা বোঝায়—তার মন যাকে চায়, সেই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটা যে বিশ্বনাথবাবুরই কন্যা। শঙ্কর চলে আসে পড়ার ঘরে; কিছু আর বলা হয় না। এদিকে লীলা ও সুশান্ত তখন মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপ্‌তে চেষ্টা করে—কিন্তু পারে না। সুশান্ত চিরদিনই অল্পভাষী, কিন্তু লীলা কৌতুকময়ী। সে হেসে বলে, "বৌদি' কেমন হলো শঙ্কর দা,' কবে দেখাবেন তাঁকে, শীগ্‌গির বলুন।"

শঙ্কর বাক্‌হারা হয়ে লীলার পানে চেয়ে থাকে।

চোখের ভাষায় সে বোঝাতে চায় তার প্রাণ কা'কে চায়। লীলা বালিকা, তাব যে সমাজে সে বাস করে, সেখানে ত্রয়োদশবর্ষীয়া কিশোরী দশমবর্ষীয়া বালিকারই ন্যায় চপলা, সংসার-অনভিজ্ঞা, ক্রীড়াময়ী। সুতরাং সে ভাষা লীলা বোঝে না, বেণী দুলিয়ে অনবরত বল্‌তে থাকে, "বলুন না শঙ্কর দা', বৌদি' কার মত দেখ্‌তে—কার মত দাদার মত, না আমার মত?"

শঙ্কর ভাবে, কেন সে বিবাহের পূর্ব্বে পালায় নাই? লীলা বিনা জীবন তার মরুময়। ওই জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকাকে পাবার জন্য সে পাগল হয়ে ওঠে। এমন সময় সুশান্ত লীলাকে ধমক দেয়, "লীলা, চুপ কর্, তুই মানুষকে এত লজ্জা দিস কেন রে!"

দাদার ভয়ে সে চুপ করে। তারপর 'কৌমুদী' খোলে ও শব্দরূপ মুখস্থ করতে থাকে। সুশান্ত একটা অঙ্ক দিয়ে শঙ্করকে স্বপ্নপুরী হতে টেনে আনে কঠিন বাস্তবে। লীলা পড়ে ক্লাশ 'সেভেনে'—সুশান্ত ক্লাশ 'এইটে'। প্রায় তাই একই অঙ্ক নিয়ে ঝগড়া হয়। লীলা অঙ্কে বড় পারদর্শী। সে 'কৌমুদী' ফেলে বলে, "দিন্ শঙ্কর দা' আমি এক মিনিটে কষে দিচ্ছি।"

শঙ্কর সেদিন বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীতে খেয়ে মেসে যায়। সারারাত ভাবে লীলারই কথা। ভুলে যায় সমাজ, সংসার, বিবাহ, সব। সে দেখে লীলার আর তার অভিমত সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় এক। বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীতে লীলাই একা স্বদেশী দ্রব্যের পক্ষপাতী, সেও তাই। তার ন্যায় অঙ্ক ও সাহিত্যে লীলার প্রগাঢ় বুদ্ধি। কতবার কত রচনায় লীলা সুশান্তকে পরাজিত করে তাকে মুগ্ধ করেছে। রচনার যেমন দৃপ্ত ভঙ্গিমা তার, স্বভাবেও একটা তেম্‌নি ভঙ্গিমা আছে, যাতে তাকে আরো সুন্দর করে রেখেছে। তবে বয়সে লীলা বড় ছোট—তা'তে কি? দেখে লীলার বুদ্ধি, লীলার রূপ অদ্বিতীয়। তার সাথে বুঝি কারুর তুলনা হয় না। ছার রাধারাণী! লীলার যোগ্য সে কোনমতেই হতে পারে না। তবে তাদের মাঝে একটা বিরাট ব্যবধান—সেটা ধর্ম্ম। লীলা খৃষ্টের অন্ধ উপাসিকা। সে খৃষ্টকে মান্য করে জগতের মহামানব ভেবে—লীলা পূজা করে একমাত্র মুক্তিদাতা-রূপে। এ বিষয়ে কতদিন তর্ক হয়েছে। সে সব মনে পড়ে। সে সময় সুশান্ত চুপ করে গেলেও লীলা থামে না। তর্কের বেশ লীলা অনেকক্ষণ ধরে রাখে। লীলাকে পেতে হলে আগে লীলার ধর্ম্মকে বরণ করে নিতে হবে, তাও সে বোঝে। কিন্তু এইখানেই তার দ্বিধা, এইখানেই সে ইতস্ততঃ করে। মনে মনে যুদ্ধ চলে। ক্লান্ত পরাজিত হয়ে কখন সে নিদ্রা যায় জান্‌তে পারে না। ভোরের স্বপ্নে সে দেখে, লীলা তার অতি নিকটে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত-খানি দিয়ে তাকে ডাকৃছে। সে ছুটে আসে লীলার পানে উন্মত্তের ন্যায়, কিন্তু লীলাকে সে ধরতে পারে না—লীলা দুষ্টু হাসি হেসে অনন্তে মিলায়। সে সারাদিন চিন্তা করে; বিশ্বনাথবাবুকে চিঠি দেয় লীলাকে প্রার্থনা ক'রে। উত্তর আসে না। পরদিন মেসের চাকর ভজাকে এক টাকা বক্‌শিস্ আর একখানা চিঠি দিয়ে পাঠায়—বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী রমা দেবীর নামে। লীলারা তখন স্কুলে—বিশ্বনাথবাবু কাজে—গৃহে রমাদেবী একা।

রমাদেবী চিঠি পড়ে দেখেন, শঙ্কর লীলার আশায় খৃষ্টান হতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু এতে নিরপরাধী একটী কন্যার জীবন শুষ্ক হয়ে যাবে—আর তাঁদের সমাজে তের বছরের মেয়ের বিয়ে দিলে সকলে বাতুল ভাব্‌বে। তা' ছাড়া, লীলা যে জগতের কিছুই জানে না, বোঝে না। বিশ্বনাথবাবু গৃহে ফিরলে রমাদেবী তাঁকে চিঠি দেখান। বিশ্বনাথবাবু শঙ্করকে খুবই স্নেহ করতেন, তাই তার এরূপ ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হলেন। সামান্য একটী অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকার জন্য শঙ্কর নিজ ধর্ম্ম, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করতে চায়? এটা তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। তিনি শঙ্করকে সে দুরাশা ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়ে চিঠি পাঠান।

শঙ্কর ভেঙে পড়ে। ভাবে, শেষ চেষ্টা লীলাকে জানান। সারাদিন ধরে একখানা চিঠি লিখে সে লীলাকে। একবার লেখে, আবার কাটে। অবশেষে লেখা শেষ হয়। সন্ধ্যায় নিজে লীলাদের বাড়ী আসে। সুশান্ত ছিল খেলার মাঠে। শঙ্কর লীলাকে একা পড়ার ঘরে দেখে পত্রখানা তার হাতে

দেয়। লীলা বালিকাসুলভ হাস্যে জিজ্ঞাসা করে, শঙ্কর দা', আপনার আজকাল কি হয়েছে—দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন—আর পড়াতেও যে বড় আসেন না?"

শঙ্কর আরক্ত-মুখে করুণনেত্রে চেয়ে বলে, "লীলা, তুমি কি বুঝ্‌বে—আমার মন কত খারাপ! শরীরও তাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি কেবল হেসে-খেলেই বেড়াও, তাই কিছুই বোঝো না। আচ্ছা লীলা, তুমি যদি আরও একটু বড় হতে—বোধ হয় আমারি ভুল হয়ে গেছে—কেন এমন হলো, তাও বুঝি না। থাক্ গে, চিঠিটা পড়ে দেখো।"

কথা শেষ হবার সাথে-সাথেই শঙ্কর বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত।

লীলা চিঠি খুলে পড়ে—

"স্নেহের লীলা,

তোমাকে কত রকমেই না সম্বোধন করতে ইচ্ছা করে! কিন্তু তুমি হয় তো বুঝবে না, তাই 'স্নেহের' লিখ্‌লাম। তোমায় যখন প্রথম দেখি তখন তুমি মাত্র সাত বৎসরের, সে সময় হতে কেন জানি না তোমায় বড় ভাল লাগে। তারপর যে বছর বি-এ দিই, তোমার বোধ হয় মনে আছে আমি হঠাৎ উধাও হয়ে চলে যাই—এলাহাবাদে। কেন জানো? তোমার ওই সুন্দর জ্যোতির্ম্ময়ী মুখখানি ভোলবার জন্যে। জানি তোমায় চাওয়া বাতুলতা, তাই আমি পালাই প্রয়াগে—এক সাধুর সাথে। সাধু আমায় জপ-তপ শেখান। সেখানে আমি যখন ধ্যানে বস্‌তুম, দেখ্‌তুম—তুমিই আমার ধ্যানের লক্ষ্মী। শেষে সাধুগিরিতে ইস্তফা দিলাম। অফুরন্ত সময় যেন আরো বেশী করে তোমার নেশায় আমায় পাগল করে তুল্‌ত। একটা মাষ্টারী জোগাড় করলাম। তা'তেও শান্তি নেই—মায়ের জ্বালায় ছুটে এলাম। মা আমায় ঠকিয়ে বিয়ে দিলেন; কিন্তু বিশ্বাস করো, বউকে কখনও চোখ খুলেও দেখি নি। সবার কাছে জানিয়েছি, তুমি ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করতে পারি না—তবু কেন যে করলাম জানি না—ভূতগ্রস্থের ন্যায় মায়ের অনুরোধ না ঠেল্‌তে পেরে। বিয়ের পরই ছুটে এলাম তোমারই আকর্ষণে। তুমি যদি রাজী হও, আমি তোমাদের সমাজভুক্ত হয়ে তোমায় বিয়ে করি। আমার ধর্ম্ম তুমিই—আমি আর কিছুই জানি না, বুঝ্‌তেও চাই না। আমি অন্ধ হয়েছি। তুমি কি আমার হাত ধরে আমায় চালাবে না। পেছনের পানে তাকাতে চাই না—তোমায় নিয়ে চল্‌তে চাই সমাজ-সংসার পেছনে ফেলে। পাগলের পাগ্‌লামী বুঝ্‌তে চেষ্টা করো। তুমি যে বড় ছোট, বড় শিশু প্রকৃতির, তাই ভয় হয় বুঝি হেসেই উড়িয়ে দেবে। আমায় ক্ষমা করো লীলা। তোমায় জানাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেছি, নীরবে সইতে আর পারলাম না। আমারি হার হয়েছে। ইতি,

তোমার

শঙ্কর দা"

লীলা পড়ে—বোঝে না তার অর্দ্ধেকও, তবু তার কান্না আসে। এ কি লিখেছে শঙ্কর দা'! মা গো, ছিঃ, শঙ্কর দাদাকে বিয়ে! তা' কি করা যায়—তিনি যে দাদা; তা' ছাড়া, বৌদি' কি ভাব্‌বেন? হয় তো শঙ্কর দা' পাগল হয়ে গেছেন, নয় তো আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন। বড় হয়ে বাবা আমায় বিলাত পাঠাবেন। আমি বিয়ে করব না। আর সতু, গীতা, মনিকা দি' কি বল্‌বে—আমি যদি এত ছোট হয়ে বিয়ে করি। তারা কত বড়—কই, বিয়ে করে নি তো?

বিবাহ কি লীলা বোঝে না, বিবাহ করতে তার ইচ্ছাও হয় না। শেষে একটা পোষ্টকার্ডে সে লেখে, 'শঙ্কর দা', আপনি পাগল হয়ে গেছেন। বেশ ভাল ডাক্তার দেখান। বৌদি'র কাছে যান্, তিনি আপনার সেবা করবেন। আমি তো বিয়ে করবো না। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি,

আপনার বোন্

লীলা"

পরদিন সন্ধ্যায় শঙ্কর লীলার চিঠি এবং সেই সঙ্গে রমাদেবীরও নানা উপদেশপূর্ণ একখানা পত্র পায়। শঙ্করের ন্যায় দৃঢ়চেতা যুবক একটি সামান্য বালিকার জন্য স্ত্রী, মাতা, সমাজ সব ছাড়্‌তে চায় দেখে তাঁরা বিশেষ মর্ম্মাহত ও

ক্ষুব্ধ। রমা দেবী আরো জানান যে, লীলার জন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত্ নয়, ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম, ইত্যাদি অনেক কথা।

শঙ্কর ভবিষ্যৎ ভাব্‌তে চায়—পারে না। লীলার জায়গায় রাধারাণীকে বসায়, তাও সহ্য হয় না। তারপর রাত্রির ঘন অন্ধকারে সে মেস ছেড়ে কর্ম্ম-কোলাহলপূর্ণ দুনিয়ার মাঝে কোথায় মিশিয়ে যায়, কেউ তার খবর রাখে না।

*　　*　　*　　*

পাঁচ বছর পরে।

একদিন বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানায় একটী অতি পরিচিত্ স্বর শোনা যায়। সেটী শঙ্করের। তাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও প্রফুল্ল দেখায়। সে বিশ্বনাথবাবুকে তার পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলে যাচ্ছিল, তিন বৎসর নানা দেশ ঘুরে মায়ের অন্তিম-শয্যায় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁর শেষ আদেশ 'বউ-মাকে গ্রহণ করো বাবা' এ কথাটা আর লঙ্ঘন করতে পারে না। এখন সে হুগলীতেই মাষ্টারী করে—বেশ মনের সুখেই দিন তার কেটে যাচ্ছে। একটী সুদর্শনা কন্যার জনকও সে হয়েছে। লীলা পাশের ঘরে থেকে সবই শোনে, আর নিজের মনে হাসে। শেষে ছুটে এসে প্রণাম করে বলে, "শঙ্কর দা', খুকুরাণীকে আন্‌লেন না?"

শঙ্কর একবার শিউরে উঠে, পরক্ষণেই স্মিতমুখে বলে, "আনবো বই কি দিদি, নিশ্চয় আনবো—আর তুমি শুনলে সুখী হবে, তোমার নামে আমার মেয়ের নাম রেখেছি।"

শ্রীবীণা দত্ত

রাজ-সংবাদ

যাহা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল, যাহা আমরা সপ্নেও কোনোদিন ভাবিতে পারি নাই, তাহাই এক্ষণে চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। মহামান্য সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড লেডি সিম্‌সন্ নামক একজন আমেরিকান্ ধনী ব্যবসায়ীর কন্যাকে ভালবাসিয়া রাজ্যত্যাগ করিলেন।

সিম্‌সন্ কোনো অভিজাত-বংশের কন্যা নহেন। তাহা ভিন্ন, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার দুইবার বিবাহও হইয়াছিল। রাজসভা এ বিবাহ মঞ্জুর না করায় সম্রাট স্ব-ইচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। অতঃপর সম্রাট হইলেন মহামান্য ষষ্ঠ জর্জ্জ।

আমরা সম্রাট দম্পতীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

জীবন

শ্রীজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন তলা এক অন্ধকূপ। কোনো এক মাড়োয়ারী ভাইয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি সন্দেহ নেই। সেই অন্ধকূপের একটা ঘনজাল দেওয়া সাতফুট বাই পাঁচফুট ঘরে, অর্থাৎ, চোর-কুটুরীতে আমি থাকি সস্ত্রীক না হলেও স-বাক্স বিছানা। ঈশ্বর গুপ্তের সেই উক্তি—'রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কোলকাতায় আছি'—কথাটা যে কত বড় সত্যি তা' এই ঘরে প্রথম রাত কাটিয়েই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আগে বড় কষ্ট হতো। সবে দেশ থেকে আস্‌ছি, ও রকম অভ্যাস ছিল না। কিন্তু আজকাল শহুরে বাবু হয়ে ও সব 'ডোণ্ট্ কেয়ার' করি। মানে, ওটুকু 'সিভ্যালরী' থাকা দরকার; যদি না থাকে তো, সেই পাড়াগাঁয়ে ফিরেযাও। আমার যখন কোন কাজ-কর্ম্ম না থাকে, তখন আমি বুঝ্‌তে চেষ্টা করি আমার ঘরটার 'অরিজিনাল্' রং কি ছিল; যদিও এ তিন বছর গবেষণার পর এটুকু বুঝেছি যে, রামধনুর সাতটা রংয়ের যে কোনো একটা ওতে লাগান হয়েছিল কোন্ এক অজ্ঞাত দিবসে। প্রথম যেদিন এ ঘরে ঢুকি, মনে আছে মাথা ঠুকে গেছলো—যদিও মাথায় আমি মোটে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। এখন যদি বিকারের ঘোরেও ঘরের বাইরে যাই, দরজার কাছে এসে মাথা আপনাআপনি নীচু হয়ে যাবে—এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

বাড়ীটার একেবারে নীচের তলায় একটা লম্বা ঘর নিয়ে একখানা দোকান। সাইন বোর্ডে লেখা—মাণিকলাল ধরম দাস এণ্ড কোম্পানী—'হার্ডওয়ার ডিলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স।' তার পাশেই একখানা ছোট ফালি মত ঘর। টকটকে লালপাগড়ী বাঁধা এক ভদ্রলোককে প্রায়ই সে ঘরটিতে গম্ভীরভাবে বসে থাক্‌তে দেখি—বোধ হয় জ্যোতিষী হবেন উঁচুদরের, কিংবা দাঁতের পোকা বা'র করেন দুপুরবেলায়, নয় তো পাণ্ডাজীও হতে পারেন। মানে, তিনি যে কি তা' আজও বুঝ্‌তে পারলুম না। কি জাত্ তাও ত জানি না। পাগড়ী বাঁধার ঢং আর লম্বা দাড়ীর বহর দেখে মনে হয় পাঞ্জাবী—কিন্তু হাতে লোহার বালা নেই; কিন্তু দাঁতে রূপোর পেরেক মারা, তাই উনি যে হিন্দুস্থানী নন্, সে কথাও জোর দিয়ে বল্‌তে পারি না। এ ঘর দুটো ঘুরে খানিকটা বালি ওঠা ইট বের করা দেয়াল বাদ দিয়ে আর একখানা মাঝারী সাইজের ঘর—ফলের দোকান। মুসলমান মালিক চাঁপ দাড়ীতে মেহেদীর রং মাখিয়ে দিনরাত সুগন্ধি তামাক টানছেন, আর ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে লেখা কি এক হিজিবিজি ভাষার বই পড়ছেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে। এ আমি তিন বছর ধরে লক্ষ কোরে আসছি—ভদ্রলোকের জীবন যেন তামাকের ধোঁয়া, আর কোরানের বাঁধাগৎ। দু' তলার অর্দ্ধেকটা নিয়ে আছেন এক বাঙালী পরিবার। অপর অংশটা—অর্থাৎ, খান তিনেক ঘর অধিকার করেছে বাবা 'জগন্নাথে'র চেলা-চামুণ্ডারা।

বাঙালী-বাবুটীর সাথে প্রথম সপ্তাতেই আলাপ হয়েছিল। তিনিই এলেন আমার কাছে যদি একটু সোডার গুঁড়ো পাওয়া যায়—ভদ্রলোকের না কি অম্বলের রোগ আছে। তাঁকে অবশ্য নিরাশ হতে হয়েছিল। এক কাপ্ চা খাইয়ে তাঁর সঙ্গে 'দাদা' পাতিয়ে ফেললুম। নাম না কি মোহিত বাবু—হ্যাঁ, মোহিত পাল। বাপ-মা কেন যে তাঁর মোহিত নাম রেখেছিলেন, সেটা আজও বুঝ্‌তে পারলুম না। একেবারে আমড়া-চেরা চোখ, আর দা-কাটা গোঁফ—বলেন আগে কিছুদিন না কি 'বাটারফ্লাই' করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু হলো না। আজকাল আর 'কেয়ার' নেন্ না; তারাও মিলিটারী কায়দায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গোঁফের জঙ্গলে দাঁত প্রায় কুয়াসাচ্ছন্ন। মাথার সাম্নের দিকের চুল নেই; কিন্তু মোহিতবাবু বলেন—'তা' নয় তাঁর কপালটাই না কি অমন চওড়া। তারপর

গল্প জমান। তাঁর কপাল দেখে পিসীমা বল্‌তেন—মোহিত আমাদের একটা কেউকেটা না হয়ে যায় না। ভদ্র-লোকের স্ত্রী চিররুগ্না—এসে অবধি দেখছি তারপিন তেল আর মকরধ্বজ নিয়েই তিনি দিন ভোর করছেন। রাতে তেল মালিশ, আর জিব দিয়ে খল-নুড়ি চাটাই তাঁর একমাত্র কাজ—এই যেন তাঁর জীবন। জগরনাথদের সাথে বাক্যিক আলাপ হয় নি; কিন্তু ত'দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বক্ষণই সচেতন থাকি—তাদের অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সঙ্গীত কানের পরদায় সব সময়ই আঘাত করে। ওদের কেউ বা বাবুর বাগানের মালী, কেউ বা রাস্তায় জল দেয়, আবার কেউ বা সকালবেলায় নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বাসি কাপড়টা ঝেড়ে নিয়ে ফুল-গঙ্গাজল হাতে ঝুলিয়ে—বাবার মাথায় জলের ছিটে দিয়ে বেড়ায়। আমার দরজার চৌকাঠে বস্‌লে ওদের জীবনের বেশ একটা আভাষ পাওয়া যায়; ওদের কার কি সম্পত্তি আছে, তা' আমিই বোধ হয় ভাল জানি ওদের চাইতে। নীল শাদা জমির ওপর লাল ডোবা কাটা সাড়ে তিন হাত এক গামছা ওদের প্রত্যেকেরই আছে দেখ্‌তে পাই; সেগুলোকে যদি গরম জলে ফুটিয়ে 'ডিস্‌টিল্' করা যায়, তা' হলে তা' থেকে অন্তত পো তিনেক নানা রকম তেল বেরুবে, এ আমি জোর করে বল্‌তে পারি। পেট কাপড়ে পানের সরঞ্জামাদির একটি 'বটুয়া' বেশ আর্টিষ্টিকভাবেই ওরা ঝুলিয়ে রাখে। ওদের মধ্যে কয়েকজন ছোকরা রকমের লোকের আরসী আঁটা ছোট কৌটো আছে; বেশ গর্ব্বিত-ভাবে তারা মাঝে মাঝে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে এত মুখভঙ্গী সহকারে যে, স্বয়ং 'লন্‌চ্যানী'ও বোধ হয় ওদের কাছে হার মানবে। ঘরটাতে যিশু খৃষ্টের পবিত্র ক্রশাকারে মোটা দড়ি টাঙান—তা'তে নানা জিনিষের সর্ব্বক্ষণ প্রদর্শনী—বিনা দর্শনীতে। সে সব জিনিষের একটা বিশেষত্ব এই যে, তারা আজও ধোপার কোপে পড়ে নি। এই সব জগরনাথরা ভারী মেয়েলীভাবে তৈরী—নোংরা কাপড় গোছান আর চুলের পারিপাট্য সাধন কর-তেই এদের ঘরোয়া জীবন কাটে, আর সুর-লয় সব সময়ই গলায় আট্‌কে আছে। ওদের খুব অল্প সময়ই আমি চুপ করে থাক্‌তে দেখি। কোন না কোন একটা বিষয় নিয়ে ওদের গবেষণা চলেছেই। পান চিবুন আর তাস খেলাতেই বেশী আনন্দ—ওই যেন ওদের জীবন।

উৎকলবাসীদের উৎকট গন্ধময় ঘরগুলো পেরিয়ে ঝাঁঝালো গন্ধময় এক 'ল্যাভাটরী।' তার পাশে মাত্র একখানি ঘর; বোধ হয় এক সময় 'বাথরুম' ছিল। তা'তে থাকে এক মুসলমান গাড়োয়ান। বেচারার অবস্থা দেখে ভগবানের ওপর ভক্তি আমার সত্যিই অনেকটা বেড়ে গেছে এই ভেবে যে, আমার অবস্থা যত মন্দই হোক্ না কেন, তিনি আমাকে ওর মত অতটা কষ্ট দেন নি। আমার ঘরটাও ওর চাইতে বড়। জান্‌লা একটা এক সময় ও ঘরের অবশ্য ছিল, কিন্তু সেদিকে একটা বাড়ী উঠে আলো-বাতাসের গলা টিপে মেরেছে, কাজেই ও ঘরে তাদের 'নো য়্যাড্‌মিশন্।' ও একা থাকে না, বউ আছে। আশ্চর্য্য, এ বদ্‌খেয়াল কি করে ওর মাথায় ঢুকল। ওদের 'বোহেমিয়ান' সংসারটার অভাব-অনটনের আর অন্ত নেই—তবু বউটির মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। অল্পেই ওরা সন্তুষ্ট—কিন্তু ভগবান সামান্যভাবে বাঁচবার উপকরণ দিয়েও ওদের সংসারে পাঠান নি। কি অবিচার! গাড়োয়ানটিই এই বাড়ীর 'লেটেষ্ট' আমদানি—তাও বছর ঘুরতে চল্‌লো। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও ওর মুখে হাসি দেখি নি। কিন্তু চুপচাপ বসেও ও থাকে না; সর্ব্বক্ষণ বিরক্তি আর গালিগালাজ করছে বউকে। জীবন যে ওর কাছে নীরব। সংসার যে বিষিয়ে গেছে ওর কাছে। কতটুকুই বা সে চায়—দু'বেলা ভরপেট আহার, আর পরণের কাপড়—লজ্জা নিবারণ করতে হবে ত? বেচারা তাও পারে না উপায় করতে। দরিদ্রের ক্রন্দন—কে শুন্‌বে? এই যন্ত্র-যুগের জয়ধ্বনির মধ্যে তার বুভুক্ষিত কণ্ঠস্বর পাত্তা পায় না। অল্পদিনই হয় তো বিবাহ করেছে—ইচ্ছা হয় বই কি পায়ে চলার বন্ধুর হাসিমুখ দেখ্‌বার—কিন্তু হায়রে, উপায় নাই! সে যে গাড়োয়ান—সে যে নিঃস্ব গাড়োয়ান। মানুষের সহ্যের সীমা আছে তো! এত দারিদ্র্য সে সইতে পারে না—ভুল্‌তে চায়—কাজেই তাড়ি বা ধেনো মদে পেট ভর্ত্তি করে পয়সা কিছু এলেই।

তারপর কেমন করে সে জীবন্ত রাক্ষস এবং একটা জলন্ত বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়, সে কথা তো সবাই জানে।

সকালবেলা। মোটা একটা নিম ডাল নিয়ে দাঁতন করছি—নীচে ভারি গলার চেঁচামেচির আওয়াজ কানে এল। কিছুক্ষণ বাদ বুঝ্‌লুম—ব্যাপারটা গাড়োয়ানের বউ-টিকে নিয়ে। কবে বুঝি গাড়োয়াননের জর হ'লে ও কিছু ফল কিনেছিল আনা তিনেকের, আমাদেরই নীচেকার ফল-ওয়ালার কাছ থেকে। তার দাম আজও শোধ করে দেওয়া হয় নি। তিন আনা পয়সা তো, ভাব্‌লুম—দিয়ে দি' না। কিন্তু ভেবে-চিন্তে দেখ্‌লুম যে, ওরা আমায় আর শোধ দিতে পারবে না। তা' ছাড়া, এতে আমার এক সপ্তাহ চা খাওয়া চল্‌বে। কাজেই মুসলমান ফলওয়ালা আরও কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করে বউটিকে বিশ্রী একটা ইঙ্গিত করে গজগজ করতে করতে কাজে চলে গেল। আমি মুখ ধুতে নেবে দেখি, বউটি তখনও সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সারা মুখটা তার বেদনার অপমানে লাল করে। গাড়োয়ানটা একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল। আমার রাগ হ'তে লাগ্‌ল—তোদের আবার ফল খাবার সখ্‌ কেনরে বাবা! খেতে পাস না—আবার নবাবী। বউটি এতক্ষণ চুপ করেছিল। হঠাৎ রেগে একেবারে ফেটে পড়ল—যে খেতে দিতে পারে না, যার রোজগার করবার ক্ষমতা নেই, তার আবার বিয়ে করা কেন—লজ্জাও হয় না! ডুবে মরুক না কেন—গঙ্গার জল তো আজও শুকোয় নি! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাত প্রায় বারোটা। শুতে যাবার চেষ্টা করছি, গাড়োয়ানটা বাড়ী ফিরলো—কথাবার্ত্তার ধরণে বুঝ্‌লুম বেশ টেনে এসেছে। নেশাখোর—কিন্তু কেন? এর উত্তর কে দেবে? তারপর সারারাত চল্‌লো ওর নেশার ঝোঁক্‌—বাজে বকা, বিশ্রী গান, ঠাট্টা, আর নসীবের ওপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। তারপর কোন্‌ সময় হয় তো নিদ্রা এসেছিল অবসাদের হাত ধরে—ওকে পাঠিয়ে দিতে সব ভোলাদের দেশে।

সকালে উঠে দেখি ও দরজা ঠেসান দিয়ে একইভাবে বিড়ি টেনে যাচ্ছে, যেন কোন কিছুই করবার ওর নেই। ওকে দেখে মনে হলো যে, সংসারের পাঁকের মাঝে ও নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে লাগাম-বিহীন ঘোড়ার মতই—যে কোন বিপদই আসুক না কেন, ও তার পরোয়া করে না। ভাব্‌লুম, এই তো জীবন—যার এত গর্ব্ব, এত আড়ম্বর, যার জন্যে এত প্রচেষ্টা!

শ্রীজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী
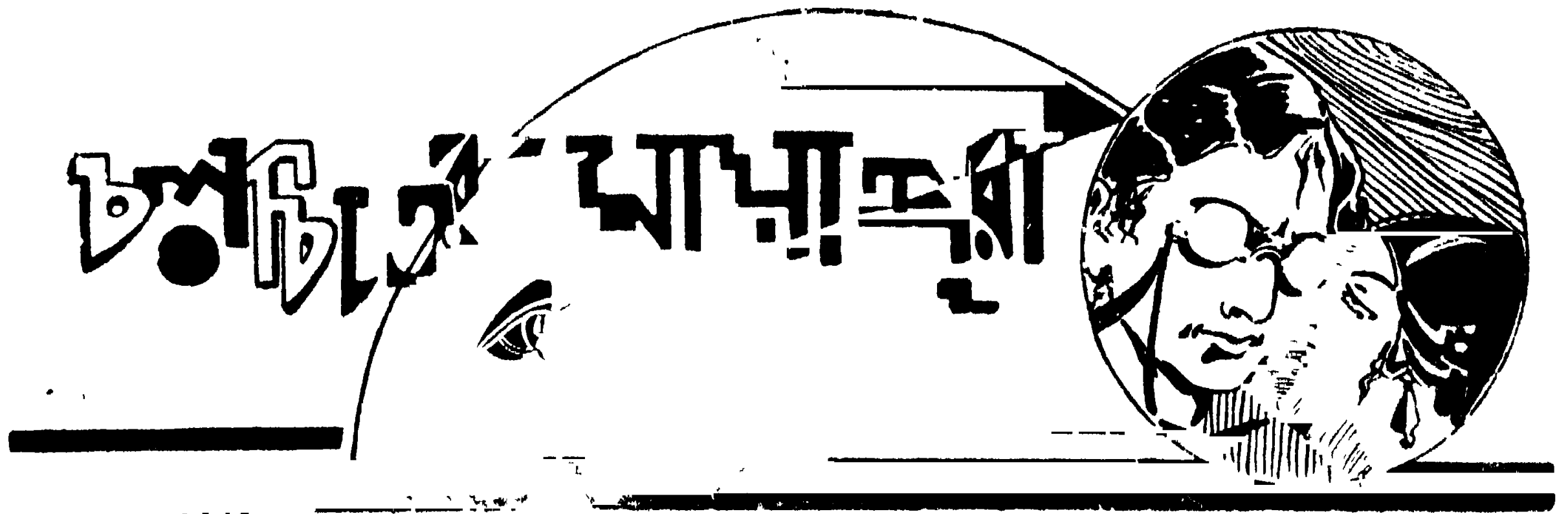
চিত্র-জগৎ

এবার কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে তিনটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাগারে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্রের তিনখানি উপন্যাস নাট্যরূপে রূপান্তরিত হইয়া ছায়াছবি দর্শকবৃন্দকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। কথাশিল্পী শরচ্চন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসগুলিই মনস্তত্ত্বমূলক। চরিত্র বিশ্লেষণই তাহার বৈশিষ্ট্য। বাক্য-বিন্যাসই তাহার অমর কীর্ত্তি। সেগুলিকে ছায়ার পর্দ্দায় প্রকাশ করা শুধু কঠিন নহে, দুঃসাহসিকতাও বটে।

বাংলাদেশে রসবেত্তা দর্শক নাই বলিলে অবিচার করা হয়। তবে রস-বিশ্লেষণকারী অভিনেতা ও অভিনেত্রী একরূপ নাই বলিলেই চলে। তাই যখনই শরচ্চন্দ্রের বইগুলি পর্দ্দায় প্রকাশ হইবে শুনি, তখনই একটা বিরুদ্ধ মত মনে মনে পোষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। তথাপি, এই সৎ-প্রচেষ্টাকে বন্দনা না করিয়াও মন নীরব থাকিতে চাহে না। বাংলার স্বনামখ্যাত প্রযোজক প্রযোজিত 'গৃহদাহ' লইয়াই আমাদের কথা সুরু করা যাক্। 'গৃহদাহ' একখানি যৌনদ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস। দুই বন্ধু মহিম ও সুরেশের বন্ধুত্ব পাকা সোনার মত। কিন্তু ব্রাহ্ম-মহিলা অচলাকে ভালবাসিয়া মহিম হইল সুরেশের বিরক্তিভাজন। সুরেশ মহিমকে বকিয়া-ঝকিয়া সেই ছিপ্‌ছিপে হাড়সার 'পুঁথি পড়া বেটাছেলে মেয়েটাকে' ভুলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাইল। তবু সে নিশ্চন্ত হইতে পারিল না; সেই মেয়েটার বাড়ী গিয়া বিচ্ছেদটাকে পাকা করাইয়া লইতে চাহিল। কিন্তু সেইখানেই হইয়া গেল গল্পের সুরু। 'বেটাছেলে মেয়েটাকে' দুই কথা শুনাইয়া দিতে গিয়া সুরেশ এমন অনেক কথা শুনিয়া আসিল, এমন একটা রূপ মনে আঁকিয়া আনিল, যাহা তাহার জীবনে মস্ত বড় বিপর্য্যয় ঘনাইয়া তুলিল। তারপর কেমন করিয়া সে ধাপে ধাপে নামিয়া গেল, তাহার মত আদর্শ চরিত্র কত বড় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, এবং অচলার মত শিক্ষিতা মেয়েও মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় কি না করিতে পারে, গ্রন্থকার এই সকল অতি সুকৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন।

বইখানি যতই ভাল হউক না কেন, সংস্কারবদ্ধ আদর্শবাদী বাঙালী ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন নাই; বরং নিন্দাই করিয়াছেন। এমনি একখানি বইকে পর্দ্দায় স্থান দিতে গিয়া প্রমথেশবাবু অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। হউক দুঃসাহস, তথাপি তাঁহার এই সৎ প্রচেষ্টাকে আমরা সানন্দে বরণ করি। তাঁহার প্রযোজনার মধ্যে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটিকে সুবিন্যস্তভাবে সাজাইবার কৌশল তিনি জানেন। পাত্র-পাত্রী যে নির্ব্বাচনে তাঁহার 'সিলেক্‌স্যান্' জ্ঞান আছে, তাহা বেশ জানিতে পারা যায়। মহিমের ভূমিকা

অভিনয়ে তিনি যে সংযত শিল্পকলা জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। অমর মল্লিকের মহিমবাবু সুন্দর হইয়াছে। সুরেশের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী অভিনয় মন্দ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার আকৃতি চরিত্রপোযোগী না হওয়ায় অধিকাংশ সময়ই অন্তর স্পর্শ করে নাই। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে অচলার ভূমিকায় যমুনাকে। তাঁহার মধ্যে সত্যই সু-অভিনেত্রীর বহু গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার কতকগুলি 'পোজ্' এত সুন্দর হইয়াছে যে, অনায়াসে প্রসিদ্ধ বিলাতী অভিনেত্রীর সহিত তুলনা করা যায়। আর একজনের উল্লেখ না করিলে অবিচার করা হইবে—তিনি মলিনা। নির্ম্মলার ভূমিকায় তিনি যে সাবলীল সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন, তাহাও কম প্রশংসার যোগ্য নহে।

ছবিখানির আলোক-শিল্প সুন্দর, শব্দ-গ্রহণ ও দৃশ্যপট প্রশংসনীয়।

* * *

সর্ব্বজননিন্দিত 'গৃহদাহ'কে মনোনীত করিয়া প্রমথেশ-বাবু যেমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রযোজক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ শরচ্চন্দ্রের সর্ব্বজনপ্রিয় 'দত্তা' উপন্যাসখানিকে ছায়া-ছবিতে রূপান্তরিত করিয়া তেমনই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

পাশাপাশি গ্রাম হইতে তিনটি ছেলে এক স্কুলে পড়িতে আসিত। লেখাপড়ায় যেমনই তিনটিতে ছিল অন্য সব ছেলের চেয়ে ভাল, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসাও ছিল তেমনি নিবিড়তর। কালক্রমে বনমালী ও রাস-বিহারী কলিকাতায় আসিয়া শুধু গ্রামের মায়া ত্যাগ করিল না, বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখাইয়া বসিল। জগদীশই শুধু গ্রামেই রহিয়া গেল। তারপর অনেক দিন পরের কথা। বনমালী অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়াও, একমাত্র কন্যা বিজয়াকে রাখিয়া যখন দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখনও বিজয়ার বিবাহ দেওয়া হয় নাই। কি জানি বনমালীর মনে কি ছিল! রাসবিহারী অভিভাবকের ছদ্মবেশে আসিয়া সস্নেহে বিজয়ার মস্তকটিকে নিজের বুকের উপর তুলিয়া লইলেন। তারপর নিজের একমাত্র পুত্র বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ দেওয়াই বনমালীর শেষ ইচ্ছা ছিল ইহাই লোক-সমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন। হয় ত বিবাহ হইয়া যাইতও—কিন্তু বিজয়া দীর্ঘদিন পরে নিজেদের পরিত্যক্ত ভিটায় বেড়াইতে আসায় সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বেই মদে ও দেনায় জর্জ্জরিত হইয়া জগদীশ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। ঘটনা-চক্রে নরেনকে দেখিয়াই বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। রাসবিহারী এবং বিলাসের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাদের ভালবাসা গভীরতম হইয়া উঠিতে লাগিল। তারপর নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াও একদিন নরেনের সহিত বিজয়ার বিবাহ হইয়া গেল। প্রকাশ হইয়া পড়িল—নরেনের সহিত বিবাহ দিবার অঙ্গীকার দুই বন্ধুর মধ্যে বহু পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই এতদিন বিজয়ার বিবাহ দেওয়া হয় নাই। দীনেশ-বাবু তাঁহার প্রযোজনার মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই। খুব সাধারণভাবেই গল্পটিকে সাজাইয়া লইয়াছেন। যদিও ইহা চলনসই পর্য্যায়ে পড়ে, কিন্তু তিনি চরিত্র নির্ব্বাচনে আমাদের একান্তভাবে হতাশ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় শিল্পী প্রযোজকের পক্ষে এ অপরাধ সত্যই অমার্জ্জনীয়। নরেনের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল আমাদের হতাশ করিয়াছেন। তাঁহার ঘাড় বাঁকাইয়া পা টানিয়া টানিয়া চলা এবং দাঁত বাহির করিয়া 'একটিং' একান্ত অসহ্য। নায়ক অনুযায়ী আকৃতিও তাঁহার নাই, বাচন-ভঙ্গীও প্রশংসার যোগ্য নহে। তথাপি কেন যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একাধিক পুস্তকে নায়কের ভূমিকায় নির্ব্বাচন করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। বিলাসের ভূমিকায় শ্যাম লাহা আলোচনার অযোগ্য। একমাত্র রাসবিহারীর ভূমিকায় অমর মল্লিক সু-অভিনয় করিয়া দর্শকদিগকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিজয়ার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী স্থানে স্থানে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিলেও তাঁহার আকৃতি প্রতি পদে অভিনয় মাধুর্য্য ব্যাহত করিতেছিল। চন্দ্রমুখীর চরিত্রের মধ্যেযে উদাস ক্লান্ত

দৃষ্টি শোভা পায়, বিজয়ার ভূমিকায় তাহা অশোভন। তাহা ছাড়া, দিন দিন তাঁহার সর্ব্বদেহে যে প্রৌঢ়ত্বের ছায়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতীকার কি হইবে? নতুবা কি বাচন-ভঙ্গী, কি ভাবাভিব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়েই চন্দ্রাবতী সম্পদশালিনী। সত্যই ইঁহার জন্য দুঃখ হয়।

শব্দ-গ্রহণ আদৌ প্রশংসা-যোগ্য হয় নাই, আবহ-সঙ্গীত ইত্যাদি চলনসই।

* * *

শরচ্চন্দ্রের আর একখানি সর্ব্বজন-প্রিয় উপন্যাস 'পণ্ডিত-মশাই।' বৈষ্ণবের মেয়ে কুসুমকে বিবাহ করিয়াছিল পণ্ডিত-মশাই—কিন্তু তাহাকে লইয়া ঘর-করা আর ঘটিয়া উঠে নাই। কুসুমের মায়ের কি একটা অখ্যাতির দরুণ পণ্ডিত-মশাই অন্যত্র বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কুসুমও ভায়ের ঘরে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া রহিল। কিন্তু এই থাকাটাই অদৃষ্ট-দেবতার ভাল লাগিল না। একটী মাত্র পুত্র চরণকে রাখিয়া পণ্ডিত-মশাইয়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বর্গলাভ করায় এবং কুসুমের মায়ের অপবাদটা মিথ্যা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় পণ্ডিত-মশাই ও তাঁহার জননী কুসুমকে তাঁহাদের গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই-খানেই বাধিল গোল। মূর্খ ভাই কুঞ্জ বোনের এই আমন্ত্রণটা যতটা গৌরবের ধরিয়া লইল, কুসুম তাহা ততটাই অপ-মানের ভাবিয়া তাতিয়া উঠিল। অবশেষে চরণের মায়ার ফাঁদে পড়িয়া সে যখন স্বামীর ঘর স্বীকার করিয়া লইল, তখন চরণ মহামারীর আক্রমণে পরপারে চলিয়া গিয়াছে। গল্পটি যেমনি করুণ, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। সতু সেন অত্যন্ত সাধারণভাবে গল্পটিকে সাজাইয়া গেলেও, পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচণ গুণে ইহা অতি হৃদয়গ্রাহী চিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

সতু সেনের নির্দ্দেশ মতে শরৎবাবুর এ ছবিখানির রূপও নেহাৎ মন্দ লাগিল না। প্রধান ভূমিকায় শান্তিগুপ্তা, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের অংশ ভালই করিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক চরিত্রে তিনকড়িবাবু, যোগেশ চৌধুরী, ও প্রভা তাহাদের অংশ বেশ অভিনয় করিয়াছেন; তাহাদের সাহায্যে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই।

শরৎবাবু তাঁহার পুস্তকে নারীর অভিমান দেখাইতে গিয়া কুসুমকে বাহ্যত হৃদয়হীন দেখাইলেও, অন্তর তাহার কতখানি দুর্ব্বল তাহা শেষ পর্য্যন্ত চিত্রিত করিতে ভুলেন নাই। রতীনবাবু পণ্ডিত-মশাইয়ের অংশ বেশ সংযতভাবেই অভিনয় করিয়াছেন।

কুঞ্জের নির্ব্বুদ্ধিতার সুন্দর চিত্র রবি রায় নিজ চেষ্টায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বৃন্দাবনের মাও আমাদের চক্ষের নিকট মাতৃমূর্ত্তি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। চরণের ভূমিকায় সাগরিকাকে ভোলা যায় না। বেণুকার ব্রজেশ্বরীর অংশ অভিনয় করা নিছক দুর্ব্বলতা। সুরেশ দাশের চিত্র গ্রহণ নিন্দনীয় নহে। মোটের উপর চিত্রখানি দর্শকদের উপভোগ্য হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

* * *

অত্যন্ত মামুলী একটী আখ্যান-বস্তু ভাল লইয়াও যে কত সুন্দর চিত্র আঁকা সম্ভব, বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত দেবকী বসু তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—এই 'সোণার সংসারে।'

গল্পাংশ এই—একটি ছোট্ট সংসার—স্বামী, স্ত্রী ও বছর তিনেকের একটি ছোট ছেলে। স্বামী রমেশ মেসে থাকিয়া শহরে চাকুরী করিত। চার বছর পরে ফুল-শয্যার তারিখে হঠাৎ সে একদিন স্ত্রী রমার কাছে ছুটিয়া আসিল।

সেইদিন রাত্রেই গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমিদার রমেশের বাড়ী আক্রমণ করিয়া রমাকে লইয়া পলায়ন করিল। রমেশ একাকী ওই দস্যুদিগের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন! সে আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জমিদার তাহার অনুচরগণকে রমার পুত্র হত্যা করিবার আদেশ দিল। কিন্তু ঘটনা-চক্রে তাহারা তাহাকে না মারিয়া পথের মধ্যে ফেলিয়া গেল। শেষ রাত্রে এক শকট-চালক তাহাকে লইয়া অনাথ-আশ্রমে দিয়া আসিল।

এদিকে রমা পাপিষ্ঠ জমিদারের হাতে তাহার নারীত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়া নদীতে প্রাণত্যাগ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এক দয়াবান যুবক তাহাকে তুলিয়া লইয়া সেবা-সদনে রাখিয়া আসিল।

রমেশ বহু অনুসন্ধান করিয়া স্ত্রী-পুত্রের কোনো খোঁজ করিতে পারিল না। তারপর বহু বৎসর পর তাহাদের সকলের মিলন হইল। আবার পলাশপুরে তাহাদের 'সোণার সংসার' গড়িয়া উঠিল।

চিত্র-গ্রহণ-কর্ত্তা শৈলেন বসু, শব্দ-গ্রহণ সি এস্ নিগাম, সঙ্গীত অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। ছায়াদেবী,মেনকা, আজুরী, অহীন চৌধুরী, জীবন গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি, ভূমেন রায়, বিনয় গোস্বামী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

অহীনবাবুর স্যার শঙ্করনাথ তাঁহার পূর্ব্ব সকল অংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। জীবনবাবুর অভিনয়ও বেশ স্বাভাবিক। ধীরাজ সুন্দর। তুলসী লাহিড়ী তাঁহার 'মণিকাঞ্চনে'র পর এই প্রথম যথার্থ শিল্পীর রূপ দেখাইয়াছেন। রতীন তাঁহার নিজ মান্য রক্ষা করিয়াছেন।

* * *

রোমিও জুলিয়েট্

[মেট্রো]

সেক্সপীয়রের আদর্শ প্রেম-নাটক। জুলিয়েটের অংশ প্রাণবন্ত করিয়াছেন নর্ম্মা শিয়ারার। লেশ্‌লি হাওয়ার্ডের রোমিও উত্তম। ব্যারীমুরের মারকুশিও সুন্দর বলিলে বোধ হয় অনেকটা বলা বাকী থাকিয়া যায়। বেসিল্ রাথ্‌বোন্‌স্ টাইবল্‌ট্ চরিত্রের নিষ্ঠুরতা চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আর যে কয়জন এ চিত্রে রূপ দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহারা সি অব্রে স্মিথ, এনডি ডিভাইন এড্‌না, মে অলিভার, রেজিন্যাল্ড ডেনি।

গল্পটীর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন—তথাপি কিছু না বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। কাপুলৎ ও মণ্টেগু দুইটী ধনী পরিবারের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য ছিল। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিতে পারিলেই যেন সন্তুষ্ট হইত।

বৃদ্ধ কাপুলৎ একটী ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। মণ্টেগু-পরিবার ভিন্ন সমস্ত ভেরোনাবাসী সেই ভোজে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বেন্‌ভোলিও রোমিওর প্রিয়তম বন্ধু। রোমিওকে লইয়া তাহার ভাবী-পত্নী রোজেলাইনের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী ভেরোনায় আর কেহ আছে কি না ইহার সত্যতা নিরূপণ করিতে সে এই ভোজে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইল।

টাইবল্‌ট্ রোমিওকে চিনিতে পারে এবং নিজের কাকাকে তাহা বলে। বৃদ্ধ তাহাকে কোনরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। রোমিও কাপুলতের কন্যা জুলিয়েটের রূপ-মাধুরী দেখিয়া মোহিত হয়। কিন্তু পরস্পরে জানিতে পারে যে,—তাহারা কে।

ভোজের পর বহু বাধ্য সত্ত্বেও রোমিও গিয়া জুলিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ করিল। দুইজন দুইজনের জন্যই উন্মত্ত—কিন্তু ধাত্রীর আহ্বানে উভয়কে অনিচ্ছায় পৃথক হইতে হইল।

গোপনে লরেন্‌স্ নামক ধর্ম্মযাজকের সহায়তায় উভয়ের বিবাহ হইল। টাইবল্‌ট্ রোমিওর বন্ধুকে হত্যা করিল। রোমিও তার প্রতিশোধ লইল—কিন্তু আইন তাহাকে ভেরোনা হইতে বাহিরে যাইবার আদেশ দিল।

রোমিওর বহিষ্কৃতির কয়েক দিন পরে বৃদ্ধ কাপুলত জুলিয়েটের বিবাহের আয়োজন করিলেন। ধর্ম্মযাজকের পরামর্শে জুলিয়েটকে একপ্রকার ঔষধ সেবনে মৃত প্রায় করিয়া রাখা হইল। কথা রহিল—রোমিও তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে।

কিন্তু এইখানেই বিশ্ব-কবির অমর লেখনী যে দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। রোমিও বুঝিল না জুলিয়েটের এ মৃত্যু কেবল ভান। তাহারই জন্য সে এরূপ করিয়াছে। এ মৃত্যু আত্মদান নহে—তাই ক্ষোভে-দুঃখে সে নিজ জীবন নাশ করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

সময়ে জাগরিতা জুলিয়েট্ তাহার প্রিয়তমের অবস্থা দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু বরণ করিয়া লইল।

দুই পরিবারের মধ্যে শান্তি-সেতু বাঁধিতেই যেন ইহারা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বাদশ বর্ষ | ১৩৪৩, মাঘ | দশম সংখ্যা

ব্যবধান

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

বেলা দুইটা বাজিতেই অতি সন্তর্পণে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া উজল একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। পথের ধারেই একটা ছোট একতলা বাড়ীর দরজার উপর দাঁড়াইয়া তাহারই সমবয়সী একটী ছেলে আকুল আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া আছে। দূর হইতে উজলকে দেখিয়া সে দীপ্তমুখে ছুটিয়া কাছে আসিয়া বলিল—এত দেরী কর্‌লি কেন, দেখ্‌ তো আমি কখন থেকে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

—কি করব ভাই, জানিস তো আমার অবস্থা। বাবা-মা না ঘুমোলে যে আসতে পারি না; তাই তো এত দেরী হয়ে যায়। নইলে কখন আসতুম।

—আচ্ছা, তোকে তোর বাবা-মা দুপুরে বাইরে আসতে, কারো সঙ্গে মিশতে বারণ করেন, না?

চলন্ত মেঘের ছায়াপাতে ম্লান দিনের আলোর মত নিমেষে পুলকের পুলক-দীপ্ত মুখের সকল দীপ্তিটুকু নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গেল। ব্যথা-বিচল-কণ্ঠে সে কহিল—এতদিন কিছু বলেন নি, কিন্তু আজ ক'দিন থেকে বাবা রোজ আমায় তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেন। তোমার বাবা না কি বলে দিয়েছেন—আমি যেন আর তোমার সঙ্গে মেলামেশা না করি।

—আমাকেও বাবা সেই কথা বলেছেন। কিন্তু কেন ভাই পুলক, তুই জানিস?

—জানি। আমরা গরীব, তোমরা বড়লোক, জমিদার। আমার বাবা তোমাদের কাছে চাকরী করেন; তাই, তোমার আমাদের সঙ্গে মিশতে নেই।

অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া উজল বলিল—দূর, তাই

বুঝি হয়! মানুষ সব সমান; তার আবার গরীব বড়-মানুষ কি। আমার যার সঙ্গে খুসী তার সঙ্গে মিশব, গল্প করব, আমি শুনব না ওদের কথা, তাই তো যেমনি মা ঘুমিয়ে পড়ে, অমনি আমি পালিয়ে আসি।

—কিন্তু যদি মাসীমা জান্‌তে পারেন, তখন কি হবে?

তাচ্ছিল্যভরে উজ্জল বলিল—কি আবার হবে, কিছুই হবে না। চল্, আম গাছে উঠি। নুণ এনেছিস?

—বারে ছেলে, আমি তো ছুরি আনব, নুণ আন্‌বি তো তুই! আনিস নি বুঝি?

—না ভাই। যা' করে পালিয়ে এসেছি, আন্‌তে গেলেই ধরা পড়তুম।

—তবে একটু দাঁড়া এখানে, আমি নিয়ে আসি। পুলক চঞ্চল পায়ে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

উজ্জল লোলুপ নয়নে অদূরস্থ আম গাছটার সুপুষ্ট সবুজ ফল ভারাবনত শাখা-প্রশাখার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—এই গাছটাতেই আজ উঠিতে হইবে; এর ফলগুলা যেমন বড় হইয়াছে, এমন অন্য কোনো গাছে হয় নাই। মিনিট-খানেকের মধ্যে কাগজের মোড়কে লবণ লইয়া পুলক দেখা দিল। সম্মুখের গাছে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উজ্জল বলিল—এই আমগুলো কত বড় হয়েছে দেখছিস পুলক? আজ ভাই এইটের আম শেষ করব। আয়, ওঠা যাক্।

কথার সঙ্গেই সে গাছে উঠিতে আরম্ভ করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুলকও গাছের একটা ডাল ধরিয়া খানিকটা উঠিয়া বলিল—কিন্তু এখানটা তোদের বাড়ীর ভারী কাছে যে, যদি দেখ্‌তে পায় কেউ?

হাত বাড়াইয়া গোটা চারেক আম ছিঁড়িয়া উজ্জল কহিল—পায় পাবে, কি কর্ব্বে আমার! বলতে আসুক না কেউ, এমন, শুনিয়ে দেবো! দিন-রাত্তির আমায় বাড়ীতে বন্ধ করে রাখবে, আমি যেন মানুষ নই!

পুলক আর কিছু না বলিয়া কাঁচা আমের সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিল। মিনিট কয়েক পরে সহসা সে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা উজ্জল, তোকে যদি একবারে তোর বাবা বন্ধ করে রাখেন, কি করিস তুই?

—করব আবার কি? কিচ্ছু খাই না। তা' হলেই আমায় ছেড়ে দিতে পথ পাবে না কেউ। আমায় কি বাবা কিছু বলেন, না আমার ওপর রাগ করেন।

—তবে আমার সঙ্গে খেলতে বারণ করেন কেন?

—কি জানি ভাই, আমিও সেইটাই বুঝ্‌তে পারি না।

পুলক নিজেই মীমাংসা করিয়া দিল। কহিল—আমরা গরীব কি না, তাই বাবাও আমার তাই বলছিলেন।

প্রতিবাদের সুরে উজ্জল কি বলিতে যাইতেই ত্রস্ত-কণ্ঠে পুলক কহিল—ওই দেখ্ উজ্জল, তোদের সেই বুড়ো চাকর, এখনি তোকে দেখ্‌তে পাবে, আমাকেও বকবে। বল্‌লুম—এখানে বসে কাজ নেই—শুনলি না তো।

উজ্জলের মুখে ভয়ের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। নীরবে সে আমের খোসা ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল। যে লোকটা আসিতেছিল, এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে সহসা শাখারূঢ় এই দুইজনের দিকে চোখ পড়িতে সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া গাছের তলায় আসিয়া বলিল—আজ আবার তুমি বাড়ীর বাইরে এসেছ দাদাবাবু? ফের ওই ছেলেটার সঙ্গে মিশেছ? বাবু তোমায় কি বলেছেন মনে নেই বুঝি?

চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলে যে ভাবে চাহে, তেমনই ভীত দৃষ্টি মেলিয়া বিচল-কণ্ঠে উজ্জল কহিল—তুমি বাবাকে কিছু বলো না গণেশ, আমি একটু পরেই বাড়ী যাব।

কড়াস্বরে আদেশের ভঙ্গীতে গণেশ বলিল—সে হবে না, এখনই চলো। নাবো গাছ থেকে।

নামিবার ইচ্ছা উজ্জলের একবারেই ছিল না। নামিবার কোন লক্ষণই তাহার দেখা গেল না। গণেশ বড় মানুষের বাড়ীর চাকর। ধরণ-ধারণ তাহার সাধারণ হইতে সতন্ত্র হইবারই কথা। কাহাকেও সে বড় একটা গ্রাহ্য করিতে চাহে না—অবশ্য প্রভু ও প্রভুপত্নী ছাড়া। উজ্জলের এ নীরবতা তাহাকে উষ্ণ করিয়া তুলিল। রুক্ষকণ্ঠে বলিল—কথা শুনতে পাচ্ছ না না কি খোকাবাবু? চলো একবার বাড়ীতে—কি হয় আজ তোমার তাই দেখো। বাবুর হুকুম শুদ্ধু তুমি গেরাহ্যি কর না।

এমন ভাবে ধরা পড়িয়া যাইবার জন্য উজ্জল একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তিরস্কার আজ অনিবার্য্য। এখান

হইতে যাইতে তাই মন সরিতেছিল না। শীতের দিনে স্নান করিতে গিয়া জল সমুখে লইয়া বসিয়া থাকার মত যতটা সময় এ ভাবে কাটাইতে পারা যায় কাটাইয়া দেওয়া যাক্ এমনই একটা ভাব তখন তাহার মনে জাগিয়াছিল।

পুলকও যথেষ্ট ভয় পাইয়াছিল। এ ভাবে তাহাদের দুইজনকে একত্র দেখিয়া জমিদার-বাড়ীর দাসী-ভৃত্য আরও কয়বার তাহাকে বকিয়া গিয়াছে—সে যে উজলের সমান নয়, উজলের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা শোভা পায় না। এ কথাও কতবার জানাইয়া দিয়াছে, তবুও সে নিজেকে উজল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। আজও আবার কি শুনিতে হইবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

দুই-চারিবার বলা সত্ত্বেও যখন উজল গাছ হইতে নামিল না, কথাও কহিল না, তখন গণেশের রাগের সবটাই গিয়া পড়িল পুলকের উপর; কারণ, খোকাবাবু প্রভু-পুত্র, জমিদারের ছেলে, তাহাকে কিছু বলা চলে না। এ মানুষের প্রকৃতির একটা রীতি। আয়ত্তের অতীত যে, তাহাকে সে এড়াইয়াই চলে। যে দুর্ব্বল, যে করতলগত, হেতু থাকুক বা না থাকুক চিরদিন ধরিয়া সকল বিরূপ, বিরক্তি, আক্রোশের কারণ, মনের ঝাল ঝাড়িবার একমাত্র পাত্র হইয়া তাহারাই শুধু দাঁড়ায় তাই দাঁত মুখ খিচাইয়া গণেশ কহিল—এই, তুই ছোঁড়াই তো সব অনর্থের মূল, তুই তো রোজ খোকাবাবুকে ডেকে আনিস। তোকে ক'দিন বারণ করা হয়েছে তা' শুনিস নি। একদিন থামে বেঁধে চাবুক না দিলে তুই সোজা হবি না। বল্‌ছি আজ বাবুকে—

উজল আর নীরব থাকিতে পারিল না, ঝাঁজের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—ও কেন ডেকে আন্‌বে আমায়, আমি তো নিজে আসি।

—আচ্ছা বাবুর কাছে সে কথা বোঝা-পড়া হবে এখন, তুমি এস তো।

—আমি যাব না, যা'।

—যাবে না? আচ্ছা বল্‌ছি গিয়ে মার কাছে।

উজলের বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিলেও আততায়ীর উদ্যত কৃপাণ সম্মুখীন নির্ভীক যোদ্ধার মত বাহিরে অবিচল ভাবটাই বজায় রাখিল। ক্ষণপূর্ব্বেই পুলকের কাছে গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে সে প্রকাশ করিয়াছিল—সে কাহাকেও ভয় করে না, গ্রাহ্য করে না। ইহারই মধ্যে সে কথাটা যে অকারণ গর্ব্ব মাত্র, তাহা পুলককে জানাইতে তাহার নিতান্ত কুণ্ঠাবোধ হইতেছিল। অন্যদিকে চাহিয়া কহিল—যা' এক্ষুণি যা', আমি তো ভয়ে মরে গেলুম আর কি! শূয়ার, ছুঁচো, গরু, গাধা, ইঁদুর, আরশোলা, চামচিকে, দূর হ'!

এ ধরণের সম্ভাষণ কাহাকেও খুসী করে না, গণেশকেও করিল না। নিস্ফল রোষে একবার শাখাসীন বালকের দিকে চাহিয়া সে ফিরিয়া চলিল। পুলক বিশুষ্ক-মুখে নীরবে বসিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উজল কহিল—ভারী দুষ্টু ওটা ভাই। ওই তো বাবাকে সব খবর দেয়। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

পুলক কিছু বলিবার আগেই উজলের নিক্ষিপ্ত বড় গোছের একটা আম গিয়া গণেশের ডান পায়ে লাগিল। অতর্কিত আঘাতে আর্ত্তরব করিয়া সে ফিরিয়া চাহিবার আগেই আরও গোটা কতক ছোট বড় আম তাহার পিঠে কাঁধে আসিয়া লাগিল। মনে মনে উজলকে শীঘ্র যমালয় দর্শনে গমন করিতে আদেশ দিয়া গণেশ বাড়ীর দিকে দ্রুত পা চালাইল। উজলও বিরস বদনে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল।

পুলক তখনও ডালে বসিয়া পা দোলাইতেছিল। আলোক উজ্জ্বল পূর্ণিমা রাতে ঘনাইয়া আসা মেঘ রাশির মত তাহাদের দুইজনকার মনেই গণেশের আগমন, ভীতি ও বিষাদের ছায়া ফেলিয়া গেল। যে আনন্দভরা মন লইয়া তাহারা গাছে উঠিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণই বদলাইয়া গিয়াছে। উজল নীরবে কয় মুহূর্ত্ত গাছের তলায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিল, তারপর সোৎসাহে কহিল—পুলক নাব। চল্ তোদের বাড়ী গিয়ে কুলের আচার খেয়ে আসি। এক্ষুণি বাড়ী গেলে আরও বকুনি খেতে হবে। খানিক পরে যাব।

পুলকের বিমর্ষ মনেও এ প্রস্তাব আনন্দের সাড়া জাগাইল। সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল।

সম্মুখের ঘরখানাতেই অনুপমা বসিয়া ছুলের ছেঁড়া

কাপড়খানায় তালি লাগাইতেছিলেন। হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া উজ্জল তাহার আঁচলে একটা টান দিয়া কহিল—মাসীমা, একটু কুলের আচার দিন্ না। আপনার আচার যা' সুন্দর লাগে!

অনুপমা স্মিতমুখে উঠিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া স্নেহভরা-স্বরে বলিলেন—তা' যেন লাগে, কিন্তু তুমি আজ আবার বেরিয়েছ বাবা, তোমার বাবা মা কত রাগ করবেন এখন। কেন মাণিক তাঁদের কথা শোনো না।

—বারে, আমি কি পোষা পাখী যে, দিন-রাত্তির খাঁচায় বসে থাকবো, বাইরে পা দেবো না! এমন করে থাক্‌তে, পারে বুঝি কেউ? আর কোথায় তো যাই না, শুধু আপনার কাছেই তো আসি আমি। পুলককে না দেখ্‌তে পেলে আমার ভাল লাগে না।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাসটাকে অনুপমা কষ্টে বুকের মধ্যে নিবদ্ধ করিলেন। সরল বালক ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে কতখানি ব্যবধান তাহা জানে না বলিয়াই এ কথা বলিতেছে। জানে না যে, ধনী ও দরিদ্রে স্বর্গ মর্ত্ত পার্থক্য। মৃৎ প্রদীপের ক্ষীণশিখা যত স্নিগ্ধ, উজ্জল হউক, বিজলী আলোকের পাশে সে নিষ্প্রভ, সেখানে তাহার স্থান নাই। বিরাট মহীরুহ ক্ষুদ্র তরুগুল্মের দিকে করুণা এবং ঘৃণার চোখেই চাহিয়া দেখে মাত্র, তাহাকে আপন করিয়া লইতে চাহে না। নিবিড় অবহেলাতেই কোমলা ব্রততীকে তাহার দেহ আশ্রয় করিতে দেয়, স্নেহ-মমতায় নহে।

অনুপমা মুহূর্ত্তের জন্য আনমনা হইয়া গিয়াছিলেন, উজ্জল তাহার হাতে মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল—কি ভাব্‌ছেন মাসীমা, আচার বার করুন, এথনই আমায় বাড়ী যেতে হবে।

—চলো বাবা, দিই গে, কিন্তু তোমার মা যখন বারণ করেন, তখন এমন করে আর তুমি বাড়ীর বার হয়ো না মণি। মা বাবার কথা শুনতে হয়।

ইচ্ছা থাকিলেও অনুপমা বলিতে পারিলেন না যে, উজ্জলের এ ঘনিষ্টতার ফলে তাহার পিতার রোষাগ্নির দাহ আসিয়া লাগিতেছে তাঁহাদেরই অঙ্গে। তাঁহারা দরিদ্র, তাঁহারা অসহায়।

দুই

দীর্ঘ দিবানিদ্রা অন্তে শয্যা হইতে উঠিয়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চোখে মুখে জল দিয়া সবেমাত্র আলবোলার দীর্ঘ নলটী হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, রুদ্রমূর্ত্তিতে ইন্দিরা দেবী ঘরে ঢুকিয়া বিনা ভূমিকায় কহিলেন—আজ আবার খোকা বাড়ীর বার হয়ে সেই ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে খেলা করেছে। গণেশ ডাক্‌তে গেছল, তাকে কাঁচা আম ছুঁড়ে মেরে আধ-মরা করে দিয়েছে। কি হবে বলো দেখি? বল্‌লে শোনে না, বারণ করলে গ্রাহ্য করে না, ছেলে যে একবারে উচ্ছন্ন গেল।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের হাতের নল পড়িয়া গেল। বিস্ফারিত চোখে পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—বলো কি, আজ আবার বেরিয়েছে, কাল অত করে বারণ করলুম! তাই তো এ যে বড় মুস্কিল হলো!

—মুস্কিল বলে মুস্কিল! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা ছেলে, সেও যদি এমনি করে যত ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে অধঃপাতে যায় তো হবে কি! এর একটা ব্যবস্থা কর। একখানা চেয়ার টানিয়া ইন্দিরা বসিয়া পড়িলেন।

নৃপেন্দ্র কহিলেন—উজল কোথায়? বাড়ী এসেছে? ডাক তো তাকে।

ডাকিতে হইল না, উজল দ্বারপ্রান্তেই ছিল। সে নীরবে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কঠিন দৃষ্টিতে একবার পুত্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে নৃপেন্দ্র কহিলেন—আজ আবার তুমি বাড়ীর বাইরে গেছলে, সেই ছোঁড়ার সঙ্গে মিশেছিলে?

উজল নিঃশব্দে মাথা হেলাইল।

নৃপেন্দ্র ক্ষণেক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—হুঁ, বুঝেছি। সেই ছোকরাই ওকে ডেকে নিয়ে যায়—তার পরামর্শেই খোকা এমন বিগড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উজল পিতাকে ভয় করিয়া চলিত। সাধ্যমত তাঁহার সম্মুখে কথা বলিতে চাহিত না। কিন্তু বন্ধুর উপর এত বড় দোষারোপে সে নীরব থাকিতে পারিল না, ব্যস্তভাবে

কহিল—না বাবা, পুলক তো আমায় ডেকে নিয়ে যায় না। আমিই তার কাছে যাই।

প্রবলপ্রতাপ ভূস্বামী। কখন কাহারও কাছে কোনো কথার প্রতিবাদ শুনা অভ্যাস নাই। বালক পুত্রের মুখের এই সামান্য উত্তরই তাঁহাকে উত্তেজিত করিল। ভয়ানক ভাবে এক তাড়া দিয়া কঠোর-কণ্ঠে কহিলেন—থাম বল্‌ছি, আমার কথার ওপর কথা! ওই সব নীচ সংসর্গের ফল, ওই জন্যেই আমি বরাবর বারণ করছি তার সঙ্গে মিশতে। যা' ভেবেছি তাই। আগে তো কখন এমন করে কথার ওপর কথা বলতে শুনি নি। এ সবই সেই ছোঁড়ার কাজ।

স্নেহপাত্রের ত্রুটী মানুষ দেখিতে চাহে না। খুঁজিয়া-পাতিয়া একজনকে আনিয়া দোষের বোঝা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। স্বামীর কথা সমর্থন করিয়া ইন্দিরা দেবীও বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও দেখেছি খোকা আগের মত নেই। ওই জন্যেই না আমি তোমায় বরাবর বলেছি—সে ছেলেটার কাছ ছাড়া কর ওকে। তারা সব ছোটলোক। তাদের চাল-চলন আলাদা, তাদের সঙ্গে আমাদের ছেলের কি মেশা চলে কখন?

আলবোলার নলে দীর্ঘ টান দিয়া নৃপেন্দ্র কহিলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়, তারা আবার মানুষ! তাদের সঙ্গে মিশলে তাদেরই মত হবে আর কি।

উজল নীরব নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আর কিছু বলিবার সাহস তাহার ছিল না। কঠোর দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া নৃপেন্দ্র কহিলেন—যাও এখন। তোমার ব্যবস্থা আমি আজই করব। সে ছেলেটাকে কালই এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, নইলে উপায় নেই।

অত্যন্ত চকিতভাবে উজল একবার পিতার দিকে চাহিল ব্যথিত অসহায় দৃষ্টিতে, কিছু হয় তো বলিতেও গেল, পারিল না। পুত্রের করুণ কাতর চক্ষু পিতা দেখিয়াও দেখিলেন না। জমিদার পুত্রের মান-সম্ভ্রম আগে। কোথাকার কে একটা ছোটলোকের ছেলে তাহার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, ইহার পরিণাম যে কত শোচনীয় হইবে, ইহা তো তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাহার কাতরতা দেখিলে, বিচল হইলে চলিবে কেন? অস্ত্রোপচার করিতে গিয়া চিকিৎসকের ব্যথিত হইয়া নিরস্ত হইলে চলে না তো। এ যে তাহারই মঙ্গলের জন্য। জমিদারের ছেলে, তাহাকে তাহার মত হইয়াই থাকিতে হইবে।

ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—হরিচরণ বোধ হয় কাছারী-ঘরে আছে, তাকে একবার আমার কাছে আসতে বলে আয়। যেন দেরী না করে। আমি যাচ্ছি সদর-বাড়ীতে। স্থূল দেহখানিকে তুলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উজল বাহির হইয়া গেল। টিপয়ের উপর হইতে পাণের ডিবাটা টানিয়া লইয়া ইন্দিরা কহিলেন—যা' হয় একটা ব্যবস্থা করে দাও, আর একটা দিনও যেন তার সঙ্গে মিশতে না পারে। ছিঃ ছিঃ, এত বড় ঘরের ছেলে হয়ে কি না ও যায় সেই চাকরটার বাড়ীতে! আমার ছেলের যে কখন এমন প্রবৃত্তি হতে পারে, তা' ভাবতেও পারি নি। নিজের মান-সম্ভ্রমের দিকে একটু লক্ষ্য নেই। নিতান্ত ছেলেমানুষী নয় তো। আমি তো জীবনে কখন ও ধরণের লোকের সঙ্গে কথাই বলেছি মনে পড়ে না।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ দুই পা আগাইয়া ছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—আমিই কি কারো সঙ্গে মিশেছি না কি। সকলের সঙ্গে বসতে হবে বলে এ বংশের ছেলেরা কখন ইস্কুল-কলেজে যায় না, আর আমার ছেলের বন্ধু হলো কি না—

তাঁহার মুখের কথাটা লুফিয়া লইয়া পত্নী বলিলেন—আমাদের একটা চাকর, তারই ছেলে—ছি ছি, আমার যেন মরতে ইচ্ছে করছে! ও যায় তাদের বাড়ীতে, কিছু খেয়ে আসে কি না তাই বা কে জানে!

এ সম্ভাবনাতেও এই দম্পতীর আভিজাত্য গর্ব্বপূর্ণ চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল। নিজেকে আশ্বাস দিয়াই যেন নৃপেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—না না, অতটা কি আর করবে, যত হোক্ এ বংশের ছেলে তো।

গৃহিণী কথা কহিলেন না। রোষ-পূর্ণ-নেত্রে ছেলের পাংশু মুখের দিকে একবার চাহিয়া নৃপেন্দ্র ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দিরা কহিলেন—যা' হয়েছে হয়েছে, আর কখনও তুমি বাড়ীর বাইরে পা দেবে না। অন্য লোকের সঙ্গে তোমার যে তফাৎ অনেকখানি, এটা সব সময় মনে রেখো। তোমার একটু সংকোচ

হয় না ওদের সঙ্গে মিশতে? আমি যে সংকোচে মরে যাচ্ছি তোমার ব্যবহারে!

উজল কথা কহিল না। মায়ের কথা তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া এমনও বোঝা গেল না। শূন্য উদাস প্রেক্ষণে সে বাইরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল, সেই জানে! রূপার ডিবা খুলিয়া গোটা তিন-চার পান একসঙ্গে মুখে দিয়া কিছু কোমল কণ্ঠে মা বলিলেন—যাও, জল খেয়ে নিয়ে বাগানে গিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও, কিম্বা গাড়ী করে কোথাও থেকে ঘুরে এস। সঙ্গী কেউ নেই, একলাটি একটু কষ্ট হয় অবিশ্যি, কিন্তু কি করবে বলো, এখানকার কারো সঙ্গে তোমার মেশা চলে না। কাল বরং তোর মাসীমাকে চিঠি দেবো, ছেলেদের নিয়ে দিনকতক এখানে আসতে। অনেক খেলার সঙ্গী পাবে, তা' হলে কোনো কষ্ট হবে না আর।

উজল এবারও নীরব রহিল। জননীর এত বড় আশ্বাস তাহাকে যে খুব তৃপ্ত করিল, এমন বোধ হইল না।

তিন

প্রভুর আকস্মিক আহ্বান হরিচরণকে বিস্মিত করিল যতটা, শঙ্কিত করিল ততোধিক। একে মনিব, তাহাতে ভূস্বামী। কম্পিত বক্ষে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া তিনি নৃপেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সজ্জিত ঘরখানা বহু লোকের সমাগমে পূর্ণ। কলরব মুখর। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মাঝখানে যোগ্য আসনে উপবিষ্ট। নমস্কার করিয়া হরিচরণ একপাশে দাঁড়াইলেন। অন্যদিন হইলে নৃপেন্দ্রের দৃষ্টি পড়িতেই দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া যায়। আজ কিন্তু ঘরে পা দিবামাত্র তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দেখো হরি, তোমার ছেলেকে এখান থেকে না সরালে ত চলছে না।

অত্যন্ত চমকিয়া হরি প্রভুর দিকে চাহিলেন। ছেলের সম্বন্ধে আরও দুইবার তাঁহাকে সতর্ক করা হইয়াছে, তিনিও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। নম্রকণ্ঠে হরি বলিলেন—তাকে কোথায় সরাব হুজুর।

হুজুর কিছু উষ্ণ হইয়াই জবাব দিলেন—কোথায় সরাবে আমি তা' কি করে বল্‌ব। মাসী, মামা, দাদা যে থাকে, তার বাড়ীতে রাখো। মোট কথা, এখানে তাকে আর রাখা চল্‌বে না। তার সঙ্গে মিশে আমার ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গ ছাড়া করতেই হবে। তার এখানে থাকা চল্‌বে না।

বিশ্বের আলোক দীপ্তি হরিচরণের চোখে ম্লান হইয়া আসিল। একমাত্র সন্তান। অনেকগুলিকে মরণের হাতে তুলিয়া দিয়া এই একটীই তাঁহাদের সম্বল। এতটুকু ছেলে, তাহাকে দূরে রাখিয়া দেওয়া, সে যে নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু এ আদেশ অবহেলা করিবার শক্তিই বা তাঁহার কই? ব্যাকুল-কণ্ঠে তিনি কহিলেন—আপন বল্‌তে আর আমাদের কেউ তো নেই হুজুর, কার কাছে তাকে রাখ্‌ব! এবার হতে তাকে আর খোকাবাবুর কাছে আসতে দেবো না। যেমন করে পারি আট্‌কে রাখ্‌ব।

মোটা তাকিয়াটার উপর ভাল করিয়া হেলান দিয়া হুজুর বলিয়া উঠিলেন—ওহে, তুমি বোঝো না, তাকে যতই বারণ কর, আটকাতে পারবে না। মানুষ তো। তারপর তাকে আটকালে হবে কি? উজলকে আটকে রাখ্‌বে কে? সকলকার চোখ এড়িয়ে সে ঠিক্ গিয়ে জুটবে তার কাছে। না না, তোমার ছেলেকে এখান থেকে সরাও। কেউ না থাকে, সহরের বোর্ডিংয়ে নিয়ে রেখে এস। ভাল থাকবে, ইস্কুলে পড়বে। সেই ভাল কথা।

বিধাতার বিধানের মত এ আদেশ অলঙ্ঘ্য জানা থাকিলেও মগ্নপ্রায় ব্যক্তির শৈবাল দল ধরিয়া বাঁচিবার মত হরি একবার শেষ চেষ্টা করিল—বোর্ডিংয়ে রাখা সে যে অনেক খরচ হুজুর! গরীব মানুষ, কোথায় পাব? তারপর ওই একটা মাত্তর ছেলে—অনেকগুলির মধ্যে সেই আছে। তার মা কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে হুজুর? সে যে ছেলেমানুষ। এবারটা—

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জমিদারী মেজাজ তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। একটা কথার এতগুলি প্রতিবাদ যে তাঁহাকে কখনও শুনিতে হয় নাই, তাহাও আবার তাঁহার একটা সামান্য ভৃত্যের মুখে। ছেলের ব্যবহারে একে মনটা বিচল

হইয়াছিল, তাহার উপর এ ব্যাপারে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবারই কথা। প্রায় চীৎকার করিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন—যা' বল্‌ছি আমি, তা' করতেই হবে। কি হবে না হবে, কে থাক্‌তে পারবে না পারবে, সে জান্‌বার দরকার আমার নেই। আমার হুকুম—কাল সকালে তোমার ছেলেকে যেখানে হোক্ রেখে আস্‌তে হবে। কাল বেলা হলে যেন তাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়। যাও, আর দিক্ কবো না। ছেলেকে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর গে।

বিহ্বল আর্ত্ত দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া হরিচরণ নৃপেন্দ্রের দিকে চাহিলেন। যূপবদ্ধ পশুর কাতরতা ঘাতককে বিচলিত করিতে পারে না। নৃপেন্দ্র অন্য এক-জনের দিকে চাহিয়া কহিলেন—হ্যাঁ হে মাধব, তোমার থিয়েটার পার্টি হঠাৎ এমন নিবে গেল কেন? সেদিন শুন্‌লুম—তোমরা পূজোর সময় 'কর্ণার্জ্জুন' প্লে করবে কিন্তু সাড়া-শব্দ যে তার কিছু পাচ্ছি না। ব্যাপার কি? দল ভেঙে গেল বুঝি?

মাধব পরম আপ্যায়িত হইয়া হাসিতে মুখ ভরাইয়া কহিল—আপনি সহায় থাক্‌তে দল ভাঙবে এ কি একটা কথা হুজুর! তবে ক'টা দিন 'রিহারস্যাল্' দেওয়া বন্ধ রেখেছি। অর্জ্জুন আর পদ্মাবতী দুটোই ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। শকুনি কাল সবে পথ্য পেয়েছে। কর্ণও দু'দিন ধরে বাড়ী নেই।

হরি তখনও দাঁড়াইয়াছিলেন, হয় তো হুজুরের কাছে আর কিছু নিবেদন করিবার আশায়। কিন্তু সে অবকাশ না দিয়াই সহসা তাঁহার দিকে চাহিয়া হুজুর কহিলেন—তুমি আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাছারী-ঘরে গিয়ে কাজ শেষ করে যাবার যোগাড় কর গে। কাল সকালেই তাকে কোথাও রেখে আসা চাই! যাও।

চার

প্রভাত আলোর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল স্পর্শে ধরণী বক্ষ সবে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শয্যা ছাড়িয়া উজল ধীর পায়ে নামিয়া আসিল। বিশাল ভবনের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তখন সুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন। বাগানের দ্বার খুলিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল সকলের অজ্ঞাতে। ঘুমন্ত পুলককে তুলিয়া হরিচরণ যাত্রার আয়োজনে লাগিয়াছেন। আদেশ ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, পালন করিতে মর্ম্ম ছিঁড়িয়া যাউক, না মানিয়া উপায় নাই। অক্ষম দুর্ব্বল চিরদিনই এইভাবে মাথানত করিয়া প্রবলের সকল কথা নির্ব্বিচারে মানিয়া আসিতেছে, আসিবেও। উপায় নাই। সারা রাত্রি অনিদ্রায় কাঁদিয়াই কাটিয়াছে। সিক্ত চোখেই ছেলেকে কাছে বসাইয়া অনুপমা খাওয়াইয়া দিতেছিলেন। অপরাধ ভারাতুর অন্তরে দ্বারে দাঁড়াইয়া উজল ডাকিল—পুলক! মাসীমা!

স্বামী-স্ত্রী চমকিয়া চাহিলেন। পুলক ছুটিয়া উজলের কাছে গিয়া ফুল্লকণ্ঠে কহিল—তুই এসেছিস, আমি ভাবছিলুম হয় তো তোকে যাবার সময় একবার দেখ্‌তেও পাব না। কি করে এলি ভাই? কেউ কিছু বল্‌লে না?

—না আমি লুকিয়ে এসেছি, কিন্তু তুই সত্যিই যাবি পুলক।

—কি করব ভাই, তোর বাবা যে বলেছেন।

উজল মাথা নামাইল। অনুপমা ছেলেকে নিকটে টানিয়া আনিয়া কিছু কঠিন ভাবেই বলিলেন—তোমায় কতদিন বারণ করেছি খোকাবাবু, তুমি ডেকো না; ওর সঙ্গে মিশো না। তুমি শোন নি। আজ আমাকে তার শাস্তিভোগ করতে হলো।

উজলের ম্লান মুখখানা নিবিড় ম্লানিমায় ছাইয়া আসিল। রুদ্ধপ্রায় স্বরে কহিল—বাবা যে এমন করবেন আমি একবারও ভাবি নি মাসীমা।

একমাত্র সন্তানের আসন্ন বিচ্ছেদ অনুপমার মাতৃ-হৃদয়কে এই ছেলেটীর উপর বিরূপ করিয়া তুলিলেও তাহার মুখের এ ম্লান ছায়া তাঁহাকে কঠিন হইয়া থাকিতে দিল না। কঠোর তুষার স্তূপ চির তরল জলেরই রূপান্তর মাত্র। স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে অনুপমা কহিলেন—তোমার আর দোষ কি বাবা? আর কি করে জানবে যে এমন হবে।

উজলের বড় বড় চোখের প্রান্ত বহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পুলকের পিঠের উপর একটা হাত রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল—তুই যাস নি ভাই পুলক, বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে থাক্ বাবা টের পাবেন না। আমি

আর আসব না তোর কাছে। কেউ কিছু জানতে পারবে না তা' হলে। তুই থাক্, ভাই।

ব্যথিত নয়নে অনুপমা তাহার শিশির-সিক্ত ফুলের মত অশ্রুম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সংশয় লেশহীন নির্ম্মল শিশুচিত্ত। ইহার মত সুন্দর বুঝি বিশ্বে আর কিছু নাই। বিমুগ্ধ নয়নে অনুপমা একবার তাহার ব্যথাম্লান মুখের দিকে চাহিলেন। তা' যে হয় না মাণিক, লুকিয়ে ক'দিন থাকৃতে পারে।

উজ্জল আর কথা কহিল না, চোখ দুইটা বারবার মুছিতে লাগিল। ব্যথিত অন্তর সমব্যথার এতটুকু স্পর্শেই গলিয়া পড়ে। নিজেকে প্রকাশ করিয়া দেয়। উজ্জলের দিকে চাহিয়া বিক্ষুব্ধ-কণ্ঠে অনুপমা বলিতে লাগিলেন—এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত একটা দিন ও আমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকে নি—ওকে ছেড়ে আমি কি করে থাক্‌ব, ওই বা কি করে থাক্‌বে! বিদেশে যদি অসুখ হয় তা' হ'লে—

গভীর আশঙ্কায় তাঁহার সারাদেহ কাঁপিয়া উঠিল, কথা শেষ করিতেও পারিলেন না। তাঁহার আশঙ্কার ভয়াবহত্ব উজ্জলের ঠিক্ মত হৃদয়ঙ্গম না হইলেও রোগশয্যায় মায়ের অনুপস্থিতির কল্পনাই তাহাকে ভাবাইয়া তুলিল। সকাতর কণ্ঠে সে কহিল—তাই তো বলছি মাসীমা, ওকে যেতে দেবেন না।

এ যে কতটা অসম্ভব তাহার অজানা হইলেও অনুপমার অজ্ঞাত নয়। মন যাহা চাহিতেছে, অথচ কোনমতেই যাহার সম্ভাবনা নাই, সে প্রসঙ্গের উত্থাপনও বিরক্তিকর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনুপমা অন্যদিকে চাহিলেন। পুলক উজ্জলের দিকে চাহিয়াছিল। কহিল—তুই কেন তোর বাবাকে বল্ না উজ্জল, কেন তিনি আমায় যেতে বল্‌ছেন, আমি আর কখনও তোকে নিয়ে আমগাছে উঠব না।

অনেকখানি আশা লইয়াই মাত-াপুত্র উজ্জলের দিকে চাহিলেন।

—আমি বাবাকে বলেছি ভাই, মার কাছে কত কাঁদলুম, তিনি শুধু বকতে লাগ্‌লেন।

অনুপমা নীরবে ঘরের অন্যধারে গিয়া ছেলের ছোট ট্রাঙ্কটী খুলিয়া তাহাতে সব কিছু দেওয়া হইল কি না তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

হরিচরণ বাহিরে ছিলেন। আর দেরী করা চলে-না, এখনই বাহির হইতে হইবে। অনুপমা ছেলের পূজার সময়কার ভাল কাপড়খানি ও ছিটের সার্টটী লইয়া বলিলেন—এস বাবা, জামা-কাপড় ছেড়ে নাও।

আমার যেতে যে একটুও ইচ্ছে কর্‌ছে না যে মা!

অনুপমা দাঁত দিয়া ঠোঁটটা চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার যে কোনো ক্ষমতা নাই। নিতান্ত অক্ষম অসহায়। পরের আদেশে আপন সন্তানকে তাই দূরে সরাইয়া দিতে হইতেছে। ঘরে ঢুকিয়া হরিচরণ কহিলেন—হয়েছে তোমাদের? আর দেরী করলে চল্‌বে না তো। পুলক আর দেরী করো না বাবা,তৈরী হবে নাও। অনেকটা যেতে হবে যে।

—আমি যাব না বাবা! আমি সেখানে থাকৃতে পারব না!

হরিচরণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তের জীবন ভিক্ষার মত এ প্রার্থনা শুধু বেদনার বোঝা বাড়াইয়াই তোলে উপায়হীন, প্রতীকার শক্তিহারা অভাগাকে। পিতার দিকে চাহিয়া পুলক কি বুঝিল কে জানে! তবে সে আর কথা কহিল না। নীরবে কাপড়-জামা বদলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমায় কবে নিয়ে আসবে বাবা? শীগ্‌গির আন্‌বে তো?

তাহারও সম্ভাবনা কম, তবুও ছেলের আশাভরা মুখের দিকে চাহিয়া এত বড় হতাশার বাণী শুনাইতে মুখে বাধিয়া গেল। বিকম্পিত কণ্ঠে হরিচরণ বলিলেন—আন্‌ব বই কি বাবা, শীগ্‌গিরই নিয়ে আসব।

—তোমাদের ছেড়ে বেশী দিন থাকৃতে পারব না বাবা, আমি মরে যাব!

পিতা মাতা দুইজনেই শিহরিয়া উঠিলেন। ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মা বলিলেন—ও কি কথা! আসবে বই কি, শীগ্‌গিরই নিয়ে আসব। ভাল ছেলে হয়ে থেকো সেখানে, মন খারাপ করো না। ক'দিন পরেই তোমায় নিয়ে আসব।

বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল ছেলের চুলে কপালে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বেলা বাড়িতেছিল। বাহির হইতে গরুর গাড়ীর চালক ডাকিয়া কহিল—আর দেরী করো না গো গোমস্তাবাবু, এখন না বেরুলে রাত্তিরের মধ্যে আর বাড়ী ফেরা যাবে না। সঙ্গে কি যাবে দ্যান, গাড়ীতে আমি তুলে ফেলি।

হরিচরণ আঙ্গুল দিয়া ছোট ট্রাঙ্ক ও বিছানার বাণ্ডিল দেখাইয়া দিলেন।

জননীর বুকে মুখ লুকাইয়া পুলক ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। উজ্জল তাহার দিকে চাহিয়া নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া হরিচরণ কহিলেন—বাড়ী যাও খোকাবাবু, বাবু জান্‌তে পারলে রাগ করবেন।

পুলককে তাহার পিতা-মাতার কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এভাবে দূরে পাঠাইবার কারণ যে সেই, এটা উজ্জল বুঝিয়াছিল। অপরিসীম কুণ্ঠায় তাহার শিশুচিত্ত বিমথিত হইলেও সে যে ইহাদের অপেক্ষাও নিরুপায় এইটুকু ভাবিয়া তাহার ব্যথা সীমা ছাড়াইয়াছিল।

দুঃখ তখনই অসহ্য হয়, যখন উদগ্র কামনা সত্বেও তাহার প্রতিরোধ করিবার এতটুকু শক্তি মানুষের থাকে না। এ বিড়ম্বনা বালক এবং বৃদ্ধকে সমানভাবেই দগ্ধ করে। গাঢ়কণ্ঠে উজ্জল বলিল—আর একটু থাকি, পুলক চলে যাক্, তারপর যাব।

হরিচরণ তাহাকে আর কিছু না বলিয়া পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—মিছে দেরী করে লাভ কি, যেতে যখন হবেই।

অশ্রুআবিল দৃষ্টি একবার স্বামীর দিকে তুলিয়া অনুপমা মুখ ফিরাইলেন। সত্য কথা, যত ব্যথাই অন্তরে বাজুক যাইতে দিতেই হইবেই, ধরিয়া রাখিবার সাধ্য তো নাই। মরণের করাল বাহু একে একে তিন-চারিটী সন্তানকে জোর করিয়া তাঁহার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। আজও শক্তিমান প্রবলের আদেশে একমাত্র সন্তানকে দূরে সরাইয়া দিতে হইতেছে, আটকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, বুঝি বা অধিকারও নাই। চোখ মুছিয়া হরিচরণ কহিলেন—আয় পুলক, আর দেরী করিস নি বাবা। দাও, ওকে ছেড়ে দাও।

পত্নীর বাহুবেষ্টন হইতে নিজেই তিনি ছেলেকে টানিয়া লইলেন। অনুপমা বলিলেন—বোর্ডিংয়েই রাখ্‌বে ওকে?

—তা' ছাড়া উপায় কি? কে আছে, কার কাছে আর রাখ্‌ব বলো।

—কিন্তু সেই সব অচেনা-অজানার মধ্যে ও কি একলা থাকৃতে পারবে?

হরিচরণের মুখে একটুখানি হাসির আভাষ জাগিল—তাহা যেন অশ্রুরই রূপান্তর। তিনি বলিলেন—পারবে না বল্‌লেই বা শুনছে কে অনু, দুঃখীর ছেলেকে সবই পারতে হয়। জানো না, বেঁধে মারলে সয় ভাল। গরীবের জীবনটাই তো বেঁধে মার খাওয়ার। তবে সময় সময় তাদের দেহ সেটা সইতে না পেরে বিদ্রোহ ক'রে একেবারেই ছুটী নেয়—আমাদেরও ভাগ্যে তাই হবে কি না, সেইটাই মনে মনে ভাব্‌ছি।

শিহরিয়া উঠিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে অনুপমা কহিলেন—থাক্ থাক্, ও সব কথা আর বলো না!

অন্যমনে বাহিরের দিকে চাহিয়া হরি বলিলেন—বাবুকে বল্লুম, বোর্ডিংয়ের খরচ দেবো কি করে? তা'তে তিনি বল্‌লেন—আমি কি জানি। সত্যি কথা, তিনি কি জান্‌বেন। কিন্তু আমি জানি, এই খরচ যোগাতে আমাদের একবেলা খাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। যাক্, ভাগ্যে যা' আছে, তাই হবে। আয় পুলক। দুর্গা দুর্গা।

ছেলের হাত ধরিয়া হরি নীরবে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিলেন। অনুপমা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার অবধি আসিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আকুল-কণ্ঠে পুলক বলিল—মা, আমায় পূজোর সময় নিয়ে এস। আন্‌বে তো?

মাতার কথা বলিবার শক্তি ছিল না, শুধু মাথাটা হেলাইলেন। উজ্জল গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পুলকের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আমায় চিঠি দিস্ ভাই পুলক, রোজ লিখিস্।

পুলক জবাব দিবার আগেই হরিচরণ গাড়ীতে উঠিয়া

বসিয়া বলিলেন—চিঠি দিলেও তোমার বাবা রাগ করবেন খোকাবাবু, ও সবে কাজ নেই।

উজ্জল কিছু বলিল না। অদূর পথে গণেশের শীর্ণ দেহটার কতকাংশ দেখা দিল। উজ্জলের দিকে চাহিয়া পুলক বলিয়া উঠিল—ওই গণেশ আসছে উজ্জল, তুই বাড়ী যা', এখনি তোকে বক্‌বে। আমি চল্‌লুম তবে।

গরুর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতদূর দেখা যায়, উজ্জল পথের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঁকের মুখে গাড়ী অদৃশ্য হইলেও উজ্জল তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। চোখ মুছিতে মুছিতে অনুপমা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। গণেশ কাছে আসিয়া বলিল—যা' ভেবেছি তাই, ঠিক্ এখানে আছে। আজ আবার ফের এখানে এসেছ দাদাবাবু?

উজ্জল তেমনিই স্তব্ধভাবে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কথা কহিল না।

—ভয় নেই একটুও। বলি, শুন্‌তে পাচ্ছ না দাদাবাবু। বাড়ী চলো, মা তোমাকে ডাক্‌ছেন। আজ কি খেতে-দেতে হবে না? বন্ধু তো চলে গেছে, আর এখানে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে কি হবে?

কথার সঙ্গে উজ্জলের হাত ধরিয়া টান দিতেই সে পাগলের মত গণেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঘুসি কিল চড়ের অবিশ্রান্ত বর্ষণ আরম্ভ করিল। মনের মধ্যকার অবরুদ্ধ সবখানি জ্বালা এই পথে বাহির হইয়া তাহাকে অনেকটা মুক্তি দিল যেন। গণেশের ধূলি-ধূসরিত মূর্ত্তিখানিও বেশ দর্শনীয় হইয়া উঠিল।

পাঁচ

নির্ম্মল মেঘশূন্য শারদ আকাশে, উজ্জ্বল রবিকরে, স্নিগ্ধ সমীরণে, কাশকুসুমশোভিত তটিনীর তীরে তীরে বিশ্বজননীর আগমনী-গীতি বাজিয়া উঠিয়াছে। এবার আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজা। তাহার আর বিশেষ বিলম্ব নাই। জমীদার-বাড়ীর ঠাকুর-দালানে সুগঠিতা প্রতিমার অঙ্গে সাজ পরনো আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীর শিশুদল সারাদিন ধরিয়া সেঁখানে বসিয়া কাহার মূর্ত্তি কেমন হইয়াছে তাহাই লইয়া নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, কখনও বা রীতিমত ঝগড়া-মারামারি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

একটু সকাল সকাল সেদিন কাজ সারিয়া হরিচরণ নৃপেন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সপারিষদ জমীদারবাবু তখন আগামী পূজায় এবার কোথাকার যাত্রাদলকে আহ্বান করিবেন সেই সমস্যার মীমাংসায় ব্যস্ত ছিলেন। হরি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঘণ্টাখানেক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি? বল্‌তে এসেছ না কি কিছু?

ভয়ে ভয়ে হরি একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ছেলেটার কথা বল্‌ছিলুম।

—বলো, কি বল্‌তে চাও। ছেলেকে আন্‌তে চাইছ তো?

হরি অনেকটা সাহস পাইলেন। এই কথাই তিনি বলিতে আসিলেও কথাটা উচ্চারণ করিবার সাহস তাঁহার হইতেছিল না। বাবুকে তাহাই বলিতে শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—পূজোর সময় ছেলেটাকে একবার আন্‌তে চাইছি। ওর মা বড় কান্নাকাটি করছে। একটা ছেলে। হুজুরের তাই অনুমতি চাইছিলুম।

নৃপেন্দ্রের ললাটে কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠিল। হরির দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—এর মধ্যে আন্‌তে চাও, ক'দিন গেছে তোমার ছেলে?

—আজ্ঞে, তা' মাস চার-পাঁচ হলো—ছেলেমানুষ।

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই হুজুর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—তা' হোক্ ছেলেমানুষ, এখনই যদি তাকে আনা হবে, তবে পাঠাবার দরকার কি ছিল। গেছে, আরও দিনকতক থাক্, জলে তো পড়ে নি। ভাল যায়গায় আছে, থাক্! সেই সাম্‌নের গরমের ছুটীতে এনো তাকে।

এ অমোঘ বিধানের প্রতিবাদ নিষ্ফল। তাহা করিতে যাওয়াও নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্য জানিয়াও হরিচরণ আজ নীরব থাকিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হইয়া উঠে, বাঁধ দিয়া তখন তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় না। সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে মানুষের বিচার-বিবেচনা

শক্তির মাত্রাও কমিয়া যায়। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই সে তখন যাহা হয় একটা কিছু করিয়া বসে। হুজুরের কথার উপর কথা বলার পরিণাম তাঁহার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কতটা ভয়াবহ হইতে পারে তাহা না ভাবিয়াই হরি বলিয়া উঠিলেন—সাম্‌নের গরমের ছুটী, তার যে এখনও অনেক দেরী বাবু, ততদিন ওইটুকু ছেলে একা বিদেশে থেকে কি বাঁচবে? এমনিই গিয়ে পর্য্যন্ত অসুখ যাচ্ছে শুন্‌ছি। এবারটা আস্‌বার হুকুম দিন হুজুর, নইলে সে মরে যাবে।

—তা' যদি যায় যাবে। আমার ছেলের দিক্‌টাও তো আমায় দেখ্‌তে হবে। তোমার ছেলের সঙ্গে মিশে সে যে উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল। না না, ওসব হবে না। ছেলে এখন যেখানে আছে, সেখানেই থাক্; এখন আস্‌বার নামও করো না।

হরির দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া নৃপেন্দ্র অন্যদিকে চাহিয়া কহিলেন—ও হে, কেষ্টচন্দর, কালই তা' হলে তুমি বেরিয়ে পড়ো। ষষ্ঠীর দিন কিন্তু এসে পড়া চাই। এবার কোলকাতা থেকে আমার শ্বশুর-বাড়ীর সবাই আস্‌ছেন। তোমাদের মা-ঠাকুরুণ বলেছেন—এবার ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্য্যন্ত পাঁচ দিন যাত্রা দেওয়া হবে। কাজেই ষষ্ঠীর দিন দুপুরের মধ্যে এখানে না এলে চল্‌বে না।

—তাই হবে হুজুর। কাল কেন, আমি আজই যাচ্ছি। তবে ভাব্‌ছি কি, তাঁরা সব কোলকাতার লোক, আমাদের এ পাড়াগাঁয়ের যাত্রা কি তাঁদের ভাল লাগ্‌বে? তাঁরা সেখানে কত বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখেন, এ কি তাঁদের পছন্দ হবে?

—হবে হে হবে। ক্রমাগত ক্ষীর-সর খাওয়ার পর মাঝে মাঝে একটু টক খেলে যেমন মন্দ লাগে না, এও সেই রকম হবে আর কি।

নিজের রসিকতায় নিজেই অত্যধিক প্রীত হইয়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ উচ্চ হাসিতে কক্ষ মুখর করিয়া তুলিলেন। অন্য সকলেও সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

কৃষ্ণচন্দ্র উঠিয়া পড়িয়া নৃপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি তবে এখন আসি হুজুর, যাওয়ার উদ্যোগ করি গে।

—আজই যাবে। বেশ। ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে যাওয়া-আসার খরচটা চেয়ে নিয়ে যাও। মনে থাকে যেন, ষষ্ঠীর দিন আসা চাই।

—সে আর আমায় বারবার বল্‌তে হবে না হুজুর, শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে ষষ্ঠীর দিনই এসে পড়ব।

ভক্তিভরে নৃপেন্দ্রের পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেল।

হরিচরণ তখনও স্থান ত্যাগ করেন নাই। মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন—হুজুর!

হুজুরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। এক ধমক দিয়া তিনি কহিলেন—কি, চাই কি তোমার? বল্‌ছি না, এখন ছেলে আনা হবে না। যদি কাছে আন্‌তে চাও তাকে—তা' হলে আমার এলাকার বাইরে গিয়ে বাস করতে হবে, এইটা মনে রেখো। যাও, আর আমাকে জ্বালাতন করো না; আমার ঢের কাজ আছে।

বাবুর পার্ষদদিগের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—সত্যি কথা বলতে কি হরি, তোমার ভাই এ বড় অন্যায়। বাবু বল্‌ছেন ছেলেকে তফাতে রাখ্‌তে, থাক্ না কিছুদিন। দু'দিন যেতে-না-যেতেই এত ব্যস্ত হলে চলে কি? বউয়েরই বা এত কান্নাকাটি করবার কি হয়েছে? এতগুলো ছেলে যে চলে গেলো, তাও তো চুপ করে আছে—আর এ ছেলে ভাল জায়গায়, ভাল লোকের কাছে রয়েছে, তা' তার সহ্য হচ্ছে না।

হরি উত্তর দিলেন না। একজনের দুঃখ অন্যে অনুভব করিতে পারে না। একের ব্যথা অন্যের বিস্ময়ের বস্তু, কখনও বা হাসির উপাদান। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি দ্বারের দিকে পা বাড়াইলেন। ম্যানেজারবাবু তখন ঘরে ঢুকিতেছিলেন, হরিকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—ও হে হরিচরণ, তোমাকেই আমি ডাক্‌তে এসেছি, তুমি বাড়ী যাও।

অজানা একটা আতঙ্ক হরির সারা দেহটাকে ঝাঁকানি দিয়া গেল। ম্যানেজারবাবুর দিকে চাহিয়া শঙ্কা-ব্যাকুল-কণ্ঠে তিনি কহিলেন—কি হয়েছে ম্যানেজারবাবু, আমার বাড়ীতে কি কিছু হয়েছে?

ম্যানেজারবাবু একবার ইতস্ততঃ করিলেন। তাঁহার এ নীরবতা হরির সংশয়কে আরও বাড়াইয়া তুলিল।

দুই পা আগাইয়া তাঁহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া হরি বলিলেন—চুপ করে আছেন কেন, কি হয়েছে বলুন ? আমার পুলকের কাছ থেকে কোনও খবর এসেছে না কি ? তার যে জ্বর হয়েছে শুনেছিলুম।

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ম্যানেজারবাবু অন্যদিকে চাহিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, তার সেই জ্বরই না কি খুব বেশী হয়েছে। সেখান থেকে খবর এসেছে।

হরি পড়িয়া যাইতেছিলেন। ম্যানেজারবাবু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আরে, তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন ! যাও, বাড়ী যাও। ভয় কি ? সেরে যাবে। শেষ কথাটা উচ্চারণ করিতে তাঁহার কণ্ঠস্বরটা ঈষৎ কাঁপিয়া গেল।

হরিচরণ ততক্ষণ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিলেন। নীরবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। ম্যানেজারবাবু দ্বার অবধি তাঁহার সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন—হয়েছে কি ? ওর ছেলের অসুখ খুব বেশী না কি ?

—নেই সে, কাল মারা গেছে। আহা, বেচারী একবার ছেলেটাকে দেখ্‌তেও পেলে না !

—মারা গেছে ! কি হয়েছিল ? কে খবর দিলে ? একসঙ্গে অনেকগুলা কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল।

নৃপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—আঃ, থামো থামো সব ! খোকা শুন্‌লে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। একেই তো ছোঁড়াটা যাওয়া অবধি সে কি রকম মনমরা হয়ে রয়েছে ! এ খবর শুন্‌লে আরও অস্থির হবে।

—ঠিক্ ঠিক্ খোকাবাবু যে ছেলেটাকে বড়ই স্নেহ করতেন।

—যেতে দাও, যেতে দাও ও কথা। ভাগ্য, ভাগ্য, কপাল ছাড়া তো আর পথ নেই।

—যা' বলেছ কালীপদ, সবই ভাগ্য। ভাগ্যের রহস্য বোঝা ভার। ওরে মধু, তামাক দিয়ে যা'। পানের ডিবেটা সরিয়ে দাও তো মাধব।

মাধব ডিবা খুলিয়া হুজুরের সম্মুখে রাখিল। গোটাকতক পাণ মুখে দিয়া ডিবাটা সরাইয়া রাখিয়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ম্যানেজারবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—হরেটা তো চলে গেল, বলা হলো না। কাল সকালে একবার তাকে শিবহাটীতে পাঠিয়ে দেবেন বিমলবাবুর কাছে। কিছু টাকা তিনি দেবেন বলেছেন। পূজোর খরচটা এবার অন্যবারের চেয়ে বেশী হবে বলে বোধ হচ্ছে। টাকার ব্যবস্থাটা আগেই করে রাখা দরকার। কাল সকালেই যেন সে যায়। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।

ছয়

পঞ্চমীর প্রভাত হইতেই বাদ্যধ্বনিতে সারা গ্রাম মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৎসর পরে বিশ্ব-জননীর আগমন, ধনী-দরিদ্র সকলের মুখেই আনন্দের ছায়া ফেলিয়াছিল। জমিদার-বাড়ীর বিশাল প্রাঙ্গণে যাত্রার আসর সাজান হইতেছিল। পাঁচদিন ব্যাপী উৎসব চলিবে। আনন্দ-উৎসাহের সীমা নাই। শুধু এক জীর্ণ ভগ্নপ্রায় গৃহের মধ্য হইতে সদ্য পুত্রহারা মায়ের বুকফাটা হাহাকার ধ্বনি রহিয়া রহিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছিল।

সকালবেলা প্রতিদিনের মতই হরিচরণ আসিয়া তাঁহার কার্য্যস্থলে প্রবেশ করিলেন। ছিন্নপ্রায় চাদরখানা গায়ের উপর হইতে নামাইয়া নিজের স্থানে গিয়া বসিলেন। ঘরের একধারে ছোট একটা টেবিলের সাম্‌নে কাঠের চেয়ারে বসিয়া ম্যানেজারবাবু একমনে কি কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। হরির দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন—বউমাকে কার কাছে রেখে এলে হরিচরণ ?

—কার কাছে আর থাক্‌বে ম্যানেজারবাবু, আমার আর আছেই বা কে ? একাই আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হরি কাজে মন দিলেন।

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—তা' এ অবস্থায় তাঁকে একা না রেখে পাড়ায় কারও বাড়ী রেখে এলে তো হতো।

—পাড়ায় ! তা' হতো। কিন্তু আজকের এ আনন্দের দিনে তার বুকভরা ব্যথার বোঝা নিয়ে কোথায় যাবে অন্যকে উত্যক্ত করতে। তার চেয়ে ঘরেই থাক্।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ম্যানেজারবাবু কহিলেন—কি হয়েছিল শুনলে কিছু? হঠাৎ এমন হলো কি করে?

ললাটে একটা আঙ্গুল দিয়া হরিচরণ বলিলেন—ভাগ্য! কি যে হয়েছিল কিছুই জানি না। তবে শুনলুম—ডাক্তারে না কি রোগ ধরতে পারে নি। গিয়ে পর্য্যন্ত একটী দিনও কেউ তার মুখে কোনোদিন হাসি দেখে নি—খালি কাঁদত, কেবল কাঁদত! বারবার সে চিঠি লিখ্‌ত—বাবা, আমায় নিয়ে যাও। ওঃ! যাক্, ভালই হয়েছে ম্যানেজারবাবু! ভগবান তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন! তার বন্দী-জীবনের শেষ হয়েছে! এ ভালই হয়েছে!

শূন্যদৃষ্টিতে হরিচরণ বাহিরের নির্ম্মল রৌদ্রকরদীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্যথিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ম্যানেজারবাবু কহিলেন—তুমি আজ কাজে এলে কেন হরি? যাও, বউমা একা রয়েছেন। তুমি কাছে থাক্‌লে তবু তিনি একটু শান্তি পাবেন। যাও, আজ আর তোমায় কাজ করতে হবে না।

—হবে না! কিন্তু কাজ না করলে আমি তো এক-দিনেরও মাইনে পাব না ম্যানেজারবাবু! তারপর আমাদের মত গরীবের শোক সম্বল করে বসে থাক্‌লে কি চলে?

সাম্‌নের খাতাটা খুলিয়া খানিকটা লিখিয়াই সহসা মুখ তুলিয়া হরিচরণ পুনরায় বলিলেন—আর কিছু নয় ম্যানেজারবাবু, আমার বড় দুঃখ—একবার শেষ সময় তাকে দেখ্‌তেও পেলুম না! নিশ্চয় সে আমাদের কত খুঁজেছে, কতবার ডেকেছে! হয় তো সময়মত একবিন্দু জলও তার মুখে পড়ে নি! চিকিৎসা হয়েছিল কি না তাই বা কে জানে! কয় বিন্দু অশ্রু সম্মুখস্থ খাতাটার উপর ঝরিয়া পড়িল।

বজ্রাহত তরুর মত তাঁহার শোকদগ্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সান্ত্বনার বাঁধা গৎ আওড়াইতে ম্যানেজারবাবুর মুখে বাধিয়া গেল। জলন্ত আগুনের উপর দুই বিন্দু জল ছিটা-ইয়া নিবাইতে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ তো বটেই, বাতুলতার নামান্তর বলাও চলে। তিনি নির্নিমেষ নয়নে এই অভাগার শুষ্ক ম্লান মূর্ত্তিটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিরাট ভূকম্পনে শোভাময় সমৃদ্ধ জনপদ যেমন ক্ষণমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, তেমনই একটা রাত্রির মধ্যে হরি-চরণের কি পরিবর্ত্তনই না হইয়া গিয়াছে! একটা বিরাট ঝঞ্ঝা তাহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি উড়াইয়া লইয়া শুধু জীবন্মৃত প্রায় দেহটাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। অলক্ষ্যে কয় বিন্দু চোখের জল মুছিয়া লইয়া ম্যানেজারবাবু কহিলেন—তোমার মাইনে যাতে না কাটা যায়, তার ব্যবস্থা আমি করব হরি, তুমি বাড়ী যাও।

—থাক্ মানেজারবাবু, আপনাকে এর জন্য অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে। কিছু ভাব্‌বেন না। আমি ঠিক্ কাজ করে যাব, আমার কোনো কষ্ট হবে না। ভগবানের বিধানও গরীবের জন্য আলাদা। অন্য লোকের দুঃখে আর আমাদের দুঃখে অনেক প্রভেদ আছে।

খাতাটা টানিয়া লইয়া হরিচরণ একমনে লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন শরতের স্নিগ্ধ সমীরে অনতিদূরস্থ পূজামণ্ডপ হইতে বালকদলের আনন্দ কলরোল ভাসিয়া আসিতেছিল। ব্যস্তভাবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন। কর্ম্মচারী দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সেদিকে তিনি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া ম্যানেজারবাবুর দিকে চাহিয়া কিছু তপ্তকণ্ঠেই বলিলেন—হরিকে যে আজ শিবহাটীতে পাঠা-বার কথা বলেছিলুম, তার কি হলো?

ব্যস্তভাবে ম্যানেজারবাবু বলিলেন—এই যে, আমি অন্য কাউকে এখনই সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। ওর ছেলেটী—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিরক্তিভরা কণ্ঠে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন—ছেলেটীর কথা আমি জানি—কিন্তু তা' বলে আমার কাজ বন্ধ রাখ্‌লে তো চল্‌বে না। আজ আর কা'কে পাঠাবেন—এখানে কত কাজ রয়েছে, সে সব করবে কে? হরিই যাক্। উঠে পড়ো হে হরি। এখনি একবার তুমি শিবহাটীতে যাও।

—যে আজ্ঞে, আমিই যাচ্ছি।

কাগজ-পত্র রাখিয়া হরি উঠিয়া পড়িলেন। নৃপেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। ব্যথিত ম্লানদৃষ্টি হরিচরণের দিকে ফেলিয়া ম্যানেজারবাবু কহিলেন—আমিই না হয় যাব, তুমি এখন বাড়ী যাও ভাই।

হরিচরণ হাসিলেন। তাঁহার শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানা সে হাসিতে যেন বিকৃত হইয়া উঠিল।—কোনো চিন্তা নেই ম্যানেজারবাবু, আমিই যাচ্ছি; বলেছি তো আমাদের জন্য ভগবানের বিধানও আলাদা! বুকের ভেতর যত আগুনই জলুক, বাইরে অবিচল আমাদের থাক্‌তেই হবে, নইলে যে চল্‌বে না! অন্যের দুঃখ আর আমাদের দুঃখ ঠিক্ এক নয় ম্যানেজারবাবু, এক নয়!

করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া তিনি নীরবে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। পূজা-বাড়ীর বাদ্যধ্বনি ছাপাইয়া সন্তানহারা অভাগিনী জননীর বুকফাটা করুণ ক্রন্দন তখনও বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

দক্ষযজ্ঞ

স্বর্গীয়া আনন্দময়ী দেবী

পরলোকগত নবীনকৃষ্ণ রায়ের বৈঠকখানায় বসিয়া কয়টি বন্ধু মিলিয়া আগামী পূজায় কোন্ পুস্তক অভিনয় হইবে তাহারই আলোচনায় ব্যস্ত। ইহাদের একটি ক্লাব আছে —তাহার নাম নবজীবন ক্লাব। ক্লাবের উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত। প্রত্যহ এই ঘরটিতেই সকল সভ্যের মিলন হয়। খবরের কাগজ, রবীন্দ্র-সাহিত্য, শরৎ-সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কোন বিষয় নাই যে, যাহার চর্চ্চা ইহারা করে না। নবীন রায়ের একমাত্র ছেলে নিখিলই এই ক্লাবের জীবন। সে ক্লাবের জন্য তাহাদের বাড়ীর একটা ঘর ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা ভিন্ন, যাহা কিছু খরচ-পত্র তাহাকেই বেশীর ভাগ দিতে হয়। চাঁদার যে টাকা উঠে, ব্যয় তাহা হইতে অনেক। বলিতে গেলে নিখিলের উৎসাহেই ক্লাব চলিতেছে।

রাজেন বলিল—ও বই ভালো নয়। পূজোর সময় এমন নাটক ঠিক্ করো, যাতে অন্ততঃ একবারও মা দুর্গার নাম পাওয়া যায়। তা' নয় বল্‌লে কি না—'পৃথ্বীরাজ!'

নরেশ বলিল—তবে 'দুর্গার মর্ত্তে আগমন হোক্।'

মণি বলিল—কেন, তার চেয়ে 'দুর্গার সহস্র নাম' হোক্ না কেন?

নিখিল প্রবেশ করিতেই রাখাল বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, 'দক্ষযজ্ঞ' তো খুব ভালো বই। কি বলিস্ ভাই নিখিল, ঠিক্ নয়?

তখন সকলেই একবাক্যে বলিল—'দক্ষযজ্ঞ' সত্যিই বেশ নাটক।

—তবে রাখুটা আপত্তি করলে যে?

—ওঃ, ওর কথা ছেড়ে দাও।

নরেনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু, 'পৃথ্বীরাজ' বা ওই ধরণের কিছু হয়।'

নিখিল বলিল—'পৃথ্বীরাজ' কাটা গেলেন। তারপর 'দক্ষযজ্ঞ' ছাড়া অভিনয় করবার মত বইয়ের নাম আর তো কেউ কিছু করো নি?

—কেন 'দুর্গার মর্ত্তে আগমন'টা কেটে-কুটে নাটক লিখে নিলে কি চলে না?—বলিয়া নরেশ হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িল।

মণি বলিল—কেন, সহস্র নামেও তো নাটক করবার চেষ্টা করতে পারা যায়।

রাজেন বলিল—তোরা দু'জনে ওই নিয়ে নাটক কি প্রহসন যা' হয় লেখ্, উপস্থিত আমরা 'দক্ষযজ্ঞ'ই করি।

রাজেনের কথায় 'দক্ষযজ্ঞ'ই স্থির হইল।

নরেন বলিল—এবার কিন্তু মহেশকে 'প্রম্‌টার' কোরো না। "আর বছর তার জন্যে কি কেলেঙ্কারীটাই না হলো! মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, আছে বই কি।

রাখাল বলিল—দেবেন আর সুরেশ দা'কে 'প্রম্‌টার' হতে বলো।

তারপর 'দক্ষযজ্ঞ' লইয়া অনেক আলোচনা-গবেষণার পর যাহাকে যে ভূমিকা দিলে মানায়, তাহাকে তাহা দেওয়া হইল। ঠিক্ হইল নবমীর দিন রাত্রে নিখিলের এখানেই অভিনয় হইবে। সকলে তখন নবীন উৎসাহে 'দক্ষযজ্ঞে' মাতিয়া উঠিল।

দুই

করঞ্জাক্ষ নিখিলের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছে। সেও নবজীবন ক্লাবের সভ্য। তাহাকেই দক্ষ রাজার ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। বিকালে বাড়ী আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া

জলযোগান্তে আপনার শয়ন-ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া সে 'পার্ট' তৈয়ারী করিতেছে।

যখন নন্দীর মুখে সতীর আগমন-সংবাদে সভামধ্যে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া শিব-নিন্দা করিতে করিতে মুখে কি কি ভাব দেখাইতে হইবে তাহারই চেষ্টায় সে ব্যস্ত, ঠিক্ সেই সময় উচ্চহাসির শব্দে চাহিয়া দেখিল—তাহার স্ত্রী শুভ্রজা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণপণ যত্নে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষরাজ তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল—ধাঃ, সব মাটি করলে! কত চেষ্টার পর যেই একটু মুখের ভাবটা ঠিক্ করেছি, অমনি তুমি সব নষ্ট ক'রে দিলে।

—আমি কি করব, তুমি দরজা বন্ধ করো নি কেন? জলখাবার খেয়েছ, পাণ খাবে তো? পান ক'টা সেজে আন্‌তে যা' দেরী হয়েছে। এসে দেখি—ও মা, আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ওই রকম মুখভঙ্গী হচ্ছে! আমি যে এলুম, তা' পর্য্যন্ত টেরও পেলে না।

—হ্যাঁ গো মশায়, ওকে মুখভঙ্গী বলে না। জানো তো তুমি সব।

—তবে কি বলে শুনি?

—একে বলে ভাবের অভিব্যক্তি। শিবকে গাল দিতে দিতে দক্ষ রাজার মুখের ভাব যে রকম হয়েছিল, তাই ফোটাবার চেষ্টা কর্‌ছিলুম। তুমি হেসেই তো সব মাটি করলে! আচ্ছা, তুমি এখন একটু চুপ ক'রে ব'সে দেখো দেখি, ঠিক্ হচ্ছে কি না।

—তার চেয়ে আমি ততক্ষণ ঠাকুরঝির সঙ্গে গল্প করি গে। ও রকম মুখ দেখ্‌লে আমি কিছুতেই হাসি চেপে রাখ্‌তে পারব না। বাব্বা, এমনিতেই আমার পেটে ব্যথা খিল্ গেছে!

—তুমি তো হাস্‌ছ। তোমার দাদা দেখ্‌লে কত বাহবা দিত।

—তবে দাদাকে ডেকে তাঁর সাম্‌নে শিবকে মুখ ভেঙ্‌চাও। আমি পালাই।

—না না, শোনো শোনো, ও আজকের মতো হয়ে গেছে। আজ থাক্। তুমি ব'সো, একটু গল্প করি।

শুভ্রজা বসিয়া বলিল—তোমরা কে কি সাজবে?

—এই আমি দক্ষ। তারপর তুমি তো সকলকে চিন্‌বে না। তবে তোমার দাদা সাজ্‌ছেন কশ্যপ, আর মণি সতী।

—শিব কে হবে?

—রাজেন।

—কে, ঠাকুর-জামাই? কই, তিনি তো তোমার মতো আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে ওই রকম করেন না।

—না, করেন কি না, চলো দেখ্‌বে।

—কোথায় যাব?

—তুমি আমার সঙ্গে এসো দেখিয়ে দিচ্ছি—বলিয়া শুভ্রজাকে লইয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বলিল—খুব আস্তে আস্তে ওই দরজার পাকি তুলে দেখো। দেখো, যেন শব্দ করো না।

শুভ্রজা যেই দরজায় হাত দিয়াছে, অমনি ভিতর হইতে রাজেনের গলা শোনা গেল—

আরে রে, সতী দে,
সতী দে, সতী দে!

বলিয়া সে এমন হুঙ্কার ছাড়িল যে, ভয়ে একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া শুভ্রজা স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল।

ওদিকে পাকিটা হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়ায় 'ঝনাৎ' করিয়া একটা শব্দ হইল। ভিতর হইতে রাজেন বলিল—কে রে?

ইহারা ততক্ষণে নিজেদের ঘরের দিকে ছুটিয়াছে। যাইতে যাইতে শুভ্রজা বলিল—বাব্বা, এ যেন মার মূর্ত্তি! দেখো বাপু, সত্যি-সত্যিই তোমাকে না মেরে বসেন।

তিন

বড় ঘরের মেঝেয় বিছানা পাতা। ঠিক তাহারই সম্মুখে একটা আলমারী খোলা। নিখিলের মা তাহা হইতে নূতন কাপড় বাহির করিয়া বিছানার উপর থাক্ দিয়া রাখিতে-ছিলেন। একটি মেয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। তাহার রঙ শ্যামবর্ণ, কিন্তু মুখশ্রী, গড়ন-পেটন সমস্তই

নিখুত। মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মেয়েটির মুখখানিকে যেন আরো সুন্দর করিয়াছে। তাহার নাম—কল্যাণী। নিখিলের সে পিস্‌তুতো বোন্‌। নিখিলের মা বলিলেন—কল্যাণ, এবার সকলকে ডাক্‌ তো মা।

—ডাকি মামীমা—বলিয়া কল্যাণী ছুটিয়া গিয়া বাড়ীর সমস্ত ঝি-চাকরকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—সবাই এসেছে মামীমা। খালি খুকীর ঝি এলো না। সে বল্‌লে—খুকী এখন নাইবে, খাবে, তারপর ঘুমোলে তবে আস্‌বে।

—আচ্ছা সে থাক্‌। তুমি এইবার যাতে যার নাম আছে, প'ড়ে প'ড়ে ঠিক্‌ ঠিক্‌ দিয়ে দাও দেখি।

—আচ্ছা দিচ্ছি—বলিয়া কল্যাণী একবার সব দেখিয়া লইল। পাশের বাক্সে কাগজের কয়টা মোড়কে পার্ব্বণীর টাকা সে দেখিয়া বলিল—তা' হ'লে যার যার টাকাও দিয়ে দি' মামীমা?

—হ্যাঁ মা, দাও—বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া মেয়েটির কাজ দেখিতে লাগিলেন।

কল্যাণ বলিল—দুঃখীরাম এসো।

একজন হিন্দুস্থানী চাকর হাত পাতিল। কাপড় ও টাকা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া প্রথমে গৃহিণীকে পরে কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। তারপর একে একে সকলেই কাপড় ও টাকা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

—সরকারদের কাউকে ডাক্‌তে বলি মামীমা?

—হ্যাঁ মা, বলো তো।

কল্যাণী বাহিরের বারান্দায় নন্দ চাকরকে যাইতে দেখিয়া বলিল—নন্দ, ননীবাবুকে ডেকে দে তো।

নন্দ ননী সরকারকে ডাকিয়া আনিল। কল্যাণী বলিল—এই আপনাদের সকলকার কাপড় আর পার্ব্বণী নিয়ে যান্‌—বলিয়া কতকগুলি কাপড় ও টাকা তাহার হাতে দিল। ননীও সেখান হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং কাপড় টাকা লইয়া চলিয়া গেল। বেলা বারোটা বাজিলে কল্যাণীর মা আসিয়া বলিলেন—এবার চলো। অনেক বেলা হলো যে, নাইতে খেতে হবে না?

—যাই ঠাকুরঝি। যা' কল্যাণ, তোর মা আর তুই 'চট্‌' করে নেয়ে-খেয়ে আয় তো। আবার বিকেলে অনেক কাজ করতে হবে।

বিকালে আত্মীয় ও আত্মীয়ারা অনেকেই আসিলেন। একটা বেশ বড় রকমের মজ্‌লিস বসিল। শুভ্রজা বলিল—ঠাকুরঝিকে বল্‌লুম যে, ঠাকুর-জামাইকে তুমি নিয়ে চলো। তা' সে এল না। মতলব খারাপ।

কল্যাণীর বড় বোন্‌ নলিনী বলিল—নির্জ্জনে প্রেমালাপের সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিয়ে তোর সঙ্গে আস্‌বে। তুই বড় অরসিক বাবু!

—আরে, তুমিও যেমন, ঠাকুর-জামায়ের প্রেমালাপের কি আর অবসর আছে! তিনি এখন দরজা বন্ধ ক'রে চেঁচাচ্ছেন—দেরে, সতী দে!—বাপ্‌রে বাপ্‌, সে যদি ভাই শুন্‌তিস! একদিন শুনে ভয়ে যাই আর কি!

—সে কথা আর বলো কেন ভাই! এ ঘরে ইনি হাস্য-রসের তুমুল তরঙ্গ তুলেছেন, আর অন্য ঘরে আর একজন রুদ্র-রসের গুরুগম্ভীর শব্দে বাড়ী কাঁপাতে লেগেছেন।

নলিনীর স্বামী প্রমথ বলিল—তা' হ'লে বলো যে, বাড়ীতে বসেই তোমরা থিয়েটার দেখ্‌ছ। বলি, ওহে দক্ষরাজ, ছাগমুণ্ডটাও হবে না কি?

—আমি তো প্রস্তুত হয়েই দক্ষের 'পার্ট' নিয়েছি। তারপর আমার বরাত!

এ কথায় ঘরশুদ্ধ সকলেই হাসিয়া উঠিল।

চার

আজ মহা-নবমী। দালানে দশভুজা দশদিক্‌ আলো করিয়া ভক্তের পূজা লইয়া যেন হাসিতেছিলেন। চারিদিকে ধুমধাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আর দু'-এক ঘণ্টা পরেই অভিনয় আরম্ভ হইবে। মায়ের সম্মুখেই উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে। বাড়ীর ভিতর নিখিলের পিসীমা খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ছাতে আটচালা বাঁধিয়া 'ভিয়ান' হইতেছিল। প্রমথ ও অন্যান্য চার-পাঁচটি ছেলে তাহারই তদারকে ব্যস্ত।

ওদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। শিব খড়ি মাখিয়া শাদা হইয়া মাথায় জটা ধারণ করিয়াছে। কোমরে বাঘছাল রঙিন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নকল সাপ জড়াইয়া

দিয়া রাজেন বলিল—কই কই, মাথায় গঙ্গা কই? জটায় সাপ কই?

একজন আগাইয়া দিল।

দক্ষ আসিয়া বলিল—ন'টা বাজতে আর পাঁচ মিনিট দেরী। নাও নাও, চটপট নাও। কার্ডে যে ন'টায় আরম্ভ লেখা হয়েছে।

প্রসূন বলিল—তা' হয়ে যাবে। তুমি ন'টায় কন্‌সার্ট আরম্ভ করিয়ে দিও তো।

হঠাৎ মঞ্চাধ্যক্ষ আসিয়া বলিল—ওহে দক্ষ যে যজ্ঞ করবে, তা' যজ্ঞ-কুণ্ডটা তো আনা হয় নি। যাও, কেউ গিয়ে শীগ্‌গির নিয়ে এস।

কে আর যায়। দক্ষ বাধ্য হইয়া নিজেই যজ্ঞকুণ্ড আনিতে ছুটিল।

পিসীমা তখন লোকজনকে বসাইয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেছিলেন। এখনই থিয়েটার আরম্ভ হইবে। সকলেই তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া নিজের নিজের জায়গা দখল করিয়া বসিবার জন্য ব্যস্ত। এমন সময় দক্ষ একজন চাকরকে বলিল—পিসীমা কোথায়? ডাক্ তো তাঁকে একবার।

খবর পাইয়া পিসীমা আসিয়া বলিলেন—কই, কে ডাক্‌ছে?

—আমি পিসীমা। একবার হোম-কুণ্ডটা চাই।

—কেন বাবা? সে যে দালানে। সে তো দিতে পারব না। কেন, কি হবে?

—আমাকে যে আজকে যজ্ঞ করতে হবে। আমাদের যে কারও ও কথা মনে ছিল না; নইলে আমিই তো বাড়ী থেকে আন্‌তে পারতুম।

—তাই তো, বড়ই যে মুস্কিলে ফেল্‌লে বাবা। তোমায় শাশুড়ী জান্‌তে পারলে রক্ষে রাখ্‌বে না। কি করি বলো?

—পিসীমা, ওদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

দক্ষের বিলম্ব দেখিয়া নিখিল কণ্ডপবেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—বেশ, এত দেরী করছ কেন? চট্‌পট আনো, আমি চল্লুম।

ব্যাপার দেখিয়া পিসীমা পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন—আজ রাত্রে কি আপনার হোম-কুণ্ডের দরকার হবে?

—না মা।

—তবে ওটা একবার পাঠিয়ে দিন্। এখানে দাঁড়াও বাবা, আন্‌লে নিয়ে যেয়ো। আমি ততক্ষণ ওদিকে দেখি গিয়ে।

পিসীমা আসিয়া দেখিলেন, সকলে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াছে। পাত তুলিয়া লইবার জন্য লোক দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের অর্দ্ধেকটায় অপর দিকে নূতন পাতা সাজান রহিয়াছে। এ দিকটা পরিষ্কার হইলেই আবার লোক বসিবে।

পিসীমা হাঁকিয়া বলিলেন—দেখিস পদ্ম, ভাল পাতা-গুলো যেন তুলে নিস্ নি।

—না মা—বলিয়া উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার আরম্ভ করিতেই হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া গেল। যে যেখানে ছিল, সকলে চেঁচাইয়া উঠিল। কেহ চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। কেহ খাইতে খাইতে হাত নামাইয়া বসিল। কেহ বলিল—আলো আন্, লণ্ঠন কি একটা বাতিই না হয় আন্!

কে আনে, আর কি প্রকারেই বা আনে। কেহ আলোর চেষ্টায় একটু এদিক-ওদিক করিতেই একটা করুণ রব উঠিল—বাবাঃ, পা-টা যে একেবারে গেল, উঃ হু হু! চোখে কি দেখ্‌তে পাও না না কি?

—তোমারও তো দুটো চোখ আছে, তবে কেন পায়ের তলায় তোমার পা-টা এল? সাম্‌লে রাখ্‌লেই তো পার্‌তে—বলিয়া সে হাতড়াইতে হাতড়াইতে চলিয়া গেল।

ওদিকে হুড়মুড় করিয়া দুই ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিল—বাবারে, মেরে ফেল্‌লে রে!

ব্যাপার দেখিয়া পিসীমা বলিলেন—কেউ নড়িস্ নি বাপু, যে যেখানে আছিস্ চুপ ক'রে থাক্। তারপর চেঁচাইয়া বলিলেন—ও গোষ্ঠ, ওরে ও নন্দ, তোদের কারো কাছে দেশলাই থাকে তো জাল্‌তে জাল্‌তে আয়।

ইতিমধ্যে একটা লণ্ঠন আসিয়া পড়িল। তাহারই সাহায্যে বাতি খোঁজার পালা আরম্ভ হইল। এমন সময়

হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিল। তখন সকলে সকলকে একবার দেখিয়া লইয়া গা হাত পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিজের কাজে ছুটিল।

এত কাণ্ডের মধ্যে দেখা গেল যে, পদ্ম-ঠাকুরুণের বেশ বাহাদুরী আছে। সমস্ত এঁটো পাতা তো সে তুলিয়াছেই, আবার সেই সঙ্গে ভাল পাতাগুলিও টানিয়া লইয়াছে। পিসীমা রাগিয়া বলিলেন—তোকে বারণ করলুম পদ্ম, তবু কি শুনতে পেলি না? এখন কি করি বল্? রাগিয়া বকিতে বকিতে আবার তিনি নূতন পাতা করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাঁড়ারী আসিয়া বলিল—মা, ভাঁড়ার-ঘর খোলা ছিল, হঠাৎ আলো নিবে গেল। আলো জ্বল্‌তেই দেখি যে, দু' হাঁড়ি দই আর একথালা সন্দেশ কে সেই ফাঁকতালে নিয়ে গেছে।

—সে কি! অন্ধকারে নিলে কেমন ক'রে?

—সকলকে দেওয়া হচ্ছিল ব'লে সাম্‌নেই ছিল। কেউ বোধ হয় আগে থেকেই নজর রেখেছিল।

—যাক্ বাবা, এদিকেও যে দেখি দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হলো! আজকের রাতটা কোনোমতে কাটলে বাঁচি। একজন আসিয়া বলিল—পিসীমা, আপনি এখানে, ওদিকে যে থিয়েটার আরম্ভ হয়ে গেছে।

—রোসো বাবা, এদিকের থিয়েটার আগে সাম্‌লাই—বলিয়া ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে অভিনয় খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গান আরম্ভ হইলে সকলে শুনিতে শুনিতে তাল দিতেছে। মধ্যে মধ্যে 'এন্‌কোর', 'এন্‌কোর' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছে। এইভাবে চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইল।

পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্য আরম্ভ হইল। এবার সতী দেহত্যাগ করিবেন। দক্ষের সভা। দক্ষ আসনে বসিয়া। কশ্যপাদি ঋষিগণ যজ্ঞে আহুতি দিতেছেন। এমন সময় সতী সেখানে প্রবেশ করিয়া একদিকে দাঁড়াইয়া বলিলেন—বাবা, আমি এসেছি।

সতীকে দেখিয়া দক্ষ জ্বলিয়া উঠিয়া শিবের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সতীকে কেহ বসিতেও বলিলেন না। শিবনিন্দা শুনিতে শুনিতে দুঃখে-অপমানে নিজের উপর ধিক্কারে সতী দেহত্যাগ করিলেন। প্রাণশূন্য দেহ মাটিতে পড়িতেই নন্দী কাঁদিতে কাঁদিতে সংবাদ দিতে ছুটিল। ঠিক্ যে মুহূর্ত্তে শিব—আরে রে, সতী দে!—রবে চারিদিক কাঁপাইয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিলেন, ঠিক্ সেই সময় পুনরায় বাড়ীর সব আলো নিবিয়া গেল। সতীর আর্ত্তনাদে স্বয়ং শিবও চেঁচাইয়া উঠিল। কশ্যপাদিও কি হলো, কি হলো!—বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

পাঁচ মিনিট পরে আলো আবার জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেখা গেল, সতী পা ধরিয়া বসিয়া আছে। তখন সকলে সেখানে আসিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সতী অতিকষ্টে বলিল—শিব এত জোরে তাহার পা মাড়াইয়া দিয়াছে যে, ডাক্তার ডাকিয়া পায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এদিকে সতী—বাবারে, মারে!—করিতে লাগিল। দক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতযোড় করিয়া দর্শকদিগকে বলিল—আজকের মতো আমি এখানেই যজ্ঞ শেষ করলুম। আপনারা সকলে বাড়ী যেতে পারেন।

তখন সকলে এ উহার মুখ দেখিতে লাগিলেন—কে কি মন্তব্য করেন শুনিবার জন্য। কিন্তু কেহই কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া দক্ষ আবার বলিল—দৈব বিড়ম্বনায় আজ আমাদের নানা বিঘ্ন ঘটায় উপস্থিত বাধ্য হয়েই অভিনয় বন্ধ করতে হলো। আপনারা সেজন্য ক্ষমা করবেন। আর দেরী করলে পায়ের যন্ত্রণায় সতী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। তাই আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মনেই আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—না না, ও রকম ক'রে বল্‌বেন না। আপনারা ওঁর পায়ের ব্যবস্থা করুন। আপনারা কি করবেন, আমাদের আনন্দ দেবার জন্যে তো যথেষ্ট আয়োজনই করেছিলেন। অদৃষ্ট দোষে আমরা সেটা সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পেলুম না। এখন দেখুন, ওঁর পায়ের কি অবস্থা।

ইহার পর একে একে প্রায় সমস্ত লোকই চলিয়া গেলেন। কেবল নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুই-পাঁচজন ডাক্তার আসিয়া কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে

লাগিলেন। ওদিকে সতীকে উঠাইয়া বাহিরের বড় ঘরে আনিয়া কৌচে শোয়াইয়া দক্ষ হাঁকিলেন—ওরে কে আছিস্, ঝণ্টুকে শীগ্‌গির বরফ আন্‌তে বল্।

তখনই একজন বরফ আনিবার জন্য ছুটিল। তখন শিব তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেই সতী অতিকষ্টে চেঁচাইয়া উঠিল—না দাদা, না, হাত দিও না ভাই! বড় যন্ত্রণা!

শিব বলিলেন—তুমি কিছু ভয় পেয়ো না। আমি লাগাব না। দেখ্‌ছি হাড়-টাড় ভেঙেছে কি না।

ইতিমধ্যে বরফ আসিয়া পড়িল। একটা গামছায় বাঁধিয়া বরফের টুকরা পায়ের চেটো ও গোড়ালির উপর দিতে দিতে বেচাবী সতী অনেকক্ষণ পরে আঃ বলিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িল।

শিব বরফ দিতে দিতে বলিল—কি ভাই, একটু কম্‌লো কি?

—হ্যাঁ অনেকটা কম—বলিয়া কি মনে কবিয়া হাসি-তেই দক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—ও কি, এই হাসি, এই কান্না! এতক্ষণ তো জগৎ অন্ধকার দেখ্‌ছিলে। এখন এমন কি হলো যে হাস্‌ছ?

এবার সতী জোরে হাসিয়া বলিল—দক্ষযজ্ঞের শেষ অঙ্কটা নাট্যকার যা' লিখেছেন, আমরা তার চেয়ে খুব ভাল ক'রে অভিনয় করেছি। শিবকে সতীব মরা দেহটা কাঁধে ক'রে ত্রিভুবন বেড়ানোর দায় থেকে কেমন সহজে রেহাই দিয়ে জ্যান্ত সতীর পদসেবায় বসিয়ে দিয়েছি—তাই মনে করেই তো হাসছি।

সতীর কথায় সকলেই, মায় দর্শক যে কয়জন সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাও হাসিয়া উঠিলেন। এমন সময় ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পা দেখিয়া বলিলেন—এই যে একটু ফুলেওছে। তা' হোক্। শিরে লেগেছে, হাড়-টাড় ভাঙে নি। 'গুলার্ড লোসন্' দিচ্ছি, তাই দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। দু'-তিনদিনেই সেরে যাবে। এখন পা নিয়ে উঠলে সারতে দেরী হবে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, এখন বলুন তো কি ক'রে কি হলো?

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের দেখ্‌ছি সত্যি সত্যিই দক্ষযজ্ঞ হয়েছে। 'গুড নাইট'—বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন। অপর সকলেও একে একে চলিয়া গেল। অগত্যা বাধ্য হইয়াই পা না সারা পর্য্যন্ত সতীকে কশ্যপালয়েই থাকিতে হইল। অবশ্য কশ্যপ প্রাণ-পণ যত্নে সতীর পদসেবার ভার লইলেন।

স্বর্গীয়া আনন্দময়ী দেবী

সংবাদ

রাজারানীর ভারত আগমন

রাজা ও রাণী দিল্লীতে অভিষেক দরবারে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া আশা করা যায়। খুব সম্ভব ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী দরবার হইবে। রাজা ও রাণী ভারতবর্ষে দুইমাস কাল অবস্থান করিবেন বিলাতে এক পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন।

করোনেশন ১২ই মে তারিখে হইবে।

রেলওয়ে ধর্ম্মঘট

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গাপুরের প্রায় এগার হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ধর্ম্মঘট অন্যান্য স্থানেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। —জনশক্তি

স্থান-পরিবর্ত্তন

হাওড়ায় নূতন পুল নির্ম্মাণের জন্য অনেক ব্যবসায়ীকেই জায়গা বদল করিতে হইযাছে। বিখ্যাত লৌহ বিক্রেতা—'টি ডি, কুমার এণ্ড ব্রাদার্স লিমিটেড'ও নিজেদের পুরাতন 'ডেবা' ত্যাগ কবিয়াছেন। তাঁহাদের নূতন ঠিকানা—দু' নম্বর দরমাহাটা ষ্ট্রীট্, লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

জীবন-নাট্যের এক অঙ্ক

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

বিশাল কলিকাতা নগরীর এক ধনীর গৃহের ড্রইংরুমে গল্পের যবনিকা উত্তোলন করিয়া আমরা দেখিতে পাই, চায়ের টেবিলের দুইপাশে দুইটি তরুণ-তরুণী—অমিয় ও ইলা।

সেইদিন, অমিয় প্রথম আবিষ্কার করিয়া বসিল যে, সে ইলাকে ভালবাসে। যে ইলাকে বাল্যকাল হইতে অমিয় নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই ইলার মধ্যে যেদিন যৌবনের ডাক্ আসিল, অমিয় সেদিন নিজের মনকে সংযত করিতে পারিল না; তাহার বাঁধন-হারা মন ইলাকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

সূর্য্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতে থাকিবে, বিরামহীন, বিশ্রামহীন; ইহাও যেমন সত্য, পুরুষ ভালবাসিবে নারীকে, তাহাও ঠিক্ তেমনি চিরন্তন সত্য।

মুগ্ধদৃষ্টি মেলিয়া অমিয় ইলাকে দেখিতেছিল। সে যেন ইলাকে নূতনভাবে দেখিয়াছে।

—অমিয় দা'।

—কেন ইলা?

—না, কিছু না।

—একটা কথা ভাব্‌ছি।

—জানি।

অমিয়ের কল্পনার ইলার মুখ হইতে যখন 'কি', 'কেন', ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠিয়া তাহার মনকে দোলা দিতেছিল, বাস্তবতার ইলার মুখ হইতে ঠিক্ সেই সময় 'জানি' উত্তরে সমস্ত এলোমেলো হইয়া গেল।

—কি জানো? অমিয় জিজ্ঞাসা করে।

—আপনার চিন্তার কথা।

—কেমন করে জান্‌লে?

—জানেন, বি-এ কোর্সে আমার 'সাইকোলজি' আছে; বয়সও আমার হয়েছে। কিন্তু অমিয় দা', ভুল করা মানুষের পক্ষে সাধারণ হ'লেও সবক্ষেত্রে ভুলের শাস্তি এক নয়।

অমিয়ের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেল, ইলার রূঢ় উত্তরে। তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, তাহার জীবনের বিস্মৃত কাহিনী—যাহার দ্বারা তাহার দাবীর মাপকাটি নির্ণীত হইবে। দুইটি হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অমিয় চিন্তা করিতে লাগিল।

অমিয় গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল শহরের জনস্রোতে। সে পথে পথে ফিরিল কয়দিন—সহায়হীন, সম্পদহীন। শেষে ভাগ্যই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল ইলাদের বাড়ীতে। সাহায্য ত মিলিলই, উপরন্তু মিলিল, বালিকা সাথী ইলা এবং তাহার লেখা-পড়ার ভার।

অমিয় যখন মাথা তুলিল, ইলা তখন চলিয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া অমিয় দেখিল বৈকাল হইয়াছে। ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল। তাহার মন তখন ভারাক্রান্ত। তাহার মাঝে যেন পরিবর্ত্তনের রেশ আসিয়াছে।

জানালাটা খুলিয়া দিয়া সে বাগানের পানে চাহিয়া রহিল। হাস্নুহেনার ঝাড়ে লাগিয়াছে তখন বাতাসের দোলা। তাহার গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। দোদুল্যমান শাখা-প্রশাখা ও ফুলগুলির মাঝে দুইটি ক্রীড়ারতা প্রজাপতির পানে অমিয় আত্মবিস্মৃত হইয়া তাকাইয়া রহিল।

মোটরের শব্দে চকিত হইয়া সে চাহিয়া দেখিল, ইউক্যালিপ্‌টাস ও ঝাউগাছের ও-পাশে গিরিমাটি রংয়ের রাস্তার উপর দিয়া ইলাদের গাড়ীখানি ধীর গতিতে

গেটের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। মোটরখানি 'ড্রাইভ' করিতেছে ইলা। তাহারই পাশে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে ইলার পানে চাহিয়া বসিয়া আছে এক সুপুরুষ যুবক।

এই দৃশ্য দর্শনে অমিয়ের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে পথে নামিয়া আসিল। অনির্দ্দিষ্ট তাহার যাত্রা।

* * *

তারপর, সুদীর্ঘ আট বৎসরে পৃথিবীতে কত কি ঘটিয়া যায়। বিরাট প্রান্তরে গড়িয়া উঠে বিশাল নগরী; কোনও নগরের বুকে আসে ধ্বংসলীলা। কত মনে, কত জীবনে এমনি ভাঙ্গাগড়া ঘটিয়া যায়। আট বৎসরের মধ্যে ছন্নছাড়া অমিয় হইয়া উঠিয়াছে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাহার বিবাহিত জীবনে সে সুখ পাইয়াছে প্রচুর। তবু ক্ষণে ক্ষণে তাহার মানসী-প্রতিমা ইলার কথা মনে পড়িয়া অমিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে।

সেবার পূজার ছুটিতে অমিয় সস্ত্রীক পুরী গিয়াছিল। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী একটি সুন্দর ডাকবাংলো ভাড়া লইয়া সে বাস করিতেছিল।

একদিন প্রভাতে মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়া অমিয় সমুদ্র-তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সাথে তাহার স্ত্রী মায়া। সমুদ্রের বুকে তখন বড় বড় ঢেউ উঠিয়াছে; বাতাসও বহিতেছিল বেশ জোরে জোরে। অমিয়ের মনে তখন ইলার চিন্তার ঝড় ঢেউ তুলিয়াছিল।

মোটর হইতে নামিয়া অমিয় ও মায়া সমুদ্রের তীর দিয়া হাঁটিতেছিল নির্ব্বাকভাবে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মায়া বলিল—হ্যাঁ গো, কি ভাব্‌ছো?

—কিছু না মায়া, মনটা কেমন ভাল নেই।

—কেন বলো তো?

—তা' জানি না। নিকটে একটি সুদর্শনা স্ত্রীলোককে দেখিয়া অমিয় বলিল—কে, ইলা না?

নমস্কার করিয়া ইলা বলিল—হ্যাঁ, অমিয় দা'।

—তুমি এখানে কি করে এলে, কার সাথে? তোমার স্বামী?

—আমার স্বামী বিলেতে গিয়েছেন; সেখানে তাঁর 'থাইসিস্' হয়েছে।

—থাইসিস্!

দুইটি জীবন দুই দিকে বহিয়া গিয়াছে। ইলা প্রশংসমান দৃষ্টিতে মায়াকে দেখিতেছিল। অমিয় বলিল—ইনি আমার স্ত্রী।

মায়া বলিল—দিদি, আসুন, ওঁর সাথে পথে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করবেন, বাড়ীতে গিয়ে হবে। আসুন, গাড়ীতে উঠুন।

ইলা নিস্তব্ধভাবে মোটরে উঠিয়া বসিল। তাহার মনেও তখন ঝড় বহিতেছে।

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

সংবাদ

কিশোর-সাহিত্য-সঙ্ঘ

শিলচরে অল্পবয়স্ক তরুণবৃন্দের চেষ্টায় 'কিশোর-সাহিত্য-সঙ্ঘ' নামে একটী সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কিশোরদের মধ্যে সাহিত্য-সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করা। এই সঙ্ঘের মুখপত্রস্বরূপ 'শারদীয়' নামে একটী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কিশোরদের এই মহান্ প্রেরণা অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ ধারায় সিঞ্চিত হইয়াছে।

হাবসী সম্রাটের দুর্ভাগ্য

লয়েড এসিওরেন্স কোম্পানী আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হেল সেলাসীর বিরুদ্ধে একলক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবীতে ব্রিটিশ আদালতে নালিশ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। কারণ, আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় আদ্দিস আবাবা ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়া সম্রাট উক্ত কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি করিয়াছেন।

হরিজনের শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ

নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ, ৫০০ জন হরিজন শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। —জনশক্তি

ধ্রুবজ্যোতি

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আট

"এমন ক'রে কেন আপনি আমাদের জ্বালাতন ক'রে তুল্‌ছেন, এর মানে কি?"

জিজ্ঞাসিতা নারী ধীর শান্তকণ্ঠে বলিল, "আপনি নিজেই তার জন্যে দায়ী। মরণ ঘুমের কোল থেকে টেনে যদি আমায় ফিরিয়ে না আন্‌তেন, আপদ জুটতো না।"

নিশীথ চঞ্চল হইয়া বলিল, "বাজে কথা ছাড়ুন। পুরুষ-জাতের সবাইকেই আপনার হাতের খেলার পুতুল ভাববেন না। মনে রাখবেন—আপনাদের নাগালের বাইরেও একটা দিক্ আছে। সেখানের শান্তিতে হাত দিতে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়, ইচ্ছে করে জ্বালা কিনে নেওয়া।"

অমলা প্রশান্ত স্বরে প্রতিবাদ তুলিয়া বলিল, "কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আপনার মনে পড়ে না কি আমরা মানুষ। নারীর অন্তরের বুভুক্ষা নিয়ে আমাদের জন্ম হয়েছে। আশা-আকাঙ্ক্ষায় মাতোয়ারা হ'য়ে আমাদেরও প্রাণ নেচে ওঠা সম্ভব।"

নিশীথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, সেইটুকুই মুছে ফেলা দরকার।"

অমলা হাসিয়া বলিল, "এটা কেমন কথা হলো জানেন, চাঁদকে বলা তার শীতলতাকে ছেড়ে দিয়ে আকাশের গায়ে ভেসে উঠ্‌তে—তার সমস্ত আলোটা অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে সূর্য্য যেমন ওঠে সারা বিশ্বে কিরণ ছড়াতে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নিশীথ বলিয়া উঠিল, "তা' বলে কি বল্‌তে চাও পাপ তার কলুষ হাতটা সবার গায়েই ছুঁইয়ে দিয়ে যাবে। পুণ্যের লেশ পৃথিবীতে আর থাকবে না, লয় হয়ে যাবে?"

অমলার কণ্ঠটাও এবার মৃদু উত্তেজনা আঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আর আপনিও কি বল্‌তে চান কোন কারণে কারও পা-টা পিছলে গেছে বলে জীবনভোর তাকে পড়তেই হবে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সে কোনদিনই পারবে না। ইচ্ছে থাক্‌লেও ফেরবার কপাট চিরদিনের জন্যই তার রুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে—হাজার ঠেলাঠেলি করলেও খুল্‌বে না।"

নিশীথের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। ভাষার প্রত্যেক আবর্ত্তনে বেশ একটু জোর দিয়া দিয়াই সে উচ্চারণ করিল, "না তা' বলি না। শুধু আমি কেন, মনুষ্য পদ-বাচ্য কোন লোকই বোধ হয় এ কথা বল্‌তে সাহস পাবেন না। সংযমের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিরোধ করে যে ফিরতে চায়, জগতে এত বড় কোন শক্তি নেই যে, তার এগিয়ে যাবার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। তবে একটা কথা—সে ফেরাটা শুধু কথার কথা, না অন্তরের আগ্রহ।"

অমলা বলিল, "হাসালেন আপনি! সে বিচারের ভার আপনার, না যে অন্তরের খেলায় বিরক্ত হয়ে মনের মত একটা পথ খুঁজে নিতে চাচ্ছে, তার। তা' ছাড়া, সংযম যা' বল্‌ছেন, একের ওপর থাক্‌বার অধিকারই যখন দিচ্ছেন না, তখন তা' আসবার সুযোগ পায় কোথা' থেকে?"

নিশীথ রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "প্রবৃত্তির দাসীর মন কখনই সে পথে পা বাড়ায় না।"

এত বড় শক্ত কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে কিন্তু নিজের অন্তরের কাছে নিজে এতটুকু হইয়া গেল। এই কথাটার আঘাত সম্মুখবর্ত্তিনীর গায়ে কতটা বাজিয়াছে জানিবার জন্যই যেন একটা চুরী করা চাহনিতে অমলার মুখের দিকে চাহিল। অমলা বেশ সরল হাস্যেই কথাটা

উড়াইয়া দিয়া বলিল, "কেন, ভালবাসার ক্ষুধাটা কি কেবল আপনাদেরই একচেটে ?"

বিস্মিত নিশীথ তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভালবাসার ক্ষুধা ?

অমলা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, উদরের বুভুক্ষার মত ভালবাসারও একটা ক্ষুধা আছে। প্রাণ ঢেলে আমরা আপনাদের সেটা পূরণ করে রাখি, তাই ধরে উঠ্‌তে পারেন না। আমাদের কিন্তু তা' নয়। দিয়েই আমরা ফতুর হই, নেবার অবকাশ ত পাই না। আপনাদের দয়া কোনদিন দেওয়ার কাছ বরাবরও পৌঁছিতে পারে না। সেবাদাসীর ওপর কে কবে আবার দয়া দেখাতে পারে। কাজেই চিরদিন পিপাসিত থাকাই আমাদের ভাগ্যফল। এর বিদ্রোহ ভ্রমেও যদি করি, লোকচক্ষে আমাদের স্থান নির্দ্দেশ হবে—পতিতার দলে। আচ্ছা, বলুন ত, সেই পতনের সাহায্য কি আপনারাই আমাদের করেন না ? আইন কিন্তু আপনাদের হাতে, তাই সাজা কেবল আমরাই পেয়ে থাকি।

ব্যথিত কণ্ঠে নিশীথ বলিল, "তারপর অমলা ? জানি, আমরা কতটা উচ্ছৃঙ্খল, তাই ত সংসারে দেবীর আসন, মাতার আসন তোমাদের জন্ম ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। সেখান থেকে নাম্‌তে দেখ্‌লে আমাদের প্রাণে বাজে। আর একটা কথা, ভাল জিনিষ যদি নষ্ট হয়, তা' আর ব্যবহারে আনা দূরের কথা, সৎসঙ্গে মিলিয়ে তুল্‌তেও ঘৃণা হয়।"

"কিন্তু—"

বাধা দিয়া নিশীথ বলিল, "বুঝেছি। তুমি সে দোষটুকুও আমাদের ঘাড়েই চাপাতে চাও। কিন্তু জেনো, এটা তোমার মস্ত বড় ভুল, নারী প্রশ্রয় না দিলে পুরুষের সাধ্য নেই যে, তার কাছে এগিয়ে যেতে পারে। হাজার পাষণ্ড হলেও সতীর তীক্ষ্ণ চাহনির কাছে সে দুমড়ে পড়বেই পড়বে। যেখানে যেখানে তার ব্যত্যয় ঘটেছে, আমার বিশ্বাস, ঠিক্ সেইখানেই নারী তার নারীত্ব ছেড়ে আগে নেমে এসেছে। রমানাথ মাইতির স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে ঠিক্ তার পাশের বাড়ীর দুর্লভ সামন্তের পরিবারে পাষণ্ডেরা অনিষ্ট ঘটিয়ে গেল—এর মানে বেশ উজ্জ্বল হয়েই সবার চক্ষের ওপর ফুটে ওঠে না কি ? হাব-ভাব, চাল-চলন দিয়ে সে তার পিছলে পড়া পা-টা সবার সাম্‌নে ভালরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল, সেই জন্যেই তো দুর্ব্বৃত্তেরা প্রশ্রয় পেয়েছে।"

অমলা ঠিক্ ঠিক্ জবাব দিতে পারিল না, নীরবে মাথা হেঁট করিয়া শুধু চিন্তা করিতে লাগিল। নিশীথ উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে অগ্রবর্ত্তী রাত্রির দিকে চাহিয়া বলিল, "সে যাক্। আমাদের সংসারের গণ্ডীর মধ্যে তুমি যতটা পা না দাও, ততটাই মঙ্গল। বাড়ীর এরা সে ভাবের লোক নয়। তবে নেহাৎ যদি আমায় পথে বার করবার অভিপ্রায় থাকে তোমার, যেও—এই তার উপযুক্ত অবকাশ।

কথাটা শেষ করিয়াই নিশীথ চঞ্চল পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অমলা চীৎকার করিয়া বলিল,"শোনো, দাঁড়াও, আমার ফেরবার পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও।"

বাতাস নির্জ্জন গৃহভিত্তি হইতে তাহার প্রতিধ্বনি ফিরাইয়া আনিল মাত্র। নিশীথ ফিরিল না—বুঝি সে শুনিতেই পাইল না। অলস দেহভার ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া অমলা শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল।

ঠিক্ সেই সময় ঘরের নিকট হইতে কে ডাকিল, "অমলা বিবি, মেজাজ সরিফ্।"

তড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া অমলা সশব্দে মুক্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে বলিল, "যান্ যান্, সরে যান্! আজ আমার বড় অসুখ।" তারপর অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতে হাতড়াইতে শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া অস্ফুট কুজনে আপনা-আপনি বলিল, "না না, অন্ততঃ আজকের দিনে তোমার পুণ্য পদধূলির অবমান হ'তে আমি দেব না!"

শ্বশুর-বাড়ীর দ্বারে আসিয়া নিশীথ চঞ্চল পদক্ষেপে দ্বিতলের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিতেছে, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে কে একজন উপরকার গৃহ অভ্যন্তর হইতে বলিয়া উঠিল, "কে আসছে দেখ্ ত রঘু।"

বেহারা তাহার অবসর নিদ্রার আসন টুলটা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর সম্ভ্রমের সহিত

আগন্তুকের উদ্দেশ্যে এক সেলাম বাজাইয়া ভিতরের কথার জবাব দিল, "জামাইবাবু।"

সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল তর্জ্জনে তাহার শ্যালক কুমুদিনীকান্তের কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, "বেরিয়ে যেতে বল্, তুই বেরিয়ে যেতে বল্, আমার বাড়ী-ঘর নোঙরা করতে আর আসতে হবে না।"

তথাপি দুই-এক ধাপ উপরের দিকে পা বাড়াইয়া নিশীথ কৌতুক-উজ্জ্বল-মুখে বলিল, "এটা নূতন ব্যারিষ্টারীর কোনো চাল না কি কুমু দা', না, বিলেতের সভ্যতাটাই এই রকমের?"

পরুষ কণ্ঠে ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "তোকে কি বল্লুম হতভাগা, তবু 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে আছিস। যা', সিধে পথ দেখিয়ে দরজা দিয়ে আয়।"

রঘু ভয়ে ভয়ে কয়েক পদ আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আজ দাদাবাবুর মেজাজের ঠিক্ নেই জামাইবাবু, আপনি বাড়ী যান্।"

নিশীথ সহাস্য-মুখে বলিল' "কেন বল্ ত? তোদের মেমদিদির সঙ্গে আজ ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "হাঁ হয়েছে, তুমি দূর হও।"

"তা' আমায় এখন দূর করে আর কি ফল হবে! কেলেঙ্কারী ত বেরিয়ে পড়েছে, বরং থাকলে মিট্‌মাট্—"

চাবুক হস্তে উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিতে আসিতে কুমুদিনীকান্ত বলিল, "বলি কথা শোনা হচ্ছে না যে, অমনি যাবে, না চাবুক দিয়ে দূর করব?"

সঙ্গে সঙ্গে 'সপাং' করিয়া একটা আঘাত নিশীথের কপালে আসিয়া বাজিল। এত বড় অপমানের পরও নিজেকে প্রাণপণ যত্নে স্থির রাখিতে চেষ্টা পাইয়া নিশীথ বলিল, "আজ মাত্রাটা কিছু বেশী হয়ে গেছে বুঝি। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে বিলিতি সভ্যতার কেবল এইটুকুই তুমি শিখে এসেছ। এর—"

শূন্যে উৎক্ষিপ্ত কশার বিপুল আন্দোলনের সহিত নিজের দেহভার দোলাইতে দোলাইতে কুমুদিনীকান্ত কহিল, হ্যাঁ, এই, এই তার জবাব।"

নিশীথ কপালের রক্ত রুমালে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষুব্ধ ব্যথায় বলিয়া উঠিল, "খুব হয়েছে ভাই, এরপরও তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পুণ্য সঞ্চয়ের ধৈর্য্য আমার নেই। তোমার ভগ্নীকে পাঠিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।"

"পাজি, নচ্ছার, শূয়ার, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! এখনও কি মনে করিস্ আমার বোন্ তোর বাড়ীতে পা বাড়াবে?"

নিশীথ ধীর সংযতভাবেই উত্তর দিল, "কিন্তু কথাটা যার, তার মুখেই আমি শুন্‌তে চাই। একের কথা অন্যের মুখ দিয়ে শুনে বিশ্বাস করতে তোমাদের আইন বলে দিলেও আমি মান্‌তে পাচ্ছি না। মাধবীকে ডেকে দাও।"

'পাষণ্ড, এরপরও সে তোমার সাম্‌নে বেরুবে! স্পর্দ্ধাও ত কম নয়! তুমি দূর হও!"

তাহাকে আর কোন কথা বলা না বলা তুল্যমূল্য বুঝিয়া নিশীথ নত বদনে কম্পিত কলেবর রঘুর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "তোর দিদিরাণীকে বল্ গে ত রঘু, জামাইবাবু দাঁড়িয়ে আছেন যাবার জন্যে। রাত অনেকটা হয়েছে, আর মিছে দেরী যেন না হয়।"

কিন্তু রঘুকে ভিতরে গিয়া উত্তর আনিতে হইল না। নিশীথ স্পষ্ট শুনিল, মাধবী কলহাস্যে ঘর ভরিয়া তুলিয়া বেশ সহজ সরল কণ্ঠেই ডাকিতেছে, "বৌদি' দাদা কেমন বাঁদর নাচাচ্ছে, দেখ্‌বি আয়!"

বৌদিদির উত্তর শুনিবার মত ধৈর্য্য নিশীথের আর রহিল না। সে পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে দুই-তিনটা সোপান এক এক লাফে অবতরণ করিয়া রাজপথের মুক্ত বাতাসের মাঝে নিজেকে টানিয়া আনিয়া ফেলিল।

নয়

'এয়ার গানে'র ছররায় দুই-চারিটা 'বটের' পাখীকে ঘায়েল করিয়া তিনজনের সে কি আনন্দের ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি! সুলতানের সহিত পাল্লা দিয়া আহত পাখীটিকে করায়ত্ত করিতে নণ্টুর সে কি উৎসাহ! প্রতিকারের নিষ্ফলতাও কিন্তু তাহাকে আমোদের একটানা স্রোত

হইতে দূরে টানিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। শেষে পরিশ্রম তাহার শ্রমকাতর দেহখানিকে অবসন্ন করিয়া দিল। বালক হাসিতে হাসিতে তখন ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা, আর পারি না! সুলতানটা যে দুষ্টু হয়েছে, ওর সঙ্গে মানুষে পারে! দিদি থাকলে কিন্তু ওটা ঠিক জব্দ হয়ে যেত। তার কাছে 'টঁ্যা হুঁ' খাটে না, যত চালাকী ওর আমার সঙ্গে।"

সুলতান কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র মনিবের এ নিন্দাবাদে কিছুমাত্র লজ্জিত হওয়ার ভাব না দেখাইয়া ঠিক নণ্টুর পাশটিতে পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল এবং আধহাতটাক্ জিব বাহির করিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। বালক তখন সরিয়া গিয়া ক্ষুদ্র দুইখানি বাহুলতায় তাহার গ্রীবা সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই বুঝি মনে করলি সুলতান, আমি তোর ওপর খুব রেগে গিয়েছি, না? আরে হাবা, তা' কি হয়? নেহাৎ গো-বেচারা তুই, তোর ওপর কি রাগ্‌তে পারা যায়। মাইরি না, সত্যি বল্‌ছি। না বিশ্বাস হয় বরং জিজ্ঞাসা কর এঁকে। কি বলেন আপনি, এই নিরীহ পশু, এর ওপর রাগ করে থাকা যায়?"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "তা' ত বটেই! তবে মধ্যে মধ্যে শাসন করবার জন্যেই যা' একটু-আধটু বকুনি দিতে হয়।"

নণ্টু ত্রস্তভাবে বলিল, "তা' বুঝি জানেন না, বকা যায় কাকে—না, যে ভালবাসে তাকে। মা আমায় এ কথা শিখিয়ে দিয়েছেন। ছেলেবেলায় দিদির সঙ্গে আমার বড় ঝগড়া হতো। সে ধম্‌কাত, আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিতুম। তাই না মা একদিন আমায় ডেকে বুঝিয়ে দিলেন—ঝগড়া কেউ কি রাস্তার লোক ডেকে করে। সেদিন থেকে দিদি আমায় হাজার চটালেও আমি কাঁদি না। তবে সে ছোটকালের কথা কি না, এখন যে বড় হয়েছি।"

কথাটা এমনভাবে উচ্চারিত হইল, যেন মণীশের সহিত তাহার বয়সের প্রভেদ তেমন অধিক নহে। বিজ্ঞতার আসন মানুষ এমনি করিয়াই নিজের করায়ত্ত রাখিতে চায়।

অন্তরের আনন্দ তুফান সাধ্যমত গাম্ভীর্য্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া রাখিয়া মণীশ বলিল, "তা' হলে এবার থেকে বকুনিটা আমি তোমায় দেব নণ্টু, না তুমি আমায় দেবে?"

বালক চঞ্চল-কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে, না না, সে বড় বিশ্রী দেখাবে। আমাদের দু'জনের মধ্যে রাগারাগি বকাবকি মোটেই হবে না।"

মুখভাব করিয়া মণীশ বলিল, "তা' হ'লে, তুমি আমায় মোটেই ভালবাস্‌তে চাও না।"

নণ্টু এবার বিপদে পড়িল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাব শোধরাইয়া লইয়া বলিল, "বারে, তা' কেন, ভালবাসা হলেই বুঝি আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি করতে হয়? আমরা কি বেরাল?"

মণীশ স্বীকার করিয়া লইল সে তাহা নহে এবং কোন কালে যে সে পদের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে বেশ একটু চিন্তা-জড়িত-কণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তা' ঝগ্‌ড়া-ঝাটি না থাকলেও আমাদের এ ভালবাসা চিরকাল থাক্‌বে ত?"

বালক তাহার উজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া বলিল, "বারে তা' কেন থাক্‌বে না! এই যে গাছের ফুলগুলো এদের সঙ্গে কি আমরা হাত-পা নেড়ে ঝগ্‌ড়া করতে যাই? কিন্তু ফুলকে কে না ভালবাসে, তাই বলুন। ওটা কি জানেন, দিদি আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কি না, তাই।"

এবার মণীশ বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইল সে নণ্টুর সমবয়সী—এমন কি, একদিনের জন্যও বড় নহে। নণ্টুর দিদি তাহারও দিদি পদবাচ্যা; কাজেই বকুনিটা দিদিরই একচেটিয়া রহিল। বালকের সহিত সখ্যতা হিসাবে এবার হইতে সে দিদির তিরস্কারের অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য।

সুলতান এতক্ষণ স্থির-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দূরে কি একটা পদার্থের উপর লক্ষ্য করিতেছিল। বালক প্রভুর এত গবেষণাপূর্ণ যুক্তি-বিচারে তাহার মন যে এতটুকুও নিবদ্ধ ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে জন্য তাহাকে বিন্দুমাত্র লজ্জিত দেখা গেল না। বরং নণ্টুর বাহু-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াই সে বেশ একটু উৎসুক আগ্রহে

উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই একটা অবোধ্য অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া গেল।

মণীশ বলিল, "তোমার ছাত্রটী যে পাগল নণ্টু, এখন উপায়?"

বালক ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, যাবে কোথা'? এখুনি ওকে ফেরাচ্ছি, দেখুন না। এই সুলতান, সুলতান, ড্যাম্ ডেভিল্, ফের্, ফের্ শীগ্‌গির।"

সুলতান এ ডাক্ উপেক্ষা করিল না বটে, অর্দ্ধপথে অনিচ্ছায় গতি সংযত করিয়া একবার পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তারপর তিরস্কার-মিশ্রিত চাহনিতে চাহিয়া যেন বলিতে চাহিল, "বড় বোকা ত তুমি! যাচ্ছি একটা কাজে, এ সময় ডেকে বাধা দেয়?" পর মুহূর্ত্তেই আবার চঞ্চল গতিতে সে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

বালক হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কৈফিয়ৎ দিল, "হয় ত দূরে শীকার-টিকার কিছু দেখে থাক্‌বে, বুঝ্‌লেন, তাই অমন করে ছুটে গেল। নইলে আমার ডাক্ ও কোন-দিনই ফেল্‌তে পারে না।"

মণীশ নীরবে তাহার কথা সমর্থন করিয়া লইল। এ সঙ্গীহীন দেশে অহেতুক বালক সঙ্গীটিকে তাহার বড় মন্দ লাগিতেছিল না। সময় ও মন এই দুইয়েরই প্রফুল্লতা সাধক এ যন্ত্রটীকে বেশ ইচ্ছা করিয়াই সে তাহার বুকে আঁটিয়া ধরিতেছিল। বিশ্বযোড়া ছেলেখেলার মাঝে দুইদিনের এ ছেলেখেলায় হারাইবার অপেক্ষা পাওনা-গণ্ডা ছিল অনেক বেশী।

রক্তাক্ত কলেবরে সারমেয়-উত্তম সুলতান ফিরিয়া আসিল। মুখে তাহার একটা মৃত খরগোস। প্রভুর পায়ের নিকট শিকারেরর ভারটা নামাইয়া সে বেশ প্রফুল্লভাবে লেজ নাড়িতে লাগিল। যেন বলিবার অভিপ্রায়, "দেখ্‌ছ কি জন্যে গেছলুম। এটা নাও, আমার কাজের একটু তারিফ কর।"

নণ্টুর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। ব্যস্তসমস্তভাবে সে কুকুরের সারা অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দেখুন না, দেখুন না, কোথায় গিয়ে লাগিয়ে এল এই হতভাগা! এত রক্ত কি ওই ছোট্ট খরগোসটার হ'তে পারে কখনও। তাই ত কি হবে, কোথায় যাব! এখনি ব্যাণ্ডেজ না ক'রে দিলে ত রক্ত বন্ধই হবে না। তা হ'লে, তা' হ'লে—যান, দেখুন, পায়ে পড়ি আপনার দেখুন, হতভাগা কোথায় কেটেকুটে এল।"

পরীক্ষা শেষে সন্দেহ অমূলক জানিতে পারিয়া বালক উৎফুল্ল-দৃষ্টিতে তখন সুলতানের আনীত ভারের দিকে লক্ষ্য করিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, দেখুন, কত বড় খরগোসটা ও মেরে এনেছে। খুব বাহাদুর বল্‌তে হবে ওকে। কি বলেন আপনি, নয় কি?"

কথায় প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একজন নীচজাতীয়া যুবতী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু বাবু, তোদের কুত্তা আমাদের খরখোস্ মারি দিয়েছে। ঘরে উহার এতটুকু বাচ্ছা ভি জীবে না। দে বাবু, উহার দাম দে?"

ভ্যাবাচাকা খাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নণ্টু আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন কোথায় রহিল তাহার সুলতানের শীকারের গৌরব, আর কোথায়ই বা রহিল সরল সতেজ হাসি। তাহাকে এ বিপন্ন অবস্থা হইতে মুক্তি দিতেই যেন মণীশ তাড়াতাড়ি মণিব্যাগ খুলিয়া দুইটী টাকা যুবতীর দিকে ফেলিয়া দিল। বাবুদের বোকামীর কথা ভাবিয়া অধর কোণের হাসির রেখা যত্নে চাপিবার জন্যই সে টাকা কুড়াইবার অছিলায় মাথা নীচু করিল। মণীশ বলিল, "আপাততঃ আমার কাছে এর বেশী কিছু নেই, ওই নিয়ে যা'। যদি বাচ্ছা ক'টা না বাঁচে, খবর দিস। আমার ওই বাড়ী। আরও কিছু দেব 'খন।"

যুবতী চলিয়া গেলে বালক নণ্টু অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আপনি কেন দাম দিলেন?"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে বুঝি, তোমার কুকুর, না? তা' কাছে ত তোমার কিছু ছিল না। —তুমি কি দিতে?"

বালক একটু ভাবিয়া বলিল, "তা' বটে! বদমাইসটা এমনি হতচ্ছাড়া, একটু ছাড়া পেয়েছে কি অমনি পরের

অনিষ্ট করতে ছুটেছে। আজ চলো না, বাড়ী গিয়ে তোমায় এমন ক'সে বেঁধে রাখব যে, আর জন্মে কখনও খুলে দেব না।'

প্রায় সব কয়টা কথাই বুঝিতে পারিয়াছে এইভাবে মাথা নীচু করিয়া স্থলতান তাহার উত্থিত করের নিম্নে আপনাকে অবনত করিয়া দিল। বালক গর্ব্ব-কৌতুকে বলিয়া উঠিল, "কি কবি বলুন দেখি? অন্যান্য করে, আবার পায়ে ধবে। আপনিই বলুন না, এতে কি শাস্তি দেওয়া যায়, না রাগ থাকে? ঢের হয়েছে, আর খোসামোদ করতে হবে না। চল্, ওঠ্।"

অবসান বেলার শেষ আলোকরেখাটুকু তখন বিদায়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মোঠো হাওয়ার একটা স্নিগ্ধ মধুব গন্ধ তাহাদেব ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টিত ছিল। মণীশ ঘড়ি খুলিয়া সময়টা একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "বাড়ী যাও নণ্টূ, বাত হলো।"

"আব আপনি?"

"আমিও বাড়ী যাই।"

"না, তা' হ'তে পাবে না। এই ডবল দেনা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পালাবেন বুঝি। চলুন, এগুলো আপনাকেই কবতে হবে। দিদি যদি আসে, একটু না হয় দেওয়া যাবে—তাও যদি খাটে। নইলে আপনি, আমি, আর স্থলতান, আর কেউ এর ভাগ পাবে না।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ দিদিকে একা ফেলে এসেছি, অন্যদিন যাব তখন।"

বালক তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "না তা' হয় না। আজই, আজই আপনাকে আমাদের ওখানে যেতে হবে।"

দূরে রমণী কণ্ঠে কে একজন হাঁকিয়া বলিল, "কেরে নণ্টু, কা'কে নিয়ে অমন টানাটানি করছিস্?"

বালক উচ্চহাস্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভগ্লুব সাহেবকে দিদি আজ পাকড়াও করেছি। একা ধরে রাখ্তে পাচ্ছি না, তুমি ছুটে এস।"

"কি কাঠগোঁয়ারই হয়েছিস, ভদ্রলোককে এমনি করে জ্বালাতন করে! দে, ছেড়ে দে।"

বালক মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ্লেন ত, ওই আমার দিদি। ভয় নেই। আমাকেও বকে ব'লে আপনাকেও ঠিক্ আজই বকুনি দেবে না। আসুন না, ওইখানেই আছে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

ইহার পরও বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাব তুলিতে মণীশের বণ্ঠ বাধিয়া গেল। পরাজিতের ন্যায় সে জেতার করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাবই নিয়োগ মত পা ফেলিয়া চলিল।

দশ

নিশীথ একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাত্রিতে রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতের সকল দ্রব্যই একযোগে তাহাকে পরিহাস করিয়া উঠিল। পক্ষীবিহীন শূন্য পিঞ্জরের দিকে চাহিলে লোকের মনের যে অবস্থা হয়, তাহাব অন্তরের অবস্থা সে সময় তাহা অপেক্ষা এক চুলও ভাল বলিয়া বোধ হইল না। আকাশভরা জমা মেঘের জড়তা বুকে চাপিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই সে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মাধবীর এত সাধের পাতান ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিল না।

সেদিন অবহেলা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূস্বরূপ দুইটী নারী তাহাব মনের দ্বারে বড় হুড়াহুড়ি লাগাইয়া দিল। একজন অভিমানের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তাহার দুর্ব্বল অন্তবকে যেমন পীড়া দিতেছিল, অন্যজন ঠিক্ সেইরূপ উদ্দাম লালসাব ডালি সযত্নে থরে থরে সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার পদস্খলনের পথ সুপ্রশস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কলুষের সংস্পর্শে থাকিয়া প্রত্যেক পবিত্র পথচারীর অন্তব এমনি করিয়াই বুঝি প্রথম টানিয়া যায়!

কথাটা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। যেন এতটুকুও মনের দুষ্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া তাহার পক্ষে অসহ্য। ঘর্ম্মস্নাত দেহটাকে মুক্ত বাতাসে স্নিগ্ধ শীতল করিয়া লইবার জন্য সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক্ সেই সময় টেলিফোনের ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, কিড়িং, কিড়িং, কিড়িং।

আশায় উৎসাহে নিভৃতে মাধবীর প্রাণের কথা শুনিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিল। মনে ভাবিল, সে আমার সাধ্বী স্ত্রী, মায়ের খাতিরে বড় ভাইয়ের সকল দুর্ব্যবহার সহ্য ও সমর্থন করিয়া লইলেও স্বামীর এ অপমানে সে নিশ্চয়ই অতি বড় মর্ম্মাহত। সকলের সম্মুখে কিছুকাল পূর্ব্বে সে যে ভাব দেখাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মৌখিক—কেবল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে সন্তুষ্ট রাখিবার অছিলা মাত্র। প্রাণে জানে স্বামী ত আমার পর হইতে পারিবে না। কিন্তু দাদা, আজিকার এ ব্যবহারের পর পরস্পরের মধ্যে চির-বিচ্ছেদের বাঁশী বাজিয়া উঠিবেই। তবে কাজ কি—যাহাতে দুই পক্ষ রক্ষা হয়, তাহাই শ্রেয়। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের এই অকারণ ভ্রমের জন্য তাহার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। ক্ষমা-ভিক্ষায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইবার আশায় সে হাতলটা পরম যত্নে কাণে তুলিয়া ডাকিল, "হ্যালো।"

উত্তর আসিল, "আপনি কে ?"

"আমার নাম নিশীথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি ?"

"থানার ইনস্‌পেক্টর।"

"কি চান ?"

"একটী উৎপীড়িতা রমণী আপনার আশ্রয় ও সাহায্য-ভিক্ষা চান্, আমরা তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে যেতে পারি কি ?"

সংক্ষেপে নিশীথ উত্তর দিল, "আসুন।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মাঝের মিলন-বন্ধনী কাটিয়া দিবার সঙ্কেত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিশীথ মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, তাই ত, কি করলুম! মেয়েটী কে তা' ত জিজ্ঞাসা করা হলো না ?"

উৎপীড়িত রমণী কথাটা তাহার প্রাণের কোণে অনবরত খোঁচা দিতে লাগিল। কে সে উৎপীড়িতা ? কেমন একটা অনিষ্ট আশঙ্কা বুকের মাঝে প্রলয় ঝটিকা তুলিয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল। তবে কি, তবে কি মাধবীকে তাহার নিষ্ঠুর ভ্রাতার হস্তে লাঞ্ছিতা হইতে হইয়াছে ? সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিজের উপর জিঘাংসা জাগিয়া উঠিল। ক্ষোভে রাগে দন্তে অধর চাপিয়া ধরিয়া সে তখন আপনার গালে আপনি কয়েকটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, "কেন তুই তাকে সে পাগলের হাতে ছেড়ে রেখে এলি বল্ ত ? এর শাস্তি বিধিমতই তোকে দেব আমি, দাঁড়া। আগে বুঝে দেখি, তার অত্যাচারের মাত্রাটা কতদূর।"

অলস চিন্তার সময়টা বড়ই দুঃসহ। অস্থিরতায় পাগল হইয়া নিশীথ বাহিরের দ্বার পরিপূর্ণভাবে খুলিয়া দিয়া সে ক্রমাগত তাহার সম্মুখে পাদচারণ করিতে লাগিল। মিনিট পনের পরে উজ্জ্বল আলোক ও 'হর্ণে'র সাড়া জাগাইয়া একখানা ট্যাক্সী দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইনস্‌পেক্টরবাবু সর্ব্বাগ্রে লাফাইয়া পড়িয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে নিশীথের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এ অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি লজ্জিত। কিন্তু উপায় কিছু ছিল না। একটী মেয়ে ক'জন গুণ্ডার হাতে বিশেষরূপে লাঞ্ছিতা হয়, এবং সেই অবস্থাতেই ছুটে আমাদের কাছে সাহায্য নিতে আসে। কপালে তার একটা গভীর ক্ষতের চিহ্ন ছিল। হাসপাতালে পাঠিয়ে তখনি ব্যাণ্ডেজ করাবার বন্দোবস্ত করেছিলুম। এখন মেয়েটী ভয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে চাচ্ছে না। আপনার নাম নিয়ে আশ্রয় পেতে এসেছে।"

উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া নিশীথ বলিল, "কই, কে সে ?"

ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনাবৃতা এক রমণী ট্যাক্সী হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া তাহার পায়ের উপর প্রণতা হইল। বিস্ময় আতিশয্যে নিশীথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি ত মাধবী নও, তবে কে ?"

লজ্জার যবনিকা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তুলিয়া রমণী বলিল, "আমি।"

সহসা সর্পদৃষ্টের মত কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া নিশীথ বলিল, "তুমি, তুমি অমলা !"

"হ্যাঁ আমি। আপনি এখন অনায়াসে যেতে পারেন দারোগাবাবু। আমি এ বাড়ীতে আশ্রয় পাব।"

কৌতুক উজ্জ্বল হাসি হাসিয়া ইনস্‌পেক্টরবাবু বলিলেন, "সে জানি।" পরক্ষণেই তিনি মোটরে গিয়া চড়িয়া বসিলেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া নিশীথ তখন বলিল, "কিন্তু, কিন্তু—"

ট্যাক্সী ততক্ষণে তাহার গন্তব্য-পথের অনেকটাই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। উপায়হীনভাবে নিশীথ বলিল, "কি করলে অমলা?"

অমলা বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, "বিশেষ কিছুই করি নি, নিজের বাড়ীতে ঢুকতে এত কাঠখড় পোড়াতে হয়, আগে আমি তা' জানতুম না। আপনি আমায় আশ্রয় নাও দিতে পারেন, দিদি কিন্তু তার ছোট বোনটীকে কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। তাঁর কাছে চললুম।"

"কিন্তু তিনি ত, তিনি ত এখানে নেই।"

সহসা অগ্রগমনমুখী অমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিস্ময়-নৈরাশ্য-জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "নেই! সে কি! কোথায় গেছেন তিনি?"

"বাপের বাড়ী।"

"এমন অসময়ে?"

মনে আসিল বলে, "তুমিই তার কারণ।" কিন্তু ঠোঁট চাপিয়া নিশীথ কথা রোধ করিয়া দিল।

পাঁচ মিনিটের অতিথি যে, তাহার নিকট ঘরের কথা প্রকাশ করিয়া লাভ কি? ধীরকণ্ঠে মাধবীর বলা কথাটাই ঘুরাইয়া বলিয়া নিশ্বাস ছাড়িল, "তাঁর ভাইপো ঘণ্টুর অসুখ, তাই দেখতে গেছেন।"

নৈরাশ্য-জড়িত-কণ্ঠে অমলা কহিল, "তাই ত, তবে আমার উপায়?"

কণ্ঠটা ঈষৎ রুক্ষতায় ভরিয়া তুলিয়া নিশীথ বলিল, "নিরুপায় হ'য়ে ত এতদিন ছিলে বলে মনে হয় না—আর নেহাৎ গাছতলায়ও মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিলে না। সেখানে ফিরে যেতে এত আপত্তিই বা কিসের?"

জড়িত-কণ্ঠে অমলা উত্তর দিল, "আছে, না হ'লে যেতেই বা চাইছি না কেন।" তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল, "তার অন্য কারণও ত থাকতে পারে।" কিন্তু পূর্ব্বেরই মত যত্নে সেভাব গোপন করিয়া সে প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মাথা নীচু করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "আপনি আমায় কি ভাবছেন তা' জানি না—কিন্তু একদিনও যে জায়গায় বাস করলে ভাল থাকবার যো নেই, সেখানে পা বাড়াতে এমনই কেমন আমার গায়ে বাজে।"

নিশীথ কথা কহিল না। ওষ্ঠ বহিয়া একটা নীরব হাসি তাহার অধর কোণে গড়াইয়া পড়িল মাত্র। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিয়া অমলা বলিল, "বুঝেছি, আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না, আর জোর করে আপনাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা পেতে যাওয়াও আমার অন্যায়। তবে সত্য যা' তাই বলছি। আজ আপনি চলে আসবার পর কেমন খেয়াল হয়েছিল, অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও আমার ঘরের দ্বার সকলের কাছে বন্ধ করে রাখব। তার ফল, এই দেখুন—বলিয়া রমণী তাহার হস্তটা কপালের ক্ষতের দিকে নির্দ্দেশ করিল। নিশীথ ধীরভাবে বলিল, "তা' ওটায় নতুন খবর তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না অমলা। দলে থেকে আমরা যদি ভিন্ন পথে চলি, একটা ঘাত-প্রতিঘাত আসে বই কি।"

রমণী কাতর চঞ্চল কণ্ঠ দোলাইয়া বলিল, "দয়া করুন! অন্ততঃ, একটা রাত আমায় ভাল থাকতে দিন। কপালে কাল যা' লেখা আছে, তাই হবে।"

নিশীথ হাসিবার বৃথা চেষ্টা পাইয়া বলিল, "তা' হয় না অমলা, কাল ভাগ্য-বিধাতা তোমার সঙ্গে আমায় এমন ক'রে জড়িয়ে দেবেন যে, সে গেরো সারা জীবন ধরে আমি খুলে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।"

ঠিক সেই সময় একরাশ আলোকের সহিত 'হর্ণ' আর একবার দ্বারের পথে বাজিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা কর্কশ কণ্ঠের স্বর ভাসিয়া আসিল, "এই দেখতেই তোর এত কান্নাকাটী মাধবী, দেখ, ভাল বেশ করেই দেখ! কি বলব, আইন আমাদের 'ডাইভোর্সে'র পথ দেয় না, নইলে—আচ্ছা, কাল এর ব্যবস্থা করব। এইও উল্লু, 'হাঁ' করে দেখছিস কি? চলো বাড়ী।"

হতবুদ্ধির মত চলিত গাড়ীখানির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা জোর নিশ্বাসের সহিত অমলা বলিয়া উঠিল, "কি হলো?"

নিশীথ মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, "বেশী কিছু নয়।"

"না, এরপর আমি আর এ বাড়ীতে একদণ্ডও থাকতে পারি না দাদা।"

"আমিও কিন্তু এ গভীর রাত্রে আমার ছোট বোন্‌টীকে পথের মাঝে বার করে দিতে পারি না।"

"কিন্তু বৌদি' ?"

"যা' ভাববার সে তা' ভেবেছেই। আর তোমার থাকা না থাকায় তার একচুল তফাৎ হবে না। কলঙ্কের ঝাঁপ ভেজিয়ে রাখা না রাখা এখন দুই সমান।"

"তার চেয়ে এক কাজ করি দাদা, এখনি আমি বৌদি'র কাছে যাই, সব ভেঙে বল্‌লে—"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "সে হয় না দিদি।"

"কেন ?"

"তোর বৌদি'কে তোর চেয়ে আমি বেশী চিনি বলে তাই। এ মুখে যা' বোঝাতে যাবি, সে ঠিক্ তার উল্‌টো ধরে নেবে। যে যে কারণ দেখিয়ে তুই সাম্‌নের পথ আবার উজ্জ্বল করে তোল্‌বার কথা ভাবছিস্, তাই তার কাছে ঘন অমানিশার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। কাজ নেই। তার চেয়ে ভগবান যে ভার দিয়েছেন, আজ তাই আমি মাথা পেতে নিলুম।"

"ভাগ্য যার পোড়ে দাদা, তার কি সব দিক্ দিয়েই কি পোড়ে ?"

"না বোন্, ভগবানের পরীক্ষাকে পরীক্ষা বলে যে মেনে নিতে না পারে, তার পক্ষে অন্য কথা। কিন্তু যে তা' মানে, ধৈর্য্যের বাঁধন দড়িতে তাব জয় বাঁধা পড়ে যায়, এতে আব কোনো ভুলই নেই।"

"কিন্তু আমার উপায় ?"

"সারারাত সে কথার জন্যে পড়ে আছে বোন্, এই ঘরেই তুই শো', আমি বাইরে রইলুম্। কোনো ভয় নেই, দেবতা স্বয়ং ছদ্মবেশে এসেও আমায় ঠকাতে পারবেন না। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম্ গে যা'।"

"তুমিও ওপাশের ঘরে শোও গে না দাদা।"

"নারে ভাই, আজন্ম ঘুমের মধ্যে দিয়ে আমি কাটিয়ে এসেছি, আজ নিশ্চিন্ত হয়ে একটু চিন্তা কর্‌তে দে। পরে এমন সুযোগ হয় ত নাও পেতে পারি। তা' ছাড়া, তোর ভবিষ্যৎ উপায়ও ত একটা ভেবে বার করতে হবে।"

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্য-জগৎ

'নব-নাট্য-মন্দিরে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' এবং 'ক্যালকাটা থিয়েটার্স'-এ 'গোরা'র অভিনয় সগৌরবে চলিতেছে। 'রূপ-মহল'-ও তাঁহাদের নব-সংস্কৃত নাট্যশালায় শ্রোতৃবৃন্দকে 'রূপকথা' শুনাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

পুরাতন 'রঙ-মহল' নাট্য-পীঠে 'নাট-মহলে'র 'আখ্‌ড়া' বসিয়াছে। স্বনামখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'রজনীগন্ধা' নামক নূতন নাটক লইয়া ইঁহারা শীঘ্রই ইঁহাদের রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবেন।

ভ্রম—

বম্বে প্রেসিডেন্সী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ , বি-এল্‌

এবার বড়দিনের সময় বেশ একটু বড় রকম পাড়ি দিয়ে আসা গেল। সেই কথাই সংক্ষেপে বল্‌বো।

একেবারে বম্বে।

রাত্রি আট্‌টা পঁচিশের ই-আই-আর-এর বম্বে মেলে চেপে বস্‌লুম। সারারাত ট্রেণেই কাট্‌লো। পরদিন সারা-দিন, সারারাত—তারপর দিন সকাল আটটার সময় বোম্বাই সহরে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হওয়া গেল।

রেলে চড়তে আমার বড় আরাম লাগে। এ যেন সজীব বায়োস্কোপ—দু' পাশের খোলা জান্‌লা দিয়ে কত কি আভাষ যে পাওয়া যায়,—সীমাহীন মাঠ, অসংখ্য পাহাড়, নদী, নালা, গাছের কোলে কোলে মানুষের বাসের কুঁড়ে। লাইন থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একটা উলঙ্গ শিশু যখন পরম কৌতূহলে গাড়ীর দিকে চেয়ে থাকে, তখন মনে হয় সে যেন নগ্ন প্রকৃতির মূর্ত্ত প্রতীক, মানুষের বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের বিকাশকে সে অবাক্‌ হয়ে দেখ্‌ছে।

অনন্ত কুড়েমির ভিতর দিয়ে মধ্য ভারতের পাড়িটা আমরা কাটালুম। গাড়ীর যে কামরাখানায় আমরা ছিলুম, সেটায় বাইরের লোক কেউই ছিল না। আমি এবং আমার স্ত্রী এই দু'টি মাত্র প্রাণীই আমরা সেই কামরাটাকে নিজস্ব করে নিয়েছিলুম।

সকালে গাড়ীখানা মোগলসরাই পার হয়ে চিওকি দিয়ে জি-আই-পি লাইনে গিয়ে পড়লো। গাড়ীর মধ্যেই আমরা স্নানাহার সেরে নিয়ে জান্‌লার কাচগুলো এঁটে দিয়ে বসে বসে বাজে সব গল্প করেছি।

দুপুরে আমাদের গাড়ী গিয়ে পড়লো মাইহার ষ্টেশনে।

কোলকাতার বাড়ী তৈরী করতে যে সব চুণ ব্যবহার হয়, তার অধিকাংশই এই অঞ্চল থেকে আমদানী করা। মাইহার ও কাট্‌নী এই দুটো ষ্টেশন এই লাইনের ওপরেই পড়ে।

এরা চুণ তৈরী করে ইঁট পোড়ানর পগ্‌মিলের মত মিল তৈরি ক'রে। ওই মিলের মধ্যে পাথর দিয়ে সেই সব পাথরকে আগুনের সাহায্যে পুড়িয়ে পাথুরে চুণ করা হয়; এ ছাড়া, ছোট ছোট পাহাড়কে বেড়া আগুন দিয়ে পুড়িয়ে একেবারে পাথরের পাহাড়কে চুণের পাহাড়ে পরিণত করে ফেলে।

মাইহার ষ্টেশনে চুণের কি ঝাঁজ! কাট্‌নীতে ও রকম নয়। কোল্‌কাতায় যেমন সব খোলার বাড়ী আমরা

কমই দেখ্‌লুম। অজন্তা ও ইলোরার গোটাকয়েক ছবি এবং আরব ও পারস্যের সামান্য গোটাকয়েক ভাঙা পুতুল। তবে এদের সাজানো বড় সুন্দর। এদের এখানে যা' কিছু আছে, সেগুলি খুব সুন্দরভাবে তারিখ দিয়ে সাজানো। কোলকাতার মিউজিয়মে কেউ যদি কোলকাতার ইতিহাস আলোচনা করে, তা' হলে সমস্ত জিনিষ একসঙ্গে কোনোখানেই পাবে না, কিন্তু এখানে বোম্বায়ের ইতিহাস চর্চ্চা করা ভারী সুবিধে, একটা ঘরে বোম্বায়ের পুরাতন যাবতীয় ছবি এবং ইতিহাস আছে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরটি পর্ত্তুগীজরা অধিকার করে এবং ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারাইনকে বিবাহ ক'রে এই সহরটি পর্ত্তুগীজদের কাছ থেকে যৌতুকস্বরূপ পান। পরে ইংলণ্ডেশ্বর এই দ্বীপটিকে সামান্য খাজনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন। এই সব ইতিহাস এই ঘরে বড় সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, কোম্পানীর কয়েকটি রিলিফ্ ম্যাপ আছে। পূর্ব্বে বোম্বাই ছিল কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি মাত্র; একশত বৎসর হলো, দ্বীপগুলিকে একত্র করে এই সহরটি তৈরী হয়েছে। স্থানে স্থানে তাই মনে হয় সমুদ্র যেন সহরের মধ্যে এগিয়ে এসেছে। এখনও বোম্বায়ের এই অংশটিতে অনেকগুলি সামুদ্রিক দ্বীপ আছে। সমুদ্রের তীর থেকে দূরে দূরে এমনিধারা অসংখ্য দ্বীপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এরই একটা দ্বীপে আমরা অনেকগুলো বাড়ী দেখতে পেলুম। শুন্‌লুম ওটায় না কি এখন কোনো লোকালয় নেই, তবে পর্ত্তুগীজদের আমলে ওইটাই ছিল তাদের কেল্লা। এমনিধারা আর একটি দ্বীপের পাশে জাহাজ শিক্ষার্থীদের 'এস্ এস্ ডাফারিন'কে অবস্থিত দেখ্‌লুম। ডাফারিন জাহাজটি মানোয়ারের মত আগাগোড়া শাদা রঙের, এখানকার সারেংরা নাম দিয়েছে স্কুল জাহাজ।

বোম্বায়ের উপকূলস্থ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলিতে লোকালয় আছে; অর্থাৎ, যে দ্বীপে পানীয় জল পাওয়া যায়, সেইখানেই লোকে বসবাস করে। এমনিধারা একটি দ্বীপের নাম 'এলিফ্যাণ্টা।'

কোলকাতার আর্টিষ্টদের মুখে আমরা অনবরতই অজন্তা, ইলোরা ও এলিফ্যাণ্টার নাম শুন্‌তে পাই। বোম্বাই থেকে সাত মাইল দূরে আরব সাগরের মধ্যেই এই এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ অবস্থিত। স্থানীয় জাহাজ কোম্পানীর লঞ্চ বোম্বায়ের 'ফেরি হোয়ার্ফ' নামক বন্দর থেকে প্রত্যহ সকাল সাতটা এবং বেলা দুটোর সময় ছাড়ে, মধ্যে কোনো একটা দ্বীপে জাহাজটা দাঁড়ায় এবং তারপরই এলিফ্যাণ্টায় যায়। থার্ডক্লাসে যাওয়ার ভাড়া লাগে দশ আনা। এ কথা পরে বল্‌বো।

'প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স মিউজিয়মে' কতকগুলি এমনজিনিষ দেখ্‌লুম যা' কোলকাতা মিউজিয়মে নেই। গ্রীক দেশের লোকেরা মৃতের অগ্নিসৎকার ক'রে একরকম পাথরের কৌটার মধ্যে অবশিষ্ট ভস্মকে স্থাপন ক'রে ওই কৌটা শুদ্ধ হয় ভাল ক'রে কোথাও সাজিয়ে রাখে, না হয় মাটীর নীচে কবরস্থ করে। কোলকাতার মিউজিয়মে ওই পাথরের কৌটা দেখি নি, কিন্তু ওখানে দেখ্‌লুম। ওখানে কতকগুলি চীন দেশের প্রচলিত পুতুল দেখা গেল। কোলকাতায় 'যমপুরের শাস্তির ছবি' বলে যে পট পাওয়া যায়, আমরা জান্‌তুম ওই ছবি আমাদেরই পরিকল্পনায় তৈরী, কিন্তু ওখানে দেখলুম তা' নয়, ওগুলো চীনদেশীয় প্রচলিত বিশ্বাস থেকে বাঙালীদের ধার করা 'আইডিয়া।' এই মিউজিয়মটিতে জামসেটজি জিজিভাই মেটার আঁতুড়-ঘরে ত্রিশদিনের দিন তাঁকে যে জামা এবং টুপি পরান হয়েছিল সেইটিই কাঁচের কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেইখানে লেখা আছে যে, পার্শীদের বিশ্বাস ত্রিশ দিনের দিন বিধাতাপুরুষ শিশুর ললাট-লিখন করে থাকেন এবং ওইদিন রাত্রে বাড়ীর সমস্ত লোকেরা একত্র রাত্রি জাগরণ করে। এ সমস্ত বিষয়ে হিন্দুদের সঙ্গে মোটামুটি সবই মিলে যায়।

এই মিউজিয়মের প্রবেশ-পথে এলিফ্যাণ্টার বড় গেটটি সাজানো আছে। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে গুহার সাম্‌নে একটি বড় হস্তী মূর্ত্তির সিংহদ্বার ছিল, সেই গেটটি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে

---

* 'এস্ এস্ ডাফারিনে' ভারতীয়দের সামুদ্রিক বিজ্ঞান এবং পোতচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা ভারতবর্ষে 'মেরিণ ট্রেনিং'-এর জন্য এই একখানিমাত্র জাহাজ আছে।

ভেঙে যাওয়ার পর খণ্ড খণ্ড করে এইখানে এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া পেশোয়াদের * একটা বড় সিংহাসন এই মিউজিয়মে আছে। পার্শীদের 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্সে'র একটি বড় মডেল এইখানে রক্ষিত আছে।

সস্ত্রীক 'প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্ মিউজিয়াম' থেকে বেরিয়ে ওখানকার বড় রাস্তা ধরে সোজাসুজি তাজমহল হোটেলের ধার দিয়ে গিয়ে আমরা পড়লুম সমুদ্রের তীরে। সমুদ্রের তীরে 'গেট অফ্ ইণ্ডিয়া' নামক গেটটির নাম আমরা কোল্‌কাতা থেকেই শুনছি।

'গেট অফ্ ইণ্ডিয়া' অর্থে সমুদ্রের তীরে বড় একটা বাঁধানো ঘাট। ওই ঘাটের ওপর বড় একটা চবুতর বড় বড় কয়েকটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতে আগমন উপলক্ষে এই চবুতরটার সৃষ্টি হয়েছে।

এটা যেন কোল্‌কাতার প্রিন্সেপ ঘাটের দালানটির নকল। 'গেট্ অফ্ ইণ্ডিয়া' থেকে ডাড়াটে লঞ্চ পাওয়া যায়। ঐ লঞ্চে করেও এলিফ্যাণ্টায় যাওয়া যায়, ভাড়া লাগে প্রায় টাকা সাতেক।

'গেট অফ্ ইণ্ডিয়া' থেকে বেরিয়ে ববাবর মালাবার পাহাড়ে যাবার পথ আছে। এই পথটিকে ওদেশী ভাষায় বলে চৌপাটী।

এই চৌপাটী জায়গাটি বেড়াবার পক্ষে বড় চমৎকার। এখানে সমুদ্রটি একেবারে দেশের মধ্যে ঢুকে এসেছে। সমুদ্রের তীরে গোল করে প্রায় দু' মাইল রাস্তা পিচ দিয়ে বাঁধানো। এখানকার সমুদ্রে একেবারেই ঢেউ নেই। এটাকে ইংরাজীতে বলে 'ব্যাক্ বে।' সমস্ত চৌপাটী ঘুরে ক্রমে ক্রমে রাস্তাটা মালাবার পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে।

মালাবার পাহাড়টি খুবই ছোট এবং নীচু। ওই পাহাড়ের ওপর বড় একটি বাগান আছে। ওই বাগানটি পূর্ব্বে ছিল ফিরোজ সা মেটা নামক একজন ধনী পার্শীর। এখন ওই বাগানটি বম্বে কর্পোরেসনের অধীনে। ওই বাগানের নীচে একটি ছোট বাঁধানো পুকুর আছে। ইংরাজিতে ওই বাগানটিকে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন বলে। ওই বাগানের ধার থেকে সমুদ্রকে বড় সুন্দর দেখায়।

মালাবার পাহাড়ের ওপরেই পার্শীদের 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্স' আছে। এই 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্সে'ই পার্শীরা তাহাদের মৃতদেহগুলি শকুনের উদরপূর্ত্তির জন্য উলঙ্গ করে তুলে ধরে, পরে সেই মাংসশূন্য হাড়গুলো নিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবরস্থ করে। এইরূপ 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্সে'র একটি ছোট মডেল কোল্‌কাতার যাদুঘরেও রক্ষিত আছে। পার্শী পঞ্চায়েতের অধীনে বোম্বায়ের সমস্ত অগ্নি মন্দির এবং এই 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্স'টি আছে। তাহারা পার্শী ভিন্ন অপর কা'কেও এই সব স্থানে প্রবেশ করবার অনুমতি দেয় না। আমরাও বাইরে থেকে এই 'টাওয়ার অফ্ সাইলেন্স' দেখে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হলুম।

মালাবার পাহাড় থেকে সোজাসুজি রওনা হয়ে আমরা হাজির হলুম বোম্বায়ের চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানা বা ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌স্ সহরের অপর প্রান্তে অবস্থিত। এই ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌স্-এ ঢুক্‌তে বামদিকে একটি দোতলা বাড়ী আছে। এইটিরই নাম 'এল্‌বার্ট মিউজিয়ম।' এই 'এল্‌বার্ট মিউজিয়মে' এ দেশের গ্রাম, স্কুল, এখানকার কৃষিক্ষেত্র, জঙ্গল ইত্যাদির মডেল আছে। এই মিউজিয়ামে কাশী বিশ্বনাথের আসল মন্দিরের একটি মডেল আছে। এখানে লিখিত আছে যে, কাশী বিশ্বনাথের মন্দির আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে এইরূপই ছিল। কোনো এক বিদেশী পর্য্যটকের ছবি এবং বর্ণনা অনুসারে বিশ্বনাথের আদি এবং অবিকৃত অবস্থার মন্দিরের এই মডেল তৈরি করা হয়েছে।

এই মিউজিয়মের দ্বারদেশে দুইটি মাইন্ আছে। বিখ্যাত জার্ম্মান রণপোত 'এম্‌ডেন্' কর্ত্তৃক এই মাইন্ দু'টি আরব সাগরে বসান হয়েছিল। ইংরাজেরা অতি সাবধানে তুলে নিয়ে সমস্ত বারুদ বার করে এই লোহার খোল দু'টিকে মিউজিয়মের দ্বারদেশে প্রহরী করে রেখে দিয়েছে।

'এলবার্ট মিউজিয়ম' দেখে আমরা 'ভিক্টোরিয়া গার্ডেন'সে প্রবেশ করলুম।

---

* মহারাষ্ট্রীয় রাজাদের পেশোয়া বলে।

কোল্‌কাতার চিড়িয়াখানা এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনের ছোট ছোট সংস্করণ তৈরী করে সেই দুটোকে একত্র মিলিয়ে দিলে যা' হয়, বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস্ ঠিক্ সেই জিনিষ। পশুর সংখ্যা কোল্‌কাতার অপেক্ষা অনেক কম। কোল্‌কাতারই মত করে খাঁচার মধ্যে এই সব পশুদের রাখা হয়েছে। কোল্‌কাতার চিড়িয়াখানায় যেমন সব গাছ আছে, এখানেও সেই রকম গাছ আছে—তবে সেই সব গাছের গায়ে ছোট ছোট লোহার টিকিট এঁটে সেই গাছের নাম লেখা।

বেড়াবার মত জায়গা বোম্বায়ের উপনগরগুলির মধ্যে 'জু' (Jhu) নামক একটি স্থান। এই জায়গাটি বোম্বাই সহর থেকে প্রায় আঠার মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার অনেকের কাছেই এই জায়গার সুখ্যাতি শুনে ছুটে গেলুম। যাতায়াত মোটর ভাড়া পড়লো নগত বারো টাকা। কিন্তু গিয়ে দেখি 'জু'টা একেবারেই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

সমুদ্র তীরে প্রায় মাইলখানেক জায়গা যুড়ে একটা সাহেবী আমোদ-প্রমোদের স্থান এই 'জু'। সমুদ্রের তীরে বসবার জন্যে বেঞ্চ এবং বড় বড় চত্বর করা আছে। কয়েকটা খাস বিলাতী এবং ফরাসী ষ্টাইলের 'রেঁস্তোরা' আছে। টার্কিস্ বাথ্, সি বাথ্, ইত্যাদি নানারূপ স্নানের জন্য খোলা এবং ঘেরা স্থান আছে। শুনলুম, ওখান থেকে খানিকটা দূরে না কি বালির চড়ায় একটা জায়গা ঘিরে নিয়ে একটি উলঙ্গ-সমিতি বা Nude Club-এর স্থাপনা করা হয়েছে। সমিতিতে বিলাতী সাহেব মেম এবং উৎকটরূপ সাহেব-প্রীতি যাদের আছে, এম্‌নিধারা দেশী লোকও সভ্য আছে। ওই স্থানের অভ্যন্তরীন লীলা-খেলা যারা ওখানকার সভ্য নয়, তাদের দেখ্‌তে দেওয়া হয় না। প্রাণভয়ে আমরা আর সেদিকে ঘেঁস্‌লুম না।

কোল্‌কাতায় বসে আমরা বোম্বায়ের ডক্ এবং বন্দরের কথা শুনে অবাক্ হয়ে যাই। কিন্তু ওখানকার সমস্ত ডক্‌টা দেখে মনে হলো, ওটা আমাদের কোল্‌কাতার থেকে বরং যেন ছোট।

কোল্‌কাতায় দুটো ডক্ আছে—খিদিরপুর ডক্ এবং কিঙ্ জর্জ্জেস্ ডক্। ওখানে মাত্র একটি ডক্ আছে—'এলেকজাণ্ড্রা ডক্'। এলেক্‌জাণ্ড্রা ডকের ধারে ব্যালার্ড পায়ায়ের ঠিক্ গায়ে লাগানো একটি মাত্র ড্রাই ডক্ আছে—সেটা খিদিরপুর ড্রাই ডকের চাইতে কোনো অংশে বড় নয়। ডকে বার্থ আছে আন্দাজ গোটা কুড়ি। মোটের ওপর আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় একা খিদিরপুরের ডকই এলেক্‌জাণ্ড্রা ডকের সমকক্ষ।

তারপর আর এক কথা। এলেকজাণ্ড্রা ডকে গুদাম ঘরের সংখ্যা কোল্‌কাতা অপেক্ষা অনেক কম। 'বণ্ডেড্ ওয়ার হাউস'ও অনেক কম। অবশ্য তার একটা বড় কারণ এই যে, অধিকাংশ মালই ব্যালার্ড পায়ার ষ্টেশন দিয়ে একেবারে জাহাজের খোল থেকে দেশ-বিদেশে চালান হয়ে যায়।

এখানকার ডকে ঢোকবার অনেকগুলো দরজা আছে। প্রত্যেকটা ফটকে ভিন্ন ভিন্ন রঙ করা এবং সেই রঙ অনুসারে গেটের নাম—যথা ইয়োলো গেট, রেড গেট, ইত্যাদি।

কোল্‌কাতার সঙ্গে বোম্বাই ডকের তুলনামূলক আলোচনা কর্‌তে গেলে আরও একটা কথা বলা দরকার। কোল্‌কাতায় পেট্রোল বা কেরোসিন ইত্যাদির জন্য আলাদা ডক্ আছে বজবজে। কিন্তু বোম্বায়ে সে রকম কিছু নেই। এখানে এই ডকের মধ্যে দুটো বার্থ আছে তেলের জাহাজের জন্য। ওই বার্থে তেলের জাহাজগুলি দাঁড়ায় এবং তাদের তৈলাধার থেকে তেল পাম্প করে ডকের পাইপ দিয়ে সোজাসুজি ওই তেলকে একেবারে মাইল চারেক দূরের তেলের ট্যাঙ্কে প্রেরণ করে। আমরা যেদিন ওখানে যাই, সেদিন দেখি তেলের জাহাজ 'এস্ এস্ আঙ্‌বাঙ্' ওই প্রণালীতে তেল পাম্প করছে।* কোল্‌কাতায় ডক্ বল্‌তে ডায়মণ্ড হারবারের সামান্য অংশ, বজ্‌বজ্ এবং খিদিরপুর ও কিঙ্ জর্জ্জের ডক্, কিন্তু বোম্বায়ে একমাত্র

* এখানকার পেট্রোলের গ্যালন মাত্র তের আনা ক'রে; অর্থাৎ, দশ আনা মাশুল দিয়ে এখানকার তেল কোম্পানী তিন আনা করে গ্যালন তেল খরিদদারদের বিক্রয় করে।

এলেজাণ্ডা ডক্। মোটের ওপর জাহাজের সংখ্যা দেখেও মনে হয়, একসঙ্গে কোল্কাতায় যতগুলো জাহাজ থাকতে পারে, ওখানে তার অর্দ্ধেক জাহাজও থাকতে পারে না। অবশ্য নদীর 'মুরিংস'গুলিও এই সঙ্গে নিতে হবে। সব দেখে আমাদের মনে হয় যে, কোল্কাতা পোর্ট-কমিশনার্সের তুলনায় বোম্বাই পোর্টকমিশনার্সের কাজ এবং আয় অনেক কম।

মানোয়ার বা রণপোত সম্বন্ধেও বোম্বায়ে খুব বেশী কিছু নেই। আরব সাগরের এই অংশটা রক্ষা করবার জন্য মাত্র কুড়িখানি যুদ্ধের জাহাজ বোম্বায়ে বারো মাস থাকে। রণপোত সম্বন্ধে সিংহলের টি্নকোমালী নামক বন্দরে আমরা যা' দেখেছি, এখানে তার কোনো তুলনাই হয় না। বোম্বাই অপেক্ষা করাচি বন্দর অধিক পরিমাণে সুরক্ষিত।

দূরদেশ ছাড়াও এখানে কতকগুলি দেশীয় জাহাজ আছে। তারা কাছাকাছি যাতায়াত করে। দেশীয় বন্দরের মধ্যে রত্নগিরি, ত্রিবাঙ্কুর ইত্যাদিব জাহাজ আছে। লক্ষ্মীদ্বীপ, মলদ্বীপ, এফ্রিকা, ব্রিটিস সোমালিল্যাণ্ডের ইউগ্যাণ্ডা, টাঙ্গায়্নিকা ইত্যাদি স্থানের জাহাজ এখান থেকে নিয়মিতরূপে যাতায়াত করে।

বিদেশী লোকের বিনা পাসে জাহাজ দেখার এখানে বেশ সুবিধা আছে। কয়েকটি গ্রেট ওয়ার ফেরৎ লোককে সাহায্য করবার জন্য এখানকার ডকে গাইডের কাজ করতে দেওয়া হয়। তারা বিনা লাইসেন্সে যাত্রীদের যে কোনো জাহাজে তুলে জাহাজ, জাহাজের এঞ্জিন-ঘব, বয়লার, এমন কি ক্রুফিটিংস পর্য্যন্ত দেখিয়ে আন্তে পারে। বিনিময়ে তাদের যাত্রী প্রতি এক টাকা করে মাশুল দিতে হয়। ওই মাশুলের কি একটা অংশ ওই লোকটি পায়। বাকী অংশটা পোর্টকমিসনার কেটে নেয়। এমনিভাবে আমি ও অন্নপূর্ণা দু'জনে পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'কাইজার-ই হিণ্ড' ও চীনা-জাহাজ 'সুসিমা মারু'র সমস্ত অংশ দেখে তিন ঘণ্টা পরে কালী ও কয়লা মেখে ভূত হয়ে হোটেলে ফিরে যাই।

বোম্বায়ের সমুদ্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 'লাইট হাউস'। রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রমধ্যস্থিত বাতিঘরগুলি আলোর সঙ্কেতে জাহাজদের পথ নির্দ্দেশ করে।

বোম্বাই সহরটা মোটের ওপর কোল্কাতারই মত। এখানকার ফোর্ট নামক স্থানে বড় বড় অফিস আছে। কল্বা দেবী রোডে বড় বড় দোকান, ব্যালার্ড পায়ারে জাহাজী অফিস, মালাবাবে সাহেব বসতি, এবং বোম্বায়ের উপনগর 'দাদার' ও 'পাবেলে' বাঙালীর বাস। সহরের মধ্যে গুজরাতী, মহারাষ্ট্রী, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, মাদ্রাজী ইত্যাদি সকল জাতিই পাওয়া যায়। ইউনিভারসিটী, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, কর্পোরেসন অফিস, জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক দোতলা ও একতলা ট্রাম, বাস্ সমস্তই উল্লেখ-যোগ্য। এদের এস্‌প্লানেডের মাঠ বা গড়ের মাঠ কোল্কাতা রেস্ কোর্সের অপেক্ষাও ছোট। এদের মিউনিসিপ্যাল মার্কেট আমাদের মার্কেটেরই মত হবে আয়তনে প্রায় অর্দ্ধেক। এখানকার ট্রাম গাড়ীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী বলে কিছু নেই, তবে দোতলা ট্রামগুলির একতলায় রেলের পায়খানার মত ছোট ছোট পায়খানা আছে। এদের নূতন বাসগুলি আমাদের বাসের মত। বোম্বায়ে বাস ও ট্রামের কোন প্রতিযোগিতা নেই; কারণ, এখানকার বোম্বে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোম্পানী নামক একই সমবায় বোম্বায়ের বৈদ্যুতিক শক্তি, ট্রাম, ও বাস পরিচালন করে। প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে এবা সংক্ষেপে বলে 'বেষ্ট।' এই কথাটা ট্রাম ও বাসেব গায়ে লেখা আছে।

ভাড়া গাড়ীর মধ্যে এখানে ট্যাক্সী ও ফিটন আছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই। ট্যাক্সীর মাইল ছ' আনা করে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা ফুরোন করে চলে। এখান-কার ট্যাক্সী ব্যবসায়ে পাঞ্জাবীদের সংখ্যাই অধিক।

বোম্বায়ের রাস্তাঘাট কোল্কাতারই মত। সহরের মাঝখানে বড় বড় পিচ দেওয়া বা কংক্রীট করা রাস্তা। গলির মধ্যে পাথর বাঁধানো সরু সরু বাঁকাচোরা পথ। বড় রাস্তার দু' ধারে ফুটপাথ। এখানকার কল্বা দেবী রোড্ প্রাচীন পথ। ওটা অনেকটা চিৎপুর রোডেরই মত।

ওইরূপ ট্রাম লাইন পাতা, ঘিঞ্জি এবং জনবহুল। বোম্বায়ে সমুদ্রতীরে কতকগুলো নতুন নতুন বাড়ী এখন তৈরী হচ্ছে বটে, কিন্তু কোল্‌কাতা ভিক্টোরিয়া হাউসের পাশে যে নতুন বাড়ী হয়েছে, তাদের সঙ্গে ওদের কোনো তুলনাই হয় না। কোল্‌কাতা গ্র্যাণ্ড হোটেল বা বেঙ্গল হোটেল বম্বের গ্র্যাণ্ড হোটেল বা তাজমহল হোটেল অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নয়। কোল্‌কাতা 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্'-এর সমকক্ষ বোম্বায়ে কিছুই নেই। তবে এখানকার বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড নামক একটা করে চালা আছে। শুনলুম, সময় বিশেষে ওই সব স্থানে ব্যাণ্ড বাজান হয়। সেগুলো কোল্‌কাতার ইডেন গার্ডেনের তুলনায় একবারে আটপৌরে।

বোম্বাই থেকে আমরা একদিন দুপুরেব লঞ্চে এলিফ্যাণ্টায় যাত্রা করলুম।

এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে ওঠা নামার বড় অসুবিধা। জাহাজ থেকে নৌকায় করে দ্বীপে এসে নামতে হয়। নামবার জায়গায় মাঝে মাঝে কাদা, এবং বড় বড় পাথর।

এই দ্বীপটি সমুদ্রের মাঝখানে প্রায় তিন-চার বর্গ-মাইল স্থান জুড়ে আছে। এই দ্বীপে সামান্য দু'চার ঘর লোকের বাস। জাহাজের ঘাট থেকে প্রায় এক মাইল পাহাড়ে উঠে যেতে হয়, তারপরই প্রাচীনকালীন্ সুবিখ্যাত এলি-ফ্যাণ্টা গুহা।

পাহাড়ের মাথার ওপর পাথর কেটে তিনটি গুহা আছে, সেই গুহা তিনটির দেওয়ালের গায়ে গায়ে শিবের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সব অঙ্কিত। মূর্ত্তিগুলি প্রকাণ্ড, আন্দাজ ষোল ফুট উচ্চ। ওই সমস্ত গুহা দেখ্‌বার জন্য গভর্ণমেণ্টের 'আর্কিওলজি'তে জন প্রতি চার আনা মাশুল দিতে হয়।

মিঃ সেন নামক এক ভদ্রলোক আছেন ওই গুহার কিউরেটার। তিনি আমাদের কতক কতক সব বুঝিয়ে দিলেন। দুঃখের বিষয় আমাকে এইটুকু জানাতে হলো যে, আমার ওই গুহা দেখে একেবারেই তৃপ্তি হয় নি। তিনি বল্লেন, গোটা একটা পাহাড় কেটে এম্‌নি-ধারা মন্দির তৈরী করা বড়ই শক্ত, ইত্যাদি। কিন্তু আমার মনে হয় ওইরকম কাজ ত পুরাতন হিন্দুরা অনেকই করেছেন। ওর চেয়ে অনেক বড় আছে বিহারেরর নালান্দা, এমন কি ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরি। যা' হোক্ তিনটি গুহার 'ফ্রেস্‌কো' দেখে আমরা আবার লঞ্চে উঠলাম।

সময় সংক্ষেপ বলে এই সংখ্যায় এলিফ্যাণ্টার বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হলো না, আগামী বারে যখন অজন্তা ইলোরা এবং পাণ্ডুলেনার আলোচনা করবো, তখন এ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করা যাবে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের প্রথম মনস্বিগণ

রুসিয়া	লেনিন্	চীন	স্যান্-ইয়েট্-সেন্
আমেরিকা	জর্জ ওয়াশিংটন	আয়ার্লাণ্ড	ডি ভ্যালেরা
ফ্রান্স	নেপোলিয়ান	আফগানিস্থান	আমানুল্লা
জার্ম্মানী	বিশমার্ক, হিট্‌লার	পারস্য	রেজা খাঁ
ইটালী	মুসোলিনী	মিশর	জগ্‌লুল পাশা
ভারতবর্ষ	গান্ধী	তুরস্ক	কামাল পাশা
জাপান	জসিদা-টোরা-জিরো	আরব্য	সফিদ হুস্ত

মানুষের জন্ম-কথা

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, বি-এ, এল্-এম্-এফ্

মানুষের সত্যকার পরিচয় লইতে আমাদের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেখানে ইতিহাস আর কিছু সংবাদ দিতে অসমর্থ, যেখানে সে ভাষাহীন, সেখানে সন্ধান করিতে গিয়া মানুষকে এমনই জায়গায় আসিতে হয় যে, তাহার প্রতি পদে হোঁচট খাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তবু মানুষ হতাশ হয় না, ভুল-ভ্রান্তি অন্ধকারের পথে চলিয়া সত্যের আলোয় উপস্থিত হইতে চায়, অতীতের কথা জানিবার তাহার এতই বেশী আকাঙ্ক্ষা যে, এ সব কষ্ট সে কষ্ট বলিয়াই মনে করে না।

অজ্ঞাতের সন্ধানে তাই মানুষ ধীরে ধীরে উপস্থিত হয় একেবারে সৃষ্টির প্রথম স্তরে, যেখানে জীব নাই, জন্তু নাই, উদ্ভিদ নাই—পৃথিবী তখন আগুনের গোলার মত; আগ্নেয়গিরি, ধূয়া ও বাষ্প, উষ্ণ জল প্রস্রবণ, গলিত ধাতুময় ধরিত্রী তখন জীবসৃষ্টির উপযোগী ছিল না। কত কোটি বৎসরে পৃথিবীর এই প্রচণ্ড ভাব শান্ত হইয়াছে তাহারও সঠিক খবর পাওয়া শক্ত। তথাপি নাছোড়বান্দা ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর শান্ত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক অবস্থা পর্য্যন্ত মোটামুটি তাহাকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই চারিটি শ্রেণীর মধ্যে জীব সৃষ্টির ক্রমবিকাশের যা' অদ্ভুত রহস্য পাওয়া যায়, তাহার কাছে মানুষের লেখা ইতিহাসের দু' পাঁচ হাজারের কথা বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই হাল্কা ও নগণ্য। প্রকৃতি তাহার নিজের বুকে বিশ্বসৃষ্টির যে অত্যাশ্চর্য্য ঐতিহাসিক মালমশলা রাখিয়া দিয়াছেন, আজ জ্ঞানীদের চোখে তাহার কিছু কিছু ধরা পড়িয়া অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কোথাও পাথরের বুকের ভিতর এক টুকরা পায়ের ছাপ বা একটি ভাঙ্গা দাঁত, ভূগর্ভে কোথাও মৃত জন্তুর সম্পূর্ণ বা আংশিক কঙ্কাল, মরুভূমির বালুকা-গর্ভে হাজার ফুট নীচে বা সমুদ্র-গর্ভে মাছের অস্থি-পঞ্জর, শামুকের খোলা বা কোন বৃহৎ অজ্ঞাতনামা জীবের পঞ্জরাস্থি আবিষ্কার করিয়া অতীতের সঙ্গে আধুনিকের যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোটি কোটি বৎসরের এই পুরা কথা অল্পের মধ্যে সাত কথায় সাতকাণ্ড রামায়ণ বর্ণনার মতই বলিতে গেলে এবং বুঝিতে হইলে আমরা প্রথম হইতেই সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইয়া কোথায় কি পাওয়া যায় তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিতে আরম্ভ করিব। তবে একটা বিষয় স্মরণ রাখা চাই যে, অতন্তঃ দু' হাজার কোটি বৎসর আমাদের গাড়ীতে থাকিতে হইবে, কাজেই আহারাদির বন্দোবস্তটাও সেই মত সঙ্গে লইয়া রাখা ভাল। তারপর এ দারুণ শীত গ্রীষ্মের পথে কত হাজার বার মরিতে হইবে, জন্মাইতে হইবে, মাটীর নীচে চাপা পড়িতে হইবে, হাঙ্গর বা দায়নোসরাসের দাঁতে হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহাও বলা যায় না; যদি এ সব কষ্ট স্বীকার করিয়া চলিতে মত থাকে, তবেই গাড়ীতে চাপা ভাল। পণ্ডিতেরা পৃথিবী সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশের যে ঠিকুজি বাহির করিয়াছেন, তাহা বড় একটুখানি ফর্দ্দ নয়। তাঁহাদের মতে পৃথিবী যখন ক্রমশঃ বসবাসের উপযোগী হইয়া উঠিল, সেই সময়কে অতি প্রাচীন যুগ বলিয়াই ধরিতে পারা যায়; ইহার পরে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের নামকরণ হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগের পূর্ব্বে কত বৎসর যে পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী ছিল তা' ঠিক বলা যায় না। তবে অনেকে বলেন, পৃথিবীর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে অন্ততঃ দু' হাজার কোটি বৎসরের কম লাগে নাই—আর মাথায় বরফ ঢালাও হইয়াছিল সেই রকম হিসাবেই। অনেকে এখনও বলেন, পৃথিবীর পায়ে ও মাথায় আজও যদি বরফ না থাকে ত সেই মুহূর্ত্তেই তিনি চটিয়া উঠিবেন। লোকটার বড়ই রুক্ষ মেজাজ নয় কি? অন্তরে অন্তরে

ইনি দিনরাত চটিয়াই আছেন, সুবিধা একটু পাইলেই একবার হয়, তখন ইনি রাজা উজীর মানিবেন না, পুলিশের লাল পাগড়ীও নয়।

অতি প্রাচীন যুগের পৃথিবী এখনকার চেয়ে বড়ও ছিল, আর নরমও ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ জমিয়া আসার জন্য শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে উঁচু-নীচু, সমান-অসমানভাবে জমাট বাঁধিতে লাগিল, কুঁচকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এই রকমে নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে সুরু করিল এবং একপ্রকার জীবাণুর আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া গেল, যাহারা মাত্র একটি কোষে উৎপন্ন হইয়া এক আমি বহু হইব এইরূপ বাসনা পোষণ করিল। অনেকে মনে করেন, এই একটি মাত্র কোষের জীব হইতে জীব ও উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টিধারা চলিয়াছে—ইহারাই আদি এবং এই আদি বহুধা বিভক্ত হইয়া প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হইয়াছে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, পৃথিবী প্রথমে যদি জীবন-ধারণের উপযোগী ছিল না ত তাহাতে প্রথম জীবের ঐ বীজ আসিল কিরূপে, কোথা হইতে? এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর জীবনের সাড়া আসিবে কেমন করিয়া? বাহির হইতে এই বীজ না আসিলে জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে কি সে বীজ লুক্কায়িত ছিল, অথচ উত্তাপে মরিয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই? জ্বলন্ত, অগ্নিময় পৃথিবী ঠাণ্ডা হইল, কিন্তু এ বীজ সে পাইল কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর হয় না, বরং আরো প্রশ্ন আসে—জীবন কি? জীব ব্যতীত জীবনের সৃষ্টি সম্ভব কি না? যদি তাহা অসম্ভব ত সৃষ্টির কারণ কি, কর্ত্তা কে, উদ্দেশ্য কি?

যাক্‌, এ সব প্রশ্নের আজও উত্তর পাওয়া যায় নাই, কখনও যাইবে বলিয়া বিশ্বাসও হয় না—যদি দু'-চার লাখ বৎসরেও কেহ ইহার উত্তর দিতে পারে ত তখন জানিলেই চলিবে। মোট কথা, অতি প্রাচীন যুগে জীবের উৎপত্তির নমুনা কিছু দেখা গেল, তবে তাহাদের জীবন-যাত্রা যতটুকু সরল ও সহজ হইতে পারে, তাহার বেশী আর তাহারা যায় নাই।

প্রাচীন যুগকে পণ্ডিতেরা ছয় ভাগে ভাগ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের চিত্রে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কত বৎসরে এই সব যুগ অতিক্রম করিয়া সৃষ্টি-পথে জীবকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। মধ্যযুগ হইতে বৎসরের আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১। ক্যাম্বেরিয়ান কালে মেরুদণ্ডহীন জীবাদি, স্পঞ্জ, প্রবাল, জেলি মৎস জন্মে।

২। অর্ডোভিশিয়ানকালে ভীষণ আগ্নেয়গিরি, ভূমি-কম্পে পৃথিবীর অদল-বদল হয়। পূর্ব্বকালের জীব প্রভৃতির জাতি বিভাগ ও উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবাদিও লক্ষিত হয়। পৃথিবীর স্থলভাগ এখনও অনুর্ব্বর, বৃক্ষাদির লক্ষণ কোথাও দেখা যায় না।

৩। সিলিউরিয়ান কালে অগ্ন্যুৎপাৎ প্রভৃতি কম থাকে। স্থলভাগ বহু স্থানে সমুদ্র মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়; পৃথিবীর অধিকাংশই মরুভূমি থাকে, কেবল নদীমুখে বা সমুদ্রকূলে নিম্নশ্রেণীর গাছপালা দেখা যায়। স্থলে বৃশ্চিক জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয় এবং জলে মাছের আবির্ভাব হয়।

৪। ডিভোনিয়ন কালে পৃথিবী বেশ বসবাসের উপ-যুক্ত হইয়া আসে। ঘাস এবং ফার্ণজাতীয় গাছ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিরও জন্ম হয়। নানা জাতের শেওলা, বৃহৎ স্পঞ্জ, প্রবাল দ্বীপ প্রভৃতি গড়িয়া উঠে এবং মৎস্য এই সময়ে তাহার প্রকৃত আধুনিকরূপ লাভ করে।

৫। কার্ব্বনিফেরাস কালকে কয়লার খনির জন্মকাল বলা চলে। এই সময় পৃথিবীর কয়লার খনি প্রভৃতির গঠন হয়। বিরাট জঙ্গল, নানা জাতীয় অতিকায় ফার্ণ, শেওলা ও বৃহৎ বৃক্ষাদি, ঝড়, ভূকম্পে ও প্রাকৃতিক নিয়মে জলাভূমি বা নদীর মধ্যে পচিতে থাকে এবং ক্রমশঃ পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে জমিয়া যায়। পূর্ব্বের অনেক জাতের কীট বা জীবাণুরা এই সময় লোপ হইয়া গেল, কিন্তু মৎস্য আপনার স্থান দখল করিয়া বসিল। কোন কোন মৎস্যে ফুসফুসের অস্তিত্ব দেখা গেল ও কখনও বা তাহারা উভচর হইয়া জলে বা স্থলে বাস করিতে লাগিল, কেহ

চিত্র ১

যুগ	বিবরণ	কাল
	মহাপ্রাচীন যুগ—বসবাসের অনুপযুক্ত উত্তপ্ত জলন্ত পৃথিবী। ২০০০,০০০০০০০ ?	
	অতি প্রাচীন যুগ— পৃথিবী বাসোপযুক্ত—পাহাড়-পর্ব্বত, নদ নদীর উৎপত্তি। প্রথম জীবসৃষ্টি।	
প্রাচীন যুগ	১। **ক্যাম্বেরিয়ান**— স্পঞ্জ, প্রবাল, জেলি মৎস্য জন্মে। ২। **অর্ডোভিশিয়ন**— মেরুদণ্ডযুক্ত জীব জন্মে।	
	৩। **সিলিউরিয়ন**—মাছের জন্ম। ৪। **ডিভোনিয়ন**— মৎস্যের প্রকৃতরূপ লাভ হয়। এই রূপই এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ৫। **কার্ব্বনিফেরাস**— কয়লার খনির জন্ম। মাছের ফুসফুস লাভ। ৬। **পারমিয়ান**— বরফের কাল। স্তন্যপায়ী জন্তুর জন্ম। ভূমি-কম্প, অগ্ন্যুৎপাত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহা আলোড়ন।	
মধ্য যুগ	**ত্রিআশীক**	৮০,০০০০০ বৎসর
	জুরাশিক	৬৮,০০০০০ "
	ক্রিটেশশ	৫২,০০০০০ "
আধুনিক যুগ	**ইওসিন**	২০,০০০০০ "
	অলিগোশিন (ক)	১৬,০০০০০ "
	মায়োশিন	৮০,০০০০ "
	প্লিওশিন (খ)	৪৫,০০০০ "
অতি আধুনিক যুগ	**প্লিষ্টোশিন** গ (পিল্টডাউন মানুষ)	২০,০০০০ " ১০,০০০০ ৫০,০০০ " } প্রাচীন প্রস্তর যুগ
		২০,০০০ নব প্রস্তর যুগ
		১০,০০০ ব্রোঞ্জ যুগ
	খৃঃ পূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর	লৌহ যুগ

স্থানে তাহাদের প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যাইতে লাগিল, পরে এইরূপ অস্ত্রাদির সন্ধানে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা বিষয়ের আবিষ্কার হইতে লাগিল; কোথাও অস্থি নির্ম্মিত অস্ত্র, অস্ত্রাদি শাণ করিবার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত কোন কঠিন প্রস্তর খণ্ড, প্রস্তর নির্ম্মিত ছুরি প্রভৃতিও বাহির হইতে লাগিল।

এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ডাক্তার ডুবয় নামে জনৈক দিনেমারবাসী অস্ত্র চিকিৎসক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাভা দ্বীপের বেঙ্গোয়ান নামক নদীর পূর্ব্বদিকে বহু পুরাতন কালের একটি আগ্নেয়গিরির সন্নিকটে কয়েকটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের তলদেশে প্রস্তরীভূত অস্থির অবস্থান লক্ষ্য করেন। এই সমস্ত অস্থি প্রভৃতি অধুনালুপ্ত বৃহৎ চতুষ্পদ জীব-জন্তুর বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহারই আশপাশে মানব অস্থির সন্ধানে তিন বৎসর ধরিয়া লোক লাগাইয়া খনন কার্য্য চালাইয়া যান এবং যে সকল জীব-জন্তুর অস্থিরাশি তিনি সংগ্রহ করিতেছিলেন, প্লিওশিন যুগে ভারতবর্ষে সেই সমস্ত জন্তু বর্ত্তমান ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অতীত যুগের জন্তুর অস্থি-পঞ্জরাদি পাইবার পর হঠাৎ এক সময়ে তিনি এক অদ্ভুত আকারের মাথার খুলির উপরের অংশ আবিষ্কার করিলেন। ইহার নাম হইল পাইথিক্যানথ্রোপশ অথবা বানর-মানুষ। মাথার খুলির সঙ্গে সঙ্গে একই স্থানে উরুর হাড় ও তিনটি দাঁতও পাওয়া গেল এবং ঐ বনের মানুষকে এই তিন রকম সংগ্রহের সাহায্যে জানিবার জন্য বিশেষজ্ঞেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যাইবে যে, অলিগোশিন কালের শেষ অংশে মানুষ শাখা বানরের শাখা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া মায়োশিন কাল অতিক্রম করিয়া একেবারে প্লিওশিন কালের শেষ বিভাগে জাভা মানুষকে পাওয়া যাইতেছে—এই দীর্ঘকাল প্রায় সাত-আট লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষের ক্রমবিকাশের পরিচয় বা প্রমাণ পণ্ডিতেরা আজও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তবে প্লিওশিন কালের প্রথম হইতেই যে প্লিওশিন মানুষ ছিল, এ কথা তাঁহারা অনুমান করেন এবং এই প্লিওশিন মানুষের কঙ্কাল খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আজও তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। প্লিওশিন কালের পূর্ব্বে মায়োশিন ও অলিগোশিন কালের কঙ্কাল যদি কখনও আবিষ্কৃত হয় ত মানুষের আবির্ভাবের কালও অনেক পশ্চাতে চলিয়া যাইবে, নতুবা জাভা মানুষের আবির্ভাব কাল দুই-তিন লক্ষ বৎসরের মধ্যেই এখনকার মত সীমা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

জাভার মানুষের মাথার হাড় ও অন্য অস্থি প্রভৃতি হইতে এইটুকুই জানা যায় যে, তাহার মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের আকারেই গঠিত হইয়াছিল এবং উরুর হাড় প্রমাণ করে যে, এখনকার মতই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা চলিতে পারিত। যে সাত-আট লক্ষ বৎসরের (মায়োশিন কালের) বিশেষ বিবরণ জানা যায় না, সম্ভবতঃ মানুষ সেই সময় তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যস্ত ছিল। নিজেকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল, এ জন্যই তাহার মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

জাভা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসিল অনেক। প্রাচীনতম মানুষ জাভা দ্বীপে আসিল কিরূপে? তাহার মরিবার কি আর অন্য জায়গা ছিল না—ভারতবর্ষের এত কাছে মরিবার দুর্বুদ্ধি তাহার কেন হইল? ভারতবর্ষের সহিত পুরাকালে ব্রহ্মদেশ ও জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের যোগ ছিল; এমন কি, অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত যাইতে হইলে অল্প-বিস্তর সাগর ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র দ্বীপ অতিক্রম করিলেই চলিত। দুই বা তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের যে মানুষের কঙ্কাল জাভায় পাওয়া গেল, ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুরা যেমন আসিয়াছিল, তেমনভাবেই ঐ মানুষেরাও আসে নাই কি? তাহা হইলে শেষকালে ভারতবর্ষকেই কি মনুষ্য সৃষ্টির আদি স্থান বলিব? পণ্ডিতেরা বলেন, হয় ত মধ্য এশিয়া বা এশিয়া মাইনর হইতে ঐ সব জন্তু প্রভৃতি লইয়াই যাযাবর জাতির মত তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ক্রমে জাভায় উপস্থিত হইয়াছিল।

এই মতের বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, যাযাবর জাতিরা খাদ্যের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে—অতি পুরাকালে খাদ্যের এত অভাব ছিল না যে, তাহারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সব হিংস্র অতিকায় জন্তুর কঙ্কালাদি জাভা মানুষের কাছে পাওয়া গিয়াছে, ঐরূপ দল লইয়া সার্কাস দেখাইতে যাওয়া ছাড়া অল্প চেষ্টায় ভ্রমণ করা বড় নিরাপদ নহে। তৃতীয়তঃ, এশিয়া বা এশিয়া মাইনর প্রভৃতি বহু স্থানে বহু বর্ষ যাবৎ অনুসন্ধানের ফলে জাভা মানুষের অপেক্ষা প্রাচীন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় নাই। দেশ হইতে সমস্ত লোকই কি এক সঙ্গে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল? যাহা হউক, এ সব বিষয়ের মীমাংসা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং এ বিষয়ে মীমাংসা ঠিকভাবে হয় নাই এখনও।

জাভা মানুষের আবিষ্কারের পর ইংলণ্ডের সাসেক্স প্রদেশে পিল্টডাউন প্রান্তরে কোনো সমাধি-স্তূপের মধ্যে মানুষের মাথার খুলির কিছু অংশ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা তৎপূর্ব্বে হিডেলবার্গ অঞ্চলে প্রাপ্ত চোয়ালের হাড় পাইয়া তাহাকেই আদি মানব বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পিল্টডাউন হইতে যাহা পাওয়া গেল, তাহা স্ত্রীলোকের মাথার হাড়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই হাড় লইয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, জাভার মানুষের স্থান ইহার অনেক পরে। কাজেই এই পিল্টডাউনের কাছে জাভার পরাজয় হইল।

পিল্টডাউনের আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্পটি মন্দ নহে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস ডসন নামে একজন উকিল বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া সম্ভবতঃ পাওনাদারদের ভয়ে সাসেক্স হইতে আট মাইল দক্ষিণে লিউস্ নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে লোক অগোচরে বাস করিতেছিলেন। অন্য কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় এবং বাড়ী হইতে বাহির হইবার বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় ভূতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। জীবিত লোকের মধ্যে কোন পশার না হওয়ায় তাঁহার আর্থিক অভাব বাড়িয়াই যাইতেছিল, এবার সে সব ভুলিবার জন্য গ্রামের পাঠাগার হইতে জীব-তত্ত্ব, উদ্ভিদ-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠে সময় কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন মাহেন্দ্রক্ষণে 'দিন চলে না ঘুরি ফিরি' অবস্থায় রাস্তায় বেড়াইতে গিয়া তিনি দেখিলেন, কয়েকজন কুলী রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য একপ্রকার নূতন ধরণের পাথর কাটিয়া আনিয়া স্থানে স্থানে জমা করিতেছে। কোথা হইতে এই পাথর আনা হইতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি পিল্টডাউনের সন্ধান পাইলেন এবং সেইস্থানে যাইয়া দেখিলেন ক্ষুদ্র পাহাড়পূর্ণ প্রান্তর কাটিয়া কাটিয়া কুলীরা একটা গহ্বরের মত করিয়া ফেলিয়াছে। কুলীদের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া তিনি এই পাথর কাটা কাজে মজুররূপে ভর্ত্তি হইলেন এবং আপনার মনোমত স্থানের পাথর কাটিতে লাগিলেন। পাথর কাটিতে কাটিতে কখন কখন তিনি প্রস্তর যুগের মানুষের (প্লিওশিনকালের) প্রস্তর অস্ত্রাদি কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। ক্রমে দীর্ঘ তিন বৎসরের পরিশ্রমের পর তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং পুরস্কার-স্বরূপ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এমন সব অস্থি প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, যাহাতে এক কথায় তাঁহার নাম যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জীবিত মানুষ তাঁহাকে যে সাহায্য করিতে পারে নাই, মৃতের কয়েক টুকরা লৌহকঠিন অস্থি তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিল।

ইহার পর বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্যার আর্থার স্মিথ উডওয়ার্ড তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিয়া আরও কয়েকটি ভগ্নাস্থি আবিষ্কার করিলেন। সমবেত চেষ্টায় যাহা কিছু পাওয়া গেল, তাহাতে বিশেষভাবেই জ্ঞানীরা বলিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ ইউরোপে ইহার অধিক পুরাতন কঙ্কাল এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই এবং ঐ জাতীয় কঙ্কালে এবং আধুনিক অতি নিম্নশ্রেণীর মানুষ কঙ্কালে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না এবং মস্তিষ্কের গঠন প্রভৃতি প্রায় আধুনিক মানুষের ভাবেই গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু মুখের ও চোয়ালের হাড় বানর জাতির মতই ছিল এবং শ্বা-দন্ত বানরের মত সরু ও নীচের চোয়াল অনেকটা সিম্পাঞ্জীর মতই ছিল। মোট কথা, এই পিল্টডাউন আবিষ্কারের মস্তিষ্ক যদিও আধুনিক মানুষের ছাঁচে গঠিত

হইয়াছিল, তথাপি মুখের চেহারায় সে বানরের কাছাকাছিই ছিল। সকলের মতে কিন্তু পিল্টডাউন মানুষের আবির্ভাব কাল প্লিওশিন কালের কিছু পরে প্লিষ্টোশিন কালের প্রথম অংশেই ফেলা হইল। নানা যুক্তি ও তর্ক-বিতর্কে আনুমানিক ১৮০০০০ বৎসর পূর্ব্বেই পিল্টডাউন মানুষের সময় নির্দ্ধারিত হইল। জাভার মানুষ মরিয়া গিয়াও পণ্ডিতদিগের বিচারের জন্ম কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। রায় বাহির হইল, তাহার প্রাধান্য বজায় রহিল দেখিয়া সে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং পণ্ডিতদিগকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল নিশ্চয়।

ডাক্তার ডুবয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জাভা দ্বীপে যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাকেই আদি মানব বলিয়া নিশ্চিত করা হইল এবং পিল্টডাউন মানুষকে দ্বিতীয় স্থানে বসান হইল।

ক্রমে ক্রমে নানাদেশে আরও অনেক স্তরের কঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। প্রায় ১৫০০০০ বৎসর পূর্ব্বের হিডেলবার্গ মানুষ ও একলক্ষ বৎসর পূর্ব্বের নীয়েনডারথ্যাল মানুষের কঙ্কালও বাহির হইল। ইহারা জাভা মানুষের সহিত বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করে নাই। পিল্টডাউনের কঙ্কালটি স্ত্রীলোকের ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ঝগড়াটা খুব জোরেই চালাইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সমস্ত স্তরের মানবেরা কেবল এক মস্তিষ্কের জোরেই মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষার জন্ম এই সময় তাহারা পর্ব্বত গুহায় বসবাস করিতে লাগিল, বিরাট বন্যজন্তু হইতে প্রাণরক্ষা ও আহারাদি সংগ্রহের জন্য তাহারা নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রাদির উদ্ভাবন করিয়া আপনাদের হীনবলকে অস্ত্র সাহায্যে সবল করিবার বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় দিল। তাহাদের নির্ম্মিত গোলা, বল্লম, মুগুর, বর্শা প্রভৃতির সহিত বড় বড় ছোরা, দা, কুড়ুল প্রভৃতিও দেখা যায়।

প্লিষ্টোশিন কালের মাঝামাঝি বা কিছু পর পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্যালিওলিথিক বা প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ শেষ সময়ে সম্ভবতঃ নিও-লিথিক বা নব প্রস্তর যুগে অগ্নির আবিষ্কার করিয়াছিল এবং বৃক্ষাদি অবিরত জ্বালাইয়া রাখিয়া আগুনের সঞ্চার করিয়া রাখিতে লাগিল। গুহার সম্মুখে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তাহাতেই তাহারা পরম সুখে হরিণ মাংসের শিক্-কাবাব বা মাটন রোষ্ট, ফাউল সেঁকিয়া খাইতে আরম্ভ করিল—কাঁচা মাংস খাইবার প্রথা কমিতে লাগিল। হরিণ, ভল্লুক প্রভৃতির চর্ম্ম শীত নিবারণের জন্য রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতে লাগিল এবং বোধ হয় এই সময় হইতে তাহারা সূর্য্য ও অগ্নির বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ও ক্রমে পূজা করিতেও শিখিয়াছিল।

পুরাতন ও নূতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা প্লিষ্টোশিন কালের প্রায় শেষভাগে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইতে লাগিল এবং রোডেসিয়ান মানুষের শাখা প্রাধান্য লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানকার মঙ্গোলিয়ান, ককেসিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতিতে বিভক্ত হইল।

আফ্রিকার উত্তর রোডেসিয়ায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রোকেন হিল' নামক পাহাড়ের কাছে প্রস্তরীভূত অবস্থায় এক জাতীয় নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইল। ইহারাই রোডেসিয়ার মানুষ নামে খ্যাতিলাভ করিল। কত বৎসর পূর্ব্বে যে এই মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তাহার সঠিক্ সংবাদ না জানিলেও অনেকের মতে ইহারা ইউরোপের নিয়েন-ডারথ্যাল মানুষের সমসাময়িক অথবা কিছু পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই জাতীয় মানুষই আফ্রিকায় বসবাস করিতেছিল। যে মাথার খুলি ও অস্থি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহারা যে অন্য জাতীয় মানুষের চেয়ে কিছু উন্নত ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক অষ্ট্রেলিয়ার বন্যজাতির সহিত তুলনায় ইহারা প্রায় একই স্তরের বলিয়া বোধ হয়; অন্য অস্থি প্রভৃতি-তেও রোডেসিয়ার মানুষকেই অষ্ট্রেলিয়ার মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষের মতই বিবেচনা হয়।

প্রাণীতত্ত্ববিদেরা' মানব জাতীয়' অর্থে আধুনিক মানুষ ও অতীত যুগের লুপ্ত মানুষের নিদর্শন বিশিষ্ট প্রাণীকেও গণনা করেন। তাঁহাদের মতে ইংরাজ, জার্ম্মাণ, নিগ্রো ও জাভা, পিল্টডাউন, নিয়েনডারথ্যাল, রোডেসিয়ান মানুষ

একই পর্য্যায়ভুক্ত। ক্রমবিকাশই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আনিয়াছে এবং এই উন্নতির পথে মস্তিষ্কের গঠন, আয়তন প্রভৃতি তাহাকে অলিগোশিন কালের শেষভাগে বানর শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানব শাখায় লইয়া গিয়াছে, নতুবা একই শাখায় চলিতে থাকিলে আজ সম্ভবতঃ আমরা সকলেই নির্ঝঞ্ঝাটে বৃক্ষশাখে বসিয়া মাঘের শীতে রৌদ্র সেবন করিয়া কৃতার্থ হইতাম।

পণ্ডিতেরা বলেন, যে কোন জীব সোজা হইয়া দাঁড়াইতে ও চলিতে পারিবে; নিম্নের অঙ্গ গমনাগমনের জন্যই বিশেষভাবে ব্যবহার করিবে এবং যাহার মস্তক অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের জন্য নূন্যপক্ষে অন্ততঃ ন' শ' পঞ্চাশ কিউবিক সেন্টিমিটর স্থান অধিকার করিবার জায়গা থাকিবে, তাহাকেই 'মানব জাতীয়' বলিয়া গণনা করা চলে। মস্তিষ্কের আয়তন স্থির করিবার জন্য প্রথমে অভঙ্গ সম্পূর্ণ মাথার খুলিতে ছিদ্র করিয়া জল ব্যবহার করা হইত; পরে পারদ ব্যবহৃত হইতে লাগিল, কিন্তু সর্ব্বশেষে আধুনিক প্রথানুযায়ী বিশেষ মাপের সরিষা প্রমাণ ষ্টীলের ছররা দ্বারা এই কাজ চলিতে লাগিল—ক্রমশঃ ইহারও কৌশল ও প্রথা পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তবে যেরূপেই হউক, মস্তিষ্কের আয়তন সত্যই কত বড় তাহার প্রকৃত জ্ঞানের উপরেই বানরকে মানবজাতীয় প্রাণী হইতে পৃথক করা যাইবে। মস্তিষ্কের মাপই অবশ্য প্রধান হইলেও আরও অনেক বিষয় অন্যান্য অস্থি প্রভৃতির গঠন কৌশল, রচনা পার্থক্য ও অবহেলা করিলে চলিবে না।

আমরা দেখিলাম অলিগোশিন কালের শেষভাগের এক শাখা মানব শাখা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রম করিয়া বানরজাতীয় গরিলা, সিম্পাঞ্জী, ওরাং প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, অপর শাখা তাহার মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতির গুণে 'বানর-মানুষ' রূপে চলিয়া মায়োশিন কাল অতিক্রম করিয়া প্লিওশিন কালের শেষে জাভা মানুষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জাভা মানুষই পৃথিবীর আদিম মানুষ।

মস্তিষ্কের আয়তন লইয়া মানুষ ও বানরের যখন এত প্রভেদ, তখন এই আয়তন সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিয়া রাখা মন্দ নহে। আফ্রিকার গরিলা ও সিম্পাঞ্জী এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের ওরাং ইত্যাদির মস্তিষ্কের আয়তন স্থান কত? সাধারণতঃ, পুরুষজাতীয় পূর্ণবয়স্ক জীব লইয়াই এ সব বিষয়ের গণনা করা হয়।

নানা পরীক্ষার পর জানা গিয়াছে যে, গরিলার দেহ যত বড়ই হউক না কেন, শক্তি অপরিসীম হউক না কেন, মস্তিষ্কের আয়তনে সে সর্ব্ব প্রথম স্তরের জাভা মানুষেরও অনেক নীচেই পড়িয়াছে। জাভা মানুষের আয়তন নয় শ' চল্লিশ কিউবিক সেন্টিমিটর এবং পূর্ণাঙ্গ পুরুষ গরিলার মাত্র পাঁচ শ' কুড়ি; ওরাং এর স্থান চার শ' চল্লিশ এবং সিম্পাঞ্জীর চার শ' এবং এ কালের মানুষ ক্রমোন্নতির ফলে মস্তিষ্কের আয়তন পাইয়াছে চোদ্দ শ' পঞ্চাশ—পনের শ' কিউবিক সেন্টিমিটর পর্য্যন্ত। অষ্ট্রেলিয়ার এখনকার অসভ্যদের মস্তিষ্ক তের শ' হইতে চোদ্দ শ' বা ওজনে পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট ছয় আউন্সের কিছু কম বেশী। সাধারণ সভ্য লোকের মস্তিষ্কের ওজন ঊনপঞ্চাশ পয়েন্ট চার আউন্স এবং বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের মস্তিষ্কের ওজন চুয়ান্ন বা ষাট বা আরও অধিক আউন্স পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের ওজন পুরুষ অপেক্ষা কিছু কমই দেখা যায়।

মানব শিশুর (এ যুগের) জন্মগ্রহণ মাত্র মস্তিষ্কের আয়তন দেখা হইয়াছে, তাহাও গড় পড়তায় তিন শ' কিউবিক সেন্টিমিটরের নীচে যায় না। তাহার তিন বৎসর বয়সে ঐ আয়তন হাজার পর্য্যন্ত হইয়া বিংশ বৎসর বয়সে পূর্ণ আয়তন, অর্থাৎ পনের শ' এর কাছে আসিয়া পড়ে। গরিলা সিম্পাঞ্জী, ওরাং, গিবন বা অন্য প্রাচীন জগতের বা আধুনিক বানর কেহই এরূপ আয়তন পায় না।

প্রাচীন রহস্য উদ্ধার করিতে এই মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্যান্য অস্থি প্রভৃতির সহিত সেই সেই যুগের যন্ত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক স্থানের অবস্থা, যে স্তর হইতে কঙ্কালাদি আবিষ্কৃত হইল সেই স্থলের মৃত্তিকা প্রস্তরের জীবনীও এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন যুগ হইতে নবপ্রস্তর যুগ

অতিক্রম করিয়া প্লিষ্টোশিন কালের শেষভাগে ব্রোঞ্জ, তামা প্রভৃতি ধাতুর নিদর্শন পাওয়া যাইতে লাগিল, কাজেই ঐ সময়ের মানুষের জীবন-যাত্রা যে প্রস্তর যুগের মানুষের অপেক্ষা কিছু উন্নত ধরণের হইয়া পড়িল, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। রোডেসিয়ার বা নিয়েনডারথ্যাল মানবেরা শেষের দিকে অর্থাৎ খৃঃ পূর্ব্ব চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ধাতু প্রভৃতির সহিত লৌহের ব্যবহারেরও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। এই লৌহ যুগ হইতেই আধুনিক যুগের গণনা করা হয়।

যে কথা বলিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছিল, সেই মানুষের জন্ম-কথার সংক্ষিপ্ত ঘটনা বা ইতিহাস বলা শেষ হইয়াছে। এতই সংক্ষেপে বলিতে হইল যে, বলিবার উদ্দেশ্য তাহাতে ব্যর্থ হইয়া গেল কি না সন্দেহ—মোটামুটি একটা আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াও এই সব ব্যাপারে সে কার্য্যে বিফলতার সম্ভাবনাই অধিক। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য দু'-একটা বিষয় আরও বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিয়া ফেলিব।

বাঙ্গলায় হাতীর বিষয়ে একটা রহস্য কথা লোকে বলিয়া থাকে—'বড়লোকের বাড়ীর শূয়ার খেয়ে-দেয়ে মোটা হাতী হয়েছে'—কথাটা আন্দাজে ঢিল মারার মত সত্যের একটু কাছ ঘেঁসিয়াই গিয়াছে।

হাতীর কথা সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইওশিন কালে মিশর দেশে শূকরের মত একপ্রকার জন্তু হইতেই ক্রমবিকাশের ফলে আধুনিক হস্তীর উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ষোল—কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার জঙ্গলে মাত্র তিন ফুট উচ্চ লম্বা ঘাড়, শুঁড়হীন, সরু পা—ছোট এই জন্তুটিকে তখন ভবিষ্যতের হস্তী বলিয়া চিনিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ইহাদের দন্ত ও মুখাকৃতি অবিকল আধুনিক শূকরের মতই ছিল, কিন্তু ক্রমোন্নতির ফলে এই 'মরিথেরিয়ম' (ইওশিন কালের নাম) অলিগোশিন ও মায়োশিন কালে ধীরে ধীরে শুঁড় ও গজদন্তের বৃদ্ধি করিয়া প্লিষ্টোশিন কালে বিরাট্ 'ম্যাষ্টোডন'-রূপে দেখা দিলেন। তখন আর তিনি সেই দুর্ব্বল বাঙ্গালী নন, একেবারে গদা হস্তে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের প্রবেশ। তাঁহার দন্তই তখন আটফুট লম্বা, শরীরের কথা বলিয়া আর প্রয়োজন কি? কলিকাতার মিউজিয়মে সকলেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন বোধ হয়। ইওশিনের মরিথেরিয়াম হঠাৎ পথে ঘাটে তাহার বংশধরকে দেখিলে নিশ্চয়ই হার্ট ফেল করিয়া মারা যাইত এবং এইরূপেই মরিয়াছে বোধ হয়। এই বিরাট্ অতিকায় হস্তীর দর্প কিন্তু ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আসিল এবং প্লিষ্টোশিন কালের শেষভাগে আধুনিক হস্তীর বেশেই তাঁহাদের পরিচয় দিতে হইল।

'বড়লোকের শূয়ার' সত্যই হাতী হইয়াছিল কি না তাহা সঠিক্ বলা যায় না, তবে মহারাণী প্রকৃতি দেবীর সন্তান শূকর মূর্ত্তি মরিথেরিয়ম হইতেই যে হস্তীর আবির্ভাব, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মরিথেরিয়মের পূর্ব্ব-পুরুষ হয়ত বা শূকর ছিল। তাহা হইলে হস্তীরও ঐ একই পূর্ব্ব-পুরুষ বলা চলে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত এত বড় মানহানিকর কথা তাঁহাদের বলাও উচিত নয়—গোঁয়ার জাত!

এইবার শেষ করি।—কিন্তু শূয়ারের নাম লইয়া শেষ করা ভাল কি? মাছের কথা একটু না বলাও উচিত হয় না; কিন্তু ইহাদের বিষয় বলিতে গেলে আমরা অবাক্-বিস্ময়ে চক্ষু অসম্ভবরূপে বিস্ফারিত করিয়া দেখি যে, পৃথিবীর প্রাচীন যুগে সিলিউরিয়ন কালে মৎস্যাদির জন্ম হইলেও আজ খুব কম করিয়াও দশ কোটি বৎসরেও তাহার বিশেষ কোনই প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কোটি কোটি বৎসরের বিরাট্ দীর্ঘ জীবন-যাত্রার পথে মৎস্য, বিশেষতঃ, বাণ, বোয়াল, মাগুর, কুচে মাছ ও ফুসফুস বিশিষ্ট মাছ আজিও সেই প্রাচীন যুগের মতই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্রমোন্নতির পথে জগৎ ছুটিয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িয়াছে, গড়িতেছে, কত আসিল পৃথিবীর বুকে, জীবন-লীলা সাঙ্গ করিয়া দু'-দশদিনের গর্ব্ব ও দম্ভে লাফালাফি করিয়া কোথায় কোন্ অনুপরমাণুরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, অথবা ভূস্তর নিম্নে, প্রস্তর মধ্যে আত্ম-পরিচয়ের ক্ষীণ চিহ্ন হারাইয়া ফেলিল—কিন্তু মৎস্য? কালবিজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী, অপরিবর্ত্তনীয় কি ইহারা? এত যুগের এত পরিবর্ত্তনের আলোড়নেও তাহার বদল হইল না, লোপ হইল না। ধন্য এই আদি জীব সনাতন পুরুষ, ধন্য এই জাতি এবং ধন্য এই বাঙ্গালী জাতি যাহারা এই আদি পুরুষের প্রধান ভক্ত!

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

থেরী

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম্-এ

"বান্ধবি, তোরা শুধাস আমায় কেন হইয়াছি থেরী,
যৌবনভরা এ তনু আমার কেন রাখিয়াছি ঘেরি'
এ পীত বসনে ? চাঁচর চিকুর রুক্ষ করেছি কেন ?
শোন্ তবে বলি, শুনিস নি কভু বুঝি বা কাহিনী হেন
শিপ্রার তটে হর্ম্মমেখলা পুরী সে উজ্জয়িনী ,
জনম সেথায় শ্রেষ্ঠীর ঘরে, হয়েছিনু বিলাসিনী।
যৌবন-ভরা অঙ্গে ফুটিত শত লাবণ্য রাশি ;
লালসার দাস অবোধ পুরুষ চরণে লুটিত আসি'।
সুখের স্বপনে কাটিত জীবন যৌবন-মধু পিয়া ;
তুষিত আদরে ধনীর দুলাল রতন ভূষণ দিয়া।
কণ্ঠ জড়ায়ে, কহিত হাসিয়া কত মধুমাখা বাণী।
ভাবিতাম মনে, এ বুঝি স্বরগ, আমি সে স্বরগ রাণী।
এমনি করিয়া গেল কতকাল, একদা শারদ-নিশা,
চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে মোহময়ী দশদিশা।
সাজায়ে অঙ্গ বসন-ভূষণে, আঁখিতে কাজল দিয়া,
অভিসার বেশে রাজপথে চলি' লালসে বিবশ হিয়া।
সহসা চকিতে হেরি পথপাশে ফুল-বীথিকার তলে,
কমল নয়ন কিশোর কুমার ; দাঁড়ানু সেথায় ছলে।
আঁখি ইঙ্গিতে সঙ্কেত করি ফিরে যাই গৃহপানে ;
অনুপম চারু মুরতি মধুর বুকে ফুলশর হানে।
অধীর পরাণ চকিত নয়নে বারেক হেরিনু ফিরে ;
সঙ্কেত বুঝি সে বর কিশোর আসিতেছে ধীরে ধীরে।
ভবন দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ানু, কহিনু নয়ন তুলি'—
'এলে যদি, এস দাসীর কুটীরে, দাও চরণের ধূলি।'
গৃহমাঝে লয়ে পরম যতনে বসানু আসন পাতি' ;
ফুলসাজ দিয়া সাজানু বাসর শেজে জ্বেলে দিনু বাতি।
সম্মুখে বসি হাসিয়া কহিনু আঁখিতে রাখিয়া আঁখি—
'ও গো প্রিয়তম, এলে যদি আজ,
বলো তোমা' কোথা রাখি ?'

শুনি সে বচন, আননে তাহার উঠিল বেদনা ফুটি' ;
আঁখি নত করি কহিল কিশোর স্তব্ধ মৌন টুটি'।—
'সম্বর রূপ জননী আমার, কর সন্তানে ক্ষমা !
তুমি বিশ্বের বন্দিতা 'নারী', তুমি যে মাতৃসমা।
তব জয়গানে ভরেছে ভুবন, অতুলন তব স্নেহ ;
কল্যাণীরূপে করিছ রক্ষা তুমি মানবের গেহ।
দেব-মন্দির ও দেহ তোমার গঠিত করুণা দিয়া ;
বক্ষে ধরেছ সুধার আধার, বাঁচে সন্তান পিয়া'।
জাগো, জাগো মা গো অন্তরে তব, জননী ঘুমায়ে আছে ;
মহিয়সী-নারী, সেই পরিচয় দাও বিশ্বের কাছে।'
মুগ্ধ মানস, স্তব্ধ হৃদয়ে শুনিলাম সেই বাণী ;
নব জগতের নূতন আলোক কে দিল সমুখে আনি' !
আমি মহিয়সী—আমি কল্যাণী জগ-বন্দিতা নারী ;
আমার মাঝারে ঘুমায় জননী অপমান করি তারি ?
বিপুল বেদনা, অসীম পুলক, অসহ এ দেহভার !
এ কি রে আলোক ! এ কি রে মহিমা !
　　　　　　　　　　　সুখ-দুখ একাকার !...
ভাঙিল চমক, দেখিনু চাহিয়া মাথে লয়ে অঞ্জলি।
শূন্য আসন—দেবতা আমার কখন গিয়াছে চলি'।
আপনার পানে ফিরিয়া চাহিনু, এ কি মোর হীন সাজ !
আমি কল্যাণী, মঙ্গলময়ী, আমি যে জননী আজ !
সেই দিন হ'তে বসন ব্যসন সব করিয়াছি দূর,
নারীর দীপ্ত মহিমায় মোর অন্তর ভরপূর !
অতীত জীবন ফেলিয়া এসেছি জীর্ণ বস্ত্র সম ;
বান্ধবি, তাই এ পীতবসন অঙ্গে হেরিছ মম।
জগতের আজ যে আছে যেথায়—তারা মোর সন্তান।
তাদের সেবায় তুচ্ছ আমার এ প্রাণ করেছি দান।
এক আশা শুধু অন্তরে জাগে, মিটে গেছে আর সব—
বারেক হেরিব, যে দিল আমায় জননীর গৌরব।"

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

হাস্য-কৌতুক

দিবাস্বপ্ন

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্

[দৃশ্য—কলিকাতার একটি বড় রাস্তা। ফুটপাথের উপর কয়েকজন মথুরাবাসী ভিখারী স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া কেহ হারমোনিয়াম্ বাজাইয়া, কেহ বা গান গাহিয়া, কেহ বা নাচিয়া লোক জমাইয়া দিয়াছে।

[তামাসা দেখিতে যাহারা ভীড় করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই-একটি পয়সা দিতেছে, আবার কেহ বা সবটাই বিনামূল্যে সারিতেছে।

[পথিকদিগের ভিতর যাহারা কাজের লোক, দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিবার অবসর যাহাদের অল্প, এমন কি তাহারও পথ চলিতে চলিতে একবার ডিঙ্গি মারিয়া উঁচু হইয়া ভিড়ের ভিতর ব্যাপার কি তাহা দেখিয়া যাইতেছে।

[বেলা তিনটা। সরকারী লোক রাস্তায় জল দিতেছে। প্রত্যহ যেমন দেয়, আজও ঠিক্ তেমনি।

[কিন্তু সঙ্গীতের এমনি মোহিনী শক্তি, রাস্তায় যে উৎকলবাসীটি জল দিতেছিল, সেও খানিক অন্যমনস্ক হইয়া গেল। ফলে হইল এই—'হোস্' পাইপের জল রাস্তায় না পড়িয়া তোড়ে গিয়া পড়িল একটা মোটরের ভিতর।

[মোটরটি তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। গাড়ী যিনি চালাইতেছিলেন, তিনি একজন তরুণী। আচম্বিতে নাকে, মুখে, চোখে, গায়ে সজোরে হুড়হুড় করিয়া জল আসিয়া পড়িতেই তরুণীর লক্ষভ্রষ্ট হইল। হাতের 'ষ্টিয়ারিং' ঘুরিয়া গেল। গাড়ীটি ফুটপাথের ধারে একটা গ্যাস-পোষ্টের সহিত ধাক্কা খাইল। গ্যাস-পোষ্টটি ভাঙ্গিয়া দু'-আধখানা হইয়া মাটিতে পড়িল। এক টুকরা কাঁচ ছিটকাইয়া আসিয়া তরুণীর কপালে লাগিল। কপাল দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

[রাস্তায় হৈহৈ পড়িয়া গেল। তামাসা দেখিতে অনেক লোক আসিয়া মোটরের চারিদিকে ভীড় জমাইল।]

[একজন বলিল]—ইস্, গ্যাসপোষ্টটা যে একবারে গেছে!

[অপর একটা লোক দুঃখের সহিত কহিল]—আহা-হা, নতুন গাড়ীখানা!

—ইন্‌সিওর করা আছে নিশ্চয়।

—একেবারে নতুন 'হিল্‌ম্যান্।'

—না, না, 'অষ্টিন।'

—ছাই জানেন, 'ষ্টুডি-বেকার।' বাজী রাখুন।

—আরে মশায়, গাড়ীর মেকার নিয়ে তর্ক করে লাভ কি? এদিকে যে রক্তগঙ্গা!

[সকলেই জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। কোনোরূপ সাহায্যের জন্য কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা গেল না।

[এমন সময় ভীড়ের ভিতর হইতে যে বীরের মত বাহির হইয়া আসিল—সে রামকান্ত।

[তাড়াতাড়ি একখণ্ড বরফ আনিয়া তরুণীর ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিল। পরে একখানা ট্যাক্সী ডাকিয়া সে তরুণীকে লইয়া হাসপাতালের দিকে চলিল।

[ভীড় করিয়া যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা তো সকল অবাক্! পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।]

[একজন বলিল]—চেনা নেই, শোনা নেই, 'ফস্' করে এমনধারা—

[অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল]—ছোকরা কে বট হে?

[দার্শনিকের ঔদাসীন্য টানিয়া আনিয়া আর একটা লোক তাহার জবাব দিল]—কি জানি বলো। অবাক্ করলে বাবা!

দুই

[দৃশ্য—হাসপাতাল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তরুণীর ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। তারপর

বলিলেন]—ক্ষতের পরিমাণ একটু বেশী বটে, তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। রক্ত বন্ধ হয়েছে। ইচ্ছা করেন তো বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন।

[রামকান্তকে অনুরোধ করিয়া তরুণী কহিলেন]—আমার এতখানি উপকার যখন করলেন, তখন আর একটু করুন—দয়া করে আমায় বাড়ী পৌছে দিন।

[রামকান্ত হাতে চাঁদ পাইল। সে তাহার সরু বুকখানা যথাসম্ভব ফোলাইয়া বলিল]—উইথ প্লেজার, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য!

[সহাবনতা হইয়া তরুণী কহিলেন]—অমন কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারবো কি না জানি না।

[বাধা দিয়া রামকান্ত কহিল]—থাক্, আপনাকে এখন আর বেশী কথা কইতে হবে না। শরীর যথেষ্ট দুর্ব্বল। কথা পরে হবে। এখন চলুন দেখি আস্তে আস্তে গাড়ীর দিকে।

[রামকান্তের সাহায্যে তরুণী আস্তে আস্তে ট্যাক্সীতে আসিয়া বসিলেন। রামকান্ত পাশেই বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।]

তিন

[দৃশ্য—তরুণীর বাড়ী। তাঁহাকে ওই অবস্থায় ফিরিতে দেখিয়া সেখানে হৈচৈ পড়িয়া গেল।

[তাঁহার অভিভাবক বলিতে এক বৃদ্ধ দাদামশায়। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ফটকের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন]—কি হয়েছে? কি হয়েছে তোর?

[প্রশ্নের জবাব দিল রামকান্ত। কহিল]—একৃসিডেণ্ট।

[আশ্চর্য্যে বৃদ্ধ কহিলেন]—একৃসিডেণ্ট! কোথায়? কি করে?

[রামকান্ত কহিল]—সে কথা না হয় পরেই শুন্‌বেন। এখন চলুন, এঁকে ধরাধরি করে আমরা শোবার ঘরে পৌছে দি'।

[রামকান্ত ও দাদামশায়ের সাহায্যে তরুণী নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইলেন। লোকজন, চাকরবাকর সব এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটী করিতে লাগিল।

[পরে রামকান্ত ঘটনাটি আগাগোড়া বৃদ্ধের কাছে বিবৃত করিল।

[শুনিয়া বৃদ্ধ কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন]—দয়াময় রক্ষা করেছেন! নইলে এ একৃসিডেণ্ট কি সোজা একৃসিডেণ্ট!

[ঈষৎ হাসি হাসিয়া তরুণী কহিলেন]—সব ধন্যবাদটা ভগবানকে দিয়ে দিলে দাদু। আর একজনের জন্যে যে কিছুই রাখ্‌লে না।

[নাতনীর বক্তব্য বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ কহিলেন]—সে কথা আর বল্‌তে। উনি যে উপকার আমাদের করেছেন, ধন্যবাদ দিয়ে তা' খাটো করবো না। উনি না থাকৃলে কি যে হতো—

[বিনয় প্রকাশ করিয়া রামকান্ত কহিল]—কিছু না, কিচ্ছু না। আমি আর বেশী কি করেছি বলুন। এ অবস্থায় সকলের যা' করা কর্ত্তব্য, তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। আচ্ছা, অনুমতি করুন আজ তা' হলে আসি।

—না না সে কি কথা। একটু চা মিষ্টি—

—সে তখন আর একদিন হবে।

—কাল তা' হ'লে একবার আস্‌বেন।

—কাল? আচ্ছা চেষ্টা করবো।

—না, চেষ্টা নয়। আস্‌তেই হবে। না এলে এ বুড়ো বড় মনোকষ্টে থাকৃবে।

—আচ্ছা, আসবো। নমস্কার।

—নমস্কার।

[রামকান্ত তরুণীর দিকে ফিরিয়া বলিল]—আজ আর আপনি বেশী নড়াচড়া করবেন না, বুঝ্‌লেন?

[তরুণী একটু হাসিয়া বলিলেন]—না।

[পরদিন এবং আরও অনেকদিন নিমন্ত্রণে এবং বিনা নিমন্ত্রণে রামকান্ত তরুণীকে দেখিতে গিয়াছিল।

[কপালের ঘা অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে। তবে এখনও আছে।

[গান-বাজনায় একটি মাস এই বাটীতে রামকান্ত মধুর সন্ধ্যা-যাপন করিয়াছে। কখনও সে গায়, তরুণী শোনেন, কখনও বা তরুণী গান, সে শোনে।

[দুইজনের ভাব দেখিয়া বৃদ্ধ দাদামশায়ের আর আনন্দের সীমা ছিল না। একদিন তিনি তাহা চাপিতে না পারিয়া স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন]—তোদের দু'টিতে ভাই বেশ মানায়! তোদের চার হাত এক করে দিতে পারলে তবেই এ বুড়োর আনন্দ। কি বলিস ভাই নাতনী ?

[দুইজনেই চুপ।]

—লজ্জা হচ্ছে, না? আরে, ও বয়সে আমাদেরও লজ্জা হতো। লজ্জা অনুরাগের লক্ষণ।

[বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। রামকান্ত কহিল]—দাদামশায় কি বল্‌লেন শুন্‌লে ?

[তরুণী কহিলেন]—যাও, তুমি ভারি দুষ্টু!—বলিয়া তরুণী একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

—আরে শোনো, শোনো। রাগ করো কেন ?—বলিয়া রামকান্ত তরুণীর উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইল।

[রামকান্ত এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে-ছিল। ঘুমের ঘোরে হাত বাড়াইয়া সে যাহা ধরিল, তাহা তরুণীর হাত নহে, অদূরস্থিত একটি বিড়ালের লেজ।

[পোষা হইলেও বিড়ালটি 'ম্যাও' করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া রামকান্তের হাতে আঁচড়াইয়া দিল।

[বিড়ালের আঁচড়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

[ধ্যেৎ! এতক্ষণ সে যাহা দেখিতেছিল, তাহা শুধু স্বপ্নই। বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

[এমন সময় ভাঙ্গা কাঁসির মত গলার আওয়াজ বাহির করিয়া বিগতযৌবনা গৃহিণী আসিয়া কহিলেন]—দিনের বেলায় কি কুম্ভকর্ণের ঘুম মা! ঘড়িতে এখন ক'টা বাজ্‌লো সেদিকে হুঁস আছে কি? ছেলেদের একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে না?

[এই কথা বলিয়া গৃহিণী ফর্দ্দ ধরিয়া ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে হাঁক্ দিলেন]—ওরে কেলো, খেঁদি, ভুলো, ক্যাবলা, পদ্দি, নালু, খুকী তোরা বেড়াতে যাবি তো সব আয়।

[মাতৃ-আজ্ঞায় বিরাট একটি ফৌজ আসিয়া হাজির হইল।]

[এ কহিল]—বাবা, আমি যাবো।

[ও বলিল]—বাবা, আমিও যাবো।

—বাবা, আমি।

—না বাবা, ও নয়।

—হ্যাঁ বাবা, আমি।

[ছেলেরা কেহ বা বাপের কোলে, কেহ বা পিঠে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। যাহারা বাবার কোল পিঠ কিছুই খালি পাইল না, তাহারা কেহ বা তক্তাপোষে, কেহ বা বালিসের উপর দাঁড়াইয়া তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করিয়া দিল।

[রামকান্ত এতক্ষণ গোঁজ হইয়া বসিয়াছিল। একে মেজাজ খারাপ, তাহার উপর এই বিরাট শিশু-সৈন্যের ভীষণ অত্যাচার।

[সে আর থাকিতে পারিল না। ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া কহিল]—নাও, সবাই মিলে ঘিরে তোমাদের বাবাটিকে কীচক বধ করো! করো, আপদ চুকে যাক্!

গৃহিণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও দেশের—খেলার কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ও দেশের কথা মনে পড়ে। আজিকার দিনে শুধু পাশ্চাত্ত্য কেন, সারা পৃথিবীতে উঁহাদের লইয়াই আলোচনা চলিতেছে। ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। অবশ্য ইংলণ্ডও কোন অংশে কম যায় না। এবার টেষ্টে দু'-দু'বার ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে হারাইয়া দিয়া দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ অনেকটা নিজেদের টিমের উপর হুমকি দিতে পর্য্যন্ত ছাড়িতেছিলেন না। বরাত সুপ্রসন্ন! তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে তিন শ' পয়ষট্টি 'রানে' হারাইয়া দিয়া কতকটা মুখরক্ষা করিয়াছেন। কতকটা বলিলাম এই কারণে যে, এখনও ইংলণ্ড এক ম্যাচে জিতিয়া রহিল। উনত্রিশ-এ জানুয়ারী তারিখে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। এখন হইতেই বিশেষজ্ঞেরা হার-জিত লইয়া আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার এই দুই-দুইবার হাব কিন্তু তাঁহাদেব ইচ্ছাকৃত নহে। বাদল-দেবতার অনুগ্রহে এই পরাজয় তাঁহাদের নীরবে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। এবার ইংলণ্ডকেও বরুণ-দেবের কৃপায় নাজেহাল হইতে হইল।

পয়লা জানুয়ারী হইতে ছয় দিন ধরিয়া ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়। মেলবোর্ণের রৌদ্রজ্জ্বল প্রান্তরে প্রায় ষাট হাজার দর্শকের সমক্ষে নববর্ষের প্রথম দিনে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়। প্রথমে অষ্ট্রেলিয়া 'ব্যাট' করিতে নামেন; কিন্তু তাঁহাদের 'ওপনিং' ভাল হয় নাই। ব্রাউন একটা রান করিতে-না-করিতেই 'উইকেট' রক্ষকের হাতে 'আউট' হইয়া গেলেন। বিশ্ব-বিখ্যাত খেলোয়াড় ব্রাডমান্ ভেরিটির বলে তের রানে রবিনসনের হাতে বল তুলিয়া দিলেন। ম্যাক্‌ক্যাবই যাহা কিছু আনন্দ দিলেন। দু' শ' তেইশ মিনিটে দেড় শ' রান উঠিল। খেলা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। ছয় উইকেটে এক শ' একাশী রান তুলিয়া অষ্ট্রেলিয়াকে নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই অন্ধকার হওয়ায় খেলা বন্ধ করিতে হইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল—আটাত্তর হাজার ছয় শ' ত্রিশখানি টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। মূল্য হইয়াছে সাত হাজার এক শ' ছাব্বিশ পাউণ্ড।

পরদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুণ খেলা দশটায় আরম্ভ হইল না। খেলা আরম্ভ হইল আড়াইটায়। সুচতুর ব্রাডমান্ বিপদ বুঝিয়া 'ইনিংশ ডিক্লেয়ার্ড' করিয়া দিলেন। তখন তাহাদের রান উঠিয়াছে নয় উইকেটে দুই শ' এবং খেলা হইয়াছে দুই শ' তিরাশী মিনিট। ইংলণ্ড ব্যাট্ করিতে নামিলেন। ব্রাডম্যানের চালাকী সফল হইল। বৃষ্টিতে বোলারদের বল দিতে যেমন সুবিধা, ব্যাটস্‌ম্যানদেব খেলিতে তেমনই বিপদ। ওয়ার্দিংটন কোনো রান না করিয়াই ফিরিলেন। ব্যারনেটও তাহার সাথী হইলেন চৌদ্দ রান করিয়া। হ্যামণ্ড ও লেল্যাণ্ড দুইজনে মিলিয়া তবু খানিকটা ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। লেল্যাণ্ড করিলেন সতের এবং হ্যামণ্ড করিলেন বত্রিশ। এক শ' যোল মিনিট খেলিয়া ন' উইকেটে ছিয়াত্তর রান করিয়া ইংলণ্ড খেলা ছাড়িয়া দিলেন। মনে মনে হয় ত তাঁহারাও অষ্ট্রেলিয়াকে তাঁহাদেরই মত অবস্থায় ফেলিবেন ভাবিয়াছিলেন।

ও' রিলি ও ফ্লিন্ট্‌উড্ স্মিথ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে প্রথম খেলিতে নামিলেন এবং ও' রিলি শুধু হাতেই ফিরিয়া গেলেন। বৃষ্টির জন্য পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে খেলা বন্ধ হইয়া গেল।

মেঘভরা আকাশের তলায় তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হইল। কিন্তু উড্ পূর্ব্ব দিনের ও' রিলির মতই শুধু হাতে

ফিরিলেন। রিগ্ ও ওয়ার্ড দুইজনে মিলিয়া পঁয়ত্রিশ রান তুলিলেন। ওয়ার্ড আঠার রান করিয়া হার্ডষ্টাফের হাতে ধরা পড়িলেন। ব্রাউন আসিয়া রিগের সহিত যোগ দিলেন। অষ্টআশী মিনিট খেলিয়া দুইজনে মাত্র পঞ্চাশ রান তুলিলেন। রিগ্ সাতচল্লিশ রান করিয়া আউট হইয়া গেলে, ব্রাড্‌মান ফিঙ্গলটনের সহিত খেলিতে লাগিলেন। সেদিনের খেলার শেষে দেখা গেল যে, ব্রাডমান এক শ' মিনিট খেলিয়া ছাপান্ন রান করিয়াছেন। ফিঙ্গলটন এক শ' বাইশ মিনিট খেলিয়া উনচল্লিশ রান করিয়াছেন। পরদিন ফিঙ্গলটন চার শ' তেতাল্লিশ রানের মাথায় এক শ' ছত্রিশ রান করিয়া এইমসের হাতে আটকাইলেন। অষ্ট্রেলিয়া পাঁচ শ' ছেষট্টি মিনিট ব্যাট্ করিয়া ছ' উইকেটে পাঁচ শ' রান করিলেন। চতুর্থ দিনে দর্শক সংখ্যা ছিল ৬৪৮২৬ এবং টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল ৫২৯১ পাউণ্ড। চারিদিনের দর্শক সংখ্যা যোগ করিয়া দেখা গেল ২৯৬৪৮৯ এবং টিকিট বিক্রয় হইয়াছে ২৫৩৯৩ পাউণ্ড। এত দর্শক বা এত টিকিট বিক্রয় অদ্যাবধি হয় নাই।

১৯১১-১২ সালে হবস্ ও রেডিসে মিলিয়া তিন শ' তেইশ রান করিয়াছিলেন। ১৯২০-২১ সালে আর্মষ্ট্রং ও কেলিতে এক শ' সাতাশী রান করিয়াছিলেন। এবার ব্রাড্‌মান ও ফিঙ্গলটন তিন শ' ছেচল্লিশ রান করিয়া সকলকে অতিক্রম করিলেন।

পঞ্চম দিনের খেলা আরম্ভ হইল। দুইদিন ব্রাডম্যান ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার এই অসুস্থতা সত্বেও তিনি অত্যন্ত চমৎকার খেলা দেখাইতে লাগিলেন। এক সময় ভেরিটির বলে জোর করিয়া মারিতে গিয়া এলেনের হাতে ছ' শ' সত্তর রানে 'ক্যাচ আউট্' হইয়া গেলেন। ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংশ-এ দু' শ' ষোল মিনিট খেলিয়া ছয় উইকেটে দু' শ' ছত্রিশ রান করিলেন।

হ্যামণ্ড ও লেলাণ্ড এক শ' নয় মিনিট খেলিয়া এক শ' রান তুলেন। এক শ' সতের রানের সময় সিভার্স হেমণ্ডকে আউট করিয়া দিলেন। রবিনসন ও লেলাণ্ড দু' শ' পঞ্চাশ রান তুলিলেন দু' শ' তেইশ মিনিটে। দু' শ' বাহান্ন মিনিটে তিন শ' ত্রিশ রান উঠিয়া গেল। ষষ্ঠ দিনের খেলা শেষ পর্য্যন্ত লেলাণ্ড এক শ' এগার নট আউট রহিয়া গেলেন।

তিন শ' তেইশ রান-এ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংশ শেষ হইল। ফল হইল—অষ্ট্রেলিয়া (ন' উইকেট) ছ' শ'—পাঁচ শ' চৌষট্টি। ইংলণ্ড—ছিয়াত্তর—তিন শ' তেইশ।

ব্রাডম্যানের রেকর্ড

১০টি	সেঞ্চুরী	ইংলণ্ডের বিপক্ষে।
৪টি	"	দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
৪টি ডবল	"	ইংলণ্ডের বিপক্ষে।
২টি "	"	দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
২টি ত্রিপল	"	ইংলণ্ডের বিপক্ষে।
১টি "	"	করিতে বিরত হন—২৯৯ (নট আউট) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

২৫ ডবল সেঞ্চুরী ও ততোধিক রান করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত। ৪টি টেষ্টে সেঞ্চুরী ইংলণ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে। অর্থাৎ, প্রত্যেকবারই যখন ষ্টেটে নামিয়াছেন।

পৃথিবীর রেকর্ড ৪৫২, নট আউট।

ইংলণ্ডে পঞ্চম টেষ্টে একদিনে ২৪৪ রান তুলিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বিপক্ষ টেষ্টে সর্ব্বোচ্চ স্কোর ৩৩৪ করিয়াছেন।

মেলবোর্ণের মাঠে টেষ্টে সেঞ্চুরীর তালিকা :—

ব্রাডমানের	হ্যামণ্ডের
১৯২৮-২৯ সালে ১১২ ও ১২৩	১৯২৮-২৯ সালে ২০০
১৯৩৩-৩৪ সালে ১০৩	লেল্যাণ্ডের
(নট আউট)	১৯২৮-২৯ সালে ১৩৭

জে বি হব্‌সের ৫টি সেঞ্চুরী :—

১২৬ (নট্ আউট), ১৭৮, ১২২, ১৫৪ ও ১৪২

সাট্‌ক্লিফের ৪টী সেঞ্চুরী ১৭৬, ১২৭, ১৪৩ ও ১৩৫

—•—

এ দেশের খেলা—ও দেশের খেলার পর এ দেশের খেলার আলোচনা করিতে গেলে যেন তাল কাটিয়া যায়। তবুও দেশের কথা বলা ত চাই।

কলিকাতায় 'এরিয়ান' ও 'স্পোর্টিং ইউনিয়নে'র যে খেলা হইয়াছিল, তাহাতে 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন' জয়ী হইয়াছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়নের পক্ষে রান করিয়াছিলেন জি বসু—১০০, এন চ্যাটার্জ্জি ৯১, কে বসু (নট আউট) ১৮। সর্ব্বসমেত ২৫২ (৪ উইকেট) 'এরিয়ানে'র রান সংখ্যা ৭৫ মাত্র।

—•—

কুচবিহার ও কলিকাতা দলের যে খেলা হইয়াছিল, সে খেলাটি 'ড্র' হইয়াছে।

কুচবিহারের পক্ষে রান করিয়াছিলেন এ কামাল—৯৬, মহারাজা ২৩, কলিকাতার গোয়ান্ত ৫৭, গিলবার্ট ৮১ (নট আউট) দ্বিতীয় খেলায় কুচবিহার পরাজিত হইয়াছেন। কলিকাতা পক্ষের রান সংখ্যা—১৭৪ (৬ উইকেটে) কুচবিহার পক্ষের—১৫৮।

—•—

এরিয়ান ও কলিকাতার খেলায় কলিকাতার পরাজয় ঘটিয়াছে—যদিও কলিকাতা প্রথম খেলায় জয়ী হইয়াছিলেন। এবারের খেলায় এস, বোস-এর ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। এমন কি, এ জয় কতকটা তাঁহারই জন্ম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোস শত রান করিয়াও নট আউট ছিলেন। কে, ভট্টাচার্য্য—৫৩, বি, মিত্র ৩৯ (নট আউট) এস, মজুমদার—৩০, ক্যালকাটা মাত্র—১০০ রান করিয়াছিলেন।

—•—

ব্রিটিশ স্কুল ও ইউরোপীয়ন স্কুলের খেলায় ইউরোপীয়ন স্কুলের পরাজয় ঘটিয়াছে। ইউরোপীয় স্কুলের কেহই ভাল ব্যাটিং করিতে পারেন নাই।

ব্রিটিশ স্কুল—২৪৬, ৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড করেন। ইউরোপীয়ান স্কুলের রান দুই ইনিংশ-এ যথাক্রমে—৭০,৭৭।

—•—

আলিগড় ইউনিভারসিটি ও রসিদ একাদশ-এর খেলায় রসিদ একাদশই জয়ী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের নামজাদা খেলোয়াড় পালিয়া, বি বোস, প্রভৃতি ২৯ রানেই আউট হইয়া যান। কে খাম্বাটা ভাল না খেলিলে ফল অন্য রকমই হইত। তিনি ৬৩ রান করেন। জি ভি দত্ত ৩৪, ইন্দার ২৪ (নট আউট) জহিরুদ্দীনের ৬১ রান উল্লেখযোগ্য।

আলিগড়ের আকটার হোসেন ৬৩ রান ও নবাব জহিরুদ্দীনের ৪২ রান উল্লেখযোগ্য।

আলিগড়—১৩৯ রান করিয়াছিলেন, রসিদ একাদশ ১৬১ রান করেন।

শ্রীব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

স্বপ্ন না সত্যি—লেখক, বিমল বসু। প্রকাশক—শ্রীসুধীরকুমার হাজরা কর্ত্তৃক 'গল্প দাদা স্মৃতি-'মন্দির' হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

বইখানিতে পাঁচটি ছোট গল্প আছে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল। বলিবার গুণে গল্পগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। আমরা উত্তরোত্তর লেখকের আরও উন্নতি কামনা করি।

শান্তিপুর-সাহিত্য-বার্ষিকী—শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ-সংগ্রহখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। ইহাতে বুঝিবার, জানিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। আমরা শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক মঙ্গল প্রার্থনা করি।

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

চিত্র-জগৎ

চিত্র-তারকাগণের ভাব-প্রকাশের ধারা

বিখ্যাত পরিচালক সি, ব্রাউন তাঁহার পনের বৎসরাধিক অভিজ্ঞতার ফলে গার্ব্বো, নর্ম্মা শিয়ারার, জীন হার্লো এবং জোয়ান ক্রফোর্ড কি ভাবে ছবির পর্দ্দায় আপন আপন ভাব-অভিব্যক্ত করেন, তার অন্তর্নিহিত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেন গ্রেটা কোনো ভাব-প্রকাশ করবার পূর্ব্বে তাঁর নিজের 'সাজেসন্' মনে মনে ঠিক্ করে নেন এবং জোয়ান খুব সতর্কতার সহিত সেগুলির মুসাবিদা করেন। নর্ম্মা শিয়ারার কোনো ভাব-প্রকাশের পূর্ব্বে নিখুঁত অঙ্ক কষার মতো কতকগুলি ভাগে জিনিষটাকে বিভক্ত করে নেন এবং জীন হার্লো যে জিনিষটা প্রকাশ করতে চান, তা' নিজের বুদ্ধিতে কল্পনা করে নেন।

তিনি আরো বলেন যে, প্রত্যেক নারীর নিজস্ব ভাব-প্রকাশ করবার ধারা বিভিন্ন। যেমন জোয়ান ক্রফোর্ড কোন দৃশ্যে নিজের মনের ভাষাকে রূপ দেবার আগে খুব খানিকটা গ্রামোফোন বাজিয়ে নেন। অনেক কঠিন দৃশ্যে অবতীর্ণ হবার আগে দেখা গিয়েছে যে,একই রেকর্ড তিন-চারবার গভীর অভিনিবেশ-সহকারে বাজিয়ে তিনি মনটীকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তবে একই রেকর্ড প্রত্যেকবার বাজিয়ে তিনি মন ঠিক্ করেন না। কোন্ সময়ে কোন্ রেকর্ড বাজিয়ে প্রস্তুত হতে হবে, সেটা তাঁর বেশ্ জানা আছে।

আবার গার্ব্বোর ধারা অন্যরকম। তিনি তাঁর ভূমিকার অংশের প্রতি লাইনটী বারংবার আলোচনা করেন এবং আলোচনা অনুযায়ী আবৃত্তি করতে করতে একেবারে তার মধ্যে যেন সমাধিস্থ হন্। তখন তাঁর মুখ দেখে মনে হয় এইমাত্র যেন তাঁ'কে 'হিপনোটাইজ্' করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে তিনি যে ভাবধারার সৃষ্টি করেন, সত্যই তা' অতুলনীয়, তার যোড়া মেলা ভার। ব্রাউন বলেন, তাঁর পরিচালনায় তিনি যতগুলি মেয়ের সংস্পর্শে এসেছেন, গ্রেটা তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিখুঁত ভাব-সৃষ্টিকারিণী।

নর্ম্মা শিয়ারার আর এক ধরণের। তিনি তাঁর অভিনয়াংশে খুব বেশী পরিমাণ নিজের বুদ্ধি খাটাবার চেষ্টা করেন। খুব ছোট ছোট কথাও তিনি বহুবার মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করেন এবং সেটী এত সতর্কতার সঙ্গে তিনি গবেষণা করেন যে, মনে হয় যেন কোনো বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত একটা খুব বড় 'প্রব্লেম্ সল্‌ভ্' করছেন। পরিচালক ব্রাউনের এ কথা কত দূর সত্য, তা' 'রোমিও জুলিয়েটে'র যে কোনো দর্শক জুলিয়েটের ভূমিকায় তা' চাক্ষুষ দেখেছেন।

কিন্তু জীন হার্লো অত বাঁধাবাঁধির মধ্যে নিজেকে ধরা দিতে চান্ না। তিনি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাব প্রকাশ হওয়া উচিত, তাই প্রকাশ করেন। অবশ্য কথা-

গুলি উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি মনে মনে জিনিষটা তোলাপাড়া করেন। মেট্রো-গোল্ডউইনের আধুনিক চিত্র 'সুজি'-তে তাঁর অভিনয় দেখ্‌লে, এই কথাই সকলের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হবে।

চিত্র-তারকার নাম-রহস্য

নাম জিনিষটা মানুষের বা বস্তুর পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু এই 'নাম' নিয়ে পৃথিবী যুড়ে সব দেশে আবহমান কাল থেকে গোলমাল চলে আস্‌ছে। তবে প্রত্যেকের ধারা বা লক্ষ্য বিভিন্ন রকমের। যেমন ধরুন, কেউ চায় বড়লোক হিসাবে নাম করতে—অর্থাৎ, তার নামটা উচ্চারণ করে লোকে বলবে, খুব বড়লোক। কেউ চায় বিদ্বান হিসাবে নাম করতে—কেউ চায় রমণী প্রিয় হিসাবে নাম করতে—আবার কেউ বা চায় নেশাখোর হিসাবে নাম করতে। মোট কথা, যেদিক দিয়েই হোক্‌ নাম করা চাই; অর্থাৎ, নামটা জাহির করা চাই এই হলো চরম লক্ষ্য।

নামের দিক্‌ দিয়ে আমাদের দেশে আরো একটা ধারা প্রচলন আছে। সেটা হচ্ছে ভাল নামকে রূপান্তরিত করে একটা খারাপ 'ডাক্‌'-নামে'র সৃষ্টি করা। যেমন ধরুন, কোনো, একটা লোকের নাম দেবাদিদেব মহাদেবের অনুকরণে রাখা হয়েছে পঞ্চানন। তা' থেকে ছোট করে তার ডাক্‌ নাম করা হলো পঞ্চা—তারপর পাঁচু—তারপর পচা—তারপর পেঁচো। শুধু এই পেঁচোই বা পঞ্চাননই ধরা পড়ে নি। আমাদের দেশের লোকের রুচিই এই রকম। খুব ভাল অর্থপূর্ণ বা কোনো দেবতার নাম পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করবার জন্য আমরা খ্যাঁদা, বোঁচা, প্রভৃতি নামের আশ্রয় নিই। এমন-ই আমাদের রুচি! 'ডাক্‌' নামের চলন বোধ হয় সব দেশেই আছে। কিন্তু আমাদের দেশের মাপকাঠিতে রূপান্তরিত করার প্রথা বোধ করি কোনো দেশেই নাই।

যাক্‌, যে কথা বল্‌তে চাই। এই নাম নিয়ে হলিউডে চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী-মহলে কি রকম অদল-বদল চলে, এইবার দেখা যাক্‌।

প্রথমে ধরা যাক্‌, ক্যারোল লম্বার্ড। তাঁর আসল নাম হচ্ছে জেন পটার্স এবং চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্ব দিনটী পর্য্যন্ত তাঁর এই নামই ছিল। কিন্তু কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে তিনি পূর্ব্বোক্ত নামটী গ্রহণ করেন। নাম বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই নামটীর মধ্যে না কি বেশ একটা মাদকতার গন্ধ আছে এবং নাম অধিকারিণী অর্থাৎ স্বয়ং ক্যারোল বলেন, নামটী গ্রহণের দিন থেকে তার ভাগ্য না কি ফিরে গিয়েছে। মজার কথা নিঃসন্দেহ।

বিখ্যাত অভিনেত্রী ক্লডেট কলবার্টের নাম ছিল, লিলি চাউচোয়িন। তিনি অতি শৈশবে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে ফ্রান্স থেকে নিউইয়র্কে আসেন এবং ষ্টেজে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নামটী গ্রহণ করেন। সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য আমরা ক্লডেট কল্‌বার্ট লিখেছি বটে, কিন্তু নামটীর ঠিক্‌ উচ্চারণ হচ্ছে কোল-বেয়ার; অর্থাৎ, তাঁর আসল নামের চেয়ে অনেক সোজা ধরণের।

গায়ক অভিনেতা বিংক্রস্‌বির আসল নাম হচ্ছে হ্যারি লিলিস্‌ ক্রসবি। ক্যারি গ্রান্টের আসল নাম আর্চ্চিলিচ। ডব্লিউ, সি, ফিল্ডস্‌-এর আসল নাম হচ্ছে উইলিয়ম ক্লড ডিউকেনফিল্ড।

অভিনেত্রী মার্লিন ডিট্রিচের আসল নাম হচ্ছে ম্যাগডালেনা ভন্‌লস্‌। প্রথম কথাটীর ইংরাজী উচ্চারণ 'ম্যাগডালেনা' হলেও ওর আসল জার্ম্মাণ উচ্চারণ হচ্ছে 'মারলেনা।' এই আসল নামটীই থাক্‌লে আজ তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করতেন কি না তা' কে জানে!

সঞ্চয়

নূতন ছবির সমালোচনা

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল, বি-কম্ (লণ্ডন)

'টকী অফ্ টকীজ' বা দস্তুরমত টকী—এই ছবিখানি বিগত পয়লা মাঘ হইতে 'শ্রী'-চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে। আমরা ছবিখানি দেখিয়া আসিয়াছি। এই ছবিখানি 'রীতিমত নাটকে'র চিত্ররূপ এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁহার দলের কয়েকজনকে লইয়া এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। শুধু অহীন্দ্রবাবু এবং চিত্র-জগতে নবাগতা সুরবালা তাঁহার দলভুক্ত নহেন। 'কালী ফিল্মসে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইখানির প্রযোজনা এবং শিশিরকুমার পরিচালনা করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন আখ্যানভাগ রচনায়ও শিশিরকুমার সাহায্য করিয়াছেন। মোট কথা, বইখানি শিশিরবাবুর আগাগোড়া নিজের হাতের জিনিষ এবং ধরিতে গেলে একমাত্র শিশিরবাবুই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া প্রফেসার দিগম্বর মজুমদাদের চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। ঘটনাটী এইরূপ—প্রফেসারের উচ্চশিক্ষিতা বি-এ পাশ করা ভগ্নী শান্তা (রাণীবালা) যখন সামান্য একটী মোটরচালকের (বিশ্বনাথ ভাদুড়ী) সহিত পলায়ন করিল, তখন ভগিনীর এই অভাবনীয় আচরণে মর্ম্মান্তিক শোক এবং আঘাত পাইয়া প্রফেসারের মাথা খারাপ হইয়া গেল। তাঁহার আধুনিকা স্ত্রী স্বাগতা (কঙ্কাবতী) স্বামীর আরোগ্য কামনায় তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু চক্রীর চক্রান্ত বোঝা ভার। সেই দেশেই প্রফেসারের ভগ্নী শান্তা তাহার সঙ্গীর সহিত একটা থিয়েটারে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিল। প্রফেসার তাঁহার স্ত্রীর সহিত একদিন থিয়েটারে গিয়া তাহাদের দেখিয়া আসিল এবং ফলে প্রফেসারের মর্ম্মবেদনা দ্বিগুণভাবে নূতনরূপে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। প্রফেসার ভগ্নীকে ফিরিয়া পাইলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন না বলিলেও ঘটনার সর্ব্বশেষে প্রফেসার সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত মিলনান্ত হইয়া বইখানি শেষ হইয়াছে। মাঝে আরো বহুবিধ ঘটনার সমাবেশ আছে। আমরা সে সমস্তগুলির উল্লেখ করিয়া গল্পটার রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নহি।

শিশিরবাবু যে কতবড় অভিনেতা, তাঁহার এই শিক্ষিত পাগলের ভূমিকার অভিনয় না দেখিলে ধারণা করা কঠিন। তাঁহার আগাগোড়া অভিনয় যুগপৎ আনন্দ-বিস্ময়ে আমাদিগকে পরিপ্লুত করিয়াছে। উন্মাদ প্রফেসারের সমবেদনায় কাতর না হইয়া উপায় নাই, এমনই তাঁহার অভিনয়ের দাবী। তাঁহার চিকিৎসক সুহৃৎ ডাক্তারের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চের আর একজন বিশিষ্ট অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু শিশিরবাবুর অভিনয়ের পার্শ্বে তাহা একান্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য, ডাক্তারের ভূমিকায় যতটুকু দেখানো বা ফোটানো সম্ভব, অহীন্দ্রবাবু তাহার কোনো ত্রুটীই করেন নাই। নাট্যকার দিব্যেন্দুর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় চিত্রোপযোগী না হইলেও আমাদের মন্দ লাগে নাই। সাধ্বী স্ত্রী স্বাগতার ভূমিকায় কঙ্কাবতীর অভিনয়ও নিন্দনীয় নহে! তবে স্থানে স্থানে তাঁহার অভিনয়ে ভাবের আতিশয্য দেখা গিয়াছে। রাণীবালার অভিনয় কেন জানি না আমাদের ভাল লাগে নাই। তাঁহার মুখ দিয়া দু'-এক স্থানে ইংরাজী না বলাইলেই ভাল হইত। অনভ্যস্ততার জন্য তাহা বড় শ্রুতিকটু হইয়াছে এবং 'কালীফিল্ম'সের ছবিতে 'কালীফিল্মসে স্যুটিং আছে' এই কথা তাঁহার মুখ দিয়া বলাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ অকারণ হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন। শিশিরবাবুর পরিচালনার ভিতর এই ভাবের আত্মবিজ্ঞাপন শুনিতে হইবে, ইহা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করি নাই। নবাগতা সুরবালার অভিনয়াংশ খুব ছোট হইলেও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শান্তশীল গোস্বামী ও শীতল পাল মহাশয়ের অভিনয়ও মন্দ উপভোগ্য হয় নাই। আশা করা যায়, এই সরস চিত্রখানি এখন কিছুদিন 'শ্রী'-চিত্রমঞ্চে দর্শক আকর্ষণ করিবে।

"সুজি"—মেট্রো-গোল্ডউইনের ছবি। পরিচালক—জৰ্জ্জ ফিজমরিস। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন জীন হার্লো, ফ্রাঙ্কট টোন্, ক্যারি গ্রাণ্ট, লুই ষ্টোন, ইত্যাদি। মেট্রো সিনেমায় বিগত দোসরা মাঘ হইতে ইহা দেখান হইতেছে। জার্ম্মান যুদ্ধের একটী কল্পিত কাহিনী লইয়া এই চিত্রটীর আখ্যানভাগ রচিত। ঘটনাটী এইরূপ: সুজি ছিল য়্যামেরিকার এক নর্ত্তকী। চাকুরী উদ্দেশ্যে লণ্ডনে তাহাকে আসিতে হয়। কিন্তু চাকুরীর বাজার অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় সে কোন চাকুরী যোগাড় করিতে পারিল না। এমন সময় দৈবচক্রে টেরীর (ফ্রাঙ্কট টোনের) সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর বিবাহ হয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে জার্ম্মান রমণী-গুপ্তচর হস্তে টেরী বিবাহ-রাত্রে রিভলভারের গুলিতে আহত হয়। সুজি তাহাকে মৃত বলিয়া পলায়ন করে। তারপর আরও কয়েক বৎসর পরে। যুদ্ধ তখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সুজি তখন ফ্রান্সে। সেই সময় ক্যারি গ্রাণ্টের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ হয়। ক্যারি যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে সুজিকে (হার্লো) পিতা (লুই ষ্টোনের) নিকট রাখিয়া চলিয়া যায়। তারপর কি ভাবে সুজির সহিত টেরির সাক্ষাৎ হইল, কি ভাবে ক্যারি জার্ম্মাণ গুপ্তচরের হস্তে নিহত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত সুজি টেরিকে পুনরায় ফিরিয়া পাইল, ছবি না দেখিলে, লিখিয়া তাহা বোঝান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ছবিখানিতে জীন হার্লোর অভিনয় এত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর যে, তাহার উল্লেখ না করিলে অবিচার করা হয়। ক্যারি গ্রাণ্টের অভিনয়ও খুব উচ্চদরের হইয়াছে। ফ্রাঙ্কট টোনের অভিনয় সকল স্থানে আমাদের ভাল লাগে নাই।

শ্রীকার্ত্তিক শীল

নিবেদন—

'গল্প-লহরী' স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হঠাৎ ছাড়িবার কৈফিয়তে আমরা জানাইতেছি যে, বহু গ্রাহকের নিকট হইতে কেবল এক-ঘেয়ে গল্পে অরুচি ধরিতেছে, কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবাদ দেওয়া হউক এইরূপ পত্রাঘাতে আমাদের বৈশিষ্ট্যের অদল-বদল করিতে বাধ্য হইলাম। প্রত্যেক গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পাঠকদিগকে অনুরোধ, তাঁহারা যেন এবার পত্রিকার এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মতামত জানাইয়া আমাদের অনুগৃহীত এবং ভবিষ্যতে কি ভাবে চলিলে তাঁহাদের মনোমত হয় সে পরামর্শ-দানে বাধিত করেন। আমরা তাঁহাদের নির্দ্দেশমত পত্রিকাখানিকে যথাসাধ্য সুন্দর করিবার যত্ন লইব। প্রকাশ থাকে যে, আমরা গল্পের বৈশিষ্ট্য কোনদিনই হারাইব না।

গঃ সঃ

রাজাসন ত্যাগ—আমাদের ভারত সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড এই সেদিন মন্ত্রী-সভার নির্দ্দেশক্রমে মিসেস্ সিম্‌সনের সহিত বিবাহ চলিবে না বলিয়া রাজাসন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আবার বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড মন্ত্রী-সভার নির্দ্দেশে অষ্ট্রিয়ার আর্চ ডাচেস প্রিন্স অটোর প্রথম ভগ্নী এডেলেডকে বিবাহ করিতে হইবে বলিয়া রাজ্যত্যাগ করিতে বসিয়াছেন।

প্রায় পনের মাস পূর্ব্বে রাণী অট্রিড্ মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। লিওপোল্ড আজ পর্য্যন্ত তাহার শোক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি নিত্য রাণীর কবরের পার্শ্বে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া থাকেন।

এই বৎসরে প্রায় চারিবার রাণীর মৃত্যুস্থানে আসিয়া নির্জ্জনে মৃত রাণীর দেহ যে গাছটীর উপর পড়িয়াছিল, সেইটীর দিকে তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। তারপর সজল নয়নে রাণীর স্মৃতিকল্পে যে গির্জ্জাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া প্রার্থনা করেন।

আর্চ ডাচেস ভ্রাতা অষ্ট্রিয়ার ভাবী সম্রাট্ বলিয়া ইউরোপীয় রাজনৈতিক-মহলে তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য আছে। বেলজিয়মের মন্ত্রীসভা বা রাণীমাতা এই জন্য এ বিবাহে বিশেষ উৎসুক। কিন্তু রাজা তাঁহার ছয় বৎসর বয়সের পুত্র প্রিন্স বউডিন্‌কে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্ম-জীবনে অবকাশ লইতে চান। রাজাকে দেখিলে আর চেনা যায় না—হয় ত এ ক্ষেত্রেও বা রাজ্যত্যাগ ঘটে।

আদর্শ প্রেম—আগ্রা হইতে পনের মাইল দূরে কুবেরপুর গ্রামে এক মন্দিরের নিকট এক ব্রাহ্মণ রমণী তাহার মৃত স্বামীর জলন্ত চিতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া 'সতী' হইয়াছেন।

কলাবতী দেবীর স্বামী রামপ্রসাদ দীর্ঘদিন রোগভোগ করিয়া সোমবার মারা যান। মহিলাটী একটী ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেন এবং কিছুক্ষণ পরে সীমান্তে সিন্দুর লেপিত নববধূবেশে সজ্জিত হইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হন্ এবং সকলের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীর চিতায় আরোহন করেন। অনতিকাল মধ্যে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হয়। প্রগতি-যুগের মেয়েরা কি বলেন?

কুয়াসার জন্য নূতন আলোক—গভীর অন্ধকারের মধ্যেও বিড়াল দেখিতে পায়। কিন্তু অন্ধকার দূরে থাকুক, সামান্য কুয়াসা হইলেই মানুষের দৃষ্টি-শক্তি রুদ্ধ হয়। এ জন্য সমুদ্র-পথে কুয়াসায় দিশাহারা হইয়া জাহাজের চালক বিপদগ্রস্ত হয়—বিপরীত দিক্ হইতে আগত দুই জাহাজের সংঘর্ষ নিবারণ করিতে পারে না। কুয়াসায় দৃষ্টিরুদ্ধ হওয়ায় এরোপ্লেনের চালকগণও অনেক সময় বিপথে চলিয়া বিপদগ্রস্ত হয়। কুয়াসার জন্য ধনে-জনে মানুষের প্রতি বৎসর যে ক্ষতি হয়, তাহার পরিমাণ বড় অল্প নহে।

কিন্তু এতদিন এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কোনো কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। সম্প্রতি ডাক্তার এরিক্‌রিগবী নামক একজন অল্পবয়স্ক বৈজ্ঞানিক একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এই যন্ত্রের নাম রাখিয়াছেন—'বিড়াল চক্ষু।' বিড়ালেরা অন্ধকারেও কেন দেখিতে পায়, এই বিষয়ে বহুদিন যাবৎ গবেষণা করিয়া তিনি এই যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিড়াল একরকম রক্তিম আলোকের সাহায্যে অন্ধকারেও দেখিতে পায়—মানুষের পক্ষে ঐ আলোক অদৃশ্য। মিষ্টার রিগ্‌বী 'বিড়াল চক্ষু' নামে যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন, ওই যন্ত্রে একখানি মসৃন কাচের পরদা আছে। যন্ত্রটির বৈদ্যুতিক চাবি টিপিলেই ওই কাচের পরদা মধ্য দিয়া কুয়াসা ভেদ করিয়া কয়েক ক্রোশ দূরের বস্তুও পরিষ্কার দেখা যাইবে। তিনি বৈদ্যুতিক কল-কব্জার সাহায্যে ওই যন্ত্রটি এরূপভাবে তৈরী করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা মানুষেও 'অদৃশ্য রক্তিম আলোক' দেখিতে পাইবে।

মিষ্টার রিগ্‌বী ইতিমধ্যেই জাহাজে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রটি বসাইয়া গাঢ় কুয়াসার মধ্যে ইংলণ্ডের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং কুয়াসার মধ্যেও বহু দূরের জিনিষ দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কুয়াসার জন্য ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের

বৎসরে সাত লক্ষ পাউণ্ডের বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে। এই প্রকার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ওই বিপুল ক্ষতির আর কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না। আকাশে ভ্রমণ করিতে এরোপ্লেন চালকগণও এই যন্ত্রের সাহায্যে গভীর কুয়াসার মধ্যেও দিক্ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে।

নস্যদানির দান—ইংলণ্ডে কে একজন না কি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, টি পি কোনারের দ্বারা ব্যবহৃত নস্যদানির বেশ মোটারকম দাম দিতে তিনি রাজী আছেন। এ বৎসর লণ্ডন নিলাম-ঘরে একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত পুরাতন নস্যদানি তিন শ' কুড়ি পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছে। এইটীর উপর একটী সুন্দর চিত্র শোভিত ছিল। অন্য কয়টীর দাম প্রায় দু' শ' পাউণ্ডেরও উপর উঠিয়াছিল। আমাদের পণ্ডিত-মহাশয়েরা তাঁহাদের পৈত্রিক নস্যদানিগুলি এই বেলা সংগ্রহ করিয়া রাখুন—কি জানি যদি টান পড়ে, একহাত লইতেও পারিবেন।

সাম্যের যুগ—মনোহর দাস কৌরমল সিন্ধু নামক বিখ্যাত কৃষিবিদ্ এক শ' কুড়ি দিনে ১৪৬৪৭ মাইল স্থল ও আকাশ-পথে আফ্রিকা ভ্রমণের পর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সভ্য-জগতের সাম্যের কথা বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পায়।

আফ্রিকায় এসিয়াবাসী এবং ইউরোপবাসীদিগকে পৃথক পৃথক স্থলে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। যত ধনী বা যত সভ্যই হউন না কেন, কোনো এশিয়াবাসী ইউরোপবাসীর সহিত এক হোটেলে বাস করিতে পান না। সিনেমায় আবার শুধু পৃথক আসন নয়, পৃথক দিক্ এবং পৃথক বেড়া-ঘেরা স্থানে তাঁহারা বসিবার আসন সংগ্রহ করেন। পৃথক পানীয়, পৃথক সাধারণ বসিবার আসন, পৃথক গাড়ী, রেঁস্তোরা, এবং ল্যাবরেটারী দুই দলের জন্য বিভিন্ন। উচ্চ জমি ভারতীয়ের জন্য নিষিদ্ধ। কোন ইউরোপীয়ন ফারমে ভারতীয় কর্ম্মকর্ত্তা রাখিবার অধিকার নাই। এ ক্ষেত্রে সাম্যের যুগ যে প্রত্যক্ষ প্রতিফলিত, তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে।

বেকার সমস্যা—গত বৎসর ৩০-এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে ৩৩৯৫৩৮ খানি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দশ হাজারখানি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান।

স্কটল্যাণ্ড-এ ৪৫১৪৮ খানি গৃহস্তূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে। ৩১৪৬৯৪৬ খানি গৃহ ইংলণ্ড ও ওয়েলসে নির্ম্মিত হইয়াছে। তথাপি শুনিতে পাই না কি তথায় বেকারের সংখ্যা সুপ্রচুর। হায়রে, ভারতবর্ষ!

বিশ্বকর্ম্মার বিস্ময়—গত বৎসরে ১৫০০০০ টনের জাহাজ ইংলণ্ডীয় পোত-নির্ম্মাণ আশ্রয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ৫১২ খানি ইঞ্জিন, ৩৫৮১০ খানি যাত্রী ও মালগাড়ী এবং ৪৪ খানি শক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্র-চালক-মহাচক্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এ এদেশের বিশ্বকর্ম্মা বোধ হয় অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিবেন।

অদ্ভুত ঘড়ি—লক্ষ্য বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র এক সেকেণ্ড ভুল এরূপ একটী ঘড়ি বহু চেষ্টার পর সুনিয়মিত সময়-রক্ষক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। জ্যোতিষী এবং নাবিকদিগের পক্ষে সময়ের সুনির্দ্দেশ একান্ত প্রয়োজন। ব্রিষ্টলে যে ঘড়িটী ছিল, তাহা গ্রিনউইচ হইতে দশ মিনিট কম চলে। প্রথম ঘড়ি বা যন্ত্রাদিতে সময় রক্ষার পন্থা আবিষ্কার করেন মিঃ জাবার্ট। যিনি পরে পোপ্ সাইল-ভেষ্টার সেকেণ্ড হইয়াছিলেন। ইহা আবিষ্কৃত হয়, ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে। ইহার সময় নির্দ্দেশক কাঁটা ছিল না, কেবলমাত্র শব্দের দ্বারা সময় নিরূপিত হইত। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে 'স্প্রিং' প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

পুলিশের বাহাদুরী—রুমেনিয়ার পুলিশ কিন্তু বেশ এক মজার জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক পকেট-মারের হাতে ও কাণে লাল রং দিয়া চিহ্নিত করিয়া দেন। শুনা যায়, এই চিহ্ন না কি একমাস পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে, । পরে উক্ত আসামীদের আবার পুলিশে হাজির হইতে হয় এবং পুনরায় চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যদি সত্য যুগ ফিরিয়া আসে, মন্দ কি?
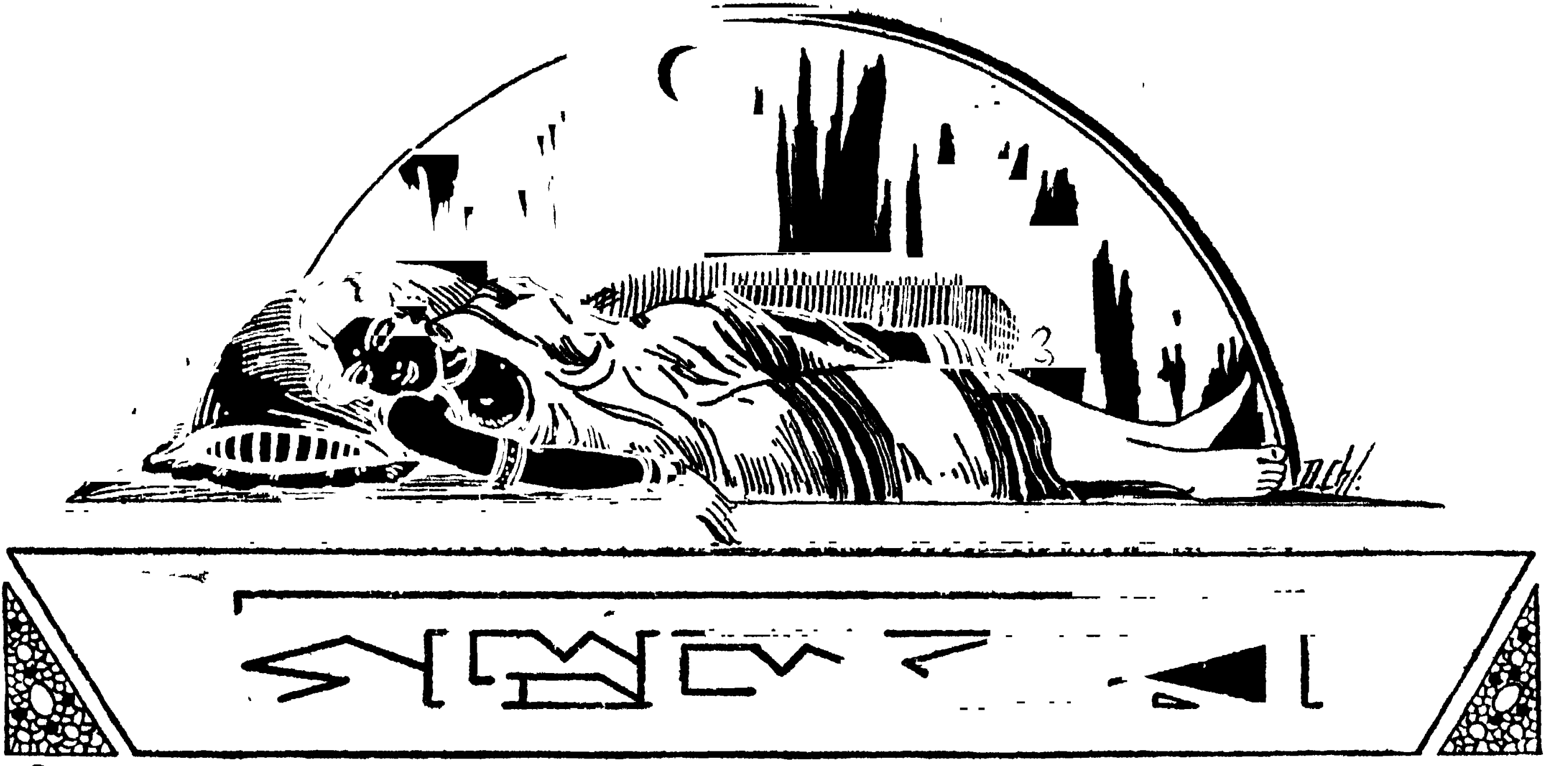
দ্বাদশ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৩ | একাদশ সংখ্যা

কণ্টকে কমল

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন 'সাহিত্য-সংরক্ষণ-সংসদ'-এ 'সাহিত্যে-স্বাস্থ্যরক্ষা' সম্বন্ধে পাকা দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হইতে অনেক চুনাপুঁটীর আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। আটটা সাতাশ মিনিটের ট্রেণটা ধরিতে পারিলে, সাড়ে নয়টার পরই বাটী পৌঁছাইতে পারিব ; নতুবা ষ্টেশনে বসিয়া বহুক্ষণ লোক গণিয়া কাটাইতে হইবে। মাথাটায় পরচর্চ্চার মেঘ জমিয়া গুমটের সৃষ্টি করিয়াছিল ; হাঁটিয়া হাওয়া খাইয়া যাওয়াই সমীচীন বোধ করিয়া বরাবর সারকুলার রোড ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু, আজকালকার দুর্দ্দান্ত যুবকদেরই মত পশ্চিম আকাশের কোণ হইতে বিদ্যুৎ অকস্মাৎ ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। অল্প সময়ের মধ্যেই মৃদুমন্দ বায়ু নিতান্তই মন্দ হইয়া রাজ্যের ধুলা-বালি গায়ে মাখিয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। হায়, হায়, সাহিত্য ত দূরের কথা, নিজের স্বাস্থ্যই যে যায়! কাজেই তখন পৈত্রিক প্রাণটী বাঁচাইতে আর কালবিলম্ব না করিয়া সম্মুখস্থ একটা পাণের দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। একটী বিগত-যৌবনা রমণী সেখানে বসিয়াছিল। আমায় দেখিয়া বলিল—"আসুন বাবু, ওই টুলটায় বসুন। বাইরে যে ঝড়!"

রুমাল দিয়া বেশ ভাল করিয়া মাথা-মুখ মুছিয়া বলিলাম—"সে আর বল্‌তে! ভাগ্যে তুমি আশ্রয় দিলে, নইলে—"

বাধা দিয়া সে কহিল—"ও কি কথা বাবু, মানুষ বিপদে পড়্‌লে আশ্রয় দেব না, বলেন কি!"

বলিবার বেশী কিছু ছিলও না। এইসব রমণীদের

জীবনের ইতিহাস আমার নিকট অজ্ঞাত নাই। নিতান্ত বিপদে না পড়িলে এই অজ্ঞাত কুলশীলার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম কি না সন্দেহ। মনের বিপরীত ভাবগুলাকে সযত্নে গোপন করিয়া তাহারই নির্দ্দেশিত চৌকীটার উপর বসিয়া পড়িলাম। বাহিরে কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব-লীলা চলিতে লাগিল। একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ত সম্ভব নয়। এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে ঘরের দিকে নজর পড়িতেই কি জানি কেন মনটা হঠাৎ নরম হইয়া গেল। রুচির পরিচয় যেন ইহার সর্ব্বাঙ্গে মাখান। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় জাগিল ঘরের একধারে কতগুলি ভাল ভাল পুস্তক রহিয়াছে দেখিয়া। উৎসুকভরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বই কার? তুমি পড়তে জানো না কি?"

সে মাথা নীচু করিয়া রহিল। খানিক পরে আমার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—"চিরদিন আমার এ দশা ছিল না বাবু, আমিও আপনাদের মত একজন ছিলুম! কিন্তু—"

রমণী চুপ করিয়া গেল। আমি শুনিবার কৌতূহলটা কোনোমতেই দমন করিতে পারিলাম না। বলিলাম—"থাম্‌লে কেন? বলো।"

মৃদু হাসিয়া বিনা প্রতিবাদে সে তখন বলিতে আরম্ভ করিল। আমিও আটটা সাতাশ মিনিটের ট্রেণের মমতা একরূপ ত্যাগ করিয়া গল্প শুনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

"বাবা ছিলেন আমাদের গাঁয়ের স্কুলের হেডমাষ্টার। ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় এবং আমার আর কোন ভাই-বোন্ না থাকায় আমি হয়েছিলুম তাঁর চোখের মণি। তাঁর কাছে যে কত ভালবাসা পেয়েছিলুম, তার হিসাব করা ত দূরের কথা, ভাব্‌লে আজও আমার মাথার ঠিক্ থাকে না। অনেক ছেলেই আমাদের বাড়ীতে পড়তে আস্‌ত। আমিও বাবার কাছে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত সব বিষয়ই শিখ্‌তুম। দিন বেশ কেটে যেতো। এদিকে আমার বিয়ের বয়স কখন যে পেরিয়ে গেছ্‌ল, কে জানে!

"বুঝতে পার্‌লুম সেদিন"—বলিয়া সে একটুখানি চুপ করিল। তারপর আবার বলিতে লাগিল—"যেদিন আমাদেরই পড়ার একটী ছেলে হঠাৎ ভালবাসার দাবী করে বস্‌ল। সেদিন চমক-ভাঙা-বুকে ঘরে ফিরে সমস্ত রাত্রিটাই তার প্রার্থনার কথাগুলো ভাবতে লাগ্‌লুম। মনে হলো—এক সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সত্য-সত্যই আমি আর সে এতটা জড়িয়ে পড়েছি যে, এখন আর কিছুতেই ফেরবার উপায় নেই।

"তারপর থেকেই দু'জনের দেখা-শোনাটা রাঙামুখেই হতে লাগ্‌ল। নির্জ্জন পথ-ঘাটে মনের কথা বিনিময় কর্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু এই গোপন করার চেষ্টাটা বেশীদিন লুকোন রইল না—নতুন চোর যে, চুরি ধরা পড়ে গেল। পাড়ার ঠান্‌দি'র আড়াল থেকে শোনা কথাটা বাবা শুনে বেশী কিছু বল্‌লেন না—তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল্‌লেন। শুন্‌লুম, তা'তে আমাতে বিয়ে হওয়া একান্তই অসম্ভব—কারণ সে কায়স্থ, আর আমরা ব্রাহ্মণ। তখন অতশত বুঝ্‌তাম না। বিছানায় পড়ে কাঁদতুম, আর ভাব্‌তুম—হলোই বা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ—হবে না কেন?"

প্রশ্নটা মন্দ লাগিল না।

"আমার কান্নায় কিন্তু কিছুই আটকালো না। শুভ কি অশুভ-লগ্নে জানি না, বিয়ে হয়ে গেল! বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের বউ হলুম। বরও যেন কার্ত্তিকের মত সুন্দর। দুঃখ-ভরা বুকের উপর হাত দুটো চেপে ধরে দৃষ্টি-বিনিময়ের সময় তাঁকে দেখে যেন অনেকটা শান্তি পেলুম।

"তারপর মাস ছয়েক পরে যখন বাপের বাড়ী ফিরে এলুম, তখন স্বামীর ভালবাসায় আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছে। পূর্ব্বের সে স্মৃতি অস্পষ্ট হতেও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

"সেদিন আমাদের বাড়ী তিনি এসেছিলেন। সারাদিন নানা কাজের অছিলায় ঘরে এসে তাঁর মুখখানি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যাচ্ছিলুম। রাত্রে তিনি ঘরে ঢুকতেই আনন্দে বিভোর হয়ে গেলুম। তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি, হঠাৎ জান্‌লায় কে টোকা মার্‌লে। সে আবেশ কাটিয়ে ওঠ্‌বার ইচ্ছা হলো না। আবার শব্দ

হলো। 'সই' মনে করে দরজা খুলে বারাণ্ডায় আস্‌তেই আমার শরীরের সব রক্ত যেন জল হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলুম—'এ কি, তুমি!'

"আগন্তুক বল্‌লে—'হ্যাঁ মন্দা, আমি তোমাকে দেখ্‌তে এলুম। এ ক'দিন এখানে ছিলুম না; এই মাত্র বাড়ী ফিরেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।'

"আমি তার দিকে বিরক্তিভরে চেয়ে বল্‌লুম—'কেন?'

"—'কেন, জিজ্ঞাসা করতে পারলে, কেন?' বলেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। গাল দুটো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌ল।···জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিতে-না-নিতেই সে ছুটে পালিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখ্‌লুম—স্বামী। লজ্জায়, ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলুম। তিনি আমার হাত ধরে ঘরে এসে বল্‌লেন—'ও কে?'

"কথা কইতে চাইলুম, কিন্তু পারলুম না। তিনি বল্‌লেন—'বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। খুব শিক্ষাই তুমি দিলে আমায়! চল্‌লুম। জীবনে আর কখন যেন ও মুখ দেখ্‌তে না হয়।'

"তিনি জামা গায়ে দিতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁর পা দুটো চেপে ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম। পোড়ামুখে একটা কথা কিন্তু বার হলো না। তিনি আমায় জোর করে টেনে ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌লুম। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে উঠে বস্‌লুম। মনে পড়ল, বার-বাড়ীতে বাবা হয় ত এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু, কাল তাঁকে কি বলব?···না না, এ মুখ তাঁকে দেখান হবে না! আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! এ পাপ প্রাণ আর রেখে ফল কি! আমি মরব!···

ঘর থেকে তখনই ছুটে বেরিয়ে গিয়ে চির-সমাধি আশায় উন্মাদের মত নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম। কিন্তু, মরণ ত হলো না! যখন জ্ঞান হলো, তখন বুঝ্‌তে পারলুম—একখানা নৌকায় আমি শুয়ে আছি। গরম কাপড় দিয়ে কে আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে রেখেছে। আমায় চোখ চাইতে দেখে একটি প্রৌঢ় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার নাম কি মা?'

"আমি বল্‌লুম—'অভাগিনী।'

—'ছি মা, আত্মহত্যা কি করতে আছে! ভাগ্যে মাঝিরা দেখ্‌তে পেয়েছিল'—

"রূপ কিন্তু আমার কাল হলো। মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে নিজের ঘরে স্থান দিলেও আশ্রয়-দাতার ছোট ছেলেটার শ্যেন-দৃষ্টি আমার উপর পড়তে দেরী হ'ল না। তখন আর অন্য কোনো উপায় না দেখে একদিন সে আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম।

"তারপর কি করে যে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছি, তা' ভাব্‌লে আজও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়! স্বামীর কাছে অবিশ্বাসী হলেও অন্তরের কাছে ত বিশ্বাস-হারা হই নি—আমার এ গৌরব নষ্ট হলে বাঁচব কিসের আশায়!

"বুঝি আমার সে প্রার্থনা ভগবানের পায়ে পৌঁছেছিল। পথে বসন্তই আমার রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য সবই অপহরণ করে নিলে। আঃ, স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম!

"তারপর একদিন দেশে ফিরে দেখ্‌লুম—বাবা নিরুদ্দেশ। শুন্‌লুম—স্বামী আবার বিবাহ করে কোলকাতায় নিশ্চিন্ত মনে ঘর-করণা করছেন। চিন্তার অবসর হলো না। চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌লুম। দেব-দর্শন ভাগ্যগুণে কিন্তু সহজেই মিলে গেল। একদিন দেখ্‌লুম, তিনি রাস্তা দিয়ে চলেছেন। আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে গড়িয়ে পড়তে সাধ হলো। অতিকষ্টে প্রলোভনটাকে চেপে রেখে তাঁর মাড়িয়ে যাওয়া পথের খানিকটা ধুলো মাথায় দিয়ে ধীরে ধীরে পেছু নিলুম। তিনি আমার দিকে বারকয়েক চাইলেন; কিন্তু চিন্‌তে পারলেন না। কোথা থেকে পারবেন—আমি নিজেই যে এখন নিজেকে আর চিন্‌তে পারি না! মনে মনে হাস্‌লুম। ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—এ একরকম মন্দ হলো না! তোমার আদেশ অমান্য করি নি স্বামী! সে মুখ নিয়ে তোমার সাম্‌নে আসা নিষেধ ছিল বটে, কিন্তু এ মুখ নিয়ে ত নয়!...

"তিনি হঠাৎ একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌লেন। সতৃষ্ণ

নয়নে সেই বাড়ীটার দিকে চেয়ে রইলুম। সাধ হলো, একবার দেখে আসি—কে সে সৌভাগ্যবতী, যে আমার স্থানটা অধিকার করে বসে আছে!

"তখনই কিন্তু চিন্তার অবসান হয়ে গেল। সব গেলেও পেট ত আছে। সে ত কোন কথাই শোনে না। তিন দিন একপ্রকার অনাহারে দিন কেটেছে, আর যে পারি না! চোখে চারদিক অন্ধকার দেখে ধীরে ধীরে একটা গাছতলায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়লুম। তারপর সে ভাবে থাকাও সম্ভব হলো না; সেইখানেই শুয়ে পড়তে হলো। কত মানুষ আমার সামনে দিয়ে চলে গেল, কিন্তু কেউ একটা কথাও বল্‌লে না। একটী পাড়াগেঁয়ে বুড়োগোছের লোক পথ দিয়ে চলেছিল। সেই আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'কি হয়েছে মা তোমার?'

"কথা কইতে পারলুম না। অবস্থা বুঝে নিজেই সে ছুটে গিয়ে কিছু খাবার এনে আমাকে খাইয়ে কতকটা সাম্‌লে তুল্‌লে।

"শুনলুম, একটু এগিয়েই তার একখানা পাণের দোকান আছে। যদি ইচ্ছে করি, সেখানে বাপের কাছে মেয়ের মত আদরে থাক্‌তে পারি।

"এ সুযোগ কি ত্যাগ করতে পারি—তবু ত তাঁকে দেখ্‌তে পাব! তখনই তার কথায় রাজি হয়ে গেলুম।

"বৃদ্ধ আজ পাঁচ বৎসর হলো মারা গেছে। সে থাক্‌তে কখনও দোকানে বসি নি; কিন্তু তারপর আর না বসে চল্‌ল না—কাজেই পাণওয়ালী সাজতে হলো—নইলে এ স্থান ছেড়ে যেতে হয় যে!

"তিনি রোজই আসেন। আমার দোকানে পাণ খান্—আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট! এর বেশী আমি চাইও না—এই আমার পরম সৌভাগ্য!"

সে নীরব হইল। বৃষ্টি তখন ধরিয়া গিয়াছিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে এতক্ষণ তাহার কথাগুলা শুনিতেছিলাম। এইবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুক-পকেট হইতে ঘড়িটা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম—আটটা বাজিয়া গিয়াছে। চোখে বোধ হয় একটু জলও আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সেটা মুছিয়া ফেলিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এতদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে সব চরিত্রগুলাকে আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করিতাম, আজ তাহাদেরই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সমস্ত পথটা কেবলই মনে হইতে লাগিল—সমাজের বিচারে হয় ত এই রমণী দোষী—শাস্তি পাইবার যোগ্য! এ ঘৃণিত অবস্থা অপেক্ষা উহার মরণই মঙ্গল ছিল! কিন্তু, হৃদয়ের তুলনার বিচার করিতে গেলে, ঘরের ভিতরকার সাতপুরু কাপড়-ঢাকা পতিব্রতাদের অপেক্ষা উহার আসন যে নিম্নে নহে, ইহা স্থির নিশ্চয়! এই তৃপ্তির কল্পনা, কল্পনার আনন্দ, অনুভব করিবার সামর্থ্য তাহাদের কতটুকু আছে? কে জানে!

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবিষ্কারকগণ

১। ওয়ারলেশ টেলিগ্রাফের আবিষ্কার কর্ত্তা—
মার্কনি ও জগদীশ বসু

২। বিশ্ববিখ্যাত সেলাইয়ের কলওয়ালা—
আইজ্যাক্‌সিদার

৩। আধুনিক ছায়া-চিত্রের উদ্ভাবক—
ফক্সট্যালবট

৪। ফটোগ্রাফির উদ্ভাবন-কর্ত্তা—
যোসেফ্ নাইড কারনাইস

বম্বে প্রেসিডেন্সী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্

[এই সংখ্যার বর্ণিত বিষয়—পুনা, আলান্দি, পাণ্ঢারপুর, হস্পেট (কিষ্কিন্দা), শোলারবদি ও দেহু]

অন্নপূর্ণা ওরফে পূর্ণা ও আমি দু'জনে বোম্বায়ের যা' কিছু 'দেখ্‌নেকো চিজ্' আছে, মোটামুটি সমস্তই দেখে এবার পুনা অভিমুখে যাত্রা করলুম।

শীতের রাত্রে দু'জনে মিলে উঠ্‌লুম এক 'কুপে কম্পার্ট-মেণ্টে।' লেপ-কম্বল জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—এমন কোনো ঐতিহাসিক কি আসবে না, যে প্রমাণ করে বল্‌বে এই দেশের নাম পুনা হয়েছে, পূর্ণার আসার তারিখ থেকে। আমাদের জলখাবার গেলাসের ভাঙা কাচের টুকরোটা কি কেউ 'রেলিক্‌' বলে বড় একটা স্তূপ করে সাজিয়ে রাখ্‌বে?

বাস্তবিক, মানুষ চায় তার কাজ। আহার-নিদ্রারূপ দৈনন্দিন কাজ নিয়ে সকলে ব্যস্ত থাকে—কিন্তু এই সব আধিভৌতিক ব্যাপারকে ডিঙিয়ে গিয়ে যারা শাশ্বতের কোনো সন্ধান নিয়ে আসতে পারে, মানুষ তাকেই দেবতা বলে পূজা করে। এখন যেমন আমরা পূজা করি মহাত্মা গান্ধীকে। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষীয় পুনাকে প্রকৃতপক্ষে সারনাথ বলাই উচিত; কারণ, আধুনিক সম্বুদ্ধ মহাত্মাজীর 'সবরমতী আশ্রম' এই পুনাতেই অবস্থিত।

জি-আই-পি রেলে বম্বে থেকে পুনা যেতে প্রায় সাড়ে চারঘণ্টা সময় লাগে। এর দূরত্ব হলো এক শ' মাইলের কিছু ওপর।

পুনা সহরের চেহারাটা যেন বাঙলা দেশের মফঃস্বল টাউন। রাস্তায় ধুলো এবং কচ্ছধারিণী স্ত্রীলোকের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। ষ্টেশনের কাছেই একটা হিন্দু হোটেল পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণত্বের বাঁধাবাঁধি এখান থেকেই বেশ কড়া রকমের হয়ে উঠ্‌তে সুরু হয়েছে। হোটেলেও ব্রাহ্মণের ঘরে আমাদের উঠ্‌তে হলো। অবশ্য এটা বলা উচিত যে, আমি একটা হিন্দু হোটেলই চেয়েছিলুম।

বোম্বাই সহরে আমরা কোনোরকম জাত-বিচারের হাঙ্গামে পড়ি নি। সেখানকার হোটেল ছিল নোংরামীর রাজা—যার যা' ইচ্ছে সে তাই করেছে। আধুনিকতা বল্‌তে তারা ধরে রেখেছিল বিশদরূপে নোংরামী করা। কিন্তু পুনায় ব্রাহ্মণের ঘরে ডাক্তারী হিসাবে সেই সমস্ত নোংরামীর পুরোপুরি যোলকলা বজায় থাক্‌লেও বাহ্যিক শুচিবায়ুর প্রকোপ ছিল কিছু উগ্র। এতাবৎকাল আমরা চেয়ার-টেবিলে ওদের দুষ্পাচ্য রান্নার সঙ্গে দন্তের সাহায্যে মল্লযুদ্ধ করেই আস্‌ছিলুম, এখানে কিন্তু সে সব চল্‌বে না। 'খাবার ঘরে গিয়ে আলাদা করে মেঝেয় বসে খেতে হবে'—এমনধারা হুকুম এল। বল্লুম—'সঙ্গে জেনানা আছে, কি করবো বলিয়ে জী?' জী বল্লেন—'জেনানার খাবার-ঘর স্বতন্ত্র আছে।' তারপর অনেক হুজ্জুতের পর আবার একটা আলাদা জায়গায় আমাদের দু'জনকে খেতে দিলেন। নাম-না-জানা, অতএব :আর্টিষ্টিক তরকারীর অভিনব স্বাদে বিরক্ত হয়ে স্ত্রী বল্লেন—'রাম রাম, এর চেয়ে আমাকে জাস্তি করে ঘিউ আর নিমক দিতে বলো; তাই দিয়েই চেষ্টা করে দেখি। আর শেষ পিঠে-চাপাটি ও শক্কর (চিনি) ত আছেই।'

খাবার গল্প ছেড়ে এবার আমরা দেশের কথা কই। খাস পুনায় দেখ্‌বার জিনিষ বিশেষ কিছুই নেই। পুনা থেকে ক্রোশ দুই দূরে একটা ছোট পাহাড় আছে। ওরা সেটাকে পার্ব্বতী-পাহাড় বলে। পার্ব্বতী-পাহাড়ে পার্ব্বতী ও শিবের মন্দির আছে। পাহাড়ের ওপর ওঠার বড় দুর্গতি। পাথরের কাঁকর দিয়ে ওঠ্‌বার ঢালু রাস্তাটা এমনভাবে তৈরি করেছে যে, পা পিছিলে যাবার

সম্ভাবনাই সমধিক। তবে মাঝে মাঝে পাথরের সিঁড়িও আছে।

পার্ব্বতী-পাহাড় জায়গাটি বড় নির্জ্জন। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই। কেবল দূরে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ। শীতের হাওয়ায় সেই গাছের পাতা সব ঝরে গিয়ে অধিকাংশই কঙ্কাল হয়ে পাথরের মাঝখানে প্রাণহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

পার্ব্বতী-পাহাড়ের চূড়ার ওপর পাথর কেটে পার্ব্বতী-মন্দির; অর্থাৎ, মানুষের হাতে তৈরী ক্ষুদ্র একটি ঘর। এই মন্দির থেকে অল্প দূরেই আর একটি ছোট মন্দির। সেখানে শিবলিঙ্গ এবং পঞ্চমুখ শিব স্থাপিত আছেন। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার ওপর থেকে বৃষ্টির ধারা এসে নীচে পড়্‌বার জন্য পাথর কেটে ছোট একটা চৌবাচ্ছার মত করা আছে। এর জল মিষ্টি হলেও খেতে তেমন ভক্তি হয় না। পাহাড়ের কয়েক ঘর অধিবাসী এইটেই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। এখানে পাণ্ডা বল্‌তে ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়েরাই সব। একটি বৃদ্ধ কেবল শেষকালে কিছু প্রণামী চাইলে। একটি মাত্র পয়সা পেয়ে সে একটু হতাশ হয়ে গেল। একটি ছোট মেয়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে 'গাইডে'র কাজ করলে। নগদ একটা আনি পেয়ে সে খুসীতে ভরে উঠ্‌লো।

পুনাতে আর একটি মন্দির আছে—তার নাম পাঞ্চালেশ্বর মন্দির। কথিত আছে রাম এবং লক্ষণ না কি সীতার অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে এই মন্দিরে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং মন্দিরের সেবাইত বিরহী রামকে সীতা-হরণের তিনদিন পরে এই মন্দিরে প্রথম জলপান করিয়েছিলেন। কথাটার মধ্যে সত্যতা হয় ত নেই; কিন্তু না থাকলেও এতে কিন্তু একটা কবিত্ব আছে। নাসিক থেকে পুনা প্রায় এক শ' মাইল। কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের চোখের সাম্‌নে যেন ভেসে উঠ্‌লো—নাসিকের পঞ্চবটীতে সীতাকে হারিয়ে সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র বিদেশে অজ্ঞাত অরণ্যে অনার্য্যদের দেশের মধ্যে এক শ' মাইল জঙ্গল অতিক্রম করে দারুণ হতাশ্বাসে ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে এই মন্দিরের সাম্‌নে এসে ধনুর্ব্বাণ ফেলে দিয়ে বস্‌লেন। একমাত্র সঙ্গী লক্ষ্মণ তাঁর পাশে এসে ছায়ার মত মৌনমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার চোখে যেন মন্দির এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ কল্লে। পাশের দিকে চেয়ে দেখে বউকে বল্লুম—'কি, মন্দিরটা কেমন লাগ্‌ছে?' সে জুতোটা খুলে ফেলে তার পায়ের নতুন ফোস্কাগুলো নিবিষ্ট-চিত্তে পরীক্ষা কর্‌ছিল। কথাটা আমার শুন্‌তে পেলে নিশ্চয়ই একটা বিরক্তিজনক উত্তর সে দিত। সৌভাগ্যবশতঃ আমার এই প্রশ্নে সে কানই দেয় নি।

ফেরার পথে গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে শিবাজীর ফোর্ট দেখ্‌তে গেলুম। ফোর্ট বল্‌তে যদি কেউ আগ্রা বা গোয়ালিয়ারের ফোর্টের কথা মনে করেন, তা' হলে আমি নাচার। শিবাজীর 'পুরন্দর' কেল্লার সঙ্গে তাদের একেবারেই তুলনা হবে না। এটা হয় ত শিবাজীর একটা ছোট গোছের ঘাঁটী হবে; কারণ, তাঁর প্রথম দুর্গ ছিল বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত টোর্ণা দুর্গ। সিংহগড় ও পুরন্দর, কেল্লা হিসাবে টোর্ণার নীচে।

এটা হয় ত সকলেরই জানা থাকবে যে, দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলটা মহারাষ্ট্রদের অধীনেই বরাবর ছিল এবং মাত্র ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ একশত আঠার বৎসর পূর্ব্বে নাসিক, আহ্মেদনগর, পুনা, শোলাপুর ইত্যাদি স্থানগুলি ইংরাজের অধিকারে আসে। ওই সময় বাজীরাও নামক পেশোয়াকে ইংরাজগণ বলপূর্ব্বক বন্দী করে' কি একটা মাসিক বৃত্তি দিয়ে যাবজ্জীবন আট্‌কে রাখেন এবং এই স্থানগুলিকে বম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

পুরন্দর দুর্গের কতকাংশ এখানকার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে আছে। যে অংশে শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি আছে, সেই অংশটুকুই যাত্রীদের দর্শন-যোগ্য। সবগুলি 'প্রটেক্‌টেড্ মনুমেণ্ট' হিসাবে সুরক্ষিত। কিন্তু 'গাইডে'র অভাবে বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। কেল্লার মন্দির অংশে শিবের মূর্ত্তি আছে। বম্বে প্রেসি-ডেন্সীর পুরাতন অধিবাসীরা যেন শিবের মূর্ত্তি উপাসনা করতেই ভালবাসতো; কারণ, এখানকার যত কিছু পুরাতন শিবপূজার স্থান আছে, সর্ব্বত্রই শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

ঐলিফ্যান্টা দ্বীপে লিঙ্গমূর্ত্তি দেখেছি বলে মনে পড়ে না, বোম্বায়ের বোম্বাদেবীর মন্দিরের পার্শ্বে পঞ্চবক্ত্র শিব, পুনাতে লিঙ্গ এবং মূর্ত্তি দুই-ই আছে, নাসিকেও তাই, অজন্তা ও ইলোরা শিবের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির জন্য জগদ্বিখ্যাত।

যেভাবে যত জিনিষ দেখে আমরা বেড়াই, গান্ধীজীর 'সবরমতী আশ্রম' কিন্তু ঠিক্ সেই ধরণের নয়। সহর থেকে অনেকটা দূরে প্রকাণ্ড একটা মাঠ নিয়ে এই আশ্রমটি স্থাপিত আছে। কন্‌কনে শীতের মধ্যে সকালে গিয়ে দেখি, ওই আশ্রমের সংলগ্ন চারণ-ভূমিতে গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি জন্তুরা বেড়াচ্ছে। দূরে দূরে আল দেওয়া ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে দু'-একজন লোক মোটা মোটা কম্বল গায়ে ঘোরাঘুরি কচ্ছে। আশ্রমের বারাণ্ডায় রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আশ্রমেরই কয়েকটি লোক নিজেদের ভাষায় কথাবার্ত্তা কইছে। এ সময় মহাত্মাজী আশ্রমে নেই বলে এখানে একেবারেই লোক সমাগম নেই।

মহাত্মাজীর 'পর্ণকুটী'রে কোনোরকম বিশেষত্ব নেই। সাম্‌নের বারাণ্ডাটা সিমেণ্ট করা বাঁধানো। ঘরখানা বাইরে থেকে ছোট বলেই মনে হলো। বন্ধ থাকার দরুণ ভেতরের ব্যাপার কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। আশপাশে কয়েক-খানি একই রকমের ঘর। সেগুলোও সব বন্ধ। শুন্‌লুম সেগুলো মহাত্মাজীর দক্ষিণ হস্তদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা। এক-একটা ব্লক বা চত্বরে এমনিধারা কতকগুলো করে ঘর আছে; তা'তে সব ব্রহ্মচারীরা বাস করেন। এ ছাড়া, দূরে দূরে সস্ত্রীক বাস করার উপযুক্ত কুটীরও আছে; সেখানে বিবাহিত ভক্তেরা থাকেন। সাধারণ লোকের শাদা চোখে এর বেশী আর কিছুই পড়ে না।

শুন্‌লুম এখানকার নিয়ম না কি বড় সুন্দর। প্রত্যেক লোকের জন্য দূরের ক্ষেতের মধ্যে একটু করে স্বতন্ত্র মাঠ আছে। তারা প্রত্যেকেই স্বহস্তে নিজের নিজের ক্ষেতে চাষ-আবাদ করে এবং সেই উৎপন্ন ফসল নিয়েই সারা বৎসর আহারাদি চালায়। সকলেরই চরকা আছে। তারা সেই চরকায় সুতো কেটে আশ্রমের তাঁতে খাদি বুনিয়ে নিয়ে পরে। পুরুষদের জন্যে ছোট ছোট খাদি, স্ত্রীলোক-দের বারহাত লম্বা, আড়াই হাত বহরের শাড়ী হয়। এরা না কি কোনো জিনিষই কিন্‌তে পারে না; তবে আবশ্যকের অতিরিক্ত কোনো কিছু তৈরী করতে পার্‌লে সেটাকে আশ্রমের অনুমতি নিয়ে বিক্রী করতে পারে। ওইভাবে তারা বিক্রী করলেও কিন্তু যা'-তা' দামে বিক্রয় করতে পারে না; আশ্রমের একটা বাঁধা দাম আছে, সেই মূল্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করার কোনো অধিকারই কারও নেই। যদি কোনো জিনিষ ক্রেতা স্বেচ্ছায় অধিক দামে ক্রয় করে, তা' হলে ধার্য্য মূল্যের অতিরিক্ত যা' পাওয়া যাবে, সেটা আশ্রমের সাধারণ ফাণ্ডে জমা হয়ে যার মাল সে ওই বাঁধা দামটুকুই পাবে। এই রকম করে এদের না কি নির্লোভী করে রাখা হয়।

মোটের ওপর সবরমতী জায়গাটা বড় মন্দ নয়। এতাবৎ কাল আমরা শুধু ঐতিহাসিক জায়গাই দেখে বেড়িয়েছি। উপস্থিত মূল্য আছে, এমন সব স্থান দর্শন বড় একটা কপালে জোটে নি। আশ্রমের মধ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত তিনটি মাত্র আশ্রম আছে বলেই আমার বিশ্বাস—বাঙলা দেশের মধ্যে বোলপুরে 'শান্তি-নিকেতন', বোম্বায়ের পুনাতে 'সবরমতী' এবং মান্দ্রাজের পণ্ডিচেরীতে 'অরবিন্দ আশ্রম।' তিনটির তিনরকম রূপ। তিনটির মধ্যে পুনার আশ্রমের বিশেষত্ব এই যে, এই আশ্রমের লোকেরা আর্থিক, দৈহিক এবং সর্ব্ব বিষয়েরই সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী। অর্থনীতির 'ডিভিসন্ অফ্ লেবার'কে এরা মোটে আমলই দেয় না। আধুনিক বিলাসিতার যুগে মহাত্মাজীর প্রচলিত রীতিনীতি বড় দুর্লভ; তবে আমাদের মত বাঙালীর পক্ষে লেখনীর সাহায্যে কল্পনায় অনেক কিছু লিখ্‌লেও বাস্তবে এইরূপে আশ্রমের নিয়মাবলী মেনে একটি দিনও বাস করা কষ্টকর।

পুনার যাবতীয় দ্রষ্টব্য দেড়দিনে শেষ করে তার উপনগরের দিকে নজর দেওয়া গেল। আমি যখন আলান্দি এবং দেহু দর্শনের বাসনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লুম, তখন কিন্তু পূর্ণা বলে—'বাড়ী চলো।' কোল্‌কাতা থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে এই 'কৈঁইমেই'-এর দেশে আর

কতদিন ঘোরা যায়?' কিন্তু তার এই অনুরোধ হাল্‌ফিল্ মুলতুবী করেই রাখা গেল।

যেদিন সকালে পুনায় গিয়ে পৌঁছাই, তার পরদিন দুপুরে আমরা এখানকার বিখ্যাত তীর্থস্থান আলান্দি অভিমুখে যাত্রা করলুম।

পুনা থেকে আলান্দি যাবার সুবিধাজনক কোনো ট্রেণ নেই—মোটরেই যেতে হয়। সস্তায় যাবার জন্যে বাস আছে—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাস ছাড়বার কোনো নিয়মিত সময় নেই। ট্যাক্সী-ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে একখানা গাড়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় দেখি আর একটি ভদ্রলোক সস্ত্রীক সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি হলেন ইন্দোরের একজন ডাক্তার—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ছুটীতে বেড়াতে বেরিয়ে পুনায় এসেছেন।

সুবিধেই হলো। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান ঠিক্ নিজের ঘাড়ে করে না বইলেও, অনেক সময় কমিয়ে দেন। ট্যাক্সী-টার ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকায় রফা হলো। যাতায়াত ভাগা-ভাগি করে আমাদের হলো দু' টাকা বার আনা করে। বেলা একটা নাগাদ আমরা আলান্দিতে এসে পৌঁছলুম। ট্রেণের থার্ড ক্লাসে এলে অবশ্য অনেক সস্তায় হতো বটে, কিন্তু তা'তে মোটের ওপর খরচ বেশীই হতো; কারণ, ট্রেণ একটা আছে সকালে, আর একটা সন্ধ্যায়। সন্ধ্যার সময় অচেনা জায়গায় যাওয়া চলে না; কাজেই পরদিন সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো—তার মানে, হোটেলে আর একদিনের ভাড়া বেশী দেওয়া* তুলনা করে দেখা গেল মোটরে আসাই শ্রেয়স্কর।

এম্-এস্-এম্ ওরফে মান্দ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলের অন্তর্গত আলান্দি ষ্টেশনের আশপাশে এই ছোট সহরটি সনাতন ধুলো, পাথরের তৈরী একতলা দোতলা ঘর, টিনের চালা, কচ্ছধারিণী স্ত্রীলোক ও কপালে হলুদ মাখা পুরুষ নিয়ে দাক্ষিণাত্যের দিনগুলি সুখে-দুঃখে একরকম করে কাটিয়ে থাকে। টাউন বলে গণ্য হলেও এদেশে ইলেক্‌ট্রিক নেই। কলের জল কোথায় দেখলাম না; বড় বড় ইদারার জলই এখানকার পানীয় সরবরাহ করে।

দেশটার নাম হচ্ছে শ্রীজ্ঞানেশ্বরের জন্য। জ্ঞানেশ্বরের নাম অনেকেরই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। দাক্ষিণাত্যে, শঙ্করা-চার্য্যের পরই শ্রীজ্ঞানেশ্বরের নাম করা যায়।

আলান্দি ষ্টেশনে থেকে মাইলখানেক দূরে একটা বড় বাগানের মধ্যে জ্ঞানেশ্বরের মন্দির। এই উদ্যানের সীমানারূপ পাথরের প্রাচীরের একটি স্থানে সামান্য কিছু 'ফ্রেস্‌কো'র কাজ আছে। এখানে চন্দন, শাদা ফুল, নারকোলের জল ইত্যাদি দিয়ে ওই অঙ্কিত মূর্ত্তির পূজা করতে হয়। কথিত আছে—পাঁচিলের ওখানটায় ঠেস্ দিয়ে বসে শ্রীজ্ঞানেশ্বর না কি তাঁর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানেশ্বর হলেন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক।

আলান্দিতে পাণ্ডাদের অত্যাচার বড় বেশী। আমাদের দেখে-শুনে ওরা একেবারে পাঁচ টাকা করে দশটাকা হেঁকে বস্‌লো আমাদের দু'জনের পূজার ফি হিসাবে। এ পর্য্যন্ত যত কিছু মন্দির দেখা গেছে, সর্ব্বত্রই পূজার পর দক্ষিণার প্রশ্ন ওঠে; এখানে কিন্তু ওটা পূজার আগেই চাই। হ্যাঙ্গাম বড় মন্দ নয়! ফি ওরা কিছুতেই কমাবে না। দশ টাকা দিয়ে পুণ্য করবার মত উৎসাহ আমাদেরও নেই। অতএব ঠিক্ করলুম, মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর আর দেখ্‌বই না। বাইরের 'ফ্রেস্‌কো' এবং বাগান দেখেই সন্ধ্যার সময় ফিরে যাবো—মন্দিরটিই জ্ঞানেশ্বরের পীঠস্থান।

ইন্দোরের ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক পুণ্য করতেই গেলেন। কান্নাকাটি করে তাঁর মাশুল তিনি কমিয়ে দু'জনের পাঁচ টাকায় রফা করে নিলেন। বেলা তিনটার সময় জ্ঞানেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্ব-বাহিনী ইন্দ্রায়নী নদীতে স্নান সেরে বেলা চারটের সময় ওই মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁরা পূজাদি দিলেন। ততক্ষণ আমরা জ্ঞানেশ্বরের বাগানে ইন্দ্রায়নী নদীর ধারে একটা বড় পাথরের ওপর বসে বসে কলা, নারকোল ও নদীর ঈষৎ কসা জল খেয়ে নানারূপ বাজে গল্প করে কাটিয়ে দিলুম। বিকেল হতেই শীত বড় কন্‌কনে হয়ে নাম্‌লো; এমন কি, রৌদ্রের তাপও গায়ে

* আমার জানতুম না বলেই হোটেলে উঠ্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম। কিন্তু পরে শুনলুম, এখানে মোরারজী গোকুল দাস এবং আরও কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে; দু'-একদিন থাক্‌বার পক্ষে এগুলি বড় মন্দ নয়।

লাগে না। নদী সরু হলেও, তার জল কি ঠাণ্ডা! তার ওপর তেমনি উপদ্রব এই মন্দিরের অনুচর হনুমান, বাঁদর এবং ষাঁড়ের।

ইন্দোরের ভক্ত-যুগল স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করার পর পাণ্ডাদের মধ্যে একজন এসে আমাকে হিন্দি ভাষায় অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা কর্লে—আমি মন্দিরে যাব কি না? আমি বল্লাম—'না।' কারণ জিজ্ঞাসা করে যখন সে বুঝ্‌লে আমার অত পয়সা নেই, তখন সে 'বোধ হয় আমার ব্যথিত হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করেই' ক্রমে ক্রমে পাঁচ সিকেয় নেমে এল। তা'তেও যখন আমি কান দিলুম না, তখন সে বেশ একটু দুঃখিত হয়ে বল্লে যে, তাকে যদি আমি ষোল আনা দক্ষিণে দিই, তা' হলে সে আমাদের দু'জনকে মন্দির নিয়ে গিয়ে জ্ঞান-বাবাকে দর্শন করিয়ে দেবে। প্রথমে যদি এই কথা শুন্‌তুম, তা' হলে হয় ত আমি যেতুম; কিন্তু এদের ব্যবহারে মনটা এত বিগড়ে গেল যে, বিরক্ত হয়ে মন্দিরে আর ঢুক্‌লুমই না। ভাব্‌লুম, দেশটা ত যা' হোক্ দেখা গেল, মন্দিরের ভেতর কি আছে তা' ডাক্তারের কাছেই শোনা যাবে। বউকে বল্লুম—যাবে না কি?' সে বল্লে—'কি হবে, তার চেয়ে এখানে বসে বেশ ভালই আছি।' কিন্তু মন্দিরের ভেতর যে কি রহস্য আছে, তা' আমার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল; কারণ, আমি না যাওয়ার দরুণ আমার ওপর ডাক্তারের সেই যে অভক্তি হয়ে গেল, তারপর তিনি আর আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই কইলেন না। মন্দিরের অভ্যন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, হয় ত ভাব্‌ছেন, পয়সা দিয়ে যে জিনিষ তিনি দেখে এসেছেন, বিনা পয়সায় সেটা আমি কেন শুন্‌বো।...

বড় রাস্তার লাল ধুলো উড়িয়ে আমরা যখন পুনায় ফিরে এলুম, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে।

মোটর থেকে এসে আমরা একেবারেই নাম্‌লাম পুনা ষ্টেশনে।

ষ্টেশনেই সামান্য জলযোগ সেরে নেওয়া গেল। হোটেলে আর যাওয়া হলো না; কারণ, তা'তে অনর্থক পয়সা খরচের ভয় ছিল। সামান্য খাওয়া-দাওয়া করে পুনার ওয়েটিং-রুমে রাত্রি বারোটা অবধি শীতের মধ্যে কম্বল জড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল।

আলান্দি থেকে ফেরার পথে মনে হলো, এই ত সামান্য কয়েক ঘণ্টা ঘোরা, মোটের ওপর এতে আর কতই বা খরচ পড়ে। এ পথে আর জীবনে হয় ত কখনও আস্‌বো না। আজ যদি না যাই, তবে হয় ত একটা দুঃখ আমার চিরদিনের জন্য থেকে যাবে। তার চেয়ে এখানকার সব দেখে যাওয়াই ভাল। বউকে বল্লুম—'পূর্ণা, চলো আমরা পাণ্ঢারপুর পর্য্যন্ত একেবারে সমস্তই দেখে যাই। কেমন, রাজী আছ?'

সে বল্লে—'তোমার যা' খুসী। অমন পাঁদাড় যখন একটা রয়েছে, তখন সেটা অমনি কেন ছাড়বে; ঘুরে নেওয়াই ত ভাল।'

বুঝ্‌লুম, তার মেজাজটা খারাপ হয়েছে। তা'কে আর একটু বেশী করে ঘাঁটিয়ে দেবার জন্যে বল্লুম—'এমন কিছু নয়, এই ত আমরা পুনা ষ্টেশনেই বসে আছি, এটা হলো বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ যাবার যে লাইন আছে, তারই মাঝের একটা ষ্টেশন। আমাদের যা' টিকিট আছে, তা'তে করে আমাদের বোম্বাই দিয়ে বাড়ী যেতে হবে; তবে পাণ্ঢারপুর যেতে গেলে এখন কিন্তু উপস্থিত মাদ্রাজের মুখে, অর্থাৎ, আমাদের বাড়ী যাওয়ার উল্‌টো দিকেই খানিকটা যেতে হয়।'

কথাটা শুনে সে বল্লে—'কতটা?'

বল্লুম—'দেখতেই পাবে।'

বল্লে—'কি দেখ্‌বো?'

বল্লুম—'সরষে ফুল।'

বিরক্ত হয়ে সে আর কোনো কথাই কইলে না। আমিও কম্বলটাকে টেনে বেশ করে গায়ে ঢাকা দিয়ে নিলুম। কি একটা ট্রেণ এসে বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুক্‌লো। ওয়েটিং-রুমে আমাদের সহবাসীরা বাক্স-বিছানা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

বোম্বাই থেকে মাদ্রাজের যে মেল ছাড়ে রাত্রি একটা নাগাদ, সেই গাড়ী এসে দাঁড়ালো আমাদের পুনা ষ্টেশনে।

বিছানাটা কোনরকমে জড়িয়ে নিয়ে আবার আমরা কাঁপতে কাঁপতে গাড়ীতে গিয়ে চেপে বস্লুম।

একেবারেই ঘুমুতে পাল্লুম না; কারণ, ভোর পাঁচটার সময় আমাদের নাব্‌তে হবে। শীতের মধ্যে একবার করে ঘড়ি দেখি, আর মনে মনে হিসেব করে ভেবে নিই, নাব্‌বার কত দেরী আছে।

সাড়ে পাঁচটার সময় বিছানা-পত্র বেঁধে নিয়ে বউয়ের তিরিক্ষি মেজাজটাকে উপভোগ করতে করতে কুদুর্ওয়াদি জংসনে গিয়ে নামা গেল।

সমস্ত আকাশ তখন কুয়াসায় ভরপুর হয়ে আছে—কাজেই শীত কিছু কম। ষ্টেশনটা নির্জ্জন এবং অন্যান্য ষ্টেশনের তুলনায় অনেকটা নিস্তব্ধ। শীতকালের ভোর বেলায় খাবারওয়ালার গলা পর্য্যন্ত ভাঙা। তা' ছাড়া, তার কোনো ক্রেতাও নেই। এখানকার একমাত্র যাত্রী হলুম আমরা; আর কেউ উঠলোও না, নামলোও না।

শীতটা কম বলে' এবং ঘুমটা ছেড়ে যাওয়ার দরুণ স্ত্রীর মেজাজখানা অনেকটা চলনসই হয়ে এসেছিল। সে বল্লে—'এবার আমরা যাব কোথায়?'

বল্লুম—'এখানে গাড়ী বদল করে আধঘণ্টার মধ্যে আর একটা গাড়ীতে উঠবো এবং সেই গাড়ী থেকে বেলা সাত-টার সময় পাণ্ঢারপুরে গিয়ে নাম্‌বো।' মালপত্র তুলে নিয়ে কুলি গিয়ে উঠিয়ে দিলে পাণ্ঢারপুরের গাড়ীতে। গাড়ী-খানা একরকম ফাঁকাতেই দাঁড়িয়েছিল। সামন্য দু'-একটা পাগড়ীপরা যাত্রী এধার-ওধার করছে, আর কালো কালো পোষাকপরা রেলের নিশাচর টি-টি-সি, গার্ড এবং এ-এস্-এম্ শ্রেণীর দু'-একটি সজীব যন্ত্র প্ল্যাটফরমের ওপর ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুদুর্ওয়াদি থেকে পাণ্ঢারপুর মাত্র তেত্রিশ মাইল। এই তেত্রিশ মাইল পথ আমাদের 'বসি লাইট রেলে' যেতে হবে। এই গাড়ীগুলো সরু লাইনের ওপর দিয়ে যায় বটে, কিন্তু তা' হলেও সেগুলো মন্দ নয়। ছোট এঞ্জিন হলেও চলে বেশ। আন্দাজ ছ'টা নাগাদ গাড়ী ছেড়ে আমরা পাণ্ঢারপুরে আটটার সময় পৌছলুম।

পাণ্ঢারপুরের নাম বোধ হয় অনেকের কাছেই নতুন ঠেক্‌বে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এই দেশটা পরম পবিত্র বলেই গণ্য হয়। এদের কাছে এই দেশটি পুরীর মতন প্রসিদ্ধ তীর্থ। এদেশী ভাষায় একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, পাণ্ঢারপুর ত্যাগ করে যারা অন্য তীর্থে ভ্রমণ করে, তারা হীরক ছেড়ে বালুকা গ্রহণ করে, বা গো-দুগ্ধ ছেড়ে লোকের দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা করে। পাণ্ঢারপুরেই বৈষ্ণব ও বৌদ্ধদের সমন্বয়ে প্রথম বৌদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়।

এদেশে মন্দিরের সংখ্যা অসংখ্য। প্রত্যেক মন্দিরই প্রাচীন এবং এখানকার কোন মন্দিরেই কারুকার্য্যের অভাব নেই। সব চেয়ে বিখ্যাত হলো এখানকার বিঠোবা বা পাণ্ডুরঙের মন্দির। সেই মন্দিরের সেবাইতরা সকলেই বৈষ্ণব। তাঁদের নাম বীর-বৈষ্ণব বা বৌদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁদের বিশ্বাস যে, পাণ্ডুরঙ বা বিঠোবা বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব। অবশ্য জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধকে নবম অবতার বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানকার হিন্দুরাও বুদ্ধকে নবম অবতার এবং বিষ্ণুকে মুল অবতারী কল্পনা করে' বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করেছে। এরা সম্পূর্ণরূপে অহিংসা-নীতি পালন করে চলে।

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হলেন পুণ্ডরীক। ইনি রামা-নুজের পরবর্ত্তীকালে এবং হয় ত বঙ্গদেশের চৈতন্যদেবের সমসাময়িকই হবেন। আধুনিক বিঠোবার মন্দির যে স্থানে স্থাপিত আছে, শোনা যায়, ওইখানেই না কি বিঠোবা দেব পুণ্ডরীককে একাদশী-তিথিতে মনুষ্য-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলেন; অর্থাৎ, আধুনিক বড় বিঠোবার মন্দিরের ওপর পুণ্ডরীক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

পাণ্ঢারপুর সহরটি মফঃস্বল টাউনের মতই বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। গঙ্গা যেমন কাশীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গেছে, পাণ্ঢারপুরকেও তেমনি ভীমা নদী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে বেষ্টন করে আছে। এখানকার এক পাণ্ডার কাছে এক সংস্কৃত শ্লোক শুন্‌লুম—যদিও তার উচ্চারণ কিছুই বুঝ্‌লুম না, তবুও সে এই বলে ব্যাখ্যা করলে যে,—ভীমা নদী ছিল একটি দেবদাসী এবং পাণ্ঢারপুর বিষ্ণুর এক পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন যখন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদয় হলো, তখন ওই দেবদাসী এসে ভক্তের কটি বেষ্টন করে ধরলে এবং আনন্দে দ্রবীভূত হয়ে নদীমূর্ত্তি ধারণ করলে। ব্রত-

ভক্তের অনুশোচনায় বিষ্ণুভক্ত ব্রহ্মচারী হতাশ হয়ে একেবারেই জমাট্ বেঁধে মাটী হয়ে গেলেন ; কিন্তু ভগবান বিষ্ণু ওই ভক্তের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাঁর দেহের ওপরেই অধিষ্ঠান হলেন এবং এই বলে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন—'তোমার সংস্পর্শে যারা আস্‌বে, তারা সকলেই পবিত্র ও আমার কৃপালাভে সমর্থ হবে।' সেইদিন থেকে এদেশে অপবিত্র বলে কোন জিনিষ আর রইল না ; অর্থাৎ, এদেশে কোন রকম জাত-বিচার নেই এবং এই দেশের মধ্যবাহিনী ভীমা নদী, পুণ্ডরীকের মন্দির, বিঠোবার মন্দির, এ সমস্তই মোক্ষলোভীদের পরম তীর্থ বলে গণ্য হলো।

পাণ্ঢারপুর বৈষ্ণবের দেশ। কিন্তু এদেশী বৈষ্ণবেরা তিলকসেবা করলেও গেরুয়া কাপড়ের পরিবর্ত্তে লাল কাপড় পরে। এখানে অনেক সংসারী-সন্ন্যাসী আছে ; অর্থাৎ, আমাদের দেশেয় ভিখারী বৈষ্ণবগোছের সম্প্রদায়। স্ত্রী-পুত্রও আছে, অথচ সন্ন্যাসীর মতন ভিক্ষাদিও করে। পাণ্ঢারপুরে প্রতি বৎসর দু'টি করে মেলা হয়—একটী আষাঢ় শুক্লা-একাদশীতে, অপরটী কার্ত্তিক শুক্লা-একাদশীতে—একাদশী-তিথি এখানে পরম পবিত্র বলে গণ্য। প্রত্যেক একাদশীতেই বিঠোবা-দেবের তিথি-পূজা হয়। এখানকার প্রধান দেবতা, অর্থাৎ, বড় বিঠোবার মন্দির অনেকটা জায়গার ওপর পাথরের প্রাচীর ঘেরা স্থানে অবস্থিত। এই প্রাচীর-ঘেরা স্থানের ঠিক্ মাঝখানে বিঠোবার মন্দির। এই মন্দিরের সাম্‌নে নাট-মন্দিরের চত্বরের অপর প্রান্তে ছোট একটী মন্দিরের মধ্যে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে—সেইটিই না কি পুণ্ডরীকের মূর্ত্তি। শিব ও বুদ্ধের সমন্বয়ে যেমন অনন্তদেবের সৃষ্টি, বিষ্ণু ও বুদ্ধের সমন্বয়ে এই বিঠোবার মূর্ত্তিও তেমনি অনন্তদেবেরই মত। অবারিত দেহ, নিমীলিত নেত্র, চতুর্হস্ত সমন্বিত এই মূর্ত্তি অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত। মূর্ত্তির ঠিক্ পেছনেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল—কিন্তু গবাক্ষহীন মন্দিরের মধ্যে সূর্য্যের জ্যোতি কোনদিনই প্রবেশ করে না। একটী বড় প্রদীপই বিঠোবার একমাত্র সম্বল। ঘরের মেঝেটি অপেক্ষাকৃত সমতল। দেওয়ালের গায়ে কি আছে ঠিক্ বোঝা গেল না—কিছু কিছু কারুকার্য্য আছে বলেই মনে হলো।

বিঠোবার মন্দির গাত্রের বাইরের দিক্‌টা বড় সুন্দর। পাথরের 'ওপর খোদাই করে' অনেক রকম বাহার করা। প্রত্যেক খোপের মধ্যেই ছাতা মাথায় দেওয়া হনুমানজীর মূর্ত্তি। মন্দিরের পেছন দিকে ছোট একটি নালা কাটা—নালার মধ্য দিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ছে ছোট একটি চৌবাচ্চায়। ভক্তেরা সেই চরণামৃত পান করে তৃপ্ত এবং ধন্য হয়।

বিঠোবার মন্দিরে ঢোক্‌বার জন্য বড় যে সিংহদ্বার আছে, সেই দ্বারের দুই পার্শ্বে এবং ভীমা নদীতে যাবার জন্য যে অপর একটী গেট্ আছে, তার দুই পার্শ্বে প্রশস্ত রোয়াক আছে। পুরী মন্দিরের সিংহদ্বারের পূর্ব্ব-দিকে, অর্থাৎ, রান্না-বাড়ীর সম্মুখে যেমন একত্র ভোজনের ব্যবস্থা আছে, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যেমন সকলেই সকলের মুখে ভাত দিয়ে আনন্দ করে, এখানেও ওই সব রোয়াকের ওপর তেম্‌নি একত্র ভোজন এবং একের অন্ন অপরকে খাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পাণ্ডাঠাকুর আমাদের খাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু আমাদের কেমন যেন ভক্তি হলো না। শেষে অন্নপ্রসাদ না নিয়ে চাপাটী প্রসাদ কাঁচা শাল পাতায় জড়িয়ে মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখা গেল। বাড়ী ফিরে গেলে যে-কোনো-দেবতায়-অসীম-বিশ্বাসবতী মায়েব কাছে এই শুক্‌নো চাপাটী যে মোহিনী মূর্ত্তি বিষ্ণুর অমৃত কলসের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে আমি সর্ব্ব কালে এবং সর্ব্ব সময়েই সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ।

বেলা প্রায় এগারটার সময় মন্দিরের কাজ সেরে আমরা বাসা, অর্থাৎ ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম। বড় বিঠোবার মন্দির ছাড়া আরও অনেকগুলি ছোটখাটো বিঠোবা, শিব এবং গণেশজীউ-এর মন্দির আছে। তবে সেগুলির কোন বৈশিষ্ট্য বা ইতিহাস নেই বলে' মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর বেশী ঘোরাঘুরি না করে সোজাসুজি ধর্ম্মশালা-তেই ফিরে আসা গেল।

ধর্ম্মশালার ধারে এক খাবারওয়ালা গরম গরম পুরি ভাজছিল। ভাত রাঁধার অনেক হ্যাঙ্গাম—হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল, সমস্তই চাই ; তার ওপর থালা কিম্বা পাতা—

লবণই বা কোথায় ? এদিকে ক্ষুধাও প্রবল ; কাজেই অধিক গবেষণা না করে একেবারেই তিনপোয়া পুরি, কিছু ভাজী এবং অল্প পরিমাণ মিঠাই কিনে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা গেল। খাওয়া-দাওয়া চল্‌ছে, এমন সময় ধর্ম্মশালার দারোয়ান এসে বল্লে—'বাবু 'মিল্ক' চাইয়ে ?'

বল্লুম—'ক্যাপিট্যাল্ আছে না কি ?'

সে বল্লে—'জী হাঁ।'

বল্লুম—'লেয়াও।'

সেরখানেক আন্দাজ সরপড়া দুধ সে কোথা থেকে নিয়ে এল—দাম চাইলে দু' আনা।

দু'জনে ভাগাভাগি করে খাওয়া গেল ; তারপর কৌটা থেকে এলাচ বার করে মুখে দিয়ে শীতের দুপুরে গায়ের কাপড় গায়ে দিয়ে নেওয়ারের খাটিয়ার ওপর ধর্ম্মশালার উঠানে সরকারী রৌদ্রে সে কেয়া আরাম করে শয়ন—একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ !

অল্প খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে যখন ওঠা গেল, বেলা তখন আন্দাজ তিনটে হবে। সুটকেশের মধ্যে পাতী লেবু ছিল, কেটে নিয়ে ওই লেবুর রস-সহযোগে এক গেলাস জল পান করে হাত-মুখ ধুয়ে জামা-টামা ঝেড়ে নিয়ে বালিশ-বিছানা গুছিয়ে স্ত্রীকে বল্লুম—'দেখো পূর্ণা, এবার চলো একবার কিষ্কিন্দাটা দেখে যাওয়া যাক্।'

সে বল্লে—'কেন, কিষ্কিন্দার কি এখনও কিছু বাকী আছে না কি ?'

বল্লুম—'হাঁ, আছে বই কি। এখান থেকে বেরিয়ে কুদ্দুর্ওয়াদি ষ্টেশনে বদলী হয়ে সেখান থেকে মাদ্রাজগামী ট্রেণে চড়ে বরাবর যেতে হবে গুণ্টাকল জংসনে। তারপর সেখান থেকে হস্পেট যেতে হয় ; হস্পেট থেকে ন' মাইল দূরে কিষ্কিন্দা ; দেখে ফিরে আস্‌তে আন্দাজ দিন দুয়েক সময় লাগ্‌তে পারে।

কথাগুলো গম্ভীর হয়ে শুনে, বেশ উপলব্ধি করে নিয়ে সে বল্লে—'তারপর, সেখানে আছে কি ?'

বল্লুম—'আছে ? আছে আর কি ? ধরে নাও, এমনি-ধারা একটা দেশ—সেখানে বালী-সুগ্রীবের রাজধানী বলে গোটাকতক কুঁড়ে ঘর হয় ত আছে, রাম-সীতার মন্দির একটা নিশ্চয়ই থাক্‌বে, সপ্ততাল ভেদের একটা কিছু নিদর্শন থাকা উচিত, এমনিধারা সব আছে।'

স্ত্রী বল্লে—'আচ্ছা, ওখানে কি হয়েছিল, সেইটে খুলে বলো দেখি।'

বল্লুম—'নাসিকে সূর্পনখার নাক কেটে নেওয়ার পর খর-দূষণের সঙ্গে রামের লড়াই হয়। তারপর ওইখান থেকে সীতাহরণ হয়। সীতাহরণের পর রাম লক্ষ্মণ ঘুরতে ঘুরতে এক শ' মাইল দূরে পুনার ওই পাঞ্চালেশ্বর মন্দিরে এসে তিনদিন পরে জলগ্রহণ করেন। তারপর তাঁরা সীতার অন্বেষণ করতে করতে কিষ্কিন্ধায় যান্—ওই কিষ্কিন্ধাই হলো হস্পেট জংসন। হস্পেটে গিয়ে হনুমানের সঙ্গে আলাপ ও বালীবধ হয় এবং সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব-স্থাপন করে তাঁরা সীতার সন্ধান সুরু করে দেন। হস্পেট থেকেই সুগ্রীবের অনুচরেরা ভারতে প্রেরিত হয় ; অর্থাৎ, সীতার সন্ধান কর্‌তে বানরগণ সারা ভারতবর্ষটা একবার 'সারভে' করে নেয়। তারপর সীতার সন্ধান পেয়ে সুগ্রীব ও রামচন্দ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এই হলো ব্যাপার।

বউ বল্লে—'বুঝেছি, আর অধিক বল্‌বার দরকার নেই। তা' আচ্ছা, এখান থেকে হস্পেট যাতায়াতের কত রেলভাড়া পড়বে ?'

বল্লুম—'সেকেণ্ড ক্লাশে গেলেও আন্দাজ প্রত্যেকের পঁচিশ টাকা মাশুল লাগ্‌বে বই কি।'

সে বল্লে—'বেশ, তুমি তা' হলে আমায় পঁচিশ টাকা দিয়ে নিজে একবার সুগ্রীবের সিংহাসনটা একা একা দেখে এস, আমি না হয় দু'দিন এই ধর্ম্মশালাতেই কাটিয়ে দেবো।'

অনেকক্ষণ আলোচনার পর ঠিক্ হলো এবার বাড়ী ফেরা হবে। কিন্তু ফেরার পথে দেহু, নাসিক, অজন্তা, ইরোলা এবং সম্ভব হয় ত সাঁচি দেখে যেতে হবে। যাই হোক্, আপাততঃ বেলা পাঁচটার সময় পাণ্ঢারপুর থেকে যে ট্রেণ কুদ্দুর্ওয়াদির দিকে যায়, সেইটাতে চেপে বসা গেল।

রাত্রি আটটা নাগাদ কুদ্দুর্ওয়াদিতে পুনরায় ফিরে আসা গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' ন'টার আপ্

মাদ্রাজ মেলে, অর্থাৎ, যে মেল মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই যায়, তাইতে উঠে বিছানা-পত্র না খুলে গায়ের কাপড়গুলো বেশ করে চাপা দিয়ে খুব সতর্ক হয়ে শুয়ে থাকা গেল।

রাত্রি একটা নাগাদ পুনরায় পুনা। মেল থেকে না নাব্লে ভোর ছ'টার সময় এই গাড়ীই আমাদের বোম্বায়ের 'ভি-টি'-তে পৌঁছে দিত; কিন্তু ওই যে দেহু এসে মাথায় ঢুকেছে, ওর জন্য সোজাসুজি বোম্বাই যাওয়া ত হবে না, ওইখানেই নাব্তে হবে। কিন্তু দেহু যেতে হয় শেলারবদি ষ্টেশন দিয়ে। শেলারবদি,পুনা ও কল্যাণের মাঝামাঝি ছোট একটা ষ্টেশন। সেখানে মেল দাঁড়ায় না; কাজে-কাজেই রাত্রি একটার সময় আমাদের পুনায় নাব্তে হলো। অবশ্য এই নাবার ব্যাপারে গার্ড আমাদের সাহায্য করেছিল; অর্থাৎ, পুনা ষ্টেশনে আমাদের দরজায় ঘা মেরে উঠিয়ে দিয়েছিল। 'গল্প-লহরী'র মারফৎ গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোন লাভ নেই; কারণ, তার হাতে 'গল্প-লহরী' পড়ার সম্ভাবনা খুব কম—পড়লেও সে এই অদ্ভুত বাঙ্লা ভাষার বিন্দু-বিসর্গও বুঝ্বে না।

রাত্রি একটার সময় পুনাতে নেমে শীতে, ঘুমে এবং পথশ্রান্তিতে অর্দ্ধমৃতপ্রায় হয়ে ওয়েটিং-রুমের দু'খানা বেঞ্চে দু'জনে আশ্রয় নিলুম। স্ত্রী বেচারা মনে মনে দেহুর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সৎকার করতে করতে এবং নিশ্চয়ই প্রেম ছাড়া আমার উদ্দেশে অন্য কিছু জ্ঞাপন করে শয়ন মাত্র নিদ্রালাভ করলেন। আমিও সুটকেশে চাবি দিয়ে সেটাকে আমার বেঞ্চের পায়ার সঙ্গে একটা লোহার শেকলে বেঁধে সেই চাবিটা সোয়েটারের পকেটে ভরে তার ওপর ওভারকোটটা চাপিয়ে সেটার সব ক'টা বোতাম এঁটে এবং পায়ে উলের মোজা পরে সাম্নের বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। দেড়টার পর থেকে সেই যে ঘুমিয়েছি, একেবারে সকাল ছ'টা।

ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি ওইখানেই সেরে নেওয়া গেল। তারপর দু'জনে সামান্য কিছু জলযোগ করে সাড়ে ছ'টার পর যে প্যাসেঞ্জারটা পুনা থেকে ছাড়ে সেইটায় চেপে বসা গেল। পুনা থেকে শেলারবদি মাত্র পনের মাইল। বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় শেলারবদি ষ্টেশনে এসে নামা গেল।

শেলারবদি থেকে দেহু প্রায় চার মাইল। ষ্টেশনটি নেহাতই ছোট। অত্যন্ত নীচু প্ল্যাট্ফরম। ষ্টেশনে এক-খানি মোটর এবং কয়েকখানি টাঙ্গা ছিল। আমরা একখানা টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

দেহুগ্রাম বিখ্যাত কবি তুকারামের জন্মস্থান। প্রসিদ্ধ ভক্ত ও সাধু তুকারাম দেহুগ্রামে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত বিঠোবার পরম ভক্ত ছিলেন। মাতৃ-বিয়োগের পর তুকারাম বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে বাকী জীবন বৈষ্ণব-বীরের ন্যায় সংসারী-সন্ন্যাসীরূপেই কাটিয়ে দেন।

দেহুগ্রামে সাধারণ দর্শকের চারটি স্থান দেখ্বার আছে। আমরা টাঙ্গা করে ওই চারটি জায়গাই দেখে নিলুম—প্রথমতঃ, তুকারামের মন্দির; দ্বিতীয়তঃ, বিঠোবার মন্দির; তৃতীয়ত এবং চতুর্থতঃ, ভাণ্ডার ও ভামগিরি। এদের কথাই একে একে বল্ব।

তুকারামের মন্দিরটি নিতান্ত ছোট। শোনা গেল, তাঁর মন্দির এখন যে স্থানে অবস্থিত, ঠিক্ ওইটাই ছিল তুকারামের জন্মভূমি ও বসতবাটী। আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল বলে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর আদৌ বনিবনাও ছিল না। তিনি অনবরতই তুকারামকে বিরক্ত করতেন। 'উওম্যান্' শব্দের ব্যুৎপত্তি বোঝাতে গিয়ে একদিন আমার 'উওম্যানে'র কাছে বেকায়দায় পড়েছিলুম। আজ তুকারামের প্রসঙ্গে তাঁর পত্নীর কথা উত্থাপন কর্তে গিয়ে পুনরায় সেই পূর্ব্বভাবের প্রকাশ পেল। 'অলমতি বিস্তরেন' নীতি অনুসারে এ বিষয়ে আর অধিক বাড়াবাড়ি করলুম না।

তুকারামের মন্দির থেকে সামান্য দূরেই বিঠোবার মন্দির। পাণ্ঢারপুরের বিঠোবার মন্দির অপেক্ষা এ মন্দির আয়তনে অনেক বড়; তবে আসল দেবতার স্থানটুকু পাণ্ঢারপুর মন্দিরের মত অত কারুকার্য্যসম্পন্ন নয়। দেবতার মূর্ত্তি পাণ্ঢারপুরের বিঠোবারই মত; তবে বোধ হয় সামান্য ছোট হবে। উপরন্তু, এখানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানজীর মূর্ত্তিও আছে।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই উঠান। সেটি আগাগোড়া পাথরের টালি পাতা। অল্প উঁচু-নীচু হলেও আগাগোড়া ভাল-

ভাবে ধোয়া। সকালের সূর্য্যকিরণ বিঠোবা মন্দিরের চূড়ায়, উঠানে, এবং পাশের নিমগাছে পড়ে' মোটের ওপর স্থানটি কবির উপাস্য দেবতার নিকুঞ্জ বলে শ্রদ্ধা এবং শান্তির উদ্রেক করে।

সকাল সকাল মন্দির দেখে আমরা বাসায় ফিরে আহারাদির যোগাড় করে নিলুম। কাল থেকে পুরী খেয়ে খেয়ে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছি। ওখানে অনেক সন্ধানের পর ভাত খাবার একটা উপযুক্ত হোটেল আবিষ্কার করে সেখানে গিয়ে ওঠা গেল। ভাত খাওয়া অর্থে শুধু ভাতই খাওয়া; সঙ্গে আলু ও পিয়াজ ভাজী ছাড়া আর যে সমস্ত অজ্ঞাত তরকারীগুলো দিলে, তার স্বাদ এবং রূপ দুই-ই আমাদের কাছে অভূতপূর্ব্ব। সে সমস্ত বাদ দিয়ে লবণ, ঘৃত এবং টক্‌ দধি-সহযোগে ভাত খাওয়ারূপ বিড়ম্বনাটা সত্বর সেরে নিলুম।

খাওয়ার পর আমরা বেরুলুম পাহাড় দেখ্‌তে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যা' কিছু দেখ্‌বার জিনিষ 'এমেরিক্যান্‌ টুরিষ্ট'দের মত সবটুকু চটুপটু সেরে নিয়ে সন্ধ্যার পর ট্রেণে গিয়ে চেপে বসা—কাজেই একটুও বিশ্রাম না নিয়েই পাহাড় দেখ্‌তে বেরোন হলো।

ভাণ্ডার ও ভামগিরি নামক পাহাড় দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত। আয়তনে দু'টিই ছোট—নীচু নীচু সিঁড়ি দিয়ে যে কোনো লোকই অতি সহজে এই সব পাহাড়ে উঠ্‌তে পারে।

ভাণ্ডারগিরির ওপর একটি বিঠোবার মন্দির এবং কালো পাথরের একটি বেদী আছে। এই বেদীর ওপর ধ্যানস্থ হয়ে বসেই না কি তুকারাম প্রথম বিঠোবার দর্শন পান। জীবনকালে অধিকাংশ সময়ই না কি তিনি এই পাহাড়ে অতিবাহিত করতেন। এখানে এখন একটি ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার দারোয়ানের ব্যবহার বেশ ভাল। পাণ্ডাদেরও কোনরূপ অত্যাচার বা চাহিদা নেই।

ভামগিরি, ভাণ্ডারগিরিরই মত। উভয় পর্ব্বতের মধ্যে দূরত্ব অতি সামান্য। এই পাহাড়ের ওপরেও বিঠোবার একটি মন্দির অবস্থিত। এখানে ছোট একটি গুহা আছে। শোনা গেল, এই গুহায় না কি তুকারামের প্রধান ভক্ত মারহাট্টা বীর শিবাজী ও রামদাস স্বামী অনেক দিন বসে বসে তুকারামের স্বরচিত ভজন ও কীর্ত্তন শুন্‌তেন। ভামগিরির যা' কিছু মন্দির বা সিঁড়ি সমস্তই না কি শিবাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই পাহাড়ের ওপরেও একটি ধর্ম্মশালা আছে। তবে যাঁদের দু'-চারদিন বাস করার মত সময় এবং উৎসাহ আছে, তাঁদের পক্ষেই ওখানে থাকা সম্ভব; কারণ, আমাদের পক্ষে কুলী খরচ করে তল্পিতল্পা টেনে তোলা এবং নাবানোর মেহনৎ পোষায় না।

পাহাড় দুটো ঘুরে আমাদের বাসায় ফির্‌তে আন্দাজ সাড়ে চারটে বেজে গেল। সারাদিন রৌদ্র ও ধূলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম যে, আর নড়্‌তে পর্য্যন্ত ইচ্ছে করছিল না। টাইম-টেবল খুলে দেখা গেল—রাত্রি একটার সময় একখানি মাত্র ট্রেণ আছে, যাতে চাপ্‌লে পরদিন সকাল সাতটায় বোম্বাই পৌছান যায়। সুসংবাদটা স্ত্রীকে শোনালুম। সে তখন অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে কম্বলের ওপর বসে বসে তার হাতের বড় বড় নখগুলির দিকে দেখ্‌ছে। আহা, বেচারার ক'দিন যাবৎ স্নান করা হয় নি! শীত এবং তাড়াতাড়ির হ্যাঙ্গামে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত পা পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নি। কোনোরকমে খাওয়া, আর নাকে দড়ি দিয়ে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে ক'দিন ধরে ছন্নছাড়া যাযাবরের মতো কোথায় যে ঘুরে মরছি, তার কোন ঠিক্‌ই নেই। এবার যেন আমারও কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কোল্‌কাতায় আমার ছোট বাড়ীটার কথা মনে পড়্‌ল। সেখানে আমার বিছানার ওপর গরীবের সামান্য ছোট বালিশ, এবং লেপখানির কথা মনে পড়লো। শীতের সন্ধ্যায় উনানের ধারে বসে গরম গরম সেঁকা লাল আটার রুটী, ডাল ও আলু ভাজার কথাও মনে পড়্‌ল, আর সেই সঙ্গেই মনে পড়্‌লো আমার ভ্রমণ-কাহিনী এবং বাইরের ঘরের চৌকীতে বসে আমাদের সার্ব্বজনীন বড় দা'র সঙ্গে নানা গল্প-সহযোগে প্রুফ্‌ দেখার আনন্দ। মানুষগুলো কেন যে সুখে থাকৃতে ভূতের কিল খাবার জন্য ঘরের পয়সা খরচ করে' বিদেশে অচেনা বিপদের মধ্যে সখ্‌ করে হট্টরে মরে, তার কোনো সদুত্তরই আমি ভেবে পেলুম না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেই পুরোনো ধূলোমাখা সতরঞ্চির মধ্যে কালো কালো কম্বলগুলো ভরে নিয়ে শেলারবন্দি ষ্টেশনের দিকে রওনা হওয়া গেল। চার মাইল মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এ দেশের ধূলি-বহুল পথ অতিক্রম করে ফাটা ঠোঁট এবং ভাঙা মন নিয়ে আমরা যখন ষ্টেশনে এসে পৌছলুম, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে গেছে। রাত্রি একটার সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেণের কামরা খুলে বেঞ্চিগুলো ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে বসা গেল। আশা হলো, পরদিন সকালে পুনরায় বোম্বায়ের 'ভি-টি'-তে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যাবে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেতাত্মা

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

সায়াহ্নকাল। সে আঁধারে দিক্‌চক্রবাল নিশ্চিহ্ন। বন-টিয়া ডেকে ওঠে নদীর শ্যামল তটে। চন্দনা গায়। উভয় তীরে সারি সারি তরুরাজি। বিস্ময়-ভরা চোখে তারা চায় ব্রীড়াময়ী পল্লী-বধূর মত।

আমার নৌকো ভাসে নদীর মাঝে।

একরাশ মেঘ জমে ওঠে উদার আকাশ তলে। ঘন কালিমায় দিগন্ত ছেয়ে যায়। কিছুই দেখা যায় না আর। বাতাস গর্জ্জে ওঠে—যেন ক্রোধান্ধ দানবের হুঙ্কার। ধূলি-মলিন পৃথিবী কেঁপে ওঠে যেন তার পদভারে। মেঘ-জটাভার আলোড়িত হয়।

—জোরে বৈঠা দে ভাই—ওই হোথাকে খাল। শীগ্‌গির পার হতে হবেক্। যে আঁধার!—মাঝি বলে ওঠে। উদ্বেল তার কণ্ঠস্বর।

মুহূর্ত্তে সকলে চকিত হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরা কাঁপ্‌তে থাকে। রক্তহীন মুখে ফুটে ওঠে ভয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। প্রাণপণে দাঁড় টানে তারা।

পরক্ষণেই সুরু হয় প্রলয়ের রুদ্রলীলা। কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব-নর্ত্তন। আকাশ ভেঙে পড়ে যেন। সবেগে তরু শীর্ষ দুলে ওঠে। সে কী দুর্য্যোগ! প্রকৃতির সে কী ভয়ানক মূর্ত্তি!...

ভীত কম্প-কণ্ঠে বলে উঠি—ওরে মাঝি, এখানেই নৌকো বাঁধ। এত ঝড়-জলে যাওয়া ঠিক্ নয় এখন। পাড়ে লাগা।

—হেথাকে নয় বাবু, হেথাকে নয়। হেথাকে রইলে সবাই মরবেক। তিন ক্রোশ পিছনে চান্দিগ্রাম আছে। হুকুম করেন ত বাবু, সেথাকে ফিরে যাই। ঝড়-জলে ভরি না—গাঁয়ে পৌঁছিয়ে দেব ঠিক্—কিন্তু হেথাকে মোরা রইতে লারবো বাবু—মাঝি বলে ওঠে।

সম্প্রসারিত শীর্ণকায়া খাল। যেন দয়িত-বিরহ-বিশীর্ণা। অসহ যন্ত্রণায় সে ডুকরে কাঁদে যেন। সর্ব্বহারার দৃষ্টি জ্বল্‌তে থাকে নিরশ্রু তার নয়নে। গভীর বন দু'তীরে।

বলে উঠি—তা' হয় না মাঝি, বৈঁচিপুরে কাল সকালে পৌঁছতেই হবে। সেখানে বন-জরীপের কাজ সুরু হবে। নৌকো এখানেই বাঁধো। এত ঝড়-জলে নৌকো ভাসিয়ে প্রাণটা ত দিতে পারি না আর।

—মাপ্ করেন বাবু, হেথাকে নয়।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠি—এর পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। তোমাদের ওপরওয়ালাদের কাছে রিপোর্ট করে দেব কালই। ভাড়াটে নৌকো ত নয়। মাস মাস মাইনে খাও; অথচ, কাজের সময়—

বিনা বাক্যব্যয়ে এবার তারা নৌকো বাঁধে।

ঝড়ের দোলায় সেটা দুল্‌তে থাকে বারবার। কোনও বাধা, কোনও নিষেধ সে মানে না—যেন অশান্ত মাতাল

নিরন্ধ্র আঁধারে আকাশ ছাওয়া। নিথর, নিস্পন্দ চারিধার। লোক-বসতির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। জনপ্রাণীর সাড়া নেই, শব্দ নেই। জলোচ্ছ্বাসের অবিশ্রান্ত ধ্বনি কেঁদে বেড়ায় কানের চারপাশে। উন্মাদ হাওয়া গর্জ্জন করে ভীম-রবে। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু আঁধার। সে অতল অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে শুধু আমরা ক'টি প্রাণী।

মাঝিরা নির্ব্বাক। ভয়ে অভিভূত, মুহ্যমান।

অস্বাচ্ছন্দ্যে মন ভরে ওঠে। চেঁচিয়ে বলি—আলো জ্বাল্ মাঝি। এত অন্ধকারে মানুষ বাঁচ্‌তে পারে!

সেদিন সে কী অন্ধকার! পাশের লোককেও চেনা যায় না।

মাঝি একজন উঠে ধীরে ধীরে ছয়ের তলে তেলের কুপি জ্বালে। সে আলোকধারা বিকীর্ণ হয় তাদের ভয়-পাণ্ডুর মুখের 'পরে। নদীর চল-চঞ্চল জলে সে রশ্মি ঝিক্‌মিক্ করে

হীরকখণ্ডের মত। সারা মনটা অপার অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে।

সামান্য তেলের কুপি—তবু, তবু ওটা মূল্যবান সেদিন! কত যেন তার ঔজ্জ্বল্য—কত যেন দীপ্তি!

সহসা কোথায় একটা ভয়ানক শব্দ হয়। দিক্‌দিগন্ত কেঁপে ওঠে সে ধ্বনিতে—যেন প্রলয়ের হুঙ্কার। পিনাক-পাণির বজ্র কণ্ঠধ্বনি।

কম্প্র-কণ্ঠে বলে উঠি—পাড় ভাঙার শব্দ শোন্ মাঝি, আর এগুলে কী সর্ব্বনাশই ঘট্‌তো! এতক্ষণে মাটির তলে চাপা পড়ে হয় ত—

কথা কিন্তু শেষ হয় না আর। উদ্দাম বাতাসে কুপিটা নিবে যায়। ঘনঘোর আঁধারে পৃথিবী আবার ভরে ওঠে—যেন সৃষ্টির আদিম কাল।

নৌকো সবেগে দুলে ওঠে পুঞ্জীভূত ফেন-ঘন উর্ম্মির 'পরে। কা'রা সবেগে যেন নেমে যায় শঙ্কা-চঞ্চল চরণ-ক্ষেপে। তাদের সে কী ব্যস্ততা, কী চাঞ্চল্য!...

চীৎকার করে উঠি—ওরে আলো জ্বাল মাঝি, আলো জ্বাল!

কথাগুলো রাতের আকাশেই মিলিয়ে যায়।

মাঝিরা তখন পালায় বহুদূরে। তারা ছোটে উর্দ্ধশ্বাসে—ফিরেও চায় না—ঝড়-বৃষ্টি মানে না। প্রাণভয়ে ব্যাকুল তারা—যেন বাধা-বন্ধহারা উন্মাদ পাগল!

নিঃসঙ্গ রাত্রি। বিহ্বল—নিষ্ক্রিয়। চল্‌বার সামর্থ্যও নেই যেন। পঙ্গু, অসাড়ের মত বসে বসে অনুভব করি আপনাকে। দ্রুত-স্পন্দনশীল বুকে অনুভব করি ক্ষীণ জীবন।

তারপর সবই তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল আঁধার গর্ভে। নয়ন পল্লব ভারী হয়ে ওঠে ঘুমে।

নীরবে প্রহর গড়িয়ে যায় নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে।

বোধ হয় মধ্যরাত্রি তখন।

ঝিল্লীর একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসে বাতাসে। চতুর্দ্দশীর চাঁদ হাসে নভ-অলিন্দে। অসংখ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করে নীলাকাশে। তাদের স্তিমিত দ্যুতি ঝরে পড়ে ধরণীর শ্যামাঙ্গে।

সন্ধ্যার সে দুর্য্যোগের স্মৃতি মনেও থাকে না তখন। হঠাৎ একটা ক্রন্দন রবে ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন ডুক্‌রে ডুক্‌রে ফুলে ফুলে কাঁদে—অবিশ্রান্ত কাঁদে!

উঠে বসি। কিন্তু এ কী!...

অনিন্দ্যসুন্দরী সে নারী। মাধুর্য্য ঝরে তার সারা অঙ্গ বেয়ে। আলুলায়িত তার কুন্তল। আধ-বিধুবর ললাট। রোদনারুণ নয়ন। মুক্তা-শুভ্র অশ্রুধারা গড়ায় তার রাঙা কপোল বেয়ে।

আমায় সে ডাকে তার মৃণাল বাহু সঞ্চালন করে; কঙ্কন ঝল্‌মল্ কর্‌তে থাকে রজত-শুভ্র চন্দ্রালোকে।

বুঝি বা বিপর্য্যস্তা নারী। সাহায্যের আশায় ডাকে, কিংবা হয় ত পথভ্রান্ত।—মনে মনে ভাবি।

তারপর নেমে পড়ি কখন।

শূন্য নৌকো দুল্‌তে থাকে নদীর নিস্তরঙ্গ জলে। ধূলি-ধূসর ধরণী তার চরণ স্পৃষ্ট হয়। পদাঙ্ক রেখা জাগে শ্যাম দূর্ব্বাদল 'পরে। সে বলে ওঠে—এস, ও গো এস!...

সে কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হয় কানের চারপাশে।

উৎসাহে মন ভরে যায়। নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্তা সে। করুণ-কাতর-আহ্বান-ধ্বনি। দ্রুত তার অনুগমন করি।

সে চলে। লীলা-চঞ্চল তার চলার ছন্দ। মণি-মঞ্জীর বেজে ওঠে সে নৃত্য-চপল ছন্দে। ঘন কুন্তল তার খেলা করে পন্নগ শিশুর মত। কটিতটে মেখলা বাজে। তারি তালে তালে নিতম্ব দোলে।

জ্ঞানহারার মত ছুটে চলি। ছুটি আর ছুটি—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই! জীবনে এ চলার শেষ নেই যেন।

তরু-শির কেঁপে উঠে বুঝি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়। তার স্বরে রাতজাগা পাখী ডাকে। সে কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হয় দিক্‌দিগন্তে।

পথ প্রান্তর অতিক্রম করে ছুটি আর ছুটি!

সে কী দুর্ভেদ্য ঘন বন—দিনের আলোও প্রবেশ করে না সেথায়। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলি। শরীর অবসন্ন

হয়ে আসে। সারা অঙ্গ ভেঙে পড়ে অবসাদে। নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তবু ছুটি।

নদীতীরের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। শুধু সম্প্রসারিত দুর্গম অরণ্য। সাড়া নেই, শব্দ নেই, মানুষের সামান্য পদধ্বনিও শোনা যায় না। নিথর, নিস্পন্দ সব।

একটা লতাকুঞ্জের অন্তরালে প্রাসাদের ধ্বংস স্তূপ বিরাট দানবের মত হাসে মুখ-গহ্বর উন্মুক্ত করে। চারিপাশে অগণ্য নরকঙ্কাল।

ভয়ে চীৎকার করে উঠি—ও গো, কোথায় তুমি, কতদূরে!··

চারিদিকে প্রতিধ্বনি হয়—কোথায়, কতদূরে!···

আতঙ্কে মন ভরে ওঠে। কিন্তু এ কী—কোথা' সে সুন্দরী রমণী! সারাদেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে! ভয়ে চক্ষু নিমীলিত হয়ে আসে। কে এ? কার পেছনে ছুটি উদ্‌ভ্রান্তের মত? উদ্বেল আশঙ্কায় সারা শরীর কাঁপ্‌তে থাকে। সে যুবতীর চিহ্নমাত্রও নেই কোথায়! চীৎকার করে উঠি। তারপর কিছুই মনে থাকে না আর।···

নব-সূর্য্য-কিরণ-ধারায় পৃথিবী স্নান করে তখন। বিহঙ্গ কল কণ্ঠে মুখর হয়ে ওঠে চারিদিক। কা'দের কণ্ঠধ্বনি ভেসে বেড়ায় ভোরের বাতাসে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিহ্বলের মত চেয়ে থাকি শুধু।

অনেক লোকজনে সে ঘর ভ'রে ওঠে। আমার মাঝিরাও দাঁড়িয়ে থাকে উদ্বেগ-আকুল অন্তরে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে যায় সব। উত্তেজনায় শরীর কাঁপ্‌তে থাকে। নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে উঠে বসি।

—থাক্ থাক্, উঠবেন না মশায়, সুস্থ হোন্ আগে। হীরু আমার ওষুধের বাক্সটা?—ডাক্তার বলে ওঠেন।

হীরু বাক্সটা আনে। ডাক্তার বল্‌তে থাকেন—মাঝিদের জন্যই আপনি প্রাণটা ফিরে পেয়েছেন মশায়। ওরা খুব ছুটোছুটি করেছে। লণ্ঠন আর লোকজন নিয়ে সারা জঙ্গল খুঁজে বেড়িয়েছে। খুব ভাগ্য ভাল আপনার যে, সাপখোপ কিছুতে কাটে নি।

—আমাগোর দোষ লেবেন্ না বাবু। ডর লেগেছিল—কিন্তু পালাই নি। কত কইলাম বাবু, আপনি ত কথা শুন্‌লেন না। তারপরে কুপিটা নিবে গেল—বড় ডর লাগ্‌লো বাবু তখন। ছুট্যে লাগ্‌নু চান্দি গাঁয়ে। রাত অনেক তখন। সেথা থেকে লোকজন আনি—কিন্তু নৌকো ফাঁকা; কেউ কোথাকে নেই! তাড়াতাড়ি ছুইতে লাগি ছোটবাবুদের বাগান—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানেই ত লোকজন ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। উঃ, অনেকগুলো লোক মেরেছে মশায়!—হীরু বলে ওঠে মাঝিদের নিরস্ত করে।

কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করি—কে ছোটবাবু?

চঞ্চলভাবে সে চারিদিকে চায়। তারপর বল্‌তে সুরু করে—

সে অনেক কাল আগের কথা। দুই ছেলে রেখে জমিদার শিব রায় মারা যান্। তাঁর দুই ছেলে—বড় রঞ্জন আর রণজিৎ ছোট। দু'ভায়ে বনিবনা ছিল না মোটেই। শিব রায় মারা যাবার বছর দুই পরে তাঁরা পৃথক হয়ে যান্। দুই সরিক।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার মধ্যিখানে প্রাচীর গাঁথা হলো। কিন্তু সে বাড়ীর কিছুই নেই আর—শুধু ইট আর কাঠের পাঁজা স্তূপাকারে পড়ে আছে। তার ফাঁকে কত বন্য-জন্তু বাস করে। আগে যেখানে ছিলো হাট-বাজার, বড় বড় বাড়ী-ঘর—আজ সেখানে খভীর, গভীর বন। বাঘ সাপের আস্তানা। শ্মশান হতেও সে স্থান এখন ভয়ানক। দিনের বেলায়ও মানুষ যায় না সেখানে।

রঞ্জনের দেওয়ানের নাম ছিল পান্নালাল—ধূর্ত্ত, শয়তানের রাজা। রঞ্জনের জমির পিপাসা প্রবল তখন।

পান্নালাল কথা কয় রঞ্জনের ঠিক্ কানের কাছে খুব নীচু স্বরে। তারপর রঞ্জন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলেন—তা' হয় না পান্না, পাঁচ হাজার টাকা ত বড় অল্প নয় —আর তা' ছাড়া, হাজার হোক্ ছোট—

তাড়াতাড়ি পান্নালাল বলে ওঠে—পয়সা একটাও দিতে হবে না আপনাকে। ও শুধু নামেই। তবে বুদ্ধির আর কদর কই? হাঃ হাঃ, সব ঠিক করে রেখেছি—এখন কথাটি আর নয়! তারপর বুঝ্‌লেন না, যাকে বলে এক ঢিলে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

এমনি করে কিছুদিন গড়িয়ে যায়। পূজোর সময় এগিয়ে আসে ক্রমশঃ।

ছোটবাবু রণজিৎ রায়ের বাগান তখন পরিষ্কার হতে থাকে।

বাগান সেটা ঠিক্ নয়। শিব রায়ের পূর্ব্ব-পুরুষের বসত-বাড়ী। কি জন্যে জানি না, শিব রায় আবার একখানা বাড়ী তৈরী করেন। সেই নতুন বাড়ীতেই তিনি বাস করতেন। কিন্তু পূজা-পার্ব্বণ যা' কিছু সেই আদি বাড়ীতেই হতো। সে কী প্রকাণ্ড বাড়ী! চারিধারে প্রাচীর। প্রকাণ্ড চণ্ডী-মণ্ডপ। সামনের দিকে শিব রায়ের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাস করতেন। পেছনে তার মস্ত বাগান। সেখানে কেউ বড়-একটা যায় না। শিব রায়ের মৃত্যুর পর ছোটবাবুর ভাগে সে বাড়ী পড়ে।

বৎসরে এই একবার মাত্র বাড়ীটা কোলাহলে ভরে উঠ্‌তো—পূজোর সময়েই। তারপর আবার সব নিঝ্‌ঝুম, নিস্তব্ধ—যেন সীমাহীন শূন্যতায় ভরা। তখন এ বাড়ীতে ঢুক্‌তেও ভয় লাগ্‌ত মশায়। ঘরগুলো সব খাঁখাঁ করত। চামচিকা বাসা বাঁধত। বাড়ীর মধ্যকার সুড়ঙ্গগুলো 'হাঁ' করে গিল্‌তে চাইত যেন। জন-প্রাণীর সাড়া নেই, শব্দ নেই।

ছোটবাবুর বারদোষ ছিলো। লোকে অনেক কথাই তাঁর নামে বল্‌তো। কোথায় না কি তাঁর এক বাইজি ছিলো। দেখ্‌তেও বেশ সুন্দরী। নাম তার মতিবিবি। ছোটবাবু তাকে ভালবাস্‌তেন। আর সেও না কি ছোট-বাবুকে ভালবাসতো খুব। আর বাসবে নাই বা কেন? অগাধ সম্পত্তির মালিক, কাঁচা বয়েস, তার ওপর অবিবাহিত। যাই হোক্ মশায়, লোক ভাল ছিলেন তিনি। সকলের দুঃখ-কষ্ট বুঝ্‌তেন। দায়-অদায়ে হাত পেতে দাঁড়ালে বিমুখ করতেন না কা'কেও।

ছোটবাবুর বাগান-বাড়ীতেই পূজো হতো।

মহাষ্টমীর রাত্রি। সারাদিন হল্লার পর ছোটবাবুর বন্ধু-বান্ধবেরা ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের মুখের মদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

সারাক্ষণ নাচ-গানের পর মতিবিবিও তখন ক্লান্ত, অবসন্ন। ধীরে ধীরে সেও শুয়ে পড়ে।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে ওঠে। সব নিস্তব্ধ—শুধু ঝিল্লীর একটানা গুঞ্জন বাতাসে ভেসে আসে।

ধীরে ধীরে মতিবিবি ওঠে। খুব ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে। তারপর সে কোথায় বেরিয়ে যায়। এত সাবধান সত্বেও পায়ের নূপুর বেজে ওঠে—ঝুমুঝুম্, ঝুমুঝুম্।

ছোটবাবু কিন্তু ঘুমোন নি। সবই জান্‌তে পারেন। সন্দেহ দোলায় মন তাঁর দুল্‌তে থাকে। তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তারপর তার অনুসরণ করেন।

প্রাচীন সুড়ঙ্গের মুখে নিঃশব্দে তিনি যান্। গিয়ে দেখেন—ভেতরে মতিবিবি যেন কার কণ্ঠলগ্না। বুঝি—পান্নালালের।

ছোটবাবু ক্ষেপে ওঠেন। শিরায় শিরায় তাঁর রক্তস্রোত ছুটতে থাকে। যেন পাগল তিনি, উন্মাদ!...

তীরবেগে ছুটে যান্ সুড়ঙ্গের মধ্যে। কিন্তু জানেন না কী নির্ম্মম চক্রান্ত করা হয়েছে তাঁকেই মারবার জন্য।...

নিমেষে পিছনের দ্বার বন্ধ হয় সশব্দে। বিমূঢ়ের মত ছোটবাবু চেয়ে থাকেন শুধু। মতিবিবি আর পান্নালাল পালায়—তাঁর আয়ত্তের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে সে কবাটও বন্ধ হয়ে যায়।

রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি—তারপর?

তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে আসেন রঞ্জন আর একদল রাজমিস্ত্রী। অচঞ্চল হাতে গাঁথতে থাকে তারা—একটার পর একটা ইট দিয়ে সুড়ঙ্গের দুই দ্বার বন্ধ করে দেয়। ওঃ, ছোটবাবুর সে কী বুকফাটা হাহাকার! রুদ্ধ দ্বার সুড়ঙ্গের বাইরে তিনি আর আসেন নি কোনও দিন।

চটুল হেসে মতিবিবি বলে—আমার পারিশ্রমিকটা রঞ্জনবাবু।

—ঘরে চলো বিবি, সেখানেই তোমার সব পাওনা-গণ্ডা

মিটিয়ে দেবো। হাঃ হাঃ, দেনা-পাওনার দিন—নগদ পাঁচ হাজার টাকা একেবারে! ফূর্ত্তিটুর্ত্তি একটু করা দরকার, বুঝ্‌লে না। এতবড় কাজ যখন নির্ব্বিঘ্নে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! চলো বিবি, ঘরে চলো—পান্নালাল বলে ওঠে।

তারপর একতাড়া নোট নিয়ে রঞ্জন বলেন—এই নাও বিবি-সাহেব, এগুলো তোমার। কিন্তু, বোতল কই বিবি?

পান্নালাল মদ ঢালে। চঞ্চলভাবে চারিদিকে সে চায়। কি একটা গুঁড়ো মেশায় মদের সঙ্গে।

অসঙ্কোচে মতিবিবি পান করে। তার মাথা টলে ওঠে; সারাদেহ অবশ হ'য়ে যায়—কিন্তু সে বুঝ্‌তে পারে তাদের ষড়যন্ত্র। বিষের ক্রিয়া সুরু হয় তার দেহে।

রঞ্জন তখন বিক্ষিপ্ত নোটগুলি কুড়ুতে থাকেন।

স্খলিত চরণে মতিবিবি দাঁড়িয়ে ওঠে। রঞ্জন জানেন না কিছুই। তারপর, এক করুণ আর্ত্তনাদ ওঠে রাতের আকাশ তলে। রক্তধারায় রঞ্জনের বুক ভিজে যায়। কাতর চীৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়।

কিন্তু মতিবিবি মরে নি মশায়। সে আজও বেঁচে আছে। অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় সে এখনও কেঁদে বেড়ায় নদীর তীরে। নিজের পাপের কথা প্রকাশ করতে চায় সে। মরবার সময় কা'কেও জানাতে পারে নি রঞ্জন রায়ের ষড়যন্ত্র—তাই সে তীরে তীরে ঘুরে বেড়ায়। যে কা'কেও দেখে, তাকেই সে নিয়ে যায় সে সুড়ঙ্গের কাছে ছোটবাবুর বাগানে। এক নিশ্বাসে হীরু কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকে।

হাঃ হাঃ রবে ডাক্তার হাসেন। বলেন—বেশ আজগুবি গল্পটা বনিয়েছ হীরু। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ওর নাম—'সম্‌নাম্‌বিউলিসম্‌।' কিছু নয়, কিছু নয়—ওটা একটা রোগমাত্র। ঘুমের ঘোরে লোকে লাফালাফি ছুটোছুটি করে। তা' ব'লে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

আমার মন বিষাদে ভরে ওঠে। শুয়ে শুয়ে ভাবি—এই নৃশংস, ভয়াবহ-কাহিনী, করুণ, মর্ম্মস্পর্শী ইতিবৃত্ত।

ডাক্তার তখনও হাসেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

বৃক্ষশ্রেণীর আয়ু

অশ্বত্থ, বট, পাকুড়	৫০০০ বৎসর
তাল গাছ	৩০০০—৫০০০ "
দেবদারু	৭০০—১২০০ "
ওকবৃক্ষ	৪০০ "
আইভিলতা	২০০ "

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হতাহত সংখ্যা

		হত	আহত
১।	আমেরিকা	৩৬,১৫৪	২১৭,৯৪২
২।	সার্ভিয়া	৩৫০,০০০	১২০,০০০
৩।	রুষিয়া	১৭০০,০০০	৯,১৮৫,০০০
৪।	ইটালী	৪৬০,০০০	১,৫০০,০০০
৫।	ফ্রান্স	১,০৬২৩০০	৫,২০০,০০০
৬।	বৃটিশ	৬৫৮,৭০৪	৩,০৪৯,৯৯১

বীরবালা

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম-এ

বীরভূমি 'রাজবারা', * সেথা ক্ষুদ্র জনপদ,
রাজপুত্র—সাধু নাম তার।
সুন্দর নবীন যুবা, অপূর্ব্ব বীরত্ব গাথা
বিঘোষিত স্বদেশ মাঝার।
একদিন যুদ্ধ জিনি', সঙ্গে বহু অনুচর,
গৃহপানে ফিরিছে কুমার।
পথ মাঝে সন্ধ্যা নামে, গগনে গরজে মেঘ,
ধরণীরে গ্রাসিল আঁধার।
সম্মুখে বিশাল মরু, রণক্লান্ত সৈন্যগণ,
চলিবার শক্তি আর নাই।
দিন শেষে, ক্লান্ত-পাখা শ্রান্ত বিহঙ্গের মত
খুঁজিতেছে আশ্রয়ের ঠাঁই।
অদূরে পশ্চিমপ্রান্তে 'মহিলে'র রাজপুরী,
চলে সাধু তারি অভিমুখে।
কৃতার্থ 'মহিল'-রাজ, বিশিষ্ট অতিথি লভি',
বঞ্চে সবে রাত্রি সেথা সুখে।
নবীন প্রভাত জাগে, জাগে সাধু সানুচর,
দেশে চলে সঙ্গে সৈন্যগণ।
সস্নেহে 'মহিল'-রাজ কহে, "বৎস, কিছুদিন
কর মোর আতিথ্য-গ্রহণ।"
রণশ্রান্ত সৈন্য সব, সানন্দে সম্মতি দিয়া
রাজপুত্র রহিল সেথায়;
হাস্য রসে গল্পে গানে, অতিথির বহুমানে
দুই-চারিদিন কাটি' যায়।
'মহিলে'র রাজকন্যা কর্ম্মদেবী নাম তার,
ষোড়শী সুন্দরী অনুপমা;
সুচারু, চম্পক জিনি' গৌর-বরণ তনু,
তাহে শোভে যৌবন সুষমা।

মধুকর চুমে নাই, প্রফুল্ল কমল যেন,
এখনও বুকভরা মধু;
অরণ্য-কমল নামে অন্য রাজকুমারের
পূর্ব্ব হতে বাক্‌দত্তা বধূ।

*　　*　　*　　*

একদিন দিনশেষে, ডুবিছে লোহিত রবি,
অলিন্দে দাঁড়ায়ে রাজবালা।
দূর গগনের কোলে মেলিয়া চঞ্চল পাখা
উড়ে যায় রাজহংস-মালা।
অস্তগামী তপনের সুবর্ণ-কিরণ-রাগ
ঝলসিছে তটিনীর গায়ে;
নারিকেল তরুশিরে নাচিছে সোনালী আলো,
মৃদুমন্দ দক্ষিণের বায়ে।
মৃগয়া হইতে ফিরে পুগল-কুমার সাধু,
তেজোদীপ্ত অশ্ব আরোহনে।
বাতায়নে রাজবালা, পথে আসে রাজপুত্র,
বাঁধি গেল নয়নে নয়নে।
সাধুর বীরত্ব-গাথা কতবার শুনিয়াছে,
রাজকন্যা দেখেছে স্বপন;
আজি এই দিন শেষে কুমার চরণ তলে
কুমারী সঁপিল তনুমন।
অরণ্য-কমল সনে বিবাহের আয়োজন,
আনন্দে চলিছে দিন-যামী।
জননীরে বলে বালা, "নাহি অন্য পতি মোর,
পুগল-কুমার মোর স্বামী।"
কন্যার অন্তর জানি পুলকিত পিতামাতা,
কন্যা দিল পুগল-কুমারে।
অপূর্ব্ব মিলন হলো, দু'টী প্রাণ হলো এক,
মাধবী বেড়িল সহকারে।

* রাজপুতানা

*　　*　　*　　*

কর্ম্মদেবী সাধু করে　　　হইয়াছে সমর্পিতা,
শুনিল তা' অরণ্য-কমল ;
রোষে ক্ষোভে অপমানে,　　　রাজপুত বীর প্রাণে,
প্রতিহিংসা জ্বালিল অনল।

উৎসব হয়েছে শেষ,　　　মনোমত বধূ লয়ে
চলে সাধু রাজ্য অভিমুখে।
নবীন-দম্পতি বুকে　　　জাগে কত নব আশা,
জীবন যাপিবে কত সুখে।

এক অশ্বে আরোহিয়া,　　　আলিঙ্গনে বাঁধি প্রিয়া
কুমার কহিছে প্রেম-বাণী ;
কত হাসি, কত চুমা,　　　আঁখিতে ঝরিছে প্রেম,
সম্মুখেতে চলেছে বাহিনী।

সহসা মরুভূ-প্রান্তে　　　উড়িল বিপুল ধূলি,
অন্ধকারে ঢাকিল ভূতল ;
কর্ম্মদেবী বক্ষ কাঁপে,　　　আঁখি মেলি দেখে সাধু—
সম্মুখেতে অরণ্য-কমল।

শত শত অশ্বারোহী　　　ঘিরিছে বাহিনী তার,
যুদ্ধ ছাড়া নাহিক উপায়।
প্রেয়সীর মুখ চুমি',　　　পুগল-কুমার কহে,
"প্রিয়তমে, লইনু বিদায়!"

অরণ্য-কমল কহে,　　　"দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এস সাধু,
সৈন্য ক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন।"
বাঁধে যুদ্ধ দুইজনে,　　　চিত্রার্পিত মূর্ত্তিপ্রায়
কর্ম্মদেবী করে নিরীক্ষণ ;

রহে আঁখি অপলক,　　　দোলে না একটী কেশ,
মুখে নাই বিষাদের ছায়া।
দুইটী তরুণ প্রাণ　　　যুঝিছে দারুণ রোষে,
বীরমদে তেজোদীপ্ত কায়া।

সহসা সাধুর শিরে　　　অরণ্য-কমল অসি
ঝলসি' উঠিল একবার ;
কর্ম্মদেবী আঁখি মুদে,　　　থরথর কাঁপে হিয়া,
চারিদিকে বিপুল আঁধার।

*　　*　　*

আঁখি মেলি দেখে বালা,　　　লুটিছে অদূরে তার
জীবনের শ্রেষ্ঠতম ধন!
কত সুখ কল্পনার,　　　আশার প্রতিমাখানি
না পূজিতে হলো বিসর্জ্জন!

*　　*　　*

অশ্ব হতে ধীরে ধীরে　　　নামি এল রাজবালা,
স্বামী পাশে দাঁড়াল আসিয়া।
ভূমি হতে অসি লয়ে,　　　ছেদিয়া দক্ষিণ বাহু,
দূতে চাহি কহিল হাসিয়া,

"এই ছিন্ন বাহু লয়ে　　　স্বামীর পিতারে দিও,
চরণে জানায়ো নমস্কার।"
আর বাহু ছেদি বালা,　　　'মহিল'-কবিরে কহে,
"লও কবি, শেষ উপহার।"

সাজাল বিচিত্র চিতা,　　　স্বামী পাশে বীরবালা,
লোল-শিখা জ্বলিল অনল ;
পাষাণ মুরতি প্রায়,　　　দূরে দাঁড়াইয়া দেখে
এ মিলন, অরণ্য-কমল।

সে স্থান আজিও আছে,　　　সাধুর জনক সেথা
রচিয়াছে, 'কর্ম্ম-সরোবর।'
যে পান্থ সে পথে যায়,　　　অতীত কাহিনী স্মরি'
বেদনায় ভরে সে অন্তর।

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

'মমি'

শ্রীজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের 'রেন্‌বো-ক্লাব-রুমে' আড্ডাটা সেদিন কুল্‌ফী বরফের মত জমাট বেঁধে উঠেছিল। একে পৌষের হাড়-কাঁপান শীত, তা'তে আবার নব্য বিলাত-ফেরৎ মুন্‌সেফ্-পুত্র শরৎ এসে যোগ দিয়েছে—আর যায় কোথা! তার কাছে বিলাতের চমকপ্রদ গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা সকলেই প্রায় 'মস্‌গুল' হয়ে গিয়েছিলুম। হাত-পায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে মনটাকে চাঙ্গা রাখ্‌বার জন্যে গরম চা ও কড়া সিগারও চল্‌ছিল হরদম। চা-টা অবশ্য ক্লাবের খরচ, সিগারটা কিন্তু শরৎ-এর পয়সায়। একেবারে খাস 'হাভানা'র মাল। কাজেই যে কখনও সিগার তো দূরের কথা,সিগারেটও টানে নি, সেও 'পরের ধন পাই তো—খাই' পন্থার অনুসরণ করে মুখাগ্নি কর্‌ছিল।

ওদিকে নিখিলেশরা 'ব্রিজ' নিয়ে মেতেছিল। হঠাৎ শুন্‌লুম, তাদের 'অক্‌সান্ ব্রিজে'র 'অক্‌সান্' হয়ে গেছে। এখন তারা পাখীর দাম নিয়ে মত্ত। কোন্ পাখীর দাম কত পর্য্যন্ত হ'তে পারে, এই নিয়ে তাদের মধ্যে হাতা-হাতি হবার উপক্রম। কেউ কারও কথা শুন্‌তে চায় না, নিজেরটা শোনাতে সবাই ব্যস্ত।

* * * খটাখট্—খটাখট্—খটাখট্ সবার মুখে একটা বিরক্তির ছায়া ঘনিয়ে আসে। এই দাঁতকপাটি-লাগান শীতে কে ওঠে বাবা কপাট খুল্‌তে। বেশ বসা গেছে আরামে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে। প্রকাশ চাইলো নবেন্দুর দিকে, নবেন্দু চাইল নিশীথের দিকে। দেখ্‌লুম, ঘর ছেড়ে কারও ওঠবার মতলব নেই। কাজেই বেশ করে রামপুরী চাদরটা জড়িয়ে আমিই আস্তে আস্তে দোর খুলতে গেলুম।

কপাট খুল্‌তেই এক ঝলক্ মারত্মক রকম ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি যে কি—শরীরি কি অশরীরি, হিন্দু কি মুসলমান, পুরুষ কি নারী কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না—এমনই তার পোষাক-পরিচ্ছদ! প্রথমেই চোখে পড়্‌ল, গলা থেকে পায়ের গোছ অবধি এক মিলিটারী ওভারকোট, তারপর একপ্রস্থ মোজা ও বুট। মাথা আর মুখের অধিকাংশই চাপা পড়েছে এক ছাইরঙের বাঁদুরে-টুপীতে। হাতে একটা ছোট হাত-ব্যাগ।

আগন্তুক সামনের কৌচ্‌টায় 'ধপ্' করে বসে পড়ল। তারপর মুখের ঘোমটাটা টেনে ফেলে বল্‌লে—কি বাবা, নরক যে গুলজার দেখছি! আমাকে চিন্‌তে পারছ না?

—আরে, এ যে আমাদের সোমনাথ দেখ্‌ছি! নবেন্দু চেঁচিয়ে উঠলো।—তারপর, তোমার ব্যাপার কি হে? এই শুন্‌লুম, কাইরো না ইজিপ্ট কোথায় বেড়াতে গেছো?

সোমনাথ তার অভ্যাসমত বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে মাথা নেড়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, ইজিপ্টে আমি সত্যিই গেছলুম। আচ্ছা, তোমরা ত সবাই চালাক—আন্দাজ কর তো আমার এই হাত-ব্যাগটায় কি থাক্‌তে পারে?

নবেন্দু বল্‌লে—কি বাবা, ইজিপ্টের জিলিপী না কি?

—না, কাইরোর গোলাপ বোধ হয়—নিশীথ বলে উঠ্‌লো।

—তোমাদের মুণ্ডু—সোমনাথ দাত খিচিয়ে উঠ্‌লো।

—তোরা যদি একটু 'সিরিয়স্' হতে জানিস।

সোমনাথ 'ক্লিপ্' টিপে তার হাত-ব্যাগটা খুলে ফেল্‌লো। কতকগুলো শুকনো খড়, কিছু কুচুনো কাগজ আত্মপ্রকাশ কর্‌ল। নবেন্দু, নিশীথ এরা সবেমাত্র হাস্‌বার উপক্রম কর্‌ছে, এমন সময় সেই খড়ের গাদার ভেতর থেকে সোমনাথ বার কর্‌ল ভিজে কাল্‌চে ন্যাকড়া জড়ান কি একটা লম্বা মত জিনিষ। আমরা তো একেবারে চুপ! কি অমূল্য সম্পদই না জানি ওর ভেতর থেকে প্রকাশিত হবে! ততক্ষণে সোমনাথের ন্যাকড়া খোলা হয়ে গেছে।

ওঃ, কি ভয়ঙ্কর! আমরা ভয়ে চম্‌কে উঠ্‌লুম।... এ যে মানুষের হাত—একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের আস্ত ডান হাত!

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম—সোমনাথ, সোমনাথ,

করেছ কি! এ হাত তুমি পেলে কোথায়? এ মরা মানুষের, না জ্যান্ত কেটে এনেছ?

সোমনাথ হোহো করে হেসে উঠ্‌লো।—আরে, না না, তোমরা কি আমায় খুনী আসামী পেলে না কি?

—সোমনাথ, তুমি কি আমাদের ডোবাবে ভাই, ওই কাঁচা হাত নিয়ে এসেছ এই ক্লাবে? তোমার সাহসকে বলিহারী যাই বাবা! যদি পুলিশ-টুলিশ দেখ্‌তে পায়! বেচারা চকিতে একবার বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করে নিলে।

সোমনাথ তখন সাম্‌নের তেপায়াটার ওপর থেকে একটা সিগার বাচতে বাচতে বল্‌তে লাগ্‌ল—তা' তোমরা যদি আর ভয়ই পাচ্ছ, তখন অত তোমাদের এর ইতিহাস শুনে কাজ নেই। এটা 'সেভেন্টিন্‌ সেঞ্চুরী'র হাত, তাই তোমাদের দেখাতে আসা, নইলে আমার এতে—

—আহা, তুমি রাগ্‌ছ কেন সোম দা'!—বাধা দিয়ে শরৎ বলে উঠ্‌লো।

আর একজন বল্‌লে—আচ্ছা, তুমিই বলো না, হঠাৎ একটা হাত দেখ্‌লে ভয় পাওয়াটা কি এতই অস্বাভাবিক?

সোমনাথ তখন তার হাতের ইতিহাস আরম্ভ করলো—

ইজিপ্‌সিয়ানরা যে তা'দের মৃতদেহ 'মমি' করে রাখে, এটা তোমরা বোধ হয় সকলেই জান। আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল এই 'মমি' জিনিষটা দেখ্‌বার। কাজেই একদিন পাশ যোগাড় করে 'মমিটরী' দেখ্‌তে গেলুম। হাজার হাজার দেহ 'মমি' করা রয়েছে। কোনোটা বা নামজাদা সম্রাটের, আবার কোনোটা বা নাম-গোত্রহীন দরিদ্র মুসাফীরের। প্রত্যেকটার পাশেই ছোট ছোট পরিচয়-পত্র। তা'তে খোদাই করা—কবে জন্ম, কবে মৃত্যু, জীবদ্দশায় তা'দের কার্য্যকলাপ, আরও অনেক কিছু। এই সব দেখে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ নজর পড়্‌ল আমার বাঁহাতি একটা 'মমি'র ওপর। পরিচয়-পত্রে দেখ্‌লুম, শবটা বহু পুরাতন—'সেভেন্টীন্‌ সেঞ্চুরী'র। শবের মালিক ছিল এক নামজাদা ডাকাত। জীবনে সে খুন করেছে পঁচাত্তর জন মানুষ। এমন কি, নিজের মাও বাদ যায় নি তার সেই হত্যা-হলাহল থেকে। শেষে এক মঠে আগুন লাগিয়ে পালাবার পথে সে ধরা পড়ে। আমার কি জানি কেন ভারী লোভ হলো, 'মমি'টার ডান হাতটার ওপর। ভাব্‌লুম, এই পঁচাত্তর জন নর-হন্তার ডান হাতটা যদি একবার পুরতে পারি আমার সেই ছোট 'মিউজিয়াম'টায়! এদিক-ওদিক চেয়ে দেখ্‌লুম। পাহারাদার তখন সেই মৃত্যু-গহ্বর থেকে কিছু দূরে এককোণে নিদ্রায় অচেতন। আর বৃথা দেরী না করে কোমর থেকে লম্বা ছুরিটা টেনে নিয়ে তার দু' চার প্যাঁচে হাতটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কর্‌লুম। কাজটা যতটা শক্ত ভেবেছিলুম, ততটা কিন্তু নয়। বহুকালের শব। অল্প আয়াসেই কাজ সাফাই হলো। তারপর অতি সোজা—আমার ট্রাভলিং-ব্যাগটায় পুরে হাতটা সোজা এই কোল্‌কাতায় আন্‌লুম।

মনোযোগী ছাত্র যে ভাবে প্রফেসরের লেকচার শোনে, সোমনাথের কাহিনী আমরাও সেই রকম একমনে গিল্‌ছিলুম। হঠাৎ ঘটনাটা শেষ হতে আমরা যেন চম্‌কে উঠ্‌লুম। ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে এগারটা বেজে গেল। অনেক রাত হয়েছে। কাজেই সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হলো।

* * *

দিন পনের বাদ। হেদো থেকে আমি আর নবেন্দু বেরুচ্ছি, হঠাৎ সোমনাথের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে গেল।

—আরে অতনু যে, এস এস কথা আছে। সে আমায় একরকম টান্‌তে টান্‌তেই একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়লো।

আমি ত অবাক! জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—ব্যাপার কি হে?

সোমনাথ বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—তোমাদের কাছ থেকে সেদিন তো বাড়ী ফির্‌লুম। রাত অনেক হয়েছিল। ভাব্‌লুম, এবার খুব একচোট ঘুম দেওয়া যাবে। কিন্তু হায়রে বরাত, সেদিন ঘুম আমার মোটেই হলো না! সারারাত কেবলই সেই ইজিপসিয়ান্‌ ডাকাতটাকে স্বপ্ন দেখেছি। সে যেন চোখমুখ রাঙিয়ে আমায় অনবরত শাসাচ্ছে—আমার হাত শীগ্‌গির ফিরিয়ে দিয়ে আয়! সে কি ভীষণ ভাই তা'র চেহারা! বিষ্ণু দা'কেও এ কথা বলেছি। সে তো বলে হাতটা ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু আমার মনে হয়, ও সব বাজে কথা। সেদিন ওই নিয়ে আলোচনা

হয়েছিল, কাজেই তার প্রতি ছবিঅচেতন মনের পর্দ্দায় ফুটে উঠেছে। যা' হোক্, আরও ক'টা দিন দেখাই যাক্ না।

সে চলে গেল।

* * *

তারপর বেশী দিন নয়। শনিবার—অর্থাৎ, ওর সঙ্গে দেখা হবার মাত্র তিনদিন বাদে সে হাজির হলো আমাদের ক্লাব-রুমে। তাকে যেন চেনাই যায় না—এমনই হয়েছে তার দেহের পরিবর্ত্তন! চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরুচ্ছে, চোখের কোল বঁসে গেছে আধ হাত। চুলগুলো বিশৃঙ্খল। সারা দেহটায় তার বিরাজ করছে একটা অমানুষিক রুক্ষ-কাঠিন্য। তার সেই হাস্য-রসিকতা আর নেই—সে হয়েছে অসম্ভব গম্ভীর। আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সে বল্লে—কি অশুভক্ষণেই না সেই ভূতুড়ে হাতটা ঘরে এনেছিলুম—সেই থেকে ঘুম আমার আর হলো না! যাই চোখ দুটো বুজুতে যাই, অমনি সাম্‌নে ভেসে ওঠে সেই ভীষণ কদাকার মুখ। ছিন্ন কনুই তুলে সে যেন দিবারাত্র আমায় ভয় দেখাচ্ছে। উৎপাতও কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। টেবিলের ওপর থেকে রূপোর সিগারেট-কেস্‌টা সেদিন থেকে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তারপর, ঠাকুর সেদিন আমার ভাত চাপা দিয়ে রেখে গেছ্‌ল, মুখে দিয়ে দেখি—কুইনিনের মত তেতো। এমনই সব নানা উৎপাত!...

সোমনাথ কেমন যেন হয়ে গেছে! হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে সে উঠে চলে গেল।

* * *

এরপর দিন দশ বার তার আর কোনো খবরই পাই নি। ক্লাবে আমি, নবেন্দু, প্রকাশ আর শরৎ বসে 'ব্রিজ' খেলছি, হঠাৎ সোমনাথের বড় দা'র ছেলে সুবোধ এসে হাজির। তার মুখে সব শুনে তো আমাদের চক্ষুস্থির! কাল রাত থেকে সোমনাথ না কি পাগলের মত হয়ে গেছে। একবার তাড়াতাড়ি আমাদের যেতে হবে সেখানে। সোমনাথের দাদা 'নার্ভাস্' মানুষ; তিনি একা কিছুই করে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।

কাছেই বাড়ী। একরকম ছুটতে-ছুটতেই সোমনাথদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তার ঘরের সাম্‌নে ক'জন ডাক্তারের সঙ্গে সতীনাথবাবু তখন অস্থিরভাবে কথাবার্ত্তা কইছিলেন। আমাদের দেখে তিনি যেন কতকটা আশ্বস্ত হলেন। সোমনাথের লম্বা ঘরটার দু'পাশে সারবন্দী 'র‍্যাক্।' তা'তে নানা দেশের নানা রকম জিনিষ—কোথাও একটা খোদাই করা পাথরের টুকরো, কোথাও বা হরেক রকমের মুদ্রা, কোনো র‍্যাকে রাশীকৃত 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট্', আরও জানা-অজানা কত কি! কিন্তু এধার-ওধার চেয়ে কোথাও সেই ভূতুড়ে হাতখানা আমরা দেখ্‌তে পেলুম না। সোমনাথ আমাদের দেখে চিন্‌তে পারলো, তারপরই কিন্তু হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো—না না, আমায় খুন্ করো না, খুন্ করো না! ও গো, তোমার হাত আমি ফিরিয়ে দেবো!...

তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে অচেতন হয়ে গেল।

সতীনাথবাবুর কাছ থেকে শুনলুম—রাত যখন স' দুটো, তখন একটা গোঁয়ানী শব্দ শুনে তিনি সোমনাথের ঘরে গিয়ে দেখেন—সে প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে। তার গলায় পাঁচটা আঙুলের দাগ মোটা রবার-টিউবের মত ফুলে উঠেছে। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠ্‌ল—আমায় খুন করো না, খুন করো না, তোমার হাত আমি ফিরিয়ে দেবো!...

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই ভূতুড়ে হাতের খোঁজ নিয়ে তিনি দেখ্‌লেন—সেটা নিখোঁজ হয়েছে। আরকের জারের মুখটা মোম দিয়ে ঠিক্ তেমনই আঁটা রয়েছে—কিন্তু তার ভেতরের হাতটা কর্পূরের মত উবে গেছে!

* * *

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমাদের 'রেন্‌বো-ক্লাব' আজও বসে, কিন্তু ঠিক্ তেমনটি আর জমে না। সোমনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হলেও একেবারে সেরে ওঠে নি। আজও মাঝে মাঝে ছাদের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—ও গো, আমায় খুন করো না, খুন করো না, তোমার হাত আমি ফিরিয়ে দেবো!...

শ্রীজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু-পতিত্ব

শ্রীহরিপদ গুহ

প্রবন্ধের নাম দেখেই যেন বাঙ্‌লা দেশের পতিব্রতা সতীসাধ্বী মা-বোনেরা তাঁদের আঁশবটি নিয়ে লেখককে না তাড়া করে বসেন। তাঁদের সঙ্গে এ' প্রবন্ধের কোনো সম্পর্কই নেই। মহিমময়ী পতিপ্রাণা বঙ্গ-ললনার কীর্ত্তি-কাহিনীতে ভারতভূমি মুখরিত। কোম্পানীর কঠোর শাসনে সতীদাহ বন্ধ হলেও, তাঁরা যে পতি-দেবতার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে চির-বৈধব্য বরণ করে নিয়ে নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করে ফেলেন, এ' কথা সকলেই অবগত আছেন।

পুরুষদের মধ্যে যেমন স্ত্রী বর্ত্তমানে, কিংবা তাঁর মৃত্যুর পর স্বামী-দেবতা ইচ্ছা করলে একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারেন, ভারত এবং তার বাইরে অনেক জাতের মধ্যে নারীদেরও তেমনই স্বামী বর্ত্তমানে কিংবা তার মৃত্যুর পর অপর ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করবার অধিকার আছে। 'যস্মিন দেশে যদাচার।'

বহুকাল থেকে জগতে চলে আস্‌ছিল যুক্ত-পরিবারের যুগ। মান্ধাতার আমলের 'বার্ব্বার'-স্তরটা আগাগোড়াই এই ধরণের পারিবারিক কেন্দ্রের সমাজ-বিন্যাসে ভরা ছিল। ক্রমে ক্রমে এক পত্নীত্ব এবং এক পতিত্ব গজিয়ে ওঠে। পুরুষ যাতে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিনা সন্দেহে চিন্‌তে পারে, তার জন্যই এই বিবাহ-পদ্ধতি সমাজে শেকড় গাড়্‌তে পেরেছে।

প্রাচীনকালের অনার্য্যদের মধ্যে এক নারীর একই সময় পরে পরে বহু পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করবার বিধি ছিল এবং এখনও সেই সকল পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির বংশধরদের মধ্যে এই প্রথা পূর্ণভাবে প্রচলিত আছে। পাঞ্জাবের কোনো কোনো অংশের অধিবাসীদের মধ্যেও বহু-পতিত্বের রেওয়াজ এখনও বর্ত্তমান।

নায়ার জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পরও নিজ গৃহে থেকে একাধিক 'পতি' বরণ করতে পারে।

অযোধ্যার তিহুরেরা বহুসংখ্যক পুরুষ বিশৃঙ্খলভাবে কয়েকটি রমণী নিয়ে একত্রে পতি-পত্নীরূপে বসবাস করে। তাদের মধ্যে হয় তো একজনের সঙ্গে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিয়েও হ'য়ে থাকে। বিয়ের পর সে স্বামীর মুখ কিন্তু একেবারে বন্ধ—টুঁ-শব্দ করবার আর উপায় নেই!

মাদুরার পশ্চিমে কল্লনদের মধ্যেও এ রকম বিবাহ-প্রথা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একজন নারী যথাক্রমে দশ, আট, ছয়, চার, অথবা দু'জন পুরুষের পত্নী হয় এবং সকলে একত্রে, অথবা পৃথকভাবে সেই নারীর গর্ভজাত সন্তানের পিতা বলে দাবী করে থাকে। পুত্রও বড় হয়ে জন-সমাজে এতগুলি পিতৃ-পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না।

মাদুরার কান্নুবন জাতির মধ্যে কোনো স্ত্রীলোক একত্র বা একসময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না বটে, কিন্তু পরে পরে তারা যতগুলি ইচ্ছে পুরুষকে পতিত্বে বরণ করতে পারে।

নীলগিরির তোডাদের মধ্যে তিব্বতীয়দের ন্যায় স্ত্রী সকল ভ্রাতার সম্পত্তি এবং সে পিতৃ-গৃহেই থাকে।

মালাবারের তায়ার এবং ত্রিবাঙ্কুরের কৃষক জাতির মধ্যেও পত্নী সকল ভ্রাতার সম্পত্তি। কোচিনে মালয়বাসী নীচ জাতির মধ্যেও এই প্রথা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে লোপ পেয়েছে। মালাবারে পণক জাতির এবং নীলগিরির বাদাগ জাতির মধ্যেও এই প্রথা আজও বর্ত্তমান বলে মনে হয়।

মালাবারের কর্ম্মকার এবং সূত্রধরদের মধ্যে এ' প্রথার অধিক প্রচলন দেখা যায়। সামাজিক প্রথানুযায়ী সর্ব্ব সময়ে এদের কন্যার চার-পাঁচটী পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়ে

থাকে। হিমালয়ের উপত্যকাবাসী এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন আছে।

পঞ্জাবে কুলু মহকুমায়ও এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। এখানে তিন-চারটী ভ্রাতার একটীমাত্র স্ত্রী থাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম সন্তানের পিতা বলে দাবী করে, দ্বিতীয় ভ্রাতা দ্বিতীয় সন্তানের দাবী করে। ক্রমান্বয়ে যতগুলি ভাই বিয়ে করে থাকে, তারা সকলেই পর পর সন্তানের জনক হয়ে থাকে।

আসামে বর্ত্তমানে যদিও আর 'বহু-পতিত্বে'র বিশেষ চল্ নেই, কিন্তু এক সময় সেখানে এ' প্রথার প্রচলন খুব বেশীই ছিল। ভুটিয়াদের মধ্যে বহু ভ্রাতার কিংবা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেবল মাত্র একটি স্ত্রী থাকে। এ' নিয়ে তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো কলহের সৃষ্টি হয় না; পালাক্রমে সকলেই তার সঙ্গে বাস করে থাকে।

মাদুরার তোত্তিয়ার জাতির মধ্যে খুড়ো, জেঠা, ভাই, ভাই-পো, ভাগিনেয় এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সকলেরই এক স্ত্রী। যদি তাদের মধ্যে কেউ এরূপ বিবাহে অসম্মত হয়, তবে তাদের পুরোহিত জোর করে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করায়। ওই নারী কিন্তু তাদের সমাজে অসতী বলে গণ্য হয় না।

রামায়ণ, মহাভারত এবং বৈদিক-যুগের অনার্য্যদের মধ্যে এক নারীর বহু পতি গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ রাজা হয়ে মন্দোদরীকে রাণী করেছিলেন। বালির মৃত্যুর পর সুগ্রীব রাজা হয়ে তারাকে নিজের অঙ্কলক্ষ্মী করে।

আর্য্যদের মধ্যে এ' প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না—কেবল একমাত্র মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই এক নারীর পঞ্চ স্বামীত্ব বজায় রাখ্‌তে গিয়ে স্বয়ং ব্যাসদেবকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সে সময় কোনো স্থলেই আর্য্যদের বহু-পতিত্বকে সমাজ অনুমোদন করত না।

গ্রীক্ এবং রোমানদের মধ্যেও এই প্রথার বহু দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়; ইংরাজ ও মুসলমানদের ভেতরেও এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বৈষ্ণবদের 'কণ্ঠী-বদল' হতেও এই প্রথার বেশ আভাষ পাওয়া যায়। উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যেও এর প্রচলন বড় কম নয়।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যেতে পারে—কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানেই আমার বক্তব্যের দাঁড়ি টান্‌লুম।

শ্রীহরিপদ গুহ

সর্পের গতি কি সত্যই দ্রুত?—

সর্ব্বসাধারণের ধারণা এই যে, সর্প বায়ুবেগে ধাবিত হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার (Colifernia) অন্তর্গত কোনো একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়ালটার মুসায়ার (Walter Mosaur) আমেরিকার 'বিজ্ঞান-হিতৈষিণী-সভায়' যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,তাহা হইতে কতকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। ডাঃ মুসায়ার ষ্টপ্ ওয়াচ (Stop-Watch) ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী সর্পের চেয়ে মানুষ অধিক বেগে হাঁটিতে পারে। দেড়শত মিটার দৌড়াইতে এই সর্পের প্রায় সাতষট্টি সেকেণ্ড সময় লাগে, কাজেই ঘণ্টায় তিনের একের তিন মাইলের অধিক বেগ হয় না।

ধ্রুবজ্যোতি

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এগার

"কেরে নণ্টু, তোর বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রে এলি না?"

বালক ঠোঁট্ ফোলাইয়া বলিল, "কাজ নেই, থাক্ গে!"

বড় জোবে শুভা হাসিয়া বলিল, "কেন রে, মা বকেছেন বলে বুঝি অভিমান হয়েছে?"

বালক মুখ ভেঙাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমায় বলেছে, কে ত কে, এল না ত এল না, আমার বড় ক্ষতি কি না!"

শুভা ভ্রাতার ঝাঁকড়া চুলের গোছায় একটু দোল দিয়া বলিল, "ক্ষতি নয়, বিকেলে বটের আর খরগোসের পালকে তা' হ'লে উজাড় করবে কে?"

বালক মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি বুঝি তাঁকে তাই বলেছিলুম?"

শুভা ঠোঁটে মোচড় দিয়া বলিল, "আমি কি তাই বল্‌ছি। হাতে বন্দুক ছিল, সাম্‌নে হতভাগা পাখীগুলোর ওড়বার ধূম লেগেছিল, হাতটা তোর 'নিস্‌পিস্' করছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারছিলি না, তাই দেখেই ত তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন—কেমন, এই নয়?"

বালক চঞ্চল কৌতুকে বলিল, "সত্যি দিদি, হাতের কি টিপ্! যেটাকে তাক্ করেন, সেইটাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল যে, নইলে অতটুকু থলিতে আঁটতই না।"

"তা' আমাদের কথা তাঁকে বেশী কিছু বলিস নি নিশ্চয়?"

"না, বলি নি, যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন, না ব'লে বুঝি থাকা যায়?"

উৎসুকভাবে শুভা বলিল, "তা' শুনে তিনি কি বল্‌লেন?"

"বল্‌বেন আর কি, হাসতে লাগ্‌লেন।"

পেট পুরে খুব খানিক নিন্দে ক'রে এসেছিস বুঝি? আচ্ছা, ভদ্রলোকের সাম্‌নে এমন করে নিন্দে ক'রে এলি কি বলে বল্‌ ত?"

"বারে, তুমি বকো কেন! জিজ্ঞেস করলে লোককে কি আমি মিথ্যে কথা বল্‌ব?"

"তা' কেন। নতুন লোক আমাদের খবর এত পাবে কোথায় যে জানবে। সে যাক্, যা' করেছিস, করেছিস, এখন যা' না, একবার নেমন্তন্নটা ক'রে আয়।"

বালক গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, আমি যাব না। কাজ কি, কাজ কি, পরকে বাড়ী এনে কি লাভ?"

শুভা একটু ঔদাসীন্য দেখাইতে চাহিয়া বলিল, "মা বল্‌ছিলেন কি না, তাই বল্‌ছি। না হ'লে তোর বন্ধুকে তুই নেমন্তন্ন করবি না করবি তা'তে আমার কি লাভ?"

বালক সোৎসুকে দিদির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি মা বলেছিলেন, বলো না ভাই, তোমাকে সেদিনের মত আজ একটা তেমনি বড় গোলাপ এনে দেব 'খন। সত্যি বল্‌ছিলেন?"

যেন দায়ে পড়িয়া কথাটা প্রকাশ করিতে হইতেছে এমনভাবে শুভা বলিল, "হ্যাঁরে, সত্যি। বিশ্বাস না হয় মাকে বরং জিজ্ঞেস ক'রে আয় গে যা'। আমার নাম করিস্ নি কিন্তু—খবরদার!"

বালক সোৎসুকে বলিল, "আচ্ছা, যাচ্ছি আমি মার কাছে জিজ্ঞেস করতে।"

দৃঢ়হস্তে ভায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া শুভা বলিল, "কি বল্‌বি?"

বালক সরল সত্য কথা বলার মত করিয়া বলিল,

"কেন বল্‌ব, হ্যাঁ মা, তুমি কি মণীশবাবুকে নেমন্তন্ন করতে বলেছ ?"

"তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন, কে বল্‌লে তোকে—তখন কি বল্‌বি ?

"কেন, বল্‌ব দিদি—।"

বাধা দিয়া শুভা ভ্রাতাকে একটা ঠেলা মারিয়া বলিল, "না, তোকে যেতে হবে না; কারও আমাদের বাড়ীতে এসেও কাজ নেই ।"

কোন্ ফাঁকে যে সে দিদির নিকট অপরাধ করিয়া বসিয়াছে, বালক তাহা ধরিয়া উঠিতে পারিল না। বিপন্নের দৃষ্টিতে শুধু তাই ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া শুভা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তোর একটুও যদি বুদ্ধি আছে নণ্টু !"

বালক গম্ভীর হইয়া বলিল, "এই দেখো, বকুনি আরম্ভ করে দিলে! সাধে কি আর লোকের কাছে বলি, তুমি ধমকাও।"

"তা' বেশ করিস্। যাক্, সে কথা হচ্ছে না। কথা কি জানিস্, ও কথা বল্‌লে মা ভাব্‌বেন আমরাই বুঝি ডাকাচ্ছি—মা গো, সেটা নেহাৎ বিশ্রী শোনাবে না ?"

বালক অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "তবে কি বল্‌ব শিখিয়ে দাও না।"

"বলবি এই—না, তোর আর কিছু বল্‌তে হবে না। নাই বা এল ?"

বালক অধিকতর কৌতূহলী হইয়া বলিল, "না দিদি, বলে দাও আমায়, অমন সঙ্গীটিকে আমি ছাড়তে পারব না। এদিকে মাও রাগ করেন, কি করি তা' বলো।"

শুভা কুঞ্চিত কপোলে বলিল, "দাঁড়া, তা' হ'লে ভেবে দেখি কি বলে আরম্ভ করবি।"

দুইজনেই নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা দূরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্বর ভাসিয়া আসিল, "নণ্টু, নণ্টু।"

শুভা তাড়াতাড়ি ভ্রাতাকে সাবধান করিয়া বলিল, "ওই মা আস্‌ছেন, আমাদের এ সব কথা ওঁকে কিছু বলিস্ নি যেন—খবরদার, খবরদার! আমি তোকে সেই রাঙা বলটা দেব 'খন।"

"সত্যি দেবে—সত্যি, সত্যি সত্যি ? বেশ, আমিও কিছু বল্‌ব না।"

মা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মণীশকে নেমন্তন্ন ক'রে এলি নণ্টু ?"

"না মা, দি'—যাব কি ?" বালক এত সতর্কতা সত্ত্বেও দিদির নাম ও তাহার নিকট শ্রুত বিষয়টী উল্লেখ করিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি শেষোক্ত কথা কয়টি বলিয়া ফেলিয়া বক্তব্য শেষ করিল। মা কি বুঝিলেন, তা' জানি না। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "যাও, না বলে আসাটা ভাল দেখায় না। তবে দেখো, বেচারীর মিছে কতগুলো পয়সা দণ্ড করিও না। যে ছেলে হয়েছ তুমি, তোমায় বলাই মিছে।"

কথাটা শেষ করিয়াই তিনি অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। বালক উৎসাহপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "বল দেবে ত দিদি—দেখ্‌লে ত, আমি কিছু বলি নি ?"

মুখ ভেঙাইয়া শুভা বলিল, "বলো নি, বাকীও বড় রাখো নি।"

বালক আগ্রহভরে বলিল, "মাইরি, মাইরি দিদি, ওটা কেমন ভুলে মুখ দে বেরিয়ে গিয়েছিল। তা', মা কিছু বুঝ্‌তেই পারেন নি। কি করেই বা বুঝ্‌বেন, শুধু 'দি' কথাটা উচ্চারণ করেছি বই ত নয়।"

শুভা মুখভার করিয়া বলিল, "ওঁরা সব বোঝেন, হাজার হোক্ আমাদের মা ত।"

বালক ভগ্নীর গায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "না, না দিদি, এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি উনি কিছু বুঝ্‌তেই পারেন নি। 'দি'তে কত কি হয়—'দি' শুধুই যে দিদি তা' ত নয়। এই ধর না, 'দি'তে দিল্‌দার, দিব্রুগড়।"

শুভা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "থামো থামো, খুব হয়েছে! মান্‌লুম, মা বুঝ্‌তে পারেন নি। এখন তুই যা' করতে যাচ্ছিস্, যা'।"

"দেবে তা' হ'লে, তোমার সেই লাল বলটা ?"

"দেব 'খন—কিন্তু কথায় কথায় তাঁকে শুনিয়ে দিস্ মাংসটা আজ আমি রাঁধছি। আমি যে বল্‌লুম, এ কথা বলিস্ নি যেন—খবরদার !"

"আচ্ছা।" বলিয়া বালক চলিয়া গেল। শুভা দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া খানিক লজ্জার চুরী করা হাসি হাসিয়া লইল। তারপর আপন-মনে বলিয়া উঠিল, "বলুক্ গে! মা আর কি বুঝ্বেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো কিন্তু তাঁর! আমি কিন্তু কিছুতেই অমন লোকের সঙ্গে সেধে ভাব করছি না। দেখে নিও, দেখে নিও, দেখে নিও!"

মণীশ তখন সযত্নে দিদির পূজার জন্য কয়েকটী ফল-ফুলের যোগাড় করিতেছিল। বালক নণ্টু তাহার উচ্চ কলহাস্যের সহিত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু আজ একলাই সকালবেলা আপনার এখানে কেমন চলে এসেছি দেখুন। আপনি বুঝি ভাব্ছেন, হয় ভগ্লু, নয় সুলতান দুটোর একটা কেউ-না-কেউ আমায় পথে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা' সত্যি নয়, একলাই আমি এসেছি; বিশ্বাস না হয় বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করে দেখ্বেন বরং। ওই যা', আপনাকে নেমন্তন্ন করার কথাটাই কেমন ভুলে গেছি দেখুন। সাধে কি আর দিদি বলে, আমি মস্ত বড় ভোলা।"

মণীশ স্মিতমুখে উজ্জ্বল হাস্যছটা বহাইয়া বলিল, "আমি কিন্তু তার সে কথা উল্টে দেবো নণ্টু—প্রমাণ ক'রে দেবো, আসলে তুমি একটুও ভোলা নয়।"

বালক চঞ্চল উৎসাহে বলিল, "তা' যদি পারেন, খুবই ভাল হয়। আজ সকালে এখানে আসার আগে 'না হক্' কতকগুলো বকুনি দিলে। আমিও তেমনি করেছি, তার সবার চেয়ে ভাল বলটা আজ আদায় করে ছেড়েছি।"

মণীশ বালক-সঙ্গীর উৎসাহে উৎসাহ দেখাইয়া সহানুভূতিপূর্ণ-স্বরে বলিল, "বেশ করেছ, এই ত কাজ! তা' বক্লে কেন?"

বালক হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। তারপর জিজ্ঞাসু নয়ন তুলিয়া বলিল, "বেশ লোক ত আপনি! আমি বলে দিই, আর আপনি দিদিকে গিয়ে লাগান, আর আমার বল পাওয়া বন্ধ হয়ে যাক্! আমায় এমনি হাবাই পেলেন কি না!"

মণীশ মুখখানা 'কাচুমাচু' করিবার চেষ্টা পাইয়া বলিল, "ছি নণ্টু, তুমি আমায় এতটা অবিশ্বাস কর! তুমি আগে, না তোমার দিদি আগে। না বলো, থাক্, শুন্তে চাই না। তবে এতে আমি বড় ব্যথা পেয়েছি জেনো।"

বালকের সরল মন এতটুকু অভিমানের আঁচ সহিতে পারিল না, গলিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সে মণীশের প্রাণের ব্যথা দূর করিতেই তখন দু'-এককথায় ঘটনাটা বুঝাইয়া দিতে চাহিল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে বাড়ীর পাঁজি-পুথি ঝাড়িয়া সকল কথা মণীশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল।

চিন্ময়ী নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এস নণ্টু, আজ ত আর তোমার কুকুর নেই, আমার সঙ্গে গল্প করবে এস।"

জিজ্ঞাসু-নেত্রে চারিদিক চাহিতে চাহিতে নণ্টু বলিল, "কিন্তু আপনি যে চান্ ক'রে পূজো করতে চলেছেন—আমায় ছোঁবেন? কত কি ঘাঁটি।"

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "তা' তোমায় ছুঁলে আমায় আর নাইতে হবে না নণ্টু—দেবতার পূজাতেও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে না। তুমি এস।"

বহুদিনের পর দিদির মুখে এ সরল হাসির রেখা ফুটিতে দেখিয়া মণীশের প্রাণ আনন্দ-রসে পরিপ্লুত করিয়া তুলিল। কৃতজ্ঞভাবে সে শুধু বালকের নির্ম্মল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতিকায় মানুষ ও তাহার ওজন— অনেকদিন পূর্ব্বে লিষ্টার সায়ারে, ডেনিয়াল ল্যাম্বার্ট নামে একটি বিরাট অতিকায় মানুষ ছিল। তাহার ওজন নয় মণ পঁচিশ সের। কোমরের কাছে শরীরের বেড় পাঁচ হাতেরও উপর। আর পায়ের বেড় হইবে দুই হাতের অধিক। লোকটির বয়স চল্লিশ বৎসরের উপর।

মেয়ে-মহল

শ্রীমতী সুজাতা দেবী

সাধারণে বলার অধিকার কেবল মাত্র পুরুষের, এ জাতীয় প্রগতির দিনে কথাটা নেহাৎ হাস্যাস্পদ। ঘর ও বাহির দুইটা দিক্। ঘরের অধিকার নারীর নামমাত্র—তাহাও কেবল খুন্তি-হাতায় সীমাবদ্ধ; তাহার বেশী কিছু চাহিবার, ভাবিবার, বলিবার অধিকারিণী সে নহে। কিন্তু কেন নহে, এই কথাটাই বুঝিবার দিন আজ আসিয়া পড়িয়াছে। ভুলিলে চলিবে না যে, নারী সন্তানের জননী—সংসারে, সমাজে তাহার দান ত কম নহেই, স্থানও কম নহে।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ সন্তান কতটুকু করে? বাল্যে মাতার কোলে বাৎসল্য-স্নেহরসে পালিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের ধারাগঠন করিতে শিখে। যদি আদর্শ সন্তান প্রয়োজন হয়, তবে আদর্শ-জননীকে প্রথমেই অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হইবে।

অতীতের দিকে চাহিলেও এই দৃষ্টান্তই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন মাতার গুণে এতবড় হইতে পারিয়াছিলেন। হৃদয়বান্ বিদ্যাসাগর নিজগুণে দয়ার সাগর হয়েন নাই—ভগবতী দেবী তাঁহার পূর্ণ প্রেরণায় তাঁহাকে এই পথ-চালিত করিয়াছিলেন। গুরুদাস, মনো-মোহন, কাহার নাম করিব? জগতে যে কেহ শ্রেষ্ঠের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে চাহিলে দেখিতে পাই আদর্শ-জননীর অনুপ্রেরণায় সে স্থল প্রাণবন্ত।

আজ 'গল্প-লহরী'র সম্পাদক-মহাশয়ের অনুরোধে আমি এই দিক্‌টীর আবরণ উন্মোচন করিবার অধিকারিণী হইলাম।

এ কাজ একার নহে, প্রত্যেক নারীর। তাই সাদরে এ বিভাগের ভার আমার বোনেদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আশা করি, তাঁহারা এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ত করিবেন নাই, বরং তাঁহাদের সত্যকার অভাব-অভিযোগের, দোষ-গুণের নির্ভীক আলোচনা করিয়া এই অংশের সদ্ব্যবহার করিবেন।

একদিন নারীর সে সম্মান ছিল—তাই নামের আগে সীতা-রাম, পার্ব্বতী-পরমেশ্বর ব্যবহার হইত। আজও সেইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে নারী যেন প্রথম পদ তাঁহাদের দানে নহে, অধিকারে অর্জ্জন করিতে পারেন, আমার এই একান্ত কামনা।

এবার আমি শ্রীমতী অমলা দেবীর 'তালতলা সাহিত্য-সম্মেলনী'তে পঠিত 'অল্প কিছু বলা' এবং 'জাপানে নারী-প্রগতি'র মধ্য দিয়া এ বিষয়টীর শুভ-উদ্বোধন করিলাম।

আশা করি, আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরও আলো-চনা করিতে পারিব।

অল্প কিছু বলা

লেখা কেরাণীর পেশা, সাহিত্যিকের নেশা! সেই নেশার ঝোঁকেই কিছু একটা বলবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই আমি সমগ্র সুধীমণ্ডলীর কাছে কবির ভাষায় নিবেদন করি—'হয়ত এ ফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে।'

আমার ভাষায় অনেক ত্রুটী থাকা সম্ভব, তবু আমার বলবার এ ব্যাকুলতাকে জননী যেমন শিশুর প্রথম কথা বলার ব্যাকুলতাকে সস্নেহ প্রশ্রয়ে বরণ করে নেন, তেমনি আমার এই সামান্যতম কয়েকটি কথা আপনাদের সস্নেহ প্রশ্রয় পাবে আশা করি।

আমি কিছু মেয়েদের কথা বলতে চাই, অর্থাৎ বলতে চাই না আলোচনা করতে চাই। আজকাল মেয়েদের সম

অধিকার নিয়ে খুবই আন্দোলন চলছে; নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনীতে নারীরা কি চান সেই মত ব্যক্ত করেছেন। সে দাস জাতির মুখেই শোভা পায়। চাইবার করবার মত কাজ মেয়েদের জন্য বহু আছে, পল্লীগঠন শিক্ষাবিস্তার যা দ্বারা সমাজ দেশের বহু উপকার হয় নারীরা তা চান না, তাঁরা চান সুলভ বিলাস, অর্থাৎ জন্ম-শাসন এবং উত্তরাধিকার। সম্পত্তি সঞ্চয় করতে পারে এমন যোগ্যতা যাদের নাই তারা চায় অধিকার দাবী, এর চেয়ে দীনতা আর কি আছে জানি না। এই সব অধিকার দাবী যারা সমগ্র নারীজাতির প্রতিনিধি সেজে ব্যক্ত করলেন তাঁরা নারী জাতিকে সম্মানিত করেন নি, কলঙ্কিত করেছেন।

যাই হোক একই পিতামাতার সন্তান যখন তারা উভয়েই, তখন পুত্র সর্ব্ব স্থাবর অস্থাবরের হ'ল অধিকারী আর কন্যা হ'ল বঞ্চিত, স্থূল যুক্তিতে এ অধিকার নিষ্ঠুরতায় মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় নারীর উত্তরাধিকারের পথে কত বাধা।

পৈত্রিক উত্তরাধিকার না হয় পুত্র কন্যা উভয়েই সমভাবে পেল, কিন্তু তাকে রক্ষা করবার যোগ্যতা তাঁদের আছে কিনা সেটাও বিবেচ্য।

সাধারণ স্ত্রীধন বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ অলঙ্কার, সে সম্পত্তিও দেখা যায় যত দিন তার রক্ষক থাকেন তত দিনই সে অধিকারীর দেহের শ্রী বৃদ্ধি করেছে এবং যে মুহূর্ত্তে সে রক্ষকবিহীন হ'ল তার পরক্ষণেই অধিকারিণীর চক্ষের সম্মুখে অধিকারিণীর আত্মীয়স্বজন তার গুরুভার লঘু করে দিলেন, এ দৃষ্টান্ত বহু দেখা গেছে।

যাঁরা দু' চারখানি অলঙ্কার রক্ষা করতে পারেন না, তাঁরা করবেন বিপুল সম্পত্তি রক্ষা! এ হাস্যকর কথা শুনে বিস্মিত মন প্রশ্ন করে 'এ কী নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করছে ?'

পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার যদি নারী গ্রহণ করেন তাতে বিপক্ষতা করা কারুরই উদ্দেশ্য নয়, এবং যোগ্যের যোগ্যতার পুরস্কার হতে বঞ্চিত করার শক্তি কারুরই নাই, কিন্তু সে শক্তি সঞ্চয় করুন, সে মন গঠন করুন, অধিকার ভিক্ষায় মেলে না, তাকে শক্তি দিয়ে উপার্জ্জন করতে হয়।

আমাদের দেশের নারীরা কি চাইছেন তাঁরা নিজেরাই জানেন না! এই যে নারী জাগরণের সাড়া একটা প্লাবনের মত এসেছে এ দেখে কোন এক সাহিত্যিকের কথা মনে হয়। তাঁরই ভাষায় বলি 'সবাই বলে নারী জেগেছেন, কিন্তু আমি দেখছি রেগেছেন। নারীর রাগই কেবল প্রকাশ হচ্ছে, জাগ্রত ভাব ত কই দেখা যাচ্ছে না।'

অধিকার চাইতে হ'লে প্রথম জানতে হবে আমরা কি চাই আমাদের কিসের অভাব, আমাদের অধিকারের পথে কি বাধা, এ সমস্ত সত্যরূপে জ্ঞানের চক্ষে জাগ্রত হয়ে দেখতে হবে, অন্ধভাবে শুধুই পথে ছুটাছুটী করলে শুধু কোলাহলের সৃষ্টি হবে, প্রতিকার কিছু হবে না।

যে দেশের মেয়েরা আজকের এই প্রগতি যুগে প্রশ্ন করেন 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে ?' যে দেশে দেশ জুড়ে আছে আনন্দময়ী, সাবিত্রীরাণী সেই জাতের প্রগতি!

গতি-ই আছে কি ?

দেশ জুড়ে সমগ্র নারীজাতি অজ্ঞান অন্ধকারে অত্যাচারে উৎপীড়িতা, আর সেই সময় জনকয়েক শিক্ষিতা নারী বলেন, 'আমাদের চাই উত্তরাধিকার।' যেন আর সমস্ত অভাব অভিযোগের মীমাংসা হয়ে গেছে, শুধু উত্তরাধিকার-টুকুই বাকী।

বর্ত্তমান সময় উত্তরাধিকার আইন যদি প্রবর্ত্তন হয়, তবে তাতে নারীর প্রয়োজন মিটবে কিনা সন্দেহ, কারণ অধিকারও শুধু জনকতক শিক্ষিতা বিশেষ বিশেষ মহিলারাই পাবে না সমগ্র নারীরাই পাবেন, এ দেশের সাবিত্রীদের হাতে সে সম্পত্তি কয় ঘণ্টা থাকার সে কথা কি তাঁরা ভেবেছেন ?

উত্তরাধিকার পেলেও এ অজ্ঞান অত্যাচারিত জাতের কোনই লাভ নাই, এঁদের সম্পত্তি তারাই লঘু করে দেবেন।

স্বামীর দাস্য করিব না

জাপানে ফুজোকাই নামে নারীদের এক পত্রিকা আছে। ফুজোকাই অর্থ নারী-জগৎ। পিতা-মাতা ও গুরুজনের আদেশ অমান্য করা জাপানীদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য।

ঐ পত্রিকায় শিক্ষিতা মহিলাগণ স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা গঠিত বিধি মান্য করিয়া যদি স্বামীগণ চলিতে পারেন, তবেই তাঁহারা স্বামীর সংসার করিবেন। তাঁহারা চাহিয়াছেন যে, সমানভাবে অর্থের উপর তাঁহাদের অধিকার থাকিবে। সংসার গৃহকর্ত্রীর আদেশানুসারে চলিবে, তাহাতে স্বামী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। স্বামীগণ নিজেদের আমোদ-আহ্লাদকে সর্ব্বাগ্রগণ্য করিতে পারিবেন না। আমোদ-আহ্লাদ সপ্তাহে একদিন করিতে পারিবেন। আহারের সময় খাদ্যের নিন্দা করিতে পারিবেন না। নিজের রুচিমত খাদ্য আহার করিতে চাহিলে গৃহিণীকে তাহা বলিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা দেওয়া গৃহিণীর ইচ্ছাধীন। তাহা না পাইলে অভিযোগ করা চলিবে না। স্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদ রাখিতে হইবে। তাহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা চলিবে না। দোকানে যাইবার সময়ে স্ত্রী সঙ্গে যাইতে চাহিলে লইয়া যাইতে হইবে। পথে স্ত্রীর ক্ষুধা পিপাসার জন্য পরিচর্য্যা করিতে হইবে। স্ত্রীকে প্রশংসা করিতে বা তাহার বেশভূষা খারাপ হইলে নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। জন্মদিনে উপহার দিতে হইবে। ভুল করিলে ভর্ৎসনা করিতে পারিবেন না—ভুল কাহার হয় না? স্ত্রীর নিকট মিথ্যা কথা বলিতে পারিবেন না। সকল কার্য্য ও বিষয়ে স্ত্রীর স্বতন্ত্র অভিমত আছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

এইরূপ স্বামীর দাস্য করিবেন না বলিয়া জাপানী নারীগণ এক ঘোর আন্দোলন তুলিয়া সমাজে পরিবর্ত্তন আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন।

নির্ব্বাচনের নেশায় পত্নী বিক্রয়—জাপানী নির্ব্বাচন-প্রার্থীর কীর্ত্তি

টোকিও সোস্যালিষ্ট দলের সাতাশ বৎসর বয়স্ক সেক্রেটারী মিঃ হিরোশি ওয়াটারনাবে টোকিও সিটি কাউন্সিলে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হন্। কিন্তু নির্ব্বাচনের জন্য আবেদন করিতে হইলে কাউন্সিল আইনানুযায়ী যে বার পাউণ্ডের প্রয়োজন, মিঃ ওয়াটারনাবের সেই পরিমাণ অর্থও ছিল না। নির্ব্বাচনের নেশা তাহাকে এতদূর পাইয়া বসিয়াছিল যে, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় পত্নীকে বার পাউণ্ড মূল্যে একটি নাচওয়ালী দলের নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে, নাচওয়ালী দল নাচের নামে পাপ ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে। তখন মিঃ ওয়াটারনাবে পত্নীকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন। এ জন্য তাঁহার দল হইতে তাঁহাকে দশ পাউণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সাহায্য-প্রাপ্তির ফলে মিঃ ওয়াটারনাবে শীঘ্রই তাঁহার পত্নীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

সুখের বিষয়, নির্ব্বাচনের নেশায় অন্ধ হইয়া স্ত্রী বিক্রয় করিতে দ্বিধা না করিলেও মিঃ ওয়াটারনাবে টোকিও সিটি কাউন্সিলের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছেন এবং তিনিই হইয়াছেন কাউন্সিলের বয়োকনিষ্ঠ সদস্য। মিঃ ওয়াটারনাবের পত্নী বিক্রয়ের জন্য নীতির দিক্ দিয়া সোস্যালিষ্ট দল হইতে তাহার উপর কোনপ্রকার দোষারোপ করা হয় নাই।

আফ্রিকার তরুণীর কালঘুম—বিশ বৎসর অচেতন

১৯১০ সালে ট্রানস্ভ্যালের লিচেনবার্গ নামক স্থানে আনা স্বোনেপোয়েল নামক আফ্রিকার এক সুন্দরী যুবতী এক কৃষক যুবককে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতামাতা প্রস্তাবিত বিবাহ অনুমোদন করেন নাই। যুবকটি ইহাতে আত্মহত্যা করে এবং সংবাদ শুনিয়া আনা মূর্চ্ছিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে; এই ঘুম সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

এখনও সে 'ট্রান্সভ্যাল প্রভিন্সিয়াল হোমে' আছে এবং সম্প্রতি তাহার নিদ্রা অবসানের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাহার সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল না হইলেও এখন সে স্বাভাবিক মানুষের মতই প্রত্যহ রাত্রিতে নিদ্রা যায়। সকালবেলা জাগরিত হয় এবং পথ্যাদিও গ্রহণ করে।

এই দুর্ঘটনার সময় তাহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর ছিল এবং সে সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু এই ঘুম তাহার এক ভীষণ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। ট্রান্সভ্যালের রণ্ডফনটেম নামক স্বাস্থ্য-নিবাসে তাহাকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর তাহাকে পথ্য করান হইত। তথাপি ক্রমেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং ডাক্তারগণ তাহার রোগ-মুক্তির আশায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর নিদ্রার পর ১৯২১ খৃঃ তাহার প্রথম সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। কিছুকাল পরই সে আবার ঘুমাইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে কয়েক মাসের মধ্যেও তাহার কোন সাড়া পাওয়া যাইত না।

এইভাবে আরও নয় বৎসর অতিবাহিত হয়; তারপর একদিন সে রাত্রি ভিন্ন ঘুমাইতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে। সেই হইতে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে।

এ পর্য্যন্ত সে কখনও তাহার প্রণয়ী যুবকের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে নাই।　　　জনশক্তি

নারীর মন

শ্রীমতী রাণী দেবী

"সুজাতা, কাল্‌কেই আমি চলে যাব।"

সুজাতা তার চোখের সরল দৃষ্টি যতীশের মুখের ওপর স্থাপিত করে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "এত শীগ্‌গির যাবে? আরও দু'দিন থেকে যাও না কেন?"

যতীশ সুজাতার একখানি হাত সাদরে গ্রহণ করে ধীরভাবে বল্‌লে, "তা' যে হয় না সু! আমি পরের চাকরী করি, তারা ত বুঝবে না যে, দেশে আমার জন্য একখানি সুন্দর সৌন্দর্য্যপূর্ণ হৃদয় উৎসুকভাবে অপেক্ষা করে। তারা ভাব্‌বে, পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাষ্টারের আবার স্ত্রীর দরকার কি?"

সুজাতার চোখ দু'টি অশ্রুতে টলমল করে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, "সত্যি, বড়লোকেরা বড় নির্দ্দয় হয়; গরীবের ব্যথা তারা কিছুই বোঝে না। তুমি ও কাজ ছেড়ে দাও; বরং এখানকার কোনো অফিসে চেষ্টা করে দেখো। শুনেছি, মার্চ্চেন্ট অফিসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার একটা চাকরী অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে। দু'জন লোক আমরা, তাতেই আমাদের দিন বেশ চলে যাবে।"

যতীশ ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "তা' কি আর হয় সু, এই পঞ্চাশ টাকাতেই কুলুচ্ছে না, কুড়ি টাকাতে কুলুবে? খেটে খেটে তোমার সোণার শরীর মাটি হয়ে যাচ্ছে। আমার মত হতভাগার হাতে পড়ে তোমার এই হাল হয়েছে। যদি অন্য কারও—"

সুজাতা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, "দেখো, ফের এ সব কথা যদি বল্‌বে, তবে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। কেন, আমার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ? টাকা থাক্‌লেই কি মানুষ সুখী হয় না কি? আমি দরিদ্রের স্ত্রী বটে, কিন্তু তোমার প্রেমপূর্ণ গভীর স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে আমি যে নিজেকে রাজেন্দ্রানীর অপেক্ষা সুখী মনে করি।" এই কথা বলে সুজাতা যতীশের বুকে মুখ লুকালো।

যতীশ ম্লান দীপালোকে পত্নীর সুন্দর সুশ্রী মুখখানি তুলে ধরে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে রইল।

দুই

যতীশ শৈশব হইতেই পিতৃ-মাতৃহীন। তার দূর-সম্পর্কীয় এক কাকা তাকে পুত্রস্নেহে লালনপালন করেন। যতীশ এই কাকার আশ্রয়ে থেকেই বি-এ পাশ করে। তারপর কাকার ইচ্ছানুযায়ী একটি পাত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সুজাতার গায়ের রঙটা শ্যামবর্ণ হলেও মুখ-শ্রী কিন্তু বড়ই সুন্দর।

যতীশ কাকার আদেশে নিজেই কনে দেখে আসে। মেয়ে দেখে কিন্তু তার পছন্দ হয় না। এই কি তার জীবন-সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত? না আছে রূপ, না আছে গুণ।

কনের বাপ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিজের মেয়ের প্রশংসা কর্লেন—"এমন মেয়ে আমাদের গাঁয়ে আর দু'টি নেই বাবা! রান্না-বান্না অতি চমৎকার পারে। ঘর-সংসারের কাজেও খুব ভাল। সব তা'তেই মেয়ে আমার পাকা। তবে সে আজকালকার গান-বাজনা কি লেখাপড়া কিছু জানে না—তা' গান-বাজনা লেখা-পড়া শিখে হবে কি? গরীব গেরস্থ-ঘরে ও সবের ত কোনো প্রয়োজন নেই। মেয়ে আমার তাই বলে একেবারে মুখ্যু নয়—চিঠি-পত্র লেখা, কি সংসারে থাক্‌তে গেলে দুধের হিসেব, গয়লার হিসেব সে সব কর্ত্তে পারে।"

যতীশ বাড়ী এসে কাকীমার কাছে বল্‌লে, "না কাকীমা, ওই মেয়েকে আমি কখনো বিয়ে কর্ব্ব না। ছি ছি, রূপ-গুণ কোনোটারই বালাই নেই!"

কাকা শুনে বিরক্তির সাথে অধর দংশন করে বল্লেন, "তা' হবে না যতীশ, বিয়ে তোমাকে কর্ত্তেই হবে। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি। মেয়ে দেখ্‌তে খারাপ নয়, রঙ্‌ একটু ময়লা হ'লেই যে কুৎসিৎ হবে, এমন কিছু নয়। তোমার রঙ্‌ত ফর্শা, কিন্তু চোখ দুটো যে দূরবীন দিয়ে দেখ্‌তে হয়। আর সুজাতার চোখ দু'টি দেখেছ? যেন হরিণের মতই কালো টানা চোখ।

যতীশ এরপর আর বল্‌বার মত কোনো কথা খুঁজে পেল না। সে চুপ করে রইল।

যাক্‌, অন্তরে সে যতই বিরক্ত হোক্‌ না কেন, বিবাহের পরে নব বধূর শান্ত শ্রী-মণ্ডিত মূর্ত্তিখানি তার প্রাণে যেন শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিল। সুজাতাকে পেয়ে সে সুখী হলো। তখন মনে মনে ভাব্‌ল—সুজাতা আমাকে যতটা ভালবাসে, শিক্ষিতা হলে সে কখনই এতটা বাস্‌ত না। আর রূপ? যতীশ মনে মনে ভাবে, সুজাতার মত এমন স্নিগ্ধ শান্ত প্রেমপূর্ণ মুখ-শ্রী সে কখনো কোনো নারীর দেখে নি।

দিনগুলি তাদের বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সহসা একদিন ছন্দপতন ঘট্‌ল। যতীশের কাকা মারা গেলেন। নগদ টাকা যৎসামান্য ছিল। কয়েক মাস তা'তে কোনোরকমে চল্‌লো। অবশেষে যতীশ কোল্‌কাতায় এক বড় লোকের বাড়ীতে একটা টিউশানি যোগাড় করে নিল। আজ কয়েক মাস হলো এই চাকরীটি সে পেয়েছে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

মাসের প্রথম যে শনিবার হয়, যতীশ সেইদিন বাড়ী এসে দুইদিন থেকে সোমবার কোল্‌কাতায় চলে যায়। মাসে একবারের বেশী সে আসতে পারে না। গাড়ীভাড়ার টাকা কয়টা অতিকষ্টে বাঁচিয়ে পত্নীর জন্য সে কোনোবার একখানি ফ্যান্সী সিল্কের শাড়ী, কোনোবার সুগন্ধি তেল, এসেন্স প্রভৃতি নিয়ে আসে। সুজাতা এজন্য মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, "দরকার কি বাবু, এত জিনিষ-পত্রে! একেই টানা-টানির সংসার। তা'তে আবার অনাবশ্যক খরচ করে টাকাগুলো নষ্ট করা কেন?"

যতীশ স্ত্রীর এই সুমিষ্ট র্ভৎসনাটুকু সাদরে উপভোগ করে।

তিন

"এ কি মাষ্টার-মশায়, আপনি যে এত শীগ্‌গির ফিরে এলেন?" কথা বলার সাথে সাথে অনিমা এসে পাঠ-গৃহে প্রবেশ কর্ল।

যতীশ তার অপর ছাত্রী নীলিমাকে পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিল। মুখ তুলে বল্লে, "কই, শীগ্‌গির আর এলুম কোথায়? ছুটি ফুরিয়ে গেছে, তাই ত—"

অনিমা ততক্ষণে পার্শ্ববর্ত্তী একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। কৌতুকপূর্ণ-স্বরে সে বল্লে, "ছুটি ফুরুলেই বা। অনেকদিন পরে বাড়ী গেলেন, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে আস্‌তে সত্যিই কষ্ট হয় না কি? তার জন্যে যদি একদিন-দু'দিন কামাই হয়, তা' হ'লে সেটা এমন অন্যায় নয়?"

যতীশ একটু বিস্মিত হলো—কেন না, এ ভাবের আলোচনা সে কোনোদিন তার ছাত্রীদের সাথে কর্ত্ত না। অনিমা এবং নীলিমা দু'জনেই তার ছাত্রী। যতীশ নিজে দরিদ্র, তাই এই ধনী-পরিবারের সাথে আন্তরিক মেলামেশা কর্ত্তে কেমন সঙ্কোচ বোধ কর্ত্ত। সে একদিনও ছাত্রীদের 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' বলে নাই। ছাত্রীরা এতে আপত্তি উত্থাপন কর্লেও এই শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী দু'টিকে সে কিছুতেই 'তুমি' বল্‌তে পার্ত্ত না। যে কয় ঘণ্টা এদের পড়াত, সেই সময়টুকু কলেজের নির্দ্দিষ্ট পড়া ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের অবতারণা কোরত না। তার সব সময়েই একটা ভয় ছিল, কি জানি হঠাৎ যদি কোনো বেয়াদবী প্রকাশ পায়, তা' হলে তার লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাক্‌বে না। কাজেই সে খুব গম্ভীরভাবেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য পালন করে যেত। এজন্য ছাত্রীরা তার অসাক্ষাতে তাকে 'পাড়া-গেঁয়ে', 'ভিজে বেরাল' প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর উপাধিতে ভূষিত কর্লেও যতীশের সাম্‌নে তারা কিন্তু বেশ সুশীলা ছাত্রীর মতই অবস্থান কর্ত্ত। তাই অনিমার মুখে এই কথা শুনে যতীশ খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে ধীরভাবে বল্লে, "ন্যায়-অন্যায়ের কথা হচ্ছে না অনিমা দেবী, তবে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা কর্ত্তে আমি শিক্ষা পাই নি কোনো দিন।"

অনিমা আবার একটা নূতন প্রশ্ন কর্ল, "আচ্ছা, দেশে আপানার কে কে আছেন—মা-বাবা, ভাই-বোন্, দাদা-বৌদি' ?"

বাধা দিয়ে ঈষৎ ব্যথিতভাবে যতীশ বল্লে, "না, আমার মা-বাবা, ভাই-বোন্, দাদা-বৌদি' কেউ নেই। এক—"

অনিমা ম্লানমুখে বলে উঠ্ল, "আহা, সত্যি আপনার কেউ নেই! তা' হলে আপনি ত বড় দুঃখী!"

যতীশ সহসা স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে অনিমার সমবেদনায় মলিন করুণ সুন্দর মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে কিছুতেই বল্তে পার্ল না, "না, আমি দুঃখী নই। সুজাতার প্রেম আমার সমস্ত অভাব দূর করে দিয়েছে।"

যতীশের তখন কোনো কথা বল্বারই ক্ষমতা ছিল না। . সে শুধু মুগ্ধচক্ষে অনিমাকে দেখ্তে লাগ্ল।

অনিমা আকণ্ঠ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে বলে উঠ্ল, "কি সব বাজে কথা বকে মরছি! আপনি একটু তাড়াতাড়ি করে নীলির পড়াটা শেষ করুন মাষ্টার-মশায়। আমার আজকে কিছু পড়া হবে না দেখ্ছি।"

যতীশ তাড়াতাড়ি ঘাড় হেঁট করে নীলিমার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়্ল। নিজের প্রতি তার কেবলই রাগ হতে লাগ্ল, ছিঃ, কেন সে এমন দুর্ব্বল চরিত্র হয়ে পড়্ল! তার মুগ্ধভাব এই তরুণী পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেছে। না, সে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নেবে।

চার

যতীশ মনে মনে ঠিক্ কর্ল, অনিমার সাথে পাঠ্য-সম্বন্ধ ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয়ে সে আলোচনা কর্ব্বে না। হাজার হোক্ এরা লোক ভাল, মাইনেও দিচ্ছে নিয়মিত। কোথায় এখন কাজ সে খুঁজে পাবে। আজকাল চাকরী পাওয়া ত আর সোজা কথা নয়।

সেইদিন অনিমা আবার প্রশ্ন কর্ল, "আচ্ছা, মাষ্টার-মশায়, আপনি কি বিয়ে কর্ব্বেন না? কি রকম বউ চান, নোলক নাকে ঘোমটা-টানা, না, 'আপ্-টু-ডেট্'?"

যতীশ নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তে পার্ল না। 'চট্' করে ব'লে বস্ল, "শেষোক্তটাই আমার পছন্দ। দিন্ না এইরকম একটা সম্বন্ধ ঠিক্ করে"—ব'লে ফেলেই সে নিজের ওপর বিরক্ত হলো। ছি ছি, মনের এ কি ছেলে-মানুষী খেয়াল! এই মিথ্যা কৌতুক করার তার কি প্রয়োজন ছিল?

অনিমা এবার বিস্মিতভাবে বল্লে, "সত্যি আপনার বিয়ে হয় নি? আমি ভেবেছিলুম—"

নীলিমা বই থেকে মুখ তুলে বল্লে, "হয় ত তিন চারটি খোকা-খুকীর বাপ হ'য়ে গিয়েছেন। হায়, হায়, আমাদের কল্পনাটা তা' হলে মাঠে মারা গেল দেখ্ছি!"

অনিমা বল্লে, "দেখুন মাষ্টার-মশায়, আমার একটি বান্ধবী আছে, আপনার আপত্তি না থাক্লে—"

যতীশ তখন গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে, "আপনার পড়া কিন্তু এখনো তৈরী হয় নি অনিমা দেবী। এতক্ষণ কেবল বাজে কথায় সময় কেটে গেল।"

অনিমা নিজের বাচালতায় যথেষ্ট লজ্জিত হলো। সে মুখ নীচু করে বল্লে, "সত্যি, এতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট কর্লুম না, আর বাজে কথা বল্ব না। দিন্, এইখানটা আমায় একটু বুঝিয়ে দিন"—ব'লে সে শান্ত সুবোধ ছাত্রীর মতই বই খুলে বস্ল।

পাঁচ

যতীশ মাসকাবারে মাইনে নিয়ে দেশে যাওয়ার উদ্যোগ কর্চ্ছিল। সাম্নে শীত আস্ছে। এবার সুজাতার জন্য একখানি আলোয়ান কেনা বিশেষ প্রয়োজন। কয়েকটা দোকান ঘুরে একটায় গিয়ে কয়েকখানা আলোয়ান নিয়ে সে পছন্দ কর্ত্তে বসল, কিন্তু কোনটাই মনোমত হলো না। সহসা তার মনে পড়্ল, অনিমাকে দিয়ে পছন্দ করালে বেশ হয়। সে তখন অনিমাদের বাড়ী গেল।

নীলিমা গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। অসময়ে মাষ্টার-মশায়কে আস্তে দেখে সে বিস্ময়পূর্ণ-কণ্ঠে বল্লে, "আপনি এখন এলেন যে!" পরক্ষণেই সহজভাবে বল্লে, "আসুন, ঘরে গিয়ে বস্বেন চলুন।"

যতীশ সহসা থম্‌কে দাঁড়াল। এতক্ষণে মনে হলো—তার এ কি ভয়ানক স্পর্দ্ধা! একজন নগণ্য শিক্ষক হয়ে সে এসেছে এই ধনী নন্দিনীর কাছে নিজের প্রয়োজনে? এদের সাথে তার কতটুকু সম্পর্ক? সে এদের গৃহ-শিক্ষক, মাইনে করা ভৃত্যেরই সামিল। তার এই অসময় প্রবেশে সকলেই হয় ত কৈফিয়ৎ চাইবে। তখন যতীশ তাদের কি জবাবদিহি কর্‌বে? বল্‌বে কি—"আমার স্ত্রীর জন্য একখানা আলোয়ান কিনব, অনিমা গিয়ে পছন্দ করে দেবে।"

ছি, এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কি আছে!

যতীশ একটু কুণ্ঠিতভাবে নীলিমাকে বল্লে, "এই, মানে, আমি হঠাৎ এদিকে এসেছিলুম কি না, তাই একবার ভাব্‌লুম—" সে ঢোক গিলে চারদিকে চাইতে লাগ্‌ল।

নীলিমা সহাস্যে বল্লে, "তা' বেশ করেছেন। সে জন্য অত লজ্জিত হচ্ছেন কেন? আসুন, এক কাপ্‌ চা খেয়ে যাবেন। দিদি বাড়ী নেই, তার এক বান্ধবীর বাড়ী গেছে।"

যতীশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, "না না, এখন আমি চা খেতে পার্ব্ব না, মাপ কর্ব্বেন। মার্কেটে আমার বিশেষ কাজ আছে—" ব'লে সে ত্বরিত পদে পিছন ফিরে এক পা দু' পা করে একেবারে গেটের বাইরে এসে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচল। ভাগ্যে কেউ দেখতে পায় নি! ছিঃ, এমন পাগলও মানুষে হয়!

* * *

রাত্রে পড়াতে গেলে অনিমা তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, "মাষ্টার-মশায়, বিকেলবেলা আমাদের বাড়ীতে এসে তখুনি চলে গেলেন কেন? নীলি চা খেয়ে যেতে বলেছিল, তা' আপনি মোটেই দাঁড়ালেন না। আমি থাক্‌লে কখনও আপনাকে যেতে দিতুম না।"

যতীশ চেয়ারে বসে কুণ্ঠিত মুখে বল্লে, "আমার একটু দরকারী কাজ ছিল, তাই—"

অনিমা আর কিছু না ব'লে নতমুখে নিজের বই পড়ে যেতে লাগ্‌ল।

যতীশ বল্লে, "নীলিমা দেবী এলেন না?"

—"না, তার বড্ড মাথা কাম্‌ড়াচ্ছে, আজকে আর সে পড়্‌বে না।"

হঠাৎ এক সময় অনিমা মুখ তুলে দেখ্‌তে পেল, যতীশ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়া মাত্র যতীশ লজ্জিত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তার বুকের ভিতর গুবগুর কর্ত্তে লাগ্‌ল। অনিমা পড়া থামিয়ে মুখ নত করে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌ল। সহসা সে বল্লে, "আপনি কাল ভোরের গাড়ীতেই বাড়ী যাবেন, না?"

যতীশ মৃদুকণ্ঠে বল্লে, "হাঁ।"

অনিমা বল্লে, "আচ্ছা, আপনি মনে মনে খুব খুসী হচ্ছেন, বাড়ী গিয়ে সকলকে দেখ্‌তে পাবেন বলে?"

যতীশ অনিমার কণ্ঠস্বরে একটা কিসের আভাষ পেয়ে মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। অনিমার সুন্দর চক্ষু দু'টি জলে ভরা; ঠোঁট দু'খানি ভাবাবেগে কাঁপ্‌ছে।

সহসা যতীশের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠ্‌ল; সর্ব্বাঙ্গে যেন কিসের একটা আলোড়ন অনুভব কর্‌ল। মুহূর্ত্তমাত্র! হঠাৎ সে সরে এসে অনিমার হাত দু'খানি ধরে গাঢ়কণ্ঠে ডাক্‌ল, "অনিমা!"

অনিমা তার হাত ছাড়িয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

যতীশ স্তব্ধ হ'য়ে বসে থেকে ক্লিষ্টস্বরে বল্লে, "অনিমা, এ তুমি কি কর্‌লে! আমার সব পরিচয় তুমি জানো না, তাই আজ—না না, আমারই মূর্খতা। আমার ভুলের জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। শোনো, আমার সব পরিচয় তোমাকে দিচ্ছি। শুনে তুমি শান্ত হও।"

অনিমা চোখ মুছে স্থির হ'য়ে বসল।

যতীশ কম্পিত কণ্ঠে বল্লে, "আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী বেঁচে আছে।"

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে অনিমা যতীশের পায়ের ওপর আপনাকে লুটিয়ে দিলে। যতীশ সযত্নে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ব্যথিত-কণ্ঠে বল্লে, "এ তুমি কি কর্চ্ছ অনিমা! কেন অযথা এত কাতর হচ্ছ? তুমি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের স্ত্রী হবে, মান-মর্য্যাদায় সমাজে শীর্ষস্থানীয়া

হয়ে দাঁড়াবে, তুচ্ছ গৃহ-শিক্ষককের ওপর কেন তোমার লক্ষ্য থাকবে? শান্ত হও তুমি, কাল থেকে আমি আর তোমাদের এখানে আস্‌ব না।"

অনিমা এতক্ষণে যেন একটু স্থির হলো। ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে, "না, আমি আর বিচলিত হবো না। আপনি বসুন।"

উভয়েই নীরব। কক্ষমধ্যে তখন ভীষণ গাম্ভীর্য্য বিরাজ কর্‌ছিল।

অনিমাই প্রথমে এই নীরবতা ভঙ্গ করে বিবর্ণ-মুখে বল্লে, "সত্যি, আপনি আর আস্‌বেন না?"

—"না অনিমা, আমি কাল থেকে আর আস্‌ব না। আমার মন বড় দুর্ব্বল। হয় ত অন্তরে একটা প্রলোভন এসে যাবে। তখন যদি কিছু—না, কালকেই আমি চলে যাব। কিছুদিন পরেই তুমি আমাকে ভুলে যাবে। এ মর্ম্মান্তিক স্মৃতি যাতে তোমাকে আর না পীড়া দেয়, আমার তাই করা কর্ত্তব্য।"

অনিমা হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ সংযত করে মৃদুকণ্ঠে বল্লে, "আপনিও এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবেন। যদি জান্‌তুম আপনার—তা' হলে কখনো এভাবে নিজেকে ধরা দিতুম না। আমি—"

যতীশ সজল চক্ষে বল্লে, "তোমার দোষ কি অনিমা, যদি আগে থেকে তোমাকে জানিয়ে রাখ্‌তুম যে, আমি বিবাহিত, তা' হলে আজ তোমাকে অন্তরে এমন আঘাত পেতে হতো না। কিন্তু কি জানি কেন তোমার কাছে কিছুতেই ও কথা বল্‌তে পারি নি। তোমাকে কেন্দ্র করে একটা মধুর কল্পনা প্রাণের মাঝে আশার বাণী শুনিয়ে যেত, যার রেশটুকু আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারি নি। তুমি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করো।"

অনিমা আবার ঝরঝর করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। কম্পিত কণ্ঠে বল্লে, "আপনি—আপনি তা' হলে আমাকে ভালবাসেন?"

"বাসি অনিমা, সত্যি তোমাকে ভালবাসি—তবে এতে আমাদের ভাগ্যে শুধু গরলই উঠবে—এ ভালবাসা আমাদের সার্থক হ'তে পার্ব্বে না।"

"আপনার স্ত্রী আছেন বলে ত? কিন্তু তিনি যদি শোনেন তাঁর স্বামী অন্য কাউকে ভালবাসেন, তা' হলে কি আমাদের বিয়েতে আপত্তি কর্ব্বেন? আমার মনে হচ্ছে, হয় ত সন্তুষ্টচিত্তেই—"

—"কে, সুজাতা রাজী হবে ভেবেছ? পাগল! আমি তোমাকে যতই কেন ভালবাসি না, তবু সুজাতাকে ব্যথা দিতে পার্ব্ব না—কারণ, তা'কেও আমি ভালবাসি। হয় ত দু'দিন পরে তোমাকে ভুলে যাব—কিন্তু সুজাতাকে আমি জীবনে কোনোদিন ভুল্‌তে পারব না!"

অনিমা গাঢ়স্বরে বল্লে, "কে বল্‌ছে আপনাকে যে, আপনি তাকে ভুলে যান্! একজন লোকের দুই স্ত্রী কি থাকে না? সতীন আছে জেনেও যদি আমি আপনাকে বিয়ে কর্ত্তে রাজী হই, তা' হলে সেই পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা মেয়েটা কি—"

যতীশ বেশ সহজভাবে বল্লে, "তুমি ভুল কর্চ্ছ অনিমা, সুজাতা অশিক্ষিতা মোটেই নয়—তবে হ্যাঁ, তোমার মত কলেজের শিক্ষা না পেলেও হিন্দুর মেয়ের নৈতিক চরিত্র রক্ষার সৎশিক্ষা সে যথেষ্টই পেয়েছে।"

ভ্রূ কুঁচকে অনিমা প্রশ্ন কর্‌লে, "তার মানে?"

যতীশ মুখ গম্ভীর করে বল্লে, "বল্‌ছি। তুমি কিন্তু আগে একটা কথার উত্তর দাও। পরশুদিন তোমাদের বাড়ীতে ওই যে একটি সুন্দর ছোক্‌রাকে দেখ্‌লুম, ও কে?"

"মিঃ গুপ্ত। খুব বড়লোক উনি। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিদারী ওঁর। বাবার ইচ্ছে, মিঃ গুপ্তের সাথেই আমার—" অনিমা সহসা আরক্তমুখে থেমে গেল।

যতীশ সহানুভূতির সাথে বল্লে, "চুপ কর্‌লে কেন? উনি বিয়ে কর্ত্তে অনিচ্ছুক বুঝি?"

দুই চোখে বিদ্যুৎ হেনে অনিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্লে, "কি বল্‌ছেন মাষ্টার-মশায়, মিঃ গুপ্ত অনিচ্ছুক! শুধু আমার অনুমতির অপেক্ষা। উনি পা বাড়িয়েই আছেন। আমিই শুধু রাজী হই নি। নীলিমা ওঁকে ভালবাসে। ছোট বোন্ যাতে সুখী হয়—তা' ছাড়া, আমি ত ধনী, ঐশ্বর্য্য-

শালী স্বামী চাই না, আমি চাই দরিদ্র প্রেমিক।" দু' হাত প্রসারিত করে সে তখন যতীশের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

যতীশ ত্বরিত হস্তে অনিমাকে তার চেয়ারেই বসিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বল্লে, "আমিও ধনীকন্যা চাই না অনিমা, গরীবের মেয়ে সুজাতা আমার অনেক ভাল।"

অনিমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "আপনি আমাকে ইচ্ছে করেই আঘাত দিচ্ছেন। যাক্, আপনি চলে যান্, সব দুঃখই আমি সইতে পার্ব্ব।"

—"যাচ্ছি। যাবার আগে আমার স্ত্রী-সম্বন্ধে একটা গল্প বলে যাই। বড়লোকের ঘরেই তার সম্বন্ধ হয়েছিল। ছেলের বাপ তাকে দেখ্‌তে এসে একেবারে আশীর্ব্বাদের কথা তুলে বসলেন। সুজাতা বল্লে, 'সযত্নে তৈরী চারা গাছ যেমন অবহেলায় বনের মাঝে শুকিয়ে যায়, তেমনি বন্য-প্রকৃতির হাতের তৈরী ক্ষুদ্র ফুলটিও টবের মধ্যে শুষ্ক হয়ে উঠবে।' ভদ্রলোক বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অবাক্ হয়ে সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে গভীর কণ্ঠে বল্লেন, 'তাই হোক্ মা, বনের ফুল টবে সাজিয়ে আমি তোমার মর্য্যাদা হানি কর্ত্তে চাই না। তুমি যে প্রকারান্তরে আমার ইচ্ছে অপূর্ণ রাখ্‌লে, এতে আমি ব্যথিত হলেও বিরক্ত একটুও হই নি। তোমার মত লক্ষ্মীর মর্য্যাদা আমার লক্ষ্মীছাড়া বয়াটে ছেলেটা হয় ত সত্যিই রাখ্‌তে পার্ত্ত না। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে হলে। এই বুড়ো বাপ প্রায়ই তোমাকে দেখ্‌তে আসবে মা'।" এই কথা বলে যতীশ ঈষৎ হেসে চুপ করল।

অনিমা অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, "থাক্, থাক্, আর আপনার বুদ্ধিমতী স্ত্রীর প্রশংসা নাই বা কর্লেন! আমিও এত বোকা নই যে—" সহসা তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বল্লে, "আমারই ভুল হয়েছে, কেন আমি আজ এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়লুম! না, আমি আপনাকে ভালবাসি না—আপনি চলে যান্ এখনি—আর কোনোদিন এখানে আসবেন না বল্‌ছি! সত্য, চিরদিন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যে লালিত-পালিত, সে কি করে আপনার মত একজন তুচ্ছ ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে সেই দারিদ্র্যের মাঝে জীবন কাটাবে! ছিঃ! আর আপনার স্পর্দ্ধাকেও বলিহারী যাই! আপনি আসেন কি না আমাকে ভালবাসা জানাতে? বেরিয়ে যান্ বল্‌ছি!"

যতীশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বল্লে, "যাচ্ছি অনিমা। কিন্তু আমার একটা কথা বিশ্বাস করো তুমি। তোমার মনে এই যে আঘাত দিলুম, এ তোমার ভালর জন্যই। আমি ইচ্ছে করেই এটা করে গেলুম। যখন তোমার বিয়ে হবে, তখনকার সেই সুখের দিনে আজকের এই ক্ষণটির তুলনায় বিচার করে তুমি বুঝ্‌বে—এ তোমার পক্ষে বেশ ভালই হয়েছে। এ ব্যথা না দিলে আমি তোমাকে কিছুতেই সুখী কর্ত্তে পার্ব্ব না। আমি জানি, তুমি এটা সহজেই নিজের মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পার্ব্বে।"

অনিমা দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বিকৃত-কণ্ঠে বল্লে, "আপনি এখনই চলে যান্ বল্‌ছি। আমি—আমি—আমি আপনাকে ভয়ানক ঘৃণা করি।"

যতীশ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েও একবার পিছন ফিরে অনিমার প্রতি চাইল।

অনিমা সজোরে ওষ্ঠাধর দংশন করে মুখ নত কর্ল। যতীশ বিহ্বলভাবে দুই বাহু প্রসারিত করে অনিমার দিকে অগ্রসর হয়ে, পরক্ষণেই কি মনে করে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে একেবারে রাজপথে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি মেলে সে এক বৎসরের পরিচিত ওই অট্টালিকার দিকে একবার সজল চক্ষে ফিরে চাইল। তার মনে হলো, অনিমা যেন এখনই ছুটে এসে তাকে বল্‌বে, "তুমি যেও না! ওগো, ফিরে এস!"

যতীশ তখন সেখান থেকে দ্রুতপদে নিজের মেসে চলে এল। মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল, "এ বেশ হলো! অনিমা, তোমাকে ভালবাসি বলেই দুঃখ দিতে পার্‌লুম না!"

পরদিন যতীশ দেশে না গিয়ে স্ত্রীর কাছে একখানি চিঠি লিখে পাঠাল।

ছয়

যতীশ সুজাতাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, "এতদিন পত্র পাও নি বলে তোমার খুবই রাগ হয়েছে, না সু?"

সুজাতা চোখের জলের মাঝে হেসে ফেলে বল্লে, "না,

হবে না! আমি কোথায় মনে মনে আশা করেছিলুম, তুমি আসবে—না এলো তোমার চিঠি! তারপর এই তিনটে মাস কি উৎকণ্ঠায় যে কেটেছে, তা' আর তোমায় মুখে বলে কি বোঝাব! তুমি এমন নিষ্ঠুর যে, সেই একখানি পত্র দেওয়ার পর আর আমার খোঁজই কর্লে না—আমি বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি!" তার চোখের প্রান্ত বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়্তে লাগ্ল।

যতীশ আদর করে স্ত্রীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে সু! কিন্তু, আমি যে তখন নিজের মনকে শুদ্ধ করে নিচ্ছিলুম, তাই ত অমন করে চুপ করেছিলুম। আমি তোমার ওপর ভয়ানক অবিচার করেছি সুজাতা, তাই চিত্তশুদ্ধির জন্য এতদিন তপস্যা করেছি। আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে—মনের কালিমা দূর হয়েছে—তোমার প্রেমে আবার আমার অন্তরকে অগ্নি-শুদ্ধ করে নেব।"

সুজাতা কিছু বুঝ্তে না পেরে স্বামীর মুখের প্রতি অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বল্লে, "কি বল্‌ছ তুমি, আমি ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি না।"

যতীশ তখন অনিমার কথা সব প্রকাশ কর্লে; নিজের মনের সেই ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যটুকুও গোপন কর্লে না।

সুজাতা স্বামীর মুখের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে আপন-মনে কি যেন ভাব্তে লাগ্ল।

যতীশ স্ত্রীকে নীরব দেখে গাঢ়কণ্ঠে বল্লে, "আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর্ত্তে পার—কিন্তু মনে রেখো, আমি কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম। যখনই তোমার প্রেমপূর্ণ ছবিখানি আমার মানস-পটে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্ল, তখনই আমার জ্ঞান হলো। বুঝ্লুম, কি ভীষণ বিপদের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি! আমি অনিমাকে তাড়াতাড়ি তার চেয়ারে বসিয়ে তোমার কথা বল্লুম। তোমার তেজস্বিতার গল্প কর্লুম। সে রেগে গেল। আমি যা' ভেবেছিলুম, ঠিক্ তাই হলো। তার আশাভঙ্গে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে সেই মুহূর্ত্তে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বল্লে। আমি চলে এলুম। মনে মনে ভারী অনুশোচনা হলো, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে। তাই পরদিন একখানা চিঠি লিখে দিলুম তোমার কাছে। তারপর দু'-চারদিনের চেষ্টাতেই একটা চাকরী পেয়ে গেলুম। মনকে এই তিন মাস বুঝিয়ে ঠিক্ করে আজ তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। আর আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে থাক্‌ব না।"

সুজাতার চোখ দু'টি অশ্রুভারে টলমল করে উঠ্ল। গাঢ়কণ্ঠে সে বল্লে, "উঃ, তুমি কি ভয়ানক পাষাণ! অনিমার অতখানি ভালবাসার কোন মর্য্যাদাই রাখ্লে না তুমি! কি আছে আমার, যার জন্যে তাকে অতটা আঘাত দিলে? তুমি কি বুঝ্তে পার না যে, তোমার একটুখানি সুখের জন্য আমি হাসিমুখে আমার প্রাণটাই দিয়ে দিতে পারি—সপত্নী নিয়ে ঘর করা ত দূরের কথা! আর তুমি কি না বল্লে,—'এ বিয়েতে আমি কখনই রাজী হবো না!' ছি ছি, অনিমা না জানি আমাকে কতখানি স্বার্থপরই ভেবে রেখেছে! এ কিন্তু তোমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে।"

যতীশ সুজাতার একখানি হাত সস্নেহে চেপে ধরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে, "না সুজাতা, অনিমা তোমাকে মোটেই স্বার্থপর ভাব্তে পারে নি। তবে আমার কাছে তোমার প্রশংসা শুনে হিংসেয় সে শেষটা আমায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বল্লে। এতে ত বেশ ভালই হয়েছে সু। সে বুঝ্তে পেরেছে যে, আমি তাকে ভালবাসি না—তাই সে এখন অপরকে ভালবেসে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা কর্ব্বে। এতে আমাদের মঙ্গলই হবে। উপন্যাসে যা' খুসী লেখা থাকুক্ না কেন, বাস্তবে এ সব সৌখীন প্রেমের কোনো মূল্যই নেই।"

সুজাতা বল্লে, "কিন্তু আমার মনে হয় অনিমাই হয় ত তোমার ভালর জন্যে তোমাকে প্রতারণা করেছে। তুমি মনে ভেবেছ, তুমি জিতেছ—কিন্তু এও ত হতে পারে যে, সে যখন বুঝেছে যে, তোমার স্ত্রী আছে এবং তাকে তুমি ভালবাস, তখন নিজের ত্রুটি সংশোধন কর্ব্বার জন্যই তোমাকে অমন করে চলে যেতে বলেছিল। তুমি কি মনে কর্‌বো সে তোমাকে সত্যই ভুলে গেছে, তোমার ওপর তার

প্রেম এখন ঘৃণায় পরিণত হয়েছে?" এই কথা বলে সুজাতা স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্ল।

যতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লে, "থাক্ সুজাতা, আর ও কথায় কাজ নেই। তোমার ওপর আমি যথেষ্ট অন্যায়ই করেছি, আর অপরাধের বোঝা বাড়াতে চাই না। মনকে লাগাম ছাড়া কর্ত্তে নেই—কে জানে কোন্ বিপথে ছুটে গিয়ে কি বিপদ ঘটিয়ে বস্‌বে! অনিমা সুখে থাক্, তার স্মৃতি আর যেন আমাদের মনকে পীড়িত না করে।"

সুজাতা স্বামীর কণ্ঠদেশ সাদরে জড়িয়ে ধরে দুঃখ-ম্লান-কণ্ঠে বল্লে, "কিন্তু তা' কি সম্ভবপর? আমি যে তোমার অন্তরের সব পরিচয় ভাল রকম জানি। আমাকে পেয়ে তোমার প্রাণের রূপ-তৃষ্ণা মেটে নি। অনিমাকে দেখে তাই ত মনের ক্ষুধা বেড়ে গিয়েছিল—এ তুমি আমার দিকে চেয়ে মুখে যতই আস্ফালন করো না কেন, সত্যিই কি তাকে একেবারে ভুল্‌তে পার্ব্বে? না না, আমি অত কঠিন প্রাণ নই গো! তুমি আমার জন্য এতখানি কর্লে, আর অনিমার কথা বল্লে আমি তোমার ওপর রাগ কর্ত্তে পারি কি? মনে মনে কেবলই ভাব্‌ছি, আমার জন্যেই তোমার যত কষ্ট। আমি যদি মরে যাই, তা' হলে তোমার এ দুঃখ—"

যতীশ সুজাতার মুখে হাত চাপা দিয়ে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বল্লে, "ও কথা তুমি আর বলো না সু, আমি তোমাকে পেয়ে খুবই সুখী হয়েছি। সামান্য একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে বলে কি চিরদিনই আমাকে অপরাধী মনে কর্ব্বে?"

সুজাতা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "অনিমাকে আমি ভুল্‌তে পাচ্ছি নে—বেচারী তার মনের এ গভীর দুঃখ কি করে সাম্‌লে চল্‌বে!"

যতীশ বেশ সহজভাবেই বল্লে, "অনিমা আমাকে ভুলে গেছে নিশ্চয়। যদি কোনোদিন তাকে দেখ্‌তে পাই, তখন দেখ্‌ব সে বিয়ে করে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছে। আমাকে তখন হয় ত চিন্‌তেই পার্ব্বে না।"

সুজাতা রাগ করে বল্লে, "তাই না কি! নারীর মন অত খেলো কি না! যেমনি পুরুষজাত নিজে, তেমনি সব্বাইকে মনে করে।"

যতীশ আহতভাবে বল্লে, "ঠিক্, এ তিরস্কার আমার উপযুক্ত বটে! তোমার কাছে আমি কত বড় অন্যায় করেছি, সে কথা মনে হ'লে আমার বুক ভেঙে যায়! তুমি সে সব কোনোদিন—"

যতীশের বাক্য অসমাপ্ত থাক্‌ল, তার চোখ সজল হয়ে উঠ্‌ল। সুজাতা স্বামীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে, "না, তুমি ভারী ছেলেমানুষ! তুমি কেন এত কুণ্ঠিত হও, কেন এত দুঃখ পাও? মানুষের মনে প্রেমের সমুদ্র লুকানো আছে। তার দু'-একটা তরঙ্গ উছলে উঠেছে, তা'তে কি এমন দোষ হয়েছে। আমি নদী, তুমি পারাবার। আমার লক্ষ্য তোমার দিকে। তোমার গভীরতায় আমার আশ্রয়। তুচ্ছ বীচিমালার বিক্ষোভে আমি ক্ষুব্ধ হবো কেন?"

যতীশ পত্নীর প্রেম-স্নিগ্ধ মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত কর্ল।

সাত

পনের বছর পরের কথা। যতীশের এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী এবং তিনটি ছেলে-মেয়ে। আয় আন্দাজে ব্যয় কম। ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যতীশ তিন বছর যাবৎ কোলকাতার সহরতলীতে ছোট একখানি একতলা বাড়ী কিনেছে। তার মেয়েটিই বড়, বেথুন স্কুলে সে অধ্যয়ন করে। ছেলে দু'টি ছোট, বাড়ীতে বাপের কাছে পড়ে।

সন্ধ্যার পর ছেলেরা পড়া কর্চ্ছিল। কন্যা সুপর্ণা মায়ের কাছে বসে স্কুলের গল্প কর্চ্ছিল। সে বল্‌ছিল, "দেখো মা, আজকে আমাদের স্কুলে একটা মজা হয়েছে! তখন টিফিনের সময়। একজন মেয়েছেলে গাড়ী করে এসে আমাদের স্কুলে ঢুক্‌লেন। কি চমৎকার মা তাঁর চেহারা! যেন একখানি ছবি! তিনি আমাদের সব ক'টি মেয়েকে কাছে ডেকে কত কথা জিগ্‌গেস কর্‌লেন। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর কর্ত্তে লাগ্‌লেন। আমার কিন্তু ভারী লজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌ল। আমি তারপর এক সময় তাঁকে বলে ফেল্লুম, "আপনি বড় ভাল লোক। আমাদের বাড়ী যাবেন এক দিন? আমার মা আপনাকে দেখ্‌লে কত খুসী হবেন।"

সুজাতা ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে বল্লে, "মুখপুড়ী, ও সব কথা বল্‌তে তোর লজ্জা হলো না? কোথাকার কে তার ঠিক্ নেই, অমনি উনি আলাপ জুড়ে বস্‌লেন।"

সুপর্ণা মায়ের বকুনী খেয়ে মুখভার করে বল্লে, "বারে, আমাকে অত আদর কর্লে'ন, আর আমি দুটো কথা বলেছি বলেই যত দোষ হয়ে গেল! কালকে বরং ওঁকে বারণই করে দেবো, কাজ নেই আমাদের বাড়ী এসে।" বলার সাথে সাথে তীব্র অভিমানে সে মুখ নত কর্ল।

সুজাতা শঙ্কিত হ'য়ে বল্লে, "না না, তা' কি বল্‌তে আছে! একবার যখন আস্‌তে বলেছিস্, তখন আর কি না করা যায়। বেশ ত, কালকেই তাঁকে নিয়ে আসিস্।"

সুপর্ণার রাগ তখনও পড়ে নি। ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বল্লে, "কাজ কি অত ঝঞ্ঝাটে! তুমি যখন অপছন্দ কচ্ছ—"

সুজাতা ঈষৎ হেসে মেয়েকে কাছে টেনে এনে তার মুখ তুলে ধরে স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে বল্লে, "হ্যাঁরে, এখনো তুই ছোট্টটি আছিস না কি! কোন কথা তোর সহ্য হয় না; অমনি চোখ ছলছল করে ওঠে। শ্বশুর-বাড়ী গেলে কি কর্ব্বি? তোর বাবাই ত তোকে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে পরকালটি নষ্ট করে দিয়েছেন।"

—"আহা, যত দোষ যেন আমার একলার! তুমিই ত দিনরাত বলো ছেলের চাইতে মেয়েকে তোমার বেশী ভাল লাগে—" বল্‌তে বল্‌তে যতীশ এসে ঘরে ঢুকে স্ত্রীর পাশে বসে পড়্‌ল।

সুজাতা মুখ নাড়া দিয়ে বল্লে, তা' সত্যিই ত! সুপর্ণাকে আমি প্রথম কোলে পাই, ও আমার নাড়ীছেঁড়া ধন। ওকে যদি ভাল না লাগে, তবে আর লাগ্‌বে কা'কে তাই শুনি?"

যতীশ হেসে বল্লে, "মনোজ আর সরোজ তা' হলে তোমার নাড়ীছেঁড়া নয়, পুষ্যি ছেলে বলো।"

সুজাতা বল্লে, "বালাই, ষাট্, ও কি অলুক্ষণে কথা! ওরা পুষ্যি হতে যাবে কেন? হাতের পাঁচটা আঙুলই সমান। তবে কি জানো, মেয়ে মায়ের ব্যথা যত বোঝে, ছেলে তা' কখনই বোঝে না। সেই জন্যে লোকে মেয়েকেই বেশী ভালবাসে—আর আমার সুপর্ণার মত মেয়েকে কি কেউ ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে? ও যে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী! এখন কার ঘরে যাবে, কে জানে!"

মাতা-পিতার স্নেহের বন্যায় সুপর্ণার ক্ষণস্থায়ী অভিমানটুকু কর্পূরের মত উবে গেল। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "বাবাকে বকো না মা-মণি, আমি যে তাঁকে কালকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি।"

সুজাতা স্বামীর দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে, "এই দেখো, তোমার আদুরে মেয়ে স্কুলে কা'কে আবার নেমতন্ন করে এসেছে।"

যতীশ প্রশ্নপূর্ণ-নেত্রে কন্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্ল।

সুপর্ণা বল্লে, "আমাদের ক্লাসে লতিকা নামে একটি মেয়ে পড়ে বাবা, তার মাসীমা স্কুল দেখ্‌তে এসেছিলেন। ভারী চমৎকার লোক! আমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি কত আদর, কত কথা জিজ্ঞেস কর্লে'ন। আমি তাই ত তাঁকে আমাদের বাড়ীতে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। তিনি কাল বিকালে আস্‌বেন বলেছেন।"

যতীশ বল্‌লে "বেশ করেছিস। তা' আমাকে সে জন্যে কি কর্ত্তে হবে?"

—"তুমি কালকে আর অফিসে বেরুতে পার্ব্বে না বাবা, তিনি এলে একটু যত্ন-আত্তি—"

—"ওরে বাবা, মেয়ের কথা শোনো একবার! একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে পড়েছেন! হ্যাঁরে, লোক এলে আমরা খুব অযত্ন করি বুঝি?" সুজাতা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রশ্ন কর্ল।

"বাঃ, আমি বুঝি তাই বল্লুম!" লজ্জায় সুপর্ণা জননীর কোলে মুখ লুকালো।

আট

"কই গো, সুপর্ণা ত এখনো এলো না? ছেলেমানুষের কথায় মিছিমিছি কতগুলি টাকা না-হক্ খরচ হয়ে গেল।"

কর্ম্মনিরতা পত্নীর এই অপ্রসন্ন উক্তিতে যতীশ কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্লে, "আহা, খাবারগুলোর জন্য এত

ব্যস্ত হচ্ছো কেন বলো ত? অতিথির ভাগটা না হয় তুমি আমাকেই—"

সুজাতা রাগ ভুলে গিয়ে হেসে ফেল্লে। বল্লে, "বেশ ত পেটুক-মশায়, কত খেতে পার দেখে নেবো। কিন্তু হ্যাঁ গা, তিনি যদি সত্যিই না আসেন, তবে কেন শুধু শুধু এত পরিশ্রম করে বাড়ী-ঘর-দোর সাজালুম বলো ত? এই যে কুড়ি পঁচিশ টাকার ফুল কিনে সাজানো, এর কি প্রয়োজন ছিল?"

যতীশ বল্লে, "কিন্তু, তুমিই ত বল্লে, এমন করে তাঁকে আদর-যত্ন কর্ব্বে, যাতে সত্যিই তিনি খুসী হন্। সুপর্ণা আগেই ত বলে রেখেছে—"

সুজাতা বল্লে, "নিশ্চয় যত্ন কর্ব্ব! সুপর্ণাকে যখন অত আদর করেছেন, আমরাও তখন তাঁকে—"

—'আহা, খালি সুজাতা কেন, আরো অনেক মেয়েকেই ত তিনি আদর করেছেন। তাই বলে সবাই যদি এমনি করে নিমন্ত্রণ সুরু করে দেয়, তা' হলে এটা যে রীতিমত একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে।"

সুজাতা রাগ করে বল্লে, "কি যে সব বল তুমি! ছেলে-মানুষ ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলেছে বলে অত ব্যাখ্যান কেন? আর এটা অন্যায় ত কিছু নয়। হলেনই বা তিনি অপরিচিতা। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে স্নেহটাই সব চেয়ে বড় জিনিষ। আমি ত অবাক্ হয়ে গিয়েছি, সুপর্ণার সাহস দেখে। কেমন সে 'টপ্' করে একেবারে বাড়ী যাওয়ার কথা পেড়ে বস্‌ল। কিন্তু নাঃ, ওঁরা যে এখনো এলেন না—"

যতীশ একটু উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনতে পেয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠ্‌ল, "ওই যে মোটর 'হর্ণে'র শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় সুপর্ণারা এসেছে। তুমি 'চট্' করে কাপড়টা বদ্‌লে নাও। ওঁরা ঠিক্ সময়েই এসে পড়েছেন। আমরাই যত ব্যস্তবাগীশ! ভাগ্যিস্ উনি মহিলা অতিথি—যদি পুরুষ হতেন, তা' হলে তোমার এই রূপ দেখে—"

সুজাতা মুখ ভেঙিয়ে বল্লে, "থাক্, থাক্, আর কথায় কাজ নেই! তা' উনি যখন মেয়েমানুষ, তখন আমার সাজ-সজ্জার বদলে তুমিই সাজগোজ করে নাও গে। আমি কোথাকার অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে, আর অতিথিটী—"

যতীশ কাণ মলে বল্লে, "এই কাণ মলা খাচ্ছি, আর তোমাকে ঘাঁটাব না। ওই দেখো, গেটের কাছে মোটর থাম্‌ল। আমি ওইদিকের ঘরটায় বসি গে, নেহাৎ দরকার না হলে আমায় ডেকো না।"

সুজাতা বাইরে এসে লাল সুরকী বিছান ছোট রাস্তায় নেমে পড়ে হাসিমুখে অতিথিকে অভ্যর্থনা কর্ল, "আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার!" বলে সে গেটের দিকে ঈষৎ অগ্রসর হলো।

মোটর থেকে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী নেমে এল। তারপর সুপর্ণা ও অপর একটি বালিকা নাম্‌ল।"

সুজাতা কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই মহিলাটি তার হাত দু'খানি ধরে স্নিগ্ধ-মধুর-কণ্ঠে বল্লে, "নমস্কার কেন কর্চ্ছ ভাই? আমরা যে প্রায় একবয়সী, দু'টি বোন্। এইবার চলো ভাই, তোমার খোকাদের দেখি গে।"

সুজাতা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল—এমন আশ্চর্য্য নারীর সাথে তার পরিচয় নেই! সাধে কি আর সুপর্ণা ভুলেছে। আত্মসংবরণ করে হাসিমুখে সে সকলকে বড় ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে বসালো। মহিলাটি এক হাত দিয়ে সুপর্ণাকে কাছে টেনে তার মাথায় চুমু খেয়ে, সুজাতাকে বল্লে," তোমার এই মেয়েটি কি চমৎকার ভাই, আমার ছাড়্‌তে ইচ্ছে করে না! তারপর নিজের সঙ্গে আনীত মেয়েটীকে দেখিয়ে বল্লে, "এটি আমার ছোট বোনের মেয়ে। লতিকা, এঁকে প্রণাম কর। ইনি তোমার মাসীমা হন্।"

লতিকা সুজাতাকে প্রণাম কর্ল। সুজাতা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে নিজের মেয়েকে বল্লে, "সুপর্ণা, যাও, লতিকাকে নিয়ে গল্প কর গে।"

সুপর্ণা অভিমান করে বল্লে, "হ্যাঁ, এখন তোমরা নিজেরা কথা বল্‌বে কি না, তাই আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ। আয় ভাই লতিকা, আমরা বাইরের বারান্দায় বসে গল্প গল্প করি গে।"

সুপর্ণা লতিকাকে নিয়ে চলে গেল। মহিলাটি ঈষৎ

হেসে বল্লে "সুপর্ণা কি ছেলেমানুষ ভাই! আহা, এমনি সরল মন ওর চিরদিন থাকুক্!"

সুজাতা বল্লে, "আপনার ছেলে মেয়ে ক'টি?"

"একটিও নেই। কিন্তু, আমাকে আপনি বল্‌ছ কেন? আমি 'তুমি' বল্‌ছি, অথচ—আমি ভাই অত পর পর ভালবাসি না।" কথার শেষে তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল।

সুজাতা তাড়াতাড়ি বল্লে, "না না, আমাকে মাপ কর ভাই, আমাকে তুমি সুজাতা বলেই ডেকো।"

সহসা মহিলাটির নয়নদ্বয় জ্বলে উঠ্‌ল। সে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে, "কি, কি নাম তোমার?"

সুজাতা মনে মনে বিস্মিত হলো। বল্‌লে, "আমার নাম সুজাতা। কেন, আপনি আমায় চেনেন না কি?"

মহিলাটি মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সহজ সুরে বল্‌লে, "আঃ, তোমার বড় ভুলো মন—এই আবার আপনি সুরু কর্লে। নাঃ, তোমাকে আমি চিনি না; তবে ওই নামে অন্য একটি মেয়েকে জান্‌তাম।

হঠাৎ সুজাতা প্রশ্ন করে বসল, "তোমার নাম কি অনিমা?"

এইবার তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। শুষ্ককণ্ঠে আপন-মনেই সে বারবার উচ্চারণ কর্ত্তে লাগ্‌ল, "অনিমা—অনিমা—অনিমা!"

অনিমা একবার সুজাতার ম্লান ব্যথিত মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত কর্ল, তারপর তাকে ব্যগ্রভাবে জড়িয়ে ধরে সজল চক্ষে হেসে বল্লে, "আমি চিনেছি ভাই, তুমি যতীশ-বাবুর স্ত্রী। নয় কি?"

সুজাতা তখন নিজের মুখখানি অনিমার বুকে লুকিয়ে রেখে চুপ করে রইল। অপরিচিতা, অথচ পরস্পরের কাছে চির-পরিচিতা রমণীদ্বয়ের অন্তরে কত অজানা বেদনা একই সময়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। উভয়ের চোখের জলে বসন সিক্ত হ'তে লাগ্‌ল।

একটু পরে চোখ মুছে অনিমা গাঢ়কণ্ঠে বল্লে, "আর ত আমি থাক্‌তে পার্‌ব না সুজাতা, এইবার আমায় উঠ্‌তে হবে।"

"না ভাই, আজকের দিন্‌টা থেকে যাও। ছেলেমেয়ে যখন নেই, তখন আর ভাবনা কিসের? তোমার স্বামী যদি ব্যস্ত হন্, তবে একটা 'ফোন্' করে দেবো 'খন। কি বলো?"

অনিমার মুখে তার সহজ সুন্দর হাসিটি ফুটে উঠ্‌ল। সে বল্লে, "বিয়ে কর্লে ত তবে স্বামী থাক্‌বে? আমার ও সব হাঙ্গাম নেই ভাই।"

সুজাতা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর একটা নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে, "কেন বিয়ে কর নি ভাই? তোমার এত রূপ, এত গুণ, এ কি এমনি বৃথায় নষ্ট হবে?"

অনিমা রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে "বাঙালীর মেয়ের ক'বার বিয়ে হয় সুজাতা? তোমাকে কি তিনি কিছু বলেন নি?"

"বলেছেন বই কি—নইলে আর তোমার নাম শুনে চম্‌কে উঠ্‌ব কেন। ওঁর কিন্তু ধারণা, তুমি বিয়ে-থা করে ছেলেপুলে নিয়ে বেশ সুখেই আছ। আজ যখন আমার কাছে সব কথা শুন্‌বেন, তখন তাঁর বুক্‌টা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।"

ব্যাকুলভাবে অনিমা বল্লে, "সে কি, তুমি আমার কথা ওঁকে বলবে না কি? খবরদার, অমন কাজটি করো না! আমার দুঃখ কিসের? বেশ ত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা কর্চ্ছি, কারও মুরুব্বীয়ানা সহ্য কর্ত্তে হচ্ছে না। বেশ শান্তিতেই আছি আমি।"

"না, এ তোমার শান্তি নয়। অন্তরে তোমার পত্নীত্ব, মাতৃত্ব পূর্ণমাত্রায় জেগে আছে। ছোট ছেলেমেয়েদের তুমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাস। কেন, কিসের জন্য তুমি নিজের জীবনটা ধ্বংস করে দিলে? সেদিন কেন তুমি আমার কাছে সে পাড়াগাঁয়ে চলে এলে না? আমাকে তোমার এত ঘৃণা হলো যে, যাঁকে ভালবাস তাঁকে পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্লে?"

সুজাতা এবার কেঁদে ফেল্ল। অনিমার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। চুপিচুপি সে বল্লে, "ছি সু,

তোমাকে ঘৃণা কর্ব্ব—এ কি একটা কথা! আমি ভাল ভেবেই তখন অত কঠিন হয়েছিলুম। আমি নিজে অনেক দুঃখ সইতে পারি, কিন্তু, যারা আমার প্রিয়জন, কিছুতেই তাদের ব্যথা এতটুকু সহ্য করতে পারি না। তোমাদের দেখ্‌তে পাব—এ আশা আমার কোনোদিন ছিল না। আজ আমি বড় সুখী হয়েছি সুজাতা, মনে আর আমার কোনো দুঃখ নেই। তোমাদের সোনার সংসার দেখে আমার মন খুব তৃপ্ত হয়েছে। আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাই ভাই, সুপর্ণাকে আমার হাতে দাও। ওকে আমি মানুষ কর্ব্ব। বাবা আমাকে যথেষ্ট টাকা-পয়সা দিয়ে গিয়েছেন। তা' ছাড়া, আমি নিজেও চাকরী করি। সুপর্ণাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল পাত্র দেখে ওর বিয়ে দেব। তোমার স্বামীকে বলে সব ঠিক্ করে রেখো, আমি কালকেই রওনা হতে চাই।"

সুজাতা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বল্লে, "একবারটী ওঁর সঙ্গে দেখা করবে না ভাই? আমি—"

শঙ্কিত হয়ে অনিমা বলে উঠ্‌ল, "ছি, ছি, তা' কি কর্ত্তে আছে! এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাম্‌নে ওসব নাটুকেপনা শোভা পায় না। আমি এইবার উঠি ভাই।"

—"দাঁড়াও ভাই, একটু মিষ্টি মুখ করে নাও। ধূলো পায়ে বিদায় নাই বা নিলে?"

সপ্ত

সন্ধ্যা সমাগত। পুরীর বেলাভূমে বসে অনিমা মুগ্ধ-চক্ষে সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছিল। স্বাস্থ্যকামী নরনারী বায়ু সেবনার্থ ইতস্ততঃ পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন।

সুপর্ণা দূরে বসে অপলক-নেত্রে চেয়ে সাগরের সেই মহান্ রূপরাশি অন্তরে অন্তরে উপভোগ কর্চ্ছিল। কি মনে করে সে অনিমার নিকট এসে সোল্লাসে বলে উঠ্‌ল, "কি চমৎকার দৃশ্য মাসীমা! সমুদ্র যে এত সুন্দর, এ আমি জীবনে কোনোদিন কল্পনা কর্ত্তে পারি নি!"

অনিমা চোখ না ফিরিয়েই বল্লে, "অনন্ত চিরদিনই এমনি সুন্দর মনোমুগ্ধকর সুপর্ণা! সেই গানখানি একবার গা না মা। এ সময় বড় সুন্দর লাগ্‌বে। সেই যে, 'অনন্ত সাগর মাঝে'—"

সুপর্ণা অনিমার পাশে বসে পড়ে মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগ্‌ল—

"অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে সুখ, গেছে দুঃখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি,
আমি সে পথের যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিক্‌বিদিক্ হারাইয়া।
জলধি রয়েছে স্থির,
ধূধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ,
মন্ত্রে যেন সবই স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে দুই বাহু প্রসারিয়া।
অনন্ত সাগর মাঝে দাও (আমার জীবন)
তরী ভাসাইয়া।"

শ্রীমতী রাণী দেবী

তন্নিবন্ধন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

সংসারে দেখা যায়, শুধু অর্থই মানুষের মনে যথার্থ সুখ-শান্তি দিতে পারে না। যেখানে অর্থ আছে প্রচুর, সেখানে হয়তো শান্তি আছে অল্প। সুবিমলের সংসারে অর্থের অনটন নাই। কিন্তু মনের সুখ-শান্তির অভাব তাহাকে আনমনা করিয়া তুলে। বাপ লোকান্তরিত হইয়াছেন শৈশবে। নিজের মাও নাই। সৎ-মা আছে। সে না থাকারই মত। নিজের ছেলে-মেয়েকে লইয়া ব্যস্ত। মানে, ইহারাই আপনার, আর সব পর। শুধু পর নহে—শত্রু।

* + * *

গ্রামের একপার্শ্বে সংহারী নদী। নদী ছোট, সংহার শক্তি বড়। শোনা যায়, এই নদীতে অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে।

রাত্রি বোধ করি এগারোটা হইবে। চতুর্দ্দিক গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সত্যই মনোরম। বড় বড় গাছের পাতা এবং শাখার ফাঁক দিয়া জ্যোস্নাধারা আসিয়া মিশিয়াছে—সংহারী নদীটার কালো জলের সঙ্গে। আশপাশে জোনাকী পোকার মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিয়া এবং পরক্ষণেই নিবিয়া যাওয়া আলোটুকু দূর, বহু দূরের দীপ্তমান চাঁদের সঙ্গে বৃথাই প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। এই প্রাণীদের জন্য দুঃখ হয় না—মনে জাগে সহানুভূতি। ঝিঁঝিঁ পোকার গান আর ভেকের ডাক এদিক্-ওদিক্ হইতে কানে আসিয়া বাজে। মাঝে মাঝে শিয়ালের চীৎকার নদীটার জলে প্রতিধ্বনিত হইয়া ধীরে ধীরে বাতাসেই মিলিয়া যায়।

সুবিমল আসিয়া বসিল—নদীটার ঘাটে। ঘাটে বাঁধানো সিঁড়ি। সংখ্যায় বোধ হয় পাঁচ-সাতটা হইবে। হাতে তাহার একটি বাঁশের বাঁশী।

সিঁড়িগুলি পার হইয়া সুবিমল জলে পা দুইটি রাখিয়া বাঁশীটা কাৎ করিয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিল, করিয়া একবার উপর দিকে চাহিল। সুন্দর, সুশ্রী বাহুল্য-বর্জ্জিত মুখ বেদনায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে।

একে এমনি রাত্রি! তার উপর বেহাগের করুণ সুর! আনাচকানাচের গাছপালা পর্য্যন্ত যেন একাগ্রতায় মোহিত হইয়া সুবিমলের বাঁশী শুনিতেছে।

এমনি বহুক্ষণ গত হইয়া গেল। সহসা কাঁধের উপর একখানি কোমল হস্তের স্পর্শ পাইয়া সুবিমল বাঁশী থামাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। দেখিল, কেতকী সাশ্রু-নয়নে দাঁড়াইয়া আছে।

পরিষ্কার কালো জলের মধ্যে দুইটি তরুণ-তরুণীর প্রতিবিম্ব। দক্ষিণ দিক্ হইতে মৃদু-মন্দ বাতাসের দোলায় জল কাঁপিতেছিল। উভয়ের প্রতিচ্ছবিও সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য জলের পানে চাহিয়া সুবিমল উঠিয়া দাঁড়াইল। কেতকীর সঙ্গে একটা কথাও বলিল না।

চলিবার উপক্রম করিতেই কেতকী পথরোধ করিয়া তাহার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল। চাপা বেদনার গুরুভারে এবার সত্য-সত্যই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সুবিমলের মুখের প্রতি অপলক-নেত্রে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, সত্যিই তুমি যাবে?

নিঃশব্দে সে তাহার হাত হইতে নিজের হাত মুক্ত করিয়া লইল। এবং ইহারই অনতিকাল পরে কেতকীর সমস্ত মুখখানা দেখিয়া লইয়া শুধু বলিল, পথ ছাড়ো।

কেতকী একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ করিয়া দিল। সুবিমলের নগ্নপদদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিয়া কিছুক্ষণ

নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতেই সঞ্চিত অশ্রুরাশি তাহার চোখের দুই কোণ বাহিয়া নাকের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সুবিমলের সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া একটা সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সম্মুখে কামনার নারী। তাহার উষ্ণ নিশ্বাস অবধি গায়ে আসিয়া মিশিতেছে। এক-একবার তাহার মন বলিতে লাগিল, যে নারী তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে এমনিধারা বেদনার গুরুত্বে মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করা উচিত হইবে কি ?

কিন্তু না, মানুষ কামনার দাস বলিয়াই কি তাহাকে কামনার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিতে হইবে ? তাহার পৌরুষ তবে রহিবে কোথায় ? কতদূরে ? কোন্‌খানে ?

মাথার উপর জ্যোৎস্নাধৌত সুনির্ম্মল আকাশ, নীচে স্বচ্ছ কালো জল, সম্মুখে কেতকী—এই তিনের একত্র সংযোগে আজ সুবিমল আপনাকে আশাতীতরূপে নির্ম্মম করিয়া তুলিল। পাশ কাটাইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই কেতকী একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘাটের উপর আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুস্রোতে রক্তবর্ণ হইয়াছে। সে একবার সুবিমলকে ডাকিল না পর্য্যন্ত। নিজের বুকখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া এই কথাই বারবার আপন-মনে কহিতে লাগিল, আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলে ?

পরদিন প্রভাতে কলিকাতায় উপনীত হইয়া সুবিমল দেখিল, পথঘাট জলমগ্ন হইয়াছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার বটে! গ্রামের আকাশ মেঘহীন, গাঢ় নীল। বারিপাতের সম্ভাবনাও দেখা যায় নাই।

নগ্নপদ। গায়ে একটা গলাবন্ধ সাবেকী কোট। ইহাও আবার জায়গা জায়গা কঠোর দৈন্যের পরিচয় দেয়। সুবিমল জল ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অভিমান মানুষের পরম শত্রু। সুবিমল অভিমানবশে বাড়ীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া সহায়হীন বিদেশে আসিয়া পা দিয়াছে। পকেটে যাহা ছিল, তাহার সহায়তায় ট্রেণের ভাড়াটা মিটিয়াছে বটে, কিন্তু এখন তাহার নিকট একটা আধলা পর্য্যন্ত নাই। অথচ এই সহরে থাকিতে হইলে চাই অর্থ, চাই বাবুয়ানী। তাহার মত একটা গ্রাম্য যুবাকে কে প্রশ্রয় দিবে ? প্রশ্রয় দিবার কথা দূরে থাক্, কে তাহাকে সমবেদনা দেখাইবে ?

কেতকীর কথা সুবিমলের মনে পড়িল। এই মেয়েটি তাহার কতদিনের পরিচিতা। বাল্যে যে সদ্ভাব কি একটা সুযোগে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, কৈশোরে তাহাই নাতি-উচ্চ-বৃক্ষে পরিণত হইয়া যৌবনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেতকীর সেই করুণ উক্তিটা তাহার কানে এখন মূর্ত্ত হইয়া বাজিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের এককোণে দুর্ব্বলতা চাপিয়া বসিল। কেন সে একটিবারের জন্যও কেতকীকে নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিল না, কেন সে এই কথা বলিতে পারিল না যে, কেতকী, দূরে চ'লে গেলে কি সেটা ত্যাগ ক'রে যাওয়া হয় ?

অকস্মাৎ একটা বাস্ দৈত্যের মত গর্জ্জন করিতে করিতে সুবিমলের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। একটু পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া সে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু জলের ছিটায় তাহার জামা-কাপড়ের এতটুকু স্থানও শুষ্ক রহিল রহিল না।

সুবিমল চক্ষু নত করিয়া একবার সেদিকে চাহিল।

* * *

একদিন, দুইদিন, তিনদিন—আজ তিনদিন সুবিমলের পেটে অন্ন জুটে নাই। ক্ষুধা অনুভব করিলে সে বাঁশী বাজাইয়া তাহা চাপিতে চেষ্টা করে। কিন্তু হায় রে, যাহার পেটে দুই মুঠা ভাত পড়ে নাই, তাহার তেমন শক্তি কোথায়! বাঁশীর সুরে প্রাণ আনা তো সহজ কথা নহে! গ্রামের নদীতটে বসিয়া, উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া চলিতে চলিতে বৃক্ষের শাখার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া কত সময় না সুবিমল বাঁশীর সুরে সারা গ্রামখানি স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। গোধূলি-বেলায় যখন কৃষকগণ বলদগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইত, সুবিমল তখন বাঁশীতে দিবাবসানের সুর ধরিয়াছে। কৃষকেরা

সম্মোহিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইত। তাহাদের গতি পঙ্গু হইয়া উঠিত। নীরবে কান খাড়া করিয়া তাহার বাঁশী শুনিত এবং ক্ষণকাল পরে কোমরের গামছা খুলিয়া তাহাতে নিঃসৃত অশ্রুকণা মুছিয়া ফেলিত। পল্লী ব্রাহ্মণেরা যখন দল বাঁধিয়া কোনো নারীর সমাজচ্যুত হইবার কাহিনীকে ফেনাইয়া এত বড় করিয়া তুলিতে তুলিতে হুঁকা হাতে পথ চলিত, সুবিমল তখন গাছের উপর বসিয়া বাঁশীতে 'ফুঁ' দিয়াছে। অমনি তাহারা সকলে আলোচনা ভুলিয়া গাছের তলায় বসিয়া পড়িত। বোসেদের সুবিমলের বাঁশী তাহাদের ভিন্ন মানুষ করিয়া দিত।

ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া সুবিমল একখানা কীর্ত্তন বাজাইতেছিল। রাত্রি হইয়াছে বেশ। অদূরে 'সিনেমা' গৃহগুলির দ্বার বন্ধ হইয়া সেদিনকার মত অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠের উপর লোকচলাচল খুব অল্প। কচিৎ দুই-একজন হাওয়া খাইয়া হয়তো বাড়ীর দিকেই ফিরিতেছিল।

সুবিমলের বাঁশীর তেমন প্রাণ নাই। তবু যেটুকু সুরের রেশ বাহির হইয়া বাঁধনহারা বাতাসের সহিত মিশিয়া দূর-দূরান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহারও তুলনা হয়তো মেলে না।

সুবিমলের বাঁশী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতেছিল—

সখারে,

কানু সে বিনোদ রায়,
বিনোদ চূড়াতে বিনোদ ভরিয়া
উড়িছে বিনোদ বায়!
বিনোদ কপালে বিনোদ তিলক
বিনোদ বিনোদ সাজে,
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী
বিনোদ বিনোদ বাজে।
বিনোদ গলাতে বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে,
কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনি
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে!...

বাঃ! চমৎকার! এমন বাঁশী বহুদিন শুনি নি!

সুবিমল বাঁশী নামাইয়া চমকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সেই আলো-আঁধারে একটি লোককে দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে অর্থের এবং সুখের চিহ্ন পাওয়া যায়। নিজে সঙ্গীত ভাল জানে না, কিন্তু সঙ্গীতের ঝোঁক অনন্ত।

লোকটির নাম, অনঙ্গ।

সে কহিল, তুমি এমন সুন্দর বাঁশী বাজাও? দূর থেকে শুনতে পেয়ে আমি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু, এই সময়ে এইখানে ব'সে বাঁশী বাজাবার কারণ কি বল্‌তে পারো?

সুবিমল মলিন ধুতিটার সাহায্যে বাঁশীটা মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। আমি যাই।

এই বলিয়া সে অনঙ্গের দিকে পিছন ফিরিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতেই বাধা পাইল। ফিরিয়া কহিল, বাধা দিলেন কেন?

এই প্রশ্নের মধ্যে একটা উগ্রভাব ছিল। অনঙ্গ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, রাগ করো না ভাই। তোমার সুরজ্ঞানে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই বল্‌ছি যে, যদি আমার বাড়ীতে গানের মাষ্টারভাবে—

সুবিমল কথাটা লুফিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, কত টাকা মাইনে দেবেন?

অনঙ্গ সানন্দে উত্তর দিল, যা' চাও তুমি।

* * * *

কেতকী ছেলেমানুষ নহে। প্রেম কি জিনিষ বুঝিতে পারে। সুবিমল এমনিভাবে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, সে কল্পনায়ও ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই। মনে সে বড় আশা রাখিয়াছিল, অন্ততঃ যাইবার পূর্ব্বক্ষণে সুবিমল তাহাকে দুইটা কথা বলিয়া যাইবে—আমি আবার আসবো, তুমি দুঃখ করো না! কেতকী তাহার চক্ষের অশ্রু নিজের কাপড়ের সাহায্য মুছাইয়া কহিবে, ছিঃ, কেঁদো না, কাঁদ্‌তে নেই। আমি কি তোমাকে কখনো ভুল্‌তে পারি।

কেতকীর কাজে মন বসে না। প্রাণের ভিতরটা

হুহু করিয়া সারাক্ষণ কাঁদিয়া উঠে। মনে মনে করযোড়ে বিশ্বপিতার পদদ্বয় সম্মুখে স্মরণ করিয়া মিনতি জানায়, যেন তাহার সু দা'র কোনো অমঙ্গল না ঘটে, যেন তাহার আরাধ্য-দেবতার মুখখানি মরণকালে দেখিতে পায়।

কখনো কখনো কেতকীর সারা অন্তর ভরিয়া একটা নির্ম্মম প্রতিহিংসা লইবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। এই প্রতিহিংসা সুবিমলের আত্মীয়দের অবলম্বন করিয়া। তাহাদের জন্যই তো সুবিমল আজ কয়দিন হইল নিজের গ্রাম ছাড়িয়া, গৃহ ছাড়িয়া সুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেতকী মনের ইচ্ছাকে দমন করিয়া রাখিল। এখন আর সে সুবিমলদের বাড়ীতে যায় না। তবে সময় সময় ভিতর হইতে কাহারো পদশব্দ শুনিলে ভাবে, তাহার সু দা' বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে নাই, তাই আবার আসিয়াছে।

কেতকীর অন্তঃকরণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। বুকের ভিতরটা একটা অজ্ঞাত পুলকে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে। সে আর ভিতরে থাকিতে পারে না। বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। দাঁড়াইয়া যখন সু দা'কে দেখিতে পায় না, তখন তাহাব চক্ষুর দুইকোণে অশ্রুবিন্দু টল্‌টল্ করিয়া উঠে। কেতকী ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া যায়।

রাত্রে কেতকী আকাশের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। নক্ষত্র-খচিত আকাশ তাহাকে যেন ব্যঙ্গ করিয়া উঠে। প্রতিটি তারা সুবিমলের মুখের চেহারা ধরিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে দেখা দেয়। কেতকী উঠিয়া দাঁড়ায়। একবার মনে করে হাত বাড়াইয়া ধরে। কিন্তু পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বসিয়া পড়ে। বসিয়া বসিয়া আবার আকাশ পানেই চাহিয়া থাকে।

*　　　*　　　*

জমিদার অনঙ্গ। সুবিমল একটা কাজের এবং আশ্রয়ের মধ্যে রহিয়াছে। অনঙ্গ শুধু বসিয়া বসিয়া সুবিমলের বাঁশী শোনে। মুগ্ধ হইয়া সে স্থির স্তব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। অনঙ্গ হাত দিয়া একসময় গোপনে চোখ দুইটা পরিষ্কার করিয়া লয়।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া যায়।

কিন্তু একদিন...!

ব্যাপারটা তবে খুলিয়াই বলি।—

অনঙ্গের অবিবাহিত ভগ্নী তমিস্রা সুবিমলকে প্রথম দর্শন হইতে কেমন যেন একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। মানে, সুবিমলের উপর তাহার মনটা কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল।

সে যখন অনঙ্গের সম্মুখে বসিয়া বাঁশী বাজায়, তমিস্রা তখন পাশের ঘরের দরজা ঈষৎ উন্মোচন করিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। যতক্ষণ সে বাঁশী বাজায়, ততক্ষণ ওই মেয়েটি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে।

সুবিমলের আহারাদি তমিস্রাই স্বহস্তে ঘরের ভিতর রাখিয়া যায়। তাহার স্নান করিবার জল সে নিজেই তুলিয়া রাখে। গামছা, সাবান, ঘটি কিছুই বাদ্ যায় না। যেন কতকালের পরিচিতা সে।

ভালোবাসার বীজ বোধ করি এমন করিয়াই উপ্ত হয়।

সেদিন সুবিমল ঘরের দরজা ভেজাইয়া শয্যার উপর শুইয়াছিল। রাত্রি বেশী হয় নাই। এমনি সময় অনেকেই গ্রীষ্মকালে বেড়াইতে বাহির হয়।

সুবিমল উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

দরজা ঠেলিয়া তমিস্রা আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ চোখে ভয় ও আনন্দের চিহ্ন প্রস্ফুটিত। ভয় এই জন্য যে, যদি সুবিমল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। আনন্দের হেতু—সে তাহারই কাছে আজ প্রাণের এতদিনের চাপা কামনাকে প্রকাশ করিতে আসিয়াছে।

তমিস্রা আসিয়া সুবিমলের শিয়রের পাশে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া সে তাহার সমস্ত অবয়বটার প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

তমিস্রার মনে আদিম কামনা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছিল।

এক সময় সুবিমল শয্যার উপর উঠিয়া বসিতেই তমিস্রার মুখের উপর চক্ষু পড়িল। সে বিস্ময়ে অভিভূত

না হইয়া পারিল না। আজ কী প্রয়োজনে, এই সময়ে, সে এ ঘরে পদার্পণ করিয়াছে!

—আপনি এখানে কেন? সুবিমল প্রশ্ন করিল।

তমিস্রা সুবিমলের দিকে চাহিল। চাহিয়া ওষ্ঠ বাঁকাইয়া একটু হাসিল। তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না।

হাসি দেখিয়া সুবিমল যারপরনাই শিহরিয়া উঠিল। এই উন্মেষিত-যৌবনা মেয়েটির আয়ত চক্ষু, পূরন্ত মুখ এবং অপরূপ লাবণ্য তাহার চক্ষুকে মোহিত করিয়া দিল।

তমিস্রা সরিয়া আসিয়া দরজাটার দিকে গেল। পরে খিল্ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুবিমলের গা ঘেঁসিয়া বসিল। বলিল, বাড়ীতে কেউ নেই।

সুবিমল বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। যেন কাল সর্প তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। কহিল, কপাটের খিল্‌খুলে দিন্

এই বলিয়া সে তমিস্রার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেই কপাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু তমিস্রা আপনাকে আজ সংযত করিয়া রাখিবার শক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে সহসা দৌড়াইয়া দরজাটায় পিঠ্ দিয়া দাঁড়াইল। এবং ইহারই পর মুহূর্ত্তে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দ্বার আগুলিয়া রাখিল।

তমিস্রার বসন অবিন্যস্ত হইয়াছে। নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্য দিয়া ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। সে টানিয়া টানিয়া বলিল, দরজা কিছুতেই খুল্‌বো না। আমার দিকে একটু ফিরে চাও, ও গো ফিরে চাও! আমি যে আর পারি না! তমিস্রার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ।

সুবিমল আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না। জোর করিয়া তমিস্রাকে সরাইয়া দিয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিল। করিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নীচে বরাবর নামিয়া রাস্তার উপর দিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

রাত্রে সুবিমল কিছু খাইল না। রাস্তার একধারে ফুটপাথের উপর মুটে-মজুরের দলে ভিড়িয়া রাত্রি কাটাইয়া পরদিন অতি প্রত্যুষেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

উষার সঙ্গে সুবিমল স্বপ্নে দেখিয়াছিল—কেতকীকে। যেন সে পীড়িত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। উঠিবার শক্তি নাই, কথা বলিবারও ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। শুধু কাহাকে যেন নীরবে চতুর্দ্দিকে হাত বাড়াইয়া খুঁজিয়া মরিতেছে

সুবিমল পথ চলিতে চলিতে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, দেখ্‌তে পাবো তো?

কিন্তু দেখা তো পরের কথা! উপস্থিত সে কি করিয়া গ্রামে পৌছাইবে? দু'-চারটাকা যাহা সম্বল ছিল, তাহাতো সে জমীদার-বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে। ট্রেণের ভাড়াটা এখন কি উপায়ে পাওয়া যায়?

সুবিমল একবার ভাবিল, ফিরিয়া গিয়া তাহার যাহা কিছু আছে, লইয়া আসে। পরক্ষণেই আবার মন সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। যে বাড়ীর নারী দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া পুরুষের কাছে নিজেকে গণিকার মত উন্মুক্ত করিয়া দেয়, সে বাড়ীর ত্রিসীমায় প্রাণ গেলেও সে আর যাইবে না। লোকের মোট বহিয়া সে ট্রেণের ভাড়াটা উপায় করিয়া লইবে।

সুবিমল সব ভুলিয়া গেল। কেতকীকে কত ভালোবাসে, সে বুঝিয়াছে। কোনোদিন গ্রাম ছাড়িয়া কেতকীর দৃষ্টির বাহিরে এতদূরে, এতদিন থাকে নাই। বাড়ীর উপর অভিমান করিয়া সে একটি সরলা কিশোরীকে কত বড় আঘাতই না দিয়া আসিয়াছে। কেন এমন হইল? কে এমন কাজ তাহাকে দিয়া করাইল?

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর্দ্রচক্ষে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দু'-তিনদিন মোট বহিয়া সুবিমল গণিয়া দেখিল, পাঁচ টাকা সাড়ে বারো আনা সে রোজকার করিয়াছে। ইহাই বা কয়জনের ভাগ্যে জুটে।

সে বাজারে আসিল। কেতকীর জন্য একখানা শাড়ী কিনিল। শাড়ী পাইয়া নিশ্চয়ই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

তাহার পর সে এক ঠোঙা আঙুর ও গোটা দুই বেদানা লইয়া ষ্টেশনের উদ্দেশে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

ষ্টেশন হইতে নামিয়া খানিকটা পথ পায়ে হাঁটিয়া তবে কেতকীদের বাড়ী যাওয়া যায়। সুবিমল যখন ট্রেণ হইতে নামিল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। শরীরের বলটুকু কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে মনে হইল। পা আর তাহার চলে না।

কাপড়ের খুঁট্ দিয়া মুখটা সে একবার মুছিয়া লইল। কিন্তু চোখ দুইটা লইয়া সে যে বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কেতকীর মুখ মনে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটা হইতে শ্রাবণের ধারার মত অবিরাম অশ্রুবিন্দু চিবুক বাহিয়া নামিয়া আসে।

যতই বাড়ীর নিকটে সে আসিতে লাগিল, তাহার বুকের স্পন্দন উত্তরোত্তর ততই বাড়িতে লাগিল। যদি কেতকী...

সুবিমল পায়ের গতি আরো বাড়াইয়া দেয়। ঝাপ্সা চোখ বারবার পরিষ্কার করিবার বৃথা চেষ্টা করে।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

জান্‌বার বিষয়

পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা [illegible]

১।	ইফেল টাওয়ার	(প্যারিস)	৯৪৩ ফিট
২।	পিশানগরের তির্য্যক স্তম্ভ		৬১২ ”
৩।	সেণ্টপল গির্জ্জা	(লণ্ডন)	৪০৪ ”
৪।	প্যান্থীইনভ্যানিডেস্		৩০০ ”
৫।	কুতুবমিনার	(ভারতবর্ষ)	২৩৮ ”
৬।	নোটারডেম প্যারী		২২৭ ”
৭।	প্যান্থিয়ন প্যারী		১৭০ ”
৮।	অক্টারলোনি মনুমেণ্ট	(কলিকাতা)	১৬১ ”

তাহা হইলে মনুমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ইজিপ্টের পিরামিডের কথা বলা হইল না; কারণ তাহার উচ্চতা জানা যায় নাই।

কতিপয় জন্তু ও উদ্ভিদের আয়ু

ছারপোকা	৬ সপ্তাহ
প্রজাপতি	২ মাস
মশা, ডাঁস, অন্যান্য পোকা ইত্যাদি	২ মাস
মক্ষিকা	৩ হইতে ৪ মাস
পিপীলিকা	১ বৎসর
খরগোস, মেষ	৬ হইতে ২০ বৎসর
ক্যানারী পক্ষী	১৫ ” ২০ ”
কুকুর	১৫ ” ২৫ ”
ব্যাঘ্র	২২ ” ৩৫ ”
গবাদি	২৫ ”
অশ্ব	২৫ ” ৩০ ”
ঈগল	৩০ ”
হরিণ	৩৫ ” ৪০ ”
শকুনি, গৃধিনী, সিংহ, ভল্লুক	৫০ ”
দাঁড়কাক	৮০ ”
কচ্ছপ, তোতাপাখী	১০০ ”

অভিভাষণ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মানুষের জীবনের মতই জাতির জীবনে পতন উত্থান যুগপৎ দেখা দেয়। পরিপূর্ণ উন্নতির পরিশেষে প্রাকৃতিক নিয়মে তার অপক্ষয়ও হয়, সমস্ত দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে এই পরম সত্যটী আমাদের সাক্ষাতে প্রকট হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের ইতিহাসও তারস্বরে বিশ্বসমাজে এই কথাই বলিয়া চলিয়াছে চরম উন্নতির এবং চরম পরিণতির পরিশেষে আজ বিপরিনাম ঘটিয়া বৃদ্ধ জরা-জর্জ্জরিত অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় সে উপনীত। একদিন সকলকেই এই অবস্থায় পৌছিতে হইবে।

নবজীবনের সঞ্চার

কিন্তু যেমন জীবদেহের বিনাশ ঘটিলেও দেহের বিনাশ ঘটে না।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যাণি
সংযাতি নবানি দেহী।

এই নীতিতে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগে নববস্ত্র পরিধৃত সুপরিচ্ছন্ন নরদেহের মতই জাতিও আবার অপক্ষীয়মান অবস্থা হইতে নবজীবনে জাত হইতে পাবে। তার সাক্ষ্য ইতিহাসে লিখিত হইবার দিন আসিয়াছে।

গ্রীস, রোম, তুর্কী এমন কি মিশরও নবকলেবর ধারণ করিতেছে। আমাদের দেশেরও কি তেমন দিন না আসিয়া থাকিবে? আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন জগতের সহজাত ধর্ম্ম। আমাদের এই বহু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতার মধ্যে যে সকল ধ্বংস কীট প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ ও ক্ষীয়মান করিয়া তুলিতেছিল, তাহাদের ক্ষয় করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করিবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু এই যে নবজীবনের প্রাক্কাল—এই সময়টি বিশেষ ভয় ভাবনা এবং জটিলতার কাল। এ জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন, এ বড় সাধারণ কাজ নহে। এর জন্য আমাদের দেশের সকল ছেলেকে এবং আরও বেশী করিয়া সমস্ত মেয়েকে একান্তভাবে সংযম ও নিষ্ঠার সহিত আত্মগঠন করিতে হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষণ

শুধু নীতি-শাস্ত্রের দু'-চারিটী বাঁধাবুলি কপচাইয়া বা প্রথম ভাগের গোপালের ছোট্ট আদর্শ-টুকু স্মরণ করিয়াই তাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিলে এদিনে আর চলিবে না। এত বড় মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য প্রয়োজন—অবিচলিত শ্রদ্ধা, অশেষ ধৈর্য্য, মহতী প্রীতি এবং সর্ব্বোপরি ঐকান্তিকতাপূর্ণ সংযম। এই সকল মহত্তম গুণাবলী প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম-সাধনা ব্যতিরেকে কখনও লাভ করা যাইতে পারে না, একথা বোধ করি আমার বলাই বাহুল্য। ধর্ম্মই মানুষকে এবং মানব-সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে। ধর্ম্মই মানুষকে ত্যাগে প্রবৃত্তি দেয়, বাসনার উদ্দাম বেগকে সংহত করিতে শিখায়, কামনার তীব্র হলাহলকে নৈষ্কর্ম্ম্যের স্নিগ্ধ সুধাপাত্রে পরিবর্ত্তিত করে। সেই ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব যেন আমাদের দেশের শিশুদের ভিতর না আসে। তরুণদের মধ্যে যতটুকু আসিয়াছে, সেইটুকুকে সবিশেষ যত্ন-সহকারে পরিহারের প্রচেষ্টাও যেন জাগ্রত হইয়া উঠে। এইটুকুই আমাদের সযত্নে এবং সাগ্রহে করিতে হইবে। নতুবা 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলে কোন ফলই ফলিবে না।

নারীজাতির আদর্শ

মেয়েদের উপর সমস্ত জাতিরই যে জীবন মরণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া সেই কথাটাই আমরা

কাজের বেলায় ভুলিয়া যাই। তাই আমাদের আত্ম-বিস্মৃত জাতি বলিলে খুবই অন্যায় বলা হয় না। একদিকে মেয়েদের উপর কঠোর শাসনের চাপ দিয়া, আর একদিকে তাহার লঘু বিলাসিতার মধ্যে ধ্বংসময় পথে পৌঁছিবার উপায় করিয়া, কোনদিক্ দিয়াই আমরা যথার্থরূপে ভবিষ্য-জাতির যোগ্যতমা জননী সৃষ্টির উপায় করিতে পারিয়া উঠি নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই আমরা যে তাহা কখনই পারিব না, এমন কথা আমি মনে করি না। ইচ্ছা করিলেই আগ্রহ জাগিবে এবং তাহা হইতেই কর্ম্মপন্থা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিবে। এই কার্য্যের জন্য আমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন ধর্ম্ম-সাধনার এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতাবোধ জাগ্রত হওয়ারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। নিজেকে শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলে কখনও কোনও কঠিন কাজে, মহৎ কাজে হাত দিবার ভরসা থাকে না। অবলা সরলা ভাবিতে ভাবিতে ঐ অবস্থাতেই দিন কাটিয়া যায়। সারল্য হয় ত থাকে না, আবল্যই দেখা দেয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ঠিক্ একই বস্তু নয়।

অভিমান কোন বিষয়েরই ভাল নহে, এ বিষয়েও নহে।

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে:—'বড় হবি তো ছোট হ'।' এটা বড় সমীচীন কথা। বস্তুতঃ, পুরুষদের মধ্যে যতটা, মেয়েদের ভিতর তার চাইতেও যেন বেশী করিয়াই শ্রেষ্ঠতাভিমান জিনিসটা প্রকট হইয়া উঠিতে দেখা যায়। ফলে এই হয় যে, যিনি একটু বড় হ'ন নিজের মহত্ত্বের দীপ্তিচ্ছটার মধ্যেই তিনি বাস করেন। গরীব সাধারণ তাঁর কাছে ঘেঁষিতে ভরসা পায় না। দেশ থাকে যে তিমিরে সেই তিমিরে, জনসাধারণ ত অনেক দূরের মানুষ, তাঁর নিজের সন্তানরাই সেই দীপ্তিমতী মাতার পরিবর্ত্তে ভাড়া করা 'নার্স' বা 'গবর্ণেস'দের কাছে দীক্ষালাভ করিরা সাধারণ মাতার সন্তানের অপেক্ষাও হীন হইয়া যায়। যাহা সৌভাগ্যের সূচনা করিয়াছিল, হয় ত কার্য্যফলে তাহাই প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের দ্যোতক হইয়া উঠে।

উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ

নারীদের সম্মানরক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গলার নারী-দিগকে সবল ও সাহসী করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনে প্রথম কার্য্যই হইবে বাঙ্গলার নারীদিগকে পর্দ্দা হইতে মুক্তি দেওয়া। কেবল গৃহেই নহে, বাহিরেও নারীদের কর্ত্তব্য আছে। পরবর্ত্তী কাজ হইতেছে নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা তাহাদের দেহ সবল করিয়া তোলা এবং তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করা। আত্মরক্ষা সকল মানবের প্রাথমিক অধিকার। কেবল আত্মরক্ষা নহে, অপরকেও তাহার রক্ষা করিবার আছে। এই কথা সকলে জানে না। এতৎসম্পর্কিত দণ্ডবিধি আইনের দ্বারা কয়টির বহুল প্রচার আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামে নারীর মর্য্যাদারক্ষার জন্য একটি সমিতি গড়া প্রয়োজন। আমার সন্দেহ নাই যে, কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকার সমিতি গঠনে উৎসাহ দেখাইবেন।

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার

নারী-শিক্ষা সম্পর্কে বহু কথা বহু লোকে বলিয়াছে। শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রয়োজন; কিন্তু আমাদের স্কুলে কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছেলেমেয়েদের দেহ বলিষ্ঠ হয় না, বিশেষ করিয়া মেয়েদের। কারণ যাহাই হউক, বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।

জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে মহিলাদের প্রভাব, জাতির উত্থান-পতন যে মেয়েদেরই উপর নির্ভর করে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের মেয়েদের ত্যাগের মহিমা বিশ্ববিশ্রুত ছিল; এ কথা কে না জানে? আজ সব জিনিষের মতই সেখানে রীতিমত ঘুণ ধরিয়াছে। অব-হেলিত হইলে মস্ত বড় ভাল জিনিষও নষ্ট হয়; এও ঠিক তাই হইয়াছে, কিন্তু সাবধানের সময় এখনও পার হইয়া যায় নাই। ছেলেরা মায়েদের মুখ চান, মায়েরাও ছেলে-দের অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আবার সেই দময়ন্তী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সুভদ্রা মদালসার যুগ ফিরিয়া

আসুক। দেশের উন্নতির অভাব আজ কোথায়? রেলপথ, রাজপথ, বিমানপথ, গগনস্পর্শ-স্পর্দ্ধিত অগণিত চিমনী, সুবিশাল পর্ব্বতমালার মতই সুউচ্চ হর্ম্ম্যরাজি কতই.না অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের সমাবেশে দেশের আকণ্ঠ পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভূষিত, বিপুল ভারাক্রান্ত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ বলিতে ভারতর্ষের মানচিত্র-খানির পার্থিব রূপটাই সব নয়! তাহা যদি হইত, তবে স্বচ্ছন্দেই বলা চলিত, দেশের দুঃখ ঘুচিয়াছে। সত্যকার দেশ—কোটী কোটী দারিদ্র্যক্লিষ্ট, স্বাস্থ্যহীন, নিরুৎসাহ, আয়ুহীন হতভাগ্য দেশবাসী। আর তাদেরই মানুষ করার ভার মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে আমাদের; ছেলেদের শুধু নয়, তাদের সঙ্গে সমান কর্ত্তব্য বোধ লইয়া আমাদের মেয়েদেরও তার জন্য তৈয়ারী হইয়া উঠিতে হইবে রাণী ভবানী, অহল্যাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ-এর আদর্শে, লীলাবতী, খণা উভয়ভারতীর পাণ্ডিত্যে, মৈত্রেয়ী, সঙ্ঘমিত্রার বৈরাগ্যে, সীতা, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রার সতীত্বে। শতাব্দী কাল মাত্র পূর্ব্বে যে দেশের জননীরা বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, গুরুদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি অগণিত মনীষীবৃন্দকে গর্ভে ধারণ করিয়া 'কুলং পবিত্রং জননী চ ধন্যা' হইয়াছিলেন, বাংলা এবং বাঙ্গালীকে বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্ততিবর্গ তাঁহাদের মত আত্মসংবেদ লাভে চেষ্টিত হইলে সফলতা লাভ না করিবেনই বা কেন? ভারত শুধু বীর প্রসবিনী নহেন; বঙ্গভূমিও ধর্ম্মবীরের, কর্ম্মবীরের, যুদ্ধবীরের জন্মভূমি। প্রবলপ্রতাপান্বিত পালরাজবংশ হইতে প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বার ভূইয়ার রাজন্যবর্গ' সীতারাম, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালীই ছিলেন। আজও যে বঙ্গভূমি বীরশূন্যা হয় নাই তার প্রমাণ জলন্ত হইয়া লিখিত আছে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের দপ্তরের খাতা-পত্রে। যে জাতির মধ্যে ত্যাগীর, ধার্ম্মিকের, বীরেন্দ্রের আবির্ভাব রুদ্ধ হইয়াছে, পঙ্কবদ্ধ সলিল পল্বলের মতই যে জাতির জীবন-শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ সত্য, তাই বলি, জীবনের সাধনাকে সার্থকতার দিকে ফিরাইয়া জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হউক মায়েরা!

জাতির বৈশিষ্ট্য

মেয়েদের বিলাসিনী তৈরী করিবেন না। বিলাসিতার দ্বারা কোন লোকেরই কোন মহত্তর স্থানলাভ করা যায় না। সতী এবং সংযত চরিত্রেরাই অমর সন্তান অঙ্কে ধারণ করিবার অধিকারিণী, সেই অধিকারই নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার। মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠপদ শুধু এদেশেই নয়, বিশ্বে নাই। কিসের মূল্যে এত বড় সম্মান তোমরা হারাইবে? এর বদলে কি মিলিবে? সকল জাতির মধ্যেই জাতীয় গর্ব্ব এবং বিশিষ্টতা আছে—তাহাই তাহাদের রক্ষা কবচ, কর্ণের মত সেই অক্ষয় কবচ অঙ্গচ্যুত করিয়া বিনাশেব পথ প্রশস্ত করিলে সে ভুলের সংশোধন হইবে না ইহা স্থির।

কর্ত্তব্যের ত্রুটি

আর একটি বিষয়ে দুইটি কথা বলিব। আজকাল সব দেশের দেখাদেখি কালধর্ম্মে এদেশেও একপ্রকার ছদ্মবেশী নারী বন্ধুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। (পূর্ব্বে থাকিলেও এতটা ছিল না)। এঁরা নিজেরা নারী-নির্য্যাতন কাহাদেরও চেয়ে কম করেন না, কিন্তু ছন্দবদ্ধভাবে নারীর স্তবগান অতি সুললিত কণ্ঠেই করিয়া থাকেন। পাথরে, পটে বা কাগজের পৃষ্ঠায় নারীচিত্র এঁরা সব যা' অঙ্কিত করেন, তাহা বিচিত্র আভরণযুক্ত হয়, কিন্তু আবরণ থাকে না। কেন আপনারা তীব্রকণ্ঠে এ অবমাননার প্রতিবাদ না করিবেন? নারীকে অসংযত, স্খলিত-চরিত্রা, এমন কি পুরুষের পক্ষে নরকের দ্বাররূপে, প্রলোভিকারূপে যাঁরা চিত্রিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, আপনারা কেহ কেহ না বলেন তারাই 'নারী হিতৈষী।' হিত শব্দের অর্থবোধ করিয়া ব্যবহার করা হইলে কখনই তা' বলা যাইত না। দ্বিতীয় কথা এই যে, দেশ জুড়িয়া

অসম্ভবরূপেই নারী-নির্য্যাতন ও নারী-ধর্ষণ চলিতেছে, এর জন্য আমরা কি করিতেছি? আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধুরাই বা কি করিতেছেন? দেশের ধনীর দুলালরা যে কোটী কোটী ধন বিলাস-ব্যসনে পরের দেশের পণ্যক্রয়ে অপব্যয় করিতেছেন, তাহার এক দশমাংশ কি অরক্ষিতা মাতৃজাতির দুর্গতি দূরীভূত করণার্থ ব্যয় করিতে পারিয়াছেন? কিন্তু কেন তা' পারেন না? আমরা তাঁদের সে শিক্ষা দিই না বলিয়া। আমাদের নিজের জাতির প্রতিই আমাদের সে আকর্ষণ নাই। পাপে ঘৃণা, পাপীর প্রতি বিদ্বেষ আমাদের শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। জাতীয়তা প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে এখনও জাগ্রত হয় নাই।

তাই দেশের সুপুত্র, বীর, আত্মমর্য্যাদাশালী সন্তানের মা হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে, অথবা কদাচিৎ হইতেছে। সাধনার কাল সমাগত, দীক্ষা নাও, সিদ্ধি অচিরে দেখা দিবে। পুষ্পাঞ্জলিকার বহু পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন—অন্যান্য যুগের অপেক্ষা কলিযুগ এক বিষয় শ্রেষ্ঠ। এ যুগে যেমন মানুষের আয়ু সুদীর্ঘ নয়, সেই হেতু এ যুগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মত সুদীর্ঘকাল সাধন করিবার প্রয়োজন হয় না। অত্যল্পকাল মাত্র সুদৃঢ়রূপে সাধনা করিলেই অভিষ্ট লাভ ঘটে। আপনারাও একাগ্রতার সহিত তপস্যা করুন, দেখিবেন অচিরকালের মধ্যেই বীর প্রসূতি এবং বীরেন্দ্র জায়া হইয়া জগৎ সমাজে বরণীয় হইতে পারিবেন। পুরুষ যদি কাপুরুষ হয়, তবে সে দোষ তাদের মাতৃরক্তের। সে ত চিরদিন নারী-নির্য্যাতক ব্যাধ মূর্ত্তিতে জন্ম লয় নাই, মাতৃঅঙ্কে সুকুমার শিশুরূপেই দেখা দিয়াছিল। তোমার শিক্ষা তার পক্ষে মনুষ্যত্বের সহায়ক হয় নাই, সে দোষ তোমার। আমার বিশ্বাস শাশুড়ীরা বধূ-নির্য্যাতক না হইলে ছেলেরা নারী-নির্য্যাতক হইতে ভরসা করে না। নারী-ধর্ষক গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে যদি সমবেতভাবে মেয়েরা তাহাদের সময় ও অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করেন, এ পাপ অনেকটা প্রশমিত হয়।*

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

* 'রাঁচি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনী'তে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর অভিভাষণ। 'এডুকেশন গেজেট' হইতে উদ্ধৃত।

মাছির ওজন—এটা হয় ত বিশ্বাসই করা যায় না যে, দশ হাজার মাছি একসঙ্গে ওজন করিলেও এক সেরের বেশী হয় না।

স্বর্ণবৃষ্টি—আমরা চন্দন-বৃষ্টি, কমলালেবু-বৃষ্টি রক্ত-বৃষ্টি, পর্য্যন্ত পড়িয়াছি, কিন্তু আকাশ হইতে যে স্বর্ণ পৃথিবীতে পতিত হয়, এ সংবাদ সত্যই আশ্চর্য্য। সম্প্রতি ডিনভারনগরের ডিন জিলেপ্‌সী নামক একজন বৈজ্ঞানিক আমেরিকার 'বিজ্ঞান-হিতৈষিণী সভা'য় (American Association for the advancement of science) এইরূপ ঘোষণায় সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। নয়া মেক্সিকোতে একটি স্বর্ণময় উল্কাপাত হইয়াছিল। ডিনভার নগরের 'নাইনিজার লেবরেটরী'র বৈজ্ঞানিক এইচ, জি, হলি উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পান যে, উহাতে সামান্য পরিমাণ স্বর্ণরেণু বর্ত্তমান আছে। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের সত্যতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আমেরিকার একজন খনিজ-বিশ্লেষণ-বিশারদও উহা নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। হলি সাহেবের অভিমত তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

বাঁশীর ডাক্

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অন্ধ—তবুও রূপে অনুপম, একটী তরুণ গেয়ে,
বাঁশীতে তাহার ভাটিয়ালী সুর, চলে যায় পথ বেয়ে।
এমনি করিয়া কতো দিন চলে জানে না তা' আজো কেহ,
সুরেতে তাহার আকুল হইয়া উঠে জনপদ, গেহ!
পল্লীর পথে পাপিয়া কোকিল শুনিয়া স্তব্ধ রহে,
সর্পেরও চোখে—সে বাঁশী শুনিয়া অশ্রু-দরিয়া বহে!
মাঠেতে রাখাল গরু ফেলে তার পিছে পিছে যায় ছুটে,
বাঁশীতে তাহার 'আরফিউসে'র সুর যেন ওঠে ফুটে!
একদা জ্যোৎস্না-নিশীথে অন্ধ কীর্ত্তন-সুর ধরি',
চলেছে দীর্ঘ রাজপথ দিয়া জাগাইয়া শর্ব্বরী।
নৃপতি শুনিয়া মুগ্ধ-হৃদয়, রাণীরে ডাকিয়া কহে,
হেন সুর তুমি শুনেছ কী কভু?...মর্ত্তের এ ত নহে!
সত্যই রাজা রাণীর মরমে পশেছিল সেই সুর,
যে সুর জাগায় সুপ্ত সুরভি...স্বর্গের সুরপুর।
রাজা কহে, মোর যতো ধন আছে দিব এই ভিখারীরে,
বেঁধে রেখে দেবো আমার প্রাসাদে, আমার জীবন-তীরে।
রাণী কহে, তাই কর হে রাজন, দিব না ইহারে ছাড়ি;
রাজা উঠে বলে, কে আছ? উহারে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।
রূপেতে উজ্জল অন্ধ যখন এল রাজ সম্মুখে,
চমকিত হয় রাজা অতিশয়; জড়াইয়া ধরে বুকে।
বলে হাত ধরে, কে তুমি পথিক, কিবা সন্তাপ পেয়ে,
এ হেন মধুর সঙ্গীত সুর বাঁশীতে যেতেছ গেয়ে?
সারা অন্তর আলড়িত করি বাজায়ে মুরলীখানি,
কোথায় চলেছ আপনার মনে, কহ সুর-সন্ধানী?
আজি কোষাগার খুলিয়া আমার দিব তব সম্মুখে,
তোমারে বন্দী করিব পথিক, আমার তৃষিত বুকে!
অন্ধ পথিক হাসিয়া রাজারে কহে, শুন নরপতি,
রত্নের প্রতি লোভ করিবার নাহি মোর দুর্ম্মতি!
বাঁশীর সুরেতে চলিয়াছি সেই মহাসুর সন্ধানে,
অজানা পথের যাত্রী হয়েছি অচেনার আহ্বানে!

রাজা কহে, তবু শোনো অনুনয়, যেয়ো যেথা হয় পরে,
শুধু কিছুদিন দয়া করে তুমি থেকে যাও মোর ঘরে।
উষাকালে মোরে—বাজায়ে বাঁশরী ঘুম হতে দিবে ডাকি',
কন্যারে মোর মুরলী শিখাবে—যাও, যাও কথা রাখি!
ক্ষণেক ভাবিয়া অন্ধ যুবক বলে, মুস্কিল তবে,
আচ্ছা...তোমার অনুনয় রাজা মেনে নিনু, তাই হবে।
ফুল-লতা ঝাউ-পাইন বৃক্ষ ঘেরা রাজ-প্রাঙ্গণে,
বসন্ত বায়ু চুপে চুপে আসি ঘুরে মরে অকারণে।
ময়ূর নাচিছে অঙ্গন মাঝে, 'চোখ গেল'—গান গাহে,
কতো নর্ত্তকী ফোয়ারার ধারে নাচিছে নূপুর পায়ে।
কতো না স্বর্ণ-পদ্মরাগের, হিরক মণির জ্যোতিঃ,
ঠিকরি ঠিকরি উর্দ্ধে উঠিছে,—তুচ্ছ অমরাবতী!
হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, বাহিরে শানাই বাজে,
আকাশে মিশেছে কৌযিক ধ্বজা, হাস্য মহালে রাজে।
সুরূপা-শোভনা প্রাসাদ-রমারা সুবাসিত কেশ খুলি',
গোলাপ মিশান ফটিক জলেতে স্নানাবেশে পড়ে ঢুলি'!
কিংখাপ পাতা মর্ম্মর ঘরে কতো দর্পণ, ছবি,
ঝিকিমিক্ করি জ্বলিয়া উঠিছে সূর্য্যের আলো লভি'।
মখমল মোড়া আসনের 'পরে—এরি মাঝে এক ঘরে,
অন্ধের কাছে রাজনন্দিনী বংশী শিক্ষা করে।
ষোড়শী তরুণী রাজার কন্যা বাঁশী সে যতো না শিখে,
বাঁশী যে বাজায় চেয়ে থাকে শুধু সদা তারি মুখ দিকে।
অন্ধ—তবুও তার ভালো লাগে, কেন সে নিজে না জানে,
কোথা যেন কোন্ সুদূরেতে যায় ভেসে তার সুরে গানে।
একদা রাজার কুমারী বলিল, অন্ধের পায়ে পড়ি,
ও গো ও প্রাণেশ, হে প্রিয় আমার, শোনো কথা দয়া করি,'
তোমা ছাড়া আমি জীবনের সাথী চাই নাক আর কারে,
তুমি কী দাসীকে স্থান দিবে নাক তোমার চরণ ধারে?
বিস্মিত যুবা বলে, এ কী তুমি পরীক্ষা করো মোরে,
তুমি হও রাজ-নন্দিনী, আর ভিখারী যে আমি দোরে!

তোমার জীবনে আছে কতো আশা, ফুল না ফুটিবে কতো,
আমার জীবন সাহারার মরু, আমি যে ভাগ্য-হত !
রাজ-নন্দিনী বাধা দিয়ে বলে, পরীক্ষা নহে প্রিয়,
সত্য ও কথা বলেছি যা' আমি, তুমি বলো সব কী ও ?
তোমারে যখন স্বামী-পদে আমি বরণ করেছি জেনো,
তোমার পিছনে দোরে দোরে আমি ঘুরিব—দুঃখ কেন ?
চাই নাক আশা—চাই নাক সুখ—চাই নাক রাজবাড়ী,
তোমারি জন্য যেতে হয় যাব যা' কিছু সকল ছাড়ি !
অন্ধ তখন রাজ-কুমারীর বুলাইয়া হাত মাথে,
বলে, ছি, সকলি ভুলে যাও তুমি, এমন করে' কী মাতে ?
কিছুদিন হ'ল রাজ-কুমারীর হইয়া গিয়াছে বিয়ে,
অন্ধ যুবক ছেড়েছে প্রাসাদ একাকী বাঁশীটী নিয়ে !
মন যেন তার শূন্য উদাস কিসের অভাব বুঝে,
কেন সে জানে না, বাঁশীতে তাহার সুর পায় নাক খুঁজে !
মুক্ত উদাসী অন্ধ পথিক, তারো ব্যাকুলতা হেন,—
আজিকে পরাণে এমনি করিয়া জাগিয়া উঠেছে কেন ?

কেটে গেছে আজ কতো না বরষ, কতো মাস, দিন কতো,
একদা পথিক রাত্রে গভীর সুর ধরে মনোমত—
স্নিগ্ধ চাঁদের রূপালী মাখানো সিন্ধুর তীরে ব'সে।
হুঙ্কার করে' অজগর সম ঢেউ আসে তটে রোষে।
অসীম আকাশসম সমুদ্রে কিবা তোলপাড় চলে,
লক্ষ দৈত্য ঝড় সাথে যেন নাচে ফেনাময় জলে !
আকাশ যেন সে মিশে গেছে ওই অদৃশ্য সুদূরেতে ;—
'নীলী' করা নীল বেলাভূমে তাল-তমালের কাননেতে।
এমন সময় শুনিল অন্ধ যেন চেনা শিঞ্জিনী,
রাণীর বেশেতে আসিয়া পড়িল পায়ে রাজ-নন্দিনী।
এলাইত কেশ ঝড়ে উড়ে পড়ে, বাস বালুকায় লোটে,
ঝরণার মতো গাল বেয়ে বেয়ে নয়নের জল ছোটে।
রাজসুতা কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ও গো প্রিয়তম মম,
এখনো কী তব দয়া হবে নাক, রবে পাথরের সম ?
যদি বুঝিতে গো বুকের এ জ্বালা, বিছার কামড় কি যে,
হ'লেও পাষাণ, গলে জল হ'তে সমবেদনায় ভিজে !
ফের আমি বলি, চাহি না, চাহি না, চাহি না জগতে কিছু,
শুধু অধিকার দাও একবার যেতে তব পিছু পিছু !
তোমার মুরলী করেছে পাগলী, ঘরে যে রহিতে নারি,
পলে পলে তব বিচ্ছেদে যেন প্রাণ যেতে চায় ছাড়ি'।

সঙ্কোচ ভরে অন্ধ তখন ক্ষুব্ধচিত্তে বলে,
সাধ যায় দেবী দেখি তব মুখ, কিন্তু আঁখি না চলে !
তোমার বুকের ও সাধ মিটাতে কী করে' যে আমি পারি !
যোগ্য তোমার হইতাম যদি—যোগ্যতা কোথা তারি ?
আমি যে দুঃখী ভিক্ষুক এক, দুঃখরে তাড়াইতে ;
ধরেছিনু বাঁশী, কে জানিতে বলো বিপরীত হবে হিতে ?
এখন বুঝেছি বাঁশী-ই আমার কাল হইয়াছে ধরে',
এই দেখ, বলি,—বাঁশীটী অন্ধ ছুঁড়ে দিল জলে জোরে।
রাজ-নন্দিনী শিহরি উঠিল, বলিল, করিলে এ কী ?
অন্ধ কহিল, করিয়াছি ঠিক্, এবে তুমি ফিরিবে কী ?
কথা শুনে হাসি পাগলের মতো রাজ-নন্দিনী কহে,—
ফিরিবার তরে আসি নি প্রাণেশ, এসেছি চরণ জয়ে।'
বাঁশী যাক্, তবু তোমার সঙ্গ লইব-ই আমি জিনে,
অন্ধ কহিল, ভুলে যাও ও গো দয়া করে এই দীনে !
তুমি হও পর, রাজরাণী, তব স্বামী প্রতি কাজ আছে ;
সে সব ছাড়িয়া লাঞ্ছনা সয়ে কেন যাবে মম পাছে ?
তোমারে কখনো প্রশ্রয় আমি দিব নাক এই ব্রতে,
বলিয়া অন্ধ ঝাঁপায়ে পড়িল উত্তালাব্ধি স্রোতে !
রাজ-নন্দিনী পলকে কাঁপিল, কিন্তু না দমি', উঠি',
কহিল, আমারে ছাড়িয়া মৃত্যু-বরণ করিবে ছুটি' ?
কখনই তাহা হইতে দিব না, মরণেরও মাঝে আমি,
করিব প্রেমের অমৃতেরে জয়, এই দেখো তবে স্বামী—
বলিয়া রাজার নন্দিনী—সেও ঝাঁপ দিল লহরীতে ;
অলক্ষ্যে কার ভরিয়া উঠিল পুলিন বেদনা-গীতে !

কেটে গেছে আজ কতো না বরষ, তবুও যেন গো শুনি,
সাগর-পুলিনে ভেসে আসে কার চাপা ক্রন্দন ধ্বনি !
ঝড় আসে বটে—তবুও তাহার কিসের করুণ ব্যথা,—
গুমরিয়া যেন বাঁশীর সুরেতে কয়ে যায় কত কথা !*

* ডাক্তার দীনেশ সেন রচিত 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা'র 'আঁধা বঁধু' গল্পটী অবলম্বনে।

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

চিত্র-জগতের বিচিত্র সংবাদ—'বেনেট ভগিনীত্রয়'

সঞ্জয়

কনষ্টান্স, জোয়ান এবং বারবারা এই তিনজন বেনেট ভগিনীই চিত্রামোদীদের বিশেষ পরিচিত। তার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই ভগিনী সু-অভিনয় করে বেশ নাম করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন বোন্‌ই বিবাহ ব্যাপার নিয়ে অল্প বয়সেই পিতার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এঁদের পিতার নাম ছিল রিচার্ড বেনেট। বাসস্থান নিউ-ইয়র্কের একটী ক্ষুদ্র সহরে।

কনষ্টান্সের বয়স যখন মাত্র পনের বৎসর, একদিন সকালে রিচার্ড উঠে আবিষ্কার করলেন চেষ্টার মুরহেড (Chester Moorehead) নামক একটী অতি তরুণ যুবকের সঙ্গে কনষ্টান্স কোথায় চলে গেছেন। পিতৃপ্রাণে একটা বিষম ধাক্কা লাগ্‌ল। ছ' মাস যেতে-না-যেতেই রিচার্ড পুনরায় খবর পেলেন, কনষ্টান্স মুরহেডকে পরিত্যাগ করে ভিলিপ প্ল্যাণ্ট নামক একটী য়্যামেরিকান ক্রোড়-পতিকে স্বামীত্বে বরণ করে হলিউডে অভিনেত্রী-খাতায় নাম লিখিয়েছেন। রিচার্ড আনন্দিত কি দুঃখিত হয়েছিলেন বলা কঠিন, কিন্তু এবারও তিনি কোনো সাড়াশব্দ দিলেন না। কিন্তু দু'-একদিনের মধ্যে মধ্যমা কন্যা বারবারা বেনেট অনেক রাত করে বাড়ী ফেরায় হঠাৎ রিচার্ড সেদিন তাঁকে অনেক কটূক্তি করলেন, ফলে বারবারা পরদিনই তাঁকে ত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন। এইবার কনিষ্ঠা জোয়ানের পালা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো বৎসর এবং জোয়ান সেইবার মাত্র স্কুলের পাঠ শেষ করেছেন। পিতা রিচার্ডকে কোন কিছু না জানিয়ে একটী ধনী কালিফোর্নিয়ান যুবক জন মার্টিন ফক্সের সঙ্গে একদিন তিনি 'ইলোপ্' করলেন।

অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত বেদনা প্রৌঢ় রিচার্ডকে এমনই একটা ধাক্কা দিল যে, এইবার তিনি বালকের মতো কেঁদে উঠলেন। যাক্, এইখানে রিচার্ডের মর্ম্ম-বেদনার কথা উল্লেখ করে আমরা পাঠকদের কৌতুহল দমন করতে চাই না বরং এই কথাটাই বলতে চাই যে, আধুনিক যুগে রিচার্ডের সেকেলে বুড়োদের মতো না কেঁদে হোহো করে হাসাই উচিত ছিল। (আমাদের আধুনিক আলোক-প্রাপ্তা ভগিনীর দল নিশ্চয়ই এতে ক্ষুব্ধ হবেন না)।

যাক্, প্রৌঢ় রিচার্ডের কথা বাদ দিয়ে আসল ঘটনার দিকে এগুনো যাক্!......জন ফক্সকে বিয়ে করে জোয়ানও হলিউডে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেইখানেই বাসা ঠিক্ করলেন। ওদিকে ফক্সও এই রকম না জানিয়ে বিয়ে করাতে পিতৃত্যজ্য হয়েছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ লস্ এঞ্জেলে তিনি একটি চাকরী পেয়ে গেলেন।

য়্যামেরিকায় অল্প উপায়ে চলা কি রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা' অনেকেই জানেন। ফলে জোয়ানকে পারি-বারিক সমস্ত কাজে বিশেষভাবে যোগ দিতে হলো। এমন দিনও গেছে, যখন গৃহস্থালীর প্রায় প্রত্যেক কাজই জোয়ানকে নিজের হাতে করতে হয়েছে। অবশ্য এখন, অর্থাৎ 'তারকা'-শ্রেণীভুক্তা হবার পর থেকে জোয়ান

আর সে জীবন-যাত্রা বহন করবেন না। একবৎসর পরে, অর্থাৎ জোয়ানের সতর বৎসর বয়সে, তাঁদের এই সুখময় জীবন-যাত্রার মাঝে প্রথম কন্যা আড্রিন বেনেট ফক্সের আবির্ভাব হয়। এই শুভ আবির্ভাবে তাঁদের জীবন-যাত্রার পথ আরো কতখানি সুগম এবং সরল হয়েছিল, তা' সহজেই অনুমেয়। 'গুপ্তপ্রেমে আনন্দ বেশী' কবির এই কথা কতখানি সত্য জানি না কিন্তু জোয়ানকে তাঁর প্রথম বিবাহজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করলে হয় ত এর একটা সত্য উত্তর পাওয়া যেতে পারে এবং আমরা যতদূর জানি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখশান্তি একমাত্র দারিদ্র্যের চাপে একেবারে নিঃশেষ হয়ে উবে গিয়েছিল।

জোয়ান বেনেটের কন্যা জন্মাবার ঠিক্ পরেই বারবারা বেনেট বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন্। অন্য দুই বোনের মতো বরবারা কিন্তু একজন স্বামী (মর্টন ডার্ডনিকে) নিয়েই আজও সন্তুষ্ট আছেন। অন্য দুই বোনের মতো খুব বেশী রোমাণ্টিক না হলেও এঁর বিবাহ বা প্রেমে পড়ায়ও কম রোমান্স নাই তা' ব'লে।

...সেই সবে হলিউডে টকির যুগ এসেছে—সেখানে যেন একটা সাড়া পড়ে গেছে। বারবারা নাচতে এবং গাইতে বেশ পটু, কাজেই তাঁর একটা কাজ জুটতে দেরী হলো না। তারপর একদিন রেডিওতে গান গাইতে গিয়ে বিখ্যাত রেডিও গায়ক মর্টন ডার্ডানির সঙ্গে বারবারার হলো পরিচয়। সেটা গাঢ়তর হয়ে হলো প্রেম, তারপর বিবাহ, এটা অত্যন্ত মামুলি ধরণের হলেও বারবারার চরিত্রের কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁর প্রকৃতি অন্য দুই ভগিনী থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিজের কার্য্যধারার ওপর তাঁর কোন অনুযোগ নেই, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। বোনেদের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিতা এবং মিসেস্ ডার্ডনি ছাড়া অন্য পদবী সৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ মোহহীনা।

যাক্, জোয়ানের যে কথা বল্‌ছিলুম। জোয়ান নিজের দেশ নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। পিতা রিচার্ডের দৌলতে ছেলেবেলা থেকে 'ডেকরেটারে'র কাজ তাঁর বেশ জানা ছিল। জোয়ান স্থির করলেন একটা দোকান খুলে সেই কাজই করবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা' কার্য্যে পরিণত করতে পার্‌লেন না, অবশ্য তাঁর মা'র এতে বিশেষ আপত্তি ছিল।

প্রৌঢ় রিচার্ড তখন আবার ষ্টেজ নিয়ে মেতে উঠেছেন। "জার্নিগান' নামক একখানি বইয়ে অভিনয় করবার জন্যে তিনি জোয়ানকে আহ্বান করেন। প্রথমতঃ অনিচ্ছা থাক্‌লেও শেষ পর্য্যন্ত জোয়ান এতে যোগ দিলেন। এবং অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে সকলকে চমকিত করে দিলেন। ফলে হলিউড থেকে নিমন্ত্রণ আসতে তাঁর বেশী দেরী হলো না।

ইতিমধ্যে, অর্থাৎ জোয়ান যখন তাঁর সুখ-দুঃখের ঝোলা নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত এবং বারবারা যখন নাচগান ছেড়ে বিয়ের ব্যাপারে মেতে উঠেছেন, তখন ওদিকে কনষ্টেন্সেরও সুখের জীবনে অশান্তির রেখাপাত হতে সুরু হয়েছে। বোধ হয় কনষ্টান্স তাঁর একঘেয়ে জীবন পছন্দ করছিলেন না। ১৯২৯ সাল পড়তেই একদিন তাঁকে প্যারিসে বিচারালয়ের আশ্রয় নিতে দেখা গেল। শোনা গেল 'কনী' বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থিনী ; অর্থাৎ, আবার তিনি বিশাল জগতে একা হতে চান্।

এই বিচ্ছেদ প্রার্থনার মধ্যে মজার খবর এইটুকু যে, উভয়ের জীবনে বা মনে কোন রকম অসদ্ভাব ছিল না—হঠাৎ একটা খেয়ালের বশে, অর্থাৎ এজীবন আর ভাল লাগ্‌ছে না, এই রকম একটা কল্পনা নিয়ে 'কনী' এই অসমসাহসিক কাজে হস্তক্ষেপ করলেন। এর পিছনে লোকে কি বলবে, ভ্রূকুটী করবে, না ভাল বলবে, সেদিকে তিনি লক্ষ্য মাত্র করলেন না। তাঁর স্বামী ফিলিপপ্ল্যাণ্টও কোনো আপত্তিই করলেন না। বোধ হয় স্ত্রী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে তিনি একান্তই নারাজ।

...যথারীতি বিচ্ছেদ-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। বিচার চলার সময়েই হোটেলে অবস্থানকালীন একদিন 'কনী' হঠাৎ এপেণ্ডিসাইটিস নামক দারুণ রোগে আক্রান্ত হন্। দু'-একদিনেই অস্ত্র না করলেই নয়। আরো মজার কথা এইটুকু যে, ফিলিপ প্ল্যাণ্ট সেই খবর পেয়েই সার্জ্জেন প্রভৃতি নিয়ে নিজেদের সমস্ত খরচে তাঁর চিকিৎসা করান। বোধ হয় সুন্দরী স্ত্রীর মোহ তখনও সম্পূর্ণভাবে তাঁর মন থেকে অপসারিত হয় নি। সে'ত দূরের কথা, এমন কি ১৯৩০ সালের বড়দিনের ছুটীতে পর্য্যন্ত প্ল্যাণ্ট 'মাই ইয়েস-টার্ডেস উইথ ইউ' শীর্ষক একটী গান রচনা করে বারবার স্বামী ডার্ডনিকে দিয়ে গানখানি রেডিওতে গাওয়ান। গানখানি শুনে অনেকে কনষ্টান্সকে প্ল্যাণ্টের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্যে অনুরোধ করেন, তবু মুনির মন টলে নি।...

হলিউড আর্টের দেশ—তাই বোধ হয় আজ এত শ্রেষ্ঠ। আগামী বারে কনষ্টান্স এবং জোয়ান বেনেটের সম্বন্ধে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

সঞ্জয়

খেলার কথা

শ্রীব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা গতমাসে তৃতীয় টেষ্টম্যাচের খবর দিয়াছি। সেবার বলিয়াছিলাম যে, চব্বিশ-এ জানুয়ারী চতুর্থ টেষ্টম্যাচ খেলা হইবে। চতুর্থ টেষ্টম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। এই জয়লাভ তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছাব্বিশ-এ ফেব্রুয়ারী পঞ্চম এবং শেষ টেষ্টম্যাচ খেলা হইবে। আশা করা যায়, অষ্ট্রেলিয়াই এ বৎসর এ্যাসেস্ জয়ী হইবেন। থাক্ সে পরের কথা, এবারের খেলার কথাই সংক্ষেপে বলি।

ও দেশের—

উনত্রিশ-এ জানুয়ারী এডিলেডের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রান্তরে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ্ খেলা আরম্ভ হয়। কিন্তু ম্যাককাব চিপারফিল্ড ও ব্রাউন ব্যতীত কাহারও খেলা ভাল হয় নাই। এমন কি ২৬ রাণে ব্রাডম্যান পর্য্যন্ত আউট হইয়া সকলকে হতাশ করেন। পরদিন মধ্যাহ্ন অবধি খেলিয়া ২৮৮ রাণে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হইলে, ইংলণ্ড-দলের ভেরিটি ও হ্যামণ্ড খেলা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই যথাক্রমে মাত্র ১৯ ও ২০ রাণ করিয়া আউট হইয়া যান। তারপর বারনেট ও লেল্যাণ্ড খেলিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সেদিনের মত তাঁহাদের খেলা বন্ধ হয়।

চতুর্থ টেষ্টম্যাচের তৃতীয় দিনে এডিলেডের রৌদ্রজ্জ্বল প্রান্তরে ২৯০০০ হাজার দর্শকের সমক্ষে বারনেট ও লেল্যাণ্ড পুনরায় খেলা আরম্ভ করেন। তখন বাতাস খুব জোরে বহিতে সুরু করিয়াছে। ইহাতে 'স্পিন্' বোলারদের খুব সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু ব্যাটস্‌ম্যানদের অত্যন্ত সন্তর্পণে খেলিতে হইতেছিল। বারনেট ও লেল্যাণ্ড খুব সতর্কতার সহিত খেলিয়া ধীরে ধীরে রাণ তুলিতে লাগিলেন। ২৮৬ মিনিটে মাত্র ২০০ রাণ উঠিল। কিছুক্ষণ বাদে লেল্যাণ্ড 'ফিল্ড উড স্মিথের' বলে চিপারফিল্ডের হস্তে 'কট্ আউট' হইয়া গেলেন। এম্‌স্ আসিয়া বারনেটের সহিত যোগ দিলেন। বারনেট মোট ৩৪১ মিনিট ব্যাটিং করিয়া নিজস্ব '১৩টি চার' ও একটি 'ছয়' করিলেন। এম্‌স্‌ও খুব চমৎকার খেলা দেখাইয়া 'আটটি চার' করিলেন। তিনি আউট হইবার পর ওয়াট বারনেটের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তিনি মাত্র ৩ রাণ করিয়া 'কট আউট' হইয়া গেলেন। বারনেট একাই ১২৯ রাণ করিয়া 'এল্, বি, ডবলিউ আউট' হইয়া যান। চা পানের পর অষ্ট্রেলিয়া নূতন উদ্যমে খেলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের অবশিষ্ট কয়জনকে আউট করিলেন। ৩৩০ রাণে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হইল।

অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

প্লেয়ার	কিরূপে আউট	বোলার	রাণ
ফিঙ্গলটন	রাণ আউট		১০
ব্রাউন	কট্, এলেন	ফারনেস	৪২
রিগ্	কট্, এম্‌স্	,,	২০
ব্রাডমান্		এলেন	২৬
ম্যাককাব্	কট্, এলেন	রবিনস্	৮৮
গ্রেগারি	এল্, বি, ডবলিউ	হ্যামণ্ড	২৩
চিপাবফিল্ড			৫৭ (নট আউট)
ওল্ডফিল্ড	রাণ আউট		৫
ও' রিলী	কট্, লেল্যাণ্ড	এলেন	৭
ম্যাক্‌কমিক	কট্, এম্‌স্	হ্যামণ্ড	৪
ফিল্ড উড্‌স্মিথ		ফারনেস	১
		উপরি	৫
		মোট	২৮৮

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

প্লেয়ার	কিরূপে আউট	বোলার	রাণ
ভেরিটি	কট, ব্রাড়মান	ও' রিলী	১৯
হ্যামণ্ড	কট, ম্যাক্‌কর্মিক্	,,	২০
বারনেট	এল্, বি, ডবলিউ	ফিল্ডউডস্মিথ	১২৯
লেল্যাণ্ড	কট, চিপারফিল্ড	,,	৬৫

ওয়াট	কট, ফিঙ্গলটন	ও' রিলী	৩
এমস্		ম্যাক্‌কমিক	৫২
হার্ডষ্টাফ্	কট, ম্যাক্‌কর্মিক্	,,	২০
এলেন	এল্, বি, ডবলিউ	ফিল্টউডস্মিথ	১১
রবিনস্	কট, ওল্ডফিল্ড	ও' রিলী	১০
ভোস	কট, রিগ্	ফিল্টউডস্মিথ	৮
ফারনেস্			০ নট আউট
		উপরি	১৩
			৩৩০

অতঃপর অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন। ফিঙ্গলটন ও ব্রাউন প্রথম ব্যাট করিতে নামেন। তাঁহারা দুইজনে ১২ মিনিট খেলিয়া ২১ রাণ করেন। ফিঙ্গলটন ১২ রাণ করিয়া এল্, বি, ডবলিউ হইয়া যান। তারপর ব্রাডম্যান্ আসিয়া ব্রাউনের সহিত যোগ দেন। সেইদিন আর সময় না থাকায় তাঁহাদের খেলা বন্ধ করিতে হয়। চতুর্থ দিনে এডিলেডের শীতল এবং রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তরে পূর্ব্বদিনের খেলা আরম্ভ হয়। খেলা আরম্ভের সময় প্রায় বত্রিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ড প্রাণপণে ব্রাডম্যানকে আউট করিবার জন্য যত্নবান ছিলেন। ব্রাডম্যান্ কিন্তু আউট হওয়া দূরের কথা, চমৎকার খেলা দেখাইতে লাগিলেন। ব্রাউন ৩২ রাণ করিয়া এম্‌সের হাতে আউট হইয়া গেলে ম্যাক্‌কাব্ তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু ৫৫ রাণ করিবার পর ওয়াটের হস্তে আউট হইয়া যান। ইহার পর রিগ্ আসিয়া ব্রাডম্যানের সহিত যোগ দেন। তিনি কিছুক্ষণ বাদেই মাত্র ৭ রাণ করিয়া হ্যামণ্ডের হস্তে আউট হইয়া যান। ব্রাডম্যান সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেলিয়া ১৭৪ নট আউট থাকায় পরদিন অর্থাৎ পঞ্চম দিনের খেলা আরম্ভ হয়। পঞ্চম দিনে ব্রাডম্যান ২১২ রাণ করিয়া হ্যামণ্ডের বলে তাহারই হস্তে 'কট আউট' হইয়া যান। ৪৩৩ রাণে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস

অতঃপর ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন। ভেরিটি ও বার্নেট ইংলণ্ডের খেলা আরম্ভ করেন। চা পানের পূর্ব্বেই ভেরিটি ও বার্ণেট আউট হইয়া যান। তখন কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাণ উঠিয়াছিল মাত্র ৪৫। চা পানের পর হার্ড-ষ্টাফ ও হ্যামণ্ড ধীরতার সহিত খেলিতে থাকেন। নিজস্ব ৪৩ রাণ করিবার পর হার্ডষ্টাফ আউট হন্। ইহার পর সেদিন আর সময় না থাকায় তাহাদের খেলা বন্ধ হয়। তখন তাঁহাদের রাণ উঠিয়াছে মাত্র ১৪৮ (৩ উইকেট)।

ষষ্ঠ দিন, অর্থাৎ শেষ দিনে প্রায় ১০,০০০ দর্শক উপস্থিতিতে খেলা সুরু হয়।

ফ্লিটউডের একটি লেগ ব্রেক বলে বিখ্যাত খেলোয়ার হ্যামণ্ড চক্ষের নিমেষে আউট হইয়া যান। তখন তাঁহার মাত্র ৩৯ রাণ হইয়াছে। লেল্যাণ্ডও ৮১ মিনিট খেলিয়া তাহার নিজস্ব ৫৫ রাণ করিয়া ফ্লিটউডের একটি দ্রুত বল জোরে মারিতে গিয়া চিপারফিল্ডের হস্তে 'কট আউট' হন্। ওয়াট ও এলেন ইংলণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট যত্নসহকারে খেলিয়াছিলেন। ফ্লিটউডের বলে অতক্ষণ খেলা কম বাহাদুরীর কথা নহে। চা পানের পরই কিন্তু ইংলণ্ডের ভাগ্যসূর্য্য একেবারে অস্তমিত হইল। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য ফ্লিটউডের বিপজ্জনক বল। সে সময় দর্শক সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় ১৫০০০ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। এলেন ৯ রাণ করিলেও ৪৩ মিনিট খেলিয়াছিলেন। মাক্‌কমিকের একটি বল মারিতে গিয়া 'কট' তুলিয়া তিনি আউট হইয়া গেলেন। মাত্র ২৪৩ রাণে ইংলণ্ডের খেলা শেষ হইল।

প্রাণপণে খেলিয়াও ইংলণ্ড কোনমতেই পরাজয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইলেন না।

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন এল্ বি ডবলিউ হ্যামণ্ড	১২
ব্রাউন কট, এম্‌স্ ব ভোস	৩২
ব্রাডম্যান ক ও ব হ্যামণ্ড	২১২
ম্যাককব্ ক ও ওয়াট ব রবিনস	৫৫
রিগ্ ক হ্যামণ্ড ব ফার্ণেস	৭
গ্রেগরি রাণ আউট	৫০
চিপারফিল্ড ক এম্‌স্ ব হ্যামণ্ড	৩১
ওল্ডফিল্ড ক এম্‌স্ ব হ্যামণ্ড	

ও' রিলি ক হ্যামণ্ড ব ফার্নেস	১
ম্যাক্‌কর্মিক ব হ্যামণ্ড	১
ফ্লিন্টউডস্মিথ (নট আউট)	২৪
উপরি	২৭
মোট (রাণ)	৪৩৩

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস।

ভেরিটি ব ফ্লিন্টউডস্মিথ	১৭
ব্যারনেট ,,	২১
হার্ডষ্টাফ ব ও' রিলী	৪৩
হ্যামণ্ড ব ফ্লিন্টউডস্মিথ	৩৯
লেল্যাণ্ড কট চিপারফিল্ড ব ফ্লিন্টউডস্মিথ	৩২
এম্স্ এল্, বি, ডবলিউ ,,	০
ওয়াট কট ওল্ডফিল্ড ব ম্যাক্‌কাব	৫০
এলেন কট গ্রেগারি ব ম্যাক্‌কর্মিক	৯
রবিনস্, ব ,,	৪
ভোস ব ফ্লিন্টউডস্মিথ	১
ফারনেস (নট আউট)	৭
উপরি	২০
মোট	২৪৩

এ দেশের—'রঞ্জিট্রফি' প্রতিযোগিতায় বাঙালা ও মধ্যভারতের যে খেলা হইয়াছিল, তাহাতে মধ্যভারত ৮ উইকেট এবং ১রাণে পরাজিত হইয়াছেন। মধ্যভারত প্রথম ইনিংসে ১২৮ রাণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মাস্তাক-আলি ২৮, জে, এন, ভায়া ৩৩, সৈদুদ্দিনের ৩০ রাণ উল্লেখ-যোগ্য। বাঙালা প্রথম ইনিংসে ২৫৫ রাণ করিয়াছিলেন, তার মধ্যে এ, এল, হোসির ৬১, এস, ডবলিউ বিবেণ্ডের ৪৭, এ, জি স্কিনারের ৩৫ (নট আউট) উল্লেখযোগ্য। মধ্য-ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৪ রাণের মধ্যে মাস্তাকআলির ৬৭, ভি, এস হাজারীর ৫৭, ইস্তাকআলির ৫২ উল্লেখযোগ্য। বাঙালা দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১০৮ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার করেন। ইহার মধ্যে কে, বসুর ৬০ রাণ (নট আউট) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কে বসুর খেলা দেখিয়া মনে হয় যে, এখনও তাঁহার শক্তি অস্তমিত হয় নাই। এখানে আর একজনের কথা না বলিলে অবি-চার করা হয়। লংফিল্ডের বোলিং অতি চমৎকার হইয়া-ছিল। তিনি একাই মাত্র ৫৭ রাণে ছয়জনকে আউট করিয়া বাঙালার জয়লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

	প্রথম ইনিংস	দ্বিতীয় ইনিংস
বাঙালা	২৫৫	১০৮ (২ উইকেট)
মধ্যভারত	১২৮	২৩৪

অতঃপর ৩০-এ জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাঙালাকে হায়দ্রাবাদের সহিত খেলিতে হয়।

বাঙালা ও হায়দ্রাবাদের খেলায় বাঙালা হায়দ্রাবাদকে ১২৭ রাণে পরাজিত করিয়াছেন। বাঙালা ও হায়দ্রাবাদের খেলার যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার একদিন পূর্ব্বেই খেলা শেষ হইয়া যায়। বাঙালা প্রথমে ২৯৯ রাণ করেন। ইহার মধ্যে এ, ক্যামেলের ১০৫, এস, ব্যানার্জ্জির ৪৭ (নট আউট) উল্লেখযোগ্য। হায়দ্রাবাদ প্রথম ইনিংসে ১৭০ রাণ করেন। তাহার মধ্যে আসাদুল্লার ৩৩ ও এস, এম, হাদির ৩২ ও ভজুবার ৩২ উল্লেখযোগ্য। বাঙালা দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৮ রাণ করেন। তাহার মধ্যে টি, সি, লঙ্‌ফিল্ডের ৩৬ ও পি, এন মিত্রের ৩০ উল্লেখযোগ্য। হায়দ্রাবাদ দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬০ রাণ করেন। তাহার মধ্যে আইবারার ৬৯ রাণ উল্লেখযোগ্য।

	প্রথম ইনিংস	দ্বিতীয় ইনিংস
বাঙালা	২৯৯	১৫৮
হায়দ্রাবাদ	১৭০	১৬০

অতঃপর বাঙালা নওয়ানগরের সহিত 'রঞ্জিট্রফি'র ফাইন্যাল খেলার দিন নির্দ্ধারিত হয়।

বম্বেতে ৬ই ফেব্রুয়ারী নওয়ানগর ও বাঙালার 'রঞ্জি-ট্রফি'র ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়। নওয়ানগর প্রথম ইনিংসে ৪২৪ রাণ করেন। তার মধ্যে ম্যান্‌কার্ডের ১৮৫, কোলার ৬০, বণবীর সিংহজীব ৪০ রাণ প্রশংসাযোগ্য। বাঙালা প্রথম ইনিংসে ৩১৫ রাণ করেন। কে বসুর ৬০, ভাণ্ডারগাচের ৭৯, বিবেণ্ডের ৪০ রাণ উল্লেখযোগ্য। নওয়ানগর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮৩ রাণ করেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্রবিজয় সিংহজীর ৯১, মুবাবক আলির ৯০, যাদবেন্দ্র সিংহজীর ৪৫ (নট আউট) প্রশংসাযোগ্য। বাঙালা দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৬ রাণ করেন। ইহার মধ্যে স্কিনারের ১২৫ এবং মিলারের ৪১ রাণ উল্লেখ-যোগ্য। স্কিনার সুন্দর এবং নির্ভুল খেলা দেখাইয়া ১৭টি ও 'চার' দুইটী 'ছয়' করেন। এস, বোস খুব চমৎকার খেলা দেখাইয়াছিলেন। খাম্বাটাও বাঁ হাতে খুব সুন্দর খেলা দেখান। এবার নওয়ানগর 'রঞ্জি ট্রফি' লাভ করিয়াছেন। বাঙালার হার কিছুমাত্র দুঃখের নয়; কারণ, এল্ হোসি, লংফিল্ড এ খেলায় যোগ দিতে পারেন নাই এবং এম্ ব্যানার্জিও শেষ পর্য্যন্ত জাম-সাহেবের আদেশে খেলিতে পারেন নাই। নতুবা কি হইত বলা কঠিন।

	প্রথম ইনিংস	দ্বিতীয় ইনিংস
নওয়ানগর	৪২৪	৩৮৩
বাঙালা	৩১৫	২৩৬

বাঙালা ২৫৬ রাণে হারিয়া গেলেন।

পঞ্চ-প্রদীপ

রাজ-সংবাদ—কেন্টের ডিউক রাজকুমারী জুলিয়ানার বিবাহ-উপলক্ষ্যে উপস্থিত থাকিয়া পরে ভ্রাতা স্বেচ্ছাপদত্যাগী ডিউক অব উইণ্ডসরের সহিত এস্‌কেণ্ড নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন জানাইয়া দিয়াছেন—ইহা মন্ত্রী-সভার অনভিপ্রেত। সুতরাং, ডিউক অব গ্লসেষ্টারেরও ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎকার বন্ধ রহিল। বড়র কাজে মন্তব্য দিতে যাওয়া ছোটর সাজে না। তাই আমরা সসম্ভ্রমে নীরবই রহিলাম।

অদ্ভুত ষড়যন্ত্র—সোভিয়েট রাশিয়া জনগণ কর্তৃক শাসিত প্রকাণ্ড রাজ্য। শোনা যায়, সেখানকার মত সুখী প্রজা জগতে আর কোথাও নাই। কিন্তু সেখানেও বিভীষণের অভাব কোথায়? কয়েকজন রাশিয়াবাসী ফ্যাসিষ্ট রাজ্যটীকে সমান দুইভাগে ভাগ করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ জাপান এবং পশ্চিমার্দ্ধ জার্ম্মানীর হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল, আজ পর্য্যন্ত প্রায় একশত লোক ধরা পড়িয়া বিচারার্থ আদালতে প্রেরিত হইয়াছে।

নূতন বিল—ডাঃ দেশমুখ প্রবর্ত্তিত হিন্দু-আইনে বিধবার সম্পত্তি অধিকার সম্বন্ধে বিল সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'পাশ' হইয়া গিয়াছে। দেশমুখ একটী মজার কথা বলেন—হিন্দু-আইনে আছে বিধবা নারী চিরদিন অধীন, কাজেই তাহার সম্পত্তিতে অধিকার থাকিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি—তবে ভারতের হিন্দুমাত্র যে আজ হাজার বৎসর পরের অধীন, তাহাদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকিবে কোন্ হিসাবে? কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত বটে!

নারীরক্ষা—সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল পয়লা জুলাই ১৯৩৭ সাল হইতে ভারতের নারী-সম্প্রদায় আর খনিতে কাজ করিতে পারিবে না বলিয়া আদেশ দিয়াছেন। ভারতে নব্বুই হাজার, অর্থাৎ শ্রমিকদিগের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক নারী আজ পর্য্যন্ত খনিতে কাজ করিত। এ ব্যবস্থায় আমরা পঞ্চমুখে গভর্ণর-বাহাদুরের প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু এই অন্ন-সমস্যার যুগে তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার কি ব্যবস্থা করিলেন, তাহা জানিতে পারিলে আমরা সহস্রমুখে প্রশংসা করিতে পারিতাম।

মেওর দেশ—আমেরিকায় দুইটী রীতি বহির্ভূত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। একটী—ইউনিস, নয় বৎসরের বালিকা, এবং জোন্স বাইশ বৎসরের বালক। দ্বিতীয়—এলিজাবেথ, বার বৎসরের বালিকা এবং বাক্‌স্ উনিশ বৎসরের বালক। এবার মিস্ মেও কি বলিবেন?

জাতিস্মর—বেরিলীবাসী নির্ম্মিয়া নামে একটী বার বৎসরের মেথর বালিকা জাতিস্মর হইয়া সেখানে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দলে দলে লোক আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইবার ত বিরাম নাই-ই—মেথর-প্রাঙ্গণ তীর্থস্থানে পরিণত না হইলে বাঁচি! মেয়েটী একদিন তাহার পিতা সাধুকে বলে—সে তাহার পূর্ব্বজন্মের পিতা তাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে এবং শীঘ্রই সেখানে চলিয়া যাইবে। তাহার কথাটা পিতা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু মেয়েটী বলে—সীতাপুরের অন্তর্গত টসসনগঞ্জে তাহার বাড়ী ছিল। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ। তাহার পূর্ব্ব পিতার নাম ছিল কাহ্নাই এবং মেয়েটীর নিজের নাম ছিল কৌশল্যা। পিঠে একটা সাংঘাতিক ফোড়া হওয়ায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে মারা যায়। ইত্যাদি।

মেয়েটীর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য সীতারাম-পুরের টমসনগঞ্জে লোক ছুটিয়াছে। তা' ছুটুক, কিন্তু আমরা ভাবিয়া পাই না ব্রাহ্মণ-কুল হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকা এমন কি পাপ করিল যে, তাহাকে একেবারে মেথরকুলে অবতরণ করিতে হইল? আশা করি, মেয়েটী এ রহস্য ভেদ করিয়া দিবে। না হইলে আমাদের পণ্ডিত-মহোদয়গণ ত রহিলেনই। এদিকে কি আর তাঁহারা আলোকপাত করিবেন না!

পুনর্জ্জন্ম—আওয়া সিং চীনদেশের সাংহাই নগরে বাস করিত। সে সৈনিক। কোনো লোক তাহার স্ত্রীকে ঠাট্টা করায় সে অতিমাত্র কুপিত হইয়া তাহাকে কুঠারাঘাতে হত্যা করে। কাজেই, ন্যায় বিচারে তাহার ফাঁসির

আদেশ হইয়া যায়। কিন্তু 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে' এই কথা প্রমাণ করিতেই সে দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িয়া যায়। ফলে, সে সাংঘাতিক আঘাত পাইলেও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা ও বিচার করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছেন, কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইয়াছে। শুনিতেছি, তাহাকে ভারতে আসিয়া দণ্ডাজ্ঞা পালন করিতে হইবে। ভারত আন্দামানে পরিণত হইল দেখিয়া [illegible] স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম।

মঙ্গল-গ্রহে মানুষ—ডাঃ হাবলের বয়স মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর। দীর্ঘকাল গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া তিনি এক অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে কালিফোর্নিয়ার 'মাউন্ট উইলসন বেক্ষণাগারে' একটী বিরাটকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহাকে প্রস্তুত করিতে না কি সাড়ে বার লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে এবং নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণে পরিণত হইবে।

নির্ম্মাণ-কর্ত্তা ডাঃ হাবল বলেন—এই যন্ত্রটী অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন হইবে। মঙ্গল-গ্রহে প্রাণী আছে কি না তৎসম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ বহু লোকে বহু কথা বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সঠিক সংবাদ দিতে পারেন নাই। এই অতিকায় যন্ত্রটীর সাহায্যে না কি তাহাই সম্ভব হইবে। মঙ্গল-গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবেই; এমন, কি পৃথিবী ছাড়া অন্যত্র মানুষ আছে ইহাও প্রমাণ হইয়া যাইবে। আমরা বলি—'এরোপ্লেন' কি আরও একটু শক্তিশালী তৈয়ারী হয় না? তাহা হইলে অচিরে উভয় গ্রহে বিবাহ-প্রথার প্রচলন হইতে পারে।

গুম্ফ-রহস্য—জন্ কোণ্টরা হাঙ্গেরীবাসী একজন ভদ্রলোক। তাঁহার বয়সের খবর জানি না, কিন্তু গোঁফের দৈর্ঘ্য যে মাত্র আটাশ ইঞ্চি এ সংবাদ দিতে পারি। বেচারী এই গোঁফ যোড়াটীকে লইয়া সারাদিন বিব্রত থাকিতেন। গোঁফের পরিচর্য্যা ছাড়া যেন অন্য কোনো কাজই ছিল না। লোকের পায়ে তেল দিতে হয় শুনিয়াছি, ইনি নিয়মিত এই গোঁফের ডগায় তেল মালিস করিতেন।

সেদিন নিত্যনৈমিত্তিক কাজের পর ভদ্রলোকের ধূম পানের ইচ্ছা হওয়ায় তিনি একটী দিয়াশালাই জ্বালাইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহার কথা আর না বলিলেই ভাল হয়। যাক্, তবু রক্ষা! শুনিতেছি, তাহার প্রিয় গোঁফ যোড়ার কোন ক্ষতি হয় নাই—তবে চক্ষু পুড়িয়া গিয়াছে। চোখের জন্য আপাততঃ তিনি হাসপাতালে।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে—ইনি তবু গোঁফসহ নিজে বাঁচিয়া গেলেন। সে বেচারীকে এই গোঁফের জন্যই শেষটা জলে ডুবিয়া মরিতে হইয়াছিল।

সে অনেকদিনের কথা। চিকাগো ওয়ার্লড একজিবিশনে সব চেয়ে দেখিবার জিনিষ একটী ছিল; যাহা অন্য কিছু নহে—এক ভারতীয় ব্যক্তির গুম্ফ। যাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মাপ করিলে কমসম করিয়াও হইত আটফুট। শুধু ওই গোঁফযোড়ার জন্যই তাহাকে বেশ মোটা মাহিনা দিয়া চিকাগোতে লইয়া যাওয়া হয়।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ! বেচারীকে আর সে মাহিনা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া লেড়কা-জরুর সঙ্গে সুখে ঘর-করণা করিতে হইল না। ফেরার পথে সাঁতার জানা সত্ত্বেও হঠাৎ সমুদ্রে পড়িয়া গিয়া পায়ে গোঁপ আটকাইয়া ঘটি-বাটির মত সে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।

বড়র মর্জ্জি—জার্ম্মানীর নাজিনীতি বিরোধী হের-ফন্ ও সিৎস্কি নামে এক ব্যক্তিকে বিগত বৎসর নোবল শান্তি-পুরস্কার প্রদান করায় নাজিনীতির প্রবর্ত্তক হিট্‌লার উষ্ণ মস্তিষ্কে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—অতঃপর কোনো জার্ম্মান নোবল পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিবে না। উক্ত ইস্তাহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভয়বাণীও প্রচারিত হইয়াছে—জার্ম্মানীতে প্রতি বৎসর নোবল পুরস্কার সদৃশ তিনটী পুরস্কার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি-দিগকে প্রদান করা হইবে। উক্ত পুরস্কারের মোট পরিমাণ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার মত হইবে। এই অর্থ সরকারি তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। স্বাধীন রাজ্যে সবই সম্ভব!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

[আদর্শগৃহী, কর্ম্মসন্ন্যাসী, লোকশিক্ষক, ধর্ম্মসমন্বয় আচার্য্য]

শ্রীবি————বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শত-বার্ষিকী জন্মোৎসব। অসংখ্য ভক্ত নরনারী আজ ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে এই নর-দেবতার স্মৃতি-পূজায় আত্মহারা। ধর্ম্ম-জগতের মহাকেন্দ্র বেলুড় আজ বিভিন্ন জাতির মহা-সম্মেলন ভূমি। যে কোন জাতির ইতিহাসে এরূপ মহা-সম্মেলনের দৃশ্য বুঝি কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই। জাতিগত ও ব্যক্তিগত বৈষম্য ভুলিয়া নরনারী বুঝি কখনও এরূপ লোকারণ্যের শোভা বাড়ায় নাই।

ইহার কারণ কি? মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে কিঞ্চিদূর্দ্ধ একশত বর্ষের ব্যবধান সরাইয়া অতীতের যবনিকা তুলিয়া ধরিতে হইবে। সম্মুখে মহা শ্মশানভূমি। ভারত গগন অমানিশার ঘনায়মান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গগনস্পর্শী চিতানলের লেলিহান জিহ্বা। শিবা, গৃধ্র প্রভৃতি শবাহারী প্রাণিকুলের ঘাত-প্রতিঘাত ও ভয়াবহ আর্ত্তনাদ। দুঃখ ও নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী হাহাকার। জাতি ও সমাজের বন্ধন রজ্জু ছিন্নভিন্ন। ধর্ম্ম দলিত, অধর্ম্ম অভ্যুত্থিত ও বিশ্বগ্রাসে উদ্যত।

এই জাতীয় ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় দুইজন মহাপুরুষ অন্ধকারের গাঢ় আবরণ অপসারিত করিয়া ভারতের ভাগ্য-গগন সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন—প্রদীপ্ত তেজে জাতীয় জীবনে নব-প্রভাতের সূচনা করিয়াছিলেন।

রাধানগরের সিংহশিশু সিংহ-বিক্রমে ধর্ম্ম-সমন্বয়-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম-বাণীর নির্ঘোষে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, সুপ্ত দেশবাসীর মোহ নিদ্রা বুঝি তাহাতে সম্যকরূপে ভাঙ্গে নাই—আপামর সর্ব্ব সাধারণ যেন সেই বিরাট আহ্বানে সাড়া দেয় নাই।

পুরুষ-সিংহ রামমোহন নবযুগের অভ্যুদয়ে যে এক সমন্বয়-পূর্ণ ধর্ম্মের সূচনা করিয়া যান, কামারপুকুরের প্রকৃতি-পালিত পল্লীসন্তান স্বভাবশিশু রামকৃষ্ণ সেই আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন—সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম্মপথ প্রদর্শন দ্বারা সমন্বয়ের পরিপূর্ণতা সাধিত করেন।

মহাপুরুষগণের জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্র অলৌকিক কিংবা অসাধারণভাবে জড়িত হইলে উহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হয় না। যুগোপযোগী ধর্ম্ম ও শিক্ষার আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে ধরিতেই তাঁহাদের আবির্ভাব। সাধারণের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য তাঁহাদের জীবন এবং কর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক। তাঁহারা মানবরূপে সংসারে আবির্ভূত হইয়া মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া জগৎ হইতে তিরোহিত হন্।

পরমহংস রামকৃষ্ণ এইরূপ মহাপুরুষগণের অন্যতম ছিলেন। অলৌকিক কার্য্যসাধনের জন্য তিনি সংসারে আসেন নাই। যোগমার্গের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াও তিনি কোন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনে প্রয়াসী হন্ নাই। সাধারণ মানবের ন্যায় কার্য্য করিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। প্রকৃত কর্ম্মী ও গৃহীর জীবন-আলেখ্য এই অধোগামী জাতির সম্মুখে ধরিয়াছিলেন।

সংসারীর জীবন আদর্শ তিনি যেরূপভাবে প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মহাযোগীই ঠিক্ সেরূপ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সর্ব্ব সাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগই যে কর্ম্ম-সন্ন্যাসীর ও প্রকৃত গৃহীর আদর্শ, তিনি তাঁহার নিজের জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া ছিলেন। সাধারণ যোগীর ন্যায় তিনি মুক্তিকামী ছিলেন না। মুক্তির পরিবর্ত্তে একটী প্রাণীর মঙ্গলের জন্য আত্ম-বলিদান তাঁহার অধিকতর কাম্য ছিল। তাঁহার এই মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহার এই উদার

অনুপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গলাভ করিয়াই ত তদীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ বিশ্ব-বিজয়ী হইয়াছেন।

প্রকৃত কর্ম্ম কি, প্রকৃত গৃহীর লক্ষণ কি তাহা তিনি অতি সরল অকপটভাবে বিবৃত করিয়াছেন। পরার্থে আত্মোৎসর্জ্জন, পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জন এবং অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাসীর লক্ষণ। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও নারায়ণ জ্ঞানে অনাথ-সেবা এই দুইটাই কর্ম্ম-সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠ উপায়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের এবং আত্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। পার্থিব সম্পদই যত অনর্থের মূল। লোভ, হিংসা, ক্রোধ, রক্তপাত, ধ্বংসলীলা, ব্যক্তিগত ও জাতিগত বৈষম্য ও বিরোধ সকলের মূলেই এই অর্থাসক্তি। ইহা মানুষের শান্তিপথের কণ্টক, চিত্তের সংকীর্ণতা বিধায়ক এবং অশান্তি ও হাহাকারের প্রস্রবণ। পরার্থে এবং দুঃখীর দুঃখমোচনে এবং স্বার্থত্যাগেই ইহার সার্থকতা। দ্বিতীয় পথ অনাথ নারায়ণ সেবা। ইহাই জ্ঞান ও ভক্তির পথ সম্প্রসারিত করে এবং সর্ব্বভূতে বিরাজমান পরব্রহ্মের সন্ধান আনিয়া দেয়। যিনি এই বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছেন, জগৎ ও জগৎবাসী শুধু ত তাঁহার মায়ার জৃম্ভন নহে, কিন্তু সেই অনন্ত-দেবের সান্ত মূর্ত্তি। ইহার ভিতর দিয়াই সেই অনন্তের সন্ধান করিতে হইবে।

বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য ভোগবিলাস চরিতার্থ নহে, কিন্তু সস্ত্রীক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংসার ও সমাজের উন্নতিবিধান ও পুষ্টিসাধন। নারী জীবনের নর্ম্ম-সহচরী নহে, কিন্তু কর্ম্ম-সহচরী। তাই নারী সহধর্ম্মিণী। হায়, জাতি আজ আপাত-মধুর বিলাসের পঙ্কিলস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া নারীকে ভোগের সঙ্গিনীরূপে পরিণত করিয়াছে! ফলে, জাতীয় অবসাদ, দুর্ব্বলতা এবং অধঃপতন। তাহাকে টানিয়া তুলিতে আজ ঘরে ঘরে কর্ম্ম-সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। আজ এমন কর্ম্ম অভ্যাস করিতে হইবে যাহার মূলে এবং পরিণামে মঙ্গল, এমন প্রেম ভক্তি দ্বারা জীবন সার্থক ও কৃতার্থ করিতে হইবে, যাহার মূলে 'প্রবৃত্তি চাঞ্চল্যের স্থলে ধ্রুবনিষ্ঠা, একাগ্রতা, সৌন্দর্য্য মোহের স্থলে কল্যাণের স্বর্গীয় দ্যুতি।' ভারত সে আদর্শ হারাইয়াছে—আজ পদাঘাতে তাহার মঙ্গল-কুম্ভ ভাঙ্গিয়াছে। আবার সেই মঙ্গল-কুম্ভ গড়িতে হইবে, আবার তাহা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রেমভরে সকলকে আহ্বান ও আলিঙ্গন আদর্শ গৃহীর ও আদর্শ লোক-শিক্ষকের এই ভাবটী তাঁহার জীবনে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। 'এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান।' এই উদার নব গায়ত্রী মন্ত্রে তিনি সকলকেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

অধিকারী ভেদে পথ বিভিন্ন মাত্র। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তিনি সেই পথই তাহার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন —কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রকৃত লোক-শিক্ষকের সে কার্য্য নয়। তিনি স্বাধীন থাকেন এবং অপরকেও তিনি স্বাধীন রাখিতে চান। আধিপত্য এবং প্রভাব বিস্তার তাঁহার কাম্য নহে। তিনি আপনাকে লোক-শিক্ষক ধর্ম্ম-গুরু নামে অভিহিত করিতেও সঙ্কুচিত এবং কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি চিরজীবন শিখিতেই আসিয়াছিলেন। 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি' এই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাই তিনি বিপথগামী জনগণের গতি-নিয়ন্তা; শুধু আমাদের গুরু নহেন, তিনি আমাদের চির-সুহৃৎ—আমাদের শাশ্বত পার্শ্বচর—পাপে ও প্রলোভনের সংগ্রামে অভেদ্য বর্ম্ম আচ্ছাদন। তাই আমরা আজ তাঁহার এত সান্নিধ্যলাভে সমর্থ, তাই তিনি আজ আমাদের এত আপন। পূর্ব্ববর্ত্তী কত লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাবে জাতি ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে। ধরা টলমল করিয়াছে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে কিন্তু আমাদের মত এরূপ মোহাচ্ছন্ন ও অধঃপতিত জাতি বুঝি তাঁহাদিগের এত নিকটে যাইতে পারে নাই, তাহাদিগকে এত ভালরূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারে নাই। তিনি ঘরে ঘরে আপন আদর্শ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। পরেরভাবে চালিত না হইয়া স্বভাবে চালিত হইতে হইবে, স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরই উন্নতির একমাত্র সোপান। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ' এই আদর্শ বীরবাণী প্রচার এবং 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই অনলবর্ষিণী উদ্দীপনা মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন

জীবনে জাগরণ আনিয়া দিয়াছে এবং উহাকে পৌরুষবলে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছে।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ সমন্বয় আচার্য্য ছিলেন, কিন্তু পৌত্তলিকতার মূলে সবলে খড়্গাঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাকথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, সভ্যজাতি উপেক্ষিত এই পৌত্তলিক সম্প্রদায়েরও মর্ম্মে ঈষৎ আঘাত করিতে তাঁহার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহাদের জন্যও তাঁহার উদার হৃদয়-স্বর্গে স্থান রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আশা ও আশ্বাসের বাণী প্রচারে কিঞ্চিন্মাত্র কার্পণ্য করেন নাই। ভক্ত বিশ্বাসের অটল ভিত্তি আশ্রয় করিয়া যে কাম্য মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁহাতে কি পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান নাই, তাহা কি জগজ্জননী অথবা জগৎ-পিতার চিন্ময়ী মূর্ত্তি নহে? পুরাণে শুনি দৈত্যকুল-দীপক ভক্ত প্রহ্লাদ এই জড়পদার্থেও সেই বিরাট্ পুরুষের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের নিভৃত কোণে সুরধুনী-কূলে এক ব্রাহ্মণ জড়প্রস্তর খণ্ডে সেই জগজ্জননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সভ্যতাদীপ্ত বিশ্বাসবিহীন, মূর্ত্তিপূজাবিরোধী পাশ্চাত্যজাতি এই কাহিনী অবান্তর বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে নাই, যুক্তি-তর্কের অগম্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বাস-পূরিত হৃদয়ে মস্তক গর্ব্বোন্নত রাখিতে পারে নাই। এইখানে রামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনে তাহার সার্থকতা। তিনি জ্ঞান ও যোগ-মার্গের আশ্রয় লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি-লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের উপযোগী আদর্শ উপাসনা স্থাপনের জন্য তিনি জড় মূর্ত্তিতে মাতৃভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন। অশিক্ষিত, মূর্খ নরনারী তাই আজ তাঁহারই সুরে সুর মিশাইয়া একাক্ষরী নব প্রণব মন্ত্র মা 'নাম' উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে এবং হইবে। শাক্যসিংহ বল, মুসা বল, ঈশা বল, শঙ্করাচার্য্য বল, অথবা রামমোহন বল, কেহই সত্যের এইদিকে আলোকপাত করেন নাই; জাতীয় ধর্ম্মাকাশে ভাস্বর তপনের ন্যায় উন্নত-অবনত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের উপর কেহই এরূপ জ্যোতি বিকিরণ করেন নাই। তাই আজ তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী জাতীয় পতাকারূপে দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া উড্ডীয়মান—আজ রামকৃষ্ণ শুধু ভারতজয়ী নহে, কিন্তু বিশ্বজয়ী।

এস ভারতবাসী, এস বিশ্ববাসী, ঊর্দ্ধে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আকাশে যে শাশ্বত ধ্রুব-তারার আবির্ভাব হইয়াছে, আজ তাহারই দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া দিশাহারা সিন্ধুযাত্রী আমরা, আমাদের জীবন-তরণী ভাসাইয়া দি'।

শ্রীবি———বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাপ্রয়াণ

আজ রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী জন্মতিথি উৎসব-দিনে কালের নিদারুণ কষাঘাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রধান মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীজী, মঠ ও মিশনের প্রধান পরিচালক-জ্যোতিষ্ক স্খলিত হইয়া গেলেন। গত সাতই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ তিনটা সাত মিনিটের সময় বাহাত্তর বৎসর বয়সে গঙ্গাধর মহারাজের মহাপ্রয়াণ ঘটিল।

এই বাগবাজারেই ইঁহার জন্মস্থান। অতি শৈশবেই ইনি শ্রীগুরুর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন্। বিবেকানন্দ-প্রমুখ কয়জন ঠাকুর রামকৃষ্ণের মহা-সমাধির পর যে সন্ন্যাস-আশ্রম গঠন করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। গুরুদেবের মহাবাণী প্রচারকল্পেই ইঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

ঠাকুরের শিষ্যদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম সেবাধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তাহাই কালক্রমে আজ রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়রূপে গঠিত হইয়াছে।

সারগাছি মুর্শিদাবাদ জেলার একটী গ্রাম। এখানে স্বামীজী প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় হঠাৎ উনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হন্ এবং সকল গ্রামবাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এখানে বাস করেন এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করেন। মোট কথা, তাহারাই স্বামীজীর অন্তর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মিশন এবং মঠের প্রধান পরিচালকরূপে ইনি তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অভাবে শোকে ম্রিয়মান শিষ্য এবং অনুরাগী ভক্ত আজ সারা ভারত জুড়িয়া।

দ্বাদশ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৩ | দ্বাদশ সংখ্যা

অরুণ, মমতা, আর মিস্ আইভি

শ্রীবিমল সেন—লণ্ডন

—আজ কি খাবার দিন, আইভি?...হুইস্কি?... আনো দেখি...কোন্‌টা দেবে?

লণ্ডন শহরের অপেক্ষাকৃত এক নির্জ্জন রাস্তার একটি বাড়ী। 'সিটিং-রুমে'র সোফার উপর অরুণ বসিয়াছিল। হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া, রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি কড়িকাঠের দিকে মেলিয়া ধরিয়া আবার বলিল—কোন্‌টা আনছ? ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট? জনি ওয়াকার?...জন্ হে'গ্?...যেটা তোমার খুসী।

ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর তিনটা 'বিয়ারে'র খালি বোতল পড়িয়া আছে। অদূরে অরুণের সোফাটার মতই গাঢ় লাল রঙের মোটা গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়া আছে এক তরুণী।

'সামার সীজন্'—গরম পড়িয়াছে।

দূরে 'বিগ্ বেন্' ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ন'টা বাজিয়া গেল। রাত্রি ন'টা। কিন্তু তখনও বড় বড় বাড়ীর মাথার উপর রোদ ঝলমল করিতেছে।

আইভির নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইয়া অরুণ বলিল—কৈ, উঠছ না যে?

আইভি বলিল—আজ আর তুমি 'ড্রিঙ্ক' করতে পাবে না রুণি!

কড়িকাঠ হইতে অরুণের দৃষ্টি নামিয়া আসিল। কিন্তু ফিরিয়া আইভির দিকে চাহিবার সামর্থ্য বুঝি তাহার ছিল না। তাই, অমনিই বলিল—বটে!...কেন, আমার অপরাধ?

—না রুণি, বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করে দিয়েছ। এভাবে স্বাস্থ্য যে দু'দিনে নষ্ট হয়ে যাবে। কেন নিজেকে এমন করে ধ্বংস করছ ?

অরুণকে এবার কষ্ট করিয়া ফিরিয়া বসিতেই হইল। মাথাটা কোনপ্রকারে স্থির রাখিয়া ক্ষণকাল আইভির প্রতি চাহিয়া রহিল। শেষে শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল —আমার স্বাস্থ্যের প্রতি এতখানি দরদ কবে থেকে হলো, আইভি ?

তাহার এ হাসি দেখিয়া আইভি জলিয়া উঠিল। চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—অনেক দিন থেকে। তোমার যদি চোখ থাকত, তা' হলে একথা অনেক দিন আগেই বুঝতে পারতে।

অরুণ তেমনি শ্লেষভরা হাসি লইয়াই বলিল—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদিন কি একটা বলেছিলে বটে।...ভুলে গেছি কথাটা।...আমায় ভালবাস, না ?...বল তো আর একবার। শুনতে মন্দ লাগে না, যাই বল।

আইভি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছলছল চোখে চাহিয়া, আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ; বলেছিলাম বৈ কি। কিন্তু তাই নিয়ে তোমার ঠাট্টা করা আমি কিছুতেই সইব না। তোমার যদি কিছুমাত্র ভদ্রতা জ্ঞান থাকে, তা' হলে আমার ও জিনিষের অপমান করো না।

হঠাৎ অরুণের বিকট হাসিতে ঘর ভরিয়া উঠিল। ফট্-ফট্ করিয়া হাততালি দিতে দিতে বলিল—'ব্র্যাভো, ব্র্যাভো', চমৎকার বলেছ !...দেখ আইভি, তুমি 'হলিউডে' যাও; এক রাত্তিরে 'ষ্টার' হয়ে যাবে।...কি আশ্চর্য্য, তোমাদের জাতের সবাই কি এক একজন 'ষ্টার ?'...ও জিনিষ কি তোমাদের রক্তে মিশে আছে ? সে যাক্, এখন বোতলটা আনো। সময় বয়ে যাচ্ছে।

আইভি আবার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল —তার আগে আমাকে বিদায় দিতে হবে।

—না না, এখনি বিদায় কেন ? ধ্বংস বলছিলে না আইভি ? ও জিনিষ যে তোমাদের হাত দিয়েই আসা উচিত। 'হিষ্ট্রি' পড়ো নি বুঝি ? শাস্ত্র-টাস্ত্রও মানো না ? আমার ত এখনও 'লিভার' পাকে নি। এরি মধ্যে বিদায় হলে যে খাপছাড়া হয়ে যাবে।

বলিয়া, উঠিয়া টলিতে টলিতে নিজেই আলমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—ছি আইভি, আর যা খুসী কর, কিন্তু ঐ কান্নার ভান আমার সহ্য হয় না! ওটা দরকার বুঝে অন্য কোন কাজে লাগিও।

আলমারী হইতে হুইস্কির বোতল এবং দুইটা গেলাস বাহির করিয়া যখন ফিরিয়া দাঁড়াইল, আইভি তখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। অরুণ এবার একটু বিরক্তভাবেই বলিল—ঐ তো তোমাদের দোষ, আইভি। তোমরা মাত্রা রেখে কোন কাজ করতে পার না। ঐ যে একদিন বলেছিলে ভালবাস, মদের নেশায় একদিন হয় তো ও কথা বিশ্বাসও করে ফেলতুম। কিন্তু, এই দেখো, বাড়াবাড়ি করে সব নষ্ট করে দিলে। আমি জানি তোমার মোটেই কান্না পাচ্ছে না। কেন মিছিমিছি চোখ দুটো রগড়ে রগড়ে রাঙিয়ে তুলছ ? যাক্‌গে সত্যিই ভালবাস না, তবু ফাঁক পেলেই হাতের মুঠোর ভেতর চেপে ধরে একটু খেলিয়ে শেষে আচমকা ছেড়ে দিয়ে মজা দেখতে কি এতই ভাল লাগে তোমাদের ?

হুইস্কির বোতল খোলা হইয়া গেল। আইভি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তুমি যদি আজ আবার ঐগুলো খাও, তা' হলে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

অরুণ এবার সত্যই একটু বিস্মিত হইয়া আইভির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। শেষে কহিল—তোমাদের পাশের বাড়ীর ঐ 'জন' ছেলেটার সঙ্গে ভাব হয়েছে বুঝি ? একটা লোকের সঙ্গে কতদিন আর তোমরা ভাব রাখবে !

বলিয়া হোহো করিয়া হাসিতে হাসিতে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল—বলে কি না ভালবাসে! আইভি ভালবাসে অরুণকে! কেমন জলের মত ও কথা এরা বলে; একটুও বাধে না। তোমাদের ও চালাকী আমার অনেক দেখা আছে, আইভি।...স্বচ্ছন্দে যেতে পার। মনেও করো না যে, সেই দুঃখে কেঁদে কেঁদে বুক ফেটে মরে যাব।

একটু থামিয়া, হাসিতে হাসিতে আবার বলিল—

একদিন, ঠিক এমনি অবস্থায় প'ড়ে সত্যিই কেঁদেছিলুম বটে। তখন ছিল কাঁচা বয়েস; তা' ছাড়া, আমার প্রতি তোমাদের এতটা দয়াও তখন দেখা দেয় নি। বড় আচমকা ঘটেছিল ব্যাপারটা; তাই সামলাতে পারি নি। কিন্তু এখন অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।......যাও আইভি, কোন আপত্তি নেই।

মিস্ আইভি যাইতে গিয়া অরুণের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর সহসা হাত বাড়াইয়া তাহার মাথাটা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ধরা-গলায় বলিল—ওঃ, রুণি, তোমারও ত একটা লোককে বেঁধবার মাত্রাজ্ঞান নেই! তুমি জান আমি যেতে পারব না। জান যে, 'জনে'র দিকে আমি ফিরেও চাই না; তবু কেন জোর করে ও কথাগুলো বললে? আমাকে বেঁধাই যদি উদ্দেশ্য থাকে, তা' হলে যথেষ্ট হয়েছে, আর বলো না।

অরুণের হাতের গেলাস হাতেই ধরা রহিল। শান্ত শিশুটির মত চক্ষু দুটি নিমীলিত করিয়া স্থির হইয়া বসিল।

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আইভি বলিল—আমি বুঝতে পারি রুণি, কিসের জন্যে তোমার মনের এ অবস্থা। কিন্তু, তুমি তরুণ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার সামনে পড়ে আছে। হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পেরিয়ে এ দেশে এসেছ, দু' হাতে টাকা ব্যয় করেছ এবং করছ—সে কি এইভাবে জীবনটাকে নষ্ট করবার জন্যে? কবে কোন বিশ্বাসঘাতিনী এক মেয়ে .....

অরুণ বাধা দিয়া, অধীর কণ্ঠে বলিল—থাক, থাক, আইভি, আর কথা বলো না। যা করছ, করে যাও। তোমাদের কাছে এইটিই আমার সব চেয়ে দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত।

এমনি সময়ে দরজায় শব্দ হইল। আইভি চেয়ারে গিয়া বসিল। অরুণ বলিল—কাম্ ইন্।

'ল্যাণ্ডলেডী' বুড়ী ঘরে প্রবেশ করিয়া, একখানা চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া জানাইল—চিঠিখানা আজিকার ডাকেই আসিয়াছিল। কিন্তু অরুণ সারাদিন বাড়ীতে ছিল না বলিয়া তাহাকে দেওয়া হয় নাই।

বলিয়া উভয়ের প্রতি একবার চাহিয়া, একটু মুচকি হাসিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আজ ভারতবর্ষের ডাক আসিবার দিন। ঠিকানাটা মেয়েলী হাতের লেখা। একবার যেন চেনা বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কাহারে লেখা, তাহা অরুণ স্মরণ করিতে পারিল না। হেলাভরে চিঠিখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—মাসী-পিসীর দলের কেউ হবেন হয় ত। কি আশ্চর্য্য, এখনও ওঁরা ভাবেন, আমি দেশে ফিরে যাব, বিয়ে করব!

আইভি বলিল—সে ত আমিও ভাবি। নিশ্চয়ই দেশে ফিরবে, বিয়েও করবে। চিরদিন ভবঘুরে হয়ে কাটাবে না কি?

অরুণ শুধু একটু মুচকি হাসিয়া গেলাস মুখে তুলিতে যাইতেছিল, আইভি ছুটিয়া আসিয়া গেলাসটা ছিনাইয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখা ফুলদানিতে সব মদ ঢালিয়া দিল।

বলিল—অন্ততঃ একটা দিন আমার কথা রাখতেই হবে তোমাকে। ছিঃ, এত করে বারণ করলুম!

গেলাস এবং হুইস্কির বোতল আলমারীর ভিতর রাখিয়া দিয়া বলিল—দেশ থেকে চিঠিখানা এল; একবার খুলেই দেখো না—কে লিখেছেন।

বলিতে বলিতে নিজেই ছুরি দিয়া চিঠিখানা খুলিল। অরুণের কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল—আমি অবশ্য বুঝি না। কিন্তু মেয়েলী হাতের লেখা বলেই মনে হচ্ছে। পড়ে দেখো, হয় ত তোমার কোন ভারতীয় প্রিয়া লিখেছেন।

চিঠিখানা নজরে পড়াতে সহসা অরুণ বিষম চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল। 'খপ্' করিয়া আইভির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, নিতান্ত বিস্মিতভাবে বলিল—এ কি··· এ তো স্বপ্নেও...এ যে...এ যে···মাপ কর আইভি, একটু বসো, চিঠিখানা পড়ে দেখি।

ইহার পর, তাহার কাছে জগতের আর সব কিছুই যেন লুপ্ত হইয়া গেল। বিয়ারের রঙিন নেশা, 'জন হেগে'র স্বপ্ন, আইভির পেলব হাতের কোমল পরশ...

অরুণ পড়িতে লাগিল—

বাবুইহাটী
১০ই আষাঢ়, ১৩৪৩

অরুণ,

বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ কোথায় রইল আমার সে দৃঢ়পণ! সাত সমুদ্র, তের নদী ডিঙ্গিয়ে, হাজার হাজার মাইল দূরে যে চলে গেছে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্য কোন ব্যথাই যার বুকে বাজে না, তার কাছে আমার এ চিঠির কতটুকু মূল্যই বা হবে। ভেবেছিলাম, কোনদিন আর তোমার কথা মনের কোণেও স্থান দেব না। কিন্তু, নারী জাতির মনের দুর্ব্বলতাই জয়ী হলো। আমি হার মানছি।

তোমার প্রতি দারুণ ঘৃণার বিষেই মন ভরেছিল। আজ নানা কারণে সে বিষের জ্বালা অনেক কমে এসেছে। যদিও বুঝি, সে কারণগুলি অতি তুচ্ছ—হয় ত তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করবার নিতান্ত ছেলেমানুষী আব্‌দার মাত্র।

এখন মনে হয়, তুমি তো এমন নির্ম্মম কোনদিন ছিলে না। একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে সহসা এমন অদ্ভুত ব্যবহার করা যে একেবারেই স্বাভাবিক নয়। তারপর থেকে তুমি তোমার নিজের জীবনটাকে নিয়েই বা এমন ছিনিমিনি খেলতে লাগলে কেন? ডাক্তারী পাশ করে কোলকাতায় এমন সুন্দর চাকরীটা পেয়েছিলে; তা' ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হলে। কয়েক বছরের পর একবার কাণে এসেছিল তুমি বোম্বেতে আছ। তখনও আমার বুকে আগুন জ্বলছে। তাই, কোন খোঁজ নেবার চেষ্টাও করি নি। সেদিন কথায় কথায় হঠাৎ তোমার বন্ধু নির্ম্মলবাবুর মুখে শুনলুম, তুমি সাগর পাড়ি দিয়ে ও দেশে চলে গেছ—বহুদিন হলো। তাঁর কাছ থেকেই তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি।

আর যে আমি পারি না, অরুণ! বিধাতার নিষ্ঠুর বজ্রাঘাতে আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেছে—এখন ভাবি, এতখানি বিষের জ্বালা বুকে পুষে রেখে, এমন দারুণ অভিমান করে, কেন এতকাল কাটিয়ে দিলুম? কেন এমন ভবঘুরে হয়ে দাঁড়িয়েছ? কেন তুমি আজ মায়ামমতাহীন, গৃহত্যাগী? তোমার জন্যে আমার বুকের ভিতরকার কান্না আর যে সয় না! হাজার হাজার প্রশ্ন মনের মধ্যে গজিয়ে ওঠে। তাই, আজ আর না পেরে, স্থির করেছি—তোমাকে সব ব্যাপারটা জানাই। এই দীর্ঘ দিনের পর কি কি শেলের আঘাত আমাকে সইতে হয়েছে, আজ তাই বলব।

একদিন—যখন তোমাকে ছাড়া আমার চোখে জগতের আর সব কিছুই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল—তোমার হাতে নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দেবার স্বর্গীয় আনন্দে পাগল হয়ে দিন গুণতুম—তেমনি সময় একদিন, তুমি আসবে বলে ঘর-বার করছি। কিন্তু তুমি এলে না। এলো তোমার বন্ধু সুনীল। একে তোমার না আসার জন্যে অভিমান, তারপর আবার সুনীলের আগমনে মন বিগড়ে গেল। কারণ তুমি জান, সুনীল তোমার বন্ধু হলেও, তাকে চিরদিন ঘৃণা করেছি। আমি তোমার বাগ্‌দত্তা জেনেও সে খোলাখুলিভাবে আমার কাছে প্রেম-নিবেদন করতে সাহস পেতো। সুযোগ পেলেই তোমার কুৎসা রটাতে চেষ্টা করত। আমি তার একটি কথাও বিশ্বাস করি নি। বরং, এ জন্যে তাকে আরও ঘৃণা করেছি।

সেদিন তার মুখে এক নতুন কথা শুনলুম। তুমি না কি তোমার পাড়ার ইলা রায়কে ভালবেসেছ। তার সঙ্গে তোমার না কি বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেছে।

কথাটা এমনিই হাস্যাস্পদ, এমনিই অবিশ্বাস্য যে, আমি হেসে গড়িয়ে পড়লুম। কিন্তু বুকের ভিতর কেঁপে উঠল।

সে বললে—চলো আমার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে। তা' হলেই সব বুঝতে পারবে।

হাসতে হাসতেই তার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে এসে দাঁড়িয়েছি। সে আমাকে এক নির্জ্জন ঝোপের ভিতর নিয়ে গিয়ে বললে—এই বেঞ্চিটাতে বসো। এখনও ওরা আসে নি দেখছি।

তারপর, আমার পাশে বসে শোনাতে লাগল—ইলার সঙ্গে না কি অনেকদিন থেকেই তোমার ভাব চলছে।

ইলাও তোমাকে ভালবাসে। এ অবস্থায় আমার সঙ্গে তুমি তখনও ছলনা করছ দেখে, সে তোমাকে অত্যন্ত জঘণ্য প্রকৃতির লোক বলেই মনে করে।

এমনি সময়ে সত্যিই দেখলুম তুমি ইলার হাত ধরে কোণের দিকের আর একটা ঝোপের ভিতরে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে। পরিষ্কার মনে হলো, তুমি আমাদের দেখতে পেয়েছ। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ না দেখার ভান করে ইলার সঙ্গে কথা কইতে লাগলে। ইলা তোমার গায়ের উপর ঢলে পড়ল।

এতক্ষণ সুনীলের কোন কথাই বিশ্বাস করতে চাই নি। কিন্তু, এখন চোখের সামনে সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে লাগল। সব স্বপ্ন বলে মনে হলো। ওঃ, অরুণ, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সে মুহূর্ত্তটি ভুলতে পারব না! আমার সে সময়কার মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

উঠে দাঁড়িয়েছি; কিন্তু কেঁপে আর কেঁদেই মরি দেখে সুনীল হঠাৎ দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে—এ কি, পড়ে যাবে যে! চলো এবার যাওয়া যাক—ওরা দেখে ফেলতে পারে।

স্বপ্নাবিষ্টের মতই তার বাহু-সংলগ্ন হয়ে গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন রাত্রে বাবা জানালেন তোমার না কি সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হৈচৈ পড়ে গেল। আমিই শুধু এ নিরুদ্দেশ হবার কারণ বুঝলুম। তোমাকে আরও কাপুরুষ বলে মনে হলো। কারণ, পালিয়ে গিয়ে তুমি ইলার সঙ্গে ছলনা করেছ।

তারপর, একদিন যেন কা'কে সাজা দেবার জন্যেই—যাকে চিরদিন অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণার চোখে দেখেছি—তাকেই জীবনের সাথী করে নিতে রাজী হলুম। তাদের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। বাবা মার আপত্তি সত্ত্বেও সুনীলের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু বিয়ে হবার পর থেকেই আমার ভুল বুঝতে পারলুম। আমি বিয়ে পাশ, কোলকাতার আধুনিক সমাজের মেয়ে। জীবনে কত কিছুরই রঙীন স্বপ্ন দেখতুম। কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে বন-জঙ্গলঘেরা এই বাবুইহাটীতে শ্বশুর-ঘর করতে আসতে হলো। বাড়ীতে দুই বুড়ো বুড়ী সুনীলের বাবা মা। তাঁদের সেবা করার লোকের দরকার।

সুনীলও কোলকাতায় একটা চাকরী নিলে।

এখানে এসে দু'দিনেই হাঁফিয়ে উঠলুম। রান্না করা, ঘর নিকোন, বাসন মাজা, দুই বুড়ো বুড়ী সেবা-যত্ন করা, তার ওপর আমার অজ্ঞতা আর মেম সাহেবীয়ানার জন্যে রাত্রিদিন বিদ্রূপ শোনা—এই ছিল আমার কাজ।

সুনীল মাঝে মাঝে আসত। আদর-সোহাগে, মিষ্টি কথায় সে আমার মুখে একটু হাসি ফোটাবার কী চেষ্টাই না করত! কিন্তু, তাকে কত যে হেলা তাচ্ছিল্য করেছি, কত যে কটু কথা বলেছি, তার সীমা নেই!

এই ভাবে একটী বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

এ সব কথা ভাবতে গিয়ে, দুঃখে, ব্যথায় আমার বুক ফেটে যায়। সে বেদনায় প্রলেপ দেবার মত আজ আর কিছুই খুঁজে পাই না। আমার ব্যবহারে সে ক্রমশঃ বিমর্ষ, মলিন হয়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারলে, আমাকে বিয়ে করে, এই বনের ভিতর আনা তার অন্যায় হয়েছে। এ কথা সে অহোরহ বলত। আমি তার সে ক্ষত স্থানে আরও ভাল করে বিষ ছড়াতুম।

একদিন অসুখ নিয়ে সে বাড়ী এলো। জ্বরে বেহুস হয়ে থাকত। তারপর সাত দিনের দিনে আমাকে ডেকে বারবার তার সকল অপরাধ ক্ষমা করবার আকুল মিনতি জানিয়ে সে চিরদিনের মত চোখ বুজলে। কি অপরাধ ক্ষমা করবার জন্য এত অনুনয়, তা' বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু সেদিন তার সেই পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে আমার চোখ ফেটে জল এল। বারবার শুধু এই কথাটাই মনে হতে লাগল যে, ওর মরণের জন্যে আমিই দায়ী। আমি ইচ্ছে করলে অন্ততঃ এই পথ ধরে আমার জীবন-মরুভূমির 'ওয়েসিস'টিতে পৌঁছতে পারতুম। তাও হলো না।

সেইদিন থেকে আমার জীবন-পথের মোড় ফিরেছে। সে তার প্রাণ দিয়ে আমাকে শিখিয়ে গেছে মানুষকে ভালবাসতে। সেই আমাকে অনুরোধ করে গেছে—

তোমাকেও ক্ষমা করতে। আজ ভাবি, আমি তার স্ত্রী হয়েও তার জীবনটা কী ভাবেই না নষ্ট করে দিয়েছি!

যাক্, মনে আমার আর কোন রাগ হিংসার জ্বালা নেই। তাই আজ হঠাৎ তোমার ঠিকানা পেয়ে এই চিঠি লিখলুম। আমি জানাতে চাই যে, তোমাকেও আমি ক্ষমা করেছি।

বড় মন কাঁদে, অরুণ! শুধু তোমায় জন্যে মনে আমার শান্তি নেই। সত্যি কিসের জন্য দেশত্যাগী হয়েছ, তা' জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু সে কি ভাল? দেশের জন্যে—এখানকার কারুর জন্যেই কি তোমার বুকে ব্যথা বাজে না?

এ হতভাগ্য দেশটা যে ছারখার হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ আর মহামারী যেন হাত ধরাধরি করে গ্রামের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য জুড়েছে। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় লোকে যেন পথের কুকুর বেড়ালের মত মরছে। বর্ষা নেমেছে। এইবার আসবে বন্যা। অনেকের সম্বল কুঁড়ে ঘরগুলিও যাবে।

তুমি ডাক্তার। এ সময় যে এখানে তোমার বড় প্রয়োজন। দেশের ছেলে, দেশে ফিরে এসো, অরুণ। এমন করে আর ভেসে বেড়িও না। তুমি তো আর সত্যি কাপুরুষ নও। তোমাকে আমি দেখতে চাই অনেক উঁচুতে—তোমার যোগ্য স্থানে। আমার স্বামীর নামে গ্রামে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়েছে। আমার বড় সাধ—তুমি এসে তার ভার নাও। তোমার জন্যে অনেক ব্যথা সয়েছি, অনেক কেঁদেছি, আমি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি যে, আমার এই একটি এবং শেষ অনুরোধ তুমি রাখবে।

মমতা

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে অরুণের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। পড়া শেষ হইলে, সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর, সহসা উন্মাদের মত বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই উঠিয়া গিয়া আলমারী হইতে হুইস্কির বোতল এবং গেলাস বাহির করিয়া লইয়া আসিল। গেলাসে ঢালিয়া, সোডা না মিশাইয়াই এক নিশ্বাসে সবটা পান করিল। আবার ঢালিয়া আবার পান করিল।

আইভি শঙ্কিতভাবে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কি রুণি? অমন করছ কেন?

অরুণের হাসি তখনও থামে নাই। অস্বাভাবিক-ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—চমৎকার!... 'ক্যাপিটাল!..ব্র্যাভো!'...এবার কা'কে বলছি জান, আইভি? ভগবানকে। খাসা চাল চেলেছেন...'মারভেলাস!'

—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, রুণি।

গেলাসটা শেষ করিয়া অরুণ বলিল—শোনো, আজ তোমায় বলি। বড় চমৎকার গল্প। 'ক্লাইম্যাক্স, অ্যান্টী-ক্লাইম্যাক্স, মেলোড্রামা' সব এতে পাবে। শোন, এই চিঠিখানা আগে পড়ে শোনাই।

বলিয়া চিঠিখানার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া আইভিকে পড়িয়া শুনাইল। হুইস্কির বোতল ততক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখ এবং মুখ জবাফুলের মত লাল। কথা জড়াইয়া আসিয়াছে।

বলিল—ওঃ, আইভি, এতদিন ধরে যে কথাটা রোজ ভেবেছি, তবু বুঝতে পারি নি—আজ তা পরিষ্কার হয়ে গেল! শোন এবার আমার দিকটা বলি—মমতাকে সত্যিই ভালবেসেছিলুম। তাকে ছাড়া জীবন আমার মরুভূমি হয়ে গেছে, তা' তো দেখতেই পাচ্ছ। তখনও তাই ভাবতুম। আমার বন্ধু সুনীল, নানাপ্রকারে বোঝাতে চেষ্টা করত যে, মমতা তাকেই ভালবাসে এবং সেও মমতাকে ভালবাসে। আমি বিশ্বাস করতুম যে, সে মিথ্যা কথা বলছে। এদিকে, আমাদের পড়ার ঐ ইলা রায়ের আমার ওপর ভয়ানক টান ছিল। একদিন সকালে সে এসে আবদার ধরলে, সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে যেতে ইডেন্ গার্ডেনে হাওয়া খাওয়াতে। তার সে আবদার কিছুতেই এড়াতে না পেরে রাজী হলুম।

সেইদিনই বিকেলে এলো সুনীল। শুনলুম, সন্ধ্যায় সে মমতাদের বাড়ীতে যাচ্ছে। তাকে ইলার কথা

জানিয়ে বললুম—যেন গিয়ে মমতাকে বলে যে, আমি সে-দিন সেখানে যেতে পারব না। তখন স্নুনীল আমার সঙ্গেও ঠিক একই ছলনা করলে। বললে—গার্ডেনে যাচ্ছ তো? আজ প্রমাণ পাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কিসের প্রমাণ?

সে বল্‌লে—গেলেই দেখতে পাবে।

গার্ডনে গিয়ে, ঘোরাঘুরি করতে করতে এক সময় সত্যিই দেখলুম, তারা হাত ধরাধরি করে এক নির্জ্জন ঝোপের ভিতর বসে আছে। একবার স্নুনীল মমতাকে আলিঙ্গনও করলে।

মাথা গুলিয়ে গেল। সারা তুনিয়াটা যেন শূন্য বলে মনে হতে লাগল। মনে হলো—বুঝি পাগল হয়ে যাব। তখন আর কোনদিকে চাইবার কোন কিছু ভাববার অবসর ছিল না। পরদিনই বেরিয়ে পড়লুম। সেই হলো আমার ঘোরাঘুরির সূত্রপাত। সমস্ত নারী জাতির উপর ঘৃণায় মন ভরে উঠেছিল। পাগলের মতই পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ঘুরে ঘুরে আজ এতদিনের পর···এখানে...ওঃ, কত বড় ছলনা! কতখানি নিষ্ঠুরতা!

বলিতে বলিতে অরুণ আবার হাসিতে লাগিল।

আইভির চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল—যাক, যা' হবার হয়েছে। এবার দেশে ফেরবার ব্যবস্থা কর। তোমার মমতা পথ চেয়ে বসে আছে।

অরুণ চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায় ফিরে যাব আইভি? সব যে শেষ হয়ে গেছে, দেখছ না? আর সে সময় কোথা'?...'টু লেট্···ইট্‌স্ টু লেট নাউ···'

তারপর, টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া যেন নিজের মনেই আওড়াইতে লাগিল—স্নুনীল···আমার পরম বন্ধু··· মমতার স্বামী...মরে গেছে...তার নামে হাসপাতাল —সেখানকার ডাক্তার আমি...আমার চোখের সামনে বিধবা মমতা...বাঃ বাঃ, সে যে আমার স্বর্গবাস হবে!...

আইভি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—চুপ কর রুণি। একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর, তোমার নেশা হয়েছে।

অরুণ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল—নেশা?...হ্যাঁ আজ একটু নেশা করতে হবে। এতবড় সমস্যাটার এমন স্নুন্দর সমাধান হয়ে গেল, আজ তো আনন্দ করবারই দিন!...একটু রসো আইভি। আমি চট্ করে ঐ মোড় থেকে এক বোতল 'স্যাম্পেন' নিয়ে আসি।···বলিয়াই টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীবিমল সেন
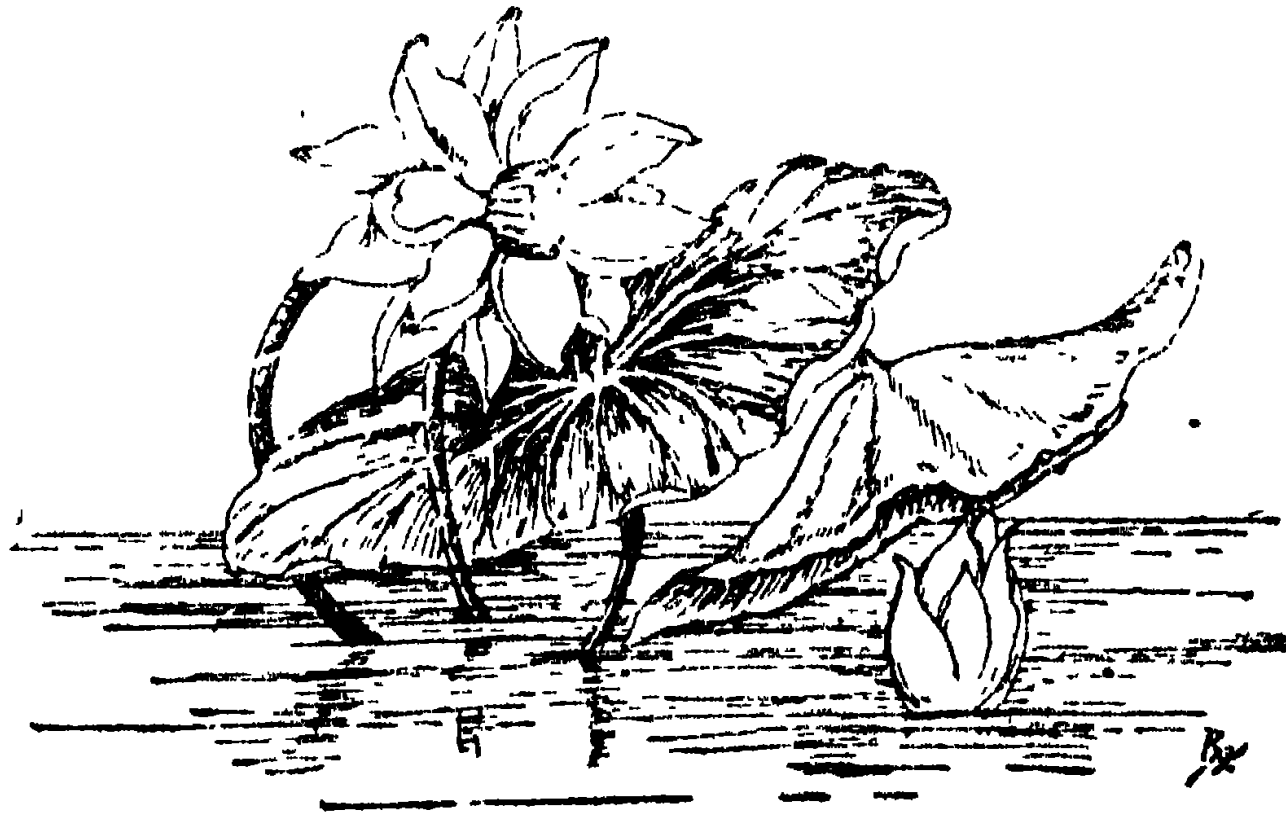
ভিক্ষালাভ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভগবান বোধিসত্ত্ব
এসেছে শুনিয়া হর্ষ-বিভোল পুরবাসী যত ভক্ত।
হারানো রতন ফিরিতেছে ঘরে,
ভিক্ষার থালি রহিয়াছে করে,
মহাভিক্ষু সে বহুকাল পরে
এনেছে পরম তত্ত্ব,
গোপার নয়নে ঝরিছে অশ্রু, রাজপুরী সুখে মত্ত।
সখীরা কহিছে—"উঠে এস দেবী, থেকো না ধেয়ানে মগ্ন।
রাজার কুমার হয়েছে শ্রমণ, দরশন করি জুড়াও জীবন,
নয়নে কেন গো ঝরিছে শ্রাবণ, কেন গো হৃদয় ভগ্ন?
ফিরায়ে দিও না এসেছে তোমার জীবন-মিলন-লগ্ন।"
অধরে গোপার হাসির রেখাটী উঠিয়া মিশিল চক্ষে,
কহিলা শ্রীমতী—"যাবো নাক আমি,
তাঁর পূজা যেথা করি দিবাযামী,
আসিবেন সেথা সে জীবন-স্বামী
আমারি নীরব কক্ষে,
তাঁর পদধূলি রাখিব আমার ভেঙে-পড়া এই বক্ষে।"
ধীরে ধীরে সেই পূজা-মন্দিরে ভাতিল পূর্ণইন্দু,
শিষ্য দু'জন গৌতম সনে, প্রবেশিল সেথা হরষিত মনে,
নীরবে গোপার নয়নের কোণে ফুটিল মুকুতা বিন্দু,
পাগলের সম মাতিয়া উঠিল নারী-জীবনের সিন্ধু।
নিরখিল দেব যোগিনীর বেশ জটাজুট বাহি অঙ্গে,
পরিহার করি সকল বিলাস,
লইয়াছে গোপা গৈরিক বাস,
এ কি সন্ন্যাস, ব্রত বার মাস
পুণ্যনিষ্ঠা সঙ্গে!
সতীর অঙ্কে হাসিছে বালক নির্জ্জনে নানা রঙ্গে।
বুদ্ধ চরণ নতশিরে দেবী করিয়া অশ্রুসিক্ত,
শিশু রাহুলের রাজবেশ খুলি, গৈরিক বাস দিল দেহে তুলি',
করে দিল শুধু ভিক্ষার ঝুলি তনয়েরে করি রিক্ত।
ভাবী কোশলের অধিপতি এ কি সন্ন্যাসী-বেশে দৃপ্ত!
"চাও পিতৃধন জনকের কাছে"—কহিলা জননী পুত্রে।
কে আমার পিতা বলো মা আমারে,
পিতা কি আছেন ভুবন-মাঝারে!
দেখি নি কখনো জীবনে তাঁহারে,
পাই নি স্নেহের সূত্রে
বলো কার কাছে চাহিব জননী আমার পিতৃমুদ্রে।"
মায়ের নিকটে ইঙ্গিত লভি' গৌরবরণ কান্তি,
কহিল সহসা ক্রন্দন করি'—"দাও পিতা মোরে
তব ধন বরি।"
বুদ্ধ হৃদয় উঠিল শিহরি, জাগিল মরমে শান্তি,
স্বরগ হইতে দেব ঋষিগণ পড়িতে লাগিল নান্দী।
ছুটিয়া আসিল রাজপরিবার, নেহারি করুণ দৃশ্য—
বৃদ্ধ রাজা ও রাণী সকাতরে
কহিছে—"রাহুল, খুলে ফেল্ ওরে,
রয়েছিস কেন চীরবাস পরে
আপনারে করি নিঃস্ব!
রাজপাট ছাড়ি যেও না বাছনি, কাঁদায়ে নিখিল বিশ্ব!"
রাহুল কাঁদিয়া বুদ্ধেরে কহে—"দাও মোরে তব বিত্ত।"
"পিতার ধর্ম্ম পালিয়া এবার, সপ্ত রত্ন দিব যে আমার।"
শুনিয়া সকলে করে হাহাকার, গোপার উলসে চিত্ত,
আকাশের তারা গগন-দেউলে করে আরতির নৃত্য।
"সময় হয়েছে হে সারিপুত্র, দিব গো তনয়ে দীক্ষা।"
অমনি শিষ্য উঠিল ব্যাকুলি,
ভিক্ষাপাত্র করে দিল তুলি',
পুত্র জননী নিয়া পদধূলি
চাহিল চরম ভিক্ষা,
বুদ্ধ পরশে গোপা ও রাহুল লভিল ধর্ম্মশিক্ষা।
তখন নেমেছে ধরণীর বুকে নীরবে ফাগুন-সন্ধ্যা,
দখিণা বাতাস ধীরে বয়ে যায়, তারার কুসুম বিকশিত প্রায়
দেবদাসীগণ মন্দিরে গায়, পুলকিত রূপ-ছন্দা,
রাজার কাননে গন্ধ বিতরি' ফুটিছে রজনীগন্ধা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মৃত্যু-রহস্য

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, বি-এ, এল্-এম্-এফ্

ইলিয়ট রোডের—নং ছোট একতলা বাড়ীখানির চারিদিকে ভোর হইতেই বিস্তর লোক জমিয়াছে। কেহ বলিতেছে, আত্মহত্যা—বিষ, ছোরা, গুণ্ডা—কত কথাই শুনা যাইতেছে। পুলিসে বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, ভিতরে কেহই যাইতে পারিতেছে না।

ছোট বাড়ী, একখানি শয়ন ঘর, একখানি রন্ধন ও ভাঁড়ার ঘর এবং ছোট একটি বাথরুম। ঘরগুলির সংলগ্ন একটু দালান ও তৎপরে পাঁচ ছয় হাত পড়তি জমিতে কয়েকটা বরবী ও হাসনাহানার গাছ। জমির পরেই উঁচু দেওয়াল বাড়িটি ঘেরিয়াছিল—উহাতেই সদর দরজা এবং তাঁহার পরেই রাস্তার ফুটপাত। শয়ন ঘরের পূর্ব্বদিকেই একটি সরু গলি পথ আসিয়া ইলিয়ট রোড পড়িয়াছে—ঐ পথে রিপণ ষ্ট্রীটে যাওয়া যাইত।

স্থানীয় দারোগা শৈলেন বসু হেড অফিসে ফোন করিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইয়া অবশেষে রায়বাহাদুর জগন্নাথ দাসকে আনাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সাব-ইন্সপেক্টর শৈলেনবাবু, একজন হেড কনেষ্টবল ও দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে লইয়া শয়ন ঘরে তদারক করিতেছিলেন। ঘরের মেঝের উপর একটি বাইশ তেইশ বছরের সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ পড়িয়াছিল, নিকটেই একখানি ছোরাও দেখা যাইতেছিল—মৃতার মুখে, নাকে, ব্লাউজ, শাড়ীতে রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। ঘরের একপাশে একটি টেবিল, তিনখানি চেয়ার, টেবিলের উপর ফুলদানীতে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুল, একপাশে সেইদিনের একখানি ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ—সমস্তই রক্তাক্ত।

প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া জগন্নাথ দাস বলিলেন, "দেখছি মেয়েটী অন্ততঃ সাত আট ঘণ্টা আগেই মারা গেছে। তুমি এ সন্ধান জান্‌লে কিরূপে শৈলেন?"

"আজ সকালে ডিউটিতে আসবার সময় হেড কনষ্টেবল শঙ্কর সিং ঐ গলিপথ দিয়েই আসছিল—রোজই যেমন আসে। সে বলে যে, এই বাড়ীতে তখনও আলো জলছিল, তাতে তার সন্দেহ হয়, আর সে উঁকি দিয়ে শোবার ঘরের জান্‌লা পথে এ ঘরের অবস্থা দেখে আমায় জানায়। ঘরের দুটো জান্‌লাই ঐ গলির দিকে পড়েছে দেখছেন।"

"তুমি এসে কি দেখলে?"

"যা এখন দেখছি—ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে আপনার শরণ নিতে হলো অগত্যা।"

জগন্নাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভালই হয়েছে, এই রকমেই লোকের শিক্ষা হয়, চতুরতা বাড়ে — ঐ কথাটাকে আমি তাই বলি, কিন্তু সে নিজের একগুঁয়েমী ছাড়ে না। তা যাক্, এতে না বোঝবার কি দেখ?"

"আজ্ঞে, আমি বুঝতে পারছি না—এটা খুন না আত্মহত্যা। খুন হলে ঘরের যে একটা বিশৃঙ্খল ভাব থাকত, ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত, তার কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এখানে, আবার স্ত্রীলোকের পক্ষে ছোরার ব্যাপার হবে আত্মহত্যার চেষ্টাও একটু অদ্ভুত মনে হয়, ছোরা দিয়ে মারতে গেল কেন? খুন না আত্মহত্যা?"

বিস্ময়ে জগন্নাথ দাস বলিলেন, "বলো কি! এ সম্বন্ধে সামান্য ঘটনাটার সন্দেহের কারণ থাকা উচিত নয়। তোমার দেখছি বঙ্কিম বাবুর হাওয়া লাগছে।"

"আজ্ঞে না তা বলছি না" বলিয়া শৈলেনবাবু হঠাৎ প্রতিবেশী ভদ্রলোকদিগকে বলিলেন, "আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না, এখন যেতে পারেন, দরকার হলে সাক্ষী দেবার সময় দয়া করবেন।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে শৈলেনবাবু বলিলেন, "আপনি এটাকে খুন বল্‌ছেন কেন?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জগন্নাথ দাস বলিলেন, "আচ্ছা টেবিল

রক্তপাতে মৃত্যু হয়েছে, আর তার কারণ ঐ ছোরা পাওয়া যাচ্ছে—ঠিক ত ?”

“হাঁ তা ঠিক, কিন্তু ছোরার মৃত্যুজনক আঘাত চিহ্ন কই ?”

“কি মুস্কিল ! লাসটা সমস্ত চোখের সামনে দেখছ, পেটের উপর ঐ তিন চার ইঞ্চি কাটা দাগটা রয়েছে, তবুও বলছ মারাত্মক চিহ্ন কোথা ? যাক, বাজে কথা আমি ভালবাসি না, এটা খুন, খুনীর সন্ধান কর, দেখো কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না।”

কথাটা শৈলেনবাবুর মনঃপূত হইল না, কিন্তু অতবড় অফিসারের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে সাহসেরও অভাব হইতেছিল।

জগন্নাথবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “সদর দরজা ও এ ঘরের দরজা বন্ধই দেখেছিলে ?”

“হ্যাঁ, ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, আমরা কৌশলে খুলেছি।”

“জানালার সার্শী বন্ধ ছিল ? লোহার ছড় দেওয়া জানলা দেখছি, কাজেই ও পথে খুনী পালায় নি”—বলিয়া তিনি ছড়গুলি নাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

“স্ত্রীলোকটীর নাম কি বললে—জানলে কিসে ?”

“বাড়ীর মালিকের সন্ধান করেছিলাম, তাঁর কাছেই শুনলাম ইনি মিসেস মণিকা চ্যাটার্জ্জি, স্বামী বিদেশে থাকেন। সংপ্রতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ পেয়ে ইনি পুরী থেকে এসেছেন। এঁরা ক্রিশ্চান।”

“ক্রিশ্চান !” জগন্নাথবাবু বলিলেন, “আমি হিন্দু মনে করেছিলাম—কিন্তু ক্রিশ্চান মেয়ের কপালে সিঁদুর টিপ কেন, হাতে নোয়া কেন ?”

“বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরের হিন্দু সংস্কার ছাড়তে পারেন নি—দেখুন, সিথিতেও সূক্ষ্মভাবে সিঁদুর রেখা রয়েছে, তবে চট করে চোখে পড়ে না, চুলে ঢাকা আছে। স্বামীর কল্যাণ কামনায় হিন্দু নারীর সংস্কার যুগে যুগে চলে আসছে, দু'একপুরুষ ক্রিশ্চান হলেও সে ধারণা লোপ পায় নি।”

“এর স্বামীর ঠিকানা, নাম, কিছু জানতে পেরেছ ?”

“না—মাত্র কুড়ি পঁচিশ দিন ইনি এ বাড়ী নিজের নামেই ভাড়া নিয়েছেন, বাড়ীতে কোন পুরুষ না থাকায় বাড়ীওয়ালা এ সব সন্ধান নিতে পারে নি।”

“চাকর, ঝি এসব কাকেও পেয়েছ ?”

“একটা ছোকরা চাকর আছে মাত্র। মণিকা দেবীর স্বামী পুরী থেকে এসেছিলেন, আর তার পরের দিনই তিনি চলে গিয়েছিলেন এই মাত্র সে জানে।”

“ছোকরার বয়স কত হবে—পনের বোধ হয়, না ?”

“হ্যাঁ, বাইরে ত তাকে দেখেছেন। পুলিসের জিম্মায় রেখেছি।”

“দিন রাত থাকে ?”

“তা থাকে।”

“মণিকার স্বামীকে কতদিন আগে এখানে আসতে সে দেখেছিল ?”

“সে বলছে দিন পনের হবে।”

“পাড়ার লোকে কিছু জানে না ?”

“না—এত অল্পদিনে কে কার সন্ধান রাখে এ সহরে।”

“যে লোকটী দিন পনের আগে এসেছিল, সে যে মণিকার স্বামী তা চাকরটা জানলে কিসে ? জিজ্ঞাসা করেছ কিছু ?”

“আজ্ঞে কিছুই বাকী রাখি নি। চাকর বলে মণিকা দেবীই তাকে বলেছিলেন যে, 'আজ ভোর বাবু আসবেন, কিছু বাজার করবি চল্' বলে তাকে নিয়ে মার্কেটে যান্। সেদিন 'গুড ফ্রাইডে'র ছুটী ছিল। ফুল, ফল ও অন্য অনেক জিনিষ কেনার পর মণিকা দেবী রিক্সা করে ফিরে এসে ছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার সময় বাবু আসেন।”

“যাক্, মোটের ওপর মণিকার পূর্ব্ব জীবনী কিছুই পাও নি ?”

“না, কিছুই পাওয়া যায় নি।”

“টাকার জন্য এ খুন হয় নি—টাকাকড়ি, বাক্স, বিছানা কোথাও কোন লুটপাট বা ছড়ান ভাব দেখছি না, সবই ঠিক আছে—তবে এ খুনের উদ্দেশ্য কি ? অথচ, আজ বা কাল রাত্রে কোন লোককেই এ বাড়ীতে আসতে চাকরটা

দেখে নি—ছেলেমানুষ, রাত্তিরে রান্নাঘরটার কাছে পড়ে ঘুমোয়, জানবেই বা কি করে ?” অল্প পরে জগন্নাথ দাস পুনরায় বলিলেন, “দিন কুড়ি পঁচিশ আগে পুরী থেকে এসেছে—আজেবাজে কাগজ, চিঠিপত্র হয় ত সেজন্যই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার স্বামীর আসবার খবর সে নিশ্চয় চিঠিতে পেয়েছে—সে চিঠি কোথা’ গেল ?”

শৈলেনবাবু বলিলেন, “হয় ত পূর্ব্বের বন্দোবস্ত ছিল যে, ‘গুডফ্রাইডে’র দিন তিনি এখানে আসবেন, তাই চিঠি দেওয়া দরকার হয় নি।”

“উঁহু, পঁচিশ দিনের মধ্যে স্বামী একখানাও চিঠি দেয় নি ?”

“অসম্ভব কি ? আমিই ত আজ দেড়মাস স্ত্রীকে চিঠি দিই নি।”

জগন্নাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আজকাল সবই বিপরীত দেখছি। আমাদের সময় একদিন অন্তর চিঠি লেখালেখি চলত হে।”

দুই

ছোকরা চাকরটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনা হইল। জগন্নাথবাবু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম ?”

বালক বলিল, “পিটার।”

“কতদিন এ বাড়ীতে আছ ?”

“একমাস হয় নি—তিনটে রবিবার হয়েছে মাত্র।”

“কাল রাত্রে যে এসেছিল, তার চেহারাটা কি রকম—দেখলে চিনবে ?”

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, “আমি জানি না—কাল রাত্তিরে কাকেও আসতে দেখি নি, বিশেষ করে কাল রাত্তির এগারটা পর্য্যন্ত জেগেছিলুম।”

“সচরাচর ঘুমোও কখন ?’

“প্রায় আটটার সময় ঘুমাই। কাল ইনি বড় কাঁদছিলেন, তাই আমার ঘুম হয় নি—প্রায়ই কাঁদতেন, কিন্তু কাল বড় বেশী কেঁদেছিলেন। গির্জ্জার ঘড়িতে এগারটা বাজবার কিছুপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি—তার পরের খবর জানি না।”

“প্রায় কাঁদতেন কেন ?”

“কি করে বলব।”

“আচ্ছা, তুমি যাও।”

বালক চলিয়া গেলে গোয়েন্দা জগন্নাথ দাস বলিলেন, “কিছু বুঝলে হে, খুনের মূলসূত্র কত সহজে পাওয়া গেল দেখলে ত। স্ত্রী প্রকৃতির কিছু জ্ঞান থাকলেই বুঝতে পারতে যে, এ ঘটনার মূলকেন্দ্র হচ্ছে প্রেম ও প্রতিহিংসা।”

“বুঝলাম না।”

“মণিকা সুন্দরী, যুবতী, স্বামীর সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নাই, চিঠিপত্রের আদান প্রদান নাই, স্বামী আসলেন, কিন্তু থাকলেন না। স্ত্রীর ওপর তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। স্ত্রী তাঁকে ভোলাবার জন্য ফুল, ফল কিনে মন রাখ্‌বার চেষ্টা করলে এবং টাকাও কিছু হাতিয়া নিলে। তারপর স্ত্রীর ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে স্বামী বিদেশে চলে গেলেন। কৌশলী চতুরা নারী কাগজ-পত্র, চিঠি প্রভৃতি কিছুই সঙ্গে রাখ্‌ত না, তবুও তার ব্যবহারে স্বামী তাকে সন্দেহ করতেন। স্বামী চলে যাবার পর মণিকা কোন নতুন প্রেমিকের সঙ্গে মান অভিনয়ের পালা করত, মাঝে মাঝে কাঁদাকাটিও হতো। তারপর চাকরটা ঘুমিয়ে পড়লে শেষ রাতে নাগর পালাত—এই রকমই লীলা চলছিল।”

“এতে প্রতিহিংসার কি পাওয়া গেল ?”

“আরও বলতে হবে ?” জগন্নাথ দাস বলিলেন, “স্বামী বিদেশে যাওয়ার নাম করে নিকটেই কোথাও লুকিয়ে ছিলেন। কাল কোন কৌশলে তিনিই মণিকার শয়ন-ঘরের রহস্য দেখতে পেয়েছিলেন। ঐ গলির জানলায় উঁকি দিয়ে বা যে কোন উপায়েই হোক্ ঘরের মধ্যে নাগর নাগরীকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পুরুষটা পালিয়ে যায়, আর স্ত্রীলোকটা পাপের প্রতিফল পায়। প্রতিহিংসা বৃত্তি মিটে গেলে মণিকার স্বামী লাইটটা নেবাতে ভুলে গেছ্‌লেন বা দরকার মনে করেন নি। তারপর কৌশলে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়াল ডিঙিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কাজেই ঘটনাটার জটিলতা কেটে গিয়ে কত সোজা হয়ে এল দেখছ। খুনী—মণিকার স্বামী। তবে তাঁর চেহারা, নাম, ধাম কিছুই জানি না, ধরা একটু শক্ত হবে।

বাচ্চা চাকরটা আর কত সাহায্য করতে পারবে।" একসঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া রায়বাহাদুর হাঁফাইতে লাগিলেন।

শৈলেনবাবু একে একে সমস্ত কথাই শুনিয়া গেলেন, প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না; মৃতার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

অল্প পরে জগন্নাথবাবু বলিলেন, "খুনীকে ধরা শক্ত হবে, কোনই সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। উপস্থিত তুমি লাসটা 'পোষ্টমর্টম' পরীক্ষার জন্য চালান দিয়ে আর যা রিপোর্ট লেখবার লিখে সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

"মিঃ ব্রাউনকেও আসতে বলেছি, দেখি তিনি কি মতামত দেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জগন্নাথবাবু বলিলেন, "পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে কি করবেন—নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন না নিশ্চয়।"

তিন

অল্প পরেই মিঃ ব্রাউন রঞ্জন রায়কে লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িলেন। রঞ্জন রায়কে দেখিয়া রায়বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্রাউন কোন কাজেই একে ভোলেন না দেখছি।"

শৈলেনবাবু একে একে সমস্ত ঘটনার কথা দুইজনকে বলিয়া গেলেন—জগন্নাথবাবুর সন্দেহ, মণিকার স্বামীর কথা, চাকর পিটারের কথা কিছুই বাদ পড়িল না। খুন বা আত্মহত্যা বিষয়ে নিজের যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন।

ঘরের অবস্থা, লাস, ছোরা প্রভৃতি যথাস্থানেই ছিল—ছোরাটি পরীক্ষার পর তাহাকে পূর্ব্বস্থানেই রাখা হইয়াছিল। লাস ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় দেখিয়া মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "খুনই বটে। মিসেস চাটার্জ্জির সম্বন্ধে জগন্নাথবাবুর সঙ্গে আমার মতের মিল আছে। আপনার কি মত মিঃ রায়?"

পেটের উপরের কাটা স্থানটির রক্ত প্রভৃতি জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রঞ্জন রায় তখন স্ত্রীলোকটির শাড়ী দিয়া উক্ত অংশ মুছিয়া দুইটি আঙুল দিয়া আঘাতের অবস্থা অনুমান করিতেছিলেন, মিঃ ব্রাউনের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। শাড়ী, সেমিজ প্রভৃতি ভেদ করিয়া ছোরা যে পথে পেটের চামড়া কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, বস্ত্রাদিতে সেই সব ছিদ্র প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ছোরাটা কি রকমে এ জায়গায় আঘাত করেছে এটাই সমস্যার কথা। উরুতে লাগা উচিত ছিল, পেটে ফুটল কি করে? কাপড়ের সঙ্গে কোনরকমে আটকে গিয়েছিল কি?"

মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।"

"ব্যাপরটা কিছু বুঝতে পারছি না।" রঞ্জন রায় ছোরাখানি হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "যদি এই ছোরা হাতে নিয়ে কেউ হঠাৎ পড়ে যায়, তা হলে ছোরাটা তার পেটে লাগতে পারে কি? জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্ পড়ে যাবার সময়, অর্থাৎ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মানুষের হাত স্বভাবতঃ তার শরীর থেকে কিছু দূরে থাকে, কিন্তু যদি সে উপুড় হয়ে হঠাৎ পড়ে যায়—শরীরের ভারটা একটু বাঁ দিকে যদি থাকে ত সম্ভবতঃ তার ডান হাত নিজের সে টালটা সামলাবার জন্য পেটের ওপর দিয়ে ঘুরে যেতে পারে, আর সে সময়ে ছোরাটা তার জামা কাপড় কেটে পেটের চামড়াও ভেদ করে যেতে পারে—কাটার চিহ্নটা ঠিক্ আড়াআড়ি নেই, বরং সামান্য বাঁকাভাবেই আছে। নাভি থেকে কোমর ঘুরে একটা সুতো বাঁধলে যে গোল লাইন পাওয়া যায়, এই কাটা [illegible] ডান দিকের সেই চিহ্ন থেকে উঠে ওপরের দিকে অল্প কোণাকুণি গেছে—হঠাৎ দেখলে আড়াআড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে নীচ থেকে অল্প বেঁকে ওপরের দিকেই গেছে।"

"তা থেকে নূতন কোন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় কি?" বলিয়া বিদ্রূপ স্বরে রায়বাহাদুর রঞ্জন রায়কে প্রশ্ন করিলেন।

"যা সব দেখছি, তাতে সম্পূর্ণ নতুন জিনিষই ত পাওয়া যাচ্ছে জগন্নাথবাবু—তবে আরও কিছু দেখা দরকার।" বলিয়া রঞ্জন রায় নিজ মনে ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন।

টেবিলের উপরিস্থিত সংবাদপত্রখানি খুলিয়া পুনরায় একটা স্থানে কি দেখিয়া অল্প হাসিলেন মাত্র, তৎপরে

মিঃ ব্রাউনের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার হাতে একখানি শাদা কাগজের উপর কি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজখানি চাহিয়া লইলেন। কাগজে কিছুই লেখা ছিল না—পোষ্টকার্ডের মত একটুকরা ফুলস্কেপ কাগজে কয়েকটা ভাঁজ ছিল মাত্র। কাগজখানি তাঁহার নূতন সত্যের ভিত্তি দৃঢ় করিল।

জানালার কাছে আসিয়া রঞ্জন রায় সার্শীর একখানা কাচের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এত জলন্ত প্রমাণ থাকতে মানুষ নিজের মনগড়া ধারণা অনুযায়ী চলে কেন বুঝতে পারা যায় না।"—বলিয়া মিঃ ব্রাউনের মত লইয়া একখানি ছুরির সাহায্যে তিনি সার্শীর কাচখানি খুলিয়া নিজের 'এটাচি কেসে' সযত্নে রাখিয়া দিলেন।

জগন্নাথ দাস হাসিয়া বলিলেন, "কাচখানায় কি আঙুলের ছাপ পেলে না কি হে? আমরা বিস্তর খুঁজেও পাই নি।"

"না, আঙুলের ছাপ নয়, তবে প্রাণের ছাপ, বেদনা ব্যথা ও হতাশার ছাপ পেতে পারি।"

"ওখানায় খুনীর নাম, ধাম তোমায় বলে দেবে না কি?"

ম্লান হাস্যে রঞ্জন রায় বলিলেন, "আগেই বলেছে—নাম, ধাম, সবই প্রকাশ করেছে, কিন্তু খুনীর নয়, এক ভগ্নহৃদয় ব্যথিতের জীবন-চরিত পাওয়া যাচ্ছে শুধু। এখানে খুন বা খুনীর কোন প্রশ্নই আসা উচিত ছিল না, মৃতা মণিকা চাটার্জ্জীর চরিত্রে যে অপবাদ আপনি দিয়েছেন জগন্নাথবাবু, তা আপনার প্রবীণ বয়সের উপযুক্ত হয় নি—এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই বোধ হয়।"

চার

চমকিত হইয়া মিঃ ব্রাউন বলিলেন, 'কি বলছেন আপনি! খুন নয়—খুনী নয়—এ সব কি তবে? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন মিঃ রায়, আমি কঠিন জেরা করি তা জানেন?"

"আমি প্রস্তুত—আপনারা সকলেই প্রশ্ন করতে পারেন"—বলিয়া রঞ্জন রায় মৃতার দিকে বিষাদ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেটের ওপর যে তিন চার ইঞ্চি কাটাটা রয়েছে, সেটা কি এই ছোরার আঘাত-জনিত নয়?"

"ছোরার আঘাতেই এই জায়গাটা কেটেছে।"

"তাতে মৃত্যু অসম্ভব নয় বোধ হয়?"

"দাঁড়ান।" রঞ্জন রায় বলিলেন, "ছোরার আঘাতের পরই একেবারে এই প্রশ্নে যাওয়া ঠিক নয়, বরং দেখা উচিত ঐ আঘাতে কতটা ক্ষতি হয়েছে—ক্ষতির মাপ ও গুরুত্বের ওপর মৃত্যু নির্ভর করে—ছোরা মারলেই কিছু মৃত্যু হয় না।"

"শব-ব্যবচ্ছেদ না হলে সে ক্ষতি বুঝবেন কিসে?"

"এ স্থানে স্পষ্টই তা জানা যাচ্ছে। আঙুলের দ্বারা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, চামড়া ও চর্ব্বি ছাড়া পেটের মাংসপেশীর একটা স্তরও কাটা পড়ে নি। ক্ষত স্থানটা দেখতে বড় হলেও আঘাতের গুরুত্ব, অর্থাৎ প্রাণহানিকর আঘাত এটা নয়। রক্তস্রাব হবে সত্য, কিন্তু এত সহজে মৃত্যু আসবার কথা চিন্তার মধ্যে আসে না। অচিকিৎসায় দু' দশ দিন বাদে হয় ত অন্যান্য উপসর্গে মৃত্যু সম্ভব, কিন্তু এ রকমে এত আকস্মিক মৃত্যু কেন?"

"হয় ত হার্টের কোন রোগ ছিল, রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হয়ে সেই রুগ্ন হার্ট তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।"

"নাকে, মুখে রক্তের কি কারণ বলবেন? টেবিলের ওপর, ফুলদানীর ওপর, ফুলের ওপর রক্ত কেন? সংবাদ-পত্রের একাদশ পৃষ্ঠায় রক্ত কেন? রঞ্জন রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুনী ছোরা মেরেছে বল্‌তে চান—কিন্তু নীচের দিক থেকে পেটের দক্ষিণ অংশে ছোরার দাগ ওপরের দিকে গিয়েছে কেন? হার্টের রোগে তাঁর না হয় হঠাৎ মৃত্যু হলো, কিন্তু এ সব প্রশ্নের সমাধান হলো কি?"

"আপনার কিরূপ ব্যাখ্যা, আমরা শুন্‌তে পারি বোধ হয়।"

"নিশ্চয় পাবেন। কিন্তু আমি ঘটনাকে অন্য রকমে

দেখছি; কাজেই বিস্মিত হবেন তা জানি”—বলিয়া রঞ্জন রায় একবার পিটারকে ডাকিতে বলিলেন।

বালক আসিলে রঞ্জন রায় তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিটার, তুমি তোমার বাবুকে দিন পনেরো আগে এ বাড়ীতে আসতে দেখছিলে না?”

“হ্যাঁ, দেখেছিলাম।”

“তিনি কি খুব কাশ্‌তেন—তাঁর কাশি শুনেছিলে নিশ্চয়?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি খুব কাশ্‌তেন বটে, বোধ হয় ট্রেণে আসতে ঠাণ্ডা লেগেছিল।”

“আচ্ছা, তুমি তোমার বাবুকে দেখলে চিনতে পারবে?”

“নিশ্চয়! এখানে প্রায় একদিন ছিলেন, আমায় একটা টাকাও দিয়েছিলেন—খুব চিনতে পারব।”

টেবিলের উপর হইতে ষ্টেটসম্যান কাগজখানির একাদশ পৃষ্ঠায় একখানি ছোট ফটোর দিকে দেখিতে বলিয়া রঞ্জন রায় বলিলেন, “এঁকে দেখেছ কোথাও?”

পিটার লাফাইয়া উঠিল। আনন্দে বলিল, “হ্যাঁ, এই ত বাবুর ছবি—আমি খুব চিনতে পারি।”

“আচ্ছা, এখন যেতে পার।”

পিটার চলিয়া গেলে রঞ্জন রায় বলিলেন, “ঘটনাটা কিছু কি বুঝলেন আপনারা?”

“না—স্পষ্ট হলো না।”

“পড়ে দেখুন। আচ্ছা আমিই পড়ছি”—বলিয়া রঞ্জন রায় পড়িতে লাগিলেন, “বিখ্যাত ধনী যোগেন্দ্রনাথ সেনের মধ্যম পুত্র সুধীর সেন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রেভারেণ্ড জে, চ্যাটার্জ্জীর মেয়ে মিস্ মণিকা চাটার্জ্জীকে বিবাহ করায় পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া কঠোর পরিশ্রমে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে সুধীরবাবুর যক্ষ্মারোগ হয় এবং তিনি স্বাস্থ্যান্বেষণে পুরীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল না পাওয়ায় নৈনিতাল স্যানিটরিয়মে চলিয়া যান। আজ পাঁচ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ নৈনিতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নীর ঠিকানা জানা না থাকায় নৈনিতাল স্যানিটরিয়মের অধ্যক্ষ সংবাদপত্র মারফৎ তাঁহার সমবেদনা জানাইতেছেন। আমরা সুধীরবাবুর ফটো ও উপরিলিখিত ঘটনার বিষয় যাহা প্রকাশ করিলাম, সে সমস্ত নৈনিতাল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

এডিটর”

পুনশ্চঃ—“সমস্ত ঘটনা মৃত্যুকালে সুধীরবাবু কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর ঠিকানা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।”

সমস্ত শুনিয়া মিঃ ব্রাউন চঞ্চল হইয়া বলিলেন, “তা হলে আমরা নিতান্ত ভুলপথে চলেছিলাম মিঃ রায়? সুধীরবাবু নিশ্চয় অন্যায় করেন নি এবং তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী হঠাৎ কাগজে এই ঘটনা পড়ে যে আত্মহত্যা করেন নি তাই ভাববার কথা। স্বামীকে তিনি ভালবাসতেন; বিশেষতঃ, যে স্বামী তাঁরই জন্য পৈত্রিক সম্পত্তি ত্যাগ করে দুঃখ বরণ করেছিলেন, সেই স্বামীকে ভালবেসে তিনিও অন্যায় করেন নি—কিন্তু ঘরময় এত রক্ত, পেটের এ কাটা, ছোরা এ সবের কি ব্যাখ্যা দিতে চান?”

“অতি সোজা উত্তর।” রঞ্জন রায় বলিলেন, “মিসেস্ চাটার্জ্জী টেবিলের নিকট বসে সংবাদপত্রখানি পড়েই চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, পিটার তা শুনেছিল। তারপর কেঁদে কেঁদে শেষ পর্য্যন্ত জগতে বেঁচে থাকার আর প্রয়োজন নেই বুঝে আত্মহত্যার জন্য ছোরা বার করেছিলেন; বোধ হয় একাকী থাকতেন বলে টেবিলের ডালায় ওটা রাখ্‌তেন। কিন্তু আত্মহত্যা করা হলো না—হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়তে লাগ্‌ল। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্বামীর সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁরও ঐ রোগ হয়েছিল। হঠাৎ অধিক মানসিক চঞ্চলতায় তাঁর ফুসফুসের শিরা কেটে অনবরত রক্ত বার হতে থাকে—মুখের রক্ত টেবিলে, ফুলে, কাগজে পড়ে। টেবিল নষ্ট হচ্ছে দেখে তিনি বিছানায় শুতে যান—কিন্তু রক্তস্রাবে তাঁর মাথা ঘুরছিল, শরীর টল্‌ছিল, শয্যায় যাবার পূর্ব্বেই তিনি মেঝের ওপর পড়ে গেলেন—পড়বার সময় আত্মরক্ষার্থে ছোরা সমেত হাত তুল্‌তে গিয়ে ছোরার আঘাতে ঐরূপ ক্ষত হয়,

ছোরাও পড়ে যায়, তিনিও পড়ে যান। রক্ত আর বন্ধ হলো না—সেবা করবার কেউ ছিল না, কাজেই ঐরূপ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলো। খুন নয়, আত্মহত্যা নয়—রোগে মৃত্যু।"

"গল্প ত রচনা করলে বেশ, কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জ্জীর যে থাইসিস ছিল তা তোমায় কে বল্লে রঞ্জন?"

জগন্নাথ দাসের প্রশ্নে রঞ্জন রায় বলিলেন, "সেই জন্যই ত সার্শীর কাচখানা নিলাম, একটু টাটকা গয়ারের দাগ পাওয়া গেছে কাচে। আর মণিকা দেবীর মুখ থেকে একটু রক্তের জমাট বাঁধা চাপ নিলেও হয়, কিন্তু অতটা দরকার হবে না।"

"গয়ারটা অন্য লোকের ত হতে পারে?"

"পারে অনেক জিনিষই, তবে এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনাটাই দেখতে হবে; বিশেষতঃ, ঐ শাদা কাগজখানায় যে তিন ইঞ্চি চওড়া ভাঁজটা দেখছেন, ওটাতে 'মাইক্রসকোপে'র 'স্লাইড' ছিল—সম্ভবতঃ, ঐ স্লাইড বা কাচখানা কোথাও পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে, এখনও রিপোর্ট আসে নি।"

ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্ত্তেই রিপোর্ট আসিয়া গেল। কনেষ্টবল পিয়নের নিকট হইতে একখানি খাম আনিয়া মিঃ ব্রাউনের হাতে দিয়া গেল।

খাম খুলিয়া তিনি দেখিলেন, কলিকাতা 'ক্লিনিক্যাল লেবরেটরী'র মেডিক্যাল অফিসার 'স্পুটাম' পরীক্ষার রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। লিখিয়াছেন, মিসেস্ এম, চ্যাটার্জ্জী প্রেরিত 'স্পুটামে' প্রচুর যক্ষ্মা বীজাণু পাওয়া গিয়াছে—রক্তেও আছে। রিপোর্টে তারিখ ইত্যাদি লিখিত ছিল।

রঞ্জন রায় বলিলেন, "যাক, ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আজ থেকে মাত্র পাঁচ দিন আগে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী গয়ার পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন—তিনি নিজের রোগের বিষয় সন্দেহই করেছিলেন, কিন্তু রোগের জন্য চিন্তা করেন নি। এখন আপনাদের আর কোন কিছু বল্‌বার আছে কি মিঃ ব্রাউন?"

জগন্নাথ দাস বলিলেন, "এটা খুন নয়?"

"না। খুনের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ রয়েছে—ছোরার আঘাতের গভীরতা, নীচ থেকে ওপরের দিকে গতি, ধস্তাধস্তি বা আত্মরক্ষার চেষ্টার অভাব, ঘরের এলোমেলো ভাবের অনুপস্থিতি, এমন কি আপনারাই বলেছেন, চেয়ার-গুলিও সাজান ছিল, ওলট-পালট হয় নি।"

"আত্মহত্যাও নয় বলছ?"

"হ্যাঁ। আত্মহত্যার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা পূর্ণ হয় নি—স্ত্রীলোকে যদিও আত্মহত্যার জন্য সচরাচর ছোরা ব্যবহার করে না, তবুও পেটের ঐ জায়গায় ছোরা মেরে আত্মহত্যার কল্পনা করা যায় না—আর ফুল, কাগজ, টেবিলের ওপরেই বা রক্ত আসবে কেন?"

মিঃ ব্রাউন অতি করুণভাবে মৃতা মণিকা চ্যাটার্জ্জীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতে-ছিলেন; হঠাৎ তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমার নাম টি, এস, ব্রাউন হয়, যদি আমি ক্রিশ্চান হই ত—এখনই, আজই আমি এর বিহিত করব। যোগেনবাবুর ঠিকানাটা কি মিঃ রায়?"

"টেলিফোন ডিরেক্টরীতে পাবেন—কিন্তু কি করবেন?"

"কি করব?" মিঃ ব্রাউনের গলার স্বর যেন কাঁদিয়া উঠিল, "কি করব? আবার বলছি সুধীরবাবু অপরাধ করেন নি—স্ত্রী স্বামীকে ভালবেসে অপরাধ করেন নি—একজন স্কুলে পড়িয়ে, আর একজন কঠোর পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করে অপরাধ করেন নি—অপরাধী আপ-নাদের সমাজের ধনী যোগেন সেন।" অল্প থামিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আর মিঃ দাস, মনে রাখবেন—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর দেহ 'পোষ্টমর্টম' ঘরে যাবে না। তাঁর পবিত্র আত্মা স্বর্গে গিয়েছে—পবিত্র শরীর নিজের খরচায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে সমাধি-ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে এঁর চরিত্রের ওপর যে দোষারোপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করব। এ দায়ীত্ব আমার। আপনি এই মুহূর্ত্তে পুলিস অভিনয় ভেঙ্গে দিয়ে লোকজন নিয়ে থানায় চলে যান—পুরোহিতের স্থানে পুলিস থাকা শোভা পায় না।"

ঝড়ের মত বেগে মিঃ ব্রাউন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন—বিস্ময়ে সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

উপন্যাস

ধ্রুবজ্যোতি

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বার

ঘুম ভাঙ্গিয়া অমল নিশীথকে দেখিতে পাইল না। বহির্দ্বারে চাবি দিয়া কি জানি সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। একলা শূন্য বাড়ীখানিতে তাহার কেমন ভাল লাগিতেছিল না। এতদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের অপেক্ষাও সে যেন নিজেকে আজ অধিকতর নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেছিল। পরক্ষণেই কিন্তু অতীত দিনের বাধ্যতামূলক কুলষতার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া, সারা বাড়ীখানা ধুইয়া মুছিয়া সে আনন্দটা সে অধিকতর উপভোগ করিয়া লইতে চাহিল। কি জানি নিষ্ঠুর ধাতা যদি কপাল দোষে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার এতটুকু সুখও হাতছাড়া করিয়া দেন, এই ভয়ে।

অগোছাল ঘর গোছ করিয়া রাখিতে গিয়া সে দেখিল, মেঝের উপর আহার্য্য ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল নিশীথ তাহা স্পর্শও করে নাই। কেন না, পাতা আসন, গেলাসভরা জল, পাশের নুণটুকু অবধি আপন দেহ বিনিময়ে পরোপকারের পুণ্য অর্জ্জন আকাঙ্ক্ষায় তখন পর্য্যন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। ঢাকা তুলিয়া দেখিল, থালাভরা লুচি, তরকারী অস্পর্শিত গৌরবে তখনও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে।

একটা ছোট নিশ্বাস তাহার নাসিকা রন্ধ্র কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল। কত স্নেহমাখা হৃদয়খানিকে সে কি ব্যথায় নোয়াইয়া দিয়াছে! রাত্রের কাণ্ডের পর সে স্পষ্ট বুঝিয়াছে, ইহাদের পতী-পত্নীর মাঝে বিচ্ছেদের ব্যবধান আনিয়া দিবার জন্য সেই একমাত্র দায়ী। কিন্তু উপায় নাই, স্বার্থের মুখ চাহিয়া তাহার নিজের জন্য বুঝি এটুকুও প্রয়োজন ছিল।

একবার কি ভাবিল। তারপর আপনাআপনি বলিল, "না, এ বাসি খাবারগুলো আর তাঁকে খেতে দিয়ে কাজ নেই। তা' ছাড়া, আমার ছোঁয়া!"

শেষোক্ত কথাগুলি এত দ্রুত উচ্চারণ করিল, যেন নিজেকেও সে বঞ্চনা করিয়া রাখিতে চায়। ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলিকে এককোণে ঠেলিয়া রাখিয়া সে স্থানটীকে মার্জ্জনা করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মস্তিষ্কের উষ্ণতা

নিবারণ করিতেই যেন তাড়াতাড়ি কলতলায় মাথা পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

স্নানের শেষে সে বুঝিল, কত বড় মূর্খতা সে করিয়া বসিয়াছে। একবস্ত্রে সে আসিয়াছিল, সেখানিও ভিজাইল —এখন পরে কি? আলনায় মাধবীর রঙ-বেরঙের অনেক-গুলি কাপড় ঝুলিতেছিল; তাহার একখানিও সে স্পর্শ করিতে পারিল না। কি ভাবিয়া—কেবল সে আর তাহার অন্তর্যামীই তাহা জানেন। পরে বাছিয়া বাছিয়া নিশীথের একখানি কাপড় হাতে লইয়া বলিল, "এখানা উনি আর পরছেন না নিশ্চয়, আমি পরতে পারি।"

তাড়াতাড়ি ভিজা কাপড়খানা ছাতে মেলিয়া দিয়া সে রন্ধনের যোগাড় করিতে বসিল। খুঁজিয়া-পাতিয়া চাল-ডাল, আনাজ বাহির করিয়া আনিল। একবার আত্মগতভাবে বলিল, "এমন করে পরের ঘরে গিন্নীপনা করতে যাওয়া ঝকমারী। যত তাড়া করছি, কাজ ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে না খাওয়া না দাওয়া, কখন যে কি হবে!"

নিজের মনোমত রান্নার যোগাড় করিয়া সে উনানে আগুন দিল। তারপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পাণ সাজিতে সাজিতে বলিল, "এখনও ফিরলেন না, বাইরে এত কি কাজ?"

আঁচ ধরিয়া উঠিল। তাহার তেজ কমাইয়া রাখিতে অমলা আবার একরাশ কয়লা ঢালিয়া দিল। সে আঁচও ধরিল, নিশীথ আসিল না। তখন নিরুপায়ভাবে ঘরের ভিতর হইতে একখানা মাজা গামলা বাহির করিয়া সে দাল চাপাইয়া দিল। ভাবিল, আমি চাপিয়ে ত দিই, তিনি এসে তখন ঢেলে ঢুলে নেবেন 'খন।"

দাল ফুটিয়া উঠিল। আলগোছে, বাটনা, নুন, মিষ্টি ফেলিয়া দিয়া অমলা ভাবিতে বসিল, ইহার পরও যদি নিশীথবাবু ফিরিয়া না আসেন, তবে সে কি করিবে? হঠাৎ বাহিরে দরজা খোলার শব্দ হইল। উৎসাহিতভাবে সে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "কোথায় ছিলেন বলুন ত, এত দেরী করতে হয়। দেখুন ত দু' দু'বার আঁচ বয়ে গেল।"

নিশীথ হাসিয়া বলিল, "গেছলুম ভবিষ্যতের একটা পথ খুঁজে বার করতে, বোধ হয় আশা পূরবে। ভাল কথা' নার্শের কাজ—"

বাধা দিয়া অমলা বলিল, "ও সব কথা এখন থাক্, পরে শুনলেও চলবে—দালটা পুড়ে যে চড়চড়ি হতে চল্লো; কাপড়খানা বদলে ওটা আগে নাবিয়ে ফেল্‌বেন চলুন।"

নিশীথ বলিল, "এত হ্যাঙ্গাম কেন করতে গেলে? কালকের খাবার পচছে, তার ওপর দোকান থেকে কিছু আনিয়ে নিলেই চল্‌ত?'

অমলা হাসিয়া বলিল, "সেগুলো থাক্‌লে ত খাবেন—আরও একটা রাক্ষুসে পেট এসে জুটছে যে!"

কাপড় ছাড়িয়া নিশীথ দাল নামাইতে চলিল। কিন্তু অনভ্যাসবশে মাত্র দু' হাতে দুইখানি শাল পাতা লইয়া সে যেমন বোক্‌নো ধরিতে গিয়াছে, হাতে ছাঁকা লাগিল। অমলা 'হাঁ হাঁ' করিয়া বলিল, "রাখুন, অমন করে পারবেন না; এই বেড়ীটা দিয়ে ধরুন। হ্যাঁ, না না, হ্যাঁ, অমনি ক'রে। ওই খোরাটায় ঢালুন। আমি জল ঢেলে দিই, ওটা ধুয়ে ফেলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর চড়িয়ে দিন, আমি তেল আর ফোড়ন দিচ্ছি। দিন ঢেলে দিন এবার। একটু ফুটুক। আপনি ততক্ষণ ভাতের হাঁড়ীটা নামিয়ে ধুয়ে নিন।"

নিশীথ কাচুমাচু মুখে বলিল, "বাপ্, এত করে রান্না আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি! আজই উড়ে-দ্রৌপদীর শরণাপন্ন হতে হবে দেখছি। তুই এগুলো ফুটিয়ে-টুটিয়ে নে অমি। আমি দোকান থেকে কিছু আনিয়ে নিই গে।"

অমলা বলিল, "না, তা' হোক্, একবেলা একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু সারারাত উপোসের পর পেটে দু'টি ভাত পড়লে ঠাণ্ডা হবে"

যাহা হউক করিয়া রান্না সারিয়া নিশীথ কলঘরে ঢুকিল। তাহার জন্য তেল, কাপড়, গামছা গুছাইয়া রাখিয়া অমলা আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিতে বসিল। নুণ, জল, নেবু থরে থরে গুছাইয়া দিয়া সে অসমাপ্ত পাণের খিলি কয়টা মুড়িতে লাগিল। স্নান সারিয়া নিশীথ নিকটে আসিতেই তাড়াতাড়ি বগি থালাখানি আর একবার ভাল করিয়া জলে ধুইয়া সম্মুখে আগাইয়া দিতে দিতে বলিল, "একে-

বারে ভাত ক'টী বেড়ে নিয়ে এসে বসুন। যে দেরী ক'রে এলেন—পরের চাকরী, এরপর খাওয়াই হয় ত হবে না।"

নিশীথ বলিল, "আজ ছুটী আছে, না থাকলেও নিতে হতো। ভদ্রলোককে কথা দিয়ে এসেছি, দুপুরবেলা গিয়ে দেখা ক'রে আসব।"

আহার শেষে কোণের লুচিগুলা বাহির করিয়া আনা হইতেছে দেখিয়া বিরক্তিভরে নিশীথ বলিয়া উঠিল, "এই বুঝি তুই খেয়েছিস পোড়ারমুখী, কেবল আমায় খাটানর মতলব।"

অমল হাসিয়া বলিল, "খাই নি, খাব ত—এড়া কাপড়ে ছুঁয়ে ফেলেছিলুম যে, আপনাকে দেব কি করে?"

ঘণ্টাখানেকের পরও অমলার হাতের কাজ ফুরাইয়া উঠিতেছে না দেখিয়া কিছু চঞ্চলভাবে বাহিরে আসিয়া নিশীথ বলিল, "অনেক কাজের কথা রয়েছে অমু, ওসব কাজ তখন পরে করিস, শুনে যা'।"

ত্রস্তে গাত্র বসন সংযত করিয়া লইতে লইতে অমল নিকটে আসিয়া বলিল, "কি বলছেন?"

নিশীথ বলিল, "আমার এক বন্ধু মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেছেন, একজন নার্শের পোষ্ট খালি আছে; যদি সুবিধে হয়, তোমার জন্যে চেষ্টা করবেন। এখন তুমি কি বলো—যাবে?"

অমলা নতমুখে বলিল, "ক্ষতি কি, আপনি যদি—"

বাধা দিয়া নিশীথ বলিল, "এইখানেই ভুল করেছ অমলা, আমি তোমার মত চাচ্ছি।"

নত চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য উর্দ্ধে তুলিয়া অমলা বলিল, "তা' মাঝে মাঝে তুমি যাবে ত দাদা?"

বাহির দ্বারের কড়া নাড়িয়া কে ডাকিল, "নিশীথবাবু, বাড়ী আছেন?"

"কে" বলিয়া নিশীথ বাহিরে গেল এবং পরক্ষণেই একটা লেফাফা হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শমন এসেছে অমু, আজ থেকে আমার হাঁড়ী বন্ধ।"

অমলা ত্বরিত-কণ্ঠে বলিল, "ঠাট্টা নয় কে লিখেছে—বৌদি'?" কি লিখেছে, আসবে?"

"না, হুকুম দিয়েছে, আমার হাড়ী বন্ধ করবার। খোরাকী হিসেবে মাইনের টাকাটা যদি তাঁকে কড়ায়-গণ্ডায় না পাঠাই, তবে দিন সাতেকের মধ্যে না পাঠাবার কারণ দেখিয়ে তাঁকে জানাতে হবে। তারপর বিচারের সূক্ষ্ম যাঁতাকলে পিষে তিনি দেখে নেবেন, বিয়ের হিসেবে কোন সর্ত্তের স্বত্ব আমার ওপর তাঁর খাটে কি না। আমিও ভেবেছি কি জানিস, শুধু মাইনের টাকাটাই দেবো না, বাড়ীগুলোর ভাড়া পর্য্যন্ত ফেলে দিয়ে আয়-ব্যয়ের ঝঞ্ঝাট থেকে নিজেকে হাল্‌কী করে নেব—কেমন, ভাল হবে না?"

অমলা বিস্মিত নয়ন তুলিয়া বলিল, "তা' কি করে হয় দাদা, তোমার নিজের খরচও ত কিছু আছে?"

নিশীথ গাঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না, তার আর দরকার হবে না দিদি! তোর যদি একটা উপায় করতে পারি, তখন একটা পেট চলে যাবে যেন্-তেন করে।"

চোদ্দ

নণ্টু ও মণীশকে টেবিলে বসাইয়া শুভা চা প্রস্তুত করিতেছিল। হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই থাম্, অত বক্‌বক্ করিস নি। মাথাটা গরম করে তুল্‌লি যে। চায়ে কতটা চিনি দেব?"

ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিলেও, দৃষ্টি রহিল মণীশের দিকে। পরক্ষণেই যথার্থ জিজ্ঞাসিতকে উর্দ্ধে চাহিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বালক ভ্রাতাকে শাসন-ছলে শিক্ষা দিবার অছিলায় বলিল, "তবু দেখো, কথা শোনে না। কি বকামী করে! রইল তবে মিষ্টি দেওয়া, এমনিই খাস্।"

বালক নণ্টু মহা স্ফূর্ত্তিতে তখন সুলতানের বোকামী সম্বন্ধে এক গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছে। কাজেই মিষ্ট-হীনতার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি না তুলিয়া বলিল, "কাঠবেড়ালীটা কিন্তু গাছে বসে সামনের পা দুটো দিয়ে ধরে বটফলটা খেতে সুরু করে দিলে; সুলতানের লম্ফঝম্ফ সে গ্রাহ্যই করলে না। গায়ে হাত চাপড়ে আমি কত বোঝালুম, গাছের মানুষ ও গাছে চড়েছে, তুই ওর সঙ্গে পারবি

কেন ? বোকার ডিম, ও কি তা' শোনে—কেবল দে লাফ, আর দে লাফ ; তা' ছাড়া, আর কথাই নেই।"

কথাটা শেষ করিয়া আপন আনন্দে সে আপনি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। মণীশ সহাস্য-মুখে শুভার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমার চায়ে চামচ দেড় চিনি দিলেই চল্‌বে। হাঁ্যা, তা' যা' বলেছ নণ্টু, সুলতানটা ভারী বোকাই বটে—তা' এতে তোমার দোষও কিছু আছে।"

বিস্ময় জিজ্ঞাসু নয়ন তুলিয়া নণ্টু উত্তর দিল, "আমার দোষ ! কি রকম ?"

মণীশ চায়ের কাপের আড়ালে মুখের সরস হাস্য গোপন করিতে চাহিয়া বলিল, "নয় ত কি ? বুড়ো হ'য়ে মরতে চল্‌লো ও, আজ পর্য্যন্ত পেরথম ভাগটাও ধরলো না—বুদ্ধি আসবে কোথা' থেকে ?"

বালক করতালি দিয়া সোৎসুকে হাসিয়া উঠিল। তারপর ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখ্‌লে দিদি, মণীশ-বাবুর কি বুদ্ধি, সুলতান না কি প্রথম ভাগ পড়তে পারে ! আরে, ও যে জানোয়ার !"

মুখ টিপিয়া শুভা উত্তর দিল, "বলো না প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের পড়া ওর সাঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে। এখন চাই আর কিছু—যেমন, দণ্ড-শাসন-পদ্ধতি, পদ-লগুড়-আঘাত-পর্ব্ব, ইত্যাদি।"

বালক হাসিতে হাসিতে আবার প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "ভাল মনে করে দিয়েছিস্ ভাই ! সে আর এক ইতিহাস, জানেন। প্রথম যেদিন আমার জন্যে ফলা বানানের বই এল, চিন্‌লুম ত ছাই, কেবল ছবিগুলো ভাল লাগ্‌ল। নির্জ্জনে বাগানে বসে সেগুলো দেখ্‌ছি, ও বেটা কোত্থেকে এসে গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ল। তখন এমনি ছিলুম বোকা, মনে হলো, আমি যে পড়ি নি, কেবল ছবি দেখে কাটিয়েছি, সে কথা ও নিশ্চয় মাকে দিদিকে বলে দেবে। ভয়ানক রাগ হলো। এক ঠেলায় ওকে সরিয়ে দিয়ে বললুম, "মা, আমি এখন পড়ছি—আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—'অ আ ই ঈ।' আর দীর্ঘ-ই—মহাক্ষেপা হ'য়ে হাতের বই কেড়ে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ও খেয়েই ফেল্‌লে।"

আবার আনন্দ কলরবে দিক্ মাতিয়া উঠিল। শুভা একটু অতিরিক্ত ব্যস্ততার সহিত বলিল, "আঃ, কি করিস ! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে বুঝি অমন করে।"

নণ্টু ক্ষণিক চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, এর মধ্যে আবার ভদ্দোর অভদ্দোর এল কোত্থেকে !"

শুভা এক রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া মণীশের দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া বলিল, "কেন, ইনি কি ?"

বালক আবার হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ্‌ছেন মণীশবাবু, দিদি কি বোকা, আপনাকে বলে ভদ্দোর !"

অধিকতর কুপিতা হইয়া শুভা বলিল, "রসো, মাকে বলে দিচ্ছি—আস্কারা পেয়ে তোমার বুক 'বলে' গিয়েছে।"

বালক চঞ্চল দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "মণীশবাবু, আমি মাপ চাচ্ছি। আমার কিন্তু মনে পড়ে না যে, আপনাকে কিছু অন্যায় বলেছি।"

মণীশ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার জানাইল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই শুভা বলিয়া উঠিল, "বল্‌লি না, এই ত বল্‌লি, উনি ভদ্র নন্।"

বালক সরল উজ্জ্বল মুখ তুলিয়া মহা স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল, "বলেছি, এখনও বল্‌ছি উনি ভদ্দোর নন্। ভদ্দোর যে হয়, তার মাথাটা গিয়ে ঠেকে ওই আকাশের গায়ে। এত উঁচু তিনি হয়ে যান যে, মেশা দূরে থাক্, আমরা তার নাগালই পাই না। উনি কি, তাই তুমিই বলো না দিদি—তা' হলে কি এমনি করে মিশতে পারতুম, না তুমিই ওঁর সামনে আমাকে ধমকাতে পারতে ? উনি তা' নন্, আমাদেরই একজন।"

শেষের দিকের কয়টা কথায় কাণ না দিয়া শুভা বলিল, "কেন, ধমকাতে পারতুম না ত কি করতুম ?"

"এতক্ষণ 'পোঁ' দৌড় দিতে। জানেন মণীশবাবু, আমাদের এখানে কিছুদিন আগে এক অতিথি এসেছিলেন, দিদি তাঁকে দেখে ত ছুট্ ছুট্, আর আমি লুকিয়ে ছিলুম গে খাটের তলায় —"

বাধা দিয়া শুভা রাগত-স্বরে বলিল, "বড় বাহাদুরীই

করেছিলে! না, বড় বাঁদর হচ্ছ তুমি নণ্টু। যাক্, আমি চল্লুম, তুমি একা যত পার বক্‌বক্ কর।"

নণ্টু এবার মণীশের কাঁধের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "তার সঙ্গে দিদির বিয়ের কথা হচ্ছিল কি না, তাই লজ্জায় পালিয়ে গেল। বল্‌বেন না যেন ওকে এ কথা।"

সহজেই স্বীকার করিয়া লইয়া মণীশ বলিল, "তোমার দিদির তা' হ'লে বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে?"

বালক সরল-কণ্ঠে বলিল, "হয়েছিল ত, কিন্তু ভেঙেও গিয়েছে—তাদের না কি কি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাক্, এখুনি আসে এই। রাগ করে ও কথ্‌খোনো থাকতে পারবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি—দেখে নেবেন।"

তাহার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুভা ভিতরে আসিতে আসিতে বলিল, "মা বলে দিলেন নণ্টু, তোরা এখন খাবি, না একটু থাকবে?"

সকৌতুক চাহনিতে মণীশের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যৎ-বক্তা ইসারায় জানাইল, কেমন তাহার কথার সত্যতা রক্ষা হইয়াছে কি না। তারপর ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া জোরকরা গাম্ভীর্য্য-জড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খাব 'খন্, এই ত চা খাওয়ালে। ততক্ষণ তুমি এঁকে গোটাকতক গান শুনিয়ে দাও। সেইটে—'দুঃখ সয়ে সয়ে'।"

শুভা চঞ্চল ক্রোধঘেরা দৃষ্টিতে চাহিয়া ধমক দিয়া বলিল, "যা' খোকা, তুই কি!"

মণীশ ছাড়িল না। বেশ একটু পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বলিল, "না না, এভাবে আমাকে বঞ্চিত করা আপনার ভাল হবে না। জানেন যখন, দু'-একটি শোনাতেই হবে—নইলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না! গান আমি বড় ভালবাসি!"

এতক্ষণে মুখে মুখে কথা কহিতে গিয়া শুভা হঠাৎ কেমন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তারপর সাধ্যমত সে দুর্ব্বলতা দমন করিয়া লইয়া বলিল, "আমার কিন্তু এ নেহাৎ অচেনা লোকের গান—সাহিত্যের দ্বারে পরের নামেই তিনি বিকিয়ে আস্‌ছেন।"

মণীশ কৌতুকভরা-কণ্ঠে বলিল, "বিকুচ্ছেন ত। এই পরদেশে এসে এক সঙ্গী পেয়েছি আপনাদের—তা' আপনারাও যদি দূরে দূরে সরে থাক্‌তে চান, সত্যি বল্‌ছি, এখানকার বাস করার জীবনটা আমার দুঃসহ ফাঁকা হ'য়ে যাবে।"

শুভা আর কোন প্রতিবাদ তুলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে নণ্টুর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নণ্টু, কি বিপদে ফেল্‌লি দেখ্ দেখি ভাই! গান গাইছি শুন্‌লে মা যদি রাগ করেন?"

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নণ্টু বলিল, "কথ্‌খোনো নয়! আচ্ছা দাঁড়াও, আমি এখুনি জিজ্ঞেস করে আস্‌ছি। মা, মা—"

ছুটিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। একবার মাত্র তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা পাইয়া শুভা অকৃতকার্য্য হইল। অতিথিকে একা ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিতেও কেমন প্রাণ চাহিল না। নিঃশব্দে ঘরের মধ্য-স্থলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে শুধু ঘামিতে লাগিল। মণীশ কিছু অপ্রতিভের কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "মাপ করবেন, আপনাকে বিপন্ন হ'তে হবে আমি তা' ভাবিও নি! যাক্, আমার দরখাস্ত আমি নিজেই তুলে নিচ্ছি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাদুলে ঝড়ো হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়া নণ্টু বলিয়া উঠিল, "মা মোটেই বারণ করেন নি দিদি—মোটেই না। বলেছেন, 'বেশ ত, গাক্ না'।"

প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে শুভা যতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, মণীশের নিকট হইতে ছাড়া পাওয়ায় অন্তর খুঁজিয়া দেখিল, প্রায় ততটুকু হতাশ্বাসে হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। মনে ভাবিল, ছি ছি, মায়ের কথা কেন তুলিলাম! উনি হয় ত কত কি মনে করিতেছেন। আবার নণ্টুর মুখে মায়ের খোলা আদেশ আসিয়া পড়ায় দোটানার মাঝে পড়িয়া সে কতদূর নিরুপায় হইয়া পড়িল, তাহা বর্ণনারও অতীত। শ্রেয় পথের মধ্যে কোন একটীকে টানিয়া রাখিতে না পারায় সে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'ভাবে নতমুখে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ প্রস্তাবটা তুলিয়া বারবার তাহার কার্য্য-কারণ হাতড়াইয়া মণীশ অন্তরে অন্তরে সত্য-সত্যই অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখন নণ্টুর মুখে সকল বাধা-বিপত্তি খণ্ডনের প্রসঙ্গ শুনিয়া তাহার সে লজ্জার স্থান দ্বিগুণ উৎসাহ-বহ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মিনতিভরা-

কণ্ঠে সে বলিল, "তা' হ'লে এবার ত আর ছাড়ছি না। আপনাকে গাইতেই হবে। আমিই নয় পিয়োনয় বস্‌ছি, আপনি ধরুন।"

শুভা কথা কহিতে পারিল না। চঞ্চল পদে পিয়োনোর নিকট আসিয়া চাবির মাঝে সকল লজ্জা চাপিয়া দিয়া সে অঙ্গুলী চালনা করিল। জড়িত হস্ত তাড়নের বেসুরা সুর ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আসিলে কণ্ঠ তাহাতে যোগদান করিল। স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত মণীশ কোন্ যাদুমন্ত্র প্রভাবে স্মৃতিহারা হইয়া শুনিতে লাগিল।

"এই পৃথিবীর মাঝে আমি চল্‌ব সয়ে সয়ে,
তোমার নিঠুর শাসনখানি মাথায় লয়ে লয়ে।"

গানের মূর্চ্ছনা দিগন্ত ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিল। কোন্ অজানা রাজ্যের সন্ধানে মণীশ ভাবাবিষ্টের মত গানের প্রত্যেক কথাটী নিজের অন্তরের সহিত মিলাইয়া মিলাইয়া ভাষাটীকে সঞ্জীবনী-মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া চলিল। মনে হইতে লাগিল, এ গান আমারই, আমারই—ও গো, আমারই!

গীত শেষে সুন্দর সুর কাণে রাখিয়াই মণীশ উৎসাহিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি কিন্তু বলে দিতে পারি—এ গান কার?"

গানের সঙ্গে সঙ্গে শুভার অন্তরটা তরল হইয়া আসিয়াছিল। চঞ্চল ঔৎসুক্যে সে তাই মাঝে কোন ব্যবধানের অন্বেষণ না করিয়াই বলিল, "বলুন দেখি কার?"

মণীশ পুলক-অস্থির-কণ্ঠে বলিল "শুধু শুধু বল্‌ছি না—বলুন, যদি পারি, কি দেবেন?"

"কি চান্ আপনি?"

"আপনার কাছে সবার চেয়ে যা' আপনার—সেই জিনিষটা।"

"আর আপনি যদি হেরে যান?"

"এই আংটীটা।"

"বারে, আমার বেলার হলো সবার চেয়ে ভাল জিনিষ, আর আপনার বেলায় আংটী!"

"সামান্য হ'লেও এটার দাম আমার কাছে কিন্তু ঢের বেশী—কারণ, এটা আমার মায়ের স্মৃতি-চিহ্ন!"

"আচ্ছা, রেহাই দিলুম—আপনাকে কিছুই দিতে হবে না—বলুন, কার গান?"

"কেন, রবীন্দ্রনাথের।"

"হেরে গেছেন, তাঁর নয়।"

"তবে কার?"

"এক অজানা অখ্যাত কবির—নাম তাঁর, শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

"বেশ, এই নিন্ আপনার বাজীর পাওনা।"

শুভা নতমুখে বলিল, "কিন্তু—"

"না, এর ভেতর আর 'কিন্তু' রাখবেন না—আমি জানি এর অবমাননা আপনার কাছে হবে না। একটা কথা—আমি কিন্তু পরিয়ে দেবো।"

উৎসাহঘোরে শুভা তাহার ডান হাতটী সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দিল। পরক্ষণেই কিন্তু লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া ঘরের চারিদিকে একবার চাহিল। সে সময় সেখানে তাহারা দুইটী প্রাণী ছাড়া আর কেহই ছিল না। বালক নণ্টু কোন্ ফাঁকে যে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কেহই তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে নাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল।

মজা এই, এক সময় যাহা অতিবড় উৎকণ্ঠার বস্তু ছিল, ঠিক্ পর মুহূর্ত্তেই হয় ত তাহা অতিবড় আরাধনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কেন? জগৎযোড়া বিজ্ঞ-সমাজের মাঝে কোনদিন কেহ কি এ 'কেন'র মীমাংসায় অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, না পারিবে?

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা-সাহিত্যের গতি

শ্রীবি——·—বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

মধ্যযুগের প্রারম্ভে রোমের গৌরব-সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। অন্ধকারের পর গাঢ়তর অন্ধকার ইয়ুরোপের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্য সুপ্ত, সভ্যতার আলোক নির্ব্বাপিত, জাতীয় জীবন মৃত এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি বিচলিত। মধ্যযুগের অবসানে, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-শক্তির সংঘর্ষে, বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে, ইয়ুরোপের গৌরব-সূর্য্য জাতীয় ভাগ্য-গগন আবার সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সুপ্তোত্থিত জাতিসমূহ নবীন উৎসাহে মাথা তুলিয়া জ্ঞান-সম্পদে জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে উন্মত্ত হইয়া ছুটিল।

বাঙ্গলার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এইরূপ একদিন আসিয়াছিল। মুসলমান শাসনের তিরোধানে এবং ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে সুপ্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে এইরূপ এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন মুমূর্ষু জাতির দেহে নবজীবন ও নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। এই জাতীয় জীবন-যজ্ঞে ঋত্বিক্‌রূপে এক মহাত্মা যে পবিত্র হোমানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন, তাহারই দিগন্তপ্রসারী শিখায় জাতির ভাগ্য-ললাট দীপ্ত হইয়া উঠিল।

মহাত্মা রামমোহনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রচলিত বাঙ্গালা-সাহিত্য এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আদি রসাশ্রিত যে সরস ও সুললিত বৈষ্ণব পদলহরী প্রেমের মোহন সুরে জাতীয় হৃদয় দোলায়িত রাখিয়াছিল, তাহা উদ্বোধনের স্থলে অন্তঃশোষী অবসাদ ও মোহনিদ্রা আনয়ন করিয়াছিল—কোমল ও মধুর ভাবের প্রভাবে জীবন জড়ত্বে পরিণত করিয়াছিল।. সাহিত্য ও সঙ্গীতের এই একদেশিতাই জাতির জীবন-বৃক্ষের কোটরস্থ বহ্নি। প্রাচীন ভারত, গ্রীস ও রোম ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। প্রকৃত সাহিত্যের কার্য্য ব্যাপকতা সৃষ্টি। জাতির অনুকূল ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি অবলম্বনেই ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি। এইরূপ উদার ও ব্যাপক সাহিত্যই জাতীয় উৎকর্ষের পরিচয়-স্থল। স্বাবলম্বন ও আপন বৈশিষ্ট্যরক্ষণ ইহার পতনের পূর্ব্বলক্ষণ। বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণে ইহার পুষ্টি ও সার্থকতা।

নব বাঙ্গালার সাহিত্য-গুরু পুরুষসিংহ রামমোহন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া যে উদার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যান, জাতীয় জীবনের সমস্ত অনুকূল বৃত্তির ভিতর দিয়া ইহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া তিনি বিভিন্ন চিন্তাধারা দ্বারা বাঙ্গালার অনুর্ব্বর সাহিত্য-ক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়াছিলেন—ভাবী ফলফুল-শালী এক বিরাট মহীরুহের বীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পূত মন্দাকিনী ধারার আনয়নে, শিবাকুলের অশিব কোলাহল তাঁহার দিগন্তনিনাদী পাঞ্চজন্যধ্বনির বিলয় করিতে পারে নাই—কত জহ্নু মুনি, কত ঐরাবত তাঁহার পথে প্রতিবন্ধক হইলেও সেই ধারায় না ভাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

ইহার পর সাহিত্যক্ষেত্রে দুইজন সাহিত্যবীরের * আবির্ভাব হয়। রামমোহনের আরব্ধ কার্য্য ইহাদের যত্নে বিশেষ প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনা এবং অনুবাদ দ্বারা ইহারা বাঙ্গালা ভাষার যথোচিত পুষ্টিসাধন করেন। ইহাদের সৃষ্ট গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব, অপূর্ব্ব শব্দবৈচিত্র্য এবং বাক্যবিন্যাস পাঠকের হৃদয়নিহিত লুক্কায়িত রস উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু গদ্য-সাহিত্যে এইরূপ শক্তির উন্মেষ হইলেও পদ্য-সাহিত্য অনেকটা প্রাচীনপন্থী; সুতরাং অপূর্ণ ছিল। সেই অপূর্ণ সাহিত্যে পূর্ণতা সাধনে মধু-সূদনের ন্যায় সব্যসাচী-বীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে, গীতিকাব্যে, নাটকে ও প্রহসনে তিনি যুগান্তর উপস্থিত করেন। প্রতিকূল অবস্থার ঘন মেঘমালা প্রতিভাদীপ্ত সেই মহাসূর্য্যের রশ্মি আবরিয়া রাখিতে পারে নাই। আততায়িকুলের তীব্র কশাঘাত

* বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত

অথবা দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ সেই অটল বীর-হৃদয় বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহা-বীরের স্মৃতি-পূজায় সত্যই লিখিয়াছিলেন—"কাল সুপ্রসন্ন। ইংরাজ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও ও তাহাতে নাম লিখ—'শ্রীমধুসূদন।'

এখন এমন এক যুগের সূত্রপাত হইল, যাহা বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে যথার্থই অতুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' এবং কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত 'বান্ধব' বাঙ্গালা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। ধর্ম্ম, সমাজ, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, উপন্যাস, কাব্য এবং সমালোচনা—এই সকলের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিল। এই দুই সাহিত্য-রথীর প্রযত্নে সাহিত্য-উদ্যান সুরম্য ও সুবাসিত কুসুমসম্ভারে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ভাষার প্রকৃত আদর্শ স্থাপিত হইল। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা'র * প্রশ্ন তাঁহারা সমাধান করিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ এই আদর্শ সাহিত্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্ব প্রথম ভাব-বিনিময়ের সুযোগ লাভ করিল। তাঁহাদের শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আদর্শ লেখক-শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। সমালোচনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারা ন্যায়দণ্ডের অবমাননা করেন নাই। এক হস্তে তীব্র কশা ও অপর হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ফলে অন্তঃসার বিহীন, আদর্শ সাহিত্যের কণ্টক, দুর্নীতি প্রচারক সাহিত্যিক ও শুকনিচয় জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়াই লয় পাইল। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী যে সকল পত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়াছে, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' তাহাদের অগ্রগণ্য।

তাহার পর রবীন্দ্র যুগ। যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ধারা নির্দ্দিষ্ট করেন, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতিভার অধিকারী হইয়া বঙ্কিমের ধারার সহিত আপন বিশিষ্ট ধারার সংযোগ করিয়া দেন। বাস্তবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া উপন্যাস এবং কথা-সাহিত্যের রচনা তাঁহারাই প্রবর্ত্তন এবং কাব্যজগতে তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য গীতি-কাব্যের চরম উৎকর্ষসাধন। টীকাকাবরূপে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যসমূহের ভাব, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহার অমর লেখনীর মুখে ফুটিয়া না উঠিলে, কালিদাস প্রভৃতি কবিকে আজ কে চিনিত, কে তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া বরণ করিত? আজ তাঁহারই ঐকান্তিকযত্নে বাঙ্গালা-সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্য-আসরে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে। আজ তাঁহারই প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন তেজের স্ফুলিঙ্গ লাভ করিয়া কত জ্যোতিষ্ক সাহিত্য-আকাশে ঝলমল করিতেছে। আজ আমাদের বাঙ্গালা ভাষা দীনা কাঙ্গালিনী নহেন—সিংহাসন আসীনা রাজ্যেশ্বরী।

তারপর?—ঘনকৃষ্ণ এক মেঘখণ্ড বাঙ্গালার সাহিত্য গগন হঠাৎ ছাইয়া ফেলিল এবং বিষাদের যবনিকা অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এক সুদূর ব্যবধান আনিয়া দিল। অন্ধকারের পর গাঢ়তর অন্ধকার সম্মুখ ও পশ্চাৎ ঢাকিয়া ফেলিল। উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র। জলে নক্র-মকরাদি-জলবিহারী প্রাণিকুলের ঝাপসাট; শূন্যে গৃধ্র প্রভৃতির পাখসাট; স্থলে শিবাকুলের অশিব কোলাহল। তাহার মধ্য দিয়া তরণী চলিয়াছে। কর্ণধার নাই, ক্ষেপণি নাই, কেতন বাতাহত, বন্ধন রজ্জু ছিন্নভিন্ন। তরীর উপর পৈশাচিক নৃত্য, চীৎকার ও হাহাকার সমুদ্র গর্জ্জনে মিশিয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতেছে।

বঙ্গবাসি, অতীতের ক্ষীণ আলোক রেখা যদি একেবারে তোমার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত না হইয়া থাকে, তবে সেই আলোকরেখার সাহায্যে একবার বর্ত্তমানের দিকে চাহিয়া দেখ। তোমার সাহিত্য ও জাতীয় জীবন এখন কোন্ পথে? অধঃপতনের চরম নিম্নে পৌঁছিতে আর কতটুকু বিলম্ব আছে? কোথায় সেই ধর্ম্ম, দর্শন, উপন্যাস ও কাব্যমূলক সৎ-সাহিত্যের অমৃতফল, কোথায় এই দুর্নীতি-মূলক ও কামবহ্নির ইন্ধন উপন্যাস ও কবিতার গরলভাণ্ড! কোথায় জীবন উন্মেষক দিব্য আলোক, কোথায় প্রাণ-

* যাঁহার এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা" শীর্ষক পুস্তিকা পাঠ করিবেন।

সংহারক ঘনায়মান অন্ধকার! কোথায় পতিতপাবনী সুরধুনীর পূতধারায় অবগাহন, কোথায় নগর উপকণ্ঠের পয়ঃপ্রণালীজাত পূতিগন্ধময় বাষ্পসেবন! কোথায় শব্দ-ব্রহ্মদ্যোতক ধ্রুপদের উদার নিঃস্বন, কোথায় ঠুংরি, খেমটা ও গজলের চঞ্চল নূপুরনিক্কণ!

আজ বাঙ্গালী সাহিত্যকে ইন্দ্রিয়ভোগের ইন্ধনে পরিণত করিয়াছে। ফলে বর্ত্তমানকেই আকড়াইয়া ধরিতে ভালবাসে। তাহার অতীতে যে কিছু ছিল অথবা থাকিতে পারে, একথা মনে একবারও স্থান দিতে ভয় পায়। তারকব্রহ্ম রাম নাম শ্রবণে ভূতযোনির ন্যায় উদার সাহিত্য অথবা সাহিত্যিকদিগের নাম শ্রবণে তাহারা শিহরিয়া উঠে এবং স্থানত্যাগে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। মস্তিষ্ক তরল, বুদ্ধি স্থূল, লক্ষ্য ভোগলিপ্সা। ধর্ম্ম ও দর্শনের নীতি বুঝিবার তাহাদের শক্তি কোথায়? ঐতিহাসিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় ধারণা করিবার তাহাদের ধৈর্য্য কোথায়? তাহারা পল্লবগ্রাহী পাঠকের ন্যায় কতকগুলি অভ্যস্ত 'বুলি' উচ্চারণ করিয়া, 'গণ্ডূষ জলে শফরীবৎ' চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। তাই রামমোহন, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ ধর্ম্ম-বীরগণের সঞ্জীবনী অমরবাণী তাহাদিগের হৃদয় দোলায়িত রাখে না। বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে তাঁহাদের মানস-খনিজাত স্বর্গীয় রত্নরাজি বিতরিত হইলেও তাহা ঠেলিয়া ফেলে এবং সমধিক মূল্যবান্ (?) 'অভিনেত্রীর অভিসার', ''গুণমণির গুপ্তকথা', 'কেন দেখিলাম' প্রভৃতির পাঠে হৃদয়ের নিকৃষ্টবৃত্তিগুলি জাগাইয়া তোলে।

কেন? ইহার কারণ কি? মানুষ স্বভাবতঃ 'বাস্তব'-প্রিয়। তাই বাস্তব জগতের চরমসীমায় পৌছিতে সে প্রয়াসী। কিন্তু চরম ফল,—অশান্তি, হাহাকার, অনুশোচনা ও কৃতকর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। তখন সে বুঝিতে পারে, যাহাকে সে বাস্তব বলিয়া মানিয়াছে তাহা কুহকিনী ছায়া, কিন্তু বাস্তব কায়া নহে। যাহাকে 'আর্ট' জ্ঞানে উন্মাদের ন্যায় ভোগ করিতে ছুটিয়াছে তাহা ''আর্ট'' নহে, 'আর্টে'র নামে আত্মপ্রবঞ্চনা। তখন সে বুঝিতে পারে, যে জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ সে পদাঘাতে চুরমার করিয়াছে তাহার অবলম্বন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। মধুহেমনবীনাদির কাব্য, বঙ্কিমরমেশাদির উপন্যাস এবং দীনবন্ধুগিরিশদ্বিজেন্দ্রাদির নাটক,—জাতীয় জীবনগঠনে ইহাদের মূল্য কি কম? তখন তাহার হৃদয়ে এই বিবেক বাণী ধ্বনিত না হইয়া থাকিতে পারে না,—"Close your Byron and Reynolds and open your Goethe"

দুর্নীতিমূলক সাহিত্যের অভ্যুদয় এবং আদর্শ সাহিত্যের সাময়িক বিলোপসাধন বাঙ্গালা-সাহিত্যেই শুধু নূতন নহে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের জাতীয় সাহিত্য কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্নীতিমূলক সাহিত্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে গরল বর্ষণ করিয়াছিল। মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, জনসন, আডিসন, সুইফ্ট্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ কর্ণধাররূপে অগ্রসর হইয়া অতঃপতনের অতলগ্রাস হইতে সাহিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। *

তবে কি নৈরাশ্যের এই ঘনায়মান অন্ধকারে আশার ক্ষীণ আলোক আছে? উত্থান ও পতন, সৃষ্টি ও লয় ইহাই জাতির ও জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহার ভিতর দিয়াই ত জাতির উন্নতি ও অভ্যুদয়। তাই আশা আছে এই ক্ষণস্থায়ী শারদ-মেঘ অচিরে অপসারিত হইবে।

আজ বাঙ্গালা-সাহিত্য-কানন হিমঋতুর আক্রমণে পত্র-পুষ্পবিহীন—সৌন্দর্য্যবিহীন। কিন্তু ইহা কতদিন? ওই শুন বসন্তের অগ্রদূত অভ্যর্থনাসঙ্গীতে দিগন্ত ভাসাইয়া আসিতেছে। ফুলেফলে, নব পল্লবে আবার কানন হাসিবে।

এস বঙ্গবাসি, মহাকবি শেলির সুরে সুর মিশাইয়া আমরাও বলি "If winter comes, can spring be far behind?"

শ্রীবি ———বন্দ্যোপাধ্যায়

* যাঁহারা এইরূপর সাহিত্যের আস্বাদ এবং নগ্ন-চিত্রের দর্শন অল্পাধিক পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা Taine লিখিত 'History of English Literature' পাঠ করিবেন।

অস্ফুট মঞ্জরী

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

শ্রাবণের অশ্রু-সজল আকাশ হঠাৎ যেন শরতের সোণার রোদে ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো।—"স্বাতী এসেছে, সত্যি সানু, বউ-মা স্বাতী এসেছে!" নিতান্ত অভাবিত একান্ত প্রত্যাশিত স্বাতীকে পেয়ে সানুর মায়ের চিন্তা-ব্যাকুলিত আশা-উন্মুখ চিত্ত প্রচুর সুখে ও উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠলো। বাস্তবিক আনন্দ হয় বই কি। গৃহে বড় ছেলে সানুর উপনয়ন। সে মহা হৈচৈ কাণ্ড! অজস্র উৎসবের আয়োজন; অথচ, শৃঙ্খলার একান্ত অভাবে অনুষ্ঠান সুরু না হতেই সমাপ্তির পথে মরে যেতে বসেছে। গৃহের তোরণে সানাই বাজছে—'ইমনে'র মিষ্ট সুর সমস্ত পল্লীকে মুখরিত করে তুলেছে। কাল উপনয়ন। দই-মিষ্টি, তরী-তরকারী, খুরী-গেলাস ইত্যাদি ভারে ভারে আসছে—অঙ্গনে স্তূপীকৃত হয়ে জমে উঠছে। বিষম ভাবনা হয়েছে সানুর মায়ের—একান্ত অসহায়ের ব্যগ্র-ব্যাকুলিত দৃষ্টি তাঁর স্বাতীর প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। 'সত্যি কি তবে স্বাতী বউ-মা এলো না, আসবে না সে? তা' হলে এ বিরাট যজ্ঞের ব্যাপার তুলবে কে?

ছুটে এসে ভিতর [illegible] দুই ক্যানাস্তারা ভর্ত্তি ছানা রাখলো। অকস্মাৎ যেন ঝড়ের মত কোথা' থেকে দু'টো দুষ্ট ছেলে এসে এক খাবলা ছানা তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। এইবার সানুর মায়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। কোলের মেয়েটীকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন; তাড়াতাড়ি ছয় বৎসরের বড় মেয়ে মিনুর কোলে তাকে দিয়ে অত্যন্ত ত্রস্তপদে যেমন অঙ্গনে নামবেন, হঠাৎ তাঁর দেহের ধাক্কা লেগে দেড় বৎসরের শিশু পুত্রটী দাঁড়িয়েছিল সিঁড়িতে, উলটে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে উঠানে পড়ে গেল। কচি দাঁতের কাঁচা রক্তে মুহূর্ত্তে স্থানটা লাল হয়ে উঠলো। ঠিক্‌ সেই সময় সানুর মায়ের অশ্রু-সজল আকাশ স্বাতীর আগমন-বার্ত্তায় শরতের সোণার রোদে ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বাতী স্বামী প্রতীপের সাথে অনাহূতের মতই ভিতর অঙ্গনে প্রবেশ করলো। অভাবিত আনন্দে আত্মহারা সানুর মা ফুল্ল-দৃষ্টিতে স্বাতীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। স্বামীর প্রণাম-পর্ব্ব সারা হলে, স্বাতী খুড়ী-শাশুড়ীকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ক্রন্দনরত শিশুটীকে বুকে তুলে নিল। এইবার সানুর মায়ের চমক-লাগা মন থেকে যেন স্বপনের ঘোর কেটে গেল। স্নেহমাখা হাতে স্বাতীর চিবুক স্পর্শ করে আপন অঙ্গুলীতে চুমু খেয়ে আশীস্‌-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বললেন—"এইবার জয়কালী-মায়ের কৃপায় বউ-মায়ের একটী টুকটুকে সুন্দর কোল-আলো-করা খুকু হোক্‌।"

স্বাতী মুখ নত করলো। তারপর সুটকেশ থেকে চকোলেট, বিস্কুট, নানা খেলানায় শিশুটীকে শান্ত করে পরণের শাড়ীখানি পরিবর্ত্তন করে উঠানের একপ্রান্তে বসে বড় কাঠের পরাতে ছানাগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল। বাস্তবিক স্বাতী বেশ কাজের মেয়ে; তার ওপর সে ঝাড়া হাত-পা—মানে, ওর ছেলে হয় নি; সানুর মায়ের ওর 'পরে বিশ্বাস ও ভরসা অকৃত্রিম, গভীর।

নিতান্ত ছোট না হলেও মাঝামাঝি গোছের করগেট টিনে ঢাকা একতলা মেটে বাড়ীখানি। চারিদিকে বাঁশের ছ্যাচে ঘেরা; তার ওপর বেশ পুরু করে মাটী লেপা। দেওয়ালগুলি শাদা ধবধবে চুণকাম করা। মেঝে সিমেণ্টের। মস্ত উঠানটার চারিদিকে বড় বড় খান পাঁচ-ছয়েক ঘর। গোবর জলে নিকান পরিষ্কার উঠানটা ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে। একপ্রান্তে চিত্র-বিচিত্রিত আল্‌পনা আঁকা কলাগাছ বেষ্টনে ছায়া-মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। ছেলেরা তখন সামিয়ানা টাঙাচ্ছিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় কয়েকটী পাচক-ঠাকুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলন্ত চুল্লীর পাশে বসে ঘর্ম্মাক্ত

হয়ে উঠেছিল। তরুণী মেয়ের দল ভাঁড়ার-ঘরের সুমুখে কিস্‌মিস্, আলুবখরা বাচ্‌ছে, কড়াইশুঁটী, পেস্তা, বাদাম ছাড়াচ্ছে, কেউ সল্‌তে পাকাচ্ছে। ও স্থানটা ওদের তরল হাস্য-পরিহাসে, উদ্দাম কলোচ্ছ্বাসে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একটী সতেরো-আঠারো বৎসরের তরুণী মেয়ে মুগ্ধ-চোখে কিয়ৎদূরে উপবিষ্টা স্বাতীর অনুপম মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—"দেখ্‌ ভাই নতি, ওই বউটা কি চমৎকার দেখতে!"

—"সত্যি ভাই, বেশ। কিন্তু শুধু দেখতেই—ওর ত ছেলে হলো না আজও। ক' বছর হলো বিয়ে হয়েছে, আশাও নেই—"

একটী অল্পবয়স্কা বধূ দিল ওকে থামিয়ে। "হ্যাঁ, নতিদি', ও যদি বাঁঝা—তবে ত শুভকাজ ওর হাতে চল্‌বে না?"

হঠাৎ একটী মেয়ের সতর্কিত নিম্নকণ্ঠের মৃদু তিরস্কারে, ওরা চকিত হয়ে উঠলো। কণ্ঠের উৎস নীরব হলো। "এই নতি দি', চুপ কর না—স্বাতী বৌদি' যে শুন্‌তে পাবে।"

মেয়েটী সত্য কথাই বলেছিল। স্বাতী বারান্দার প্রান্তে দশ বছরের ছোট ননদ জ্যোৎস্নার সাথে গল্প করতে করতে তরকারী কুটলেও তরুণীদের আলাপ ওর শ্রুতিমূলে প্রবেশ করছিল। ও শুনেছিল সমস্তই। আর শুন্‌লেই বা কি? ওর বুকের এ গভীর ক্ষতের যাতনা যে ওকে সহ্য কর্‌তেই হবে। দিক্ লোকে যত দিতে পারে খোঁচা।" স্বাতীর মনে পড়ল—এই তো সেদিন সন্ধ্যেবেলা পাশের বাড়ীর সাব-ইঞ্জিনিয়ারের ভোরের শিশির-মাখা সদ্যফোটা ফুলের মত ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটীকে একটু আদর করেছিল—ওঃ, তার মা সে কি ভীষণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল! দাসীর উদ্দেশ্যে বলা তার দীপ্ত কণ্ঠস্বর সুস্পষ্টরূপেই শ্রবণে প্রবেশ করলো—বন্ধ্যা-নারীর মাতৃত্বের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা না কি রূপান্তরিত হয় ডাইনীর মায়াতে। ওই মায়া না কি সন্তান বিনষ্ট—'ম্যাম্-ম্যা-ম্যা'—হঠাৎ ছাগ কণ্ঠের অতি করুণ আর্ত্তনাদে স্বাতীর টুকরো টুকরো চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে গেল। মন ভীষণভাবে নড়ে উঠলো। মুখ তুলে সে অঙ্গনে চাইল। দেখ্‌তে পেলো—দু'টী বেশ সুপুষ্ট নধর কুচকুচে কালো রঙের ছাগলকে টান্‌তে টান্‌তে সানুর ছোট ভাই ভানু উঠান পার হয়ে গোয়ালের অভিমুখে যাচ্ছে। ছাগল দু'টীর বড় বড় চোখগুলো কেন যেন অশ্রু টল্‌মল্ করছে। স্বাতী গভীর দৃষ্টিতে ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাসির ঝর্ণায় উথ্‌লে উঠে জ্যোৎস্না বললো—"অমন করে চেয়ে আছ কি বৌদি,' কাল সকালে যে ওদের 'ঘ্যাচাঙ' হবে।"

"ঘ্যাচাঙ?"

—"হ্যাঁ গো, বলি দেওয়া হবে কালী-মন্দিরে। খুড়ীমার যে মানত আছে। সানু দা'র আগে পাঁচ ছয়টী ভাই বোন্ মরে গেছলো কি না, তাই এক সন্ন্যাসী-ঠাকুর বলেছিলেন—'একাগ্র ভক্তিচিত্তে যে জয়কালী-মাকে স্মরণ করতে পারে, তার প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হয় না'।"

—"সত্যি জ্যোৎস্না, ছেলে যাদের হয় না—ছেলে দেন্ তাদের জয়কালী-মা?" হঠাৎ স্বাতীর ওষ্ঠপ্রান্ত ওর ঘজ্ঞান্তে ব্যগ্রতায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

—"নিশ্চয়!" উৎসাহিত হয়ে জ্যোৎস্না বল্‌লো—"তিনি জাগ্রত দেবী বৌদি'। একবার মনে মনে বল্‌লেই হলো। বলো না, দেখো, বছর ঘুরবে না—তোমার কোলে সোনার খোকা আসবেই আসবে।"

স্বাতী আঁচলে মুখ লুকুলো, মুখ মোছার ছলে। তারপর কি একটা কাজের অছিলায় সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

আজ তার বুকে কিসের কোলাহল সুরু হয়ে গেছে। তার কর্ম্মচঞ্চল হাত দু'খানি যেন মেল ট্রেণের গতি পেয়েছে। কয়েক ঘণ্টার ভেতর সে অগোছান অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে তুল্‌ল।

সন্ধ্যার দিকে সানুর মা রান্নাঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন—স্বাতীর নারকেল নাড়ু তৈরী হয়ে গেছে; সে তখন তাঁর শিশুপুত্রটীকে মিষ্টি করে গল্প বলতে বলতে দুধ খাওয়াচ্ছে। তৃপ্তিতে তাঁর মায়ের অন্তর ভারী হয়ে উঠ্‌ল।

স্বাতীও কি জানি কেন অকারণ রাঙা হয়ে উঠ্‌ছিল। তাকে সে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে—"হ্যাঁ জ্যেঠিমা,

পাঁচশো লোক নিমন্ত্রণ হয়েছে, ও দুটো পাঠায় আলু না দিলে কুলুবে কেমন করে?"—বলে একটী যুবক ঘরে প্রবেশ ক'রে।

—"না বাবা, ওতে কি কুলোয় কখনও—ওই যে বৌমা যাচ্ছে, আলুগুলো কুটে দেবে 'খন"—বলে সানুর মা স্বাতীর মুখের দিকে তাকালেন।

—"বৌদি' তা' হলে আসুন, আলুগুলো বার করে দি' বারান্দায়"—বলে যুবকটী এগিয়ে যাচ্ছিল।

স্বাতী মধুর কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"না ঠাকুরপো, আমি ঘরের ভেতর বস্‌ব'খন, তুমি একটা গ্যাসবাতি পাঠিয়ে দিও।"

না, স্বাতী আজ বারান্দায় সর্ব্বসমক্ষে বস্‌তে পারবে না—না, কিছুতেই পারবে না! মন বড় চঞ্চল আজ তার। মনের উৎসব-সমারোহ ওর মুখে, দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না হয় ত হেসে বল্‌বে—"কি গো বৌদি', তোমার ও হাসির মানে আমি বুঝি নে? আহা, ছেলে যেন আর কারও হয় না! ওঃ, মেয়ে যেন আনন্দে পাগল হয়ে উঠ্‌লেন!"

স্বাতীর ঠোঁটের কোণে এক টুক্‌রা স্মিতহাসি ঝক্‌মক্‌ করে উঠ্‌ল। পরমুহূর্ত্তে সে কল্পনার রঙিন আলোকে আত্মহারা হয়ে গেল।

.

ধূপধূনা-চন্দন সুবাসিত জয়কালী-মায়ের পূজা-মন্দির যেন তারই মানত বলির বাদ্যে মুখরিত হয়ে উঠেছে। দ্বিখণ্ডিত ছাগের তাজা রক্ত দেবীর সে পদ্মফোটা রাঙা পা দু'খানি ধুইয়ে দিচ্ছে। বাহির প্রাঙ্গণে যত ভিক্ষু—কেহ হস্তহীন, কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ। ওদের সমবেত আশীসে, কলরবে স্থান মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

হঠাৎ সে কল্পনাতেই যেন চীৎকার করে উঠলো—"মালতী, ও মালতী শুনতে পাচ্ছিস না, খোকনকে বাইরে আর রাখিস নি, ভেতরে নিয়ে আয়, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে যে। দে, উলের ফ্রকটা পরিয়ে দিই।"

স্বামী আপন কক্ষের জানালায় খেলায় রত ফুটফুটে সুন্দর শিশুটির তুলতুলে মুখখানির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে—চমৎকার, আহা কি চমৎকার ওই শিশু!

শিশু খলখলিয়ে হেসে উঠ্‌লো দাসীর ক্রোড়ে। মাথা-ভরা কুচকুচে কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল গোলাপী রঙের মুখে। অপরূপ! স্বাতী ভাবলো—শিশুর মুখের ঝলমলে ওই হাসি অপরূপ! ওই হাসি বুঝি নারীর চলার পথকে সত্যিকারের সৌন্দর্য্য-বিভূষিত করতে পারে, সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে পারে!

—"ও রে বাপ্‌ রে, বৌদি', এখনো তোমার এক ধামা আলু যে পড়ে! এদিকে গ্যাসবাতি নিবে এল, জল দিয়ে দেবো?"—বল্‌তে বল্‌তে হেনা ঘরে প্রবেশ করলো। স্বাতীকে জাগ্রত করলো ওর মধুর স্বপন হতে। নিবু নিবু গ্যাস বাতিতে জল ভরলো; আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে শয্যার আশ্রয়ে পালিয়ে গেল। তখন জমীদারের বৃহৎ ঘড়িটায় ঢংঢং করে বারটা বাজ্‌লো।

স্তব্ধ, গভীর রজনী। নিথর, নিরন্ধ্র অন্ধকার নিশীথের কালো বুকে নিবিড়রূপে জমাট বেঁধেছে। তখন রাত্রি দুটো কি আড়াইটা বেজেছে। শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষণিকের হাসা চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। মাঝে মাঝে দু'-একখানি এক্কাগাড়ী সুপ্ত পল্লীকে জাগ্রত করে ষ্টেশন হতে শেষ রাত্রের প্যাসেঞ্জার নিয়ে গ্রামের ভেতরে ছুটে যাচ্ছে। খট্‌—খট্‌—খট্‌ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ বিরাট স্তব্ধতার বুক চিরে ঘন বনের প্রান্তকে চকিত, কম্পিত করে তুল্‌ছে। প্রতিধ্বনি গুমরে মরছে। 'ম্যা-ম্যাম্‌-ম্যা।' সানুদের গোয়ালে সেই ছাগল দু'টী ডেকে উঠলো। ওঃ, কি মর্ম্মন্তুদ ওদের ওই আর্ত্তনাদ—রাত্রির বুকটা যেন বিদীর্ণ করে তুল্‌ছে! আহা ওরা অমন করে কাঁদে কেন? স্বাতী ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভেঙে গেল। ওদের কণ্ঠের ওই কাতর রোল ওর বুকে যেন তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ করলো। ও ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বস্‌লো।—"ও গো বলো না, বলির ছাগল দুটো এত রাত্রে কেন অমন করে ডাক্‌ছে!"

স্বাতী ভীষণ উতলা হয়ে উঠলো; কিন্তু ঘুমন্ত স্বামীর কাছে কোনই প্রত্যুত্তর পেল না। ওর কাণে কাণে কে যেন বল্‌লে—"না গো, ওরা ডাকছে না, এ কণ্ঠস্বরকে ঠিক্ ডাকা তো বলা চলে না! ওরা মায়ের পায়ে শেষ-বিদায়-নতি জানাচ্ছে! যাবে, তাই কাঁদছে!"

স্বাতী আতঙ্কে শিউরে উঠলো; বেদনায় চিত্ত আর্দ্র হলো। দ্বিখণ্ডিত ছাগের লাল টক্‌টকে তাজা রক্ত ওর চোখের সুমুখে তখন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। না না, ওরা মরবে না—কিছুতেই মরতে পারবে না! কেন মরবে ওরা? স্বাতী নিদ্রিত স্বামীকে জাগ্রত করে তুল্‌লো—"ও গো, বলো না, আমাদের স্বার্থ পূরণের জন্য আত্মদানই কি ওদের জন্মের পূর্ণ সার্থকতা?"

স্বাতীর চোখ দু'টী অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো। ওর ব্যথাভরা কম্পিত কণ্ঠস্বরে প্রতীপের ঘুম ভেঙে গেল। সে তন্দ্রালস চোখ দু'টী রগড়ে নিয়ে স্মিতমুখে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে একান্ত স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বল্‌লে—"কি স্বাতী, এখনও ঘুমোও নি তুমি?"

আবার দূর হতে ভেসে এল সেই ছাগের সকরুণ আর্ত্তনাদ—অশ্রু-উচ্ছ্বলিত, ঘনঘন কম্পিত। ক্রমেই যেন অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে কোন্ সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। স্বাতী বল্‌লে প্রতীপের মুখের দিকে তাকিয়ে—"শুনেছ কি তুমি, ওরা যে আর কাঁদতে পারছে না!"

স্তম্ভিত প্রতীপ অবাক্ হয়ে স্ত্রীর উত্তেজনা-দীপ্ত ব্যথা-আর্দ্র মুখের দিকে ক্ষণকাল নীরবে তাকিয়ে রইল। দু' মুহূর্ত্ত সে ভাবলো। কিছুক্ষণ পর স্ত্রীর কথাগুলি যখন সে উপলব্ধি করতে পারলো, তখন হেসে উঠলো হোহো করে। মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বুঝিয়ে মিষ্টি করে স্বাতীকে বল্‌লো—"তুমি অসম্ভব বোকা স্বাতী। অকারণে নিজেকে এমনি করে দগ্ধ করছ। ভেবে দেখো, ওই ছাগল দুটো একদিন মরবেই—হয় তো নিষ্ঠুর কশায়ের হাতে ওরা মারা যাবে। তার চেয়ে দেবীর পায়ে—মন্দ কি?"

স্বাতী স্বামীর কথার কোনই উত্তর দিলে না। হয় তো বা সে কথাটা সে মেনে নিলে। প্রতীপ আশ্বস্ত হয়ে স্ত্রীর মাথাটা বালিসে রেখে দিল। এবারে স্বাতী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো। প্রতীপের তন্দ্রামধুর চোখ দু'টী আবার নিদ্রায় নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ হলো প্রকৃতির কৃষ্ণরূপ শুভ্র হয়ে উঠেছে। আব্‌ছা অন্ধকার ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে। অস্পষ্টতায়, স্বচ্ছতায়, ভোরের শুচি-স্নিগ্ধ আলোর উন্মোচনে নহবতে ভৈরবী রাগিণী সুরু হলো। তার মিষ্ট আলাপে প্রতীপের ঘুম গেল ভেঙে।—"শোন ত স্বাতী, কৃষ্ণ-অভিনন্দিত সুরটা কি মধুর হয়ে উঠেছে!"

প্রতীপ পাশ ফিরে স্বাতীকে জাগ্রত করতে চাইল—কিন্তু স্বাতী ছিল না শয্যায়; পড়েছিল ছোট একটুকরো চিঠি। প্রতীপ চিঠিখানা তুলে নিল। স্বাতী লিখেছে—"জয়কালী-মায়ের আশীর্ব্বাদে যে করুণা পেতে পারতুম, তা' আমি সানন্দে প্রত্যাখান করলুম। জীবের প্রাণের বিনিময়ে সুখ, আনন্দ আমি চাই নে। চাই নে বলেই, খুড়ীমায়ের অভিশাপের পশরা মাথায় তুলে নিতে হবে জেনেও, এ শুভ-উৎসবে যোগ দিতে পারলুম না। যেখানকার মানুষ সেইখানে চল্‌লুম। এ যাওয়ায় তোমাকেও সাথে নিতে পারলুম না; কারণ, আমার জন্যে তুমি কেন উৎসব আনন্দে বঞ্চিত হবে। ক্ষমা করো।"

তখন উষার বন্দনা-গীতিকে মুখরিত করে জয়কালী-মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে বলির বাজ্‌না বেজে উঠেছে।

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

মতিমহল টকিজের রাঙা 'বৌ' চিত্রে

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা
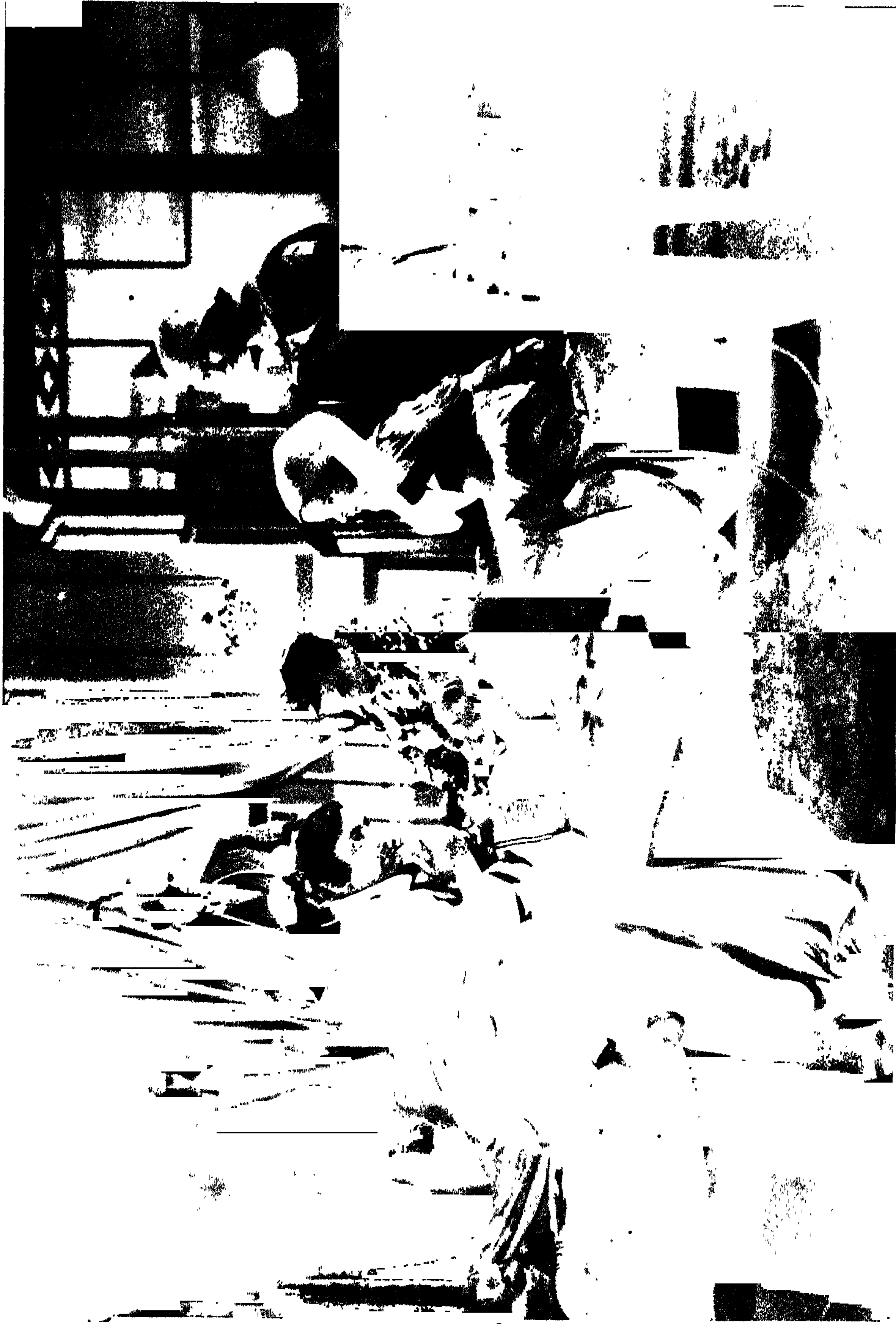
বোম্বে প্রেসিডেন্সী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্

[এই সংখ্যার বর্ণিত বিষয়—নাসিক, পাণ্ডুলেনা, ত্র্যম্বকেশ্বর, ইলোরা, অজন্তা ও সাঁচী]

দেশ অনেক বেড়িয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ বেড়ানর আনন্দ যে কোন্খানে সেটা আমি আজও পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারি নি। শুকনো মুখ ও ফাঁকা ট্যাঁক নিয়ে বাড়ী ফেরার সময় আনন্দ ও দুঃখ কি যে হয় সেটা বলা খুব শক্ত—তবে মোটের ওপর বোধ হয় সুখই হয়; কারণ, তা' নইলে লোকে আর স্বেচ্ছায় ঘরের কড়ি খরচ করে বিদেশের অজানা বিপদের মাঝখানে হাবুডবু খেতে বেরুতো না।

বোম্বাই থেকে বাড়ী ফিরলেই ভালো হয়; কারণ, এখন স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি,—বাংলাদেশের তেল এবং জল আমায় প্রাণে প্রাণে ডাক দিচ্ছে। শীতকালে বেড়াবার দুঃখ আছে অনেক। না যায় গা হাত পরিষ্কার করা, না আছে দিনের তেমন বহর। সন্ধ্যের পর বাইরে একটু থাকাব যো নেই; এমন কি, ফাটা ঠোঁটের জ্বালায় হাসি পেলেও কাঁদতে হয়। কিন্তু তবুও মনে হলো—হয় ত এদিকে জীবনে আর কখনও আস্বো না; যাওয়ার পথে যে ক'টা পড়ে, একেবারে ঘুরেই যাই।

পুনা থেকে ফেরার পথে যেদিন সকালে এসে বোম্বাই ভি-টি'-তে পৌঁছেছিলুম, সেইদিনই রাত্রি বারটার এক প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চেপে বসা গেল। গাড়ীখানা গাধাবোট; কারণ, সমস্ত ষ্টেশনেই সে থাম্তে থাম্তে যায়। কিন্তু তা'তে আমাদের কিছু আসে যায় না। ওই গাড়ীতে যাওয়ার সুবিধে এই যে, ওখানা সকাল সাতটায়, অর্থাৎ, শীতকালের ভোরবেলায় নাসিক রোড ষ্টেশনে পৌঁছে দেয়।

দিলেও তাই। দারুণ শীতের মধ্যে ওভারকোট জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে নাসিক রোডে এসে নাবা গেল।

এখান থেকে নাসিক সিটি হলো ছ' মাইল দূরে—ট্যাক্সীভাড়া অভাবনীয় সস্তা। বাস্ প্রত্যেকের চার আনা করে, আর ট্যাক্সী যায় প্রত্যেকের ছ' আনা টিকিটে। আশ্চর্য্য এই যে, এখানে টাঙা নেই।

আমি ও পূর্ণা দু'জনে একটা ট্যাক্সীতে চেপে বস্লুম। ট্যাক্সী'র সঙ্গে কথা হলো যে, আমরা বার আনাই দেবো, যদি আমাদের ভেতরে বসবার জায়গায় সে আর তৃতীয় সোয়ারী না তোলে—আমাদের এই আব্দারে সে প্রথম রাজী হয় নি; কিন্তু তারপর যখন সিটিগামী তৃতীয় কোনো যাত্রী আর পেলে না, তখন অগত্যা রাজী হতে বাধ্য হলো।

মাঠের মাঝখান দিয়ে এই ছ' মাইল রাস্তা। মাঠে সামান্য কুয়াসা ছিল, কিন্তু শীতও প্রবল। ছ' মাইল পিচ্ দেওয়া বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে সেদিন সকালে বোধ হয় একা আমরাই যাত্রী ছিলুম; কারণ, আর কোন গাড়ী ত দেখ্লুম না।

নাসিক সিটিতে ঢোকার মুখে এক টোল-হাউস আছে। নাসিক মুন্সীপালের নিয়ম এই যে, বিদেশী যাত্রী বেড়াবার উদ্দেশ্যে এই দেশে এলে, তাদের প্রত্যেককে চার আনা হিসেবে কর দিতে হয়। ছাপানো রসিদে কি যে লিখ্লে তা' বুঝ্লুম না। দু'জনের আট আনা সেলামী দিয়ে নাসিক সহরে আমরা ঢুক্লুম।

ইট এবং পাথর বা'র করা পুরাতন বাড়ী। রাস্তা বাঁধানো হলেও ধূলো প্রচুর। বাঙালীর নাম-গন্ধও নেই। অসংখ্য পাণ্ডা এসে আমাদের গাড়ীখানার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগ্লো।

আমাদের ট্যাক্সীখানায় ড্রাইভারের সঙ্গে আর একটি লোক ছিল বসে। আমি জানতুম সে ওই গাড়ীরই লোক। এতক্ষণে সে আমাকে তার পরিচয় দিলে। শুন্লুম যে, সে না কি পাণ্ডা। আমার মস্তকমুণ্ডন, পিণ্ডদান ইত্যাদি

সমস্ত কাজই সে সস্তায় করিয়ে দেবে। উপরন্তু সে যখন ষ্টেশন থেকে আমাদের ধরেছে তখন তাকে আমাদের ছাড়া উচিত নয়। ইত্যাদি।

গুণের মধ্যে লোকটা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে হিন্দী বলা যায়। আমাদের বুঝ্‌তে বিশেষ কষ্ট হয় না। খোঁজ নিয়ে শুন্‌লুম, নাসিকে বাঙালী বলে কোন জীব একেবারেই নেই; এমন কি, দু'চারদিনের জন্যে তীর্থ করতে গেছে, এমন ধারা বাঙালীর সংবাদও দিতে পার্‌লে না। ওখানে থাকার জন্যে বিশ্রী নোংরা এবং ভাঙা দরজা-ওয়ালা ধর্ম্মশালা আছে—তা' ছাড়া, পাণ্ডার বাড়ী আর গুজরাতী হোটেল। কোলকাতায় শুনে গেছ্‌লুম নাসিকের পাণ্ডা না কি তেমন সুবিধের নয়—বিশেষ করে আমাদের পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করে শুন্‌লুম, তারা দুই ভাই মাত্র বাড়ীতে থাকে; মেয়েছেলে কেউ নেই এবং তার বাড়ীটা মন্দিরগুলোর কাছ থেকে দেড় মাইল দূরে। কথা-বার্ত্তায় সন্দেহ হলো। শেষ পর্য্যন্ত নাসিক রোডে বাজারের ওপর এক তিনতোলা গুজরাতী হোটেলে গিয়ে ওঠা গেল। তেতলায় আমরা একখানা ঘর পেলুম—সেই সঙ্গে একটা জলের কল। আমাদের দিতে হবে দু'জনের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা কিংবা তার যে যে কোন অংশের জন্যে চার টাকা, কমটম নেই।

সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেলে স্থিতি হয়ে নিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে সকালের ছোট হাজ্‌রী খেতে বসা গেল। ছোট হাজরী অর্থে ভাত, পিঁয়াজ ও আলুর মিশ্রিত চচ্চড়ী, দু'খানা করে বিস্কুট আর একবাটী করে দুধ চা। নেহাৎ মন্দ লাগ্‌লো না। তেতলার বারান্দায় পিঠ রোদ্দুরে দিয়ে টেবিলে বসে গুজরাতী প্রাতরাশ গলাধঃকরণ করে দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়া গেল।

পূর্ব্বতন পাণ্ডা-মশায় সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরই কথা মত একটা টাঙা ভাড়া করা গেল।

খোঁজ করে শুন্‌লুম, নাসিকের সব কিছু দেখ্‌বার জন্যে দুটো দিন থাকা দরকার। একদিনেও হয়, কিন্তু তা'তে শরীরের ওপর অত্যাচার বড় বেশী হয়ে পড়ে।

সকালবেলায় টাঙায় চড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথম যাওয়া গেল গোদাবরী নদীর তীরে। বড় রাস্তার ওপর এবং বাজারের ধার দিয়ে থানার সামনে ঘেঁসে যেতে যেতে একটা সাঁকো পাওয়া গেল। সেই সাঁকোটাই গোদাবরীর সাঁকো। নীচের নদী ঠিক্‌ শুক্‌নো দামোদরের মত—কেবল বালি। মধ্যে মধ্যে সামান্য জলের রেখা; তবে তেমন প্রশস্ত নয়—অর্থাৎ, বর্ষাকালেও সে নদীর তেমন কোনো জোর থাকে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-মহাশায় নিশ্চয়ই 'গোদাবরীকে চাক্ষুষ দেখেন নি। এই নদী দেখ্‌লে কখনই 'গোদাবরীতটে মোরা ছিনু সুখে' ইত্যাদি রূপ লিখ্‌তেন না।

রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে বনবাসে বেরিয়ে ছিলেন, তখন এই স্থানে লোকালয় ছিল না। এই নাসিকই হলো প্রাচীন দণ্ডকারণ্য। গোদাবরী নদীর ওপর সাঁকো তখন পড়ে নি এবং সস্ত্রীক রাজকুমারকে পায়ে হেঁটেই এই এই সব জঙ্গলে ঘুরতে হয়েছিল। রামের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য লোক হলেও কেবল মাত্র বিংশ শতাব্দীর সাহেবী-যুগে জন্মেছি বলেই রামের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণেই সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘুরে এসেছি। রামচন্দ্র নিশ্চয়ই ভাত এবং পিঁয়াজের মিশ্রিত ব্রেক্‌ফাষ্ট, চায়ের সঙ্গে তিন-তলা হোটেলে বসে উপভোগ করতে পারেন নি।

বাজার থেকে আন্দাজ আধ মাইল দূরে সাঁকো পার হয়ে একটু ঘুরে গিয়ে গাড়ী থেকে নামতে হয় গোদাবরীর তীরে। ওইখানেই অনেকগুলো ধর্ম্মশালা আছে। পাথরের বাড়ী ও নোংরামীর রাজত্ব। লোটা, থুথু, দাঁতন কাঠি ময়লা গামছা, ছেড়া কম্বল ও কাঠের ধোঁয়ায় প্রাণটা যেন একে-বারে আঁৎকে ওঠে।

মাত্র ওই জায়গায়, গোদাবরীতে খানিকটা জল আছে; তাও নদীটাকে পুকুরের মত করে কেটে বাঁধিয়ে রেখেছে—অনেকটা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত আলান্দির মত। জল থাকলেও নদী এখানে অত্যন্ত সরু, অর্থাৎ প্রস্থে বিশ হাতের বেশী নয়। নদীর দু'পাশেই পাথর দিয়ে বাঁধনো সিড়ি এবং সিড়ির একটা ধাপের নীচেই জল। ঘাটের ওপরেই ছোট একটা মন্দির জল থেকে আন্দাজ পনের হাত দূরে এবং দু'হাত উচ্চে। মন্দিরের মধ্যে গোদাবরী

দেবীর প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। মূর্ত্তির চার হাত, নাকে এক বড় নথ। যাত্রীরা গোদাবরীর তীরে এসে মস্তক মুণ্ডন করে পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করে। উত্তর ভারতীয়ের নিকট কাশী যেমন পবিত্র, দক্ষিণ ভারতের নাসিকও তদ্রূপ।

গোদাবরী ঘাটের পাশে আর তিনটি ছোট ছোট ঘাট আছে। পৌষ মাসের সকালের শীতের মধ্যেও বহু লোককে সেখানে স্নান করতে দেখলুম। স্রোতহীন শীর্ণ গোদাবরীর জল এই জন-সঙ্ঘের সমবেত স্নান ও থুৎকারে একেবারে পুণ্যের আকর স্বরূপা হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুর ছেলে—সেই জলই মাথায় স্পর্শ করলুম।

দেখি, এক অতি বৃদ্ধ ওই শীতের মধ্যে এক ঘাটে স্নান করে,' সেখান থেকে উঠে আবার অপর ঘাটে গিয়ে স্নান করছে, আবার সেখান থেকে উঠে অপর ঘাটে। খবর নিয়ে শুনলুম, এই তিনটি ঘাটের তিনটি বিভিন্ন নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে স্নান করার ভিন্ন ভিন্ন ফলও আছে। ঘাট তিনটির নাম যথাক্রমে—রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ও ধনুষকুণ্ড। তিনটিতে স্নানের কি ফল ঠিক্ মনে নেই, তবে সমবেত ফল যে অচিরাৎ শয্যা-গ্রহণ, সেটা অতি সহজেই অনুমেয়। তিনটি ঘাটেরই জল নিয়ে মাথায় স্পর্শ করলুম। তবে আধুনিকভাবে কিছু কিছু ভাবিতা, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়েই সমভাবে বিকৃত মেজাজসম্পন্না স্ত্রীর মাথায় পূতবারি সিঞ্চন করার সাহস আমার হলো না।

গোদাবরী ঘাটের ওপরেই কয়েকটি মন্দির আছে; তন্মধ্যে বিখ্যাত আছে দু'টি—কপালেশ্বর ও সুন্দরনারায়ণ। কপালেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও সুন্দরনারায়ণে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। প্রত্যেক মন্দিরেই হনুমানজীর মূর্ত্তি, সমস্ত মন্দিরই মুন্সীপালের রাস্তা থেকে একতলা দেড়তলা সমান উঁচু। শুধু মন্দির বলে নয়, সমস্ত বাড়ীই ওই রকম উঁচু; কেবল একমাত্র গোদাবরী-দেবীর মন্দিরই নীচু। শুনলুম, বর্ষাকালে গোদাবরীর জল যখন বাড়ে, তখন না কি ওই মন্দির জলে ডুবে যায়, কিন্তু অন্যান্য মন্দির ও বাড়ী ঠিক্ই থাকে। পূর্ব্বে হয় ত নদীর তেজ খুব বেশী ছিল, সেইজন্যই পুরাতন বাড়ীগুলি রাস্তা থেকে অত উঁচু-পোতার ওপর তৈরী।

সুন্দরনারায়ণ ও কপালেশ্বর মন্দির থেকে আন্দাজ এক মাইল দূরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটী না কি ত্রেতাযুগের রাম-সীতার পঞ্চবটী। একান্ত শীর্ণ এবং বৃদ্ধ বট অনেকগুলি ঝুরি নামিয়ে দাড়ীওয়ালা বুড়োর ন্যায় প্রবীণ হয়ে বসেছে—কিন্তু হলে কি হয়, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী অপেক্ষা কোনমতেই সে বড় নয়।

পঞ্চবটীর ধারেই সীতা-গুম্ফা নামক মন্দির। সীতা-গুম্ফায় ঢুকতে প্রত্যেকের এক পয়সা করে দক্ষিণা লাগে। গুহা বল্‌তে পাহাড় কাটা গুহা যেন কেউ না মনে করেন, এটি মানুষের হাতে তৈরী পাথরের ঘর—ওপরে খোলার চাল। সীতা-গুম্ফায় ঢুকতে একটা মানুষের হাতে তৈরী সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেতে হয়। এই সুড়ঙ্গের ভেতর কোনোরকমে শুয়ে শুয়ে যাওয়া যায়—কলেবর স্থূল হলে কোনরকমেই যাওয়া সম্ভব নয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই, যে মন্দির ও সুড়ঙ্গের মধ্যে বিজলী বাতি আছে।

সীতা-গুম্ফার মধ্যে ছোট ছোট তিনটী মূর্ত্তি আছে—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। তাঁদের সাম্‌নে আছে হনুমানজীর মূর্ত্তি। সীতা-গুম্ফা সুড়ঙ্গের ঠিক্ সামনেই পড়ে পঞ্চবটীর গাছ। এবং ওর কাছেই আছে রামের মন্দির। কেন ঠিক জানি না, তাকে ওরা কালরামের মন্দির বলে। অনেকখানি জায়গার ওপর ওই মন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরের ঠিক্ সামনেই আছে হনুমানজীর মূর্ত্তি। এই মন্দিরের মধ্যে কিন্তু মামুলী ঘিয়ের প্রদীপ। দেখে শুনে মনে হয়, প্রগতির আলো এসে সীতা-গুম্ফাতেই আগে প্রবেশ করেছে; বেচারা রাম এখনও অন্ধকারেই পড়ে আছেন। হাজার হোক্, সীতা ত নারী বটে!

কালরামের মন্দির থেকে মাইল দুই দূরে আছে তপোবন। দিল্লী-ডেকান ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে এই দু' মাইল পথ যেতে হয়। এই রাস্তাটিকেই আমরা পুনাতে পেয়েছিলুম—আন্দাজ আশী ফুট চওড়া রাস্তা। দু' পাশে খানা, খানার পাশে ক্ষেত, ক্ষেত থেকে অনেক দূরে দূরে সব পাহাড় দেখা যায়। নাসিকে কোনরকম পাহাড় নেই,

রাস্তায় কোনরকম উচু-নীচুও নেই—কিন্তু নাসিক থেকে পাঁচ সাত দশ মাইল দূরে দূরে পাহাড় আছে! প্রায় প্রত্যেক পাহাড়ের ওপরই মন্দির, তার মধ্যে কতকগুলি জৈন, কতকগুলি হিন্দু, তবে মুসলমানের কোন চিহ্নই এখানে নেই। নাসিকের প্রসিদ্ধ কুষ্ঠাশ্রম এই ট্রাঙ্ক রোডের ওপরেই পড়ে। তপোবন যাবার পথে আমরা কুষ্ঠাশ্রমটা একবার দেখে নিলুম।

আসানসোল থেকে পাঁচ মাইল দূরে উষাগ্রামের কুষ্ঠাশ্রমের তুলনায় নাসিকের কুষ্ঠাশ্রম ছোটও বটে এবং এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে দারিদ্র্যও প্রকট। এখানকার আশ্রমে ধূলো বড় বেশী; কারণ, বড় রাস্তার ধারে ধূলো নিবারণ সত্য সত্যই অসাধ্য। আশ্রমের প্রকাণ্ড চত্বরে কপিকল দেওয়া কূপের ধারে উন্মুক্ত রৌদ্রে কুষ্ঠরোগীদের স্নানের ব্যবস্থা আছে—কুষ্ঠরোগীদের জন্য নানারূপ খেলার বন্দোবস্ত এবং তাদের মধ্যে যারা কর্ম্মক্ষম তাদের না কি উপযুক্ত কাজ দিয়ে যাতে তারা দু' পয়সা উপার্জ্জন করতে পারে, অথচ রোগটাও সংক্রামক হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে। একতলা টিনের চালা দেওয়া টানা 'সেডে'র মধ্যে ছোট ছোট খুপ্‌রী করা ঘরের এক-একটিতে এক-একজন রোগী বাস করে।

কুষ্ঠাশ্রম ছাড়িয়ে একটু দূরে নাসিক পিঁজরাপোল পড়ে। এখানে গোমহিষাদির যত্ন বড় বেশী। এদেশের বিশেষত্ব এই যে, এখানে গোমাংস একেবারেই পাওয়া যায় না। মাছ কিম্বা ছাগমাংস খুব কমই মেলে। সহরের হোটেলে আমরা মাছ পাই নি। শুনলুম, দশ টাকা দিলেও ওরা না কি মাছ-মাংস চট্ করে আনিয়ে দিতে পারে না।

পিঁজরাপোল ছাড়িয়ে ট্রাঙ্ক রোড থেকে জঙ্গলের মধ্যে একটা মেটে রাস্তা নেবে গেছে। সেই রাস্তা ধরে তপোবনে যেতে হয়। তপোবন অর্থে লোকালয়হীন নির্জ্জন অরণ্য। খানিক দূরে গিয়ে আর টাঙাও যেতে পারে না—তখন পায়ে হাঁটতে হয়। স্থানে স্থানে সাধুদের 'ঝোপ্‌ড়া' আছে। কোনোখানে কোনো সাধু আগুন জ্বালিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। কোনখানে 'ঝোপড়া' খালি; অর্থাৎ, সাধু দেহরক্ষা করেছেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বন, দুপুরেও পাখীর ডাক্ যেন কানে আসে রাত্রির মত স্তব্ধ এবং গম্ভীর হয়ে। এ ছাড়া, দূরের ঝরণা থেকে জলস্রোতের অবিরাম একটানা ধ্বনি আর আমাদের তিনজনের পথচলার পদশব্দ।

কোল্‌কাতার লোকের পক্ষে ভালোও লাগে, ভয়ও হয়। এমনিভাবে পায়ে-চলার পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে, হঠাৎ যেন ঝরণার শব্দটা বড় জোর হয়ে পড়ে। তারপর বন-জঙ্গল কমে আসে, নীচু একটা পাহাড়ী উপত্যকায় গিয়ে পড়া যায়।

সেই হলো গোদাবরী ও গঙ্গার সঙ্গমে। সেখানে গোদাবরী অর্থে কালো পাথরের ওপর থেকে বড় একটা নালার জলের মত গোদাবরীর জল নাম্‌ছে, আর গঙ্গা অর্থে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সেইরূপ সরু আর একটি জলের ধারা এসে ওই গোদাবরীর সঙ্গে মিশ্‌ছে। এই গঙ্গাকে ওরা কপিল গঙ্গা বলে। প্রবাদ এই যে, অগস্ত্যমুনি কপিল ও গঙ্গা দু' জনকেই তপঃপ্রভাবে নাসিকের এই তপোবনে আকর্ষণ করেছিলেন এবং তদবধি গঙ্গার একটি শাখা না কি এইখানেই বহতা আছে। স্থানটিকে তপোবন বলার কারণ এই যে, এখানে না কি অনেক ঋষির আশ্রম ছিল। আমরা গৌতম, অগস্ত্য ও কপিল এই তিনজনের মূর্ত্তি এই গঙ্গা ও গোদাবরী সঙ্গমের নিকট দেখ্‌লুম।

স্থানটি প্রকৃতই মনোরম,—অবশ্য সূর্য্যের আলো, গাইড এবং ফেরার উপযুক্ত বাহনাদি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের আয়ত্বে থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায় একতলা সমান উঁচু-নীচু পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে সরু সরু জলের ধারা। দূরে দূরে বড় বড় গাছ, পাখীর ডাক এবং গোটাকয়েক সাদা রঙের মন্দির নামক ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। এমনি ধারা কুঁড়ে ঘরের একটাতে রাম সীতার ছবি আছে। প্রবাদ যে, ওইখানেই না কি তারা এসে বসে বসে গোদাবরীর শোভা নিরীক্ষণ করতেন ওইখানেই হনুমানজীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে, সীতাহরণের পূর্ব্বে যে হনুমান কেমন করে ওখানে আস্‌তে পারে তা' আমায় পাণ্ডা ঠিক্ বোঝাতে পার্‌লে না, কিছু দূরে আর একটি চালা ঘরে নাকছেদী মন্দির, অর্থাৎ ওইখানেই না কি লক্ষ্মণ শূর্পণখার

নাসিকাচ্ছেদ করেন। পাহাড়ের খানিকটা খোলা জায়গা দেখিয়ে বল্‌লে—ওইখানেই খরদূষণের সঙ্গে রামের যুদ্ধ হয়েছিল। ওই জায়গাটার একধারে আর একটি চালা ঘরে স্বর্ণমৃগ ও মারিচের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ওদেরই কাছে গঙ্গা-গোদাবরী সঙ্গমের ধারে এক জায়গায় দু' লাইনে পাঁচটা ছোট ছোট গোলাকার গর্ত্ত আছে; গর্ত্তের মধ্যে মানুষের একটি হাত সহজেই যেতে পারে। শুন্‌লুম, ওই পাঁচটা গর্ত্ত না কি পাঁচটা যজ্ঞকুণ্ড। ওদের নাম যথাক্রমে—অগ্নিকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড ও মুক্তকুণ্ড। প্রত্যেক কুণ্ডের মধ্যেই জল আছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। ওই জল স্পর্শ করলে না কি খুব বেশী রকম পুণ্য হয়। কুম্ভমেলার * সময় এইখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তপোবন থেকে দু'মাইল দূরে জটায়ুর মন্দির আছে—সেইখানেই না কি জটায়ুর মৃত্যু হয়। সেখানে যাওয়ার পথ বড় দুর্গম্ বলে আমাদের আর যাওয়া হয় নি।

তপোবন দেখে আমরা যখন হোটেলে ফিরে এলুম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারটা। হোটেলে এসে আহারাদি শেষ করে পুনরায় বাহির হওয়া গেল।

নাসিক থেকে আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে একটি পাহাড় আছে। ওই পাহাড়ে কতকগুলি গুহা আছে। ওই গুহাযুক্ত পাহাড়টিকে ওরা বলে 'পাণ্ডুলেনা।' ইংরাজীতে বলে 'লিনা কেভ্‌স্।' †

পাণ্ডুগুহা পাহাড়টি আন্দাজ সাত শ' ফিট উঁচু। পাহাড়ের প্রায় তিনভাগ ওপরে উঠে এই সমস্ত গুহাগুলি পাওয়া যায়। এলিফ্যান্টা, অজন্তা, ইলোরা এবং পাণ্ডুগুহা এগুলি সমস্তই একজাতীয়। এই চারিটি গুহাকে একত্রে বোম্বায়ের গুহা বলে অভিহিত করা হয়।

বোম্বায়ের গুহাগুলির সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাষ দেওয়া যাক্। এই সমস্ত গুহাই মানুষের হাতে কেটে তৈরী করা। সব ক'টা গুহাই পাহাড়ের ওপর; অর্থাৎ, গুহায় যেতে পাহাড়ে অনেকখানি উঠতে হয়। কিন্তু কোনো গুহাই পর্ব্বতের শিখরের ওপর নয়—পাহাড়ের চূড়ো থেকে একটুখানি নীচে। গুহাগুলি তৈরী করার কায়দা সর্ব্বত্রই সমান। এগুলি যেন পাহাড়ের ভেতর থেকে পাথর কুরে গর্ত্ত করা গোছের ঘর; অর্থাৎ, এর সাম্‌নে দিকে ফাঁকা, আর ভেতরের তিন পাশে কালো পাথরের নিরেট দেওয়াল। আলো যাবার অপর কোনো পথ না থাকায় গুহাগুলোর মুখের কাছে সামান্য আলো থাক্‌লেও, ভেতরে অন্ধকার। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, পাহাড়ের ভেতর থেকে এই সব বড় বড় ঘরগুলি বেশ মসৃণভাবে কেটে বার করা। ঘরগুলির গড়নও সব একরকম। মাঝখানে চতুষ্কোণ একটি হল ঘর—প্রস্থে এবং লম্বে আন্দাজ চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট হবে (কোনো কোনো ঘর দু' শ' আড়াই শ' ফুট পর্য্যন্ত বড় আছে) ওই ঘরের সাম্‌নেটা ফাঁকা—কেবল গোটাকতক থাম আছে, আর সরাসরি ভেতরে ঠিক্ তেম্‌নি ধারাই আরও একসেট থাম আছে। ভেতরের থামগুলির পেছনে একটা করে ছোট বেদী; সেই বেদীর ওপর দেবদেবীর মূর্ত্তি বসান থাকে। এই সমস্ত ঘরগুলির গড়ন দেখ্‌লে মনে হয়, ওই বেদীর ওপর দেবমূর্ত্তিকে স্থাপন করে ভক্তেরা এই ঘরের প্রশস্ত মেঝেয় সারি সারি বসে দেবারাধনা, পাঠ বা গান ইত্যাদি শ্রবণ করতেন; হয় ত এই সব ঘরেরই মাঝখানে দেবদাসী-দের নৃত্য হতো। এ ছাড়া, এই সব বড় বড় হলঘরের দুই পাশে, অর্থাৎ, এই হলের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে ডাইনে এবং বাঁয়ে একহাত উঁচু এবং দু'হাত চওড়া রোয়াক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত রোয়াকের কোলে গর্ত্ত-গৃহ; অর্থাৎ, ছোট ছোট খুপ্‌রী ঘর আছে। পঁচিশ ত্রিশখানা এম্‌নিধারা খুপ্‌রী ঘর প্রত্যেক হলের দু'পাশে আছে। এই সমস্ত খুপ্‌রীগুলি প্রস্থে এবং লম্বে আন্দাজ সাত ফুট হবে। এদের মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে পাঁচ ছ'ফুট খাড়াই এবং আড়াই ফুট আন্দাজ চওড়া দরজা আছে। দরজা আমরা দেখতে পাই না; কারণ, কাঠের

---

* সারা ভারতবর্ষে চার জায়গায় কুম্ভমেলা হয়। যথা—প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনী।

† 'লেনা' অর্থে সভা। 'পাণ্ডুলেনা'—অর্থাৎ, পাণ্ডব-সভা। ইলোরায় 'দুমারলেনা' নামক গুহা আছে। উহার অর্থ—বিবাহ-সভা।

দরজা দু' হাজার বছর ধরে টেঁকে থাকা সম্ভব নয়। তবে কপাটের পাল্লা বেঁধে রাখ্‌বার জন্যে পাথরের মধ্যে দড়ি যাবার উপযুক্ত দু' তিনটে করে ছেঁদা প্রত্যেক প্রবেশ-পথের গায়েই আছে। মনে হয়, ওই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দড়ি চালিয়ে তারা ওই দড়ির সাহায্যে দরজাগুলি বেঁধে বা ঝুলিয়ে রাখ্‌তো। খুপ্‌রীগুলির মধ্যে দরজার সাম্‌নে আন্দাজ ফুট চারেক করে মেঝে থাকে। ওই চারফুটের পরেই একটা আড়াই ফুট আন্দাজ উঁচু এবং ঘরের দেওয়াল থেকে দেওয়াল অবধি বিস্তৃত তিনফুট চওড়া বেদী আছে—এক কথায় তিনফুট চওড়া এবং দেওয়াল থেকে দেওয়াল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাতফুট লম্বা একখানা করে পাথরের নিরেট বেঞ্চ। দেখ্‌লেই বোঝা যায়, তারা ওই ঘরগুলো শোবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো।

এরপর আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এই যে, এদের প্রত্যেক হলঘরে ঢোকার সিঁড়ির দুই পাশের দু'টি করে চৌবাচ্চা। এগুলি যথেষ্ট গভীর এবং এমনভাবে তৈরী যে, পাহাড়ের ওপরের সমস্ত জল এই চৌবাচ্চায় এসে জমে। এলিফ্যান্টায় এই চৌবাচ্চার জল এখনও পর্য্যন্ত অত্যন্ত সুস্বাদু এবং তৃপ্তিকর। দর্শকমাত্রেই এই জল পান করে। পাণ্ডুলেনার চৌবাচ্চাগুলি শ্যাওলায় ভর্ত্তি এবং নোংরা হয়ে আছে। ইলোরার জলাশয় সংস্কৃত অবস্থায় থাকলেও, জল কেউ বড় একটা খায় না। অজন্তার জলাশয়ে বার মাসই একটা ঝরণার ধারা পড়্‌তে থাকে—ফলে সেখানে একটা স্রোত আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, এই সমস্ত গুহাগুলি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে নির্ম্মিত নয়। আমার মনে হয়, তার কারণ এই যে, সর্ব্বোচ্চ শিখরে ঝড়-বজ্রাঘাত ইত্যাদির ভয় আছে বলেও বটে এবং ওইখানে জলাভাব হবে বলেই খানিকটা নীচে এই গুহাগুলি তৈরী হয়েছে।

আমরা চিরদিন বৌদ্ধ-শিল্পের সুখ্যাতি করেই থাকি—কিন্তু এখানে এসে মনে হয় যে, হিন্দু-শিল্পও কোনো অংশে খাটো নয়। এলিফ্যান্টা হিন্দু শৈবগণের কীর্ত্তি। পাণ্ডুলেনা শৈব এবং পঞ্চপাণ্ডবের ভক্তদের প্রস্তুত। ইলোরার গুহা দেখ্‌লে মনে হয়, উহা প্রথমতঃ হিন্দুরই ছিল, পরবর্ত্তী কালে হিন্দু গুহার দুই পার্শ্বে বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলি তৈরী হয়েছে—কেবল অজন্তাই একা বৌদ্ধদের সামগ্রী। সব ক'টা গুহা দেখে মনে হলো, ইলোরাই সর্ব্বোত্তম; তন্নিম্নে অজন্তা ও পাণ্ডুলেনা। এলিফ্যান্টা বিশেষ কিছুই নয়। পাণ্ডুলেনার নাম আমরা বড় একটা শুনি না; কারণ, এটির ওপর 'আর্কিওলজিক্যাল্‌ ডিপার্টমেণ্টে'র নজর এতদিনে পড়েছে। আমরা যখন যাই, তখন দেখি 'আর্কিওলজিক্যালে'র লোকেরা এর সংস্কার করছে; কিন্তু বাকী তিনটি বহুপূর্ব্বেই সংস্কৃত হয়ে গেছে। বাকী তিন্‌টিতে 'কিউরেটার' এবং 'রেজিষ্টার্ড গাইড্‌' নিযুক্ত আছে। অজন্তায় ইলেকৃট্রিক আলো আছে। ওই সব গুহায় যেতে হলে যাত্রীদের প্রত্যেককে চার আনা করে মাশুল দিতে হয়; কিন্তু পাণ্ডুলেনায় 'কিউরেটা'র নেই, দর্শনীও দিতে হয় না। মনে হয়, ভবিষ্যতে শিল্পী-মহলে পাণ্ডুলেনাও বড় একটা স্থান পাবে।

আমাদের বর্ণিত গুহার অনুরূপ গোটা ত্রিশেক গুহা পাণ্ডু পাহাড়ে আছে। কোনগুলি বা খুব বড়, কোনগুলি ছোট। কতকগুলি গুহার মধ্যে দারুণ প্রতিধ্বনি হয়; কতকগুলিতে একেবারে কোনরকম শব্দই হয় না। একটা গুহার মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মরাজকে মধ্যে বসিয়ে দু'পাশে চার ভায়ের মূর্ত্তি—মূর্ত্তিগুলি প্রকাণ্ড পুতুল বিশেষ। আর একটি উঁচু গুহার মধ্যে ইন্দ্রসভা আছে। সেখানেও ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রকে মাঝখানে বসিয়ে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইত্যাদি দেবমূর্ত্তি সব আশে পাশে আছেন। একটা গুহার মধ্যে প্রকাণ্ড এক পাথরের কলস বসানো আছে—কলসটা আন্দাজ বিশফুট উঁচু। অধিকাংশ গুহার মধ্যেই বেদীগুলি খালি পড়ে আছে; সম্ভবতঃ, দেবমূর্ত্তি কোনরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। কতকগুলি গুহার বেদীতে এমনভাবে যোনীপীঠ কাটা আছে যে, দেখ্‌লেই মনে হয়, সেখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল; ভবিষ্যৎকালে কেউ হয় ত তাকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। ইতিহাস ভালরূপ জানি না—তাই এ সব গুহার ওপর ধর্ম্মদ্বেষীদের কোনোরকম অত্যাচার হয়েছে কি না ঠিক্‌ বলতে পারলুম না।

এরপর কথা হলো এই সব গুহার প্রাচীর শিল্প নিয়ে। এদের প্রাচীরে এবং স্তম্ভে অনেক রকম কারুকার্য্য আছে। স্তম্ভে যতরকম চক্র, পদ্ম ইত্যাদি আঁকা আছে এবং প্রাচীরে 'ফ্রেস্কো রিলিফে'র দ্বারা—অর্থাৎ, দেওয়াল থেকে উঁচু করে পাথর কুরে যতরকম মূর্ত্তি আঁকা আছে, এই সব মূর্ত্তিই হচ্ছে 'ওরিয়েন্টাল আর্টের মডেল।' কিন্তু বাংলা পত্রিকায় 'ওরিয়েন্টাল আর্ট' নামধেয় যে সব ছবি আমরা দেখ্‌তে পাই, সেগুলি এদের 'ভেঙ্‌চানী' বিশেষ। এলিফ্যান্টা ও অজন্তার দেওয়ালে যে সমস্ত ছবি আঁকা আছে, সেগুলির মধ্যে লীলায়িতভাব কিছু বেশী। ইলোরা ও পাণ্ডুলেনার অঙ্কিত ছবিগুলি সে তুলনায় অনেকখানি 'রিয়ালিষ্টিক।' নটবাজ শিবের মূর্ত্তি আমরা আধুনিক ছবিতে যা' পাই, তা'তে করে শিবের অস্থিগ্রন্থি সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল জন্মায়; কিন্তু ইলোরায় শিব-তাণ্ডব দেখলে ও রকম সন্দেহ হয় না। ইলোরার 'রাবণ-কা-খাই' নামক প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী ও শিব-তাণ্ডবই বিখ্যাত মূর্ত্তি। ওই সব মূর্ত্তি দেখ্‌লে মনে খুব অদ্ভুত আনন্দ না হলেও এটা বোঝা যায় যে, যারা ওই সব মূর্ত্তি এঁকেছিলেন, তাঁদের সামঞ্জস্যের জ্ঞান ছিল—আজকালকার চিত্রকরদের মত একেবারেই মাতোয়ারা হয়ে হাত-পাগুলোকে যেখানে সেখানে লীলায়িত করে মানুষকে মৃন্ময় পিণ্ড বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নি।

এই সব গুহা নিয়ে আজকালকার স্থপতিরা বড় বড় গবেষণা করেন। তাঁদের মতে এই সব বড় বড় গুহা না কি মানুষের হাতে কাটা ভয়ানক শক্ত এবং তার চেয়েও কঠিন এই গুহাগুলিকে এমনভাবে তৈরী করা—যাতে করে যুগ-যুগান্তর ধরে এরা এম্‌নিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়—এগুলি এমন বিশেষ কিছু শক্ত নয়। সেকালের লোকের ধৈর্য্য ছিল অনন্ত—যাঁরা পুথির একখানা পাতাকে চিত্রিত করতে একমাস পর্য্যন্ত সময় দিতেন এবং সারাজীবনে একজন লোক দু'-তিনখানা পুথিকে নকল করতে পারলেই জীবন সার্থক বলে মনে করতেন, তাঁদের পক্ষে এই সব কাজের মধ্যে তেমন কোনো বাহাদুরী নেই। লোককে কাজ করতেই হবে। সেকালের আমলে কাজ ছিল কম; কাজেই প্রতিযোগিতার কোন বালাই ছিল না—ফলে একদল লোক এই সব কুঁড়েমীর কাজ, অর্থাৎ চিত্রকলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমরাও যখন হাতে কোনো কাজ না পাই, তখন গল্প লিখে নিরজে ও পাঠকের সময় কাটাবার আয়োজন করি। তারপর শিল্পের স্থায়ীত্ব নিয়ে কথা—এরা স্থায়ী হবে না ত হবে কে? নিরেট পাহাড় থেকে কুরে কুরে খানিকটা অংশ যদি বার করে নেওয়া যায়, তা' হলে কি তার কোনো ক্ষতি হয়? আজকালকার দু' মাইল ব্যাপী রেলওয়ে 'টানেলে'র তুলনায় এই সব গুহা ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ওইসব 'টানেল' যদি প্রত্যহ রেলের কম্পন সহ্য করে অবাধে সারা পাহাড়টাকে ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তা' হলে পাহাড়ের মাথার ওপর ছোট ছোট পাথর-কাটা ঘর কি টিঁকে থাকতে পারে না? আসল কথা, এগুলোর এত সুখ্যাতি হওয়ার কারণ শুধু সাহেবদের বিস্ময়প্রকাশ!...সাহেবেরা আমাদের দেশে এসে প্রথমতঃ আমাদের ঘৃণা করত দেখে, আমরাও দাসত্বে এমন পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলুম যে, সেই ঘৃণা অতি সহজেই মেনে নিয়েছিলুম। তারপর তারা যখন দেখ্‌লে যে, এ হতভাগ্য জাতির পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই সব করে গেছেন, তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে অনেক সব বড় বড় কথা বলে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিলে; আমরাও অবাক হয়ে ওদের কথায় সায় দিয়ে চোখ কপালে তুললুম। ওরা বল্‌লে—তোমরা ত অদ্ভুত কাজ করেছ। আমরা বল্‌লুম—তাই ত। কিন্তু এটা আমরা ভুলে যাই যে, ওদের সেই যুগের পূর্ব্ব-পুরুষদের তুলনায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা উন্নত ছিলেন বলেই যে তাঁদের দাম, তা' নয়; তাঁরা প্রকৃতই অনেক বড় ছিলেন এবং জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা যা' করেছিলেন, তা' তাঁদের পক্ষে বিস্ময়কর নয়। সেটা হলো তাঁদের কাছে সেই যুগের স্বাভাবিক জিনিষ—যেমন আমাদের কাছে কয়লার খনি বা রেলের এঞ্জিন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা যদি তাঁদের কাজের এইরকম নিদর্শন না রেখে যেতেন, তা' হলে সেইটাই হতো তাঁদের পক্ষে অগৌরবকর। যাঁরা বেদান্ত এবং জ্যোতিষের সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁরা বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে পারেন নি বলে আমরা

লজ্জিত হই—তাঁদের ব্যোমযান তৈরীর কোনো প্রমাণ পেলে আমরা বিস্মিত হব না, স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌বো।

পাণ্ডু পাহাড়ের গুহাগুলো ঘুরতে ঘুরতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে হয়ে এল। এখানকার 'গাইড' সব এদেশী স্ত্রীলোক। তারা শুধু কতকগুলো নাম জানে; তা' ছাড়া, আর কিছুই জানে না। সামান্য দু'-একআনা পয়সা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখায়। পাহাড়ে ওঠার রাস্তার দু'পাশে এদেশীয় ছেলে এবং বুড়োরা করুণ-স্বরে চীৎকার করে ভিক্ষা করে। তারা জানে ভদ্রলোক দেখ্‌লেই হাত পেতে পয়সা চাইতে হয়। যে স্ত্রীলোক আমাদের 'গাইড' হয়ে সমস্তটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালে, তার স্বামী নিকটস্থ পাহাড় থেকে কাঠ ভেঙে মাথায় করে নাসিকে গিয়ে বিক্রয় করে। তার শাশুড়ী পাহাড়ের পথে 'শেঠজী, ঢেপুয়া' ইত্যাদি সুর করে ভিক্ষা করে। তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাহাড়ী ছাগলের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের টিপিতে টিপিতে বনে-জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে নেচে বেড়ায়। পাহাড়ের গোড়ায় গাছের শুক্‌নো ডাল ও পাতা দিয়ে ছাওয়া তাদের কুঁড়ে ঘর। বুনো কলা, নোনা, জঙ্‌লী খরগোস, পাখী, ঘাসের বীজের রুটী এবং সামান্য পরিমাণে চাল তাদের খাদ্য। দু'-একখানা কাপড় বা কম্বল সামান্য নুণ বা তেল তারা পয়সা দিয়ে কেনে—ওই পয়সা তারা ভিক্ষা করে ও কাঠ বেচে সংগ্রহ করে।

সারাদিন রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে যখন হোটেলে ফিরে এলুম, শীতের সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে।

রাত্রে গভীর ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে আমরা ট্যাক্সী-যোগে ত্র্যম্বকেশ্বর যাত্রা করলুম।

নাসিক থেকে ত্র্যম্বকেশ্বর আন্দাজ কুড়ি মাইল। নাসিক বাজারের ধারে যে চৌরাস্তা আছে, তাই থেকে সোজা পশ্চিমদিকে ত্র্যম্বকেশ্বরের বাঁধানো পথটি বেরিয়ে গেছে। এই রাস্তার দু'ধারে মাঠই বেশী; মাঝে মাঝে দু'-একখানা গ্রামও দেখা যায়। নাসিক থেকে ত্র্যম্বক যেতে মোটর ভাড়া সাত টাকা লাগে। সস্তায় যাবার মত বাস্ আছে—প্রত্যেকের বার আনা করে টিকিট। কিন্তু মুস্কিল এই যে, বাসের যাত্রী পুরোপুরি না হলে বাস্ ছাড়ে না।

ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়ের মাঝখানে একটী বড় পর্ব্বতের সানুদেশে ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটী উচ্চ এবং খাড়াই—দেখ্‌লে অনেকটা বৌদ্ধ-গয়ার মন্দিরের মত মনে হয়। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বোম্বায়ের এই অঞ্চলে শিবের মূর্ত্তিরই প্রাদুর্ভাব বেশী। বাংলা দেশে বা কাশীর কোনো মন্দিরে শিব-মূর্ত্তি দেখেছি বলে মনে পড়ে না; কিন্তু এখানে লিঙ্গমূর্ত্তি এবং শিলার সংখ্যাই যেন কম। ত্র্যম্বকেশ্বরের মূর্ত্তি কিন্তু মাটীর সঙ্গে আঁটা নয়। প্রত্যেক সোমবারে এই মূর্ত্তিকে চতুর্দ্দোলে বসিয়ে নিকটস্থ সরোবরে স্নান করাতে নিয়ে যায় এবং ওই সময় বেশ একটা মিছিল হয়। শিবরাত্রি এবং কুম্ভমেলার সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির যেমন উত্তর ভারতীয়ের নিকট পূজ্য, দক্ষিণ ভারতীয়ের নিকট ত্র্যম্বকেশ্বরও তদ্রূপ।

ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দিরের পূজারীরা অত্যন্ত কড়াগোছের লোক। সাধারণ যাত্রীদের মন্দির প্রবেশ নিষেধ। স্ত্রীলোকদের মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই। আজকাল আবার 'হরিজনে'র হাঙ্গামে মন্দিরের সেবাইতবর্গ কেমন যেন আরও সতর্ক হয়ে উঠেছেন। সাধারণ লোকে মন্দিরের বাইরে থেকে মূর্ত্তি দর্শন করে ও পূজারীদের হাত দিয়ে পূজা পাঠিয়ে থাকে। আমি নেহাৎ নাছোড়বান্দা হয়ে পাণ্ডাকে খোসামোদ করে এবং উপবীত দেখিয়ে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলুল—কিন্তু মূর্ত্তিকে স্পর্শ করার হুকুম পাই নি। মাছ খাওয়া হিন্দুকে ওরা দারুণ ঘৃণা করে—অবশ্য মাদ্রাজের মত 'মৎস্য-ব্রাহ্মণ' বলে একেবারেই অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না।

যে পর্ব্বতের সানুদেশে ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দিরটি স্থাপিত, ওই পাহাড়টি এখানকার সকল পাহাড়ের তুলনায় পরিষ্কার এবং উঁচু। ওই পাহাড় থেকেই গোদাবরী নদীর উৎপত্তি। মন্দিরের পাশ দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি আছে—সিঁড়ি দিয়ে আন্দাজ সাত আট শ' ধাপ্ উঠ্‌লে খানিকটা খোলা জায়গা পাওয়া যায়। ওইখানে সাধুদের 'ঝোপ্‌ড়া' আছে। লোকালয়হীন নির্জ্জন অরণ্য, দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়া এবং চূড়ায় চূড়ায় অসংখ্য কঙ্কালসার বৃক্ষ। আমরা যখন

গিয়েছিলুম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। সূর্য্যের আলোয় সমস্ত স্থানটা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। স্তব্ধ পর্ব্বতের ওপর ঝরণার একটানা কল্‌কল্ শব্দ আস্‌ছিল স্তব্ধতারই অংশ হয়ে। সেই শব্দটুকু না থাক্‌লে হয় ত ওই নীরবতা অসম্পূর্ণই থেকে যেতো।

পাণ্ডাদের ছেলেরাই এখানকার 'গাইড্।' তারা সঙ্গে করে এই স্থান থেকে আমাদের আরও অনেকখানি নিয়ে গেল। পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ গা বেয়ে আমাদের অপর দিকে খানিকটা নাব্‌তে হলো; নাব্‌তেই চোখের সাম্‌নে আমরা গোদাবরীর 'গোমুখী-উৎস' দেখ্‌লুম। ওখানকার ঝরণার আকার না কি গরুর মুখের ন্যায়; কিন্তু আমার চোখে তা' কিছু পড়লো না। আমি দেখ্‌লুম—সামান্য ঝরণা; তবে শীতকাল বলে হয় ত তেমন জোর ছিল না। সামান্য জল পাহাড়ের গা ব'য়ে কল্‌কল্ করে তলায় গিয়ে পড়ছিল। পাশের সিঁড়ি দিয়ে ঝরণার তলায় গিয়ে নাম্‌লুম। সেখানে দু'-একজন সাধু বসে আছেন। শিলাখণ্ডের ওপর আর একজন পাণ্ডা দু'জন গুজরাটিকে মন্ত্র পড়িয়ে গোদাবরীর পূজা করাচ্ছে। বোম্বায়ের সমস্ত মন্দিরেই যেমন নারকোল দিয়ে পূজা করতে হয়, এখানেও ঠিক্ তেমনি। নারকোল, সন্দেশ এবং পাহাড়ী ফুল দিয়ে গোদাবরীর ঝরণাকে আমরা পূজো করলুম। হিন্দুর ছেলে এমনি করেই প্রকৃতির প্রত্যঙ্গে বিশ্বদেবকে স্মরণ করে।

ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের কাছেই দেখ্‌বার মত আরও একটি জিনিষ আছে—সেটির নাম কুশাবর্ত্ত কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলেই প্রতি সোমবার দিন ত্র্যম্বকেশ্বর শিবকে স্নান করান হয়; কারণ, শিবের মন্দির থেকে গোদাবরীতে মূর্ত্তিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কুশাবর্ত্ত মন্দিরটী চতুষ্কোণ; চারিদিক পাথর দিয়ে বাঁধানো। কুশাবর্ত্তের জল তেমন পরিষ্কার নয়। বোধ হয়, এই পুকুরের তলায় মাটী নেই—হয় ত পাহাড়ের বৃষ্টির জলই এই কুণ্ডে সঞ্চিত হয়ে পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। কুশাবর্ত্তের ঘাটের ওপরেও দু'-একজন সাধু ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। এখানে যাত্রীরা মস্তক-মুণ্ডন ও পিণ্ডদান করে। আমাদের পাণ্ডাঠাকুর ফুল ও নারকোলের সাহায্যে আমাকে কুশাবর্ত্তের পূজা করিয়ে দিলেন।

কুশাবর্ত্তের কিছু দূরে আর একটী অনুরূপ পুষ্করিণী বা কুণ্ড আছে—তার নাম গঙ্গাসাগর-কুণ্ড। গঙ্গাসাগর-কুণ্ডের ধারে নিবৃত্তি দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটী ছোট এবং অন্ধকার। নিবৃত্তি দেবী কালিকামূর্ত্তি। মন্দিরের রোয়াকে লিঙ্গমূর্ত্তি শিব আছেন। কথিত আছে—এই নিবৃত্তি দেবী না কি কোন এক ঋষি কর্ত্তৃক স্থাপিতা। রাম সীতা একদিন দণ্ডকারণ্য থেকে এই ঋষির আশ্রমে বেড়াতে এসে এই দেবীকে দর্শন করেছিলেন এবং এঁর উপাসনা করেছিলেন। রাম সীতা যেখানে দাঁড়িয়ে উপাসনা করেছিলেন, সেখানে শিলার ওপর চারটি চরণ আঁকা আছে। যাত্রীরা সেখানে রাম সীতার পূজা দিয়ে থাকে।

ত্র্যম্বকনাথে যাত্রীরা পাণ্ডাদের বাড়ীতেই আহারাদি করেন—রুটি ও ভাত প্রসাদই তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। তবে ভক্ত যাত্রীদের আহার করার সময় থাকে না; কারণ, পূজাদি সমাপ্ত করে তাঁরা ত্র্যম্বকনাথকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণের কাজটী বড় সোজা নয়। একবার প্রদক্ষিণ করতে অন্ততঃ পক্ষে তিনঘণ্টা সময় লাগে। প্রায় সাতটী ছোট ছোট পাহাড়ে উঠে এবং নেবে এই ত্র্যম্বকনাথকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রদক্ষিণ করার সময় এখানে একটী সুন্দর গ্রাম-সম্বলিত পাহাড় পার হতে হয়। তার নাম—জয়ভাটের পাহাড়। এখানকার সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে মাত্র জয়ভাটের পাহাড়েই লোকালয় আছে। ঘুরে ঘুরে এইটুকুই দেখ্‌তে পাই—মানুষ যেখানেই পানীয় জল পেয়েছে, সেই-খানেই নিজেদের ডেরা বেঁধে বাস করেছে।

মন্দির পরিক্রমা না করে এবং মাত্র সামান্য জলযোগ সেরে মোটরে নাসিক ফিরে আসতে আমাদের বেলা সাড়ে তিনটে হলো। যাঁরা ওখানে পিণ্ডাদি দান করেন, তাঁদের ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে যায়।

নাসিকের হোটেলে ফিরে এসে অপরাহ্নের রৌদ্রে ধীরে-সুস্থে স্নান করে আহারাদি সেরে নিতে বেলা প্রায় পাঁচটা হলো। তারপর একটু আরাম করে শোয়া গেল; কারণ, রাত্রে আবার নতুন একটা অভিযানের আয়োজন

করতে হবে। এবার আমাদের যাত্রা হবে ইলোরা অভিমুখে।

সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই বেডিং বাক্স গুছিয়ে নিয়ে চোদ্দ আনা দিয়ে এক ট্যাক্সী ভাড়া করে যাওয়া গেল নাসিক রোড ষ্টেশনে।

নাসিক রোড ষ্টেশনে ট্রেণের অভাব নেই—রাত্রি আটটার মেলে চড়ে রাত্রি ন'টা নাগাদ মানমাড় ষ্টেশনে নামা গেল।

ইলোরায় যাবার ট্রেণ বড় সুবিধাজনক নেই। মানমাড় থেকে নিজাম ষ্টেট রেলের মিটার গেজ গাড়ী যেগুলো হায়দ্রাবাদ অভিমুখে যায়, তাইতে করে ইলোরা রোড বা দৌলতাবাদ দুটো ষ্টেশনের যেটায় ইচ্ছে নামা যায়—কারণ, ইলোরা গুহা ওই দুটো থেকেই প্রায় সমান দূরে।

রাত্রি ন'টার সময় মানমাড় ষ্টেশনে নেবে সামান্য জলযোগ সেরে ওয়েটিং-রুমে শোয়া গেল। রাত্রে খুব সতর্ক হয়েই থাকতে হলো; কারণ, আমাদের যেতে হবে রাত্রি তিনটার গাড়ীতে। দুটো না বাজ্‌তে-বাজ্‌তেই কুলী এসে ডাক্ দিলে—'গাড়ী আগিয়া সাব'। উঠ্‌লুম। নীচ এবং সরু গাড়ী—ধূলোর রাজত্ব। গাড়ী ছাড়ার পনের মিনিট পূর্ব্বে গাড়ীর আলো জ্বালা হয়; কাজেই অন্ধকারে কোনরকম করে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে বিছানা করে শোয়া গেল।

মানমাড় থেকে ইলোরা রোড ষ্টেশন মাত্র পঞ্চান্ন মাইল। ভোর ছ'টায় গাড়ী থেকে নাবা গেল।

ইলোরা হায়দ্রাবাদের নিজামের অন্তর্গত দেশ। এ দেশের পয়সা সিকি আধুলি সমস্তই নিজামের নিজস্ব টাকশাল থেকে তৈরী হয়; তবে ষ্টেশনের কুলী এবং গাড়োয়ানেরা আমাদের দেশের টাকা-পয়সাও গ্রহণ করে।

এখানে অবশ্য 'কাষ্টমে'র হাঙ্গাম নেই; তবে 'অকট্রয় ডিউটি' আছে। নতুন কোন জিনিষ নিয়ে এদেশে ঢুকতে গেলে হায়দ্রাবাদ ষ্টেটকে মাশুল দিতে হয়।

আমাদের কাছে নতুন জিনিষ কিছুই ছিল না। একবার দেখে নিয়ে 'অক্‌ট্রয়ে'র লোকটি আমাদের ছেড়ে দিলে। আমরা গিয়ে ট্যাক্সী নিলুম।

এখানকার ট্যাক্সী ব্যবসায়ে নসেরবান্‌জীর একচেটিয়া অধিকার। এইরূপ একচেটিয়া অধিকার রাখ্‌বার জন্যে—না কি প্রত্যেক বৎসর ষ্টেটকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিতে হয়—ফলে ট্যাক্সীর ভাড়া কিছু বেশী। ইলোরা রোড থেকে ইলোরা গুহা আন্দাজ সাত মাইল—ট্যাক্সীভাড়া যাতায়াত আট টাকা।

ইলোরা রোড থেকে ইলোরা গুহায় যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার বাঁধানো। ইলোরা গুহা থেকে অজন্তা গুহা ষাট মাইল দূরে। ইলোরা থেকে অজন্তা যাবার উপযুক্ত বাঁধানো রাস্তা আছে। নসেরবান্‌জীর মোটরে যাতায়াতের ভাড়া পড়ে—পঞ্চাশ টাকা। 'টুরিষ্ট'রা ওই পথেই যায়; তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে ট্রেণই ভাল। আমরা ট্রেণের পথের কথাই বল্‌বো।

দূর থেকেই ইলোরা গুহার পাহাড়টি দেখা যায়। এ জায়গাটা তেমন পর্ব্বতবহুল নয়। এক সময় যে এখানে সহর ছিল, তা' দেখ্‌লেই বোঝা যায়। একটা প্রকাণ্ড সমতল মাঠের প্রান্তে স্বাভাবিক প্রাচীরের মত বহুদূর ব্যাপী নীচু এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পর্ব্বতের ওপর ইলোরা গুহাগুলি সারিবদ্ধভাবে ক্ষোদিত।

পাহাড়ের নীচেই ডাকবাংলো এবং হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের অতিথিশালা; অর্থাৎ, 'গেষ্ট হাউস' আছে। 'গেষ্ট হাউসে'র চাবি ওই ইলোরা গুহার 'কিউরেটারে'র কাছে থাকে। ডাকবাংলোর ধারে ছোট ছোট কয়েকটি দোকান-ঘর আছে। তার মধ্যে কয়েকটি বন্ধ; দু'টি মাত্র খোলা ছিল। চা, দুধ, পুরী, বহুদিনের বাসি পাউরুটী এবং বিস্কুট এখানে পাওয়া যায়।

ডাকবাংলো বা 'গেষ্ট হাউস' কোথাও আমাদের যেতে হলো না; কারণ, বুদ্ধি করে আমাদের মালপত্র সমস্তই ইলোরা রোড ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিলুম। ওখানকার দোকান থেকে গরম গরম পুরী ভাজিয়ে পেট ভরে খেয়ে নেওয়া গেল; দুধও বেশ ভালই পাওয়া গেল। বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে সমস্ত কাজ চুকিয়ে নিয়ে পাহাড়ে ওঠবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

ইলোরা পাহাড়টি নীচু হলেও যেটুকু উঠ্‌তে হয়,

সেটুকু একেবারেই খাড়াই। পূর্ব্বেই বলেছি ইলোরা পাহাড়টি নীচু এবং উত্তর দক্ষিণে লম্বা। পাহাড়ে ওঠবার অনেকগুলি রাস্তা আছে। আমরা যে পথ দিয়ে উঠ্‌লুম, তা'তে পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে পড়া যায়। সেদিন আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি সহযাত্রী এবং যাত্রিনী ছিলেন—তবে দুঃখের বিষয় সকলেই অবাঙালী; কারও সঙ্গে বাংলা কথা কইবার যো ছিল না। স্ত্রী বেচারী ক'দিনের ভ্রমণে প্রথমটা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন; এখন যেন 'মরিয়া' গোছের ভাব—কথাও নেই, বার্ত্তাও নেই। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াগুলো যে রকম বৈদান্তিক 'তুরী'য় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বিনা আপত্তিতে টুকটুক্ করে চল্‌তে থাকে, তিনিও তেম্‌নিভাবে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন।

ইলোরার গুহাগুলিও পাণ্ডু পাহাড়ের গুহার ন্যায় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরের খানিকটা নিম্নে ক্ষোদিত। সম্মুখে প্রশস্ত পথ। পথের একধার গভীর নীচু। সেখানে নিম্নভুমিতে অল্প অল্প জঙ্গল এবং দু'-একটা বড় বড় গাছ আছে। পথের আর একধারে খাড়াই পাহাড়—ওই পর্ব্বতের গায়ে গুহাগুলি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত। পাহাড়টি উত্তর দক্ষিণে লম্বা—উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি আন্দাজ দেড় মাইলব্যাপী লম্বা লাইনে জৈন, হিন্দু, ও বৌদ্ধ গুহাগুলি কোন্‌টি একতলা, কোন্‌টি দোতলা, কোন্‌টি বা তিনতলা করে পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। এদের মধ্যে মাঝখানের হিন্দুগুহাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আমার ত মনে হলো, পাহাড়ের মাঝখানে হিন্দুগুহাগুলিই সর্ব্বপ্রথম তৈরী করা হয়েছিল; তারপর পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ এবং জৈনগণ ওই হিন্দু-মন্দিরের আশপাশে তাঁদেরও উপাস্য দেবদেবীর নামে কতকগুলি গুহা-মন্দির তৈরী করেছেন।*

অজন্তা, এলিফ্যান্টা বা পাণ্ডুলেনার সঙ্গে ইলোরার প্রভেদ এই যে, এখানে কতকগুলি মন্দিরে এখনও পাণ্ডা আছে ও কতকগুলি মূর্ত্তির এখনও পূজা হয়। সমস্তটাই হায়দ্রাবাদ 'আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র অধীনস্থ হলেও এখনও যাত্রীরা পূজা বা প্রণামী ব'লে যা' দেয়, তা' কিন্তু ওই পূজারীই গ্রহণ করে। সে হিসাবে ইলোরা এখনও তীর্থ বিশেষ—কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত নয়।

এখানকার 'কিউরেটা'র যাত্রীদের যত্ন ক'রে যথাসম্ভব ঘুরে ঘুরে বড় বড় গুহাগুলো দেখিয়ে থাকেন। শুনলুম, যাত্রী এখানে প্রায় রোজই দু'-একজন থাকে—বিশেষ করে বড়দিনের সময় ত বটেই।

আমরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক্ থেকে একে একে বর্ণনা করতে করতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাব।

পূর্ব্বেই বলেছি—দক্ষিণ দিকের গুহাগুলি বৌদ্ধদের। বৌদ্ধদের পাশাপাশি বারটি গুহা আছে। এ গুহাগুলি নাসিকের গুহারই মত—তবে এগুলির সাম্‌নের বাহার কিছু বেশী। উপরন্তু, এই গুহার সাম্‌নে দরজার ওপর 'ভেন্টিলেটারে'র মত করে পাথরের প্রাচীরে খানিকটা কাটা আছে—তা'তে গুহার ভেতর কিছু বেশী পরিমাণে আলো যায়।

বৌদ্ধগুহার মধ্যে কয়েকটির শিল্পী-সমাজে বেশ নাম আছে—তন্মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা গুহা অন্যতম। বিশ্বকর্ম্মা গুহা অর্থে একটি নয়; বিশ্বকর্ম্মাকে মাঝখানে নিয়ে দুই পাশে দুইটি বড় বড় গুহা—একটির নাম ধারোয়ার গুহা, অপরটির নাম চামারোয়ার। বিশ্বকর্ম্মা গুহার প্রবেশ-পথটিতে দুইটি থাম দেওয়া। প্রবেশ-পথের মাথার ওপর দরজার চেয়ে সামান্য ছোট আর একটি দরজার মত করা আছে—এটি 'ভেন্টিলেটার।' বিশ্বকর্ম্মার গুহায় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে—

---

* ঐতিহাসিকদের মত কিন্তু অন্যরকম। তাঁরা বলেন—বৌদ্ধগুহাগুলিই প্রাচীন। হিন্দুগুহা তার পরবর্ত্তী সময়ের এবং জৈনগুহা তারও পরে। কিন্তু হিন্দুগুহাই প্রথম এই পাহাড়ে ক্ষোদিত হয়েছে—আমার এইরূপ ধারণা হওয়ার কারণ এই যে, হিন্দুগুহাগুলিরই আশপাশে ভাল ভাল ঝরণা আছে এবং হিন্দুগুহার স্থানটি বৌদ্ধগুহা অপেক্ষাও উত্তম। তবে ঐতিহাসিকদের সঙ্গে একমত হয়ে কি আমাদের বল্‌তে হবে যে, বৌদ্ধেরা ভবিষ্যৎকালে হিন্দুরা মন্দির তৈরী করবে এই রকম আশা করে ভাল জায়গাটা ছেড়ে রেখে পাহাড়ের একপ্রান্তে গিয়েছিল নিজেদের গুহা তৈরী করতে?

লোকে বুদ্ধদেবকেই বিশ্বকর্ম্মা বলে পূজা করে। এখনও বিশ্বকর্ম্মা-পূজার দিন বোম্বায়ের বড় বড় ছুতারগণ ওই মন্দিরে বিশ্বকর্ম্মারূপী বুদ্ধদেবের পূজাদি করে।

বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরের গায়েই লোকেশ্বরের মন্দির আছে। লোকেশ্বর অর্থে বুদ্ধদেব। এখানে লোকেশ্বরের মন্দিরের দু'পাশের দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আঁকা আছে।

বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণে এবং লোকেশ্বরের কিছু ওপরেই একটি গুহা আছে—তার নাম মহারবাড়া গুহা। এই মহারবাড়া গুহাটি প্রকাণ্ড। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা যায়। স্ত্রী-সেবিত বুদ্ধমূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে ত পড়ে না।

এই সমস্ত গুহাগুলির উত্তর দিকে দোতলা এবং তিনতলা গুহা আছে। দোতলা এবং তিনতলা গুহাগুলি অনেকাংশে হিন্দু গুহার মত। মনে হয়—হিন্দুগুহাবলীর প্রান্তস্থিত গুহাগুলিকে বৌদ্ধেরা নিজেদের অধীন এবং ওর মধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করে নিজস্ব করে নিয়েছে। ওই সমস্ত গুহার মধ্যে বুদ্ধদেব, বজ্রপাণি, পদ্মপাণি ইত্যাদির মূর্ত্তি আছে। দোতলা এবং তিনতলা গুহার দেওয়ালে নানারকম লতা, ফুল, সাপ ইত্যাদি আঁকা। তিনতলা গুহায় আন্দাজ বার চোদ্দ ফুট উচ্চ এক বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। ওই মূর্ত্তির পার্শ্বে এবং ওপরে এক এক গুচ্ছে সাতজন বা ন'জন ধ্যানী বুদ্ধ বা বোধিস্বত্ব মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এ ছাড়া; তিনতলা গুহায় অনেক বৌদ্ধ দেবী-মূর্ত্তিও আছে—'লোচনা' 'মামুখী,' 'হারিতী' ইত্যাদি বৌদ্ধ-দেবীর ছবি আমরা বড় একটা পাই না। এখানে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অঙ্কিত আছে। সময় এবং আলোক-চিত্রের যন্ত্রাবলী থাকলে ওই সমস্ত মূর্ত্তির ছবি নেওয়া সম্ভব হতো। আলাদা আলাদা ক'রে ওদের ছবি কোথাও নেওয়া আছে বলে আমার জানা নেই।

তিনতলা গুহার পাশ থেকেই হিন্দুগুহা সুরু হলো।

ইলোরার সমস্ত গুহার মধ্যে হিন্দুগুহাগুলিই সমধিক সুন্দর; কাজেকাজেই ওখানকার হিন্দুগুহাই বিখ্যাত। সতেরটি বড় এবং অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দুগুহা আছে; এই গুহাগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—যথা, 'রাবণ-কা-খাই', 'তেলি-কা-গণ', ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে পশ্চিম ভারতে বোধ হয় 'তেলি' জাতির প্রাধান্য ছিল। গোয়ালিয়ারের 'তেলি-কা-লাট', ডাকোরে 'তেলি-কা-পুর', ইলোরায় 'তেলি-কা-গণ' ইত্যাদি নামের স্বতন্ত্র দালান দেখে এইরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত?

রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, কুমারবাড়া, দশাবতার, কৈলাস ইত্যাদি সবগুলি বড় বড় হিন্দু-মন্দিরের সম্মুখেই একটি বা দু'টি করে ঝরণা আছে। ঝরণার নীচে পাথর কেটে পুকুর বা জলাশয় করা আছে—ওই জলাশয়ই সেকালের গুহাবাসীদের সম্বৎসর পানীয় সরবরাহ করতো।

ইলোরার হিন্দু-শিল্পের বিশেষত্ব এই যে, বৌদ্ধ এবং অধিকাংশ জৈন গুহাকে প্রকৃতপক্ষে গুহাই বলা যায়; যে রকম এলিফ্যান্টা বা পাণ্ডুগুহায় আছে—কিন্তু হিন্দুগুহাগুলিকে গুহা না বলে মন্দির বলাই উচিত। হিন্দু বা জৈনগুহায় পাহাড়ের ভেতরটা কুরে কুরে বার ক'রে গহ্বর করা হয়েছে—কিন্তু হিন্দু-শিল্পীরা পাহাড়ের ভেতর এবং বাহির দুটো অংশই কুরে কুরে মোটের ওপর এক-একটা ভিন্ন ভিন্ন মন্দির তৈরী করেছেন। পাহাড় কুরে বার করা বলে এ সব মন্দিরের কোথাও যোড়া নেই এবং এগুলি রাস্তা থেকে সামান্য একটু নীচুও বটে—কিন্তু এগুলির মধ্যে আলো আছে; অপরাপর গুহার ন্যায় অন্ধকার নয়। অপরাপর গুহার ওপর লতাগুল্মমণ্ডিত অসমতল পাহাড়; কাজেই সেখান থেকে আলো আসার কোন উপায়ও নেই—কিন্তু হিন্দু-মন্দিরে আলো আসার জন্য ছোট ছোট গর্ত্ত আছে; কারণ, হিন্দু মন্দিরের ওপরটাকে কেটে ত মন্দিরই করা হয়েছে।

হিন্দু-মন্দিরের মধ্যে 'রাবণ-কা-খাই' নামক গুহার ভেতর নটরাজ শিবের তাণ্ডব-মূর্ত্তি, মহিষ-মর্দ্দিনী, হরপার্ব্বতী, দশস্কন্ধ রাবণ ইত্যাদি নানা চিত্র অঙ্কিত আছে। স-বাহন দেবীগণ এই মন্দিরের দু' পাশের দেওয়ালে আঁকা আছেন। যথা—ঐরাবতের ওপর ইন্দ্রানী, শূকরের ওপর বরাহী, গরুড়ের ওপর লক্ষ্মী, ময়ূরে কৌমারী, বৃষভে মাহেশ্বরী, হংসে সরস্বতী, ইত্যাদি।

'রাবণ-কা-খাই' গুহার দক্ষিণ দিকে দশ অবতার গুহা। এখানে জয়দেব বর্ণিত বিষ্ণুর দশ অবতারের চিত্র দেওয়ালে আঁকা আছে এবং গুহার মধ্যস্থলে বিষ্ণুর একহাত ভাঙা মূর্ত্তি আছে। এই গুহাটিও দ্বিতল।

ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিরিশিল্প এই ইলোরায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে না কি এই গিরিশিল্প সর্ব্বোত্তম।

কৈলাস-মন্দির আকারে প্রকাণ্ড। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অল্প নীচু গড় বা খাদ আছে। প্রবেশ-পথের নিকট একটি পাথরের সাঁকো ওই খাদের ওপর পাতা আছে। প্রবেশ-পথের দু'ধারে দু'টি বড় বড় দীপদান বা আলো দেবার উপযুক্ত পাথরের স্তম্ভ—এগুলি উচ্চে প্রায় বিশ ফুট আন্দাজ হবে। এই স্তম্ভেরই কাছে মন্দিরের প্রহরী-হিসাবে দু'টি বড় বড় পাথরের হাতী—হাতী দু'টি জীবন্ত হাতীর মতই বৃহদাকার। মন্দিরের দ্বারের কাছেই ঝরণা—ঝরণার তলায় জলাশয়।

মন্দিরের ভেতরটা খুবই প্রশস্ত। প্রায় তিন শ' ফুট লম্বা এবং দু' শ' ফুট চওড়া হল। হলঘরের দু' পাশে লোকের বাসের উপযুক্ত ছোট ছোট খুপ্‌রী ঘর এবং সাম্‌নে শিবের মূর্ত্তি। শিবের দু'পাশে খানিকটা দূরে দূরে দুই বিরাট্‌কায় নন্দী এবং ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি। এত বড় গুহা যতটা অন্ধকার হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী আলোই আছে। ঘরগুলো যথেষ্ট উঁচু—এর আবহাওয়াটা কেমন যেন থম্‌থমে গোছের। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বল্‌তে সহজেই ভয় এবং সম্ভ্রম হয়।

কৈলাসের উত্তর দিকে রামেশ্বর ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি গুহা—এ ছাড়া, আরও অনেকগুলি ছোট ছোট গুহা আছে। তাদের দেওয়ালে সব দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পশু, দানব, নর্ত্তকী ইত্যাদির মূর্ত্তিও আঁকা আছে। কেউ গোটা, কেউ ভাঙা; কেউ দেওয়াল থেকে বেশ উঁচু করে আঁকা, কেউ দেওয়ালের সঙ্গেই মিশিয়ে আছে। ইলোরা এবং অজন্তা গুহায় সামঞ্জস্যেরই তারিফ্‌ করতে হয়—কোথাও কিছু বেমানান বলে মনে হয় না। সূক্ষ্ম এবং স্থূল দু'রকম কাজেরই নিদর্শন আছে।

ইলোরার হিন্দু-মন্দিরের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সব ক'টা বড় বড় মন্দিরেরই চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করার উপযুক্ত পরিক্রমা-পথ আছে। একটা গোটা পাহাড়কে কেটে কুরে সেকালের হিন্দুরা এই মন্দিরগুলিকে তৈরী করেছেন—ঠিক্‌ যেন কাঁচা কাদাকে ছাঁচে ফেলে গড়ার মত করে। এঁদের ধৈর্য্য, বুদ্ধি এবং যন্ত্রপাতির তারিফ্‌ করতে হয়।

হিন্দু-মন্দিরের সংলগ্ন উত্তরদিকেই জৈন-মন্দির। জৈন-মন্দির আরম্ভের প্রথমেই আছেন—পার্শ্বনাথ। পার্শ্বনাথের মন্দিরটী প্রকাণ্ড উচ্চ। হিন্দু-মন্দিরের অনুকরণে এই মন্দিরটীও ভেতর এবং বাহির দুইদিক থেকেই কুরে বার করা হয়েছে বলে এটা মন্দিরের মত দেখাচ্ছে। প্রকাণ্ড উচ্চ এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সম্পন্ন মন্দিরের মধ্যে প্রশস্ত হল। হলের দু' পাশে দু' সারি খুপ্‌রি ঘর—মধ্যে বিশালকায় পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। এই মন্দিরটী অনেকাংশে কৈলাসের অনুকরণেই তৈরী। পার্শ্বনাথের মন্দিরের পর পাহাড়টী নীচু হয়ে গেছে বলেই হোক্‌, কিংবা হয় ত ঝরণার কোনো ধারা পায় নি ব'লে, কিংবা অন্য কোনো কারণে খানিকটা জায়গা ফাঁকা আছে; অবশ্য এটা একেবারেই ফাঁকা নেই—এখানে কতকগুলি ছোট ছোট খালি গুহা জঙ্গল হয়ে আছে এবং সেই গুহাগুলোর সাম্‌নে দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তাটা পার হয়ে পাহাড়ের একেবারে দক্ষিণ অংশে গেলে আরও কতকগুলি গুহা-মন্দির পাওয়া যায়। ওইখানে একসঙ্গে তিনটী গুহা আছে। ওদের—ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ-সভা এবং রণ্‌ছোড়জীর মন্দির বলে। মধ্যেরটি ইন্দ্রসভা—ওখানে দেবরাজ ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি অপরাপর দেবতা পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। পার্শ্বের জগন্নাথ-সভায় জগন্নাথরূপী পার্শ্বনাথ সখিগণমধ্যে এবং অপর পার্শ্বের রণ্‌ছোড়জী মুরারী (দেবদাসী) গণ বেষ্টিত অবস্থায় অধিষ্ঠিত আছেন। এই তিনটী মন্দিরেই যথেষ্ট কারুকার্য্য আছে। মন্দিরের প্রবেশ-পথের সম্মুখে কৈলাস-মন্দিরে হস্তীর মত দু'টি পাথরের হাতী আছে এবং ওই হাতীর পিঠে একটিতে এক পুরুষ মূর্ত্তি

এবং অপরটিতে এক স্ত্রীমূর্ত্তি আছে—হস্তী এবং আরোহী দুয়েরই বিরাট্ আকৃতি।

কলাচর্চ্চা করতে করতে আকাশে সূর্য্যদেব এবং উদরে জঠরাগ্নি দুয়েরই প্রকোপ যেন ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি হবে। শীত-কালের রদ্দুরের ঝাঁজ বড় বেশী। ষ্টেশনে ফিরে গিয়ে কিছু আহারাদির যোগাড় দেখ্‌তে হবে—কাজেই আর ঘোরা হলো না। দূরে দূরে আরও কয়েকটী গুহা ছিল। 'গাইড' বল্লে—'ডুমারলেনা', 'সীতা কা নানি', 'ব্রহ্‌রভদ্র' ইত্যাদি গুহা না কি দেখ্‌বার জিনিষ—কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন সব রকম দেখা ও গবেষণার বাইরে; কোনোরকমে পাহাড় থেকে নাম্‌তে পারলে বাঁচি।

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় ইলোরা রোড ষ্টেশনে ফিরে এসে ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছ থেকে আমাদের তৈজস-পত্রাদি নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করলুম।

তারপর স্নানাদি সেরে একটা পুরীওয়ালার কাছ থেকে পুরী খেয়ে ষ্টেশন-মাষ্টারকে ফেরার গাড়ী সম্বন্ধে জানাতে হলো। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ একখানা গাড়ী ইলোরা রোড দিয়ে মানমাড় যায়—কিন্তু পূর্ব্বে থেকে না জানালে তিনি ইলোরায় থামেন না। থার্ডক্লাস যাত্রীর জন্যে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন কি না জানি না—তবে আমরা তাকে এক মিনিটের জন্য আটক কর্ত্তে পেরেছিলুম। কতকগুলি টাকা নষ্ট ক'রে, একবোঝা আর্ট পেটে পুরে অর্দ্ধাশনে রাত্রি দেড়টার সময় মানমাড় ষ্টেশনে ফিরে এলুম।

ফেরার পথে শুনলুম, ইলোরা রোড থেকে দুটো ষ্টেশন দূরে ওই লাইনেরই আউরাঙ্গাবাদ নামক ষ্টেশনের কাছেই সম্রাট ঔরঙ্গজেবের স্ত্রী রাবেয়ার কবর আছে। ওই কবর না কি তাজমহলের মতই সুন্দর এবং ষ্টেশনের কাছেই। পাছে আমার যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাই ভয়ে ভয়ে স্ত্রী বল্লেন—বেশ বেশ, সেইখানেই চলো, অমনি আমাকেও কবরস্থ করে আসবে। রাবেয়ার কবর দেখ্‌তে কেমন যেন উৎসাহ আর হলো না।

রাত্রি দেড়টার সময় মানমাড়ে ফিরে এসে কলা এবং দুধ খাওয়া গেল। কোলকাতার গাড়ীখানা আমাদের মানমাড় পৌছানর দশ মিনিটের মধ্যেই এসে গেল। মনটা যেন কেমন করে উঠলো বাড়ী ফেরবার জন্যে—কিন্তু মনকে জোর করে দমিয়ে দিলুম। অজন্তা ও সাঁচী না দেখে দেশে ফিরে গেলে লোকে আমায় বল্‌বে কি? সঙ্গিনীটিকে কিছু আর বললুম না—কোল্‌কাতার গাড়ী যাচ্ছে শুনলে তিনি হয় ত একাই সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠবেন।

রাত্রি আড়াইটা নাগাদ কি একটা এক্‌স্‌প্রেস এল—তা'তেই আমাদের যেতে হলো। ভোর পাঁচটার সময় সে আমাদের পচোরা জংসনে নাবিয়ে দিলে।

পচোরা যে জংসন, সে শুধু নামেই—ওর চেয়ে আমাদের শেওড়াফুলি জংসনও বড় আছে। যাই হোক্, পচোরায় নেবে হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য মেঠাই খেয়ে ও খাইয়ে যতটুকু তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব, তাই লাভ করা গেল।

অজন্তা যেতে গেলে জি-আই পির চিওকি-বম্বে লাইনের পচোরা থেকে একটা সরু লাইনের গাড়ীতে উঠ্‌তে হয়। এ গাড়ী দেখ্‌তে ঠিক্ বারাসাত বসিরহাট লাইট রেলের মত। এই রেলটি জি-আই-পির অধীনস্থ পচোরা-জামনের শাখা বিভাগ। ওই শাখা বিভাগের পচোরায় উঠে মাইল পঁচিশেক দূরে গিয়ে পাহুর নামক ষ্টেশনে নাব্‌তে হয়। বেলা সাড়ে সাতটার সময় পচোরায় উঠে আন্দাজ সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা পাহুরে এসে নাব্‌লুম।

এই পাহুর জায়গাটিও হায়দ্রাবাদ নিজামের রাজত্ব। এখানের টাকা-পয়সা সবই নিজামের নিজস্ব টাকশাল থেকে তৈরী। এই ষ্টেশনে গাড়ী বা ট্যাক্সী সাধারণতঃ কিছুই পাওয়া যায় না; তবে গাড়ীর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে যদি পাহুরের ষ্টেশন-মাষ্টারকে সংবাদ দেওয়া যায়, তা' হলে তিনি তার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করে দেন। বন্দোবস্ত আর কি? এখানকার ট্যাক্সীর ব্যবসায়ও নসেরবান্‌জীর অধীনে। ষ্টেশন-মাষ্টার নসেরবান্‌জীর আশ্রমে একটা খবর দিয়ে দেন মাত্র।

আমাদের এইরূপ খবর মানমাড় থেকেই দেওয়া ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা না হলেও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের

জন্যে ট্যাক্সী একটা ছিল। (তা' সেটা হয় ত খবর না দিলেও থাকৃত।) এখানেও অজন্তা যাতয়াতের ট্যাক্সীভাড়া আট টাকা। পাহুর থেকে অজন্তা পাহাড় আন্দাজ সাত মাইল। পাহুর ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় মালপত্র ফেলে দিয়ে আমরা আবার ট্যাক্সীতে গিয়ে বস্‌লুম।

ইলোরা এবং অজন্তা দুটোর গড়ন ঠিক্ একই রকম। ইলোরা গুহার মত অজন্তা গুহাগুলিও একটু নীচু এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের খানিকটা ওপরে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত। এ সবগুলি গুহাই মানুষের হাতে তৈরী এবং এই গুহাগুলি বৌদ্ধদের সম্পত্তি।

অজন্তায় মোটের ওপর উনত্রিশটি গুহা আছে। নাসিকের পাণ্ডুলেনায় যেমন 'আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র দ্বারা প্রত্যেক গুহায় নম্বর দেওয়া আছে, অজন্তার গুহায়ও সেই রকম এক, দুই, তিন ইত্যাদি করে নম্বর দেওয়া। এই উনত্রিশটি গুহার প্রথমটি পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে এবং শেষটি পশ্চিমদিকে; কারণ, ইলোরার পাহাড় যেমন উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, এখানকার পাহাড় তেম্‌নি পূর্ব্ব পশ্চিমে। ওইরূপ বিস্তৃত পাহাড়ের ওপর মানুষের চলার উপযুক্ত রাস্তা এবং ওই রাস্তার সাম্‌নে সারিবদ্ধভাবে উনত্রিশটি গুহা প্রায় মাইলখানেক জায়গা যুড়ে আছে।

ইলোরা পাহাড়ের ন্যায় অজন্তা পাহাড়ও নীচু ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং অজন্তার গুহাগুলি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের খানিকটা নিম্নে ক্ষোদিত। এখানকার গুহাগুলির মাত্র ভেতরটাই কুরে বার করা হয়েছে; ওপরটা ইলোরার বৌদ্ধ-মন্দিরের মত অসমতল পাহাড়ী জায়গার মত হয়ে লতাগুল্ম আবৃত অবস্থায় আছে। এই বিষয়ে হিন্দু গুহাশিল্প বৌদ্ধ গুহাশিল্প অপেক্ষা অনেক উন্নত। হিন্দুরা পাহাড়ের ভেতর এবং বা'র দু' দিক্ই কেটে পাহাড়টাকে একটা গাঁথানো দালানের আকার দেয়—এতে স্থাপত্যজ্ঞানের পরকাষ্ঠাই সূচিত হয়।

ইলোরার তুলনায় অজন্তা পাহাড়ের অধিক সুবিধা এই যে, অজন্তায় একটি প্রকাণ্ড বড় ঝরণা আছে। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর থেকে এই ঝরণাটি প্রবল ধারায় খানিকটা নেবে এসে অনেকগুলি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে এই গুহার কাছে একটি জলাশয়ে সঞ্চিত হচ্ছে এবং কতকটা জল জলাশয় উপচে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। পানীয় হিসাবে এই জল অতি উপাদেয় এবং এখানকার যাত্রীরা এই জল সুবিধামত সঞ্চয় করে নিয়ে যায়। এলিফ্যান্টা পাণ্ডুলেনা বা ইলোরার জলাশয়ে কেবলমাত্র বৃষ্টির সময় ঝরণার আকারে পাহাড়ের ওপর থেকে জল এসে পড়ে; কিন্তু এখানে জলের একটা ক্ষীণধারা বার মাসই থাকে—ওই ধারাকে এরা 'সাতধারা' বলে।

হায়দ্রাবাদ 'আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র একজন 'কিউরেটার' অজন্তাতেও থাকেন। তিনি এই গুহাগুলি যাত্রীদের মোটামুটী দেখিয়ে দেন। এলিফ্যান্টা বা ইলোরার 'কিউরেটার' অপেক্ষা ইনি কিছু অধিক আরামেই থাকেন—কারণ, কোয়াটার্সের কম্পাউণ্ডটি বেশ বড়; খেলার উপযুক্ত 'লন্' এঁর বাসার সঙ্গেই আছে। উপরন্তু, ইনি প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করারও বেশ সুবিধা পান্; কারণ, এঁর বাসার লাগোয়া একটি ছোট মিউজিয়ম এবং পাঠাগার আছে। অজন্তা গুহায় প্রাপ্ত সামান্য ছোট ছোট কতকগুলি জিনিষ এই মিউজিয়মে থাকে—তবে এই মিউজিয়মের সঙ্গে সারনাথ মিউজিয়মের তুলনাই হয় না। আগ্রার তাজমহলে ঢুক্‌তে বাঁ হাতে যেমন একটি ঘরের মধ্যে আগ্রা তাজের ছোট মিউজিয়ম আছে, এও ঠিক্ সেইরূপ। অজন্তায় বৈদ্যুতিক আলো আছে। কতকগুলি গুহাতেও আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অজন্তা গুহার সঙ্গে পাণ্ডু গুহার অনেক সাদৃশ আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, পাণ্ডুপাহাড়ের একটি গুহাতে এক প্রকাণ্ড কলস ছিল; অজন্তাতেও দশ নম্বর গুহাতে ওইরূপ একটি কলস আছে—তবে অজন্তার সমস্ত গুহাগুলিই প্রকাণ্ড বড়; কলসটিও অনুপাতে পাণ্ডুগুহার কলসের তুলনায় অনেক বৃহৎ। তবে ওই কলসের মাথার ওপর আঁটা স্তূপের উপরিস্থিত চতুষ্কোণ পাথরের বাক্সর মত ছোট্ট একটি বাক্স আছে। ওর মধ্যে যা' পাওয়া গেছ্‌লো, তা' বুঝি বিলেতের কোনো মিউজিয়ম না কোথায় আছে।

অজন্তার গুহায় ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি এবং গুহার প্রাচীরে তক্ষণ শিল্পের (Fresco) দ্বারা শিকার-চিত্র, বন্যহস্তীর

দল, অজগর সাপ, অর্দ্ধ উলঙ্গ দেবদাসী ইত্যাদি ছোট বড় নানা মূর্ত্তি বিভিন্নরূপ ভঙ্গীতে আঁকা আছে। কোনোগুলি বাইরে থেকে যা' আলো আসে, তাইতেই দেখা যায়; কোনগুলিতে 'টর্চে'র আলো ফেলে দেখ্‌তে হয়। গুহার ভেতর কতকগুলির মধ্যে একটি হল ও তার দুইধারে সারিবদ্ধ বাসোপযোগী খুপ্‌রী (বিহার) এবং কতকগুলিতে কেবল মাত্র হল ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট 'সিলিং' আছে—(চৈত্য)। এই শ্রেণীর গুহাগুলির 'সিলিং'কে রক্ষা করার জন্য ঘরের দু'ধারে প্লেন পল তোলা থাম আছে। কি নাসিক, কি অজন্তা সব জায়গাতেই দেখ্‌লুম যে, এই থামগুলো পুরাকালের মিস্ত্রীরা ঠিক্ মত তৈরী করতে পারে নি; কারণ, এই থামের অনেকগুলিই ভেঙে গেছে—তবে আশ্চর্য্য এই যে, থাম ভাঙা সত্ত্বেও 'সিলিং'-এর কোন ক্ষতি হয় নি। 'আর্কিওলজিক্যাল' বিভাগ থেকে এই সমস্ত থাম মেরামত করে রাখা হয়েছে। অজন্তা গুহাকে যে সমস্ত চিত্রকলার জন্য বৌদ্ধগুহা বলা হয়, তার অনেকগুলি চিত্রকলাই নাসিকে ও এলিক্যান্‌টায় আছে; তবে ওই দু'টি স্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নেই—পরিবর্ত্তে নাসিকে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আর এলিফ্যান্‌টায় হর-পার্ব্বতীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আছে। আমার মনে হয়, এক জাতীয় মিস্ত্রীই এই সমস্ত গুহাগুলি ভিন্ন ভিন্ন যুগে তৈরী করতো; তাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে যে রকম কারুকার্য্য আস্‌তো, তারা তাই করতো। কেবল বৌদ্ধদের দ্বারা যে সমস্ত গুহা তৈরী হতো, তাদের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি এবং হিন্দুদের দ্বারা যে সবগুলি তৈরী, তার মধ্যে হর-পার্ব্বতী, অর্দ্ধনারীশ্বর, পঞ্চপাণ্ডব ইত্যাদির মূর্ত্তি বসান হতো। কাজেকাজেই হিন্দু এবং বৌদ্ধগুহা চিত্রগুলি অনেকাংশে একই রকম হয়েছে।

অজন্তার উনত্রিশটি গুহা দেখে শেষ করতে বেলা প্রায় একটা হলো। এরকম করে অনাহারে অনিদ্রায় এক-একদিনে দেখ্‌বার জিনিষ বোধ হয় এগুলি নয়; কারণ, আসল কথা—আমার এগুলো তেমন ভাল লাগ্‌লো না। কোলকাতায় বসে যখন এগুলোর কথা মনে হতো, তখন দেখার ইচ্ছা হতো দারুণ; কিন্তু আসল জায়গায় গিয়ে যেন কেমন বিতৃষ্ণা আসে। এ যেন পাগলের খেয়াল। ঢিবির ওপর ঢিবি দেখে, ইঁদুরের মত কুরে কুরে কে কবে গুহা তৈরী করে গিয়েছিল, এখন সেগুলো অন্ধকারে, লোকালয়-হীন পাহাড়ের ওপর ভূতের বাড়ী হয়ে পড়ে আছে। এ দেখে আমার কিই বা লাভ, জ্ঞানই বা এমন কি বাড়বে? তবে সাবধান, এ কথাটা জনান্তিকে বল্‌লুম। যে সব আর্টিষ্টরা কোলকাতায় পাখার নীচে বসে বসে অজন্তার ছাপানো ছবি দেখে 'ওরিয়েণ্টাল আর্টে'র একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েছেন, তাঁরা কিন্তু এ সব শুন্‌তে পেলে আমাকে একদম্ ফাঁসী দেবেন—অবশ্য পত্রিকার স্তম্ভে।

অজন্তার গুহাগুলি দেখে বেরোবার সময় 'জঠরবাবু' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। আর্ট দেখে তিনি যেন দারুণ বিরক্ত হয়েছেন—তখন তবু অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রয়াসী। কিন্তু অন্ন-ব্যঞ্জন এখানে মেলে না। আমাদের ট্যাক্সী ড্রাইভার দয়াপরবশ হয়ে আমাদের গাড়ীখানা ফরদ্‌পুর দিয়ে ঘুরিয়ে নিলেন।

ফরদ্‌পুর অজন্তা গুহা থেকে ক্রোশ দুয়েক দূরে। এটি একটি ছোট সহর। অজন্তাবাসীদের যা' কিছু আবশ্যকীয় জিনিষ, সমস্তই এই ফরদ্‌পুর থেকে যায়।

ফরদ্‌পুরের এক হোটেলে এসে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে ছাগমাংস সহযোগে ভাত খেয়ে আবার যখন গাড়ীতে উঠলুম, বেলা তখন প্রায় তিনটে। অজন্তায় ঘুরতে ঘুরতে এখানকার গুহা শিল্পীদের ওপর আমাদের যে বিরক্তি হয়েছিল, পেটে ভাত পড়ে এখন সেটা অনেকাংশে কমে গেল।...পাহুর ষ্টেশনে যখন আবার ফিরে এলুম, তখন বেলা প্রায় চারটে।

পাহুর থেকে পচোরায় ফেরার উপযুক্ত গাড়ী ছিল রাত্রি সাতটার সময়। ওই গাড়ীতে চড়ে যখন পচোরা জংসনে ফিরে এলুম, তখন রাত্রি প্রায় ন'টা।

পচোরা থেকে সাঁচী যাওয়ার ভারী সুবিধা। বোম্বাই থেকে কোল্‌কাতা ও দিল্লী যাওয়ার গাড়ী একই লাইন থেকে যাত্রা করে এবং ইটার্সি জংসন হয়ে এই দু'খানা গাড়ী দু'টি ভিন্ন ভিন্ন লাইনে চলে যায়। কাজেই কোলকাতা বোম্বায়ের টিকিটে আমাদের ইটার্সি পর্য্যন্ত চল্‌বে। ইটার্সি থেকে সাঁচী মাত্র নব্বুই মাইল। ওই নব্বুই মাইলের

যাতায়াত টিকিট কাট্‌লেই কোলকাতা যাত্রীর সাঁচী যাওয়া চলে। এই সমস্ত ভেবে-চিন্তে এগারটার সময় পচোরা জংসন থেকে বোম্বাই-পাঞ্জাব মেলে চড়ে বসা গেল।

সেদিন রাত্রে যা' ঘুম হয়েছিল, তা' স্মরণীয়। পরদিন বেলা সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠে দেখি, ট্রেণটা দারুণ জোরে মধ্যভারতের পাহাড়ী জায়গার ওপর দিয়ে ছুটছে। জান্‌লা খুল্‌তেই জানুয়ারীর প্রাতঃসূর্য্য এসে আমাদের গাড়ীর মধ্যে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে গেল—সেই সঙ্গে খানিকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং অভদ্র হাওয়াও বটে। আমরা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিলুম। হায়দ্রাবাদের রাজত্ব ছেড়ে আমরা এবার ভূপালের রাজ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছি। ভূপাল জংসনের কয়েকটা ষ্টেশন পরেই সাঁচী। সাঁচীর তিনমাইল পরেই ভিল্‌সা। সাঁচী ছোট ষ্টেশন বলে এখানে মেল দাঁড়ায় না; তবে যেমন ইলোরা রোড ষ্টেশনে দরকার হলে ডাউন গাড়ী দাঁড় করান যায়, তেমনি সাঁচীতেও প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী থাক্‌লে এক মিনিটের জন্য গাড়ীটা দাঁড়ায়। বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ বম্বে-পাঞ্জাব মেল আমাদের সাঁচী ষ্টেশনে নাবিয়ে দিলে।

সাঁচী একটি ছোট গ্রামের নাম। এটা না কি প্রাচীন বিদিশার রাজধানী। একসময় এখানে বৌদ্ধদেরই খুব বেশীরকম প্রাদুর্ভাব ছিল। বৌদ্ধেরাই এই দেশে বড় বড় স্তূপ তৈরী করে সেই স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য বৌদ্ধ অর্হাদের শরীরের অংশ বিশেষকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। এইরূপ স্তূপের জন্যই সাঁচীর নাম—এই স্তূপ-গুলিকে সাহেবেরা 'ভিল্‌সা টোপ' ব'লে (স্তূপ শব্দের অপ-ভ্রংশ টোপ) অভিহিত করে।

সাঁচী ষ্টেশন থেকেই সব চেয়ে বড় যে স্তূপটি (অর্থাৎ, যার জন্য সাঁচী বিখ্যাত) সেইটি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সাঁচী ষ্টেশনের ধারে ডাক্‌বাংলো আছে; কিন্তু অনর্থক ডাকবাংলোর ভাড়া দিয়ে কোনো লাভ নেই বলে মাল-পত্রগুলি ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মা করে দিয়ে দু'জনে মিলে হাঁটতে সুরু কর্‌লুম। সাঁচী স্তূপ ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে দেশীয় 'গাইড' সব ষ্টেশনেই পাওয়া যায়। তাদেরই প্যান্ট-কোটপরা একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে পড়লুম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সকালের রোদ্দুরটি বেশ ভাল লাগ্‌ছিল। এদিকে গরম গরম পুরী পেটে পড়ার দরুণ হাঁট্‌তেও বেশ ভাল লাগ্‌ছিল। ভাড়া বাঁচিয়ে ফেলে পদব্রজেই রওনা দিলুম—এদিকে 'রেস্ত'ও তখন অনেক কমে এসেছে।

ষ্টেশন থেকে সাঁচী স্তূপ এক মাইলেরও কম। স্তূপটি একটি পাহাড়ের ওপর স্থাপিত। কিন্তু পাহাড় সে নামে—তাকে একটা উঁচু টিপি বল্‌লেও চলে। অজন্তা পাহাড়ের চেয়ে একে নীচু বলে মনে হলো।

রেল ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাইনে একটি বড় পুকুর পাওয়া যায়। 'গাইডে'র মুখে শুন্‌লুম, এই পুকুরটা না কি প্রাচীন কালের। পুকুরে নাব্‌বার সিঁড়ির ধাপগুলো অত্যন্ত ক্ষয়ে গেছে। 'গাইড' বল্‌লে—এই যে পাথরের ধাপ, এ সব ওই স্তূপ যখন তৈরী হয়েছে, তখনকার জিনিষ। পুষ্করিণীর জল কিন্তু পুরনো পুকুর বলে যতটা নোংরা হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেকাংশে পরিষ্কারই ছিল।

পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। এই মোড় পার হওয়ার পরই সাঁচী পাহাড় এবং তার অসংখ্য স্তূপ সমস্তটাই একসঙ্গে চোখে পড়ে। 'গাইডে'র কাছে শুন্‌লুম, এখানে মোটের ওপর উনত্রিশটি স্তূপ আছে—তার মধ্যে মাঝখানের স্তূপই সব চেয়ে বড়; পাশের গুলি তুলনায় অনেক ছোট।

পুকুরের ধার থেকেই পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি সুরু হলো। কিন্তু এই সমস্ত সিঁড়িকে ঠিক্ সিঁড়ি বলা যায় না—এ যেন পাথর বাঁধানো চড়াইয়ের রাস্তা—এত চওড়া এবং নীচু এর এক-একটি ধাপ। 'প্লেন' থাক্‌লে এর ওপর দিয়ে অনায়াসে টাঙা বা মোটর বেশ চলে যেতে পারতো।

ক্রমে ক্রমে আমরা সাঁচী পাহাড়ের ওপর উঠ্‌লুম। পাহাড়ী রাস্তার আশপাশে কলা ও নোনা গাছ প্রচুর। রাস্তার ধারে ধারে এক এক জায়গায় প্রচুর ঢাক্‌ফুল; এ ছাড়া গাছপালা বড় একটা নেই। এ যেন অনেকটা

মরুভূমি। সূর্য্যের আলোয় সমস্ত জায়গাটা ধুধু করছে এবং দূরে দূরে অসংখ্য স্তূপ।

এইখানেই সাঁচীর গণ্ডগ্রাম। পাহাড়ী রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে দূরে জংলী বাঁশ এবং ঝাউপাতা দিয়ে ছাওয়া এ দেশের অধিবাসীদের ঘর। গরু, ছাগল এবং মানুষ একই ঘরে বাস করে। দূরে দূরে, ক্ষেতে বোধ হয় ওদের চাষ-আবাদ ইত্যাদি আছে। ওদের বুড়োবুড়ী এবং ছেলেরা সাঁচী স্তূপের পথে বসে ভিক্ষে করে দু'-এক পয়সা যা' পায়, তাই ওদের সম্পত্তি। এই সব অঞ্চলে এসে ঘুরলে বোঝা যায়—ভারতবর্ষে প্রত্যেকের গড়ে দৈনিক দু'আনা আয় কেমন করে সম্ভব হয়।

ষ্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সাঁচীর বড় স্তূপ। এই স্তূপটি সাঁচী পাহাড় নামক টিবির ঠিক্ মাঝখানে এবং সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। স্তূপটি প্রকাণ্ড উঁচু—স্তূপের চতুর্দ্দিকে ছ' সাত ফুট উঁচু করে পাথরের বেড়া। এই বেড়াগুলি 'প্লেন' লাল পাথরের তৈরী। এই বেড়ার চারদিকে চারটি গেট আছে—এই গেট চারটির ওপর নানারকম ছবি তক্ষণ শিল্পের (fresco) সাহায্যে অঙ্কিত আছে।* এগুলিকেই সাঁচী রেলিং-চিত্র বলে। এই ছবিতেই জাতকের অনেকগুলি গল্প না কি আঁকা আছে।

স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং-এর চারদিকে এইরূপ চারটি গেট আছে—গেটের মুখে মুখে স্তূপে ওঠ্‌বার উপযুক্ত চারটি সিঁড়ি আছে; এই সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা ওঠার পর একটা গোল রাস্তায় যাওয়া যায়। এই গোলাকার রাস্তাটি স্তূপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে আছে—ওইটাই ছিল ভক্তদের প্রদক্ষিণ করার পথ—ওই পরিক্রমা ধরে এখনও বৌদ্ধ-ভক্তেরা পর্ব্ব-উপলক্ষে প্রদক্ষিণ করে।

---

* সাঁচীর রেলিংগুলি অবিকল বৌদ্ধ-গয়ার মন্দিরের রেলিং-এর মত। এই রেলিং-এর কতকাংশ কোলকাতা মিউজিয়মের একতলায় প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকস্থ ঘরে রক্ষিত আছে। বেলগেছিয়া পরেশনাথের বাগানে পার্শ্বনাথের মন্দিরে যাবার জন্য যে চারটি গেট্ তৈরী হয়েছে, সেগুলি অবিকল এই সাঁচী গেটের অনুকরণে নির্ম্মিত।

স্তূপের ওপর একটি ছোট বাক্সর মত পাথরের ঘর আছে। ঘরটি আন্দাজ তিন ফুট, চতুষ্কোণ ও খাড়াই; বাক্সের ওপর একটি গোলাকার পাথরের ছাতা আছে। ওই ছাতার নীচে যে পাথরের ঘর বা বাক্স আছে, ওরই মধ্যে না কি একটি শ্বেতপাথরের ঝাঁপি (বাক্সর) মধ্যে বুদ্ধদেবের কর্ত্তন দন্ত রক্ষিত ছিল। ওই দাঁতটিকে ভাল-ভাবে রক্ষা করার জন্যই এই বিরাট্ আয়োজন। স্তূপের সিঁড়ির ধারে ধারে ছোট ছোট পাথরের বেদী আছে। বোধ হয় ওই সব বেদীর ওপর ভক্তেরা বসে বুদ্ধদেবের ধ্যান করতেন। যাই হোক্, এখন ওই স্তূপই কেবল আছে; কারণ, পাথরের ঝাঁপি সমেত বুদ্ধদেবের দাঁতটিকে বৌদ্ধেরা এখান থেকে সরিয়ে এনে সারনাথের 'মূল গন্ধকুটী বিহারে'র বেদীর নীচে একটি ছোট ঘর করে সেই ঘরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করছে। বহুদিন পূর্ব্বে যখন আমরা সারনাথ গিয়েছিলুম, তখন ওই কথা সারনাথেই শুনে এসেছিলুম।

বুদ্ধদেবের স্তূপের দু'পাশে আরো দু'টি স্তূপ খুব কাছাকাছি আছে। ওই দু'টি বুদ্ধদেবের স্তূপ অপেক্ষা অনেক ছোট এবং নীচু। ওই দু'টিতে বুদ্ধদেবের দু'জন বড় ভক্ত 'সারিপুত্ত' ও 'মহামোগ্‌গলান'-এর দেহের অংশ বিশেষ রক্ষিত আছে।

কয়েকটি স্তূপ দেখার পর আমরা মন্দির ও বিহার দেখ্‌তে গেলাম। মন্দির ও বিহারগুলি বড় স্তূপের দুই পাশে ও প্রায় পাঁচ শ' গজ দূরে পেছন দিকে অবস্থিত। মন্দির অর্থে একখানি বড় ঘর ভাঙাচোরা অবস্থায় কয়েকটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ভগ্নাবশেষ যা' কিছু আছে, সব তা'তেই 'ফ্রেস্‌কো'র কাজ পাওয়া যায়।

সাঁচীতে যে কয়েকটি স্তূপ ও বিহার আছে, সেগুলি সবই পাথর ও ইটের তৈরী। স্থানে স্থানে এক এক জায়গায় ভাঙা আছে বলে ইট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইটগুলি অত্যন্ত ছোট, পাথরগুলি বড় বড়। ছোট জায়গায় ইট দিয়ে ভরাট করা হয়েছে; বড় জায়গায় সারি সারি পাথর বসান। উনত্রিশটি স্তূপের মধ্যে অধিকাংশই ছোট; কেবল বুদ্ধদেবের স্তূপটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং পেছনের আর একটি স্তূপও কথঞ্চিৎ বড় আছে।

এখানকার বিহার অর্থে বড় হলঘর। ঘরের মধ্যে একদিকে বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি এবং হলঘরের আশ-পাশে দু'-একটি গর্ভ-গৃহ অর্থাৎ, খুপরী আছে। এই সব খুপ্‌রীতে বোধ হয় বৌদ্ধ-গুরুগণ বাস করতেন।

সাঁচীতেও এক দুই করে স্তূপের নম্বর দেওয়া আছে। দু' নম্বর মন্দিরের পেছনে যে দু' নম্বরের স্তূপ আছে, সেই স্তূপের ধারে একটা বড় পাথরের বাটী দেখ্‌লুম। বাটীটি অন্ততঃ পক্ষে ছয় হাত বহরের এবং তার মধ্যে অন্যূন পাঁচ ছয়টি মানুষ স্বচ্ছন্দে বসে থাক্‌তে পারে। 'গাইডে'র কাছে শুনলুম, ওই বাটীতে প্রসাদ তৈরী করে পুরাকালে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এ বিষয়ে দেখ্‌ছি প্রাচীনকালীন লোকেদের একই রকম ব্যবস্থা ছিল। আজমীরে তারাগড় পাহাড়ের ওপর মুসলমানদের একটি ডেকৃচি দেখেছিলাম—সেটিও এইরূপ প্রকাণ্ড বড়। আগ্রা ফোর্টে এইরূপ বড় একটি পাথরের বাটী দেওয়ানী-আমের সাম্‌নের উঠানে আজও পর্য্যন্ত পড়ে আছে। সেকালের লোকেরা বোধ হয় ছোট ছোট বাটী পছন্দ করত না—ভ্রাতৃভাব সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে এক বাটী থেকে সকলকে খেতে হবে এইরূপ উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এত বড় বড় হাঁড়ী বা বাটী তৈরী করা হতো।

সাঁচী স্তূপ থেকে আধ মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড় আছে—সেটাকে নাগাউরী পাহাড় বলে। ওই পর্ব্বতে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখনও ওই মঠে বাস করেন।

কথায় কথায় প্রবন্ধ অনেক বড় হলো। সংক্ষেপে সারবার জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও এটা কেমন যেন শেষ হতে আর চায় না। তবুও অনেক সৌভাগ্য যে, এই সব ঐতিহাসিক স্থানের ইতিহাস আমি তেমন কিছু জানি না। ইতিহাস জানা থাক্‌লে এর মধ্যে সেই সব জ্ঞানের কসরৎ এসে পড়তই—ফলে ভ্রমণ-কাহিনীটি একে-বারেই অপাঠ্য হয়ে উঠতো।

সাঁচী স্তূপ থেকে ষ্টেশনে ফিরে আস্‌তে বেলা প্রায় একটা হলো। এখানে আর ভাতের কোনো সুবিধে হলো না। স্ত্রী কিন্তু এতে তেমন বিরক্ত হলেন না; কারণ, আজ আমাদের উপস্থিত ভ্রমণ শেষ হলো—এবার বাড়ীর দিকে ফেরা হবে। অবশ্য এই লাইনেই সাঁচী থেকে দেড় শ' দু শ' মাইলের মধ্যে বিখ্যাত খাজুরাহো এবং গোয়ালিয়র আছে। সাঁচীতে যারা আসে, তারা এই সব দেখেই ফেরে। কিন্তু আমাদের তেমন উৎসাহ নেই; কারণ, গোয়ালিয়র আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ঘুরে গিয়েছি—আর খাজুরাহো যাতায়াতের না আছে পয়সা, না সময়, না উৎসাহ। শরীরও ক্রমে অপটু হয়ে পড়ছে।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় পাঞ্জাব বম্বে মেলকে সাঁচীতে এক মিনিটের জন্যে দাঁড় করিয়ে তাইতেই ওঠা গেল। রাত্রি সাড়ে এগারটা, বারটা নাগাদ ইটার্সি জংসনে এসে নাম্‌লুম। কোলকাতায় যাবার বম্বে মেল ইটার্সিতে আসে সকাল দশটার সময়—কাজেই সেদিন রাত্রিতে ষ্টেশনেই কাটালুম। ইটার্সি ষ্টেশনের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওয়েটিং-রুমে দিব্য বিছানা করে শুয়ে ঘুম দেওয়া গেল।

পরদিন সকালে ষ্টেশনেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের রদ্দুরে খানিকটা সময় কাটিয়ে স্নানাহার সেরে গাড়ীতে উঠলুম বেলা দশটার সময়। সন্ধ্যার পর মোগল-সরাই ষ্টেশনে আহারাদি সেরে নিয়ে আর একটা ঘুমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে হাওড়ায় এসে উপস্থিত হলুম।

বাইরে বাইরে ক'দিন বেশ ছিলুম। বাড়ী ফিরতে মনে একটু আনন্দ হলো—কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন যেন দুঃখও হয়। আবার যে কবে বেরুব, তার ঠিক্ নেই। কতদিন যে কোলকাতার জেলখানায় একঘেয়ে রুটিন-অনুযায়ী কাজ করতে হবে, তা' একমাত্র ভগবানই জানেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজাও বাজাও শঙ্খ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মলয় যখন বাড়ী ফিরে এল, তখন তার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। অনেক আঘাত না পেলে এরকম হয় না। আঘাত সে পেয়েছে বই কি। এস্প্লানেড্ বুকষ্টলে কাগজখানায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তার লেখাটা—কিন্তু নেই, কোথাও নেই! তার ওপর কাগজওয়ালা ছাতুখোরটাও কি না সকলকার সাম্নে অপমান কর্‌লে তাকে—এই বাবু, কাহে ঝামেলা কর্‌তা হ্যায়; লেগা, না কেয়া?

কিন্তু সে যাক্—লেখাটা যে ওঠে নি, এইটেই তার কাছে বড় পরাজয়। কেন, তার লেখা কী ওঠ্‌বার যোগ্য হয় নি? না হয় সে গ্র্যাজুয়েটই নয়, না হয় সে কুমারীই নয়, কিন্তু তাই বলে কে বল্লে যে, সে প্রতিভাহীন? থাক্‌তে পারে না কী তার মধ্যে মহৎ গুণ? পেতে পারে না কী সেই একদিন নোবেল প্রাইজ? কেন, য়ুনিভারসিটির শীর্ষ-স্থান অধিকার না কর্‌লে কী হওয়া যায় না লেখক? রবীন্দ্রনাথ ক'টা পাশ করেছেন? শরৎচন্দ্র, সত্যেন দত্ত, নজরুল ইস্‌লাম, রাইডার হ্যাগার্ড, হল কেন, টলষ্টয়, জন মেস্‌ফিল্ড, আলফ্রেড নোয়েস, বার্ণাড শ, ইয়েট্‌স্, বোরণসন্, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁরা কে ক'জন য়ুনিভারসিটির কৃতী ছাত্র? হায়, সাধে কী বলে বাংলাদেশ!

সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌লো। তার ছোট ভাই তের বছরের ছেলে রবি তখন হারমোনিয়াম বাগিয়ে গান ধরেছে—

কেন, এসে ফিরে গেলে সজনী,
মোর, মিছে ক'রে দিলে রজনী?

গানের ভাষা শুনেই পিত্তি জ্বলে উঠ্‌লো মলয়ের। আগুনে যেন ঘিয়ের ছিটে পড়্‌লো। সমস্ত রাগটা ফেলে দিলে ওই ছোট ভাইটার ওপরেই। ছুটে গিয়ে 'গদাম' করে সে একটা কিল্ মার্‌লে তার পিঠে। বিরাশী সিক্কার কিল্।—বাঁদর ছেলে! দু'দিন বাদে তোর পরীক্ষা, আর গান আর গান!...তাও ওই অশ্লীল গান!...তোকে হারমোনিয়াম ছুঁতে কে বলেছে শুয়ার? বল্, বল্, কে বলেছে।—তার কাণে আচ্ছা করে প্যাঁচ লাগালে।

রবি প্রথমটায় একটু ধোঁয়া দেখ্‌লে। তারপরই বলে উঠ্‌লো—সারাদিন তো আমি পড়্‌ছি।

—পড়্‌ছিস্? কী পড়্‌ছিস্? পড়লে অঙ্কে পনের পাস্? ওই পড়া?

ক্ষীণস্বরে রবি প্রতিবাদ তুল্‌লো—পনের আমি পাই নি।

এবার চড় তার গালে।—পনের পাস্ নি? পনের পাস্ নি? কত পেয়েছিস্ তবে? একশ'র মধ্যে দু'শ', না তিনশ'? আবার মিথ্যে কথা...আন তোর 'প্রগ্‌রেস্ রিপোর্ট'—আমি হেড-মাষ্টারকে চিঠি লিখ্‌বো···লিখ্‌বোই আজ...লিখ্‌বোই।

মলয় চীৎকার ক'রে ঘুরপাক খেয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো।

মা এসে পড়্‌লেন গণ্ডগোলের মাঝখানে।—কী, হয়েছে? হয়েছে কী তোমাদের? তাঁর স্বরে উৎকণ্ঠার ভাব।

রবি সাহস করে বলে ফেল্লে—দাদার পচা লেখা ওঠে নি ব'লে আমায় মার্‌ছে মা—দেখো না, দেখো না।

মলয় খিঁচিয়ে উঠ্‌লো:—আমার লেখা ওঠে নি তোকে আমি বল্‌তে গেছ্‌লুম? লেখা আমার ওঠাবে না কোন্ সম্পাদক? তারা বোঝে কী লেখার?...নিজের চরকায় তেল দে দিকি বাঁদর।

মলয় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মা ছুটে এসে মলয়েক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন—তোর লেখা ওঠে নি ব'লে তুই-ই বা মার্‌বি কেন ওকে শুনি? ও তার জন্যে দায়ী?...ও কী করেছে তোর?

—কী করেছে? বাঘের মতো মলয়ের চোখ জ্বলে উঠলো।—তুমি জানো ও কী করেছে? এই সব গান ওর মত ছেলে গাইবে? ওর টেবিলটা হাঁট্‌কে দেখেছ?

দেখেছ—ক'খানা নভেল আছে ? এই ছেলেকে তুমি আদর দিয়ে বাঁদর তৈরী করছো ? ওকে আমি মেরে খুন ক'রে ফেল্‌বো তা' জানো !

—ওইটুকু ছেলেকে মেরে খুন করতে সকলেই তো পারে—তা'তে আর বাহাদুরী কী তোর ?...তুই-ই বা নিজে কী, জিগ্যেস্ করি ? দু' বছর তো আই-এ ফেল করলি ! লজ্জা করে না পদ্য লিখ্‌তে ? লজ্জা করে না পরের দোষ দেখ্‌তে ?

—তুমি তো বল্‌বেই ও কথা ! কিন্তু তুমিই বা ওকে শাসন কচ্ছ কই ? যত দোষ নন্দ ঘোষেরই, নয় ? ও আজ অশ্লীল টপ্পা গাইবে—কাল বিড়ি টান্‌বে—পরশু বাবার বাক্স ভাঙ্‌বে ! তা' বেশ ! আমার দরকার কী ? করুক্, করুক্—কিন্তু দেখ্‌বো, কে ওকে প্রমোশন দিতে যায়।

মলয় নিজের ঘরে ঢুকে গেল। রবি কেঁদে উঠ্‌লো। —আমি কোনো বছর ফেল করি নি ওর মত।

মলয় আবার তেড়ে মারতে এল।—খবরদার মা, ওকে থামাও, তা' না হলে ও মারা যাবে আজ !

মা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন।—আমি তোমাদের এ সব ঝগড়া শুন্‌তে চাই না বাপু...কর্ত্তা আসুন। মা কাজে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হ'তেই মলয় পড়তে বস্‌লো—কিন্তু পড়বেই বা কী সে ? দু' বছর ফেল হ'য়ে আর পড়ার উৎসাহই বা কোথা' ? টেবিল থেকে তো নির্ব্বাসিত করেছে সে তার অর্দ্ধেক পাঠ্য পুস্তক। এখন সেখানে স্থান লাভ করেছে—শরৎচন্দ্র, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমাঙ্কুর, অচিন্ত্য, আরো অচিন্তনীয় অনেক নিষিদ্ধ পুস্তক। সে দু'-চারখানা বই ঘাঁটলে।...কিন্তু এগুলো আর ভাল লাগে না। সে এখন পরের লেখা আর কেন পড়বে ? সে তো নিজেই স্রষ্টা ! সৃষ্টি করবে সাহিত্য !...পরকে পড়াবে।

সে লিখ্‌তে লাগ্‌লো কবিতা—ছোট কবিতা। তার-পর টেনে আন্‌লে তার অর্দ্ধ-লিখিত উপন্যাস—'অশনি-শিখা।'—সেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে রমলা, তার সঙ্গে সিনেমায় 'মিট্' করবার কথা আছে প্রণবের।

প্রণব আসবে না...আসবে তার বন্ধু নলিনী। রমলার সঙ্গে হবে ভাব। রমলা তার সঙ্গে বিলাত যাবে। অথচ প্রণব...বেচারা প্রণব...দেশের কাজে জেল খেটে মরবে ! বন্ধুও যাবে রমলাকে ছেড়ে। শেষে রমলা...অনেক কথা !...উপস্থিত কী হবে সে লিখ্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ কখন তার বাবা শীতলবাবু পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেটা তার খেয়াল ছিল না। শীতলবাবু উকিল—আলিপুর জজ কোর্টের। সম্প্রতি তিনি মক্কেলহীন হ'য়ে পড়েছেন। সেজন্যে মেজাদটা তাঁর হ'য়ে পড়েছে বড্ড খিট্‌খিটে। আর, তার ওপর এই ছেলে—মলয় ! তার ওপর খুবই চটে উঠ্‌লেন। খালি কবিতা আর কবিতা !...পড়্‌বার নাম-গন্ধও নেই ! কলেজের অধ্যাপক-দের পেট মোটা কচ্ছেন, আর ছেলে হয়ে আস্‌ছেন ফেল্ ! ...এতে কী কম রাগ ধরে ! আজকালকার ছেলেদের মানুষ করার পেছনে টাকার যে কী তাণ্ডব শ্রাদ্ধ তা' তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন—অথচ, ছেলের সেদিকে খেয়াল নেই। রাত দুটো তিনটে পর্য্যন্ত ঘরে আলো জ্বলছে, আর ছেলে লিখ্‌ছেন কি না গান, গল্প, উপন্যাস—যেগুলো বাংলাদেশের ছোকরাগুলোকে ম্যালেরিয়া রোগের মতো জাপটে ধরে পঙ্গু করে তুলেছে।...এ সমস্ত লিখেই বা লাভ কী হবে ? সেই তো একদিন কলম পিষ্‌তেই হবে ! সেই তো একদিন অফিসের দোরে দোরে 'নো ভেকান্সী' দেখে বেড়াতে হবে ! সাহিত্যিক হয়ে বাংলাদেশে ক'জন খেতে পায় ? তার চেয়ে পড়্ না বাবা মন দিয়ে—যদি বি-এটা পাশ করতে পারিস্, তবু কাজের হবে ! তখন বড়লোক শ্বশুর পাকড়ালে বিলেত-টিলেত ঘুরে আস্‌তে পারিস্। অন্ততঃ, একটা হিল্লে তো হবেই। বাবার আর স্বর্গে কী বাতি দিবি ?

তিনি রেগে উঠ্‌লেন—প্রচণ্ড ভাবে রেগে উঠ্‌লেন। কী হচ্ছে কী তোমার ?—তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠলো বজ্রের ধ্বনি।

মলয় চম্‌কে উঠ্‌লো—যেন ভূত দেখেছে ! হাতের কলমটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়েই 'ইণ্টারমিডিয়েট সিলেক্‌সান'খানা টান্‌বার জন্যে হাত বাড়ালে। কিন্তু

যেখানা টান্‌লে, সেখানা 'সিলেক্‌সান' নয়—শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন ।'

এবার শীতলবাবু পিতলের মত গরম হ'য়ে উঠ্‌লেন।—সর্ব্বনাশ। চরিত্রহীন···চরিত্রহীন !—এইখানা কি তোর পড়্‌বার বই হতভাগা? তিনি বন্দী সিংহের মত উগ্র হ'য়ে উঠ্‌লেন।—এর জন্যে আমি মাইনে দিয়ে পড়াচ্ছি তোকে ?·· এর জন্যে আমি মক্কেলদের দোরে দোরে ঘুর্‌ছি·· ও রে হারামজাদা...

তিনি রাগে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মলয়ের টেবিল আক্রমণ ক'র্‌লেন এবং নিমেষে বইগুলো 'ছত্রখান' ক'রে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। মলয়ের 'অশনি-শিখা' উপন্যাসখানা টান্‌ মেরে এককোণে ছুঁড়ে ফেল্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে পাতা থেকে বেরিয়ে এল একটা ফটো—মেয়েছেলের ফটো !

এখানে ফটোটার একটু 'রেফারেন্স' দেওয়া দরকার। এ মূর্ত্তিটি হচ্ছে মলয়ের বান্ধবীর। মধুপুরে তারা একবার বেড়াতে গেছ্‌লো। সেইখানে মলয়ের সঙ্গে মেয়েটার হয় ভাব। বড়লোকের মেয়ে। বাপ মা নেই। মামার কাছে মানুষ। মামা হচ্ছেন—সৌরেন গাঙ্গুলী। বালীগঞ্জে থাকেন। ডাক্তারী করেন। আসলে কিন্তু মস্ত বড় ঔপন্যাসিক। তিনি না কি আবার 'ট্রাজিডি' লেখেন না। বলেন—বাংলাদেশ তো কেঁদেই আছে। বোষ্টমদের কেত্তনের জ্বালায় তো টেঁকাই দায়। তার চেয়ে পাঠক-পাঠিকারা হাস্‌তে শিখুক। একজন সাহেব না কি ব'লে গেছেন—বাংলাদেশ হাস্‌তে জানে না...তা' তাঁর কথা মিথ্যা হোক্‌। যাক্‌, সেই মামার ভাগ্নীর সঙ্গে তার ভাব। এখনো চিঠি-পত্র চলে—অবশ্য কলেজের ঠিকানাতে। দু'জন দু'জনকে···

শীতলবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। এই ছেলের মধ্যে এতো !···মলয়ের মা এলেন।

—ও গো, দেখো, দেখো, কী সর্ব্বনাশ ! মেয়েছেলের ফটো দেখো তোমার ছেলের বইয়ে···

শীতলবাবু কাতরাতে লাগ্‌লেন। মায়ের চোখে পলক পড়্‌লো না। তিনি ফটোটা তুলে নিয়ে বহুক্ষণ দেখ্‌লেন ; তাঁরপর বলে উঠলেন—এ আহুতি না ?

—আহুতি কে ? শীতলবাবুর গলা দিয়ে সন্দেহের স্বর বেরুলো।

—সেই যে মধুপুরে আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌তো ; যার মামা সেই ডাক্তার !—মা বল্‌লেন।

—বেড়াতে...বেড়াতে আস্‌তো তো কী হবে ? শীতলবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—তার ফটো ও পেলে কোথায় ?

ছেলের দিকে তিনি চাইলেন। চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঝরে পড়্‌ছিলো।.. ছেলে উত্তর দিলে না। কম্পমান··· ঘর্ম্মমান ছেলে।

শীতলবাবু যেন হঠাৎ মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লেন। মলয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন—বেরো হারামজাদা !···বেরিয়ে যা' ! চরিত্রহীন পড়ে ওই চরিত্রহীন হয়েছিস ? বাপের হোটেলে খুব মজা, না ? বেরো··· বেরো শীগ্‌গির···

তাকে ধাক্কা দিয়ে তিনি ঘর থেকে বার ক'রে দিলেন। মা এগিয়ে আস্‌ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তার সেই কাল-বৈশাখী মূর্ত্তি দেখে বিশেষ সাহস পেলেন না। মলয় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

শীতলবাবুর গোঁ ভীষণ। তিনি পিঠে তার এক চড় মার্‌লেন।—শুয়ার ! এতদূর তোমার অধঃপতন হয়েছে ! দাঁড়িয়ে আছ কি ?···যাও·· শীগ্‌গির···যাও···আমি এ চরিত্রহীনকে বাড়ীতে রাখ্‌বো না—কিছুতেই না। তিনি রাগে দিশেহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন।

মলয় আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। সত্যিই তো বিচার কোথায় ! সে নিজের অপমান সইতে পারে, কিন্তু কেমন ক'রে সইবে প্রেমের অপমান ? তা' ছাড়া, সে সাহিত্যিক। জীবনে এখন পেতে হবে তাকে অনেক দুঃখ —অনেক অপমান—অনেক দারিদ্র্য। সে তো চায়ই ওই। য়ুরোপের বড় বড় সাহিত্যিক পেয়ে গেছেন কত লাঞ্ছনা, কি বিরাট দুঃখ ! টলষ্টয়ের কথা, গর্কীর কথা, ভিক্টর হুগোর কথা তার মনে পড়্‌লো। তাঁরা মানব-জীবনকে তো শান্তি দিয়ে গেছেন—কিন্তু নিজের জীবনকে করেছেন কতখানি দুর্ব্বহ ! তার মধ্যেই তো ছিল তাঁদের গৌরব ! এই তো চায় সে। এই তো আকাশের সম্মুখীন হবার

তার সুবর্ণ সুযোগ—এই তো জগৎকে দেখ্‌বার তার দুঃসাহসিকতা। সে আজ মিশ্‌বে পথের ধূলার সঙ্গে—মিশ্‌বে জনমানবের সঙ্গে, মিশ্‌বে হিমের সঙ্গে। তার অভিজ্ঞতা পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে—তার সঞ্চয় স্ফীত হবে—তার মানবতা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

সে 'টপ্‌' করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো।···পেছনে শুনতে পাওয়া গেল মা যেন ডাকছেন, কিন্তু সে আর ফিরলে না।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগ্‌লো অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত। ক্ষুধাও তার পেলে। কিন্তু কী করবে সে? পকেটে নেই পয়সা। 'হাঙ্গার' পড়েছে। তারি নায়কের মতো ক্ষুধা সে জয় করলে। কিন্তু ঘুমকে জয় করা সহজ নয়। সে বাড়ীর কাছাকাছি একটা বাজারে এসে আলুওয়ালার পাশে গুটিসুটি মেরে চুপ্‌চাপ্‌ শুয়ে পড়্‌লো। ভাব্‌লে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মতো তারও জীবনে আস্‌বে কালকের উষার সঙ্গে নূতন উষা—নূতন জীবন—নূতন জগৎ!···সে ঘুমিয়ে পড়্‌লো।

যখন জাগ্‌লো, তখন দেখে ভোর—আলুওয়ালা তাকে আবিষ্কার করে পুলিসের হাতে দিতে যাচ্ছে।··রাজ্যের লোক জমা হয়েছে। সকলের চোখেই তীব্র সন্দেহের দৃষ্টি। সর্ব্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত! মলয়ের গর্ব্ব, ভিক্টর মাথায় উঠ্‌লো। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি', শেষে সেই দশা। পুলিস প্রশ্ন করলে—তোমারা নাম কেয়া হায়? তোমরা বাবাকা নাম কেয়া হায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মলয় উত্তর দিয়ে আর শেষ করতে পারে না। অবশেষে একটা চেনা লোক এসে সনাক্ত করলে। মলয় ছাড়া পেলে।

সঙ্গে সঙ্গে শীতলবাবু এসে পড়্‌লেন। উকিলবাবুর ছেলে ব'লে কে তাঁকে ইতঃপূর্ব্বেই সু-সংবাদটী জানিয়ে দিয়েছেন। শীতলবাবু বাস্তবিকই এখন শীতল। কোনো কিছু বল্‌লেন না; মলয়ের হাত ধরে বাড়ী নিয়ে এলেন।

মায়ের চোখের জল তখনো থামে নি। রাত্রি থেকে তিনি অন্নজল ত্যাগ করেছেন। কর্ত্তাকে অনেক পীড়ন করেছেন—হ্যাঁ গা, দোষের কাজটা কি করেছে ছেলে? না হয় আহুতির ফটোই রেখেছিলো, তাই ব'লে তুমি তাড়িয়ে দিলে অতবড় ছেলেকে? আহুতির সঙ্গে না হয় বিয়েই দিও না।

কর্ত্তা শেষের দিকে নীরবই ছিলেন। ছেলে এনে দিয়ে এখন তিনি গম্ভীরভাবে অন্যদিকে প্রস্থান করলেন।

তারপর প্রায় মাস ছয়েক গেল।—একরকম নির্ঝঞ্ঝাটেই।

একদিন পাশের খবর বেরুলো। কে একটী বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেল মলয়কে। মলয়ের এটা দরকার ছিল না; তবু যখন দিয়ে গেল, তখন যেতেই হবে—গেলও।

ছেলেদের চিংড়িহাটা ঠেলে আবিষ্কার করলে তার রোল নম্বর, রেজিষ্টার্ড নম্বর। কিন্তু এ কী! সেই···সেই নীল পেন্সিলের ক্রশ। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না। সে মাথা ঘুরে বসে পড়্‌লো। তার ইচ্ছা হলো—একবার শ্যামাপ্রসাদের পায়ে গিয়ে মাথা খোঁড়ে—প্রসাদ ভিক্ষা করে বলে—ও গো নিষ্ঠুর, ও গো তরুণ ভাইস্‌চ্যান্সেলার, এখনো তোমার দয়া হলো না একজন সত্যিকারের আর্টিষ্টের ওপর? সে না হয় তোমার আশ্রয়ে এসেছিল; কিন্তু তাই ব'লে তাকে তিনবার—তিনবারই ফেল করিয়ে দিতে হবে?

পরিচিত বন্ধুদের এড়িয়ে সে হেদোয় চলে এল।···একটা বেঞ্চে গম্ভীর হয়ে বসে পড়লো।

প্রভাত মুখুয্যের না কার একটা গল্প তার মনে পড়্‌ল।···ঠিক্‌ এই রকমই একটা ছেলে ফেল করে হেদোর বেঞ্চে বসে কাঁদছিলো। একজন বৃদ্ধ তার প্রতি দয়ালু হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—চলো আমার বাড়ী। সে গেল। বৃদ্ধ তাঁর মেয়েকে ডাক্‌লেন—আঠার-উনিশ বছরের অবিবাহিতা সুন্দরী মেয়ে। তারপর ছেলেটীকে তার

মাষ্টার নিযুক্ত করে দিলেন।···ছেলেটী কবি—তার বই-টইও ছাপিয়ে দিলেন।···কী চমৎকার তার জীবন!

কিন্তু তার মতো ভাগ্যবান সে কী? বৃদ্ধের উদ্দেশে মলয় চারধারে তাকালো। কিন্তু নেই—নেই আজ কাছে-পিঠে কোনো বৃদ্ধ। ভগবানের কি লীলা! মানুষ যা' আশা করে, ভগবান ঠিক্ তার উল্‌টো করেন। তা' না হ'লে বৃদ্ধগুলোও কী না 'রেড্ ইণ্ডিয়ান'দের মতো আজ অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সে কপালে একটা চপেটাঘাত করলে। দুত্তোর, জীবনের কাঁথায় আগুন! এত গুণ, এত প্রতিভা তার নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে শুধু গরীব হয়েই। তা' না হলে সে য়ুনিভারসিটিতে অর্থকরী বিদ্যা শিখ্‌তে আসবে কেন? অর্থকরী নয় তো কী! এ শিক্ষায় কি আছে? কালিদাস বলে গেছেন—'দারিদ্রদোষে গুণরাশিনাশী।' চমৎকার কথা! সে যদি আজ রবি ঠাকুরের বংশেও জন্মগ্রহণ করতো, তবু ঘুচ্‌তো তার অর্থকষ্ট! সেও ছাপাতো চোদ্দ বছর বয়সে বই—সেও যেত বিলাত—সেও গড়তো 'শান্তি-নিকেতন'—একসঙ্গে পড়াতো ছেলেমেয়েদের—দেখিয়ে দিতো য়ুনিভারসিটিকে!

রাগে দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছা হলো। হ্যাঁ, মরেই সে যাবে। দরকার নেই এ পোড়া দেশে বেঁচে। আর বাবার কাছে মুখই বা দেখাবে কী ক'রে? বাবা চান্ পাশ—তিনি চান ডিগ্রী। না, সে পারবে না—পারবে না এ মিথ্যাচার সইতে! অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য! সে মরে যাবে—বাংলা সাহিত্যের বুকে রেখে যাবে ব্যর্থতার দুরপনেয় কলঙ্ক! কিন্তু কেমন ক'রে মরবে? সেনগুপ্ত, বা সি, আর, দাশের মতো তো তার পুণ্য নেই। সে পারবে না সেরকম! কিন্তু সহজেই পারবে বিষ খেতে...সহজেই পারবে 'দেবদাসে'র মতো মরতে। 'দেবদাসে'র ছিল 'পার্ব্বতী'—তার আছে—আহুতি। সে আজ রাত্রিতেই আহুতির বাড়ী গিয়ে মরবে।

বিষ! এখন বিষ চাই!···সে উঠ্‌লো। চেনাশোনা ডাক্তারখানা না হ'লে বিষ কেনার সুবিধা হবে না। তাকে যেতে হলো তাই বাড়ীর দিকেই—পাড়ার ডাক্তারখানার পরিচিত কম্পাউণ্ডারের কাছে।

কম্পাউণ্ডার তখন ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ করতে যাচ্ছেন। রাত্রি সাড়ে দশটা বাজে। মলয় ডাক্‌লো—শচীনবাবু।

—কী খবর? বলুন।

—বিষ আছে—বিষ?

—বিষ! বিস্ময়ের সুরে শচীনবাবু বল্‌লেন—কেন?

—দরকার আছে...দিন দিকি আট আনার···এমন বিষ দেবেন, যা' খেলে খুব সহজেই মরা যায়, বুঝ্‌লেন?

শচীনবাবু থমকে দাঁড়ালেন।—আজকে আপনাদের পাশের খবর বেরিয়েছে, না?

—হ্যাঁ, বেরিয়েছে, তা' কি হবে? মলয়ের মুখ বিরক্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো।—দিন, দিন, তাড়াতাড়ি দিন্।

কোথায় খাবেন?···লেকে না কি?—শচীনবাবু আড়ালে চোখ টিপে বল্লেন।

—আঃ, কেন বকাচ্ছেন!...দেবেন কি না বলুন?

—দোবো বই কি! আটগণ্ডা পয়সা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শচীনবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপর পনের মিনিট পরে বাইরে এসে এক কুচো শাল পাতায় মোড়া কী একটা জিনিষ দিলেন মলয়ের হাতে। বল্‌লেন—দেখ্‌বেন, আমার নাম-গন্ধ কিন্তু করবেন না। আর হ্যাঁ, শুনুন, মরা খুবই সহজ হবে এটা খেলে—তবে একটা নিয়ম আছে···

—বলুন।

—এটা খেলে অন্ততঃ পাঁচঘণ্টা পরে মৃত্যু হবে··· খেয়েই ঘুমিয়ে পড়তে হবে আপনাকে—জেগে থাকলে চলবে না। তারপর যখন জাগবেন, দেখ্‌বেন একটা নূতন রাজস্ব।···চারধারে ইন্দ্রকানন···রূপোলী ঝর্ণা ব'য়ে যাচ্ছে...দেবতারা অমৃত পান করছেন—কীর্ত্তন হচ্ছে··· আরো কত কী!..

শচীনবাবু নিজের কবিত্বে নিজেই হেসে উঠ্‌লেন।

মলয় বল্‌লে—বটে! আপনি তা' হ'লে দেখে এসেছেন বলুন! আচ্ছা...নমস্কার।

সে বিষটা পকেটে ফেলে চল্‌তে সুরু করলে। হঠাৎ

পথে দেখা কেষ্টার সঙ্গে। কেষ্টা মলয়দের বাড়ীর 'পুরাতন ভৃত্য।'

—কী রে, কোথায় যাচ্ছিস এত রাত্তিরে?

—আজ্ঞে বাবু, আপনেকে খুঁজ্‌তি যাচ্ছি...মা বল্‌ছেন কুতা গেছে ছেলে...কুতা গেছে ছেলে...

—যাক্‌, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভালই হয়েছে... শোন্‌।

মলয় তাকে নিয়ে একটা রকে বস্‌লো। পকেট থেকে খানিকটা কাগজ ও এক টুক্‌রো পেন্সিল বার ক'রে সে বাবাকে চিঠি লিখ্‌তে লাগ্‌লো—

বাবা,

আমি আজ রাত্রিতে মারা যাব। বিষ কিনেছি। সেটা খাব ৪৮।৴, গড়িয়াহাটা রোডে গিয়ে। ফেল ক'রে আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নেই। ওইখানেই মরা ভালো। আহুতি দেখ্‌বে...দেখ্‌বে বই কি! বেঁচে থাক্‌লে ওকে আমি বিয়ে কর্‌তুম।...তুমি যখন যাবে, তখন আমি পরলোকে। আমার শেষ প্রণাম নিয়ো, মাকে জানিয়ো। ইতি...

চিঠিখানা কেষ্টার হাতে দিয়ে মলয় বল্‌লে—তুই কোন্‌ ঠাকুরকে বেশী মানিস্‌ বল্‌ দেখি?

কেষ্টা কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে—আজ্ঞে কালীকে।

—কালীকে! ব্যাটা আমার কালীভক্ত!...আচ্ছা, নে ...পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিয়ে মলয় তাকে বল্‌লে—তোকে একটা কাজ কর্‌তে হবে...কালীর নামে শপথ কর।

কেষ্টা টাকা পেয়ে তাই কর্‌লে। মলয় বল্‌লে—এই চিঠিখানা বাবাকে দিবি, কিন্তু এখন নয়—কাল সকালে, বুঝ্‌লি? বাবাকে বল্‌বি কি জানিস?...বল্‌বি, বাবুর এক বন্ধু এসে দিয়ে গেল। ব্যস্‌...পার্‌বি ঠিক?

—হ্যাঁ বাবু, খুব পার্‌বো; কিন্তু এখন গিয়ে কী বল্‌বো?

—বল্‌বি কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না তাকে।

কেষ্টা দাঁত বার করে হাস্‌তে লাগ্‌লো। মলয় বল্‌লে—বল দেখি কী বল্‌লুম সব?

কেষ্টা চালাক আছে; সমস্ত বল্‌লে। মলয় বল্‌লে—আচ্ছা যা'।

তাকে বিদায় দিয়ে সে চল্‌লো—গড়িয়াহাটা রোডে। কাছে পয়সা আছে, তবু সে হেঁটেই চল্‌লো। আজ জন্মের মতো সে দেখে নেবে পথ, প্রান্তর, পৃথিবী, আকাশ!...

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সে থাম্‌লো। বড় বাড়ী—বাগান-ওয়ালা নিস্তব্ধ বাড়ী। আগেও দু'-চারবার এসেছে। মামা তার লেখার তারিফ্‌ করেছেন। তখন এসেছিলো সে অতিথি হয়ে, আজ এসেছে...! কাউকে কিছু বল্‌বে না—শুধু লিখ্‌বে একখানা চিঠি। জানাবে—সে নিজে আত্মহত্যা করেছে। জানাবে—সে আহুতিকে ভাল-বাস্‌ত। বুকের ওপর পিন দিয়ে চিঠিখানা জামার ওপর গেঁথে রেখে দেবে। কাল সকালে সকলে দেখ্‌বে...দেখ্‌বে পুলিস—দেখ্‌বেন মামা—দেখবেন মামী—আর বিশেষ ক'রে দেখ্‌বে আহুতি! তাকে ছেড়ে যেতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

সে লিখ্‌লে চিঠি। নিঃশব্দে পাঁচিল টপ্‌কালে। তারপর একটা কামিনী গাছের তলায় গিয়ে 'ঝুপ্‌সি' মেরে চোরের মতো শুয়ে পড়্‌লো। বিষটা খেয়ে নিলে—মিষ্টি বিষ। ব্যস্‌ ...আর কী! এইবার সব শেষ! 'ঘুমের দেশে ভাঙিবে ঘুম, উঠিবে কলস্বর।'

রাত্রি তখন তিনটে। সৌরেনবাবু বিছানা থেকে জেগে উঠ্‌লেন। তাঁর খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় পড়্‌লো ধাক্কা—বাবু, বাবু, ডাকু আয়া হায়... ডাকু!—দরোয়ানের স্বর কম্পিত!

—ডাকু কী রে?—সৌরেনবাবু চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

—দেখিয়ে না বাবু!

—সে কি! সৌরেনবাবু 'চট্‌' ক'রে দরজাটা খুলে বাইরে এলেন। পেছনে মামীমা অমিতা দেবীও জেগে উঠেছিলেন ইতঃপূর্ব্বে। তিনি বড্ড ভীতু! চোরের নাম শুন্‌লেই তাঁর হৃদকম্প হতো।...স্বামীর হাতটা একেবারে

চেপে ধরে চীৎকার ক'রে উঠলেন—ও গো, তুমি যেয়ো না, যেও না।

—যাব না মানে? চোর…চোর…দাঁড়াও ধরি। এই ভজুয়া, কাঁহা হায়?

—বাবু, বাগানমে শোরাহা।

—সে কী রে? রিভালবার—রিভালবারটা কই? সৌরেনবাবু অস্থির হয়ে উঠ্লেন।

পাশের ঘরে আহুতি ঘুমুচ্ছিল। সেও গোলমালে জেগে উঠেছে। ভয়-কম্পিত দুরুদুরু বুকে মামার কাছে এল। বহ্বারম্ভে চোরের কাছে যাওয়া হলো। মলয় তখন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। সৌরেনবাবু 'টর্চ্চ' ফেল্লেন।

—এ কী, এ যে মলয়!

—মলয়! আহুতি চম্‌কে উঠ্লো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মলয়! সৌরেনবাবু জোর দিয়ে বল্লেন। —কিন্তু এখানে কেন, এ চিঠি কিসের…বুকে গাঁথা রয়েছে?

চিঠিটা টেনে নিয়ে পড়লেন। লেখা আছে এই—আহুতি, আমি যাচ্ছি…অনেক জ্বালা সয়েই যাচ্ছি। তোমার ওপর কোন রাগ নেই। খুব ভালবাসতুম তোমায়। ইচ্ছা ছিল, তোমায় বিয়ে ক'রে সুখী হবো—কিন্তু তা' আর এ জন্মে হলো কই? আমি বিষ খেয়েছি। মৃত্যুকালে তোমার বাড়ীই আমার কাছে পবিত্র বলে মনে হলো—তাই এখানে মরতে এলুম…দুঃখ করো না। ইতি—মলয়।

চিঠি প'ড়ে সৌরেনবাবুর মুখ শাদা হ'য়ে উঠ্লো। কী আশ্চর্য্য! কী সাংঘাতিক! কিন্তু দম্‌লেন না। তিনি নিজে ডাক্তার। পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। দেখ্লেন দিব্যি ঘুমুচ্ছে। এক টুকরো শালপাতা প'ড়ে আছে। গন্ধ নিয়ে বুঝ্লেন—এটা সিদ্ধি কিংবা মদনানন্দ মোদক। জয় বাবা মদনানন্দ!…তিনি পত্নীর দিকে ফিরলেন। বল্লেন—নাও, চোরকে ঘরে তোলো…ও রে আহুতি, তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি ছিল! ধন্য মেয়ে তুই! আজকালকার এ দিব্যি উপন্যাস দেখছি যে!

আহুতির লজ্জায় কথা বেরুলো না। ছি… ছি…

সৌরেনবাবু হেসে উঠ্লেন। খুব চাল চেলেছ ছোকরা!

সকাল সাতটার সময় সৌরেনবাবুর বাড়ীর দরজায় এসে একটা মোটর থাম্‌লো। তা' থেকে নাম্‌লেন, শীতলবাবু…তাঁর পরিবার। উভয়ের কি অবস্থা হয়েছে তা' পাঠক-পাঠিকারা বুঝ্তেই পারছেন! সারা রাত্রি চক্ষে ঘুম ছিল না একটুও। সুযোগ্য ছেলের জন্যে তাঁরা ভেবে ভেবে খুন হয়েছেন। তারপর সকালে কেষ্টা যখন চিঠিখানা দিলে, তখন তাঁদের অবস্থা অনুমানেই ধ'রে নিন্ না। মায়ের ফিট্ হ'য়ে গেল…কর্ত্তা কেঁদে উঠ্লেন।…তারপর এই তো হাওয়ার বেগে আস্‌ছেন। আগে থাকৃতেই সৌরেনবাবু তৈরীই ছিলেন। আসুন, আসুন, বলে অভ্যর্থনা লাগিয়ে দিলেন। শীতলবাবু কেঁদে উঠ্লেন। মা আরো জোরে…

—ও কী, কাঁদছেন কেন? সৌরেনবাবু অভয় দিলেন—সে তো সুস্থ শরীরে ওপরে বসে আছে…দেখ্বেন আসুন না।

পতি-পত্নী কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। এও কি সম্ভব! তাঁরা মাছের মত চেয়ে রইলেন।

ওপরে উঠে দেখ্লেন—মূর্ত্তিমান সত্যই ব'সে আছে—সাম্‌নে চায়ের কাপ। তা' হ'লে আছে! বেঁচে আছে! …এইটেই যথেষ্ট! বাপ-মা হুমড়ি খেয়ে মলয়ের ওপর এসে পড়্লেন।

খানিকটা পরেই আবহাওয়াটা বেশ সহজ হ'য়ে এল। শীতলবাবু গিন্নীর ইঙ্গিতে সৌরেনবাবুর দুটো হাত চেপে ধরলেন।—আমার একটু অনুরোধ রাখ্তেই হবে আপনাকে—বলুন আপনি রাখ্বেন…

সৌরেনবাবু নিঃশেষিত বর্ম্মা চুরুটটা ফেলে দিয়ে বল্লেন—বিলক্ষণ, সাধ্য থাকলে রাখ্বো বই কি।

আপনার এই ভাগ্নীটিকে আমায় দিয়ে দিতে হবে। বড় চমৎকার মেয়ে! আমার ছেলের সঙ্গে খুব মিল হয়েছে! একটু থেমে আবার বল্‌তে লাগ্লেন—এবার আই-এ

অবশ্য পাশ করেছে ও—ভুলক্রমে নীচেরটা দেখ্‌তে ঠিক্ তাঁর. ওপরের রোল নম্বর দেখে এসে এত বড় বিভ্রাট বাধিয়েছিল। তবু মনে হয়, ও ছেলের আর কিছু লেখা-পড়া হবে না মশায়। একটা চাকরী যোগাড় করেছি··· সেখানেই ঢুকিয়ে দেবো···আপনি বলুন রাজী আছেন কি না?

সৌরেনবাবু গলা ছেড়ে হেসে উঠ্‌লেন।—আমি ত ওর সঙ্গেই বিয়ে দেব ঠিক্‌ই করেছিলুম—এখন আপনি যখন নিজে বল্‌ছেন, তখন আর এর চেয়ে আনন্দের কি আছে! তবে এখনই চাকরীর দরকার কি? পড়ছে, পড়ুক না। গায়ত্রী সরস্বতী কাঁধে চেপেছে যখন, তখন ও সব দুষ্টু সরস্বতী আব তিষ্ঠুতে পার্‌বে না। সব্ ঠিক্ হ'য়ে যাবে।

—তাই হোক্, লেখাপড়া শিখুক, এই ত চাই। দয়া করে—

—ছি···ছি···ও কথা বল্‌বেন না। সৌরেনবাবু উঠে পাশের ঘরে গেলেন। সেখানে মলয় ও আহুতিকে ডাক্‌লেন। দু'জনের হাত এক ক'রে দিয়ে বল্‌লেন—বলো, আমার হৃদয় তোমার হউক···

আহুতি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। মনে মনে বল্‌লে—তোমার মুণ্ডু হউক!

মামা চোখ রাঙিয়ে উঠ্‌লেন।—কী, বল্‌বি না? বল্‌তেই হবে তোকে! বল্।

তিনি আবার দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড করিয়ে দিলেন। অমিতা দেবী খাটের তলা থেকে কচ্ছপের মত মুখ বাড়িয়ে শাঁখ বাজাতে সুরু কর্‌লেন।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মাতৃ-মঙ্গল

শ্রীমতী সুজাতা দেবী

[এ সংখ্যায় আমরা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী রত্নমালা দেবীব 'নারী-প্রগতির ধারা' পত্রস্থ করিলাম। ইহা পুরাতন সুরেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। কিন্তু যে সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই, তাহার আলোচনা করিতে গেলে পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ অনিবার্য্য। সেই কারণেই ইহা প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান শিক্ষা নারী-সমাজেব কল্যাণকর নহে—এ কথা নানা পত্রিকায়, নানাভাবেই পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট কোন পথ কেহই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আশা করি, আগামী সংখ্যায় আমরা এ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য মত ও পথের কথা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইব।

আমি আমার ভগ্নীদের এ বিষয় আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি। যাঁহার লেখায় যুক্তি থাকিবে আমরা সাদরে তাঁহার লেখা প্রকাশ করিব।]

শ্রীমতী সুজাতা দেবী

নারী-প্রগতির ধারা

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী, সাহিত্য-ভারতী

সেকালের সহিত একাল, তুলনায় যেন যুগান্তর বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান জগতে নারীর শিক্ষা-দীক্ষার যে নূতন ধারা আনিয়াছে, তাহার ফলে এখন নারীজাতি অবাধ স্বাধীনতা পাইয়া সকল বিষয়েই পুরুষের সহিত সমান তালেই পা ফেলিয়া চলিয়াছেন। প্রগতির গতিতে তাহারা এখন একাকিনী নির্ভয়ে ট্রাম-বাসে ভ্রমণ করে। সকল কার্য্যে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহে। অন্তঃপুরে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, সন্তান পালন, স্বামী-পুত্রের ও গুরুজনের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়া নারী-জীবনের সার্থকতা বোধ

করে না। এখানকার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায়, কলেজের ডিগ্রিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, শাসন-তন্ত্রে, ব্যায়ামে, নৃত্যগীতে পুরুষের সমকক্ষতা করাই নারী জীবনের চরমোৎকর্ষ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ পথ, এ শিক্ষাধারা আমাদের নারীজাতির জাতীয় জীবনের অনুকূল নহে। যে ভারতের নারী এক দিন সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা নামের মহান্ গৌরবে বিশ্ব-সংসার বিমুগ্ধ করিয়াছিল, এখনও যাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি জগতের বক্ষে জাগ্রত আছে, সে সকল পবিত্র ছবি ক্রমেই নারী-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। নারীর শিক্ষা মানে সংযম। যে শিক্ষায় সংযম নাই, তাহা নারীর শিক্ষা নহে; যে শিক্ষা সংযমহীন, তাহা নারীর পক্ষে কল্যাণকর নহে। শিক্ষা মানে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু যে শিক্ষায় সংযমের বাঁধন নাই, যে শিক্ষা দুর্নীতির পথেই আমাদের টানিয়া লইয়া যায়, তাহা সর্ব্বোতভাবে পরিত্যজ্য। কেন, তাহা একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নারীকে ভগবান জননীর আসনে স্থানদান করিয়াছেন। নারী বিশ্বের জননী, মাতৃত্বেই তাহার পূর্ণ পবিণতি। নারী যতই বিদুষী বা বিদ্যাবতী হউক না, ভগবান তাহাকে জননীরূপে সৃষ্টি করিয়া বাৎসল্য, স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা দিয়াই তাহার হৃদয় গঠিত করিয়াছেন। নারী যদি তাহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া বিপরীত পথে চলে, তাহা হইলে কখনই সমাজের কল্যাণ হইবে না—হইতে পারে না। এ শিক্ষা সৃষ্টি করে না—ধ্বংস করে। আজ যেদিকেই চাহিয়া দেখি—বিলাসিতার প্রবল স্রোত প্রবাহিত। দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় নারী সমাজ উন্মত্ত। মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে যে, তাহারা পণ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টিরক্ষার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি। তাহাদের দায়ীত্ব পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহাদের সংযমের উপর, নিষ্ঠার উপর, জাতির ভালমন্দ নির্ভর করে। কেন না, সু-মাতা হইতেই সৎপুত্রের উদ্ভব হয়। নারীরা যদি অর্জ্জুনের মত, অভিমন্যুর মত, কর্ণের মত মহারথী পুত্রলাভ করিতে চাহে, তবে কুন্তীর মত, ভদ্রার মত, দ্রৌপদীর মত জননী হইতে হইবে। নারীর অবাধ স্বাধীনতার ফলে নারী-প্রগতির অকল্যাণই সাধিত হইতেছে। মনে রাখিও যে, যাহা আমাদের নারী-সমাজকে চঞ্চল করে, বহির্মুখ করে, বিলাসপরায়না করে, সে শিক্ষায় নারী-সমাজের মঙ্গল সুদূরপরাহত।

আমাদের দেশের নারী-সমাজের উপরই দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করিতেছে। যাহাদের ভবিষ্যতে জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তাহাদের ধর্ম্ম-প্রাণাও হইতে হইবে—কেন না, ধর্ম্মই মানব-জীবনের মূল ভিত্তি। ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে বহু বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। আদর্শ জননী হইতে আদর্শ সন্তান জন্মগ্রহণ করে—জননীর শিক্ষা-দীক্ষাতেই সন্তান মহান্ হইয়া থাকে। আজকালকার জননীরা প্রায়ই সন্তান পালনের দায়ীত্ব লইতে চাহে না—দাসদাসী, আয়াকেই শিশু-পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। শুধু সন্তানদিগের উত্তম আহারে (!) সুন্দর বেশভূষায় সাজাইয়া, যাহা নিজেরা ভালবাসে, তাহাই তাহাদের ভালবাসিতে শিখায়—না শিখিলে হতাশায় নিশ্বাস ফেলিতে ছাড়ে না। সংযমের মূল্য কত, তাহা বুঝে না বলিয়াই ছেলেদেরও বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করে না—ফলে, অকালে নব-কিশলয়গুলি ঝরিয়া পড়ে দেখিয়া হা-হুতাশ করিয়া মরে। বড় জোর বা কলিকালের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা পায়। অবিশ্বাস করা শাস্ত্র, প্রয়োজনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বলে—শাস্ত্রেই ত আছে কলির লোকের পরমায়ু হইবে অত্যল্প, ইত্যাদি।

বুঝিতে হইবে, পিতামাতার অনুকরণেই সন্তানদিগের প্রকৃতি গঠিত হয়। সন্তান যদি ধর্ম্মহীন, নীতিজ্ঞানহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়, সে দোষ পিতামাতার—কেন না, তাহারা নিজে সংযমী মিতাচারী না হইলে তাহাদের সন্তান-সন্ততিও সংযমী মিতাচারী হইতে পারে না। এখনকার নারী-প্রগতির যে ধারা চলিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে স্বেচ্ছাচারিতার উপাসনা—তাহা কখনই আমাদের জাতীয় জীবনের মঙ্গলকর নহে। ইহাতে কোনদিন কোন দেশের, কোন নারীরই কল্যাণ হইতে পারে না।

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ

বাঙ্‌লা-সাহিত্য ক্ষেত্রে এ যুগে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় যেমন এক বিরাট বিস্ময়, তখনকার কালে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবও তদপেক্ষা অল্প বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রাক্‌-বঙ্কিমযুগের বহু সাহিত্যিক এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে দুইজন,—অক্ষয়চন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র,—তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যের মরাগাঙে স্রোতের প্রবাহ আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর অকস্মাৎ যেন সেই স্বল্পস্রোতা তটিনী সকলকে চমকিত করিয়া কুলুকুলু রবে উদ্দামবেগে সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ যে বাঙ্‌লা ভাষায় উপন্যাস রচনা করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে সকলকে নিস্প্রভ করিয়া যে অপূর্ব্ব উপন্যাস সমূহ লিখিতে সুরু করিলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে বাঙ্‌লার প্রথম ও প্রধান ঔপন্যাসিক বলিয়া সাদরে অভিনন্দিত করিল। প্রকৃত উপন্যাস যে কি, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহা আমাদিগকে প্রথম দেখাইলেন। তাঁহার উপন্যাস পাঠ করিয়া বাঙালী প্রথম বুঝিতে শিখিল, বাঙ্‌লা ভাষা কত সমৃদ্ধিশালিনী, সাহিত্যের ক্ষেত্র কত সুবিস্তৃত ও কী বিরাট সম্ভাবনার বীজ তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে! কী সে অপূর্ব্ব ভাষা, অপ্রকাশিতপূর্ব্ব ভাব, লিখিবার কী অভিনব ভঙ্গী! তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া কী কাহারও উপায় ছিল? তাই এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য!" সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে যেন সহসা পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতবহুল ভাষা ছিল, বিশেষ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বোধগম্য; সাধারণ অল্প শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে তাহার রসগ্রহণ সহজসাধ্য ছিল না। প্যারীচাঁদের ভাষা ছিল ইহার বিপরীত; সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য সাধারণ্যে ব্যবহৃত সহজবোধ্য চলতি বাঙ্‌লায় তিনিই প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তজ্জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে তাঁহাকে বিদ্রূপও লাভ করিতে হইয়াছিল যথেষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতানুসারিণী সাগরী ভাষা ও চলতি আলালী ভাষার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া বঙ্গবাণীকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিলেন ও সুশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত নির্ব্বিশেষে আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য লাভ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-জগতে সহসা যেন এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন; বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে তিনি উন্নতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিলেন 'এভোলিউশন' বা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া নহে, 'রেভোলিউশন' বা আকস্মিক আমূল পরিবর্ত্তনের দ্বারা।

পাশ্চাত্য মনিষী ভিক্টর হুগো বলিয়াছেন, "সৃষ্টির প্রাচুর্য্য প্রতিভার একটি লক্ষণ।" "প্রলিফিসিটি ইজ্‌ এ সাইন্‌ অফ্‌ জিনিয়াস্‌" এই লক্ষণের দ্বারা বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী সাহিত্যিক এই তথাকথিত উপন্যাস-প্লাবিত, অসংখ্য সাহিত্যিক সমাকীর্ণ বাঙ্‌লা দেশেও খুব অধিক মিলিবে না। তাঁহার প্রতিভায় শুধু যে 'ভার' ছিল তাহা নহে, ধারও ছিল অসাধারণ; অর্থাৎ, তাঁহার সৃষ্টি ছিল যেমন প্রচুর, তেমনি বিচিত্র। উপন্যাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ম্মল হাস্যরসাত্মক লঘু সাহিত্য রচনা পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তিনি দুর্ল্লভ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা যদি এরূপ সর্ব্বতোমুখী নাও হইত, তিনি যদি উপন্যাস কয়খানিই লিখিয়া যাই-

তেন, অথবা যদি সব কয়খানি উপন্যাস না লিখিয়া মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী, 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি প্রধান কয়টিমাত্র উপন্যাসেরই লেখক হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম আজ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। অথচ, তাঁহার উপন্যাসে কোথাও বস্তু-তান্ত্রিকতার অছিলায় কুরুচি অথবা অশ্লীলতার বাষ্পমাত্রও তিনি আমদানী করেন নাই।

তৎকালে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের নাম শুনিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাঁহাদিগকে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করেন।

সাহিত্য-সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধ তপস্বী। যেমন ছিল তাঁহার সাহিত্যে নিষ্ঠা ও সংযম, তেমনি ছিল তাঁহার রসবোধ। সেইজন্যই তাঁহার অপরূপ সাহিত্য-সৃষ্টিতে আমরা শিব ও সুন্দরের দুর্লভ সমন্বয় দেখিতে পাই।

আজ আমাদের সাহিত্যে যে সকল আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ইংরাজ কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়, "দাউ স্বুডেষ্ট বি লিভিং এট্ দিস্ আওয়ার, বেঙ্গল হ্যাথ্ নিড্ অফ্ দি।" হে বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, দেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র, তোমার অভাব যে আমরা আজ মনে প্রাণে অনুভব করিতেছি!

নিজে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীকভাবে জাতীয়তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র আজও হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশবাসীকে জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তাঁহার আকৃতিতেও যেন প্রতিফলিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া একজন নবাগত অপরিচিত ব্যক্তিও বোধ করি বলিয়া দিতে পারিত, লোকটি অসাধারণ ধীমান্, নির্ভীক্ ও তেজস্বী। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের পর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "...দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।"

বঙ্গাব্দ তের শ' সালের এই চৈত্র মাসেই বঙ্গবাণীর বর-পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তর গমন করেন। আজ তাঁহার ত্রিচত্বারিংশৎ মৃত্যু-বর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র-বার্ত্তা

আফ্রিকায় যে লোয়ার জামবেজি ব্রিজ তৈরী হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে তা' হলো দীর্ঘতম।

বিখ্যাত ব্রিজগুলির দৈর্ঘ্য	ফুট
লোয়ার জামবেজি ব্রিজ	১১,৬৫০
টে ব্রিজ (স্কটল্যাণ্ড)	১০,৫২৭
আপার শোন্ ব্রিজ্ (ভারতবর্ষ)	১০,০৫২
ফোর্থ ব্রিজ (স্কটল্যাণ্ড)	৮৩৫০
মহানদী ব্রিজ (ভারতবর্ষ)	৬৯১২
রিয়োস্যাল্যাডো ব্রিজ (আর্জেন্টিনা)	৬৭০৩
গোদাবরী ব্রিজ (ভারতবর্ষ)	৩০৯৭

* * *

আগে যে সব পত্নী মুখরা ও দজ্জাল হতো, তাদের একটা টুলে বসিয়ে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা হতো। তারপর যতক্ষণ না তারা শোধবারে ব'লে প্রতিজ্ঞা করত, ততক্ষণ তাদের জলে চোবান হতো।

* * *

উঁচু কপাল শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। একজন অভিজ্ঞ লোক দেখেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু কপাল আছে এ্যালাসকার এস্কিমোদের।

* * *

চন্দ্রের চেয়ে সূর্য্য ৮০০,০০ গুণ বেশী আলো দেয়।

* * *

চিত্র-জগতের নানা কথা

সঞ্জয়

জোয়ান ক্রফোর্ড-এর বন্ধুত্ব

হলিউড আর্টের দেশ। সেখানে শোয়া, বসা, দাঁড়ান—এমন কি, ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত বোধ করি আর্টে চলে; অর্থাৎ, সব-কিছুরই ভেতর রীতিমত আর্টের গন্ধ পাওয়া যায়। কাজেই আর্ট হিসাবে একজনের বিবাহিত পত্নী আর কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রেম করবে, এ আর এমন বিচিত্র কি? কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে, ও দেশে কারও সঙ্গে কারও বেশী বন্ধুত্ব বা প্রেম করা দেখ্‌লে, ও নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করা হয় না; তবে একেবারেই যে আলোচনা চলে না, সে কথা বলা যায় কি করে? তা' হলে আমরা জান্‌লুমই বা কোথা' থেকে? আসল কথা হচ্ছে এই যে, সেখানে আলোচনা বা পরনিন্দাও করা হয় আর্টিষ্টিকভাবে।

'মেট্রো'র সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী জোয়ান ক্রফোর্ড এবং সু-অভিনেতা ক্লার্ক গেবল্‌-এর বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যে খবর পেয়েছি, আজ মোটামুটি সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবো।

মোটের ওপর এঁদের দু'জনের বন্ধুত্ব বেশ সরল এবং পরস্পরের পক্ষে আনন্দদায়ক। তবে এদের নূতনতম 'লাভ্‌ অন্‌ দি রান্‌' নামক ছবিখানি তোলবার সময় একদিন বন্ধুত্ব ভয়ানক বাঁকা পথে গিয়ে পড়েছিল। তিনি ত আর এদেশের মেয়ে নন্‌—শেষ পর্য্যন্ত প্রায় একেবারে হাতাহাতি হবার উপক্রম। ডিরেক্টার ভান্‌ ডাইক্‌ (Van Dyac) মহাশয় অনেক কষ্টে তাঁদের নিবৃত্ত করেন। এই ব্যাপারে যতটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে, জোয়ানেরই দোষ ছিল বেশী; তাই তিনি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গিয়ে ক্লার্কের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন এবং মৃদু একটু হেসে ক্লার্কও মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বেকার গরম মুহূর্ত্তের কথা ভুলে গিয়ে বোধ করি ভগ্নী-স্নেহেই জোয়ানকে নিজের বুকের ওপর আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করলেন। এক নিমেষেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেল।

এঁদের প্রথম পরিচয় ব্যাপারেও বেশ একটু আর্টের গন্ধ পাওয়া যায়। সে আজ অনেক দিনের কথা—ক্লার্ক সেই সবে কয়েকদিন হলিউডে এসেছেন। একদিন তাঁকে 'কাষ্টিং অফিসে' (Casting office) ডেকে পাঠান হলো এবং জানান হলো—'ডান্স, ফুলস্‌ ডান্স' (Dance, Fools Dance) ছবিতে জোয়ানের নায়করূপে তাঁকে নাব্‌তে হবে। জোয়ান বলেন: "ক্লার্ক তখন এত বেশী লাজুক ছিলেন যে, লজ্জায় তখন তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম থেকেই তাঁকে আমার কেন জানি না বড্ড ভাল লাগ্‌ছিল।"

এই ছবিখানিতে অভিনয় করেই ক্লার্কের খুব নাম বেরিয়ে গেল। ক্লার্ক বলেন: "জোয়ানের সঙ্গে প্রথম দিন সাক্ষাতের পর থেকেই আমাদের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মে গেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, জোয়ান ছবি তোলা ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। কো[illegible] 'এ্যাঙ্গেলে' কি ভাবে দাঁড়ালে ছবি বেশ ভাল উঠবে, [illegible] সমস্ত কথাই তিনি বলে দিয়েছেন।"

পরিচালক ভান ডাইক্‌ (Van Dyac) এঁদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বেশ একটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন: "দু'জনেই সমানদরের অভিনেতা বলেই দু'জনের বন্ধুত্ব এত বেশী। তা' ছাড়া, বোধ করি এর ভেতর মনস্তত্ত্বেরও একটু-আধটু হাত আছে। এঁরা দু'জনেই খুব সাধারণ অভিনেতার পদ থেকে ক্রমশঃ উন্নতি করেছেন এবং দু'জনের অন্তর্নিহিত উচ্চ আশাও তা'তে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমার মনে হয়, এঁদের বন্ধুত্ব তাই এত প্রবল।"

কিন্তু মজার কথা এই যে, 'ড্যান্সিং লেডী' (Dancing Lady) ছবিতে এঁরা দু'জনেই খুব ভাল অভিনয় করে নাম করলেন এবং তার সঙ্গে ফ্রান্কট্‌ টোন্‌ও (Franchot Tone) খুব নাম করলেন। কিন্তু একমাসের মধ্যেই জোয়ান, মিসেস্‌ ফ্রান্কট্‌ টোন্‌ হয়ে গেলেন।

আর্ট ছাড়া আর বলি কি?

গ্রেটা গার্ব্বো বড় কেন ?

অনেকের মতে গ্রেটা চিত্র-জগৎ থেকে অবসর নিয়েছেন। সম্পূর্ণ সত্য না হলেও ব্যাপারটা আংশিক সত্য বলে মনে হয়। প্রায় একবছর আগে 'কুইন ক্রিষ্টিয়ানা'র ভূমিকায় তাঁকে আমরা দেখেছিলুম, আবার দীর্ঘদিন পরে এইবার 'ক্যামিল্' ছবিতে তাঁকে দেখ্‌লুম। 'ক্রিষ্টিয়ানা'র যে রূপ-ছবি তিনি এঁকেছিলেন, তাই-ই শুধু এক বছর কেন, হয় ত পরবর্ত্তী আরো কয়েক বছর দর্শকদের মনে জাগরূক থাকত। কিন্তু তাঁর আধুনিক এবং নবতম ছবি 'ক্যামিল্' বোধ করি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ছবিকেই ছাপিয়ে গিয়েছে। এই ছবিতে তিনি কি রকম উঁচুদরের অভিনয় করেছেন, ঠিক্ ভাষা দিয়ে তা' বোধ হয় প্রকাশ করতে পারব না। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী, হাত নাড়ার ভঙ্গী, চাহনি, মুখ-চোখের ভঙ্গী সবই যেন এক মায়ার সৃষ্টি! চোখে না দেখ্‌লে তা' বুঝি অনুভব করা যায় না।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজাণ্ডার ডুমার 'ক্যামিল্' উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ যেমনি করুণ, তেমনি মনোমদ। গ্রেটার অভিনয় বুঝি তার চেয়েও স্থানে স্থানে মনোরম। তাঁর ভালবাসার পাত্র 'আরণ্ট' (Ardnt) এর পিতার ভূমিকায় লায়োনেল ব্যারিমুরের সঙ্গে একটা ছোট দৃশ্যে তাঁদের দু'জনের অভিনয় যে কোন্ স্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম এবং এ দৃশ্য জীবনে ভুল্‌তে পারব কি না সন্দেহ। গ্রেটার ভালবাসার পাত্র 'আরণ্ট', অর্থাৎ, নায়কের ভূমিকায় রবার্ট টেলারের অভিনয়ও অনবদ্য হয়েছে। তিনিও উৎকৃষ্ট অভিনয় করে ভূমিকাটী প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। মোট কথা, এত ভাল ছবি আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের দেশের নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অন্ততঃ একবার এই ছবিখানি দেখা দরকার বলে মনে করি।

আলিবাবা

চলচ্চিত্র জগতে নূতন যুগের সূচনা করেছে মধু বসু প্রযোজিত 'আলিবাবা' এ কথা আমাদের মান্‌তেই হবে। একমাত্র 'নটীর পূজা'য় ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনয় করেছিলেন; কিন্তু ব্যবসাদারীর দিকে দৃষ্টি রেখে এই প্রথম ছবি তোলা হলো এবং স্বীকার করতেই হবে যে, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। সাধনা বসুর 'মর্জ্জিনা' আমাদের সত্যই মুগ্ধ করেছে। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, শ্রী আছে। অনেকের মধ্যে তা' নাই বল্‌লেও চলে। আমরা ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও মার্জ্জিত রস-সম্পদপূর্ণ অভিনয় দেখ্‌বার আশায় রইলুম। সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় ও ইন্দিরা রায় মন্দ অভিনয় করেন নি। মধু বসুর আব্‌দালাও প্রশংসাযোগ্য। দৃশ্যপট পরিকল্পনা সুন্দর হয়েছে।

সঞ্জয়

সাইকেলে দিল্লী-যাত্রা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীপশুপতি ঘোষ 'বাগবাজার জিম্‌নাসিয়মে'র দুইটী সভ্য গত তেসরা জানুয়ারী সাইকেল-যোগে দিল্লী-অভিমুখে প্রথম 'অল্ ইণ্ডিয়া স্কাউট জাম্বুরী' দেখিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন-মহাশয় তাঁহাদিগকে মাল্যভূষিত করিলে 'জিম্‌নাসিয়মে'র সমুদয় সভ্যবৃন্দ ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ বিদায়-অভিনন্দন দেন। তাঁহারা প্রতিদিন পঞ্চাশ হইতে নব্বুই মাইল সাইকেল চালনা করিয়া উনিশ দিনে দিল্লীতে পৌছান। পথে তাঁহারা বৌদ্ধগয়া, লক্ষ্ণৌ ('অল্ ইণ্ডিয়া ইনডাস্‌ট্রিয়াল্ একজিবিসন্') ফতেপুর সিক্রী প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।

দিল্লীতে তাঁহারা মিঃ জিতেন্দ্রনাথ রায়ের আতিথ্য-গ্রহণ করেন। মিষ্টার ও মিসেস্ রায় বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

এই দুইটী সভ্য চিরদিনই দেশ-ভ্রমণে বিশেষ উৎসাহী। ইঁহারা পূর্ব্বেও দুই-তিনবার সাইকেলে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মিত্র শীঘ্রই সাইকেলে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিবেন।
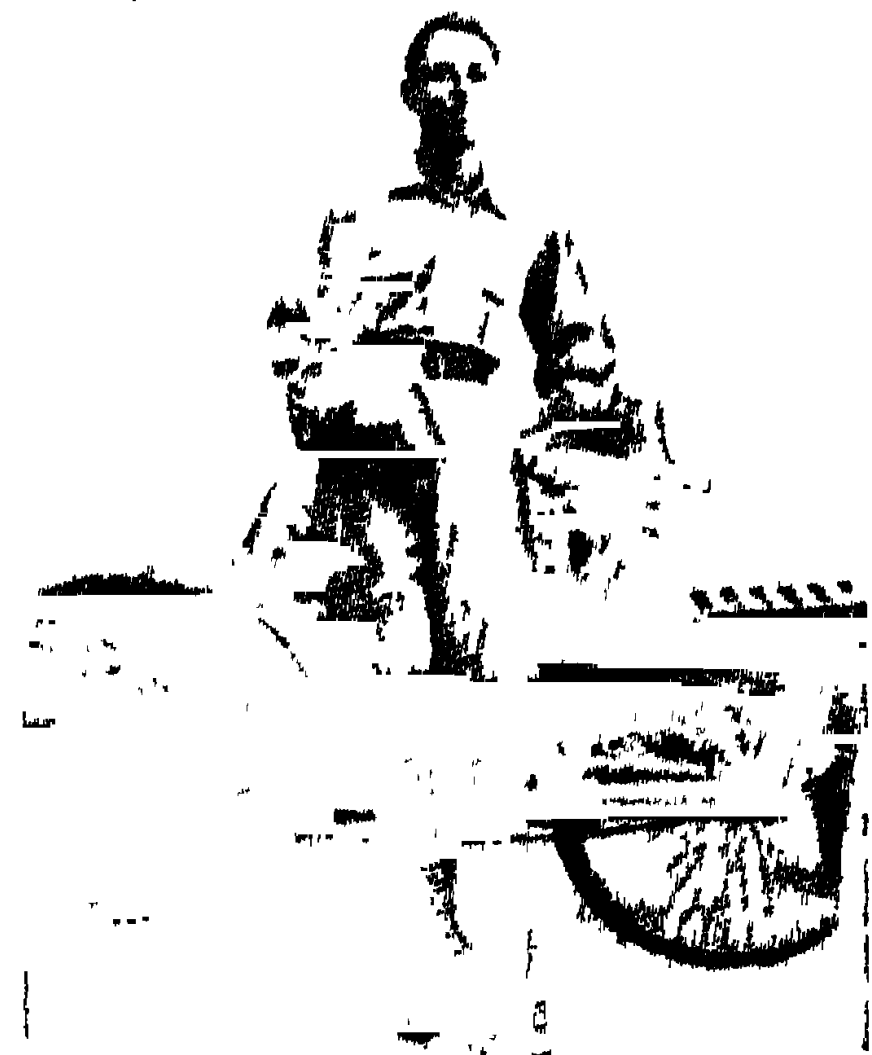
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মিত্র

খেলার কথা

শ্রীব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বৎসরের ন্যায় এবারও অষ্ট্রেলিয়া 'এসেস্' বিজয়ী হইয়াছেন। বারবার দুইবার বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াও এভাবে জয় লাভ করা শুধু অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষেই সম্ভব। ব্রাড্‌মান অধিনায়কের যে অপূর্ব্ব কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বহুদিন ক্রীড়ামোদী দর্শকদিগের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস

ও-দেশের—ছাব্বিশ-এ ফেব্রুয়ারী এডিলেডের প্রান্তরে পঞ্চম টেষ্ট আরম্ভ হয়। খেলা আরম্ভের পূর্ব্বেই দর্শকগণে গ্যালারী ভরিয়া গিয়াছিল। বেলা এগারটার সময় পঁচিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া 'টসে' জয়লাভ করিয়া প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে রিগ্ ও ফিঙ্গলটন 'ওপ্নিং' করেন। ইঁহাদের কেহই ভাল খেলিতে পারেন নাই। রিগ্ আটাশ রান করিবার পর 'আউট' হন্। ইহার পর ব্রাড্‌মান আসিয়া ফিঙ্গলটনের সহিত যোগদান করেন। জলযোগের পরই ফিঙ্গলটন সতের রান করিয়া ভোসের হস্তে 'কট আউট' হইয়া যান। ইহার পর ম্যাক্‌কাব আসিয়া ব্রাডমানের জুটি হইলেন। তাঁহারা দুইজনেই খুব হাত জমাইয়া খেলিতে লাগিলেন। এ্যালেন (ক্যাপ্‌টেন, ইংলণ্ড) এই জুটি ভাঙ্গিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। 'বোলার' পরিবর্ত্তন করিয়া বিভিন্নভাবে মাঠ সাজাইয়া—মোটের উপর তাঁহার আয়ত্তে যত কৌশল ছিল, তাহা প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে ফল ফলিল। তিন শ' তিন রানের মাথায় ভেরিটির বলে ম্যাক্‌কাব এক শ' বার রান করিয়া ফার্ণেসের হাতে 'কট আউট' হইয়া গেলে ব্যাডকক্ ব্রাড-ম্যানের সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে তিন শ' বিয়াল্লিশ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ হইল। ব্রাডমান—এক শ' পঁয়ষট্টি ও ব্যাডকক্ বার রান করিয়া 'নট আউট' রহিয়া গেলেন।

এডিলেডের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রান্তরে দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হয়। পূর্ব্বদিনের 'নট আউট' ব্রাডমান ও ব্যাডকক্ খেলা আরম্ভ করেন। খেলা দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে লোক সকাল হইতে ভীড় করিয়াছিল। খেলা আরম্ভের সময় প্রায় ষাট হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন; পরে তাহা আশী হাজারে দাঁড়ায়। সকলে উদ্-গ্রীব হইয়া ব্রাডমানের দুই শতাধিক রানের আশায় উন্মুখ হইয়াছিলেন। সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে দ্বিতীয় দিনের খেলার সূচনা হয়। কিন্তু হরিষে বিষাদ ঘটিল। ব্রাডমান গতদিনের রানের উপর চার রান যোগ করিয়া ফার্ণেসের বলে দ্বিতীয় 'ওভারে' 'বোল্ড আউট' হইলেন। তখন অষ্ট্রেলিয়া দলের রান উঠিয়াছিল মাত্র তিন শ' ছেচল্লিশ। ব্রাডমানের পর গ্রেগরী যোগদান করিলেন। গ্রেগরী ও ব্যাডকক্ জুটী প্রথমে খুব সতর্কতার সহিত খেলিতে আরম্ভ করেন। গ্রেগরী ও ব্যাডককের সাহচর্য্যে খেলা ক্রমশঃ জমিয়া উঠে। জলযোগের পর ব্যাডকক্ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকেন। তাঁহার খেলা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি যেন ব্রাডমানের নূতনতম অবদান। গ্রেগরী ও ব্যাডকক্ রানের পর রান বাড়াইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যাডকক্ পাঁচ শ' সাত রানের মাথায় এক শ' আঠার রান করিয়া ওয়ার্দিংটনের হস্তে 'কট আউট' হন্। চা পানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া দলের রান উঠে পাঁচ শ' ত্রিশ। (পাঁচ উইকেট) চা পানের পর পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। গ্রেগরী তাঁহার শত রান পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই 'আউট' হন্। তাঁহার খেলা অতীব চমৎকার হইয়াছিল। তিনি আউট হইবার পর ওল্ডফিল্ড একুশ রানে আউট হন্। ও'রিলী মাত্র এক রান করিয়া ভোসের কবলে পড়েন। ইহার পর ফ্লিন্টউডস্মিথ ও ম্যাক্‌কর্মিক খেলা আরম্ভ করেন; কিন্তু সময়াভাবে খেলা বন্ধ করিতে হয়। পর দিন, অর্থাৎ, তৃতীয় দিনে পূর্ব্বদিনকার খেলা আরম্ভ হয়। ম্যাক্‌কর্মিক ও ফ্লিন্টউডস্মিথ খেলা আরম্ভ করেন। তাঁহারা ধীরে ধীরে খেলিতে থাকেন। ঠিক ছ'শ' মিনিটে ছ'শ' রান তুলেন। ইহার চারি রান পরে ফার্ণেসের বলে ফ্লিন্ট-উডস্মিথের 'ষ্টাম্প' উন্মূলিত হয়। ছ'শ' চার রানে অষ্ট্রে-

লিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। শেষ পর্য্যন্ত ম্যাক্‌কর্মিক নট আউট থাকিয়া যান।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হইলে সেইদিনই বেলা বারটার সময় ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে। বার্ণেট ও ওয়ার্দিংটন ব্যাট করিতে নামেন। সকালবেলা এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা বেশ ভাল হইয়াই উঠিয়াছিল। এই মাঠে ইংল্যাণ্ড বেশ রান তুলিতে পারিবে বলিয়া দর্শকদিগের ধারণা ছিল। খেলা আরম্ভ হইবার সময় মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। বার্ণেট ন্যাসের একটি দ্রুত বল মারিতে গেলেন। বল ব্যাট ছুঁইয়া ওল্ডফিল্ডের হস্তে পৌছিল। বার্ণেট 'আউট' হইলেন।

ইহার পর ব্যাট করিতে আসিলেন হার্ডষ্টাফ। তিনি ধীরে-সুস্থে খেলা সুরু করিলেন। ও'রিলী বল দিতে লাগিলেন। জলযোগের পর গ্রীষ্ম খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ন্যাসের বল খুব চমৎকার হইতেছিল। ওয়ার্দিংটন ফিলট-উডস্মিথের বলে একটি 'হুক' করিতে গিয়া আউট হইলেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ দেড়ঘণ্টা ব্যাট করিয়া চুয়াল্লিশ রান করেন। ইহার পর হ্যামণ্ড আসিয়া খেলায় যোগ দিলেন; কিন্তু ভাল করিয়া খেলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই 'আউট' হন্। ইহার পর আসিলেন লেল্যাণ্ড। কিন্তু ও' রিলীর বলে মাত্র সাত রানে তিনি আউট হইলেন। হার্ডষ্টাফ এই বিপর্য্যয়ের মুখে ধীরভাবে খেলিতেছিলেন। ওয়াট আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। উভয়েই বেশ দৃঢ়তার সহিত খেলিতেছিলেন। এই জুটি চুয়াল্লিশ রান করিলে পর ক্ষীণালোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই খেলা বন্ধ করিতে হয়। পরদিন, অর্থাৎ চতুর্থ দিনের খেলায় ওয়াট মাত্র আটত্রিশ রান করিয়া ব্রাডমানের হস্তে আউট হন্। ইহার পর এমস যোগ দেন; কিন্তু তিনিও মাত্র উনিশ রানে ন্যাসের বলে 'বোল্ড আউট' হন্। মোট দু'শ' উনচল্লিশ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

প্রথম ইনিংস শেষ হইলে তখনও অষ্ট্রেলিয়া তিন শ' পঁয়ষট্টি রানে জয়ী থাকায় ইংলণ্ডকে 'ফলো' করাইতে বাধ্য করেন। ইংলণ্ড পক্ষের বার্ণেট ও ওয়ার্দিংটন্ প্রথম খেলা 'ওপ্‌নিং' করেন। কিন্তু তাঁহাদের খেলা আরম্ভ ভাল হয় নাই। ওয়ার্দিংটন্ নয় রানের মাথায় একটী 'ছয়' করিয়া ম্যাক্‌কর্মিকের বলে ব্রাড্‌ম্যানের হস্তে 'কট আউট্' হন্। ইহার পর হার্ডষ্টাফ্ বার্ণেটের সহিত যোগ দেন। কিন্তু কেবলমাত্র এক রান করিয়া ন্যাসের বলে 'বোল্ড আউট' হন্। ইহার পর হ্যামণ্ড ও বার্ণেট খেলিতে থাকেন। বার্ণেট একচল্লিশ রানের মাথায় 'এল্ বি ডব্‌লিউ' হন্। হ্যামণ্ড একাশী মিনিটে তাঁহার নিজস্ব পঞ্চাশ রান করেন। তারপর হ্যামণ্ড ছাপান্ন রান করিয়া ব্রাডমানের হস্তে 'কট আউট' হন্। ওয়াট্ আসিয়া লেল্যাণ্ডের সহিত যোগ দেন। কিন্তু তিনি মাত্র নয় রানে 'রান আউট' হন্। লেল্যাণ্ডও দ্বিতীয় 'ওভারে' ফ্লিণ্ট উডস্মিথের বলে মাক্‌কর্মিকের হস্তে 'কট্ আউট' হয়। সময়াভাবে সেদিন তাঁহাদের খেলা বন্ধ করিতে হয়। পঞ্চম দিন, অর্থাৎ শেষ দিনে পূর্ব্বদিনকার 'নট আউট' ভোস এবং ভেরিটি খেলা আরম্ভ করেন। কিন্তু পূর্ব্ব রানের সহিত এক রানও যোগ করিবার পূর্ব্বেই ফ্লিণ্ট উডস্মিথের বলে দু'জনেই আউট হইয়া যান্। শেষ পর্য্যন্ত ফার্নেস 'নট আউট' থাকিয়া যান।

এক শ' পঁয়ষট্টি রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও দুই শত রানে পরাজিত হইয়াছেন।

এদেশের—'রঞ্জি ট্রফি'র ফাইনাল খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং প্রথম ইনিংসে ভীষণভাবে পরাজিত হ'। এইজন্য 'ফলো অন্' করিতে বাধ্য করিলে তাঁহারা না খেলায় এরিয়ান কুচবিহার কাপ পাইলেন।

হকি

গত বৎসর মোহনবাগান হকি লিগ্ বিজয়ী হইয়াছিলেন। এবৎসর লিগ্ খেলা আরম্ভ হইয়াছে—কিন্তু কে যে লিগ্ বিজয়ী হইবে, তাহা বলা বর্ত্তমানে কঠিন। কেন না, কাষ্টম তিনটী ম্যাচ খেলিয়াছেন—কিন্তু তাহার মধ্যে দুইটী খেলায় হারিয়া গিয়াছেন—একটী খেলায় 'ড্র' করিয়াছেন। রেঞ্জার্স তিনটী খেলিয়াছে, একটীতেও জয়ী হইতে পারেন নাই। মোহনবাগান দু'টী খেলায় জয়ী হইলেও অন্যটীতে 'ড্র' করিয়া বসিয়া আছেন। ভবানীপুরের উপর আশা ছিল, তাঁহারাও সেণ্ট জোসেফের নিকট হারিয়া নিরাশ করিয়াছেন। ক্যালকাটা, ডালহাউসী সমান সমান। তবে বি, জি প্রেস ও মিলিটারী মেডিকেল মন্দ খেলিতেছেন না। আর্ম্মেনিয়ান দ্বিতীয় যাইতেছে। আগামী সংখ্যায় এ বিষয় বিস্তারিত খবর দিব।

শ্রীব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন একজন বিদেশী নিউ ইয়র্কের হাকিমার সহরে নগরবাসীর পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি অস্ত্রধারণের বিরোধী বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়াছে।

বিচারপতি ফ্র্যাঙ্ক জে ক্রেগ্ তাঁহার জবাব-দানকালে বলিয়াছেন—তুমি এখন বা কোনদিনই নগরবাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না; কারণ, এদেশে অস্ত্রধারণে অক্ষম কোন লোকই দেশীয় পদবাচ্য হইতে পারে না। টীকা নিষ্প্রয়োজন!

* * *

আদর্শ প্রেমিক পিটার সফি নামক একটী যুবক পর পর এক শ' ত্রিশটী যুবতীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারে টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। পরে এথেন্সের সালনিকায় সে ধরা পড়িয়াছে। শুনা যায়, সে না কি তাহার সকল প্রণয়িনীরই ফটো লইয়া একখানি 'এল্বাম্' তৈয়ারী করিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে।

* * *

এ বৎসর লণ্ডন শহরে বাঙালী ছাত্রদল সম্মেলিত হইয়া ডাঃ কে, সি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺সরস্বতী-পূজা করেন। এ পূজায় বিশেষ দর্শনীয় এই যে,—প্রাচীন বৈদিক মতে মিঃ বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা নির্ম্মিত সরস্বতীর প্রস্তর মূর্ত্তি। উহা সুসজ্জিত রথে পূজা-মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়।

মিঃ অর্জ্জুন মুখোপাধ্যায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। সযত্ন প্রেরিত গঙ্গাজল পূজায় ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বশেষে বাঙালী ছাত্রদিগের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়।

* * *

মাঞ্চুকুর আন্টাঙ্গ নামক সহরের কোন নাট্যশালায় প্রায় সাতশতজন লোক অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। প্রায় শতাধিক দেহ সিঁড়িতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পথ বন্ধ—গ্যালারী ভাঙ্গিয়া পিঠে পড়িয়াছিল। গণনায় ছ' শ' পঞ্চাশটী দেহ পাওয়া গিয়াছে—ইহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং বালক।

নূতন বৎসর উপলক্ষে একখানি চীনা বই অভিনীত হইতেছিল। শুনা যায়, সেখানে না কি দেড়হাজার দর্শক অভিনয় দেখিবার জন্য জমায়েত হইয়াছিল। অভিনেতার গৃহের মোমবাতিই না কি এ অগ্নিদাহের কারণ।

* * *

নিউ হেভেনের মিসেস্ নেটেলাইক্লোড্ কুইষ্ট দুই বৎসরে দুইটী যমজ শিশু স্বামীকে উপহার দিয়াছেন। প্রথম জাত সন্তানটী ১৯৩৬ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর রাত্রি এগার ঘটিকার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; অন্যটী ১৯৩৭ সালের পয়লা জানুয়ারী বারটা ত্রিশ মিনিটের সময় পৃথিবী দর্শন করিয়াছে। ইংরাজী মতে দুই ভাইয়ের বয়সে এক বৎসর তফাৎ হইয়া গেল।

* * *

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চেন সিম্পা আঠার বৎসর বয়সে মিস্ নেয়া নাম্নী একটী এগার বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু বর কন্যার পিতার সহিত কোন কারণে লাঠালাঠি করিয়া পলায়ন করে। আজ পর্য্যন্ত সে সৈনিক-জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মিস্ নেয়ার অভিভাবক বা হিতৈষীমণ্ডলী চেন সিম্পাকে ভুলিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবার জন্য নেয়াকে সাধিয়াছে, কিন্তু সে তার বাক্‌দত্ত স্বামীর আশা ছাড়িতে পারে নাই।

বর এতদিন বাদে ফিরিয়া বধূর গলে মাল্যদান করিয়াছে। সে এখন 'কি চ্যাঙ্ সি সেন্' দলের একজন প্রধান অধ্যক্ষ।

* * *

চীন দেশের ছাত্রীরা জাপানী মাল প্রত্যাহার করিবার জন্য ব্যাজ ও নিশান লইয়া ন্যান্কিনের পথে পথে ঘুরিয়াছিল—কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ব্যাজ এবং নিশানের কাপড় দুইটীই জাপানে প্রস্তুত।

* * *

মার্টিন সিয়ারার নামক জনৈক ভদ্রলোক একটি অদ্ভুত ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাঁচ হাজার টুকরা লম্বা কাঠ ও কয়েক মাইল লম্বা তার আছে। তাহাতে পৃথিবীর সাতাশটি বড় বড় সহরের বিভিন্ন সময় দেখা যায়।

পুস্তক-পরিচয়

কেদার-বদরীর পথে—(চিত্রসম্বলিত ভ্রমণ-কাহিনী) —শ্রীকাত্যায়নী দেবী প্রণীত। প্রকাশক—ডাক্তার কে, পি, রায়, এম্-বি। ১৯৫, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কেদার-বদরীর পথে গ্রন্থখানির ভিতর লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লব্ধ বিচিত্র কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায় এবং তীর্থ-ভ্রমণের একটি বাস্তব চিত্র লিপি-নৈপুণ্যে চমৎকার ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লেখিকার ভাষা প্রশংসনীয়। কোথাও বর্ণনা বাহুল্য না থাকায় ভ্রমণ-কাহিনীখানি চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। যাঁহারা ভ্রমণ-পিপাসু,তাঁহাদিগের পক্ষে এই বইখানি বিশেষ উপযোগী। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এরূপ গ্রন্থের মর্য্যাদা যে সকলের নিকট অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা পড়িয়া সত্যই তৃপ্তিলাভ করিবেন।

ছেলেদের বীর হাম্বীর—শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ। প্রকাশক—শ্রীঅনিলকুমার গুহ। ১০।১এ, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ইহা একখানি ঐতিহাসিক গল্প-পুস্তক। লেখকের ভাষা সুন্দর। গল্পটীকে ফুটাইয়াছেনও মন্দ নয়। এ শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হওয়া শিশু-সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। তবে বইখানির দাম অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে হইল। বহিরাবরণও ভাল হয় নাই। এ বিষয়ে প্রকাশকের দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

আজগুবি—শ্রীইন্দিরা দেবী। 'হৃষীকেশ-স্মৃতি-মন্দির', ৫।১, কেওার ডাইন্ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে শ্রীমতী লীলা দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

এখানি ছেলেদের কবিতা পুস্তক। লেখিকা ইতঃপূর্ব্বে নানা মাসিক-পত্রে লিখিয়া বেশ নাম করিয়াছেন—এ বইখানি তাঁহার সুনাম আরও বর্দ্ধিত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ছেলেদের অনাবিল আনন্দ দিবার-জন্য অজস্র ছবিও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখিকার কবিতা লেখার হাত আছে। ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরও ভাল রচনার আশা করি।

রোবায়াৎই হাফেজ—অনুবাদক, শ্রীসুধীরকুমার হাজরা। শ্রীনির্ম্মলকুমার মিত্র কর্ত্তৃক 'সুজাতা-স্মৃতি-মন্দির' হইতে প্রকাশিত। দাম—আট আনা।

অনুবাদকের ভাষা সহজ, সুন্দর। আমরা বইখানি পড়িয়া যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি।

ওমরখৈয়ম—৺সুজাতা দেবী। প্রকাশক—শ্রীসুধীর-কুমার হাজরা। ৬।১৪, একডালিয়া রোড; কলিকাতা। দাম—নয় সিকা।

ওমরখৈয়মের বাঙ্‌লা অনুবাদ অনেকেই করিয়াছেন, আরও করিবেন। কেন না—খৈয়মের সুর আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

সুজাতা দেবীর অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। ইনি অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন বলিয়া সত্যই আমাদের দুঃখ হয়। কেন না, তাঁহার মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট শক্তি ছিল—ভবিষ্যতে তিনি অনায়াসে নিজেকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন।

ছবি ও প্রচ্ছদ-পট চমৎকার। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই মাসে 'গল্প-লহরী'র বৎসর শেষ হইল। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনারা ২০-এ চৈত্রের মধ্যে ১৩৪৪ সালের দক্ষিণা সাড়ে তিন টাকা, এবং উপহার পাঠাইবার জন্য আরও ছয় আনা, অর্থাৎ তিন টাকা, চোদ্দ আনা মনিঅর্ডার করুন। আগামী বৎসরের জন্য আমরা কি আয়োজন করিয়াছি, বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার নিবেদনে তাহা দেখুন।